উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

[উদ্বো]ধন কার্যালয় কলকাতা মাঘ ১৩৯৮ ৯৪তম বর্ষ ১ম সংখ্[যা]

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র চুরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

৯৪তম বর্ষ

মাঘ ১৩৯৮ থেকে পৌষ ১৩৯৯
জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ১৯৯২

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
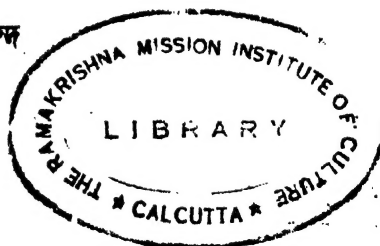
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : চুয়াল্লিশ টাকা ☐ সডাক : পঞ্চাশ টাকা ☐ প্রতি সংখ্যা : ছয় টাকা

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৯৪তম বর্ষ

মাঘ ১৩৯৮ থেকে পৌষ ১৩৯৯

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ১৯৯২

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

আসাম

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর

বিহার

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংঘ, সেক্টর-১/বি,
বোকারো স্টীল সিটি

উড়িষ্যা

রামকৃষ্ণ মঠ, চক্রতীর্থ, পুরী

ত্রিপুরা

রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা

মধ্যপ্রদেশ

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কোয়ার্টার নং-৫০৭
(এস. এস. টি.)/২, বাজনী, জেলা : বস্তার

মহারাষ্ট্র

রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার, বোম্বাই-৫২

পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা

রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ, কাঁকুড়গাছি
রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গল, ২৮বি, গড়িয়াহাট রোড
সলিলা সরকার, এ-ই ৬৫৫, সল্ট লেক
রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম, ৫/৩৬, বিজয়গড়
সেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স, ৩/৫/৩,
রামকান্ত বসু স্ট্রীট, বাগবাজার
গদাধর আশ্রম, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক, সেলিমপুর
বিবেকানন্দ যুব কল্যাণ কেন্দ্র, চেতলা
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
বিবেকানন্দ গ্রন্থলোক, ৯, আর. এন. টেগোর রোড,
নরপল্লী, কলকাতা-৭০০ ০৬৩
সুবহ, ৫৬ ডি. ডি. মণ্ডলঘাট রোড, দক্ষিণেশ্বর
রামকৃষ্ণ কুটির, এইচ-২১এ নবাদর্শ, বিরাটি

উত্তরবঙ্গ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, জলপাইগুড়ি
বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, দিনহাটা, কুচবিহার

মেদিনীপুর

রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক রামকৃষ্ণ মঠ, গড়বেতা

উত্তর ২৪ পরগনা

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া
বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নবব্যারাকপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, স্যান্ডেলের বিল
নবং পাঠাগার ও বিবেকানন্দ আলোচনা চক্র, নিমতলা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, ভাঙ্গড়

হুগলী

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, ঘাসিক জঙ্গল রোড, কাতরং

নদীয়া

রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ
রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, কল্যাণী রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর

বর্ধমান

রামকৃষ্ণ মিশন [illegible], আসানসোল
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রামমোহন
এ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, ডি. পি. এল. বলানী,
দুর্গাপুর
স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি,
বিদ্যাসাগর এ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর

বীরভূম

বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র
পৌর বাণিজ্যিক ভবন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫
আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, পোঃ ভদ্রপুর

সংগ্রহ-কেন্দ্র

এম. কে. বুক সেলার্স, পোঃ বি. চারালি,
জেলা : শোণিতপুর, আসাম
শ্যামবাজার বুক স্টল, ২/২০, এ. পি. সি. রোড,
পাতিরাম বুক স্টল, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম, বেলুড় মঠ
সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া রেল স্টেশন

সৌজন্যে : আর. এম. ইণ্ডাস্ট্রিজ, কাঁটাদিয়া, হাওড়া-৭১১ ৪০১

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ ম[illegible] মিশনের একমাত্র
বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

৯৪তম বর্ষ মাঘ ১৩৯৮

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য □ চুয়াল্লিশ টাকা □ সডাক □ পঞ্চাশ টাকা □ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও দেওয়া যায়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) □ এক হাজার টাকা
বর্তমান সংখ্যার মূল্য চার টাকা

গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন ৯৪তম বর্ষ

সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
যুগ্ম সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বেগের বিষয় যে, গত কয়েক মাস যাবৎ গ্রাহকদের অনেকে সাধারণ ডাকে, এমনকি রেজিস্ট্রি ডাকেও, উদ্বোধন হয় দেরিতে পাচ্ছেন অথবা একেবারেই পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন। সহৃদয় গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানাই যে, স্থানীয় ডাকঘর এবং ঊর্ধ্বতম ডাকবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ডাকবিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের পত্রিকা-প্রাপ্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিতরণের আশ্বাসও দিয়েছেন। গ্রাহক-দের অনেকেই ভাবছেন হয়তো উদ্বোধন-এর পক্ষ থেকে ঠিকমতো পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয় না। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। আমরা নিয়মিত পত্রিকা ডাকে দিয়ে থাকি। ডাকঘরের সঙ্গে ব্যবস্থামতো প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ২৩ অথবা ২৪ তারিখ গ্রাহকদের পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়।

গত আশ্বিন সংখ্যা ডাকে পাননি বলে কেউ কেউ জানাচ্ছেন এবং ডুপ্লিকেট কপি পাঠাতে অনুরোধ করছেন। গত আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র সংখ্যায় প্রতিবারের মতো আমরা জানিয়ে-ছিলাম যে, আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। সহৃদয় গ্রাহকগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণ এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। কাগজ ও মুদ্রণাদির অতি-দুর্মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি বিনামূল্যে দেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া, এবছর শারদীয়া সংখ্যার অত্যধিক চাহিদায় মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলিও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত।

শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করবেন বলে জানিয়ে যাঁরা ৩১ ডিসেম্বরের ('৯১) মধ্যেও সংগ্রহ করেননি, তাঁদের সংখ্যাটি পাবার আর নিশ্চয়তা থাকছে না।

☐ মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকার বর্ষ শুরু হয়। ☐ প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে বর্তমান বর্ষের (৯৪তম বর্ষ : ১৩৯৮-১৩৯৯/১৯৯২) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ : চল্লিশ টাকা ☐ ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ : পঞ্চাশ টাকা ☐ বাংলাদেশ—নব্বই টাকা ☐ বিদেশের অন্যত্র— দুশো টাকা (সমুদ্র-ডাক), চারশো টাকা (বিমান-ডাক)।

আজীবন গ্রাহকমূল্য : এক হাজার টাকা (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য)

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বৎসরান্তে নবীকরণ-সাপেক্ষ) কিস্তিতেও (অনূর্ধ্ব বারোটি) প্রদেয়। কিস্তিতে জমা দিলে প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে একশো টাকা দিয়ে পরবর্তী এগারো মাসের মধ্যে বাকি টাকা (প্রতি কিস্তি কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা) জমা দিতে হবে।

☐ ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে "Udbodhan Office, Calcutta" এই নামে পাঠাবেন। পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়।

☐ চেকের/ড্রাফটের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

☐ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯·৩০—৫·৩০ ; শনিবার বেলা ১·৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

মাঘ ১৩৯৮ জানুয়ারি ১৯৯২ ৯৪তম বর্ষ—১ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

'উদ্বোধন'-এ সাধারণকে কেবল positive ideas (ইতিবাচক ভাব) দিতে হবে। negative thoughts (নেই নেই ভাব) মানুষকে weak (নির্জীব) করে দেয়। যে-সকল মা-বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়—বলে 'এটার কিছু হবে না', 'বোকা গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেক স্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চ অধিকারের তুলনায় যারা ঐরূপ শিশুদের মতো, তাদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive ideas দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐসব বিষয় কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভালরকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম—তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ব্যাপার!

Physical, mental, spiritual (শরীর, মন ও আত্মা-সম্বন্ধীয়) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive idea (গড়বার ভাব) সকল দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করে করেই আমাদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thoughts ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে।... ঠাকুর কারও ভাব নষ্ট করেননি। মহা অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণে সকলকে তুলতে হবে—জাগাতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

ঐ যে বাজে তূর্য তাঁহার

ভারতবর্ষ আজ, এই মুহূর্তে বহু কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সঙ্গীন পরিস্থিতি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অস্থিরতা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দেশের কোন কোন অংশে চূড়ান্ত নৈরাজ্য, দৈনন্দিন জীবনে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমূহের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান নিঃসঙ্গতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানের ব্যাপক ক্রমাবনয়ন প্রভৃতি সমবেতভাবে সমগ্র দেশকে একটি বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্নের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। এইগুলির সহিত যুক্ত হইয়াছে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'য়ের মতো দুটি ভয়াবহ সঙ্কট। একটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এবং অপরটি জাতিগত বা আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতা, যাহাকে ইদানীং 'আঞ্চলিকতাবাদ', 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইতেছে। ঠিক এই মুহূর্তে এই দুটি সমস্যা ভারতবর্ষে যেন দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এবং ইহাদের সমাধানের উপরেই যেন দেশ ও জাতির স্থায়িত্ব আজ নির্ভরশীল। আজ দেশের প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের উচিত কেমন করিয়া এই প্রতিবন্ধককে অপসারণ করা যায় আন্তরিকভাবে তাহার উপায় অনুসন্ধান করা এবং যাহাতে উহারা আরও বৃহৎ বিপর্যয়ের মধ্যে দেশ ও জাতিকে না ফেলিতে পারে তাহার জন্য সর্বপ্রকারে সক্রিয়ভাবে সতর্ক থাকা।

সমাধানের পথ খুঁজিতে হইলে প্রথমে যাহা করা প্রয়োজন তাহা হইল সমস্যার মূলকে চিহ্নিত করা। সমস্যার শিকড়টি চিহ্নিত হইলে উহার উৎপাটন কঠিন হইতে পারে, আয়াসসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু অসম্ভব হইবে না। আমরা যদি দেশের ঐ দুটি বিভেদমূলক শক্তির উৎস অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে দেখিব যে, উহা হইল সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল প্রধানতঃ তিনটি বস্তু: অসন্তোষ, অসহিষ্ণুতা এবং অবিশ্বাস। এই অসন্তোষ, অসহিষ্ণুতা এবং অবিশ্বাসের জন্য কে বা কাহারা দায়ী অথবা কিভাবে দায়ী তাহা লইয়া বিচার বিশ্লেষণ করিয়া এখন লাভ নাই, কারণ উহাতে অনর্থক শক্তিক্ষয়ই হইবে এবং সমাধানের উপায় ক্রমেই নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে। ক্ষতি তো যাহা হইবার হইয়াছেই, এখন আবার পরস্পরের সমালোচনা এবং দোষদর্শন করিয়া কী লাভ? এখন প্রয়োজন কি করিলে অসন্তোষ, অসহিষ্ণুতা এবং অবিশ্বাস দূর হইবে, নূতন করিয়া উহারা আর বিস্তার করিবে না এবং কিভাবে আমরা পরস্পরের মধ্যে আমাদের আদি মিলনভূমিটি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, সে-সম্পর্কে সর্বপ্রযত্নে অগ্রসর হওয়া। বুদ্ধদেব বলিতেন, যদি কেহ অকস্মাৎ শরবিদ্ধ হইয়া গবেষণা করিতে বসে কে তাহার উদ্দেশে শরনিক্ষেপ করিয়াছে, কোন্ দিক হইতে করিয়াছে, কী তাহার উদ্দেশ্য ইত্যাদি, তাহা হইলে সে তাহার অন্তিম মুহূর্তকেই শুধু ত্বরান্বিত করে। তাহার যাহা প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত তাহা হইল ঐ শরটিকে শরীর হইতে উৎপাটন করা। স্বামী বিবেকানন্দও বলিতেন: "ঘর যদি অন্ধকার থাকে এবং তুমি যদি 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া চিৎকার কর, তাহা হইলে কি অন্ধকার দূর হইবে? একটি প্রদীপ বা একটি বাতি লইয়া আইস, অন্ধকার আপনিই চলিয়া যাইবে।" তিনি বলিতেন, অশুভকে দূর করিতে হইলে শুভকে আনিতে হইবে, দুর্বলতাকে দূর করিতে হইলে শক্তির আশ্রয় লইতে হইবে, হিংসাকে নাশ করিতে হইলে প্রেমকে অবলম্বন করিতে হইবে, বিদ্বেষকে উৎপাটন করিতে হইলে প্রীতিকে অন্যের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি ছাড়া কোন সমস্যারই সমাধান হয় না।

ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে মহাবিচিত্র একটি দেশ। এত বিচিত্র ধর্ম, এত বিচিত্র জাতি, এত বিচিত্র সংস্কৃতি পৃথিবীতে কোথাও নাই। এই বৈচিত্র্য যেমন ভারতবর্ষের দুর্বলতা, ইহাই আবার তেমনই উহার শক্তি। যুগ যুগ ধরিয়া এই বৈচিত্র্যকে লইয়াই ভারতবর্ষ পথ চলিয়াছে। সমস্যা আসিয়াছে, সঙ্কট দেখা দিয়াছে, কিন্তু কখনও এই বৈচিত্র্যের জন্য তাহার অস্তিত্ব বিপন্ন হয় নাই; উপরন্তু বৈচিত্র্যের সুবাদে ভারতবর্ষ একটি অপূর্ব সহিষ্ণুতা এবং গ্রহীষ্ণুতার কৃষ্টি গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহা তাহার দেহ, মন ও আত্মাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু নানা কারণে ভারত ক্রমে ক্রমে হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহার বৈচিত্র্যের প্রাণদায়ী শক্তিকে— তাহার যুগ-যুগ লালিত সহন ও গ্রহণের চরিত্রকে।

ভারতবর্ষ যে তাহার শক্তিকে ক্রমে হারাইতেছে তাহা দেশের মানুষ বুঝিতে না পারিলেও একজন 'নিরক্ষর' এবং 'সাধারণ' ব্যক্তি কিন্তু তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। 'মতুয়ার বুদ্ধি'কে অর্থাৎ মত, বুদ্ধি, চিন্তা এবং আদর্শের গোঁড়ামিকে ত্যাগ করিয়া সহন ও গ্রহণের উদার মন্ত্রকে, মিলন ও সমন্বয়ের আদর্শকে তিনি দেশ ও জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। গুরুর চিন্তা ও আদর্শকে বলিষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গিতে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি জানিতেন অসন্তোষ, অসহিষ্ণুতা এবং অবিশ্বাস হইতেই জন্ম লয় গোঁড়ামি, যাহা মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে, গ্রাস করে তাহার শুভ ও সৎ বুদ্ধিকে। স্বামীজী বলিতেন: "অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিরই মতো এই গোঁড়ামিও একটি ভয়ানক ব্যাধি। মানুষের যত রকম কুপ্রবৃত্তি আছে, এই গোঁড়ামি তাহাদের সবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহা দ্বারা ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়, স্নায়ুমণ্ডলী অতিশয় চঞ্চল হয় এবং মানুষ ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠে।" (বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১৫২) স্বামীজী তাঁহার ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়, তাঁহার চিঠিপত্রে, তাঁহার প্রকাশ্য ও বৈঠকী ভাষণে তিনি বারম্বার ঐ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সরব হইয়াছেন। শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক ভাষণেই তাঁহার বজ্রনাদ পৃথিবী শুনিয়াছিল: "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং উহাদের ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সকল জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এইসব ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত।··· আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্মমহাসভার সম্মানে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহা সর্ববিধ গোঁড়ামি—তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতনের এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।"

এই কথাগুলির পশ্চাতে বিশ্বের ইতিহাসের সহিত স্বামীজীর গভীর পরিচয়ের ভিত্তি ছিল; কিন্তু সে-পরিচয় তখনও পর্যন্ত ছিল গ্রন্থ-ভিত্তিক। পক্ষান্তরে যে-পরিচয় ছিল তাঁহার প্রত্যক্ষ, তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা-লব্ধ তাহা তাঁহার দেশের ইতিহাস। আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমা (যাহার শতবর্ষ-পূর্তি বর্তমান বৎসরে উদ্‌যাপিত হইতেছে) করিয়া তিনি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যে গভীর সংকট আসন্ন তাহা হইল সংহতির সংকট, ঐক্যের সংকট, অখণ্ডতার সংকট। সেই সংকট হইতে পরিত্রাণের জন্য তিনি তাঁহার দেশবাসীর নিকট, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট অব্যাহতভাবে সদর্থক চিন্তা ও ভাবরাশিকে মর্মস্পর্শী ওজস্বী ভাষায় তুলিয়া ধরিতে থাকিলেন:

"আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে।···

"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

"আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।" (বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৯)।

"গ্রহণই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত—বর্জন নয়।···কেবল পরমতসহিষ্ণুতা নয়;···আমি উহাতে বিশ্বাস করি না। আমি 'গ্রহণে' বিশ্বাসী।··· আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রীস্টানদিগের গির্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও তাঁহার ধর্মের শরণ লইব এবং অরণ্যে গমন করিয়া হিন্দুদিগের পার্শ্বে ধ্যানে মগ্ন হইব, যাঁহারা সকলের হৃদয়কন্দর-উদ্ভাসনকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট। শুধু তাহাই নহে, ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম আসিতে পারে তাহাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব।" (বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১৯১-১৯২)

"হে পঞ্চনদের সন্তানগণ, এখানে··· আমি তোমাদের নিকট আচার্যরূপে উপস্থিত হই নাই··· দেশের পূর্বাঞ্চল হইতে আমি পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিতে এবং পরস্পরের ভাব মিলাইবার জন্য আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি—আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে, আসিয়াছি

আমাদের মিলনভূমি কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে; কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-বাণী অনন্তকাল ধরিয়া আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে, তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি তোমাদের নিকট কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব করিতে, কিছু ভাঙিবার পরামর্শ দিতে নয়।…

"সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, দোষদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে; এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করিবার, এগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে। সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তায় যে জাতীয় অগ্রগতি প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্মুখে আগাইয়া দিতে হইবে।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ২৬৭-২৬৯)

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল —আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই,… ভারতবাসী আমার প্রাণ; … বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ…।" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯)

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত স্বামীজীর মুখে মাদ্রাজের মানুষ শুনিয়াছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতের রূপরেখা কী হইবে। অধ্যাপক কে. সুন্দররাম আয়ার তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন: "স্বামীজী ভারতবর্ষে তাঁহার বিরাট ধর্মীয় উত্থান ও সংস্কারের পরিকল্পনা আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যাহাতে হিন্দু, খ্রীস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ—সকলেই ভ্রাতৃভাবে আশা এবং সমন্বয়বোধে পূর্ণ হইয়া এক সাধারণ পতাকাতলে সমবেত হইবে এবং সকল মত ও পথের মানুষ অশ্রান্ত প্রয়াসে অগ্রসর হইয়া চলিবে জাতীয় আকাঙ্ক্ষাপূর্তির সাধারণ লক্ষ্যে।" (**Reminiscences of Swami Vivekananda, 2nd Edn., 1964, p. 94**)

ঐক্যবদ্ধ সমুন্নত ভারতের যে-স্বপ্ন স্বামীজী দেখিতেন উহা তাঁহার ভাবনা ও কর্মকে এমনভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া সকলে অনুভব করিত যেন—কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী লিখিতেছেন—"তিনিই স্বয়ং সাকার ভারতবর্ষ।" (**'Reminiscences', p. 110**) ভগিনী নিবেদিতার অভিজ্ঞতাও একইরূপ: "বিবেকানন্দের ধারণায় ভারতবর্ষ ছিল এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে গ্রথিত এবং গভীরভাবে দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, ঐ ঐক্য যতখানি মনোলোকের ততোধিক হৃদয়ের।… তাঁহার ব্যক্তিগত সংগ্রাম এবং আকাঙ্ক্ষা আবর্তিত হইত তাঁহার স্বদেশের কল্যাণসাধনের অনির্বাণ বাসনাগ্নিতে। তিনি কখনও জাতীয়তার প্রবক্তা ছিলেন না—তিনি ছিলেন জাতীয়তার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।" (**The Master as I Saw Him, 9th Edn., 1963, p. 240**)

আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বে যখন দেশের জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে দানা বাঁধে নাই, জাতীয়তাবোধের যথার্থ অর্থে উন্মেষ হয় নাই, ভারতবাসী যে একটিই জাতি (one nation) এই বোধ রাষ্ট্রনৈতিক অর্থে জাগ্রত হয় নাই, তখন স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতবর্ষের মানুষের নিকট জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে একটি ভারতীয় জাতির বলিষ্ঠ ধারণা দিয়াছিলেন, দিয়াছিলেন প্রদেশ বা অঞ্চলের গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া আসমুদ্রহিমাচল এক অখণ্ড ভারতবর্ষের সজীব রূপরেখা। ভারতবর্ষ শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নহে—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, শিখ, পারসিক, জৈন প্রভৃতি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের সমান দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ। কাশ্মীর হইতে কেরল, মণিপুর হইতে মহারাষ্ট্র, আসাম হইতে আন্দামান, গঙ্গা হইতে গোদাবরী, ইরাবতী হইতে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত যে বিশাল ভূখণ্ড, ইহার প্রতিটি ধূলিকণায় সকল ভারতবাসীর সমান অধিকার। কারণ, উহা ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের প্রিয় মাতৃভূমি। ইহার একটি অংশে আঘাত করিলে আমাদের সকলের মাতৃদেহকেই আঘাত করা হইবে। এই বোধ, এই আবেগ, এই দৃষ্টি স্বামী বিবেকানন্দের দান। ইহার সাহায্যে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত সকল অসন্তোষ, অসহিষ্ণুতা ও অবিশ্বাসের আমরা মূলোৎপাটন করিব এবং বর্তমানের কঠিন সমস্যার সমাধান করিয়া ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ ভারতকে আমরা গড়িয়া তুলিব। সংহতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ দেশের নিকট, ঐক্যের মন্ত্রে সম্বদ্ধ জাতির নিকট কোন প্রতিবন্ধকই নহে অপ্রতিরোধ্য—কোন সমস্যাই নহে অনতিক্রম্য।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৩০তম জন্মদিবসে এবং তাঁহার ভাব-শরীর 'উদ্বোধন'-এর ৯৪তম জন্মবর্ষে পদার্পণের পুণ্যলগ্নে দেশবাসীকে ইহা স্মরণ করাইবার দায়িত্ব আমাদের।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্*

বৃন্দাবন
৭ জানুয়ারি (১৯)০৩

প্রিয় কালীকৃষ্ণ,

তোমার প্রেরিত স্নেহ উপহার মাত্র গতকালই পাইয়া প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। [স্বামীজীর] ফটোগুলির একটি পূর্বেই দেখিয়াছি। অপরটি—পাগড়ী-পরা—নূতন এবং খুবই সুন্দর—কী শিশুসুলভ এবং নিষ্পাপ মুখ! অহোভাগ্য! এখন আমাদের স্বামীজীর ছবি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে! হায় অদৃষ্ট!

খগেনের পত্র হইতে তোমার আরোগ্যলাভ এবং পুনরায় পূর্ণ শক্তি ফিরিয়া পাইবার সংবাদে খুবই আনন্দিত হইয়াছি। মা তোমাকে আশীর্বাদ করুন। আশ্রমের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা জানাইবে।

ইতি
য়ানন্দ

॥ ২ ॥

ীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

মায়াবতী
১।৪।(১৯)০৫

প্রিয় গঙ্গাধর[১],

তোমার প্রেরিত ২৩শে মার্চের পোঃ কাঃ এখানে আসিয়া পাইয়াছি। তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমি ও অমৃতানন্দ (Mr. Johnson) গত পরশ্ব সন্ধ্যাকালে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মাদার[২], স্বরূপানন্দ ও কানাই[৩] টনকপুরে আছেন। কুলির অভাবে আসিতে পারেন নাই। দুই এক দিনে আসিয়া যাইবেন। এখানে এখনও বেশ শীত। Temperature 40°। আশ্রমটি বেশ সুন্দর করিয়া তৈয়ার হইয়াছে, কার্যও মন্দ হইতেছে না। অবশ্য আশানুরূপ ফল বিলম্বেই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষে। প্রভুর কৃপায় সমস্ত কুশলেরই আশা করা যায়। আমার শরীর সেইরূপই আছে। এখনও কোন পরিবর্তন বোধ করিতেছি না। তবে এখানকার জলবায়ু যে অতি সুন্দর ইহা বলাই বাহুল্যমাত্র। সুশীল তোমাকে প্রণামাদি জানাইতেছে। ছেলেদের শুভেচ্ছা দিবে। তুমি আমার ভালবাসাদি জানিবে।

ইতি
শ্রীতুরীয়ানন্দ

* চিঠিটি ইংরেজীতে লেখা।

১ স্বামী অখণ্ডানন্দ   ২ মিসেস সেভিয়ার   ৩ স্বামী নির্ভয়ানন্দ

॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

মায়াবতী
২৯।৬।(১৯)০৫

প্রিয় গঙ্গাধর,

তোমার ১৯শে তারিখের পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আশ্রমের কার্যসমুদয় সুচারু সম্পন্ন হইতেছে জানিয়া কতই আনন্দ অনুভব করি। প্রভু তোমার শরীর কুশলে রাখুন, তোমাদ্বারা তাঁহার অনেক কার্য হইবে। আমার শরীর সেইরূপই চলিতেছে, বিশেষ উন্নতি বোধ করিতেছি না। স্নায়বীয় রোগ প্রায় সম্পূর্ণ সারে না। যাহা হউক এখানে যন্ত্রণা যেমন মাথাধরা বা ঘোরা এবং শারীরিক অবসন্নতা প্রভৃতি অনেক কম বোধ হইতেছে। বঙ্গদেশাভিমুখে যাইবার এখন কোন সংকল্প নাই। তোমার আশ্রম দর্শনের ইচ্ছা হয়। প্রভুর ইচ্ছা হইলে কোন সময় আমাদের ইচ্ছা সফল হইতে পারিবে। ভূমিকম্প পীড়িতের সাহায্যকার্য শেষ করিয়া কানাই প্রভৃতি ফিরিয়াছে। এখন আর সে প্রদেশে তত কষ্ট নাই। এখানকার অন্যান্য সংবাদ মঙ্গল। তোমার আশ্রমের পরিবার-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সে-সকলের কুশল সংবাদে সুখী হইয়াছি। প্রভু তোমাকে তাহাদের কল্যাণে নিযুক্ত রাখুন প্রার্থনা। সকলের প্রণামাদি জানিবে। আমার ভালবাসা ও নমস্কার গ্রহণ করিবে।

ইতি
তুরীয়ানন্দ

॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

মায়াবতী
২৪।৭।(১৯)০৫

প্রিয় গঙ্গাধর,

তোমার ১৩ই তারিখের দীর্ঘ পত্র পাঠে বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইলাম। বোধহয় স্বরূপানন্দ তোমায় এক পত্র লিখিবেন। আমার শরীরের ফোঁড়াগুলি একটু সারিয়াছে। তবে এখনও সম্পূর্ণরূপে যায় নাই। আর আর সকলে ভাল আছে। সরলাদেবীর কৈলাসযাত্রা এবৎসর স্থগিত রহিল। তিনি এখনও এইখানেই আছেন। শীতকালে থাকিতে পারেন। তোমার শারীরিক কুশল লিখিয়া সুখী করিও। গৃহ-নির্মাণকার্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব কি? যত শীঘ্র হয় ততই ভাল না? মঠ হইতে সংবাদাদি প্রায়ই পাইয়া থাক বোধহয়। সকল ছেলেদের আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানাইবে। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও নমস্কার গ্রহণ করিবে। ইতি

তোমার
শ্রীতুরীয়ানন্দ

॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

মায়াবতী
১০।৯।(১৯)০৫

ভাই গঙ্গাধর,

আমার ৺বিজয়ার নমস্কার ও কোলাকুলি জানিবে এবং তোমার ছেলেদের ভালবাসা ও আশীর্বাদাদি জানাইবে। আশাকরি এবার মার পূজায় তোমরা খুব আনন্দ করিয়া থাকিবে। বঙ্গদেশে এবার মার নামে খুব ধূম মাচিয়াছে দেখিতেছি। মা আমাদের মানুষ করুন এই তাঁহার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা। এখানকার সংবাদ কুশল। তোমাদের কুশল লিখিয়া সুখী করিও। আমার আন্তরিক ভালবাসাদি জানিবে। সকলে তোমাকে ৺বিজয়ার প্রণাম প্রভৃতি দিতেছে। ইতি

তোমার
শ্রীহরি

ভাষণ

আত্মচৈতন্যের উদ্বোধন

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

ধর্মের মূল কথা হলো আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মচৈতন্যের জাগরণ। 'কল্পতরু দিবসে' শ্রীরামকৃষ্ণ আশীর্বাদ করলেনঃ "তোমাদের চৈতন্য হোক।" স্বামী বিবেকানন্দ সারাজীবন ধরে বললেনঃ প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগ্রত হোন। নতুন কোন ধর্ম প্রচারের জন্য বা নবীন সম্প্রদায় সৃষ্টি করার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আসেননি। আমাদের ভিতরের চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলতেই তাঁদের আবির্ভাব।

আপন অন্তরে ভগবানের উপলব্ধি—আত্মচৈতন্যের জাগরণ বা আধ্যাত্মিক বিকাশ সকল ধর্মেরই মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব ধর্মেই আহার-বিহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধের ছড়াছড়ি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেসব বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলেননি। এককথায় শুদ্ধসত্ত্ব জীবনযাপনের কথাই তাঁরা বারবার বলেছেন।

শুদ্ধসত্ত্ব জীবনযাপন করতে করতে অন্তরে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটবে। বিকাশের অর্থ—শক্তি আমার ভিতরেই আছে, কিন্তু চাপা পড়ে আছে, আবৃত হয়ে আছে, ক্রমশঃ সেই শক্তিকে বিকশিত, প্রকাশিত করতে হবে। আমরা দেখি, একটি শিশুর জীবনে ধীরে ধীরে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটছে। পশু-পাখির শারীরিক ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু আত্মিক ব্যক্তিত্ব নেই। সদ্যোজাত শিশুরও তাই। একবছর দুবছর বয়স হলে তার আত্মিক বিকাশ ঘটতে থাকে। এই আত্মিক বিকাশের প্রাথমিক অর্থ—'অহং' জ্ঞান বা আমিত্ববোধ। ছোট্ট শিশু প্রথম বলে—'এটা চাই, ওটা চাই।' কিন্তু কিছুদিন পর সে বলতে শুরু করে—'আমি চাই, আমায় দাও।' এই আমিত্ববোধই আত্মিক ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র শক্তি জাগরিত হয়। আধ্যাত্মিক আমিত্ববোধ এরই পরম সীমা। মানুষের ছোট্ট 'আমি' যে কত বিশাল ও কত মহান হতে পারে, একমাত্র ভারতবর্ষই বিশ্বকে সেকথা শুনিয়েছে। মহাপুরুষ পরম্পরায় বা বেদ-উপনিষদাদির মধ্যে এই 'আমি' বা এই অন্তর্নিহিত চৈতন্যের যে-কথা শ্রুত হয়, সেই চৈতন্যের জাগরণই যে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য একথা স্মরণ করিয়ে দিতেই এযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজী। এই ক্ষুদ্র ছোট 'আমি'টাকে—তাঁদের ভাষায় 'কাঁচা আমি'কে—'পাকা আমি' করতে হবে।

স্বামীজী বলছেন, আমাদের ভিতরে অনন্ত শক্তি আছে। শারীরিক ও মানসিক শক্তি—বুদ্ধি-মেধা-স্মৃতি-ধৃতি—এসবই সেই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। আধার ও প্রয়াস অনুসারে এক-একজনের মধ্যে সেই শক্তির এক-একরকম বিকাশ। কিন্তু সমস্ত শক্তির কেন্দ্রে আছে আত্মশক্তি। এই আত্মশক্তি বা আত্মচৈতন্য না থাকলে কোন শক্তিই শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় না। অতএব এই আত্মচৈতন্যকে বিকশিত করতে হবে। তার বিকাশের জন্য প্রয়োজন অধ্যাত্মবিদ্যা। এই অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনই হলো ধর্মবিজ্ঞান। ছোঁয়াছুঁয়ি, আচার-বিচার, বিধিনিষেধ—এগুলো ধর্ম নয়। উপনিষদে বিদ্যার দুটি বিভাগ আছে। সেখানে বলা হয়েছে—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে।" একটি পরাবিদ্যা, একটি অপরাবিদ্যা। অপরাবিদ্যা জাগতিক কল্যাণের জন্য—ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য। তার প্রয়োজন ঋষিরা অস্বীকার করেননি। কিন্তু পরা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা হচ্ছে—"যয়া তৎ অক্ষরমধিগম্যতে", যার দ্বারা ঐ অক্ষর অর্থাৎ অবিনশ্বর পুরুষকে জানা যায়। 'অক্ষর' হচ্ছেন সেই বিভুচৈতন্য—যিনি অণুরূপে প্রতিটি জীবদেহে বিরাজিত। তাঁর স্বরূপ জানার জন্যই

পরাবিদ্যার প্রয়োজন, তাঁর স্বরূপজ্ঞানই ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসার আগে তিনি অপরাবিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে গেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর অন্তর তৃপ্ত হয়নি। তারপর পাঁচবছর শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে পরাবিদ্যার সাধনা। সেই সাধনায় সফল হয়ে তিনি কিন্তু অপরাবিদ্যাকে ছোট করেননি। তিনি উভয় সাধনার মধ্য দিয়ে উপনিষদের সেই বাণীকেই সত্য বলে প্রচার করেছেন—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে।" প্রকৃতিবিজ্ঞান বা ভৌতবিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান—দুটিই প্রয়োজন মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য—স্বামীজীর জীবনে এটি প্রমাণিত। তবে অধ্যাত্মবিদ্যাতেই সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা এবং সার্থকতা।

ধর্মপথে আমরা এগোচ্ছি কিনা তার প্রমাণ কি? একটি শিশুর ওজন হয়তো সাত পাউন্ড। তাকে প্রচুর ভাল ভাল খাইয়েও সাত মাস পর যদি দেখি, তার ওজন সেই সাত পাউন্ডই আছে তবে বুঝতে হবে, তার শারীরিক বিকাশ ঘটছে না। সেই রকম ঠাকুরঘরে পূজারতি করে, নিয়মিত ঘড়ি ধরে জপাদি করেও যদি দেখা যায়, হৃদয় উদার হয়নি—মনে তেমনি হিংসা দ্বেষ অভিমান আছে, সকলের প্রতি সহানুভূতি বা ভালবাসা জাগেনি, তবে বুঝতে হবে, ধর্মের পথে কিছুই অগ্রসর হওয়া যায়নি। আত্মচৈতন্যের বিকাশ হৃদয়ের মধ্যে যত হবে তত এই 'কাঁচা আমি'র ভাবটা দূর হবে। 'কাঁচা আমি' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'অহং'ভাব-এর কথা, ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ 'আমি'র কথা। এই 'আমি' শুধু নিজের স্বার্থ বোঝে। 'পাকা আমি' বলতে তিনি বলছেন, সকলের মধ্যে একই চৈতন্য বিরাজমান তা উপলব্ধি করতে যা প্রেরণা দেয়। 'পাকা আমি'-র বিকাশে মানুষ সকলকে ভালবাসে—সকলকে সেবা করে। 'এক'কেই সবার মধ্যে দেখে বলে সে শোক-মোহ-বিমুক্ত হয়। এইভাবে বিচার করে সাধনপথে এগোতে হয়।

কেবলমাত্র সাধনের সময় নয়—বাড়িতে ছোট শিশুকে শিক্ষা দেবার সময় থেকেই এই 'পাকা আমি'র বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। অনেক সময়ই দেখা যায়, একই বাড়ির দুটি শিশুর মধ্যে একজন কোন খাবার পেলে একাই খেয়ে নেয়, অপর-জন সেই সামান্য বস্তুই সকলের সঙ্গে ভাগ করে খায়। প্রথমটির 'আমি' কাঁচা, দ্বিতীয়টির আমিত্ব বিকশিত হচ্ছে। এখন মা-বাবা শিশুকে এই আমিত্ব বিকাশের সহায়তা করলে সেটাই হবে ধর্মের প্রথম সোপান।

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, সমাজে বেশির ভাগ লোকই বিলিয়ার্ড বলের মতো কেবল একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে চলে। এই ধাক্কাধাক্কি বা ঝগড়াঝাঁটি হলো 'কাঁচা আমি'র প্রকাশ। এই 'কাঁচা আমি'কে পাকা করে শান্তভাবে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য নিয়ে চলতে হলে প্রয়োজন অন্তরে সেবার ভাব জাগানো। এই সেবার ভাব থেকেই প্রেমের সঞ্চার হবে। আর যার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে ধর্মের পথে সে তো অনেক সোপান পার হয়ে গেছে। এভাবেই হবে পাকা আমির বিকাশ—আত্মচৈতন্যের স্ফুরণ।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তর আছে। শিশুবয়সের প্রথম বিকাশ শারীরিক স্তরে। তারপর ক্রমে অহং-এর প্রকাশ। ধীরে ধীরে হয় মানসিক শক্তির বিকাশ। ক্রমে আসে সামাজিক ব্যক্তিত্ব। এখান থেকেই সেবাভাবের শুরু। একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার প্রয়াস। ইংরেজীতে সুন্দরভাবে বলা হয়ঃ "**Individuality growing into personality.**" আমার অহং এতদিন আমার মধ্যেই সীমিত ছিল—আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার এটা, আমার সেটা। সবসময়ই 'আমার আমার'। এখন আমি অপরকে স্বীকার করছি—তোমার আনন্দ, তোমার দুঃখ-বেদনার অংশ আমি ভাগ করে নিতে চাইছি। বিশ্বমানবের প্রতি এই বোধ জাগলে সেটাই হবে আধ্যাত্মিক বিকাশ। স্বামীজী বলছেনঃ "**Expansion is life and contraction is death.**"—বিকাশই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। যত আমরা নিজেকে সঙ্কুচিত করে রাখব ততই আমরা আত্ম-হননের পথে এগোব। সুতরাং নিজেকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—সকল দিকেই বিকশিত করে তুলতে হবে। এই বিকাশ, এই আত্মজ্ঞানের

স্ফুরণ ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়েই হয়। এই বিকাশই আমাদের পশু থেকে পৃথক করে আমাদের শক্তি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা শুরু মাত্র—গোড়াপত্তন। ছোট শিশুকে ক্রমশঃ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কিভাবে 'ক্ষুদ্র আমি', 'কাঁচা আমি'কে 'পাকা আমি'তে পরিণত করতে হয় তাদের কাছে তার ইঙ্গিত দিতে হবে। এরপর দীর্ঘ পথ সে নিজেই চলবে। এইখানে তার সহায় অধ্যাত্মবিদ্যা—বেদ-বেদান্তের দিব্যবাণী, যা ভারতের একান্ত নিজস্ব। শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে চরমোৎকর্ষ লাভ করা, নোবেল পুরস্কার পাওয়া—সবই অর্থহীন হয়ে যায় যদি এই মনুষ্যজীবনে 'পাকা আমি' বিকশিত না হয়, আত্মচৈতন্যের স্ফুরণ না হয়, আত্মস্বরূপের উপলব্ধি না হয়।

সমুদ্রমন্থনকালে শিবের বিষপানের কাহিনী পুরাণে আছে। এই বিষপান করে নীলকণ্ঠ হওয়ার তাৎপর্য কি? শিব বিষ হজম করেছেন। তোমার শিরে সহস্রারে সেই শিব বিরাজ করছেন। তাঁর ধ্যান করে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হলে তুমিও সেই বিষ হজম করার শক্তি পাবে। আমাদের জীবনে ঐ সমুদ্রমন্থনের অর্থ কি? জীবন-সমুদ্রে নিত্য সুখ-দুঃখ, অমৃত-বিষ কতই উঠছে। উভয়কে সহজভাবে গ্রহণ করার শক্তি চাই। বিষকে বা দুঃখকে অস্বীকার করা যাবে না—কিন্তু সে যেন আমাদের অভিভূত করতে না পারে, কণ্ঠের নিচে না নামে। এই হলো আধ্যাত্মিক বিকাশ। তোমার ভিতরে অনন্তশক্তি-সম্পন্ন আত্মা বিরাজমান। তাঁকে জানলে অনন্তের ভাব জাগবে—অসীম শক্তি ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে—সব ক্ষুদ্র ভাব হৃদয় থেকে দূর হয়ে যাবে।

যতক্ষণ আমরা শুধু নিজেকে নিয়ে, নিজের দেহসুখ নিয়ে আবদ্ধ থাকি ততক্ষণ আমাদের হৃদয়ে ক্ষুদ্র ভাব বাসা বেঁধে থাকে। যখন আমরা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি না তখনই হৃদয়ে মহান ভাবের সঞ্চার হয়। সকলের সুখসাধন করার জন্য, সকলকে সেবা করার জন্য মন তখন ব্যাকুল হয়। শুধুমাত্র নিজের বা নিজের পরিবার বা প্রিয়জন নয়—সমগ্র বসুধাই তখন তার কুটুম্ব হয়ে ওঠে। গৃহস্থ তার নিজ গৃহে যতক্ষণ আবদ্ধ, ততক্ষণ সেই গৃহ কারাগার-স্বরূপ। কারাগার ভেদ করে জগতের কল্যাণে আত্মনিয়োজিত করাই গৃহস্থের সনাতন ধর্ম। এই শরীরে আবদ্ধ থেকেই মুক্ত হওয়া, গৃহে বাস করেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার কথা ভারতবর্ষই একদা বলেছে। আমাদের পুরাণে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে তাঁর বহু দৃষ্টান্ত বিধৃত রয়েছে।

আধ্যাত্মিক বিকাশ বা ধর্ম যে সংসারত্যাগ ভিন্ন হবে না তা নয়। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমকেই ভারতবর্ষ সমানভাবে মর্যাদা দিয়েছে। এদের মধ্যে গার্হস্থ্য ধর্মের দায়িত্বই সবথেকে বেশি। কারণ, অপর তিন আশ্রমেরই আশ্রয়স্থল গার্হস্থ্য। গুরুগৃহে ব্রহ্মচারীরা অধ্যয়ন করেন গৃহস্থেরই পৃষ্ঠপোষকতায়। বানপ্রস্থী তথা সন্ন্যাসীদের মাধুকরী বা জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যে আহার প্রয়োজন, তাও নির্বাহ করার ভার গৃহস্থেরই। একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সর্ববিধ উন্নতি নির্ভর করছে গৃহস্থের ওপর। সুতরাং গৃহস্থ যদি সংকীর্ণ ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে তাহলে সে তার স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হবে। তাকে উদার হতে হবে। সেটাই তার আধ্যাত্মিক বিকাশ। আজ ভারতীয় গৃহস্থসমাজের একটি বৃহৎ অংশ এই ধর্মের কথা বিস্মৃত হওয়াতেই সমাজে এমন বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে। আদর্শ গৃহী ও আদর্শ সন্ন্যাসীর মধ্যে কে বড়—এই বিচার করা মূর্খতা। স্বামীজী বলেছেন, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বড়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ গৃহস্থ পার্ষদরা প্রমাণ করে দিয়েছেন গৃহস্থও কত উঁচুতে উঠতে পারেন। সেইসব গৃহস্থ ভক্তদের আচরিত ধর্মই এযুগের আদর্শ। গৃহে থেকেও আত্মচৈতন্যের বিকাশ যে কোন্ সীমায় পৌঁছায় তা তাঁরা নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী আমাদের শিখিয়েছেন—ব্যক্তি হিসাবে সুন্দর হতে হবে, ব্যক্তি-জীবনের মান উন্নত করতে হবে।

'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত', শ্রীশ্রীমায়ের কথা, স্বামীজীর বাণী ও রচনা আলোচনা করলে দেখব,

আদর্শ নাগরিকের যা যা গুণ থাকা উচিত সেসব শিক্ষা আমরা তাঁদের জীবন ও উপদেশ থেকে পাই। তাঁরা বলেছেন, নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথা ভাবাটা অধর্ম, অপরের কথা ভাবা ধর্ম।—এইসমস্ত উপদেশের মনন ও আচরণই আমাদের উদার করে তুলতে ও আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়ক হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামীজী বিশেষ কোন ধর্ম প্রচার করতে আসেননি—সনাতন মানব-ধর্মের কথাই তাঁরা বলেছেন, যে-ধর্ম আচরণ করলে মানুষ 'মান হুঁশ' হবে। তাঁরা 'ষোল আনা' করেছেন, আমরা 'এক আনা' করতে পারলেই অভীষ্ট লাভ হবে। গীতায় ভগবান বলছেন: "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" সুতরাং এই আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছাই। সেই লক্ষ্য হলো অণুচৈতন্যের বিভুচৈতন্যে বিস্ফারণ। একই আত্মা সর্বভূতে আছেন জেনে সকলের প্রতি প্রেম ও সেবার ভাব নিয়ে থাকা—এই-ই প্রকৃত ধর্ম। সেই ধর্ম লাভের জন্য তৎপর হতে হবে। উপনিষদ বলছেন: "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" স্বামীজী বলছেন: "Arise, awake and stop not till the goal is reached."—ওঠ, জাগো, যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্যে না পৌঁছাচ্ছ ততক্ষণ থেমো না।* □

* গত ৩ জুলাই, ১৯৯০ কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ।

টেপরেকর্ড থেকে অনুলিখন: সীতা রায়চৌধুরী এবং বাসন্তী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির (মাঝে)। পিছনে—বিষ্ণুমন্দির/গোবিন্দজীর মন্দির/রাধাকান্ত-মন্দির। সামনে—কালীমন্দিরের নাটমন্দির; এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মথুরবাবুকে অনুরোধ করে পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় তিনি বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সমকালীন অগ্রগণ্য সাধক ও পণ্ডিতদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। বিচারসভায় সমবেত সাধক ও পণ্ডিতবর্গ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এবং শিবমন্দিরের (দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছবি প্রচ্ছদে নেই।) অবস্থান বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু হিন্দুদের দিক থেকেই নয়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের দিক থেকেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি তাৎপর্য রয়েছে। মন্দিরের জমির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, বাকি অংশের অনেকটা জুড়ে ছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী সাহেবের পীরের দরগা। এই যোগাযোগ যেন দৈবনির্দিষ্ট। কারণ, এই ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে যুগাবতার মহাসমন্বয়ের উদার বাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন।—যুগ্ম সম্পাদক

কবিতা

বেলুড় মঠের প্রবীণ গাছগুলি

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বেলুড় মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে
এখনো কয়েকটা গাছ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।
বৃদ্ধ হয়ে গেছে তারা।
অনেক ডালপালা তাদের
ভেঙে গেছে—মরে গেছে।
বিবর্ণ বিদীর্ণ তাদের শুকনো ডালপালা
কেমন অসহায় ক্লান্তিতে
আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে!
অথবা না। তারা গভীর দৃষ্টিতে
কী যেন পর্যবেক্ষণ করছে,
সামনের নিরন্ত বহতা
গেরুয়া গঙ্গার দিকে মুখ করে
মনে হয় তারা কী যেন ভাবছে মনে মনে!
অথচ আশ্চর্য, এই গাছগুলি একদিন
উদ্ধত আবেগী যৌবনে
উচ্ছল উজ্জ্বল সবুজ হয়ে
আকাশের দিকে মুখ তুলে ছিল—
অসংখ্য বলিষ্ঠ বিস্তৃত তাদের প্রসন্ন ডালপালায়
স্নিগ্ধ সবুজ পাতার সে কী
সমৃদ্ধ সম্পন্ন সুন্দর সমারোহ!
পৌষে-মাঘে তাদের সোনালী মুকুল
জেগে উঠত থোকায় থোকায়
বৈশাখে তাদের কত ফল ধরত—
অসংখ্য—অনেক—অগুনতি—
নিবিড় নিটোল আরক্ত হয়ে উঠত
সূর্যের স্নেহ বুকে করে প্রথম কালবোশেখীতে—
বিবেকানন্দ বেঁচে ছিলেন সেদিন।
তখন তিনিও তাঁর শরীরে মনে
তরুণ যৌবনের প্রদীপ্তি নিয়ে
বৃহৎ বনস্পতির মহিমায় দাঁড়িয়ে
আছেন এই মর্ত্যভূমিতে—
যেন ওদেরই একজন সহযাত্রী সঙ্গী হয়ে।
সারা পৃথিবী দিগ্বিজয় করে
ফিরে এসেছেন তিনি;
কুন্দ-শুভ্র ধ্যানময়ী মার্গারেট, ক্রিস্টিন,
জোসেফিন, ধীরামাতা, আরো অনেক মুখের মিছিল
এবং সঙ্গে নবীন তারুণ্যে উদ্ভাসিত
গুরুভাই ও শিষ্যরা—
দেশ-বিদেশের আরো নানা সুধী সজ্জন,
তরুণের দল বসেছেন তাঁর পদপ্রান্তে।
এই গাছগুলি সেই সময়কার
সেই আশ্চর্য দিনগুলির সাক্ষী।
ওরা সেইসব আশ্চর্য দেবদূতদের,
দেবী মহীয়সীদের দেখেছিল,
একান্ত করে, পেয়েছিল তাঁদের সহজ সান্নিধ্য।
সকালে সন্ধ্যায় ওরা সঙ্গী হতে পেরেছিল তাঁদের।
ওদের প্রশান্ত ছায়ায় তাঁরা হাঁটতেন।
কথা বলতেন। হাসতেন।
আজো যখন বিকেলে ঘন হয়ে আসে
ধীরে ধীরে সন্ধ্যার উদাস ছায়া
নামে গঙ্গার জলে—ওপারের ঘাটে ঘাটে,
আকাশে উঁকি দেয় নীরব সন্ধ্যাতারা,
সোনালী চাঁদ—
আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠে এপারে মন্দিরে—
ওদের মন কেমন করে
ওদের সেই হারানো দিনের পুরনো দিনের
আশ্চর্য উজ্জ্বল উচ্ছল বন্ধু-বান্ধবীদের জন্য।
ওদের জীর্ণ পল্লবে, বিশীর্ণ ডালপালায়
সেইসব বিগত দিনের নির্জন করুণ বিষাদ।
তাই ওরা আর ফল দেয় না,
মুকুল ধরে না ওদের পল্ল[illegible]
মঞ্জরীহীন শুষ্ক ধূসরতা [illegible] মুড়ে
কী এক বোবা ব্যথায় আক্রান্ত-
নীরবে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে
আর একটি দুটি শুকনো পাতা টুপটাপ
খসে পড়ে মাটিতে!
হয়তো করুণ দীর্ঘশ্বাসে
মুখর হয়ে ওঠে ওদের অবুঝ মন—

আমরা শুনি না, বুঝি না,
বুঝতে পারি না ওদের দুঃখ।
গাছগুলি, আশ্চর্য, তবু দাঁড়িয়ে আছে!
এরপর একদিন তারা হয়তো আর থাকবে না।
নরম মিহি সোনালী রোদ্দুর গায়ে জড়িয়ে নিয়ে
সেদিনকার সেইসব দেবকান্তি
উন্নত প্রশান্ত পবিত্র পুরুষেরা,
সেইসব আশ্চর্য মহিমময়ী শুভ্রবর্ণা দেবকন্যারা
এই দেশটাকে যাঁরা আপন করে
নিয়েছিলেন মায়ের মতন—
তাঁরা আর কোনদিন এসে দাঁড়াবেন না
ওদের ছায়ার অঙ্গনে।
তবু ওরা সবাই যেন সেইসব
সুন্দর সোনালী দিনের মোহন স্বপ্নে
অনন্য অপরূপ সেইসব মধুর স্মৃতিতে
নিবিড় মন্থর হয়ে আছে।
আজো শেষ রাতের তারা-জ্বলা মুহূর্তে,
নিঃশব্দ গোধূলী লগ্নে
ওরা বোধ হয় সেইসব
আশ্চর্য শোভন দিনের ধ্যান করে।
দারুণ নিদাঘ মধ্যাহ্নে হয়তো
ওদের বুকের মধ্যে কেমন করে!
ডালপালাগুলি আকাশের দিকে
মুখ করে তাকিয়ে থাকে।
এরপর ওরাও আর থাকবে না—
এই বৃদ্ধ প্রবীণ বৃক্ষসমাজ।
তখনো পৃথিবী বেঁচে থাকবে
বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে মগ্ন হয়ে।

শিকাগোয় স্বামীজী

মঞ্জুভাষ মিত্র

শিকাগোয় স্বামীজী সেদিন তাঁর
তেজোদীপ্ত অবয়ব, সুন্দর মুখশ্রী,
করুণাকোমল দুটি চোখ আর সন্ন্যাসীর
গৈরিক বেশভূষা নিয়ে মনোজয় করেছেন
বিশ্বধর্মসভায় আগত পৃথিবীবাসীর।
শৈশববয়স থেকে শুনেছি কাহিনী এই মহৎ গভীর
প্রথম বাক্যেই তিনি আমেরিকাবাসীদের
হৃদয় নিলেন কেড়ে—
"হে আমার আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতাগণ!"
সময়ের রঙ্গমঞ্চে এই ছিল
মনীষীর ইতিহাসখ্যাত সম্ভাষণ।

তিনি বলেছি[illegible]দিন—
সহিষ্ণুতা
"নানা উৎসজা[illegible] নদীরা ধায় যেমন সমুদ্রে
স্ব-স্ব
সর্বমানুষের পথ সোজা হোক বাঁকা হোক
হে ঈশ্বর, মিলেছে তেমনি তোমাতে",
গীতার বাণী করেছেন তিনি উদাহৃত—
"যে আমার কাছে আসে, যেভাবেই হোক,
আমি তার কাছে আসি
সব মানুষই পথযাত্রায় সংগ্রামরত,
পথ আসে আমারি নিকটে।"

তেজোপূর্ণ সন্ন্যাসীর গম্ভীর উদাত্ত বাণী
কালসিন্ধুপার থেকে মর্মে এসে লাগে—
"ভেদাভেদ, ধর্মান্ধতা, ভয়াবহ হানাহানি, নিপীড়ন
ঘিরেছে সুন্দরী পৃথিবীকে,
পৃথিবীকে ভরেছে তারা হিংসা দিয়ে,
ভাসালো মানবরক্তে কতবার ধ্বংস হেনে;
কত সভ্যতাকে কত জাতিসমূহকে
ঠেলে দিল হতাশার দিকে।
এইসব ভয়াবহ দানবেরা না থাকলে
আজকে ধরণী কত অগ্রগণ্যা হতো!
কিন্তু আজ তাদের ধ্বংসের সময় এসেছে,
ওই শোন সুমঙ্গল ঘণ্টাধ্বনি-গান
বিশ্বমানবের প্রাঙ্গণসভায়—
সকল ধর্মোন্মাদের মৃত্যুদন্ড হবে,
তরবারির অশেষ অত্যাচার, লেখনীর সুতীব্র
বিষোদ্গার—সব স্তব্ধ হবে
মানুষে মানুষে সর্ববৈরিতার হবে চির অবসান।"
বিংশশতকের শেষভাগে আজকের বিভেদের
বিষ-জর্জরিত এই পৃথিবীতে
স্বামীজীর আলোচ্য মহৎ বাণী মননে স্মরণ করে
সময় এসেছে মানুষের সত্তাকে সুস্থিত করার।

বীর সন্ন্যাসী

বিভাস রায়

অজ্ঞানতার ঘনতমসায়
এল দেবদূত নয়নে যাহার
কণ্ঠে প্রেমের অভয়বাণী,
স্বর্গের ঋষি এল নামি আজ,

ভারতগগন রয়েছে ঢাকা,
আশার-আলোক-রশ্মি-আঁকা।
চক্ষে করুণা পড়িছে ঝরি—
ধরণীর ধূলি ধন্য করি।

নবীন ভারত জাগেনি তখনো,
বীর সন্ন্যাসী জাগালো তাহারে,
ভারতপথিক পথ ভুল করি,
তুমি মহাত্মা এলে তাই বুঝি

কুম্ভকর্ণ রয়েছে ঘুমে,
জননীর মতো স্নেহের চুমে।
চলে যায় পাছে ভিন্ন পথে
ত্যাগের মহান বিজয়রথে।

তোমার কণ্ঠে তাই ওঠে ধ্বনি ঃ
সর্বত্যাগী উমানাথ তব
সীতা, সাবিত্রী আদর্শ নারী,
তবে এ মহান ভারত হবে

'হে ভারত, তুমি ভুলো না কভু
উপাস্য আর প্রেমের প্রভু ;
তাদের জীবন গ্রহণ কর ;
আগের চেয়েও মহত্তর।

মূর্খ, চাঁড়াল, ব্রাহ্মণ আর
ভারতবাসীই তব ভাই হোক,
জীবে প্রেম যেই জন করে সে-ই
দীন দরিদ্র আর্ত আতুরে

মুচি মেথরের রেখ না ভেদ,
ভারতের বাণী জীবনবেদ।
ঈশ্বরে সেবে, যেও না ভুলি,
ভাই বলে বুকে লও গো তুলি।

ভারতের প্রতি ধূলিকণা, ভাই,
তার কল্যাণ তব কল্যাণ,
তোমার জীবনে প্রাচীন ভারত
নবীন যাত্রা করেছে সূচনা

সোনার চেয়েও অনেক দামী,
এই ভাব রাখ দিবসযামী।
জীবন লভিয়া উঠেছে জাগি।
তোমার অভয় আশিস মাগি।

অমৃতপুত্র যখন সকলে
ভারত তখন জগৎসভায়
হে মহামানব, ধ্রুবতারাসম
হে পথদ্রষ্টা, ভারতবাসীর

ঋষির যোগ্য পুত্র হবে,
আবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
জাতির জীবনে সত্য হও,
শত সহস্র প্রণাম লও।

বিবেকানন্দ সূর্যের এক নাম

সুচরিতা মুখোপাধ্যায়

আজ প্রভাতে পূর্বগগনে এ কার অভ্যুদয়,
সূর্যসদৃশ সন্ন্যাসিবেশে এ কোন্ আলোকময় ?
সহসা সূর্য মিলাল সূর্যে, সূর্য কহিল হাসি ঃ
"সূর্যেরই নাম বিবেকানন্দ, শোন হে বিশ্ববাসী।"

স্বামীজী স্মরণে

গৌতম মুখোপাধ্যায়

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
ধর্মে কর্মে জীবনযজ্ঞ
যশোগৌরব হিমাচল চুমে
মুগ্ধহৃদয়ে বিশ্বজগৎ

নব ভারতের মন্ত্রগুরু,
নব হোমানলে করেছ শুরু।
আরতি তোমার ভুবন ভরে,
ধন্য তোমারে প্রণাম করে।

প্রতিভা তোমার প্রখর তপন
মনীষা তোমার আকাশ-উদার
সাগরের মতো হৃদয় তোমার
কতরূপ তার, কত তরঙ্গ

দীপ্তি তাহার বিশ্বময়,
অসীমের মাঝে হয়েছে লয়।
বিপুল অতল অন্তহীন,
সৃষ্টি তাহার রাত্রিদিন।

তন্দ্রালু জাতি নিদ্রানগরে
শুনিল তোমার কম্বুকণ্ঠে
মহাভারতের বেদ-উদ্গাতা
অভেদ জ্ঞানের দিব্য আলোকে

হেরিল তোমাতে প্রভাতসূর্য,
বজ্রবাণীর বিজয়তূর্য।
মহাতপস্বী আর্য ঋষি,
দীপ্ত করিলে তামসী নিশি।

যুগসারথির পাঞ্চজন্যে
তেজোভাস্বর দুটি চোখে জ্বলে
হিমালয়সম পুরুষ প্রধান
ভারতভূমির কৌস্তভ মণি

যুগান্তরের ঘোষিত বাণী,
বিশ্বজয়ের প্রতিভাখানি।
মহান বিরাট ব্রহ্মচারী,
ত্যাগ গৈরিক পতাকাধারী।

ভুবনে-ভবনে ভাবনা-করমে
ওহে সুন্দর, তোমার বাণীতে
স্বদেশে বিদেশে মন্ত্রে তোমার
প্রেম, ক্ষেম, প্রীতি, দয়া, ভালবাসা,

এত যে মাধুরী জীবনে ভরা,
রূপ যে তাহার পড়েছে ধরা।
লভিল অমোঘ সে মহা শিক্ষা,
করুণা, শক্তি, ক্ষমা, তিতিক্ষা।

তোমার দেশের মূঢ় ম্লান মূক
তাদের শ্রান্ত শুষ্ক বক্ষে
আমাদের মাঝে দাঁড়াও স্বামীজী
নবীন যুগের শ্রেষ্ঠ মানব

নির্যাতিতেরে দিয়েছ ভাষা,
জাগায়ে তুলেছ নবীন আশা।
পূজিব তোমায় হৃদয় ভরি,
চরণে তোমার প্রণাম করি।

"উদ্বোধন"-এর ৯৪তম জন্মবর্ষে

নিবেদিতা চট্টোপাধ্যায়

শতবর্ষের পূর্তিলগ্নে পৌঁছাতে বাকি বছর ছয়,
'উদ্বোধন', তবু তোমার কাছে একটি শতক কিছুই নয়।
যে ভাববহ্নি বহিয়া চলেছ শতাব্দীপ্রায় বর্ষ-সাল,
হাজার বছরেও নিভিবে না তাহা, ফুরাবে না তব আয়ুষ্কাল।

পরমহংসদেবের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

রামবাবু (রামচন্দ্র দত্ত) স্বামীজীকে সঙ্গে করে ঠাকুরের কাছে লয়ে গেছলেন। স্বামীজী ঠাকুরের কাছে যাবামাত্র—ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং ভাব হলো। রামবাবু বললেন: "তোমায় দেখে ভাব হয়েছে।" এরপর ঠাকুর স্বামীজীর বাড়ি দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। বলতেন: "ওকে আমার কাজের জন্য পৃথিবীতে টেনে এনেছি; ঐ একমাত্র ঠিক ঠিক জ্ঞানের অধিকারী।" একদিন বুকে হাত দিবামাত্র স্বামীজী বেহুঁশ হলেন। স্বামীজী চিৎকার করে বললেন: "কর কি, কর কি, আমার বাপ মা আছে।" ঠাকুর বললেন: "থাক, থাক, ঐ পাওয়ার ঠিক ঠিক অধিকারী। এর নিজের সংস্কার নয়; বাপ মার সংস্কার।"

একসভা লোক ঘরে বসে থাকত, বড় বড় লোক,—কেশব সেন প্রভৃতি; তাদের সামনে [ঠাকুর] বলতেন: "তোকে পেলে আমি কাউকে চাই না।"

ঠাকুর বলতেন: "ও সর্বাঙ্গ সুন্দর, কোনও খুঁত নাই। যেমন দেখতে, তেমনি গাহিতে, বাজাইতে, বলতে-কইতে, বুঝতে বুঝাতে। মহা পবিত্র, ছোট-কাল থেকে কখনো মিছা কথা বলে নাই।"

ঠাকুর কারুর জন্যে মা-কালীর কাছে ভক্তি ছাড়া আর কিছু চাইতেন না। স্বামীজী বললেন: [১]"আমি জানি তুমি টাকাকড়ির জন্য মা-কালীর কাছে কিছু বলবে না। কিন্তু ভীষ্মের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বাণ ধরতে হয়েছিল, তেমনি আমার জন্য মা-কালীর কাছে বলতে হবে। তোমাকে বলতুম না... কি করি, ভাই বোনের কষ্ট দেখতে পারি না" ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন: "তুই কালীর ঘরে যা যা ইচ্ছা তাই চাগে যা।" স্বামীজী কালীঘরে গেলেন, কিন্তু কেমন মন হয়ে গেল—স্বামীজী কাঁদতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন: "বিবেক বৈরাগ্য দাও।" কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন। ঠাকুর বললেন: "কি চেয়ে এলি?" স্বামীজী বললেন: "বিবেক বৈরাগ্য চাইলাম।" ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন: "আমি জানি তোর দ্বারা টাকাকড়ি চাওয়া হবে না।"

তারপর সকলের সামনে আনন্দ করে বলতেন: "দেখ, নরেনের ভাই বোন খেতে পায় না—তাও কালীর কাছে বিবেক বৈরাগ্য চেয়েছে।" ওকালতি পড়ছিলেন। ঠাকুর একদিন বললেন: "দেখ, এতে তোর টাকাকড়ি, গাড়িঘোড়া হবে কিন্তু ভগবান তো পাবি না।" এই কথায় স্বামীজী ওকালতি ছেড়ে দিলেন।

স্বামীজীর প্রাণটা দিনরাত ভগবানের জন্য কাঁদত। কেউ বুঝতে পারত না, ঠাকুর বুঝতে পারতেন। একদিন স্বামীজী খুব জোরে চিৎকার করে কাঁদছিলেন। ঠাকুর বুঝতে পারলেন, স্বামীজী কিজন্য কাঁদছেন। স্বামীজীকে ডাকিয়ে বললেন: "তুই এইজন্য কাঁদছিস?" স্বামীজী—"হ্যাঁ।" তখন ঠাকুর বললেন: "তোকেই দিব। তুই আগে আমার জন্য খাট। তোর জন্য আমি এতদিন দুঃখ করলেম—তুই আমার জন্য দুঃখ কর। আমি যা খেটেছি তার তুই এক আনা খাট—তোকে গদি করে দিব।"

স্বামীজী একবার বুদ্ধগয়ায় পালিয়ে গেলেন। গুরুভাইরা ঠাকুরের কাছে ব্যস্ত হয়ে বলায় ঠাকুর বললেন: "কোথাও কিছু নেই; সব এইখানে।" স্বামীজী দু-একদিন পরে ফিরে এলেন।

ঠাকুরের অভাবের পর সকলে স্বামীজীকে বলতেন: "ঠাকুর আপনাকে এত বড় বলেছেন, আপনি কি বুঝলেন?" স্বামীজী বললেন: "তিনি বড় বলেছেন, আমি সে-কথা খুব মানি, কিন্তু আমি এখনো তো বুঝিনি। আমি আগে বুঝি, তারপর তোমাদের নিয়ে বুঝিয়ে দেব।"

গুরুভাইরা সব বাড়ি ফিরে গিছলেন, স্বামীজী ধরে ধরে তাদের ফিরিয়ে এনে বললেন: "তিনি তোদের ভালবাসতেন কি সংসার করবার জন্য!"

১ যখন তাঁহাদের সাংসারিক কষ্ট হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজে নাটক হয়েছিল; স্বামীজী শিব সেজেছিলেন। ঠাকুর ঐখানে ছিলেন। স্বামীজীকে ঐ বেশে নেমে আসতে বললেন। স্বামীজী ইতস্ততঃ করছেন দেখে কেশববাবু বললেন: "উনি যখন বলছেন নেমে এস না।" ঠাকুর বললেন: "দেখ কেশব, তোমার একটা বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে, এর আঠারোটা শক্তি আছে।" কেশববাবু খুব আনন্দ করে বললেন: "এতো ভাল কথা, আমিও তাই চাই; নরেন আমার চেয়ে ছোট কেন হবে।"

স্বামীজীকে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে ঠাকুর কোন মানা করেন নাই। তাঁকে ভাল ভাল জিনিস খাওয়াতেন, আর বলতেন: "ওকে খাটতে হবে।" ঠাকুর স্বামীজীকে তামাক সাজতে, শৌচের জলাদি দিতে দিতেন না; বলতেন, ওসব কাজ করবার অন্য লোক আছে। তিনি জানতেন, ওঁর দ্বারা বড় বড় কাজ হবে।

স্বামীজী রাতভোর ধ্যানজপ করতেন। গান, বাজনায় গুরুভাইদের স্ফূর্তি দিতেন। শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলে স্বামীজীর কাছে গান-বাজনা শিখেছিলেন।

ঠাকুরের দেহ যাবার পর সকলে বলতে লাগল—ঠাকুর কি পাগলাপনা করে গেলেন! স্বামীজীর কর্মটা শিকাগোয় প্রকাশ পেলে, তখন লোকে বললে—ঠাকুরের কথাই ঠিক।

যখন স্বামীজী ভারতে ফিরে এলেন তখন মিস সেভিয়ার, গুডউইন সাহেব আর আমি দেখা করতে গেলাম; মনে মনে ভাবছি, স্বামীজীর গোটাকতক সাহেব শিষ্য হয়ে অহঙ্কার হয়েছে। স্বামীজী আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে হাত ধরে বললেন: "তুই আমার সেই লাটুভাই, আমি সেই নরেন।" তখন বুঝতে পারলাম স্বামীজীর মানুষ চেনবার শক্তি হয়েছে।

স্বামীজী বললেন: "আয় আমরা বসে খাই, তুই একপাশে বসে যা; বাঙালীদের সঙ্গে কথা কইছি, দেখ এরা কেমন হুজুগে।" খাওয়া-দাওয়ার পর বললেন: "দেখলি, ঐদেশের যত বাজে খবর নিলে, এত কাজ হলো, কার দোহাই দিয়ে হলো—তার খবর নিল না। ভাই, আশ্চর্য হচ্ছি, আমার দ্বারা এত বড় কাজ হবে আমি জানতাম না।"

বিলেত থেকে আসার দু-চার দিন পরেই বিলেতের পোশাক ছেড়ে সেই দুটাকা দামের চাদর, ২।।০ টাকা দামের জুতো ব্যবহার করতে লাগলেন। এত যে মান সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

স্বামীজীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা

কেউ দুঃখ পেয়ে স্বামীজীর কাছে আসলে আর কিছু না পারলে দুটি গান শুনিয়ে স্ফূর্তি দিতেন।

গুরুভাইদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ঠাকুরের নিচেই। যাকিছু গুরুভাইদের ধর্ম-কর্ম সব ওঁর দ্বারাই হয়েছে।

স্বামীজী আপনার ভাইদের চেয়ে গুরুভাইদের ভালবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন।

অভেদানন্দকে যখন বললেন: "তুই আমেরিকায় চল।" তখন অভেদানন্দ কাঁদতে লাগল, আর বললে: "একা কি করে যাব?" স্বামীজী বললেন: "আমি একা কি করে গিছলাম? যাঁর মুখ দেখে আমি গিছলাম, তুইও তাঁর মুখ দেখে যা।"

আলমোড়া পাহাড়ে স্বামীজীকে এক মুসলমান ফকির অসময়ে ফল খাইয়েছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে একদিন দেখা। স্বামীজী দৌড়ে গিয়ে তার হাতে দুটাকা দিলেন। আমি বললাম: "ঐ লোককে কেন টাকা দিচ্ছ?"

স্বামীজী বললেন: "ও আমায় অসময়ে ফল খাইয়েছিল; দুটাকা কি বলছিস ওরে লেটো, অসময়ে উপকারের মূল্য নেই।"[২]

কাঁকুড়গাছিতে স্বামীজী রামবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিছলেন। রামবাবু তখন পীড়িত। স্বামীজী অনেকের সাক্ষাতে জুতো এগিয়ে দিলেন। রামবাবু কেঁদে বললেন: "বিলে, কর কি, কর কি?" স্বামীজী উত্তরে বললেন: "রামদাদা। আমি তোমার সেই বিলে। তুমি যা উপকার করেছ, তা কি আমি ভুলে গেছি?" উভয়েই কাঁদতে লাগলেন।* □

২ স্বামীজী পরিব্রাজক অবস্থায় আলমোড়া ভ্রমণকালে আহারাভাবে মৃতকল্প হইলে ঐ ফকির কাঁকুড় খাওয়াইয়া প্রাণদান করিয়াছিল।

* উদ্বোধন, ২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৮, পৃঃ ২১৬—২২০

বীর বিবেকানন্দ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী*

স্বামী বিবেকানন্দ কতকগুলো সত্য তুলে ধরেছেন। একটি সত্য এই, ভারতবর্ষের জন্য বীরত্বের প্রয়োজন ছিল। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা বিকাশলাভ করছিল। সেটা ছিল একটি শ্রেণীর ব্যাপার, শিক্ষিত ভদ্রলোক-শ্রেণীর মধ্যেই তা ছিল সীমাবদ্ধ। এই জাতীয়তাবাদী চেতনার একটা দিক অভিমানের। অভিমানী মানুষ নিজেকে গুটিয়ে ফেলে, বিচ্ছিন্ন করে, আত্মমুখী হয়ে পড়ে। বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সেটা ছিল বহির্মুখী, তাঁর আকাঙ্ক্ষা জগৎ জয়ের, ছড়িয়ে পড়ার, সমাগত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করার। সেজন্য একদা তিনি বিশ্বজয়ে বের হয়েছিলেন। এমন প্রবল ছিল তাঁর কথা, অনমনীয় ছিল আত্মবিশ্বাস, সাহসী ছিল অবস্থান যে, তাকে অস্বীকার করতে পারেনি কেউ। ক্লীবতায় আচ্ছন্ন ভারতবর্ষে বীরত্বের যে কত বেশি প্রয়োজন সে তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন এবং সেই অভাব মেটাবার জন্য নিজে সমস্ত জীবনটিকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর কাজের মধ্যে যে একটি বিদ্রোহ ছিল সেটাকে না বুঝলে আমরা বিবেকানন্দকে বুঝতে পারব না কিছুতেই। কলোনীর বাবুদের থেকে কতদূরে ছিলেন এই মানুষটি।

বিবেকানন্দকে জাতীয়তাবাদী বললে নিশ্চয়ই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। কেননা, জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে একটা সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় থাকে সেটি তাঁর মনের মধ্যে কখনো ঠাঁই পায়নি। তাঁর জাতীয়তাবাদ জ্ঞানকে বাদ দিয়ে নয়, যুক্তিকে তা অস্বীকার করে না, বিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশি বলেছেন কে? ভারতবর্ষ তাঁর কাছে ছিল পুণ্যভূমি, কিন্তু তাই বলে ইউরোপ, আমেরিকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্জনগুলো থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেননি।

বিবেকানন্দ ধার্মিক ছিলেন। তিনি ধর্মপ্রচারকও ছিলেন। কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে তাঁর ধর্ম যতটা ঈশ্বরের প্রয়োজনে, তার চেয়ে বেশি মানুষের প্রয়োজনে। ধর্মকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে না দেখে মানুষের দৃষ্টিতে দেখেছেন। মানুষই বড় ছিল তাঁর কাছে, সবচেয়ে বড়। মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই। মানবতাবাদী ছিলেন তিনি সর্বাংশে। তাই তিনি কেবল একটি ধর্ম প্রচার করেননি, সকল ধর্মের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। সেইখানে তিনি বিশ্বজনীন। ধর্মের নামে পৃথিবীতে হানাহানি হয়েছে, রক্তপাত ঘটেছে, যুদ্ধ করেছে মানুষ। সেসব ঘটনার পিছনে ধার্মিকতা বা যথার্থ ধর্মবাদিতা ছিল না। ছিল আপন আপন প্রভুত্ব বিস্তারের স্থূল আকাঙ্ক্ষা। বস্তুতন্ত্র ছদ্মবেশ ধারণ করেছে ধর্মের। বিবেকানন্দের ধর্মে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান ছিল না, তিনি প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করতে চাননি, মানুষকে কাছে আনতে চেয়েছেন। সব ধর্মের মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে মৈত্রী গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষে ধর্মচর্চা অভিনব কোন

* ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক।

ঘটনা নয়, অভিনব ছিল বিবেকানন্দের নিজস্ব ধর্মদৃষ্টি।

যে-পরিবেশে বিবেকানন্দের জন্ম ও অবস্থান ছিল সেখানে বর্ণাশ্রম ছিল একটি প্রধান সত্য। অতিপ্রাচীন ও দৃঢ় ছিল বর্ণে বর্ণে ব্যবধান। ধর্মকে সেই বর্ণাশ্রম টিকিয়ে রাখার আবরণ ও অজুহাত হিসাবেও ব্যবহার করা হয়েছে। বিবেকানন্দ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। প্রবল ছিল সেই বিদ্রোহ। বাইরে থেকে নয়, বিদ্রোহ ভিতর থেকেই, সেজন্যই ভিতরের মানুষদের জন্যই অতটা বিপজ্জনক। তিনি বললেন—সকল ভারতবাসী আমার ভাই, কেউ ছোট নয়, মেলচ্ছ নয়, অস্পৃশ্য নয়। ডোমকে জড়িয়ে ধরলেন, মেথরকে টেনে নিলেন বুকে। দরিদ্রকে নারায়ণ হিসাবে দেখলেন—সত্যিকারের অর্থে। ধর্মের দেশে এধরনের ধার্মিক বিদ্রোহ ছিল অসাধারণ ঘটনা। রাজা রামমোহন ধর্ম-সংস্কার করেছেন একভাবে, তিনি কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছেন, যুক্তিবাদিতা এনেছেন। রামমোহন ছিলেন ধর্মের ব্যাপারে আপসপন্থী; স্বামী বিবেকানন্দ প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাসী, কুসংস্কার ও আনুষ্ঠানিকতা থেকে দূরে, কিন্তু কোনদিক দিয়েই আপসে বিশ্বাসী নন। দুজন দু-পথের যাত্রী।

সবচেয়ে বড় কথা, বিবেকানন্দ নিরন্ন ভারতবাসীর দুঃখে অত্যন্ত কাতর ছিলেন। নিজের শ্রেণী থেকে নেমে আসতে চেয়েছিলেন। এক শ্রেণীহীন ভারতবাসীর কথা ভাবতেন তিনি। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র যে আদর্শ মতবাদ তা নয়, কিন্তু অন্য কোন সামাজিক বিন্যাসের চেয়ে সমাজতন্ত্রই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ, সেজন্য তিনি সমাজতন্ত্রী ছিলেন। এও এক বিস্ময়ের বিষয়ঃ ধার্মিক বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস। কিন্তু অস্বাভাবিক ছিল না সেই ঘটনা, বরং অনিবার্য ছিল। কেননা একদিক দিয়ে বিবেকানন্দ ছিলেন নিঃসংশয়ে ইহজাগতিক। সন্ন্যাসী ছিলেন কিন্তু তাই বলে ভুলেও অস্বীকার করেননি জগৎকে। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ইহজগৎকে বাদ দিয়ে নয়, বরং তা ইহজগতের প্রয়োজনেই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মানতেন না, সকল মানুষকে সমান জ্ঞান করতেন, তাই তাঁর পক্ষে অসাম্যমূলক সমাজব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বীকৃত পথ শ্রেণীসংগ্রাম। স্বামী বিবেকানন্দের সে-পথে যাবার কথা নয়, তিনি তা যানও নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল হৃদয় পরিবর্তনে। আশা ছিল, সেভাবেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সেও স্বাভাবিক ছিল তাঁর পক্ষে। সমন্বয় চেয়েছেন তিনি সর্বক্ষেত্রে, চেয়েছেন একক্ষেত্রেও। দ্বন্দ্বের স্থলে সমঝোতা ছিল তাঁর কাম্য, বিশেষ করে এইজন্য যে, তিনি অবশ্যই জানতেন যে, জগৎ দ্বন্দ্বময়। উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর যে বিরোধ, তাকে তিনি খুব স্পষ্টভাবে জানতেন; ধর্মে ধর্মে ব্যবধান, বর্ণে বর্ণে সংঘর্ষ—কোন বিষয় থেকেই চোখ ফিরিয়ে নেননি তিনি; কিন্তু সেই সঙ্গে চেয়েছেন কলহের স্থলে গড়ে উঠুক সমঝোতা ও সহমর্মিতা।

সমস্ত কিছু মিলে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ছিল বীরত্বে ভরা। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। এই বিশেষ বীরত্ব বিরল ছিল তাঁর চতুষ্পার্শ্বে। তিনি যে পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে নত হয়ে থাকাই ছিল স্বাভাবিক, অবনত অবস্থাতেই লোকে যতটা সম্ভব সৃষ্টিশীলতা বজায় রাখতে চাইত। বীর বিবেকানন্দ এই অবনত দশাকে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।* □

* উদ্দীপন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩, পৃঃ ৩৩-৩৪; প্রকাশস্থান—ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রাসঙ্গিকী

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত পুস্তিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর অনুগামীদের অবদান অপরিসীম। কেশবচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় সহচর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ইংরেজীতে যে চমকপ্রদ নিবন্ধ লিখেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবদ্দশাতেই সেই প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে 'Interpreter and the Young Man' পত্রিকায় প্রকাশিত উপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পুস্তিকা ১৮৭৬-১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। উপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সঠিক সময় জানাতে পারেননি। পুস্তিকা প্রকাশের সঠিক সময় দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি।

আমার বিনীত জিজ্ঞাসা—প্রতাপচন্দ্রের পুস্তিকা প্রকাশের সঠিক সময় কি উম্মোচিত হয়েছে? স্বীকার করতেই হবে, প্রতাপচন্দ্রের পুস্তিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসামান্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তিরোভাবের অব্যবহিত পরে বাঙলা ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনীকারও ছিলেন কেশব-অনুগামী ব্রাহ্মনেতা ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। তাঁর 'পরমহংসের উক্তি এবং সংক্ষিপ্ত জীবন' ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই গ্রন্থের গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

কয়েকমাস আগে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় 'মতামত' স্তম্ভে আমি আমার জিজ্ঞাসা ব্যক্ত করেছি। চতুরঙ্গ (মে, ১৯৯১) পত্রিকায় প্রকাশিত (৮৯-৯০ পৃষ্ঠা) আমার সেই চিঠির কপি নিচে সন্নিবিষ্ট করলাম।

কালিদাস মুখোপাধ্যায়
গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৮৪

কিছু তথ্য সম্বন্ধে সংশয়

'চতুরঙ্গ' উচ্চমানের পত্রিকা। এ-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি অতীব মূল্যবান এবং তথ্যসমৃদ্ধ। জানুয়ারি ···সংখ্যায় প্রকাশিত [একটি] প্রবন্ধের কোন কোন বক্তব্য সম্বন্ধে আমার সংশয় জেগেছে। তাই এই পত্রের অবতারণা।

প্রখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ মিত্র "ধর্মে, সমাজে, ভাষায় প্রগতিবাদী বিবেকানন্দ" প্রবন্ধে (জানুয়ারি, '৯১) লিখেছেন, '১৮৭৮-এর ১৫ মে "কেশবচন্দ্রের সাধারণ সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সে-দলের সদস্য এবং কেশবচন্দ্রের "নববৃন্দাবন নাটকে" তিনি যোগীর ভূমিকায় অভিনয়ও করেন (পৃঃ ৬৯৪)।' উল্লেখ্য এই যে, ১৮৭৮ সনে কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৮৭৮ সনে কুচবিহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মরা কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এর ফলে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" দ্বিখণ্ডিত হয়। শিবনাথ ও বিজয়কৃষ্ণের নেতৃত্বে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থন ও সহযোগিতায় ১৮৭৮ সনে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্র কিছুদিন পরে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে "নববিধান" প্রতিষ্ঠিত করেন। নরেন্দ্রনাথ শিবনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ পরিচালিত "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে"র সভ্য ছিলেন—কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত "নববিধানে"র সদস্য ছিলেন না। তবে আমন্ত্রিত হয়ে নরেন্দ্রনাথ "নববিধানে"র "নববৃন্দাবন" নাটকে যোগদান করেছিলেন। হরপ্রসাদবাবু অন্যত্র লিখেছেন, '১৮৭৯ সালে The Theistic Quarterly Review পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরেজী প্রবন্ধ "Paramahamsa Ramakrishna" বেরোয় এবং পরে পৃথক পুস্তিকারূপে "উদ্বোধন"

থেকে সেটি ছাপা হয় (পৃঃ ৭০১)।' হরপ্রসাদবাবুর বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক নয়। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধ 'The Hindu Saint' শিরোনামে The Theistic Quarterly পত্রিকার ১৮৭৯ সনের অক্টোবর-ডিসেম্বরের সংখ্যায় বের হয়। উক্ত প্রবন্ধটি ১৮৭৬ সনের ১৬ এপ্রিল 'Sunday Mirror' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবন্ধটি ১৯০৭ সনে উদ্বোধন অফিস হতে 'Paramahamsa Ramakrishna' নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উদ্বোধন থেকে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হবার বহু বছর পূর্বেই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৩ সনে আমেরিকা যাবার সময় স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত পুস্তিকার কিছু কপি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৯৪ সনের ২৩ জুন স্বামীজী তাঁর এক মাদ্রাজী শিষ্যকে লেখেন, "ভাল কথা, তুমি মজুমদারের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত খানকতক পাঠাতে পার? কলকাতায় অনেক আছে।" (পত্রাবলী, ১ম ভাগ, শ্রাবণ, ১৩৭১, পৃঃ ১৯৪)…

কালিদাস মুখোপাধ্যায়
৪১, শ্রীরামপুর রোড (নর্থ)
গড়িয়া, কলিকাতা-৭০০ ০৮৪

আমাদের কাছে লেখা কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের চিঠি এবং সংশ্লিষ্ট 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর চিঠি—দুই-ই আমরা বিখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসুর কাছে পাঠিয়ে দিই। অধ্যাপক বসু তার উত্তরে যে-চিঠি আমাদের লিখেছেন সেটি নিচে মুদ্রিত হলো।

—যুগ্ম সম্পাদক 'উদ্বোধন'।

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে নতুন কিছু জানাবার নেই। উনি নিজেই যদি নিজের প্রশ্নের পুরো মীমাংসা করে নিয়ে আমাদের জানাতে পারেন আমরা উপকৃত হবো। তবে প্রসঙ্গতঃ আমার যা বলার তা বলছি।

(ক) শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক একটি ইংরেজী লেখা কেবল The Theistic Quarterly Review পত্রিকায় বেরোয়নি, তা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালেই ১৮৭৬-৭৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংবাদ শ্রীমুখোপাধ্যায় পেয়েছেন ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে Interpreter and the Young Man পত্রিকায় উপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের প্রবন্ধ থেকে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু উপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের লেখায় ঠিক কোন্ সংবাদ আছে তা উদ্ধৃতিযোগে জানাননি। জানালে ভাল হয়।

(খ) মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের প্রবন্ধসূত্রে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় কিছু তথ্য সম্বন্ধে সংশয় জানিয়ে যে-পত্র পাঠিয়েছেন, (যেটি আমার কাছে পাঠানো হয়েছে) তাতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উক্ত প্রবন্ধটি ১৮৭৯ অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় যে-পত্রিকায় বেরিয়েছিল, তার নাম দিয়েছেন—The Theistic Quarterly। এখানে উক্ত নামের শেষে যা যুক্ত থাকে সেই 'Review' শব্দটি বাদ। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইতিহাসচর্চা করেন, সুতরাং বিনা প্রমাণে কিছু লিখবেন না। Review শব্দটি যদি অনবধানবশতঃ বাদ গিয়ে না থাকে তাহলে সঙ্গত কারণেই তা বাদ দিয়েছেন। সেটিও আমাদের জানালে ভাল হয়। কারণ, উক্ত Review কথাটি আছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' গ্রন্থে (১৩৫৯, পৃঃ ২৩৭), 'বাণী ও রচনা'-র ষষ্ঠ খণ্ডের তথ্যপঞ্জীতে (পৃঃ ৫১৪) এবং 'বাণী ও রচনা' বা ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' বইয়ের অনেক আগে 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকার মার্চ ১৮৯৩ সংখ্যায়, যাতে এই লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। রচনাটির শেষে লেখা ছিল ঃ

"Reprinted from the *Theistic Quarterly Review*, October, 1897, and *The Aids to Moral Culture*."

(গ) আমার কাছে সত্যচরণ মিত্র কর্তৃক ১৯০৫ সালে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের The Sages of India বলে একটি বক্তৃতা-পুস্তিকার ছিন্ন অংশ আছে। তার বিজ্ঞাপনে পাচ্ছি, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ঐ লেখাটি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক একাধিক লেখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেরিয়েছে। শেষোক্ত বইটির

কয়েকটি ছেঁড়া ফর্মা পেয়েছি হরমোহন মিত্রের আত্মীয় শ্রীদুলাল মিত্রের কাছ থেকে। সেখানে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের রচনার মন্তব্যের সঙ্গে ফুটনোট হিসাবে নানা ব্যাখ্যাত্মক মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বইটি সম্ভবতঃ ১৮৯৬ সালে বেরিয়েছিল।

(ঘ) রামকৃষ্ণ-বিষয়ে প্রতাপচন্দ্রের উদ্দীপ্ত লেখাটি গোঁড়া ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্ম-অনুরাগীমহলে কী ধরনের বিমর্ষতার সৃষ্টি করেছিল তার নমুনা পাই 'ইন্ডিয়ান মিরার'-এর ৪ জানুয়ারি ১৮৯৪ সংখ্যা থেকে। স্বামী যোগেশানন্দ (ইনি বর্তমানে শিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটিতে আছেন।) তা আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন ঃ

"On the *Theistic Quarterly Review* Miss Collet has the following paragraph in the Brahmo Year Book ... 'Of the original papers I have only room to specify one in the October number entitled *The Hindu Saint*, an enthusiastic description of a celebrated living Yogi, Ram Krishna Paramhansa, who is held up for admiration, but who seems to me rather to be an object of the deepest and saddest commiseration, for the fearful injury wrought upon a noble nature by the fanatic asceticism of Hindu faith." [বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২১-১২২]

লেখাটি পড়ে বলতে ইচ্ছা হয়, আহা কী করুণাময়ী! কতখানি ভালবাসা বুকে নিয়ে উনি ইন্ডিয়ানদের আচারে-ধর্মে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান করার ব্রত নিয়েছিলেন! অথচ যাঁদের সম্বন্ধে ওঁর বড় বেশি ভরসা ছিল তাঁদের প্রধান একজন রেভাঃ প্রতাপচন্দ্র কিনা পাগল রামকৃষ্ণের প্রশস্তি গাইলেন !!!

তাই শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসরণে আমিও প্রতাপ-প্রশস্তি করছি, যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে ঐ লেখার জন্য ঘরে পরে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল।

(ঙ) স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার আগে যে প্রতাপচন্দ্রের পূর্বোক্ত পুস্তিকা বেরিয়েছিল, তা স্বামীজীর চিঠি থেকেই দেখা যায় এবং মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তা জানিয়েছেন।

মারি লুইস বার্কের 'Swami Vivekananda : New Discoveries' (1958) বই-এ (পৃঃ ৬২) 'বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট'-এ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তারিখের বিস্তৃত উদ্ধৃতি আছে। তার একাংশে পাই ঃ

"He [Vivekananda] has some pamphlets that he distributes, relating to his master, Paramhansa Ramakrishna, a Hindu devotee, who so impressed his hearers and pupils that many of them became ascetics after his death. Mozoomdar also looked upon this saint as his master, but Mozoomdar works for holiness in the world, in it but not of it, as Jesus taught."

মজুমদার যে শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুর মতো দেখেন, একথা 'বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট'-এর প্রতিবেদক অবশ্যই স্বামীজীর কাছে শুনেছেন। স্বামীজী তা তাঁর ভারতে অবস্থান-কালের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই বলেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য এই ধরনের কথা বলার আনন্দময় অবসর তাঁর আর থাকবে না। কেন, সে-ইতিহাসে প্রবেশ করার প্রয়োজন এখানে নেই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ঃ 'বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট'-এর বিবরণটি লেখেন ফ্রান্সিস অ্যালবার্ট ডাউটি এবং তা কলকাতার বিখ্যাত 'ইন্ডিয়ান মিরার' কাগজে পুনর্মুদ্রিত হয় ১১ নভেম্বর ১৮৯৩ তারিখে। [Vivekananda in Indian Newspapers (1893—1902), 1969, p. 2]

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
হাওড়া-৭১১ ১০৪

বিশেষ রচনা

স্বামীজীর একটি চিঠিঃ প্রসঙ্গ শিকাগোয় স্বামীজীর প্রথম পদার্পণ এবং প্রতিক্রিয়া

তাপস বসু

১৮৯৩-এর ১১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্লড্‌স কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন-এর অঙ্গরূপে শিকাগো শহরের আর্ট ইনস্টিটিউট-এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে স্বামীজী ১৮৯৩-এর ৩১ মে প্রধানতঃ মাদ্রাজী যুবকদের সংগৃহীত অর্থানুকূল্যে বোম্বাই থেকে জাহাজ যাত্রা শুরু করে কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং, চীনের ক্যান্টন এবং জাপানের নাগাসাকি, ইয়াকোহামা হয়ে ২৫ জুলাই কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে পৌঁছান। সেখান থেকে ট্রেনে ৩০ জুলাই রাতে শিকাগোয় পৌঁছান। ধর্মমহাসভার নির্দিষ্ট তারিখ (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) থেকে তাঁর শিকাগোয় পৌঁছানোর সময়ের ব্যবধান প্রায় ছ-সপ্তাহ। ধর্ম-মহাসভার তারিখ স্বামীজীর জানা ছিল না। তিনি দেখলেন, অনেক আগেই তিনি চলে এসেছেন। শিকাগোর মতো অত্যন্ত ব্যয়বহুল শহরে সামান্য সঙ্গতিতে বেশিদিন থাকা ছিল অসম্ভব। দিন বারো হোটেলে থেকে স্বামীজী তাই শিকাগো ছেড়ে অপেক্ষাকৃত কম খরচের শহর বস্টনে চলে যান। যাত্রাপথে ট্রেনে প্রৌঢ়া মিস ক্যাথেরিন (কেট) এ্যাবট স্যানবর্নের সঙ্গে আলাপ হওয়ার সূত্রে তাঁর অতিথি হিসাবে তাঁর 'ব্রীজি মেডোজ'-এর খামারবাড়িতে অবস্থান করেন। পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক জন হেনরী রাইটের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয় এই মিস স্যানবর্নের সূত্রেই। স্বামীজী আগস্ট মাসের শেষে (২৪ আগস্ট) 'ব্রীজি মেডোজ' থেকে সেলেমে মিসেস কেট ট্যানাট উডস-এর বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন এবং সেখানে এক সপ্তাহ থাকেন। সন্নিহিত নানা স্থানে স্বামীজী সর্বমোট এগারোটি বক্তৃতায় অংশ নিয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এবং মননঋদ্ধ বক্তৃতা শুনে অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পান। তিনি ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য ধর্মমহা-সভার কর্মকর্তাদের কাছে স্বামীজীর একটি পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরেই ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ৯ সেপ্টেম্বর শিকাগোয় পৌঁছান স্বামীজী। ১১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩-এ অনুষ্ঠিত শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর অংশ-গ্রহণ এবং বিপুল বিজয়ের কাহিনী তো সর্বজন-বিদিত। অতঃপর স্বামীজী আমেরিকার নানা স্থানে বক্তৃতার আমন্ত্রণ পান এবং সেই সমস্ত বক্তৃতার ফলে ওদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে-ছিলেন তিনি। বেশ কিছুদিন পর তিনি আবার শিকাগোয় ফিরে এসেছিলেন। ধর্মমহাসভার আগে স্বামীজী তিনবার শিকাগো শহরে অবস্থান করে-ছিলেন। এই তিনবার অবস্থানে লব্ধ অভিজ্ঞতা, ধর্মমহাসভার প্রসঙ্গে নানা তথ্য এবং তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে সমকালে লেখা তাঁর পত্রাবলীতে যে বাণীরূপের আলপনা তিনি এঁকেছেন তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে স্বামীজীর আন্তর্জাতিক চেতনা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা, সর্বোপরি তাঁর স্বদেশভূমির জন্য গভীর বেদনা-বোধের নিটোল রূপের একটি প্রকাশ আমরা পাই।

প্রথমবার শিকাগোয় এসে স্বামীজী হোটেলে বারো দিন ছিলেন। হোটেলে থাকার ব্যয়বহুলতা, শিকাগো সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা এবং অর্থাভাবের কথা আমরা জানতে পারি ২০ আগস্ট ১৮৯৩-এ ব্রীজি মেডোজ (মিসেস স্যানবর্নের খামার-বাড়ি) থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠিটি থেকে।[১] এই চিঠিটিই আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়। এখানে আমরা এক-দিকে ধর্মমহাসভার আগে স্বামীজীকে যে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার কিছুটা

১ পত্রাবলী, অখণ্ড ৫ম সং, ১৯৮৭, পৃঃ ৭৫-৮২ ; পরবর্তী সমস্ত উদ্ধৃতি ঐ একই পত্র থেকে দেওয়া হয়েছে।

আভাস যেমন পাই, তেমনি পাই সমকালীন ভারত এবং আমেরিকার ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কেও একটি স্পষ্ট ধারণা।

ক. শিকাগোয় প্রথম পদার্পণ :

"জাপান হইতে আমি বঙ্কুবরে (Vancouver) পেঁছাইলাম। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল। খুব শীত ছিল। গরম কাপড়ের অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কোনরূপে বঙ্কুবরে পেঁছিয়া তথা হইতে কানাডা দিয়া শিকাগোয় পেঁছাইলাম। তথায় আন্দাজ বারো দিন রহিলাম।"

খ. প্রথম দেখা শিকাগোর বিশ্বমেলা প্রসঙ্গ :

"এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম। সে এক বিরাট ব্যাপার। অন্ততঃ দশ দিন না ঘুরিলে সমুদয় দেখা অসম্ভব।"

গ. শিকাগোর ধনী সমাজের মানসিকতা প্রসঙ্গে :

"বরদা রাও যে মহিলাটির [ইনি বিশ্বমেলার এক 'ডিরেক্টরে'র স্ত্রী] সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার স্বামী শিকাগো সমাজের মহা গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহারা আমার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার লোক বিদেশীকে খুব যত্ন করিয়া থাকে, কেবল অপরকে তামাশা দেখাইবার জন্যে [যাঁর বাড়িতে স্বামীজী তখন অতিথি, তিনিও ঐ মানসিকতার ঊর্ধ্বে নন। স্বামীজী এই চিঠিতেই লিখেছেন সে-কথা : "তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন !!!"] ; অর্থসাহায্য করিবার সময় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়। এবার এখানে বড় দুর্বৎসর, ব্যবসায় সকলের ক্ষতি হইতেছে। সুতরাং আমি শিকাগোয় অধিক দিন রহিলাম না। শিকাগো হইতে আমি বস্টনে আসিলাম।"

চিঠির এই অংশটিতে স্বামীজী অতিথি-পরায়ণতার সূত্রে ওদেশের মানুষজনের 'তামাশা'র কথা যেমন উল্লেখ করতে ভোলেননি, তেমনি তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি এড়ায়নি সেখানে ব্যবসার মন্দা-জনিত অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কেও।

স্বামীজী তাঁর ঐ স্বল্প কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন যে, **আমেরিকার সমাজকে চালায় সেদেশের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নারীসমাজ। সেদেশের বিদগ্ধ মহলে প্রভাব বিস্তার করতে হলে প্রথমে আমেরিকার শিক্ষিত নারীসমাজে নিজের গুণগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।** স্বামীজী লিখছেন : "এই গ্রাম হইতে কাল আমি বস্টনে যাইতেছি। সেখানে একটি বৃহৎ মহিলাসভায় বক্তৃতা করিতে হইবে।··· সেখানে যদি বেশিদিন থাকিতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব পোশাক চলিবে না। রাস্তায় আমাকে দেখিবার জন্য শত শত লোক দাঁড়াইয়া যায়। সুতরাং আমাকে কালো রঙের জামা পরিতে হইবে। কেবল বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ি পরিব। কি করিব ? এখানকার মহিলাগণ এই পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহারাই এখানকার সর্বময় কর্ত্রী ; তাঁহাদের সহানুভূতি না পাইলে চলিবে না।"

"এই সোমবার সেলেমে এক বৃহৎ মহিলাসভায় বক্তৃতা দিতে যাইতেছি। তাহাতে আরও অনেক সভাসমিতির সঙ্গে আমার পরিচয় হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ পথ করিতে পারিব।"

ঘ. স্বামীজীর আর্থিক সঙ্গীন অবস্থা :

শিকাগোয় ব্যয়বহুলতার স্বামীজীর চিন্তান্বিত মুখচ্ছবিটা আমরা দেখতে পাই : "এখানে আমার খরচ ভয়ানক হইতেছে। তোমার স্মরণ আছে, তুমি আমায় ১৭০ পাউণ্ড নোট ও নগদ ৯ পাউণ্ড দিয়েছিলে। এখন দাঁড়াইয়াছে ১৩০ পাউণ্ড। গড়ে আমার এক পাউণ্ড করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে।··· আমেরিকানরা এত ধনী যে, তাহারা জলের মতো টাকা খরচ করে। আর তাহারা আইন করিয়া সব জিনিসের মূল্য এত বেশি রাখিয়াছে যে, জগতের অপর কোন জাতি যেন কোনমতে এদেশে ঘেঁষিতে না পারে। সাধারণ কুলি গড়ে প্রতিদিন ৯।১০ টাকা করিয়া রোজগার করে ও উহা খরচ করিয়া থাকে।···আমাকে এখন অনাহার, শীত, অদ্ভুত পোশাকের দরুণ রাস্তার লোকের বিদ্রূপ—এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে।··· এখন শীত আসিতেছে। আমাকে সকল রকম গরম কাপড় যোগাড় করিতে হইবে। আবার এখানকার অধিবাসী অপেক্ষা [ওদেশীয় শীতের প্রচণ্ডতায়] আমাদের

অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয়।... আমাকে এখানে কিছুদিন থাকিতে হইবে।... যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমাকে অন্ততঃ ছয়মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আমিও যেকোন কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাই, তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিতেছি।... এইমাত্র দরজির কাছে গিয়াছিলাম, কিছু শীতবস্ত্রের অর্ডার দিয়া আসিলাম। তাহাতে ৩০০ টাকা বা তাহারও বেশি পড়িবে। ইহা যে খুব ভাল কাপড় হইবে, তাহা মনে করিও না। অমনি চলনসই গোছের হইবে।... যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পার, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও। ইতিমধ্যে যদি অনুকূল কিছু ঘটে, লিখিব বা তার করিব। 'কেবল' (তার) করিতে প্রতি শব্দে পড়ে চার টাকা।"

আর্থিক সমস্যার জন্য ঐকালে স্বামীজীর মনে ধর্মমহাসভায় যোগদান না করার চিন্তাও উদিত হয়েছে। স্বামীজী উল্লিখিত পত্রে লিখছেন: "আমি শিকাগোয় আর যাইব কিনা, জানি না। আমার তথাকার [শিকাগোর] বন্ধুগণ আমাকে ভারতের প্রতিনিধি হইতে বলিয়াছিলেন, আর বরদা রাও যে ভদ্রলোকটির [পূর্বে উল্লিখিত] সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি শিকাগো মেলার একজন কর্তা। কিন্তু আমি প্রতিনিধি হইতে অস্বীকার করি, কারণ শিকাগোয় একমাসের অধিক থাকিতে গেলে আমার সামান্য সম্বল ফুরাইয়া যাইত।"

ঙ. নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর 'প্রভু' শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর নির্ভরতা প্রতি মুহূর্তে তাঁকে সঞ্জীবিত করেছে:

"এখানে আসবার জন্যে যেসব সোনার স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা ভাঙিয়াছে, এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শতবার মনে হইয়াছে এদেশ হইতে চলিয়া যাই; কিন্তু আবার মনে হয় আমি এক গুঁয়ে দানা। আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমি কোন পথ দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে। মরি বাঁচি উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।"

চ. আমেরিকার খ্রীস্টীয় সমাজে মহাসভার আগেই স্বামীজী সমাদৃত হতে শুরু করেছিলেন:

"জানিয়া রাখো, এই দেশ খ্রীস্টানের দেশ। এখানে আর কোন ধর্ম ও মতের প্রতিষ্ঠা কিছু-মাত্র নাই বলিলেই হয়। আমি জগতে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার ভয় করি না। আমি এখানে মেরী-তনয়ের সন্তানগণের মধ্যে বাস করিতেছি। প্রভু ঈশাই আমাকে সাহায্য করিবেন। একটা জিনিস দেখিতে পাইতেছি, ইঁহারা আমার হিন্দু-ধর্মসম্বন্ধীয় উদার মত ও ন্যাজারাথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া খুব আকৃষ্ট হইতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকি যে, আমি সেই গ্যালিলীয় মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না। কেবল তাঁহারা যেমন যীশুকে মানেন, সেই সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষগণকে [তাঁহাদের] মানা উচিত। একথা ইঁহারা আদরপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন। এখন আমার কার্য এতটুকু হইয়াছে যে, লোকে আমার সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারিয়াছে ও বলাবলি করিতেছে।"

এখানে লক্ষণীয় যে, হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ওদেশের মানুষজনের ধ্যান-ধারণা স্বামীজীর মাধ্যমে পরি-বর্তিত হতে শুরু করেছিল ধর্মমহাসভার আগেই

ছ. সেই সময়ে শিকাগোয় মেলা উপলক্ষে জনৈক পাগলাটে ভারতীয় ব্রাহ্মণ যে কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন তাও জানাতে ভোলেননি স্বামীজী:

"শিকাগোয় সম্প্রতি বড় একটা মজা হইয়া গিয়াছে, কপুরতলার রাজা এখানে আসিয়া-ছিলেন। আর শিকাগো সমাজের কতকাংশ তাঁহাকে কেষ্টবিষ্টু করিয়া তুলিয়াছিল। মেলার জায়গায় এই রাজার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বড় লোক, আমার মতো ফকিরের সঙ্গে কথা কহিবেন কেন? এখানে একটি পাগলাটে ধুতিপরা মারাঠী ব্রাহ্মণ মেলায় কাগজের উপর নখের সাহায্যে প্রস্তুত ছবি বিক্রয় করিতেছিল। এ-লোকটা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের নিকট রাজার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—এ ব্যক্তি খুব নীচ জাতি, এই রাজারা ক্রীতদাসস্বরূপ, ইহারা দুর্নীতিপরায়ণ ইত্যাদি; আর এই সত্যবাদী (?) সম্পাদকেরা—যাহার জন্যে আমেরিকা বিখ্যাত—এই লোকটার কথায় কিছু গুরুত্ব আরোপের ইচ্ছায় তাঁহার

পরদিন সংবাদপত্রে বড় বড় স্তম্ভ বাহির করিল, তাহারা ভারতাগত একজন জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করিল—অবশ্য আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছিল। আমাকে স্বর্গে তুলিয়া দিয়া আমার মুখ দিয়া তাঁহারা এমন সকল কথা বাহির করিল, যাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই ; তারপর এই রাজার সম্বন্ধে মারাঠা ব্রাহ্মণটি যাহা যাহা বলিয়াছিল, সব আমার মুখে বসাইল। আর তাহাতেই শিকাগো সমাজ একটা ধাক্কা খাইয়া তাড়াতাড়ি রাজাকে পরিত্যাগ করিল। এই মিথ্যাবাদী সম্পাদকেরা আমাকে দিয়া আমার দেশের লোককে বেশ ধাক্কা দিলেন !"

এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, স্বামীজী প্রথমবার শিকাগোয় অবস্থানকালেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বিশেষ করে সাংবাদিকদের। সাংবাদিকেরা তাঁর সম্পর্কে "সবিশেষ জানিবার আগ্রহে মেলাভূমিতে কিংবা সুযোগ অনুযায়ী অন্যত্র তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি যে হোটেলে ছিলেন, সেখানকার মালিকের নিকট হইতেও ইঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।"[২]

জ. শিকাগোর কারাগার ও কারাবাসী সম্পর্কে স্বামীজী জানান ঃ

"কাল নারী কারাগারের অধ্যক্ষা মিসেস জনসন মহোদয়া এখানে আসিয়াছিলেন ; এখানে 'কারাগার' বলে না, বলে—'সংশোধনাগার'। আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অদ্ভুত জিনিস। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাঁহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়। কি অদ্ভুত, কি সুন্দর ! না দেখিলে তোমাদের বিশ্বাস হইবে না।"

ঝ. সাধারণ মানুষ সম্পর্কে মার্কিন সমাজের উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী গভীর বেদনার সঙ্গে স্বদেশের পতিত মানুষদের চরম দুরবস্থার কথা স্মরণ করেছেন ঃ

'ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি। তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পথভ্রষ্টগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না—কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।"

এই অবস্থার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে চিন্তাশীল মানুষেরা হিন্দুধর্মকে দায়ী করেছেন। স্বামীজী লিখছেন ঃ "চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তর ধর্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র

স্বামীজী ব্যাধির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন ঃ

"শোন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম তো শিখাইতেছেন—জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহু রূপ-মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।··· সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দুধর্মের মহান উপদেশসমূহ অনুসরণ করিয়া···।"

এর পাশাপাশি হিন্দুধর্মের নামে সমাজপতিদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা তুলে ধরতে তিনি কিন্তু ভোলেননি ঃ

"হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না। আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও

২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় খণ্ড, ২য় সং, ১৩৭৬, পৃঃ ৩

ব্যবহারিক' নামক মত দ্বারা সর্বপ্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।"

ঞ. নৈরাশ্যের মধ্যেও দেশবাসীর জন্য তাঁর বলিষ্ঠ উত্থানের বাণী ঃ

দেশের মানুষের জন্য তিনি গোপনে অশ্রুপাত করেছেন, কিন্তু নৈরাশ্যের অন্ধকারে তাঁর 'ভারত-কল্যাণ' চিন্তা যে হারিয়ে যায়নি, তা তিনি আলাসিঙ্গাকে প্রত্যয়ের দীপ্রতায় জানিয়েছেন এবং নানা প্রতিকূলতার কণ্টকময় পথে যুবকদেরই দায়িত্ব নিয়ে অন্ধকারের উৎসে আলো জ্বালাতে হবে, তা বলিষ্ঠ ভাষায় বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, ভগবান গীতায় বলিতেছেন, 'কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।'···সারাজীবন আমার নানা দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেই কাটিয়াছে। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। লোকে আমাকে উপহাস এবং অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর, বদমাস বলিয়াছে। আমি এসমস্তই সহ্য করিয়াছি তাহাদেরই জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে।···

"গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নাই—তাহারা একরূপ মৃতকল্প বলিলেই হয়। ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখো। কোন চালাকির প্রয়োজন নাই; চালাকির দ্বারা কিছুই হয় না। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে।

"···এ একদিনের কাজ নয়, পথ ভীষণ কণ্টক-পূর্ণ।···ভারতের শত শত যুগসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।"

ট. স্বদেশের দুর্দশায় স্বামীজীর মর্মদাহ ঃ

দেশের সাধারণ মানুষের দুর্গতি, তথাকথিত শিক্ষিত, উচ্চবর্ণের মানুষের কুসংস্কার, গোঁড়ামি, হৃদয়হীনতা স্বচক্ষে দেখেছিলেন স্বামীজী তাঁর দীর্ঘ ভারত-পরিক্রমায়। ভারতের দুর্দশায় তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়েছিল এবং তা মোচনের উপায় সন্ধান করতেই তিনি সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন। উপস্থিত হয়েছিলেন শিকাগো তথা আমেরিকায়। কিন্তু পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতবর্ষ যে কত পিছিয়ে রয়েছে, ভারতের মানুষ যে কী সীমাহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং কত গভীরভাবে অধঃপতিত তা তিনি বুঝলেন শিকাগো এবং আমেরিকার শহরগুলি দেখে। একদিকে আমেরিকার উদার মুক্ত সমাজ, তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে স্বদেশের সমাজব্যবস্থায় ও স্বদেশের অবহেলিত মানুষের ক্ষেত্রে তার বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করে তিনি প্রতিদিন রক্তময় অশ্রু বিসর্জন করেছেন, রাতের পর রাত তাঁর কেটেছে নিদ্রাহীন। বেদনার অশ্রুতে কলম ডুবিয়ে স্বামীজী লিখলেন ঃ "তাহাদের [ভারতীয় সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মানুষ] চক্ষু নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিসীমার বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পায় না। তাহাদের নিয়মিত কার্য—আহার, পান, অর্থোপার্জন ও বংশবৃদ্ধি—যেন গণিতের নিয়মে অতি সুশৃঙ্খলভাবে পর পর সম্পাদিত হইয়া চলিয়াছে। ইহার অতিরিক্ত আর কিছু তাহারা জানে না। বেশ সুখী তাহারা! তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে সমুত্থিত শোক, তাপ, দৈন্য ও পাপের যে কাতরধ্বনিতে ভারতাকাশ সমাকুল হইয়াছে, তাহাতেও তাহাদের জীবন সম্বন্ধে দিবাস্বপ্নের ব্যাঘাত হয় না। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমা-স্বরূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসীস্বরূপা করিয়া তুলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, একথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদিত হয় না।···"

দেশের গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীদের নিষ্ঠুরতার রূপ তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। গভীর ও তীব্র মর্মদাহে স্বামীজী লিখলেন ঃ "আমি [ভারতবর্ষে] তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে।" 'জুয়াচোর' ভাবিলেও স্বামীজী অন্তর থেকে কোন বিদ্বেষ তাদের সম্পর্কে পোষণ করেননি। অপমান ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তিনি তাদের

কাছে বারবার গিয়েছেন, চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধকে, দায়বদ্ধতাকে জাগ্রত করে দিতে।

গণ্যমান্যগণের নির্বোধ কুসংস্কার কিধরনের ছিল স্বামীজীর চিঠিতে সে-সম্পর্কে একটি ধারণা পাই। স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখছেন ঐ চিঠিতেঃ "বালাজী ও জি. জি.-র স্মরণ থাকিতে পারে, একদিন সায়ংকালে পণ্ডিচেরীতে এক পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইতেছিল। তাহার সেই বিকট ভঙ্গি ও তাহার 'কদাপি ন' (কখনও নয়)—এই কথা চিরকাল আমার স্মরণ থাকিবে। ইহাদের অজ্ঞতার গভীরতা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তাহারা জানে না, ভারত জগতের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ, আর সমুদয় জগৎ এই ত্রিশকোটি লোককে অতি ঘৃণার চোখে দেখিয়া থাকে।"

ঠ. দেশের যুবকদের কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা ঃ

দেশের দরিদ্র অনুন্নত মানুষদের জন্য বেদনায় প্রপীড়িত স্বামীজী পরম ব্যাকুলতায় দেশের শিক্ষিত যুবসমাজের কাছে আবেদন জানালেন মাদ্রাজের আলাসিঙ্গার মাধ্যমে ঃ "লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক।" দেশের উন্নতি-কল্পে দেশের সর্বত্র তিনি ঘুরেছেন। কিন্তু দেশ থেকে সাড়া পাননি। তাই এসেছেন আমেরিকায়।

স্বামীজী লিখলেন ঃ "হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি।... আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা —দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।...মহাবলি প্রদান কর; বলি—জীবনবলি তাহাদের জন্য... সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা-জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।...

"এস, ভ্রাতৃগণ! সমস্যাটির অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া দেখ! এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। কিন্তু আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের জয় হউক—আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উহাতে ব্রতী হইতে প্রস্তুত থাকিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে! রোগ কি বুঝিলে, ঔষধ কি তাহাও জানিলে, [এখন] কেবল [আত্মশক্তিতে] বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে ও তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্রের প্রবন্ধসমূহও গ্রাহ্য করি না।

"বিশ্বাস, বিশ্বাস! সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি।...তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত।...অগ্রসর হও,... পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। আগাইয়া যাও, সম্মুখে সম্মুখে! এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।"

এ সেই চিরপরিচিত বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর। সেই তেজ, সেই অগ্নি, সেই বীর্য, সেই অমোঘ আত্মবিশ্বাস!

মাঝে মাঝে তাঁর হতাশা এসেছিল ঠিকই। কিন্তু সে-সবই সাময়িক। কারণ, পরক্ষণেই তিনি বলছেনঃ "কোমর বাঁধো ...প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডাকিয়াছেন। ভগবান অনন্তশক্তিমান; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন।"

হ্যাঁ, তিনি প্রাণের গভীরে বিশ্বাস করতেন, সমগ্র পৃথিবীর জন্য এবং সমগ্র ভারতের জন্য তিনি এক নতুন জাগরণের মন্ত্র নিয়ে এসেছেন। সেই মন্ত্র ঘোষণার পাদপীঠ আমেরিকা—আমেরিকার ধর্ম-মহাসভা। তিনি স্বয়ং অথবা তাঁর অনুগামিগণ তার জন্য নির্বাচিত। তাই তিনি বললেনঃ "এত চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়িতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পার, আমায় সাহায্য কর।... আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব। আর যদি আমি এখানে রোগে, শীতে বা অনাহারে মরিয়া যাই, তোমরা এই ব্রত লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। [চাই] পবিত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস।" □

পরিক্রমা

শিবক্ষেত্র কল্পেশ্বরের পথে

দিলীপকুমার দত্ত

হেলাং। বাস যেখানে আমাদের নামিয়ে দিল, সেখানে জনপ্রাণীর কোন চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড়ের অর্ধচন্দ্রাকৃতি সানুদেশকে বেষ্টন করে বদরীনারায়ণ থেকে আমাদের বহনকারী বাহনটি দূরে বাঁকের আড়ালে নেমে গেল পিপুলকোঠি হয়ে হৃষীকেশের দিকে। পশ্চিমে পথের পাশে পাশে দুই পাহাড়ের মাঝের সঙ্কীর্ণ খাদ ধরে নেমে চলেছে স্বর্গ থেকে বয়ে আসা নৃত্যভঙ্গিমায় উচ্ছল পর্বত-কন্যা অলকানন্দার সুনীল জলধারা। উপলে উপলে সে-ধারা যত বেশি প্রতিহত, ততই তার নূপুর-নিক্কণ বেজে উঠেছে দ্রুত তাল-লয়ের ঝঙ্কারে। পাইন-চীর-দেওদারের গগনস্পর্শী নিবিড় অরণ্য স্বর্গের অপ্সরী অলকানন্দার খাদ থেকে ধীর মন্থর চরণপাতে উঠে গেছে শিখরে শিখরে। প্রভাতের রৌদ্রোজ্জ্বল সুশুভ্র টুকরো টুকরো মেঘের স্নেহালিঙ্গনে তাদের বুকে মর্মরিত শিহরণ। অলকানন্দার দুই তীরে নিটোল নানা আকারের নানা বর্ণের ছোট-বড় অসংখ্য নুড়ি ফেনিল জলধারার দুগ্ধধবল নীলিমা আর ঘন সবুজ অরণ্যপ্রকৃতি মনটাকে কেমন যেন শিশুর মতো চপল করে তোলে। ইচ্ছা করে, উচ্ছল জলধারায় পা ডুবিয়ে ঐ নুড়ির সাম্রাজ্যে সারাদিন খেলা করে বেড়াই।

গাড়োয়াল হিমালয়ের বিশেষ আকর্ষণ শিবক্ষেত্র পঞ্চকেদারের অন্যতম কেদার কল্পেশ্বরে যাবার একান্ত বাসনা নিয়ে যোশীমঠ আর পিপুলকোঠির মধ্যে একটি নিভৃত গ্রাম হেলাং-এ অবতরণ। কল্পেশ্বর যাবার হাঁটাপথ শুরু হয়েছে এখান থেকেই অলকানন্দা পার হয়ে কর্মনাশা গঙ্গার তীর ধরে। মূল হেলাং গ্রাম পাহাড়ের ওপরে মাইল দুই দূরত্বে। যখন বাসপথ ছিল না তখন পায়ে চলা পাকদণ্ডী পথ সেই গ্রাম ছুঁয়ে যাত্রীদের এগিয়ে দিত বদরীর পথে। চটি বা ধর্মশালা তখন সবকিছুই ছিল ওপরে গ্রামের মধ্যে। বর্তমান বাসপথ এগিয়েছে নদীর তীর ধরে পাহাড়ের সানুদেশ বেষ্টন করে। ধর্মশালা বা চটির প্রয়োজন তাই ফুরিয়েছে। যন্ত্রযান পথকে আজ অনেক সংক্ষেপ করে দিয়েছে। ভোরে হৃষীকেশ থেকে ছেড়ে আসা বদরীর বাসের যাত্রীরা রাত্রিযাপন করেন এখান থেকে আরও ছ-সাত মাইল এগিয়ে যোশীমঠে, নয়তো মাইল বারো-চোদ্দ পিছনে পিপুলকোঠিতে। কেদার-বদরী পরিক্রমা-কারীদের কাছে হেলাং-এর তাই কোন গুরুত্ব নেই। স্থানীয় কোন যাত্রীর ওঠা বা নামার প্রয়োজন থাকলে তাহলেই বাস কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামে হেলাং গ্রামের নিচে এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি উপত্যকাভূমিতে, নয়তো সোজা এগিয়ে চলে।

আশ্রয় বা মালপত্র রাখার প্রয়োজনে অনেকখানি পিছিয়ে এসে গুটি পাঁচ-ছয় মাত্র চালাঘর দেখতে পাই পথ আর নদীর মাঝের সামান্য একফালি উপত্যকাভূমিতে। সামনে পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট্ট মন্দির বজরঙ্গবলীর। চালাঘরগুলিতে কয়েকটি ছোট ছোট দোকান আর একটি আস্তাবল—যেখানে গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়া সবাই থাকে। ভাবিনি, তাদের পাশেই একটি আশ্রয় জুটে যাবে। প্রথম দোকানটিতে চা-পকোড়া, চাল ডাল তেল নুন, আলু, গবি, ভাড়ায় নেবার জন্য বাসনপত্র—সবই মেলে। মালিক পাঞ্জাবী হিন্দু যুবক ভোলা দত্ত সারাদিন দোকান চালিয়ে সন্ধ্যার আগেই ফিরে যায় ওপরের গ্রামে। ফিরে যায় আর সকলেও। তখন চরাচর জুড়ে শুধুই মুক্ত প্রকৃতির কানাকানি।

ভোলা দত্তই তার দোকানের লাগোয়া, সামান্য ওপরে আস্তাবলের পাশে পাথরের একটি ছোট্ট ঘর ব্যবস্থা করে দেয় সেদিনের আশ্রয় হিসাবে। উচ্চতায় ঘরটি সাড়ে পাঁচফুট, লম্বা-চওড়ায় আট ও ছ-ফুটের মতো। রাস্তার দিকে গরাদ ও পাল্লাহীন একটি জানালা। ঘরের দরজাটি ভিতর কিংবা বাহির—যেকোন দিক থেকে বন্ধ করা অবস্থাতেও অনায়াসেই খুলে ফেলা যায়—কিন্তু কোন ভয় নেই। চুরি বা অতিথির অসমাদর এদের কাছে কল্পনারও বাইরে। সহধর্মিণী ছায়ার জিম্মায় সামান্য কিছু রান্নার উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আহার্য যোগানোর ভার নেয় ভোলা দত্ত নিজেই।

পাঁচটার মধ্যেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে সবাই রওনা হয়ে যায় গ্রামের দিকে। অনেকখানি চড়াই পথ ভাঙতে হবে—আমার কল্পেশ্বর ভ্রমণ নির্বিঘ্ন হবার শুভ কামনা জানিয়ে তারা চলে গেল। মোহময়ী হিমালয় প্রকৃতির পাশাপাশি সেই প্রকৃতির গর্ভশায়ী এই ধরনের মানুষগুলিও তাদের অন্তরের সারল্য, মাধুর্য, উষ্ণ আতিথ্য, সদা প্রসন্নতায় মনকে ভরিয়ে দিয়ে গেল চিরকালের জন্য। কল্পেশ্বরের পথে আহার্য বা আশ্রয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই। ভোলা দত্ত নিজেই উপযাজক হয়ে আমাদের রাতের আহারের পর পরদিন ভোরে কল্পেশ্বর যাত্রায় সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য সেই অপরাহ্নের মধ্যেই তৈরি করে দিয়েছে পুরী। আর দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাবার আগে উনুনের পোড়াকাঠের গরম ছাইয়ের স্তূপে গুঁজে দিয়ে গেছে বেশ কিছু আলু। বারবার সতর্ক করে গেছে, ঘণ্টাখানেক পরেই যেন সেগুলি বের করে নিই। সঙ্গে কাগজের পোঁটলায় দিয়ে গেছে নুন, মরিচ আর ভাজা জিরা গুঁড়ো। নুন-মসলা মাখানো পোড়া আলু পুরীর সহকারী একটি উপাদেয় ব্যঞ্জন। কিন্তু এ আহার্যসামগ্রী পরের দিন আমাদের ছুঁতেই হয়নি। হৃদয়-মনের সঙ্গে উদরও পরিতৃপ্ত হয়ে উঠেছিল নানাজনের হৃদয়ের অযাচিত উপহারে। ভোলা দত্ত ও অন্যান্যরা যখন বিদায় নিল, মনে হলো তারা যেন তাদের একান্ত প্রিয়জনকে ছেড়ে যাচ্ছে। অথচ একটি বেলামাত্র এদের সঙ্গে আমার পরিচয়।

অলকানন্দার ওপর ঝোলানো সংকীর্ণ সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে যেন মুহূর্তে কেটে গেল দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু। উত্তরমুখো হয়ে দাঁড়ালে দেখা যায়—বাম তীরে অর্থাৎ পশ্চিমে উন্মত্ত অলকানন্দায় ঝাঁপ দিয়েছে সংকীর্ণ কিন্তু প্রাণোচ্ছলা কর্মনাশা গঙ্গা। কিছুটা দূরে নদীর পূর্বতীরে মিশেছে আরও এক পার্বত্য নদী। অর্থাৎ তিনটি নদী মিলে দুটি পৃথক সঙ্গমক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে এখানে। এই কারণেই হেলাং-এর নিচে এই জায়গাটার আর একটি স্বতন্ত্র নাম আছে—ত্রিবেণী। সেতুর ওপর শরীর ছিল নিশ্চল, কিন্তু মন উদ্দাম গতিতে ছুটে বেরিয়েছে প্রকৃতির অঙ্গন থেকে অঙ্গনে। সেতুর হাত দশ-বারো নিচে উন্মত্ত জলধারা, পাহাড়ের গায়ে চীর পাইনের ঘেরাটোপে গোধূলি আকাশের ঝিকিমিকি। দূরে উত্তরে যোশীমঠের পাহাড়শ্রেণী ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে এগিয়ে গেছে হেমকুণ্ডের সপ্তশৃঙ্গ, বদরীবিশাল অতিক্রম করে স্বর্গারোহিণী ধরে তুষার-আচ্ছাদিত দুর্গম মানা, নারায়ণ, নীলকণ্ঠের শিখর ছাড়িয়ে অলকাপুরীর দিকে, যেখান থেকে অলকানন্দার মর্তে আগমন। দিনের আলো যত স্তিমিত হয়ে আসে পাহাড়-শিখরে শারদীয়া সপ্তমীর চাঁদ ততই উজ্জ্বল লাবণ্যে ভরে ওঠে। একসময় দিনের শেষ আলোটুকু বিদায় নেয়।

আমার আস্তানার সামনে বজরঙ্গবলীর ছোট মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে। পরিচয় হয়ে গেল পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো প্রৌঢ় এক মানুষের সঙ্গে—ব্রহ্মচারী রামচন্দ্রজী। শরীর বিহারের রামগড়ের। চতুষ্পাঠীর পাঠ শেষ হবার আগেই পথে নামেন কুড়ি বছর বয়সে। তারপর আজ চল্লিশ বছরের বেশি পথই তাঁর একমাত্র ঘর-সংসার। পথের জীবনেই সপ্ততীর্থের অধিকারী হয়েছেন। সঙ্গের চিরসাথী শুধুমাত্র একখানি গীতা। অল্প কিছুদিন আশ্রয় নিয়েছেন এই মন্দিরে। জন্মাষ্টমীর সময় থেকে কিছুদিন ছিলেন রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদারের পথে গৌচরে। জন্মাষ্টমীর সময় থেকে কিছুদিন মেলা বসে সেখানে। আজ সকালে গিয়েছিলেন কর্ণপ্রয়াগে। সন্ধ্যার পর এই কিছুক্ষণ হলো ফিরেছেন যোশীমঠের দিকের শেষ বাসে। হেলাং

গ্রামের আরও কয়েকজনও নেমেছেন সেই বাস থেকে। সন্ধ্যারাতির পর আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে জ্যোৎস্নামাখা পাহাড় অরণ্যের চড়াই পথে উঠে গেলেন রামচন্দ্রজী।

পাহাড়ঘেরা সেই জনমানবশূন্য পথের পাশে মন্দিরের ছোট্ট চাতালে বাতাসের হিম-ছোবল অগ্রাহ্য করে আমরা মাত্র তিনটি প্রাণী জ্যোৎস্নার মায়ামেদুর আলোছায়ায় ত্রিবেণীর কল্লোচ্ছ্বাস আর অরণ্যমর্মরের মুক্তরাজ্যে যেন নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিলাম। রামচন্দ্রজীর অজস্র অভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো কাহিনী আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। সেইসঙ্গে তাঁর প্রাণখোলা অট্টহাসি। যখন ঘরে ফিরলাম তখন মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত, চাঁদ পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়তে চলেছে। তিনটি পার্বত্যধারার বেষ্টনীবন্ধ হয়ে তাদের অবিশ্রান্ত নির্ঝরধ্বনি শুনতে শুনতে কখন ঘুমের মধুর আবেশে ডুবে গেছি টের পাইনি। 168166

ভোরে নির্মেঘ উজ্জ্বল আকাশ রৌদ্র ছড়াবার আগেই পা বাড়াই কল্পেশ্বরের পথে। বাতাস হিমশীতল কিন্তু বড় স্নিগ্ধ। অলকানন্দা পার হয়ে কর্মনাশার তীর ধরে পায়ে চলা সরু চড়াই পথ এগিয়ে গেছে দুপাশের উপলরাশির মাঝ দিয়ে। কর্মনাশা গঙ্গা এখানে সঙ্কীর্ণ হলেও উতরাই পথে ভীমগর্জনা ভৈরবী। পাথরে পাথরে প্রতিহত তার ফেনিল লাবণ্য সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। বিভোর হয়ে সেই ধারা ধরে এগিয়ে গিয়েছিলাম অনেকখানি। বিপরীত দিক থেকে নেমে আসছিলেন প্রৌঢ় কৃপাল সিং। দুই কাঁধে ঝোলানো দুটি বড় ব্যাগ লাল টুকটুকে আপেলে ভর্তি। সহাস্যে আলাপ করে জানালেন, আমরা ভুল পথে এসেছি। মনে পড়ল, রামচন্দ্রজী বলেছিলেন, কর্মনাশার ওপর পাইনের দুটি মোটা গুঁড়ি ফেলা সেতু অতিক্রম করে কল্পেশ্বরের পথ। সেই অভিনব সেতু চোখে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু মন যে সচেতন ছিল না। কৃপাল সিং সেই পাইন-সেতু পর্যন্ত প্রায় আধমাইল পথ ফিরিয়ে এনে সেতুর অপর তীরে পথের যথানির্দেশ দিয়ে নেমে যাবার আগে আমাদের হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে গেলেন দুটি করে রাঙা আপেল।

পরের পথ পাইন-চীরের ঘন বনের ভিতর দিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। ছোট ছোট লম্বারেখায় মুহুমুর্হু 'ইউ'-আকারের বাঁক নিয়ে একটানা ওপরে উঠে গেছে। পথের দুপাশে মাঝে মাঝে নানা আকারের ক্যাকটাস, লম্বা ডাঁটির মাথায় নানা বর্ণের গুচ্ছে গুচ্ছে ফুলের সম্ভার। পথে পাইনের ঝরা পাতা আর ফুলের পুরু প্রলেপ। পাইন-চীরের কাণ্ডনিঃসৃত রস সারা পথটাকে সৌরভে ভরে রেখেছে। এসব গাছের রসই জমাট বেঁধে তৈরি হয় ধুনা রজন। প্রতিটি মোটা কাণ্ডের গাছেই মাটি থেকে সামান্য ওপরে কাণ্ডে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে তার নিচে বেঁধে দেওয়া হয়েছে টিনের শম্বুকাকৃতি একটি করে পাত্র। ক্ষতনিঃসৃত ঘন আঠালো রস তাতে জমা হচ্ছে। ব্যবসায়িক দুনিয়ার হিংস্র স্বার্থপরতায় মন ব্যথিত হয়।

দু-কাঁধে আপেলের ব্যাগ ঝুলিয়ে একের পর এক নেমে আসেন রামরতন পাণ্ডে, ইয়াদব (যাদব), হরনাথ সিং, এছাড়া আরও অনেকেই। প্রত্যেকেই দুদণ্ড দাঁড়িয়ে সাদর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করেন গন্তব্যের কথা, মোকামের (বাড়ির) অবস্থান, আর বিদায় নেবার আগে হাত ভরে দিয়ে যান রাঙা-হলুদ সুপক্ক আপেলে। নিষেধ করলেও শোনেন না। অবশেষে দু-একজনকে নিরস্ত করি তাঁদের স্নেহ-সম্মানের উপহারে পুষ্ট আমার কাঁধের ঝোলাটি দেখিয়ে। চিত্রটাকে বিপরীতভাবে ভাবতে চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই আকার পায় না। নাগরিক সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্তুঙ্গ গর্বে এধরনের একটি চিত্রের কোন স্থান নেই।

চড়াই পথ এবং পাইনের ঘন অরণ্য শেষ হয় এক নাতিবিস্তৃত উপত্যকাভূমিতে এসে। সল্লা। ছোট্ট একটি পাহাড়ী গ্রাম। ধাপের পর ধাপ ফালি ফালি চাষের ক্ষেত জুড়ে আশ্বিন শেষে সুপুষ্ট ধানের ছড়া যেন সবুজ-হলুদের জাজিম বিছিয়ে রেখেছে। কোন কোন অংশে ধান কাটা শুরুও হয়ে গেছে। পথের পাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীর-ঘেরা কয়েকটি মাটির বাড়ি। খড়ের চালে, মাচায়, বড় বড় গাছের কাণ্ডে ঝুলছে শীতের নানারকম সবজি—করলা লাউ শশা। অস্বাভাবিক বড় তাদের আকৃতি। আর

আছে অজস্র ফলে ভর্তি আপেল গাছ। এক জায়গায় কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে থমকে দাঁড়াতে হলো। প্রাচীরের ভিতরে একটি লম্বা চাপলাস গাছের কাণ্ডে ঝুলছে বড় পেঁপের মতো মোটা ডিম্বাকৃতি একটি ফল। ফলের খোসার নক্সা এবং গাছের পাতার চেহারায় বুঝলাম সেটি নতুন কিছু নয়,—শশা। হিমালয়ের উর্বর মাটি আর শীতল বাতাসের গুণে অস্বাভাবিক গড়ন। বুঝিনি, দুদণ্ড থমকে দাঁড়িয়ে আমাদের এই কৌতূহল অলক্ষ্যে কোন পল্লীজননীর অযাচিত বাৎসল্যের উদ্রেক করেছে। টের পেলাম সেখান থেকে অনেকখানি হেঁটে আসার পর। পিছনে একজোড়া বালক-বালিকার আমাদের দিকে ধেয়ে আসা ছুটন্ত মূর্তি এবং আর্তস্বরে 'এ ভাইয়া, এ ভাইয়া' চিৎকার। দুপাশে মাঠের কাজে ব্যস্ত কিছু নারী-পুরুষ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু আর্তস্বরের লক্ষ্য তাঁরা নন। কেননা তাঁরাও সেই স্বরের লক্ষ্য হিসাবে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে দাঁড়ায় টলটলে মুখ দুই ভাইবোন—কুমার সিং আর ইলা। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে, এত মিষ্টি লাবণ্য সে-মুখদুটিতে। কুমারের দুহাতে ধরা সেই শশাটির মতোই একটি সুবৃহৎ শশা। বিস্মিত হই। কুমারকে প্রশ্ন করিঃ "কি হবে এটি?" হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দেয়ঃ "লে যায়গা। খায়গা।" ওঁদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম, সঙ্গে এত জমে গেছে, এটি তোমরা নিয়ে যাও। কিন্তু, কে শোনে আমার কথা। কত হবে কুমারের বয়স? জোর বছর নয়-দশ। ইলা আরও বছর দুয়েকের ছোট। কুমার থমকে দাঁড়িয়ে বলেঃ "নেহি নেহি, ইয়ে তুম্ লে যাও।" হঠাৎ চোখ পড়ে দূরের একটি বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনের পথে এক মহিলা দাঁড়িয়ে কুমার আর ইলার প্রতি কি যেন ইশারা করছেন। তাইতে কোন নিষেধই শুনতে চায় না তারা। অভিভূত হয়ে যাই। আমার ঝুলিতে শুধু আর একটি ফলের ভারই নয়, জমা হয় সাত রাজার ধন মাণিক-জড়ানো একটি শাশ্বত মাতৃহৃদয়। বিনিময়ে কিছুই নিতে চায় না কুমার আর ইলা। জোর করে দিতেও চাই না। শুধু ক্যামেরার সামনে তাদের দাঁড়াতে বলি। তাদের মুখে ফুটে ওঠে খুশির শতদল। আমার রত্নভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকে স্বর্গের দুটি দেবশিশুর হাসিমাখা পবিত্র মুখ।

ফেরার পথের একটু প্রসঙ্গ এই সঙ্গে যোগ করি। কল্পেশ্বর মন্দির দেখে ফেরার পথে দীর্ঘ সময় রৌদ্রতাপে হেঁটে আসার পর তৃষ্ণার্ত হয়ে ফলটি সদ্ব্যবহারের মনস্থ করি। এই সল্লা গ্রামেরই একটি বাড়ির উঠানে এক বৃদ্ধকে দেখে তাঁকে অনুরোধ করি ফলটি কেটে দিতে। বৃদ্ধ আমাদের মাটির দাওয়ায় বসিয়ে ফলটি নিয়ে চলে যান ভিতরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসেন, সঙ্গে একটি বছর সাতেকের বালিকার হাতে একটি জলের ঘটি এবং বৃদ্ধের দুহাতে দুটি গ্লাসে ঘন ঠাণ্ডা লস্যি। ওপরে ভাজা জিরার গুঁড়ো ভাসছে। বৃদ্ধ আমাদের হাত-মুখ ধুয়ে আগে সরবতটুকু পান করতে অনুরোধ করেন। কিছুক্ষণ পরেই দুটি রেকাবিতে এসে হাজির টুকরো করা শশার পাহাড়, সঙ্গে নুন, কালোজিরা, কাঁচালঙ্কা আর পুদিনা পাতা বাটার একটি মিশ্রণ। অত খাওয়া সম্ভব নয়। প্রচুর আপেল ছাড়াও কল্পেশ্বর মন্দিরে প্রচুর আহার্য জুটেছে। তাছাড়া যে-তৃষ্ণার জন্য শশা খাওয়ার বাসনা, ঠাণ্ডা লস্যি পান করেই সেই তৃষ্ণা মিটেছে। কিছু টুকরো তুলে নিয়ে বাকিটুকু জোর করেই ফিরিয়ে দিই। বৃদ্ধ জানতে চান আমাদের আহার হয়েছে কিনা। সম্মতি-সূচক মাথা নেড়ে বিদায় জানিয়ে পথে নামি। মনে মনে বলি, কল্পতরুর নন্দনকানন দিয়ে ঘেরা দেবভূমি স্বর্গরাজ্যের অধিষ্ঠান এই হিমালয়ের প্রত্যক্ষ জগতের বাইরে আর কি কোথাও আছে? থাকলেও সে-স্বর্গে আমার কোন লোভ নেই।

সল্লা ছাড়িয়ে উপত্যকাভূমির ওপর দিয়ে পথ অনেকখানি সমতল। স্থানীয় ভাষায়—ময়দান পথ। চড়াই-উতরাই থাকলেও তা খুবই সামান্য। সল্লা থেকে মাইল তিন-চার দূরত্বে ছয় হাজার সাতাশ ফুট উচ্চতায় উর্গম গ্রাম। রোদ চড়া হলেও খুব একটা কষ্ট হয় না চড়াই না থাকায়। গ্রামটি সল্লার চেয়ে আকারে বড়। উপত্যকাভূমি এখানে অনেকখানি প্রশস্ত। শোনা যায়, এ-গ্রামের প্রাচীন নাম ছিল অর্জম। অর্জ নামক এক ঋষির তপস্যাস্থল ছিল এই

গ্রাম। সেই অর্জম-এরই বিবর্তনে উর্গম। গ্রামে ঢোকার মুখেই পথের ডানদিকে সপ্তবদরীর অন্যতম ধ্যানবদরীর প্রাচীন মন্দির। সংরক্ষণের অভাবে জীর্ণ, চারধারে আগাছার ঝোপ। পাথরের তৈরি বহু প্রাচীন মন্দিরটি আধো আলো-অন্ধকারে স্নিগ্ধ, সুশীতল, ধূপ-ধুনার গন্ধে সুরভিত। বেদির ওপর পাথরের বেশ বড় বিষ্ণুমূর্তি। সামনে অনেকখানি প্রশস্ত দালান। বিগ্রহ দর্শন সেরে আমরা কল্পেশ্বরের পথ ধরলাম।

উর্গম থেকে কল্পেশ্বর খুব বেশি দূরে নয়, বড় জোর মাইল দেড়-দুই। বাকি পথটুকুর গোটাটাই স্বল্প চড়াই। উপত্যকার বিস্তারও খুব কম নয়। কিছুটা আসার পর পথ দ্বিধাবিভক্ত। বামদিকের পথ গেছে কল্পেশ্বর—মাঠের চাষীরাই চিনিয়ে দেয়। লোকালয় ছাড়িয়ে আবার কিছু সময় নিবিড় অরণ্যে ঢাকা পথ। চীর-পাইনের সঙ্গে চাপলাস অর্জুন আমগাছের সহাবস্থান। কিছুটা চলার পর আবার দূর থেকে ভেসে আসে পাহাড়ী নদীর কলধ্বনি। কর্মনাশা গঙ্গা ছেড়ে আসার পর আর কোন নদী পথে পড়েনি। অরণ্যের সীমা পার হয়ে কিছুটা উন্মুক্ত প্রান্তরের শেষে নজরে পড়ে একটি অর্ধসমাপ্ত পরিত্যক্ত পাথরের বাড়ি। আয়তনে বেশ বড়। পাশ দিয়েই বয়ে গেছে উচ্ছল আর এক পাহাড়ী নদী—কল্পগঙ্গা। শুনি, কোন এক বাঙালী সাধু তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে এখানেই আশ্রয় নিয়ে সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটি ধর্মশালা। সেই মহতী প্রচেষ্টা তাঁর অকাল-মৃত্যুতে ঐ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় থেকে গেছে। সামনে কল্পগঙ্গার উঁচু তীরে অনেকখানি তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। চলার ক্লান্তি দূর করতে সেখানে বসে থাকি বহুক্ষণ। নদীর অপরদিকে পাহাড়ের উচ্চ শিখর থেকে ভীমবেগে কল্পগঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে একটি ঝরনা। নদী আর ঝরনার ঐকতানে সে এক বিচিত্র সঙ্গীতলহরী মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে বহুক্ষণ। কল্পেশ্বরের শুরু এখান থেকেই। কিছুটা দূরে গাছপালার ফাঁকে নদীর ওপর ছোট্ট একটি লোহার সেতু জলপাইরঙে রাঙানো। চোখে পড়ছে সেতুর ওপাশে পাহাড়ের গায়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে নিবিড় গাছপালায় ঢাকা কয়েকটি কুটির। সে-গুলির আড়ালেই পাহাড়ের গুহাপ্রদেশে আছেন কল্পেশ্বরজী।

পঞ্চকেদারের মধ্যে কল্পেশ্বরের নাম উচ্চারিত হয় একেবারে শেষে। স্থানগত উচ্চতার বিচারে কল্পেশ্বর সর্বনিম্নে। মূল কেদারনাথের উচ্চতা ১১,৭৫৩ ফুট; দ্বিতীয় তুঙ্গনাথ সব চেয়ে উচ্চভূমিতে অবস্থিত—উচ্চতা ১২,০৭২ ফুট; তৃতীয় রুদ্রনাথ ১১,৬৭০ ফুট; চতুর্থ মদমহেশ্বর বা মধ্যমহেশ্বরের অবস্থান ১১,৪৭৪ ফুট উচ্চতায়। এগুলির সবকটিই তুষারক্ষেত্রে অবস্থিত। ব্যতিক্রম শুধু পঞ্চমকেদার কল্পেশ্বর। এর উচ্চতা সাত হাজার ফুটের কিছু বেশি। অন্যান্য অনেক তীর্থস্থানের মতোই পঞ্চকেদারের উৎসমূলেও আছে একটি পৌরাণিক কাহিনীর পরিমণ্ডল, যা স্বর্গ-মর্ত, দেবতা-মানুষ, পুরাণকাহিনী আর ইতিহাসকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। পাণ্ডবদের কাছ থেকে মহাদেব মহিষরূপ ধারণ করে মাটির নিচে প্রবেশ করতে চান। কিন্তু মাথাটি প্রবিষ্ট হলেও শরীরের পশ্চাৎ অংশ জেগে থাকে মাটির ওপর। সেটিরই প্রস্তরীভূত রূপ মূল কেদারশিলা। কেদারনাথ মন্দিরে বিগ্রহের পরিবর্তে সেই শিলাখণ্ডটিকেই তেল সিঁদুর চন্দনে চর্চিত করে শিবের উদ্দেশে পূজা নিবেদিত হয়। বাকি চার কেদারে মহিষরূপী সেই মহাদেবের বিভিন্ন চার অঙ্গের অধিষ্ঠানভূমি। তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে মুখ, মদমহেশ্বরে নাভি আর এই কল্পেশ্বরে জটা। এঁদেরই সঙ্গে অখণ্ড সূত্রে সংযুক্ত হয়ে আছেন নেপালের পশুপতিনাথজী। সেখানে অধিষ্ঠিত মহিষরূপী শিবের সম্মুখভাগ।

একসময় আচ্ছন্নের মতো এসে দাঁড়াই গুহা-মন্দিরের সামনে। ঢালু পাহাড় মাথার ওপর বিচিত্র আচ্ছাদন রচনা করেছে। গুহামুখ বাঁধিয়ে ছোট্ট একটি দরজা বসানো। পাথরের চাতাল। গর্ভগৃহ প্রায় অন্ধকার, একটি মাত্র প্রদীপের আধো আলোয়, ফুল ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যের সুবাসে কেমন যেন একটা রহস্যময় অপার্থিব স্বর্গীয় পরিবেশ। এই পরিবেশে চিত্তের সব মালিন্য, সংকীর্ণতা, পাপবোধ দূর হয়ে যায় এক লহমায়। আস্তিক যাঁরা, এখানে হিমালয়ের এই অপরূপা প্রকৃতির ধ্যানগম্ভীর তপোভূমিতে তাঁরা খুঁজে পান পরম রসময়ের অপার স্নেহ-করুণা,

রসাদ্র অন্তরে উপলব্ধি করেন তাঁর অপ্রতিরোধ্য অস্তিত্ব। আবার নাস্তিক যাঁরা, এই বিশাল সুন্দরের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তাদের অসহিষ্ণু রুক্ষ মনও শান্ত কোমল হয়ে ওঠে; আপনার ক্ষুদ্রত্বের উপলব্ধি —এই অসীম বৈচিত্র্যময় জগৎপ্রকৃতির অন্তরালে এক মহাশক্তির অদৃশ্য উপস্থিতির অনুভবে তাঁদেরও অন্তরে ঘটে পূর্ণ আত্মোপলব্ধি। হিমালয় যেভাবেই হোক বিরাট সুন্দরের স্নেহ-করুণার স্পর্শে মনকে অভিভূত করবেই।

কিংবদন্তী, দেবরাজ ইন্দ্র দুর্বাসার অভিশাপে শ্রীহীন ও গতপ্রভ হয়ে হিমালয়ের এই অঞ্চলেই শিব-পার্বতীর তপস্যা করেন এবং সিদ্ধিতে কল্পবৃক্ষ লাভ করেন। তাই শিবেরও অধিষ্ঠান এখানে কল্পেশ বা কল্পেশ্বর নামে। শিব স্বয়ংই গিরিনন্দিনীর কাছে এই কল্পস্থলকে তাঁর পঞ্চম আলয় হিসাবে অভিহিত করেছেন:

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পঞ্চমং বৈ মমালয়ম্।
কল্পস্থলমিতি খ্যাতং সর্বপাপপ্রণাশনম্॥
যত্রাহং দেবদেবেন হ্যর্চিতঃ পর্বতাত্মজে।
মুঢ়ো দুর্বাসসা শপ্তো নষ্টলক্ষ্মী হতপ্রভঃ॥
আরাধ্য মাং ত্বয়া যুক্তং প্রাপ্তবান্ কল্পপাদপম্।
অহং চ দেবদেবেশি কল্পেশস্ত্বং সমাগতঃ॥"

কল্পেশ্বর গুহামুখের সামনে দুপাশে দুসারি ঘর। বামদিকের পাহাড়ের গায়ে কিছুটা ওপরের একটি ঘরে আসন নিয়েছেন এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী—নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী। দীর্ঘ ঋজু দেহ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, নেপালের শরীর। ধুনির আগুনে লোটায় জল বসিয়ে আমাদের নিষেধ উপেক্ষা করে চা তৈরি করে খাওয়ালেন, সঙ্গে এক ধরনের ঝাল নোনতা লাড্ডু। বড় সঙ্কোচ বোধ হয়, যদিও চা-টি এসময় খুবই আকাঙ্ক্ষার ধন ছিল। অভিভূত করে দেয় মনকে। মানুষের প্রাণের ঐশ্বর্য বিশ্ব থেকে হারিয়ে যাচ্ছে কে বলে! গোটা বিশ্ব যদি একদিন বিবেকশূন্য স্বার্থের দাসে পরিণত হয়ও, হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে সে প্রাণ-গরিমা অটুট থাকবে, যা সেখান থেকে আবার একদিন সারা বিশ্বে সঞ্চারিত হয়ে প্রাণের অবিনাশী গৌরবকে আবার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেবে।

সামান্য প্রণামী আর কয়েকটি আপেল তেওয়ারীজীর পায়ের কাছে রেখে অনেকক্ষণ বসি। তিনি নানা সৎপ্রসঙ্গ করেন। ভারতের তীর্থ-ভূমিগুলির প্রকৃত তাৎপর্য, ভারতবাসীর নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্রগঠনে তীর্থের ভূমিকা আর ভারতের অন্তরাত্মার সঙ্গে—তার ভৌম রসসাধনার সঙ্গে হিমালয়ের অচ্ছেদ্য একাত্ম সম্পর্ক নিয়ে তিনি অনেক সুন্দর কথা বললেন। পরিতৃপ্ত হৃদয় মন ও শরীর নিয়ে তাঁর কুটির ছেড়ে নেমে আসি। স্বর্গের কল্পবৃক্ষ—যা এই কল্পকতীর্থ কল্পেশ্বর থেকেই দেবরাজ আহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নন্দনকাননে, তার কাছে কল্প বা বাসনা নিয়ে উপস্থিত হলে তবেই সে তা পূরণ করে। কিন্তু কল্পেশ্বরজীর কাছে আমাদের কোন কিছু চাইতে হয়নি, কোন বাসনা নিয়েও তাঁর কাছে হাজির হইনি, তবু ভোলানাথ তাঁর ঝুলি উজাড় করে আমাদের অন্তরে ভরে দিয়েছেন আনন্দরসের অসীম ভাণ্ডার, সকল প্রাপ্তির রোমাঞ্চ।

আমাদের কল্পেশ্বর পরিক্রমার এখানেই সমাপ্তি টানতে পারতাম, কিন্তু পরিশেষে আর একটি ছোট্ট গল্প আছে, যা না শোনালে অসমাপ্ত থেকে যাবে এই স্বর্গরাজ্য পরিভ্রমণের কাহিনী। তেওয়ারীজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেরার উদ্দেশে কল্পগঙ্গার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে বাধা পাই। গুহামুখের ডানদিকে কয়েকটি ঘর। বুঝিনি, সেখানে কেউ ছিলেন। ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন দুজন মহারাষ্ট্রীয় পরিব্রাজক—মুকুন্দরাম দেশমুখ আর অনন্তরাম হোলকার। পরম বিনয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁদের আশ্রমকুটিরে। ঘরের দুপাশে দুটি কম্বল-শয্যা আর অতি নগণ্য কয়েকটি উপকরণ। এঁরা গৃহী এবং অভিন্নহৃদয় দুই বন্ধু। মহারাষ্ট্র ছেড়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরছেন বছরখানেক। আরও বছরখানেক নানা তীর্থ দর্শন করে স্বগৃহে ফিরবেন। পাঁচদিন হলো তাঁরা কল্পেশ্বরে এসেছেন। এক লহমায় তীর্থ দর্শন করে ফিরে যাওয়ার পুণ্য সঞ্চয়ে তাঁদের কোন লোভ নেই, তাঁরা চান তীর্থের মাটি জল ও বাতাসের স্পর্শে, তীর্থের দেবতা মানুষজনের স্পর্শে শরীর মন প্রাণ—সর্বাঙ্গ বিভোর করে তুলতে। ভাবি,

এঁরাই তো ভারতের যথার্থ রস-সাধক। চোখের সামনে ভেসে ওঠে চতুরাশ্রমভিত্তিক ভারতের সনাতন জীবনের মর্ম-সৌন্দর্য। এখন এঁদের বানপ্রস্থ আশ্রমের জীবন। ততক্ষণে আহার্যভর্তি দুটি রেকাবি আমাদের দিকে এগিয়ে ধরেছেন দেশমুখজী —"থোড়া জলপান কীজিয়ে মহারাজ।" রেকাবি-ভর্তি দু-তিন রকমের মিঠাই ছ-সাতটি, সঙ্গে এক মুঠো করে শুকনো নারকেলকুচি, খেজুর, কিশমিশ ও আখরোটের মিশ্রণ। মিঠাইগুলি নিজেরাই তৈরি করেছেন, অপূর্ব স্বাদ-গন্ধ। একটি রেকাবি সরিয়ে দিয়ে বাকিটি আমরা ভাগ করে নিতে চাই, কিন্তু কিছুতেই তা করতে দেন না তাঁরা। সেইসঙ্গে সনির্বন্ধ মিনতি ভেসে আসে আজকের দিনটা সেখানেই থেকে যাবার জন্য। বলেন, তাঁদের সঙ্গে অতিরিক্ত কম্বল আছে, খাবার আছে—কোন অসুবিধা হবে না। মনে মনে আমি শুধু ভাবি—কে বড়, স্বর্গের দেবতা না মর্তের মানুষ, স্বর্গের কল্পবৃক্ষ না মর্তের মানুষ-কল্পতরু।

তবু অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সুদীর্ঘ কালের ঘরছাড়া সুদীর্ঘ পথের পথিক মানুষ দুটিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যস্বরূপ সামান্য কিছু দেবার জন্য পকেটে হাত দিয়ে চমকে উঠি। ছোট একটি পকেট-ডায়েরী পথে আমার নিত্যসঙ্গী, সেটি নেই। তেওয়ারীজীকে দেবার পর পকেটে আর কিছু ছিল না, কিন্তু ডায়েরীটার ভিতরে নানা লেখার ফাঁকে ফাঁকে কিছু টাকা সবসময় রেখে দিই। মুকুন্দরামদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রত্যুপহার কিছু দিতে না পেরে একরাশ লজ্জা নিয়ে তাঁদের বিদায় জানিয়ে ফিরতে হয়। অর্থের জন্য নয়, ভ্রমণপথের নানা টুকি-টাকি লেখায় ভরা ডায়েরীটা—যা আমার কাছে বিরাট ঐশ্বর্য। সে-কারণেই মনটা ভীষণভাবে দমে গেল। মনে আছে—অসমাপ্ত বাড়িটার সামনে বসে ডায়েরীটা ব্যবহারও করেছি। উদ্বিগ্ন হয়ে একটু দ্রুতই সেদিকে পা চালাই।

কল্পগঙ্গার সেতুতে পা দেবার আগেই দূরে দেখতে পাই দুটি বালক এদিকেই আসছে। আমাদের দেখে তারা দ্রুত ছুটে আসে। কিছুটা দূরে থাকতেই হাঁপাতে হাঁপাতে তারা প্রশ্ন করে: "এ ভাইয়া, এ ভাইয়া, তুমহারা কোই কিতাব খো গিয়া?" ঝটিতি উত্তর দিই: "হ্যাঁ, কোথায়?" হাতটাও বাড়িয়ে দিই। না, তারা কুড়িয়ে আনেনি, যদি আমাদের সঙ্গে দেখা না হয়। বছর দশেকের রাজীব আর সুরযপ্রসাদ আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয় সেই অর্ধসমাপ্ত বাড়িটার সামনের অংশে। বলে: "উধর কিতাব মে রুপিয়া ভি হ্যায়।" কিন্তু দেখেটেখে যেখানে পড়ে ছিল, ঠিক সেখানেই রেখে দিয়েছে। ডায়েরীর ভিতর টাকা, টুকরো কাগজ, বন থেকে তোলা বিভিন্ন ফুলের নমুনা সবকিছু যথাযথ।

আমার শহুরে মন লজ্জায় কুঁকড়ে আসে। অমৃতরসে ভরা পাত্র আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে সুরযপ্রসাদরা। চোখের সঙ্গে সমস্ত অন্তরটাও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে। দূরে কল্পগঙ্গার সেতুর ওপর এখনও স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে যে-দুটি শিশু—রাজীব আর সুরয, হিমালয়ের কোল আলো করে এরা সুধারসের স্রোত বহন করে নিয়ে চলেছে আবহমান কাল ধরে, চলবেও অন্ততঃ ভবিষ্যৎ কাল জুড়ে। গতদিনের ভোলা দস্ত থেকে এই মুহূর্তের রাজীব-সুরয,—এদের ছেড়ে কোথায় খুঁজে পাব অমৃতরসের দেবতাকে, প্রাণের ঠাকুর—অন্তরের ঈশ্বরকে!!

বাস্তবিক সৌন্দর্য-নিকেতন হিমালয় দেবতারই লীলাভূমি আর আমাদের স্বর্গরাজ্য। তার পথ-প্রকৃতির মনমাতানো সৌন্দর্য একান্ত সহজ স্বাভাবিক-] তায় ছড়িয়ে পড়েছে এখানকার সহজ সরল দীন-দরিদ্র মানুষগুলির মানসিকতায়ও। যান্ত্রিক সভ্যতার ফসল—বিলাস-সামগ্রীর স্পর্শহীন এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলিতে চিরায়ত ভারতবর্ষের মর্মগভীর অন্তর্জীবনের স্নিগ্ধ পবিত্রতা আজও অটুট। ভারতবর্ষের মানুষ অমৃতের উৎসরূপে তাঁদের দেব-ভূমি স্বর্গরাজ্যকে তাই স্থাপন করেছে এই হিমালয় হিমালয়েরই বুকে। মহাকবি কালিদাসের রচনায় অমর হয়ে আছে দেবতাত্মা হিসাবে ভূষিত এই হিমালয়ের শাশ্বত পরিচয়। আসলে মানব-মানসিকতার চিরপ্রশান্ত নিষ্কলঙ্ক শ্রেষ্ঠ রূপই তো দেবত্ব—তা মানবত্বের বাইরে কিছু নয়। এই মানসিকতার বিচারেই হিমালয় যথার্থ বৈকুণ্ঠভূমি—দেবতার লীলাক্ষেত্র। এই অতল অপার চপল গম্ভীর ভূমা সৌন্দর্যের প্রাণময় জগৎকে যদি দেবতাদের লীলাভূমি না বলি তো কাকে বলব! □

নিবন্ধ

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাত্ম-জগতের বিশাল ব্যক্তিত্ব। তাঁকে নিয়ে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে আলোচনাদি হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু বর্তমানে বিবেকানন্দ-আলোচনা শুধু অধ্যাত্মবাদী মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, প্রায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ছে। যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, এমন সব বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিক ব্যক্তিবর্গও তাঁকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনাদি করছেন। তার কারণ, 'ধর্ম' বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি, তার বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সাধারণতঃ স্বামীজীর যে-দিকটি আমাদের বিশেষ আকৃষ্ট করে তা হলো তাঁর স্বদেশপ্রেম। তাঁর বক্তৃতাবলী, রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ করলে এবং তাঁর সারা জীবনের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে তাঁর স্বদেশ-প্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় মেলে। তাঁর চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টায় বিশ্বমানব-কল্যাণের বিরাট প্রতিফলন ঘটলেও ভারত ও ভারতবাসীর কল্যাণই ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের একটি প্রধান বিষয়। দেশের আপামর জনসাধারণের সামাজিক, আর্থিক ও আত্মিক—অর্থাৎ দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং সে-স্বাধীনতা রক্ষার উপায়—এসবই তাঁর চিন্তায় ও কাজে প্রতিফলিত হয়েছে। ভারত-কল্যাণের উপায় উদ্ভাবনের ভাবনা-চিন্তা এত বিস্তৃত ও গভীরভাবে এবং তাঁর মতো এত দরদ দিয়ে কোন দেশনেতা করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা সন্দেহ। ভারতীয় সমাজ-জীবনের সর্বদিকে ছিল তাঁর প্রসারিত গভীর দৃষ্টি। ভারতের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, চিত্র, ভাস্কর্য, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির বৈশিষ্ট্য—এক কথায়, জীবনের সকল ক্ষেত্রের মর্মস্থলে প্রবেশ করেছে তাঁর গভীর দৃষ্টি। ফলে স্বামীজীর স্বদেশপ্রেমের ধারা শতধা বিভক্ত হয়ে সমাজ-জীবনের প্রতিটি খাতে প্রবাহিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা এবং মোক্ষকামী সন্ন্যাসীদের সমাজসেবার ক্ষেত্রে প্রেরণাদান—এসবই তাঁর স্বদেশ-প্রেম থেকে উৎসারিত।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'আমার সমরনীতি' ('My Plan of Campaign') নামক বক্তৃতায় স্বদেশপ্রেমীর তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হলো—(১) হৃদয়বত্তা ও আন্তরিকতা, (২) স্বদেশবাসীর দুঃখ দূর করার উপায় উদ্ভাবন করা এবং (৩) সেই উপায়কে কার্যকরী রূপদান করার দৃঢ়তা। প্রথমতঃ হৃদয় দিয়ে স্বদেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করতে হবে। রক্তের মতো শিরায় শিরায় প্রবাহিত করে দিতে হবে স্বদেশের উন্নতির চিন্তার স্রোত এবং হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে স্বদেশবাসীর কল্যাণ-ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ এই দুর্দশা প্রতিকারের উপায় স্থির করতে হবে। শুধু চিন্তা করলে কাজ হবে না। সে-চিন্তাকে কার্যে পরিণত করার যথার্থ পথ খুঁজে বের করতে হবে। তৃতীয়তঃ চাই দৃঢ়তা। উদ্ভাবিত নির্দিষ্ট পথে অবিচলিত হয়ে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে হবে। সমগ্র জগৎ যদি বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় তথাপি যা আদর্শ বলে স্থিরীকৃত হয়েছে তা থেকে সরে আসা চলবে না। যিনি এরূপ করতে পারবেন তিনিই হবেন যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্বামীজীকে বিচার করলে দেখি যে, তিনি প্রতিটি শর্ত সম্পূর্ণ সার্থকভাবে পূর্ণ করেছেন।

প্রশ্ন জাগে, স্বামী বিবেকানন্দের এই স্বদেশ-প্রেমের উৎস কি? তিনি সর্বত্যাগী বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তো তাঁর কাছে এই জগৎ মিথ্যা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই 'মিথ্যা' জগতের কল্যাণের জন্য তিনি যত চোখের জল

ফেলেছেন, তাঁর হৃদয়ের প্রতিটি রক্তবিন্দু যেভাবে ঝরিয়েছেন, জগৎকে দৃঢ়সত্য বলে সিদ্ধান্তকারী যাঁরা জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকে উপভোগ করেই জীবনের সার্থকতা ও জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পান, তাঁদের মধ্যে কেউ এমন করেছেন কিনা সন্দেহ। তাই এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ সহজাত দরদী মনের অধিকারী হয়েই জন্মেছিলেন। বাল্যকালেই অপরের দুঃখ-কষ্ট নিবারণের চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। ভিখারিদের প্রতি গভীর মমতায় যথাসর্বস্ব দান, প্রতিবেশীদের বিপদ-আপদে সাহায্য করা, খেলার সাথীদের প্রতি সহমর্মিতা, আহতের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং ছাত্রাবস্থায় গরিব সহপাঠীর বেতন মকুব করার চেষ্টা—এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, তিনি স্বাভাবিক দরদী মন নিয়েই জন্মেছিলেন। তাছাড়া তাঁর বাবা-মায়ের চরিত্রও তাঁর স্বাভাবিক দরদী মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর বাবা বিশ্বনাথ দত্ত পরের দুঃখ-কষ্ট নিবারণে ছিলেন মুক্তহস্ত। দানের ব্যাপারে বিশ্বনাথ দত্ত পাত্রাপাত্র বিচার করতেন না। কেউ প্রার্থী হলেই হলো। বাবার বদান্যতায় স্বামীজীও (তখন যুবক নরেন্দ্রনাথ) একবার প্রতিবাদ করেছিলেন। উত্তরে বাবা বলেছিলেনঃ "জীবনটা কত দুঃখের তা তুই এখন কি বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি তখন দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তার লাভের জন্য যারা নেশা-ভাঙ করে, তাদের পর্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখবি।"[১] তাঁর জননী ভুবনেশ্বরী দেবীরও ছিল মমতার শরীর। প্রতিবেশিনীরা সর্বদাই ছিল তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশী এবং তিনি কখনো গরিব-দুঃখীকে রিক্তহস্তে ফিরতে দিতেন না।

ছাত্রাবস্থায় নরেন্দ্রনাথ ইতিহাসাদি পাঠের মাধ্যমে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তারাশির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন জোয়ান অব আর্ক, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ চরিত্র এবং ফরাসী বিপ্লবের মতো ইতিহাস পরিবর্তনকারী ঘটনাবলীর সঙ্গে। এই সকল চিন্তা, চরিত্র ও ঘটনা তাঁর স্বাভাবিক দরদী মনকে অবশ্যই কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। ফলে দেশের কল্যাণ-চিন্তা ঐ সময় তাঁর মনে অবশ্যই স্থান পেয়েছিল। আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং স্বদেশী শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য দূর করে দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন করার উদ্দেশ্যে নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'হিন্দুমেলা' এবং 'জাতীয় ব্যায়ামাগার'। সেই হিন্দুমেলা ও জাতীয় ব্যায়ামাগারের সঙ্গে তরুণ নরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া আনন্দমোহন বসুর 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'-এ ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা নরেন্দ্রনাথ শুনতে যেতেন। সুতরাং বলা যেতে পারে, স্বদেশপ্রেমের বাতাবরণ তিনি ছাত্রাবস্থায়ই পেয়েছিলেন। আর এইজন্যই আধ্যাত্মিক সত্যানুসন্ধানী নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরেও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন। শুধু ধর্মীয় পিপাসা মিটাবার জন্যই যে তিনি এই সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন, তা নয়। এই সম্পর্কের একটি প্রধান কারণ ছিল যে, ব্রাহ্মসমাজ ধর্মালোচনা ছাড়াও সমাজসংস্কার, জাতিভেদপ্রথা দূরীকরণ এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে প্রয়াসী ছিল। ব্রাহ্মসমাজের সমাজসংস্কারের এই দিকটির প্রতি নরেন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময় স্বদেশপ্রেমের বীজ তাঁর মধ্যে উপ্ত হলেও তা অঙ্কুরিত হয়নি। কারণ, রাজনীতিতে কিংবা সমাজসংস্কারের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন—এমন কোন চিন্তা তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল বলে মনে হয় না। ঐসময় তিনি স্বদেশচিন্তার চেয়ে ধর্ম বা ঈশ্বরচিন্তা নিয়েই অনেক বেশি ভাবিত ছিলেন। এই ঐকান্তিক ঈশ্বরান্বেষণই তাঁকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে এনেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বছর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থেকে এবং তাঁর উপদেশে নিজের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'ভারত-পরিক্রমা'য় নির্গত হলেন। এইসময় তিনি সম্যক্ পরিচিত হলেন ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে। বুঝতে পারলেন, বিরাট এক সম্ভাবনাময় জাতি দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং পরাধীনতার নিগড়ে নিবদ্ধ হয়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে। যে-মানুষকে

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম সংস্করণ, ১৩৭০, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ২১-২২

উপনিষদের ঋষি 'অমৃতের পুত্র' বলে সম্বোধন করেছেন সেই অমৃতের পুত্রগণ নিজ মহিমা ভুলে, নিজেদের ঐতিহ্য ও গৌরব ভুলে হীনদশা প্রাপ্ত হয়েছে। একটি ধর্মপ্রাণ মহান জাতির ধর্মীয় জীবন থেকে প্রকৃত ধর্ম দূরে সরে গিয়ে সেখানে স্থান নিয়েছে লোকাচার, দেশাচার, কুসংস্কার ও ছুঁৎমার্গ। ভারবর্ষের এই হীনদশা স্বামীজীর প্রাণে প্রচণ্ড আঘাত করল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তখন থেকেই তিনি ভারতবাসীর দুঃখমোচনের কথা চিন্তা করতে গেলেন এবংলা দেশের উত্থানের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে প্রস্তুত হলেন। ভারতবর্ষের জাগরণ ও ভারতবাসীর দুঃখমোচনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য তিনি ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় দেশের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয়েই যে তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম বিশেষভাবে বর্ধিত হয়েছিল তা তাঁর নিজের উক্তি এবং তাঁর চিঠিপত্র থেকে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, স্বদেশের দুর্দশার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ই তাঁর স্বদেশপ্রেমের মূল উৎস।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। স্বামীজীর মধ্যে স্বদেশপ্রেমের অগ্নিটি প্রজ্বলিত করেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং; যদিও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা সমাজসংস্কারক নেতৃবৃন্দের মতো দেশ বা সমাজের বিশেষ বিশেষ কোন দুঃখ-দুর্দশার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তা মোচনে আত্মনিয়োগ করতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে নরেন্দ্রনাথকে উপদেশ দেননি, অথবা দিয়ে থাকলেও কখন ও কিভাবে তা দিয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই। স্বদেশের আপামর জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য যে-জিনিসটির প্রয়োজন সেইটি নরেন্দ্রনাথের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে রাখা প্রয়োজন, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম সাধারণ কোন রাজনৈতিক নেতার একপেশে আবেগ বা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হয়নি। তাঁর স্বদেশপ্রেম উৎসারিত হয়েছিল গভীর মানবিকতাবোধ থেকে। বিবেকানন্দের মধ্যে সেই সুপ্ত মানবিকতাবোধকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রনাথের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্রহ্মানন্দে লীন হয়ে থাকা—যেখানে কোন জাগতিক দুঃখকষ্ট স্পর্শ করে না, সেই অবস্থায় তন্ময় হয়ে থাকা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তা তাঁকে করতে দেননি। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নির্বিকল্প সমাধি প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বললেন: "তুই ত বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই ত গান গাস, যো কুছ হায় সো তুঁহি হ্যায়।"[২] একথার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বোঝাতে চাইলেন, শুধু সমাধিতে ডুবে থাকার চেয়েও বড় অবস্থা হলো সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করে সকলের সঙ্গে ব্রহ্মবোধে ব্যবহার করা। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তখন সমাধির জন্য এতই ব্যাকুল যে, পুনরায় তিনি একই আবদার রাখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। বললেন: "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো পাঁচ-ছয়দিন ক্রমাগত সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে লীন হয়ে যাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন: "ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এতো অতি তুচ্ছ হীন কথা! না রে এত ছোট নজর করিসনি।"[৩] অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সমাধিতে লীন হয়ে থাকতে দেননি। সমাধি আস্বাদন করিয়ে বলেছিলেন: "চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে, তখন আবার চাবি খুলব।"[৪] শ্রীরামকৃষ্ণের এসকল কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ বুঝলেন যে, কেবল নিজমুক্তির জন্য লালায়িত থাকাও একপ্রকার স্বার্থপরতা। তাঁর মনে হলো, ঠাকুর যে বলেন 'চোখ বুজিলেই ভগবান আছেন, আর চোখ চাহিলে তিনি নেই?'—একথার একটি গভীর তাৎপর্য আছে। কিন্তু বুদ্ধিতে

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, কথামৃত ভবন, ৩।২৩।২

৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩

৪ ঐ, পৃঃ ১৪৫

এই নবীন বাণীর নবালোক প্রতিফলিত হলেও হৃদয় দিয়ে তার তাৎপর্য গ্রহণ করতে তাঁর কিছু সময় লেগেছিল। ভারত-ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথার নবালোক হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মাত্র। বুঝেছিলেন, "তোকে এখন কাজ করতে হবে"—একথার অর্থ ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণকে জাগ্রত করা শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই যে তিনি দেশবাসীকে জাগ্রত করার প্রেরণা পেয়েছিলেন প্রব্রজ্যাকালেই স্বামীজী তা স্বীকার করেছেন। হাতরাস রেল-স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার শরচ্চন্দ্র গুপ্তের (পরবর্তী কালে স্বামী সদানন্দের) সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন: "দেখ বাবা, আমার জীবনে একটা মস্তবড় ব্রত আছে, অথচ আমার ক্ষমতা এত অল্প যে, আমি ভেবেই আকুল—কি করে এটা উদ্‌যাপিত হবে। সে-ব্রত পরিপূর্ণ করার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি—আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা।"[৫] স্বামীজী আরও স্বীকার করেছেন যে, তিনি রামকৃষ্ণের দাস। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-কর্মভার তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত করে গেছেন, যে-পর্যন্ত না তিনি তা সমাপ্ত করতে পারেন সে-পর্যন্ত তাঁর বিশ্রাম নেই। সারা জীবন ধরে স্বামীজী তাঁর গুরুরই কাজ করে গেছেন। ভারত-বর্ষকে জাগ্রত করার বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান অসীম—একথা আজ ঐতিহাসিক সত্য। আর এও সত্য যে, যাঁর প্রেরণায় তিনি ভারতবর্ষের জন্য জীবনপাত করেছেন সেই ব্যক্তি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ভারত-জাগরণে বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রেরণাই যে কাজ করেছে, এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিও, যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উক্তি। তিনি বলেছেন: "শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত একযোগে না দেখিলে স্বামীজীকে যথার্থভাবে বিচার করা যাইবে না। স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমানের মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে।"[৬] অনুরূপ উক্তি করেছেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পাল: **"Vivekananda, however, does not stand alone. He is indissolubly bound up with his master, Paramahansa Ramakrishna.··· The modern man can only understand Paramahansa in and through Vivekananda, even as Vivekananda can be understood only in the light of the life of his Master."**[৭]—বিবেকানন্দের একা কোন সত্তা নেই। তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক যুগের মানুষ পরমহংসদেবকে বুঝতে পারে বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে, আবার বিবেকানন্দকে বুঝতে পারবে তাঁর গুরুর জীবনালোকে।

এপ্রসঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যে কী, তিনি যে কে তা বোঝার ক্ষমতা আমার নাই। শুধু এইটুকু জানি যে, তিনি স্বামীজীর স্রষ্টা, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তির উৎস। যে-শক্তিতে সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়েছিল, যে-শক্তিতে ভারতের কয়েকশো বছরের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙেছিল সেই শক্তির মূল তিনি।··· দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে রামকৃষ্ণদেব শুধু বিবেকানন্দেরই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দেননি, তিনি ওখানে বসেই স্বামীজীর মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের কুলকুণ্ডলিনীকেই জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের নবজাগরণের মন্ত্রপুরুষ তাই শ্রীরামকৃষ্ণ, নায়ক বিবেকানন্দ—যোগেশ্বর রামকৃষ্ণদেব, ধনুর্ধারী বিবেকানন্দ। দক্ষিণেশ্বরের শক্তিপীঠে যে হোমানল জ্বালিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব তা থেকে উত্থিত হয়েছিলেন যজ্ঞপুরুষ বিবেকানন্দ। সকলের অলক্ষ্যে, লোকলোচনের অন্তরালে, নীরবে নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে নিরক্ষর পূজারীর ছদ্মবেশে যুগাবতার নরেন্দ্রনাথের মধ্যে বিবেকানন্দকে—ভাবিষ্যৎ ভারতের সেই মহান রূপকারকে—তিল তিল করে নির্মাণ করেছিলেন।"[৮]

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের মূল উৎস যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। □

৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ২৪৬

৬ উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৩৭, পৃঃ ৭০

৭ Prabuddha Bharata, July, 1932, p. 323

৮ স্বামী বিবেকানন্দ: মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮, পৃঃ ৬১

স্মৃতিকথা

মহারাজের স্মৃতি

স্বামী অশেষানন্দ

ভাষান্তর : সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

আমেরিকার পোর্টল্যান্ড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ নবতিপর সন্ন্যাসী স্বামী অশেষানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে তিনি ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর স্মৃতিচারণে তিনি দেখিয়েছেন, মহারাজ কিভাবে রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, মহারাজ কি বিচিত্রভাবে দেবমানবের জ্ঞান আর শিশুসুলভ চপলতা প্রকট করতেন। মূল স্মৃতিকথাটি ইংরাজীতে লেখা।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দ আমার জীবনে বিশেষ স্মরণীয়। ঐ বছর শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজোর দিন আমি মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষালাভ করলাম। আমি তখন মহারাজের গুরুভাই স্বামী সারদানন্দের সেবক হয়ে উদ্বোধন কার্যালয়ে বা 'মায়ের বাড়ী'তে থাকতাম। সারদানন্দজী মহারাজের অনুমতি নিয়ে আমি কয়েকটা দিন মঠে কাটাতে এসেছিলাম। যখন মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্যের জন্য প্রার্থনা জানালাম, তিনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন : "সারদানন্দ তো খুব বড়লোক। তুমি তাঁর সেবক। তুমি আমাকে ১০৮ টাকা দক্ষিণা দেবে। তা না হলে আমি তোমাকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দিতে পারব না।"

মহারাজের ঐকথা শুনে আমি তো অবাক। উত্তরে আমি শুধু বললাম : "মহারাজ, আমার তো কোন টাকাপয়সা নেই। আমার পক্ষে এত টাকা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আপনি যদি দয়া না করেন আমার আর কোন উপায় থাকবে না।" মহারাজ গম্ভীরভাবেই বললেন : "আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি, তাতে তোমার সমস্যার সমাধান হতে পারে। তুমি স্বামী সারদানন্দের কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে নিয়ে এসো।"

আমি সারদানন্দ মহারাজকে কথাটা জানাতে তিনি খুব আন্তরিকতা ও তৎপরতার সঙ্গে একটি পত্র লেখালেন এবং তাতে সই করে আমাকে সেটি মহারাজের নিকট নিয়ে যেতে বললেন। পত্রে লেখা ছিল : "পূজ্যপাদ মহারাজ, উদ্বোধনের সবকিছু আপনার, এমনকি আমিও আপনার দাস। আপনি কি চান বলুন, এখুনি দিয়ে দেওয়া হবে।"

আমি ব্রহ্মচর্য পেলাম, কোন টাকা দিতে হয়নি। সবটাই রসিকতা করেছিলেন মহারাজ। সমাধিমান পুরুষ লীলা করতে চান। তিনি ঈশ্বরলীলার অনুবর্তন করেন। তিনি লীলা উপভোগ করতে পারেন, কারণ তাঁর কোন বাসনা নেই। অথচ আমরা সবকিছু গুরুগম্ভীরভাবে নিই এবং কষ্ট পাই, কারণ আমরা মায়ায় আবদ্ধ।

এই ঘটনাটি আমার পক্ষে বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কারণ, এই ঘটনাটিই আমাকে মহারাজের খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এনে দিল। ইতিপূর্বে আমি তাঁর কাছে গিয়েছি এবং ভক্তিভরে প্রণাম করেছি, কিন্তু কিরকম যেন ভয় ও শঙ্কার ভাব ছিল। মহান লোকগুরু মহারাজ জানতেন, এই ভয় ও দূরত্ববোধ অধ্যাত্মবিকাশের পথে বাধাস্বরূপ। ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসার মাধ্যমেই বাধা অপসারিত হয় এবং নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সেদিন থেকে আমি মহারাজের নিকট খুব সহজ বোধ করতাম এবং ভোরবেলায় ধ্যানের সময় তাঁর ঘরে যেতাম। এসময় মহারাজের মুখখানি অবলোকন করা একটি আনন্দের বিষয় ছিল। ঘরে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করত

এবং মহারাজ আত্মমগ্ন হয়ে থাকতেন। তাঁর উপস্থিতিতে মন আপনা থেকেই শান্ত হয়ে আসত। ঠাকুরের একটি কথা আমার মনে পড়ত, মনে হতো কথাটি খুব সত্য—"তুমি যদি আগুনের কাছে গিয়ে বস, তাপ লাগবেই।" তেমনি আত্মদীপ্ত মানুষের সঙ্গ করলে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও আনন্দলাভ হবেই।

ধ্যানের পর মহারাজ গঙ্গার ধারের বারান্দায় আসতেন এবং একটি আরাম কেদারায় বসতেন। কখনো কখনো গান হতো, কখনো নানা বিষয়ে কথা-বার্তা হতো। একদিন মহারাজ বললেন: "ভগবানের নিকট ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। তাঁকে সোজা বল যে, তুমি তাঁকেই চাও, আর কিছুই চাও না। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় রেখ না। দীনহীন ভাব যার আছে সে শীঘ্রই ভগবানের দর্শন-লাভ করে ধন্য হয়ে যায়। যদি তুমি ভক্তিভরে তাঁর কাছে যাও তিনি দেখা দেবেনই। তুমি ভুল করছ বা তাঁকে এতদিন ডাকনি বলে লজ্জা পেও না। তোমার দোষত্রুটি নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। তাঁর নিকট শিশুর মতো সরলতা নিয়ে যাও, তিনি তোমাকে নেবেনই নেবেন। সরল ও নিষ্পাপ হও। শিশুর মতো সরলতা ও বিশ্বাস ছাড়া কেউ তাঁকে জানতে পারে না।"

আর একদিন মহারাজ কর্মের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি বললেন: "সর্বদা মনে রেখ তুমি কর্মের দ্বারা ঈশ্বরেরই সেবা করছ। তাঁকে ভক্তির দ্বার দিয়ে দেখা যায়। যদি মানুষের প্রীতির জন্য কর্ম কর, নিরাশ হতে হবে; যদি ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর, তাহলেই একমাত্র শান্তি ও সুখলাভ করতে পারবে। যদি তিনি প্রীত হন, সমগ্র জগৎ প্রীত হবে। সম্পদে বিপদে তিনি ছাড়া তোমার কেউ নেই—একথা মনে রেখ। তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম নিষ্ঠাভরে পালন করে তাঁরই সেবা করছ।"

মহারাজের মধ্যে একাধারে শিশুর মতো সরলতা ও ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞান ছিল। একদিন তিনি বলরাম-বাবুর নাতিদের ভয় দেখাবার জন্য বাঘের মুখোশ পরেছিলেন। ভয়ে প্রথমে চিৎকার করবার পর একটি শিশু বলে উঠল: "ও, এতো মহারাজ! তুমি আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।" তারপর মহারাজ মুখোশ খুলে ফেলে বাচ্চাগুলিকে কোলে তুলে নিলেন। আমাকে দিয়ে মিছরি আনিয়েছিলেন, সেই মিছরি ওদের দিলেন।[১]

পরমুহূর্তেই মহারাজ এমন চিন্তামগ্ন হয়ে গেলেন যে, আমি তাঁকে যে-প্রশ্ন করতে এসেছিলাম তা আর করতে পারলাম না। তিনি এত গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন যে, আমি কথা বলতে সাহস পেলাম না। নীরবে বসে থেকে মনে মনে প্রণাম করে আমি সেদিন চলে এলাম।

আমরা মহারাজের মহত্ত্বের শতাংশের একাংশও বুঝতে পারিনি। তাঁকে চিনেছিলেন তাঁর গুরু-ভাইরা। স্বামী সারদানন্দ বলতেন: "মহারাজ ও ঠাকুরের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।" মহারাজ আমাদের সকলকে শাসন করতেন, কিন্তু তা করতেন রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে পদাধিকার বলে নয়, তাঁর ভালবাসার অমোঘ শক্তির দ্বারাই তিনি আমাদের শাসন করেছেন।* □

১ বস্তুতঃ, যখন মায়ার পারে সত্যকে আমরা দর্শন করি, তখনই আমাদের ভবভয় দূরে হয়।—যুগ্ম সম্পাদক

* **The Eternal Companion : Life and Spiritual Teachings of Swami Brahmananda, Ramakrishna Math, Madras, 10th Impression, 1990.**

পরমপদকমলে

‘নরেন শিক্ষে দিবে’

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃত অর্থে ছিলেন এক মহাবিপ্লবী। তিনি ছিলেন ভূমিকম্পের মতো। পৃথিবী কাঁপে দু-ধরনের শক্তিতে, এক হলো—‘স্লো আর্থ ট্রেমার’, যা ভিতর থেকে পাহাড়-পর্বত ঠেলে তোলে। সমুদ্রের তল উঁচু করে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন করায়। দুই—ভয়ংকর কম্পন, পৃথিবী ভেঙেচুরে শেষ করে দেয়। ঠাকুর প্রথমে আমাদের মনের পরিবর্তন চেয়েছিলেন। ছোট মনের মালা দিয়েই গাঁথা হয় সমাজ-মন। ব্যক্তি-মানুষকে না পালটালে সমাজের পরিবর্তন অসম্ভব। ঠাকুর ছিলেন বিজ্ঞানী। ‘ভব-রোগ-বৈদ্য’। আগে নিরীক্ষণ, পরে পথের সন্ধান। কোন্ হাতিয়ারে তৈরি হবে মানুষের সুখের বাসস্থান!

॥ নিরীক্ষণ ॥

তিনি দেখলেন সমাজের ওপরতলা, নিচের তলা। ওপরতলায় রয়েছেন বিষয়ভোগী ধনী। বিষয় ছাড়া তাঁরা কিছু বোঝেন না। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সৌখিন ধার্মিক। যথেষ্ট ভোগ হয়েছে। আট-নটি ছেলেপুলে। আচ্ছা, এইবার দেখা যাক ধর্মের ‘এক্সারশানে’ বেরিয়ে বাড়তি কিছু পাওয়া যায় কিনা। রয়েছেন প্রচারক। যে-প্রচার সকল মানুষের অন্তর স্পর্শ করে না। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের মতো মেন্টাল এক্সারসাইজ। ঈশ্বরের রূপ ও গুণ বর্ণনা। আর কেবল পাপ-পুণ্যের কথা। ওপর-তলার কিছু শিক্ষিত মানুষের ‘আসেম্বল’। নিচের দিকের ধর্মে গুরুবাদ। বিপথগামিতা। বীভৎস কদাচার। ধর্মের আড়ালে যাবতীয় ভোগ। মানুষের দেবতাকে মুক্ত না করে পশু-মুক্তি। ঠাকুর ইন্টেলেকচুয়ালদের দেখলেন। মথুরবাবুকে সঙ্গী করে সমাজের মাথাওয়ালাদের কাছে একে একে গেলেন। দেখলেন জ্ঞান আছে, বিজ্ঞান নেই। হৃদয় আছে, অন্তর নেই। পশ্চিমের ভোগবাদের ছোঁয়ায় বিভ্রান্ত। অহং-সর্বস্ব। সকলেই ভেবে বসে আছেন, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। ঠাকুর গোলাম বাঙালীদের কাছে গেলেন। তাদের অন্তঃপুরে ফুঁড়ে ফেঁড়ে ঢুকে গেলেন। দেখলেন সবাই দুখচেটে সংসারী। শিশ্নোদরপরায়ণ। দাসত্ব মনের ওপর চেপে বসে আছে। কাম-কাঞ্চনে আসক্ত। তমোগুণী। স্ত্রৈণ। ঠাকুর সাধুদেরও দেখলেন। বেশির ভাগই পুঁটলি সামলানো সাধু। লুচি-হালুয়া দেখে লাফায়, মেয়েদের দিকে আড়ে আড়ে চায়। সন্ন্যাস যেন জীবিকা। এর-পর ঠাকুর বিশাল প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন, যেখানে পড়ে আছে দেশের নব্বুই ভাগ। চুলে তেল নেই, পেটে অন্ন নেই, মাথায় ছাদ নেই। কলকাতার পথে চলেছেন ঘোড়ার গাড়িতে। সহিসকে বলছেন—চালাও, চালাও। জোরসে চালাও, আমি দেখব, সব দেখব। শহর দেখব, শতাব্দী দেখব, দেহজীবী দেখব, শিস্‌মারা বকাটে ছোঁড়া দেখব, গোরা সাহেব দেখব। দেখলেন। সকলেরই দৃষ্টি নিচের দিকে। পোকার মতো সব কিলবিল করছে জীবনের অন্ধকারে। পণ্ডিতসমাজ শকুনির উপমা। উঠেছে অনেক ওপরে, দৃষ্টি ভাগাড়ে। শতাব্দীর আঁচল ধরে টান মারলেন। উন্মোচিত হলো তার শরীর। এইবার তিনি দুর্দম-নীয়, ভয়ঙ্কর। কারোকে রেহাই দিতে রাজি নন। রাসমণিকে কষিয়ে দিলেন এক চড়। ভগবানের নাম করতে করতে বিষয়চিন্তা কেন? ঈশ্বর মন দেখেন। মন আর মুখ এক কর। গঙ্গার ঘাটে জয় মুখুজ্জেকেও হাঁকিয়ে দিলেন দুই থাপ্পড়। শম্ভু মল্লিককে করলেন তিরস্কার। সমাজসেবা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল স্থাপন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরলাভ হলে মানুষ নিরাসক্ত হয়। অহং ঘুচে যায়। আনন্দলাভ করে। মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থে গিয়ে অনবরত বিষয়ের আলোচনা শুনে বললেন, খুব হয়েছে, আমাকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়ে দাও। কেশবচন্দ্র সেনকে ‘পালপিট প্রচার’ থেকে টেনে আনলেন ভক্তির জগতে। তিনি দু-হাতে মানুষকে দিতে চান—রুক্ষ মাথায় তেল, নিরন্নকে অন্ন, বার-বানতাকে চৈতন্য। ভগবানের কাছে চাইলেন একজন রসদদার। পেলেন মথুরবাবুকে। পেলেন শম্ভুচরণ মল্লিককে। চাইলেন একটি ‘সন্তান’। পেলেন রাখালচন্দ্রকে। চাইলেন ‘খাপখোলা একটি

তরোয়াল'। পেলেন নরেন্দ্রনাথকে।

॥ বিস্ফোরণ ॥

নরেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সমাধি। চেয়েছিলেন নিজের মুক্তি। তা কি করে হয়! ঠাকুর ধমক দিলেন, স্বার্থপর। তুই হবি বটবৃক্ষ। আমার শক্তির ঝুরি তুই ধারণ করবি। নিচেরটাকে তুলে আনবি ওপরে। জগৎটাকে কাঁপিয়ে দিবি। নব ভারত জাগবে তোর মধ্য দিয়ে। বিশ্বকে শোনাবি, যত মত তত পথ। সোস্যালিজমের 'ফোররানার' হবি তুই। বলবি, জীবই শিব।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত শক্তির আধার করে রেখে গেলেন বিবেকানন্দকে। ভূমি প্রস্তুত। যত গৃহী মধ্যবিত্ত পথের সন্ধান পেয়েছেন। সমাজ-মন আলোড়িত। শতাব্দী শেষ হয়ে গেল। বিগ্রহ অন্তর্হিত। ভাব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। নব-ভাবের ধূপের ধোঁয়ায় পরিবেশ আচ্ছন্ন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের পার্ষদরা ছটফট করছেন। 'নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'। তাঁরা একবার বলছেন, চল, ফিরে যাই গৃহে। লীলা তো শেষ। আবার বলছেন, না, কখনো নয়। ছেড়ে দিয়ে ধরা কেন? চলো যাই সন্ন্যাস নিয়ে তীর্থে তীর্থে।

অসম্ভব, তা কি করে সম্ভব? ভগবান শক্তির তন্তু দিয়ে গেঁথে দিয়ে গেছেন পার্ষদমালিকা। ছেঁড়ে কার সাধ্য! স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'আমার তো সিদ্ধাই করার উপায় নেই, আমি তোর ভেতর দিয়ে সিদ্ধাই করব।' একখানা কাগজে ঠাকুর লিখে গিয়েছিলেন: 'নরেন শিক্ষে দিবে।' নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমি ওসব পারব না।' ঠাকুর বলেছিলেন: 'তোর হাড় করবে।'

ঠাকুর কতটা শক্তি নরেন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন, তা অনুভব করতে পেরেছিলেন কালীপ্রসাদ। নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনি জেলে বসে আছেন, কালীপ্রসাদকে বললেন: "আমার হাত ধর দেখি।"

ধরামাত্রই কালীপ্রসাদ বললেন, "কি একটা 'শক' তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল।" ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন: "তুমি আমার জন্যে দেহ ধারণ করে এসেছ। মাকে বলেছিলাম, মা, আমি কি যেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব? মা কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকব! তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি, 'আমি এসেছি'।" কাশীপুরে ঠাকুর বলেছিলেন: "চাবি আমার কাছে রইল। ও আপনাকে জানতে পারলে দেহত্যাগ করবে।"

রাখাল বরাহনগর মঠে বলছেন: "চল নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।"

নরেন্দ্রনাথ বলছেন: "বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস?"

আর একজন ভক্ত শুনে বলছেন: "তাহলে সংসার ত্যাগ করলে কেন?"

নরেন্দ্রনাথ বলছেন: "রামকে পেলাম না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকব—আর ছেলে মেয়ের বাপ হব—এমন কি কথা!"

শ্বেত অঙ্গে টকটকে গেরুয়া। কপাটের মতো বিশাল তাঁর বক্ষ। পদ্মপলাশ লোচন। ঠাকুর বলতেন: "রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই।" দাঁড়িয়ে আছেন দৃপ্তভঙ্গিতে। মুখে যাঁর একটিই কথা—'ওয়াহ গুরু-কি ফতে!' তিনিই চিনেছিলেন গুরুকে—শঙ্করের বিচারশক্তি ও চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি এইবার একা-ধারে মূর্তিমন্ত হলো, আবার শ্রীকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সমন্বয় বার্তা শোনা গেল, আবার দীন দরিদ্র পাপী-তাপীর জন্য বুদ্ধদেবের ন্যায় একজন ক্রন্দন করছেন, শোনা গেল; অবতারপুরুষগণ যেন অসম্পূর্ণ ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের পূর্ণ করেছেন। **"Once more the wheel is turning up, Once more vibrations have been set in motion from India, which are destined at no distant day to reach the farthest limits of the earth."**

॥ পরিশেষ ॥

বিদেশী অনেক গাছ লাগাবার চেষ্টা হলো। স্বদেশভূমিতে তা পারল না শিকড় চালাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জোড়া কলমের ভাবতরু আজ বিশালবৃক্ষ। কোন্ ছায়াতে বসে আছ তাপিত পথিক? জান না! তাহলে শোন স্বামীজীর মুখ দিয়ে কি আপুন ঝরছে—

"Now my brothers, if you do not see the hand, the finger of Providence, it is because You are *blind, born-blind indeed*'.' □

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

ক্যান্সার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়*

'ক্যান্সার হ্যাজ নো আন্সার' অর্থাৎ ক্যান্সারের কোন জবাব নেই বা চিকিৎসা নেই,—কথাটা খুবই প্রচলিত। মনে হয় এর দ্বারা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, ক্যান্সার হলে মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু আজকের বিজ্ঞানের যুগে কথাটার সবটা সত্য নয়। ক্যান্সার সম্বন্ধে গণচেতনা ক্যান্সার থেকে মুক্তিলাভের উপায়। প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়লে অনেক ধরনের ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা সম্ভব।

বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে 'ক্যান্সার' শব্দটি একটি আতঙ্কবিশেষ। 'ক্যান্সার' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'ক্যানক্রাম' থেকে নেওয়া, যার গ্রীক প্রতিশব্দ হলো 'ক্র্যাব' (কাঁকড়া)। সংস্কৃত বলা হয় 'কর্কট'। ক্যান্সার সম্পর্কীয় বিজ্ঞানকে 'অনকোলজি' বলা হয়। এটিও একটি গ্রীক শব্দ থেকে নেওয়া। মানব-সভ্যতার প্রায় আদিম যুগ থেকেই এই রোগ বিদ্যমান। কাঁকড়া যেভাবে কোন মানুষকে জড়িয়ে ধরে ক্যান্সারও মানবদেহকে সেইভাবে জড়িয়ে ধরে। শুধু মানুষই নয়, জন্তু-জানোয়ার এমনকি উদ্ভিদও এই মারাত্মক রোগের কবল থেকে মুক্তি পায়নি।

ক্যান্সার মানে শরীরের কোষের অসংযত বৃদ্ধি। কিন্তু বৃদ্ধিই তো কোষের ধর্ম, জীবনের ধর্ম ; তবে অসংযত, বিশৃঙ্খল কোন বৃদ্ধির গালভরা নাম ক্যান্সার। ক্যান্সার মোটেই ছোঁয়াচে, সংক্রামক বা বংশগত রোগ নয়। এই রোগের কারণ ভাইরাস জীবাণু বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এখনো সে-সম্বন্ধে কোন কিছু নিঃসন্দেহে বলা যাচ্ছে না বা ধরা পড়েনি। আমাদের দেশে এখনো অনেকে এই রোগকে অচ্ছুত বলে মনে করেন—এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। এইসব রোগীদের প্রতি সকলকেই সহানুভূতিশীল হতে হবে। সমস্ত বয়সের ব্যক্তিরই এই রোগ হতে পারে। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র সমাজের সকল স্তরের মানুষেরই এই রোগ হতে পারে। সাধারণের ধারণা ক্যান্সার হলে আর নিস্কৃতি নেই। এই ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অনেক ধরনের ক্যান্সার আছে যা শুরুতে ধরা পড়লে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব। তাই এই রোগ সম্বন্ধে অহেতুক আতঙ্কগ্রস্ত হবার কোনও কারণ নেই।

ভারতবর্ষে শতকরা ৭৫ ভাগ রোগীই চিকিৎসকের কাছে আসেন একেবারে শেষ পর্যায়ে। প্রথম অবস্থায় যে ২৫ শতাংশ রোগী আসেন তার ৭৫ শতাংশ রোগীকেই সারিয়ে তোলা যায়। আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ৫ লাখ লোক এই রোগে মারা যান এবং এই রোগের শিকার হন আরও কয়েক লক্ষ লোক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) স্ট্যাটিসটিকস্ অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে বছরে ৫০ লক্ষের বেশি লোক এই রোগে মারা যান। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ লক্ষ লোক এই রোগের শিকার হবেন। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্ট্যাটিসটিকস্ অনুযায়ী শতকরা ৫০ ভাগ ক্যান্সারই প্রতিরোধ করা সম্ভব জনশিক্ষার মাধ্যমে।

ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য কতকগুলি সতর্কতা-মূলক লক্ষণ বিশেষজ্ঞরা দিয়ে থাকেন। এগুলিকে ক্যান্সার রোগের প্রাথমিক লক্ষণও বলা যেতে পারে। পরপৃষ্ঠায় কতকগুলি লক্ষণের কথা জানালাম, সেগুলি দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের

* লেখক কলকাতার আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেডিওথেরাপি বিভাগের প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান।

পরামর্শ নিতে হবে। তবে এইসব উপসর্গ দেখা দিলেই ক্যান্সার হয়েছে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। তবুও সাবধান হওয়া ভাল।

(১) দেহের কোন অংশের ঘা সাধারণ চিকিৎসায় ভাল হচ্ছে না।

(২) হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্তন অথবা বহুদিনের কাশি সারছে না।

(৩) খাদ্যবস্তু গিলতে অসুবিধে অথবা বহুদিন ধরে হজমের গণ্ডগোল।

(৪) তিল, আঁচিল ও জন্মদাগের রঙ, আকার ও আয়তনের হঠাৎ পরিবর্তন।

(৫) শরীরের কোন অংশের বেদনাহীন মাংসপিণ্ডের (টিউমার) হঠাৎ আবির্ভাব ও দ্রুত বৃদ্ধি।

(৬) (বয়স্ক লোকের) প্রায়শই পায়খানার গণ্ডগোল। কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য, কখনো তরল পায়খানা, কখনো পায়খানার সঙ্গে রক্ত নির্গত হওয়া।

(৭) দেহের কোন অংশ থেকে অস্বাভাবিক রক্তপাত, যেমন: নাক, মুখ, মলদ্বার, মূত্রনালী ইত্যাদি।

(৮) শরীরের ওজনের দ্রুত হ্রাস।

(৯) পাঁজরে অসহ্য যন্ত্রণা।

অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং অর্ধশিক্ষার জন্য বহুলোকের ক্যান্সারে প্রাণহানি ঘটছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই রোগের প্রকোপে প্রায় বিনা চিকিৎসায় অকালে মৃত্যুবরণ করছেন। তাই সর্বাগ্রে চাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা। সরকারি তরফে এই কাজকে একটি আবশ্যিক কাজ বলে গণ্য করতে হবে। বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্রকে এই ব্যাপারে প্রচারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা এবং ক্লাবকে দায়িত্ব নিতে হবে। জনসাধারণকে বোঝাতে হবে ঐ লক্ষণগুলি দেখা দিলে তাঁরা যেন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং অহেতুক আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে সময়মত চিকিৎসার সুযোগ নেন। জনগণকে জানাতে হবে কি কি কারণে ক্যান্সার হতে পারে। সে-সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করছি। যেমন—

১। মশলাযুক্ত পান, দোক্তা, খৈনী খাওয়া।

২। অত্যধিক গরম খাবার খাওয়া।

৩। ধূমপান বা মদ্যপান করার ফলে মুখের বা গলার ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৪। কিছু জীবিকার সাথে ক্যান্সারের সম্পর্ক আছে, যেমন—

(ক) অ্যানিলিন ডাই (একটি বিশেষ ধরনের রঙ) থেকে মূত্রস্থলীর ক্যান্সার হতে পারে।

(খ) গ্যাসোলিনের রাসায়নিক পদার্থ থেকে প্যানক্রিয়াসে ক্যান্সার হতে পারে।

(গ) পিচ বা আলকাতরা থেকে চামড়ায় ক্যান্সার হয়।

(ঘ) মাস্টার্ড গ্যাস ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।

এই সমস্ত পদার্থ নিয়ে যাঁরা নিয়মিত কাজ করেন তাঁদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে সঠিক জ্ঞান ও সতর্কতা পৌঁছে দিতে হবে, যাতে তাঁরা তাঁদের কাজ সম্বন্ধে আতঙ্কিত না হন।

৫। ক্রমাগত উত্তেজনা।

দেহের কোন জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজক পদার্থ দিয়ে অনাবশ্যক উত্তেজিত করলে সেখানে ক্যান্সার হতে পারে, যেমন—

(ক) তিল বা আঁচিলকে ক্রমাগত খোঁচানো।

(খ) কাশ্মীরে শীত থেকে বাঁচবার জন্য অনেকে জ্বলন্ত কয়লা ভর্তি মাটির পাত্র পেটের নিচে চামড়ায় ঠেকিয়ে রেখে উত্তাপ অনুভব করেন—এঁদের চামড়ায় ক্যান্সার হতে পারে।

৬। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের পরিচ্ছন্নতা।

অপরিচ্ছন্ন, অপরিস্কার, অস্বাস্থ্যকর শরীরেই রোগ বাসা বাঁধে। সুতরাং মানুষের পরিচ্ছন্নতার দিকেও সমানভাবে নজর রাখতে হবে। পুরুষাঙ্গে অথবা জরায়ুমুখের ক্যান্সার যৌনাঙ্গের অপরিচ্ছন্নতা থেকেও হতে পারে।

৭। খাদ্যে, ঔষধে এবং প্রসাধনসামগ্রীতে যে-সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয় তা থেকেও ক্যান্সার হয়। এখনো পর্যন্ত জানা গেছে, চারশোর বেশি সংখ্যক রাসায়নিক পদার্থ ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সক্ষম। খাদ্য, পানীয় এবং প্রসাধনসামগ্রী কতটা রাসায়নিক পদার্থ মেশানো যাবে তার

ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে কোনসময়েই সেই নিয়ম মানা হয় না। ফলে বহুলোক ক্যান্সারের শিকার হন।

৮। যৌন-সম্পর্কিত ক্যান্সার।

(ক) যেসব পুরুষদের পুরুষাঙ্গের সামনের চামড়া ছোটবেলায় কেটে ফেলা হয় (যেমন ইহুদি, মুসলমান) তাদের ক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার দেখা যায় না বললেই চলে।

(খ) যে-মহিলা অধিক সন্তানের জননী, তাঁর ক্ষেত্রে জরায়ুমুখের ক্যান্সার হবার প্রবণতা বেশি থাকে।

(গ) যেসব মায়েরা সন্তান জন্মাবার পর বাচ্চাকে স্তনদুগ্ধ অল্পদিন খাইয়েছেন বা একেবারেই খাওয়াননি তাঁদের স্তনে ক্যান্সার হবার প্রবণতা থাকে। অবিবাহিত মহিলাদের স্তনের ক্যান্সার হবার প্রবণতা সর্বদাই থেকে যায়।

৯। আবহাওয়ার দূষিতকরণ।

পরিবেশ সংরক্ষণ এখন একটি জরুরী বিবেচ্য বিষয়। কলকারখানা এবং যানবাহনের ধোঁয়ায় পরিবেশ আজ দূষিত। কীটনাশক পদার্থ গ্রাম ও শহরে যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। এইসব রাসায়নিক পদার্থ বেশকিছু ক্যান্সার সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

১০। পারমাণবিক রশ্মির প্রয়োগ।

যেকোন পারমাণবিক রশ্মি মানুষের শরীরে যত কম প্রবেশ করে ততই ভাল। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত রশ্মি মানুষের ক্ষতি করে না। কিন্তু পরিমাণ অধিক হলে নানান উপসর্গ দেখা দেয়। কাজেই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র দরকারেই যেন এক্স-রে করানো হয়। হিরোসিমা নাগাসাকির বিস্ফোরণের ফলস্বরূপ বহুকাল পরেও বহু লোককে ক্যান্সারের কবলে পড়তে হয়েছে

১১। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

মাসে একবার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পারলে ভাল। প্রতিটি গ্রামে ও শহরে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য সুলভে বা সহজে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা স্বাস্থ্য-সংগঠনের সাহায্য না পাওয়া গেলে তা সম্ভবপর হবে না।

এবার ক্যান্সারের বর্তমান চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানাচ্ছি। আগেই বলেছি, ক্যান্সার সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে 'অনকোলজি' বলে। যাঁরা ক্যান্সারের চিকিৎসা করেন তাঁদের বলে 'অনকোলজিস্ট'। চিকিৎসাপদ্ধতির মোটামুটি দুটি ভাগ আছে। যেমন, সার্জিক্যাল অনকোলজি অর্থাৎ শল্য-চিকিৎসা দ্বারা অপারেশন করে যতদূর সম্ভব ক্যান্সারে আক্রান্ত জায়গাটি কেটে বাদ দেওয়া। দ্বিতীয় পদ্ধতিটির নাম রেডিয়েশান অনকোলজী বা রেডিওথেরাপি। এখানে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ-পদ্ধতিতে ক্যান্সার-কোষকে বিনাশ করা হয়। তৃতীয় পদ্ধতির নাম কেমিক্যাল অনকোলজী বা কেমোথেরাপি—এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করে রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

আরও কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেমন, প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম হরমোন ব্যবহার করা হয়, যেখানে হরমোন এবং ক্যান্সারের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। আর একটি পদ্ধতি হলো ইমিউনো-থেরাপি। এতে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হয়।

অনেক ক্ষেত্রেই এইসব পদ্ধতিগুলির মিশ্রণে ক্যান্সারের চিকিৎসা সুষ্ঠভাবে করা সম্ভব হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মোটামুটি ক্যান্সার প্রতিরোধের চারিটি উপায় অবলম্বন করতে বলেছে :

(১) ক্যান্সার হবার কারণগুলি (যেগুলি আগে বলা হয়েছে) দূরীকরণ।

(২) খাদ্যে বেশি পরিমাণে গ্রীন ভেজিটেবল এবং স্যালাডের ব্যবহার।

(৩) ধূমপান, খৈনী, পান, জর্দা, মদ্যপাম থেকে বিরত থাকা এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা (জল, বায়ু ও পরিবেশ দূষণ রোধ)।

(৪) প্রত্যেকেরই উচিত নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো।

সুতরাং বলা যায়, 'ক্যান্সার হ্যাজ অ্যান আনসার'। □

গ্রন্থ-পরিচয়

"পল্লীর কুটিরেই ভারতের আত্মা"

চিত্তরঞ্জন বসু

Swami Vivekananda's Vision of Rural Development : Swami Prabhananda. Ramakrishna Mission Lokasiksha Parisad, Ramakrishna Mission Ashrma, Narendrapur, South 24-Parganas. Price : not printed.

অনেকদিন বাদে একখানি ভাল বই পড়ে আনন্দ পেলাম। ৭২ পৃষ্ঠার এই বইটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তাছাড়া একটি পরিশিষ্টও আছে।

ভারতে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। সুতরাং আপামর গ্রামবাসীর উন্নতির অর্থ হলো ভারতের উন্নতি। এই পুস্তিকায় স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় গ্রামীণ জীবনের পরিমাণগত (quantitative) ও গুণগত (qualitative) উন্নয়নের দিক তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে জীবনের উন্নততর মূল্যবোধের দিকে ভারত এগিয়ে যাবে। লেখক পল্লী-উন্নয়ন মানসে 'বিবেকানন্দ মডেল' তৈরি করেছেন এবং তিনি আশা করেন যে, এই মডেল অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হলে পল্লী-উন্নয়নের প্রায় সবরকম সমস্যার সমাধান হবে।

পশ্চিমবঙ্গে সোনারপুরের দক্ষিণ-পূর্বে, আরাপাঁচ গ্রুপের কয়েকটি গ্রামের উন্নয়ন প্রকল্পে 'বিবেকানন্দ মডেলে'র বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। পরিশিষ্টে এর উল্লেখ আছে। পাঠক-পাঠিকা বইখানি পড়ে 'বিবেকানন্দ মডেল'-এর উৎকর্ষ যথোচিত উপলব্ধি করতে পারবেন। বইতে যেসকল পরিসংখ্যান পরিবেশিত হয়েছে তার হয়তো কিছু কিছু এর মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু মূল বক্তব্য বা চিন্তাধারার কোন পরিবর্তন হয়নি।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারত সরকার গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বহু প্রকল্প রচনা করেছেন। যেমন, গুরগাঁও এক্সপেরিমেন্ট, বরোদা এক্সপেরিমেন্ট, এটাওয়া প্রোজেক্ট ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন প্রকল্পই সার্থক হয়নি। লেখকের মতে তার অন্যতম কারণ ঃ পরিকল্পনা বাইরে থেকে চাপানো হয়েছে, ভিতর থেকে আসেনি। আদেশের মাধ্যমে পরিকল্পনার কাজ সম্পাদনের চেষ্টা হয়েছিল মাত্র, অন্তরের টান সেখানে ছিল না (পৃঃ ৫)। কোন কোন পরিকল্পনা আমলাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল, স্থানীয় পল্লীবাসী বা নেতাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। বিপ্লবের জোয়ার বা আন্দোলন ওপর থেকে এসেছে, আপামর গ্রামবাসীর কাছ থেকে আন্দোলনের জোয়ার আসেনি (পৃঃ ৭)। গ্রামীণ উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন গ্রামবাসীর আগ্রহ, উৎসাহ, পুরোপুরি উন্নয়নের স্রোতে মিলে যায়।

রবীন্দ্রনাথ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সহযোগিতা ও মিলনের মাধ্যমে মৃতপ্রায় গ্রামগুলিকে পুনর্জীবিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পল্লীবাসী তাঁকে স্বাভাবিক নেতা হিসাবে মেনে নেয়নি (পৃঃ ১০)। পল্লী-উন্নয়নে স্থানীয় পল্লীবাসীদেরই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিতে হবে। বাইরের বিশেষজ্ঞ কেবলমাত্র তাদের সাহায্য করবে (পৃঃ ১১)। মহাত্মাজীর গ্রামীণ ভারতের স্বরাজ ব্যবস্থার মূলভিত্তি বিকেন্দ্রীকরণ। তাঁর প্রধান বক্তব্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ। তাঁর পরিকল্পনার ত্রুটি ছিল। ৭ লক্ষ গ্রামের জন্য ৭ লক্ষ গ্রামসেবক সংগ্রহ করা বাস্তবে সত্যিই কঠিন।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু সেই পুরনো লাঙ্গল, সেই হাড়-বের করা বলদ, সেই ঋণের বোঝায় জর্জরিত দরিদ্র কৃষক। তা হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে জনমানসে এক নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ হয়েছিল।

লেখক গ্রামোন্নয়নের ছয়টি মূল স্বতঃসিদ্ধ বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেছেন (পৃঃ ৪৩)। বিবেকানন্দ বলেছেন, পল্লী-জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের জাতীয় পাপ। পল্লীর কুটিরেই বর্তমান ভারতের আত্মা বিরাজমান। আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের মাধ্যমে পল্লীর জনমানসকে পুষ্ট করতে হবে। ধর্ম হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত

ঐশ্বরিক শক্তি বিকাশের বিজ্ঞান এবং প্রতিটি আত্মাই অনন্ত সম্ভাবনা-সূচক ঐশী শক্তিতে বলীয়ান। প্রচলিত অর্থে ধর্ম অনেক সময় মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও জটিলতা সৃষ্টি করে। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মকে আত্মার বিজ্ঞান বা অধ্যাত্মবাদ আখ্যা দিয়েছেন। আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে লেখক স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন (পৃঃ ৪৪)। স্বামীজী বলেছেন ঃ একহাতে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরে অপর হাতে অন্যান্য জাতির কাছ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিখতে হবে। কিন্তু তাকে জীবনের মূল আদর্শের সাথে আত্মীকরণ করে নিতে হবে। তবেই ভারত যথার্থ মহিমামণ্ডিত হয়ে আবির্ভূত হবে। পৃথিবীর যেকোন মূল্যবান সম্পদের চেয়ে মনুষ্য-সম্পদ অধিকতর মূল্যবান। সুতরাং ভারতের আপামর পল্লীবাসীর সার্বিক উন্নয়ন ও মঙ্গলসাধনই হচ্ছে ভারতের চরম ও পরম কল্যাণ। লেখক এই অংশটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। স্বামীজী আত্মনির্ভরশীলতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ ঢেলে দিলেও ভারতের একটি ছোট্ট গ্রামের সার্বিক উন্নতি হতে পারে না—যদি না গ্রামবাসীদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতার গুণ না জন্মে। গ্রামোন্নয়নের এটাই হলো বীজমন্ত্র। বাইরের সাহায্য পল্লীবাসীর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্মবিকাশ, আত্মনিয়ন্ত্রণ বা স্বশাসনের শিক্ষাই পল্লীবাসীর সার্বিক উন্নতির মূলমন্ত্র। কর্মই ধর্ম—কাজই হচ্ছে পূজা। এই জ্ঞান, এই ধ্যান, এই তপস্যা, এই মন্ত্র নিয়ে আমাদের দীক্ষিত হতে হবে পল্লী-উন্নয়নের মহাযজ্ঞে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষাই উন্নয়নের মূল উপাদান। তিনি মানুষ গড়ার শিক্ষা, চরিত্র গঠনের শিক্ষার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। আর ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতরে যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান তার প্রকাশ। সুতরাং উভয় স্থলেই শিক্ষকের কার্য কেবল পথ থেকে সব অন্তরায়কে সরিয়ে দেওয়া। ভারতীয় মাটি, জল, কৃষ্টি, সভ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাকে আপামর জনসাধারণের দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। এই বক্তব্যটিও লেখক সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন (পৃঃ ৫৬)। প্রত্যেকের চরম মঙ্গলই এই ভাবাদর্শের মূল কথা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই তা সম্ভব। পাখি যেমন এক ডানায় ভর দিয়ে উড়তে পারে না, তেমনই কোন সমাজ নারী ও গণমানুষকে অবজ্ঞা করে উন্নয়নের পথে এগোতে পারে না। কৃষির ওপরে নির্ভরশীল শিল্পের মাধ্যমে স্থানীয় মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার—কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপ, ছদ্মবেশে বেকার (Disguised unemployment) প্রভৃতি সমস্যার সমাধান সম্ভব—স্বামীজী মনে করতেন। যুবকবৃন্দকেই এই পরিবর্তন আনতে হবে। যুব-সমাজকেই জাগতে হবে, ভাবতে হবে, কাজ করতে হবে, উদ্বুদ্ধ হতে হবে। উল্লিখিত কাজগুলোর সমাধানে রাজনীতিকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে। বৈদান্তিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে সমাজতন্ত্র—স্বামী বিবেকানন্দ সুপারিশ করেছেন। কারণ বেদান্ত ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই উদ্দেশ্য হলো মানুষে মানুষে সমতা, স্বাধীনতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং শোষণ থেকে মুক্তি (পৃঃ ৭০)।

সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বৈদান্তিক দর্শনের অদ্বিতীয়ত্ব বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছেন। লেখক গ্রামোন্নয়নে বৈদান্তিক দর্শনের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। স্বামীজীর বৈদান্তিক দর্শনের মূলমন্ত্র হলো দুটি—মানুষের দেবত্ব ও মানবজীবনের অনিবার্য আধ্যাত্মিক পরিণতি। সব সমাজ, সব রাষ্ট্র, সব ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানুষের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত শক্তির স্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে এবং মানুষের সব স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে মানুষের অনিবার্য আধ্যাত্মিক পরিণতির প্রয়োজনে।

স্বামীজী 'নর'কে শুধু 'নরোত্তম' করতে চাননি, —তিনি চেয়েছেন 'নর'কে তার স্বরূপ 'নারায়ণে' প্রতিষ্ঠিত করতে। এরই মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের পল্লী-উন্নয়নের ভাবাদর্শের চরম ও পরম কল্যাণের বীজ উপ্ত রয়েছে। স্বামীজীর সেই ভাবাদর্শের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে আলোচ্য পুস্তিকাটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছে। ☐

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সভার ১৯৯০-৯১ খ্রীস্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৮২তম (বিরাশিতম) বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯১ বিকাল সাড়ে তিনটায় বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যদের নিকট রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৯০-৯১ খ্রীস্টাব্দের নিম্নলিখিত কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন।

হারলেম (নেদারল্যান্ডস)-এ একটি নতুন শাখাকেন্দ্র স্থাপন, গঙ্গার জলকে পানযোগ্য করার জন্য বেলুড় মঠে একটি **ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, বিহারে আদিবাসীদের** বসবাসের জন্য ১৭টি স্বল্প মূল্যের বাড়ি ও একটি সমাজগৃহ নির্মাণ, **অন্ধ্রপ্রদেশে** ২০০টি **ঝঞ্ঝা-নিরোধ বাড়ি** ও ৪টি **আশ্রয়গৃহ-সহ-সমাজগৃহ নির্মাণ**প্রকল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই বর্ষের ব্যাপক কর্মসূচীতে **ত্রাণ ও পুনর্বাসনের** জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ৫২'৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। এছাড়া ১৪'১০ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রীও দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

জনকল্যাণমূলক কর্মতালিকায় দরিদ্র ছাত্রছাত্রী, রুগ্ন, বার্ধক্যক্লিষ্ট, দুঃস্থ ও অনাথ নরনারীর সাহায্যের জন্য প্রায় ৬১'৬১ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

চিকিৎসা-সেবাক্ষেত্রে মিশনের নয়টি হাসপাতাল এবং ৭৯টি বহির্বিভাগীয় ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রশংসনীয় কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় সাত কোটি টাকা খরচ করে প্রায় ৪৩ লক্ষ রোগীর সেবা করা হয়েছে।

শিক্ষা বিভাগে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত উচ্চমানের ধারা বজায় রেখেছে। এবছর মিশনের ৭৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,০২,৯৫২ জন। শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়েছে ২৩'৬৯ কোটি টাকা।

গ্রামীণ ও আদিবাসীদের সেবায় দেশের বহু পল্লী ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিস্তারিত কর্মসূচীতে মিশন প্রায় ২'২৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

বিদেশের শাখাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে মিশনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার অব্যাহত ছিল।

বেলুড়ের মূলকেন্দ্র ভিন্ন রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠের **ভারতে ও বহির্ভারতে** যথাক্রমে ৭৯টি এবং ৭৬টি শাখাকেন্দ্র এই বছর ছিল।

ত্রাণ

উত্তরপ্রদেশ ভূমিকম্পত্রাণ : কনখল আশ্রমের মাধ্যমে উত্তর কাশী জেলায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ১২৫০টি পরিবারের মধ্যে পাঁচ মেট্রিক টন চাল, দশ মেট্রিক টন অন্যান্য জিনিসপত্র, ৪০০ সেট বাসনপত্র, ১৫০০ কম্বল, ১০০ পশমের পোশাক, ৫০ হাজার বিভিন্ন রকম কাপড়-চোপড়, ৫০০ জোড়া জুতা, ২০০ তাঁবু ও ৫০০ ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসাত্রাণও চলছে।

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

মালদা আশ্রমের মাধ্যমে মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ক্ষতিগ্রস্ত ৫,২০০ পরিবারের মধ্যে ১৯৯৬টি শাড়ি, ১৯৯টি ধুতি ও ১২, ২৩০টি বিভিন্ন রকমের পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

তামিলনাড়ু বন্যাত্রাণ

গত ১৭ ও ১৮ নভেম্বর প্রবল বর্ষণে মাদ্রাজ

শহরের উত্তর ও দক্ষিণাংশের ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিগুলিতে **মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ** ৫,৩০০টি পাউরুটি বিতরণ করেছে।

উড়িষ্যা বন্যাত্রাণ

পুরী মঠের মাধ্যমে পুরী জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ২৩০টি ধুতি, ১৯০টি শাড়ি, ১৬৫টি চাদর, ১৫টি বালতি বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ছাত্রদের ১৫০ সেট বই দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ

গুন্টুর জেলার নিজামপটনম মণ্ডলের মুক্তেশ্বরপুরম ও কোঠাপালেম গ্রামে আশ্রয়গৃহ-সহ সমাজগৃহের প্লাস্টার করার কাজ চলছে।

বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামঞ্চিলি মণ্ডলের কোঠাপালেম গ্রামে আশ্রয়গৃহের কাজ এগিয়ে চলছে।

বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম জেলার বনসখালি ও কাট্টোলি অঞ্চলে ৯৭৮টি গৃহনির্মাণ প্রকল্পের মধ্যে ৭৪৪টি বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং এগুলির সত্ব বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় গত ২৪ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বিনামূল্যে এক চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে পুরী শহরের সরকারি হাসপাতালের চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ পি. সি. ভুঁইয়া ও ডাঃ বরেন পট্টনায়ক ৫২ জন রোগীর চক্ষু অস্ত্রোপচার করেন। ২৪ অক্টোবর শিবির উদ্বোধন করেন পুরী শহরের সংসদ ব্রজকিশোর ত্রিপাঠী। রোগীদের শিবিরে থাকা-খাওয়া, ঔষধ এবং চশমা ও বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ৪৫ জন স্বেচ্ছাসেবক সেবাকার্যে সহায়তা করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গল গত ৪ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যে কামারপুকুরে এক চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। এই শিবিরে মোট ১১৪ জন রোগীর চক্ষু অস্ত্রোপচার করা হয়। পল্লীমঙ্গলের পরিচালনায় এটি ছিল দশম অস্ত্রোপচার শিবির।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা): গত ১ ডিসেম্বর 'ইউনিটি' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন রেভারেন্ড চালর্স আর. হোয়াট। ২৭ ডিসেম্বর বেদান্ত সোসাইটিতে এবং ২৯ ডিসেম্বর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর 'ক্রিসমাস ইভ' পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ২২ ডিসেম্বর যীশুখ্রীস্টের ওপর ভাষণ দিয়েছেন ডেভিড জানজেন ও স্বামী প্রমথানন্দ। ১৫ ও ৩১ ডিসেম্বর যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে। তাছাড়া ৩১ ডিসেম্বর 'নিউ ইয়ার্স ইভ'ও পালিত হয়েছে। গত ৮ ডিসেম্বর গীতার শিক্ষা বিষয়ে অন্টারিওর লন্ডনে হিন্দু কালচারাল সেন্টারে সোসাইটির প্রধান স্বামী প্রমথানন্দ ভাষণ দেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো): গত ডিসেম্বর মাসে প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। তাছাড়া তিনি প্রতি শুক্রবার এই পুরনো মন্দিরে যোগসূত্রের ক্লাস নিয়েছেন। ২৭ ডিসেম্বর পূজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ 'শ্রীসারদাদেবী: হার সাইলেন্ট ইনফ্লুয়েন্স' বিষয়ে ভাষণ দেন। যীশুখ্রীস্টের জন্মদিন উপলক্ষে সকালে বাইবেল পাঠ করেন এবং ভাষণ দেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন (সিয়াটল): গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের রবিবার ধর্মীয় ভাষণ এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 'ক্রিস্‌মাস ইভ' উপলক্ষে ক্যারল পরিবেশন ও পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি সঙ্গীত, পূজা, অঞ্জলি, প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে পালিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস: ডিসেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মীয় ভাষণ দিয়েছেন স্বামী চেতনানন্দ। তাছাড়া ডিসেম্বর মাসের ১ম ও ২য় মঙ্গলবার মুণ্ডক উপনিষদ্ এবং ১ম ও ২য়

বৃহস্পতিবার 'শ্রীরামকৃষ্ণ দ্য গ্রেট মাস্টার'-এর ক্লাসও নিয়েছেন তিনি। ২৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-তিথি পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ২৯ ডিসেম্বর সঙ্গীত, জপ-ধ্যান, পূজা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ ডিসেম্বর ক্রিসমাস উৎসব পাঠ, জপ-ধ্যান, ক্যারল, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ১৫ ও ৩১ ডিসেম্বর যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো : ডিসেম্বর মাসে সাপ্তাহিক ভাষণ ও ক্লাস যথারীতি হয়েছে। তাছাড়া ২৭ ডিসেম্বর ভক্তিগীতি, পূজা ও প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের এবং ৩১ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিও পালিত হয়েছে। তারপর বেলা ১০-৩০ মিনিট থেকে ১২-৩০ মিনিট পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'নিউ ইয়ার্স ইভ' উদ্‌যাপিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক : ডিসেম্বর মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ। তাছাড়া তিনি প্রতি শুক্রবার 'বিবেকচূড়ামণি' এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী কল্যাণেশ্বরানন্দ (প্রফুল্ল) গত ১৮ নভেম্বর বেলা ১০-১০ মিনিটে বেলুড় সারদাপীঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। গত দু-একবছর ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে ভুগছিলেন এবং দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে থেকে খুব দুর্বলতা অনুভব করছিলেন।

স্বামী কল্যাণেশ্বরানন্দ ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষালাভ করেন এবং ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। আট বছর মায়াবতী এবং তার শাখাকেন্দ্র কলকাতার অদ্বৈতাশ্রমে কাজ করার পর তিনি ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের কর্মী হন। দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি এই আশ্রমেরই কর্মী ছিলেন। অদ্বৈতাশ্রমে থাকাকালীন তিনি মেদিনী-পুরের ঝঞ্ঝা ও বন্যাত্রাণে অংশগ্রহণ করেন। ফটোগ্রাফি বিষয়ে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। সারদা-পীঠের ফটোগ্রাফি বিভাগের উন্নতি-কল্পে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফটো তোলার শখের জন্য তিনি 'ফটোগ্রাফার স্বামী' নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। সরল, নিরহঙ্কারী ও হাসিখুশি স্বভাবের এই সন্ন্যাসী সকলের প্রিয় ছিলেন। □

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ২৭ ডিসেম্বর '৯১ (১১ পৌষ, ১৩৯৮) বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৯তম শুভ আবির্ভাব-তিথি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঐদিন ভোর থেকে রাত্রি ৮-৩০ পর্যন্ত অগণিত ভক্তনরনারী মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন করেন। সকলকেই হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। দুপুরে প্রায় ছয় হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়িপ্রসাদ দেওয়া হয়। সকাল ৯টায় 'সারদানন্দ হল'-এ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সকাল ১০টায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা ছ'টায় গীতি-আলেখ্য করেন তপন সিংহ ও সম্প্রদায়।

গত ১৫ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের এবং ৩১ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সত্যব্রতানন্দ ও স্বামী দেবস্বরূপানন্দ।

খ্রীস্টোৎসব : গত ২৪ ডিসেম্বর যীশুখ্রীস্টের আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। সন্ধ্যায় যীশুখ্রীস্টের প্রতিকৃতির সম্মুখে আরাত্রিক ও ভোগ নিবেদন করা হয়। যীশুর বাণীর তাৎপর্য আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানান্তে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। □

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২৭ অক্টোবর '৯১ **রাণাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘে নদীয়া জেলার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** 'ডি' অঞ্চলের প্রথম ষাম্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সেবাসঙ্ঘে বিশেষ পূজানুষ্ঠানাদি এবং নগর-পরিক্রমা হয়। অধিবেশন ও প্রকাশ্য ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় রাণাঘাট 'রবীন্দ্র ভবনে'। প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় সকাল ৯-৩০ মিনিটে। এই অধিবেশনে 'ডি' অঞ্চলের আশ্রমগুলির কার্যধারা নিয়ে আশ্রমের সদস্যগণ আলোচনা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে (২—৪টা) যোগদানকারী আশ্রমগুলির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। তারপর অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্য ধর্মসভা। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবরাজানন্দ ও প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। প্রকাশ্য ধর্মসভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ ও স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর **কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** ('সি' অঞ্চল) অন্তর্গত **নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার** আশ্রমগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আশ্রমগুলির ভূমিকা, কার্যধারা ইত্যাদির সঙ্গে প্রশ্নোত্তর সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন পরিষদের সহ-সভাপতি স্বামী দিব্যানন্দ। বিকালে সর্বসাধারণের জন্য ধর্মসভাও অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন রহড়া আশ্রমের সম্পাদক স্বামী জয়ানন্দ।

গত ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর **উত্তর পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** ৮ম ষাম্মাসিক অধিবেশন **লামডিং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতিতে** অনুষ্ঠিত হয়। ২২টি আশ্রম থেকে ৫৭ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। এই সম্মেলনে বেলুড় মঠ থেকে ভাবপ্রচার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক স্বামী স্মরণানন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের প্রেসিডেন্ট স্বামী উদ্গীতানন্দ দুই দিনের কার্য পরিচালনা করেন। তাছাড়া শিলং মিশনের সম্পাদক স্বামী রঘুনাথানন্দ ও চেরাপুঞ্জি মিশনের সম্পাদক স্বামী ইষ্টানন্দ যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে ২১সেপ্টেম্বর সারাদিনব্যাপী ভক্তসম্মেলন হয় এবং সন্ধ্যারতির পর স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরদিন সকাল ৮টা থেকে পরিষদের অধিবেশনে আশ্রমগুলির কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়। সন্ধ্যারতির পর অনুষ্ঠিত ধর্ম-সভায় ভাষণ দেন উপস্থিত সন্ন্যাসিবৃন্দ।

গত ৩ নভেম্বর **কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** এক বস্ত্র-বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কৃষ্ণনগর শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মোট ৮৯জন দুঃস্থ নর-নারীর মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন স্বামী দেবরাজানন্দ, স্বামী বিশ্বনাথানন্দ ও স্বামী গোপেশানন্দ। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও প্রসাদ বিতরণ হয়। সন্ধ্যায় এক ধর্মসভারও আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় সেবাধর্মের ওপর বক্তব্য রাখেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ ও স্বামী দেবরাজানন্দ। উল্লেখ্য এই আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় গত শ্যামাপূজার সময় স্থানীয় পূজাপ্রাঙ্গণে পাঁচদিনের জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বেদান্ত সাহিত্যের একটি বুকস্টল খোলা হয়েছিল। বুকস্টলটি স্থানীয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর **ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর) কথামৃত পাঠচক্রের** উদ্যোগে একদিনের সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ, জপ-ধ্যান, ভজন-সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী কমলেশানন্দ। মোট ৫০ জন ভক্ত সাধন-শিবিরে যোগদান করেছিলেন।

গত ২৩ জুন **রামকৃষ্ণ-বিশুদ্ধানন্দ সমিতির** বার্ষিক অধিবেশন ৩ ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সে (কলিকাতা-১৯) অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী রমানন্দ এবং সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। □

বিজ্ঞান-সংবাদ

পোড়া ঘায়ের চিকিৎসায় মধু

পুড়ে গেলে যেসব ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় সেইগুলির বদলে মধু লাগালে আরও ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে ; ঘা তাড়াতাড়ি শুকোচ্ছে এবং অন্যান্য জটিলতাও (complications) কম দেখা যাচ্ছে। গবেষণাটি করা হয়েছে সোলাপুর মেডিকেল কলেজের শল্য-চিকিৎসা বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ সুব্রহ্মণীয়মের তত্ত্বাবধানে। গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি ব্রিটিশ জার্নাল অব সার্জারিতে প্রকাশিত হয়েছে। সব রকম ঘায়ে পুরাকাল থেকেই অন্যান্য চিকিৎসার সঙ্গে মধু লাগান হতো।

বর্তমান গবেষণাকাজে ১০৪ জন রোগী, যাদের সমস্ত শরীরের ৪০ শতাংশের কম অংশ অগভীরভাবে (superficial অর্থাৎ কেবল ত্বক অংশ) পুড়ে গেছে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সোলাপুর হাসপাতালের 'বার্ন ইউনিট'-এ সতেরো মাসে যেসব রোগী ভর্তি হয়েছিল, তাদের ওপর এই সমীক্ষা করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ৫২ জনকে, পোড়া অংশ লবণ-জল দ্বারা পরিষ্কার করে নিয়ে মৌচাক থেকে আহৃত অপরিশুদ্ধ মধু লাগান হয়েছে। মধু লাগানোর পর সেই অংশ পরিশোধিত গজ বা কাপড় (sterile gauge) দিয়ে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। প্রতিবার ব্যান্ডেজ পরিবর্তন করার সময় মধু লাগান হতো। অন্য ৫২ জনের ক্ষেত্রে ক্ষত অংশে সিলভার সালফাডায়াজিন মাখানো গজ জড়ান হয়েছিল এবং পরিবর্তনও করা হতো এই গজ দিয়ে। সবচেয়ে বেশি বয়সের রোগী ছিল ৬৫ বছরের ও সবচেয়ে কম বয়সের রোগী ছিল এক বছর বয়স্ক, গড় ২১-৩০ বছর। যেসব রোগীর ক্ষেত্রে মধু লাগান হয়েছিল, তাদের ৯১ শতাংশ সাতদিনেই জীবাণুমুক্ত হয়েছিল ; অন্য-ভাবে চিকিৎসিত রোগীদের ৭ শতাংশ এই সময়ে জীবাণুমুক্ত হয়েছিল। [এখানে স্মরণীয় যে, পুড়ে যাওয়ার পরে সেই অংশে জীবাণু সংক্রামিত হওয়াই চিকিৎসা ব্যাপারে মস্ত বড় সমস্যা।] মধু দ্বারা চিকিৎসিত রোগীদের ৮৭ শতাংশ পনেরো দিনেই ভাল হয়ে গিয়েছিল ; অন্য-ভাবে চিকিৎসিত রোগীদের ১০ শতাংশ ঐসময়ে আরোগ্যলাভ করেছিল। এদের ঘায়ের তলা থেকে নতুন চামড়ার পূর্ববর্তী গ্রানিউলেশন টিস্যু (granulation tissue) অপেক্ষাকৃত আগে থেকেই (১৩.৪ দিনের জায়গায় ৭.৪ দিনে) দেখা গিয়েছিল। অধ্যাপক জানাচ্ছেন যে, মধু-চিকিৎসার অন্যান্য ভাল দিক হচ্ছে—যন্ত্রণা নিবৃত্তি, আরোগ্যকালে অধিক চামড়া গজিয়ে চামড়ার সংকোচন (post-burn contraction) কম হওয়া, কম খরচ এবং সহজপ্রাপ্যতা।

মধু সম্বন্ধে অধ্যাপক সুব্রহ্মণীয়ম আরও জানাচ্ছেন যে, মধু স্বভাবতই জীবাণুশূন্য (sterile) এবং যেসব জীবাণুর দ্বারা ঘা সংক্রামিত হয়, তাদের বাধা দেয়। এর ঘনত্ব আক্রমণকারী জীবাণুদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং ক্ষত অংশ দিয়ে শরীরের জলীয়াংশ বাষ্পীভূত হতে (fluid loss) বাধা দেয়। [পুড়ে যাওয়া রোগীদের জলীয়াংশ কমে যাওয়া আর একটি বড় সমস্যা।]

মধুতে হয়তো এমন সব উৎসেচক বা এনজাইম (enzyme) আছে, যা আরোগ্য ক্রিয়ায় (healing process) সাহায্য করে। ☐

[**Medical Times, September, 1991, pp. 1 and 6**]

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে।... প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির মৃত্যুও ঘটে।... যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। —মা সারদাদেবী

He who sees Siva in the poor, in the weak and in the diseased, really worships Siva, and if he, sees Siva only in the image, his worship is but preliminary. He who has served and helped one poor man seeing Siva in him, without thinking of the caste, creed or race, or anything, with him Siva is more pleased than with the man who sees Him only in temple.

Swami Vivekananda

SPACE DONATED BY :

A WELL-WISHER

Doing good to others out of compassion is good, but the seva (service) of all beings in the spirit of the Lord is better.

Swami Vivekananda

There is no higher virtue than charity. The lowest man is he whose hand draws in receiving; and he is the highest man whose hand goes out in giving.

Swami Vivekananda

Be not a traitor to your thoughts. Be sincere; act according to your thoughts, and you shall surely succeed.

Swami Vivekananda

Each soul is potentially divine.

The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal.

Do this either by work or worship or psychic control, or philosophy—by one or more, or all of these—and be free.

This is the whole of religion. Doctrines or dogmas, or rituals or books, or temples or forms, are but secondary details.

Swami Vivekananda

We shall spend no time arguing as to theories and ideals, methods and plans. We shall live for the good of others; we shall merge ourselves in struggle. The battle, the soldier, and the enemy will become one.

Sister Nivedita

অমৃতঃকথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতি মাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

৩

In the world take always the position of the giver. Give everything and look for no return. Give love, give help, give service, give any little thing you can, but keep out barter. Make no conditions and none will be imposed. Let us give out of our own bounty, just as God gives to us.

Swami Vivekananda

KONATRON
IC-CONTROLLED
AUTOMATIC
INVERTER
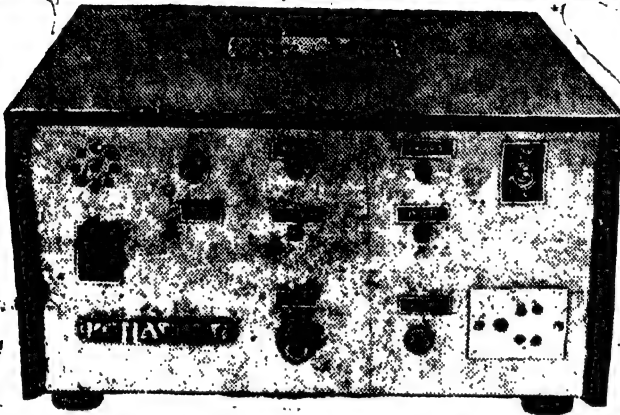
একটি আবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্র

পোঃ+গ্রাম—গুড়াপ ; হুগলী। পিন—৭১২ ৩০৩

গুড়াপ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্র সন্নিহিত অঞ্চলে একটি আত্মিক উন্নতির উপাসনাকেন্দ্র এবং জনকল্যাণ ও সেবামূলক কেন্দ্ররূপে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। ধর্মপ্রাণ-অধ্যাত্মজ্ঞানপিপাসু ভক্তদের কাছে এই আশ্রম এক শান্তির আশ্রয়। শ্রীশ্রীজগন্মাতা সারদাদেবীর দীক্ষিত সন্তান, গণিতজ্ঞ কেশবচন্দ্র নাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম ও সেবাকেন্দ্রটি শুরু থেকেই নানা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক উৎসবানুষ্ঠান, শিক্ষামূলক এবং বিভিন্ন সেবামূলক ও জনহিতকর কাজ করে আসছে। এই আশ্রম ও সেবাকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীন "হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের" অন্তর্ভুক্ত।

স্বামীজীর নির্দেশিত পথে সেবামূলক নানা কর্মসূচীর মধ্যে বর্তমানে দুঃস্থ নরনারীদের জন্য ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশন সেন্টার—প্রথাবহির্ভূত প্রাথমিক বিদ্যালয়, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক কোচিং সেন্টার, চিকিৎসাকেন্দ্র, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ-সম্বন্ধীয় পাঠাগার, সাধুনিবাস এবং একটি অতিথিভবন স্থাপন করার উদ্দেশ্যে আশ্রমের উপাসনাকক্ষের দক্ষিণ প্রান্তে তিনতলার ভিতযুক্ত ছাদ ঢালাই সমেত চারটি বড় ঘর, প্রশস্ত বারান্দা, রান্নাঘর, স্নানাগার ও সিঁড়ি নির্মাণ করার কাজ শেষ হয়েছে।

এ যাবৎ সংগৃহীত অর্থের সঙ্গে ৬৩ হাজার টাকা ঋণ সংগ্রহ করে গৃহনির্মাণের এই অসম্পূর্ণ রূপদান করা সম্ভব হয়েছে। নির্মীয়মাণ এই গৃহের বাকি কাজগুলি শেষ করার জন্য এখনো আরও লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন। ক্রমান্বয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে এই নির্মাণকাজের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্বোক্ত ঋণ ছাড়াও পুনরায় অতিরিক্ত ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমে নির্মাণকাজটি শেষ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মভিটায় প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম ও সেবাকেন্দ্রের সর্বপ্রকার উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুযায়ী এই গৃহনির্মাণ প্রকল্পটির জন্য এই ঋণ-ভার ও অর্থাভাব থেকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করতে মহানুভব শিল্পপতি, উদার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এবং ভক্তবৃন্দের নিকট বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

UCO BANK—গুড়াপ শাখার ব্যাঙ্ক-ড্রাফট্ আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক। চেক বা ড্রাফট্ "Secretary, Sri Ramakrishna-Vishuddhananda Ashrama & Sevakendra, Gurap, Hooghly." এই নামে রেজিস্টার্ড ডাকে (অথবা মনি অর্ডার যোগেও) পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

[**বিশেষ আবেদন :** আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি '৯২ (রবিবার) সকাল ১০টায় বেলুড় মঠের পূজনীয় স্বামীজীদের উপস্থিতিতে নির্মীয়মাণ এই "বিশুদ্ধানন্দ ভবনের" উদ্বোধনের দিন স্থির হয়েছে। এই শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।]

গুড়াপ : হুগলী	অমিয়রঞ্জন ঘোষ	দেবীপ্রসাদ নাগ	রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫ জানুয়ারি, ১৯৯২	সভাপতি	কোষাধ্যক্ষ	সম্পাদক

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষ-পূর্তি উৎসব

ব্যবস্থাপনায়

সারদা-রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির উৎসব সমিতি

[এটি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোন শাখাকেন্দ্র নয়।]

বৈশালী পার্ক,
১৩৫/৮ ভুবনমোহন রায় রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০৮

অনুষ্ঠানসূচী : ১৯৯২

১২ জানুয়ারি	ধর্মসভা	গৌরহাটী (আরামবাগ, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ)
১৬ ফেব্রুয়ারি	ধর্মসভা	দুর্গাপুর (বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ)
১৫ মার্চ	ধর্মসভা	ভুবনেশ্বর (ওড়িশা)
১৫ এপ্রিল	ধর্মসভা	দিল্লী
মে	সেমিনার	ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)
জুন/জুলাই	সাধু সম্মেলন (উত্তরকাশী রুদ্রাবাস ও শঙ্কর মঠের সহিত যৌথ উদ্যোগে)	উত্তরকাশী (উত্তর প্রদেশ)
আগস্ট	ধর্মসভা ও সাধুসেবা	হৃষীকেশ (উত্তর প্রদেশ)
সেপ্টেম্বর/অক্টোবর	**সমাপ্তি উৎসব**	

(১) স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর জন্মস্থান কর্ণাটকের সুজির এবং পৈত্রিক ভিটা গুরুপুরে পুণ্যযাত্রা।
(২) জন্মস্থান সুজিরের শতবর্ষপূর্তি স্মারক-শিলা স্থাপন।
(৩) স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর একখানি তৈলচিত্র তাঁর বর্তমান পরিবারবর্গের হস্তে প্রদান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(ক) যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চান তাঁরা উৎসব সমিতির ঠিকানায় ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন।
(খ) প্রণামী ও অর্থাদি সমিতির ঠিকানায় সভাপতির নামে পাঠাতে হবে।
(গ) চেক পাঠালে A/c. Payee, 'V. Centenary Fund' লিখতে হবে।
(ঘ) প্রয়োজনে অনুষ্ঠানসূচীর পরিবর্তন হতে পারে।

অহিভূষণ বসু, সভাপতি
১৫ জানুয়ারি ১৯৯২ সারদা-রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির উৎসব সমিতি

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচিপত্র

৯৪তম বর্ষ ফাল্গুন ১৩৯৮

সম্পাদক

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ ছয়/তিরিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঞ্চাশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও দেয় —প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা

বর্তমান সংখ্যার মূল্য ছয় টাকা

গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন ৯৪তম বর্ষ সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
যুগ্ম সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বেগের বিষয় যে, গত কয়েক মাস যাবৎ গ্রাহকদের অনেকে সাধারণ ডাকে, এমনকি রেজিস্ট্রি ডাকেও, উদ্বোধন হয় দেরিতে পাচ্ছেন অথবা একেবারেই পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন। সহৃদয় গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানাই যে, স্থানীয় ডাকঘর এবং উর্ধ্বতম ডাকবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ডাকবিভাগের উর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের পত্রিকা-প্রাপ্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিতরণের আশ্বাসও দিয়েছেন। গ্রাহকদের অনেকেই ভাবছেন হয়তো উদ্বোধন-এর পক্ষ থেকে ঠিকমতো পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয় না। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। আমরা নিয়মিত পত্রিকা ডাকে দিয়ে থাকি। ডাকঘরের সঙ্গে ব্যবস্থামতো প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ২৩ অথবা ২৪ তারিখ গ্রাহকদের পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়।

গত আশ্বিন সংখ্যা ডাকে পাননি বলে কেউ কেউ জানাচ্ছেন এবং ডুপ্লিকেট কপি পাঠাতে অনুরোধ করছেন। গত আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র সংখ্যায় প্রতিবারের মতো আমরা জানিয়েছিলাম যে, আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। সহৃদয় গ্রাহকগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণ এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। কাগজ ও মুদ্রণাদির অতি-দুর্মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি বিনামূল্যে দেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া, এবছর শারদীয়া সংখ্যার অত্যধিক চাহিদায় মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলিও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত।

শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করবেন বলে জানিয়ে যাঁরা ৩১ ডিসেম্বরের ('৯১) মধ্যেও সংগ্রহ করেননি, তাঁদেরকে সংখ্যাটি আমাদের পক্ষে আর দেওয়া সম্ভব নয়।

☐ মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকার বর্ষ শুরু হয়। প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে বর্তমান বর্ষের (৯৪তম বর্ষ : ১৩৯৮-১৩৯৯/১৯৯২) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ : চল্লিশ টাকা ☐ ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ : পঞ্চাশ টাকা ☐ বাংলাদেশ—নব্বই টাকা ☐ বিদেশের অন্যত্র— দুশো টাকা (সমুদ্র-ডাক), চারশো টাকা (বিমান-ডাক)।

আজীবন গ্রাহকমূল্য : এক হাজার টাকা (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য)

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বৎসরান্তে নবীকরণ-সাপেক্ষ) কিস্তিতেও (অনূর্ধ্ব বারোটি) প্রদেয়। কিস্তিতে জমা দিলে প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে একশো টাকা দিয়ে পরবর্তী এগারো মাসের মধ্যে বাকি টাকা (প্রতি কিস্তি কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা) জমা দিতে হবে।

☐ ব্যাংক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে "Udbodhan Office, Calcutta" এই নামে পাঠাবেন। পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়।

☐ চেকের/ড্রাফটের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

☐ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯·৩০—৫·৩০; শনিবার বেলা ১·৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

টেলিফোন : ৫৪-২২৪৮

ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ ৯৪তম বর্ষ—২য় সংখ্যা

দিব্য বাণী

পরমহংসদেব তক্তাপোশের উপর উপবিষ্ট। ভক্তেরা তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কেহ মাদুরের উপর, কেহ শুধু মেঝের উপর বসিয়া আছেন।

ঘরের পশ্চিমদিকের দ্বারমধ্য দিয়া ভাগীরথী দেখা যাইতেছে। শীতকালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী। পুণ্যসলিলা কলুষহারিণী গঙ্গা যেন ঈশ্বর-মন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে সাগর অভিমুখে যাইতেছেন।

শ্রীম

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ একাধারে গঙ্গা এবং গঙ্গাসাগর

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীর সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন বর্তমান যুগ-সমস্যার কথা, যুগ-যন্ত্রণার কথা। "এই যুগ বিজ্ঞানের যুগ, মানুষের জয়যাত্রার যুগ।"—সাহিত্যিক বলিয়া চলিলেন ঃ "বিজ্ঞান আজ পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশকে এক করিয়া দিয়াছে। পাঁচ-পাঁচটি মহাসাগর এবং ডজনখানেক সাগর-উপসাগরের দুরতিক্রম্য ব্যবধান, শত শত যোজন বিস্তৃত পর্বতমালার দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক কোনভাবেই তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। যে-চাঁদ এতকাল স্বপ্ন ও কল্পনার বস্তু ছিল, পৃথিবীর মানুষ সেখানেও সগর্বে তাহার পদচিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছে। চন্দ্র-বিজয় তো এখন পুরানো ঘটনা, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ গ্রহান্তরেও যাত্রা ও বসতি-স্থাপন করার কথা ভাবিতেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে আর মানুষের সাধ্যাতীত কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকিবে না। মানুষ সর্বজয়ী হইয়া উঠিবে। কিন্তু..."

'কিন্তু' বলিয়া বর্ষীয়ান সাহিত্যিক একটু থামিলেন। বলিলাম ঃ "থামিলেন যে?" তিনি "একটি বিষয় খুবই ভাবিবার যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও উন্নত দেশগুলিতে, যেখানে বিজ্ঞান তাহার বিস্ময়কর ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখিতেছে, মানুষ আজ মনের দিক হইতে বড় অসুখী, বড় নিঃসঙ্গ। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর, বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের, সন্তানের সঙ্গে বাবা-মায়ের, ভায়ের সঙ্গে ভায়ের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর, এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের মানসিক দূরত্ব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এত বৈভব, এত প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়াও উন্নত দেশগুলির মানুষ আজ এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতায় ভুগিতেছে। বস্তুতঃ, এই মানসিক নিঃসঙ্গতা শারীরিক ক্যান্সারের চাইতে অধিকতর দুরারোগ্য একটি নূতন ক্যান্সারের সৃষ্টি করিতেছে শারীরিক ক্যান্সারকে নির্মূল করিবার উপযুক্ত প্রতিষেধক হয়তো বিজ্ঞান একদিন আবিষ্কার করিবে, কিন্তু ততদিনে এই মানসিক ক্যান্সার যে পৃথিবীতে মহামারী ঘটাইয়া ফেলিবে!"

সাহিত্যিক থামিলেন। তাঁহার মুখের রেখায় বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগ প্রকট। তাঁহাকে বলিলাম ঃ "আমাদের একজন বহুমানিত সন্ন্যাসী স্বামী যতীশ্বরানন্দ—যিনি বেশ কিছুকাল আগে লোকান্তরিত হইয়াছেন, যাঁহার ইউরোপ এবং আমেরিকার সমাজকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার অভিজ্ঞতা ছিল—বলিতেন, 'আমেরিকা-ইউরোপ এখন বড় বেশি স্নায়ুর চাপে ভুগিতেছে। অধিকাংশ লোকই মানসিক রোগাক্রান্ত ; সর্বত্রই ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। আমেরিকার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসককে বলিতে শুনিয়াছি যে, সেখানকার হাসপাতালের শয্যাগুলির অর্ধেকেরও বেশি

মানসিক রোগীদের দ্বারা ভর্তি থাকে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা আরও ভয়ানক। কারণ, হাসপাতালে তো আর সবাই আসে না অথবা সবাইকে ভর্তি করা হয় না। এই হাসপাতালে না-আসা মানসিক রোগীদের সংখ্যা ধরিলে ইউরোপ-আমেরিকায় "সুস্থ" ও "সুখী" মানুষ কয়জন পাওয়া যাইবে বলা কঠিন।' যতীশ্বরানন্দজী বলিতেন—'আশঙ্কার বিষয়, ভারতবর্ষেও এই অবস্থা আসন্ন।' স্বামী যতীশ্বরানন্দ যখন এই কথা বলিয়াছিলেন তাহার পর তিনটি দশক অতিক্রান্ত। সমস্যাটি বর্তমানে পাশ্চাত্যে আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আশঙ্কাজনকভাবে উহার ছায়াপাত ঘটিতেছে। দেশ ও বিদেশের যে-চিত্র আমাদের সম্মুখে আজ দেখিতেছি তাহা মোটেই আশাপ্রদ নহে। শোনা যায়, ইউরোপ-আমেরিকায় নাকি বারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা ঘুমের ওষুধ খায়। সেখানে যেমন চোখ, দাঁত, কান ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য প্রতি পরিবারের নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ থাকে, তেমনই থাকে নির্দিষ্ট মনোবিশেষজ্ঞ বা সাইকিয়াট্রিস্ট-ও।

সাহিত্যিকের কপালে ভাঁজ পড়িল। তিনি বলিলেন: "তাহা হইলে এই দুরারোগ্য রোগমুক্তির উপায় কি?" বলিলাম: "উপায় তো মানুষকেই বাহির করিতে হইবে। আপনারা সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী মানুষ—আপনারা ভাবুন, দেশের মানুষের কাছে আপনাদের চিন্তাকে তুলিয়া ধরুন।" সাহিত্যিক বলিলেন: "আপনাদের ব্যবস্থাপত্র কি?" বলিলাম: "যদি একটু 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'-ভাবে বলি, তাহা হইলে বলিব—উপায় ধর্ম, এবং যদি 'কংক্রীট'-ভাবে বলি, তাহা হইলে বলিব—রামকৃষ্ণ। বছর কয়েক আগে আমাদের সঙ্ঘের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী ইউরোপে বক্তৃতা সফরে গিয়াছিলেন। পশ্চিম জার্মানীর রাজধানীতে একটি সভায় তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তর পর্ব চলিতেছে। বাইশ-চব্বিশ বছরের এক সপ্রতিভ ও শিক্ষিত তরুণী সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করিলেন: 'স্বামীজী, আমাদের দেশ আপনার কেমন লাগিতেছে?' সন্ন্যাসী বলিলেন: 'খুব ভাল। তোমরা কত উন্নতি করিয়াছ, তোমাদের বাড়ি-ঘর কত সুন্দর, রাস্তাঘাট কত ভাল, তোমাদের দেশে বেকারসমস্যা নাই, স্বাস্থ্যহীনতা নাই, যোগাযোগব্যবস্থা কত উন্নত!...' সন্ন্যাসীকে তাঁহার মুগ্ধতার তালিকা শেষ করিতে না দিয়া তরুণীটি বলিয়া উঠিলেন: 'সব ঠিক স্বামীজী, কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের দেশের মানুষ এত আত্মহত্যা করে কেন, কেন আমাদের মধ্যে এত মানসিক শূন্যতা, সব থাকিয়াও কেন কিছুই না থাকিবার বোধ আমাদের দিন দিন গ্রাস করিতেছে?' প্রশ্নটি শুনিয়া সন্ন্যাসী স্তম্ভিত, সভাস্থ সকলেই নিস্তব্ধ। কারণ, তরুণীটি যে তাঁহার প্রশ্নে তাঁহার দেশের সকলের অন্তরের নিহিত হাহাকারকে প্রতিফলিত করিয়া দিয়াছেন! সন্ন্যাসী কিছু বলিবার আগেই মেয়েটি বলিয়া উঠিলেন: 'স্বামীজী, ইহার কারণ, আমরা ধর্ম হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছি। রামকৃষ্ণ কি তাহাই বলেন নাই?' এক নিঃশ্বাসে 'ধর্ম' এবং 'রামকৃষ্ণ' শব্দ দুটি উচ্চারণ করিয়া তরুণীটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন উত্তরণের ভূমি কোথায়।

"ঐ পশ্চিম জার্মানীরই আর একজন বয়স্ক অভিজাত মানুষ কয়েকবছর আগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে এদেশের একজন বলিয়াছিলেন, 'আপনি দুর্গাপুর দেখিতে যাইবেন?' জার্মান ভদ্রলোক বলিলেন, 'দুর্গাপুর? কি আছে, সেখানে?' 'বড় একটি ইস্পাতের কারখানা।' জার্মান ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, 'আমি পশ্চিম জার্মানীর মানুষ, পৃথিবীর সেরা ইস্পাত সেখানে তৈয়ারি হয়—আর আপনি আমাকে দুর্গাপুর দেখাইতে চাহিতেছেন! না, না, দুর্গাপুর দেখিতে আমি এত দূর হইতে, এত অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতে আসি নাই। আমি যাইতে চাই কামারপুকুরে, স্পর্শ করিতে চাই সেই ভূমিকে যেখানে জন্ম লইয়াছিলেন বর্তমান ও আগামী কালের পরিত্রাতা রামকৃষ্ণ। আত্মহত্যা, নিঃসঙ্গতা, স্বার্থপরতা, প্রেমহীনতায় পীড়িত ও জর্জরিত পাশ্চাত্যের তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।'"

সাহিত্যিক একটু চমকাইলেন যেন। বলিলেন: "একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন কি? আত্মহত্যার সংকল্প লইয়াই শ্রীম'র কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আকস্মিক আগমন ও ঠাকুরকে প্রথম দর্শন এবং তখনই 'কথামৃতে'র সূচনা—যে 'কথামৃতে' আজ জগৎ তাহার ওষ্ঠাধর ও কণ্ঠ সিক্ত করিতে চাহিতেছে!"

ভাবিলাম, সত্যই তো, 'কথামৃত' তো আমরা সকলেই পড়ি, কিন্তু উহার সূচনাতেই যে এরূপ একটি প্রতীকী ব্যাপার রহিয়াছে তাহা কী আমরা ভাবি? পারিবারিক অশান্তিতে প্রপীড়িত হইয়া, হৃদয়ে গভীর যন্ত্রণা বহন করিয়া শ্রীম ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের এক রাত্রিতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া জনৈক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেন। পরদিন জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ শ্রীম গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবেন সংকল্প করিয়া বাহির হইলেন। হাতে একটি ভাঙা ছাতা, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া জুতা। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে রানী রাসমণির বাগানে যখন তিনি প্রবেশ করিয়াছেন তখনও তাঁহার মনে সেই চিন্তার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। তাহার পর মহাপুরুষের দর্শন এবং তাঁহার দু-একটি অমৃতকথা শ্রবণ! শ্রীম'র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া: "আহা কী সুন্দর স্থান! কী সুন্দর

মানুষ! কী সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না।"

কী ঘটিয়া গেল, শ্রীম কি নিজেই তখন জানিতেন? শুধু দেখিলেন তাঁহার আত্মহত্যার সংকল্প কখন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এক সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে তিনি পুনরায় ফিরিয়া যাইলেন তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার নিকট তাঁহার অস্থায়ী ঠিকানায়। আত্মহত্যা করা আর তাঁহার হইল না!

শ্রীম ফিরিতেছেন আর ভাবিতেছেন। কী ভাবিতেছেন? তিনি নিজেই তাহা লিখিয়াছেন। "ফিরিবার সময় [তিনি] ভাবিতে লাগিলেনঃ এ সৌম্য কে?—যাঁহার কাছে [আবার] ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে।... কী আশ্চর্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে!..."

অতঃপর শ্রীম'র জীবনে কী ঘটিয়াছে সারা পৃথিবীর মানুষ এখন তাহা অবহিত। শ্রীম শুধু নিজেই নূতন করিয়া বাঁচিবার প্রেরণা লাভ করেন নাই, সমগ্র জগৎকেও তিনি তাহার অংশীদার করিয়া দিয়া গিয়াছেন শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র মাধ্যমে। প্রথম দর্শনের বহু বছর পর কার্তিক ১৩১৬ (অক্টোবর, ১৯০৯) সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এ শ্রীম তাঁহার পরম প্রাপ্তি প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেনঃ

"মিটিল প্রাণের তৃষা বহুদিন পরে--
জীবনের সমস্যা পুরিল এতদিনে--
গেল দূরে কী আশ্চর্য, মন-অন্ধকার
সার্থক হইল বুঝি মানবজীবন!"

কিভাবে তাঁহার "প্রাণের তৃষা" মিটিয়াছে, কিভাবে তাঁহার "জীবনের সমস্যা"র সমাধান হইয়াছে তাহার বাঙ্ময় ইতিবৃত্ত বিধৃত রহিয়াছে 'কথামৃতে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। শতাব্দীকালেরও বেশি ব্যবধানে আজ আমরা বুঝিতেছি যে, শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধানে শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত তৃষ্ণা ও সমস্যা লইয়া উপস্থিত হন নাই, তিনি বস্তুতপক্ষে জগতের প্রতিটি মানুষের প্রতিনিধি হইয়াই উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া জগতের প্রতিটি মানুষ পাইয়াছে তাহার তৃষ্ণা ও যন্ত্রণা উপশমের পথ ও পাথেয়ের সন্ধান।

শারীরিক আত্মহত্যার হঠকারী সংকল্প হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শ্রীম ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে মৃত্যুহীন জীবনে প্রবেশ করিতেছিলেন। মৃত্যু হইতে অমৃতের পথে সেই তীর্থযাত্রার কাহিনী আমরা পাইতেছি 'কথামৃতে'র প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। কিন্তু যাহারা শারীরিক আত্মহত্যা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ মানসিক ও আত্মিক আত্মহত্যা নিত্যদিন করিতেছে অথবা করিবার সংকল্প গ্রহণ করিতেছে তাঁহাদের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায় এবং কিভাবে? ইহার উত্তরে বলিব যে, তাহাদের জীবনেও শ্রীরামকৃষ্ণ পরম দিশারী এবং 'কথামৃতে'র মধ্যে সেই উত্তরণের কাহিনীও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা গিরিশচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছি। গিরিশচন্দ্রের মনে কখনও শারীরিক আত্মহত্যা করিবার সংকল্প উদিত হইয়াছিল কিনা আমাদের জানা নাই, তবে তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে প্রতিদিন মানসিক ও আত্মিক আত্মহত্যার পাপে ডুবিতেছিলেন তাহা গিরিশচন্দ্রের জীবনী-পাঠকগণ অল্পবিস্তর অবগত আছেন। অবশ্য গিরিশচন্দ্র নিজমুখে তাঁহার রামকৃষ্ণ-পূর্ব জীবনের পতন বা স্খলনকে যত বড় করিয়া বলিতেন তিনি ততখানি পতিত বা স্খলিত হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তবে যতটুকু জানা যায় তাহাতে ইহা অনায়াসেই বলা যায় যে, গিরিশচন্দ্রের জীবনের প্রাক্-রামকৃষ্ণ পর্ব এবং উত্তর-রামকৃষ্ণ পর্ব প্রায় দুটি বিপরীত মেরুই এবং গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী যে পরিবর্তন উহাকে ভিক্টর হুগোর ভাষায় বলা যায় --"Not a transformation, but a transfiguration"—নিছক রূপান্তর নহে, উহা মহিমার উত্তুঙ্গ উন্মোচিত রূপ। স্বজন বিয়োগের শোক, অন্যের ঈর্ষা ও বন্ধুদের বিশ্বাসহীনতায় মর্মদাহ, স্খলিত জীবনের আত্মগ্লানিতে বিধ্বস্ত দাম্ভিক গিরিশচন্দ্র যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়াছেন তখন কণ্ঠ হইতে না হইলেও হৃদয়ের গহন প্রদেশ আলোড়িত হইয়া উদ্গত হইয়াছিল তাঁহার সুতীব্র হাহাকার যাহাকে স্বরচিত নাটকে তিনিই একদা বাণীরূপ দিয়াছিলেনঃ

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই?

*

দারুণ এ-ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমো নাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে গিরিশচন্দ্র নিজেই এই গান গাহিয়া শুনাইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়াছেন ইহা গিরিশের নাটকের গান নহে, ইহা তাঁহার মর্মভেদী আত্মবিলাপ, ইহা তাঁহার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। যে পাপগ্রস্ত, যে দুঃখভারে মথিত তাহার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মমতা অধিক। অন্য কেহ পারুক আর না পারুক, গিরিশচন্দ্র পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন রোগপাণ্ডুর, দরিদ্র, নিরক্ষর ব্রাহ্মণের ললাটে উৎকীর্ণ বিধাতার ফলকঃ "I am come not to destroy, but to **fulfil**"—আমি ভাঙনের মুদ্গর লইয়া আসি নাই, আমি আনিয়াছি পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি।

একদিন গিরিশ আসিয়াছেন কাশীপুরে। "খ্রীস্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা" রামকৃষ্ণ পরার্থে রক্তবমন করিতে করিতে তখন শয্যাশায়ী। আত্মবলিদানের ক্ষণ ক্রমেই

আগাইয়া আসিতেছে। কথা বলিতে কষ্ট হয়, অথচ গিরিশ আসিবামাত্র ক্ষুধার্ত গিরিশের জন্য সেবক লাটুকে রামকৃষ্ণ বলিলেন জলখাবার আনিতে।

শ্রীম লিখিতেছেনঃ "গিরিশের জন্য জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তারপর নিজে হাতে করিয়া খাবার গিরিশের হাতে দিলেন।...

"গিরিশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরিশকে খাইবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কুঁজায় করিয়া জল আছে। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস।...

"ঠাকুর অতি অসুস্থ। দাঁড়াইবার শক্তি নাই।

"ভক্তেরা অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন—[ঠাকুর] শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাইতেছেন। [গিরিশকে] নিজে জল গড়াইয়া দিবেন। ভক্তদের নিঃশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস হইতে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন, ঠান্ডা কিনা!... [গিরিশকে] ওই জলই দিলেন।"

গিরিশের উদর পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার দরকার পিপাসার শীতল জল। শ্রীরামকৃষ্ণ উহা দিবার জন্য সেবককে কিন্তু আদেশ করিলেন না, অথচ বিছানা হইতে উঠিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। কিন্তু তৃষ্ণার্ত গিরিশকে জল যে তিনি স্বয়ং দিবেন। শরীরকে অগ্রাহ্য করিয়া অমানুষিক কষ্টে বিছানা হইতে মেঝেতে ঘসিয়া ঘসিয়া তিনি চলিলেন জলের কুঁজার কাছে। শয্যা হইতে কুঁজোর দূরত্ব কতই বা হইবে? দুই হাত কি তিন হাত। কিন্তু ঐ দূরত্ব তখন তাঁহার নিকট শত যোজন দূরত্ব অতিক্রম করার মতোই। উহাতেই তাঁহার দেহান্ত হইতে পারিত—এতই দুর্বল তিনি তখন। এ যেন ক্রুশকাষ্ঠ আপন স্কন্ধে বহন করিয়া বধ্যভূমির দিকে যাত্রা খ্রীস্টের!

"খ্রীস্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতার" হাত হইতে পিপাসার জল পাইলেন গিরিশ। প্রাণ ভরিয়া পান করিলেন তিনি। ইহার পরে আমরা দেখিব, ক্রমে শুধু দেহের পিপাসাই নহে, গিরিশের মনের, আত্মার—তাঁহার সকল পিপাসাই চিরতরে "জুড়াইয়া" যাইবে।

কারণ, যাহা তিনি পান করিয়াছেন তাহা রামকৃষ্ণ-গঙ্গার অমৃতবারি। গিরিশ গঙ্গায় স্নান করিতে চাহিতেন না, শ্রীরামকৃষ্ণ জোর করিয়া তাঁহাকে একদিন দশহরায় দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাস্নান করাইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে গিরিশ কখনও কখনও গঙ্গাস্নান করিতেন। গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইবার বাসনায় নহে—গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিবার পূর্বে তিনি বলিতেনঃ "মা গঙ্গা, ঠাকুরের কৃপায় তোমাকে পবিত্র করিবার জন্য তোমার জলে স্নান করিতেছি।"

একথা গিরিশের পক্ষেই বলা সম্ভব। কারণ, গিরিশ যে রামকৃষ্ণ-গঙ্গায় ডুব দিয়া রামকৃষ্ণ হইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীম গিয়াছিলেন ভাগীরথী-গঙ্গায় ডুব দিয়া আত্মহত্যা করিতে। ভাগীরথী-গঙ্গায় ডুবিয়া মানুষ মরে, কিন্তু রামকৃষ্ণ-গঙ্গায় ডুবিলে মৃত্যু নাই, সেখানে অবগাহন করিলে মর মানুষ অমর হয়।

শ্রীম-ও রামকৃষ্ণ-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া অমর হইয়াছেন—যে-অমরতার অপর নাম রামকৃষ্ণ।

হলিউডের অভিজাত পরিবারের বিদুষী সুন্দরী যুবতী কন্যা ন্যান্সিকে 'উদ্বোধন'-এর পাঠকগণের মনে থাকিবে। ['লস এঞ্জেলস টাইমস'-এ প্রথম পৃষ্ঠায় চিত্রসহ প্রকাশিত ন্যান্সির কাহিনী আমরা বলিয়াছি 'উদ্বোধন'-এর ফাল্গুন ১৩৯৫ সংখ্যার 'কথা-প্রসঙ্গে'।] নিজেই পেট্রোল ঢালিয়া প্রকাশ্য দিবালোকে ন্যান্সি তাহার শরীরে আগুন ধরাইয়া আত্মাহুতি দিয়াছিল। আগুন ন্যান্সির সর্বশরীর লেলিহান শিখায় গ্রাস করিতেছিল। ন্যান্সি কিন্তু নির্বিকার। সে শুধু নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল তাহার হাতে-ধরা একটি আলোকচিত্রের দিকে।

আলোকচিত্রটি ছিল রামকৃষ্ণের। স্বয়ং জ্বলিতে জ্বলিতে ন্যান্সি পৃথিবীর সকল জ্বলন্ত মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল পৃথিবীর পরিত্রাতার বিগ্রহকে—যাঁহার বিগলিত প্রেম ও করুণার জাহ্নবী-ধারা আজ ও আগামী দিনের জ্বরতপ্ত মানুষের ওষ্ঠাধর ও কণ্ঠকে শীতল ও সিক্ত করিবার জন্য নিরন্তর প্রবাহিত।

কিংবদন্তী বলে, জাহ্নবী গঙ্গা মানুষের ত্রিতাপ জ্বালা হরণ করে, আর গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে সেই গঙ্গাসাগর মৃতকে পুনর্জীবন দান করে। রামকৃষ্ণের মধ্যে যেন গঙ্গা এবং গঙ্গা-সাগরের, কিংবদন্তী এবং ইতিহাসের মহাসঙ্গম। পাশ্চাত্য মনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁহার স্বকর্ণে শুনিয়াছেন সেই মহামিলনের কলধ্বনি, শুনিয়াছেন রামকৃষ্ণের কণ্ঠে উপনিষদের ঋষির সেই অপূর্ব উদ্ঘোষণের মেঘমন্দ্র প্রতিধ্বনিঃ আমি অমরত্বের শোণিতবাহী দিব্য শিরা-উপশিরা। আমি জ্বর-বিকারগ্রস্ত বিনিদ্র ধরিত্রীর কর্ণে সেই ধমনীর শোণিতস্পন্দন ধ্বনিত করিয়া তুলিতে চাই। চাই পৃথিবীর শুষ্ক কণ্ঠ ও ওষ্ঠাধরকে অনন্ত জীবনের শোণিতধারায় সজল-সিক্ত করিয়া তুলিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বস্তুতই একই সঙ্গে গঙ্গা এবং গঙ্গা-সাগর। 'পুনর্জীবিত' শ্রীম এবং গিরিশচন্দ্রের জীবনে বিধৃত হইয়া আছে রামকৃষ্ণ-গঙ্গা এবং রামকৃষ্ণ-গঙ্গাসাগরের যে বার্তাবিনিময় তাহারই কিয়দংশ। □

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

॥ ১ ॥

হৃষীকেশ
১৩।৩।(১৯)০৬

প্রিয় রামচন্দ্র,*

তোমার ৮ই মার্চের পোস্টকার্ড পাইয়াছি। কনখলে থাকাকালীন গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রও পাইয়াছিলাম। পূর্বে প্রাপ্তিস্বীকার করিতে না পারায় দুঃখিত। এখানে আসিবার সময়ে চিঠিটি ফেলিয়া আসি। আশ্রমের সকলেই প্রয়াগে মাঘমেলায় গিয়াছিল বলিয়া আমাকে উহা পাঠাইবার কেহ ছিল না। তোমার ঠিকানাও আমার মনে ছিল না। ফলে লিখিবার ইচ্ছা থাকিলেও তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। আমি প্রয়াগে যাই নাই। মায়াবতী হইতে নির্ভয়ানন্দ সেখানে গিয়াছিলেন। অবশেষে কিছুদিন পূর্বে স্বামী স্বরূপানন্দের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। নবাগতগণ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি খবর পাইয়াছিলাম। তাহার পর মায়াবতী হইতে আর কোন সংবাদ পাই নাই। তুমি [শরীরের ?] বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারিতেছ না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আশাকরি তুমি তোমার সম্পাদকীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে করিয়া যাইতেছ। মিঃ তিলকের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা কর কি ? আমি একপ্রকার আছি। আমি এখানে আসিবার পর কিছুদিন পর্যন্ত ভালবোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। যেহেতু এখানে শীঘ্রই গরম পড়িবে তাই এই স্থান ত্যাগ করিব ভাবিতেছি। জানি না, কোথায় যাইব। তবে তুমি যদি আমার কনখলের ঠিকানায় পত্র দাও তবে যেখানেই থাকি না কেন চিঠি পাইব। মাঝে মাঝে তোমার সংবাদ পাইলে খুবই আনন্দিত হইব। তুমি হৃষীকেশের কোন সংবাদ পাইয়াছ কি ? আমি তাহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে।

ইতি
তোমার শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

॥ ২ ॥

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
কনখল
জেলা—সাহারানপুর, ইউ. পি.
১৬ নভেম্বর, (১৯)০৫

প্রিয় রামচন্দ্র*

তোমার ১৮ই অক্টোবর তারিখের প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া সবিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই চিঠি মায়াবতী হইতে আলমোড়ায় আমার নিকট পুনঃ প্রেরিত (re-directed) হইয়াছিল—আমি তখন সেখানে ছিলাম। ইহার পর নৈনিতাল গিয়াছিলাম ; এখানে সপ্তাহখানেক হইল আসিয়াছি। মায়াবতীতে ক্রমশঃ শীত পড়িতে আরম্ভ হওয়ায়—যদি সম্ভব হয়, ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া শীতকালটা হৃষীকেশে কাটাইতে

* **চিঠি দুটি ইংরেজীতে লেখা।—যুগ্ম সম্পাদক**

কনখলে আসিয়াছি। আমার শীঘ্রই হৃষীকেশ যাওয়ার বাসনা—কিন্তু কল্যাণানন্দ এবং অন্যান্যরা আমাকে তথায় যাইতে দিতে ইচ্ছুক নহে। তাহাদের রাজি করানো বেশ কঠিন ব্যাপার। দেখা যাউক, আমি কতদূরে কৃতকার্য হই। আমি এখন বেশ সুস্থবোধ করিতেছি। তবে আমার মনে হয় এই স্থান হইতে পাহাড়ই আমার পক্ষে অনেক স্বাস্থ্যকর ছিল। সঙ্গের চিঠিটি স্বামী সদানন্দকে দিয়াছি—তিনি মায়াবতী হইতে আলমোড়ায় আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদ যাইবার পথে এখানে আসিয়াছেন। এলাহাবাদে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সহিত বাস করিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে এবং যত্নে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার বাসনা। স্বামী স্বরূপানন্দ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নিকট স্বামী সদানন্দের একটি পরিচয় এবং অনুরোধ পত্র লিখিয়াছেন। অবশ্য স্বামী সদানন্দ স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে জানিতেন। আমি সম্প্রতি মিসেস সেভিয়ার এবং কানাইয়ের[১] নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি। তাঁহারা সকলে মায়াবতীতে ভালই আছেন। অমৃতানন্দ[২] কিছুকাল পূর্বে ইংল্যান্ড হইয়া আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে। মনে হয় এর মধ্যে এইসকল সংবাদ স্বরূপানন্দের নিকট হইতে পাইয়াছ। তুমি বোম্বাই পৌঁছিবার পর স্বরূপানন্দকে যে চিঠি দিয়াছ তাহা আমি দেখিয়াছি। হৃষীকেশ যখন কনখলে ছিল তখন তাহার চিঠিও আমি পাইয়াছিলাম। তখন আমি মায়াবতীতে ছিলাম। আমি দুঃখিত, আজ পর্যন্ত তাহার চিঠির উত্তর দিতে পারি নাই। আমার অনুমান সে এখন বারাণসীতে তাহার ভাইয়ের সহিত আছে। মায়াবতীতে যেভাবে জীবনযাপন করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল, বোধহয় সেই আগ্রহ এখন আর নাই। সম্ভবতঃ সে এখন তাহার মত পরিবর্তন করিয়াছে। এই বিষয়ে তুমি বোধকরি আমার চাইতে ভাল জান। আমরা আমাদের লক্ষ্য সত্যের দিকে যেন ঠিকভাবে চলিতে পারি—কুতর্ক এবং আত্মপ্রবঞ্চনাকে আশ্রয় করিয়া যেন আমরা বিপথে চালিত না হই।

বোম্বাই-এ মিঃ তিলকের সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিয়াছ এবং তোমার সহিত আমাদের মিশন ও তাহার কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং তোমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছ শুনিয়া আমার খুবই আনন্দ হইয়াছে। মিঃ তিলক সম্বন্ধে আমার কত উচ্চ ধারণা এবং তাঁহার প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা আমি পোষণ করি তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। আমি স্বামীজীর নিকট তাঁহার চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা শুনিয়াছি। তিনি তোমাকে এতটা পছন্দ করিয়াছেন এবং তুমিও তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্বকে প্রশংসা করিতে পারিয়াছ জানিয়া আমি খুশি হইলাম। আমি আশা করিতেছি তুমি ইতোমধ্যে সেখানে মোটামুটি একটি স্থান করিয়া লইয়াছ। তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমার তথাকার বন্ধুগণ তোমাকে এতখানি সাহায্য করিতেছেন জানিয়া তাঁহাদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তোমাকে আরও কিছুকাল অবিবাহিত থাকিবার জন্য এবং বি. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে সচেষ্ট হইবার জন্য মিঃ তিলক যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা খুবই উত্তম। আমি মনে করি সেইভাবে চলিলে তুমি যথেষ্ট উপকৃত হইবে। তোমার যখন আবার আমাকে পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইবে তখন লিখিবে। তোমার পত্র পাইলে আমি গভীর তৃপ্তি পাইব। মা তোমাকে সর্বদা আশীর্বাদ করুন এবং তোমাকে তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় দান করুন। তুমি খুবই বিবেকবান এবং সৎ। তুমি চলিয়া যাইবার পর অদ্বৈত আশ্রমের প্রত্যেকে তোমার অনুপস্থিতি তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে। আমার নিজের কথা বলিতে পারি যে, আমি বিশ্বাস করি এবং সত্য সত্যই আশা করি—আমরা পুনরায় কিছুকাল বাদে পুনর্মিলিত হইব এবং মায়ের ইচ্ছা হইলে জগতের সেবায় কিছু অর্থপূর্ণ কর্ম করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব। আশা করি তুমি সুস্থ এবং কুশলে আছ। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে।

ইতি
মাতৃপদাশ্রিত
শ্রীতুরীয়ানন্দ

১ স্বামী নির্ভয়ানন্দের ২ মিঃ জনসন

বিশেষ রচনা

প্রার্থনা

(শ্রীরামকৃষ্ণলীলাচিন্তন-সহ)

স্বামী প্রেমেশানন্দ

গত ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে লোকান্তরিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহুমানিত সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য সন্তান স্বামী প্রেমেশানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে সর্বতোভাবে নিষ্ণাত। তাঁর অপূর্ব ত্যাগ-বৈরাগ্যময় সমুন্নত সাধনজীবন, তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞা, তাঁর প্রখর বাস্তববাদিতা এবং তাঁর স্নেহময় ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে বহু মানুষ তাঁর কাছে আসতেন। বিশেষ করে অধ্যাত্মজীবনের প্রতি আন্তরিক আগ্রহশীল তরুণ ও যুবকদের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ স্নেহদৃষ্টি। তাঁর প্রেরণায় অনেক তরুণ ও যুবক ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করেছেন, অনেকে গৃহস্থাশ্রমে থেকেও নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যাত্মজীবন যাপন করেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানকারীর সংখ্যা যেমন অনেক, তেমনি গৃহস্থাশ্রমে থেকেও উন্নত জীবনযাপনকারীর সংখ্যাও যথেষ্ট। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়, চিঠিপত্র লিখে, উপদেশ-পরামর্শের মাধ্যমে তিনি অনেককে অধ্যাত্মপথের সন্ধান দিতেন। সম্প্রতি ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরের সম্পাদনায় তাঁর একটি পত্র-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন সেটি কত প্রেরণাপ্রদ। বর্তমান রচনাটি অধ্যাত্মজীবন যাপনে আগ্রহী জনৈক যুবকের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন। সেই যুবকের কাছ থেকে অনেকেই সেটি তখন বা পরবর্তী সময়ে নিজেদের সাধনপথের নির্দেশিকা হিসাবে লিখে নিয়েছিলেন। অদ্বৈত আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দ তাঁদের অন্যতম। অনুরূপ মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের এবং সাধারণভাবে সকল ভক্তকে অধ্যাত্মজীবনে আলোকদান করবে এই আশায় তিনি এযাবৎ অপ্রকাশিত রচনাটি উদ্বোধন-এ প্রকাশের জন্য আমাদের দিয়েছেন।—যুগ্ম সম্পাদক

ঠাকুর, আমি জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন। তবু আমার ইচ্ছা হয়, তোমার পথে চলি। আমার জ্ঞান নাই। তাই চলতে চলতে তোমার পথ ছেড়ে সংসারের পথ ধরি। আমার ভক্তি নাই; তাই তোমার পথে চলতে চলতে থমকে দাঁড়াই, বসে পড়ি, আলস্যে সময় কাটাই। যদি জ্ঞান থাকত তবে পথ ভুল হতো না,—এদিক ওদিক সরলেই নিজে বুঝতে পারতাম কি ভুল হয়েছে।

যদি তোমার ওপর টান থাকত, যদি ভক্তি থাকত, তবে সেই প্রাণের টানে ছুটে চলতাম তোমার পথে। তোমার ওপর মনের টান হলে মনই বলে দিত কিসে মন তোমার দিকে চলে, কিসে সরে পড়ে।

মন 'সংসার' চায় না, আবার তোমাকেও যেন চায় না। "ঠাকুরের কাজ" মনে করে কাজ আরম্ভ করি, কিন্তু তোমায় ভুলে গিয়ে কাজ নিয়ে মেতে উঠি—কাজ যে তোমারই পূজা তা মনে রাখতে পারি না। তাই প্রভু, আমি প্রার্থনা করি, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও। ঠাকুর আমি জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন। তুমি অহেতুক করুণাসিন্ধু। আমায় অক্ষম জেনে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।

আমি যখন তোমায় ভাবি, তখন ঠিক বুঝি 'আমি তোমার দাস'; কিন্তু পরক্ষণেই আমি সাধারণ মানুষের মতো হয়ে যাই—ভুলে যাই তোমার সাথে আমার কি সম্বন্ধ। যদি তুমি জ্ঞান দাও, তবে তো আমি দিবানিশি অনুভব করব যে, আমি তোমার অংশ, আমি তোমার দাস, আমি তোমারই সন্তান, আমি আর কারো কিছু নই। প্রভু, আমাকে জ্ঞান দাও, বুঝিয়ে দাও যে, আমি দেহ নই, মন নই। আমি যে তোমারই অংশ তা না বুঝলে তোমার ওপর ভক্তিও হবে না। আমি বোধ করি আমি দেহ, আমি মন। তাই তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ যে আছে তা বুঝতে পারি না। তুমি যদি জানিয়ে দাও যে, আমি তোমারই অংশ তবে তোমাকে আপন জেনে তোমাকে ভালবাসব। অতএব ঠাকুর, কৃপা করে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও—আমি জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করে কৃতার্থ হই।

॥ ২ ॥

ঠাকুর, আমি তোমার তত্ত্ব জানি না। কিন্তু আমি তোমার রামকৃষ্ণরূপকে জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু

বক্ষে ধরে নিয়েছি। আমার এমন ক্ষমতা নেই যে, মনটি ধ্যানে রামকৃষ্ণময় করি। তাই প্রভু তোমার লীলাস্মরণই আমার পক্ষে সাধনার সর্বোত্তম উপায় মনে করি।

তুমি ক্ষুদিরামের গৃহে যে চন্দ্রমণির কোলে দ্বিতীয়ার চাঁদরূপে শিশু সেজেছিলে আমি তা স্মরণ করে ধন্য হই। তুমি জগতের মালিক হয়েও ক্ষুদ্র শিশু সেজেছিলে, তা অত্যন্তই আশ্চর্য ব্যাপার। চন্দ্রমণির স্তন্যপান করে তুমি জীবনধারণ করেছিলে, প্রভু! তারপর মানবশিশুর ন্যায় হাঁটতে শিখলে, শিশুদের ন্যায় খেলা করলে। কেউ বুঝতেই পারল না যে, তুমি অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, তুমি ঈশ্বর। কী আশ্চর্য তোমার এই অবতারলীলা! হায়! আমি যদি ঐ সময় কামারপুকুরে জন্মাতাম, তবে তোমার সঙ্গে খেলা করে, তোমাকে ভালবেসে ধন্য হতাম।

তুমি ছাত্র সেজে পাঠশালে গিয়েছিলে। যাঁরা গুরুমশায় ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই শত জন্ম কঠোর তপস্যা করে তোমাকে ছাত্ররূপে লাভ করেছিলেন। শত জন্ম সাধনা করে যাঁর দেখা পাওয়া যায় না, সেই শ্রীহরি পরম স্নেহের ছাত্র গদাই সেজে গুরুমশায়দের মুক্তি দিল। আর যেসব বালক-সহপাঠী সহপাঠীজ্ঞানে তোমার সঙ্গে বিদ্যালয়ে যেত, পাশে বসত, তোমাকে স্পর্শ করত, তাদের ভাগ্যের কথা স্মরণ করলে মনটা দুঃখে পূর্ণ হয়; কারণ তুমি মানুষ হয়ে এলে অথচ আমরা মানুষ হয়েও একটিবার তোমায় দেখতে পারলাম না। আমাদের ঈর্ষা হয়—কামারপুকুরের লোকগুলি অনায়াসে শুধু কামারপুকুরে জন্মেছিল বলে, পরমপুরুষ তোমাকে, বিনা সাধনায় আপনার করে নিল। হায়, আজ আমরা কত চেষ্টা করেও তোমাকে আপন বলে মনে করতে পারছি না!

তুমি মানিক রাজার আমবাগানে গ্রামের ছেলেদের নিয়ে খেলা করলে। তোমার সঙ্গে থাকবার জন্য, বৈকুণ্ঠে যাবার জন্য লোকে কত সাধনা করে। আর 'বৈকুণ্ঠপতি' তুমি এলে কামারপুকুরে রাখালদের সঙ্গে খেলা করতে! হায়, আমি কেন রাখাল হয়ে জন্মে, হে জগন্নাথ, তোমার সঙ্গ খেলা করবার সুযোগ পেলাম না!

কৃপাময়, আমার সুবুদ্ধি দাও, আমি যেন বিষয়-চিন্তা ছেড়ে শুধু তোমার চিন্তা করতে পারি। তাহলে তুমি যখন আবার আসবে তখন মানুষ হয়ে তোমার নরলীলায় যোগদান করতে পারব, অথবা তোমার চিন্তা করতে করতে রামকৃষ্ণলোকে গিয়ে তোমার লীলায় যোগদান করে ধন্য হব।

কামারপুকুরের কুকুর-বিড়ালেও তোমাকে দেখতে পেল, কিন্তু আমরা মানুষ হয়েও তোমাকে দেখতে পেলাম না! যে-পশু তোমাকে দর্শন করেছে সে কি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়?

কামারপুকুরের মাটিতে সর্বত্র তুমি হেঁটে বেড়িয়েছ। তাই সেখানকার মাটি চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে। আমি যদি ঠাকুর, মাটি হতাম, তবে আমার বুকে তুমি গদাই রূপে চরণ দিতে। যে-মাটি তোমার চরণ স্পর্শ করেছে সে-মাটি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ।

তুমি যখন কলকাতায় দাদার জন্য রান্না করতে তখন যদি আমি চাকর হয়ে তোমার সাহায্য করতাম, তবে আমি ঋষিমুনির সাধনার ধন তোমার দর্শন পেতাম। তুমি যাঁদের বাড়িতে ঠাকুরপুজো করতে যেতে তাঁরা ধন্য, সেসব বাড়ি তোমার পদস্পর্শে তীর্থ হয়ে রয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা কত কঠোর সাধনা করেন জ্ঞান-ভক্তি লাভের জন্য। যারা তোমার মনোমোহন মানুষমূর্তি দেখে, তোমার গান শুনে তোমাকে মানুষ ভেবে ভালবেসেছে—তারা কোন্ পুণ্যে কাঁচ কুড়োতে গিয়ে কাঞ্চন লাভ করল, ঠাকুর? তা তো তোমার অহেতুক প্রেমেই। তুমি ইচ্ছা করলে যখন-তখন যাকে-তাকে জ্ঞানী করে তুলতে পার, ভক্তির ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিতে পার। তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছামাত্র অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায়। তাই শক্তি, সামর্থ্য বা যোগ্যতা না থাকলেও আমি তোমার চরণে নিত্য প্রার্থনা জানাই—তুমি আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।

॥ ৩ ॥

ঠাকুর, তুমি স্বয়ং পরব্রহ্ম, ভগবান হয়ে কালীর পুজারী সাজলে! সেই দৃশ্য কি চমৎকার! তুমি মায়ের সম্মুখে বসে পুজা করছ (ভগবান নিজে পুজক, ভগবানই পুজ্য!)। তখন যারা তোমাকে দেখেছে তারা ধন্য। সেই দৃশ্য কল্পনা করে আমরাও

ধন্য। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে তুমি কত সাধন করেছ। পূর্ব পূর্ব অবতারে এমন সাধনের কথা শোনা যায় না। এবার কি আমাদের সাধনে অক্ষম জেনে আমাদের জন্যই তুমি এত সাধন করলে? তবে প্রভু, আমরা কেবল তোমার চরিত্র চিন্তাই করব, আর কোন সাধনা আমাদের অনাবশ্যক। যাঁরা তোমার গুরু সেজেছিলেন তাঁদের কথা ভেবে আমরা আনন্দিত হই। কেনারাম ভট্টাচার্য, ভৈরবী যোগেশ্বরী, জটাধারী, তোতাপুরী, গোবিন্দ রায় প্রভৃতি ব্যক্তি মানুষ হয়েও মানুষের অসাধ্য কর্ম করেছেন। তাঁরা পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের শিক্ষা-দাতা হয়েছেন। আমরা তাঁদের চরিত্র চিন্তা করে ধন্য হলাম।

তোমার দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী সাধনার যে অতি সামান্য বিবরণ জানতে পেরেছি, তা জগতের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা। মানবদেহ এত তপস্যা যে সহ্য করতে পারে—তা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তোমার সাধনের কথা জেনে আমরা সাধনে উৎসাহ পাই না। সেই সাধনা আমাদের একান্ত অসাধ্য জেনে হতাশ হয়ে পড়ি। তবে মানবজাতির জন্য তুমি সাধন করে সাধনফল আমাদের দিয়ে গিয়েছ। আমরা তোমার সাধক চরিত্রের অনুধ্যান করেই শান্তি লাভ করব।—একথা যদি তুমি নিজে না বলতে তবে, ঠাকুর, আমরা এই পথে চলতেই সাহসী হতাম না।

তোমার এই অপূর্ব তপস্যা আমাদেরই জন্য, এই বিপুল উদ্যম আমাদের জন্য। একথা জেনে আমরা এইমাত্র বুঝেছি যে, তুমি আমাদের কত ভালবাস। আর কোন মানুষ তো দূরের কথা—পিতা-মাতা, আত্মীয়-বান্ধব, পরোপকারকারী মহা-পুরুষগণ তো দূরের কথা—ঋষিমুনিগণও আমাদের এত ভালবাসতে পারেন না। আমাদের মতো বিষয়াসক্তগণের মন আকর্ষণ করার জন্য তুমি এত সাধন করলে॥

আমরা বুঝেছি তুমিই আমাদের সবচেয়ে আপনজন। ঠাকুর, তোমার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করলাম। তুমি আমার সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি গ্রহণ করে কৃতার্থ কর।

॥ ৪ ॥

ঠাকুর, তুমি তীব্র তপঃক্লেশ সহ্য করে যে অতুল সম্পদ লাভ করেছিলে তা বিকিরণ করার জন্য, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে, ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসু মুমুক্ষুদের আহ্বান করেছিলে। যেসব পরম সৌভাগ্যবান তখন জন্মেছিলেন, তাঁরা তোমার কৃপা লুটে নিয়েছিলেন। হে কল্পতরু, আমরা দুর্ভাগ্যবশে তখন উপস্থিত ছিলাম না বলেই কি তুমি আমাদের বঞ্চিত করবে? তোমার তো সম্পদের অভাব নেই। আমার মতো নগণ্য ভিখারীকে এক কণিকা প্রেমভক্তি দেবার ইচ্ছা কি তোমার নেই? কোটি কোটি বার জন্ম-মৃত্যুর পর আমি যে বড় কাতর, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার মতো ক্ষুদ্রজীবের এক কণিকা মাত্র ভক্তিতেই জীবন ধন্য হবে—তাও কি তুমি দিতে পারবে না?

কত পতিত কাঙাল, কত পাপী, বারবনিতা তোমার চরণস্পর্শে মুক্তি পেল। তুমি যাকে-তাকে স্পর্শ করে কৃপাদৃষ্টি দান করে, উপদেশ দিয়ে এবং অন্য কতভাবে ভক্তি দিলে; তুমি রসিক মেথরের চিত্ত আকর্ষণ করলে। তোমার এই প্রেমবিতরণ-লীলা স্মরণ করে আমরা আজ 'হায় হায়' করছি—আমরা সেই শুভ সময়ে উপস্থিত থাকতে না পেরে তোমার অহেতুক কৃপালাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

কিন্তু ঠাকুর, তুমি তো সনাতন পুরুষ। তোমার ভাণ্ডারে জ্ঞানভক্তির কি অভাব যে, আমাদের তুমি বঞ্চিত করে রেখেছ। তুমি কত লোকের পাপ নিজের দেহে টেনে নিয়ে নিজে দারুণ রোগ-যাতনা সহ্য করলে। কঠোর তপস্যায় দেহক্ষয় করেও তোমার তৃপ্তি হলো না—দারুণ রোগ-যন্ত্রণায় দেহনাশ করে দিয়ে গেলে। প্রভু, আমরা কি তোমার পর, যে আমাদের এক কণিকা জ্ঞানভক্তি দিতে তুমি বিরত? যাঁরা তখন জন্মেছিল তাঁরাই কি শুধু তোমার আপনজন?

আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও, প্রভু, আমি তোমার নিত্যলীলা দর্শন করে কৃতার্থ হব। তুমি মানুষের জন্য এতই ব্যাকুল, মানুষকে এত ভালবাস জেনে আমি অতি দুর্বল হয়েও তোমার নিকট জ্ঞানভক্তি প্রার্থনা করতে সাহসী হয়েছি। শুনেছি, অধিকারী বিচার না করেই তুমি প্রেমভক্তি দিয়ে থাক। তাই

তোমার চরণে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও। তোমাকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করে তোমার সেবায় জীবন নিযুক্ত করে ধন্য হই।

॥ ৫ ॥

ঠাকুর, তুমি সর্বজ্ঞ। জগতে যেখানে যাকিছু আছে সবই তুমি জান, যেখানে যখন যাকিছু ঘটে সবই তুমি জান। আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু, প্রতি স্নায়ু-নাড়ী, প্রতি মাংসপেশী, এমনকি প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস তুমি দেখছ। আমার মনের ভাল-মন্দ সকল চিন্তাই তুমি দেখছ। এক কথায়, আমি চিরকাল তোমার চোখের সামনেই রয়েছি। কিন্তু আমি অজ্ঞান। আমি তোমাকে দেখি না। তাই তোমার এত সম্মুখে থেকেও মনে হয় যেন তুমি আমায় দেখছ না। আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও, আমি যেন সকল কাজে, সকল চিন্তায় তোমাকে অনুভব করি। আমি যদি বুঝতে পারি তোমার সম্মুখে রয়েছি, তাহলে আমার সকল কাজই যে পরম সাধনা হয়ে ওঠে।

এই জগৎ নাকি তোমার দেহ, তুমি নাকি সর্বময়। তাহলে আমার মধ্যে, আমার দেহে মনে তো তুমিই রয়েছ। কাঠের চেয়ারে যেমন সর্বত্রই কাঠ থাকে, লোহার অস্ত্রে যেমন কেবলই লোহা, মাটির পুতুলে যেমন কেবলই মাটি, তেমনি আমার 'আমি'তে কেবলই তো তুমি। শুধু আমাতে কেন—আমি যা কিছু দেখি, শুনি, ছুঁই, খাই—সবই তো তুমি। জগতে যত জীব কীট-পতঙ্গ—সকলই তো তুমি। যার সঙ্গে যত ব্যবহার করি তাতো তোমারই লীলা, ঠাকুর। তুমি লীলার ছলে জগৎ হয়েছ, জীব হয়েছ। আমি যদি একথাই কেবল স্মরণ রাখতে পারি তাহলে আমার কাজ তোমার কাজ, সকল কাজ তোমারই সেবা হয়ে যাবে।

আমি তো দিবানিশি খেটে মরি, ভেবে ভেবে ক্লান্ত হই। কেন খাটি, কেন ভাবি, বুঝতে পারি না। আর চারিধারে দেখি সকল মানুষ, সকল জীব, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত কি কাজে যেন ব্যস্ত, কি চিন্তায় যেন আকুল। এসকলই তোমার লীলা। তুমি অনন্ত প্রাণী হয়ে অনন্ত প্রকারে লীলা করছ।

আমি ভাবি, 'আমার কি গতি হবে?' কিন্তু সকল গতি তো তোমার পানেই চলেছে। আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার ভাল, আমার মন্দ—সবই প্রভু তোমার, শুধুই তোমার। আমি তোমার চৈতন্যসমুদ্রে, তোমার আনন্দরসেই ভাসি, ডুবি। কিন্তু আমি জ্ঞানহীন বলে মনে করি আমি তোমার বাইরে আছি—তোমার কাছ থেকে দূরে আছি। আর নানা ভয়ে ভীত হয়ে, নানা দুঃখে দুঃখী হয়ে বৃথাই নিজেকে পীড়িত করি।

ঠাকুর, আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও। আমি জগতের সর্বত্র আমার নিজের অন্তরে, বাইরে যেন শুধু তোমাকেই দেখি। তুমি তো আমার আরাধ্য—অন্তর্যামী। আমি সকল কাজে, সকল ভাবে কেবল তোমাকেই দেখব। আমার কোন অভাব, কোন বেদনা, কোন ভয় থাকবে না।

॥ ৬ ॥

ঠাকুর, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।

ঠাকুর, যেসব উপায় অবলম্বন করলে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, সেসব উপায় অবলম্বন করবার শক্তি আমার নেই। শাস্ত্র পাঠ করে জ্ঞানবিচার করবার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আমার নেই। শাস্ত্রপাঠ করবার মতো বিদ্যাও আমার নেই। সুতরাং ঐ উপায়ে জ্ঞানলাভ আমার পক্ষে অসম্ভব।

যোগাভ্যাস করতে গেলে মনের যে অসাধারণ সামর্থ্যের প্রয়োজন, তা আমার নেই। যে প্রবল শক্তির দ্বারা মনকে গুটিয়ে এক কেন্দ্রে স্থির করা যোগের প্রধান সাধন, সে-শক্তি আমার নেই। কাজেই এই পথও আমার অগম্য।

যে-শুদ্ধ মন আপনা-আপনি তোমাতে আকৃষ্ট হয় আমার সে-মন কোথায়? আমার মন তোমার চিন্তা অপেক্ষা তোমার ঘটিবাটি ঘর-দরজার চিন্তা করতে ভালবাসে। তোমার প্রতি ভক্তি কি এই মন দিয়ে সম্ভব?

আমি পারি শুধু দেহ-মন খাটিয়ে তোমার ঘর-সংসার চালাতে। আমার এই কর্মসকল যদি তুমি গ্রহণ কর তবে এই পূজা আমি নিঃসংকোচে করতে পারি।

তুমি নিজে গীতায় (৯।২৭) বলেছ ঃ

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥"

তা যেন আমি করতে পারি।

তুমি গীতায় (৯।২৮) বলেছ ঃ

"শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥"

তোমাকে সকল কর্মের ফল দিতে পারলে ধীরে ধীরে সকল কর্মের ফল খসে পড়বে, আর আমি 'প্রকৃত সন্ন্যাসী' হয়ে মুক্তিলাভ করব।

আমার মতো কর্মাসক্ত লোকের পক্ষে এমন আশার বাণী আর নেই। তোমার এই পরম আশ্বাসই আমার যাত্রাপথের প্রধান সম্বল হোক, প্রভু!

আমি কাজ ছাড়া আর কি করতে পারি? আমি যাকিছু করব তা তোমার জন্যই করব। আমি যাকিছু খাব, প্রভু, তোমার জন্যই খাব। তোমারই এই দেহ, তা তোমার কাজের জন্যই নির্মাণ করেছ। এই দেহ রক্ষার জন্যই তো খাওয়া। আর তুমিই তো ক্ষুধারূপে সর্বভূতে রয়েছ। আমরা যাকিছু খাই তা তো জঠরানলরূপে 'রামকৃষ্ণাগ্নি'তে আহুতি দেওয়া। নিজে যা খাই, অন্যকে যা খাওয়াই—সবই তো তোমারই পূজা। আমার তো অন্য পূজার প্রয়োজন নেই। ফুল-তুলসী, ধূপ-চন্দন তোমার মূর্তির সম্মুখে দিয়ে যে-পূজা তাতে কল্পনার প্রয়োজন। কিন্তু এই পূজা তো সাক্ষাতেই পূজা। এই পূজা যেন আমি করতে পারি, প্রভু।

আর যদি আমি তোমার হোম করি, যদি আগুনে ঘৃত-বিল্বপত্র দিয়ে তোমার পূজা করি, যদি পুষ্প-চন্দনাদি তোমার মূর্তি বা পটে তোমার প্রীতির জন্য প্রদান করি—আমি তোমাকে খুশি করা ছাড়া অন্য মতলব যেন মনে না রাখি। আমি যাকিছু করব, প্রভু, সকল কাজের ফল তুমি ভোগ কর। আমি যেন কোন কাজেরই প্রতিদান না চাই।

ঠাকুর, যখনই কোন কিছু কাকেও দেব, তা যেন তোমার প্রীতির জন্যই দিই। তুমিই তো সর্বজীব সেজেছ। যাকিছু দান করি—তোমাকেই তো তা দিই। তুমি ছাড়া জগতে আর কে আছে? দান করে কী প্রতিদান চাইব? তুমি ছাড়া চাইবার বস্তু এজগতে কী আছে, ঠাকুর? তাই যা দেব, বিনিময়ে কিছু চাইব না।

আমার আর কি তপস্যার প্রয়োজন ঠাকুর? আমি যেন তোমার কাজে শরীর-মন ক্ষয় করি। আমার বলতে আমার যাকিছু মনে হবে, আমি নিঃশেষে তা তোমায় যেন দিতে পারি। যদি কোন বস্তুতে 'আমার' বুদ্ধি হয়, আমি বুক চিরে তা তোমার চরণে যেন অর্পণ করি। যখন আমার বলতে আর কিছু থাকবে না, তখন আমার এই 'আমি'টাকে 'শ্রীরামকৃষ্ণাগ্নি'তে আমি পূর্ণাহুতি দেব।

দয়াময়, তুমি আমার সহায় হও। আমি মূঢ়তাবশে যদি দিতে সঙ্কুচিত হই, তুমি কেড়ে নাও। যদি আমার বলে কোন কিছুতে লোভ করি, কঠিন আঘাতে আমার মোহবন্ধন ছিন্ন কর, প্রভু! আমার মোহনিদ্রা দূর করবার জন্য যত কঠোর দণ্ডের প্রয়োজন সবই আমি তোমার নিকট চেয়ে নিলাম। আমার শত অপমান হবে ফুলের মালা, যদি ঠাকুর, তোমায় আমি পাই। আমার সকল বেদনা হবে পরম সম্পদ, যদি তোমায় আমি না ভুলি।

তুমি সকল রূপের খনি। আমি অন্য রূপে দেখব না। তুমি রসের সাগর। আমি তুচ্ছ রসে মজব না। তোমার প্রকাশ সকল পুণ্যগন্ধে। তোমার স্পর্শ আমার অন্তরের অন্তস্তলে চিরস্থায়ী। আমি আর কোন স্পর্শ চাই না। তোমার অনাহত ধ্বনি আমি বুকের ভিতর শুনব—বাইরের সঙ্গীতে আমার প্রয়োজন নেই, প্রভু!!

॥ ওঁ ॥ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥ ওঁ ॥ □

কবিতা

শ্রীরামকৃষ্ণ

সৈয়দ আনিসুল আলম

নও বাংলার শুধু, গৌরব ভারতের ;
সকল মানুষজাতির, সভ্যজগতের ।
শেখালে চরম সত্য সহজ কথায়—
অন্তরের সংকীর্ণতা আনে অন্তরায় ।
পতিতে উঠালে তুমি, কাছে নিলে টানি
চন্দ্রমার মতো জ্বলে তব শুভবাণী ।
ধর্মের আসল কথা একই দেখি মনে,
মানবহৃদয় প্রেমে বাঁধে জনগণে ।
শান্তি সুখ পুণ্য মেলে জীবের সেবায়,
প্রেমের অমোঘ বাণী অপ্রেম নেভায় ।
মহীয়ান করে শুধু ত্যাগের জীবন,
মানবের সাথে করি মানবমিলন ।
বেঁধেছ আলোর গেহ এদেশের মাঝে,
রূপায়ণ হতে দেখি ধর্ম-কথা কাজে ।

করুণা নয়নে চাহ

তরুণ মুখোপাধ্যায়

হে রামকৃষ্ণ পরমহংস,
সাধককুল-অবতংস,
করহ সকল কলুষ ধ্বংস
আঁধার নিবারি এস গো ।
আজিকে ধরণী হিংসামত্ত,
মিথ্যা-দানবে নাশে গো সত্য ;
জাগাও হৃদয়ে সততা, সত্ত্ব,—
জুড়াও যত দাহ গো ।
মতের, পথের যতেক দ্বন্দ্ব
ছিঁড়েছে জীবনবীণার ছন্দ—
হে মহাসাধক ঘুচাও ধন্দ,
মৈত্রী-সাম গাহ গো ।
নিখিল আর্তমানব পানে
করুণা-নেত্রে চাহ গো ॥

তোমার পায়ের নূপুর হয়ে

রুমা ভট্টাচার্য

ঠাকুর, তুমি আরেকটি বার
বাউল বেশে এলে
তোমার পায়ের নূপুর হয়ে
বাজব পলে পলে ।
আলখাল্লার কোণা যদি
মাটিতে লুটায়
পথের ধুলার রেণু হয়ে
চুমিব তার গায় ।
তৃণের মতো লগ্ন হয়ে রব চরণতলে
তোমার পায়ের নূপুর হয়ে বাজব পলে পলে ।
আমার একতারাটির তার যদি গো
ছিন্ন হয়ে যায়,
রাগভক্তির ডোরে ঠাকুর,
বেঁধে নেব তায় ।
চন্দনেরই বিন্দু হয়ে রব চরণতলে
তোমার পায়ের নূপুর হয়ে বাজব পলে পলে ॥

জীবন সার্থক হবে

শান্তশীল দাশ

সুখ দুঃখ দুই-ই তাঁর দক্ষিণ হাতের দান,
দুইকেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে হবে ।
দুঃখে বিষাদগ্রস্ত হলে চলবে না,
সুখেও বিহ্বল হলে চলবে না ।
ঠাকুর বলতেন, এক হাতে সংসার কর,
অন্য হাতে তাঁর নাম জপ কর,
তাঁকে স্মরণ কর ।
তাহলে দুঃখে বিষণ্ণতা আসবে না,
সুখে বিহ্বলতা আসবে না ।
কাজটা সহজ নয়,
তবু চেষ্টা করতে হবে ।
স্মরণ করতে হবে ঠাকুরের কথা,
মেনে চলতে হবে তাঁর কথা ।
সুখ দুঃখ দুই-ই তাহলে সহজে
গ্রহণ করা যাবে ;
জীবন সার্থক হবে ।

প্রত্যক্ষ

হিমানী রায়

মগ্নচৈতন্যের পরপারে সদাই জাগিছ তুমি
হৃদয়েতে করি অনুভব।
সাধ জাগে মনে, এ দুটি নয়নে,
হেরিব ও-রূপ তব।

কবে আসি তুমি, পুরাবে বাসনা,
রয়েছি প্রতীক্ষায়।
দয়া করে নাথ, এস ত্বরা করি,
দিন যে গো চলে যায়।

জীবনের সেই সুলগন লাগি,
সদা জেগে থাকে আঁখি,
ক্ষণেকের তরে না পড়ে পলক,
পথ পানে চেয়ে থাকি।

না জানি কখন, সম্মুখে আমার,
আসিয়া দাঁড়াবে তুমি,
করুণাঘন মুরতি তোমার,
হেরিব জীবনস্বামী।

অপার আনন্দে ভরে যাবে প্রাণ
সংশয় যাবে চলে
যাহা কিছু মোর সকলি সঁপিব,
পঙ্কজ পদতলে।

কবিতায় রামকৃষ্ণ*

শান্তি সিংহ

॥ ১ ॥

হাত কাঁপছে, ফাতনার দিকে মন
দুলে উঠছে—বিশ্ব-ত্রিভুবন।
বিষয়ী-মা-সতীর তিন টান
এক যে হলে সিদ্ধি ও সম্মান।

॥ ২ ॥

ছোট্ট মাছের ভেতর চৈতন্যসঞ্চার
কচুরিপানায় ঢাকা টলটলে জল
অচিন গাছ কিংবা হোমাপাখি
এখবর রাখে সে-ই, যার মন সহজ সরল!

॥ ৩ ॥

দড়ির দু-প্রান্ত টেনে দুই ভাই জমি করে ভাগ—
দুজনের মনোভাবে ঈশ্বরও হেসে বলে, 'হায়!'
ডাক্তার প্রবোধ দেন, 'ভয় কেন? আমি আছি, জেন'-
অন্তর্যামী সকৌতুকে মিটিমিটি হাসে পুনরায়!

॥ ৪ ॥

হাঁস জলকে ভালবাসে,
জল কি তাকে চায়?
একাঙ্গী প্রেম একতরফা
রসিক জেনে যায়!

* উৎস : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত।

একটু আলোর জন্যে

সলিল মিত্র

একটু আলোর জন্যে আমি আছি স্থির অপেক্ষায়,
প্রত্যাশায় আছি একটু আলোর,
অলিতে গলিতে আজ ঘনীভূত অন্ধ-তামস,
উজ্জ্বলতা কোথায় হারালো?
কেউ তো বলে না আজ,
'অন্ধকার দূর করে দিতে
প্রসন্ন প্রাণের দীপ জ্বালো!'
একটু আলোর জন্যে স্থির অপেক্ষায় আমি আছি
বিশ্বাসের বাতাসের ভার—
আলোর দাক্ষিণ্য এনে দিতে পারে বুকের সীমায়,
তাই বুঝি জীবন আমার
বাতাসে বিশ্বাস খোঁজে,
যে বিশ্বাস মুছে দিয়ে অন্ধকার
উজ্জ্বল আলোয় একাকার
করে দেবে এই বিশ্ব, ভিতরে বাহিরে—
ক্ষীণ হবে যন্ত্রণার ভার!

বিশেষ রচনা

শিকাগো বিশ্বধর্মসম্মেলন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ তখন মাদ্রাজে। শিকাগো বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদানের সম্ভাব্যতা নিয়ে তাঁর চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত। একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন, সম্মুখে বিশাল সমুদ্র—বিপুল তরঙ্গমালার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামীজীকে ইঙ্গিত করছেন তাঁকে অনুসরণ করার জন্য।[১] এই স্বপ্নকেই স্বামীজী গুরুর নির্দেশ বলে গ্রহণ করলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে স্বপ্নের বহু ব্যাখ্যা প্রচলিত তার মধ্যে একটি হলো, স্বপ্নদ্রষ্টার কোন অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা মনের ইচ্ছার সহায়করূপে স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে অর্থাৎ অতীত ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তিগত ইচ্ছার সংযোগ সাধিত হয়।[২] স্বামীজীর ক্ষেত্রে এই স্বপ্নের অবশ্যই অতীত ঘটনার পটভূমিকা আছে, কিন্তু সেই ইতিহাস আমাদের সম্পূর্ণ জানা নেই; তবে কিছু কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এই স্বপ্নের পটভূমিকা সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারা যায়।

একদিন সমাধিভঙ্গের পর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে বলেছিলেন: "দেখ গা, আমি এক দেশে গেছলুম। সেখানকার লোকগুলো সব সাদা সাদা। আহা! তাদের কি ভক্তি!"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্ম সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা বিশ্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত হোক—এই ইচ্ছা অবশ্যই স্বাভাবিক। বিশেষ করে যেসময় খ্রীস্টধর্মের প্রভাব সমগ্র জগতে বিস্তৃত তখন ধর্মের প্রকৃত সত্য তাদের মধ্যেও প্রসারিত হওয়া এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্মকথার সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। সমাধিলব্ধ নির্দেশে তারই আভাস।

এর পরের ঘটনা কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন তাঁর লৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তির বিলম্ব নেই। সেই সময় নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রের আলোচনা হতো। তিনি চাইতেন নরেন্দ্রনাথ তাঁরই বাণীবাহকরূপে মানবসমাজের সম্মুখে উপস্থিত হোক—সেই মানবসমাজ শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ একথা মনে করার কোন কারণ নেই। 'সাদা সাদা লোক'-এর দেশেও বৈদান্তিক চিন্তাধারা প্রচারিত হোক—এই ইচ্ছা অবশ্যই তাঁর ছিল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ জানাতেন তাঁর অক্ষমতা। এই নিয়ে য়ের মধ্যে চলত সংঘাত। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ মেনে নেন শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ। ২০ মার্চ (১৮৮৬) দোলযাত্রার দিন তিনি নরেন্দ্রনাথকে অনুনয় করে বলেন: "তুই যে জন্যে কাঁদছিস [প্রত্যক্ষানুভূতি] তোকে তাই দেব, কিন্তু তুই আমার জন্যে খাট। তোর জন্যে আমি এতদিন দুঃখ করলাম, তুই এদের জন্যে দুঃখ কর। আমি ষোল আনা খেটেছি, তুই এক আনা খাট—তোকে আমি গদি করে দেব।"[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে দুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি—(১) "এদের জন্যে দুঃখ কর" এবং (২) "তোকে গদি (সিংহাসন) করে দেব"। 'এদের' কথাটি ঠিক কোন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ? শুধুই কি সন্ন্যাসি-শিষ্যদের কথা চিন্তা করে বলেছিলেন কথাগুলি? নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এখানে শুধু সন্ন্যাসি-শিষ্যদের জন্য খাটার প্রশ্ন আদৌ ওঠে না, কেননা তিনি স্বয়ং তাঁদের উপযুক্ত করে তৈরি করেছিলেন। তাঁর অবর্তমানে শুধু প্রয়োজন ছিল সংগঠনের।

১ Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples, Vol. I, 1979, p. 380

২ Dreams and Nightmares—J. A. Hadfield, Penguin Books Ltd., 1954, p. 65

৩ শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ৫০০

৪ আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী প্রভানন্দ, ১৯৮১, পৃঃ ২২১

'এদের' কথাটি ব্যাখ্যার জন্য আমাদের পূর্ববর্তী ১১ জানুয়ারির (১৮৮৬) ঘটনার কথা স্মরণ করতে হবে। সেদিন তাঁর রোগের চরম অবস্থা—"গলার ভিতরের ক্ষত বাইরে বেরিয়ে পড়েছে—রক্ত-পুঁজ ঝরছে। গলায় বাঁধা হয়েছে গাঁদাপাতার পুলটিশ। সেই অবস্থার মধ্যে একখণ্ড কাগজ চেয়ে নিলেন, একাগ্র মনে লিখলেন—

জয় রাধে প্রেমোহি [প্রেমময়ী] নরেন সিক্ষে [শিক্ষে] দিবে

জখন [যখন] ঘরে বাহিরে

হাঁক দিবে

জয় রাধে।"[৫]

অনেকেই এটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'নির্দেশনামা' বলে মনে করেন। কিন্তু কথাগুলির মধ্যে এমন একটা জয়োল্লাস আছে, যাতে একে সাধারণ নির্দেশনামা হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর আনন্দে উদ্বেল মুখ সহজেই সবার চোখে পড়ে। মনে হয়, নরেন্দ্রনাথের স্বীকৃতিই ছিল এই ঘটনার পটভূমিকা। মনে পড়ে আর একদিনের কথা—সেদিনও শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে বিহ্বল হয়েছিলেন, যেদিন নরেন্দ্রনাথকে তিনি 'সর্বস্ব' দিয়েছিলেন। অবশেষে এল সেই দিন। তিরোভাবের "তিন-চার দিন মাত্র বাকি। এক শুভ-মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে তাঁর সম্মুখে বসিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। নরেন্দ্রনাথ অনুভব করেন, ঠাকুরের দেহ হতে সূক্ষ্ম তেজোরশ্মি তড়িৎকম্পনের মতো তাঁর শরীরের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাববিহ্বল নরেন্দ্রনাথ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। চেতনা লাভ করে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে জল। তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলেন, আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফাকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি।"[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় এই ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে ভাবী জগৎকল্যাণের কাজ—নরেন্দ্রনাথের নবজীবনের উন্মোচন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, নরেন্দ্রনাথ "ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে।" শুধুমাত্র দেশের গণ্ডির মধ্যেই তাঁকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাননি এবং তাঁকে দিয়েছেন 'গদি' প্রদানের প্রতিশ্রুতি। এই ক্ষেত্রে আমরা নরেন্দ্রনাথের জীবনকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে নিতে পারি—(১) কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শক্তি প্রদানের পূর্ববর্তী জীবন এবং (২) তার পরবর্তী জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে নরেন্দ্রনাথ যখন এসেছেন তখন তিনি ছাত্র। তাঁর জীবন তখনো পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে পরবর্তী জীবনকে প্রত্যক্ষ করলেও অন্যের কাছে তাঁর প্রতিভা স্পষ্ট নয়। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর তিনি সামান্য চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। 'কথামৃতে' উল্লিখিত বিভিন্ন সময়ে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বিতর্কের সময়ও তাঁকে সাধারণের থেকে বিশেষ কিছু বলে মনে হয় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শক্তিলাভের পর তিনি অনেকখানিই পরিবর্তিত মানুষ। সেসময় পথচারী মানুষও তাঁকে "দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য" বলে মনে করেছে। রাজদরবারেও গৃহীত হয়েছেন গুরুরূপে—তবে রাজমহিমায় অধিষ্ঠিত হননি। রামনাদের রাজা তাঁকে গুরু হিসাবে বরণ করেছেন, খেতড়ির রাজাও তাই করেছেন। কিন্তু বিশ্বধর্মসভাই তাঁকে এনে দিয়েছে রাজার মর্যাদা—সিংহাসনের অধিকার। সম্মেলনের প্রথম দিনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে সেদিন সভায় উপস্থিত মিসেস এস. কে. ব্লজেট লিখেছেন: "এই তরুণটি [স্বামীজী] উঠে 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাগণ' বলে সম্বোধন করার পর সাত হাজার শ্রোতা তাদের কাছে অভাবনীয় এই কথাগুলিকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তারপর অজস্র মহিলা সামনের বেঞ্চগুলি টপকে স্বামীজীর নিকটবর্তী হয়। আমি তখন মনে মনে বললাম, 'বাছা, যদি এই আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পার, তবে বুঝব তুমি স্বয়ং ঈশ্বর'। (স্বামীজীর জীবনী-গ্রন্থে আছে, সম্মেলন উদ্বোধনের পরের দিন একটি বিলাসবহুল গৃহে অতিথি হয়ে রাতে স্বামীজী তাঁর দেশবাসীর দারিদ্র্য-দুর্দশার কথা স্মরণ করে বেদনার্ত-হৃদয়ে কেঁদেছিলেন। এই ছিল সেই আকস্মিকভাবে লাভ করা খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রতিক্রিয়া।)"[৭] মিসেস

৫ আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ২২০ ৬ ঐ, পৃঃ ২২৩

৭ Swami Vivekananda in the West—Marie Louise Burke, Vol. I, 1983, p. 81

লেগেট বলেছেন : "আমার জীবনে দুইজন সুবিখ্যাত ব্যক্তির সহিত দেখা হইয়াছে।… একজন জার্মান সম্রাট, অপরজন স্বামী বিবেকানন্দ।"[৮] সিস্টার ক্রিস্টিন এক ঝড়জলের রাতে ডেট্রয়েট থেকে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে স্বামীজীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বলেছেন : "ভগবান ঈশা এখন পৃথিবীতে বর্তমান থাকিলে যেরূপে আমরা তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা করিতাম, আমরা আপনার নিকট সেইরূপেই আসিয়াছি।"[৯] মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক ধর্মপাল [ইনি শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন] লিখেছেন : "স্বামী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ প্রতিকৃতিসমূহ শিকাগোর পথে পথে লটকাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহার নিচে লেখা রহিয়াছে 'স্বামী বিবেকানন্দ'। সহস্র সহস্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পথিক এই প্রতিকৃতিগুলির প্রতি ভক্তিভরে সম্মান প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছে।"[১০] ধর্মসম্মেলনে উপস্থিত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিরাম ম্যাক্সিমের ভাষায়—"বিবেকানন্দ যখন কথা বললেন, তারা [গোঁড়া খ্রীস্টান সম্প্রদায়] দেখে তাদের সামনে একজন নেপোলিয়ন উপস্থিত।"[১১] সমুচ্চ স্বীকৃতির এমনি অনেক উদাহরণই উদ্ধার করা যেতে পারে যা তাঁর পরাধীন স্বদেশে আগে তিনি পাননি। বিদেশে এই অভাবনীয় গৌরব অর্জনের ফলে স্বদেশেও অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। স্বদেশের মাটিতে প্রথম পাদস্পর্শের পর তাঁর গাড়ি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং রামনাদের রাজা। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, পরাধীন ভারতবর্ষে 'ভক্তের রাজা' হওয়া সম্ভব, কিন্তু 'নরেন্দ্রনাথ' নাম সার্থক করতে চাই বিদেশের স্বীকৃতি।

বিশ্বের পটভূমিকায় নরেন্দ্রনাথকে উপস্থিত করতে নেপথ্যচারী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিত্যসঙ্গী। মাদ্রাজে অবস্থানকালে একদিন তাঁকে তাঁর বন্ধুরা একজন ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে নিয়ে যান। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর গুরু সর্বদাই তাঁর সঙ্গে অবস্থান করছেন।[১২]

শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশে অবস্থানকালেও নানাবিধ ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বামীজী বুঝেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করছেন, তাঁকে প্রতিনিয়ত শক্তি যোগাচ্ছেন। ডেট্রয়েটে স্বামীজীর প্রতিপক্ষ গোঁড়া খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে চরম সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়েছেন। গির্জার পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে তাঁর নামে হাজারো কুৎসা প্রচারিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ডাকে তাঁর কাছে আসত গাদা গাদা চিঠি—ব্যক্তিগত আক্রমণ, ভীতি প্রদর্শন—কিছুই বাদ নেই তাতে। যে-সমস্ত পরিবার তাঁকে আতিথ্য দান করতেন তাঁরাও নিন্দিত হয়েছেন। সেই সময় তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয় কফির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে। স্বামীজী কফিপাত্র তুলে দেখতে পান, তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি—তিনি নিষেধ করছেন পান করতে।[১৩]

আরও একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে পারি। ধর্মসম্মেলন চলাকালে স্বামীজীর অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল লায়ন পরিবারের আবাস। মিস্টার লায়ন সামান্য সময়ের মধ্যে স্বামীজীর গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন—মিসেস লায়নও স্বামীজীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। স্বামীজী বিদেশী—তাঁর উপযোগী আহার হয়তো পাচ্ছেন না এই আশঙ্কা তাঁর ছিল ; একদিন তিনি স্বামীজীকে বলেন ; "আমাদের আহার্য হয়তো আপনার মনোমত হচ্ছে না। যদি বলেন আমি আপনার পছন্দমত কিছু রান্নার চেষ্টা করে দেখতে পারি।" স্বামীজী উত্তর দেন : "না, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এখানে আসবার আগে আমার গুরু আমায় নির্দেশ দিয়েছেন, পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে আমি যেন সেখানকার আচার-ব্যবহার, আহার্য সবকিছুতে অভ্যস্ত হয়ে উঠি।"[১৪]

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী স্বামী বিশ্বানন্দকে একটি চিঠি লিখেছিলেন ; তাতে তিনি লিখেছিলেন : "স্বামীজী একবার আমাকে বলেছিলেন, একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে

৮ বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১১শ মুদ্রণ, ১৩৬৯, পৃঃ ১৭০ ৯ ঐ, পৃঃ ১৬৫ ১০ ঐ, পৃঃ ১৩৭

১১ Swami Vivekananda in the West, Vol. I, .p. 139

১২ Life of Swami Vivekananda, Vol. I, p. 381

১৩ Ibid., p. 483

১৪ Swami Vivekananda in the West, Vol. I, p. 154

মিচিগ্যান লেকের তীরে তাঁর মন ধীরে ধীরে ব্রহ্মে লীন হতে থাকে। অকস্মাৎ তিনি তাঁর সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পান। মনে পড়ে যায়, এ পৃথিবীতে তিনি কি কাজে এসেছেন। তাঁর মন আবার ধীরে ধীরে নেমে আসে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রত সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।"[১৫]

স্বামীজীর শিকাগোয় উপস্থিতি ও ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের মধ্যবর্তী কালের ঘটনাগুলি সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার —অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

৩০ জুলাই রাত ১১টায় তিনি শিকাগো পেঁছালেন। সঙ্গে মালপত্র সামান্যই এবং অর্থ-সম্বলও যথেষ্ট নয়। বিশ্বমেলার দৌলতে তখন শিকাগো রীতিমত ব্যয়বহুল শহর। তাঁকে বাধ্য হয়েই উঠতে হয় হোটেলে। সংবাদ সংগ্রহ করে তিনি জানলেন, ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়পত্র চাই। কিন্তু সেই নির্বান্ধব অপরিচিত শহরে পরিচয়হীন এক তরুণকে প্রশংসাপত্র কে দেবে? আর সেটা সংগ্রহ করতে পারলেও নাম নথিভুক্ত করার দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান ও আমেরিকাবাসীর কাছে আপন বক্তব্য উপস্থাপনের কোন সুযোগই আর নেই। হতাশ হয়ে স্বামীজী স্থির করলেন, সাধারণ দর্শক হিসাবেই তিনি সভায় যোগ দেবেন কিন্তু তারও বিলম্ব ছয় সপ্তাহ। প্রথম শ্রেণীর হোটেলে দৈনিক একটি ঘরের জন্য খরচ তিন ডলার বা তারও বেশি। তিনি হিসাব করে দেখলেন, দৈনিক তাঁর খরচ হচ্ছে পাঁচ ডলার, সুতরাং তাঁর সামান্য পুঁজিতে তা দিয়ে সেই ব্যয়-বহুল শহরে থাকা অসম্ভব। তখন শরৎকাল। শীতের আগেই সেই সময়ে যা ঠাণ্ডা তাতে তিনি যথেষ্ট বিব্রত। কারণ, তাঁর কাছে আমেরিকার শীতের উপযোগী পোশাক বলতে কিছু নেই। তার ওপর আরও সমস্যা, তাঁর নিজস্ব পোশাকে রাস্তায় বেরনো রীতিমত ঝামেলার ব্যাপার। বিচিত্র পোশাকের এই বিদেশীকে দেখে স্থানীয় লোকেরা নানাভাবে হেনস্তা করে। একদিন তো রাস্তায় এমন ব্যাপার ঘটল যে, হোটেলে ফিরে হতাশে বিবেকানন্দ ভেঙে পড়লেন। ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর সামনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরিচিত ভঙ্গিতে তাঁকে স্পর্শ করে উৎসাহ দিলেন: "আরে ওঠ, ওঠ—লোক না পোক।"[১৬] উজ্জীবিত স্বামীজী স্থির করলেন, কম খরচে সম্মেলন পর্যন্ত আমেরিকায় থাকার জন্য শিকাগো ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে থাকবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অচিরে বস্টন যাত্রা করলেন, আর ট্রেনেই ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা, যাকে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনীকারেরা "রহস্যময় ঈশ্বরের লীলা" বলে উল্লেখ করেছেন। এই ট্রেনেই পরিচয় হলো "দৈবপ্রেরিত এক সহৃদয় মহিলা" মিস কেট স্যানবর্নের সঙ্গে। তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন ম্যাসাচুসেটস-এ তাঁর নিজস্ব খামারবাড়ি 'ব্রীজি মেডোজ'-এ এবং তিনিই পরিচয় করিয়ে দিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক জন রাইট-এর সঙ্গে। রাইট অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামীজীর প্রতিভা চিনে নিলেন এবং পরিচিতিপত্র লিখে দিলেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে "চমৎকার গুণসম্পন্ন যোগ্য প্রতিনিধি, যাঁর পাণ্ডিত্য আমাদের সমস্ত বিদগ্ধ অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যের যোগফলের চেয়েও বেশি" বলে। তিনি বললেন, বিবেকানন্দ "সূর্য-তুল্য, যাঁর কিরণ বিস্তারের অধিকারের জন্য কোনও প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন হয় না।" অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর শিকাগো প্রত্যাবর্তনের টিকিট কিনে এবং কিছু অতিরিক্ত অর্থ তাঁর হাতে দিয়ে আবার ফেরৎ পাঠালেন শিকাগোয়। ৮ সেপ্টেম্বর (অথবা ৯ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্নে স্বামীজী পেঁছালেন শিকাগোয়, কিন্তু আবার নতুন বিপত্তি। কোথায় তিনি যাবেন অথবা কোথায় তাঁকে যেতে হবে, সেই ঠিকানা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। কোথায় যেতে চান সেটাও কাউকে বোঝাতে পারছেন না, কারণ সেটা নিজেই তিনি জানেন না। বিভ্রান্ত অবস্থায় কিভাবে তিনি সেই রাত্রি যাপন করেছিলেন এবং পরদিন কি

১৫ Swami Vivekananda in the West, Vol. III, 1985, p. 108 and Vol. I, p. 174
১৬ Ibid., Vol. I, p. 63

অবস্থায় হেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই বহুকথিত কাহিনী সকলেরই জানা। এর আগের একটি চিঠিতে (২০ আগস্ট) স্বামীজী লিখেছিলেন : "শতবার মনে হইয়াছে, এ দেশ হইতে চলিয়া যাই; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমি কোন পথ দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে।"[১৭] কিন্তু যিনি পথের সন্ধান জানেন তিনি কেন বারবারই স্বামীজীকে বিবিধ বিপত্তির সম্মুখীন করছেন। এই দুটি ঘটনা এবং আরও কয়েকটি ঘটনা থেকে এর কারণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্বধর্মসম্মেলনে স্বামীজীর যোগদান প্রয়োজন হয়েছিল পরবর্তী কালে আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-ভাবধারার ব্যাপক প্রসারের জন্য। সম্মেলন তার সমাপ্তি নয়, সূচনা মাত্র। সুতরাং তার জন্য আবশ্যিক ছিল, যেসব পরিবারের সঙ্গে স্বামীজী সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বিপত্তির মধ্যে দিয়ে সেই-সব পরিবারের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরাও পূর্বনির্দিষ্ট সূত্রে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁকে চিনতে পেরেছেন এবং সাহায্যের উদার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন, যার ফলে স্বামীজীর আমেরিকা অভিযান সহজ ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে। শিকাগো স্টেশন থেকে মিসেস হেলের বাড়ির দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল। এই রাস্তায় তিনি অনেকেরই সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু তারা সেই কৃষ্ণকায় বিচিত্র মানুষটিকে দেখে হয় দরজা বন্ধ করে দিয়েছে অথবা প্রকাশ্যেই অপমান করেছে। দীর্ঘক্ষণ পথ চলার পর ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে তিনি পথের ধারে বসে পড়েছেন। না, আর সাহায্য ভিক্ষা নয়, এবার সম্পূর্ণ শরণাগতি। ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেছে রাস্তাপারের দরজা—তাঁর সামনে এসে অযাচিত ভাবে দাঁড়িয়েছেন মিসেস হেল। এতক্ষণে স্বামীজী পৌঁছেছেন যথার্থ ঠিকানায়, যাঁর সাহায্য ছাড়া আমেরিকায় তাঁর ব্রত সম্পাদন সুগম হতো না।

আরও অনেক পরিবারের মধ্যে বিশেষ একটি পরিবারের কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি। আগেই জানিয়েছি, বিশ্বধর্মসম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতি-নিধিদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল কতকগুলি ধনী পরিবারে। তাঁরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের কাছে একজন করে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছিলেন। সেইমত স্বামীজীর জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল মিঃ লায়নের গৃহে। মিঃ লায়ন চেয়েছিলেন, একজন "উদার মানসিকতাসম্পন্ন" ব্যক্তিকে, কারণ তিনি ছিলেন দর্শনে বিশেষ আগ্রহী, কিন্তু গোঁড়ামির সম্পূর্ণ বিরোধী। মিঃ লায়নের ২৬২ মিচিগ্যান এভিনিউর আবাসে স্বামীজী পৌঁছালেন মধ্যরাত্রে। মিসেস লায়ন শুধু জেগেছিলেন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে, অন্য সকলেই নিদ্রিত। তাঁদের বাড়িতে কাকে পাঠানো হচ্ছে, তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী, কি তাঁর পরিচয়—এসব কিছুই তাঁরা জানতেন না। ঘণ্টাধ্বনি শুনে দরজা খুলেই মিসেস লায়ন চমকে উঠলেন—এ যে এশিয়াবাসী কৃষ্ণকায় মানুষ। নিজেকে সামলে নিয়ে যথোচিত অভ্যর্থনা করে স্বামীজীকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিলেন, কিন্তু সেই রাতে চিন্তায় তাঁর ভাল ঘুম হলো না। সমস্যাটা তাঁদের নিজেদের জন্য নয়। বিশ্বমেলা উপলক্ষে সে-সময় তাঁদের বাড়িতে অনেক আত্মীয়স্বজন আতিথ্য-গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শ্বেতাঙ্গ ভিন্ন অন্য সকলকেই প্রাক্তন নিগ্রো ক্রীতদাস বলে মনে করতো। সমস্যাটা তাঁদের নিয়েই।

পরদিন সকালে গৃহকর্তার ঘুম ভাঙলে মিসেস লায়ন স্বামীর কাছে বিবেকানন্দের আগমন সংবাদ এবং সেই সূত্রে উদ্ভূত সমস্যার কথা জানালেন। সেরকম পরিস্থিতি হলে বাড়ির কাছে অডিটোরিয়াম হোটেলে স্বামীজীকে রাখার পরামর্শও দিলেন। প্রতিদিনের অভ্যাস অনুযায়ী মিঃ লায়ন পোশাক পরে প্রাতরাশের আধঘণ্টা আগে সংবাদপত্র পাঠের জন্য লাইব্রেরী ঘরে উপস্থিত হয়ে সেখানে পেলেন নবাগত অতিথিকে। সামান্যক্ষণ আলাপ করে প্রাতরাশের আগেই স্ত্রীর কাছে এসে বললেন : "এমিলি, আমার অন্যসব অতিথিরা যদি চলেও যায় তার জন্য আমি একটুও দুঃখিত হব না—এই ভারতীয়টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং এপর্যন্ত যত অতিথি আমাদের বাড়ি এসেছে, তাদের সকলের চেয়ে আকর্ষণীয়। সুতরাং তাঁর যতদিন

১৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৬১

ইচ্ছা তিনি এখানেই থাকবেন।"[১৮] লায়ন পরিবারে স্বামীজী গৃহীত হয়েছেন একান্ত আপনজনের মতো। মিঃ লায়ন হয়েছেন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং মিসেস লায়ন 'আমেরিকান মা'।

রাইট-হেল-লায়ন এবং পরবর্তী কালে আরও কয়েকটি পরিবার ছিল ভারতীয় "সাইক্লোনিক সন্ন্যাসী"র বাত্যাবিক্ষুব্ধ জীবনে শান্তির আশ্রয়।

॥ ৩ ॥

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট-এ শুরু হলো বিশ্বধর্মমহাসম্মেলন 'নিউ লিবার্টি বেল'-এর দশটি ঘণ্টাধ্বনির মধ্য দিয়ে। দশটি ধ্বনি দশটি ধর্মের প্রতীক—তার মধ্যে একটি হিন্দুধর্ম, যার প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। প্রথম দিনে বক্তৃতা হয় মোট চব্বিশটি। প্রভাতী অনুষ্ঠানের প্রায় সবটাই কেটে গেল প্রার্থনা-সঙ্গীত ও স্বাগত ভাষণে। বৈকালিক অধিবেশনে চারজন বক্তা তাঁদের লিখিত ভাষণ পাঠ করার পর সুপণ্ডিত ফরাসী যাজক বোনে' ম্যারি স্বামীজীকে আহ্বান করলেন ভাষণ দানের জন্য। এর আগেও তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, কিন্তু তিনি বারবারই অন্য বক্তাকে সুযোগ দিয়ে নিজে সরে গেছেন। তার কারণ স্বামীজীর মুখ থেকেই শুনি: "কল্পনা করিয়া দেখ, নিচে একটি হল, আর ওপরে প্রকাণ্ড গ্যালারি; তাহাতে আমেরিকার সুশিক্ষিত বাছা বাছা ৬।৭ হাজার নরনারী ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া উপবিষ্ট, আর প্ল্যাটফর্মের ওপর সর্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি। যে জীবনে কখনো সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে। সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইবার পর সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু বলিলেন। তখন আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্নে বক্তৃতা করিতে ভরসা পাইলাম না।"[১৯]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোনে' ম্যারির উৎসাহবাক্যেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পাঁচটি ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ করলেন—"Sisters and Brothers of America" ("আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ")। "তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে যেন তালা ধরিয়া যায়" —স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন। "তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম।… সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন, 'মূকং করোতি বাচালং', তিনি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তোলেন। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক। সেইদিন হইতে আমি এক বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম।"[২০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বামীজীর সম্ভাষণসূচক পাঁচটি ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ ও তার প্রতিক্রিয়াই তাঁর প্রাথমিক জড়তা ও ভীতি ঘুচিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে এতখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার মতো সে সম্ভাষণে সত্যই কিছু ছিল কি? প্রশ্নটি উত্থাপন করে নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন মারি লুইস বার্ক: "ধর্মসম্মেলনের শ্রোতারা নিজেরাই সঠিক জানত না যে, কেন স্বামীজীর প্রথম সম্ভাষণেই এতখানি অভিনন্দন জানাল। আগের ক্ষেত্রে [এতখানি না হলেও পূর্ববর্তী অনেক বক্তাই অভিনন্দিত হয়েছিলেন] অভিনন্দনের স্পষ্ট কারণ ছিল—রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সহানুভূতি, বক্তার পূর্বপরিচিতি অথবা নিজেদের প্রাক্তন অপরাধের অপনোদন। কিন্তু স্বামীজীর ক্ষেত্রে এসব কিছু ছিল না। আবার তাঁর প্রারম্ভ সম্বোধনটাই কেবল করতালির কারণ হতে পারে না, যেহেতু শ্রোতারা সকাল থেকেই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের কথা অনেকের বক্তৃতাতেই শুনে আসছে। স্বামীজীর সম্বোধনের মধ্যে অব্যক্তপূর্ব কিছুর দ্বারাই কি তাদের আবেগ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেনি?… সংক্ষেপে একটা কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে, স্বামীজীর সম্বোধনের শব্দগুলি উচ্চারণের পর শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত ও দীর্ঘ উদ্দীপ্ত অভিনন্দন উত্থিত হয়েছিল তা এক গভীর অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়েছিল, যে-অনুভূতি ছিল ঐ শব্দগুলির উৎস। তার ফলে বক্তা ও

১৮ Swami Vivekananda in the West, Vol. I, p. 152

১৯ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮০-৩৮১

২০ ঐ

শ্রোতা উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তারই মধ্যে নিহিত ছিল স্বামীজীর পাশ্চাত্য পরিদর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য। এটাই অন্তত মনে হয়। যদিও সেসময় খুব কম লোকই বুঝতে পেরেছিলেন, কোন্ শক্তি এমন গভীরভাবে তাদের নাড়া দিয়েছিল।"[২১]

স্বামীজী সেদিন কোন্ শক্তির স্পর্শে 'মূক' থেকে 'বাচাল' হয়ে উঠেছিলেন সেটা আলাসিঙ্গাকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতেই উল্লেখ করেছেন: "আমি দিন দিন বুঝিতেছি, প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন আর আমি তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।"[২২]

২৮ ডিসেম্বর ১৮৯৩ তারিখে স্বামীজী হরিপদ মিত্রকে লিখেছেন: "কবে দেশে যাব জানি না। প্রভুর ইচ্ছাই বলবান।"[২৩]

পাশ্চাত্য গমনের পরে বিবেকানন্দ যখন প্রভুর সান্নিধ্য অনুভব করে তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে শুরু করেছেন তখন থেকে তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে দূর হয়েছে। ২৮ মে ১৮৯৪ আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন পূর্ববর্তী চিঠির ভাষাতেই: "জানি না, কবে ভারতে যাইব। সমুদয় ভার তাঁহার উপর ফেলিয়া দেওয়া ভাল, তিনি আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছেন।"[২৪]

তখন শুধু বক্তৃতামঞ্চ বা কাজের গতিবিধির ওপরেই নয়, ব্যক্তিগত পত্র লেখাতেও তিনি অদৃশ্য শক্তির ওপর নির্ভরশীল। ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছেন: "আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। or.ward, হরে হরে—হুঁশিয়ার তিনি আসছেন! যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেমেয়ে—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত—তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরি হবে, তাদের ভেতর তিনি আসছেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।"[২৫]

বিবেকানন্দকে 'অবাক' করা এই মহাশক্তির আবির্ভাব কিভাবে ঘটেছিল, কেমন করেই বা মুখে সরস্বতী বসেছিলেন তারও পরিচয় তিনি দিয়েছেন একই পত্রে: "লেকচার ফেকচার (বক্তৃতা) তো কিছু লিখে দিই না··· সব দাঁড়াঝাঁপ, যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন।···একবার ডেট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলাম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে 'মধো, তোর পেটে এতও ছিল!"[২৬]

পুনশ্চ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪-এর চিঠি:

"আজকাল গোঁড়া বেটাদের ত্রাহি ত্রাহি এদেশে। ···আমাকে বেটারা যমের মতো দেখে। বলে, কোথা থেকে এ বেটা এল, রাজ্যির মেয়েমদ্দ ওর পিছু পিছু ফেরে—গোঁড়ামির জড় মারবার জোগাড়ে আছে। আগুন ধরে গেছে বাবা! গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে, তা নিববার নয়।"[২৭]

সন্দেহ নেই, পাশ্চাত্য জগতে নতুন বিশ্বাসের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু সেই আগুন, সেই দাহিকা শক্তি লাভ করে-ছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাঁর আদেশ লাভ করেই এই আগুন ছড়াবার কাজে তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন।

"ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এইটের জন্য" নিজেকে নির্দেশ করে বলেছিলেন বিবেকানন্দ। নিশ্চিতভাবে তিনিই ছিলেন শিকাগো ধর্মমহা-সম্মেলনের নায়ক, কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র নেপথ্যচারী শ্রীরামকৃষ্ণ। এক সময় তিনি বলেছিলেন: "এমন দিন আসবে যখন ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও বুদ্ধির জোরে সারা দুনিয়ার ভিত কাঁপিয়ে দেবে।" তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করে তুলতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন—সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন অ-প্রস্তুত নরেন্দ্রনাথকে। ☐

২১ Swami Vivekananda in the West, Vol. I, p. 82

২২ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪ ২৩ ঐ, পৃঃ ৩৮৯

২৪ ঐ, পৃঃ ৪২৯ ২৫ ঐ, পৃঃ ৪৫৭ ২৬ ঐ, পৃঃ ৪৫৫ ২৭ ঐ, পৃঃ ৪৮৪

সৈয়দ আলী আহ্সান*

এ পৃথিবীতে বসবাস, জীবনযাপন এবং প্রাত্যহিকতা সর্বদাই একটি সমাপ্তির পথে চলে। আমরা জন্মগ্রহণ করি মৃত্যুর দিকে আমাদের অভিযাত্রাকে সফল করার জন্যে। মনে হয় মৃত্যুই যেন প্রধান, আর সবকিছু অ-প্রধান। পৃথিবীর সকল মানুষ কিছুকাল বিবিধ কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত থেকে অবশেষে মৃত্যুকে মান্য করে। কিন্তু এটাই কি চরম সত্য? এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান সাময়িক বটে, কিন্তু এ পৃথিবীতে মানুষের কি কিছুই করণীয় নেই? বিভিন্ন সময় মানুষের মনে এসব প্রশ্ন উদয় হয় এবং নানাভাবে মানুষ এর উত্তর দেবার চেষ্টা করে। গৌতমবুদ্ধ জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর তাৎপর্য কি—জানবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন কেন মানুষ জন্মগ্রহণ করে? কেন জরা, ব্যাধিতে সে আক্রান্ত হয়? কেন মৃত্যুকে সে অতিক্রম করতে পারে না? গৌতমবুদ্ধ এর উত্তরের সন্ধান করতে গিয়ে একটি বিশ্বাসে উপনীত হলেন যে, কোন মানুষই নিঃসঙ্গ বা একক নয়, সে একটি অনন্ত জীবন-চেতনার অংশ, সে একটি বিরাট সমগ্রের বিন্দুমাত্র। তাকে নিয়েই সমস্ত কিছুর শেষ নয়। যেমন, সমুদ্রের মধ্যে অনন্ত স্রোতধারা আছে এবং সমুদ্রের চলমানতা এসমস্ত স্রোতধারাকে অবলম্বন করেই, তেমনি অনন্ত জীবন-চৈতন্যের মধ্যে একজন মানুষ অংশগ্রহণ করছে মাত্র। সে কোন ক্রমেই সমগ্র নয়। সুতরাং বুদ্ধ চাইলেন যে, মানুষ যেন বিপুলের দিকে ধাবিত হয় এবং সকল জন্ম অতিক্রম করে একটি চরমতম সিদ্ধিতে লয়প্রাপ্ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনি জীবনকে একটি অচলতা বলে কখনো গণ্য করেননি। জীবন তাঁর কাছে একটি বিরাট অস্তিত্বের উন্মোচন ছিল। যে বিরাটকে আমরা কখনো দেখি না, যে অনন্তকে আমরা অনুভব করতে পারি না, যে বিপুল আর্তিকে আমরা স্পষ্ট করতে পারি না; সে সমস্ত কিছুই জীবনের অভিজ্ঞানের মধ্যেই চেষ্টা করলে পেতে পারি। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি অনন্তের অংশভাগে এবং বিপুল অনন্ত তাঁর মধ্যে দীপ্যমান রয়েছে। যেহেতু একজন মানুষের মৃত্যুর পর পৃথিবী বেঁচে থাকে, পাহাড়ের ক্ষয় হয় না, সমুদ্রের জলস্রোত অব্যাহত থাকে, সুতরাং প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে অনন্তের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা। এভাবে যোগসূত্র স্থাপন করেই একজন মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

মানুষের জীবনে মানুষ বহুবিধ সম্পর্ক নিয়ে বাস করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, উদ্ভিদজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, প্রাণিজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক—এসব সম্পর্কের মধ্য দিয়েই মানুষ মানুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, এসমস্ত সম্পর্ককে পবিত্র করা, শুভ এবং কল্যাণপ্রদ করা। শ্রীরামকৃষ্ণ এসমস্ত সম্পর্কের কথা বারবার বলে গেছেন। তাই লক্ষ্য করি, তিনি পথের সন্ধান দিতে গিয়ে বলছেন যে, প্রত্যেক মানুষই তার আন্তরিক বিকাশের সাহায্যে তার যাত্রাপথ খুঁজে পাবে। এভাবেই তিনি 'যত মত তত পথ'-এর ভিত্তি স্থাপন করলেন। অর্থাৎ বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় একটিমাত্র সত্যকেই আবিষ্কার করতে চাচ্ছে। যেহেতু সকল মানুষের লক্ষ্যই এক, সুতরাং কেউ লঘু কিংবা কেউ গুরু নয়, সকলেই সমান।

* ডক্টর সৈয়দ আলী আহ্সান অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ এবং ভূতপূর্ব উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা। তিনি বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিস্ময়কর প্রজ্ঞার সাহায্যে সকল মানুষকে একই বিশ্বাসের স্রোতে প্রবহমান দেখেছিলেন। যেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন—'অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান।'

আমরা সাধারণ মানুষ প্রতি মুহূর্তে লৌকিক অলৌকিকের প্রশ্ন তুলি। এই দুয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন দ্বন্দ্ব নেই, যেটা লৌকিক সেটাই অলৌকিক, আর যেটা অলৌকিক সেটাই লৌকিক জীবনে আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে, একটি বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়, অবশেষে তা বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। বীজের সন্নিবিষ্ট সংকীর্ণ আশ্রয়ে বিরাট বৃক্ষের পরিণতি কিভাবে লুক্কায়িত ছিল, আজ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক তার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এ পৃথিবীতে যা ঘটে তার ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন এবং কি করে ঘটে তারও একটা ব্যাখ্যা তাঁরা উপস্থিত করেন, কিন্তু কেন ঘটে তা তাঁরা বলতে পারেন না। এভাবেই লৌকিক অলৌকিক একাকার হয়েছে। আমরা দেখি মানুষ শূন্যে পরিক্রমায় যাচ্ছে, চাঁদে পদচারণ করছে, কিন্তু এগুলো করতে পাচ্ছে তার কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অদৃশ্য অনেক শক্তি রয়েছে, সেগুলোর গতিবিধিও আমরা অংশতঃ অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছি। মাধ্যাকর্ষণ আছে, তাই একটি বিশেষ শক্তির গতিকে আশ্রয় করে আমরা এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাবার চেষ্টা করছি। এই যে অদৃশ্য অনন্ত শক্তি, সেই শক্তি কি? সেই শক্তির উৎসই বা কোথায়? বৈজ্ঞানিকরা এসব প্রশ্নের উত্তর এখন আর দেন না। তাঁরা বলেন, শক্তি যেহেতু আছে, তাকে যতটা পারি ব্যবহার করব।

মহাপুরুষদের কাহিনী ভিন্ন রকম। তাঁরা শক্তির উৎস-সন্ধানী। তাই দেখি হযরত মুহম্মদ (দঃ) অলৌকিকের দিকে ধাবিত হয়েছেন এবং সকল শক্তির মূলীভূত কারণকে অনুসন্ধানের জন্য নিশাযোগে শূন্যপথ অতিক্রম করে বিধাতার সান্নিধ্যে উপনীত হবার কথা বলেছেন। এখানে আসল তত্ত্ব হচ্ছে যে, এই যে অনন্ত শক্তি, সেই শক্তি কি এবং কেন? কোথায় তার উৎসভূমি? তিনি এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন। এভাবেই মহাপুরুষগণ সমস্ত অসম্ভবকে অধিগম্যতার মধ্যে নিয়ে আসেন। একারণেই কোন কোন ধর্মসম্প্রদায় এসমস্ত মহাপুরুষদের বিধাতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করেন। মূলতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিধাতাকে সাক্ষাৎ অনুভব করা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বিধাতাকে এভাবে অনুভব করতে চেয়েছিলেন এবং অনন্ত শক্তির প্রভা সমস্ত বিশ্বময় দেখেছিলেন। তাই তাঁর বিবেচনায় কোথাও রহস্য ছিল না, সবকিছুই পরম প্রজ্ঞা বা পরমপুরুষের লীলা বৈচিত্র্যে পরিণত হয়েছিল।

ডারউইন তাঁর সমসকার সীমিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা বলতে চেষ্টা করেছিলেন যে, ক্ষুদ্র শক্তি থেকেই ক্রমান্বয়ে বৃহৎ শক্তির উদ্ভব। তাঁর বিবেচনায় ক্ষুদ্র অ্যামিবা থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে অবশেষে প্রাণী এবং প্রাণী থেকে অবশেষে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। কোন ধর্মই এটাকে স্বীকার করে না এবং আধুনিক বিজ্ঞানও এই তত্ত্বকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছে। ধর্ম বলছে যে, অনন্ত একটি শক্তি আছে, যে শক্তি মহত্তম এবং বৃহত্তম। এই শক্তির সঙ্গে আর কোন শক্তির তুলনা চলে না। এই শক্তিই হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির উৎস। আধুনিক বিজ্ঞানও বলছে যে, সীমাহীন অনন্ত শূন্যের মধ্যে যে বিস্ময়কর পরিকল্পনা রয়েছে, তার পিছনে একটি একক শৃঙ্খলা বিদ্যমান। আইনস্টাইন এঁকে শৃঙ্খলা বলছেন, আমরা এঁকে বলি পরমপুরুষ ভগবান, আল্লাহ্ অথবা God। ডারউইনের তত্ত্ব এখন বৈজ্ঞানিকরা অস্বীকার করেছেন, তার কারণ হলো মানুষ যদি বানর থেকেই এসে থাকবে তাহলে বানর এবং মানুষের মধ্যে স্মৃতিগত মৌলিক পার্থক্য কেন রয়েছে? একজন মানুষকে কোন কিছু শেখালে সে অন্য মানুষকেও শেখাতে পারে। অর্থাৎ সে তার গুণাবলী অন্যের মধ্যেও সংক্রামিত করতে পারে। কেননা, মানুষের জাতিগত একটা স্মৃতি আছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে এই স্মৃতিকে ধারণ এবং বহন করে চলেছে। এর ফলে তার মধ্যে এক বিশেষ ধরনের চৈতন্য আছে যে চৈতন্যের সাহায্যে সে সৃষ্টির রহস্যের তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতে চায়। একটি বানর কখনো তা পারে না। একটি শিম্পাঞ্জীকে আমরা এতটা শিক্ষিত করত পারি যে, সে একটি গাড়িও চালাতে পারবে কিন্তু সে অন্য একটি শিম্পাঞ্জীকে শিখাতে পারবে

না। তার জাতিগত কোন স্মৃতি নেই এবং যে জ্ঞান সে লাভ করে সেটা এককভাবেই লাভ করে, অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারে না। আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা ডারউইনের তত্ত্বকে অস্বীকার করছেন এবং মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের মূলে যে ঐশী শক্তি কার্যকর আছে তাঁকে উড়িয়ে দিতে সক্ষম হচ্ছেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনী আলোচনা করলে আমরা সৃষ্টির রহস্যের সন্ধান পাই। তিনি লৌকিক জীবনে বিভিন্ন উপমা বা রূপকের সাহায্যে অলৌকিককে আমাদের বোধের আয়ত্তে এনে দিয়েছেন। তিনি ব্যাকুলতা সম্পর্কে একজন শিষ্যকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন: "ব্যাকুলতা চাই। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্যও গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেমন করে ভগবানকে পাব? গুরু বললেন,—আমার সঙ্গে এস,—এই বলে একটি পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পর জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন,—জলের ভেতর তোমার কি রকম লাগছিল? শিষ্য বললে, —প্রাণ আটুবাটু করছিল, যেন প্রাণ যায় যায়। গুরু বললেন,—দেখ, ভগবানের জন্য যদি তোমার এই প্রাণ যায় যায় করে তাহলে তাকে লাভ করবে।" অন্যত্র তিনি বলছেন: "ভগবানের সাক্ষাৎ চাও? প্রেমে উন্মাদ হও, তাহলে সর্বভূতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটবে। গোপীরা সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। সবকিছু কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল —আমরাই কৃষ্ণ। তখন তাদের উন্মাদ উন্মাদ অবস্থা। গাছ দেখে বলে এরা তপস্বী, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছে। তৃণ দেখে বলে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ অমৃত সাগরে যাবার পথের কথা বলেছেন। অমৃত আস্বাদন করে অমরত্ব লাভের কথা বলেছেন। লৌকিক অর্থে অমরত্ব লাভ নয়, যথার্থ যোগের অর্থে অমরত্ব লাভ। তাই তিনি বলেছেন,—এ পৃথিবীতে মানুষের পথ তো অনন্ত, এসব পথের মধ্যে জ্ঞান আছে, কর্ম আছে, ভক্তি আছে। যে-পথ দিয়েই মানুষ চলুক, যদি তার পথযাত্রা আন্তরিক হয়, তাহলে সে অবশ্যই ঈশ্বরকে পাবে। এভাবেই আমরা দেখি যে, যোগ তিন প্রকারের—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। জ্ঞানী পরমসত্যকে জানতে চায় 'নেতি', 'নেতি' বিচার করে, সৎ এবং অসৎ বিচার করে। এই বিচারের শেষ যেখানে হয় সেখানেই সমাধি হয় এবং তখনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। বিখ্যাত পারসীক কবি মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর গৃহে গ্রন্থ পরিবৃত হয়ে বাস করতেন। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি সমস্ত জ্ঞানের অধিকার পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর গুরু শামস্ তব্রেজ তাঁকে বললেন: "তুমি তোমার পার্থিব জ্ঞানকে যেদিন অস্বীকার করতে সক্ষম হবে সেদিনই অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী তুমি হতে পারবে। জ্ঞানের অহমিকা তোমাকে ক্ষুদ্র করেছে, সংকীর্ণ করেছে। পৃথিবীর জ্ঞানকে যেদিন তুমি মিথ্যা করতে পারবে, সেদিনই তোমার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হবে।" এটা জ্ঞানযোগের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ এই জ্ঞানযোগের কথাই বলেছিলেন।

গীতায় আছে—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' (২।৪৭)। অর্থাৎ কর্মের ওপর তোমার অধিকার আছে, ফললাভের আকাঙ্ক্ষা তোমার জন্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ একথাই খুব সহজ সাধারণ ভাষায় বুঝিয়েছেন: "কর্ম দ্বারা ঈশ্বরকে মনে রাখ। তুমি যদি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ কর, তাঁতে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম কর সেটাই তোমার কর্মযোগ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য ভক্তিযোগই সবচেয়ে সহজ পথ। যে কিছু বোঝে না, কিছু জানে না, তার যদি ভক্তি থাকে, তাহলে ভক্তিতে সে পার পাবে। ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তন করে তাঁকে মনে রাখ। কলিযুগে ভক্তিযোগই তোমার জন্য সহজ পথ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। সব পথেই ঈশ্বরের পথে যাওয়া যায়। কিন্তু ভক্তিযোগই হচ্ছে সহজ পথ।

ঠিক একই কথা হযরত মুহম্মদ (দঃ) বলেছিলেন: "তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহলেই তোমার মুক্তি আসবে।" এই বিশ্বাসের মূলে আছে ভক্তি এবং নিবেদিত চিত্ততা। যথার্থ মুসলমান সে, যে নিজেকে পূর্ণভাবে পরমসত্তার কাছে নিবেদন করতে সক্ষম হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"কোনরকমে তাঁর উপর যদি ভক্তি হলো, তাহলেই তো হলো। নানা খবরে কাজ কি? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয় তাহলেই হলো। ভালবাসা হলেই তাঁকে লাভ করা যাবে। তারপর যদি দরকার হয়, তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন, সব পথের খবর দেবেন। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলেই হলো, নানা বিচারের দরকার নেই। আম খেতে এসেছ, আম খাও,—কত ডাল, কত পাতা—এসবের হিসাবের দরকার নেই। হনুমানের ভাব—আমি বার-তিথি-নক্ষত্র জানি না—এক রাম চিন্তা করি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সামনে অনন্তের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন, এক বিপুল চিন্ময়কে আমাদের আয়ত্তে এনে দিয়েছিলেন। আজকের দিনে এই সমস্যা-সঙ্কুল পৃথিবীতে তাঁর কথা আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য।* □

* উদ্দীপন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃঃ ২৯-৩২; প্রকাশ-স্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ।

সিঁথি বেণী পাল উদ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ বেদী

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ (হাওড়া)

আবেদন

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাক্ষেত্র উত্তর কলকাতায় সিঁথি বেণী পালের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদী ও তৎসংলগ্ন ২ কাঠা ৬ ছটাক জমি ঐ এলাকার ভক্তমণ্ডলীর আবেদনক্রমে বেলুড় মঠ নিঃশর্ত দানরূপে গ্রহণ করেছেন। গত ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ থেকে বেদী-প্রাঙ্গণে (১৩সি, সমর সরণী, কলিকাতা-৫০) প্রতি ইংরেজী মাসের দ্বিতীয় শনিবার ও তৃতীয় রবিবার বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণ ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করছেন। এর জন্য বেদীতে সাময়িক আচ্ছাদন (প্যাণ্ডেল) নির্মাণ ও আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগীদের একটি রেজিস্টার্ড সংস্থা "সিঁথি বেণী পাল উদ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজ" সহায়তা করছেন।

সম্প্রতি মঠ কর্তৃপক্ষ বেণী পালের বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাগমনের স্মৃতি রক্ষার্থে এই জমির ওপর একটি দ্বিতল পাকাগৃহের প্ল্যান অনুমোদন করেছেন। প্রস্তাবিত গৃহটি নির্মিত হলে এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শ অনুধ্যান ও প্রচারের একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা হবে।

প্রস্তাবিত স্মৃতি-ভবন নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করতে আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এজন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগী ভক্তমণ্ডলী এবং সহৃদয় জনসাধারণের নিকট অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। চেক / ড্রাফট "রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়"—এই নামে লিখে এবং মনিঅর্ডার নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাবেন:

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া, পিন-৭১১২০২ অথবা

(২) সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বরাহনগর, কলিকাতা-৭০০ ০৩৬।

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী রামকৃষ্ণ মঠে প্রদত্ত সমস্ত অনুদান আয়করমুক্ত গণ্য হবে।

স্বামী গহনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া

১৩. ১০. ১৯৯১

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংস

রমেশচন্দ্র মজুমদার

ভারতবর্ষের ধর্ম-জীবনের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী একটি বিশিষ্ট যুগ। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, কোন দেশেই ধর্ম, সভ্যতা, কৃষ্টি প্রভৃতির বিবর্তন ঠিক কালের মাপে হয় না। হয়তো পাঁচশত বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না, কিন্তু পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যেই প্রাচীন ভাবের ধারা আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল। অনুসন্ধান করিলে অনেক স্থলেই এইরূপ গুরুতর পরিবর্তনের মূলে কোন বিশেষ কারণ লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমুদয় কারণে আমাদের দেশে ও সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মুখ্য কারণ পাশ্চাত্য জাতির সহিত পরিচয়। ইহার ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রেও যেমন, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রেও তেমনিই গুরুতর পরিববর্তনের সূচনা হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ধর্মজীবনে আমাদের চিন্তার ধারা ছিল অনেকটা ইউরোপের মধ্যযুগের অনুযায়ী। অর্থাৎ সংস্কার, প্রথা ও শাস্ত্রবাক্য স্বাধীন চিন্তার বিকাশ রুদ্ধ করিয়াছিল। যাহা কিছু প্রাচীন এবং প্রচলিত তাহাকেই নির্বিচারে গ্রহণ করা আমাদের রীতি ছিল। ধর্ম ছিল সাধারণতঃ অনুষ্ঠানমূলক অর্থাৎ নানা প্রকার পূজা ব্রত আচার নিয়মপালনই সাধারণ লোকের নিকট একমাত্র ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। চিরাগত সংস্কার আমাদিগকে এমনই অন্ধ করিয়াছিল যে, সাধারণতঃ যে সমুদয় নৈতিক নিয়মাবলী ও সদ্‌গুণ ব্যবহারিক জগতে স্বীকৃত হয় ধর্মের নামে তাহা উপেক্ষিত ও পদদলিত করিতে কাহারও বিবেক অথবা মনুষ্যত্বে কোনরূপ আঘাত লাগিত না। আমরা মুখে বেদ উপনিষদ্ স্মৃতির দোহাই দিতাম এবং প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের বংশধর বলিয়া গৌরব করিতাম কিন্তু কার্যতঃ প্রাচীন শাস্ত্রের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞানের পরিবর্তে অর্থহীন আচার ও অনুষ্ঠানই আমাদের নিকট ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

পাশ্চাত্য দেশের সংস্পর্শে বৈজ্ঞানিক যুগের প্রভাব প্রথম আমাদিগকে স্পর্শ করে। জড়বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, আমাদের দেশে সুযোগ ও সুবিধার অভাবে প্রথমতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু যে মনোভাবের উপর সমগ্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত তাহাই আমাদের দেশে ধর্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত করে। প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাস বিনা বিচারে না মানিয়া লইয়া স্বাধীন চিন্তা ও পরীক্ষা দ্বারা তাহার সত্যাসত্য নির্ধারণ ও নূতন তথ্য আবিষ্কার ইহাই বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। জড় জগতে ও অন্তর্জগতে, উভয় ক্ষেত্রেই এই নূতন প্রণালীতে সত্য অন্বেষণের চেষ্টা বৈজ্ঞানিক যুগের লক্ষণ। ইউরোপীয় জাতির সংস্পর্শে আসিয়া এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা প্রথম এই মনোভাব লাভ করি। প্রচলিত সংস্কারের পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তার পরিচালনা করা এই নূতন শিক্ষার প্রথম দান।

এই শিক্ষার প্রথম ও প্রকৃষ্ট ফল রাজা রামমোহন রায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি এই নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া হিন্দুর ধর্মজীবন অনুশীলন করেন। তিনিই প্রথম প্রচার করেন যে, যাহা কিছু প্রচলিত তাহাই অন্ধভাবে অনুকরণ না করিয়া হিন্দুর প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়া প্রকৃত ধর্মতথ্য উদ্ধার করিতে হইবে। যাহা কিছু এই

প্রাচীন বেদ-উপনিষদের বিরোধী, তাহা পরিবর্জন করিয়া ধর্মের সংস্কার করিতে হইবে।

ধর্মজগতে স্বাধীন চিন্তার অধিকার এবং বেদ-উপনিষদ্‌কেই হিন্দুধর্মের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ—ইহাই রামমোহনের দান। তাঁহার মতবাদের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়া উঠে তাহাও প্রধানতঃ এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। রামমোহনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজ্ঞান ও আচার্য কেশবচন্দ্রের অপূর্ব ধর্ম-উন্মাদনা—এই তিনটি মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রভাবান্বিত করিয়া তোলে এবং বঙ্গদেশে তখন শিক্ষিত ব্যক্তির অধিকাংশই প্রকাশ্যে অথবা পরোক্ষে এই নূতন ধর্মমতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছিলেন।

হিন্দুধর্মে যাঁহারা আস্থাশীল ছিলেন তাঁহারাও এই নূতন শিক্ষার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। স্বাধীন চিন্তা দ্বারা ধর্মসংস্কার—এই মত তাঁহারাও হয়তো ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিতেন, কিন্তু দুইটি বিষয়ে রামমোহনের প্রচারিত ধর্মমত ও ব্রাহ্মসমাজের সহিত হিন্দুসমাজের মূলতঃ বিরোধ ছিল এবং ইহার ফলে এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় কখনও সম্ভবপর ছিল না।

রাজা রামমোহন বেদ ও উপনিষদ্‌কেই হিন্দুধর্মের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপনিষদের পরবর্তী যুগে প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া এই ধর্মের যে পরিবর্তন হইয়াছিল তাহাকে তিনি অবনতির চিহ্ন বলিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্জন করিয়াছিলেন। শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি উপাসক-সম্প্রদায়, পৌরাণিক যুগের পূজা-পদ্ধতি, মধ্যযুগের ভক্তিবাদ —এ সমুদয়কে একেবারে উড়াইয়া দিয়া কেবলমাত্র উপনিষদের ব্রহ্মোপাসনা ও অধ্যাত্মজ্ঞানের উপর তিনি নূতন হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের যে সমুদয় আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির ফলে এবং তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির যে অভাবমোচনের জন্য উপনিষদের পরবর্তী যুগে এই সমুদয় ধর্ম-বিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা গত দুই সহস্র বৎসর অব্যাহতভাবেই বর্তমান আছে। সুতরাং এই সমুদয় একেবারে উপেক্ষা করিয়া সে ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা বিরাট হিন্দুসমাজ যে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। সাধারণ হিন্দু ইহাকে হিন্দুধর্মের সংস্কার না বলিয়া হিন্দুধর্মের সংহার মনে করিবে ইহা কিছু বিচিত্র নহে।

তারপর ব্রাহ্মসমাজ আর একদিক দিয়া হিন্দুধর্মের সংস্কারের পরিপন্থী হইল। রাজা রামমোহন কেবল অধ্যাত্ম অথবা ধর্মজ্ঞানের সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ইহার সহিত সমাজসংস্কার যোগ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম-বিশ্বাসে যাহাদের সহানুভূতি ছিল, ইহার সামাজিক সংস্কার তাহাদিগকে বিমুখ করিয়া দিল। প্রচলিত দেব-দেবীর পূজার পরিবর্তে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা, ইহা অনেক শিক্ষিত লোকের নিকট আদৃত হইত, কিন্তু এই ভগবানের উপাসনা করিতে হইলেই যদি সমাজ পরিবার ত্যাগ করিয়া একেবারে পূর্বজীবন পরিহার করিতে হয় তাহা হইলে ইহার আকর্ষণও কমিয়া যায়। রাজা রামমোহনের পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যদি কেবল হিন্দুর অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষেই মনোনিবেশ করিতেন, তবে এই বিষয়ে ফল বেশি হইত এবং ক্রমে সামাজিক সংস্কারও সহজ হইত। কিন্তু তাহা হইল না, ব্রাহ্মসমাজ উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ হিন্দুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন কিন্তু যে অতিরিক্ত মূল্য দিয়া ইহার গণ্ডির ভিতর প্রবেশ করিতে হইত অনেকেই তাহা দিতে পারিত না।

সাধারণতঃ উল্লিখিত দুইটি কারণে হিন্দুধর্মের সংস্কার বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একদিকে খ্রীস্টধর্মের আর একদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিলেন। ইহাতে হিন্দুসমাজ শক্তিহীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল কিন্তু ইহার উন্নতির বিশেষ কোন পন্থা আবিষ্কার হইল না। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রভাবে হিন্দুধর্মের যে উন্নতির সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল তাহা কার্যে পরিণত হইল না।

হিন্দুসমাজের এই সন্ধিক্ষণে রামকৃষ্ণ পরমহংসের উদয়। তাঁহার অপূর্ব অধ্যাত্মজীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দু নূতন জীবন লাভ করিল এবং বিরাট হিন্দুধর্মের সংস্কারের পথ প্রশস্ত হইল।

বেদের পরবর্তী যুগে হিন্দুধর্মে যে শিব বিষ্ণু কৃষ্ণ কালী প্রভৃতির উপাসনা ও পূজা—যাহা এখন হিন্দুধর্ম নামে সাধারণতঃ প্রচলিত—ইহা একেবারে উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী—ইহাই ছিল রামমোহন ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক ভারতবাসীর মত। ইহা লইয়াই যত বাদ বিতর্ক এবং ইহার কোন সুমীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও সংস্কারের পথ নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। ভগবান রামকৃষ্ণ বাদবিতণ্ডার পথ ত্যাগ করিয়া নিজের জীবনের সাধনা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, এই সমুদয় পূজা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াও উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক মতের প্রভাবে আমরা বর্তমান যুগে প্রাচীন কাহিনী বা প্রচলিত বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক—একমাত্র পরীক্ষিত সত্য ছাড়া আমরা আর কিছু গ্রহণ করিতে রাজি নই। রামকৃষ্ণ নিজের সাধনা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক ও উপনিষদ প্রচারিত ধর্মের ন্যায় পৌরাণিক যুগের প্রচলিত ধর্মও উচ্চ অধ্যাত্ম-জ্ঞানের সহায়। এই পরীক্ষিত সত্যের উপরই বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠালাভ ও সংস্কার সম্ভব হইয়াছে ও ভবিষ্যতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বর্তমান হিন্দুসমাজের অনেক বিষয়ে সংস্কারের পক্ষপাতি, কিন্তু তাঁহারা ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারকে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ করেন নাই। তাঁহারা একটি সংকীর্ণ সমাজ গড়িয়া ধর্মসংস্কারের গণ্ডি তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেন নাই। রামকৃষ্ণ মঠে জাতি-ভেদ নাই—কিন্তু হিন্দুসমাজে যাঁহারা জাতিভেদ মানেন তাঁহারাও রামকৃষ্ণ প্রচারিত ধর্মমতের সম্পূর্ণ অধিকারী এবং মঠের সর্ববিধ কার্যে যোগদান করিতে পারেন। রামকৃষ্ণের ভক্ত ও শিষ্যেরা ধর্মমত প্রচার করেন, কিন্তু একথা বলেন না যে, তাঁহাদের ধর্মমত গ্রহণের পূর্বে জাতিভেদ বর্জন ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে ধর্ম ও সমাজকে পৃথক রাখিয়া তাঁহারা ধর্মের সংস্কার ও অধ্যাত্মজীবনের উন্নতির পথ সরল ও সুগম করিয়াছেন।

বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্থান কোথায় এবং তিনি হিন্দুধর্মের জন্য কি করিয়াছেন উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু সকলের উপর তাঁহার বড় দান এই যে, আজকালকার জড়বাদের যুগে তিনি অধ্যাত্মজ্ঞানের উচ্চ আদর্শ জীবন্তভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ঐহিক সম্পদ ও বৈভবের ঊর্ধ্বে যে মনুষ্যের চরম ও পরম কামনার জিনিস আছে, মানুষের আত্মা যে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তির প্রয়াসী এবং মুক্তিই যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সাধনা—এই চিরন্তন সত্যের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ঋষিগণের চরণরজঃ পূত এই ভারতভূমি অধ্যাত্মজ্ঞানের উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া অন্ধ জড়বাদের মোহে নিপতিত হইয়াছিল। শুদ্ধাত্মা অখণ্ড সাত্ত্বিকতার আধার রামকৃষ্ণ এই নবযুগের ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার উদাত্ত গম্ভীরস্বরে আমাদিগকে ভারতের সেই প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ, সাধনার প্রকৃষ্ট উপায়, সাংসারিক জীবনের সহিত উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনার সমন্বয় এই সমুদয় গূঢ়তত্ত্ব সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের নিকট বিবৃত করিয়া তিনি আমাদিগকে উচ্চতর এক নূতন জগতের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি পণ্ডিত বা দার্শনিক ছিলেন না কিন্তু সাধনার বলে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার উপলব্ধিজাত সহজ সত্য তিনি সহজ কথায় আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিয়াছেন। অমৃতের অধিকারী আমরা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা কালক্রমে পিতৃপুরুষের অমৃতভাণ্ড হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম অথবা অমৃত হারাইয়া কেবল শূন্যভাণ্ড লইয়া কোলাহল করিতে-ছিলাম। তিনি সেই অমৃত আহরণ করিয়া আবার আমাদের ভাণ্ড পূরণ করিয়া দিয়াছেন। উপনিষদ্ ও বেদান্তের উচ্চ আদর্শ কিরূপে সহজ জীবনযাত্রার পথে অনুসরণ করা যায় তিনি আমাদিগকে তাহা শিখাইয়াছেন। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও কিরূপে উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শে জীবন অনুপ্রাণিত করিয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে পৌঁছাইতে পারা যায় তাঁহার জীবন-কথা ও অপূর্ব সরল উপদেশ-বাক্য হইতে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। ঐহিক সুখ-সর্বস্ব যুগে ভোগ-লালসায় মত্ত, তামসিক আদর্শে অনুপ্রাণিত অন্ধ নরনারীর সম্মুখে যিনি

এই নূতন সাত্ত্বিক জীবনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন তাঁহার জন্মের শতবর্ষ-পূর্ণ দিনে আমরা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

কিন্তু কেবল হিন্দুর দিক হইতে রামকৃষ্ণকে বিচার করিলে তাঁহাকে খাটো করা হইবে। তিনি বর্তমান যুগে ধর্মসমন্বয়ের যে অপূর্ব আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাই এই যুগের একমাত্র আদর্শ। ধর্মের সহিত ধর্মের বিরোধে আজ পৃথিবীর আকাশ বাতাস কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে—ধর্মের নামে হিংসা দ্বেষ অত্যাচার আজ বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলনের অন্তরায় হইয়া সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, যে-ধর্ম মনুষ্যকে উচ্চতর আদর্শের সন্ধান দিবে তাহাই আজ তাহাকে ঘোরতর তামসিক পশুতে পরিণত করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিনে তিনি, সমুদয় ধর্মের মূলেই যে সত্য আছে, সমুদয় ধর্মমতই যে সেই একই গন্তব্য-স্থানে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ—এই মহৎ উদার বাণী ঘোষণা করিয়া বিভিন্ন ধর্মের মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। সমুদয় মনুষ্য সেই বিরাট পুরুষেরই অংশ, সুতরাং মূলতঃ তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই—বেদান্তের এই সারসত্য প্রচার করিয়া তিনি বিশ্বমানবের মধ্যে মৈত্রী ও প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপনা করিয়াছেন। পরস্পর যুদ্ধকলহে ক্রমশঃ ক্ষয়শীল আত্মঘাতী মানবজাতির সম্মুখে তিনি যে বিরাট আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন অদূরে ভবিষ্যতে তাহাই মানবের রক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ হইবে। সর্বত্র এই মহান আদর্শ প্রচারিত হইলে জগতে আবার শান্তি স্থাপিত হইবে। জয় ভগবান রামকৃষ্ণের জয়।* □

* উদ্বোধন, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৪২, পৃঃ ২৭৫-২৭৮

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির (মাঝে)। পিছনে—বিষ্ণুমন্দির/গোবিন্দজীর মন্দির/রাধাকান্ত-মন্দির। সামনে—কালীমন্দিরের নাটমন্দির ; এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মথুরবাবুকে অনুরোধ করে পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় তিনি বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সমকালীন অগ্রগণ্য সাধক ও পণ্ডিতদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। বিচারসভায় সমবেত সাধক ও পণ্ডিতবর্গ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধাত শিরোধার্য করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দিরের (দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছবি অবশ্য প্রচ্ছদে নেই।) অবস্থান বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু হিন্দুদের দিক থেকেই নয়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের দিক থেকেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি তাৎপর্য রয়েছে। মন্দিরের জমির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, বাকি অংশের অনেকটা জুড়ে ছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী সাহেবের পীরের দরগা। এই যোগাযোগ যেন দৈবনির্দিষ্ট। কারণ, এই ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে যুগাবতার মহাসমন্বয়ের উদার বাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। এই বাণীই আজ শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে। দেশ ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মত ও পথের অসহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে এই বক্তব্যই আমরা তুলে ধরতে চাইছি।—**যুগ্ম সম্পাদক**

স্মৃতিকথা

আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছি

রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য

১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ আগস্ট প্রায় ১০০ বছর বয়সে লোকান্তরিত পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য ভক্তিতীর্থের এই স্মৃতিকথাটি শ্রুতিলিখিত হয় ১২ জুলাই ১৯৭৪। ৫৬।৪ গ্রে স্ট্রীট (অরবিন্দ সরণি), কলকাতা-৬ ঠিকানায় তিনি থাকতেন। তখন তাঁর বয়স ৯৮ বছর (তাঁর জন্ম : অক্টোবর ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে)। বাল্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে একবার দেখেছিলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন চুরাশি বছর তখন সংস্কৃত ভাষায় পাঁচ হাজারেরও বেশি শ্লোকে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কাব্যজীবনী তিনি লেখেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বপ্নাদেশ ছিল এই রচনার প্রেরণা, তিনি বলতেন। ষাটের দশকে প্রকাশিত কাব্যজীবনীটির নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতম্'।

তাঁর বাবা যদুনাথ সার্বভৌম কৃত্যতত্ত্ববিশারদ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের পূর্বপুরুষগণও সংস্কৃতের দিক্‌পাল পণ্ডিত ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য ছিলেন কলকাতার হাতিবাগান চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা (প্রতিষ্ঠা : ১৯১৬ খ্রীঃ) ও প্রধান অধ্যাপক। প্রায় ষাট বছর ধরে ঐ চতুষ্পাঠীতে তিনি দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকারের 'বেস্ট টীচার' সম্মানে তিনি ভূষিত হন। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা জানেন প্রায় ১০০ বছর বয়সেও তাঁর মস্তিষ্ক কতখানি সক্রিয় ছিল, মানসিকভাবে তিনি কতখানি সজীব ছিলেন, শারীরিক দিক থেকেও বয়সের তুলনায় ছিলেন কতখানি সমর্থ। সংগৃহীত স্মৃতিকথাটির অংশ-বিশেষ এখানে প্রকাশিত হলো। স্মৃতিকথাটি প্রকাশের ব্যাপারে আমরা রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্যের পৌত্র রামগোবিন্দ ভট্টাচার্যের নিকট কৃতজ্ঞ।—যুগ্ম সম্পাদক

আমার যখন আট বছর বয়স তখন একদিন আমার বাবার সঙ্গে রানী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে গিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে দিনটি ছিল গ্রীষ্মকালের এক সকাল। আমাদের বাড়ি মেদিনীপুর জেলার বগড়ী কৃষ্ণনগর মৌজার খুনবেড়িয়া গ্রামে। সেখান থেকে কামারপুকুরের দূরত্ব মাইল বিশেক। আমার বাবা ঠাকুরের সমবয়সী ছিলেন, অল্প বয়স থেকেই পরস্পর পরস্পরকে চিনতেন। দুজনের মধ্যে বিশেষ সখ্যতা ছিল। বাবা বছরে ২।৩ বার থাকতেন কলকাতায়। দেশ থেকে এসে এবং দেশে ফেরার আগে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে একবার দেখা করতেনই। দেশে যাবার আগে কামারপুকুরে কোন সংবাদ দেবার থাকলে তিনি ঠাকুরের কাছে জেনে যেতেন এবং ঠাকুর কেমন আছেন সেই সংবাদও নিয়ে যেতেন। দেশ থেকে কলকাতায় এলে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে কামারপুকুরের সংবাদাদি তাঁকে দিতেন। সেবার বাবা দেশে যাবেন। যাবার আগে বাবা একদিন আমাকে বললেন : "চল তোকে আজ এক জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে মা কালীর বিখ্যাত মন্দির দেখবি, আর দেখবি জীবন্ত ভগবানকে।"

মন্দিরে মা ভবতারিণীকে প্রণাম করার পর বাবা আমাকে ঠাকুরের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঠাকুর তখন ঘরে ছিলেন না। একজন যুবক (তিনি ঠাকুরের কোন শিষ্য হতে পারেন অথবা তাঁর ভাইপো রামলালও হতে পারেন) বললেন, ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে আছেন। বাবার সঙ্গে গেলাম পঞ্চবটীর দিকে। ঠাকুর পঞ্চবটীর সামনে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দর্শন করছিলেন বোধহয়, সঙ্গে দু-একজন যুবক ভক্তও ছিলেন। বাবাকে দেখে ঠাকুর খুব খুশি হয়ে বাবার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বাবাও করলেন। দেখলাম, বাবা ধুলোর ওপরেই ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর পদ-ধূলি মাথায় নিলেন এবং আমার মাথাতেও তাঁর পদধূলি দিলেন ; আমাকে বললেন : "তোকে যে বলেছিলাম 'জীবন্ত ভগবান দেখাব'—এই তিনি —তোর সামনে! ওঁর পদস্পর্শ করে ধন্য হ।" এই কথা বলে তিনি নিজেই আমার মাথাটি ঠাকুরের চরণপ্রান্তে স্পর্শ করালেন। আমি

সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরকে প্রণিপাত করলাম। ঠাকুর তাঁর পদ্মহস্ত আমার মাথায় রেখে বললেন ঃ "ওঠ, বাবা ওঠ।" আমি উঠে দাঁড়ালে বললেন ঃ "তুই দীর্ঘজীবী হবি ও পণ্ডিত হবি।" ঠাকুরের পায়ে মাথা রাখা এবং তারপর তাঁর হাত আমার মাথায় রাখার সময় যেন আমি আর আমার মধ্যে ছিলাম না। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। যখন তিনি আমার উদ্দেশে তাঁর আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন তখনো আমি স্বাভাবিক নই, মুহূর্তের জন্য আমার বাহ্যসংজ্ঞা লোপ পেয়েছিল ; কিন্তু আমার কানে তাঁর কথা প্রবেশ করছিল। বেশ কয়েক মুহূর্ত ধরে তাঁর কথাগুলি আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকটি কথা বলে বাবা কলকাতায় ফিরলেন। সেই আমার তাঁকে প্রথম এবং শেষ দর্শন। যদিও বয়স তখন আমার খুবই কম, মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু ঠাকুরের চেহারা আমার চোখে যেন আজও ভাসছে। দীর্ঘদেহ, সুঠাম চেহারা। সৌম্য কান্তি, প্রসন্ন হাস্যে উজ্জ্বল মুখ। গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা নয়, তবে ফরসাই। যৌবনে ঠাকুরের গায়ের রঙ অত্যন্ত ফরসা ছিল বাবার কাছে শুনেছি। বাবা বলতেন ঃ "সোনার মতো গায়ের রঙ ছিল ঠাকুরের। সাধনকালে ভয়াবহ কঠোরতায় দেহ শীর্ণ হয়ে যায় এবং গাত্রবর্ণের উজ্জ্বলতাও হ্রাস পায়।"

শত শত জন্মের বহু সুকৃতি ও পুণ্যের ফলে একদিন একবারই মাত্র তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেছি। কিন্তু তাতেই আমি ধন্যাতিধন্য হয়ে গিয়েছি। ঐ দর্শনের বছর আড়াই পর এক-রাত্রে স্বপ্নে আমার সেই প্রথম-দেখা মূর্তিতে ঠাকুর আমাকে দর্শন দিয়ে বললেন ঃ "ওরে ছেলে, ভাল আছিস তো ? আমি চললাম।" শুনে আমি শিউরে উঠলাম। পরে জেনেছিলাম ঐ রাত্রে তাঁর মহাসমাধি লাভ হয়েছে।...

স্বামীজীকে আমি কয়েকবারই দেখেছি বিদেশ থেকে ফেরার পর। স্বামীজীর এক মাস্টার-মশাই—স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক—আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি বাঙালী, কিন্তু খ্রীস্টান। স্বামীজীকে খুবই ভালবাসতেন। স্বামীজী সম্পর্কে তাঁর খুব উঁচু ধারণা ছিল। তিনি যখন শুনলেন তাঁর কলেজের মহা প্রতিভা-বান ছাত্রটি এক পৌত্তলিক পূজারী ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব নিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছে, তখন খুবই হতাশ হয়েছিলেন। পরে স্বামীজী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে একবার গিয়েছিলেন। তিনি কাছাকাছিই থাকতেন। স্বামীজী তখনো নরেন্দ্রনাথ—বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ হননি, তবে সন্ন্যাস নিয়েছেন। মাস্টারমশাই স্বামীজীকে বললেন ঃ "আচ্ছা নরেন, তুমি এ কী করলে! শেষ পর্যন্ত এক পাগলা পুরুতঠাকুরের কাছে মাথা মুড়োলে! আবার শুনি তুমি নাকি মনে কর যে, তোমাদের ঐ পুরুতঠাকুর নাকি ভগবান —জগতের পরিত্রাতারূপে মানুষ হয়ে এসেছেন ? এসব গাঁজাখুরি গালগল্পে তুমিও বিশ্বাস করলে ?" স্বামীজী শান্তভাবে বললেন ঃ "মাস্টার-মশাই, আপনি ঠিকই শুনেছেন, আমি তাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর বলেই বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি, জগৎকে পরিত্রাণ করার জন্য মানুষরূপে তিনি দেহধারণ করেছেন। আপনার মতো আমিও আগে এসমস্তকে গাঁজাখুরি গালগল্পই মনে করতাম। তাঁকেও ঐ কথা কতবার বলেছি সরাসরি। তিনি ছিলেন শিশু—আমার কথা শুনে তিনি শিশুর মতো হাসতেন, আর বলতেন—'তোকে কি আমি বিশ্বাস করতে বলছি ?' কিন্তু আমাকে যে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতেই হলো, মাস্টারমশাই। তিনি যে আমাকে দেখিয়ে দিলেন একদিন যে, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর ঐ রামকৃষ্ণ-শরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই রামকৃষ্ণ হয়ে এবার আবির্ভূত হয়েছেন। একবার রাম রূপ, একবার কৃষ্ণ রূপ পৃথক পৃথক ভাবে তিনি আমাকে দেখিয়েছেন, তারপর তাঁরা দুজনে রামকৃষ্ণ-শরীরে মিলে গেলেন—সেভাবেও দেখিয়েছেন। সে-দেখা hallucination নয়—সাদা চোখেই দেখা। শুধু ঐভাবেই নয়, আরও নানা ভাবে আমি বুঝেছি, আমি জেনেছি, আমি দেখেছি যে, তিনিই স্বয়ং ভগবান।" স্বামীজীর ঐ মাস্টারমশায়ের নিজের মুখেই আমি একথা শুনেছি। তিনি বলেছিলেন ঃ

"নরেনকে ভালভাবেই আমি জানতাম, জানতাম ভেলকিবাজিতে ভুলবার পাত্র নয় সে মোটেই। সেদিন বুঝেছিলাম, অন্ধ ভক্তি থেকে রামকৃষ্ণকে সে ভগবান বলে বিশ্বাস করেনি। তার পরবর্তী জীবনের ঘটনাতে তো দেখাই গেল রামকৃষ্ণ সাধারণ ছিলেন না।..."

স্বপ্নে ঠাকুর আমাকে সংস্কৃতে তাঁর কাব্যজীবনী লিখতে আদেশ করেন। একবার নয়, একাধিকবার। প্রথমে সেই স্বপ্নাদেশকে আমি নিছক স্বপ্নই ভেবেছি। কিন্তু পরে আমার বয়স যখন ৮০ ছাড়িয়েছে তখন আবার আমাকে ঠাকুর স্বপ্নে দর্শন দান করেন এবং তাঁর সংস্কৃত জীবনী লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আমি তাঁকে আমার বয়স ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা বলি; কিন্তু তিনি বললেন: "তোর কোন চিন্তা নেই। তুই লিখতে শুরু কর।" এসব কথা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি যে স্বপ্নে একাধিকবার তাঁর নির্দেশ পেয়েছি এবং চুরাশি বছর বয়সে তাঁর চরিতকাব্য লিখেও ফেলেছি। তাঁরই আশীর্বাদের শক্তিতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতম্' লেখা ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। তিনিই কৃপা করে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন।... আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যাপারে অর্থের জন্যও আমাকে ভাবতে হয়নি। ভারত সরকার অনুদান দিয়েছেন। এই গ্রন্থ বহু সুধীজনের কাছে সমাদৃত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে যেমন ভারতের জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিখ্যাত পণ্ডিত আছেন, তেমনি আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, আছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজও। আমি প্রাণে প্রাণে বুঝেছি এবং আজও বুঝছি, রামকৃষ্ণদেব নরদেহে অবতীর্ণ ভগবান স্বয়ং। তাঁর কৃপাকণিকায় মূক হয় বাচাল, পঙ্গু হয় গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ। তাঁর অমোঘ আশীর্বাদ আমার জীবনে বর্ণে বর্ণে ফলেছে: "তুই দীর্ঘজীবী হবি ও পণ্ডিত হবি।" আমি দীর্ঘজীবী হয়েছি এবং আমি পণ্ডিত হয়েছি।

আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছি, আমি তাঁর চরণ-স্পর্শ করেছি। আমি বুঝি আর না বুঝি, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তো আমাকে দেখেছেন, আমার মস্তক স্পর্শ করেছেন। হোক না তা শুধু একটিবারই! আমি জানি একবার দৃষ্টিপাতেই, একবার স্পর্শ-দানেই তিনি আমাকে অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন।

॥ ওঁ নমো শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ ॥ □

প্রাসঙ্গিকী

হৃদয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ

অন্যান্য সংখ্যার মতো উদ্বোধনের গত পৌষ সংখ্যাটিও নানাদিক থেকে আকর্ষক হয়েছে। উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয় ('কথাপ্রসঙ্গে') 'সন্তোষের চেতন প্রতিমা' একটি অনন্য রচনা। অভয়বরদা জননী সারদার শতরূপের একটি অনুপম রূপ উক্ত রচনায় চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত রচনাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর হৃদয়ের নির্যাতনের প্রসঙ্গ এবং ক্ষমাসুন্দর মনোভাবের কথা পাঠ করে আমার মনে যে-প্রশ্ন জেগেছে, তার উত্তর জানার জন্য এই চিঠি। কয়েকদিন আগে শিহড়ে হৃদয়ের বাসভবনে গিয়ে এই প্রশ্নটি যেন আরও উতলা করল।

প্রশ্নটি হলো—কত পাপী-তাপী, ভক্ত-অনুরাগী, পুণ্যাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সাহচর্য পেয়ে ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে জন্ম সার্থক করলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এত কাছে থেকেও হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের হৃদয়ে বা মানসিকতায় কোন পরিবর্তন হয়েছিল কি?

পলাশ মিত্র

কলকাতা-৭০০ ০২৬

দীর্ঘ ২৬ বছর হৃদয়রাম শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসাবে থেকে আন্তরিকভাবে তাঁর দেখাশোনা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটতম আত্মীয় থেকে শুরু করে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ—কেউ তাঁর মতো এত

দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য পাননি। হৃদয় তাঁর 'মামা'কে যথেষ্ট ভালবাসতেন এবং তাঁর অনেক সেবাও করেছিলেন। এসব সত্ত্বেও হৃদয়রাম ছিলেন চরম বিষয়াসক্ত, অহঙ্কারী, হিংসুক, স্বেচ্ছাচারী এবং লোভী। দীর্ঘদিন ঠাকুরের সেবা করলেও হৃদয় ঠাকুরের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছেন। হৃদয়রামের চরিত্রে এই দ্বৈতরূপের উল্লেখ পাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতেও —"হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল—অনেক সেবা করেছিল। হাতে করে গু পরিষ্কার করত। তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল। এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করতে গিছিলাম।" শুধুই কি ঠাকুর? হৃদয়ের অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি শ্রীমাও। যে-মাকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং জগজ্জননী-রূপে পূজো করেছিলেন, সেই মা-ও হৃদয়ের অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণে চোখের জলে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেছিলেন। ঠাকুর এবং মা হৃদয়কে ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু কর্মফল কি হৃদয়কে ত্যাগ করেছিল? মনে হয় না। এই কর্মফলই হৃদয়ের জীবনকে বিড়ম্বিত করেছিল নানা ভাবে। শ্রীমাকে অপমান করার কয়েকমাসের মধ্যেই নিয়তির নির্দেশে হৃদয়কে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।" শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে যাঁরা ঈশ্বরলাভের পথ খুঁজেছিলেন এবং নিজেদের ঈশ্বরোপলব্ধির উপযুক্ত আধাররূপে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা তাঁদের ভাব অনুযায়ী অবশ্যই সফল হয়েছিলেন; কিন্তু হৃদয়ের ভাব ছিল ভিন্ন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান-রূপে দেখার চেয়ে 'মামা'-রূপেই দেখতে চাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে 'মামা'র চেয়েও অনেক অনেক বেশি, সে-ধারণা হৃদয়ের ছিল না। আরও একটি কথা এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চবটীতে হৃদয়ের একবার দৈবদর্শন এবং অর্ধবাহ্যদশা এসেছিল, তাতে তিনি দেখেছিলেন যে, তিনি নিজে "দিব্যদেহধারী জ্যোতির্ময় দেবানুচর, সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থেকে চিরকাল তাঁর সেবা করছেন।" কিন্তু যা ধ্যানের গভীরে অনুভব করার বিষয়, হৃদয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তা নিয়ে সোরগোল করেছিলেন। তাই "ঐরূপ দর্শন করিবার সময় হয় নাই" বিবেচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়ের ভাবকে প্রশমিত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণী হৃদয়ের কাছে অনেকটা 'বদহজম' হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি দিন ঠাকুরের সঙ্গে থেকেও হৃদয় সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি, শ্রীরামকৃষ্ণ কে এবং তাঁর সঙ্গে হৃদয়ের প্রকৃত সম্পর্কটা কি। তাই ঈশ্বরোপলব্ধির আশীর্বাদ প্রার্থনার পরিবর্তে হৃদয় ঠাকুরের কাছে নাম, অর্থ, প্রতিপত্তি, 'সিদ্ধাই' প্রার্থনা করেছিলেন। এথেকেই বোঝা যায়, হৃদয়ের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা গ্রহণের উপযুক্ত আধাররূপে নিজেকে তৈরি করতে পারেননি।

তবে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ও সান্নিধ্যের ফল কি ব্যর্থ হয়? হঠকারী নির্বুদ্ধিতার ফলে হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তা তো আমরা জানি। তারপর থেকেই তাঁর দুর্দশার শুরু। দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতা তাঁকে গ্রাস করে। এই দুঃখ-দুর্দশা কেন? তিনি নিজেই শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়েছিলেন তার উত্তর: "আপনার সঙ্গ ছাড়া, তাই দুঃখ!" জীবনের শেষপ্রান্তে একদিন আলমবাজার মঠে হৃদয়কে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ জিজ্ঞাসা করেন: "কি মুখুজ্যে, কেমন আছ?" হৃদয় বললেন: "আরে দাদা—মরে আছি! আর কি সেদিন আছে? মামা গেছেন, তার সঙ্গে আমার প্রাণও চলে গেছে। খালি দেহটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

পার্থিব বিচারে হৃদয়ের শেষ জীবন খুব দুঃখেই কেটেছে, কিন্তু শেষ বিচারে আমরা কি দেখছি না—হৃদয় তাঁর 'মামা'র মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন। সেই উপলব্ধিই তো তাঁর আসল প্রাপ্তি। এই 'atonement'-জাত উপলব্ধিই তো অধ্যাত্মজীবনের একটি প্রধান চরিতার্থতা। অনুশোচনার অগ্নিতে শুদ্ধ হয়ে হৃদয়ের সেই প্রাপ্তি ঘটেছিল। জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য, তাঁর কৃপালাভ জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। দেরিতে হলেও হৃদয়ের উপলব্ধি তাঁর মানসিক পরিবর্তনের এবং উত্তরণের ইঙ্গিতবাহী। [হৃদয়রাম সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য আমি পেয়েছি স্বামী চেতনানন্দের একটি প্রবন্ধ থেকে (দ্রঃ উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৯৩)] □

কাঞ্চনকুমার দাস
কলকাতা-৭০০ ০০৩

কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগর

সুবীর ষড়ংগী

আমাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নান করার। তা আর কোনবারই হয়ে উঠছিল না। ঈশ্বর সে-সুযোগ দু-বছর আগে (১৪ জানুয়ারি ১৯৯০) করে দিলেন। হঠাৎই যোগাযোগ হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা—হুগলী নদী জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতির সঙ্গে। ওদের চারটি লঞ্চ ছাড়বে হাওড়া স্টেশনের জেটি থেকে ১৩ জানুয়ারি সকাল ৭.৩০ মিনিটে। দুটি টিকিট বুকিং করে ফেললাম। লঞ্চ গঙ্গাসাগর পৌঁছাবে সন্ধ্যা ৬টায়। টিকিট কাটার পর থেকে একটু ভয় ভয় ছিল। এতখানি জলপথে যাত্রা আবার পরদিন জলপথেই ফেরা। রাতের খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে ঠাকুরের নাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর চারটেয় উঠে দুটো কম্বল বেঁধে নিয়ে ও একটা ঝোলা ব্যাগে টুকিটাকি কিছু গুছিয়ে নিয়ে, অল্প কিছু খেয়ে ৬টার বাস ধরে সল্ট লেক থেকে বেরিয়ে পড়লাম হাওড়ার উদ্দেশে।

৬.৪০-এ পৌঁছে গেলাম হাওড়ায়। তখন জেটি-অফিস গমগম করছে তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে। একদিকে রেডক্রস থেকে কলেরা-নিবারক টিকা দেওয়া হচ্ছে। হুগলী নদী জলপথ পরিবহন থেকে ঘন ঘন মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে—চারটি লঞ্চই ৭.৩০ মিনিটে ছাড়বে। সবাই প্রস্তুত হয়ে থাকুন। জেটির কাছে গিয়ে আমরা জমায়েত হলাম। লঞ্চ চারটির নাম—কংসাবতী, ইছামতী, তিস্তা ও তিতাস। লঞ্চগুলিকে ফুল, মালা ও রং-বেরঙের কাপড় দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। আমাদের দুজনের লঞ্চ হচ্ছে ইছামতী—হুগলী নদী জলপথ পরিবহনের ভাষায় ২ নং ভেসেল। ঠিক ৭.১৫ মিনিটে লঞ্চে উঠবার ছাড়পত্র পাওয়া গেল। সুন্দর গার্ডেন চেয়ার দিয়ে বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের সীট পড়েছে আপার ডেক-এ রেলিং-এর ধারে। আমরা গিয়ে নিজের জায়গায় বসলাম। গঙ্গাকে ছুঁয়ে সকালবেলার ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। গরম জামাকাপড় পরা আছে। সকালের শীতটা ভালই লাগছে। অন্যান্য যাত্রীরাও যে যার জায়গায় বসতে আরম্ভ করেছেন। জলপথ পরিবহনের স্বেচ্ছাসেবকরা সবাইকে সাহায্য করছেন। এদিকে মাইকে অনবরত ঘোষণাও চলছে, তাড়াতাড়ি যাত্রীদের যে যার লঞ্চে জায়গা দখল করে নেওয়ার জন্য—প্রতি লঞ্চে একশো আশি জন যাত্রী। সব যাত্রীদের লঞ্চে উঠে নিজ নিজ জায়গায় বসা একসময় শেষ হলো এবং আর এক মুহূর্তও কালবিলম্ব না করে ঠিক ৮টার সময় লঞ্চ যাত্রা শুরু করল গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে। সব যাত্রীরাই "কপিল মুনি কি জয়, গঙ্গামাঈ কি জয়" বলে শুভযাত্রা শুরু করলাম।

দেখতে দেখতে লঞ্চ গতি নিয়ে নিল। আমাদের লঞ্চ সর্বাগ্রে আছে। মাঝ গঙ্গা দিয়ে চলেছে। দুধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। দেখতে দেখতে চলেছি। ইতিমধ্যে পরিবহনের পক্ষ থেকে এক প্রস্থ চা ও বিস্কুট পরিবেশিত হলো। সঙ্গে যাঁরা যা খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন তাই দিয়ে সকলে জলযোগ শেষ করে নিলেন। এদিকে লঞ্চের মাইকে গানও চলছে। সে এক মনোরম পরিবেশ! গঙ্গাবক্ষের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছি, দুদিকের অপরূপ ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছি। দুদিকেই কারখানার সুসজ্জিত গাছ-গাছালিতে ভর্তি বাংলো দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে বাটানগর এসে গেল। আবার পরিবহন কর্তৃপক্ষ একপ্রস্থ কফি ও বিস্কুট বিতরণ করলেন। পিছনে একটু দূরেই

আসছে কংসাবতী, তিস্তা ও তিতাস। ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়া বইছে। রোদও পড়েছে লঞ্চের ডেকে। এগিয়ে চলেছি আমরা। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল বাঁদিকের পাড়ে নতুন গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক উপনগরী। গঙ্গাবক্ষ থেকে দেখতে ভারী সুন্দর লাগছিল। আরও কিছুটা এগুনোর পরে রূপনারায়ণ ও গঙ্গার সঙ্গম পাওয়া গেল। অনেকেই এই সঙ্গমস্থলে কলা, ধান, ফুল, বেলপাতা নিবেদন করলেন। আমাদের জানা ছিল না, তাই আমরা সঙ্গে কিছু আনিনি। আমরা খালি হাতেই প্রণাম করলাম। এখান থেকেই গঙ্গার প্রসারতা বাড়তে লাগল। দুকূল আস্তে আস্তে আবছা হতে আরম্ভ হয়েছে।

শুধু জল আর জল। অসীম জলরাশির মধ্যে ভেসে চলেছি। যাত্রীরা কেউ কেউ তাস খেলছেন। কেউ কেউ গল্পগুজব করছেন। সবাই একটা দল বেঁধে আছেন। যতই এগুচ্ছি নদীর প্রসারতা তত বাড়ছে। দুকূল আর দেখা যায় না। বেলা ১.৩০ মিনিটে আমরা ডায়মন্ডহারবার পেঁছালাম। এখানকার জেটিতে ১৫ মিনিটের জন্য লঞ্চ ভিড়ল। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন, আগামীকাল ফেরার সময় দুপুরের খাবার এখান থেকে নেওয়া হবে। তাই খাবারের অর্ডার দিয়েই লঞ্চ ছাড়বে। খানিকক্ষণের মধ্যে খাবারের অর্ডার দিয়েই লঞ্চ ছেড়ে দিল। ডায়মন্ডহারবার বেশ বড় শহর। তার কূল ধরে চলেছি। পাশে দেখা গেল ট্যুরিজমের সাগরিকা হোটেল। নামখানা যাবার রাস্তাও দেখা যাচ্ছে। অনবরত বাস, গাড়ি, ভ্যান ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে জ্যামও হয়ে যাচ্ছে। এইসব দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। ডায়মন্ডহারবারও পার হলাম। এবার আবার আমরা মাঝ গঙ্গায়। ধীরে ধীরে দুকূল আরও আবছা হয়ে আসতে লাগল—তারপর অসীমের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। যেদিকে তাকাই শুধু জল আর জল। মাঝে মাঝে দু-একটা বড় জাহাজ কিছুদূরে দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে। তার ঢেউয়ে আমাদের লঞ্চ দুলে উঠল কিছুক্ষণ। সবাই এখন যাঁদের যা সংগ্রহ, তাই দিয়ে দুপুরের আহারে ব্যস্ত। আমাদের সঙ্গে ছিল রুটি, আলুর দম আর মিষ্টি। তাই দিয়ে দ্বিপ্রাহরিক আহার শেষ করলাম। ততক্ষণে আমরা আরও অনেকটা এগিয়ে গেছি। তখন প্রায় তিনটা বাজে। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন, আর ঘন্টা তিনেকের মধ্যে আমরা সাগরদ্বীপে পেঁছে যাব। সবাই খুব আনন্দ অনুভব করলাম। সেই কখন সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে বসে আছি। মাঝখানে একবার লঞ্চের ছাদে উঠে ড্রাইভারের কেবিনে বসার জায়গা থেকে নদীবক্ষ দেখলাম। যেদিকে তাকাই শুধু জল আর জল। মনেই হচ্ছে না আমরা কোন নদীবক্ষে ভেসে চলেছি—যেন সাগরে পাড়ি দিয়েছি। গঙ্গা যে এত বিশাল আগে না এলে বুঝতে পারতাম না। জল মাঝে মাঝে একটু নীল নীল দেখা যাচ্ছে—আবার ঘোলা। সাগরের কাছাকাছি যে এসে যাচ্ছি তা বোঝা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে নদীবক্ষে সন্ধ্যা নামল। লঞ্চের সব আলো জ্বলে উঠল। মাঝে একবার বৈকালিক চা ও বিস্কুট পরিবহনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাইকে ঘোষণা শোনা গেল—"বাঁদিকে সবাই দেখুন লাইটিং টাওয়ার।" একটি আলো জ্বলছে আর নিভছে। তারপরেই একটা দ্বীপ ভেসে উঠল—এটা হলো কাকদ্বীপ। অনেকক্ষণ পর পাড় ও মাটি দেখতে পেয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। শুধু জল আর জল দেখতে দেখতে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম যাকে বলে 'সী-সিকনেস' তা কি জিনিস ও কি কষ্টকর। কাকদ্বীপ পার হতে কিছু সময় লাগল। এতক্ষণে নদীবক্ষে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। আর কিছুই দেখা যায় না। পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছি। ওঁরা সাতজন এসেছেন—থাকেন টালীগঞ্জে।

অনেকটা এগিয়ে গেছি। হঠাৎ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন: "আমরা সাগরদ্বীপে ঢুকছি। দেখুন, দূরে দেখা যাচ্ছে আলোকোজ্জ্বল সাগরদ্বীপ।" সবার মন এতক্ষণ যাত্রার পরে আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। দূরে দেখা যাচ্ছে বিরাট অঞ্চল জুড়ে সাগরদ্বীপের আলোকমালা। এতক্ষণ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আসতে আসতে এই আলোকমালা যেন

মনে-প্রাণে আনন্দের ঢেউ বইয়ে দিল। সবাই বলে উঠল: "কপিল মুনি কি জয়, গঙ্গাসাগর কি জয়।" ধীরে ধীরে লঞ্চ সাগরদ্বীপের দিকে এগুতে লাগল। পিছনের তিনটি লঞ্চও কাছে চলে এসেছে। সাগরদ্বীপ ধীরে ধীরে প্রকট হচ্ছে এবং তার আলোক বিচ্ছুরণ নদীবক্ষেও এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে প্রায় দুমাইল লম্বা এক আলোকমালা। ততক্ষণে আমাদের লঞ্চ দ্বীপের কাছাকাছি এসে গেছে। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন: "আপনারা যে যার জায়গায় বসে থাকুন, লঞ্চ এবার নোঙর করবে। নোঙর করার পর স্বেচ্ছাসেবকরা আপনাদের নামতে সাহায্য করবে।" লঞ্চ নোঙর করল। তখন বাজে পৌনে ৬টা। তারপর কর্তৃপক্ষের বড় নৌকা এসে ভিড়ল লঞ্চের গায়ে। নৌকাকে লঞ্চের সঙ্গে বাঁধা হলো এবং লঞ্চ থেকে নৌকা অবধি সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হলো। স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে যাত্রীরা সিঁড়ি দিয়ে নৌকার পাটাতনে নামলেন। পনেরো জন করে যাত্রী ও সঙ্গে একজন করে স্বেচ্ছাসেবক চললেন তীর অবধি। আমরা দ্বিতীয় নৌকায় চাপলাম এবং তীরের একটু আগে নৌকা ভিড়ল। আধ হাঁটু জলে নামতে হলো। অল্প কাদা-জলে হেঁটে ডাঙায় উঠলাম। পরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক যাত্রীকে একটি করে সাদা টুপি ও একটি করে ব্যাজ দিয়েদিলেন। প্রত্যেকেই টুপি ও ব্যাজ পরে নিয়েছি। টুপির গায়ে লেখা—'হুগলী নদী জলপথ পরিবহন।'

ডাঙায় উঠে স্বেচ্ছাসেবকরা যাত্রীদের সঙ্গে করে ক্যাম্প পর্যন্ত নিয়ে যেতে লাগলেন। পিছনে অন্য যাত্রীরা ভাগে ভাগে নৌকায় নামছেন এবং ডাঙায় আসছেন। তারপর স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় ক্যাম্পের দিকে হাঁটছেন। ক্যাম্পে আসার পথেই বাঁদিকে কপিল মুনির আশ্রম চোখে পড়ল—আলোকমালায় সজ্জিত। রাস্তার দু-ধারে হোগলার ছাউনি, আর রাস্তার মাঝে মাঝে জলের কল। রাস্তার একধারে লাইট-পোস্টের গায়ে দড়ি দিয়ে টাঙানো হুগলী নদী জলপথ পরিবহনের প্ল্যাকার্ড পথ নির্দেশ করছে। আমাদের ক্যাম্প হয়েছিল ইয়ুথ হোস্টেলের পিছনে। পরিবহন কর্তৃপক্ষের এত সুন্দর পথ-নির্দেশের ব্যবস্থা রয়েছে যে, স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য ছাড়াই ক্যাম্পে আসা যায়। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখলাম ত্রিপলের ছাউনি, পাশে ত্রিপল লাগানো ও নিচে খড়ের ওপর চট বিছিয়ে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক যাঁরা ক্যাম্পে ছিলেন তাঁরা আমাদের নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দিলেন। সেখানে প্রথমেই আমরা কম্বল ও চাদর বিছিয়ে পিঠটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। ১০ ঘণ্টা একটানা যাত্রার পর শরীর একেবারে এলিয়ে আসছিল। পর পর সব যাত্রীরা আসছেন এবং যে যার জায়গায় বিছানা করে নিচ্ছেন। সবাই খুবই ক্লান্ত। আমরা যখন ক্যাম্পে পৌঁছাই তখন সন্ধ্যা ৭টা। ক্যাম্পের পিছনে কাঁচা বাথরুম ও পাশে জলের কল। আমাদের এক পাশে কুণ্ডু স্পেশ্যালের ক্যাম্প ও আর এক পাশে ব্যানার্জী স্পেশ্যালের ক্যাম্প। আমরা প্রায় ৪৫ মিনিট বিশ্রাম করে উঠে পড়লাম কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দেব বলে। সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম কপিল মুনির আশ্রমে। মন্দিরের সামনে বিরাট চত্বর, দু-পাশেই পুজোর জিনিসের দোকান। বিভিন্ন দামের পুজোর পসরা নিয়ে বসে আছে দোকানীরা। চারদিক আলোকমালায় ঝলমল করছে। মাঝখানে মূল মন্দির, সেখানে কপিল মুনি, সগর রাজা ও গঙ্গামায়ের মূর্তি। বাঁদিকে হনুমানজীর মন্দির ও ডানদিকে ইন্দ্রদেবতা ও বিশালাক্ষীর মন্দির। মন্দির-প্রাঙ্গণ ফাঁকাই ছিল। কারণ ভিড়টা রাত দুটো থেকে বাড়ে। আমরা পুজোর জন্য মিষ্টি, নারকেল ও ধূপ-বাতি কিনে নিলাম কপিল মুনির মন্দিরের জন্য ও আলাদাভাবে হনুমানজীর মন্দিরের জন্য। তাড়াতাড়ি পুজো হয়ে গেল। প্রণাম সেরে আমরা মেলা-প্রাঙ্গণ ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। চারদিকে বিভিন্ন রকম খাবারের দোকান। দুধারে সারি সারি হোগলার ঘর। নানা প্রদেশের যাত্রী, সন্ন্যাসীরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যে-রাস্তা ধরে আমরা ক্যাম্পে এসেছিলাম সে-রাস্তা ধরে গেলে সোজা গঙ্গার সঙ্গমস্থল ও উল্টোমুখে হাঁটলে সোজা

চেমাগুড়ি বাস-স্ট্যান্ড বা মেন রোড। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে বড় চিকিৎসা শিবির খোলা হয়েছে, শিবির খুলেছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান।

মেলার রাস্তাকে বাঁদিকে রেখে ডানদিক ধরে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর গিয়ে রাস্তা আবার বাঁদিকে মোড় নিল। এই পর্যন্ত মেলা-প্রাঙ্গণ। তারপর পীচের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম সোজা। দু-পাশে গভর্নমেন্ট অফিস। প্রায় ১ কিঃ মিঃ এই পথে হাঁটার পর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দির দেখা গেল। বিশাল মন্দির। মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়লাম। হাজার হাজার যাত্রী চাতালে চন্দ্রাতপের নিচে শুয়ে আছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে একটু এগিয়েই বড় রাস্তার মোড় পেলাম। সেখানে দেখলাম লেখা আছে—'রাজেশ্বরী হিন্দু হোটেল'। ঢুকে পড়লাম সেখানে। দারুণ খিদেও পেয়েছিল। তখন রাত প্রায় সওয়া ৯টা। গরম গরম ভাত, ডাল ও কুমড়োর তরকারি সহযোগে রাত্রির আহার হলো। তারপর বেরিয়ে পড়লাম আরো একটু ঘুরতে। মেন রোড ধরে হেঁটে চলেছি চেমাগুড়ি বাস-স্ট্যান্ডের দিকে। একটু এগিয়েই বাঁদিকের রাস্তা ধরলাম। মোড়েই লোকনাথ মিশন। বাঁদিকের রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে চলেছি। প্রথমে পড়ল মাড়োয়ারী রিলিফ হসপিট্যাল। অস্থায়ী ব্যবস্থা, কিন্তু বেশ বড়। তারপর পড়ল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্যাম্প। সব দেখে আবার রাস্তায় উঠলাম এবং সোজা হেঁটে পৌঁছে গেলাম ইয়ুথ হোস্টেলে। তার পাশেই আমাদের ক্যাম্প। সবে পেটে ভাত পড়েছে ও তারপর শারীরিক ক্লান্তি। শরীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে এলিয়ে পড়ল।

৩.৩০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠে দেখি পাশের সহযাত্রীরাও উঠে পড়েছেন। তৈরি হয়ে নিলাম। দেখলাম, পাশের সহযাত্রীরাও প্রস্তুত। ঠিক করলাম স্নান সেরে আর ক্যাম্পে ফিরব না, সোজা লঞ্চে চলে যাব। সবাই সঙ্গমঘাটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। শরীরে মনে বেশ শিহরণ হচ্ছিল। 'অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্ত উপস্থিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই সঙ্গমস্থলে পৌঁছে গেলাম। তখন ভোর ৪টা। সাগরমেলা কর্তৃপক্ষের উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের আলোকে সঙ্গমস্থল আলোকোজ্জ্বল। তখন ভাটা চলছে। জল অনেক দূরে। একজন ভদ্রলোক এলেন। তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করে কলকাতা থেকে রাত্রি ৩.২০ মিনিটে সাগর-মেলাতে পৌঁছেছেন এবং সোজা সঙ্গমস্থলে চলে এসেছেন। তাঁর বাসযাত্রার অপরিসীম কষ্টের বর্ণনা শুনে বুঝলাম আমরা কত সুবিধাতে এসেছি। এগিয়ে চললাম স্নানের উদ্দেশ্যে। কাদা ভেঙ্গে এগুচ্ছি তো এগুচ্ছি। কিছুটা জল, আবার কিছুটা কাদা। আস্তে আস্তে ভাল জল দেখা গেল। জলের মধ্য এগিয়ে চলেছি। ভিতরে, আরও ভিতরে। এই করতে করতে একগলা জলে পৌঁছে গেলাম। কাক-চক্ষু জল। মুখে দিলে নোনা লাগছে। এখানে আমরা দুজন ও আরও একজন ভদ্রলোক। মাত্র তিনজন। একেবারে ফাঁকা। প্রাণ ভরে স্নান করলাম। অন্ততঃ দশটা ডুব দিয়েছি। সাঁতারও কাটলাম। পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলাম। শীত বলতে একদমই নেই।, স্নান করতে বেশ আরামই লাগছিল। পুণ্যস্নান মাঘীক্ষণে। তখন কটা বাজবে জানি না। ৫টা হবে বোধ হয়। গঙ্গাদেবীকে সঙ্গমের জল হাতে নিয়ে প্রণাম জানালাম সবার মঙ্গল কামনা করে। সত্যি, স্নানে যে কী তৃপ্তি পাওয়া যায় তা এই প্রথম অনুভব করলাম। এর আগে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায়, বাগবাজারের গঙ্গায় বহুবার স্নান করেছি—কিন্তু এ যে কী অপরিসীম আনন্দ তা বলে বোঝানো যাবে না। ভাগ্যগুণে সঙ্গমের খুব ভাল স্থানে আমরা পরিস্কার একগলা জলে স্নান করেছি।

এবার ফেরার পালা। উঠতে মন চাইছিল না জল থেকে—কিন্তু ফিরতে তো হবেই। গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমরা আবার জল ভেঙে ডাঙায় উঠলাম। তখনো সূর্যোদয় হয়নি। দেখলাম আমাদের পাশ দিয়ে সার বেঁধে হুগলী নদী জলপথ পরিবহনের কিছু যাত্রী লঞ্চের উদ্দেশে চলেছেন। আমরাও ও'দের সঙ্গ নিলাম। নৌকা অপেক্ষা করছিল। সারি সারি নৌকা

আসছে যাত্রীদের নিয়ে। চারটি লঞ্চই পাশাপাশি নোঙর করা আছে। যে যার নির্ধারিত লঞ্চে গিয়ে উঠছেন। গতকাল পরিবহন কর্তৃপক্ষ নামার সময় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, সকাল ৭.৩০ মিনিটের মধ্যে লঞ্চে ফিরে আসতে হবে। আমরা প্রায় ৬.৩০ মিনিটে লঞ্চে পেৌঁছে গেছি। লঞ্চ থেকে দেখা যাচ্ছে সঙ্গমঘাট। বহু তীর্থযাত্রী তখনো স্নান করছেন। পরিবহন কর্তৃপক্ষ বারবার ঘোষণা করছেন, চারটি লঞ্চের সব যাত্রীরা এসে গেলেই লঞ্চ ছাড়বে। ইতিমধ্যে অনেকেই এসেছেন। স্বেচ্ছাসেবকরা তালিকা মিলিয়ে নিচ্ছেন। শেষে দেখা গেল, দুটি লঞ্চের চৌদ্দজন যাত্রী তখনো এসে পেৌঁছাননি। বারবার তাঁদের জন্য কর্তৃপক্ষ নাম ঘোষণা করছেন। তখন প্রায় ৯টা বাজে। ইতিমধ্যে একপ্রস্থ চা ও বিস্কুট বিতরণ করা হয়ে গেছে। লঞ্চের সমস্ত যাত্রী স্থির চক্ষুতে ঘাটের দিকে তাকিয়ে আছি—কোন নৌকা এলেই তাতে সাদা টুপি পরা কেউ আছেন কিনা। এরকম করতে করতে আরও ৪জন যাত্রী এসে গেলেন।

কর্তৃপক্ষ দেরি দেখে স্বেচ্ছাসেবক পাঠালেন নৌকা করে ঘাট ও ক্যাম্পে দেখতে—কেউ কেউ ওখানে রয়ে গেছেন কিনা। তাঁরা ফিরে না আসা অবধি অপেক্ষা করতেই হবে। ৮টায় লঞ্চ ছাড়ার কথা, তখন বাজে প্রায় ১০টা। ইতিমধ্যে আরও ৪জন এসে গেলেন। সবাই খুব অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। পাশে ক্যালকাটা পুলিশের লঞ্চটি দাঁড়িয়ে ছিল, সেটিও ছেড়ে চলে গেল। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ তখন প্রায় ভাঙতে বসেছে। সেই কখন থেকে বসে আছি তীরের দিকে তাকিয়ে। দূরে একটা নৌকা দেখা গেলেই লক্ষ্য করছি তাতে সাদা টুপির কেউ আছে কিনা। কিন্তু হা হতোহস্মি! কোনদিকেই সাদা টুপির আর চিহ্ন নেই। পরিবহন কর্তৃপক্ষ তখন ঘোষণা করলেন, আমাদের সকালের জলখাবার এখানেই এখন দিয়ে দেওয়া হবে। তবুও একটু আনন্দ। বসে থাকতে থাকতে কোমর ধরে যাচ্ছে। টিফিন সরবরাহ হলো। তারপরে কফি। খেয়ে কিছুটা প্রাণ জুড়োলো। মাঝে মাঝে বিরক্তিও লাগছিল ঐ কয়জন দায়িত্বহীন যাত্রীদের জন্য—আবার মনে হচ্ছিল, আমরা যদি ওঁদের অবস্থায় পড়তাম! আমরা সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি স্বেচ্ছাসেবকদের ঐ নৌকাখানা কখন ফিরে আসে। এইটাই শেষ আশা-ভরসা। এদিকে কর্তৃপক্ষ বারবার ঘোষণা করছেন, স্বেচ্ছাসেবকরা পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এলেই লঞ্চ ছেড়ে দেবে। অবশেষে সব আশা ভঙ্গ করে স্বেচ্ছাসেবকরা ফিরলেন, কিন্তু সঙ্গে কোন যাত্রী নেই! তাঁরা জানালেন বাকি ৬জন যাত্রীকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি। তাঁদের নামে ওঁরা থানায় ডায়েরী করে এসেছেন। লঞ্চ কর্তৃপক্ষ তখন ঘোষণা করলেন, লঞ্চ এবার নোঙর তুলবে ও যাত্রা শুরু হবে।

ধীরে ধীরে লঞ্চ মুখ ঘোরালো ও চলতে আরম্ভ করল। আমরা সাগরদ্বীপকে পিছনে ফেলে যাত্রা শুরু করলাম। আস্তে আস্তে সাগরদ্বীপ মিলিয়ে গেল। আবার সেই অসীম জলরাশি। আসার সময় আমরা ভাটার টানে এসেছিলাম। এবার শুরু হলো জোয়ার। নদী ফুলে ফেঁপে রয়েছে। তাই লঞ্চের গতি মন্থর। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। দেখতে দেখতে কাকদ্বীপ পেরিয়ে এলাম। সবাই স্নানের গল্প ও মেলার গল্প করছি। ডায়মন্ডহারবারে আমাদের দুপুরের খাবার দেওয়ার কথা বেলা ১.৩০ মিনিটে কিন্তু ছাড়তে দেরি হওয়ার জন্যে লঞ্চ ডায়মন্ডহারবারে পেৌঁছাবে বেলা ৫টায়। সঙ্গে যা খাবারের অবশিষ্টাংশ ছিল তা অল্প অল্প কিছু খাচ্ছি। এবারে আমাদের লঞ্চ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথমে তিতাস বেরিয়ে গেছে। ডায়মন্ডহারবারে যখন পেৌঁছালাম তখন পোনে ৫টা। এখানে আমাদের লাঞ্চ হলো। দেখতে দেখতে নদীবক্ষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। এখন আবার ভাটা শুরু হয়েছে। রূপনারায়ণের সঙ্গম পেরিয়ে এলাম। ফলতাও পেরিয়ে এলাম। তখন রাত্রি নেমে এসেছে। লঞ্চের সব আলো জেবলে দেওয়া হয়েছে। শীতও বেশ লাগছে। কর্তৃপক্ষকে লঞ্চের পর্দা ফেলে দিতে বলা

হলো। কিছুটা গরম হলো। তখন প্রায় ৭.১৫ মিনিট।

কিছুক্ষণ পর দেখি আমাদের লঞ্চটি খালি ঘুরপাক খাচ্ছে। কোন্ দিকে যে যাচ্ছি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ লঞ্চটি বেশ জোরে একটা ধাক্কা খেল। সবাই বেশ দুলে উঠল। এ ওর ঘাড়ে পড়ে—এরকম অবস্থা। লঞ্চ চড়ায় ধাক্কা মেরেছে। আবার পিছিয়ে এসে চলতে আরম্ভ করল। সবারই একটু ঘুম ঘুম ভাব। কিছুক্ষণ আগে ডায়মন্ডহারবারে পেটভর্তি খাবার খেয়েছি। ঠান্ডা হলেও তা অমৃত। তারপর দুদিনের ক্লান্তি। ত্রিপলের পর্দা ফেলে দিতে লঞ্চের ভিতরটা বেশ গরমও হয়েছে। তাই সবারই ঘুম ধরে আসছে। হঠাৎ জোরে আবার এক ধাক্কা! এ ওর ঘারে পড়ি আর কি। লঞ্চ আবার চড়ায় ধাক্কা খেয়েছে। তখন বাজে রাত্রি ৮টা। হিসাব করে দেখা গেল এখন যদি আমরা এগুইও রাত্রি ১২টা-১২.৩০ মিনিটের আগে হাওড়ায় পৌঁছানো যাবে না। তখন হাওড়া থেকে কোন যানবাহনও পাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যে দু-দুবার বিপদ-সংকেত দেখা দিয়েছে। রাত্রের যাত্রাতে আর যে কোন বিপদ অপেক্ষা করে নেই তার কি ঠিক-ঠিকানা? তাছাড়া লঞ্চের সার্চ লাইট (সামনের) আলো) নদীর ঘন কুয়াশাকে ভেদ করতে পারছে না। আমরা সামনে যাচ্ছি কি পিছনে যাচ্ছি—তাও বুঝতে পারছে না ড্রাইভার। এই রকম পরিস্থিতিতে ঠিক হলো এইখানেই লঞ্চ নোঙর করবে, এখানেই আমাদের রাত্রিবাস করা হোক। পরের দিন সূর্যোদয় হলে দিক নির্দেশ করে এগুনো যাবে। কপালে ভোগান্তি যা আছে তা তো হবেই। অন্যান্য লঞ্চের পরিচালকদের ঘোষণা করে বলা হলো আমাদের পাশে এসে নোঙর করতে। কিন্তু তিতাস এগিয়ে গেছে। ওর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

লঞ্চ নোঙর করল। চেয়ার সরিয়ে যে যার শোবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কেউ চেয়ারের ওপর পা এলিয়ে, কেউ লঞ্চের ডেকে কম্বল বিছিয়ে লেপ-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। সেরকম সুব্যবস্থা না হলেও সারাদিনের ক্লান্তিতে অচিরেই আমরা নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়লাম। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। ঘড়ি দেখছিলাম। জায়গাটা যে কোথায় কেউই ঠাহর করতে পারছে না। অবশেষে সকাল হলো। সবাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠল—যাক এবার যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু বিধি বাম! পর্দা তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চারিদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। পাঁচ হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। এমনকি আমাদের পাশে একটু দূরেই যে আরও দুটি লঞ্চ দাঁড়িয়েছিল, তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। মাইকে ঘোষণা করে জানতে হচ্ছে, তারা আছে কিনা। নিচে তাকালেই জল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পাশে তাকালে কুয়াশা ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এই অবস্থায় বসে থেকে ঈশ্বরের নাম নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। অনেকেই বললেন যে, ফেরার সময় আমরা "কপিল মুনি কি জয়, গঙ্গামাঈ কি জয়" ধ্বনি দিইনি বলেই এই দুর্ভোগ। হবেওবা তাই। লঞ্চ থেকে একবার সকালের চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। তা খেয়ে শরীরটা একটু চাঙ্গা হলো। কিন্তু মনে ভয়, সবাই ইষ্টদেবতার নাম জপ করছি। সাড়ে ৯টা বাজল।

সূর্যদেবতার দেখা নেই। ১০টার সময় সবাই বলল পাশের দুটি লঞ্চকে সামনে পিছনে রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন সোজা—আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে যাবে। জায়গাটা যে কোথায় তাও ঠাহর করা যাচ্ছে না। তাই করা হলো। লঞ্চ নোঙর তুলে খুব ধীর গতিতে এগুতে আরম্ভ করল। তখন জোয়ার। একটু এগুতেই দুটো কালো কালো কি দেখা গেল। মনে হলো নৌকা। একটু কাছে যেতেই বোঝা গেল দুটো বজরা নৌকা। নোঙর করে আছে। ওদের মাঝিরা আমাদের বিপদের কথা বুঝতে পেরেছে। তারাই হাত নেড়ে আমাদের কাছে ডাকল। ওরাই বলল, এটা বিড়লাপুর। ওরা নদীর পোকা। ওরা মাল নিয়ে যাচ্ছে বড়বাজার। ওদের পরামর্শ অনুসারে একটি বজরাকে আমাদের লঞ্চের সঙ্গে মোটা রশি দিয়ে বাঁধা হলো এবং কংসাবতীর সঙ্গে আরেকটি বজরাকে বাঁধা হলো। তারপর ওদের মাঝিরা

আমাদের লঞ্চে উঠে এল। তিস্তাকে মাঝে রেখে কংসোবতীকে সামনে রেখে আমরা পিছন থেকে সার বেঁধে এগিয়ে চললাম মাঝিদের নির্দেশ অনুসারে। ওরা ডাইনে বাঁয়ে সামনে—কোন্‌দিকে যেতে হবে ঐ ঘন কুয়াশার মধ্যেও দেখিয়ে দিচ্ছিল। যেন স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের পাশে থেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই ভাবে কিছুদূর যাওয়ার পর বেলা ১১টা বাজল।

তখন কুয়াশা কেটে গেছে এবং সূর্যদেবেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে। দেখলাম, আমরা নদীর একটা কূল ধরে চলেছি। ঈশ্বরকে, কপিল মুনিকে ও গঙ্গা-দেবীকে শতকোটি প্রণাম জানালাম। তিতাসের দেখা আমরা আর পেলাম না। তাই তার অবস্থা কিছু বুঝতে পারলাম না। বাটানগরে যখন পেঁছালাম তখন দেখলাম দুটি উদ্ধারকারী লঞ্চ পরিবহন কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছেন। বজরা দুটিকে ঐ লঞ্চদুটির সঙ্গে বেঁধে নেওয়া হলো। যাত্রীদের প্রত্যেকেই তখন অস্থির হয়ে উঠেছেন, কখন পেঁছাবেন হাওড়া। এত ক্লান্তি ও অধৈর্যের মধ্যেও দু-পাশের দৃশ্য সবকিছু ভুলিয়ে দিচ্ছিল। একে একে উলুবেড়িয়া, ফুলেশ্বর, বাউড়িয়া, খিদিরপুর ও নির্মীয়মাণ দ্বিতীয় হুগলী সেতু অতিক্রম করে আমরা হাওড়ায় পেঁছালাম বেলা দুটোয়। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। এসে শুনলাম, তিতাসও রাত্রে আটকে পড়েছিল, বেলা ১২টার সময় হাওড়া জেটিতে পেঁছেছে। ভগবান, কপিল মুনি এবং গঙ্গামাঈকে প্রণাম করে যে যার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। ☐

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

যাবজ্জীবেৎ

অমিয়কুমার দাস

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—চার্বাক-কথিত ও জনগণের বহু-পরিচিত সংস্কৃত শ্লোকটিকে আজ বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে বিচার করতে বসেছি। শ্লোকটির অর্থ—'যতদিন বাঁচ সুখে থাক ; ঋণ করেও ঘি খেও।'

অতি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড (Essential Fatty Acid—ই. এফ. এ) বা পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (Poly-unsaturated Fatty Acid), যথা—লাইনো লেনিক অ্যাসিড (Linolenic Acid), লাইনোলেইক অ্যাসিড (Linoleic Acid), অ্যারাচিডোনিক অ্যাসিড (Arachidonic Acid), আমাদের খাদ্যে যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন। এই অতি প্রয়োজনীয় তৈল উপাদানগুলি টোড স্কিন (Toad skin) বা 'ব্যাঙের চামড়া' নামক খসখসে চর্মরোগ নিবারণ করে ; রক্তে কোলেস্টেরল (Cholesterol)-এর পরিমাণ কম রাখে ; অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস (Atherosclerosis) বা রক্তের চাপ বৃদ্ধি ও করোনারি থ্রম্বোসিস (Coronary Thrombosis) রোগ নিবারণ করে। কয়েকটি তেলের ই. এফ. এ-এর পরিমাণ নিম্নরূপঃ কুসুম তেল বা স্যাফ্লাওয়ার তেল (Safflower oil)—৭৫%, তুলাবীজের তেল —৫০%, তিল তেল—৪৫%, বাদাম তেল—২৮%, সরষের তেল ২০%, বনস্পতি—৬%, নারকেল তেল—৩%, ঘি—২%। দেখা যাচ্ছে, আবহাওয়ার তাপে যেসব তেল জমে—ঘি, মাখন, ডালডা, পাম তেল, নারকেল তেল—এদের মধ্যে ই. এফ. এ খুব কম থাকে ; এরা রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায়, উচ্চ রক্তচাপ ও হার্টের রোগ ঘটায়। তবে কারণ হিসাবে এই সঙ্গে বংশগতি, সক্রিয় ও পরোক্ষ

(indirect) ধূমপান, অতি ভোজন, দুশ্চিন্তা ও শারীরিক ব্যায়াম বা শ্রমের অভাবকেও দায়ী করা হয়েছে।

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যে তাপমান বা ক্যালরি (calorie) : চাল, আটা, ডাল—৩৫০ ক্যালরি ; শাক-সব্জি, ফল—২৫-৩০ ক্যালরি ; দুধ, মাংস, ডিম—৬০-১৮০ ক্যালরি ; আলু—৯০ ক্যালরি ; মিষ্টি আলু—১২০ ক্যালরি ; চিনি, গুড়—৪৫০ ক্যালরি ; বাদাম, তৈলবীজ—৬৫০ ক্যালরি ; তেল, ঘি, মাখন, ডালডা—৯০০ ক্যালরি।

তেল, ঘি, মিষ্টি বেশি খেলে ও ব্যায়াম বা শ্রম কম হলে দেহে মেদ বৃদ্ধি হয়, স্থূলত্ব (obesity) রোগ হয় : এসব লোকের আয়ু কম হয়, তাই জীবনবীমায় এদের প্রিমিয়াম (premium) বা কিস্তির টাকা বেশি লাগে। তেল, ঘি ও মিষ্টিতে বেশি ক্যালরি থাকায় মোটা ও ভুঁড়িওয়ালা লোকে এসব কম খাবে ও বেশি পরিশ্রম করবে, যাতে জমানো চর্বি খরচ হয়।

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যে ভিটামিন 'এ'-এর পরিমাণ নিম্নরূপ (আন্তর্জাতিক মাপকাঠি—International Unit বা আই. ইউ.তে) :

মাখন—৩২০০ আই. ইউ. ; গাওয়া ঘি—২০০০ ; ভয়সা ঘি—৯০০ ; সরিষা, তিল, তিসি ইত্যাদি জাত তেল—০ ; বনস্পতি—২৫০০ (ভারত সরকারের আইন মেনে মেশানো হয়) ; নটে শাক—১২০০ ; ঐ ডাঁটা—৪২৫ ; সজনে শাক—১১৩০০ ; ঐ ডাঁটা—১৮৪ ; পালং শাক—৯৩০০ ; পুঁই শাক—১২৪০০ ; মূলো শাক—৯৫৩০ ; মূলো—৫ ; আপেল, আঙুর—০ ; পাকা আম—১২০০ ; কমলালেবু—১৮০০ ; পাকা পেঁপে—১১১০ ; টমাটো—৫৮৫ ; গাজর—৩১৫০। তাই বুঝি বলে—'শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই, মানুষের মধ্যে মুই'। পুঁই শাকে বেশি ভিটামিন আছে ঠিকই, কিন্তু ছোট মাছ দামে সস্তা, কাঁটা-সহ খাওয়া হয় বলে ক্যালসিয়ামও পাওয়া যায়। আর 'মোর মতন চালাক লোক কেডা ?'—এ তো অনেকেরই ধারণা। আমাদের দৈনিক প্রয়োজন ৩০০০ থেকে ৪০০০ আই. ইউ.।

ঘির দাম বেশি, তাই ঘিতে ভেজাল মেশানো হয় বেশি ; ডালডা মিশ্রিত ঘি-ই বোধহয় বাজারে বেশি। তবে ঘির আছে আভিজাত্যের মান (prestige value)। তাই বুঝি বলে—'পান্তা খেয়ে ঘি-এর ঢেঁকুর তোলা।' **ঋণ করে কেন, বিনা পয়সায় দিলেও ঘি খাবেন না, বিশেষতঃ চল্লিশোর্ধ্ব বয়স ও মোটা হলে।**

ঘি বাদ, এবার ঋণ নিয়ে কিছু আলোচনা দরকার।

'ঋণ' কথাটায় আপনাদের নিশ্চয় মনে পড়ছে মহাভারতে (বনপর্ব, ৩১৩।১১৪) যুধিষ্ঠিরকে করা বকরূপী ধর্মের প্রশ্নগুলি : "কো মোদতে কিমাশ্চর্যং কঃ পন্থাঃ কা চ বার্তিকা"—সুখী কে ? আশ্চর্য কি ? পথ কি ? বার্তা কি ?

'সুখী কে ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির ধর্মবককে বলেছিলেন (বনপর্ব, ৩১৩।১১৫) :

"দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।"

—অপ্রবাসে (অর্থাৎ নিজগৃহে) অঋণী থেকে মধ্যাহ্নকালে শাক ভাত খেয়ে যার কাল যায় সেই সুখী।

'অঋণী' কথাটি ছাড়া এই শ্লোকটির আর কিছুই মানা যাচ্ছে না। এই যুগে প্রবাসে বা বিদেশে বাস করা, লন্ডন নিউইয়র্ক ঘুরে এসে কলকাতার জ্যামে পড়ার চেয়ে ভাল। আর শুধু শাক-ভাতে শরীর টেকে না, সুস্বাস্থ্যের জন্য সুষম খাদ্য প্রয়োজন। শাকের গুণগান অবশ্যই করতে হয়। শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ আছে। তবে শাক টাটকা হবে, ধুয়ে সম্ভব-মত বড় করে কাটবেন, কেটে ধোবেন না বা ফেলে রাখবেন না ; কেটেই ঢাকা দিয়ে রান্না করবেন ; বেশি সময় ধরে রান্না করবেন না বা রান্না খাবার বারবার গরম করবেন না ; রান্নায় টমাটো দেওয়া ভাল, কিন্তু বেকিং পাউডার (Baking Powder) বা সোডা ভিটামিন নষ্ট করে ; তরকারি-সিদ্ধ জল ফেলবেন না। প্রতিদিন ১০০ গ্রাম শাক রান্না করে

খাওয়া দরকার। শাক কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে ও অন্ত্রে সম্মার্জনীর কাজ করে। অর্থাৎ খাবারের সঙ্গে বালি ইত্যাদি খেলে শাক তা মলের সঙ্গে বের করে দেয়। ঝিনুকে বালি ঢুকে মুক্তা হওয়ার মতো আমাদের ২৩ ফুট দীর্ঘ অন্ত্রের (intestine) ভাঁজে ভাঁজে বালি ঢুকে অ্যাপেন্ডিসাইটিস (Appendicitis) ও টিউমার (Tumour) বা ক্যান্সার (Cancer) হতে পারে।

সুষম খাদ্য প্রতিদিন খেতে হয়। সুষম খাদ্যে থাকবে আমিষ জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন, চর্বি বা তেল, শর্করা জাতীয় খাদ্য বা কার্বোহাইড্রেট, সল্ট (Salt) বা খনিজ লবণ, জল ও ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ।

কয়েকটি প্রোটিনবহুল খাদ্যে প্রতি ১০০ গ্রামে প্রোটিনের মান: ডাল, বাদাম, তৈলবীজ—২৪ গ্রাম; দুধ—৩-৪ গ্রাম; আটা, ডিম—১২ গ্রাম; সোয়াবীন—৪০ গ্রাম; মাছ, মাংস (হাড় ও কাঁটা বাদে)—১৮ গ্রাম; আতপ চাল, বেশি ছাঁটা সিদ্ধ চাল—৬ গ্রাম; কম ছাঁটা সিদ্ধ চাল—৪.৫ গ্রাম। প্রোটিন দেহে সঞ্চয় হয় না। তাই ভোজবাড়িতে বেশি মাছ মাংস দই খেয়ে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। তাছাড়া প্রোটিন-খাদ্য চিনি গুড় দিয়ে ফোটালে প্রোটিন-মান কমে যায়; মিথিওনিন (Methionine) ও লাইসিন (Lysine) নামে প্রোটিনের দুটি অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড শর্করার সঙ্গে একটা যৌগ তৈরি করে, যা আমাদের দেহের উৎসেচক বা এনজাইম (enzyme) ভাঙতে পারে না; ফলে ঐ প্রোটিন আমাদের কাজে লাগে না।

শাস্ত্রবাক্যগুলির 'অঋণী' থাকার উপদেশ আজও একইভাবে প্রযোজ্য। ঋণের অনেক জ্বালা, অনেক অপমান। দুশ্চিন্তায় রাতারাতি মাথায় টাক পড়ে যায়, চুল পেকে যায়। চিন্তায় চিন্তা-জ্বর, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, বদহজম, অম্বল রোগ, পেপটিক আলসার (peptic ulcer), একজিমা, হাঁপানি প্রভৃতি অসুখ হয়। ইংরেজী প্রবাদ—"Cut your coat according to your cloth" বা বাঙলায়—"আয় বুঝে ব্যয় কর" খুবই খাঁটি কথা।

ঋণের কারণ দূরীকরণে, রোগের কারণ ও চিন্তার কারণ দূরীকরণে, 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার', 'নেশা সর্বনাশা', 'বিবাহ সম্বন্ধে পরামর্শদাতা সংস্থা', 'কোনটি আগে কোনটি পরে', 'সাংসারিক ব্যয় সংকোচ', 'সুপ্রজনন বিদ্যা' (Eugenics) প্রভৃতি কথাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা ও এদের সুষ্ঠু প্রয়োগ করা প্রয়োজন; কারণ এগুলি বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত ও সফল বলে প্রমাণিত।

এবার রইল—"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ।" কবি কামিনী রায়ের কথা স্মরণ করুন—"দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?" অর্থাৎ সারা জীবন শুধু সুখে কাটানো যায় না, সুখ পেতে হলে আগে দুঃখ নিতে হয়, নিজেকে বিশ্বভুবনের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হয়। তাছাড়া কেউ তার শুধু জীবদ্দশাতেই বেঁচে থাকে না। টমাস আলভা এডিসন, সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, রোমাঁ রোলাঁ, লুই পাস্তুর, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, আদিম গুহামানব যিনি প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিলেন, সুচের আবিষ্কর্তা—এঁরা আমাদের জীবনের মধ্যে বেঁচে আছেন, আছেন স্বর্গের অমৃতলোকে। এ্যাটিলা, হিটলার, চেঙ্গিজ খান, গুণ্ডা বদমাশরা বেঁচে থাকে—প্রায়শ্চিত্ত করে মানুষের দুঃখানল আর দুঃস্বপ্নের নরকে। আর আমরা সাধারণ লোকে বেঁচে থাকি আমাদের কাজের মধ্যে।

"কিমাশ্চর্যম্?" —আশ্চর্য কি?—বকরূপী ধর্মকে যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তর স্মরণ করুন: "অহন্যহান ভূতানি গচ্ছান্তি যমমান্দরম্। শেষাঃ স্থিরত্বামচ্ছান্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্॥" অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে জীব মারা যাচ্ছে, বাকিদের চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছা—এরচেয়ে আর আশ্চর্য কি আছে। কিন্তু "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"—মহৎ ও সৎ কাজ এমনি করেই করে যেতে হবে; সেজন্য মনুষ্য-জীবনে উচ্চ আদর্শ চাই।

বহু শতাব্দী ধরে আদৃত এবং পরীক্ষিত শাস্ত্রবাক্যগুলির অনেক বাদ যায় অনেক মতবাদের মতো। এসবও কি আশ্চর্য? নাকি সেসবও পরিবর্তনশীল জগতের অমোঘ নিয়মমাফিক? ☐

দু-ফোঁটা চোখের জল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুরকে আমি চোখের সামনে দেখতে পাই। তাঁর চলা, বসা, কথাবলা। শুনতে পাই তাঁর কণ্ঠস্বর। স্পষ্ট, কাটা কাটা, তীক্ষ্ণ, আবার স্নেহ-মাখা। কখনো আবিষ্ট, কখনো স্পষ্ট। দেখতে পাই, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন অপলকে। মানুষের কর্মটাই আমরা দেখতে পাই, তার চিন্তা-ভাবনা আমাদের নজরে পড়ে না। অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ আমার চিন্তা, আমার ভাবনার নড়াচড়া দেখতে পান। আমি যখন টলে যাই, তখন তিনি আমার হাত ধরে বলেন ঃ

"কালীর চরণ করেছে যে স্থূল
সহজে হয়েছে বিষয়েতে ভুল
ভবার্ণবে পাবে সে কূল
মূল হারাবে সে কেমনে।

"মন বহুরূপী ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টাতে পারে; কিন্তু আমার যে নির্দেশ ছিল সাত্ত্বিক রঙে চুবিয়ে নাও মনকে। সেখানে রজোগুণের ছটফটানি কেন? কেন তামসিকতার কালো মেঘ ছেয়ে আসে? সত্তের অহঙ্কার দিয়ে দূর কর তাকে। বিচারের ফুঁ মেরে উড়িয়ে দাও। জ্ঞানের আগুন জ্বালো। বিষয় থেকে অবিষয়ে চলে যাও। বল, 'ভবে সেই সে পরমানন্দ যে-জন পরমানন্দময়ীরে জানে।' তুমি ধরতে দিলেই, তোমার হাত আমি ধরব। আমি যে ধরে আছি, সেই বিশ্বাসটা কিন্তু তোমার থাকা চাই।

"আমি তোমার কাছে একটা জিনিসই চাইব, সেটা হলো বিশ্বাস, জ্বলন্ত বিশ্বাস। তার মানে সমর্পণ। মনে আছে, আমি তোমাকে বলেছিলুম, ছেলে যদি বাপকে ধরে আলের ওপর দিয়ে চলে, তাহলে বরং খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে, সে ছেলে কখনো পড়ে না।

"এখন বল, আমি যে তোমার হাত ধরব, তার জন্যে তুমি কি করেছ? তুমি আমার দিকে কতটা এগিয়েছ? আমি একটু অন্যভাবে, আভাসে বলেছিলাম, তুমি যদি তাঁর দিকে এক পা এগোও, তিনি তোমার দিকে এগিয়ে আসবেন একশো পা। শোন, আমি মায়ের কাছে শুদ্ধাভক্তি চেয়েছিলাম। মাকে বলেছিলাম, 'এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। মা, এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।'

"এখন বল, তুমি কি আমার তেমন ভক্ত হতে পেরেছ? স্মরণ-মনন সকালের দাঁত মাজা নয়। মনন-হীন ঘণ্টা নাড়া নয়। ব্লটিং পেপার যেভাবে জল শুষে নেয়, সেইভাবে তোমার মন কি ভক্তি শুষে নিতে পেরেছে? নিত্য আর অনিত্যের বোধ কি তোমার হয়েছে? তোমার কি একবারও মনে হয়েছে, সেই দিনই দুর্দিন, যেদিন হরিকথা হলো না? তোমার চরিত্র কি সেই রকম দৃঢ় হয়েছে যে, কোন প্রলোভনই তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না! নিষ্ঠা বলতে আমি কি বোঝাতে চেয়েছিলুম, আশা করি, স্মরণে আছে—'সব মতকে নমস্কার করবে, তবে একটি আছে নিষ্ঠাভক্তি। সবাইকে প্রণাম করবে বটে, কিন্তু একটির উপরে প্রাণ-ঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা। রামরূপ বই আর কোনও রূপ হনুমানের ভাল লাগত না। গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, তারা দ্বারকার পাগড়িবাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে চাইল না।'"

ঠাকুর, ভয় হয়, সেই নিষ্ঠা কি আমার হয়েছে! ধর্মের অ্যাডভেঞ্চার করছি না তো! সেই অশিক্ষিত মানুষটির মতো আমার ভিতরে কি ভক্তিরস দানা বেঁধেছে, যে একখানি গীতা হাতে নিয়ে অঝোরে কাঁদছে? কৌতূহলীর প্রশ্ন, 'তুই গীতার কিছু বুঝিস? কি লেখা আছে পড়তে পারিস?' 'না,

পারি না ; কিন্তু আমি জানি, এতে আমার প্রভুর কথা লেখা আছে। ঠাকুরের মতো ঠাকুরকেই কি বলতে পারব—'বেদান্ত জানি না ঠাকুর ! জানতে চাই না। ওসব জ্ঞানীরা জানুন। আপনাকে পেলে বেদ-বেদান্ত কত নিচে পড়ে থাকে !' আমি কোনদিন আপনার মতো বলতে পারব কি—'কৃষ্ণ রে ! তোরে বলব, খা রে নে রে বাপ ! কৃষ্ণ রে ! বলব, তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছিস বাপ !' আর ঠাকুর, আমার চোখে জল আসবে, অন্ততঃ দু-ফোঁটা। আপনি বলতেন, তাঁর কথায় যখন চোখে জল আসবে, তখন বুঝবে, তোমার ভিতরে রঙ ধরেছে। যখন দেখবে বিষয়-কথা ভাল লাগছে না, তখন বুঝবে তিনি উদিত হচ্ছেন তোমার ভিতরে। তখনই একটা রোখ আসবে মনে, ঝিঁকি মারবে, দেখবে তোমার অভ্যাস, তোমার সংস্কার ঝুরঝুর করে ঝরে গেছে। তৈরি হবে নতুন সংস্কার। তোমার মুখে ঝিলিক মারবে আধ্যাত্মিক হাসি। 'ভয় হতে তব অভয় মাঝারে' নতুন জন্ম হবে।

ওসব কথায় কান দিও না, যারা বলে, "ধর্ম হলো অক্ষমের আফিং।" ধর্ম অবশ্যই আফিং, সে কেমন? যেমনটি বলেছেন আমার ঠাকুর। একটা পাখি, তাকে একবার সকাল আটটার সময় এক গুলি আফিং খাওয়ানো হয়েছিল। সে ঐ রোজ সকাল আটটায় যেখানেই থাকুক ঠিক উড়ে চলে আসত আফিং-এর লোভে। ধর্ম ঐ আফিং, একবার ধরলে আর ছাড়ে না। এমন নেশা ! ধর্মের ব্যবসা আর ধর্মের নেশা দুটো আলাদা জিনিস।

ঠাকুর আধার বুঝতেন। চালাকি করলেই ধরতে পারতেন। অলস মানুষকে ধমকাতেন। বলতেন, 'সংসার করেছ, ছেলেপুলে হয়েছে। আগে কর্তব্য কর, ভরণপোষণের ব্যবস্থা কর, তারপর ধর্ম করবে। তোমার সংসার অন্য লোকে সামলাবে, চালাকি পেয়েছ !' পেটকাওয়াস্তে সাধুদের তিনি গ্রাহ্য করতেন না। বলতেন, 'যে-সাধুর বগলে পুঁটলি দেখবে, বুঝবে তারা ঠিক ঠিক সাধু নয়। তাদের আলোচনার বিষয় হলো, কোন্ বাবু কেমন খাইয়েছে, কোথায় কত বড় ভাণ্ডারা হয়েছে !' ঠাকুর গেরুয়ার অপমান সহ্য করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, 'সন্ন্যাসী তো ঈশ্বরচিন্তা করবেই। সে আর নতুন কথা কি ! কিন্তু গৃহী ! আমার আসল কথা তো গৃহীকে নিয়েই।'

তাই তো একটু ভরসা পাই।

"সে কি, সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে

"কিভাবে থাকব ?"

"বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যারা ভগবান বই জানে না তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্বদাই 'রাম', 'ওঁ রাম' জপ করে। জ্ঞানপথের লোকেরাও 'সোঽহম্' জপ করে। কারও কারও সর্বদাই জিহ্বা নড়ে।"

"সর্বদাই স্মরণ-মনন থাকা উচিত।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণ-মনন কি আমার ঠিক হচ্ছে? যদি হয়, তাহলে আমার হবেই। ঠাকুর বলছেন, "সকলেরই মুক্তি হবে।"

মুক্তি মানে কি? তাড়াতাড়ি মৃত্যু ! মুক্তিরও তো একটা ব্যাখ্যা আছে ! সংসারী মানুষের মুক্তি হলো সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি। কামনা-বাসনা-ভয় থেকে মুক্তি। অনিশ্চয়তা থেকে অদ্ভুত এক নির্ভরতায় মুক্তি। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় মুক্তি। রোগ জানুক আর দেহ জানুক, মন তুমি আনন্দে থাক। আনন্দের জোয়ারই হলো মুক্তি।

ঠাকুর বলছেন, মুক্তি হবে, "তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলতে হয়।"

আমার গুরু, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলছেন আমাকে, "ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করবে, নৃত্যকী যেমন মাথায় বাসন রেখে নাচে। আর পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই ? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে হাসতে, কথা কইতে কইতে যাচ্ছে।"

আর বলছেন, "জ্ঞানের সাধনা কর। জান কি জ্ঞান কাকে বলে, আর আমি কে ?"

"ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা—এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্তা। তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই আমি বলি, মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তুমি ঘরণী, আমি ঘর, আমি গাড়ি, তুমি ইঞ্জিনিয়ার। যেমন চালাও, তেমনি চলি, যেমন করাও, তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি। 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'॥" ☐

রসিকোত্তম

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে বা ভক্তগৃহে অন্যান্যের সঙ্গে নরেন্দ্র বসে আছেন। রসের হাট বসেছে।

থালাভর্তি মোহনভোগ এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেই বলছেন: "ওরে, মাল এসেছে! মাল! মাল! খা! খা!" আবার বলছেন: "হ্যাঁ গা, কি বলে? পরমহংসের ফৌজ এসেছে! শালারা বলে কি!"

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হচ্ছে—কিন্তু রাখাল কোথায়? শোনা গেল, ঘুমাচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন: "একজন মাদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল। যাত্রার দেরি দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন উঠল তখন সব শেষ হয়ে গেছে।" তারপর? "তখন মাদুর বগলে করে বাড়ি ফিরে গেল!"

ডাক এসে গেলে কিভাবে সব ছেড়ে ছুটতে হয়, তাও সবাইকে শ্রীরামকৃষ্ণ শেখাচ্ছেন:

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া—রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরা। সকলে শোয়ার একটু পরেই গঙ্গার বান এল। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানা ছেড়ে 'ওরে বান দেখবি আয়' বলে ডাক দিয়ে পোস্তার ওপরে ছুটলেন। সগর্জনে বান এসে গেল—উত্তাল তরঙ্গ উন্মত্তের মতো পোস্তার ওপরে লাফিয়ে পড়তে লাগল। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের মতো আনন্দে নাচতে লাগলেন। এধারে ভক্তগণ ঠিক সময়ে হাজির হতে পারেননি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে কাপড়-চোপড় সামলে বেরুতে হয়েছিল। তাঁরা যখন গেলেন, তখন বান প্রায় চলে গেছে—কেউ সামান্য দেখলেন, কেউ তাও নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এধারে বড় আনন্দে ছিলেন—বান চলে যাবার পরে ভক্তদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন: "কিরে কেমন দেখলি?" তাঁর ধারণা ছিল, সবাই তাঁর সঙ্গে ছুটে এসেছিল। যখন শুনলেন, কাপড়-চোপড় সামলে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে ঠিকভাবে বান দেখা হয়নি, তখন বললেন: "দূর শালারা, তোদের কাপড় পরবার জন্য কি বান অপেক্ষা করবে? আমার মতো কাপড় ফেলে দিয়ে এলি না কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পগুলি সাহিত্যের সম্পদ। সেগুলি কখনো কয়েকটি আঁচড়, কখনো পুরো নক্সা, কখনো একেবারে ছোট গল্প। যেমন পোদোর গল্প—

"এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছোকরা ছিল। লোকে তাকে পোদো বলে ডাকত। গ্রামে একটি পোড়ো মন্দির ছিল। ভিতরে ঠাকুর-বিগ্রহ নাই, মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থ গাছ, অন্যান্য গাছপালা হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে চামচিকে বাসা করেছে। মেঝেতে ধুলো ও চামচিকের বিষ্ঠা। মন্দিরে লোকজনের আর যাতায়াত নাই।

"একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামের লোকেরা শঙ্খধ্বনি শুনতে পেলে। মন্দিরের দিক থেকে শাঁখ বাজছে ভোঁ ভোঁ করে। গ্রামের লোকেরা মনে করলে, হয়তো ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা কেউ করেছে, সন্ধ্যার পর আরতি হচ্ছে। ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে সকলে দৌড়ে দৌড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত—ঠাকুর দর্শন করবে আর আরতি দেখবে। তারই মধ্যে একজন মন্দিরের দ্বার আস্তে আস্তে খুলে দেখে, পদ্মলোচন এক পাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ ভোঁ শাঁখ বাজাচ্ছে—ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা নাই—মন্দির মার্জনা হয় নাই—চামচিকার বিষ্ঠা রয়েছে। তখন সে চেঁচিয়ে বলছে—

> মন্দিরে তোর নাহিক মাধব!
> পোদো, শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল!
> তায় চামচিকে এগারজনা দিবানিশি
> দিচ্ছে থানা—"

গল্পগুলির সামনে ঝুলছে হাসির চিত্রিত যবনিকা, কিন্তু ভিতরে উদ্যত মোহমুদ্গর! ☐

গ্রন্থ-পরিচয়

মহত্তম উপমা-শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ
পলাশ মিত্র

উপমা রামকৃষ্ণস্য : বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। কথামৃত প্রকাশনী, ৫৭সি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। মূল্য : কুড়ি টাকা।

সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষা ও অনবদ্য উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও বাণী আমাদের চিরকালের সম্পদ হয়ে আছে। কথার মধ্যে গল্প এনে, উপমা এনে কথার সৌন্দর্য-মাধুর্য এবং আকর্ষণ এমন পর্যায়ে আর কেউ এনেছেন বলে জানা নেই। উপমার প্রয়োগে তিনি ছিলেন সবার সেরা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পাতায় পাতায় এই সব ছবি সূর্যের মতো ভাস্বর হয়ে আছে। উপমায় কথা পায় নতুন এক মাত্রা। সৌন্দর্যে গভীরতায় এবং ব্যাপ্তির বৈচিত্র্যে সাধারণ কথাও তখন সাহিত্যরসের লাবণ্যে পাঠক ও শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের এইসব উপমা জীবন থেকে নেওয়া। এইসব উপমার গায়ে লেগে আছে সোঁদা মাটির গন্ধ।

উপমার এই অনন্য প্রয়োগে মহাকবি কালিদাসও হার মেনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে একশো চুয়াত্তরটি গল্পের সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা প্রয়োগের অভিনব ও অনন্য উদাহরণ উপস্থাপিত করে সংকলক রূপ-সাগরে ডুব দেবার সুযোগ করে দিয়ে সকলের ধন্যবাদার্হ হলেন। কথামৃতের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং সুরেশচন্দ্র দত্ত সংকলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ থেকেও এখানে দুটি গল্প উদ্ধৃত হয়েছে। প্রতিটি গল্পেরই একটি শীর্ষনাম দিয়েছেন সংকলক। সংকলন-সূত্রও উল্লেখ করেছেন তিনি। ফলে আগ্রহী পাঠক মূলগ্রন্থ পাঠ করার সুযোগও পেতে পারেন।

এই গ্রন্থের জন্য মনোগ্রাহী ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকাটি লিখেছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তিনি যথার্থই বলেছেন : "শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকাশ-কৌশলে ঘরোয়া উপমাও সাহিত্যগুণমণ্ডিত হয়ে যায়।" শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রয়াত দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাণী মুদ্রিত হওয়ায় গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে। গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ শোভন এবং সুন্দর। তবে ৩১ পাতায় গল্পের শিরোনামে 'প্রণাম' বানানে 'দন্ত্য-ন' বড় দৃষ্টিকটু লাগে। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি সব বয়সের পাঠককেই আকৃষ্ট করবে। এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সংকলক ও প্রকাশককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অমর গল্পকার শ্রীরামকৃষ্ণ
কমল নন্দী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গল্পামৃত : সম্পাদনায় পরিমল চক্রবর্তী ও অপর্ণা চক্রবর্তী। রত্না বুক এজেন্সী, ৬১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। মূল্য : বারো টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পগুলি পরিবেশনের গুণে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে গভীর অনুভূতিময় একটি সচেতনতা সৃষ্টি করে। কথকের শক্তিতে গল্পগুলি শাস্ত্রোক্ত প্রবচনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। 'কথামৃতে'র অনুকরণে সেইজন্য নামকরণটি সার্থক। সম্পাদক-দম্পতি গল্পগুলি 'কথামৃত' থেকে আহরণ করে সুবিন্যস্ত করেছেন এক-একটি শিরোনামে। সংকলক-দ্বয়ের প্রচেষ্টা আন্তরিক হলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত গল্প ও সম্পাদকদ্বয়ের আলোচনা কোন কোন ক্ষেত্রে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, যার ফলে ক্ষেত্রবিশেষে আকস্মিক ছন্দপতন ঘটেছে। যেমন পৃঃ ৪—"মানুষের স্বধাম হচ্চে পরব্রহ্ম।" তারপরেই "ত্রিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।" পৃঃ ৩০—'অবতার' শিরোনামায় সব গল্পগুলিই

প্রাসঙ্গিক নয়। এই ধরনের পুস্তিকার সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, অধ্যাত্মপিপাসু পাঠক এতে তৃপ্ত হন না। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব গল্পসর্বস্ব নন; তাঁর জীবন-বেদের গৌণ অংশ হলো এই গল্প বলা। তবে সাধারণ পাঠকের গল্পগুলি ভালই লাগবে মনে হয়। সাধারণ পাঠকদের পক্ষ থেকে বলা যায় যে, এই ধরনের বই তাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে সহজে পৌঁছে দিতে পারে।

ক্যাসেট-সমালোচনা

ক্যাসেটে শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি

হর্ষ দত্ত

'একবার ডাক দেখিরে মন তারে': মাধুরী মিউজিক্যাল, ৬৪বি, বি. কে. পাল এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০০৫। মূল্য: কুড়ি টাকা।

তাঁর নাম চতুর্দিকে প্রচারিত হোক, একধার থেকে লোক ভেঙে পড়ুক অথবা দক্ষিণেশ্বর প্রত্যাশী মানুষদের ভিড়ে বাজার হয়ে যাক—এসব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো চাইতেন না। কেশবচন্দ্র সেনকে কথাচ্ছলে তিনি বলেছিলেন, ফুল ফুটলে মৌমাছিরা তার সৌরভের খবর পেয়ে আপনিই এসে জুটবে। একথা সকলেরই জানা, তাঁর জীবৎকালে মাত্র কয়েক-জন শুদ্ধসত্ত্ব শিক্ষিত যুবক এবং কতিপয় সত্যনিষ্ঠ গৃহীভক্ত সেই সৌরভের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ ঘটে গেল। সারা পৃথিবীতে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে গেল তাঁর অপূর্ব পুণ্য জীবনকথা, তাঁর লোকোত্তর বাণীর অমৃতধারা। তৃষিত তাপিত মানুষের কাছে তখন থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ একটি আশ্রয়, একটি ঘটনা, একটি উত্তরণ-পর্ব। আজও আমাদের কাছে তিনি ধ্রুবসত্য।

গ্রন্থ, সাময়িক পত্র, বক্তৃতাদি, রেকর্ড, ছায়াচিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' সংসারের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। ইদানীং আবার ক্যাসেটের মাধ্যমে তাঁর লীলাকথা ব্যাপক-ভাবে শ্রুতিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। মাধুরী মিউজিক্যাল সংস্থার নিবেদন 'একবার ডাক দেখিরে মন তারে' এই মাধ্যমের একটি সাম্প্রতিক সংযোজন।

ক্যাসেটটির শুরু অনেকটা রেডিও-প্রচারিত 'মহালয়া'র ধাঁচে। 'জীবনের চলার পথে অনুভূত হয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সচল সবাক উপস্থিতি।... তিনি আছেন মুক্ত মনের খোলা হাওয়ায়, দূরে আকাশের নীলিমায়, হতাশার মধ্যে আশ্বাসে, বিভ্রান্তির মধ্যে বিশ্বাসে... আমাদের অন্তরের অন্তর্লোকে।'—ইত্যাদি অলঙ্কৃত বাক্যে সজ্জিত প্রাক্-ভাষ্যটি পাঠ করেছেন জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ইকো প্রয়োগের ত্রুটি অথবা রেকর্ডিং-এর গণ্ডগোল, যেকোন কারণেই হোক, ভাষ্য-পাঠকের গলায় ভাব-গাম্ভীর্য ফুটে ওঠেনি।

'তুমি ব্রহ্ম', 'বৈকুণ্ঠ হতে', 'তুমি, কাঙাল বেশে', 'মা এসেছে' ইত্যাদি নিবেদিত গানগুলি বহুশ্রুত। সহজ সরল সুরের চলন। যন্ত্রানুষঙ্গে স্পষ্টতই সিনথেটাইজার ব্যবহার করা হয়েছে। তবে যন্ত্র-বাদন গানকে ছাপিয়ে ওঠেনি। গায়ক প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবাশিস দত্তের গলা ভাল। একমাত্র গায়িকা সঙ্গীতা পালের কণ্ঠ কিন্তু তেমন সুশ্রাব্য নয়। তালেও দুর্বলতা আছে। সামগ্রিক-ভাবে ক্যাসেটটি মাধুর্যমণ্ডিত হলেও, রেকর্ডিং-এর মান তেমন উন্নতমানের নয়। সংগ্রহযোগ্য ভক্তি-গীতির ক্যাসেট এমন নিম্নমানের কেন হবে? প্রচ্ছদে উল্লিখিত আট ও নয় নম্বর গানদুটি ক্যাসেটে স্থান বদল হয়েছে। এটি একটি ত্রুটি। আরও একটি ত্রুটি, প্রচ্ছদে দুবারই 'দেখিরে' শব্দটি 'দেখিয়ে' লেখা হয়েছে। কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও ক্যাসেটটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগীদের ভালই লাগবে মনে হয়। এই সঙ্গীতাঞ্জলিটির পরিচালক—দেবাশিস দত্ত। সঙ্গীত পরিচালক—প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজক—শ্রীপদ ভট্টাচার্য ও সঙ্গীতা পাল। ☐

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২৭ ডিসেম্বর **বেলড়ু মঠে** শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর আবির্ভাব-উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। সারাদিন ধরে অগণিত ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেছে। দুপুরে বাইশ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। বিকালে স্বামী প্রভানন্দের পৌরোহিত্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্ম-তিথি-উৎসব **জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে** যথারীতি ভোরে মঙ্গলারতি, চণ্ডীপাঠ, বেদগান, পূজা-হোম, জীবনালোচনা এবং উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের মাধ্যমে পালিত হয়। দু-হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান। ২৮ ডিসেম্বর আশ্রমে প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব হয়। প্রায় ত্রিশজন ছাত্র সমবেত ভাবে এই প্রথম স্মৃতিচারণ, খেলাধুলা প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিন অতিবাহিত করে।

২৯ ডিসেম্বর রবিবার শতাধিক ভক্ত বিভিন্ন স্থান থেকে সমবেত হয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধ্যান, ভজন, পাঠ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, প্রসাদ-গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিন অতিবাহিত করেন। এই ভক্তসম্মেলনে গৌহাটী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী ইজ্যানন্দ পৌরোহিত্য করেন।

সারদাপীঠস্থ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২ ও ৩ অক্টোবর '৯১ তারিখগুলিতে আন্তঃশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরের এই প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙলায় আবৃত্তি, প্রবন্ধ রচনা, কুইজ, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, বিতর্ক এবং তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দেড়শতাধিক ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রথিতযশা ব্যক্তিরা বিভিন্ন দিনে এই প্রতিযোগিতাগুলির বিচারক ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, অধ্যক্ষ সুনীল রায়-চৌধুরী, অধ্যক্ষ অত্রিকুমার চ্যাটার্জী, অধ্যক্ষ শীতলপ্রসাদ ভট্টাচার্য, গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডিদাস মাল, বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল মল্লিক, নচিকেতা ভরদ্বাজ, প্রণবেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। ৩ অক্টোবর পুরস্কার বিতরণ সভায় বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী, অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু, বিশিষ্ট মার্গসঙ্গীত শিল্পী সুনন্দা পট্টনায়ক, প্রখ্যাত আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ। সভার শেষে প্রত্যেক বিভাগের সফল প্রতিযোগী এবং অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিযোগী-দের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিদ্যামন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে গত ১৮ নভেম্বর '৯১ তারিখে বিদ্যামন্দিরের প্রযোজনায় ও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর সহযোগিতায় ইনস্টিটিউটের বিবেকানন্দ হলে একটি 'ভজন-সন্ধ্যা'র আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণীয় শিল্পী ছিলেন পণ্ডিত ভীমসেন যোশী এবং অজয় চক্রবর্তী।

গত ২৪ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনা-নন্দজী **ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের** বিবেকানন্দ লাইব্রেরী হল উদ্বোধন করেন। পরে আয়োজিত জনসভায় তিনি লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শিবেশ্বরানন্দ। সভার সভাপতিত্ব করেন উড়িষ্যার ক্রীড়া, সংস্কৃতি, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের মন্ত্রী শরৎকুমার কর। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রসন্নকুমার পট্টনায়ক।

গত ২৫ নভেম্বর '৯১ সকাল ৮-৩০ মিনিটে স্বামী গহনানন্দজী ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিবেকানন্দ এম. ই. স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষা ও তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। ঐদিন সকাল ৯টা থেকে সারাদিনব্যাপী ভক্তসম্মেলনে তিনশতাধিক ভক্ত যোগদান করেন। সম্মেলনে স্বামী গহনানন্দজী, স্বামী ভক্ত্যানন্দ, স্বামী শিবেশ্বরানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ

সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐদিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে স্বামী গহনানন্দজী উড়িষ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভায় যোগদান করেন এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে পরিষদের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৭ নভেম্বর **পুরী রামকৃষ্ণ মঠ** আয়োজিত এক ভক্তসম্মেলনে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী ভাষণ দেন এবং ঐ উপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। ঐদিন তিনি বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উড়িয়া ও তেলেগু ভাষার পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার সরঞ্জাম বিতরণ করেন। তাছাড়া ঐদিন তিনি পেন্টাকোটায় পুরী মঠ-পরিচালিত সেবাকেন্দ্রের শিক্ষানবিসদের দুটি সেলাই কল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বিতরণ করেন।

বোম্বাই আশ্রম পরিচালিত বোম্বাইয়ের সাকোয়ারে অবস্থিত আদিবাসী যুবকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে 'এন্ট্রেপ্রেনার-শিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম'-এর বিদায়ী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি. ডি. তুলজাপুরকার এবং প্রধান অতিথি ছিলেন নাবার্ড (NABARD)-এর মহানির্দেশক পি. কোটাইয়া। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পটি নাবার্ড কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত।

বাড়িষা রামকৃষ্ণ মঠে গত ৯ নভেম্বর বৃদ্ধাবাসের আবাসিকদের কাছে 'ধর্ম কি ও কেন' বিষয়ে একটি ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। পরদিন সকালে মঠের পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্রে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয়। আবাসিকগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য উৎসাহের সঙ্গে বিক্রয়কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করেন।

পরিদর্শন

গত ৬ নভেম্বর '৯১ রাষ্ট্রপতি আর. বেঙ্কটরামন তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্যসহ **কালাডি আশ্রম** পরিদর্শন করেন। কেরালার রাজ্যপাল বি. রাচাইয়া ও মুখ্যমন্ত্রী কে. করুণাকরণ এবং কেন্দ্রীয় মানব-সম্পদ মন্ত্রী অর্জুন সিং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন।

গত ৪ নভেম্বর কেন্দ্রীয় ইস্পাত দপ্তরের মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব এবং ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী সুরজিৎ দত্ত **বিবেকনগর (ত্রিপুরা) আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

গত ৮ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি আর. বেঙ্কটরামন **কোয়েম্বাটোর আশ্রম** পরিদর্শন করেন এবং আশ্রম-বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

দন্ত-চিকিৎসা শিবির

পুরী রামকৃষ্ণ মঠের ব্যবস্থাপনায় গত ২৬ ও ২৭ নভেম্বর দু-দিনের এক দন্ত-চিকিৎসা শিবিরে মোট ১৮৯ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা) : গত ১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় এই বেদান্ত সোসাইটিতে নববর্ষ উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ১২ জানুয়ারি শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ। ২৫ জানুয়ারি রামনাম ভজন এবং ১১ ও ১৯ জানুয়ারি যথাক্রমে স্বামী সারদানন্দজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালিত হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পুজো, পাঠ, ভক্তিগীতি, অঞ্জলি-প্রদান ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। ১৯ জানুয়ারি স্বামী প্রমথানন্দ টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড হিজ মেসেজ' বিষয়ে একটি ভাষণ দিয়েছেন।

১৭-১৯ জানুয়ারি নায়গ্রা জলপ্রপাতের সন্নিকটে এই বেদান্ত সোসাইটির পরিচালনায় বার্ষিক শীত-কালীন সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে জপ-ধ্যানাদির সঙ্গে উপনিষদ্ ও গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ওপর ক্লাস হয়েছে। শিবির পরিচালনা করেন স্বামী প্রমথানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (ক্যালি-ফোর্নিয়া) : জানুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে যথারীতি ধর্মীয় ভাষণ হয়েছে। বুধবারগুলিতে উপনিষদ্ ও বিবেকচূড়ামণির ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী প্রপন্নানন্দ। তাছাড়া প্রতি শনিবার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি পুজো, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। সভায় স্বামী বিবেকানন্দের ওপর ভাষণ দিয়েছেন

এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রশ্বাদ্মানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ, মিস্টার চুক চাট্টেন ও মিসেস বারবারা পাউয়েল।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো): গত জানুয়ারি মাসের প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। তাছাড়া তিনি ঐ কেন্দ্রের পুরনো মন্দিরে বেদান্ত শাস্ত্রের ক্লাস নিয়েছেন। ১ জানুয়ারি পূজা, অঞ্জলি প্রদান, ভক্তিগীতি পরিবেশন ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে নববর্ষ পালিত হয়। ২৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়েছে। পূজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, জপ-ধ্যান, সঙ্গীতানুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক: জানুয়ারি মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ। ২৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তিনি 'স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড হিজ মেসেজ অব বেদান্ত' বিষয়ে একটি বিশেষ ভাষণ দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি প্রতি শুক্রবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী সুর্ষানন্দ (সরোজ) গত ২১ নভেম্বর সন্ধ্যা ৫-৪৬ মিনিটে ৮৩ বছর বয়সে কনখল সেবাশ্রম হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। গত ১৮ নভেম্বর উত্তরকাশী কুঠিয়ায় দুপুর প্রায় ১টায় কাপড়ে আগুন লেগে তিনি সাংঘাতিকভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উত্তরকাশী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অধিকতর ভাল চিকিৎসার জন্য তাঁকে কনখল সেবাশ্রম হাসপাতালে আনা হয়। যথাসাধ্য ভাল চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ঐ বছরই বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে ইনস্টিটিউট অব কালচার, উদ্বোধন, বারাণসী সেবাশ্রম ও বেলুড় সারদাপীঠের কর্মী ছিলেন। রেঙ্গুন এবং রামহরিপুর কেন্দ্রের প্রধানরূপেও তিনি কাজ করেছেন। কিছু সময় তিনি বেলুড় মঠের প্রধান কার্যালয়ে আইন সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করতেন। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি উত্তরকাশী কুঠিয়ার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। সরল ও কঠোর জীবন-যাপনের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

জাতীয় যুবদিবস

গত ১২ জানুয়ারি '৯২ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। বিকাল তিনটায় শ্রোতৃ-পরিপূর্ণ সারদানন্দ হল-এ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এরপর শুরু হয় বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতি-যোগিতা। বয়স অনুযায়ী প্রতিযোগীদের দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। 'ক' বিভাগে ১৫ থেকে ২১ বছর এবং 'খ' বিভাগে ২২ থেকে ৩০ বছর বয়সের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। ক ও খ বিভাগে বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে 'স্বামী বিবেকানন্দের মানবপ্রেম' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-ভাবনা'। আবৃত্তির বিষয় ছিল যথাক্রমে 'স্বদেশমন্ত্র'/'To the Awakened India' এবং 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'/'Angels Unawares'। ১৫ থেকে ২০ বছরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা'। সন্ধ্যা ছটায় আয়োজিত হয় প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা। ১৮৯২ থেকে ১৮৯৭-এর মধ্যে স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে প্রতিযোগীদের প্রশ্ন করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধি-কারীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগীদের মোট সংখ্যা ছিল ১০০ জন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। ☐

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে (কলকাতা) গত ১১ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক 'শিকাগো দিবস' পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে ঐ ধর্মমহাসভার পটভূমি, তাৎপর্য ও স্বামীজীর অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। তাছাড়া ধর্ম-মহাসভায় প্রদত্ত স্বামীজীর কয়েকটি ভাষণের ওপর বক্তব্য রাখেন অরূপ নন্দী, পঞ্চানন হালদার, ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারক দে এবং বিকাশ ঘোষ। বিদায়ী ভাষণ দেন দীপ্তিকুমার শীল।

২৮ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার ১২৫তম জন্ম-জয়ন্তী পালিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা। প্রধান অতিথি ছিলেন সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। সভায় ভগিনী নিবেদিতার বহুমুখী কার্যাবলী ও আত্ম-ত্যাগের বিষয় আলোচিত হয়।

২৯ অক্টোবর সোসাইটিতে ইন্দ্রনারায়ণ মিত্র ও বিভাবতী মিত্র স্মারক বক্তৃতা দেন উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রসারে স্বামী সারদানন্দ'।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, উত্তর ব্যাঁটরা, হাওড়া: গত ১৫-১৭ নভেম্বর '৯১ এই আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ-পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ১৫ নভেম্বর অপরাহ্ণে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী বোধসারা-নন্দ। ভাষণ দেন আশ্রম-সভাপতি কালীকেশব বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতিনাট্য পরিবেশন করে হাওড়ার 'কল্পতরু' সংস্থা। ১৬ নভেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। সন্ধ্যায় অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত লক্ষ্মীকান্ত দাসের পরিচালনায় ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়। ১৭ নভেম্বর ছিল সাধারণ উৎসব। ঐদিন বিশেষ পূজা, পাঠ, সঙ্গীতানুষ্ঠান, গীতি-আলেখ্য, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভৈরবানন্দ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রম-সম্পাদক রঘুনাথ দে। সন্ধ্যায় সারদাপীঠের জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

ইন্দ্রাণী পার্ক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র গত ২৪ নভেম্বর শারদ-সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। এই উপলক্ষে একটি হোমিও মেডিক্যাল ক্যাম্প, সেমিনার, গীতি-আলেখ্য ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব এবং মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন স্বামী তত্ত্বস্থা-নন্দ। সেমিনারের উদ্বোধন করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে ধর্ম ও সমাজসেবা'। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী-দের মধ্যে ছিলেন ডঃ জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জী, প্রণব মুখার্জী প্রমুখ। তাছাড়া অনেক যুবপ্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সান্ধ্য অধিবেশনের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভৈরবানন্দ, বক্তব্য রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। পরে 'নদের নিমাই' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘে গত ৫ নভেম্বর '৯১ প্রতিবারের মতো 'বরাভয়-লীলা' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৭ ডিসেম্বর '৯১ শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১০টায়। অপরাহ্ণ ৫টায় 'মায়ের কথা' পাঠ ও

ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কেয়া ঘোষ। পরবর্তী অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্যামলী বসু। সর্বশেষে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মিতা বসু।

নববারাকপুর শ্রীসারদা সঙ্ঘ : গত ১৭ নভেম্বর '৯১ কালীবাড়ী রোডস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে সঙ্ঘের দ্বাদশ বার্ষিক আধ্যাত্মিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১৪০ জন মহিলা প্রতিনিধি যোগদান করেন। শিবিরে ভাষণ দান ও আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অমৃতপ্রাণা, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা। বিকাল ৪-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমবেত প্রতিনিধিদের মধ্যে এই শিবির খুবই আগ্রহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

বৈশালী পার্কে (কলকাতা) সারদা-রামকৃষ্ণ মিলনমন্দিরের ব্যবস্থাপনায় গত ৩১ অক্টোবর '৯১ একটি বিশেষ অনুষ্ঠান শিশুদের বস্ত্র বিতরণ, ধর্মালোচনা, ভজনাঞ্জলির মাধ্যমে পালিত হয়। গত ৩ নভেম্বর কালীঘাটের কুষ্ঠরোগীদের ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। বিতরণ করেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডঃ সরোজ গুপ্ত। ৫ নভেম্বর প্রতিবন্ধী শিশুদের ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করেন বড়িষা রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গোপেশানন্দ।

১০ নভেম্বর ভবানীপুরের নর্দান পার্কে ভারত বয়েজ স্কাউট ও গাইডস হলে আয়োজিত ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অজিতনাথ রায়। ঐদিন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সম্পর্কে একটি স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গুরুবাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে উদ্যোক্তাদের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন। সভার সূচনায় সেটি পাঠ করে শোনান মিলনমন্দিরের অধ্যক্ষ অহিভূষণ বসু। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী কিভাবে তাঁর সমস্ত কর্মে ও আচরণে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর আদর্শকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নৈর্ব্যক্তিক গুরুবাদের মহান ঐতিহ্যকে তিনি কিভাবে আমৃত্যু সঙ্ঘগুরু হিসাবে তুলে ধরেছিলেন, সে-বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ, স্বামী গোপেশানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ডাঃ সুদর্শন (কর্ণাটক) এবং বিচারপতি অজিতনাথ রায়। বিপুল সংখ্যক ভক্ত নরনারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, গৌরীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের সম্পাদিকা **শ্রীমতী ভ্রমর সেন** গত ১৫ আগস্ট উক্ত আশ্রমেই পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

ডিগবয় (আসাম) আশ্রমের কর্মী **হরিমোহন দে (সাধুবাবু)** গত ২ অক্টোবর পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। আশ্রমের প্রথম থেকেই তিনি সেখানকার আবাসিক কর্মী ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন সরল, অমায়িক ও নিরলস। বহু মানুষ নানাভাবে তাঁর নিকট উপকৃত হয়েছেন।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **কানাইলাল ঘোষ** গত ৬ নভেম্বর '৯১ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে পিকনিক গার্ডেনের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তাঁর পিতা ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ ও মাতা সুখবালা ঘোষ ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্র-শিষ্য। এই সুবাদে শৈশবে তিনিও শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করেন। রামকৃষ্ণ মঠের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসী তাঁদের দিনাজপুরস্থ (অধুনা বাংলাদেশে) পৈত্রিক বাড়িতে গিয়েছেন। উল্লেখ্য, বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর পৈত্রিক বাড়িতেই প্রথম স্থাপিত হয়। □

বিজ্ঞান-সংবাদ

ঔষধ প্রতিহতকারী ম্যালেরিয়ায় চীনা ঔষধি

বর্তমানকালে কয়েক শ্রেণীর ম্যালেরিয়া-জীবাণু চালু ঔষধগুলিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা অর্জন করায় ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ম্যালেরিয়ায় ক্লোরোকুইন ঔষধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কোন কোন ম্যালেরিয়া-জীবাণু ক্লোরোকুইন প্রতিহতকারী ক্ষমতা (resistance) অর্জন করেছে; তার মধ্যে প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম জীবাণুই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা অর্জন করেছে। এই ফ্যালসিপেরাম জীবাণু পূর্বভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে খুব বেশি আছে। এই জীবাণুর কিছু কিছু শুধু ক্লোরোকুইনের বিরুদ্ধেই নয়, অন্যান্য ম্যালেরিয়ার ঔষধের বিরুদ্ধেও প্রতিহতকারী ক্ষমতা পেয়েছে। ফ্যালসিপেরাম জীবাণুই সাংঘাতিক জ্বর সৃষ্টি করে এবং এর আক্রমণে মৃত্যুহারও খুব বেশি। সেজন্য ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় এই জীবাণুই এখন মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং একে নিয়ে বহু গবেষণাও চলছে। সুখের বিষয় যে, এই জীবাণু এখনো কুইনাইনের বিরুদ্ধে প্রতিহতকারী ক্ষমতা পায়নি; তবে কুইনাইনের কার্যকারিতা আধুনিক ব্যবহৃত ঔষধগুলির চেয়ে কম।—যুগ্ম সম্পাদক

চীনদেশের ঔষধি থেকে প্রস্তুত 'আর্টিথার' (arteether) নামক ম্যালেরিয়ার ঔষধটির মানুষের চিকিৎসায় কার্যকারিতা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শীঘ্রই আরম্ভ হতে চলেছে নেদারল্যান্ডে। এর দায়িত্বে আছে ইউ. এন. ডি. পি. (UNDP), বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।

একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছে যে, প্রারম্ভিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব নতুন ধরনের ম্যালেরিয়া-জীবাণুর আক্রমণে চালু চিকিৎসায় কোন কাজ হয় না, সেখানে আর্টিথার এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য যোগ খুব কার্যকরী হয়েছে।

'আর্টিমিশিন' (artemisin) বা কুয়িংহাওসু (quinghaosu) ঔষধি থেকে প্রস্তুত ঔষধ দু-হাজার বছর আগে থেকে ম্যালেরিয়া ও আনুষঙ্গিক শীত-কম্প বা জ্বরের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর্টিথার চীনদেশের এবং চীন বহির্ভূত দেশের নানা হাসপাতালে বিশ লক্ষেরও বেশি মাত্রায় ঐসব রোগে ব্যবহৃত হয়েছে। এথেকেই এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হচ্ছে।

এই ঔষধের সবচেয়ে বড় অবদান হলো মস্তিষ্কের (cerebral) ম্যালেরিয়ার মৃত্যুহার কমিয়ে দেওয়া; যেখানে অন্য চিকিৎসায় মৃত্যুহার ২০-৩০ শতাংশ, সেখানে আর্টিমিশিন ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যুহার দাঁড়ায় ১০ শতাংশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, মৃত্যুহারের এই বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে আর্টিমিশিন শরীরের কোষস্থিত ম্যালেরিয়া-জীবাণুকে বার করে দেয়, জ্বর কমিয়ে দেয় এবং সংজ্ঞাহীনতাকে দমিত করে।

যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হতে চলেছে, তাতে প্রথমে দেখা হবে, নেদারল্যান্ডের সুস্থ লোকদের শরীরে এই ঔষধের কোন কুফল হয় কিনা। তার ফলাফল দেখে এই ঔষধ প্রয়োগ করা হবে ম্যালেরিয়া-রোগীদের ওপর এবং তুলনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সমান সংখ্যক ম্যালেরিয়া-রোগীকে দেওয়া হবে বর্তমানে চালু অন্যান্য ম্যালেরিয়ার ঔষধ।

দেখা যাচ্ছে যে, আফ্রিকা মহাদেশে বছরে ২৭ কোটি লোকের ম্যালেরিয়া হয় এবং দশ লক্ষেরও বেশি মারা যায়; মৃতদের মধ্যে বেশির ভাগই শিশু। এই অসুখের কবলে পড়ে একশোরও বেশি গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। যত আন্তর্জাতিক ভ্রমণ বাড়বে ততই ইউরোপ ও আমেরিকার ম্যালেরিয়ামুক্ত দেশগুলিতে এই রোগের অনুপ্রবেশ ঘটবে। □

[Medical Times, November, 1991, p. 6

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে।... প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির মৃত্যুও ঘটে।... যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

কার্বাঙ্কল, পোষ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া
বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া
কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।

"—নিঃশ্বাস ফেলা, এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার জো নাই। তাই কর্ম করবে, কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হতে পারে, সে-বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

Doing good to others out of compassion is good, but the seva (service) of all beings in the spirit of the Lord is better.

Swami Vivekananda

There is no higher virtue than charity. The lowest man is he whose hand draws in receiving ; and he is the highest man whose hand goes out in giving.

Swami Vivekananda

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।... তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভালকাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

Fill the mind with the highest thoughts, hear them day after day, think them month after month. The ideal of man is to see God in everything. But if you cannot see Him in everything see Him in one thing, in that thing which you like best, and then see Him in another. So on you can go. Swami Vivekananda

Be not a traitor to your thoughts. Be sincere; act according to your thoughts, and you shall surely succeed.

Swami Vivekananda

POWER

অমৃত কথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতি মাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

Faith, sympathy, fiery faith and fiery sympathy! Faith, faith, faith in ourselves, faith, faith in God—this is the secret of greatness.

Swami Vivekananda

Pray to God with all your might. One has to work. Can anything be achieved without work ? Even in the midst of household duties one must make time for prayer.

Sri Ma Sarada Devi

When a father's photograph is seen the father is remembered. In the same way, by the worship of an image the form of the Truth is awakened in the mind.

Sri Ramakrishna

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

৯৪তম বর্ষ চৈত্র ১৩৯৮

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চুয়াল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঞ্চাশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা

বর্তমান সংখ্যার মূল্য ছয় টাকা

Statement about Ownership and Other Particulars of

UDBODHAN

FORM IV

Place of Publication :	1, Udbodhan Lane, Baghbazar Calcutta-700003
Periodicity of its Publication :	Monthly
Printer's Name	Swami Satyavratananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
Publisher's Name	Swami Satyavratananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
Editor's Name	Swami Satyavratananda & Swami Purnatmananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
Name & Address of individuals who own the Newspaper	Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal

Swami Bhuteshananda	*President*	do
Swami Ranganathananda	*Vice-President*	do
Swami Gahanananda	*General Secretary*	do
Swami Atmasthananda	*Asstt. Secretary*	do
Swami Gitananda	" "	do
Swami Prabhananda	" "	do
Swami Satyaghanananda	*Treasurer*	do
Swami Bhajanananda		do
Swami Gautamananda		do
Swami Hiranmayananda		do
Swami Mumukshananda		do
Swami Prameyananda		do
Swami Shivamayananda		do
Swami Smaranananda		do
Swami Tattwabodhananda		do
Swami Vagishananda		do
Swami Vandanananda		do

I, Swami Satyavratananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI SATYAVRATANANDA
Signature of Publisher

Date : 1. 3. 1992.

Printed in compliance with the Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

চৈত্র ১৩৯৮ মার্চ ১৯৯২ ৯৪তম বর্ষ—৩য় সংখ্যা

দিব্য বাণী

প্রপঞ্চসৃষ্ট্যুন্মুখলাস্যকায়ৈ, সমস্ত সংহারকতাণ্ডবায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
প্রদীপ্তরত্নোজ্জ্বল-কুণ্ডলায়ৈ, স্ফুরন্মহাপন্নগ-কুণ্ডলায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র ঃ শঙ্করাচার্য

কথাপ্রসঙ্গে

প্রসঙ্গ অর্ধনারীশ্বর

হিন্দুদের দেবদেবীর মধ্যে জনপ্রিয়তার বিচারে অগ্রগণ্য সম্ভবতঃ শিব। প্রাক্-বৈদিক যুগে তিনি প্রধান দেবতা-রূপে পূজিত হইতেন, বৈদিক যুগেও তিনি অন্যতম প্রধান দেবতারূপে বন্দিত ; পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত এবং পরবর্তী যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ধর্মসাহিত্য, লোকসাহিত্য, ধর্মজীবন এবং লোক-জীবন—সর্বত্র দেবদেবীগণের মধ্যে শিবেরই প্রায় একাধিপত্য। তত্ত্বভাবনায় এবং রূপকল্পনায় এত বৈচিত্র্য, এত চমৎকারিত্ব এবং এত ভাবাবেগ অপর কোন দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বর্ণহিন্দু, নিম্নবর্ণ, আদিবাসী, উপজাতি, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বি-শেষে সকলের হৃদয়ের এত কাছাকাছি অপর কোন দেবদেবী আসিতে পারেন নাই। হিন্দু দেবদেবীর বিস্তৃত তালিকায় 'দেবাদিদেব', 'মহাদেব', 'মহেশ্বর' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক অভিধাগুলি শুধুমাত্র শিবের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত।

শিবের একটি বিশেষ রূপ অর্ধনারীশ্বর। এই রূপটি হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে অনন্য। ইহার যেমন একটি ধর্মীয় এবং দার্শনিক তাৎপর্য রহিয়াছে, তেমনই রহিয়াছে একটি সামাজিক তাৎপর্যও। 'শিবরাত্রি' উপলক্ষে শিবের অর্ধ-নারীশ্বর রূপ ও তাহার তাৎপর্য প্রসঙ্গ বর্তমান সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে আলোচিত হইতেছে।—**যুগ্ম সম্পাদক**

॥ ১ ॥

মহাকবি কালিদাস তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য রঘুবংশের সূচনায় (১।১) লিখিয়াছেন ঃ

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ॥

কালিদাস বলিতেছেন, শব্দ এবং অর্থ যেমন পরস্পরের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধযুক্ত, জগতের জননী এবং জনক পার্বতী এবং মহেশ্বরও তেমনই সতত পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

'কালিদাসের কাল' লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে। তবে মোটামুটি বলা যায় যে, আজ হইতে কম-বেশি দেড়-হাজার বছর আগে তিনি বর্তমান ছিলেন। সুতরাং শিব-পার্বতীর যুগ্ম বা মিলিত রূপ-কল্পনা বা অর্ধ-নারীশ্বরের রূপ-ভাবনা যে দেড়-হাজার বছর আগের, সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বস্তুতঃ, শিবের বা শিব-গৌরীর বা উমা-মহেশ্বরের অর্ধনারীশ্বর রূপ, যাহাতে একই দেহের অর্ধাংশে শিব এবং অপর অর্ধাংশে শিবানী, বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

শিবের এই বিশেষ রূপ বা মূর্তিটির উদ্ভব ঠিক কখন হইয়াছে, বলা কঠিন। বৈদিক ঋষিগণ মূর্তিপূজক ছিলেন না, কিন্তু প্রাক্-বৈদিক যুগে অথবা বৈদিক যুগের সমকালীন সিন্ধু-সভ্যতার যুগে মূর্তিপূজার বহুল প্রচলন ছিল। তবে সিন্ধু-

সভ্যতার যুগের যেসব দেবমূর্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলি শিবমূর্তি বা শক্তিমূর্তি বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেও উভয়ের সংমিশ্র যুগলমূর্তি অথবা 'অর্ধনারীশ' বা 'অর্ধনারীশ্বর' মূর্তির নিদর্শন মেলে নাই। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি হইতে দেখা যায় যে, গুপ্তযুগে (তৃতীয়-পঞ্চম শতাব্দী) এবং কুষাণ যুগে (প্রথম-তৃতীয় শতাব্দী) মূর্তিপূজা হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয় হইতে শুরু করিয়াছিল। মজার বিষয় হইল যে, গুপ্ত এবং কুষাণ যুগের যেসব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূর্তির ডানদিকে সায়ুধ অর্ধ-মহাদেব, বামদিকে অর্ধপার্বতী। গুপ্ত ও কুষাণ যুগের এই অর্ধনারীশ্বর মূর্তিগুলিই এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্ধনারীশ্বর মূর্তির প্রাচীনতম নিদর্শন। দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর এবং দরশুরামের প্রাচীন মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিগুলি চোল-যুগের (নবম-দশম শতাব্দীর) বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

কালিদাস সম্পর্কে কিংবদন্তী যে, তিনি গুপ্ত-সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বা বিক্রমাদিত্যের (চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী) নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। গুপ্তযুগের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি এবং কালিদাসের শিব-পার্বতীর সংমিশ্র রূপকল্পনায় ইহাই প্রমাণিত যে, শিবের এই বিশেষ রূপটি হিন্দুদের মধ্যে কালিদাসের পূর্ব হইতেই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া-ছিল। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, কালিদাসের বন্দনাটি 'অর্ধনারীশ্বর' কল্পনার জনক। গুপ্তযুগের অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি এবং কালিদাসের রচনা উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর তাহা নিরূপিত না হইলে কালিদাসের রচনাকে সেই সম্মান দেওয়া চলে না। পক্ষান্তরে, প্রাপ্ত মূর্তি এবং কালিদাসের পার্বতী-পরমেশ্বর স্তুতি হইতে ইহাই সুস্পষ্ট যে, অর্ধ-নারীশ্বর কল্পনা ও মূর্তি পূর্ব হইতেই প্রচলিত না থাকিলে গুপ্তযুগের মূর্তি এবং কালিদাসের রচনায় তাহার প্রকাশ দেখা যাইত না। [ত্রিপুরা এবং নেপালে কিছু মুদ্রা ও মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যাহাতে লক্ষ্মী-নারায়ণের অর্ধনারীশ্বর রূপ দেখানো হইয়াছে। তবে স্পষ্টতই ঐ মুদ্রা ও মূর্তিগুলি বহু পরবর্তী কালের এবং উমা-মহেশ্বরের অর্ধনারীশ্বর রূপ ও কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত।] বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ, কালিদাসের সমকালীন অথবা কিছু পরবর্তী কালের (ষষ্ঠ শতাব্দী) জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির তাঁহার 'বৃহৎ-সংহিতা'য় (৫৮।৪৩) শিবমূর্তির প্রতিমালক্ষণ বর্ণনা-কালে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিরও বর্ণনা দিয়াছেন। উহা হইতেও আমাদের পূর্বোক্ত ধারণার যৌক্তিকতা সমর্থিত হয়।

বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন কয়েকটি পুরাণে অর্ধ-নারীশ্বরের উল্লেখ বা বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মহাপুরাণগুলি খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী হইতে খ্রীস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান রূপ পাইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। এই পুরাণগুলির সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায় যে, কালিদাসের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে অর্ধনারীশ্বর রূপের কল্পনা ও মূর্তি-ধারণা ভারতবর্ষে ছিল। মৎস্যপুরাণে সুস্পষ্টভাবে এবং সবিস্তারে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বর্ণিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণে দেবগণের প্রতিমালক্ষণ বর্ণনা-অধ্যায়ে (২৬০।১-১০) অর্ধনারীশ্বর মূর্তির যে-বিবরণ পাইতেছি তাহা নিম্নরূপ ঃ

অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি অর্ধনারীশ্বরং পরম্।
অর্ধেন দেবদেবস্য নারীরূপং সুশোভনম্ ॥
ঈশার্ধে তু জটাভাগো বালেন্দুকলয়া যুতঃ।
উমার্ধে চাপি দাতব্যৌ সীমন্ততিলকাবুভৌ ॥

*

অর্ধনারীশ্বরস্যেদং রূপমস্মিন্নুদাহৃতম্ ॥

—অধুনা দেবদেবের পরম অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বিষয়ে বলিতেছি। তাঁহার অর্ধাংশে সুশোভন নারী-রূপ বিরাজিত। তাঁহার অর্ধাংশ ঈশমূর্তিতে বালচন্দ্র-কলাযুক্ত জটাভার এবং যে-অর্ধে উমামূর্তি তাহাতে সীমন্ত ও তিলক উভয় অর্পণ করিতে হইবে।

*

ইহাই অর্ধনারীশ্বরের রূপ।

বায়ুপুরাণ (৯।৭৫-৮০) এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৯।৭০-৭২) দেবাদিদেবের অর্ধাঙ্গে নারী ও অর্ধাঙ্গে নর রূপে আবির্ভাব-প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড, ৫৬।৫৫-৫৬) বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মার যজ্ঞ-সমাপ্তির পর শিব ও পার্বতী ব্রহ্মা-পত্নী সাবিত্রীকে যজ্ঞস্থানে আনয়ন করিতে যাইলে সাবিত্রী শিব ও পার্বতীকে একদেহ হইবার বরদান করিয়াছিলেন ঃ

শরীরার্ধে চ তে গৌরী স্থাস্যতি শঙ্কর।
অনয়া শোভসে দেব ত্বয়া ত্রৈলোক্যসুন্দর॥

পরবর্তী কালে রচিত কালিকাপুরাণে (নবম-দশম শতাব্দী?) হর-গৌরীর অর্ধনারীশ্বর রূপ গ্রহণের যে-উপাখ্যান রহিয়াছে তাহাতে বলা হইতেছে যে, একদা গৌরী মহাদেবের হৃদয়ে এক নারীর ছায়া দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং ক্রুদ্ধ হন। মহাদেব তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন, ঐ ছায়া অন্য নারীর নহে, উহা গৌরীরই ছায়া। গৌরী সে-কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া নিজদেহ মহাদেবের দেহে মিলিত করিতে চাহিলেন ঃ

যথা তবাহং সততং ছায়েবানুগতা হর।
ভবেয়ং সাহচর্যেণ তথা মাং কর্তুমর্হসি॥
সর্বগাত্রেণ সংস্পর্শং নিত্যালিঙ্গনবিভ্রমম্।
অহমিচ্ছামি ভবতস্তত্ত্বত্তেৎ কর্তুমর্হসি॥
(কালিকাপুরাণ, ৪৫৷১৪৯-১৫০)

—হে হর, সতত সাহচর্যে যাহাতে আমি ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগত হইতে পারি, তুমি তাহাই কর। তোমার সর্বগাত্রের (সর্বাঙ্গের) স্পর্শ এবং নিত্য আলিঙ্গন-সুখ যাহাতে আমি পাই, তুমি তাহাই কর।

মহাদেব বলিলেন, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। তুমি আমার অর্ধশরীর গ্রহণ কর। তাহা হইলে আমার অর্ধশরীর নারী হইবে, অর্ধশরীর হইবে পুরুষ। তুমি যদি তোমার শরীর দুই অর্ধে বিভক্ত কর, তাহা হইলে আমি তোমার অর্ধশরীর আমার শরীরে হরণ করিয়া লইব।

দেবী বলিলেন ঃ আমি তোমার অর্ধ দেহ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিব, কিন্তু যে-সময় সেই দেহার্ধ ত্যাগ করিব সেইসময় উভয় দেহ যেন পুনর্বার সম্পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বর রাজি হইলেন। উভয়ে উভয়ের অর্ধশরীর হরণ করিলেন ঃ

এবমস্তু ভবেন্নিত্যং যথার্ধং হর্তুমর্হসি।
শরীরস্যার্ধহরণং ভূয়স্তব যথেপ্সিতম্॥
(কালিকাপুরাণ, ৪৫৷১৫৮)

পরবর্তী কালের অন্যান্য যে-সকল গ্রন্থে অর্ধ-নারীশ্বর প্রসঙ্গ রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে শারদা-তিলক-তন্ত্র (দশম-একাদশ শতাব্দী), নারদ-পঞ্চরাত্র (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী), তন্ত্রসার (ষোড়শ শতাব্দী) এবং প্রাণতোষিণী তন্ত্র (অষ্টাদশ শতাব্দী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শারদাতিলক-তন্ত্রে (১৯৷৫৮) অর্ধনারীশ্বরের ধ্যান-মন্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ

নীলপ্রবালরুচিরং বিলসত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপলকপালকশূলহস্তম্।
অর্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রূপম্॥

—নীলপ্রবালের বর্ণ সমন্বিত, ত্রিনেত্র, পাশ, রক্তপদ্ম, কপাল এবং শূল-হস্ত (চতুর্ভুজ), অর্ধাঙ্গে অম্বিকা এবং অর্ধাংশে ঈশ (শিব), দুইভাগে বিভক্ত উভয়ের অলংকার ভূষিত, মস্তকে শিশুচন্দ্রশোভিত (অর্ধ-নারীশ্বর) রূপকে আমি প্রণাম করি।

উপরি-উক্ত ধ্যানমন্ত্রটি তন্ত্রসারেও বিদ্যমান।

আচার্য শঙ্কর (৭৮৮-৮২০ খ্রীস্টাব্দ) বিরচিত অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্রটি ভাষা ও ভাবের চমৎকারিত্বে অতুলনীয়। আচার্যের এই স্তোত্রটি সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নহেন। তাঁহার 'অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্রটি' 'হরগৌর্যষ্টক' নামেও কোথাও কোথাও উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিদ্যাপতির অর্ধ-নারীশ্বর সম্পর্কে একটি সুন্দর স্তোত্র পাওয়া যায়। অর্ধনারীশ্বর-রূপের বর্ণনা করিয়া বিদ্যাপতি বলিতেছেন ঃ

জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি।
জয় অর্ধপুরুষ জয়তি অর্ধনারী।

*

ভনে কবিরঞ্জন বিধাতা জানে।
দুই [এ] কত্র বাঁটল এক পরাণে॥

একটি প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, শিবের এই বিচিত্র রূপটির কি কোন বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে? উত্তরে বলিব, অবশ্যই রহিয়াছে। এ-সম্পর্কে টি. এ. গোপীনাথ রাও উল্লিখিত অর্ধনারীশ্বর-মূর্তির উদ্ভব সংক্রান্ত একটি উপাখ্যান যথেষ্ট আলোকপাত করে। উপাখ্যানটি হইল এই ঃ

একদা দেবতা এবং ঋষিগণ কৈলাসে হর-পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। ঋষি ভৃঙ্গী ছিলেন শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি পার্বতীকে অগ্রাহ্য করিয়া শুধুমাত্র শিবকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। ঋষি ভৃঙ্গীর এই স্পর্ধিত উপেক্ষায় পার্বতী অপমানিত বোধ করেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃঙ্গীকে নিছক চর্ম-আবৃত কঙ্কালে পরিণত করেন। ফলে ভৃঙ্গী দু-পায়ে দাঁড়াইতেও অক্ষম হইয়া পড়েন। ভক্তের প্রতি অনুকম্পাবশে শিব ভৃঙ্গীকে

তৃতীয় পদ দান করেন, কিন্তু পার্বতীর সম্মান রক্ষার্থে স্বয়ং পার্বতীর সঙ্গে একদেহ হইয়া তিনি অর্ধনারীশ্বর-রূপে অবস্থান করেন, যাহাতে ভৃঙ্গী পার্বতীকেও প্রদক্ষিণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু 'ঘণ্টাকর্ণ' (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গোঁড়া শিবভক্ত ঘণ্টা-কর্ণের গল্প রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের পাঠকদের অবিদিত নহে। দ্রঃ 'কথাপ্রসঙ্গে', উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮) ভৃঙ্গীর পোড়া গোঁড়ামি যাইবার নহে। তিনি তখন বক্রকীট-রূপে হর-পার্বতীর যুগ্মদেহের মধ্যে গর্ত করিয়া শুধু শিবদেহার্ধ প্রদক্ষিণ করিতে থাকিলেন। (**Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Pt. I, The Law Printing House, Madras, 1916, pp. 322-323**)

গোপীনাথ রাও উপাখ্যানটির আকর-নির্দেশ করেন নাই। তবে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, এই উপাখ্যানটির সূত্র অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের কোন 'শৈব' পুরাণ, যখন শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দানা বাঁধিতে শুরু করিয়াছে এবং আপন-আপন সম্প্রদায়ের প্রধান দেব-দেবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। অধ্যাপক ব্যানার্জী মনে করেন, কালের বিচারে অর্ধনারীশ্বরের রূপ-ভাবনা এই উপাখ্যানের বহু পূর্বের। (দ্রঃ **Development of Hindu Iconography, University of Calcutta, 1956, p. 553**) তবে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি কতখানি তীব্র হইতে পারে উপরোক্ত পৌরাণিক উপাখ্যান হইতে তাহা স্পষ্ট।

উপাখ্যানটি পরবর্তী কালের হইলেও উহাতে অর্ধনারীশ্বর-ভাবনার মূলতত্ত্ব ও দার্শনিক তাৎপর্যটি কিন্তু নিহিত। তাহা হইল ঃ ঈশ্বর বা সত্য বস্তুতঃ এক। পরম ঈশ্বর বা পরম সত্যের নিত্য-রূপের নাম 'শিব' এবং লীলা-রূপের নাম 'পার্বতী'। শব্দ এবং অর্থ যেমন অচ্ছেদ্য, অবিচ্ছিন্ন এবং অবিভাজ্য, তেমনই শিব এবং শিবানী, হর এবং পার্বতী এক এবং অভিন্ন। সুতরাং দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে অর্ধনারীশ্বর বেদান্তের অদ্বয়-তত্ত্বেরই প্রতীক। তান্ত্রিক দর্শন অনুসারেও শিব ও শক্তি স্বরূপতঃ অভেদ।

ধর্মীয় বিচারে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি-কল্পনার তাৎপর্য হইল সাম্প্রদায়িক সমন্বয় ও সম্প্রীতি। শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের যে কোন হেতু নাই, বরং নাম ও রূপ-ভেদে উভয় সম্প্রদায় যে একই সত্যের উপাসনায় ব্রতী, তাহা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করিবার মানসে হিন্দুধর্মের প্রাচীন আচার্যগণ পরম দেবতার এই বিচিত্র রূপের কল্পনা করিয়াছিলেন। অথবা বলিতে পারি, তাঁহাদের হৃদয়ে ধ্যানের গভীরে এই তত্ত্ব এবং রূপের উপলব্ধি হইয়াছিল ঃ এক ঈশ্বর—অর্ধাঙ্গে তিনি নারী, অপর অর্ধাঙ্গে তিনি পুরুষ। এইরূপে তাঁহারা বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়া তত্ত্বের সহিত সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের, বেদের পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী তত্ত্বের সহিত তন্ত্রের শিব-শক্তি তত্ত্বের সমন্বয়ের স্বর্ণসূত্রটিও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিককালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবন ও বাণীর মাধ্যমে ভারতীয় দর্শনের এই সমন্বয়কে সাকার করিয়া দিয়াছেন।

অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা এবং রূপভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তাৎপর্যও রহিয়াছে। সভ্যতার চালিকাশক্তির সূত্রটি শুধু পুরুষেরই হস্তধৃত নহে, সমানভাবে তাহা নারীরও হস্তধৃত। সভ্যতার উদ্ভব ও অগ্রগতির মূলে নারী ও পুরুষ উভয়ের অবদান সমানভাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। প্রচলিত সমাজ-কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ সময়েই হয়তো নারীর ভূমিকা নেপথ্যচারিণীর, কিন্তু নেপথ্যে হইলেও গুরুত্বের দিক দিয়া নারীর ভূমিকা পুরুষের ভূমিকা হইতে কোন অংশেই কম নহে। যে-সমাজে নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা, যে-সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা তুল্যভাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত এবং যে-সমাজে নারী ও পুরুষের শক্তি সুষ্ঠুভাবে সম্মিলিত, সেই সমাজই আদর্শ সমাজ। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ ইহা জানিতেন। সেই উপলব্ধি এবং তাহা অপর সকলকে অবহিত করানোর প্রয়াসের ফলশ্রুতি হইল অর্ধ-নারীশ্বরের তত্ত্ব এবং অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিভাবনা। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নারী ও পুরুষের ভূমিকাকে সমান স্বীকৃতি ও গুরুত্বদানের পক্ষে আধুনিককালে প্রথম বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের। তিনি বলিতেন ঃ নারী ও পুরুষ সমাজ-পক্ষীর দুইটি পক্ষ। উভয় পক্ষ সমান সবল না হইলে পাখি যেমন উড়িতে অক্ষম, সেইরূপ নারী ও পুরুষের সমান উৎকর্ষ ভিন্ন সমাজেরও সুষ্ঠু অগ্রগতি অসম্ভব। □

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

মায়াবতী
১৭।১০।(১৯)০৫

প্রিয় গঙ্গাধর[১],

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়াছি। ইতিপূর্বে এক ৺বিজয়ার কার্ডও পাইয়াছিলাম। তুমি আমার ৺বিজয়ার পত্র পাইয়া থাকিবে। তোমাদের সকলের অসুখ হইয়াছিল জানিয়া দুঃখিত হইয়াছি। আশাকরি এক্ষণে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছ। আমার শরীর একটু ভাল। কাল আমি এখান হইতে আলমোড়া হইয়া হরিদ্বার যাইব মনস্থ করিয়াছি। এখানে ক্রমে বেশ শীত পড়িতেছে। সকলেই ভাল আছে ও তোমাকে প্রণাম ভালবাসা জানাইতেছে। মঠে যাইলে সকলকে আমার প্রণাম ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে। মধ্যে মধ্যে পত্রাদি লিখিয়া সুখী করিও। কাল শশী[২] মহারাজের নিকট হইতে পত্র—৺বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ—পাইয়াছি। তাঁহারা সকলে ভাল আছেন। তুমি আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও প্রণামাদি জানিবে এবং তোমার ছেলেদের শুভাশীর্বাদ ও ভালবাসা জানাইবে।

ইতি
তোমার
তুরীয়ানন্দ

শ্রীহরিঃ শরণম্

P. O. Nagal
Dt. Bijnour
8. 4. (19)08

প্রিয় নিকুঞ্জলাল,

তোমার পূজনীয়া মায়ের পোস্টকার্ড গতকল্য পাইয়াছি। আমি গত ১৫ই মার্চ গড় মুক্তেশ্বর ছাড়িয়া গঙ্গার তীরে তীরে পদব্রজে এখানে আজ দশদিন হইল আসিয়াছি। পথে হস্তিনাপুর (শুকদেব যেখানে পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাইয়াছিলেন) প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়াছি। গড় মুক্তেশ্বর যাওয়ার একদিন পূর্বে আমি তোমাকে একখানি পত্র দিয়াছিলাম। তাহা তুমি পাও নাই দেখিতেছি। আমি তোমার পত্র পাইয়াছিলাম ও তদুত্তরেই লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক তুমি শারীরিক ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। যদি এতদিনে জ্বালামুখী রওয়ানা হইয়া থাকি তাহা হইলে এই পত্র মাস্টার তোমাকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবে। আর যদি যাওয়া না হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমিও পত্র পাইয়া আপনাদের কল্যাণ লিখিয়া সুখী করিবে। আমার শরীর সম্প্রতি মন্দ নাই। এখানে নবরাত্রি করিতেছি। আরও কিছুদিন থাকিয়া পরে হরিদ্বারাভিমুখে যাইব। গ্রীষ্মে আমি কোথায় যাইব জানি না। উত্তরকাশী যাইতে পারি। প্রভুর যেমন ইচ্ছা হইবে। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে ও জানাইবে।

কিমধিকমিতি
শ্রীতুরীয়ানন্দ

১ স্বামী অখণ্ডানন্দ

২ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্যায়

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮ সংখ্যার পর]

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসব সীমিত ছিল মুখ্যতঃ সাধু-ব্রহ্মচারী ও গৃহী ভক্তদের মধ্যে, কিন্তু পরবর্তী রবিবার ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে আয়োজিত সাধারণ উৎসবে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতি এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজীর একান্ত ইচ্ছা ছিল মঠের নিজস্ব জমিতে যেন সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকবার তিনি চিঠি লিখে গুরুভাইদের উদ্দীপিত করেছিলেন। যেমন ৩০ নভেম্বর ১৮৯৭ তারিখে তিনি লিখেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঃ "নিজের জমিতে মহোৎসব করে তবে কাজ—তাতে বুড়োই মরে আর চেঁকড়াই ছেঁড়ে।" কিন্তু আইনজ্ঞদের পরামর্শে এবং জমি প্রস্তুতির সময়াভাবে নিজস্ব জমিতে সাধারণ উৎসব সংগঠন করা যায়নি। বালিতে পূর্ণচন্দ্র দাঁ মশায়ের ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগঠিত হয়েছিল এই উৎসব। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ মার্চ তারিখের 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের লিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদনের সারাংশের বাঙলা অনুবাদ এখানে উপস্থিত করা হলো ঃ

"এখানে এই রবিবার সকালে আকাশ সূর্যকিরণে ঝলমল করছিল। কাছে কোন মন্দিরের ঘণ্টা বেজে চলেছিল, শিবের মন্দিরটির ওপর ঝরে পড়ছিল বিশাল গাছটির শুকনো পাতা। বাতাস ছিল জাফরানের গন্ধে ভরপুর।... পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়ি ও উদ্যানের ঘাটে নামবার অনেক আগে থেকেই নৌকায় বসে হাজার হাজার মানুষের কোলাহল এবং কীর্তনাদির রব শুনতে পাচ্ছিলাম।... এত বেশি মানুষের ভিড় হয়েছিল যে, নদীর ঘাট থেকে আমাদের উদ্যানবাড়িটিতে পেঁছাতে হিমসিম খেতে হয়েছিল।...

"উপস্থিত সকল মানুষই আন্তরিকভাবে আগ্রহী। শত শত বাঙালী যুবক সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল এবং স্বামীজীকে দেখতে পেয়েই তাঁর পিছু নিয়েছিল এবং চিৎকার করছিল 'বক্তৃতা। বক্তৃতা।'[৭৭] উদ্যানের অপর এক অংশে সন্ন্যাসিগণ রাঁধুনি বামুনদের দিয়ে প্রস্তুত খিচুড়ি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করছিলেন। শিশুসহ প্রায় কুড়ি হাজার লোককে সারাদিন ধরে খাওয়ান হয়। এই বৃহৎ মহোৎসবে মানুষদের শান্তভাব ও শৃঙ্খলাবোধ দেখে বিস্মিত হতে হয়।... কিন্তু উদ্যানের প্রধান আকর্ষণ ছিল একটি সাময়িকভাবে তৈরি মন্দির, যার বেদির ওপর শোভা পাচ্ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি। মন্দিরের থাম ও ধনুকাকৃতি খিলানগুলি ছিল গাঁদা ফুল দিয়ে ঢাকা। চন্দ্রাতপের কাজ করছিল জালের ন্যায় বোনা যুঁই কুঁড়ির মালার গুচ্ছ, তার মাঝে-সাজে ছিল গোলাপফুল।

"এই মহোৎসব একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সব বাধন ভেঙে উঁচু-নিচু, পুরুষ-নারী, আপন-পর সকলে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। গোপালের মার[৭৮] মতো স্বাভাবিক ভক্তি সবাইকে

৭৭ ৩ মার্চ ১৮৯৮ তারিখের 'The Indian Mirror' ঘোষণা করে ঃ 'Last Sunday... Swami Vivekananda, who being pressed by the crowd, deli ered a short address suited for the occasion, with his fascinating appearance and charming lustrous eyes, always drew a great multitude of people around him."

৭৮ এখানকার উৎসব-প্রাঙ্গণেই মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল কামারহাটির 'গোপালের মা'র সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

এখানে টেনে এনেছিল, সেই ভক্তির আলোকে সকলেই তীব্রভাবে অনুভব করছিল, সবার মধ্যে একত্ব।"

লক্ষ্য করবার বিষয়, এরূপ সমারোহের বৃহৎ উৎসবও স্বামীজীকে তৃপ্ত করতে পারেনি। তিনি মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেনঃ "এই বৎসরের মহোৎসবে আমি সন্তুষ্ট হই নাই।... প্রত্যেক মহোৎসব হওয়া চাই—এখানকার সকল ভাবধারার এক অপূর্ব সমাবেশ। আমি আগামী বৎসর এবিষয়ে চেষ্টা করিব এবং আমি ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিব।"

এদিকে যেসময়ে দাঁ-দের ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেসময়ে বেলুড়ের নতুন জমিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ একটি ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমটিতে উপস্থিত ছিল হাজার হাজার মানুষ, দ্বিতীয়টিতে ছিল পনেরো বিশজন। দ্বিতীয় ঘটনাটি যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যাক।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসবের তিনদিন পর অর্থাৎ ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ স্বামীজী মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেনঃ "যে জমি কেনা হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও এখনই ঐ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে, তথাপি রবিবারে উহার উপর আমি কিছু-না-কিছু করাইব। অন্ততঃ শ্রীজীর ভস্মাবশেষ ঐ দিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লইয়া গিয়া পূজা করিতেই হইবে।"

আবার দেখা যায়, স্বামী প্রেমানন্দ ৬ মার্চ তারিখে মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন, যার একাংশে রয়েছেঃ "গত রবিবার দাঁ-দের বাগানে মহোৎসব অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় অন্যান্য বছরের তুল্য। ঐদিন নতুন জায়গায় নরেন্দ্র নিজে ঠাকুর লইয়া গিয়া পূজা ও হোম করিয়াছিলেন এবং পায়সান্ন[৭৯] ভোগ হইয়াছিল। গতকল্য ঐ জায়গাটি ৩৯,০০০ টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে। শ্বেত পাথরের মন্দির ও প্রকাণ্ড বাটী তৈয়ারের আয়োজন হইতেছে। শীঘ্রই কার্য আরম্ভ হইবে। দেখেশুনে লোকে অবাক হয়ে থাকে।"

প্রাসঙ্গিক কিছু বাড়তি তথ্য পাওয়া যায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের একটি চিঠিতে। তিনি ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেছিলেনঃ "চল্লিশ হাজার টাকা দিয়া আঠারো বিঘা উত্তম জমি গঙ্গার পশ্চিমকূলে ক্রয় করা হইয়াছে। আরও মঠের জন্য প্রায় একশত বিঘা জমি ঐ জমির চতুষ্পার্শ্বে ক্রয় করিবার মতো আছে। জমিতেই প্রায় দুই লক্ষ টাকা পড়িয়া যাইবে এবং ——— মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে প্রায় ১০।১২ লক্ষ টাকা পড়িবে। এ-সমস্ত বৃহৎ ব্যয়ভার একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর কে লইতে সমর্থ?" এর মধ্যে নেতা বিবেকানন্দের নতুন মঠ-সংগঠন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার একটু আঁচ পাওয়া যায়।

'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র নবম খণ্ডে একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, সে-ঘটনার তারিখ ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮।[৮০] এরই ইংরেজী অনুবাদ 'The Complete Works of Swami Vivekananda' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে স্থান পেয়েছে, কিন্তু এখানে কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়াও অধ্যায়গুলির কালক্রমানুসারী বিন্যাসে দেখা যায়, ঘটনাটি ঘটেছিল নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্থিত মঠ-জীবনের প্রথম দিকে। 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে স্বামী গম্ভীরানন্দ মঠের নতুন জমিতে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠার দিনটি সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৮১] সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, 'বাণী ও রচনা'য় ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮ তারিখের ঘটনাটি ঘটেছিল রবিবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮।

৭৯ স্বামী শিবানন্দ বলেছিলেনঃ "আমি ঠাকুরের ভোগের পায়েস রান্না করেছিলাম'। (মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, ১৩৫৬, পৃঃ ১৩৩)

৮০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ১১০-১১৭

৮১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ— স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ২য় সং, ৯৩ ও ১৭৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ তারিখে নতুন জমিতে যে-অনুষ্ঠানটি হয়েছিল তার পটভূমি সমেত বর্ণনা 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' পাওয়া যায়। সেখানকার বর্ণনা : "প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বামীজী ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পূজকের আসনে বসিয়া পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল-বিল্বপত্র ছিল, সব দুই হাতে এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব দর্শন।··· ধ্যান-পূজাবসানে··· তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন।··· শঙ্খঘণ্টারোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢলঢলভাবে নৃত্য করিতে লাগিল।··· স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, "তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব।···" সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নতুন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই জানবি, বহুকাল পর্যন্ত "বহুজনহিতায়" ঠাকুর ঐ-স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।'··· সকলে মঠ-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী স্কন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন।

"অনন্তর স্বামীজী পুনরায় পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হোম করিলেন এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সহায়ে স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। বোধহয়, ঐদিন ঐস্থানে তিনি কয়েকটি গৃহস্থকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। পূজা সমাপন করিয়া স্বামীজী সাদরে সমাগত সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে একে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়কেন্দ্র করে রাখেন।' সকলেই করজোড়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন।" স্বামীজীর আদেশে শিষ্য শরচ্চন্দ্র তাম্রকৌটা মাথায় করে নীলাম্বরবাবুর বাগানের ঠাকুরঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সেখানে সানন্দে স্বামীজী বলেন : "ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হলো। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল। আমার মনে এখন কি ইচ্ছে, জানিস? এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান।"[৮২]

এদিনের ঘটনার সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া গেছে স্বামী অদ্ভুতানন্দের জবানীতে। তিনি বলেছিলেন : "উৎসবের দিন (সাধারণ উৎসবের দিন) তো সবাই গেলো, বিবেকানন্দ ভাই নিজে সেদিন পূজায় বসলো, কাঁধে কোরে কৌটাটি নিয়ে এলো। পূজার শেষে সবাইকে উদ্দেশ কোরে বলেছিলো—'আজ থেকে এই মঠে তাঁকে এনে বসালাম। তিনিই আমাদের চালাবেন। দেখিস ভাই! তাঁর চালনায় তোরা যেন সবাই চলতে পারিস। তিনি চান পবিত্রতা, সরলতা আর উদারতা। তোরা এ তিনটে জিনিসের অমর্যাদা করিসনি। এখানে সকল মতের, সকল ভাবের মিল রাখতে হবে, কাউকে ছোট, কাউকে বড় করা হবে না।"[৮৩]

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কয়েকদিন পরের একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদের' একুশ অধ্যায়ে। সেখানে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন : "বর্তমান মঠের জমিও অল্পদিন হইল খরিদ করা হইয়াছে।··· মঠের জমি তখনও জঙ্গলপূর্ণ।··· মঠের জমিটি যিনি খরিদ করাইয়া দেন, তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত আসিয়া বিদায় লইলেন।···

"স্বামীজী বলিতে লাগিলেন··· 'সেদিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করলুম, তখন মনে হলো, যেন এখান হতে তাঁর ভাবের বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ্ব ছেয়ে ফেলেছে!··· বেদান্ত কেবল পড়ে কি হবে? Practical life-এ শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে। শঙ্কর এ অদ্বৈত-বাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব বলে এসেছি। ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে,

৮২ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩

৮৩ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, ১ম সং, পৃ ৩৬৬

পর্বতে প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে'।"[৮৪]

এ-স্থলেই উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় অপর কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা। কালীপূজার পূর্বদিন, শনিবার, ১২ নভেম্বর ১৮৯৮ তারিখে শ্রীমা তাঁর নিত্যপূজিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি নিয়ে মঠের ঘাটে এসে নেমেছিলেন। ঠাকুরঘরে প্রণাম করে তিনি মঠবাসিগণের প্রণাম নিয়েছিলেন। বাগানবাড়ির দোতলায় উত্তর-পূবের ঘরটিতে শ্রীমা বিশ্রাম করেছিলেন। নতুন জমিতে উত্তরদিকে একতলা কোঠাবাড়িটির দোতলা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতাস্থির তাম্রকৌটাটি নবনির্মিত সাধুভবনে (বর্তমানে 'স্বামীজীর বাড়ী' বলে পরিচিত) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীজীর) পূজা করেছিলেন। সেদিন সকালবেলা কলকাতা থেকে এসেছিলেন স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ। খুব সম্ভবতঃ শ্রীমা যেসময়ে পূজা করছিলেন স্বামীজী প্রভৃতি কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছিলেন। পূজা সাঙ্গ হলে স্বামীজী শ্রীমাকে বলেছিলেনঃ "মা, তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে

নীলাম্বর-ভবনে মঠ (দক্ষিণ দিক থেকে)। গোলপাতার ছাউনীর ঘরটি ঠাকুরঘর।
সময়ঃ ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ। **শিল্পীঃ বিমল সেন**

তৈরি করার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছিল। মঠের ডায়েরীতে লেখা রয়েছেঃ "Holy Mother came to see the new Math with Her Thakur. Our Thakur was taken to the new house and Mother performed the worship there. She then came to the Math, offered bhoga and took her meals. She was much pleased to see the new house." আমাদের মনে হয়, নীলাম্বরবাবুর বাগানের মঠে নিত্যপূজিত বেড়াও।" শ্রীমা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নতুন জমি ঘুরে ফিরে দেখেছিলেন। নতুন বাড়ি দেখে আহ্লাদিত শ্রীমা, খুব সম্ভবতঃ এবারেই বলেছিলেনঃ "এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা হলো —ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।" নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে ফিরে এসে ঠাকুরঘরে শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে অন্নভোগ নিবেদন করলেন। শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীদের পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হয়।[৮৫] কিছু বাড়তি তথ্য পাওয়া যায় স্বামী

৮৪ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪-১২৯

৮৫ মঠের ডায়েরীতে পাইঃ Some women who came with Mother were sumptuously fed. No pain was spared to entertain Mother and those (who) accompanied Her.'

অদ্ভুতানন্দের জবানীতে, তিনি বলেছিলেনঃ "মা তো মঠে গিয়ে সেদিন নিজের হাতে ঠাকুরের পূজা করলেন। সেদিন মঠের সকলে মিলে তাঁর পায়ের ধূলি নিয়েছিলো; এখনও মঠে সে-ধূলি পূজা হয়। মা তো মঠবাড়ি দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের চূড়া দেখে বলেছিলেন—'বাঃ বেশ হয়েছে! এখানে এলেই ওখানকার কথা মনে পড়বে'।"[৮৬]

সেদিন অপরাহ্নে স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে শ্রীমা কলকাতায় ফিরে যান। প্রথম তিনজন বলরাম ভবনে আয়োজিত নিবেদিতার স্কুলসংগঠন-বিষয়ক সভায় যোগদান করেছিলেন। গৃহস্থ ভক্তগণকে নিয়ে ঘরোয়া সভা। ভক্তগণ যাতে তাদের মেয়েদের স্কুলে পড়তে পাঠায়, সেজন্য নিবেদিতা আবেদন জানান। স্বামীজীর প্রচেষ্টায় কিছু সাড়া পাওয়া যায়। পরদিন শ্রীমা ১৬নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িতে স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করেন এবং প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। মেয়েদের স্কুল আরম্ভ হয়। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত সেবাকার্যে বালিকা বিদ্যালয়ের সংযোজন এক নতুন উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করে।

এইকালে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮ তারিখে। শুক্রবার, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৫। স্বামীজী কলকাতা থেকে আগের দিন মঠে এসে রাত্রিবাস করেছিলেন এবং সেদিনের মঠ-ডায়েরী থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মচারী হরিপদ (পরবর্তী কালে স্বামী বোধানন্দ) কলকাতায় গিয়েছিলেন ঠাকুর-পূজার জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনতে। আলোচ্য দিনে কলকাতা থেকে এসেছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সদানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দ। সেদিনকার অনুষ্ঠানাদির পর স্বামীজী এবং এই তিনজনে কলকাতায় ফিরে গেছিলেন। প্রশ্ন ওঠে, সেদিন কি অনুষ্ঠান হয়েছিল? মঠের ডায়েরীতে শুধুমাত্র লেখা রয়েছেঃ "Thakur was taken to the New Math and the New Math was consecrated." অতিরিক্ত অন্য কোন তথ্য সেখানে নেই। ব্যক্তিগত ডায়েরী রাখতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাঁর ডায়েরীতে এবিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। প্রাসঙ্গিক সব তথ্যাদি বিচার করে আমাদের মনে হয়েছে যে, ঠাকুরঘর, ধ্যানঘর, রান্নাঘর ইত্যাদির জন্য নতুন বাড়িটির নির্মাণ-কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছিল। এই দিনটিতে 'আত্মারামের কৌটা' নতুন ঠাকুরবাড়িতে এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম করা হয়েছিল। নতুন মঠেই রান্না করে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অন্নভোগ দেওয়া হয়েছিল। ঠাকুরবাড়িতে এই পূজা ও হোমকে কেন্দ্র করে নতুন মঠের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হয়েছিল।

এইসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১১ ডিসেম্বর নতুন মঠে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে রাত্রিবাসও করেছিলেন। স্বামীজী পুনরায় নতুন মঠে রাত্রিবাস করেছিলেন ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর তারিখে। এদিকে ১২ ডিসেম্বর স্বামী প্রেমানন্দ বৃন্দাবন থেকে এসে পৌঁছেছিলেন, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এসেছিলেন বেনারস থেকে। সম্পূর্ণপ্রায় নতুন মঠ দেখার জন্য শ্রীমা বেলুড়ে এসেছিলেন ২০ ডিসেম্বর ১৮৯৮। নতুন মঠ দেখে শ্রীমা তৃপ্ত ও আহ্লাদিত হয়েছিলেন। এরকম কোন একদিনে শ্রীমার মুখে মঠবাসিগণ শুনেছিলেন তাঁর এক দিব্যদর্শনের কথা। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি বরাবরই দেখতেন, যেখানে মঠবাড়ি কলাবাগান-টাগান, তার মধ্যে একটি ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর বাস করছেন।[৮৭] শ্রীমা মঠ থেকে স্বামী প্রকাশানন্দকে নিয়ে বালীতে যান সম্ভবতঃ কল্যাণেশ্বর শিবমন্দিরে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, রামকৃষ্ণ মঠের বিকাশের আলোচ্য অধ্যায়ে শ্রীমা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। [ক্রমশঃ]

৮৬ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, ১ম সং, পৃঃ ৩৬৪

৮৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৮

শিব*

অচেত বিধাতা

শ্রীঅরবিন্দ

ভাষান্তর : অমলকুমার দে

প্রচণ্ড শীত অদ্রিশিখরে একটি মুখ
স্তব্ধ মহান ; শুভ্র কৃচ্ছ্র প্রকট রেখা
মিলিতেছে সেথা তুহিন শৃঙ্গ অমেয় কূট
ভেদিছে স্বর্গ, অপ্রতিরোধ শুদ্ধ শিখা।
বিরাজে ঊর্ধ্বে জটাধরকেশ কোন ভূধর
যুগান্তে এক বেষ্টিত বেণী অমর শির
বিশাল নিরালা বায়ু প্রাণহীন তারি উপর
বৃত্ত আকার সীমা নাহি তার বিস্তৃত ধীর।
ললাটে দীপ্ত বিধুর কিরণ, নীল ধূসর
স্থির আলোকের অঙ্গুলি এর ব্যাপ্ত দূরে
দিতেছে আলোক বিশূন্যেতায়। পুরুষবর
শান্তির বেশে শক্তি প্রকাশে অনীহা ঝরে।
জন্মি অসীমে আসিল এখন বাহিরে তার
বিকট তুষারে স্তব্ধ আননে যার প্রকাশ
বহ্নিশিখায় রক্তবরণে কম্পনভার,
অগ্নিবিন্দু ব্যাপ্ত আকাশে ঈশ-আভাস।
আলোক-বর্শা অগ্রে প্রকাশে বৃহদাকার,
হৃদয়-আধারে গূঢ় গুণ্ঠন করিল দীর্ণ ;
হীরক-হৃদয়ে কাড়িল বহ্নি বসন তার,
জীবনবিন্দু কনকপাত্রে হলো আকীর্ণ।
আছিল বন্ধ নিতান্ত মূক উৎস অনল
জন্ম লভিল তারকানৃত্য বসুধারাজি ;
প্রকাশে জীবন আত্মনিবেশে অচেত বল,
বাহিরিল প্রেম প্রদীপ্ত বীজ চেতনে আজি।

* 'Shiva : The Inconscient Creator'—Collected Poems—Sri Aurobindo, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1986, p. 573

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

"Are there among men who hunger for
My Grapes? Let them come forward
with their baskets.
Are there among you men who are athirst
For my blood? Let them come forward
with their cups."
—Mikhail Naimy

আমার ভেঙেছে ঘুম, কে যেন বলেছে :
কেউ কি ঘুমিয়ে আছ ? উঠে বসো।
তোমার পিছনে আমি আছি।

চারিদিকে চেয়ে দেখি। কাছে কেউ নেই। তবু
কার কথা কানে বেজে যায় :
কেউ কি অভুক্ত আছ ? থালা নিয়ে এস।
কেউ কি তৃষ্ণার্ত আছ ? জলপাত্র নিয়ে কাছে এস।

সেই মন্ত্রে ছুটে গেছি। কার কাছে যাব একা ?
কার কাছে ছুটে যেতে হয় ?
ছুটে গেছি। কেউ কাছে নেই। তবু তার মন্ত্র
কানে বেজে যায় :
কেউ কি রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েছ ?
অগ্রসর হও, আমি আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

জীবন যখন তৃষ্ণাকাতর,
হৃদয় কাতর প্রশ্নে,
স্মরণ কর শরণালয়
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণে।

আর কতদিন অন্ধকারে
শেখ সদরউদ্দীন

আর কতদিন অন্ধকারে বনের ভিতর থাকব রে,
চোখে কালো পর্দা বেঁধে
সূর্যটাকে ঢাকব রে!

জঙ্গলেতে বন্ধ হয়ে কাল কেটে যায় সারাক্ষণ—
সূর্য কখন ওঠে-ডোবে,
পায় নাকো টের অন্ধ মন।
আলোর জন্যে প্রাণটা কাঁদে, দুঃখ কোথায় রাখব রে?
আর কতদিন অন্ধকারে বনের ভিতর থাকব রে!

সর্বক্ষণই শিউরে থাকি,
ঘিরে থাকে শঙ্কা-ভয়—
মানুষ বলে দেবার মতো নেই আজিকে পরিচয়!

বনের মাঝে থেকে থেকে পশু হবার ভয় আছে—
বনে কেন বন্ধ র'লাম—
জবাব পাব কার কাছে?
কবে রবির
আলোর আবীর চোখে-মুখে মাখব রে?

ফাগুন প্রভাতে
অমিয়মোহন বসু

কৃষ্ণচূড়ার লাল মাথা দোলে
ফাগুন প্রভাতে বাতাস লেগে
গন্ধ মদির ছড়িয়ে দিয়েছে
নিঃসীম রাতিতে মাধবী জেগে।

ফুলে ফুলে ছোটে প্রজাপতি দল
চিত্র পক্ষে মেখে পরাগ
দল বেঁধে সেথা লোভী মধুকর
পরিমল আশে সদা সজাগ।

গানে গানে ডাকা শুরু করিয়াছে
জানা ও অজানা পাখির দল,
ব্যর্থ কি আজি প্রকৃতির এই
হৃদ্যতা-হাসি-ফুল ও ফল?

ফাগুনে ঊষার নীরব লগনে
একথাটি মোর হৃদয়ে বাজে
মানবত্ব কি বন্দীই রবে,
ভুল মানুষের ক'দিন সাজে?

বিষাদে মুক্তি
জয়ন্ত বসু চৌধুরী

বিষাদসিন্ধু মন্থন করি, অমৃত উদ্বোধন
যন্ত্রণাময় বেদনার মাঝে আত্ম-সংবেদন॥

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহৎ কৃষ্টি সুরগীতি মহাকাব্য
শোক হতে তারা শ্লোক হয়ে জাগি,
রসনদী রাখে নাব্য॥

শুক্তির বুকে ব্যথার ক্ষত যে, মুক্তার রূপে মুক্তি
মাতৃগর্ভ যন্ত্রণা আনে, সন্তানে অনুরক্তি॥

প্রচণ্ড ঐ মার্তণ্ডের অমোঘ অগ্নিবাণে
বিশুষ্ক করে জীব-জগতেরে তৃষ্ণাকাতর প্রাণে॥

স্নিগ্ধ শ্যামল জলদ যে তাই তাপ-তপস্যা সিদ্ধি
মৃত্যু-তোরণ দুয়ার দিয়ে যে জীবনের মহাঋদ্ধি॥

ঝরাপাতা ব্যথা দেয় ব্যাকুলতা নব কিশলয় 'পরে
তমিস্র রাত করে যে সাধনা, আলোর মরণ তরে॥

অস্তরাগের শেষের কবিতা, সবিতার ভাবী ব্রতে
আগামীর নববার্তাক হয়ে ভাসাবে আলোর স্রোতে॥

অর্জুনে জানি, বিষাদের গ্লানি, অর্জুনে মহাবাণী
পুরুষোত্তম উদ্গীত-গীতি গীতা-আশ্রয় দানি॥

অপূর্ণতার জয়ের অন্তে পূর্ণ আত্মানন্দ,
যোগযুক্ত বিষাদ, তখন, উন্মেষে ঋতছন্দ॥

প্রকাশ

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্রাট চলেছিলেন দিগ্বিজয় শেষে
যেতে যেতে পথে দেখলেন
পূর্বাস্য হয়ে প্রায় নগ্ন এক বৃদ্ধ ফকির
উদীয়মান সূর্যের দিকে হাতজোড় করে
চেয়ে আছে চুপচাপ।

সম্রাট ভাবলেন,
দীনহীন কোন এক প্রার্থী বুঝিবা।
তাঁর মনে দয়া হলো।
উদার জয়ীর কণ্ঠে করুণা মিশিয়ে
বৃদ্ধকে বললেন তার কিসের অভাব,—
কি চাই তার ?
তিনি কোনদিন কাউকে ফেরান না,
বিশেষতঃ যুদ্ধজয়ের পর।

সকালের উজ্জ্বল আলো আড়াল করে
সম্রাটের দীর্ঘ ছায়া পড়ল বৃদ্ধের চোখের ওপর।
কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর
বৃদ্ধ ফকির বলল, 'কুছ নেহি
মেরে সামনেসে হট্ যা
ঔর উস্ প্রকাশকো মেরে পাশ আনে দে··· ।'

বিবেকানন্দ

পলাশ মিত্র

তুমি বলেছিলে শেষ কথা ভালবাসা—
আমরা এখনো ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে রত ঃ
অবিশ্বাস আর মিথ্যার বেসাতিতে
নিজের কাছেই নিজেরাই অবনত।

তুমি বলেছিলে সততা সবার আগে—
আমাদের কাজে সে-প্রকাশ আর কই ?
ছলনা এবং হতাশার ঘেরাটোপে
আমরা এখনো অকারণে ডুবে রই।

তুমি বলেছিলে জাগাতে শূদ্রজনে,
জীবে প্রেম মানে ভগবানের সেবা করা—
অজ্ঞ মেথর চণ্ডাল মুচি নিয়ে
সার্থক হয় আমাদের এই ধরা।

তুমি বলেছিলে ধর্ম ঢুকেছে হাঁড়িতে
ধর্ম নিয়েই মাতামাতি হানাহানি—
ছুঁৎমার্গেই নরকের পথ খোলা
ভুলে গেছি আজ তোমার অমোঘ বাণী।

তোমার ছবিতে মালা দিতে গিয়ে
কত কথা পড়ে মনে ঃ
তুমি আছ, তবু
আঁধার রাত্রে কাঁদি কেন অকারণে !

সত্য-সুন্দর-আনন্দ

বন্যা মজুমদার

কতকিছু পেয়েছিনু আমার জীবনে,
ছিল বিত্ত, বৈভব বিপুল পরিমাণে।
দিনশেষে সে-ঐশ্বর্য মিথ্যা মনে হয়,
সত্যের স্বরূপ যিনি তাঁরই বিহনে।

মন দিয়ে, মন নিয়ে চলেছি ভুবনে
পরিপূর্ণ ছিল ধরা প্রেমে-প্রাণে-গানে।
দিনশেষে সবকিছু অসুন্দর লাগে
সুন্দরস্বরূপ যিনি তাঁরই বিহনে।

খ্যাতি ছিল, যশ ছিল ভরা এ-জীবনে
গর্বে পূর্ণ ছিল বুক শ্রেষ্ঠত্বের মানে।
দিনশেষে সে-গরব নিরানন্দময়
আনন্দস্বরূপ যিনি তাঁরই বিহনে॥

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচক : স্বামী বাসুদেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮ সংখ্যার পর]

নৃশরীর ভেদ

প্রশ্ন : স্ত্রী-পুরুষে আপনারা এত ভেদ করেন কেন? এটা কি ঠিক কথা, স্ত্রী-শরীরে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : ভেদ করতে হয় দেহের, মনের ও বলের তারতম্যের জন্য। স্ত্রী ও পুং শরীরে সংস্কারগত ভেদ আছে। শাস্ত্র বলেন, স্ত্রী ও পুরুষ জন্ম হয় জীবের অভিমানবশতঃ। শরীর স্থূল ও সূক্ষ্ম। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের স্থূলশরীরে অভিমান বেশি; এই জড়ে অভিমান-বশতঃ আত্মায় তারা 'পরার্থ'-বুদ্ধির আরোপ খুব বেশি করে। সেইজন্য স্ত্রীলোকে ভোগ্য-শক্তির প্রভাব খুব বেশি। আর সাধারণতঃ পুরুষে সূক্ষ্ম-শরীরাভিমান বেশি বলে তাদের দেহ ও মনে ভোক্তৃশক্তির প্রভাব খুব বেশি। কিন্তু ঐ দুটোই হচ্ছে স্ব-আত্মাতে আরোপ। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, তাতে কোন লিঙ্গভেদ নেই। স্ত্রী ও পুরুষ সকল শরীরই প্রকৃতি-পরিণাম। স্ত্রী ও পুরুষ সকল শরীরেই সেই এক আত্মা—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরগুলো যেন আত্মার ওপর এক-একটা বিচিত্র পর্দা। পর্দাগুলো সরিয়ে ফেল, দেখবে এক শ্রীচৈতন্যই সর্বদেহমন্দিরের একমাত্র উপাস্য দেবতা। 'জো রাম দশরথকী বেটা, ওহি রাম ঘট্‌ঘট্‌মে লেটা'।

প্রশ্ন : তাহলে যথার্থ পুরুষ-প্রকৃতি কি?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : জীবের যে-দিকটা চেতন সেটাই হচ্ছে পুরুষ এবং যে-দিকটা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ, সেদিকটা প্রকৃতি, তা সে নরই হোক বা নারীই হোক। আমরা লৌকিকভাবে যে স্ত্রী ও পুরুষ শব্দ-দুটো গ্রহণ করি তার অর্থের মধ্যেও সেই এক তত্ত্বই বিদ্যমান।

স্বামীজী নারীজাতির মধ্যে এই চৈতন্যবোধ জাগাবার জন্য অসম্ভব চেষ্টা করে গেছেন। অনেক সময় নারীরাই তার বিরোধী দেখা যায়, যেমন দাসেরাই দাস-ব্যবসা ওঠানোর বিরোধী হয়েছিল। যদি কোন নর কোন নারীকে কুৎসিৎ পরামর্শ দেয়, তা যেমন নির্ভয়ে প্রত্যাখ্যান করা উচিত; তেমনি যদি কোন নর কোন নারীকে তার আত্মতত্ত্ব থেকে বিপথগামিনী করতে চায়, তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। নারীদের সর্বক্ষণই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে চোখের সামনে রাখা উচিত। তাহলে সেই পরমপ্রেমাস্পদ পরমাত্মা তাঁদের মধ্যেও জাগরিত হয়ে তাঁদের জীবনীশক্তিকে মহিমময়ী করে তুলবেন—তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন—

'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ মদাত্মা সর্বভূতাত্মা।' (২৫।৯।৪৩)

নারীর আদর্শ

প্রশ্ন : আপনি গার্গী, মৈত্রেয়ী, চূড়ালা, লীলা, সুলভা, শাণ্ডিলীর কথা বলছেন। এঁরা সব ব্রহ্ম-বাদিনী। কিন্তু আমাদের মতো বউ-ঝিদের মাহাত্ম্য কি শাস্ত্রে আছে?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : কেন থাকবে না? চ্যবনের স্ত্রী সুকন্যা, ভুবন বিখ্যাত রূপবতী চন্দ্রসেনা, সীতা, দ্রৌপদী, অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা, অত্রি-পত্নী অনসূয়া, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শ্রীবৎস-পত্নী চিন্তা, ঋগ্বেদে মুদ্গলের পত্নী ইন্দ্রসেনা, বিশ্ববারা প্রভৃতির কথা আছে। অবশ্য সতী, সীতা, সাবিত্রী, গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সারদা—এঁরা মহাশক্তির সাক্ষাৎ অবতার; এঁদের সঙ্গে আর কারোর তুলনা হয় না। রামমাতা কৌশল্যা, কৃষ্ণমাতা দেবকী, বুদ্ধমাতা গৌতমী, খ্রীষ্টমাতা মেরী, চৈতন্যমাতা শচীদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণ-মাতা চন্দ্রমণিও ওঁদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। (৬।৩।৪৪)

[ক্রমশঃ]

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আলোয়ারে শ্রীবিবেকানন্দ

শ্রীশ্রমণক

'শ্রীশ্রমণক' স্পষ্টতঃ প্রবন্ধ-রচয়িতার ছদ্মনাম। মনে হয়, প্রবন্ধটি তৎকালীন উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দের লেখা। শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের নেপথ্যে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এবছর স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ-পূর্তি হচ্ছে। সেকথা স্মরণ রেখে এই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে।

যুগ্ম সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীর উপর যে মহান কার্যের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তিনি তৎসম্পাদনের সময় উপস্থিত কিনা জানিবার জন্য এবং ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ লাভের পক্ষে তাঁহার সহভ্রমণকারী গুরুভাইদিগের সহবাসও এক মহা অন্তরায়-স্বরূপ দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, "গুরুভাইদের মায়া ত্যাগ করতে হবে, একলা ভ্রমণ করতে হবে, নইলে এদের রোগাদি হলে এদের জন্য বড়ই চিত্তচাঞ্চল্য আসে—এ এক মহা বিঘ্ন। তপস্যার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে হবে।" সেই আজ্ঞা লাভের জন্য তাঁহার প্রাণ-মন সর্বদাই উৎকণ্ঠিত। নানা দেশে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় জীবনের অনন্ত সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টাই সেই ভগবদাজ্ঞালাভের তপস্যা স্থির করিয়া তিনি গুপ্তভাবে একাকী ভারতের নানা স্থানে পর্যটন করিবেন সংকল্প করিলেন এবং তদনুযায়ী দিল্লী হইতে গুরুভাইদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একলা ভারতের পূর্ব গৌরব স্থান রাজপুতানায় প্রবেশ করিলেন।

ইংরাজী ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই একদিন প্রভাতে স্বামীজী আলোয়ার স্টেশনে নামিলেন। আলোয়ার একটি আধুনিক রাজ্য; দেড়শত বর্ষ পূর্বে যখন দিল্লীর সম্রাটের বলবীর্য খর্ব হইয়া আসিতেছিল, সেই সময় প্রতাপ সিংহ নামে জয়পুরের বিখ্যাত মানসিংহের বংশোদ্ভব জনৈক রাজপুত বিনা আয়াসে এই রাজ্য স্থাপন করেন।

রেল স্টেশনের পশ্চিমে আলোয়ার নগর, তাহার পশ্চিমে পর্বতশ্রেণী; চতুর্দিকেই ছোট ছোট পাহাড়। সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতেই চতুর্দিকে ময়ূরগণের কেকারব; পথে প্রান্তরে বৃক্ষে অট্টালিকার ছাদে প্রাঙ্গণে তাহারা দিক আলো করিয়া, পথিকের আর অসহায় নিরাশাপূর্ণ কৃষকের হৃদয়ে প্রাণপ্রসূ আশাবীজ রোপিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যেন আনন্দে তাহাদের আশেপাশে নৃত্য করিতেছে, আর আব্দারপূর্বক 'ন্যাও ন্যাও' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। তাহারা যেন ভারতের ভাবী গৌরব প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে নিজেরা বিভোর হইয়াছে এবং দরিদ্রগণকেও সেই আনন্দের অংশভাগী করিবার জন্যই যেন তাহাদের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিতেছে। স্বামীজী স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে নগর প্রবেশের জন্য পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে উদ্যান ও ক্ষেত্রসমূহ পরে সৌধশ্রেণী আরম্ভ, কিয়দ্দূরে পথ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া উত্তরে ও দক্ষিণে চলিল। এই দুই পথের ঠিক মধ্যস্থলেই আলোয়ারের উচ্চ বিদ্যালয়। স্বামীজী বিদ্যালয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, উত্তরদিকের পথে অনতিদূরে পুরাতন শহরের দ্বারের নিকট যে সরকারি চিকিৎসালয় আছে, তাহার ডাক্তার একজন বঙ্গদেশী। স্বামীজী চিকিৎসালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই এক বাঙালীকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইনিই সেই বঙ্গদেশী চিকিৎসক এবং তাঁহাকে আপন মাতৃভাষায় সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ "মশাই, এখানে সাধু-সন্ন্যাসী থাকবার একটু স্থান হতে পারে?"

ডাক্তার গুরুচরণ লস্কর হাসপাতালের দ্বারে দাঁড়াইয়া দূরে স্বামীজীকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, আর ধীরে ধীরে স্বামীজীর ওপর তাঁহার শ্রদ্ধা

সঞ্চারিত হইতেছিল। স্বামীজী আসিয়া তাঁহাকে মাতৃভাষায় প্রশ্ন করিবামাত্র ডাক্তার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উত্তর করিলেনঃ "নিশ্চয়! আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন।" এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়ের মধ্যস্থিত বাজারের ওপর একটি কুঠরি দেখাইলেন এবং বলিলেনঃ "আপাততঃ এইখানে থাকতে কষ্ট হবে কি ?"

স্বামীজী কহিলেন, "কিছু না।" ডাক্তার তৎপরে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনাইয়া দিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে কেবলমাত্র একখানি কাষায় বস্ত্র, একখানি কম্বলের মধ্যে কতকগুলি পুস্তক আর একটি কমণ্ডলু। তিনি ভ্রমণকালে পুস্তকগুলি কম্বলে বাঁধিয়া আপন স্কন্ধে বহন করিতেন। ডাক্তার সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাঁহার এক মুসলমান বন্ধুর (যিনি পূর্বোক্ত বিদ্যালয়ের উর্দু ও পার্শী শিক্ষক ছিলেন) নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেনঃ "মৌলভী মশাই, একজন বাঙালী দরবেশ দেখবেন তো আসুন। এমন মহাত্মা কখনো দেখেননি। আপনি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা করুন, আমি আমার কাজটা সেরে আসছি।" মৌলভী মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত স্বামীজী সমীপে উপস্থিত হইয়া নগ্নপদে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বামীজীকে ভক্তি সহকারে সেলাম করিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে আপনার নিকটে যত্নপূর্বক বসাইয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন এবং অনেক কথার পর কহিলেনঃ "কোরানের একটি বড় বিশেষ গুণ আছে। প্রায় এগারশো বৎসর পূর্বে যেমন পাওয়া গিয়েছিল, আজও সেইরকম বিশুদ্ধ ভাবেই আছে। কেউ আর তার মধ্যে কলম চালায়নি।"

গুরুচরণ স্বামীজীর সহিত দুই-চারিটি মাত্র বাক্যালাপ করিয়াই তাঁহাকে অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তিনি নিজ কার্যস্থলে উপস্থিত হইয়াই তথায় সমাগত ব্যক্তিদিগকে তাঁহার আগমনবার্তা কহিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই শহরের নানা স্থান হইতে বহু ভদ্রলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। ডাক্তার মহাশয় আপনার দৈনিক কার্য শেষ করিয়া স্বামীজীকে আপন আবাসে লইয়া গেলেন এবং ভোজনান্তে পুনরায় সেই কুঠরিতে আসিলেন। লোকসমাগম ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, পার্শী শিক্ষকের মুসলমান বন্ধুগণ দলে দলে আসিয়া স্বামীজীর ধর্মকথা শুনিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। স্বামীজী ধর্মোপদেশচ্ছলে কখনো একটি উর্দু গান, কখনো হিন্দি ভজন, কখনো বাঙলা কীর্তন, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বা রামপ্রসাদের গান করিতেছেন, আবার কখনো বা উপনিষদ্ গীতা বাইবেল কোরান পুরাণ ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া আবার কখনো বা বুদ্ধ শংকর রামানুজ নানক চৈতন্য কবীর তুলসীদাসের এবং তাঁহার গুরুদেবের জীবনের নানা ঘটনা শাস্ত্রোক্ত বচনের প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করিয়া সকলকে ধর্মের সার-শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। এইরূপে দুই-তিন দিন কাটিলে পর জনকয়েক বর্ধিষ্ণু লোক পরামর্শ করিলেন যে, স্বামীজীকে নগরের মধ্যস্থলে কাহারও বসতবাটীতে রাখিলে সকলেরই তথায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন ও সেবা করিবার সুবিধা হইতে পারে। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে এই স্থির করিয়া স্বামীজীকে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শম্ভুনাথজীর বাটীতে লইয়া গেলেন। শম্ভুনাথজী একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আলোয়ার রাজ্যের ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার, এক্ষণে পেনসানভোগী। স্বামীজী প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান ও ধ্যানাদির পর প্রায় নয়টার সময় আপনার ঘরের বাহিরে আসিতেন। তিনি প্রত্যহই দেখিতেন, দশ-পনেরোজন লোক, কখনো কখনো পঁচিশ-ত্রিশজন লোক তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে ইতর ভদ্র পণ্ডিত মূর্খ, শৈব বৈষ্ণব, সিয়া সুন্নি, যুবা বৃদ্ধ সকল প্রকার লোকই আছেন। বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত জনতা সমভাবে বর্তমান। স্বামীজীর মুখের বিরাম নাই; শ্রোতৃবর্গের যাহার যাহা খুশি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। স্বামীজী কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। হৃদয়স্পর্শী উত্তরে সকলেই সন্তুষ্ট হইতেছেন। হয়তো স্বামীজী ভাবে বিভোর হইয়া তীব্র বৈরাগ্য, জ্ঞানমার্গ বা ভক্তিমার্গের কথা কহিতেছেন; ইতিমধ্যে একজন একটু সময় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "মহারাজ, আপনার কোন্ শরীর ?" স্বামীজী অমনি উত্তর করিলেন, "কায়স্থ শরীর।"

আবার খানিক পরেই হয়তো একজন জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "বাবাজী মহারাজ, আপনি গেরুয়া পরেন কেন?" বাবাজী উত্তর করিলেনঃ "এটা ভিক্ষুকের বেশ। সাদা কাপড় পরে থাকলে অনেক দরিদ্র লোকে ভিক্ষে চায়। নিজে ভিক্ষুক, অনেক সময় কাছে এক পয়সাও থাকে না যে তাদের দিই। আবার চাইলে না দিতে পারলে কষ্ট হয়। গেরুয়া পরা দেখলে তারা বোঝে যে, এও আমাদের একজন, এর কাছে আবার কি চাইব?" পরক্ষণেই আবার সেই পূর্ব্ববৎ তত্ত্বপ্রবাহ চলিতেছে। ক্রমে সেই তত্ত্বপ্রবাহ চলিতে চলিতে মা কালীর কৃপা ও মহিমার প্রসঙ্গ আসিল, প্রাণ মাতিয়া উঠিল, স্বামীজীর মুখে আর অন্য কথা আসিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে "মা, মা" ধ্বনি হইতে লাগিল। সেই মধুর স্বর ক্রমে করুণ হইয়া অন্তরে মিলিয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ স্থির, সেই আরক্তিম আয়ত লোচনদ্বয় হইতে বেগে প্রেমাশ্রু ছুটিতে লাগিল। শ্রোতাগণের প্রাণ আর্দ্র হইল ও তাঁহারাও নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সকলেই স্থির নিস্তব্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া স্বামীজীর প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। স্বামীজী আবার গান ধরিলেন; তাঁহার মধুর কণ্ঠপ্রবাহের সহিত নয়নের স্নিগ্ধ বারি মিশিয়া সকলের প্রাণে ভগবদনুরাগের প্রস্রবণ মুক্ত করিয়া দিল। আবার ক্ষণেক পরে নানা দেশের নানা কথায় হাসির হিল্লোলের মধ্য দিয়া অপূর্ব্ব উপদেশ দিতেছেন। দ্বিপ্রহরের সময় গৃহস্বামী পণ্ডিতজী স্বামীজীকে আহারে আহ্বান করিলেন। স্বামীজী সকলের নিকট বিদায় লইয়া ভোজনে গমন করিলেন এবং তাঁহারাও সকলে স্ব স্ব স্থানে মধ্যাহ্নভোজনে গমন করিলেন।*

[ক্রমশঃ]

* **উদ্বোধন, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩১৩, পৃঃ ১-৪**

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির (মাঝে)। পিছনে—বিষ্ণুমন্দির/গোবিন্দজীর মন্দির/রাধাকান্ত-মন্দির। সামনে—কালীমন্দিরের নাটমন্দির; এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মথুরবাবুকে অনুরোধ করে পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় তিনি বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সমকালীন অগ্রগণ্য সাধক ও পণ্ডিতদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। বিচারসভায় সমবেত সাধক ও পণ্ডিতবর্গ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দিরের (দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছবি অবশ্য প্রচ্ছদে নেই।) অবস্থান বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু হিন্দুদের দিক থেকেই নয়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের দিক থেকেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি তাৎপর্য রয়েছে। মন্দিরের জমির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, বাকি অংশের অনেকটা জুড়ে ছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী-সাহেবের পীরের দরগা। এই যোগাযোগ যেন দৈবনির্দিষ্ট। কারণ, এই ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে যুগাবতার মহাসমন্বয়ের উদার বাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। এই বাণীই আজ শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে। দেশ ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মত ও পথের অসহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে এই বক্তব্য আমরা তুলে ধরতে চাইছি।—**যুগ্ম সম্পাদক**

শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

জীবন্মুক্তিবিবেকঃ

বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮ সংখ্যার পর]

অস্মিংশ্চ ত্যাগে স্ত্রিয়োঽপ্যধিক্রিয়ন্তে। ভিক্ষুকীত্যনেন স্ত্রীণামপি প্রাগ্‌বিবাহাদ্বা বৈধব্যাদূর্ধ্বং সন্ন্যাসেঽধিকারোঽস্তীতি দর্শিতম্‌। তেন ভিক্ষাচর্যং, মোক্ষশাস্ত্রশ্রবণং, একান্ত আত্মধ্যানং চ তাভিঃ কর্তব্যং, ত্রিদণ্ডাদিকং চ ধার্যম্‌। ইতি মোক্ষধর্মে চতুর্ধরীটীকায়াং সুলভাজনকসংবাদঃ। শারীরকভাষ্যে বাচক্নবীত্যাদি শ্রূয়তে। দেবতাধিকরণন্যায়েন বিধুরস্যাধিকারপ্রসঙ্গেন তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদে। অতএব মৈত্রেয়ীবাক্যমাম্নায়তে—

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং
যদেব ভগবন্‌ বেত্থ তদেব মে ব্রূহি" ইতি।

অন্বয়

অস্মিন্‌ ত্যাগে চ (এই ত্যাগ বিষয়ে), স্ত্রিয়ঃ অপি (স্ত্রীলোকেরাও), অধিক্রিয়ন্তে (অধিকার লাভ করে)। ভিক্ষুকী (ভিক্ষুকী), ইতি অনেন (এই শব্দ দ্বারা), স্ত্রীনাম অপি (স্ত্রীলোকদেরও), বিবাহাৎ প্রাক্‌ (বিবাহের পূর্বে), বা (অথবা), বৈধব্যাৎ ঊর্ধ্বং (বৈধব্যের পর), সন্ন্যাসে (সন্ন্যাসে), অধিকারঃ অস্তি (অধিকার আছে), ইতি (ইহা), দর্শিতম্‌ (দেখানো হয়েছে)। তেন (সেই সন্ন্যাসানুসারে), ভিক্ষাচর্যং (ভিক্ষাচর্যা), মোক্ষশাস্ত্রশ্রবণং (মোক্ষশাস্ত্রের শ্রবণ), চ (এবং) একান্ত আত্মধ্যানং (নির্জনে আত্মচিন্তন), তাভিঃ (তাহাদিগের দ্বারা), কর্তব্যম্‌ (করণীয়), চ (এবং) ত্রিদণ্ডাদিকং (শিক্য, জলপবিত্র ও কৌপীন এই ত্রিদণ্ড), ধার্যম্‌ (ধারণ কর্তব্য), ইতি (এইরূপ), মোক্ষধর্মে (মহাভারতের মোক্ষধর্ম-প্রকরণের), চতুর্ধরীটীকায়াম্‌ (নীলকণ্ঠের চতুর্ধরী টীকার মধ্যে), সুলভাজনকসংবাদঃ (সুলভাজনক সংবাদ আখ্যায়িকায়) [দৃষ্ট হয়]।

শারীরকভাষ্যে (ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে), তৃতীয়াধ্যায়ে (তৃতীয় অধ্যায়ে), চতুর্থপাদে (চতুর্থ পাদে), দেবতাধিকরণন্যায়েন (দেবতারাধনের হেতু থাকায়), বিধুরস্য (বিধুরের অর্থাৎ মৃতপত্নীকের), অধিকার-প্রসঙ্গেন ([ব্রহ্মবিদ্যা] অধিকার প্রসঙ্গে), বাচক্নবী ইত্যাদি (বাচক্নবী প্রভৃতির নাম), শ্রূয়তে (শোনা যায়)।

অতএব (অতএব), মৈত্রেয়ীবাক্যম্‌ (মৈত্রেয়ী-বাক্য), আম্নায়তে (কথিত হয়)—

যেন (যাহা দ্বারা), অহং (আমি), অমৃতা (অমৃতস্বরূপ), ন স্যাম্‌ (হব না), তেন (তা দ্বারা), অহম্‌ (আমি), কিম্‌ কুর্য্যাম্‌ (কি করব), ভগবন্‌ (হে ভগবন্‌), যদেব (যাই) বেত্থ (জানেন) তদেব (তাই), মে (আমাকে), ব্রূহি (বলুন)।

বঙ্গানুবাদ

এই ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসে স্ত্রীলোকেরাও অধিকার লাভ করে। 'ভিক্ষুকী' এই শব্দদ্বারা বিবাহের পূর্বে অথবা বৈধব্যের পর স্ত্রীলোকদেরও যে সন্ন্যাসে অধিকার আছে, তা দেখান হয়েছে। সেই সন্ন্যাসানুসারে ভিক্ষাচর্যা, মোক্ষশাস্ত্রের শ্রবণ এবং নির্জনে আত্মচিন্তন তাদের করণীয় এবং শিক্য, জলপবিত্র ও কৌপীন—এই ত্রিদণ্ড ধারণও তাদের কর্তব্য। মহাভারতের মোক্ষধর্ম প্রকরণে সুলভাজনকসংবাদে নীলকণ্ঠের চতুর্ধরী টীকা থেকে এই বিষয় জানা যায়।

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদে দেবতারাধনের অধিকার থাকায় বিধুরের ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের অধিকার প্রসঙ্গে বাচক্নবী প্রভৃতির নাম শোনা যায়।

অতএব এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের (২।৪।৩) মৈত্রেয়ীবাক্যেও বলা হয়েছে—"যা দ্বারা আমি অমৃতস্বরূপ হব না, তা দ্বারা আমি কি করব? হে ভগবান, (এ-সম্বন্ধে) যা জানেন, তাই আমাকে বলুন।"

বিবৃতি

ত্যাগ ব্যতীত যে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়, একথা শ্রুতি, স্মৃতি সর্বত্রই সমানভাবে বলা হয়েছে। আচার্য ভর্তৃহরি বৈরাগ্যের প্রশংসা করে বলছেন—"ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্‌ ভয়ং, মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্‌। শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্‌ ভয়ং, সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌ ॥" (বৈরাগ্যশতকম্‌, ৩১)

শ্রুতির কৈবল্য উপনিষদ্‌, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ প্রভৃতিতে আমরা ত্যাগের উচ্চ প্রশংসা দেখে থাকি। এই ত্যাগের অধিকারী কেবলমাত্র পুরুষই নয়, নারীও। সে-কথা মৈত্রেয়ী, বাচক্নবী গার্গী প্রভৃতি বৈদিক যুগের নারীগণের প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই। শারীরক সূত্রের ভাষ্যেও দেখা যায়, 'বিধুরে'র সন্ন্যাসে অধিকার আছে। 'অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ" (৩।৪।৩৬) সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলছেন—"বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাং চ অন্যতমা-শ্রমপ্রতিপত্তিহীনানাম্‌ অন্তরালবর্তিনাং কিং বিদ্যায়াম্‌ অধিকারঃ অস্তি, কিংবা নাস্তি ইতি সংশয়ে, নাস্তি ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্‌।... এবম্‌ প্রাপ্তে ইদম্‌ আহ—'অন্তরা চাপিতু' অনা-শ্রমিত্বেন বর্তমানঃ অপি বিদ্যায়াম্‌ অধিক্রিয়তে।... রৈক্কবাচক্নবী প্রভৃতীনাম্‌ এবং ভূতানাম্‌ অপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রুত্যুপলব্ধেঃ ॥" বিধুর অর্থাৎ মৃতপত্নীক, অথবা যাঁরা ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপক কিন্তু বিবাহাদি করেনি অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমী নয়, সেরূপ ব্যক্তির ব্রহ্মবিদ্যালাভে অধিকার আছে অথবা নেই—এই প্রশ্নে পূর্বপক্ষীর অনধিকার মতকে নিরসন করার জন্য সিদ্ধান্তী বলছেন, সূত্রান্তর্গত 'অন্তরা চাপিতু' বাক্যে অনাশ্রমীরও বিদ্যাধিকার দেখা যায়। শ্রুতিতে রৈক্ক ও বাচক্নবী প্রভৃতির দৃষ্টান্তে তা প্রমাণিত হয়।

শ্রুতি ভিন্ন স্মৃতি থেকেও বিবাহের পূর্বে ও বৈধব্যের পরে নারীর সন্ন্যাসে অধিকার আছে—এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় মহাভারতের শান্তি পর্বের মোক্ষধর্ম প্রকরণে 'সুলভা-জনকসংবাদ' আখ্যায়িকায়। সুলভানাম্নী এক সন্ন্যাসিনী জনকসভায় আগমন-পূর্বক মহারাজের সঙ্গে মোক্ষধর্ম বিষয়ক যে আলোচনা করেন তা মহাভারতের শান্তি পর্বে বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। এই অংশে টীকাকার নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যাকালে 'ভিক্ষুকী' (মহীমনুচচারৈকা সুলভা নাম ভিক্ষুকী।—মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩১০ অঃ) শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন। জীবন্মুক্তি-বিবেক গ্রন্থে উদ্ধৃত সুলভা-জনক অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে অনেকে মনে করেন। কারণ, বিদ্যারণ্য টীকাকার নীলকণ্ঠ অপেক্ষা অনেক পূর্ববর্তী। যাই হোক প্রমাণ হিসাবে অবশ্য এই ব্যাখ্যা ও সুলভার ভিক্ষুকীত্ব নারীগণের সন্ন্যাসাধিকার বিষয়ে স্মৃতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এযুগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ভাব প্রচারকল্পে স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসের যে আদর্শ দিয়ে যান, তা অবলম্বন করেই 'শ্রীসারদা মঠ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসে অধিকার প্রসঙ্গে বৈদিক মতবাদের উদাহরণস্বরূপে এই মঠ দণ্ডায়মান। এসকল প্রমাণ দ্বারা বর্তমানে প্রচলিত নারীর সন্ন্যাসাধিকার বিষয়ে সংশয় নিরসন করা যায়।

[ক্রমশঃ]

নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মপত্রিকা

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হবার অব্যবহিত পরে ক্ষুদিরাম তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণের যে জন্মপত্রিকা তৈরি করিয়েছিলেন তা পরবর্তী কালে হারিয়ে যায়। এর ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মসময় নিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর তিরোভাবের পরেও আনুমানিক প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী লিখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম "১৮৩৩-৩৫-৩৬ কালমধ্যে" সঞ্চালিত হয়েছে এবং "১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের কথা যদি কেহ বলিয়া থাকেন তবে তাহা আমাদের জানা নাই।"[১] আমরা কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মসময় ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ বলেও প্রচারিত হতে দেখেছি। নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো ঃ

(ক) ১৩০০ বঙ্গাব্দে (১৮৯৩ বা ১৮৯৪) ক্ষেত্রনাথ ভট্ট কর্তৃক গণিত কোষ্ঠী অনুসারে জন্মসময় ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ।

(খ) 'Theistic Quarterly Review', October, 1879 এবং 'The Baker and Taylors Co.' New York, 1901 শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মসময় ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ বলে প্রচার করেছেন।

(গ) ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২১ আগস্ট 'The Indian Mirror' পত্রিকা লেখেন ঃ "Ramkrishna Bhattacharji, better known in the Hindu Community as 'Paramahamsa', was born on the 10th of Falgoon, 1834."

(ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ৩ কার্তিক (অক্টোবর, ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ) অম্বিকা আচার্য যে-কোষ্ঠী তৈরি করেন তদনুসারে জন্মসময় ১৭৫৬ শকাব্দ, ১২৪১ বঙ্গাব্দ এবং ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ও রামচন্দ্র দত্ত অম্বিকা আচার্যকে অনুসরণ করে লিখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মসময় ১৭৫৬ শকাব্দ—১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ৩১ আগস্ট 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা অম্বিকা আচার্যকে অনুসরণ করে লেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৭৫৬ শকে (১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ)।

(ঙ) ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্কে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। নাম 'Sri Ramakrishna Paramahamsa Dev'। স্বামীজী পরে উইম্বলডনেও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা-দুটি একত্রিত করে 'My Master' পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রথম দিকের একাধিক সংস্করণে জন্মসময় বলা হয়েছে—২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ। পরবর্তী কালে জন্মসময় সংশোধন করে বলা হয়েছে—১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ। অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত সপ্তদশ সংস্করণে (আগস্ট, ১৯৮৪) ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দই দৃষ্ট হয় (পৃঃ ১৫)। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'The Life of Ramakrishna' গ্রন্থে (নভেম্বর, ১৯৮৬) নির্দেশ করেছেন—১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ (পৃঃ ২২)। মূল কোষ্ঠী হারিয়ে গেলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে বহুবার বলেছেন যে, তাঁর জন্মসময় —ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি, বুধবার এবং লগ্নে ছিল রবি, চন্দ্র ও বুধ—এই ত্রিগ্রহের যোগ। শ্রীরামকৃষ্ণের পরিবারবর্গের কাছ থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছিল যে, জাতক ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সূর্যোদয়ের স্বল্পকাল পূর্বে। পরবর্তী কালে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের কোষ্ঠী তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই উক্ত সূত্রাবলী অনুসরণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় অম্বিকা আচার্য যে-কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন (অক্টোবর, ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ) সেই কোষ্ঠী অনুসারে জন্মসময়—১৭৫৬ শকাব্দ (১২৪১ বঙ্গাব্দ, ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ) ১০ ফাল্গুন, শুক্লা দ্বিতীয়া, বুধবার, ৫৯ দণ্ড ১২ পল অর্থাৎ

১ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে—গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ১

সূর্যোদয়ের ১৯ মিনিট ১২ সেকেন্ড পূর্বে। শ্রীরামকৃষ্ণ অম্বিকা আচার্যের কোষ্ঠীকে ভ্রমাত্মক মনে করতেন, কিন্তু কেন ভ্রমাত্মক মনে করতেন তা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি। তবে ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে কথোপকথনের সময় একটু আভাস দিয়েছিলেন মনে হয়। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জুলাই বলরাম মন্দিরে বসে গিরিশচন্দ্র অম্বিকা আচার্যের কোষ্ঠী দেখছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলেন: "দ্বিতীয়ার চাঁদে জন্ম। আর রবি, চন্দ্র, বুধ—এছাড়া আর কিছু বড় একটা নাই।" গিরিশচন্দ্র বললেন: "কুম্ভরাশি। কর্কট আর বৃষে রাম আর কৃষ্ণ, সিংহে চৈতন্যদেব।"[২] গিরিশচন্দ্র সম্ভবতঃ বলতে চেয়েছেন যে, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণাবতার। সাক্ষ্য তাঁর জন্মরাশি। জ্যোতিষশাস্ত্রে গিরিশচন্দ্রের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই তিনি জন্মরাশির ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের দিক থেকে এই গুরুত্ব প্রদানের আদৌ কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। যাই হোক, কয়েকমাস পরে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন গিরিশচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন এবং হাত জোড় করে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন: "তুমিই পূর্ণব্রহ্ম। তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা।"[৩] এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের একদিনের কথোপকথন স্মরণ করা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে বিশ্বাস করলেও নরেন্দ্রনাথ তখনও বিশ্বাস করেননি। "কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর যখন ক্যান্সার রোগে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন, ভাতের তরল মণ্ড পর্যন্ত গলাধঃকরণ হইতেছে না, তখন একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট বসিয়া ভাবিতেছেন, এই যন্ত্রণামধ্যে যদি বলেন যে, আমি সেই ঈশ্বরের অবতার তাহলে বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে ঠাকুর বলিতেছেন—'যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে।' নরেন্দ্র এই কথা শুনে অবাক হইয়া রহিলেন।"[৪]

দেখা গেল, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর অবতারত্বের কথা ঘোষণা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। সুতরাং তাঁর কোষ্ঠীতে ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রসম্মত অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হতে বাধ্য। অম্বিকা আচার্যের কোষ্ঠীতে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়নি। সুতরাং উক্ত কোষ্ঠী যে প্রমাদপূর্ণ ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ কোষ্ঠীটিকে ভ্রমাত্মক মনে করতেন। অম্বিকা আচার্যের কোষ্ঠী যে সঠিক নয় তার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ—১৭৫৬ শকের (১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ) পঞ্জিকায় ১০ ফাল্গুন, শুক্লা দ্বিতীয়া, বুধবার ছিল না, ১০ ফাল্গুন ছিল কৃষ্ণানবমী শুক্রবার। ১৭৫৪ (১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ) এবং ১৭৫৭ শকের (১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ) পঞ্জিকায় ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া, বুধবার পাওয়া যায় এবং লগ্নে ত্রিগ্রহের যোগও পাওয়া যায়। প্রশ্ন হলো, উক্ত দুটি শকাব্দের মধ্যে কোনটি স্বীকার্য? এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের বক্তব্য আমাদের মনোযোগ দাবি করে। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: "১৭৫৪ শক ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া নির্ণয় করিলে, তাঁহার মুখে তাঁহার বয়স সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তদপেক্ষা ৩ বৎসর ২ মাস বাড়াইয়া তাঁহার আয়ু গণনা করিতে হয়। পক্ষান্তরে, ১৭৫৭ শককে তাঁহার জন্মকাল বলিয়া নির্ণয় করিলে তাঁহার জীবৎকালে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণ তাঁহার যে জন্মোৎসব করিতেন, তৎকালে তিনি নিজ বয়স সম্বন্ধে যেরূপ নির্ণয় করিতেন, তাহা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার পরমায়ু গণনা করিতে হয় না। শুধু তাহাই নহে, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, ঠাকুরের বিবাহকালে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর বয়স ৫ বৎসর মাত্র ছিল—ঐ বিষয়েও কোন ব্যতিক্রম করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন, ঠাকুর দেহরক্ষা করিলে সমবেত ভক্তগণ কাশীপুর-শ্মশানের মৃত্যু-নির্ণায়ক (রেজিস্টারি) পুস্তকে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর লিখাইয়া দিয়াছিলেন—তাহারও কোনরূপ পরিবর্তনের আবশ্যক হয় না। ঐসকল কারণে আমরা ১৭৫৭ শককেই ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া অবধারিত করিলাম।"[৫] স্বামী সারদানন্দের অনুমান-সিদ্ধ

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৯৮৫-৯৮৬ ৩ ঐ, পৃঃ ১০১৮ ৪ ঐ, পৃঃ ১১৮৫

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, ১৩৫৮, উদ্বোধন সং, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, পৃঃ ৭৮-৭৯ পাদটীকা

যুক্তির যাথার্থ্য অনস্বীকার্য। স্বামী সারদানন্দ ১৭৫৪ শক বর্জন করেছেন এবং ১৭৫৭ শককে গ্রহণ করেছেন। অনুমান প্রমাণ নয়, কিন্তু স্বামী সারদানন্দের অনুমান অভ্রান্ত। কারণ তাঁর অনুমানের পশ্চাতে দুটি প্রত্যক্ষ ও প্রতীতিগম্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টের গণনা—১৭৫৪।১০।৯।০।১২। তা থেকে জানা গেল, শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ১৭৫৪ শকের (১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ) ১০ ফাল্গুন সূর্যোদয়ের ১২ পল বা ৪ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড পরে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে রাত্রি অবসান হবার অল্প পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ক্ষেত্রনাথ ভুল জন্মসময় ধরে গণনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ক্ষেত্রনাথ ভট্ট-কৃত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকুণ্ডলীতে লগ্নে ত্রিগ্রহের যোগ ব্যতীত একমাত্র শুভযোগ—তুঙ্গী শুক্রের সঙ্গে স্বক্ষেত্রী বৃহস্পতি যুক্ত। এছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য সৌভাগ্য বা রাজযোগ নেই। এই কুণ্ডলীতে জন্মকালীন গ্রহাবস্থান যেকোন সাধারণ ভাগ্যবান মানুষেরই হতে পারে, কিন্তু দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের হতে পারে না। সুতরাং ক্ষেত্রনাথ ভট্টের কোষ্ঠীর প্রামাণিকতা স্বীকার্য হতে পারে না। নিচে ক্ষেত্রনাথ ভট্ট-কর্তৃক গণিত জন্মকুণ্ডলীর গ্রহাবস্থান প্রদত্ত হলো:

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৃষে—মঙ্গল (৫)। কর্কটে—রাহু (৮)। কন্যায়—শনি (১২)। মকরে—কেতু (২১)। কুম্ভে—লগ্ন, চন্দ্র (২৪), রবি (২৪) এবং বুধ (২৩)। মীনে—বৃহস্পতি (২৫) এবং শুক্র (২৭)।

১৭৫৪ শক (১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ) বর্জন করবার পরে ১৭৫৭ শককে (১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ) প্রকৃত জন্মসময় বলে গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, বিবাহের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ছিল ২৪ বছর এবং শ্রীশ্রীমার বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর। স্বামী সারদানন্দ অন্যত্র লিখেছেন: "পাত্রী কিন্তু নিতান্ত বালিকা, বয়স পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে।"[৬] দ্বিতীয় হিসাবই সঠিক। কারণ, শ্রীশ্রীমা জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর এবং তাঁর বিবাহ হয় ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের মধ্যভাগে (১২৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের শেষদিকে)। অতএব বিবাহের সময় শ্রীশ্রীমার বয়স ছিল ৫ বছর ৪ মাসের কিছু বেশি। এই হিসাব অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শ্রীশ্রীমার চেয়ে প্রায় ১৮ বছরের বড়। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মসময় অনিবার্যভাবে ১৭৫৬ শকে (অর্থাৎ ১৮৫৩—১৮=১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ) এসে দাঁড়ায়। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৭৫৬ শকের ফাল্গুন মাসে শুক্লা দ্বিতীয়া, বুধবার পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় ১৭৫৭ শকে। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত জন্মসময় ১৭৫৭ শক (১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ)। মনে হয় শ্রীশ্রীমার কোষ্ঠী অবলম্বন করে উপরি-উক্ত পদ্ধতিতেই শশিভূষণ ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মসময় স্থির করেন—১৭৫৭ শকাব্দ (১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ)। যথার্থ জন্মসময় স্থিরকৃত হবার পরে সে-যুগের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় জ্যোতিষী নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ (১৮৫৯-১৯২৩) ১৭৫৭ শকের ভিত্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণিক কোষ্ঠী তৈরি করে দেন। কোষ্ঠীটি যে সম্পূর্ণ নির্ভুল তার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ জন্মকুণ্ডলীতে নবগ্রহের বিস্ময়কর অবস্থান ও অভূতপূর্ব শুভ যোগাদির উপস্থিতি। এরূপ গ্রহাবস্থান ও যোগাদি একমাত্র নররূপে অবতীর্ণ ঈশ্বরাবতারের পক্ষেই সম্ভব।

নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণের গণনানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মসময়—১৭৫৭ শকাব্দ, ১২৪২ বঙ্গাব্দ, ৬ ফাল্গুন, শুক্লা দ্বিতীয়া, বুধবার, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি। পঞ্জিকায় ১৭ ফেব্রুয়ারিই পাওয়া যায়, কিন্তু ইংরেজী হিসাবে রাত্রি ১২ ঘটিকার পরে ভূমিষ্ঠ হবার জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারি হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারির হিসাবই সঠিক। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীতে ১৮ ফেব্রুয়ারিই লিখেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের 'My Master' পুস্তিকার ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণে ১৮ ফেব্রুয়ারি দৃষ্ট হয়, যদিও 'মদীয় আচার্যদেব' পুস্তিকার ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণে ১৭ ফেব্রুয়ারিই বলা হয়েছে। নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ শ্রীরামকৃষ্ণের কোষ্ঠী কখন প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন তা কোথাও উল্লিখিত হয়নি। লীলাপ্রসঙ্গের প্রথম

৬ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, সাধকভাব, পৃঃ ১৭৫

খণ্ড, গুরুভাব—পূর্বার্ধ (শ্রাবণ, ১৩১৮) ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড, গুরুভাব-উত্তরার্ধ (আশ্বিন, ১৩১৮) ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় খণ্ড, সাধকভাব (ফাল্গুন, ১৩২০) প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে এবং চতুর্থ খণ্ড, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন প্রকাশিত হয় (বৈশাখ, ১৩২২) ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে। স্বামী সারদানন্দ তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে বলেছেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত জন্মসময় নিরূপণ করতে পেরেছেন। গ্রন্থের পরিশিষ্টে তিনি সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবছর, মাস, বার, তারিখ, তিথি ও আনুমানিক জন্মমুহূর্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ জন্মসময় নিয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং জ্যোতির্ভূষণ কর্তৃক গণিত কোষ্ঠীকে প্রামাণিক বলে স্বীকৃতি দান করেন। উপরি-উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে, জ্যোতির্ভূষণ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণ্য কোষ্ঠী তৈরি করে দেন ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে অথবা ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে।

স্বামী সারদানন্দ জ্যোতির্ভূষণ কর্তৃক গণিত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকুণ্ডলীর গ্রহাবস্থান সম্বন্ধে লিখেছেন: "উহা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদি অবতার-প্রথিত পুরুষসকলের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।"[৭] "কেন হীন নহে" তা অনুধাবন করতে হলে, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশঙ্করাচার্য এবং শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকুণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকুণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা অপরিহার্য। নিচে উপরি-উক্ত অবতারদের রাশিচক্রে তাঁদের জন্মকালীন গ্রহাবস্থান দেওয়া হলো। বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হলো নক্ষত্রসংখ্যা। জ্যোতিষশাস্ত্রে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন পাঠকও ইচ্ছা করলে জাতচক্র এঁকে নিতে পারবেন।

শ্রীরামচন্দ্র: মেষে—রবি ও বুধ। মিথুনে—কেতু। কর্কটে—লগ্ন, বৃহস্পতি ও চন্দ্র (৮)। তুলায় শনি। ধনুতে—রাহু। মকরে—মঙ্গল। মীনে—শুক্র।

শ্রীকৃষ্ণ: বৃষে—লগ্ন, কেতু ও চন্দ্র (৪)। সিংহে—রবি। কন্যায়—বুধ। তুলায়—শুক্র ও শনি। বৃশ্চিকে—রাহু। মকরে—মঙ্গল। মীনে—বৃহস্পতি।

শ্রীশংকর: মেষে—রবি (১), শুক্র (১), বুধ (২)। বৃষে—চন্দ্র (৪)। কর্কটে—লগ্ন, বৃহস্পতি (৮)। সিংহে—মঙ্গল বক্রী (১০), কেতু (১১)। তুলায়—শনি (১৪)। কুম্ভে—রাহু (২৫)।

শ্রীচৈতন্য: সিংহে—লগ্ন, চন্দ্র (১১), কেতু (১১)। বৃশ্চিকে—শনি (১৭)। ধনুতে—বৃহস্পতি (২০), মঙ্গল (২০)। কুম্ভে—রাহু (২৫), রবি (২৫), বুধ (২৫), শুক্র (২৫)।

শ্রীরামকৃষ্ণ: বৃষে—রাহু (৩)। মিথুনে—বৃহস্পতি বক্রী (৬)। তুলায় —শনি বক্রী (১৫)। বৃশ্চিকে—কেতু (১৭)। মকরে—মঙ্গল (২২)। কুম্ভে—লগ্ন, রবি (২৪), চন্দ্র (২৫), বুধ বক্রী (২৪)। মীনে—শুক্র (২৬)।

এবার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পূর্ববর্তী অবতারদের জন্মকুণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জাতচক্রে রবি, বৃহস্পতি শনি, মঙ্গল ও শুক্র—এই পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গী। লগ্নে চন্দ্র ও বৃহস্পতি—জীবযোগ। জীবযোগ অতীব শুভপ্রদ। পঞ্চম পতি ও দশম পতি মঙ্গল একাই রাজযোগকারক এবং চন্দ্র সহ তুঙ্গী বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। নবম পতি বৃহস্পতি এবং দশমপতি মঙ্গল পরস্পরের সপ্তমে—প্রবল রাজযোগ। রবি ও চন্দ্র উভয়েই রাজ্যপ্রদ এবং উভয়েই কেন্দ্রগত হবার জন্য বিশেষ শুভ।

শ্রীকৃষ্ণের জাতচক্রে চন্দ্র, বুধ, শনি ও মঙ্গল—এই চারটি গ্রহ তুঙ্গী। চতুর্থ পতি রবি এবং অষ্টম ও একাদশ পতি বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রী। রাজ্যপ্রদ রবি ও চন্দ্র কেন্দ্রগত। ভাগ্যপতি ও কর্মপতি শনি একাই রাজযোগকারক। লগ্নপতি ও ষষ্ঠপতি শুক্র স্বক্ষেত্রে তুঙ্গী শনিযুক্ত। বৃষ লগ্নে ষষ্ঠপতিত্ব দোষাবহ নয়—শুভপ্রদ।

শঙ্করাচার্যের রাশিচক্রে রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি এবং শনি—এই চারটি গ্রহ তুঙ্গী। লগ্নে ধর্মাধিপতি বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি আছে ধর্ম-স্থানে ও ভক্তিস্থানে। ভক্তিস্থানাধিপতি মঙ্গল একাই

৭ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, পৃ: ৭৭

রাজযোগকারক এবং বাগ্‌স্থানে মিত্রগৃহে বক্রী। কর্মভাবে রবি তুঙ্গী এবং শুভগ্রহ বুধ ও শুক্র যুক্ত। রবি, বুধ ও শুক্র—এই তিনটি গ্রহই বলবান দশম কেন্দ্রে অবস্থিত। রাজ্যপ্রদ রবি দশমে তুঙ্গী এবং রাজ্যপ্রদ চন্দ্র একাদশে (লাভে) তুঙ্গী।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা মহর্ষি পরাশর বলেন—"লক্ষ্মীস্থানং ত্রিকোণঞ্চ বিষ্ণুস্থানঞ্চ কেন্দ্রকম্। / তয়োঃ সম্বন্ধমাত্রেণ রাজযোগাদিকং ভবেৎ॥" অর্থাৎ ত্রিকোণ বা কোণ স্থানকে বলা হয় লক্ষ্মীস্থান এবং কেন্দ্রস্থানকে বলা হয় বিষ্ণুস্থান। তাদের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ হলে রাজযোগ হয়। লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম গৃহকে বলা হয় কেন্দ্র এবং পঞ্চম ও নবম গৃহকে বলা হয় ত্রিকোণ বা কোণ।

চৈতন্যদেবের জাতচক্রে ৯টি গ্রহের মধ্যে চন্দ্র, কেতু, শনি, রাহু, রবি, বুধ ও শুক্র—সাতটি গ্রহ আছে কেন্দ্রে (বিষ্ণুস্থানে) এবং বৃহস্পতি ও মঙ্গল—এই দুটি গ্রহ আছে কোণ বা ত্রিকোণে (লক্ষ্মীস্থানে)। দেখা গেল, নবগ্রহের সব কয়টি গ্রহই আছে কেন্দ্র ও কোণে। এই অসাধারণ শুভযোগ অতীব দুর্লভ। চতুর্থ ও নবম পতি মঙ্গল একাই রাজযোগকারক হয়ে ভক্তিস্থানে স্বক্ষেত্রী বৃহস্পতি যুক্ত। চতুর্থ পতি মঙ্গল ও পঞ্চম পতি বৃহস্পতির যোগে প্রবল রাজযোগ ঘটেছে। ধর্মাধিপতি মঙ্গলের সঙ্গে ভক্তিস্থানাধিপতি বৃহস্পতি সম্বন্ধ করায় অতি বলবান সৌভাগ্যযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ণাবলী বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি আছে ধর্মস্থানে, লাভে এবং লগ্নে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জাতচক্রে রাহু, শনি, কেতু, মঙ্গল ও শুক্র—এই পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গী। জ্যোতির্ভূষণ কর্তৃক গণিত জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহস্ফুট দেওয়া হয়নি। আয়াসসাধ্য বলে প্রায় কোন জ্যোতিষীই গ্রহস্ফুট গণনা করেন না। গ্রহস্ফুট ব্যতীত গ্রহাবস্থানের নিগূঢ় তাৎপর্য সম্যক্ অবধারণ করা সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রহস্ফুট বিচার করে সন্দেহাতীতরূপে জানা গেল, তাঁর পাঁচটি গ্রহ শুধু তুঙ্গী নয়—সুতুঙ্গী। জ্যোতিষশাস্ত্র বলে, জন্মসময়ে যার একটি গ্রহ তুঙ্গী থাকে তিনি ভোগী হন, দুটি তুঙ্গী হলে ধনী, তিনটি তুঙ্গী হলে ধনেশ্বর, চারটি তুঙ্গী হলে রাজা, পাঁচটি তুঙ্গী হলে রাজচক্রবর্তী বা রাজচক্রবর্তীর তুল্য মান-মর্যাদা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "দুটি সাধ ছিল। প্রথম—ভক্তের রাজা হব, দ্বিতীয়—শুঁটকে সাধু হব না।"[৮] রাশিচক্রে পাঁচটি গ্রহ সুতুঙ্গী থাকায় তিনি হয়েছেন ভক্তের রাজচক্রবর্তী—রাজাধিরাজ। সুতুঙ্গী শুক্র তাঁকে 'শুঁটকে' সাধু হতে দেয়নি, তাঁকে 'রসে বশে'ই রেখেছে। উল্লেখ্য এই যে, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যের মতো শ্রীরামকৃষ্ণের লগ্নে ছিল চন্দ্র। রামচন্দ্র, শঙ্করাচার্য এবং চৈতন্যদেবের মতো শ্রীরামকৃষ্ণেরও বুধাদিত্য যোগ ছিল। রামচন্দ্র শঙ্করাচার্য ও চৈতন্যদেবের তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণের বুধাদিত্য যোগ ঢের বেশি বলবান, কারণ, তাঁর জাতচক্রে রবি ও বুধ যথাক্রমে কেন্দ্রপতি ও কোণপতি। আগেই বলা হয়েছে, কেন্দ্রপতি ও কোণপতি সম্বন্ধ করলে রাজযোগ হয়। কুণ্ডলীতে রবি, চন্দ্র, বুধ, রাহু ও কেতু—এই পাঁচটি গ্রহ কেন্দ্রগত (বিষ্ণুস্থানে) এবং বৃহস্পতি ও শনি কোণগত (লক্ষ্মীস্থানে)। দেখা গেল, নয়টি গ্রহের মধ্যে সাতটি গ্রহেরই কেন্দ্র ও কোণে অবস্থিত। লগ্নপতি শনি ধর্মস্থানে সুতুঙ্গী এবং ধর্মাধিপতি শুক্র বাগ্‌স্থানে সুতুঙ্গী। পঞ্চমগৃহ (ভক্তিস্থান) থেকে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি আছে ধর্মস্থানে, স্বগৃহে এবং লগ্নে। শ্রীরামচন্দ্রের লগ্নে আছে বৃহস্পতি ও চন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্র ও কেতু, শঙ্করাচার্যের একমাত্র বৃহস্পতি, চৈতন্যদেবের চন্দ্র ও কেতু। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের লগ্নে আছে রবি, চন্দ্র ও বুধ। জ্যোতিষশাস্ত্রে রবি আত্মা, চন্দ্র মন এবং বুধ বোধ বা বুদ্ধির প্রতিরূপ। দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আত্মা, মন ও বুদ্ধির পরিপূর্ণ মিলন ঘটেছিল। এই অভূতপূর্ব মিলন পূর্ববর্তী কোন অবতারের জীবনে দেখা যায় না। স্বীকার করতেই হবে, শ্রীরামকৃষ্ণের জাতচক্র শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশঙ্করাচার্য এবং শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা "কোন অংশে হীন" তো নয়ই বরং অনেক বেশি সমুন্নত। বিদগ্ধ পাঠক নিঃসন্দেহে ধারণা করতে পারবেন—"যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।" এবং উপলব্ধি করবেন—স্বামী বিবেকানন্দ কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে "অবতারবরিষ্ঠ" বলে প্রণাম জানিয়েছেন। □

৮ কথামৃত, পৃঃ ৯৮৬

প্রাসঙ্গিকী

অস্ট্রেলিয়ায় রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন সমাচার

মেলবোর্ন তথা অস্ট্রেলিয়ায় রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ধীরে ধীরে যথেষ্ট প্রসারলাভ করছে। এখানকার রামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের দ্বারা আয়োজিত কিছু অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সংবাদ পাঠালাম। যদি অনুগ্রহ করে উদ্বোধন-এ প্রকাশ করেন তাহলে বিশেষ বাধিত হব।

প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও ফিজি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী দামোদরানন্দের পরিচালনায় গত ২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, '৯১ মেলবোর্নে বর্তমান পত্রলেখকের [ইনি মেলবোর্ন বেদান্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ।] উদ্যোগে বিভিন্ন ভক্তের গৃহে পাঁচরাত্রি সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান ও আড়াই দিনব্যাপী বেদান্ত সাধন-শিবির আয়োজিত হয়। প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে জয়শ্রী-রাঘবন ও পুলোমা-দিলীপ মুখার্জীর গৃহে সৎসঙ্গ হয়। অপর তিনরাত্রি ফিজি থেকে আগত ভক্তবৃন্দ যথাক্রমে ডাঃ কে. ডি. শর্মা, শ্রীরাজারাম ও শ্রীদেবেন-এর গৃহে 'পরমার্থপ্রসঙ্গ', শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা এবং সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে অনেক ভক্তের সমাগম হয় এবং অনুষ্ঠান-শেষে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মেলবোর্ন শহর থেকে ৭০ কি. মি. দূরে নিভৃত জেমব্রুক পার্কের মনোরম পার্বত্য পরিবেশে স্বামী দামোদরানন্দের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বেদান্ত সাধন-শিবিরে এবছর ষোলজন যোগদান করেন। দিবাকালীন শিবিরে অতিরিক্ত দশজন যোগদান করেন। বেদান্ত সাধন-শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের প্রেরিত আশীর্বাণী পাঠ করে। জপ-ধ্যান-আরাধনা-মন্ত্রোচ্চারণে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ধর্ম-প্রবচন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সতেরো অধ্যায় পাঠ-ব্যাখ্যা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ভক্তবৃন্দকে উদ্বোধিত করে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয় ও অভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে আগত মৃদবিদরী-দম্পতি, শ্রীমতী লুসি ও ডাঃ সুমন্ত। অভারতীয় অংশগ্রহণকারীরাই সংখ্যায় বেশি ছিলেন। দুটি চীনা যুবক ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। স্থানীয় চিন্ময় মিশন সাউথ শাখার অধ্যক্ষা ডাঃ শ্রীমতী গণপতি আধ্যাত্মিক সাধনা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। মেলবোর্ন শহরের অন্যতম গুরুদ্বার সংস্থার সম্মানিত বর্ষীয়ান ধর্মব্যাখ্যাকার শ্রীপুরুষোত্তম মাহীনদ্র সিংজী 'গুরু ও গ্রন্থসাহেব' সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। অংশগ্রহণকারী অনুসন্ধিৎসুদের প্রশ্ন, বর্ষীয়ান অগ্রবর্তীদের উত্তরদান এবং সাধন-শিবিরের মুখ্য পরিচালক স্বামী দামোদরানন্দের ব্যাখ্যা ও উপদেশে আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মেলবোর্ন ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক আয়োজিত এটি চতুর্থ বেদান্ত সাধন-শিবির।

মেলবোর্ন বেদান্ত সোসাইটির সদস্যরা প্রতি মাসের দ্বিতীয় রবিবারে 'গস্‌পেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ' ('কথামৃত'), 'গস্‌পেল অব দ্য হোলি মাদার' ('মায়ের কথা') এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ ও আলোচনায় নিয়মিত মিলিত হচ্ছেন।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ আমার বাড়িতে ভক্তজনের অংশগ্রহণে প্রতি বছরের মতো শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯১ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেলবোর্ন শহরতলীর উপকণ্ঠে মিলপার্ক উপনগরীর গৃহে। সেখানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, পাঠ-আলোচনা, আরাত্রিক ভজন, প্রসাদ বিতরণ ছিল উভয় স্থানে অনুষ্ঠিত উৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। ☐

ভূপেশ গঙ্গোপাধ্যায়
ওকলে (মেলবোর্ন)
ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া

বিশেষ রচনা

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দঃ প্রতিক্রিয়া এবং তাৎপর্য

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮ সংখ্যার পর]

তাৎপর্য

আগেই বলেছি, প্রতিক্রিয়ার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের তাৎপর্য।

উদ্বোধনী ভাষণের (১১ সেপ্টেম্বর) প্রথম সম্ভাষণটি কিভাবে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল তা আমরা আগেই বলেছি। এখন ভাষণটির বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করব। অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ এটি, অথচ হীরকের দ্যুতির মতো আজও এটি উজ্জ্বল। সমগ্র ভাষণটি দিতে স্বামীজীর পাঁচ-সাত মিনিট সময় লেগেছিল, অথচ এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে তাঁর পাশ্চাত্য বিজয়ের চাবিকাঠি। প্রথমেই তিনি আমেরিকাবাসীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য। এই ধন্যবাদজ্ঞাপন তিনটি তরফে ঃ (১) পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তরফে, (২) সমস্ত ধর্মের মাতৃতুল্য সনাতন ধর্মের তরফে এবং (৩) সর্বশ্রেণীর ও সর্বসম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের তরফে। প্রাচ্যের কোন কোন ধর্মীয় প্রতিনিধিদের বক্তৃতায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বাণীকে বিশেষভাবে উল্লেখের জন্য তাঁদেরও তিনি ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এমন একটি ধর্মের তিনি সদস্য, যা বিশ্বকে শুধু সহিষ্ণুতাই শেখায়নি, সার্বিক স্বীকৃতিও শিখিয়েছে এবং এজন্য তিনি গর্বিত। অন্যান্য ধর্মকে শুধুমাত্র সহ্য করা নয়, তাদেরকে সত্য বলে স্বীকার করায় তিনি বিশ্বাসী। তিনি আরও গর্বিত এই কারণে যে, তিনি এমন একটি জাতির সদস্য, যা পৃথিবীর সমস্ত নির্যাতিত ও উদ্বাস্তু জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের যুগে যুগে আশ্রয়দান করে এসেছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে নিজ নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত ইহুদীদের ও জরথুস্ত্রীয়দের প্রথম আশ্রয় গ্রহণের কথাও এপ্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন। পুষ্পদন্তের 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে' নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটির স্বচ্ছন্দ ইংরেজী অনুবাদ প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি বক্তৃতাটির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ঃ

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথ-জুষাম্।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

(বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে; সরল ও বক্র নানা পথে তারা এগিয়ে চলে, কিন্তু সব নদীর একমাত্র গন্তব্য সমুদ্র। তেমনি লোকে নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্য হেতু সরল ও বক্র নানা পথ অবলম্বন করে, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমিই সকল মানুষের একমাত্র গতি।) স্বামীজীর অনুবাদ ঃ "As the different streams having their sources in different places all mingle their waters in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tandencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee."

তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেন, সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং তাদেরই উত্তরসূরী ধর্মান্ধতা কিভাবে পৃথিবীকে দীর্ঘদিন ধরে কলুষিত করে এসেছে, হিংসা ও রক্তপাতের দ্বারা বহু সভ্যতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিলেন যে, এসবের মেয়াদ যেন শেষ হয়ে আসে—ধর্মমহাসভার প্রথম প্রভাতেই যেন সর্বপ্রকার ধর্মান্ধতা, কলম বা তরবারির সাহায্যে ধর্মীয় নিপীড়ন এবং তার বিষময় প্রতিক্রিয়াসমূহের মরণ-বিষাণ বাজে এবং সকলে এক মিলনের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়।

স্বামীজীর আশা পূরণ হয়নি। কিন্তু তাঁর ঐ প্রাথমিক বাণীর তাৎপর্য আজও অম্লান। মানব-সভ্যতা কিভাবে রক্ষা পেতে পারে, তার মূলসূত্রটি তিনি শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর ঐ প্রথম ভাষণেই অনবদ্য ভাষায় ও আবেগে প্রকাশ করেছিলেন।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ঐ প্রথম ভাষণটি ব্যারোজের "History of the Parliament of Religions" নামক পুস্তক থেকে সংগৃহীত। শিকাগোর সমসাময়িক চারটি পত্রিকায় ঐটির যা বিবরণী বেরিয়েছিল মারি লুইস বার্ক তা থেকে সংগ্রহ করে বক্তৃতাটির কিছু পুনর্গঠন করেছেন।[৫] এতে কিছু কিছু বাড়তি সংযোজন আছে, যা স্বামীজী বলেছিলেন বলে তাঁর ধারণা। মূল বক্তব্যে বিশেষ কিছু হেরফের হচ্ছে না বলে আমরা সেগুলির আলোচনা আর করছি না। খুবই ছোট হলেও স্বামীজীর বক্তৃতাটি ছিল অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধানেও এর প্রধান বক্তব্যগুলি অম্লান আছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান বিশ্বের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। যথা, প্রতিটি ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতাই যথেষ্ট নয়, সত্য বলে তাকে স্বীকার করাও অবশ্য প্রয়োজন। স্বামীজীর গুরুদেবের বিখ্যাত বাণীরই প্রতিধ্বনি এতে আমরা দেখতে পাই—"যত মত, তত পথ"। সবারই মূল লক্ষ্য এক, মত ও পথ যতই আলাদা হোক না কেন। মৌলবাদ (fundamentalism)—তা হিন্দু, মুসলমান অথবা অন্য যে-কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদই হোক না কেন—পরিহার করতে হবেই, যদি আমরা মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে চাই।

ঐ বক্তৃতাটিতে স্বামীজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকেও একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ধর্মমহাসভার মতো মহতী সভার আয়োজন গীতার একটি সুমহান তত্ত্বেরই নব উদ্ঘোষণ মাত্র। গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটির সাবলীল ইংরেজী অনুবাদ তিনি দিয়েছিলেন :

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"
(গীতা, ৪।১২)

(হে পার্থ। যারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমি তাদের সেভাবেই প্রার্থিত ফলপ্রদান করি; মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার পথেই চলে।)

স্বামীজী প্রদত্ত অনুবাদ : 'Whosoever comes to Me, through whatsoever form, I reach him; all men are struggling through paths which in the end lead to Me."

শিবমহিম্নঃ স্তোত্র এবং গীতা থেকে স্বামীজীর উদ্ধৃতি দুটি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা; কিন্তু বাস্তবে তা আমরা পালন করছি কই?

স্বামীজীর দ্বিতীয় যে-বক্তৃতাটি আমরা পাই[৬] তা আরও ছোট। ঐটি ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখের এবং এর শিরোনাম—'Why We Disagree' ('আমাদের মতপার্থক্য কেন হয়')। তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী বক্তার ভাষণের রেশ ধরে স্বামীজী শ্রোতাদের একটি ছোট গল্প বলেন—একটি কূপমণ্ডূক ও একটি সামুদ্রিক মণ্ডূক বা ব্যাঙের সংলাপ। কুয়োর ব্যাঙটির জন্ম-কর্ম সবই সীমাবদ্ধ একটি ছোট কুয়োর মধ্যে। সামুদ্রিক ব্যাঙের আকস্মিক আগমনে সে তাকে প্রশ্ন করল : 'কোত্থেকে এসেছ তুমি, ভাই?' উত্তর—'সমুদ্র থেকে।' তখন কুয়োর ব্যাঙের আবার প্রশ্ন : 'সমুদ্র? সে কত বড়? আমার কুয়োর মতো এত বড়?' সমুদ্রের ব্যাঙের সহাস্য উত্তর : 'তোমার এই ছোট্ট কুয়োর সঙ্গে বিশাল সমুদ্রের কোন তুলনা হয়?' কুয়োর ব্যাঙ তার কুয়োর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বারংবার লম্ফপ্রদান করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করল যে, তার কুয়োর থেকে বড় আর কিছু হতে পারে না; সুতরাং সমুদ্রের ব্যাঙ নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলছে এবং তাকে তখনি তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

স্বামীজী গল্পটি বলে উপসংহার টানলেন এই বলে যে, হিন্দু তার ছোট কুয়োটিতে বসে ভাবছে, গোটা বিশ্বটাই তার কুয়োর মধ্যে। অনুরূপভাবে নিজ নিজ কুয়োতে বসে মুসলমানও ভাবছে তাই, খ্রীস্টানও ভাবছে তাই। সমস্ত মতপার্থক্যের মূল এখানেই। উপসংহারে তিনি আমেরিকাবাসীদের ধন্যবাদ জানালেন এইজন্যে যে, ধর্মমহাসভার সাহায্যে তাঁরা এই কূপমণ্ডূকতার প্রাচীর ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছেন; ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁদের এই প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন।

৫ Swami Vivekananda in the West : New Discoveries—Marie Louise Burke, Vol. I, p 84
৬ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, p. 4

মূল মহাসভায় স্বামীজীর তৃতীয় বক্তৃতাটি হয়েছিল ১৯ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ নবম দিবসে। মহাসভাতে এটিই ছিল তাঁর দীর্ঘতম ভাষণ। লিখিত এই প্রবন্ধটি তিনি সভায় পাঠ করেন। সরকারিভাবে এটির নাম ছিল 'Hinduism as a Religion'। 'Complete Works'-এ[৭] এর শিরোনাম—'Paper on Hinduism'। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১৩-২৮) এটি শুধু 'হিন্দুধর্ম' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের কাছে বক্তৃতাটি সুপরিচিত এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

মারি লুইস বার্ক এই বক্তৃতাটির অসাধারণত্ব সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার মন্তব্য উল্লেখ করেছেন।[৮] স্বামীজীর 'Complete Works'-এর ভূমিকায় নিবেদিতা এই সুন্দর মন্তব্যটি করেছিলেনঃ "It may be said that when he began to speak, it was of 'the religious ideas of the Hindus', but when he ended, Hinduism had been created." (একথা বলা যায় যে, তিনি হিন্দুদের ধর্মীয় ধারণাসমূহের আলোচনা দিয়ে বলা শুরু করেছিলেন; কিন্তু তিনি যখন শেষ করলেন, তখন হিন্দুধর্ম সৃষ্ট হলো।) এর অর্থ এই নয় যে, স্বামীজী হিন্দুধর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দুধর্ম (যাকে সনাতন ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম বলা হয়ে থাকে) তা কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি বলে হিন্দুরা কখনই মানেননি। নিবেদিতার উপরি উল্লিখিত মন্তব্যের আসল অর্থ হলো, হিন্দুধর্ম বলতে সত্যি সত্যি কী বোঝায় এবং তার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রূপ কি (বিশেষ করে পাশ্চাত্যবাসীদের চোখে) তা স্বামীজীর ঐ বক্তৃতাতে প্রকাশ পেয়েছিল। মারি লুইস বার্ক বলেছেন, বাস্তবিকই হিন্দুধর্মের নামে যুগ যুগ ধরে যত বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং আপাতবিরোধী, বিভ্রান্তিকর ধারণাসমূহ পুষ্পিত হয়েছে, তাদের মধ্যে মৌলিক সামঞ্জস্য ও ঐক্য স্বামীজীই তুলে ধরেছিলেন। মূল বিশ্বাস এবং চরম লক্ষ্য যে এক, আধ্যাত্মিক আদর্শ ও দর্শন যে 'মহতো মহীয়ান্, অণোরণীয়ান্'কে জানারই আকুল প্রয়াসমাত্র—তাও শ্রোতাদের মনে তিনি গেঁথে দেন। তিনি এগুলি যে শুধু পরিষ্কার ও প্রাঞ্জলভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন তাই নয়, নিখিল মানবাত্মার অন্তস্তল থেকে উৎসারিত এক অসীম প্রেরণাদায়ক জীবন্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতি তিনি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। পরবর্তী কালে বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়াম আর্নেস্ট হকিং তাঁর 'Recollections of Swami Vivekananda' নামক প্রবন্ধে ('Vedanta and the West', Sept.-Oct, 1963, p. 163) স্বামীজীর এই বক্তৃতাটির প্রতিক্রিয়া শ্রোতাদের মনে কেমন হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনিও ঐ ভাষণের অন্যতম শ্রোতা ছিলেন এবং তাঁর বয়স তখন মাত্র ২০ বছর। মারি লুইস বার্ক ঐ প্রবন্ধটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৯] বক্তৃতাটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমরা তার সামান্য একটু অংশমাত্র এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

"I hear his emphatic rebuke:

'Call men sinners?

It is a sin to call men sinners!'

...What his following words were, I cannot recall with the same verbal clarity: they carried the message that in all men there is that divine essence, undivided and eternal: Reality is One and that One, which is Brahman, constitutes the central being of each one of us." ("আমি তাঁর তীব্র ভর্ৎসনা এখনো শুনতে পাচ্ছিঃ

'মানুষকে পাপী বলছ?

মানুষকে পাপী বলাই পাপ!'

...তাঁর এর পরের কথাগুলি আমি সঠিক আক্ষরিকভাবে এখন স্মরণ করতে পারছি না, তবে তারা এই বাণীই বহন করেছিল যে, সর্বমানবে সেই অবিভাজ্য, অনন্ত ঐশী সত্তা বিদ্যমান; সত্য এক এবং সেই এক হলো ব্রহ্ম, যিনি আমাদের প্রত্যেকের মূল সত্তা।") হকিং বক্তৃতাটির দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন, দীর্ঘ ৭০ বছর পরে প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধের উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিতে আমরা তার পরিচয় পেলাম।

৭ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, pp 6-20

৮ Swami Vivekananda in the West · New Discoveries, Vol. I, p. 114 ৯ Ibid, Vol. I, p.118

ঐ বক্তৃতাটির প্রারম্ভে তিনি হিন্দু, জরথুস্ট্রীয় ও ইহুদী এই তিনটি প্রাগৈতিহাসিক ধর্মের উল্লেখ করেন। প্রচণ্ড আঘাত সত্ত্বেও এগুলি লুপ্ত না হয়ে এখনো জীবিত আছে কেন তিনি তার ব্যাখ্যাও করেন। এর পরেই তিনি বলেন, বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ হিন্দুদের বেদান্তের মহোচ্চভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র। সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্ত-জ্ঞান থেকে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক পৌরাণিক গল্পসমূহ, এমনকি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়-বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—এগুলির প্রত্যেকটিরই হিন্দুধর্মে স্থান আছে। ফলে যে-প্রশ্নগুলি স্বতই মনে উদিত হয়, তিনি তার উল্লেখ করেন—কোন্ সাধারণ কেন্দ্রে এসকল বহুধা বিভিন্নভাবে সংহত হয়েছে? কোন্ সাধারণ ভিত্তি অবলম্বন করে আপাতবিরোধী ভাবগুলি অবস্থান করছে? এসব প্রশ্নেরই মীমাংসা তিনি ঐ ভাষণটিতে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

বেদের অনাদিত্ব বলতে সঠিক কি বোঝায় তিনি তার বিশ্লেষণ করেন। বৈদিক ঋষিদের (যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নারীও ছিলেন) সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের আবিষ্কারের কথা প্রসঙ্গতঃ তিনি দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করেন (যথা, সৃষ্টি কোন্ অর্থে অনাদি ও অনন্ত, জন্মান্তরবাদ কেন সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত, দেহনিরপেক্ষ আত্মায় বিশ্বাস ইত্যাদি)। গীতা থেকে ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ থেকে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-দুটির তিনি উল্লেখ করেন :

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"
(গীতা, ২।২৩)

(কোন শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করতে পারে না। অগ্নি এঁকে দহন করতে পারে না। জল এঁকে আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু এঁকে শুষ্ক করতে পারে না।)

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ২।৫)

(হে অমৃতের সন্তানগণ! হে বিশ্বের ও দিব্য-ধামসমূহের অধিবাসিগণ! তোমরা শোন।)

দৈহিক নশ্বরত্ব সত্ত্বেও আত্মার অমরত্ব কিভাবে সদা বিদ্যমান তার কথা স্বামীজী বলেন। আমেরিকার মানুষকে 'অমৃতের সন্তান' বলে সম্বোধন করে হুকিং-এর পূর্বোল্লিখিত কথাগুলি (পাপ ও পাপী সম্বন্ধে) বলেন এবং তাঁদের আশ্বাস দেন এই বলে —"তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দ-ময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।"

এর পরে তিনি বলেন সেই বিরাট আদি পুরুষের কথা, যিনি সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে, অথচ প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন। কঠ উপনিষদে যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"
(কঠ উপনিষদ্, ২।৩।৩)

(তাঁর ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, সূর্য তাপ দেন, ইন্দ্র ও বায়ু এবং মৃত্যু তাঁদের স্ব-স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হন।)

এই বিরাট পুরুষের স্বরূপ কি? তিনি সর্ব-ব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান—সকলের ওপরেই তাঁর করুণা। মানুষ কিভাবে তাঁর পূজা করবে? প্রেমাস্পদরূপে—ঐহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তররূপে তাঁকে পূজা করতে হবে। বেদোক্ত এই শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা, এর পরে তিনি উল্লেখ করেন—"ইহলোকে ও পরলোকে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভাল-বাসা ভাল; কিন্তু ভালবাসার জন্যই তাঁহাকে ভাল-বাসা আরও ভাল।" স্বামীজী আরও বললেন : "কোন মতবাদ বা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়; অপরোক্ষানু-ভূতিই তার মূলমন্ত্র। আদর্শস্বরূপ হয়ে যাওয়া এবং তাকে জীবনে পরিণত করাই ধর্ম। ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করা; দিব্য-ভাবে ভাবান্বিত হয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া এবং তাঁর দর্শনলাভ করে সেই 'স্বর্গস্থ পিতা'র মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম।... সকল হিন্দু এবিষয়ে একমত। ভারতের সকল হিন্দুসম্প্রদায়ের এটাই সাধারণ ধর্ম। পূর্ণতাই পরম তত্ত্ব; সেই পরম কখনো দুই বা তিন হতে পারে না, তাঁতে কোন গুণ বা ব্যক্তিত্বও আরোপ করা যেতে পারে না। সুতরাং যখন জীবাত্মা এই পূর্ণ বা পরম অবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে

এক হয়ে যান এবং একমাত্র ব্রহ্মকেই নিত্য ও পূর্ণ-রূপে উপলব্ধি করেন। তিনিই আত্মার স্বরূপ—নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান, নিরপেক্ষ আনন্দ—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।··· এই অনন্ত বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব লাভ করতে গেলে দুঃখপূর্ণ ক্ষুদ্র দেহাবদ্ধ ব্যক্তিত্বকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। যখন আমি নিখিল বিশ্বের প্রাণস্বরূপ হয়ে যাব, তখনই মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব, যখন আনন্দস্বরূপ হয়ে যাব, তখনই দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাব; যখন জ্ঞানস্বরূপ হয়ে যাব, তখনই সকল ভ্রমের নিবৃত্তি হবে। এই হলো যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞান বলে—দেহগত ব্যক্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র; প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি শরীর নিরবচ্ছিন্ন জড়-সমুদ্রে অবিরাম পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।··· এই অদ্বৈত (একত্ব)-জ্ঞানই কেবলমাত্র যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।"

স্বামীজী এ-প্রসঙ্গে আরও বলেন: "একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছু নয়; এবং যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তখনই তার অগ্রগতি থেমে যায়; কারণ ঐ বিজ্ঞান তার লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে।··· এইরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হতে পারে না। সর্বপ্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের এটিই চরম লক্ষ্য। ···ফলেই বৃক্ষের পরিচয়। যখন দেখা যায়, যাদেরকে পৌত্তলিক বলা হয়, তাদের মধ্যে এমন মানুষ রয়েছেন, যাঁদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম অতিশয় দুর্লভ, তখন স্বতই মনে প্রশ্ন উদিত হয়—পাপ থেকে কি কখনো পবিত্রতার জন্ম হয়? কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ।··· মন্দির, প্রার্থনা-গৃহ, দেববিগ্রহ বা ধর্মশাস্ত্র—সবই মানুষের ধর্ম-জীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও সহায়ক মাত্র; তাকে আরও অগ্রসর হতে হবে। মহানির্বাণ তন্ত্রে (৪।১২) আছে 'বাহ্যপূজা—মূর্তিপূজা প্রথমাবস্থা; কিঞ্চিৎ উন্নত হলে মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী স্তর; কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষাৎকারই উচ্চতম অবস্থা'।"

স্বামীজী বললেন: "হিন্দুধর্মে বিগ্রহ-পূজা যে সকলের অবশ্য কর্তব্য, তা নয়; কিন্তু কেউ যদি বিগ্রহের সাহায্যে নিজের দিব্যভাব উপলব্ধি করতে পারে ('দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ'), তাহলে কি তাকে পাপ বলা সঙ্গত হবে? সাধক যখন ঐ অবস্থা অতিক্রম করে যান তখনও তাঁর পক্ষে ওটিকে ভুল বলা সঙ্গত নয়। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম থেকে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য থেকে সত্যে—নিম্নতর সত্যে থেকে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করে। নিম্নতম জড়োপাসনা থেকে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরবার, উপলব্ধি করবার জন্য মানবাত্মার বিভিন্ন প্রয়াস মাত্র। জন্ম, সংসর্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের সাধন-প্রচেষ্টা নিরূপিত হয়। প্রত্যেকটি সাধনাই ধাপে ধাপে ক্রমোন্নতির অবস্থা। প্রত্যেকটি মানবাত্মাই ঈগল-পক্ষীর শাবকের মতো ক্রমশঃ উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকে এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করে শেষে সেই মহান সূর্যে উপনীত হয়।"

প্রসঙ্গতঃ স্বামীজী উপনিষদ্ থেকে একটি অপূর্ব ভাবকে উপস্থাপন করেছিলেন:

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥"

(মুণ্ডক, ২।২।১০; শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৪; কঠ, ২।২।১৫)

(সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না; চন্দ্র, তারা এবং এই সকল বিদ্যুৎও তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। এই অগ্নি তাঁকে কিরূপে প্রকাশ করবে? এঁরা সকলেই তাঁর আলোকে প্রকাশিত।)

স্বামীজী বললেন: "যথার্থ হিন্দু কারুর দেব-বিগ্রহ বা প্রতীককে গালি দেন না বা প্রতিমা-পূজাকে পাপ বলেন না। তিনি একে সাধকের এক প্রয়োজনীয় অবস্থা বলে স্বীকার করেন। শিশুর মধ্যেই পূর্ণ মানবের সম্ভাবনা আছে। তাই বলে কি বৃদ্ধের পক্ষে শৈশব বা যৌবনকে পাপ বলা উচিত হবে?··· বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরতে পেরেছিলেন।··· তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন, আপেক্ষিককে আশ্রয় করেই নিরপেক্ষ পরম তত্ত্বের চিন্তা, প্রকাশ এবং উপলব্ধি সম্ভব। প্রতিমা, ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করবার অবলম্বনস্বরূপ।" [ক্রমশঃ]

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : অগ্রহায়ণ, ১৩৯৮ সংখ্যার পর]

সেই প্রাচীর-ঘেরা স্থান থেকে একটি ছোট দরজার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে পড়লাম শ্রীরাধাদামোদরের মন্দির-প্রাঙ্গণে। খুবই সাধারণ দালানবাড়ির মতো মন্দির। সামনে মার্বেল পাথরে বাঁধানো উঠান। সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দিরের গর্ভ-গৃহে একটি লম্বা বেদির ওপর সারি দিয়ে বসানো পাঁচ জোড়া রাধাকৃষ্ণ-মূর্তি। মাঝেরটি বড়, এটিই জীব গোস্বামীর পূজিত আদি শ্রীরাধাদামোদরের প্রতিভূ-মূর্তি। এই বিগ্রহ সম্পর্কে শোনা যায়—"স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধাদামোদরে / স্বহস্তে নির্মাণ করি দিল শ্রীজীবেরে।" নিজের হাতে এই বিগ্রহ তৈরি করে সাধকাগ্রণী রূপ ভ্রাতুষ্পুত্র জীবকে দেন এঁর সেবা-ভার। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের মাঘী শুক্লা দশমী তিথিতে সেই বিগ্রহ বর্তমান বেদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে সেই মূল বিগ্রহ মুসলমান অত্যাচারের সময় জয়পুরে স্থানান্তরিত হন। বর্তমান বিগ্রহ তারই প্রতিভূ-মূর্তি। রূপ গোস্বামী বহু গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি যে ভাস্কর্যবিদ্যাও জানতেন, এটি তার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পাশের অন্য বিগ্রহগুলির নিচে টিনের প্লেটে তাঁদের সেবাইত হিসাবে চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ভূগর্ভ গোস্বামী, বিখ্যাত কবি ও সাধক বিল্বমঙ্গল প্রমুখের নাম লেখা আছে। প্রত্যেক বিগ্রহের অঙ্গেই তাঁদের সেবকদের কত প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা ও সেবার স্পর্শ আছে ভেবে মন আনন্দে ভরে যায়। প্রাণভরে সেই বিগ্রহদের দর্শন করে ও তাঁদের সেবকদের চরণে প্রণাম জানিয়ে বেরোবার সময় বাবাজী আরও একটি জিনিস এখানে দেখিয়ে দিলেন। সনাতন গোস্বামীর জীবন প্রসঙ্গে শুনেছি গোবর্ধন শিলার কথা, শেষ জীবনে যেটি পরিক্রমা করে তাঁর নিত্য গোবর্ধন-পরিক্রমা সাঙ্গ হতো। সেই হাত দেড়েক লম্বা ও বিঘৎখানেক চওড়া পবিত্র শিলাটি দর্শন করলাম। তাঁতে শ্রীকৃষ্ণের একটি সুন্দর দক্ষিণচরণ-চিহ্ন, তার একদিকে একটি গোক্ষুর ও একটি বাঁশীর তলার দিকের গোলাকার ছাপ বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। খুব কাছে থেকে সেই দিব্য-স্মারকটি পূজারী আমাদের দর্শন করিয়ে কৃতার্থ করলেন। সেই শিলাটিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

বাবাজী আবার গান ধরেছেন :

"রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে
গোকুল-তরুণী-মণ্ডল-মহীতে
দামোদর-রতিবর্ধন-বেশে
হরিনিস্কুট-বৃন্দাবিপিনেশে
বৃষভানুদধি-নব-শশিলেখে
ললিতা-সখিগুণ-রমিত-বিশাখে
করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে··· ।"

ভাবে বিভোর হয়ে বাবাজী পথে নেমে এসেছেন। গলার স্বর মৃদু, কিন্তু আবেগে শরীর একটু দুলছে। যেতে যেতেই বাঁদিকে দেখিয়ে দিলেন সেবাকুঞ্জ। ঠিক নিধুবনের মতোই ঘেরা একটি স্থান, তার মধ্যে সেইরকমই বহু লতাকুঞ্জ। গাছগুলি অদ্ভুতভাবে এঁকে বেঁকে এক-একটি মণ্ডপের মতো করে দিয়েছে। একপাশে একটি ছোট প্রাচীন মন্দির। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার শৃঙ্গার বেশ করিয়ে দিচ্ছেন—এই দৃশ্যের অতি প্রাচীন একটি রাজস্থানী পট। তার নিচে একটি সুন্দর পালঙ্কে শয্যা, তাতে মেয়েদের সাজবার নানা রকম উপকরণ রাখা আছে। প্রতি সন্ধ্যায় এখানে আরতির পরে ঐ পালঙ্কে ফুল-মালা দিয়ে সব সাজিয়ে দেওয়া হয়। তারপর দরজা বন্ধ করে সকলে সেবাকুঞ্জের বাইরে চলে যান। রাত্রে ঐ

কুঞ্জের মধ্যে কেউ থাকতে পারে না। পরদিন সকালে দেখা যায়, সাজানো ফুল সব এলোমেলো হয়ে আছে। ভক্তের বিশ্বাস—এই সেবাকুঞ্জে প্রতিরাত্রে রাই-কিশোরের অভিসার-উৎসব হয়। এই কুঞ্জে একটি কুণ্ডও আছে, তার নাম বিশাখাকুণ্ড। আর একটি দর্শনীয় জিনিস এখানে দেখলাম, কুঞ্জের একপাশে একটি প্রাচীন তমাল গাছ রয়েছে। তার প্রধান কাণ্ডের গায়ে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কালো তেলচকচকে শালগ্রাম শিলার আকার হয়ে রয়েছে। প্রবাদ, এই গাছে বৃন্দাবনলীলায় বালক কানাই মাখন খেয়ে হাত মুছেছিলেন। সে যাই হোক, এই নিকুঞ্জবন বা সেবাকুঞ্জ আজও ভক্তের মনে যে এক অপূর্ব ভাবপ্রবাহের সৃষ্টি করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখনো প্রাচীনা ব্রজরমণীরা ঝাড়ু হাতে এই কুঞ্জস্থলী পরিষ্কার করেন বিকেলবেলায়, যাতে রাত্রের অভিসার-লীলায় বৃন্দাবন বিহারীলাল ও তাঁর দিব্য সাধিকাদের চরণে কাঁকড়ের ব্যথা না লাগে। এই ঝাড়ু দেওয়ার দুর্লভ সুযোগ আমিও নিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য এক বৃদ্ধা সেবিকার হাতের ঝাড়ুটি চেয়ে নিয়ে।

সেবাকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে তার সংলগ্ন শ্যামানন্দ ঠাকুরের নূপুর-প্রাপ্তির স্থানটিও দেখাতে ভুললেন না বাবাজী। এই শ্যামানন্দ ঠাকুর চৈতন্য-পরবর্তী কালে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব প্রচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পেয়েছিলেন। ইনি বৃন্দাবনে এসে জীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং নিজেকে শ্রীরাধিকার দাসীজ্ঞানে ভজন করতে থাকেন। একদিন এই সেবাকুঞ্জে ঝাড়ু দেওয়ার সময় একটি নূপুর কুড়িয়ে পান তিনি। সেবাকুঞ্জের পাশে অন্য একটি ঘেরা বাগানের মতো জায়গায় একটি ছোট্ট বেদি করে দিয়ে স্থানটি চিহ্নিত করা আছে। দেওয়ালের গায়ে লেখাও আছে—নূপুর-প্রাপ্তিস্থান। প্রবাদ, তিনি ভাবে বিভোর হয়ে সেই নূপুরটি নিয়ে শ্রীমতীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে যান এবং ভক্তের এই ভক্তির টানে শ্রীমতী স্বয়ং এসে তাঁর হাত থেকে নূপুরটি শ্রীচরণে ধারণ করেন। তারপর থেকে তিনি ও তাঁর অনুরাগী বৈষ্ণব সম্প্রদায় কপালে তিলকের মাঝখানে নূপুরাকৃতি চিহ্ন ধারণ করতে থাকেন। অভাস্ত আবেগের সঙ্গে বাবাজী এইসব অপ্রাকৃত লীলার কথা স্মরণ করছিলেন। স্থান-মাহাত্ম্য যথেষ্ট থাকলেও বর্তমানে এই অঞ্চল অত্যন্ত জরাজীর্ণ ও অবহেলায় পড়ে আছে দেখে কষ্ট হলো।

এই পবিত্র স্থান দর্শন করে এগিয়ে চললাম আমরা রূপ গোস্বামীর প্রাণধন শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের পথে। এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে বৃন্দাবনের বাজার অঞ্চল পার হয়ে আমরা এসে পৌঁছালাম এক বিরাট লালপাথরের তৈরি প্রাচীর-ঘেরা জায়গায়। মস্ত বড় লালপাথরের তোরণের নিচ দিয়ে পূর্বদিকে চলেছি। বাবাজী আগে আগে হনহন করে যাচ্ছেন। বাঁদিকে থেকে গেল আধুনিক শ্রীগোবিন্দের মন্দির, যেটি ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে নন্দকুমার বসু নামে এক বাঙালী ধনী জমিদার তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। তার সামনে দিয়ে ছোট গলিপথে একটু এগোতেই বিশাল লালপাথরের কারুকার্যময় মন্দিরের পিছনদিকে এসে পড়লাম। মাঝখানে একটি ছত্রী; সেটি খুব বেশিদিনের নয় বলে মনে হলো। তার নিচে সাদাপাথরের ওপর দুটি চরণচিহ্ন খোদাই করা। দেওয়ালের গায়ে প্রাচীন শিলালেখ। এই ছত্রীর দুপাশে দুটি ছোট মন্দির, মূল মন্দিরের দুধারে দুটি শাখা মন্দিরের মতো মন্দির-সংলগ্ন হয়ে রয়েছে। ডানদিকে মন্দির রেখে ঘুরে গিয়ে মন্দিরের সামনে দাঁড়ালাম। বেশ বোঝা যায়, নিচের সদর রাস্তাটি থেকে এই মন্দির-ক্ষেত্র বেশ খানিকটা উঁচু। সেজন্য এই অঞ্চলটির নাম 'গোমাটিলা'।

এই মন্দিরের প্রধান দ্বার পূর্বমুখী। উত্তর ও দক্ষিণে আরও দুটি দরজা আছে। আমরা উত্তর দ্বারের দিকটা একটু নির্জন দেখে সেখানে গিয়ে বসলাম। কতকটা আত্মগতভাবেই বাবাজী আবার শুরু করলেনঃ "কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ও দ্বারকায় যদুবংশ ধ্বংসের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর নরশরীর পরিত্যাগ করলেন তখন পাণ্ডবরা অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের ও শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে মথুরার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে মহাপ্রস্থানে চলে যান। এই বজ্রনাভই প্রথম মথুরা-মণ্ডলে প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলগুলি চিহ্নিত করে সেই স্থানে লীলার অনুসারী কতকগুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে চারটি 'দেব'—গোবর্ধনে

মানসী-গঙ্গাতীরে হরিদেব, মহাবনে বলদেব, মথুরায় কেশবদেব ও এখানে গোবিন্দদেব। দুইটি 'নাথ'—গোবর্ধনে শ্রীনাথ ও বংশীবটে গোপীনাথ, আর দুই 'গোপাল'—বৃন্দাবনে সাক্ষীগোপাল ও ছত্রবনে মদন-গোপাল বিখ্যাত। এর মধ্যে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন সম্বন্ধে আরও সুন্দর একটি কাহিনী প্রচলিত। বজ্রনাভ তার জননী উষাকে একসময় বলেন: 'মা তুমি তো আমার দাদুর বাবা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছ; তাঁর চেহারা কেমন ছিল বল তো?' তার উত্তরে উষা যেভাবে কৃষ্ণরূপের বর্ণনা দেন—সেই মতো বজ্রনাভ দক্ষ কারিগর দিয়ে কষ্ঠিপাথরের তিনটি মূর্তি তৈরি করিয়ে এনে মাকে দেখাতে নিয়ে যান। উষা একটি মূর্তি দেখে বলেন, এঁর চরণ তাঁর চরণের মতো। এটি হলো মদনগোপাল। আর একটির বুক দেখিয়ে বলেন, এর বক্ষঃস্থল তাঁর বক্ষের মতো। এটি গোপীনাথ। আর অন্য মূর্তিটি দেখেই তিনি লজ্জায় মাথায় ঘোমটা টেনে দেন। দাদাশ্বশুর শ্রীকৃষ্ণের মুখের অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখেন ঐ মূর্তিতে। এটি গোবিন্দদেবের মূর্তি। এ-তিনটিই বংশীধারী কৃষ্ণমূর্তি। আর হরিদেব, কেশবদেব বাঁহাত তোলা ডানহাত কোমরে গিরিধারীর মূর্তি। শ্রীনাথ, সাক্ষীগোপাল ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণমূর্তি।

"তবে এইসব কোন মূর্তির সঙ্গে সেসময় রাধারানীর কোন মূর্তি তৈরি হয়নি। যাইহোক বজ্রনাভ এইসব দেবতাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজার প্রচলন করলেন। ক্রমে দ্বাপরের পরে কলিকালে সেসব স্থান কালপ্রবাহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। পরে আবার হিন্দু রাজাদের আমলে সেইসব জায়গায় নতুন মন্দির নির্মাণ করে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১০১৮ খ্রীস্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদের মথুরা-লুঠের সময় আবার মথুরামণ্ডল ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের অত্যাচারে অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করল। বৃন্দাবন আবার ধ্বংসস্তূপ ও ঘোর জঙ্গলে পরিণত হলো। তবে তখনো কোন কোন ধর্মপ্রাণ সাধু-সন্ন্যাসী কদাচিৎ তীর্থদর্শন মানসে এখানে এসে সেই প্রাচীন তীর্থের অন্বেষণে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাতেন। সেইসব ভয়ানক অত্যাচারের দিনে প্রাচীন মন্দিরের পূজারীরা আদি বিগ্রহগুলিকে রক্ষা করার জন্য কোথাও কূপ, নদী বা পুষ্করিণীতে ফেলে দিয়ে বা মাটির মধ্যে পুঁতে রেখে বা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকে দস্যুদের হাতে মারা পড়েছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গিয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই প্রথম বৃন্দাবনে এসে লুপ্ত তীর্থ ও বিগ্রহগুলি উদ্ধার করবার জন্য কাতর হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। মূলে বৃন্দাবনে তিনি কোন বিগ্রহ খুঁজে পাননি। শুধু গোবর্ধনে শ্রীনাথ গোপাল, মানসী-গঙ্গার তীরে হরিদেব, খদিরবনে শেষশায়ী লক্ষ্মীনারায়ণ আর নন্দীশ্বরে যশোদা ও নন্দরাজার মধ্যে একটি ছোট্ট দিব্যকান্তি শিশুকৃষ্ণের মূর্তি দর্শন করেন। এই-কালেই তিনি রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড তীর্থ প্রকট করেন। এখান থেকে ফিরে গিয়ে তিনিই রূপ ও সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠান লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের জন্য।

"বৃন্দাবনে এসে সনাতন প্রথম মদনগোপালমূর্তি প্রকট করেন। তারপরে রূপ গোবিন্দকে উদ্ধার করেন গোমাটিলা থেকে। এই জায়গা তখন ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। রূপ কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছেন ভগবানের লীলাস্থান অন্বেষণে, এমন সময় এই যমুনার ধারে এক রাখাল ছেলে এসে তাঁকে বলে, 'এখানে একটি টিলায় একটা গরু রোজ এসে আপনা থেকে দুধ ঢেলে যায়, আপনি সেখানে গিয়ে একবার দেখে আসুন।' রূপ এসে দেখেন ঘটনাটি সত্য। তখন কৌতূহলবশে কিছু লোকজন সংগ্রহ করে স্থানটি খুঁড়তেই প্রকট হন শ্রীগোবিন্দের অনবদ্য-কান্তি ত্রিভঙ্গ-বিগ্রহ। চোখের জলে শ্রীবিগ্রহের অভিষেক করে তাঁকে সেইখানেই এক কুঁড়ে ঘরে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। সেদিন ছিল ১৫৩৫ খ্রীস্টাব্দের শুক্লা একাদশী। সম্ভবতঃ গজনীর মামুদের ধ্বংস-কাল ১০১৮ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর এইসব বিগ্রহ মাটির তলায় বা অন্যত্র গোপনে লুকানো ছিল। মহাপ্রভু এবং রূপ-সনাতনাদি সাধকদের চেষ্টায় তাঁরা আবার লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশিত হন।"

[ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দ ও দিব্যভারত

নৃত্যগোপাল রায়

রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্যের জনৈক মনীষীকে বলিয়াছিলেন: "If you want to know India, study Vivekananda. In him nothing is negative, but everything positive." রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভারতের মর্মবাণী কি, তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে। আবার ভারতের মর্মবাণী ভারতবাসীদের নিকট শুধু একটি নিছক অনধিগম্য আদর্শ মাত্র নয়—যুগে যুগে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া এই আদর্শ ভারতবাসীর জীবনের সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুগে যুগে এই দেশে অবতার ও মহামানবের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা ভারতের মর্মবাণীর এক-একটি আলোকশিখা প্রজ্বলিত করিয়াছেন। ভারতের জনগণ দূর হইতে মুগ্ধ নেত্রে সেই আলোকশিখার প্রভা নিরীক্ষণ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই—সেই আলোকে আপন আপন প্রাণের প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া আদর্শের সন্ধানে সাধনা করিয়াছে। ভারতীয় আদর্শের মূলকথা চৈতন্যের সন্ধান—অর্থাৎ চৈতন্যলাভের সাধনা।

ভারতীয় সাধনার অন্যতম প্রধান সুর ত্যাগের মন্ত্রে ধ্বনিত। 'অন্যতম' বলার হেতু এই যে, ত্যাগের সাধনা বলিতেই ভারতের সাধনার সবখানি বুঝায় না। তাহার সাধনার মন্দাকিনীস্রোতে এ-পাশ ও-পাশ হইতে কত জীবনের কত ধারা আসিয়া মিশিয়াছে। অবশ্য ত্যাগের সাধনা ভারতেরই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর আর কোথাও ত্যাগের পথ প্রাধান্যলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ভারতের পক্ষে ত্যাগ যেন তাহার মজ্জাগত ধর্ম। তাই ত্যাগ ভারতের মর্মবাণীর সপ্তসুরের প্রধান সুর। ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে সিদ্ধার্থের ত্যাগের কাহিনী প্রচলিত। কিন্তু কে খবর রাখে, ভারতের পথে, ঘাটে, গিরিকন্দরে কত লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণ স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর সাধনায় লিপ্ত? ভারতের সমাজে ও সংসারাশ্রমেও সত্যকার ত্যাগীর অভাব নাই। পরমত্যাগী শ্মশানবাসী ভোলানাথ শিব এদেশে ত্যাগের আদর্শ।

পুরাকালে এই দেশে শৈশবেই ব্রহ্মচর্য আশ্রমে যখন শিক্ষা ও সাধনা শুরু হইত, তখনই ত্যাগের রঙে তরুণ শিক্ষার্থীর মনের গহন ও অঙ্গের বসন রঞ্জিত হইত। ব্রহ্মচর্য আশ্রম শেষ হইলে আরম্ভ হইত কর্মময় গার্হস্থ্য জীবন। তাহার পর আবার সে বাহির হইয়া আসিত ত্যাগের পথে বানপ্রস্থের যাত্রায়। পরিশেষে তাহার যাত্রা সমাপ্ত হইত—চরম ত্যাগের মহাসমুদ্রে—সন্ন্যাসধর্মে। অর্থাৎ শুরুতেও ত্যাগ, আবার সমাপ্তিতেও ত্যাগ—কিন্তু মাঝখানে দেখি এক কর্মময় জীবন। এবং এই কর্মময় জীবনের লক্ষ্য যে ভোগবিলাস ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় শাস্ত্রে ও ইতিহাসে।

অর্থাৎ ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে ত্যাগও যেমন সত্য কর্মও তেমন সত্য। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বনে, জঙ্গলে ও পর্বতগুহায় বসিয়া সমাহিত চিত্তে সাধনা করিতেন, তাঁহাদেরও যেমন লক্ষ্য ছিল চৈতন্য বা ব্রহ্মলাভ, তেমনি যাঁহারা সংসারে থাকিয়া কর্ম করিতেন তাঁহাদেরও লক্ষ্য ছিল কর্মের পথে জড়ের মধ্যে চৈতন্যের সন্ধান। ভারতীয় দৃষ্টিতে সমস্ত জড়-প্রকৃতির মধ্যেও সেই চৈতন্যই বিরাজ করিতেছেন—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "ব্রহ্মেদং সর্বম্"। এই সত্যই সমগ্র বেদ উপনিষদের মূলতত্ত্ব। এই সত্য আবিষ্কারের ফলেই ভারতীয় দৃষ্টির সর্বাবয়ব-উদারতার (catholicity) উদ্ভব। বেদান্তের এই তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্মসমন্বয়ের বীজ। এদেশে এই সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল বলিয়াই এখানে মূর্তিপূজার অর্থ পৌত্তলিকতা নয়—অরূপ যে ভাবঘন ব্যঞ্জনায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার পূজা।

রামকৃষ্ণাবতারে আসিয়া দেখি, ভারতের সাধনা এক সম্পূর্ণ নূতন পথ পরিগ্রহ করিয়াছে—জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের পরিপূর্ণ সমন্বয়ের পথ। পূর্ব পূর্ব যুগে ভারতের মর্মবাণীর এক-একটি সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সপ্তসুর একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। পূর্ব পূর্ব যুগে দেখা গিয়াছিল, এক-একটি আলোক রশ্মি—এবার সপ্ত-রশ্মির আলোর রথে আবির্ভূত হইলেন পূর্ণ সূর্য। সমন্বয়ের পূর্ণতা আসিয়া পূর্বের সমগ্র অপূর্ণতা বিদূরিত করিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিসাধনায়, তাঁহার ব্যাকুল করা 'মা', 'মা' ডাকে মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হইয়া ধরা দিলেন। ভাবি, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তির অবতার। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, তাঁহার মধ্যে ভক্তির আবরণে জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি। সমগ্র বেদান্ত উপনিষদ্ যেন তাঁহার মধ্যে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—তাঁহার কথামৃতে ধ্বনিত হইতেছে উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের বাণী, কিন্তু এবার সংস্কৃতের পরিবর্তে বঙ্গভাষায়—তফাৎ এইটুকু। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—এই জ্ঞানের উন্মেষে তাঁহার সমগ্র চেতন ও অচেতন সত্তা ত্যাগের দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিল—ফলে তিনি কাঞ্চন কি মুদ্রা স্পর্শ করিতে পারিতেন না। বাসনাত্যাগী দেহ-মনে সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণের সংসারাশ্রমে অবস্থান সার্থক করিয়াছে উপনিষদের বাণী—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। প্রেমের সাধনাকে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপায়িত করিয়াছেন জীবসেবা মন্ত্রে। বলিলেনঃ "ছিঃ ছিঃ, জীবে দয়া কিরে! শিব-জ্ঞানে জীবসেবা।" বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। স্বীয় অনুভূতিলব্ধ এই ছোট্ট দুটি কথায় তিনি নরেনের চোখের সম্মুখে একটি নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া দিলেন। জীব ও শিবে অভেদজ্ঞান তাঁহার জীবনে হইয়াছিল উপলব্ধিগত সত্য। তাই লোকের এঁটো পাতা মাথায় বহিয়া গঙ্গায় বিসর্জন দিতেন—কুকুরের ভুক্তাবশিষ্টও ভগবানের প্রসাদজ্ঞানে খাইতে দ্বিধা করেন নাই। সর্বপ্রকার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে—তাই পদদলিত ঘাসের ব্যথা, ফুল তুলিতে পুষ্প-পাদপের বেদনা নিজদেহে অনুভব করিয়া কাতর হইতেন।

কেহ কেহ মনে করেন, বিবেকানন্দের কর্মযোগে রামকৃষ্ণের প্রভাব কোথায়—কর্মযোগে রামকৃষ্ণের অবদান কি? কিন্তু রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ আসলে অভিন্ন—যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি। ঠাকুর নরেনের মধ্যে দেখিতে পাইলেন ভারতের আত্মার সহস্রদল পদ্মের স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়ি। শুধু নিজের নির্বিকল্প সমাধি চাহে বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেনঃ "তোকে দিয়ে যে জগতে আমার অনেক কাজ রয়েছে।" তাই কর্ম-যোগী রামকৃষ্ণ নিজের শক্তি নরেনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া বলিলেনঃ "তোকে আজ আমার যাকিছু সর্বস্ব দিয়ে ফতুর হয়ে গেলাম, কিন্তু চাবিকাঠি রইল আমার কাছে।" তিনি আশ্বাস দিলেন, সময় হইলে খুলিয়া দিবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নির্দেশ দিলেন, এখন তাহাকে জগতের মঙ্গলের জন্য —প্রত্যেকটি জীবের ক্ষুধার অন্ন জোগাইবার জন্য ("খালি পেটে ধর্ম হয় না।")—তাহার ঐহিক ও পারমার্থিক মুক্তির জন্য সেবার পথে কর্ম করিতে হইবে। এইভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেনের মধ্যে নিজের শক্তিসঞ্চার করিলেন। সেইদিন হইতে নরেন কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ—সেইদিন হইতে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ অভিন্ন। ভারতের আকাশে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসূর্য—আর স্বামী বিবেকানন্দ সেই মহাসূর্যের আলোকময় বার্তা। তাই ভারতের সাধনার ক্ষেত্রে স্বামীজী আবির্ভূত হইলেন জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের সমন্বয়-মূর্তিতে। তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বৈদিক ঋষিদের সত্য-দৃষ্টি, শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম কর্ম, বুদ্ধের হৃদয় ও ত্যাগ, শঙ্করের জ্ঞান, মহাবীর হনুমানের ভক্তি এবং শ্রীচৈতন্যের প্রেম। অর্থাৎ ভারতের সকল সাধনার ধারা স্বামীজীর মধ্যে মিলিত হইয়াছে। এই মহা-মিলন বা মহাসমন্বয় পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের পরে negativism এদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। স্বামীজীর উদয়ে ভারতের আকাশ হইতে negativism-এর মেঘ কাটিয়াছে। মনে হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "সম্ভবামি যুগে যুগে"—এই আশ্বাসবাণীর সত্যতা প্রমাণ করিতে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন বিবেকানন্দাবতারে। বুদ্ধ হইতে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকলেই অনেকাংশে শ্রীকৃষ্ণের

বিপরীতধর্মী অর্থাৎ antithesis ; স্বামীজী এই বিপরীত ভাব বা বিরোধ বিদূরিত করিয়া একটা সমন্বয় বা synthesis আনিলেন। তাঁহার মধ্যে শুধু যে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে তাহা নয় —শ্রীকৃষ্ণের ভাবের সাথে শ্রীচৈতন্য, শংকর, বুদ্ধ এবং উপনিষদের ভাবেরও সমন্বয় হইয়াছে।

বিবেকানন্দাবতারে আমরা পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়া পাই। তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের পৌরুষ, বীর্য, নিষ্কাম কর্মের আদর্শ এবং বিশ্বরূপের জ্ঞানালোক। আদর্শ ভক্ত হনুমান রামনাম সম্বল করিয়া সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। ভক্তবীর বিবেকানন্দও দেখি গুরুপদে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সমুদ্রপারে পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাইতেছেন। একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্বামীজী ছিলেন জ্ঞানের আবরণে পরমভক্ত। তাই দেখি, ভবতারিণীর মন্দিরে যাইয়া মায়ের কাছে তিনি আর কিছু প্রার্থনা করিতে পারিলেন না—প্রার্থনা করিলেন শুদ্ধা ভক্তি। গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান তো দূরের কথা—কোথায় রহিল তাঁহার জ্ঞান-গরিমা—কোথায় রহিল তাঁহার অদ্বৈতবাদ—প্রার্থনা করিলেন শুদ্ধা ভক্তি। অন্তরের অন্তস্তলে যে পূর্ণভক্ত, তাহার ভক্তি ছাড়া মায়ের কাছে আর কি আবিঞ্চন থাকিতে পারে ? একবার নয়—দুইবার নয়—তিন তিনবারই ঐ একই প্রার্থনা করিলেন—"মা, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও"। ঠাকুর রামকৃষ্ণও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—নরেন বিষয় বাসনার পাশ কাটিয়েছে। কিন্তু কি সে সার্থক আয়ুধ, যাহা দ্বারা সে এই পাশ কাটিল ?—জ্ঞান নয়, বিচার নয়, বিবেক নয়,—তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত হৃদয়ের শুদ্ধা ভক্তি। আবার তাঁহার গুরুভক্তির কথাও আজ অনুপম দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘরে ঘরে প্রচলিত। এমন গুরুভক্ত শিষ্য পাইয়াছিলেন বলিয়া লোকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাগ্যবান মনে করে। ক্যান্সার রোগে ঠাকুরের দেহের যখন প্রায় অন্তিম অবস্থা, তখন একদিন পুঁজরক্ত মিশ্রিত তাঁহার প্রসাদ স্বামীজী মহা আনন্দে ভক্তি-সহকারে গ্রহণ করিলেন—উপস্থিত গুরুভাইরা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ইহা তাঁহার সীমাহীন গুরুভক্তির নিদর্শন।

স্বামীজীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ভগবান বুদ্ধের দরদী হৃদয়—যে-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল দেব ও ঋষির কোটি কোটি বংশধরগণের জন্য, যাহারা আজ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহারা—'অনাহারে মরিতেছে এবং যাহারা অর্ধাশনে কাটাইতেছে।' আবার দেখি বুদ্ধের ত্যাগ। এই ত্যাগ নিজের মুক্তির জন্য নয়—অপরের দুঃখ মোচনের জন্য। বলিতেছেন: "দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে এবং এই চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম-যশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি এমন-কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ ?" আবার বলিতেছেন: "তোমার চতুর্দিকে যে-দেবতাকে দেখিতেছ সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না ?" তাঁহার এই বিরাটের উপাসনার ব্রতে যেমন ধ্বনিত হইয়াছে জীবসেবামন্ত্র, তেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে বৈদান্তিক দিব্যদৃষ্টি।

জ্ঞানমার্গে আচার্য বিবেকানন্দ আচার্য শংকরেরই উত্তরসাধক। শংকরের মতো বেদান্তই তাঁহার জ্ঞানযোগের উৎস এবং বেদান্ত প্রচার তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত। কিন্তু আচার্য শংকরের উত্তরসাধক জ্ঞানযোগী বিবেকানন্দের ব্রত আরও ব্যাপক এবং দ্যুতি আরও বিস্তৃত। বিশ্বের জড়বাদের তমসা বিদূরিত করিয়া সর্বাবয়ব বেদান্তের ভিত্তিতে এক বিশ্বধর্মের (Religion of Universal Gospel) প্রবর্তন বিবেকানন্দাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বামীজী দেখিলেন, বেদান্তে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গঙ্গা-যমুনা মিলন হইয়াছে এবং একমাত্র বেদান্তই হইতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের সেতু।

স্বামীজীর মধ্যে শঙ্করের জ্ঞানের গভীরতা রহিয়াছে, কিন্তু শঙ্করের মায়াবাদের negativism নাই। শঙ্করের মতে জগৎ নিছক মায়া—অতএব মিথ্যা। স্বামীজী এই মায়াবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেখিলেন, মায়াবাদের এই ব্যাখ্যা মানুষকে কর্মবিমুখ করে এবং ব্যাহত করে তাহার আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও তাহার দেবত্বের উন্মেষ। তিনি বলিলেন, পরম (absolute) সত্য না হইলেও আপেক্ষিক (relative) সত্য—অর্থাৎ মায়ারূপে

জগৎ সত্য। তাই মায়াকে তিনি 'statement of fact' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বলিলেনঃ "Realise that in illusion it is real"—মায়ার নিজস্ব বাস্তব রূপ রহিয়াছে—চিরন্তন সত্যকে আড়াল করিয়া মায়া বিরাজ করিতেছে। আবরণ হিসাবে ইহা সত্য। এই আবরণ উন্মোচন করিলে দেখা যাইবে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছেন সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ। এইরূপে স্বামীজী মায়াবাদের negativism পরিত্যাগ করিয়া তাহার একটি positive রূপ দিলেন। মায়ার negative ব্যাখ্যায় একমাত্র ব্রহ্মই সত্য—সমগ্র সৃষ্টিই ভ্রম—"All this is but illusion"—তুমি, আমি, চন্দ্র-সূর্য সব মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এই পরম জ্ঞান লাভই একমাত্র লক্ষ্য। এই জ্ঞানের উন্মেষেই মায়ার ভ্রম কাটিয়া অদ্বৈত ব্রহ্ম লাভ হইবে। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যুক্তি ধার্মিক মনোবৃত্তি মনোবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়োপলব্ধ জগতের এই negative ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। স্বামীজী বেদান্তের ভিত্তিতেই মায়ার positive রূপ দিয়া প্রজ্ঞা ও যুক্তির, দর্শন ও বিজ্ঞানের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সংস্থাপিত করিলেন। মায়ার negative ব্যাখ্যায় মানুষের কর্মযোগ সাধনার অবকাশ নাই—তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশেরও প্রশ্ন আসে না। স্বামীজী মায়ার আপেক্ষিক নিজস্ব সত্যতা (fact) স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই মানবতার মহিমা প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন—বলিতে পারিয়াছিলেনঃ "We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on one boundless ocean which I am." বেদান্তের প্রতিধ্বনি তুলিয়া তিনি বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা উঠ, জাগো, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। এই মানবতার পরিমণ্ডলে আসিয়া বেদান্তের পূজারী বিবেকানন্দ আচার্য শঙ্করকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর ভারতের মস্তকে জ্ঞানের কিরীট পরাইয়াছিলেন—যেন হিমাদ্রির শিখরে শিখরে অরুণ কিরণ দীপ্ত তুষার কিরীট। স্বামীজী সেই দীপ্তোজ্জ্বল তুষার বিগলিত করিয়া প্রেমের খাতে প্রবাহিত করিলেন। তাঁহার বিশ্বধর্মের প্রবাহে জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম মিশিয়াছে এবং প্রেমের সাথে জ্ঞান। চৈতন্যদেবের মতো তিনি প্রেমের বার্তা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কর্মযোগ সাধনায়, তাঁহার বিশ্বধর্মের সঙ্গীতের প্রধান সুরটি প্রেমের সুর—"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।" তাই "জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" এই প্রেমের অন্বেষণে যেন তাঁহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে।

ভারতের কর্মযোগীকে তিনি এই প্রেমের দীক্ষামন্ত্র দিয়া গিয়াছেন। কর্মযোগীর ইহা শুধু আদর্শমাত্র নয়—তাহাকে বাস্তবজীবনে তিলে তিলে এই সাধনা করিতে হইবে। তাই স্বামীজীর প্রেমের দীক্ষায় নাই নেতি নেতি ভাব—negativism—নাই কোন পলায়নী মনোবৃত্তি। প্রেম ও সেবা তাঁহার কর্মযোগব্রত—একটি positive ধর্ম। বৈরাগ্যের নামে কর্মবিমুখতা নয়—নিষ্কাম কর্মের পথে বৈরাগ্যের সাধনা—ত্যাগের সাধনা। কর্মবিমুখতা বৈরাগ্য আনিবে না, আনিবে ক্লৈব্য—আনিবে তামসিকতা। তাই কর্মের উদ্দীপনায় তামসিকতা দূর করিতে হইবে। এইরূপে স্বামীজী যে-পথের নির্দেশ দিলেন, যেখানে ত্যাগ ও কর্ম, প্রেম ও সেবা হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বামীজী জ্ঞানভিত্তিক, ত্যাগভিত্তিক ও প্রেমভিত্তিক কর্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ভারতের কর্মযোগীকে এক মহান ব্রতে ব্রতী করিয়া গিয়াছেন। এই মহাব্রতের একটি ধারা বহুরূপে প্রকটিত বিরাটের সেবার মধ্যে প্রেমের সন্ধান—অপর ধারা জ্ঞান ও প্রেমের বলে বিশ্ববিজয় করিয়া জগতে চৈতন্যাশ্রয়ী বিশ্বধর্মের প্রবর্তন।

কবে কোন্ যুগে ভারতের গিরিকন্দরে, তপোবনে বেদান্তের শাশ্বতবাণী সচ্চিদানন্দ মন্ত্র উত্থিত হইয়াছিল। কবে কোন্ যুগে পুরুষোত্তম নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে কর্মমন্ত্র উদ্গীত হইয়াছিল—তাহার পর ভারতের বুকের উপর দিয়া ত্যাগের যুগ, জ্ঞানের যুগ, প্রেমের যুগ বহিয়া গেল—ভারতের আকাশে তাহা আদর্শের এক-একটি গগনচুম্বী জলদার্চিরেখা (high watermark)। কিন্তু

বেদান্তের সর্বাবয়বত্ব বর্জিত বলিয়া এবং কর্মযোগ-ভিত্তিক নয় বলিয়া এই সব বিভিন্ন যুগের ভাবধারায় ক্রমে জমিয়াছিল এক negativism-এর কুহেলিকা।

শ্রীকৃষ্ণের কাল হইতে আবার কত যুগ পরে আসিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। স্বামীজীর কণ্ঠে আবার ঝঙ্কৃত হইল বেদান্তের বাণী—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা", উদ্‌গীত নবযুগের কর্মযোগের গীতা। তাহার শঙ্খনিনাদে বিদূরিত হইল negativism-এর জড়িমা। সর্বপ্রথম সমন্বয় হইল জ্ঞান, ত্যাগ ও প্রেমের সাথে কর্মের—মিলিত হইল ভারতের সকল যুগের সকল সাধনার ধারা। তাই ভারতবর্ষকে জানিতে হইলে স্বামীজীকে বুঝিতে হয় এবং স্বামীজীকে বুঝিতে পারিলেই ভারতবর্ষকে জানা যায়। * □

* মাসিক বসুমতী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ৩৫ বর্ষ, মাঘ, ১৩৬৩, পৃঃ ৬৭৪-৬৭৭

সংগ্রহ : চন্দনা সরকার

পরমপদকমলে

মহাভাব
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভক্তি পাকলে ভাব—তারপর মহাভাব, তারপর প্রেম, তারপর বস্তুলাভ (ঈশ্বরলাভ)। ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীকে বোঝাচ্ছেন। এক অবতার আর এক অবতারের অবস্থা বিশ্লেষণ করছেন। ঠাকুর বলছেন: "গৌরাঙ্গের মহাভাব, প্রেম। এই প্রেম হলে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না—তাদের ভাব পর্যন্ত। আর গৌরাঙ্গের তিনটি অবস্থা হতো। কেমন?"

ঠাকুর প্রশ্ন করছেন নবদ্বীপ গোস্বামীকে। মিলিয়ে নিতে চাইছেন।

নবদ্বীপ গোস্বামী বলছেন: "আজ্ঞা হাঁ। অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা আর বাহ্যদশা।"

ঠাকুর বলছেন: "অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন। অর্ধবাহ্যদশায় কেবল নৃত্য করতে পারতেন। বাহ্যদশায় নামসংকীর্তন করতেন।"

ঠাকুর বলছেন: "লীলা ধরে ধরে নিত্যে যেতে হয়, যেমন সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠা। নিত্য-দর্শনের পর নিত্য থেকে লীলায় এসে থাকতে হয়। ভক্তি-ভক্ত নিয়ে। এইটি পাকা মত। তাঁর নানা রূপ, নানা লীলা।" ঈশ্বরের লীলা কি কি? ঈশ্বর-লীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। ঠাকুর বলছেন: "তিনি মানুষ হয়ে অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন প্রেমভক্তি শিখাবার জন্যে। দেখ না চৈতন্যদেব। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেম-ভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্তলীলা—কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার গাভীর বাঁট।"

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান শ্রীচৈতন্যের অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে বোঝাতে চাইছেন, অন্যরকম হওয়ার উপায় নেই, যে-লীলার যা-প্রকাশ। শুধু তোমরা মিলিয়ে নাও। বুঝতে পার ভাল। না পার অন্ধকারে ঘুরপাক খেয়ে মর।

ঝামাপুকুরের নকুড়বাবাজী এসেছেন।" ঠাকুর নিজের ঘরের পশ্চিমবারান্দায় বসে আছেন। বসে

আছেন রাখাল, মাস্টার প্রমুখ ভক্তেরা। একটু আগে ঠাকুর ছিলেন ভবতারিণী মন্দিরে পূজার আসনে। সেই সময় শ্রীমও ছিলেন সঙ্গে। ঠাকুর মায়ের পাদপদ্মে ফুল দিয়েছেন। নিজের মাথায় ফুল রেখে ধ্যানস্থ হয়েছেন। বহুক্ষণের ধ্যান। ভাবে বিভোর। শ্রীম দেখেছেন, তিনি নৃত্য করছেন, আর মুখে মায়ের নাম—'মা বিপদনাশিনী গো, বিপদনাশিনী!' সেই ভাব নিয়েই এসে বসেছেন পশ্চিমের বারান্দায়। ঠাকুর ভাবাবেশে পর পর কয়েকটি গান গাইলেন। আহারান্তে সামান্য বিশ্রাম। এলেন মনোহরসাঁই গোস্বামী। গোস্বামীজী কীর্তন গাইছেন—পূর্বরাগ।

"ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়
কিবা মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্বকাননে চায়।"

শেষ লাইনটি শোনা মাত্রই ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা। গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

কীর্তনিয়া তখন গাইছেন—

"শীতল তছু অঙ্গ
তনু পরশে, অমনি অবশ অঙ্গ।"

মহাভাবে ঠাকুরের শরীর কাঁপছে। কেদারের দিকে তাকিয়ে কীর্তনের সুরে ঠাকুর বলছেন:

"প্রাণনাথ, হৃদয়বল্লভ তোরা কৃষ্ণ এনে দে;
সুহৃদের তো কাজ বটে;
হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল;
তোদের চিরদাসী হব।"

গোস্বামী কীর্তনিয়া ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা দেখে মুগ্ধ। তিনি হাতজোড় করে বলছেন: "আমার বিষয়বুদ্ধি ঘুচিয়ে দিন।"

ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন: "সাধু বাসা পাকড় লিয়া। তুমি এত বড় রসিক; তোমার ভিতর থেকে এত মিষ্টি রস বেরোচ্ছে।"

"সাধু বাসা পাকড় লিয়া"। বড় অপূর্ব কথা। তিনি কৃপা করে কাছে টানেন, তাঁর কৃপায় লীলা-দর্শন। মহাভাব সন্দর্শনে নিজের ভাব যদি সামান্যও উথলে ওঠে তাহলেই তো মহাপ্রাপ্তি। সেই তো আমার 'বাসা পাকড়ানো'। চোখের সামনে দেখছি অবতারলীলা:

"হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুনৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হাহা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥"

এই 'হাহা' ভাবটি যদি সঞ্চারিত হয় অন্তরে হাহাকারের মতো তাহলেই তো "বাসা পাকড় লিয়া"। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের যা হতো, মহাপ্রভুরও তাই হতো:

"স্তম্ভ কম্পপ্রস্বেদ বৈবর্ণ্য অশ্রুস্বরভেদ
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায় উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িঞা মূর্ছিত॥
মূর্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার উঠি করে হুহুংকার
কহে এই আইলা মহাশয়।"

একটু আগেই ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে করতে গাড়িতে আসছিলেন। গন্তব্য পানিহাটি। সেখানে মহোৎসব। সেখানে গাড়ি পৌঁছালো। ঠাকুর গাড়ি থেকে নামলেন। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। মহাসংকীর্তন। খোল-করতালের শব্দ। হঠাৎ ঠাকুর তীরবেগে ছুটছেন। একা। ভক্তের দল হতবাক্। এ কি ভাবান্তর! কোথায় ঠাকুর! নিমেষে অদৃশ্য।

ঐ তো তিনি! নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তনের দলে দুহাত তুলে নৃত্য করছেন। মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন। পাছে পড়ে যান, গোঁসাইজী তাই ধরে আছেন।

"মত্ত গজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন
গজযুদ্ধে বনের দলন
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ তনুমনে অবসাদ
ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥"

"সাধু বাসা পাকড় লিয়া।" ☐

যৎকিঞ্চিৎ

"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল"

বিভা দাস

আমি, আমিত্ব অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ অহংকার ও দম্ভ। সর্বত্রই দেখি এই আমিত্বের সংঘাত। কি ব্যক্তিজীবনে, কি সমাজজীবনে আমিত্বের কর্তৃত্বাভিমানের ফলেই বাদ-বিসম্বাদ, অশান্তি। মানুষের শৈশবকালে বুদ্ধি উদ্গমের সঙ্গেই আমিত্ব-অভিমান জাগ্রত হয়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে করতে আমিত্ব ব্যক্তিজীবনে বা সমাজজীবনে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। সমাজে দুর্বলের ওপর সবলের যে অত্যাচার তার মূলে ঐ আমিত্ব। ব্যক্তিজীবনে যে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের ওপর টান, তার মূলেও ঐ 'আমি'। ঐ 'আমি' থেকেই বিষয়ের প্রতি আসক্তি, নাম-যশের পিছনে ছোটাছুটি।

টাকার অহংকার, জ্ঞানের অহংকার, মানের অহংকার, পদের অহংকার প্রভৃতি বহুবিধ অহংকার মানুষের শুদ্ধসত্ত্ব মনের ওপর একটি মোহের আচ্ছাদন ফেলে রাখে। এই মোহের আচ্ছাদন থেকে মানুষ মুক্ত না হলে দুঃখ থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আজ যা 'আমার' বলে ভাবি, কাল তা আমার সামনেই শেষ হয়ে যায়, তাকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা আমার থাকে না।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এক শুদ্ধসত্ত্ব মন আছে, যাতে ঈশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু সেই মন মায়া দ্বারা আবৃত—অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন। তার ফলে মানুষের বোধ থাকে না যে, সে অমৃতের সন্তান। মানুষ যখন সাধনার দ্বারা তার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করে, তখন তার 'আত্মজ্ঞান' লাভ হয়। সে তখন জানতে পারে সে কে, এই জগৎ-সংসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি। ঐ 'আমি' বা 'অহং' বোধ লুপ্ত হলে জীব ও জগতের সঙ্গে মানুষের একাত্ম-বোধের উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধি হলে তবে পরস্পরের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ, হানাহানি, অশান্তি প্রভৃতির ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল।" তিনি বলছেন, আমিত্বের অভিমান থেকেই সংসারে যত অ-সুখ, যত বিপত্তি। বলছেন "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

'আমি' দোষের। তবে 'আমি'র স্তর-ভেদ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'কাঁচা আমি' বর্জনীয়, কিন্তু 'পাকা আমি'-কে তিনি দোষের বলেননি। বরং বলেছেন, 'পাকা আমি' সাধনার সহায়ক।

'কাঁচা আমি' সংসারে বিষয়-সুখের জন্য, কাম-কাঞ্চনের জন্য লালায়িত হয়, সংসারের পাঁকে নিমজ্জিত হয়েও ভাবে পরম সুখে আছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "বদ্ধ জীবের—সংসারী জীবের—কোন-মতে হুঁশ আর হয় না। এত দুঃখ এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।" বদ্ধজীবের অবস্থা কেমন? না, উটের 'কাঁটা ঘাস' খাওয়ার মতো। যত খায় তত তার মুখ থেকে রক্ত পড়ে, তবুও সে কাঁটা ঘাস খাওয়া ছাড়তে পারে না।

'আমি ঈশ্বরের দাস', 'আমি ঈশ্বরের ভক্ত', 'আমি তাঁর সন্তান','আমি তাঁর আশ্রিত'—এই 'আমি' হলো 'পাকা আমি', শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়। ওটি থাকলে ভয় নেই। সংসারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষের এই 'পাকা আমি' বা ঈশ্বর ভক্তি কি করে আসবে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "কলিযুগে অন্নগত প্রাণ—দেহাত্মবুদ্ধি, অহং-বুদ্ধি যায় না। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তার নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই।"

সহজ পথের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন ঠিকই; কিন্তু কতখানি সহজ সেই পথ? শুধু ব্যাকুলতা হলেই হলো। সন্তানের জন্য মায়ের যেমন টান, সাধ্বী নারীর স্বামীর প্রতি যেমন টান, আর বিষয়াসক্তের বিষয়ের প্রতি যেমন টান, তেমন টান যদি ভগবানের প্রতি আসে, তাকে বলে 'ব্যাকুলতা'। সহজ উপায় হলো—'মোড় ফেরানো'। ভগবানের দিকে মনের মুখ ঘোরানো।

ব্যাকুলতা আন্তরিক হতে হবে। প্রাণের আকুল আকুতিতে চোখের জলে মনের কালিমা ধুয়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা মনে জাগরিত হয়। ঈশ্বরের নাম-গুন-গান, ধ্যান, প্রার্থনা ইত্যাদি করতে করতে 'অহং'-এর নাশ হয়। আমিত্বের লয় হয়ে সকল ক্ষুদ্র অহংকারের নাশ হয়ে জীবের সঙ্গে আত্মার মিলন ঘটে, মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়। ☐

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকণা

মুকুন্দবিহারী সাহা

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা জেলার সিঙ্গাইর গ্রামে আমার জন্ম। অবিভক্ত বাংলার এই ক্ষুদ্র গ্রামটি ছিল ঢাকা শহর থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় আসি এবং স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হই। ঝামাপুকুরে এক বাসায় থাকতাম। একদিন আমার এক বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান গৃহীভক্ত শ্রীম বা কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথা বলে। সেই বন্ধুর সঙ্গে একদিন শ্রীম-কে প্রণাম করতে যাই। রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ তথা রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের সঙ্গে সেই আমার পরিচয়ের শুরু। মাঝে মাঝেই শ্রীম-র কাছে যেতাম। ক্রমে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়। এভাবে কিছুদিন চলে। ইতিমধ্যে আমি বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। শ্রীম একদিন বললেন বেলুড় মঠে যেতে। বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, স্বামী শিবানন্দ মহারাজ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজ, স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ, স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের পার্ষদদের দর্শন লাভ হয়। ক্রমে তাঁদের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্যও হয়।

একদিন শ্রীম-র কাছেই শুনি, বাগবাজারে শ্রীশ্রীমা-ঠাকরুণ আছেন। যে-বন্ধু আমাকে শ্রীম-র সংবাদ দিয়েছিলেন, সেই বন্ধুকে নিয়েই একদিন গেলাম বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে। এটি ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। নিচে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ। তাঁর অনুমতি নিয়ে দোতলায় গেলাম মাকে প্রণাম করতে। অপরূপ মাতৃমূর্তি! মা পুরুষদের সঙ্গে কথা বলতেন না, কিন্তু আমরা যখন প্রণাম করলাম, মা আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি করি, কলকাতায় কোথায় থাকি, দেশ কোথায় ইত্যাদি। মায়ের কথা ছিল অতি সুমিষ্ট। ঐ দুই-চারটি কথায় আমার প্রাণ-মন ভরে গেল। বললাম: "মা, আমি দীক্ষা নেব।" স্মিত হেসে মা বললেন: "বেশ তো বাবা, কাল সকালে এস।" বললাম: "কি নিয়ে আসব?" মা বললেন: "কিছু না, শুধু দুটো ফুল।" পরদিন সকালে গেলাম মায়ের বাড়ী, সঙ্গে শুধু দুটি ফুল। দীক্ষা হয়ে গেল। মায়ের এক সেবক বললেন: "একটু মিষ্টি আননি?" কথাটা শুনে খুব লজ্জা পেলাম। পরদিন কলেজের ছুটি হলে মাকে প্রণাম করতে ছুটলাম। গতদিনের কথা মনে ছিল। দোকান থেকে একটুখানি মিষ্টি কিনে নিয়ে গেছি। যে-মহারাজ গতদিন মিষ্টির কথা বলেছিলেন, তিনি বললেন: "এখন কোত্থেকে?" বললাম: "কলেজ থেকে সোজা।" মিষ্টির প্যাকেটটি মহারাজকে দেখিয়ে বললাম: "মায়ের জন্য এনেছি।" মহারাজ বললেন: "বোকা, কলেজের কাপড় না ছেড়েই মিষ্টি নিয়ে এসেছ? ওকি মা খাবেন?" মনে ভারি কষ্ট হলো। মাকে শুধু প্রণাম করেই চলে আসব ভেবে দোতলায় গেছি। মাকে প্রণাম করে উঠতেই মা বললেন: "কই গো ছেলে, আমার জন্য যে মিষ্টি এনেছ, দেবে না?" অন্তর্যামিনী মা—কিছুই তাঁকে বলতে হয় না! কিন্তু কলেজের কাপড়ে-আসা আমার আনা মিষ্টি তো মা খাবেন না। আমি তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। মা বললেন: "কই গো? দাও।" মা হাত পাতলেন। সঙ্কোচের সঙ্গে মিষ্টির ছোট প্যাকেটটি বের করলাম। চোখে একটু জলও এসেছে। বললাম: "আমার কাপড় যে ছাড়া নয় মা। কলেজ থেকে সোজা আপনার কাছে এসেছি।" মা বললেন: "তাতে কি হয়েছে!" মিষ্টির প্যাকেটটি মায়ের হাতে দিতে মা একটুখানি তা থেকে মুখে দিয়ে পুরো প্যাকেটটাই আমার হাতে দিয়ে বললেন: "খাও।" যেন অমৃত খেলাম।

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ "মা, কি করব আমি ?" মা বলেছিলেন ঃ "কি আবার করবে। সৎপথে থাকবে। বিয়ে করো না। মাস্টারি করবে, ছেলেদের মানুষ করবে।" মাকে বললাম ঃ "কিন্তু, বিয়ে না করে যদি কুপথে যাই ?" মা বললেন ঃ "এদিকে এস।" কাছে যেতে মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ "কোন ভয় নেই, বাবা।"

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে এম. এ. পাশ করি। পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই রামপুরহাটে নতুন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু করি। মা বলেছিলেন ঃ "মাস্টারি করবে।" কর্মজীবনের সূচনা হলো মাস্টারি দিয়েই। সেই মাস্টারি আর কোনদিন ঘুচল না। মায়ের নির্দেশ ঃ "ছেলেদের মানুষ করবে"। তা আজও পালন করার চেষ্টা করে চলেছি। কতখানি পেরেছি, তা মা-ই জানেন। [অকৃতদার মুকুন্দবিহারী সাহা পরবর্তী কালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে রামপুরহাট থেকে সাত মাইল পশ্চিমে সাঁওতাল-অধ্যুষিত তুম্বুনি গ্রামে একক প্রয়াসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে 'শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ' নামে ছাত্রদের জন্য একটি বড় আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কালো পাহাড়ের কোলে অবস্থিত তুম্বুনির নতুন নাম হয় 'শ্যাম-পাহাড়ী'।]

তখন রামপুরহাটে দুই-এক বছর হলো এসেছি। ধুবলহাটির রাজ-পরিবারের এক কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের একটি প্রস্তাব আসে। মা আমাকে বলেছিলেন ঃ "বিয়ে করো না।" এই প্রস্তাবটিকে আমি সরাসরি অগ্রাহ্য করতে পারতাম, কিন্তু তা না করে সোজা বাগবাজারে মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মাকে সব কথা বললাম। মা বললেন ঃ "কেন বাবা, তুমি তো বেশ আছ। তোমাকে দিয়ে অনেক ছেলের কল্যাণ হচ্ছে, এর পরে আরও অনেকের হবে। অনেক বড় কাজ করবে তুমি।" "কিন্তু মা, আমার যে মাঝে মাঝে সংসার করতে খুব ইচ্ছে করে।" মা বললেন ঃ "তোমার তো অনেক বড় সংসার হবে।" আমি বললাম ঃ "কিন্তু মা, আমি কি এভাবে সারাজীবন থাকতে পারব ? যদি কখনো মনে দুর্বলতা আসে ?" মা দৃঢ়ভাবে বললেন ঃ "ওর জন্য তুমি ভেবো না। কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। যখনই দুর্বলতা আসবে ঠাকুরকে স্মরণ করবে, আমাকে ভাববে।"

আজ জীবনের প্রান্তসীমায় এসে দেখছি,* মায়ের আশীর্বাদে জীবনটা তাঁদের আশ্রয় করে কাটাতে পেরেছি। আমি বিশ্বাস করি, মায়ের আশীর্বাদে পৃথিবীতে কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ☐

* ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ১৪ মার্চ মুকুন্দবিহারী সাহা পরলোকগমন করেছেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

মাতৃদুগ্ধ-পায়ী শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বেশি

একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাতৃদুগ্ধ-পায়ী শিশুরা বোতলে দুধ খাওয়া শিশুদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয়। অষ্টমবর্ষ বয়স্ক শিশুদের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা (আই. কিউ বা I. Q.) করে এইরকম তথ্য পাওয়া গেছে। মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের কেম্ব্রিজস্থিত ডান নিউট্রিশন সেন্টারে এই পরীক্ষা করেছেন ডাঃ অ্যালান লুকাস ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। ডাক্তারদের অভিমত হলো, এই পার্থক্যের কারণ নিহিত মাতৃদুগ্ধের মধ্যে এবং তা মা-বাবার বুদ্ধিমত্তার (যার প্রতিফলন হয়ে থাকে শিশুর বুদ্ধিমত্তায়) মধ্যে নয়। গবেষকরা এই ব্যাপারে অন্যান্য সম্ভাব্য কারণও পরীক্ষা করে দেখেছেন, যেমন যেসব মা শিশুকে স্তন্যপান করান, তাঁরা সন্তান সম্বন্ধে বেশি যত্নশীল এবং সেজন্য যোগ্যতর জননী। ☐

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা রোগ-জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব কিনা

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, রোগের মূল কারণ হলো ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়া, জার্ম-প্যারাসাইট ইত্যাদির মানব-শরীরে অনুপ্রবেশ। এই কারণেই তাঁরা এগুলিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টাকে ক্রমাগত জোরদার করে চলেছেন। শিশু জন্মাবার পর থেকেই তাদের এগুলির হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য নানা ব্যবস্থাও তাঁরা দিনদিন বাড়িয়ে চলেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে বছরের পর বছর ধরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে তাঁরা অনুসন্ধান করে চলেছেন, পৃথিবীব্যাপী নানা চরিত্র ও আয়তনের কীটগুলিকে কোন্ কোন্ ঔষধের সাহায্যে ধ্বংস করা যায়, তা দেখতে। নতুন নতুন কীটনাশক ঔষধ আবিষ্কার করতে পারলে চিকিৎসাজগতে অর্থের সঙ্গে সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও লাভ হয় প্রচুর। এইভাবে একসময় পেনিসিলিনের প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। লুই পাস্তুর নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদির দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, এক-এক সময়ে এক-এক রকমের ক্ষুদ্র কীট বা জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন প্রকারের রোগ আনয়ন করে, কিন্তু সজীব দেহের মধ্যে অস্বাভাবিক ক্ষেত্র পেলেই এরা সেখানে প্রবেশ করে ও সেখানে অবস্থান করে। দেহের ভিতরে থেকে দেহাংশ আহার করে এরা বংশবৃদ্ধি করে ও ক্রমশঃ সুস্থ দেহীকে অসুস্থ করে তুলতে থাকে। কিন্তু মানবদেহের অভ্যন্তরে যদি কোন অস্বাভাবিকতা না পাওয়া যায় তাহলে প্রবিষ্ট বাহ্যিক জীবাণু তার পরিবেশের অভাবে ধ্বংস হয়। আবার দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত অস্বাভাবিক অবস্থার যদি শীঘ্র প্রতিকার না করা যায় তাহলে তাতে জীবাণু তৈরি হবার প্রবণতা প্রকাশ পায়। এই বক্তব্য থেকে বোঝা গেল যে, রোগজীবাণু তখনই মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে যখন দেহের প্রতিরোধ-ক্ষমতার অবনতি হয়। হ্যানিম্যান প্রতিরোধ-ক্ষমতার দুর্বলতাকে রোগের প্রধান কারণ বা মায়াজমেটিক অবস্থা বলেছেন। সুস্থ মানুষের জীবনীশক্তি দেহে প্রতিরোধ গড়ে রাখে, তাই জীবাণুগুলি দেহে প্রবেশ করলেও তাদের প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাবে নির্বীর্য ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় স্বল্পকাল থাকে এবং দেহের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করতে পারে না; শীঘ্রই জীবাণুগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন নর্দমার পোকাকে পরিষ্কার জলে এনে রাখলে, তারা নোংরা পরিবেশের অভাবে ধ্বংস হয়।

লুই পাস্তুর বুঝেছিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের চারপাশের বায়ু রোগজীবাণুতে ভরপুর। শ্বাস-গ্রহণের মাধ্যমে এরা নাসাপথে শরীরে প্রবেশ করে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, মানুষ সে-অনুপাতে অসুস্থ হয় না। কারণ, মানুষের প্রকৃতিপ্রদত্ত অদৃশ্য প্রতিরোধশক্তিই মানুষকে সুস্থ রাখে। হ্যানিম্যান এই শক্তিকে প্রাণরক্ষাকারী জীবনীশক্তি বা ভাইটাল ফোর্স বলেছেন। ভাইটাল ফোর্স দুর্বল হলেই দেহে স্থূলরোগ ও জীবাণুবাহিত রোগ প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বাড়ির নর্দমার কোন অংশ ফেটে গিয়ে গর্ত হয়ে তাতে নোংরা জল দীর্ঘদিন জমলে একপ্রকার কীট জন্মায়। যদি নর্দমাতে কোন গর্ত না থাকে বা জল জমবার সুযোগ না থাকে তাহলে কোন কীট সেখানে এলেও তা ধুয়ে চলে যায়। নর্দমার ফাটল বা গর্ত হলো মানবদেহের মায়াজমেটিক অবস্থার মতো, যা কীট জন্মাবার, তাদের বংশবৃদ্ধি ও দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি করার পরিবেশ তৈরি করে। এদেরকে ধ্বংস করার জন্য কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করে মেরে ফেললেও কিছুদিন পরে আবার নতুন করে কীট জন্মায়। কারণ, মায়াজমেটিক অবস্থাকে দূর না করে কীটকে বারবার ধ্বংস করলেও কীট পুনরায় সৃষ্টি হবে। কিন্তু কীটনাশক ঔষধের পরিবর্তে ফাটলটি মেরামত

করলে আর কীট জন্মাবার অবকাশ থাকে না। অক্ষত নর্দমা হলো মায়াজমেটিক দোষমুক্ত জীবনীশক্তি যা কীটকে ধুয়ে দেয়, পরিবেশকে করে নির্মল।

চিকিৎসাবিজ্ঞানী হ্যানিম্যান বললেন, আমাদের শরীরে যেসকল রোগ হয় তাদের কারণ কোন পদার্থের অন্তর্গত বস্তু নয়। যেহেতু জীবাণু হলো সজীব পদার্থ, তাই তা কোন রোগের কারণ হতে পারে না। চোখে বালিকণা পড়লে তা বার করে দেবার জন্য জীবনীশক্তি অস্থির হয়, যতক্ষণ না বার করে দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ সে অস্থির করে রাখে দেহীকে। ঠিক সেভাবেই বাহ্যিক কোন জীবাণু বা পদার্থ দেহে প্রবেশ করলে ভাইটাল ফোর্স বা জীবাণুশক্তিও তাকে সহ্য করতে পারে না, তাকে বিনষ্ট করে বা নির্গত না করে সে ক্ষান্ত হয় না। সামান্যমাত্র বিশুদ্ধ জল ইনজেকশন দ্বারা শিরার মধ্যে প্রবেশ করালে দেহীর অবস্থা মারাত্মক হয় এবং অধিক পরিমাণে প্রবেশ করালে মৃত্যুও হতে পারে। জীবাণু জল বা বাতাস থেকে অধিক স্থূল। জীবনীশক্তির ধর্ম হলো জীবাণুকে বিতাড়িত করে শরীরকে সুস্থ রাখা। তাই অবিরত নানা প্রকারের ও নানা আকারের জীবাণু দেহে প্রবেশ করা সত্ত্বেও মানুষ বেঁচে থাকে তার জীবনীশক্তির জন্য।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পর আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা জীবাণুকে দেখতে পেয়ে রোগের একমাত্র কারণ হিসাবে জীবাণুকে চিহ্নিত করেছেন। অথচ রোগ কি অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগে ছিল না? ছিল, তবে তখন রোগের কারণ আন্দাজ-ভিত্তিক ছিল। হ্যানিম্যানই একমাত্র বিজ্ঞানী, যিনি আধুনিক ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্যবহারিক জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা মায়াজম-তত্ত্বের দর্শন করেছিলেন। তাই তিনি রোগের কারণ বললেন—সোরিক, সিফিলিটিক বা সাইকোটিক অবস্থা। পৃথিবীর দুটি মানুষ এক রকম দেখতে হয় না, এক রকম দেখতে হলে তাদের স্বভাব এক রকম হয় না; স্বভাব এক হলেও তাদের রুচি, পছন্দ-অপছন্দ এক হয় না। যমজ সন্তানদেরও সবকিছুই হুবহু একই রকম হয় না। তাই সকলের রোগও একই প্রকারের হতে পারে না। যেমন দুই যমজ ভাইয়ের জ্বর হলে দেখা যায়, প্রথম জন শীতে জড়সড় হয়ে যায় ও গায়ে প্রচুর চাদর চাপা দেয়। দ্বিতীয় জনের শীতভাব না থাকায় চাপা দেওয়া সে অপছন্দ করে। প্রথম জন প্রচুর জল পান করে, দ্বিতীয় জন একেবারেই জল চায় না। একজন ঠাণ্ডা জল মাথায় দিতে চায়, অন্যজন মাথায় জল দিলে কাঁদে। এর দ্বারা সহজেই বোঝা গেল, দুই ভাই যমজ হলেও তাদের জীবনরক্ষাকারী শক্তি বিভিন্ন বা দুইজনের মায়াজমেটিক অবস্থা দু-রকম। মায়াজম হলো এক রোগশক্তি, যা হলো সু-চিকিৎসিত না হওয়া বা চাপা পড়া রোগের ফলে উদ্ভূত এমন এক অবস্থা থেকে যা রোগী সারাজীবন ধরে ভোগ করে। সেই রোগের প্রভাব তার সন্তানদের মধ্যেও প্রবাহিত হয় বংশপরম্পরায়। পোকা-লাগা আমবীজ দিয়ে যে-আমগাছ হয় তার ফলেও পোকা হয়, কারণ পোকা-লাগার সূক্ষ্ম প্রভাব থেকে বীজটি মুক্ত ছিল না। সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সুপ্ত রোগবীজ বাহ্যিক কোন উত্তেজক কারণ ছাড়া বংশগত রোগের চরিত্র প্রকাশ পায় না। দেশলাইয়ের বাক্সে দেশলাই কাঠি থাকে। সেই কাঠিতে আগুন সুপ্ত থাকে, কাঠিটি বারুদে ঘষা দিলেই আগুন জ্বলে ওঠে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রোগজীবাণুকে ধ্বংস করতে সক্ষম, কিন্তু টেস্ট টিউবে নয়। জীবিত মানুষের দেহে মায়াজমেটিক ঔষধ প্রয়োগ করে হোমিওপ্যাথিক মানবশরীরে অবস্থিত রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে। সুস্থ দেহে রোগশক্তি বা জীবাণু প্রবেশ করতে পারে না, যদিও প্রবেশ করে তা শরীরের কোন ক্ষতি করতে পারে না। এই কারণেই রোগজীবাণু সবসময় আমাদের শরীরে প্রবেশ করলেও আমরা রোগাক্রান্ত হই না। এর প্রধান কারণ শরীরের রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করে। কিন্তু যদি শরীরের রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা হ্রাস পায়, তবেই রোগী জীবাণুকে ধ্বংস করতে অক্ষম হয়ে রোগাক্রান্ত হয়। এটাও মনে রাখা দরকার যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগজীবাণু-গুলির তুলনায় মানুষের প্রতিরোধশক্তি অনেক বেশি। এজন্যই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখতে পাই, বাড়িতে একজন অসুস্থ হলে বাড়ির অন্যান্য সকলে রোগাক্রান্ত হয় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে-ঔষধ সরাসরি জীবাণু মারতে পারে না সে-ঔষধ দিয়ে কিভাবে রোগ প্রতিরোধ সম্ভব? শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধে স্থূল পদার্থ থাকে না, কিন্তু ঔষধের অন্তর্নিহিত শক্তি (Dynamis) থাকে। এটা দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা না গেলেও প্রয়োগ দ্বারা এর অহরহ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে বিদ্যুৎ বর্তমান থাকলেও তা দেখা যায় না, কিন্তু স্পর্শ করলে অঘটন ঘটে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যেহেতু স্থূল মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় না তাই সে আধুনিক ঔষধের মতো যান্ত্রিক পরিবর্তন আনতে পারে না. কিন্তু জীবনীশক্তিকে প্রভাবিত করে রোগীকে অসুস্থতা থেকে আরোগ্য করে।

আধুনিক চিকিৎসকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থূল মাত্রায় প্রচুর পরিমাণে ঔষধ দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করেন। তাঁরা নিশ্চয় বুঝেছেন যে, রোগী যে-রোগের চিকিৎসার জন্য আসেন, সে-রোগ সাময়িকভাবে সারলেও অন্য চরিত্রের নতুন রোগে তিনি আক্রান্ত হন। যেমন অ্যালোপ্যাথিক মলম দিয়ে চর্মরোগ নিরাময় হলো, কিন্তু দেখা গেল যে, হাঁপানি রোগ বা আলসার বা সাইনাস রোগে নতুন করে ঐ ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন। আমবাত চিকিৎসার পর রক্তক্ষরণ, টিউমার অপারেশানের পর ক্যান্সার, তরল সর্দি শুকিয়ে নিউমোনিয়া ইত্যাদি হবার প্রবণতা লক্ষণীয়। হ্যানিম্যান অ্যালোপ্যাথিকের উচ্চ ডিগ্রী এম. ডি. উপাধিপ্রাপ্তির পর চিকিৎসার এইসকল বিভ্রাটকে বারবার উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তো হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার করলেন। প্রতিটি দেহকোষের মধ্যে জীবনীশক্তি বর্তমান। দেহকোষকে রোগমুক্ত করতে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। এক, সরাসরি দেহকোষকে ঔষধ দিয়ে আক্রমণ করা। এইভাবে সরাসরি আক্রমণে রোগজীবাণু-আক্রান্ত দেহকোষগুলো সাময়িকভাবে জীবাণুমুক্ত হয় বটে, কিন্তু যে-দেহকোষগুলি সুস্থ, সেগুলোও প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত হয়ে স্বশক্তি হারিয়ে ফেলে দুর্বল হয়। ভবিষ্যতে এই দুর্বল দেহকোষগুলি নতুন কলেবরে নতুন রোগের কারণ হয়ে উঠতে থাকে। যেমন ঔষধের দ্বারা উচ্চ রক্তচাপ (ব্লাডপ্রেসার) কমাতে কমাতে এমন একটা অবস্থা উপস্থিত হয় যখন রোগীর কিডনির রোগ দেখা দেয়। দুই, পরোক্ষভাবে এমন ব্যবস্থা করা, যাতে দেহকোষগুলি জীবনীশক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তার ফলে রোগজীবাণু দেহের প্রতিরোধশক্তির কাছে পরাভূত হয়। হ্যানিম্যান তাই প্রথম পন্থাকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় পন্থাটিকে চিকিৎসাজগতে প্রয়োগ করলেন, যার দ্বারা সরাসরি দেহকোষ বা জীবনীশক্তিকে পরাভূত করার প্রয়োজন হয় না। জীবনীশক্তিকে ও দেহকোষকে সজীব করে এবং জীবনীশক্তি নিজে ক্ষমতাশালী হয়ে দুর্বল অবস্থা কাটিয়ে রোগীকে সুস্থ করে। আমে পোকা ধরলে ফলের মধ্যেকার পোকা বার করে দিয়ে বা ফলের গায়ে ঔষধের প্রলেপ বা স্প্রে করে হয়তো সেই আমকে পোকা-মুক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু গাছের সকল আমের পোকা বা পোকা না লাগার ব্যবস্থা করা যায় না। সেটা করতে হলে গাছের জীবনীশক্তিকে বৃদ্ধি করার জন্য গাছের গোড়াতে ঔষধের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে গাছের ফলের চিকিৎসা না করে পরোক্ষভাবে গাছকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে, যাতে গাছের জীবনীশক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

ঔষধের অন্তর্নিহিত শক্তি (dynamis) দ্বারা মনুষ্য দেহের অভ্যন্তরস্থ শক্তিকে (dynamis) উত্তেজিত করে জীবাণুরূপী শক্তি (dynamis)-কে নিষ্ক্রিয় এবং জয় করে পরোক্ষভাবে জীবাণু ধ্বংস করা হলো রোগমুক্তির এবং নীরোগ থাকার সব থেকে কার্যকর উপায়।

ওপরের আলোচনায় নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছে যে, সরাসরি জীবাণুকে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টায় নানা বিপদের সম্ভাবনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবাণুরা ঔষধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে যে, অ্যালোপ্যাথি ঔষধ প্রথম প্রথম প্রয়োগে যে-উপকার হয় কিছুদিন পরে সেই ঔষধে আর উপকার হয় না, উপরন্তু এলার্জি হয়। অপরদিকে হোমিওপ্যাথিক নীতি অনুসারে পরোক্ষভাবে জীবাণু ধ্বংস করলে রোগমুক্তির পর ঔষধজনিত পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি থাকে না। কারণ, হোমিও-পদ্ধতিতে জীবনীশক্তিকেই উজ্জীবিত করা হয়, যা ভবিষ্যতে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ রুখতে সক্ষম হয়। □

গ্রন্থ-পরিচয়

বিবেকানন্দের সমাজদর্শন

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

Vivekananda—The Prophet of Human Emancipation : Santwana Dasgupta. W2A (R) 16/4, Phase IV (B), Golf Green, Calcutta-700 045. Price : Rs. 150.

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের প্রধান উৎস আধ্যাত্মিকতা ; এখানেই এর তাৎপর্য, এখানেই এর অনন্যতা। আর এখানেই এর আবেদনের বিশ্বজনীনতা ও সর্বকালিনতা। কার্ল মার্ক্সের সাম্যবাদের অনেক প্রশংসনীয় দিক আছে ; কিন্তু তার সীমাবদ্ধতাও অনেক। স্বামী বিবেকানন্দ মানবজীবনের সকল স্তরেই ধর্মকে ভিত্তি করতে চেয়েছিলেন ; এই ধর্মের অর্থ অবশ্যই ইংরেজীতে যাকে 'রিলিজিয়ন' বলা হয়, তা নয়। এ-ধর্ম হচ্ছে মানুষের কর্তব্যনিষ্ঠা, যা তার শ্রেয়ঃ (কঠোপনিষদ্-এ একে আপাতরমণীয় শ্রেয়ঃ থেকে পৃথক করা হয়েছে), যা তাকে ধারণ করে বা ধরে রাখে, পদস্খলন থেকে বাঁচায়। এই ধর্মের কথাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন : "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ" (৩।৩৫)। মার্ক্স 'রিলিজিয়ন'কে 'জনগণের আফিম' আখ্যা দিয়ে উপহাস করেছিলেন ; কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল 'ধর্ম'কে উপেক্ষা করা। তিনি মোটামুটিভাবে পার্থিব সুখকে জীবনের সর্বস্ব মনে করেছিলেন ; শাড়ি-গাড়ি-বাড়ির বাইরে যে-জগৎ আছে সে-জগৎকে তিনি যথেষ্ট মর্যাদা দেননি। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, মানুষ শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ এ-ভুল একেবারেই করেননি। তাঁর সমাজদর্শনে যে-মানুষের কথা ভাবা হয়েছে, সে শুধু মরণশীল বা বিচারশীল নয়, সে-মানুষ 'অমৃতের সন্তান'ও বটে। তার আধ্যাত্মিক জীবনকে তিনি অবহেলা করেননি। কারণ, তিনি তাকে দেখেছেন খণ্ডিত ভগ্নাংশ-রূপে নয়, অখণ্ড পূর্ণ-রূপে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় লেখিকার পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর রয়েছে ; তাঁর মৌলিকতাও অনস্বীকার্য। এখানে তাঁর গবেষণার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

তাঁর গ্রন্থে লেখিকা বিবেকানন্দকে 'মানবমুক্তির অগ্রদূত'-রূপে বর্ণনা করেছেন। এই পরিচয় অবশ্য স্বামীজীর নতুন নয় ; যা নতুন, তা হচ্ছে তাঁর সমাজদর্শনকে সামগ্রিকভাবে দেখা। এই দেখার যে-চেষ্টা লেখিকা করেছেন তাতে তিনি সফল হয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি স্বামীজীর সমাজদর্শনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখিকা দেখিয়েছেন যে, এ-দর্শন বেদান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্তের বৈপ্লবিক তাৎপর্য তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে বিবেকানন্দ শিখেছিলেন যে, সবার ওপরে মানুষ সত্য, যে-মানুষ ঈশ্বরের সচল রূপ। এ-কারণেই শিবজ্ঞানে জীবসেবার অপরিহার্যতা। এ-চেতনা যাঁর একবার হয়েছে তাঁর সমাজদর্শন কখনোই গতানুগতিক ধরনের হতে পারে না—বৈপ্লবিক হতে বাধ্য। উইল ডুরান্ট যে-কথা রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে লিখেছেন, সে-কথা স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য : "He tolerated sympathetically the polytheism of the people, and accepted humbly the monism of the philosophers, but in his own living faith God was a spirit incarnated in all men and the only true worship of God was the loving service of mankind."

নরত্ব ও দেবত্বের সমীকরণকে যথার্থই বৈপ্লবিক ধারণা বলা যায়। লেখিকা বিবেকানন্দের এই উক্তিটি এ-প্রসঙ্গে উধৃত করেছেন : "Never forget the glory of human nature. We are the greatest God that ever was or will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I am."

মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে পূর্ণভা

বিকশিত করা প্রয়োজন, এ-কথা স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ-কাজে মানুষের প্রধান বাধা ভয় ও দুর্বলতা, যা সর্বাগ্রে পরিহার করা প্রয়োজন। অভয়মন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত হতে হবে, যে-মন্ত্র উপনিষদের বিস্ফারক মর্মবাণী। ভয়ের ক্লৈব্য থেকে অভয়ের বীর্যে আমাদের উত্তরণ প্রয়োজন—যে-অনুশাসন ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের। আর ভয়ের প্রস্থানের পরে শক্তির আগমন কি বিলম্বিত হতে পারে? নিজেকে দীন-নিঃসহায়, অশক্ত-অসমর্থ মনে করার চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই; নিজেকে সবল, শক্তিমান এবং বজ্রমুষ্টিধর মনে করার চেয়ে বড় পুণ্যও আর কিছু নেই। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেনঃ "এটাই বড় সত্য, শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ, শাশ্বত, অমর জীবন, দুর্বলতা সর্বক্ষণের কষ্ট, দুঃখ, দুর্বলতাই মৃত্যু।" মানুষকে বিবেকানন্দ অনন্ত শক্তির আধার মনে করতেন। কারণ, তাঁর কাছে মানুষে ও ব্রহ্মে কোন পার্থক্য ছিল না। যে-বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের মূল কথা এই, তাঁর সমাজদর্শনে যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে সেটা স্বাভাবিক। লেখিকা দেখিয়েছেন যে, পাশ্চাত্য জগতের অনেক বিশিষ্ট বিদ্বান ও সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি অন্যরকম হওয়ায় অর্থাৎ তাতে বস্তুবাদ বা ভোগবাদের প্রভাব থাকায় তাঁরা জাগতিক উন্নতির জন্য যেসব বিধান দিয়েছেন তা স্থায়ী ও সুন্দর ভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি।

লেখিকার অধ্যয়নের পরিধি বিস্ময়কর। অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের উক্তি উদ্ধৃত এবং আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, সাম্প্রতিক-কালে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সাযুজ্য স্বীকৃত হলেও স্বামী বিবেকানন্দের কালে এ-দুইয়ের মধ্যে বিরোধের ওপর সাধারণতঃ জোর দেওয়া হতো। কিন্তু বিবেকানন্দ নিজে বেদান্তকে 'বৈজ্ঞানিক ধর্ম'-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক ধ্যানধারণার পূর্বাভাস দিতে পেরেছেন। আজকাল অবশ্য বেদান্তকে আধুনিক বিজ্ঞানের 'ব্যাকগ্রাউন্ড ফিলজফি' বা 'দার্শনিক ভিত্তিভূমি'-রূপে গণ্য করা নতুন কিছু নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু 'মানব' ও 'ধর্মের' ধারণাতেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেননি, বিপ্লব সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা বৈপ্লবিক। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্রেণী-সংগ্রামকে তিনি অস্বীকার করেননি; বরং তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতেও এই সংগ্রাম ঘটেছে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে অন্যান্য দেশেও ঘটেছে। তাঁর মতে, এ-সংগ্রাম অবধারিত এবং অনিবার্য। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, ধর্ম সমাজে যে-পরিবর্তন আনে তা কিছু কম বৈপ্লবিক নয়; তাই তিনি 'বৌদ্ধ বিপ্লব' ও 'জৈন বিপ্লবের' কথা বলেছেন। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাবে যে-সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তন এসেছে তা কিছু কম বৈপ্লবিক নয়। কারণ, তা পুরোহিতদের কাছ থেকে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে জনগণের হাতে তুলে দিয়েছে। বিবেকানন্দ মনে করতেন, সত্যিকারের সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবের পক্ষে রাজনৈতিক পন্থা প্রকৃষ্ট উপায় নয় এবং সে-কারণে বর্জনীয়।

লেখিকা আরও দেখিয়েছেন যে, বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকাতে তিনি 'ইতিহাস' এবং 'যুক্তি'-কে 'বিজ্ঞানের' সম-মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর নিজস্ব অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব তাই স্বকীয় দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। এইসব সম্পর্কিত তাঁর চিন্তা তাঁর যে-সকল ভাষণে ও রচনায় ব্যক্ত হয়েছে লেখিকা সেগুলির সুনিপুণ বিশ্লেষণ ও সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। ('সঠিক' কিনা সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে; 'নানা মুনির নানা মত'; তবে এতে গ্রন্থের উৎকর্ষের কোন হানি হবে না।) সুন্দরতর পৃথিবীর জন্য এবং মানবজাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে-কর্মসূচী আমাদের দিয়েছেন তার অপরিসীম মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা এবং সমাজতান্ত্রিক ও অন্যান্য দেশে তার প্রভাব সম্পর্কে লেখিকা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরে বিবেকানন্দের ভূমিকাও যথোচিতভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের উপসংহারে লেখিকা যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, গতিশীল কর্মচাঞ্চল্যই বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের মর্মবাণী।

পরিশেষে মুখবন্ধ-লেখক স্বামী লোকেশ্বরানন্দের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলিঃ "শুধু সমাজতত্ত্ব-বিদ্‌দের নয়, সব চিন্তাশীল ব্যক্তির বিশেষ মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য এই গ্রন্থ।" ☐

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন

গত ১২ জানুয়ারি **বেলুড় মঠে** সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ।

দিল্লী আশ্রম গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস পালন করেছে। ঐদিন এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৩০তম জন্মদিবস উপলক্ষে কলকাতার ভবানীপুরস্থ **গদাধর আশ্রম** ব্যান্ড, ট্যাবলো ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে। হরিশ পার্ক থেকে শোভাযাত্রা আরম্ভ হয় এবং পথ পরিক্রমান্তে সেখানে সমবেত হয়ে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সমবেত সভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণানন্দ ও স্থানীয় পৌরপিতা অনিল মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, ক্লাব, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ভক্তবৃন্দ সহ প্রায় ১২৫০ জন শোভাযাত্রায় যোগদান করে। অনুষ্ঠানশেষে সকলকে টিফিন-প্যাকেট দেওয়া হয়।

গত ১১ এবং ১২ জানুয়ারি, ১৯৯২ **তমলুক রামকৃষ্ণ মঠে** একাদশ বার্ষিক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৮৫ জন যুবপ্রতিনিধি এতে অংশ গ্রহণ করে। ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রভাতে শহর পরিক্রমা করে। অঙ্কন, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে গোষ্ঠী আলোচনা-চক্র (group discussion) অনুষ্ঠিত হয়।

১২ জানুয়ারি সান্ধ্য অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের আসর পরিচালনা করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানে গীতি-নাট্য পরিবেশন করেন তমলুক বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের সদস্যবৃন্দ। মঠাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং দ্বিতীয় দিনে সমাপ্তি ভাষণ দেন। পরে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

কালাডি আশ্রম (কেরালা) গত ১১—১৩ জানুয়ারি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করেছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণাঞ্চলের নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার এ্যাডমিরাল কে. পেস্টনজী।

ভুবনেশ্বর আশ্রম গত ১২ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত উড়িষ্যার নানা স্থানে যুবসমাবেশ, সভা প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস ও জাতীয় যুবসপ্তাহ উদ্‌যাপন করেছে। উড়িষ্যার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী শরৎকুমার কর ভুবনেশ্বর মঠে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

গত ১২ জানুয়ারি **বিবেকনগর আশ্রমের** (**ত্রিপুরা**) যুবদিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার যুবকল্যাণ মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, যুবদিবসে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক যে-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে বিবেকনগর আশ্রম-বিদ্যালয় শৃংখলা ও কৌশল প্রদর্শনে প্রথম হয়েছে।

নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতেও **জাতীয় যুবদিবস** পালিত হয়েছে :

আলং (অরুণাচলপ্রদেশ), বারাসত, অদ্বৈতাশ্রম (কলকাতা), চেরাপুঞ্জী, গড়বেতা, খেতড়ি, মালদা, মনসাদ্বীপ, পুরী মিশন, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম, রাজকোট এবং বিশাখাপত্তনম।

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলঘরিয়াস্থ **রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের** প্ল্যাটিনাম জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৪—২৬ ডিসেম্বর। ২৪ ডিসেম্বর সকালে উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন সাধারণ সম্পাদক স্বামী

গহনানন্দজী। তিনি একটি স্মরণিকা গ্রন্থ এবং বিদ্যার্থী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নির্বেদানন্দজীর জীবনী ও রচনা সম্বলিত 'স্বামী নির্বেদানন্দ ঃ জীবনী ও রচনাবলী' নামে একটি বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুরে গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯১ থেকে ২৭ ডিসেম্বর '৯১ পর্যন্ত চারদিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। ২৪ ডিসেম্বর ধুনি উৎসবটি 'ত্যাগব্রত সংকল্পদিবস'রূপে পালিত হয়।

গত ২৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৩০তম আবির্ভাবতিথি বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম এবং ধর্মসভাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। ধর্মসভায় স্বামী অচ্যুতানন্দ সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। কয়েকজন তরুণ বক্তা স্বামীজীর আদর্শের ওপর আলোচনা করেন। এইদিন প্রায় নয় হাজার ভক্ত বসে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পরিদর্শন

গত ২৯ ডিসেম্বর '৯১ ভারতের রাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কটরামন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সস্ত্রীক **বেলুড় মঠ** পরিদর্শন করেন।

চিকিৎসা-শিবির

কোয়েম্বাটোর আশ্রম গত ১৪ ডিসেম্বর '৯১ এক হৃদ্‌রোগ চিকিৎসার-শিবির পরিচালনা করে। এই শিবিরে ২৬৫ জন রোগীর ই. সি. জি. করা হয় এবং পরবর্তী চিকিৎসা করার জন্য মোট ৬০৫ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চক্ষু অস্ত্রোপচার-শিবির

গড়বেতা (মেদিনীপুর) আশ্রম ৩ জানুয়ারি চক্ষু অস্ত্রোপচার-শিবির পরিচালনা করে। এই শিবিরে মোট ২৭ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

আঁটপুর আশ্রম গত ৩ থেকে ৯ ডিসেম্বর '৯১ এক চক্ষু অস্ত্রোপচার-শিবির পরিচালনা করে। এই শিবিরে মোট ৩২ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

বহির্ভারত

গত ১৯ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৩০তম আবির্ভাব-তিথি উৎসব উপলক্ষে **কলম্বো আশ্রম** (শ্রীলংকা) আয়োজিত এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গহনানন্দজী। শ্রীলঙ্কার তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ডব্লিউ. জে. এম. লোকবন্দর এবং কলম্বো হাইকোর্টের বিচারপতি সি. ভি. বিঘ্নেশ্বরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন।

গত ১৫ জানুয়ারি **ঢাকা আশ্রমে** একটি এক্স-রে ইউনিট বসানো হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সভায় ভাষণ দেন বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়াদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাদিক হোসেন, বাংলাদেশস্থ ভারতের হাইকমিশনার কে. শ্রীনিবাসন এবং বাংলাদেশে ভ্যাটিক্যানের রাষ্ট্রদূত।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন ঃ ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রবিবার ধ্যান বিষয়ে, প্রথম রবিবার শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিষয়ে এবং চতুর্থ রবিবার জন্মান্তর বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। গত ২৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। ঐদিন পূজা, ভক্তিগীতি পরিবেশন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো) ঃ গত ফেব্রুয়ারি মাসের রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। ৫ ফেব্রুয়ারি পূজা, পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান, ভক্তিগীতি ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি পালিত হয় এবং ঐদিন তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (ক্যালিফোর্নিয়া) ঃ ফেব্রুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী প্রপন্নানন্দ। বুধবারগুলিতে উপনিষদ্ ও বিবেকচূড়ামণির ক্লাস এবং প্রতি শনিবার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা) : গত ফেব্রুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ। এছাড়া ১ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সম্পর্কে, ১৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ সম্পর্কে এবং ২৯ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেহত্যাগ

গত ২৩ নভেম্বর **স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ (রামন)** দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। যদিও তিনি কিছু বার্ধক্যজনিত উপসর্গে ভুগছিলেন, তবু মোটামুটি তাঁর স্বাস্থ্য ভালই ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি প্রচারকার্যে ভ্রমণ করেছেন।

স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট মাদ্রাজ মঠে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ঐবছরই ত্রিচুর আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। ত্রিচুর আশ্রম ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে শ্রীলঙ্কা, মাদ্রাজ মঠ, রাজমুন্দ্রী এবং উতকামণ্ড কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশাখাপত্তনম আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা থেকে তিনি ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই আশ্রমের প্রধান ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দেই তিনি মরিশাস কেন্দ্রের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে তিনি মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের কর্মী, ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ এবং দুই বছর প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচারের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যান এবং সাফল্যের সঙ্গে প্রচার-কার্য করে সেখানে তিনি কয়েকটি ছোট প্রাইভেট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জাম্বিয়া ও জিম্বাবোয়েতে-কিছু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তগোষ্ঠীও তৈরি করেন। শাস্ত্রজ্ঞ, সুবক্তা এবং যোগাসনে দক্ষ এই সন্ন্যাসী সারাজীবন অক্লান্তভাবে সঙ্ঘের সেবা করেছেন। তাঁর দেহত্যাগ সঙ্ঘের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

স্বামী আস্থানন্দ (রমাপতি) গত ২৩ নভেম্বর ভোর ৫টায় হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাঁর স্বাস্থ্য ভালই ছিল। দেহত্যাগের আগের দিনও তিনি 'মায়ের বাড়ী' (উদ্বোধন) এবং বেলুড় মঠ দর্শন করেছেন।

স্বামী আস্থানন্দ ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে সরিষা আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি রাঁচি স্যানাটোরিয়াম, বেলুড় মঠ, সেবাপ্রতিষ্ঠান, কামারপুকুর, রাম-হরিপুর, পাটনা, তমলুক, বারাণসী সেবাশ্রমের কর্মী ছিলেন। অল্প সময়ের জন্য তিনি পুরী মিশনের প্রধানও ছিলেন। ভদ্র, অমায়িক, প্রেমিক এই সন্ন্যাসী সকলের প্রিয় ছিলেন। □

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১১ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে উপস্থিত সকলকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

২৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। বিকাল ৪টায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন তপন সিন্‌হা ও সম্প্রদায়।

১৯ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী, ৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, ৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী ও ১৮ ফেব্রুয়ারি স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সত্যব্রতানন্দ, স্বামী দেবস্বরূপানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ও স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। □

বিবিধ সংবাদ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব
(২৭.১২.৯১)

শিখরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘে (উত্তর ২৪ পরগনা) অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের ওপর বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ, কৃষ্ণকান্ত দত্ত ও ডাঃ সুধীরকুমার রাহা।

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে (কলকাতা-৩২) অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী। বক্তব্য রাখেন গোপা দস্তরায়, ডঃ ভবানী গাঙ্গুলী।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ, গোয়াবাগান-এ অনুষ্ঠিত এক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী কমলেশানন্দ। বক্তব্য রাখেন বন্দিতা ভট্টাচার্য ও মদন নন্দী। প্রায় ২০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পূর্ণিয়া (বিহার)ঃ প্রায় ২৬০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ, পানচেৎ, ধানবাদ (বিহার)।

খড়্গপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি (মেদিনীপুর)ঃ দুপুরে প্রায় সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সারদা সংঘ, বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, (হালপুর, নদীয়া)ঃ ২০০ ভক্তকে বসিয়ে ও ৩০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

মাকড়দহ শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ে (হাওড়া) অনুষ্ঠিত এক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন স্বামী সাংখ্যানন্দ ও নিমাইসাধন বসু। প্রায় ২৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সংঘ, সম্বলপুর (উড়িষ্যা)ঃ দুপুরে ৪০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠান

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন গত ৭ ও ৮ ডিসেম্বর **ভাঙ্গড়** রামকৃষ্ণ ভক্তসংঘে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে প্রথমদিন অনুষ্ঠিত হয় যুবসম্মেলন। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৬৪০ জন যুব-প্রতিনিধি এতে যোগদান করে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে প্রণবেশ চক্রবর্তী ও কৃষ্ণকান্ত দত্ত। বক্তব্য রাখেন স্বামী কমলেশানন্দ। আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরে কিছু সংখ্যক যুবপ্রতিনিধিও অংশগ্রহণ করে। প্রবাল কুমারের 'কথা-বলা-পুতুল' বেশ আকর্ষণীয় হয়। ৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সদস্য আশ্রমগুলির প্রতিনিধিদের সম্মেলন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভাবপ্রচার পরিষদের সভাপতি স্বামী অমলানন্দ। স্বাগত ভাষণ দেন কুমারেশ দাশশর্মা, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শিবময়ানন্দ ও স্বামী অজরানন্দ। ঐদিন বারাসত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পুরুষানন্দও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাঙ্গড় ভক্তসংঘের সভাপতি জয়দেব সাধুখাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, জাজপুর (উড়িষ্যা)-এর ব্যবস্থাপনায় গত ২৮—৩০ ডিসেম্বর '৯১ কন্টাবনিয়া, শংখচিলা ও চোরদা গ্রামে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী দিব্যানন্দ। ধর্মসভা উপলক্ষে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্যান্ডেলের বিল-এর উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর '৯১ দুলদুলী মঠবাড়ী দেবনারায়ণ হাইস্কুলে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে এক শিক্ষক-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় সম্মেলন উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বদেবানন্দ। তারপর স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শের ওপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গোষ্ঠী-আলোচনা পরিচালনা করেন যথাক্রমে অধ্যাপক শ্যামলকুমার সরদার, ডঃ সুরেশ কুমার কুইতি ও শ্রীরামগোপাল বিশ্বাস। সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ। ৩১টি প্রতিষ্ঠানের ৯৫ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে

অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে বহু নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন

গত ১৯ নভেম্বর **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, ধর্মনগর (উত্তর ত্রিপুরা)**-এর নবনির্মিত ঠাকুর-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। এদিন বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। আগের দিন ১৮ তারিখ বাস্তুপূজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং পরের দিন ২০ তারিখ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের তহবিল থেকে ত্রিপুরার বড়মুড়া ও আঠারোমুড়া উপজাতি-কল্যাণ তহবিলে এবং উত্তরপ্রদেশে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের জন্য ৫০১ টাকা করে দান করা হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র থেকে সন্ন্যাসিগণ উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

জলেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মসমন্বয়ী আশ্রম, (বালেশ্বর, উড়িষ্যা)-এর নবনির্মিত মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২০ ও ২১ নভেম্বর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মন্দিরের উদ্বোধন করেন স্বামী স্মরণানন্দ। উভয় দিনই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমদিন সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন দাস এবং বক্তব্য রাখেন স্বামী আপ্তকামানন্দ, স্বামী শশধরানন্দ ও প্রতাপচন্দ্র ষড়ঙ্গী। দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন রাধাকমল দাস ও প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দ। ওড়িয়া ভাষায় কথামৃত পাঠ করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। এদিন প্রায় ৫০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন সুরপীঠ-এর অরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও সহ-শিল্পিবৃন্দ। তাছাড়া প্রভাতফেরী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

বহির্ভারত

গত ১৩ ডিসেম্বর '৯১ **বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গল (মৌলভী বাজার) বিবেকানন্দ যুব সমিতির** উদ্যোগে শ্রীমঙ্গল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির নির্বাহী পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক নৃপেন্দ্রলাল দাশ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে হবিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক অধ্যাপক নিখিল-রঞ্জন ভট্টাচার্য ও শ্রীমঙ্গল পৌরসভার চেয়ারম্যান এম. এ. রহিম। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য জ্যোৎস্না গোস্বামী, অজিতকুমার পাল প্রমুখ। তাঁদের ভাষণে সেবাধর্মের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রায় ১০০০ দুঃস্থ ব্যক্তিকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়েছে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **বিভূতিভূষণ ধাড়া** গত ৪ অক্টোবর বেলা ১-৩০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। তিনি নানা সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজ গ্রাম আসলহরিতে তিনি তাঁর বাবার নামে আশুতোষ স্মৃতি পল্লী পাঠাগার স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি হুগলী জেলার বালি-দেওয়ানগঞ্জে কৃষ্ণভামিনী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়ে তাঁর ইচ্ছায় শ্রীশ্রীমা সারদামণির নামাঙ্কিত হয়। উল্লেখ্য, ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর নিরভিমানতা, অমায়িক ব্যবহার, সঙ্ঘের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

রামকৃষ্ণ 'বানপ্রস্থ আশ্রমের (২৪।১ আর. এন. টেগোর রোড, কলকাতা-৩৫) অধ্যক্ষ **রমণীরঞ্জন সিদ্ধান্ত** ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানী রোগে গত ১ ডিসেম্বর '৯১ সকাল ১০টা ১০মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানী রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি বেলুড় মঠের নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। □

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে।... প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির মৃত্যুও ঘটে।... যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

এন্টিফ্লজেস্টিন
কার্বাঙ্কল, শোথ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া
বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া
কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।

যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয় চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

সর্বদার তরে জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি?··· আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিত হয়ে থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণে রেখো যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

Doing good to others out of compassion is good, but the seva (service) of all beings in the spirit of the Lord is better.

Swami Vivekananda

There is no higher virtue than charity. The lowest man is he whose hand draws in receiving; and he is the highest man whose hand goes out in giving.

Swami Vivekananda

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।... তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভালকাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

Fill the mind with the highest thoughts, hear them day after day, think them month after month. The ideal of man is to see God in everything. But if you cannot see Him in everything see Him in one thing, in that thing which you like best, and then see Him in another. So on you can go.

Swami Vivekananda

Be not a traitor to your thoughts. Be sincere; act according to your thoughts, and you shall surely succeed.

Swami Vivekananda

Each soul is potentially divine.

The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal.

Do this either by work or worship or psychic control, or philosophy—by one or more, or all of these—and be free.

This is the whole of religion. Doctrines or dogmas, or rituals or books, or temples or forms are but secondary details.

Swami Vivekananda

We shall spend no time arguing as to theories and ideals, methods and plans. We shall live for the good of others; we shall merge ourselves in struggle. The battle, the soldier and the enemy will become one.

Sister Nivedita

অমৃত কথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতি মাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

৯৪তম বর্ষ বৈশাখ ১৩৯৯

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চুয়াল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঞ্চাশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা
বর্তমান সংখ্যার মূল্য ছয় টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

আবির্ভাব-তিথি ও পূজাদির সূচী

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে)

বাঙলা ১৩৯৯ সন, ইংরেজী ১৯৯২-৯৩ খ্রীস্টাব্দ

১।	শ্রীশংকরাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	২৪ বৈশাখ	বৃহস্পতিবার	৭ মে	১৯৯২
২।	শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	২ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	১৬ মে	,,
৩।	গুরুপূর্ণিমা	আষাঢ় পূর্ণিমা	৩০ আষাঢ়	মঙ্গলবার	১৪ জুলাই	,,
৪।	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	১২ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	২৮ জুলাই	,,
৫।	স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	২৮ শ্রাবণ	বৃহস্পতিবার	১৩ আগস্ট	,,
৬।	শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	৫ ভাদ্র	শুক্রবার	২১ আগস্ট	,,
৭।	স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১১ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	২৭ আগস্ট	,,
৮।	স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	৫ আশ্বিন	সোমবার	২১ সেপ্টেম্বর	,,
৯।	স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	১০ আশ্বিন	শনিবার	২৬ সেপ্টেম্বর	,,
১০।	স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	২১ কার্তিক	শনিবার	৭ নভেম্বর	,,
১১।	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	২৩ কার্তিক	সোমবার	৯ নভেম্বর	,,
১২।	স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	১৭ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতিবার	৩ ডিসেম্বর	,,
১৩।	**শ্রীশ্রীমা**	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১ পৌষ	বুধবার	১৬ ডিসেম্বর	,,
১৪।	স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	৫ পৌষ	রবিবার	২০ ডিসেম্বর	,,
১৫।	শ্রীযীশুখ্রীস্ট	—	৯ পৌষ	বৃহস্পতিবার	২৪ ডিসেম্বর	,,
১৬।	স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	১৫ পৌষ	বুধবার	৩০ ডিসেম্বর	,,
১৭।	স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	২৩ পৌষ	বৃহস্পতিবার	৭ জানুয়ারি	১৯৯৩
১৮।	**শ্রীশ্রীস্বামীজী**	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	৩০ পৌষ	বৃহস্পতিবার	১৪ জানুয়ারি	,,
১৯।	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	১০ মাঘ	রবিবার	২৪ জানুয়ারি	;;
২০।	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	১৩ মাঘ	বুধবার	২৭ জানুয়ারি	,,
২১।	স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	২৩ মাঘ	শনিবার	৬ ফেব্রুয়ারি	,,
২২।	**শ্রীশ্রীঠাকুর**	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	১১ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	২৩ ফেব্রুয়ারি	,,
	(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		১৬ ফাল্গুন	রবিবার	২৮ ফেব্রুয়ারি	,,
২৩।	শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	২৪ ফাল্গুন	সোমবার	৮ মার্চ	,,
২৪।	স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণাচতুর্থী	২৭ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	১১ মার্চ	,,
২৫।	শ্রীরামচন্দ্র	রামনবমী	১৮ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	১ এপ্রিল	,,

১।	শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	১৭ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৩১ মে	১৯৯২
২।	স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	১ আষাঢ়	সোমবার	১৫ জুন	,,
৩।	শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	১৭ আশ্বিন	শনিবার	৩ অক্টোবর	,,
৪।	শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	৮ কার্তিক	রবিবার	২৫ অক্টোবর	,,
৫।	শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	১৪ মাঘ	বৃহস্পতিবার	২৮ জানুয়ারি	১৯৯৩
৬।	শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	৭ ফাল্গুন	শুক্রবার	১৯ ফেব্রুয়ারি	,,

উদ্বোধন

বৈশাখ ১৩৯৯ এপ্রিল ১৯৯২ ৯৪তম বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

দিব্য বাণী

বারোটি বালক মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে, সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ়সংকল্প। সকলেই হাসিত। হাসি হইতে ক্রমে গুরুত্বের বিষয়ে পরিণতি ঘটিল। রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হইল। ঠাট্টা বিদ্রূপ যতই প্রবল হইয়া উঠিল, আমরাও তত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। তারপর আসিল দারুণ দুঃসময়—ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের পক্ষেও।... সহানুভূতি জানাইবার একটি লোকও নাই। বালকের কল্পনার প্রতি কে সহানুভূতি দেখাইবে?...একজন ছাড়া কেহই সহানুভূতি জানাইল না।

সেই একজনের সহানুভূতিই আশা ও আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিল। তিনি এক নারী।... সেই নারী আমাদের গুরুদেবেরই সহধর্মিণী। তিনি ঐ বালকদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতেন; কিন্তু তাঁহার কোন শক্তি ছিল না। আমাদের অপেক্ষাও তিনি দরিদ্র ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

'রামকৃষ্ণ-মিশন'-এর প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সম্পাদকীয়।

সঙ্ঘমাতা সঙ্ঘনির্মাতা

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির আর আছে কিনা সন্দেহ যে, পুরুষের দ্বারা পরিচালিত এবং শুধুমাত্র পুরুষের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের (যে-প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সেই মুহূর্তেই আন্তর্জাতিক) নিরঙ্কুশ এবং অবিসংবাদী নেতৃত্ব দান করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে উহাকে গঠন করিতেছেন একজন নারী। পৃথিবীর এতাবৎ কালের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা একবারই ঘটিয়াছে এবং বলা বাহুল্য, সেই প্রতিষ্ঠানের নাম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এবং সেই নারীর নাম সারদাদেবী। ঘটনাটির অনন্যতা আরও একটি চমকপ্রদ কারণেও। ঐ নেতৃত্ব-গ্রহণ এবং সংগঠনের জন্য সারদাদেবী কখনই স্বয়ং প্রকাশ্যে ও পুরোভাগে আসেন নাই। শুধু তাহাই নহে, দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর কাল আমৃত্যু ঐ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিলেও কোন আনুষ্ঠানিক পদেরও তাঁহার প্রয়োজন হয় নাই। সর্বোচ্চ সংগঠক ও নেতৃত্বের অবস্থানটি তাঁহার হইলেও তিনি যেমন সচেতন অথবা অসচেতন কোনভাবেই উহা চাহেন নাই, তেমনই সঙ্ঘের কেহই নিজের বা নিজেদের সচেতন অথবা অসচেতন প্রয়াসে তাঁহাকে ঐ অবস্থানে অধিষ্ঠিতও করেন নাই। অথচ ঘটনাটি ঘটিয়াছে, এবং ঘটিয়াছে সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ও চূড়ান্ত স্বাভাবিক ভাবে। তাঁহার জীবনকালে অথবা তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব লইয়া কোন প্রশ্ন উঠে নাই। উহা ছিল বাতাসের মতোই স্বচ্ছন্দ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক এবং প্রতিদিনের সূর্যোদয়ের মতোই অনিবার্য। অথচ, তাঁহার জীবনকালে খুব কম লোকই জানিতে পারিয়াছে তাঁহার অবিসংবাদী ও নিরঙ্কুশ সর্বোচ্চ অবস্থানের বৃত্তান্ত, তাঁহার নীরব সংগঠকের ভূমিকার পরিচয়। তিনি প্রায় অদৃশ্যই থাকিয়াছেন, তাঁহার ভূমিকা রহিয়াছে সকলের অলক্ষ্যে, তাঁহার আদেশ ক্বচিৎ উচ্চারিত অথবা শ্রুত হইয়াছে। অথচ তাঁহার ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত সামান্য ইচ্ছা পরিগণিত হইয়াছে অবশ্যকৃত্য হিসাবে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক সর্বোচ্চ পদাধিকারী হইতে সাধারণ সভ্য পর্যন্ত সকলের দ্বারা অক্ষরে অক্ষরে উহা সম্পাদিত হইয়াছে কুণ্ঠাহীন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে এবং প্রশ্নহীন আনুগত্যে।

বাস্তবিক, অভূতপূর্ব এই ঘটনা, তুলনারহিত

এই দৃষ্টান্ত। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিতরে এবং বাহিরে থাকিয়া এই অনন্য ও অপূর্ব ইতিহাসের সাক্ষী হই-বার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন মনস্বিনী এবং তেজস্বিনী মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল—পরবর্তী কালে ভগিনী নিবেদিতা। তাঁহার অভিজ্ঞতার রূপ তাঁহার নিজের রচনাতে এইরকম: "শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছু করিবার পূর্বে তাঁহার পরামর্শ সর্বদা লইতেন। রামকৃষ্ণের শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশ সর্বদা শিরোধার্য করিয়া চলেন।... তাঁহার সম্পর্কে [সঙ্ঘের] সন্ন্যাসিগণের বীরোচিত সম্ভ্রম দেখিবার মতো।... প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁহাকে সর্বাগ্রে স্মরণ রাখা হয়।... তাঁহার যেকোন ইচ্ছাকে স্থায়ী আদেশতুল্য জ্ঞান করা হয়। সে এক দর্শনীয় অপরূপ সম্পর্ক।"

এবার আমরা ইতিহাসের দিকে যাইব। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক প্রধান স্থপতি স্বামী বিবেকানন্দ হইলেও উহার প্রকৃত স্থাপয়িতা শ্রীরামকৃষ্ণ। ইহা আমরা জানি। কিন্তু সারদাদেবী? সারদাদেবী এই সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, উহার জননী, উহার পালনকর্ত্রী, উহার পুষ্টিবিধাত্রী। সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তাঁহার অভিষেক ও বোধন হইয়াছিল ষোড়শী পূজার সেই ঐতিহাসিক রাত্রিতে। জননী-রূপে তাঁহার ক্রমবিকাশ নহবতে। আর, পালনকর্ত্রী এবং পুষ্টিবিধাত্রীর ভূমিকাটি প্রথম হইতেই জননীর ভূমিকার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংপৃক্ত থাকিয়াছে। সন-তারিখ না জানা যাইলেও মোটামুটি বলা যায় যে, সেদিনই তাঁহার মধ্যে সংঘজননীর সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গিয়াছিল যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশকে অমান্য করিয়া নিষ্কম্প কণ্ঠে তিনি বলিয়াছিলেন: আমি যে মা। মা সন্তানদের মধ্যে ভাল-মন্দের বিচার করে না। 'মা' বলিয়া যে-ই আমার কাছে আসিবে তাহাকে আমি কখনও ফিরাইতে পারিব না।

বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু ঐ উত্তরটি শুনিবার প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। কারণ, সারদাদেবীর মধ্যে ভাবী রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননীর প্রকাশের পরীক্ষাই তিনি সেদিন করিতেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অপর একটি দিনের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে। উহারও সন-তারিখ অজ্ঞাত। পরবর্তী কালের ত্যাগী পার্ষদ-গণের সাধনজীবনকে অভীষ্ট খাতে বহাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের রাত্রির আহারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সারদাদেবী বালক ও যুবক ভক্তগণের প্রয়োজন ও ক্ষুধার অনুপাতে প্রতিদিনই শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন উহা জানিতে পারেন এবং সারদাদেবীকে সতর্ক করিয়া অনুযোগ করেন যে, ঐরূপ "বিবেচনাহীন স্নেহের দ্বারা" তিনি উহাদের "ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতেছেন"। তৎক্ষণাৎ দৃঢ়কণ্ঠে সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়া দিলেন: আমার সন্তানদের লইয়া তোমায় ভাবিতে হইবে না। উহাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখিব।

সেদিন 'জননী'র নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া 'জনক' স্মিতহাস্যে নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সে-হাস্য ছিল পরম নিশ্চিন্ততার। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন, সংঘজননী জাগিয়াছেন। পৃথিবীর কোন শক্তির সাধ্য নাই ঐ সর্বপ্লাবিনী মাতৃত্বের তরঙ্গকে প্রতিরোধ করে।

বলা হয়, "মাতা নির্মাতা"। মাতাই সন্তানদের নির্মাণ করেন। মাতার স্নেহ ও শাসন, উদ্বেগ ও স্বপ্ন অন্যের অগোচরে গড়িয়া তোলে এক-একটি সংসারকে, বাঁধিয়া রাখে এক-একটি পরিবারকে। শ্রীমা সারদাদেবী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ক্ষেত্রে প্রথম হইতে ঠিক তাহাই করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ পরি-চালনভার সন্ন্যাসীদের হাতে। কাশীপুরে অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁহার ভাবী সঙ্ঘের স্থপতিদের পাঠাইলেন মাধুকরী ভিক্ষায়। তাপদগ্ধ সংসারীদের দুয়ারে দুয়ারে নিঃসম্বল ত্যাগব্রতীরা অমৃতের বার্তাবহরূপে দাঁড়াইবেন। যাত্রার পূর্বে তাঁহারা গিয়া দাঁড়াইলেন সারদাদেবীর দুয়ারে। একটি টাকা দিয়া সন্তানদের আশীর্বাদ করিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে যে-অমৃতের পাত্রটি তিনি পাইয়াছিলেন তাহাই যেন 'ষোল আনা'য় পূর্ণ করিয়া তাঁহার সন্তানদের হস্তে সমর্পণ করিলেন তিনি। অমৃতত্ব লাভ ও সেই অমৃতত্ব বিতরণের সাধনাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের স্থপতি-গণের সাধনা। সেই সাধনার উত্তরাধিকার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে তাঁহারা পাইয়াছেন। সেই সাধনা জয়যুক্ত হউক—সেই স্বপ্ন সার্থক হউক, সঙ্ঘজননী সেই আশীর্বাদই সেদিন প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সন্তান-দের করিলেন। 'জননী'র আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া নব-প্রসূত একটি মহা-আন্দোলনের মশাল লইয়া উহার অগ্নিহোত্রিগণ সেই প্রথম পথে বাহির হইলেন। ভাবগত অর্থে এই ঘটনাটিকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক সূচনা বলা যাইতে পারে। এই সূচনা সভা আহ্বান করিয়া হয় নাই, প্রচারমাধ্যমে

বিজ্ঞাপিত করিয়া হয় নাই। নীরবে, নিভৃতে, লোক-লোচনের অন্তরালে উহা করিয়াছিলেন সারদাদেবী।

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন মরদেহ ত্যাগ করিলেন। তাহার পূর্বে নরেন্দ্রনাথকে তিনি চিহ্নিত করিয়া গেলেন সঙ্ঘের নেতারূপে, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের তথা সঙ্ঘের ভার সমর্পণ করিয়া গেলেন সারদাদেবীর উপর। বলিলেনঃ "শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।" যাইবার আগে বলিয়া গেলেনঃ "এ [নিজেকে দেখাইয়া] আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মরজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু রহিয়া গেলেন আরেক রূপে সারদাদেবীর মধ্যে আরও "অনেক বেশি" করিবার উদ্দেশ্যে। কয়েক বৎসর পরের কথা। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। এক বৎসর আগে 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর সূত্রপাত হইয়াছে। প্লেগ-রোগাক্রান্ত কলকাতা ও কলকাতার মানুষকে বাঁচাইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর সন্ন্যাসীদের পথে পথে নামাইয়াছেন। নিঃসম্বল সন্ন্যাসীদের কতটুকুই বা সংস্থান। কয়েকদিনের মধ্যেই ত্রাণকার্যের জন্য আর্থিক সঙ্গতি নিঃশেষ হইয়া গেল। স্বামীজীকে সেকথা বলা হইলে মহাপ্রাণ স্বামীজী বলিলেনঃ মঠের জমি বিক্রি করিয়া ত্রাণের কাজ চালাইব। আমরা সন্ন্যাসী-ফকির মানুষ, মুষ্টিভিক্ষা করিয়া গাছতলায় শুইয়া দিন কাটাইতে পারি। যদি মঠের জায়গা-জমি বিক্রি করিয়া হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাইতে পারা যায় তো কিসের জায়গা আর কিসের জমি?

গুরুভাইরা প্রমাদ গণিলেন। স্বামীজীকে বুঝাইবে কে? স্বামীজীকে তখন স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল, মঠের জমি বিক্রির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সিদ্ধান্ত জানা প্রয়োজন। অমনি স্বামীজী বলিলেনঃ নিশ্চয়ই। চল, মায়ের কাছে যাই। মায়ের কাছে যাইয়া স্বামীজী তাঁহার ইচ্ছার কথা জানাইলেন। সারদাদেবী শান্তভাবে সব শুনিয়া বলিলেনঃ সে কি বাবা, মঠ বিক্রি করিবে কি? মঠ কি শুধু একটিমাত্র সেবাকাজেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে? কত কাজ তাঁহার। তাঁহার অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। যুগ যুগ ধরিয়া এইভাব চলিবে। আরও কত সেবা, কত ত্রাণ, কত প্রকল্প মঠকে পরিচালনা করিতে হইবে। এই তো সবে তাঁহার কাজের শুরু।

স্বামীজী বুঝিলেন, সঙ্ঘজননীর চিন্তা ও দৃষ্টি কত দূরপ্রসারিত। সেদিন সারদাদেবীর ঐ কয়টি কথায় শুধু যে বেলুড় মঠ রক্ষা পাইল তাহা নহে, রক্ষা পাইল বিশাল সম্ভাবনাময় একটি মহান ভাবান্দোলনও—আগামী দিনে মানবসভ্যতার সমৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব যাহার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেনঃ "তোমাকে অনেক বেশি করতে হবে।" সারদাদেবী তাঁহার দীর্ঘ জীবনকালে বারবার এইভাবে সঙ্ঘকে নানা জটিল সঙ্কটে রক্ষা করিয়াছেন, যথার্থ উপদেশ ও সিদ্ধান্ত দান করিয়া তাহাকে পরিচালিত করিয়াছেন তাহার ধ্রুব লক্ষ্য-পথে। বাস্তবিক, সেদিন সারদাদেবী না থাকিলে শিশু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত কিনা কে বলিতে পারে? হিন্দু পৌরাণিক ঐতিহ্যে শিব 'দেবাদিদেব', 'মহাদেব' বলিয়া পরিগণিত। দেবতাদের মধ্যে তিনিই শুধু সমাধিলীন 'যোগেশ্বর'। কিন্তু ঐ ঐতিহ্য অনুসারেই ঐ পরম দেবতা আবার চূড়ান্ত খেয়ালী এবং চরম উদ্দামও। তিনিই আবার তখন ভাঙ্গনের দেবতা। তাঁহার আকস্মিক খেয়ালে এবং উদ্দামতায় সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া খান খান হইবার উপক্রম হয়। শিবাংশে জন্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দের স্বভাবেও প্রতিফলিত হইত শিবেরই যুগ্ম সত্তা। তাঁহার খেয়াল ও উদ্দামতাও ছিল অপরের নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে বাগ মানাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। শুধু একজনের কাছেই তিনি ছিলেন শান্ত, সুবোধ বালকের দ্বিধাহীন আত্মসমর্পণে নিত্য-ভুলুণ্ঠিত। তিনি সারদাদেবী। স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ পরবর্তী কালে বলিতেনঃ শ্রীশ্রীমাই স্বামীজীর উদ্দাম আবেগকে রাশ টানিয়া ধরিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেন।

স্বামীজীর মাথায় সঙ্ঘ-সংগঠনের চিন্তা শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের মুহূর্তে হইতেই জাগরূক ছিল, স্বামীজী পরবর্তী কালে তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু স্থায়ী মঠ বিষয়ে স্থায়ী চিন্তা সারদাদেবীকে যেভাবে অধিকার করিয়াছিল তাহা আর কাহাকেও সেভাবে করে নাই। পরবর্তী কালে যখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দিকে দিকে উহার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হইতেছে তখন একদিন সারদাদেবী বলিয়াছিলেনঃ "ভালবাসাই তো আমাদের আসল। এই ভালবাসাতেই তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে। আহা, এর জন্য ঠাকুরের কাছে কত

কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তাঁর কৃপায় নরেন আমার ধীরে ধীরে এইসব করলে। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ঘর-সংসার ছেড়ে নরেন, রাখাল, শরৎ, বাবুরাম—সব ছেলেরা ঠাকুরের ভাব আশ্রয় করে একসঙ্গে জুটল। দেখে আমার খুব আনন্দ হলো। ওমা! কিছুদিন পরে দেখি তাদের বৈরাগ্য এল, সকলেই সংসারত্যাগী, কেউ কাউকে তেমন মানতে চায় না। একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে। এখানে ওখানে ভিক্ষে করে খায়, আর গাছতলায় তলায় ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হলো। ঠাকুরের কাছে এই বলে আকুলভাবে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই ক-জন শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেদের নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, এই ক-জনকে না হয় ধন্য করলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল। তাহলে আর এত কষ্ট করে আসার কী দরকার ছিল? এত তপস্যারই বা কী প্রয়োজন ছিল? দেশে এরকম সাধুর তো অভাব নেই, **আমার ছেলেরা তোমার ভাব নিয়ে এক-একটি স্থান আশ্রয় করে বসবে, আর সব সংসার-তাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার ভাব পেয়ে শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে—এইজন্যই তো [তোমার] আসা!"**

বর্তমানের সুবিশাল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—"এই মঠ-টঠ যা কিছু" সব সঙ্ঘজননীর সেই ব্যাকুল প্রার্থনার ফলশ্রুতি। 'সঙ্ঘ' মানে সংহতি, ঐক্য। সারদা-দেবী তাঁহার প্রার্থনায় তাহার জন্যও ব্যগ্রতা জানাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "আমার প্রার্থনা··· ওরা সব তোমাকে আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে **একত্রে** থাকবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম মহিলা-ভক্ত, সারদাদেবীর অন্যতম অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী যোগেন-মাকে পরবর্তী প্রজন্মের সাধু-ব্রহ্মচারীদেরকে বলিতে শুনা গিয়াছে ঃ "যা কিছু দেখছ (মঠ-আশ্রমাদি) সব মায়ের কৃপায়!" সঙ্ঘের প্রতি সারদাদেবীর স্নেহ কী অপরিসীম ছিল স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় তাঁহার 'আমার জীবন ও ব্রত' শীর্ষক একটি বিখ্যাত ভাষণে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। [দিব্য বাণী দ্রষ্টব্য]

মাতার স্নেহ অকাতরে সঙ্ঘকে দিয়াছেন বলিয়াই কি তিনি সঙ্ঘমাতা? না, প্রয়োজনে কঠোর শাসনে সঙ্ঘকে স্থির লক্ষ্যে, ধ্রুব আদর্শের পথে পরিচালিত করিয়াছেন বলিয়াও তিনি সঙ্ঘজননী। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন ঃ "তিনি স্নেহময়ী ছিলেন, কিন্তু স্নেহদুর্বলা ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ওপর তাঁর একটা অদৃশ্য প্রভাব অলক্ষ্যে সতত ক্রিয়াশীল ছিল। সঙ্ঘের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ অবনত না হয় সেদিকে [তিনি] সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

"···একটি ঘটনার কথা মনে আছে। তাঁর কোন সন্ন্যাসী শিষ্য সন্ন্যাসের পবিত্র ব্রত ভঙ্গ করে অনুতপ্ত হন। মা তাঁকে বললেন, 'তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি, তুমি আমার সন্তানই থাকবে, কিন্তু ব্রতভঙ্গকারীর কোন প্রায়শ্চিত্তেই সন্ন্যাসিসঙ্ঘে স্থান হতে পারে না।' মাতৃহৃদয়ও ক্ষেত্রবিশেষে কত কঠিন হতে পারে, এ আমার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা।" ভগিনী নিবেদিতাও তাঁহার প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতায় জানাইয়াছেন ঃ "যখন কঠোরতার প্রয়োজন হয় তখন তিনি কোনরূপ যুক্তিহীন ভাবালুতায় প্রভাবিত হন না। কোন ব্রহ্মচারীকে হয়তো কয়েক বছরের জন্য মাধুকরী ভিক্ষান্নে জীবন নির্বাহ করার শাস্তি দিয়াছেন, তাহাকে তদ্দণ্ডেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সন্ন্যাসের ব্রত যে লঙ্ঘন করিয়াছে সে কখনই তাঁহার সাক্ষাতে আসিবার অনুমতি পাইবে না।"

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এবং সারদাদেবী—কোন্ সম্পর্কে উভয়ে সম্পর্কিত, সেবিষয়ে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ আলোকপাত করিয়াছেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মে (১৩০৪ বঙ্গাব্দের ১৯ বৈশাখ) বলরাম মন্দিরে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং উহার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিশ্লেষণের পর স্বামীজী সভায় উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ **"শ্রীশ্রীমাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্নী হিসাবে মনে কর তোমরা? তিনি শুধু তা-ই নন ভাই, আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী।"**

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এবং রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের কোন্ ভূমিতে সারদাদেবীর অবস্থান, সেবিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দই চরম কথাটি বলিয়া গিয়াছেন। ☐

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

॥ ১ ॥

বৃন্দাবন
৩১।১।(১৯)০৩

প্রিয় কালীকৃষ্ণ,*

তোমার দীর্ঘ চিঠির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। গভীরভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে প্রতিবারই তুমি অসুস্থ বোধ কর জানিয়া চিন্তিত হইয়াছি। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, আমি মনে করি, পতঞ্জলি-বর্ণিত 'অন্তরায়াঃ'-র তুমি একটির সম্মুখীন হইয়াছ। পদ্ধতি জানা থাকিলেও প্রকৃতি তোমার বিরোধিতা করিতেছে। প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ আনিতে হইলে প্রকৃতিকে তোমার তুষ্ট করা উচিত। জোর করিতে যাইলে সাধারণতঃ ভালর চাহিতে মন্দই হয় অধিক। তুমি "ঈশ্বরপ্রণিধানম্" ("তস্মিন্ পরমগুরৌ আত্মসমর্পণম্")—অবলম্বন করিতেছ না কেন? ধ্যানই মুক্তির একমাত্র উপায় নয়। অসুখী বা হতাশ হইও না। উহাতে বরং তোমার অগ্রগতি ব্যাহতই হইবে। যে-সকল শুভকর্ম তুমি করিয়াছ তাহা নষ্ট হইবে না বা বৃথা যাইবে না। ধীরে এবং যথাযথ ধৈর্যের সহিত অগ্রসর হও যাহাতে কৃতকার্য হইতে পার। "যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ/অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" কখনও ভুলিও না যে, ভগবানকে লাভ করিবার জন্য একটি জীবন যথেষ্ট নয়। ধৈর্য অবলম্বন কর এবং লাগিয়া থাক। মা তোমাকে আশীর্বাদ করুন।

যদিও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাই নাই, তবে এখন পূর্বাপেক্ষা ভাল বোধ করিতেছি। কৃষ্টলাল[১] ভালই আছে। আমি এইস্থান ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব জানি না। মা-ই কেবল জানেন। মতিলাল এবং সুশীলকে আমার শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা জানাইবে। মা তোমার মনে শান্তি দিন—এই আমার প্রার্থনা।

ইতি
প্রভুপদাশ্রিত
শ্রীতুরীয়ানন্দ

॥ ২ ॥

বৃন্দাবন
২০ নভেম্বর, (১৯)০৩

প্রিয় কালীকৃষ্ণ*

তোমার পোস্টকার্ডের জন্য ধন্যবাদ। গতকালই উহা পাইয়াছি। সম্প্রতি তুমি খুব একটা সুস্থবোধ করিতেছিলে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আশাকরি কবিরাজী চিকিৎসায় পুনরায় ঠিক হইয়া যাইবে। তুমি যদি এখানে আসিতে ইচ্ছা কর এবং তাহা যদি (চিকিৎসকদের মতে?) সঙ্গত হয়, তবে আসিতে পার। তুমি এখানে আসিলে আমি খুবই খুশি হইব। একসময় রাখাল মহারাজ[২] এবিষয়ে উল্লেখ করিয়াছিলেন, আবারও হয়তো তোমাকে বলিতে পারেন। কৃষ্ণলাল রাখাল মহারাজের পত্রের অপেক্ষায় আছে। সে ভাবিতেছে, অন্য কাজে না হইলেও শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে তাহার কলিকাতায় যাওয়া উচিত। আমি এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছি। কোথায় যাইব এখনও নিশ্চিত নহি। এখানকার আবহাওয়াও খুব সুন্দর হইতেছে। সুতরাং এখানে শীতকালটা কাটাইতে চেষ্টা করিতে পারি। তোমাদের ওখানে এবারও সকলকে আমার কথা বলিও এবং তাহাদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালবাসা ও সম্ভাষণ জানাইও। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে।

ইতি
তোমাদের স্নেহবদ্ধ
শ্রীতুরীয়ানন্দ

* চিঠি দুটি ইংরেজীতে লেখা।—যুগ্ম সম্পাদক

১ স্বামী ধীরানন্দ   ২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্যায়

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ১১ ॥

আলোচ্যকালে মঠজীবনের উল্লেখ্য ঘটনাবলীর অনেক কিছুই স্বামীজী-কেন্দ্রিক। যেহেতু স্বামীজী ছিলেন মঠের মধ্যমণি, সে-কারণে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর অনেকগুলিই তাঁকে কেন্দ্র করে ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। এসকল ঘটনাবলীর মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বের বর্ণালী, যা অপর সকলকে বিমোহিত করেছে। আরও পরিস্ফুট হয়েছে যে, স্বামীজী কিভাবে অপরের অগোচরে সকলের আরাধ্যরূপে উন্নীত হয়েছিলেন। কাশ্মীরে অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করে স্বামীজী ১৮ অক্টোবর মঠে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য এবং গভীর অন্তর্মুখীন ভাব দেখে স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ গুরুভাইগণ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। দু-তিনদিন পরে স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মঠে উপস্থিত হতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে বলেনঃ "কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারও সঙ্গে কোন কথাবার্তা কন না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছে গল্পসল্প করে স্বামীজীর মনটা নিচে আনতে চেষ্টা করিস।" নিঃসন্দেহে প্রাণোচ্ছল স্বামীজীর মধ্যে তূষ্ণীম্ভাব সকলকে ভাবিত করে তুলেছিল, বিশেষ করে মঠবাসিগণ যখন জানতে পারেন যে, অমরনাথ-দর্শনের পর থেকেই স্বামীজীর মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা শিব বসে আছেন। কিন্তু স্বামীজীর অন্তরের ভাব চাপবার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। তিনি ১৮ অক্টোবর অপরাহ্নেই মঠের নতুন জমিতে বাড়ি তৈরির অগ্রগতি দেখতে গেছিলেন। সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্দিষ্ট আসরে তিনি তাঁর সদ্যরচিত তিনটি কবিতা পাঠ করে সকলকে চমৎকৃত করেন। শেষ কবিতাটি ছিল 'Kali the Mother'। ১৯ ও ২০ অক্টোবর তারিখে তিনি নিজের হাতে সপ্তশতী হোম করেন। পরদিন ছিল দুর্গাসপ্তমী। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ ও ব্রহ্মচারী বিমলানন্দকে নিয়ে স্বামীজী কলকাতায় বাগবাজারে যান শ্রীমাকে প্রণাম করতে। সেদিনই কথাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীমার নিকট অনুযোগ করেছিলেন তাঁর ওপর মুসলমান ফকিরের অভিচার সম্বন্ধে। শ্রীমা তাঁকে মিষ্ট বচনে শান্ত করেছিলেন।

কলকাতা কর্পোরেশনের উপ-সভাপতি ও তৎকালীন মঠবাড়ির মালিক নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই কাশ্মীর ও জম্মুর প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ৬ নভেম্বর মঠে এসেছিলেন। খবর পেয়েই স্বামীজী মঠে এসে তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানান ও আদর-আপ্যায়ন করেন।

যখন স্বামীজী মঠে উপস্থিত থাকতেন সেসময়ে মঠে দেখা যেত 'নিত্য-উৎসব'। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীশিষ্য, স্বামীজীর প্রাক্তন সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধব ছাড়াও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি মঠে উপস্থিত হয়েছেন স্বামীজীর সাক্ষাতের জন্য। এসেছেন মাননীয় আনন্দ চার্লু, বৌদ্ধনেতা অনাগারিক ধর্মপাল, শ্যামদেশের রাজপুত্র জিনবর বংশ, খেতড়ির মুন্সী জগমোহনলাল, বিশপ কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অধ্যাপক নৃত্যগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি। এসকল গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাড়াও যুবকেরা এসেছে দলে দলে। যুবকদের দেখলেই স্বামীজী মহাখুশি। ঐসময় কত ঘটনা ঘটেছে স্বামীজীকে নিয়ে! কতজনের কত স্মৃতি! একদিন জনকয়েক কলেজের ছোকরা চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিল বেলুড়ে। নীলাম্বর-বাবুর বাগানের মঠে স্বামীজীর সঙ্গে তাদের দেখা। স্বামীজী স্বামী সদানন্দকে ডেকে বলেনঃ "ওরে গুপ্ত, এই ছোকরারা সব এসেছে। এদের তাড়াতাড়ি

একটা খাবার বাবস্থা করে দে।" কর্মিতকর্মা স্বামী সদানন্দ ঘণ্টাখানেকের ভিতর চমৎকার খিচুড়ি ও মাংস রান্না করে এনে হাজির। স্বামীজী তাদের বলেন: "নে, সব খেয়ে নে।" সকলেরই বোধ হয়, স্বামীজী তাদের অতি আপনার।[৮৮] আবার দেখি, একদল যুবক এসেছে স্বামীজীকে দেখতে। দলের মধ্যে ছিল শরৎ সরকার, প্রবোধ বসু প্রভৃতি। কালবৈশাখীর সময়। আকাশে ঘনঘটা দেখে স্বামীজী একেবারে নৌকার কাছ পর্যন্ত নিজে এসে সবাইকে তুলে দিলেন। আর মাঝিকে বলে দিলেন: "বাবা, বড্ড মেঘ উঠেছে, এদের সাবধানে নিয়ে যেও।"[৮৯] যুবকগণ ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরে, এমন দরদী মানুষ কে কবে দেখেছে!

যুবকদের বন্ধু ও সুহৃদ বিবেকানন্দই আবার মঠবাসিগণের চোখে আরাধ্য দেবতা হয়ে উঠেছিলেন। ছোট একটা ঘটনার বর্ণনা দেওয়া যাক। নীলাম্বরবাবুর বাগানের ঘাটে একদিন স্বামীজী গঙ্গাস্নান করে উঠছেন। সেবক কানাই মহারাজ (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) স্বামীজীর মাথা-গা মোছাতে থাকেন। স্বামীজীর ইংরেজ-শিষ্য গুডউইনের ইচ্ছা স্বামীজীর পা মুছিয়ে দেন। তাঁর মনোভাব বুঝে স্বামীজী তাঁকে পা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন: "Sit down and rub it."[৯০]

শিষ্যগণ স্বামীজীকে 'গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ' মনে করেন এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তাঁর নিজের গুরুভাইগণ দেখতেন যে, তাঁর মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা জ্বলজ্বল করছে। স্বামী প্রেমানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে মাদ্রাজে লিখেছিলেন: "নরেনের মধ্যে তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) শক্তিই কাজ করছে, দেখ না পৃথিবীর মধ্যে যেন হুটোপাটি লাগিয়ে দিয়েছে!" শুধু যে শ্রীঠাকুরের শক্তি স্বামীজীর মধ্য দিয়ে কাজ করছিল তাই নয়, গুরুভাইগণ বিশ্বাস করতেন যে, স্বামীজী ও শ্রীঠাকুর ছিলেন অভিন্ন। একদিন স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীঠাকুরের পূজার পুষ্পপাত্রে স্বামীজীর শ্রীচরণ স্থাপন করে পূজা করেছিলেন। স্বামীজী এবিষয়ে স্বামী প্রেমানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, স্বামী প্রেমানন্দ বলেন: "তা বেশ করেছে; তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন?"[৯১]

প্রেক্ষাপটে স্বামীজী যেখানে প্রধান চরিত্র, সেখানে বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব, ভাবৈশ্বর্য থাকাই প্রত্যাশিত। কিন্তু মঠজীবনে এতদ্ভিন্ন পরিস্থিতিতেও বৈচিত্র্য ও আনন্দোৎসবের অভাব ছিল না। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

২৮ মে ১৮৯৮ সন্ধ্যাবেলায় জপ-ধ্যানের পর ভক্ত কালীপদ ঘোষ ফোনোগ্রাফ যন্ত্র বাজিয়ে মঠবাসিগণকে চমৎকৃত করেছিলেন। ফোনোগ্রাফ তখন এদেশে নতুন আমদানী হয়েছে। ইতঃপূর্বে ২৯ মার্চ সন্ধ্যারতির পর একটি কনসার্ট বা ঐকতান-বাদনের আসর বসেছিল হলঘর তথা নাটমন্দিরে। এর নেতা অমৃতলাল দত্ত ওরফে হাবুবাবু স্বামীজীর সম্পর্কিত ভাই। তিনি বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী। কাশীপুর বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের পীড়াপীড়িতে হাবু দত্তের বুক স্পর্শ করেছিলেন, যার ফলে তিনি বেশ কিছুক্ষণ জ্ঞানরহিত হয়ে পড়েছিলেন। উপস্থিত মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড ও মঠবাসিগণ বাদকদের খুব প্রশংসা করেন।

কাশ্মীর থেকে ফিরে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড প্রথমে কিছুদিন কলকাতায় এবং তারপর বেলুড়ের উত্তরে বালীতে একটি ভাড়াবাড়িতে বাস করছিলেন। বড়দিনের দিন তাঁদের আমন্ত্রণে অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী খ্রীষ্ট-উৎসবে যোগদান করেছিলেন। ৩০ ডিসেম্বর নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির সম্ভবতঃ নিচের হলঘরেই মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডকে বিদায় অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। সভানুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন স্বামী সারদানন্দ। বিদেশী এই দুই মহিলা ঠাকুরঘরে প্রণাম করে বিদায় নেন। মিসেস বুল আর কখনো মঠে ফিরে আসেননি, অবশ্য মিস ম্যাকলাউড অনেকবার এদেশে এসেছেন এবং বেলুড় মঠে বাস করেছেন।

২৩ ডিসেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দ তরুণ মঠবাসিগণের

৮৮ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, পৃঃ ২৪৭

৮৯ ঐ, পৃঃ ২৩৯

৯০ ঐ, পৃঃ ২৫৪

৯১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১০২

একটি দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতার গড়ের মাঠে বেলুন ওড়ানো দেখবার জন্য। প্রায় আড়াই মাস আগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও অপর কয়েকজন বলরাম-ভবনে গিয়েছিলেন নিকটবর্তী একটি স্থানে আন্দুল দলের কালীকীর্তন শুনতে। এরও আগে ২৪ জুলাই বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর আমন্ত্রণে মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ বলরাম-ভবনে ভাণ্ডারায় যোগ দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং তুলসীরাম ঘোষও ভিন্ন ভিন্ন দিনে কয়েকজন সাধুকে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

আলোচ্যকালে মঠের ইতিহাসে উইম্বলডন-নিবাসী মিস হেনরিয়েটা মুলারের ভূমিকা যুগপৎ আনন্দের ও দুঃখের। আনন্দের হেতু, তিনি অর্থদান করে মঠ-কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব জমি কিনতে সাহায্য করেছিলেন; দুঃখের হেতু, তিনি পরে সঙ্ঘের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। স্বামীজীর মহৎ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁর ভারতীয় কর্মসূচীর আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে। খেয়ালী ও আগ্রাসী প্রকৃতির এই ধনী ইংরেজ মহিলার প্রকৃত স্বরূপ অল্পসময়ের মধ্যেই উন্মোচিত হয়েছিল। মিস হেনরিয়েটা মুলারের উদ্ধত আচরণে স্বামীজী কিরূপ বিব্রত বোধ করতেন তার কতকটা ধারণা করা যাবে স্বামীজীর অপ্রকাশিত একটি চিঠির অংশ থেকে। ৯ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে স্বামীজী আলমোড়া থেকে সিংহলে গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে লিখেছিলেনঃ "এখানে আমরা দু-তিনদিন বিনসর ডাকবাংলোয় ছিলাম—পরে আমি শ্যামধুরায় যাত্রা করায় মিস মুলার ক্ষেপিয়া আলমোড়ায় গিয়াছে। মিস মুলার বিষম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে···। আমি বন্ধুর বাটীতে যাইতেছি। অতি খিকুপে মন। এই বৃহৎ বাড়ি আমাকে না বলিয়া কহিয়া ৮০ টাকা মাস এক season-এর জন্য ভাড়া করাইল। সকলের উপর মহারাগ, গালিমন্দ। এক্ষণে আমি অর্ধেক দিব বলায় কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ। বেচারীর মাথা খারাপ বোধ হয়। দিবারাত্র সকলকে গালিমন্দ করছে। মধ্যে চাকরটা সকল চুরি করায় বিষম হাঙ্গামা হইয়াছিল। এখন বলে, আমি ও বদ্রি শাহরা সকলে তাকে লুটিতেছি।" কিন্তু এই মহিলা স্বামীজীর সহ্যশক্তি ও মিষ্ট ব্যবহারে এবং গুডউইনের বোঝানোর ফলে সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। ১১ মার্চ ১৮৯৮ তারিখে স্টার থিয়েটারে মিস মার্গারেট নোবলের ভাষণের পর মিস মুলার একটি ছোট ভাষণ দিয়েছিলেন। শ্রোতাদের "আমার প্রিয় বন্ধুগণ ও স্বদেশবাসিগণ" সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর ভারতে পদার্পণের কাল থেকেই তিনি ভারতকে স্বদেশ বলে অনুভব করেছেন।

তাঁর পরিকল্পনা ছিল মার্গারেট নোবলের সহযোগিতায় ভারতীয় মেয়েদের জন্য একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করবেন। এই পরিকল্পনা কখনই বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। গুডউইনের সহযোগিতায় মিস মুলার মঠের জমি কেনার জন্য বেশ কিছু অর্থ দিয়েছিলেন। এই অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ স্পষ্টভাবে জানা যায় ই. টি. স্টার্ডিকে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ তারিখে লেখা স্বামীজীর চিঠি থেকে। স্বামীজী লিখেছিলেনঃ "I hear that there has been some talk about the money you gave me. I got £ 500=7500 Rs.+£ 500=7500 Rs. from Miss Souter, Miss Muller gave through Goodwin 30,000 Rs.: total 45,000 Rs. Miss Muller got us to buy a piece of land which cost 40,000 Rs. and 4000 Rs. to level it and fill up the huge gaps in it, as it was a dockyard···. Miss Noble's school was started with funds I got in India from the Maharajah of Kashmir and my Madras Publications and her own money largely."[১২] মিস মুলারের অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ অনেক হলেও জমি সংগ্রহের সবটুকু অর্থ তিনি দেননি।

মঠের জমি কেনা হয়েছিল ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের

১২ Swami Vivekananda in the West: New Discoveries—Marie Louise Burke, Vol. V, pp. 84-85

মার্চ মাসে। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকমাসের মধ্যেই এই ইংরেজ মহিলার চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি আবার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ক্ষোভের প্রকৃত কারণ দুর্বোধ্য। বিবেকানন্দ-গবেষক মারি লুইস বার্ক মন্তব্য করেছেনঃ "What Miss Muller's grievances were exactly, I do not know; but whatever they may have been, she had returned to England in the early part of 1899 filled with resentment." কিন্তু shape of the news, which we have just received from the most authentic source, that Miss Muller has completely severed her connection with Swami Vivekananda's movement to spread Hinduism and that she has returned to her Christian faith." দক্ষিণ ভারতের এই পত্রিকা এবং উত্তর ভারতের 'The Statesman', 'Indian Mirror' পত্রিকা মুখরোচক ঐ সংবাদটি নিয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে বসে।
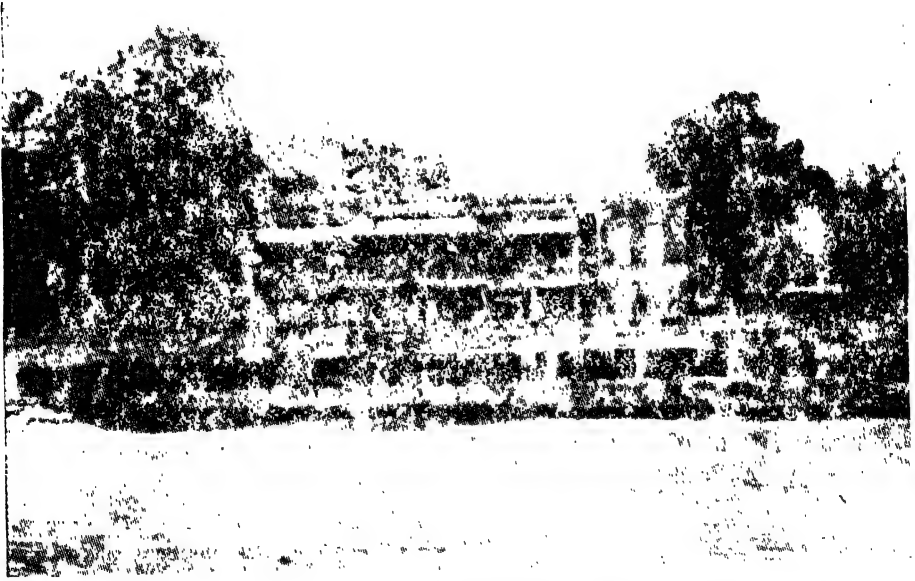
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ির আলোকচিত্র। কাল: ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ। সৌজন্য: জিতেন রায়।

ভারত-ত্যাগের পূর্বে তিনি একটি অভাবনীয় কাণ্ড করে বসলেন। তাঁর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর হাতে-গড়া মঠের বিরুদ্ধে মহিলার বিষোদ্গার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে পড়ল। গোঁড়া খ্রীস্টান পত্রিকা 'The Indian Social Reformer' ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৮ তারিখে সগৌরবে ঘোষণা করলঃ "To our Christian brethren we beg to offer a Christian present in the

মিস মুলারের এরূপ দুর্ভাগ্যজনক আচরণ সম্বন্ধে অপর এক ইংরেজ মহিলা মিসেস সেভিয়ার ১ জানুয়ারি ১৮৯৯ তারিখের চিঠিতে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেনঃ "What a pity Miss Muller should advertise her foolishness in the paper!" মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ অবশ্য মিস মুলারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ সকল দুর্ব্যবহার হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন। [ক্রমশঃ]

প্রবন্ধ

শ্রীচৈতন্য-আন্দোলনের

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব সন্ন্যাসতত্ত্ব বা অলোকিক প্রেমতত্ত্বই আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচারিত। কিন্তু একসময় শ্রীচৈতন্য-আন্দোলন আমাদের দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেও কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। শ্রীচৈতন্য-ভাবের সেই দুর্বার প্রবাহ কেবলমাত্র ভক্তদের আঙ্গিনা দিয়েই বয়ে যায়নি। পাঁচশ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকদের মানসভূমি এখনো তা নিঃসন্দেহে উর্বর করে চলেছে। একথা ভাবলেও অবাক লাগে যে, শ্রীচৈতন্য-আন্দোলন মূলতঃ ধর্মভিত্তিক হলেও আমাদের দেশের মনীষী ও চিন্তাবিদরা এবং সমাজতাত্ত্বিকরা এই আন্দোলনের মধ্যে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও ধ্যান-ধারণার যথেষ্ট উপাদান খুঁজে পেয়েছেন ও পাচ্ছেন।

প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের দিকটি স্বল্প কথায় তুলে ধরেছেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে। তাঁর মতে: "চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে গৌড়দেশে বৈষ্ণবধর্মে নবশক্তি উন্মেষের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। চণ্ডীদাসের পদাবলীসমূহ ও কৃষ্ণকীর্তনে তাহার আভাস পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস গৌড়ীয় সাহিত্যে যে রচনারীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদ-কর্তৃগণ গৌড়ে ও বিদ্যাপতি মিথিলায় তাহা অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় এই জাতীয় গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বে কোন কবি কোন দেশে এই রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। গৌড়ীয় স্বাধীনতা বিনষ্ট হইলে ঘোর বিপ্লবের যুগে বোধ হয় সাহিত্য-চর্চা সম্ভবপর ছিল না। রাজা গণেশের অভ্যুদয়ের পরে গৌড়ীয় সাহিত্যে নবযুগ আরম্ভ হইলে চণ্ডীদাস সর্বপ্রথমে জয়দেব অবলম্বিত গীতি-কবিতা রচনা-রীতি বাঙলা ভাষায় নিয়োগ করিয়াছিলেন।"[১]

স্বনামধন্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের তাৎপর্য তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "...চৈতন্যের সাত্ত্বিক ভাবযুক্ত দিব্য প্রেমোন্মাদনাপূর্ণ রাধাকৃষ্ণের আদর্শানুযায়ী ভগবদ্‌ভক্তির ও প্রেমের তরঙ্গ সারা দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিল—রাধা-কৃষ্ণের লীলা ও হরিনাম কীর্তনে বাংলাদেশ প্রেমের ও ভক্তির বন্যায় যেন ডুবিয়া গেল। ইহাতে আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের আচার-বিচারের এবং জাতিভেদের বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল না। স্ত্রী-লোক, শূদ্র এবং আচণ্ডাল সকলকেই প্রেমের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের মনে ভগবৎপ্রেম ও সাত্ত্বিকভাব জাগাইয়া তোলাই ছিল চৈতন্যের আদর্শ ও লক্ষ্য।

"রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতন্যের পূর্বেও এদেশে ছিল। কিন্তু তাহা বহু পরিমাণে সাত্ত্বিক ভাবশূন্য হইয়া নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল।... অবশ্য চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ও অন্যত্র বিশুদ্ধ উচ্চ প্রেমের আদর্শও চিত্রিত হইয়াছে। উচ্চাঙ্গ ভক্তিরসের যে অভাব আছে এমন নয়। অর্থনীতির একটি মূলসূত্র

১ বাংলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, মনোমোহন প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃঃ ২৪৬-২৪৭

এই যে, যদি খাঁটি ও মেকি টাকা একত্র বাজারে চলে তবে ক্রমে ক্রমে খাঁটি টাকা লোপ পায়। চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন, 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তাহে।' কিন্তু সাধারণ মানুষ 'রজকিনী প্রেম' এই দুটি কথার উপর যতটা জোর দিয়াছে, 'কামগন্ধহীন প্রেমের' উপর ততটা নহে। চণ্ডীদাসের পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একসঙ্গে প্রচারিত ও এক কবির লেখা হইলেও (এবিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করেন) কৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণই জনপ্রিয় হইবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

"এই কলুষতার মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যের বলিষ্ঠ পৌরুষ, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক বৈষ্ণবধর্মকে এক অতি উচ্চস্তরে তুলিল। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্য অনুভূতি, প্রাণোন্মাদকারী কীর্তন এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে দিব্য আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ সমস্ত কলুষতা ধুইয়া ফেলিল। বৈষ্ণবধর্মে তখন নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল।"[২]

ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সুবৃহৎ পুস্তক 'বৃহৎ বঙ্গে' শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে এবং মূলতঃ শ্রীচৈতন্যেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-পথের চিরভাস্বর এক পথিকৃৎ-রূপেই শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বর-আরাধনা বা ভগবৎপ্রেমের যে-আদর্শ জগতে রেখে গেছেন তার তুলনা প্রায় মেলে না। আর তাই হলো ধর্মসাধনার 'প্র্যাকটিক্যাল ডিমন্সট্রেশন' অর্থাৎ 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' একসময় গানে ও কীর্তনে তিনি মাতিয়েছিলেন বাংলা ও উড়িষ্যাকে। তাঁর সেই দিব্যোন্মাদনা নিয়ে কত গানই না রচিত হয়েছে সেসময়!

"দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা,
তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়ে আর
পেলাম না।"

আবার কীর্তনছন্দে সে কী উদ্দাম গণ-জাগরণ!

"আমার গোরা জাতের বিচার মানে না রে—
দেখবি যদি আয় সকলে।"

খোল-করতাল-সহযোগে সেই উদাত্ত সর্বজনীন আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেনি চাষী, জেলে, মুচি, মালা, কামার, কুমোর প্রভৃতি সাধারণ মানুষ। এখনো গ্রামগঞ্জের হাটে-মাঠে-ঘাটে সকাল-সন্ধ্যায় শোনা যায়—

"ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ
কহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যেজন গৌরাঙ্গ ভজে
সেজন আমার প্রাণ রে।"

শ্রীচৈতন্যদেব কেবল অলৌকিক ভাবজগতেরই 'মহাজন' নন, 'গানের' জগতেও তিনি নিঃসন্দেহে এক 'মহাজন'। কারণ, তাঁর প্রেমোন্মাদনা বা ভাব অবলম্বন করে বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনেক 'মহাজন-পদাবলী' বা কীর্তন সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণতঃ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কীর্তনকে 'মহাজন-পদাবলী' আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু সেইসব 'মহাজন-পদাবলী'ও 'গৌরচন্দ্রিকা' ছাড়া অসম্পূর্ণ। যেমন রাধাকৃষ্ণ-লীলার 'পূর্বরাগ' গাওয়ার আগে কীর্তনীয়া গৌরাঙ্গ-ভাবের একটি পদ গেয়ে আসর জমিয়ে তোলেন—

"আজু হাম কী পেখলু নবদ্বীপচন্দ্র।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব।
পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘরপথ।
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত।
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ।
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ।"

(রাধামোহন ঠাকুরের 'পদকল্পতরু' দ্রষ্টব্য)

কীর্তনীয়া তাঁর শ্রোতাদের রাধাভাবে ভাবিত করার জন্য এইভাবে একটি 'গৌরচন্দ্রিকা' গেয়ে সেই সেই ভাবের কৃষ্ণলীলার পালার আসর মাতিয়ে রাখেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখের পদাবলীতে শ্রীচৈতন্যদেবই যেন রাধাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছেন

২ বাংলা দেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক), জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩৮০, মধ্যযুগ, পৃঃ ২৫৮-২৫৯

বারবার। সেকথা আজ আর অজানা নয়—যেন কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার পশ্চাদ্পটে শ্রীচৈতন্যের ভাবতনুখানিই দেখেছিলেন এইসব পদাবলীর মহাজনেরা। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরেও বৈষ্ণব-সাহিত্য উর্বর হয়ে ওঠে জানা-অজানা আরও বহু কবি ও গীতিকারের দ্বারা। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িককালের বা কিছু পরের যেসব কবির নাম জানা যায় তাঁরা হলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, অনন্তদাস, বংশীদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, চন্দ্রশেখর বা শশিশেখর, ঘনশ্যামদাস প্রভৃতি। নরহরি সরকার ছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ও সর্বজনবিদিত বৈষ্ণবগুরু। আর গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি কিছু পরবর্তী কালের, এঁদের মধ্যে আবার গোবিন্দদাসকেই শীর্ষস্থানীয় মনে করা হয় চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরে। তিনি ব্রজবুলিতেই অধিকাংশ পদ রচনা করেছেন। অবশ্য মৌলিকতায় জ্ঞানদাসও বড় কম যান না। তাঁর রচনা যেন লৌকিক প্রেমের জোয়ারেই তরণী বেয়ে অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমের তীরে উত্তরণ ঘটিয়ে দেয় ভাবের সাধককে। জ্ঞানদাসের রচনায় বিরহিণী রাধার এই আকুতি আজও তুলনাহীন ঃ

"রূপলাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি স্থির নাহি বাঁধে॥"

বলরামদাস ও ঘনশ্যামদাস ছিলেন গোবিন্দদাসেরই বংশের লোক। এঁদের সকলেরই রচনা শ্রীচৈতন্যের ভাব ও ভাবনায় প্রভাবিত এবং বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে এঁরাও 'মহাজন' বলে কম-বেশি স্বীকৃত।

বৈষ্ণব-সাহিত্য রচনায় শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ ও তাঁর অনুগামীরা বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', মুরারি গুপ্তের 'চৈতন্যচরিত' ও কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' খুবই সমাদৃত। তবে শেষোক্ত দুটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত (প্রথমটি কাব্য ও দ্বিতীয়টি নাটক)। এছাড়া উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে গোবিন্দদাসের 'কড়চা' (চৈতন্য-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত), জয়ানন্দ ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'। লোচনদাসের কাব্যে ভাবের প্রাচুর্যই বেশি, ঐতিহাসিক মূল্যে কম। রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' নাটক শ্রীচৈতন্যের মথুরা ও বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-লীলাতে পরিপূর্ণ। তাঁর 'উজ্জ্বল-নীলমণি' বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রে শীর্ষস্থানীয়। সনাতন গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস' শ্রীচৈতন্যের আদেশেই লিখিত বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র স্মৃতিগ্রন্থ। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী লেখেন বৈষ্ণব-সমাজের প্রসিদ্ধ দার্শনিক বিচারগ্রন্থ 'ষট্-সন্দর্ভ'। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর'-এর স্থান 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র পরেই। এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা শুধু বৈষ্ণব-সাহিত্যের নয়, প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ। এই শতকেই অর্থাৎ সপ্তদশ শতকে রচিত নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস' একটি অমূল্য ঐতিহাসিক রচনা। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেই আরও যেসব অসংখ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হয় তাদের মধ্যে হরিচরণদাসের 'অদ্বৈতচরিত', ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত-প্রকাশ', নরহরি চক্রবর্তীর 'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দ সেন) কর্তৃক লিখিত 'পদকল্পতরু' ও রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র' সমসাময়িক-কালের খুবই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এগুলি মূলতঃ বৈষ্ণব মহাজন ও গীতিকারদের লেখা বিভিন্ন পদ সংগ্রহ করে তৎসহ সংস্কৃত টীকা ও ভাষ্যসহ রচিত। বৌদ্ধ যুগের অবসানে এইসব গ্রন্থ খুবই প্রচারিত ও সমাদৃত হয়।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে অনেক মুসলমান সাধকের নাম পাওয়া যায়। এঁদের অনেকের পদাবলীও বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এঁদের মধ্যে মরমী সুফী সাধকদের কারও কারও নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্য-শিষ্য সনাতন গোস্বামীর 'ভগবৎভক্তিচরণামৃত' গ্রন্থে বৃন্দাবন-লীলার যে-বর্ণনা আছে, তাতে সুফী আসক (প্রেম) ও মাসুকের (প্রেমিকা) ভাবই পাওয়া যায়। এবিষয়ে বঙ্গে 'সুফী প্রভাব' গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৩-১৮৪) এনামুল হক লিখেছেন ঃ "বাংলা ভাবপ্রবণ দেশ।

দরবীশেরা যখন বাংলাদেশে আসিয়া ঐস্লামিক ভাবপ্রবণতার আমদানী করিলেন, তখন বাঙালীর হৃদয় সহসা খুলিয়া গেল। তাঁহারা ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। বাঙালীর নিজস্ব ভাবপ্রবণতার সহিত ঐস্লামিক ভাবপ্রবণতা মিশ্রিত হইল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৈষ্ণবভাবের কবিতায়, আউল-বাউলের উদাস সঙ্গীতে, ফকীর ও জিকির সম্প্রদায়ের ধর্মের বাণীতে বাংলাদেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।"[৩]

এনামুল হকের মতে এই সংমিশ্রণের ফলেই ঘটল বাঙালীর চিন্তার মুক্তি এবং তারই ফলশ্রুতিতে একদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের উদ্ভব, অপর একদিকে 'লৌকিক ইসলামের' জন্ম। হক সাহেব লিখেছেন: "এই সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে শাস্ত্রীয় ইসলাম কোনদিনই বিশেষ প্রভাববিস্তার করিতে পারে নাই। ফলে আঁটঘাটবাঁধা শাস্ত্রীয় ইসলামের গণ্ডির বাহিরে আনিয়া যে-সকল সুফী ইসলামের সহিত এদেশীয় চিন্তাধারার যোগ ঘটাইলেন, তাঁহারাই সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের হৃদয় অধিকার করিলেন। ইহাতে ফল হইল এই যে, বাংলার সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এমন এক প্রকারের নূতন ইসলাম জন্মলাভ করিল, যাহাকে 'লৌকিক ইসলাম' বলিয়া নাম দেওয়া যায়। বাংলার এই লৌকিক ইসলামের রূপ অতি চমৎকার ও কৌতুকাবহ। ইহাতে হিন্দুধর্ম স্থান পাইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম জায়গা করিয়া লইয়াছে, এবং আর্য অনার্য ও বৈষ্ণব-বিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে।"[৪] বস্তুতঃ বৌদ্ধযুগের অবসানে বৈষ্ণব ও সুফী প্রভাবেই বাংলার প্রধানতঃ নিরক্ষর শ্রেণীর মধ্যেই যে মর্মমুখী চিন্তার বিকাশ ঘটে তাই বাংলার 'বাউল মত'।

এই নতুন ভাবের জোয়ার বাংলার শিল্পকলা ও স্থাপত্যশিল্পেও এসেছে। শ্রীচৈতন্যের ভাব ও সাধনা অবলম্বনে অঙ্কিত মধ্যযুগের অজস্র চিত্রকলা দেশ-বিদেশের শিল্প-রসিকদের আকৃষ্ট করেছে। এবং এই সময়কার স্থাপত্যশিল্পেও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্থাপত্য-কার্যের যেসব অনন্যসাধারণ নিদর্শন রয়েছে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের উদারতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তাতে কিছুটা অবশ্যই পড়েছে। বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ্যাবিদ্ ব্রাউন এই প্রসঙ্গে বাংলার 'জোড়-বাংলো ছাতের' ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথও এই সময়কার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্থাপত্যকার্যে পারসিক গম্বুজ (dome), বাংলার ন্যুব্জ (bent) কার্নিশ ও হিন্দুস্তম্ভের (column) এক মিশ্রপদ্ধতি লক্ষ্য করেছেন

এই প্রসঙ্গে একটি করুণ বিষয়ের অবতারণা করতে হয়। তা হলো বৈষ্ণবদের 'মাথুর' পালা-কীর্তন। কৃষ্ণলীলার বিরহ-বিধুর কাহিনীর অন্তরালে বাংলার স্থাপত্যশিল্পের এক মর্মান্তিক বেদনার কথাই ধ্বনিত হয় এই পালাকীর্তনে। মধ্যযুগের এই ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন: "মুসলমানগণ আসিয়া (তুর্কী আক্রমণের কালে) দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রাজসাহী জেলায় স্কন্দগুপ্তের মহিষী যে-দেবমন্দিরগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাম্রশাসনের কবি লিখিয়াছেন, তাহারা কারুকার্যে জগতে অদ্বিতীয় ছিল, এইরূপ শতশত মন্দির শুধু স্থাপত্যশিল্প হিসাবে নহে, অন্য হিসাবেও বড় ছিল। ইহাদের আঙ্গিনায় যে কীর্তন-গান হইত, প্রত্যহ যে রাজ-ভোগ হইত, রাজা ও প্রজা একত্র হইয়া ভক্তির যে লীলা প্রকটিত করিতেন, যে-সকল পর্বত-প্রমাণ কুসুমস্তবকের স্তূপ প্রত্যহ দেবসেবার জন্য আহৃত হইত এবং বিগ্রহের অঙ্গরাগের জন্য যে বিপুল সম্ভার সমানীত হইত, শত শত ভক্তিপ্রেম ও ত্যাগের স্মৃতিজড়িত, হিন্দুর ধর্ম ও সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় যে-সকল মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য সমাহিত হইত, সেই সকল মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, বিগ্রহ-প্রস্তর রেণুতে পরিণত হইয়া ধূলির সঙ্গে মিশিয়া গেল—হিন্দুর প্রাণাধিক প্রিয় এই মন্দিরগুলির চিতাশয্যায় দাঁড়াইয়া কবি যখন গাহিলেন:

> 'কুসুম ত্যাজিয়া অলি, মহীতলে লুঠত,
> কোকিল না করতহি গান,
> মোহি যমুনা-জল, অনল সমান ভেল
> —বাঁশীস্বরে না বহে উজান,
> সখাগণ, ধেনুগণ, বেণুরব বিসরণ।'

—তখন ঐতিহাসিক দৃশ্য অধ্যাত্মসম্পদের

৩ উদ্ধৃত: বাংলার ইতিহাস—ডক্টর [illegible] দত্ত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৩, পৃঃ ১০৯ ৪ ঐ, পৃঃ ১১০

অঙ্গীয় হইল এবং 'মাথুর' শ্রোতার করুণ সুরে আঁটা হৃদয়তন্ত্রীতে বারবার ঘা দিতে লাগিল। বৈষ্ণবদের এই 'মাথুরের' পালা মর্মান্তিক পরিবেদনার সুর। এই মাথুরের মতো করুণ গান এদেশে আর কিছুই হয় নাই—ইহা জাতীয় গৌরব। কবির তীব্র ব্যথার সুরে একদিকে কৃষ্ণ-ভক্তির বন্যা, অপরদিকে রাজকীয় ঐশ্বর্যের বিলোপ-জনিত মর্মান্তিক বিলাপ।"[৫]

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সবচেয়ে বড় অবদান বোধহয় সেসময়কার সমাজচিন্তায় বিপ্লব ঘটানো এবং এরও প্রেরণামূলে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং। সমাজে এমন মানুষের অভাব নেই, যাদের ধারণা ভগবৎ-প্রেমিক হওয়া মানে কেবল চোখ বুজে ধ্যান করা, মঠে-মন্দিরে যাওয়া, দেবতার সামনে পূজার ডালি ধরে দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু অবতার-পুরুষদের জীবন-দর্শন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কেবল 'চোখ বুজে' নয়, ঈশ্বরকে 'চোখ মেলেও' ধ্যান করা যায় মানুষের মাঝেই। অর্থাৎ তাঁরা সমাজকে কোনদিনই উপেক্ষা করেন না, সমাজ-সচেতনতাই হলো অবতার-জীবনের একটা বড় দিক। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনাদর্শ তারই একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঈশ্বর-প্রেমে দরবিগলিত-অশ্রুআঁখি, মুক্ত মানুষ তিনি। কোন জাগতিক বন্ধনেই তো তাঁকে বাঁধা যায়নি। অথচ জীবপ্রেমে তিনি বাঁধা পড়ে গেলেন, বিশেষতঃ সমাজে যারা অবজ্ঞাত-অবহেলিত তাদের আলিঙ্গন করতে তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত প্রেমপ্রবাহ যেন মুক্তধারার ন্যায় ছুটত। সেই প্রেম-প্রবাহে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সব একাকার হয়ে যেত। তাঁর প্রেমের টানে তথাকথিত উচ্চবর্ণদের সাথে এক-ঠাঁই হয়েছিল কামার, কুমোর, জেলে, মালা, মুচি প্রভৃতি কত সম্প্রদায়েরই না মানুষ। তাঁর প্রেমের ছোঁয়া লেগেছিল আদিবাসী-উপজাতিদেরও। রক্ষণশীল সমাজের জাতপাতের বেড়া তিনি 'হরিনামের' দ্বারাই ভেঙেছিলেন। নির্ভয়ে প্রচার করেছিলেন—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" অর্থাৎ চণ্ডালের হরিভক্তি হলে সে ব্রাহ্মণের চেয়েও বড়। একেই তো বলে সামাজিক বিপ্লব। এই কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক নিত্যানন্দ—তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্ষদ। সাহস ছিল বটে নিত্যানন্দের! পানিহাটিতে একদিন চার বর্ণের লোককে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে 'চিড়াভোগ' খাওয়ালেন আর এই ভাবেই জাতপাতের মূলে করলেন কুঠারাঘাত।

দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীচৈতন্য-অবদানের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদারতার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের বর্ণাশ্রম ছিল না, ছিল না স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বা জাতপাতের বালাই। উচ্চবর্ণের অত্যাচারে কোণঠাসা সাধারণ মানুষ সহজেই এই নবীন ধর্মের দিকে ঝুঁকল। হীনবল বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরাও ঠাঁই পেল শ্রীচৈতন্য-ধর্মে। এই অসহায় ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা একসময় বাংলাদেশে নেড়া-নেড়ী নামেও পরিচিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ নিত্যানন্দ এঁদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে উদ্ধার করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের আকর্ষণীয় মন্তব্য: "বৈষ্ণব-সমাজের উপর সমস্ত বাংলাদেশটার উপর—চৈতন্যের যে প্রভাব তাহার তুলনা নাই। নিত্যানন্দ পুরীতে আসিলেই চৈতন্য সঙ্গোপনে এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাঁহাকে সমাজ-সংশোধনের উপদেশ দিতেন ('চৈতন্যভাগবত')। তিনি জানিতেন নিত্যানন্দের ন্যায় সর্বজাতির প্রতি সমদর্শী, উদারহৃদয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণসমাজে আর দ্বিতীয়টি নাই। এই জন্য জাতিভেদের উৎকট বৈষম্য দূর করিয়া উদার বৈষ্ণব-সমাজের দ্বার উন্মুক্ত করিবার ভার নিত্যানন্দের উপর দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ও তাঁহার পুত্র বীরভদ্র খড়দহে বসিয়া পতিতদিগকে যে স্নেহ-মধুর আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ১২০০ নেড়া (মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু) ও ১৩০০ নেড়ী (উক্তরূপ বৌদ্ধ ভিক্ষুণী) সাগ্রহে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয় করিয়াছিল।…বহু বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু নিত্যানন্দের প্রসারিত ভুজাশ্রিত হইয়া বৌদ্ধ জনসাধারণ সাধারণ বৈষ্ণব-মত অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজের গণ্ডিতে স্থানলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।"[৬]

এইভাবে সমাজ থেকে জাতপাতের বেড়া না হয় উঠে গিয়েছিল, কিন্তু ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য? শ্রীচৈতন্যের কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু তিনি যে সমাজের অনেক

৫ বৃহৎ বঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন, ২য় খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪২, পৃঃ ৯৯৭ ৬ ঐ, পৃঃ ৭৩৬

ধনীলোককে কাছে টেনে ফকির করেছিলেন আর তাদের অর্থ বিলিয়ে দিতে বলেছিলেন দেশের গরিব-দুঃখী মানুষকে তা তো আমাদের জানা। বার্ষিক বিশ লক্ষ টাকা আয়ের মালিক জমিদার রঘুনাথকে পুরীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করিয়েছেন। রাজমহেন্দ্রীর রাজ্যপাল রায় রামানন্দকে কৃষ্ণপ্রেমের টানে পথে নামিয়েছেন। গৌড়ের নবাব হোসেন শাহের মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ রূপ ও সনাতন সর্বস্ব ত্যাগ করে ছুটে এসেছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমের টানে। এইভাবে ধনীদের তিনি করলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, আর দরিদ্রদের নিলেন বুকে টেনে। তাই দেখি তাঁর প্রেমের অঙ্গনে একদিক থেকে যেমন এলেন প্রভৃত সম্পদশালী ব্যক্তিরা, তেমনি অন্যদিক থেকে এলেন কুটীরবাসী খোলা-বেচা শ্রীধর, জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত ভিখারী শুক্লাম্বর প্রভৃতি। সব মিলিয়ে এ যেন এক মহামিলনেরই মেলা—যাতে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের গণ্ডি নেই, নেই কোন জাতপাতের বালাই।

তাই একথা বলতে আজ আর কোন বাধা নেই যে, শ্রীচৈতন্যদেবের 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' ছিল সে-যুগের গণজাগরণ ও ব্যক্তি-মুক্তিরই একটি স্লোগান। এর দ্বারা তিনি সমাজের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। কেবল ধর্ম-আন্দোলনে নয়, সে-যুগের সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন এবং ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাব যুগান্তর এনেছিল। আসলে শ্রীচৈতন্যের সেই প্রেমধর্মে মানুষ আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। মানুষের অধ্যাত্মচেতনা ও সমাজচেতনার অবরুদ্ধ দ্বার তিনি উন্মুক্ত করেছিলেন তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারাই। নারীর স্বাধিকারও স্বীকৃতি পেয়েছিল তাঁর এই ধর্মের মধ্য দিয়েই। প্রচলিত হয়েছিল অসবর্ণ বিবাহ। 'জল অচল' বলে সেখানে কেউ উপেক্ষিত ও অনাদৃত নয়। শ্রীচৈতন্যের বিপ্লবাত্মক এই সমাজচিন্তাকে যিনি কার্যকরী করেছিলেন সেই নিত্যানন্দকে আমাদের দেশের প্রথম 'ডেমোক্র্যাট' বলেছেন মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। আর আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বা 'ডায়লেকটিক' ব্যাখ্যায় অদ্বিতীয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীচৈতন্যযুগকে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান বা গণ-বিপ্লবের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে ঃ "বাংলায় মুসলমান শাসনকালের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান হইতেছে—চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থান। মুসলমান বিজয়ের পর চতুর্দশ শতাব্দী হইতে উভয় ধর্মের ভাবের সম্মিলনে নব বৈষ্ণবধর্মের ও সংস্কারক সম্প্রদায়মণ্ডলীর ('সন্ত'-আন্দোলনসমূহের) উত্থান হয়। বাংলায় সেই তরঙ্গের প্রতিধ্বনি আসিয়া গৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত ধর্মরূপে বিস্তৃতি লাভ করে। এই ধর্মের উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলমানকে এক প্রেম-ধর্মে একত্রিত করা ('ব্রাহ্মণে যবনে মিলি করিতেছে কোলাকুলি; / পরস্তেকে চাহ একবার'—দীন কৃষ্ণদাস)। পুনঃ এই ধর্মে বর্ণবিভেদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করে ('জাতির বিচার নেই বৈষ্ণব বর্ণনে'—দেবকীনন্দন, বৈষ্ণব-বন্দনা)। বৈষ্ণবধর্মে প্রথম যুগে মুসলমান ভক্তদের গ্রহণ করা হয় এবং তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় লোক ঝড়ু ঠাকুর সকলের সম্মান পান।"[৭]

বিকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেও সমাজে তখন নানা অনাচার চলছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কাছে প্রথম ধাক্কা খেল তথাকথিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা। সে ধাক্কায় তাদের অনাচারের সহায় অনেক ভয়ঙ্কর দেবদেবীই সমাজ থেকে অন্তর্হিত হলেন। তান্ত্রিকেরা পরাভূত হলে ধর্মের নামে উদ্ভূত নানা 'মিরাকল' বা ইন্দ্রজালবিদ্যার প্রতিও লোকের আগ্রহ কমে এল। এরপর থেকে অনেক ধর্মান্তরিত বৌদ্ধেরাও বৈষ্ণবমতাবলম্বী হলেন। অনেকে আবার রাজার অনুগ্রহ লাভ বা অত্যাচারের ভয়েও বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয়গ্রহণ করেন (অবশ্য এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে)। উড়িষ্যার পুরী ও কটক জেলার মরাকী ও রাঢ়ের তাঁতিদের 'প্রচ্ছন্ন' বৌদ্ধ বলে অনেকের ধারণা। এমনকি বৈষ্ণবধর্মের কয়েকজন বড় সাধকও অন্তর থেকে একেবারে বৌদ্ধসংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি আজীবন। শোনা যায়, এঁরা উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, অচ্যুতানন্দ, বলরামদাস, চৈতন্যদাস—এমনি সব উচ্চস্তরের সাধকরাও

৭ ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় খণ্ড, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃঃ ২২৩

ছিলেন একদা বৌদ্ধমতাবলম্বী।

শ্রীচৈতন্য-আন্দোলনের এই ঢেউ অন্তঃপুরেও প্রবেশ করেছিল। অন্তঃপুরবাসিনী কুলবধূরাও কখনো কখনো প্রকাশ্য সঙ্কীর্তনে যোগ দিতেন—"সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি" (বলরাম-দাস)। অনেক মহিলা আবার প্রতি বছর রথযাত্রার সময় হাঁটাপথে বহু কষ্ট করে পুরী যেতেন শ্রীচৈতন্য-দেবকে দর্শন করতে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে উন্নত স্তরের সাধিকাও হয়েছিলেন।

সুতরাং ইতিহাসের যে-কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা দেখি না কেন, আজ একথা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে, মধ্যযুগের কেবল ধর্ম-আন্দোলনে নয়, সেযুগের সমাজজীবনের পট-ভূমিকাতেও শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবকে মধ্যযুগের এক মহান 'জাতীয়তাবাদী নেতা' (আধুনিক সংজ্ঞায়) বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। কারণ, তিনি নিজেও বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। যেমন বাঙলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উড়িয়া, পালি, প্রাকৃত, আরবী, পারসী, মৈথিলী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম প্রভৃতি। তাঁর প্রেমের টানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এইসব ভাষাভাষী কত মানুষই না এসেছিলেন। কাজেই সেসময় ভারতের 'জাতীয় সংহতি'র তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। কেবল কথায় নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি পায়ে হেঁটে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জানা-অজানা বহু মানুষই তাঁর প্রেমধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শ্রীচৈতন্যকে বলেছেন—'ভারত-পথিক'। সেই অর্থে রামমোহন, কবীর, দাদু, নানক, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দও 'ভারতপথিক'। জন্ম এঁদের যে-প্রান্তেই হোক না কেন, কোন আঞ্চলিক অভিধায় এঁদের চিহ্নিত করা চলে না। ধর্ম ও সম্প্রদায় নিয়ে আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বহু ঊর্ধ্বে বিরাজিত এঁদের ধ্যান-ধারণা। শ্রীচৈতন্যের ধ্যানধারণাও সারা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিশেষ করে সংহতির এক সার্থক রূপকার তিনি। □

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির (মাঝে)। পিছনে—বিষ্ণুমন্দির/গোবিন্দজীর মন্দির/রাধাকান্ত-মন্দির। সামনে—কালীমন্দিরের নাটমন্দির; এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মথুরবাবুকে অনুরোধ করে পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় তিনি বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সমকালীন অগ্রগণ্য সাধক ও পণ্ডিতদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। বিচারসভায় সমবেত সাধক ও পণ্ডিতবর্গ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধাত শিরোধার্য করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দিরের (দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছবি অবশ্য প্রচ্ছদে নেই।) অবস্থান বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু হিন্দুদের দিক থেকেই নয়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের দিক থেকেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি তাৎপর্য রয়েছে। মন্দিরের জমির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, বাকি অংশের অনেকটা জুড়ে ছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী সাহেবের পীরের দরগা। এই যোগাযোগ যেন দৈবনির্দিষ্ট। কারণ, এই ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে যুগাবতার মহাসমন্বয়ের উদার বাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। এই বাণীই আজ শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে। দেশ ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মত ও পথের অসহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে এই বক্তব্য আমরা তুলে ধরতে চাইছি।—**যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন**

বুদ্ধপূর্ণিমায়

সরিৎশেখর মজুমদার

সন্ধ্যারাত। তৃণশায়ী আমি তরুতলে।
আকাশের নীলাভ উদ্ভাস :
আজ লগ্ন বুদ্ধপূর্ণিমা!
চেয়ে দেখি, পূর্ণচন্দ্র!
মুণ্ডিতশির, যেন সন্ন্যাসী পরণে চীবর ;
বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ।
আভূমি-আকাশ জুড়ে
প্রেম-জোছনার মাখামাখি।
—কোথায় প্রণাম রাখি
সে-দ্বিধার হলো নিরসন ;
হে ভিখারি! তোমাকে প্রণাম।
জন্মসূত্রে রাজসিক ;
স্বেচ্ছায় ঘর-ছাড়া
জন্ম-মৃত্যু-জরা জিজ্ঞাসায়।
আত্মস্থ সূর্যতেজ,
ধরেছ করুণাঘন পরিপূর্ণ
স্নিগ্ধ চন্দ্ররূপ।
নিরাসক্ত হে মহাসম্রাট!
'হৃদয়' সাম্রাজ্য যার তার আবার
ভৌগোলিক সীমা?
আকাশের সিংহাসনে
ধ্যানগম্ভীর তুমি—
যেন বসে মৃগদাভে
মৈত্রী-করুণার মুদ্রায়।
বলাকার স্নিগ্ধসৌম্য
শ্রমণের সারি
কলকণ্ঠে পারমিতা-গীতি।
সেই সুর,—ত্রিশরণ ধ্বনি!
তৃণশায়ী আমি ভিক্ষু
শরণার্থী তব সঙ্ঘারামে!

বৃক্ষমূলে

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

মাথার ওপরে খড়্গ দোলে
চারপাশে অগ্নি-আয়োজন।
শীতলতাস্নিগ্ধ গুহামুখ
এখনও রয়েছে বন্ধ। যদি
অভিঘাত দাও ঘণ্টা থেকে
ইচ্ছা থেকে খর প্রতিধ্বনি
তোল, যদি খোলে বন্ধ দ্বার
যদি জাগে অন্ধকার থেকে
কল্পগাছ, শাখা মেলে বলে—
'তোমার চৈতন্য হোক'—তবে
হবে না প্রণত বৃক্ষমূলে?

মানসী বরাট

আলো-ঝলমল-নীল-নির্মল,
বোশেখী-পূর্ণিমাতে,
কে গো এলে তুমি
হে মহাভিক্ষু—ভিক্ষাপাত্র হাতে॥

রাজার কুমার ছাড়ি রাজবেশ,
বাহিরিলে পথে মুণ্ডিতকেশ,
শূন্যপাত্রে ভরে কৃপাসুধা
মিটালে আর্ত ধরণীর ক্ষুধা॥

কহিলে উদার কম্বুকণ্ঠে,
'এসেছি গো আমি এসেছি,
যুগে যুগে ওগো আর্ত-মানব,
তোমাদেরই ভালবেসেছি॥'

জ্ঞান, কৃপা আর করুণা আধার,
অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ,
আপনা বিলায়ে হলে নিঃশেষ,
তুমি অমিতাভ বুদ্ধ॥

পবিত্র বিস্ময়

শিবসৌম্য বিশ্বাস

মাঝে মাঝে তোমার কথা মনে পড়ে,
মাঝে মাঝে
সহসা শরীরে জেগে ওঠে খুশির তরঙ্গ,
জেগে ওঠে অন্তর থেকে
শান্ত স্নিগ্ধ সিন্ধুর নিঃশব্দ উচ্চারণ ;
শিহরিত হয়ে ওঠে মনের গভীর সত্তা,
দোলা খায় ঈড়া-পিঙ্গলার সুরে,
কোথায় আমার সেই শুদ্ধসত্ত্ব রূপ—
পরিপূর্ণ জীবনের প্রকাশ ?
এই মরজীবনের অব্যক্ত বন্ধনে
রাত্রিদিন যন্ত্রণার অবসানে
ক্বচিৎ কখনো আলোর পাখি মেলে দেয়
তার বলিষ্ঠ দুটি ডানা—
উড়ে চলার পথে আমায় সে নিয়ে চলে ;
উড়ে চলি—
আমিও উড়ে চলি জীবনের শাশ্বত আকাশে,
সম্মুখে পবিত্র বিস্ময় !

ক্ষণিকা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

সৃষ্টি আর প্রলয়ের উত্তাল তরঙ্গ-মাঝে
ছোট এক সেতু।
স্থিতি তার নাম।
বাসা-খুঁজে-ফেরা পাখি সন্ধানী চোখ মেলে
চেয়ে থাকে উৎকণ্ঠ ব্যাকুল—
অশান্ত সন্ধ্যায় শুধু বাঁচার আশ্রয়,
আশ্বাসের নীড় নয়,
নয় কোন সাধের আলয়।

নির্বোধই শুধু শান্তির কথা ভাবে ;
ঝড়ের রাতে কি সুখের প্রদীপ জ্বলে ?
পাখির ধর্ম গতি, সীমাহীন গতি,
ওড়া আর ওড়া, শুধু আকাশেতে ওড়া,
স্থিতির বাঁধনে সেতুবন্ধন নয় ;
ক্ষণ-যতি, শুধু ক্ষণিক বিরতি চাই ;
স্থিতিতে কাটিয়ে রাতের প্রহরগুলি
সোনালী সকালে আবার ওড়ার পালা।

অভ্যুদয়

নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

ভেঙে দাও, ওগো ভেঙে দাও সংশয়
'জীর্ণ হউক যত বাধা যত ক্ষয়।
অন্ধকারার পাষাণ দুয়ার
এবারের মতো ভাঙুক আবার
বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও আমার
অন্তর-নির্ভয়।
নয়ন মেলিতে তোমার উদয়
পলক ফেলিতে এ কী বিস্ময়—
কানে কানে কও মরণে আমার
হবে না চির-বিদায়,
আমারে যতো না দুঃখ দহিবে
শতগুণ তার তুমি যে সহিবে
তোমার সঙ্গে কাঁদিবে আমার
সকল দৈন্য দায়!
খুলিবে দুয়ার, বাজিবে ডঙ্ক,
আসিবে তরুণী উষসী
অঙ্গনতলে ফুকারি' শঙ্খ
দাঁড়াবে হে মহা তাপসী।
তুমি ধীরে, অতি ধীরে,
প্রাণ-সরসীর তীরে
গুন্ঠন মোর উন্মোচি' যাবে
ছড়ায়ে বিশ্বময়।
নন্দিত হবে পরমধন্য
অনন্য অভ্যুদয়॥

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আলোয়ারে শ্রীবিবেকানন্দ

শ্রীশ্রমণক

[পূর্বানুবৃত্তি]

'শ্রীশ্রমণক' স্পষ্টতঃ প্রবন্ধ-রচয়িতার ছদ্মনাম। মনে হয়, প্রবন্ধটি তৎকালীন উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দের লেখা। শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের নেপথ্যে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এবছর স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ-পূর্তি হচ্ছে। সেকথা স্মরণ রেখে এই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে।

যুগ্ম সম্পাদক

ভোজনান্তে স্বামীজী বাহিরে আসিয়া দেখেন, নিকটস্থ পল্লীর লোকেরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে পুনরায় পূর্বের মতো জনতা হইল এবং সেই প্রাণস্পর্শী কথার প্রস্রবণও ছুটিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেনঃ "মহাসাম্যবাদ আমাদের দেশে চিরকালই বর্তমান। সেই সাম্যবাদ আকবর বাদশার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল; তাই তিনি প্রতি বুধবার একটি ধর্মসভা করিয়া হিন্দু মুসলমান পার্শী (জোরোয়াস্ট্রিয়ন) খ্রীস্টিয়ান সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে একত্র করিয়া পরস্পরের মধ্যে তত্ত্ববিচার করিতে বলিতেন, আর আপনি সেই বিচারের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেন। কখনও বা তর্কে পরস্পরের মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হইত। বাদশা এই সময়ে নিজে তাঁহাদের মধ্যস্থ হইয়া কলহ নিবারণ করিতেন। সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য অনেক হিন্দু ধর্মশাস্ত্র তখনকার রাজভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। একদিন বাদশার মাতাঠাকুরানী শুনিলেন যে, খ্রীস্টীয় দেশে কোন ব্যক্তি একখানি কোরান একটা কুক্কুরের গলদেশে বাঁধিয়া তাহাকে নগর পর্যটন করাইয়াছে। সম্রাজ্ঞী তাঁহার ধর্মশাস্ত্রের এইরূপ অবমাননার প্রতিশোধ নিবার জন্য তাঁহার উপযুক্ত পুত্রকে ডাকাইয়া খ্রীস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের তদ্রূপ অবমাননা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। বাদশা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, একজন মূর্খ ব্যক্তি আমাদের ধর্মশাস্ত্রের অবমাননা করিয়াছে বলিয়া আকবর বাদশার মাতার সেইরূপ নীচানুষ্ঠান করা উচিত নহে। আমার ধর্ম আমার কাছে যেরূপ আদর ও পূজার বস্তু, তেমনি অন্যের কাছে তাহার নিজের ধর্মও আদরের ও পূজার বস্তু। সে মূর্খ, একথা বুঝে না, তাই এরূপ অসদনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু একথা যে বুঝিয়াছে, সে কেমন করিয়া ঐরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইবে? সম্রাজ্ঞী পুত্রের মহৎ বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আকবরকে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে জিদ করিতে লাগিলেন। বাদশা অবশেষে কহিলেনঃ 'মা, আমি আপনার আজ্ঞা কখনও অবহেলা করি নাই। কিন্তু আজ তাহা আপনিই করাইলেন; প্রাণ থাকিতে কোনও ধর্মের অবমাননা আমার দ্বারা ঘটিবে না।'

"তাইঃ—

'সবসে বসিয়ে, সবসে রসিয়ে
সবকা লিজিয়ে নাম।
হাঁ জী হাঁ জী করতে রহিয়ে
বৈঠিয়ে আপনা ঠাম ॥'

"অর্থাৎ, আপনার ইষ্টে নিষ্ঠা রাখিয়া, আপনার ধর্মে দৃঢ় হইয়া সকলের সহিত রসালাপ করা ভাল, কারণ সকল ধর্মই সত্য, সকল ধর্মই সেই শ্রীভগবানে পৌঁছিবার পথ। কিন্তু আপনার ধর্ম ভালরূপে না বুঝিয়া অন্য ধর্মের চর্চা করিলে তাহাতে কুফল ব্যতীত সুফল ফলে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রথমে আপনার ধর্ম সাধন করেন, তৎপরে অন্যান্য ধর্ম সাধনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সকল ধর্মের উদ্দেশ্য সেই এক ঈশ্বর লাভ।"

স্বামীজী প্রতিদিন বৈকালে যখন ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখনও তাঁহার সঙ্গে অন্ততঃ দশ-বারো জন লোক থাকিতেন। ইতস্ততঃ পদচারণ করিয়া সকলে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিতেন। সন্ধ্যার

পর সকলেই স্ব স্ব কার্য হইতে অবসর পাইয়াছেন, সুতরাং এই সময়ে জনতা আরও বেশি। স্বামীজী আসিয়া গান ধরিলেন—বাঙ্গালা কীর্তন ; সকলকে তাঁহার সহিত যোগ দিয়া গাহিতে কহিলেন। দুই-চারি দিন এইরূপ করিবার পর সকলে তাঁহার সহিত সমস্বরে বেশ বাঙ্গালা কীর্তন করিতে পারিতেন, মধ্যে মধ্যে নৃত্যও হইত। রাজপুতানা বৈষ্ণব প্রধান স্থান, কৃষ্ণ-বিষয়ক গান সকলের অত্যন্ত ভাল লাগে, তাই স্বামীজী একদিন গাহিলেন,—

"(আমি) গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিয়ে
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যথায় নিঠুর হরি ॥
আমি মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
যদি কোন ঘরে মিলে প্রাণবঁধু
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে ॥
আমি আপন বঁধুয়া আপনি বাঁধিব
রাখিতে নারিবে কেউ রে।
যদি রাখে কেউ ত্যজিব এ জীউ
নারী বধ দিব তারে ॥"

স্বামীজী গানটি বুঝাইয়া দিয়া তৎপরে গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে দরবিগলিত অশ্রু-ধারায় সর্বাঙ্গ সিক্ত হইল। সকলেরই চক্ষে জল, দৃষ্টি সেই মহাপুরুষের প্রতি ; কেহ ভাবিতেছেন বাবাজী বৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন পাইতেছেন, তাই এত বিভোর, এত প্রেম ! নতুবা আমরাও তাঁহাকে ডাকি, কিন্তু আমাদের তো এরূপ তন্ময়তা জন্মায় না। কেহ বা ভাবিতেছেন,—এইটুকু ঈশ্বরের বিভূতি, ইনি ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন। গান গাহিতে গাহিতে স্বামীজীর স্বর করুণ হইতেও করুণতর হইয়া আসিল, হৃদয়ের আবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, শরীর স্থাণুবৎ স্থির, মুখমণ্ডল পতিপ্রাণা রমণীর মতো, যেন প্রাণবঁধুর পরশে প্রেমে উৎফুল্ল।

কৃষ্ণ-বিষয়ক গানগুলি সকলের এতই ভাল লাগিত যে, অদ্যাপি কেহ কেহ তাহার দুই-একটি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, কেহ বা বিস্মৃতি ভয়ে লিখিয়া রাখিয়াছেন। ক্রমে রাত্রি এগারোটা কখন বা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এইরূপ আনন্দ চলিত। সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, কেহই বুঝিতে পারিতেন না। রাত্রের মতো বিদায় লইয়া সকলে চলিয়া যাইবার সময় পথে সকলেরই মুখে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা। কেহ বা বলিলেন : "বাবাজী কি আনন্দপূর্ণ লোক, মুখে হাসি লেগেই আছে।" আর একজন কহিতেছেন : "মশাই, এমন সুন্দর শ্লোকপাঠ আর কাহার মুখে শুনিনি।" অন্য এক ব্যক্তি কহিতেছেন : "স্বামীজীর কণ্ঠে 'নাদ' আছে। আর দেখেছেন, এত লোকে এঁত বিরক্ত করে, তা রাগ নেই, কত আহাম্মকের মতো যা তা জিজ্ঞাসা করছে ; সব কথার জবাব দিচ্ছেন। আমি হলে তো মশাই চটে যাই।" আর একজন কহিলেন : "রাগ টাগ নেই, সিদ্ধ পুরুষ। নইলে দেখুন না আবার কতক্ষণে তাঁর কাছে যাব মনে হয়।"

বঙ্গদেশের নগরের সহিত তুলনায় রাজপুতানার নগরসমূহে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। তথাকার পল্লীগ্রামে ইংরেজী শিক্ষিত লোক প্রায় নাই বলিলেও চলে, তবে যে দুই-একজন দৃষ্ট হয়, তাঁহারা কোন রাজকীয় কর্মচারী। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সংখ্যাও অতি অল্প। আলোয়ার রাজধানীতে যে-দুইজন আছেন, তাঁহারা সকলেই স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিয়া তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। স্বামীজীর কিন্তু আদর-যত্ন মূর্খ দরিদ্রের প্রতি বেশি অথচ প্রত্যেকেই মনে করেন যে, তিনিই স্বামীজীর অতিশয় প্রিয়পাত্র।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পর পূর্বোক্ত মৌলভী মহাশয়ের আপন বাটীতে ভিক্ষা করাইবার প্রবল বাসনা জন্মিল। ভাবিলেন, "স্বামীজী দরবেশ, তাঁহার জাত ফাত নেই ; তবে পণ্ডিতজীর বাড়িতে আছেন বলে পণ্ডিতজীর যদি কোন আপত্তি হয়।" ইহা ভাবিয়া প্রতিদিন যেমন স্বামীজীকে দর্শন করিতে যান এইরূপ একদিন সন্ধ্যার সময় যাইলেন।*

[ক্রমশঃ]

* উদ্বোধন, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩১৩, পৃঃ ৩০৭

মধু বৃন্দাবনে
স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীগোবিন্দজীর বিগ্রহকে প্রণাম করে উঠতে বাবাজী আমাকে এই মন্দিরের নাটমন্দিরের বাঁদিকে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গিয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে একটু ওপরে উঠে আবার অন্যদিক দিয়ে মাটির নিচে নামতে লাগলেন। দশ-বারোটা ধাপ নিচে নেমে একটা প্রায় অন্ধকার ছোট কুঠুরিতে গিয়ে আমরা পৌঁছালাম। হামাগুড়ি দিয়ে বসে ক্ষীণ দীপালোকে দেখলাম—সেই গর্ভ-গৃহে একটি ছোট শ্বেতপাথরের বেদিতে অষ্টভুজা সিংহবাহিনী দেবী যোগমায়ার খোদাই করা বিগ্রহ। নিচে দুটি ছোট চরণচিহ্নও দেখা গেল। বাবাজী ও স্থানীয় এক পাণ্ডা এই স্থানটিকে 'যোগপীঠ' বলে নির্দেশ করে বললেন, এখানেই শ্রীগোবিন্দজী প্রকট হয়েছিলেন। এই পবিত্র পীঠে প্রণাম জানিয়ে ওপরে উঠে এসে সামনেই মন্দিরের বর্তমান পূজারীদের দেখা পাওয়া গেল। তাঁরা বললেন, এই মন্দিরটি দিল্লীর সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে তৈরি করিয়ে দিয়ে-ছিলেন। তার সাক্ষী হিসাবে দেখিয়ে দিলেন মন্দিরের উত্তর দেওয়ালে একটি প্রাচীন শিলালিপি। লালসিন্দুর দিয়ে সেটি ঢেকে দিলেও দেবনাগরী অক্ষরগুলি বোঝা যায়। তাতে লেখা আছে—আকবর বাদশাহের ৩৪ রাজ্যাব্দে পৃথ্বীরাজাধি-রাজ-বংশীয় শ্রীভগবন্তদাস-পুত্র শ্রীমানসিংহদেব শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠস্থানে এই মন্দির নির্মাণ করেন। আকবরের ৩৪ রাজ্যাব্দ মানে ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দ, অর্থাৎ রূপ গোস্বামীর দেহত্যাগের ২৭ বছর পর এই মন্দির তৈরি হয়। রূপ ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দে অপ্রকট হন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এই মন্দির হওয়ার আগে এখানেই আশেপাশে কোথাও কোন ছোট মন্দিরে এই বিগ্রহ রূপ গোস্বামীর সেবা গ্রহণ করতেন। যাইহোক, এই মন্দির তৈরি হয় আগা-গোড়া জয়পুরী লালপাথরে। এই পাথর আকবর বিনামূল্যে দেন। মন্দির তৈরি করতে সে-যুগে খরচ পড়েছিল তেরো লক্ষ টাকা। মন্দিরের ভিতরে ও গর্ভমন্দিরের দরজার ডানদিকে আরও দুটি শিলা-লিপি দেখালেন বাবাজী। একটিতে সংস্কৃতে পাঁচটি শ্লোক আছে। এতে বৃন্দাবন ও আকবর বাদশার প্রশস্তি আছে। মূল বিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হয় মুসলমান আক্রমণের সময়। সেই শূন্যস্থানে একটি গিরিধারী বিগ্রহ ও নিতাই-গৌর মূর্তি শোভা পাচ্ছে। বিশাল নাটমন্দির। নাটমন্দিরের ওপরে তিনদিকে বারান্দা দেওয়া। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে সেখান থেকে সম্ভ্রান্ত রমণীরা নাটমন্দিরের নৃত্য-গীতাদি অনুষ্ঠান দেখতেন। নাটমন্দির পূর্ব-পশ্চিমে ১১৭ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ১০৫ ফুট। মধ্যযুগের হিন্দু-স্থাপত্যের এটি অনুপম নিদর্শন।

প্রাচীনকালে এই মন্দির পঞ্চচূড়া সমন্বিত ছিল। জনশ্রুতি, ঔরঙ্গজেব আগ্রা থেকে এই মন্দির-শীর্ষের বাতি দেখে এই মন্দির ধ্বংস করার আদেশ দেন। ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দের রমজান মাসে মথুরা-ধ্বংসের সাথে এই মন্দিরও বিধ্বস্ত হয়। মুসলমানেরা আসছে—এই খবর পেয়ে পুরোহিতেরা ব্রজের বেশির ভাগ প্রাচীন বিগ্রহগুলিই রাজস্থানের নানা স্থানে সরিয়ে ফেলেন। ফলে বৃন্দাবনের প্রাচীন বিগ্রহ-গুলি নষ্ট হতে পারেনি। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাদামোদর, রাধাবল্লভ, বৃন্দাদেবী সবাই স্থানান্তরিত হন। কিন্তু বিপদ কেটে গেলেও তাঁদের আর ফিরিয়ে আনা যায়নি। একমাত্র বাঁকে-বিহারীজী—রাধারমণ ও রাধাবল্লভের বিগ্রহগুলি পুরোহিতেরা সরিয়ে না নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে-ছিলেন নিজেদের বাড়িতে। তাই এই তিনটি প্রাচীন বিগ্রহই বর্তমানে বৃন্দাবনে আছেন। গোবিন্দজীর

এই মন্দির ছাড়া মদনমোহন, গোপীনাথ, যুগল-কিশোর ও রাধাবল্লভের মন্দিরও মুসলমান আমলে ধ্বংস হয়। এইসব মন্দিরগুলিই জয়পুরী লাল-পাথরের অপূর্ব কারুকার্য করা ছিল। এখনো বাকি তিনটি মন্দিরের কিছু কিছু অংশ যা অবশিষ্ট আছে, তা দেখে বোঝা যায় কি অদ্ভুত শিল্প-প্রতিভা ছিল তখনকার শিল্পীদের। এই মন্দির-গুলিই ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে আকবরশাহ বৃন্দাবনে এসে এখানকার বৈষ্ণব বাবাজীদের দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে নির্মাণ করার অনুমতি দেওয়ার পরে বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয়েছিল। তার একশো বছর পরে ঔরঙ্গজেবের আমলে সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ধীরে ধীরে এইসব কথা বলতে বলতে বাবাজী বাইরে এলেন। মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়ে বাইরের কারুকার্য দেখিয়ে যোগপীঠের ঠিক বিপরীতে মূল মন্দিরের সংলগ্ন উত্তরদিকে আর একটি ছোট মন্দির দেখিয়ে বাবাজী বললেনঃ "এটি ছিল বৃন্দাদেবীর মন্দির। রূপজী বৃন্দাবনের ব্রহ্মকুণ্ড থেকে বৃন্দাদেবীকে প্রকট করিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মুসলমান আমলে তিনিও চলে গিয়ে এখন কাম্যবনে বিরাজ করছেন। একদিকে যোগপীঠ অন্যদিকে বৃন্দাদেবী আর মূল মন্দিরের মাঝখানে শ্রীগোবিন্দজী বিরাজ করতেন। সেই আমলে শ্রীরাধা ছিলেন না। রূপ তাঁর গোবিন্দ-প্রাপ্তির পরে তাঁর সেবাভার হরিদাস গোস্বামী নামে এক ভক্ত বৈষ্ণবের ওপর দিয়ে নিজে কখনো এখানে, কখনো জীব গোস্বামীর কাছে, কখনো বা রাধাকুণ্ডের তীরে রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে থেকে ভক্তিগ্রন্থ রচনা ও ভজনাদি করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও কাব্যরচনার তুলনা ছিল না। তাঁর নিজের রচনা বলে ষোলখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'শ্রীহংসদূতকাব্য', 'শ্রীমৎ উদ্ধবসন্দেশ, 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব', 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি', 'দানলীলা-কৌমুদী', 'মথুরামহিমা', 'শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিবিধি', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।"

বাবাজী জানালেন, যে-গীতটি গাইতে গাইতে রূপ এই মন্দিরে এসেছিলেন, সেটিও ছিল তাঁরই রচনা। বাবাজী বললেন, শুনলেই বোঝা যায় যে, ভজনটি খুবই প্রাচীন ও অপ্রচলিত।

সনাতন ও রূপের বৃন্দাবন-বাসের জীবন সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতে আছে ঃ

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ,
এক-এক বৃক্ষতলে এক-এক রাত্রি শয়ন,
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী,
শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি।
কাঁরো বা মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া বহির্বাস
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনামে নর্তন উল্লাস।
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে,
নাম-সংকীর্তন প্রেমে, সেও নহে কোনদিনে।
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন,
চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন॥"

প্রাচীন মন্দিরে প্রণাম করে বেরিয়ে এসে বাবাজী নিয়ে এলেন নতুন বহড়ুর মন্দিরে। সাধারণ দালানের মতো এই মন্দিরটি ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলা-দেশের জমিদার নন্দকুমার বসু তৈরি করেছেন। এই নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিভু বিগ্রহ ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তবে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে সেই বিগ্রহ দৈবক্রমে ভেঙে যাওয়ায় বর্তমান বিগ্রহ সেখানে আসন গ্রহণ করেন। শোনা যায়, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম আদি গোবিন্দজী ও রাধারানীর বিগ্রহ শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথধাম থেকে পাঠিয়েছিলেন।

এই মন্দিরে এখন পাঁচবার ভোগ ও সাতবার আরতি হয়। পূজারীরা সবাই বঙ্গদেশীয় আর সেবার তত্ত্বাবধানে এখনো জয়পুরের রাজবংশেরই কর্তৃত্ব প্রচলিত। শ্রীরূপ তাঁর অপরূপ শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ঃ

"স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণ দৃষ্টিম্।
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়মুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ॥
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশীতীর্থোপকণ্ঠে।
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥"

—হে বন্ধু! যদি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে জাগতিক বিষয়ভোগে তোমার বাসনা থাকে, তবে কেশীঘাটের কাছে মুখে বাঁকা হাসি, ত্রিভঙ্গ বিগ্রহ, বাঁদিকে একটু

বঙ্কিমদৃষ্টি, মুখপঙ্কজ কিশলয়ে বিরাজিত মধুর মুরলী ও শিখিপুচ্ছ শোভিত অপরূপ শোভামণ্ডিত ঐ শ্রীগোবিন্দের মূর্তি কখনো দর্শন করো না।

এই শ্লোকে একথা বলার উদ্দেশ্য, এই মূর্তি দর্শনে অন্য সবকিছু দেখার অতৃপ্তি আসবে। এইসব কথার শেষে বাবাজী বললেন: "শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলায় পাছে সংসারাবদ্ধ মানুষ প্রাকৃতভাব আরোপ করে বিভ্রান্ত হয় সেইজন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ শক্তি বলে বলীয়ান রূপ নিজের অসাধারণ বৈদগ্ধ্য ও সাধনার জোরে তাঁর শাস্ত্র-গ্রন্থাদির মধ্যে নিজেদের অনুভূতির আলোকে বৈষ্ণবতত্ত্বকে উদ্ভাসিত করে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের মঞ্জুষার মধ্যে তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকে স্থাপিত করলেন। সে-শাস্ত্র একাধারে আলঙ্কারিকের রসব্যাকরণ ও ভক্তিপথের পথিকের হরিলীলা-স্মৃতি। তাঁদের পরিবেশিত গৌড়ীয় ধর্ম ভারতে সর্বজনগ্রাহ্য হলো। তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদকর্তা ও রসব্যাখ্যাতাদের গীত ও ব্যাখ্যানের একমাত্র বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়েছিল। এর মাধ্যমে জীব ও ঈশ্বরের নিগূঢ় সম্পর্কের মাধুর্য বিচিত্রভাবে আলোচিত হয়েছে, যা আজও এই পথের পথিকের প্রধান সম্পদ।"

রূপের নিরহঙ্কারি প্রসঙ্গে জীবের সঙ্গে বল্লভাচার্যের বিতর্ক ও জীবকে পরিত্যাগ প্রসঙ্গে বাবাজী শোনালেন কালিদাস রায়ের লেখা কবিতাটি। জীবকে রূপ সেসময় বলেছিলেন: "যশপ্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা মেখে এলে সারা গায়।" জীব দুঃখে কাতর হয়ে যমুনার তীরে পড়েছিলেন। সনাতন সে-খবর পেয়ে তাঁকে তুলে এনে রূপের চরণে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন: "জীবে দয়া তব পরম ধর্ম, জীবে দয়া তব কই?" কথাটির তাৎপর্য বুঝে রূপ জীবকে ক্ষমা করে বুকে তুলে নেন। এছাড়া মীরাবাঈ প্রথম বৃন্দাবনে এসে রূপের দর্শনপ্রার্থী হলে কঠোর বৈরাগী রূপ নারী-দর্শন করবেন না বলায়, মীরা বলেন: "আমি তো জানতাম বৃন্দাবনে পুরুষ একমাত্র পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, নতুন পুরুষ আরও একজন এসেছেন তা তো জানতাম না।" মীরার এই অপূর্ব কথা শুনে রূপের ভুল ভাঙে। রূপের জীবনের এরকম বহু ঘটনা তখনকার বৃন্দাবনবাসীদের কাছে আদর্শ-স্থানীয় ছিল।

রূপের দেহত্যাগের পর বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের অভিভাবকের স্থান গ্রহণ করেন জীব গোস্বামী তাঁর জন্ম ১৫২৩ খ্রীস্টাব্দে মালদহের কাছে রামকেলিতে। তাঁর ছিল যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি ব্যক্তিত্ব। ২৪ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে জ্যাঠামশায়দের কাছে চলে আসেন। তার আগে কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতির কাছে বেদান্ত শাস্ত্রাদি খুব ভাল করে পড়েন। এখানে এসে এঁদের কাছে বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি খুব ভাল করে পড়াশুনা করেন ও কঠোর সাধনায় ডুবে যান। তিনি যেসব শাস্ত্রাদি রচনা করেছেন, সবই দেবভাষায়, বাঙলাভাষায় তাঁর কোন রচনা নেই। তিনি নিজে তাঁর নিজের শিক্ষাপ্রসঙ্গে বলেছেন:

"সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু রসভাবপ্রান্ত।"

জীবের প্রসঙ্গ হতে হতেই বাবাজী আমাকে মন্দিরের মূল প্রবেশপথের উত্তরদিকের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের ছাদে এনে তুললেন। চোখের সামনে চারিপাশে গোটা বৃন্দাবন ভেসে উঠল। পশ্চিমে মদনমোহন, তারও পিছনে যমুনা, উত্তরে গোপীনাথ, যুগল-কিশোর, পূর্বে শ্রীরঙ্গনাথ, দক্ষিণে রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দির, আরও দূরে পাগলাবাবার সাততলা মন্দির—সব দেখা যাচ্ছে। বাবাজী বললেন: "এই যে মন্দির, এটি তৈরি হয় মানসিংহের অর্থে, কিন্তু তত্ত্বাবধানে ছিলেন জীব গোস্বামী। তিনিই তখন বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রধান পরিচালক। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, দক্ষতা, পাণ্ডিত্য, ত্যাগ ও তিতিক্ষার অধিকারী ছিলেন তিনি। ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে আকবর বাদশাহ এক ফরমানে জীব গোস্বামীকে গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন বিগ্রহদের প্রধান সেবক বলে স্বীকার করেন। এই মন্দিরেই আর এক নবীন বিখ্যাত বৈষ্ণবসাধক শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে ভাগবত-পাঠের আসরে জীবের দেখা হয় এবং

জীবের চরণে তিনি নিজেকে সেইসময়ে সমর্পণ করেন। জীব শ্রীনিবাসকে গোপাল ভট্টের কাছে পাঠিয়ে দেন। গোপাল ভট্ট তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেও জীবই ছিলেন শ্রীনিবাসের শিক্ষাগুরু। পরবর্তী কালে এই শ্রীনিবাস আচার্যই বিষ্ণুপুর ও বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের অন্যতম প্রধান নেতার আসন গ্রহণ করেন। জীবের কথাপ্রসঙ্গে বাবাজী বললেনঃ "জীব গোস্বামীই প্রথম আগ্রা থেকে তুলট কাগজ এনে বৈষ্ণব গ্রন্থাদি এই কাগজে লেখার প্রচলন করেন। তার আগে ভূর্জপত্র বা তালপাতার পুঁথির প্রচলন ছিল। তাঁর লেখা প্রায় পঁচিশখানি বিখ্যাত গ্রন্থ পাওয়া যায়, যার কতকগুলি রূপ, সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীদের রচনার টীকা। প্রতিটি গ্রন্থই বৈষ্ণবমত ব্যাখ্যায় অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে আছে। তাঁর শ্রীরাধা-দামোদর বিগ্রহ ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দের মাঘী শুক্লাতিথিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই দামোদর মন্দিরের পিছনের প্রাঙ্গণেই ৮৫ বছর বয়সে ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে পৌষ শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে তিনি বৃন্দাবনরজঃ প্রাপ্ত হন।"

কথা শেষ করে বাবাজী করজোড়ে গান ধরলেনঃ

"মুঞি অতি মূঢ়মতি।
তোমা বিনু নাহি গতি।
শ্রীজীব জীবন-প্রাণ-ধন ॥
বহুজন্ম পুণ্য করি।
দুর্লভ জনম ধরি।
পাইয়াছি শ্রীজীবচরণ ॥
শ্রীজীব করুণাসিন্ধু।
স্পর্শি আর একবিন্দু।
প্রেমরত্ন পাবার লাগিয়া ॥
কহে রঘুনাথদাস।
তুয়া অনুগত আশ।
রাখ মোরে পদছায়া দিয়া ॥"

সন্ধ্যা নামছে বৃন্দাবনের বুকে। বাবাজীকে সেদিনের মতো বিদায় জানিয়ে আমি আশ্রমের পথ ধরলাম।

ফেরার পথে বাবাজীর কথামত মহাপ্রভুর অন্যতম দাক্ষিণাত্য ভক্ত গোপাল ভট্টজীর প্রাণধন শ্রীরাধারমণ মন্দির দর্শন করে গেলাম। বর্তমান মন্দির ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে কুন্দনশাহ করে দিয়েছেন। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন একটি গণ্ডকী শালগ্রাম। গোপাল ভট্ট মহাপ্রভুর নির্দেশে ৩০ বছর বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে এসে রূপ ও সনাতনের কাছে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পাঠ ও তাঁর শালগ্রাম শিলাকে প্রাণ ঢেলে সেবা করে দিন কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দের বৈশাখ মাসে এক শেঠ এসে বৃন্দাবনের গোবিন্দজী, মদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহের সেবার জন্য নানা সাজপোশাক ও অলংকার বিতরণ করতে থাকেন, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন এই শালগ্রাম শিলার ভাগে কিছুই জোটে না। অভিমানে ক্ষুব্ধ গোপাল কাতর হয়ে পড়লে সেই রাত্রি প্রভাতে আশ্চর্য কাণ্ড দেখা গেল। সেই শালগ্রাম শিলাটি একটি হাতখানেক উঁচু, অপূর্ব কোমল, কমনীয়-কান্তি ত্রিভঙ্গ গোপাল-মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন। ভক্তের আগ্রহ মিটাবার জন্য তাঁর এই রূপ পরিগ্রহের বার্তা ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। শেঠ ফিরে এসে নানা অলংকার ও সাজপোশাকে সাজিয়ে দিলেন এই ভাব-বিগ্রহকে। এই সেই রাধারমণ বিগ্রহ। ঐ বছর বৈশাখী পূর্ণিমাতেই তাঁর অভিষেকের পরে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন বর্তমান মন্দিরের উত্তরে একটি ছোট মন্দিরে। আজও বর্তমান মন্দিরের বাইরে একটা ছোট্ট লালপাথরের সিংহাসনের মতো জায়গা নির্দেশ করা হয় বিগ্রহের প্রকটস্থান বলে। আর তারই কাছে শ্রীভট্টজীর সমাধিভূমি। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে এই দেবসেবার ভার তাঁর জনৈক শিষ্যের হাতে দিয়ে তিনি শ্রীবৃন্দাবন-প্রাপ্ত হন।

এই অপূর্ব দেববিগ্রহ দর্শন করে ফিরে চললাম আশ্রমের পথে। রাধারমণজীর মন্দিরে তখন কীর্তন চলছেঃ

"গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়,
রাধারমণ হরি, গোবিন্দ জয় জয়।"

[ক্রমশঃ]

শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

জীবন্মুক্তিবিবেকঃ

বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থানাং কেনচিন্নিমিত্তেন সন্ন্যাসাশ্রম-স্বীকারে প্রতিবন্ধে সতি স্বাশ্রমধর্মেষ্বনুষ্ঠীয়মানেষ্বপি বেদনার্থো মানসঃ কর্মাদিত্যাগো ন বিরুধ্যতে। শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু লোকে চ তাদৃশাং তত্ত্ববিদাং বহূনামুপলম্ভাৎ। যস্তু দণ্ডধারণাদিরূপো বেদনহেতুঃ পরমহংসাশ্রমঃ স পূর্বৈরাচার্যৈর্বহুধা প্রপঞ্চিত ইত্যস্মাভিরুপরম্যতে॥

অন্বয়

ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ-বানপ্রস্থানাম্ (ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থিগণ), কেনচিৎ নিমিত্তেন (কোনও কারণবশতঃ), সন্ন্যাসাশ্রমস্বীকারে (সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে), প্রতিবন্ধে সতি (অসমর্থ হলে), স্বাশ্রমধর্মেষু (নিজ আশ্রমোচিত ধর্মের), অনুষ্ঠীয়মানেষু অপি (অনুষ্ঠান করেও), বেদনার্থঃ (তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য), মানসঃ (মানসিকভাবে), কর্মাদিত্যাগঃ (কর্মের ত্যাগ), ন বিরুধ্যতে (বিরুদ্ধ হয় না)। শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণেষু (শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস ও পুরাণে), চ (এবং), লোকে (এজগতে), তাদৃশাম্ (সেরূপ), বহূনাম্ (অনেক), তত্ত্ববিদাম্ (তত্ত্বজ্ঞকে), উপলম্ভাৎ (পাওয়া যায়)। যঃ তু (কিন্তু যে), দণ্ডধারণাদিরূপঃ (দণ্ড প্রভৃতি ধারণরূপ), বেদনহেতুঃ (তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত), পরমহংস-আশ্রমঃ (পরমহংস আশ্রম), সঃ (তা), পূর্বৈঃ আচার্যৈঃ (পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক), বহুধা (বহুভাবে), প্রপঞ্চিতঃ (ব্যাখ্যাত হয়েছে), ইতি (এই কারণে), অস্মাভিঃ (আমাদিগের দ্বারা) উপরম্যতে (উপরম করা হলো)।

বঙ্গানুবাদ

ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থিগণ কোনও কারণবশতঃ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে অসমর্থ হলে নিজ আশ্রমোচিত ধর্মের অনুষ্ঠান করেও তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য মানসিকভাবে কর্মত্যাগ করতে পারেন। সে-ত্যাগ তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী হয় না। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ এবং এজগতেও সেরূপ অনেক তত্ত্বজ্ঞকে দেখা যায়। কিন্তু যে-দণ্ডধারণাদিরূপ পরমহংস আশ্রম তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, তা পূর্বাচার্যগণ বহুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই কারণে সেই বর্ণনার উপরম করা হলো।

[এপর্যন্ত 'বিবিদিষা সন্ন্যাস' সম্বন্ধে আলোচনা করে গ্রন্থকার অতঃপর 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস' পর্যালোচনা করছেন।]

অথ বিদ্বৎসন্ন্যাসং নিরূপয়ামঃ। সম্যগনুষ্ঠিতৈঃ শ্রবণমনননিদিধ্যাসনৈঃ পরতত্ত্বং বিদিতবদ্ভিঃ সম্পাদ্যমানো বিদ্বৎসন্ন্যাসঃ। তং চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সম্পাদয়ামাস। তথা হি বিদ্বচ্ছিরোমণির্ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যো বিজিগীষুকথায়াং বহুবিধেন তত্ত্বনিরূপণেন আশ্বলায়ন-প্রভৃতীন্ বিপ্রান্ প্রবিজিত্য বীতরাগকথায়াং সংক্ষেপবিস্তরাভ্যামনেকধা জনকং বোধয়িত্বা মৈত্রেয়ীং বুবোধয়িষুস্তস্যাস্ত্বরয়া তত্ত্বাভিমুখ্যায় স্বকর্তব্যং সন্ন্যাসং প্রতিজজ্ঞে। ততস্তাং বোধয়িত্বা সন্ন্যাসং চকার। তদুভয়ং মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণস্যাদ্যন্তয়োরাম্নায়তে॥

অন্বয়

অথ (অনন্তর), বিদ্বৎসন্ন্যাসং (বিদ্বৎ সন্ন্যাস), নিরূপয়ামঃ (নিরূপণ করব)। সম্যক্-অনুষ্ঠিতৈঃ (যথাবিধি অনুষ্ঠিত), শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈঃ (শ্রবণ-মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা), পরতত্ত্বং (পরম তত্ত্ব), বিদিতবদ্ভিঃ (জ্ঞাতাদের দ্বারা), বিদ্বৎসন্ন্যাসঃ (বিদ্বৎ সন্ন্যাস), সম্পাদ্যমানঃ (অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে)। তং চ (তাই), যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যাজ্ঞবল্ক্য), সম্পাদয়ামাস (সম্পাদন করেছিলেন)। তথা হি (যেহেতু সেই বিষয়ে), বিদ্বৎ-শিরোমণিঃ (জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ), ভগবান্ (ভগবান), যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যাজ্ঞবল্ক্য), বিজিগীষুকথায়াম্ (বিজিগীষু কথায়), বহুবিধেন (বহু প্রকারে), তত্ত্বনিরূপণেন (তত্ত্বনিরূপণ দ্বারা), আশ্বলায়ন-প্রভৃতীন্ (আশ্বলায়ন প্রভৃতি), বিপ্রান্ (ব্রাহ্মণদের), প্রবিজিত্য (পরাজিত করে), বীতরাগকথায়াম্ (বীতরাগকথায়), সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাম্ (সংক্ষেপ

ও সবিস্তারে), অনেকধা (অনেক প্রকারে), জনকং (জনককে), বোধয়িত্বা (ব্যাখ্যা করে), মৈত্রেয়ীং (মৈত্রেয়ীকে), বুবোধয়িষু (বোঝানোর জন্য), ত্বরয়া (অবিলম্বে), তস্যাঃ (তাঁর), [মনযোগ], তত্ত্ব-অভিমুখ্যায় (তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ করার জন্য), স্বকর্তব্যং (নিজ কর্তব্য), সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস-সংকল্প), প্রতিজজ্ঞে (জ্ঞাপন করলেন)। ততঃ (তদনন্তর), তাং (তাঁকে) বোধয়িত্বা (বুঝিয়ে), সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস), চকার (অবলম্বন করলেন) তদুভয়ং (এই উভয় প্রস্তাবই), মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণস্য। (মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের), আদি-অন্তয়োঃ (আদি ও অন্তে), আম্নায়তে (পঠিত হয়)।

বঙ্গানুবাদ

অনন্তর বিদ্বৎ সন্ন্যাস নিরূপণ করব। যথাবিধি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের অভ্যাস দ্বারা যাঁরা পরম-তত্ত্বকে জেনেছেন, তাঁদের দ্বারাই বিদ্বৎ সন্ন্যাস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য সেই সন্ন্যাস সম্পাদন করেছিলেন। যেহেতু সেই প্রসঙ্গে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য 'বিজিগীষু কথায়' বহুপ্রকারে তত্ত্বনিরূপণপূর্বক আশ্বলায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে পরাজিত করে 'বীতরাগ কথায়' সংক্ষেপে ও বিস্তারে অনেক প্রকারে জনকের নিকট ব্যাখ্যা করেছিলেন। তারপর মৈত্রেয়ীকে বোঝানোর জন্য এবং অবিলম্বে তাঁর মনোযোগ তত্ত্বাভিমুখী করার জন্য নিজ কর্তব্য সন্ন্যাস-সংকল্প তাঁকে জানালেন। তারপর মৈত্রেয়ীকে বুঝিয়ে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। [সন্ন্যাস প্রস্তাব ও সন্ন্যাস সম্পাদন] এই উভয় প্রস্তাবই মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের আদি ও অন্তে পঠিত হয়।

বিবৃতি

বিদ্বৎ সন্ন্যাস প্রকরণটি বিস্তৃতভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়। গ্রন্থকার যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই তত্ত্বটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য দীর্ঘকাল গার্হস্থ্য ধর্মে অবস্থানকালে যথাবিধি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন অনুষ্ঠানপূর্বক বিষয়ে বীতরাগ হয়েছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে জনকসভায় উপস্থিত যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠের উদ্দেশ্যে নিবেদিত গাভীসকল গ্রহণকালে অশ্বলাদি উপস্থিত ব্রাহ্মণদের প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হয়ে যে-সমস্ত কথা বলেন তা 'বিজিগীষু কথা' নামে প্রচলিত। অতঃপর উক্ত উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে 'যাজ্ঞবল্ক্য কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ' প্রভৃতি জনকের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য যে-তত্ত্বজ্ঞাপন করেন তাই 'বীতরাগ কথা' নামে প্রচলিত। এই চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণে বিষয়ে বীতরাগ, বীতস্পৃহ যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট সন্ন্যাসের সংকল্প জ্ঞাপন করেন। শ্রবণাদি সাধনানুষ্ঠান দ্বারা তিনি যে-তত্ত্ব জেনেছিলেন তারই ব্যাখ্যা করেছিলেন রাজর্ষি জনকের নিকট। এই তত্ত্বব্যাখ্যার উপসংহারে রাজর্ষি বিদেহ জনককে তিনি নিবেদন করেন ঃ "স বা এষ মহানজ আত্মাহজরোহমরোহমৃতোহভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৫)।

অতঃপর মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের আদি ও অন্তে 'বিজিগীষু' ও 'বীতরাগ' কথার উদ্ধার করে বলছেন—

"অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোহন্যদ্ বৃত্তমুপাকরিষ্যন্।
মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা
অরেহহমস্মাৎ স্থানাদস্মি" ইতি।
"এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো
বিজহার" ইতি চ॥

অন্বয়

অথ হ (এই অবস্থায়), যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যাজ্ঞবল্ক্য), অন্যৎ বৃত্তম্ (অন্যপ্রকার জীবন অর্থাৎ সন্ন্যাস), উপাকরিষ্যন্ (স্বীকারে উৎসুক হয়ে), যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যাজ্ঞবল্ক্য), উবাচ হ (বললেন), অরে মৈত্রেয়ী ইতি (হে মৈত্রেয়ী), অহম্ (আমি), অস্মাৎ স্থানাৎ (এই গৃহস্থাশ্রম থেকে), প্রব্রজিষ্যন্ বৈ অস্মি (প্রব্রজ্যা অবলম্বন করব)।

অরে, এতাবৎ (হে মৈত্রেয়ী, এই সাধনই), খলু (নিশ্চিত), অমৃতত্বম্ (মোক্ষের সাধন), ইতি উক্ত্বা (এই বলে), যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যাজ্ঞবল্ক্য), বিজহার হ (সন্ন্যাস অবলম্বন করে চলে গেলেন)।

বঙ্গানুবাদ

এই অবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্য অন্যপ্রকার জীবন অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণে উৎসুক হলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "হে মৈত্রেয়ী, আমি এই গৃহস্থাশ্রম থেকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করব।

"হে মৈত্রেয়ী, এই (সন্ন্যাস) সাধনই মোক্ষের সাধন"—এই কথা বলে যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস অবলম্বন করে চলে গেলেন। [ক্রমশঃ]

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচক : স্বামী বাসুদেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

উপাসনা ও মহামায়া

প্রশ্ন : মহামায়ার উপাসনার এত কী প্রয়োজন ? একেবারে ঈশ্বরকে ধরলেই তো হলো ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : মহামায়া পথ ছেড়ে দিলে তবে হয়, নইলে কিছুই কিছু নয়। তিনি জীবের বুদ্ধিরূপে আছেন, আবার ভ্রান্তিরূপেও আছেন।

প্রশ্ন : কিন্তু ভগবান যে বলছেন, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" (গীতা, ৭।১৪)

স্বামী বাসুদেবানন্দ : তাও বলেছেন, আবার বলেছেন, "মায়য়া অপহৃতজ্ঞানম্", "মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্" (গীতা, ৭।১৩), "যোগমায়াসমাবৃতঃ" (গীতা, ৭।২৫)। শ্রীমদ্ ভাগবতকার প্রথম বললেন—

"যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যয়াত্মনিকৃতে ইতি তদ্ ব্রহ্মদর্শনম্ ॥"
(১।৩।৩৪)

অবিদ্যাদ্বারা আত্মাতে কল্পিত জগৎ। যখন এই সদসদ্রূপা বিক্ষেপাবরণাত্মিকা অবিদ্যা স্বসংবিদের দ্বারা অর্থাৎ স্বরূপের সম্যগ্‌জ্ঞানের দ্বারা প্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ বিলয়প্রাপ্ত হন, তখন ব্রহ্মদর্শন হয়।

কিন্তু সরষের ভিতর ভূত ঢুকে থাকলে সরষে দিয়ে ভূত ঝাড়বে কি করে ? যে-বুদ্ধি দিয়ে তাঁর ধ্যান-ভজন করবে, তিনি যদি তাকে বিষয় দিয়ে চঞ্চল করে তোলেন, তখন কি করবে ? তাঁর দয়া হলে তবে ভগবদ্ভক্তি হয়, যা ব্রহ্মদর্শন করায়। "বিষ্ণুভক্তিপ্রদাদুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।" ভাগবতকার এই তত্ত্ব বুঝেই বলেছেন :

"যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥"
(১।৩।৩৪)

'বিশারদ' মানে সর্বজ্ঞ ভগবান। তাঁর যে দেবী মায়া তিনি হলেন বৈশারদী—ইনি অবিদ্যারূপে যতক্ষণ বিক্ষেপ ও আবরণ করেন ; ততক্ষণ জীবত্ব যায় না, আর যখন ব্রহ্মবিদ্যারূপ 'কৃষ্ণমতি'-রূপে প্রকাশ পান তখন অবিদ্যাকৃত জীবোপাধি নাশ পায় এবং আগুন যেমন কাঠ দগ্ধ করে নিজেও উপশমপ্রাপ্ত হয়, সেই রূপ এই ব্রহ্মমতি অবিদ্যোপাধি নাশ করে যদি উপরত হন, তখনই তিনি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সম্পন্ন হন এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জীবেরও জীবত্ব ঘুচে শিবত্ব লাভ হয়—তত্ত্বজ্ঞেরা এরূপ জেনেছেন।

ষট্‌চক্রভেদে কুণ্ডলিনীকে আশ্রয় করে জীব ব্রহ্মমার্গে প্রবেশ করে। তারপর সহস্রারে গিয়ে সেই মহামায়া "স্বে মহিম্নি পরমানন্দ-স্বরূপে মহীয়তে পূজ্যতে"—অর্থাৎ তাঁর স্বরূপ যে ব্রহ্মবস্তু, তাঁর সঙ্গে একীভূত হন। সেই জন্য তন্ত্র বলেছেন, "রতিরস-মহানন্দ-রসিকাম্"।

প্রশ্ন : তখন জীবের কি হয় ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : দর্শন হয়।

প্রশ্ন : দর্শন কি ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : শ্রীধর বলেছেন, 'জ্ঞানৈকস্বরূপম্'। —জীবের জীবত্ব ঘুচে শিবত্ব লাভ হয়। আবার দেখুন, ভাগবতের আরেক

জায়গায় মৈত্রেয় বিদুরকে মহামায়ার অঘটন-ঘটনপটিয়সী শক্তির কথা বলছেন—

"অতো ভগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরো॥"
(৩।৬।৩৯)

এই ভগবতী মায়া ব্রহ্মরুদ্রাদি মায়ীদেরও মোহিনী। এমনকি যিনি স্বয়ং পরমাত্মা শ্রীহরি, তিনিও নিজের আত্মবর্ত্ম অর্থাৎ স্বীয় মায়ার গতি কতদূর তা জানেন না, তা অপরের আর কা কথা!

অবশ্য এটা অত্যুক্তিই। কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা বা বিভূতি বা বিস্তারই হচ্ছে মায়া। তথাপি তিনি যে কিরূপ 'দুরত্যয়া' সেইটি জীবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। মৈত্রেয় আবার বলছেন—

"সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যাতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্॥"
(৩।৭।৯)

ভগবানের এই মায়া 'নয়'-বিরোধী অর্থাৎ যুক্তিবিরোধী। কেননা যিনি ঈশ্বর, বিমুক্ত, সর্বজ্ঞ তাঁর এই জীবভাব অর্থাৎ বন্ধন এবং কার্পণ্য যিনি ঘটান, তাঁকে তর্ক দ্বারা কি করে বোঝান যাবে? সেজন্য পণ্ডিতরা তাঁকে অনির্বচনীয়া, অচিন্ত্যা প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন ঃ তাহলে ঈশ্বর ও জীবে ব্যবহারিক জগতে ভেদ করব কি করে?

স্বামী বাসুদেবানন্দ ঃ ব্রহ্ম যখন বিদ্যামায়াশ্রিত হন, তখন তাঁকে বলি ঈশ্বর, আর তিনি যখন অবিদ্যামায়াশ্রিত হন, তখন তাঁকে বলি জীব। অবিদ্যাহেতু জীব প্রকৃতির ধর্ম নিজের বলে গ্রহণ করেছে, আর ঈশ্বর বিদ্যামায়া আশ্রয় করাতে 'প্রকৃতি ধর্ম তাঁতে আরোপিত'—এই জ্ঞান থাকায় তাঁকে বিদ্যা বা অবিদ্যা কোন মায়াই মুগ্ধ করতে পারে না, তিনি উদাসীনবৎ, জলক্রীড়াবৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি করছেন। মৈত্রেয় বলছেন—

"যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ॥"
(৩।৭।১১)

—যেমন জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের জলোপাধিকৃত কম্পাদি দেখা যায়, যেমন জল দুলছে, তাতে মনে হচ্ছে চন্দ্রও দুলছে, সেইরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত জীব দেহ-মন-বুদ্ধির কম্পন নিজেরই বলে বোধ করে। সেটা অসৎ হলেও সৎ বলে দেখা যায়, কারণ আকাশের চাঁদ কখনো জলের দোলনে দোলে না, সেরূপ দ্রষ্টা জীবাত্মার অনাত্মা প্রকৃতির গুণ নিজের বলে বোধ হয়, পরন্তু ঈশ্বরের হয় না।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু তারপর যে রয়েছে—

"স বৈ নিবৃত্তিধর্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ॥"
(৩।৭।১২)

—বাসুদেবের অনুকম্পায় নিবৃত্তিধর্ম ভক্তিযোগের দ্বারা ধীরে ধীরে সেই অজ্ঞানের তিরোধান হবে।

স্বামী বাসুদেবানন্দ ঃ ঠাকুরের অনুকম্পা হলেই মহামায়ারও অনুকম্পা হবেই। মহামায়ার অনুকম্পা হলেই তখন ব্রহ্মমতি উপস্থিত হবে। যার ঠাকুরের প্রতি মন গিয়েছে তার প্রতি মহামায়া খুশি হয়েছেন বুঝতে হবে। সদ্‌বুদ্ধি যদি মা না দেন, তাহলে জীব ঠাকুরকে ডাকবে কেন? মায়ের কৃপায় সদ্‌বুদ্ধি আসায় মাকে ডাকতে পারছেন এবং তারপর তাঁর কৃপা উপলব্ধি করতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ তাঁর কৃপা তো সর্বক্ষণই রয়েছে, অথচ জীব বুঝতে পারছে না কেন?

স্বামী বাসুদেবানন্দ ঃ "মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানাঃ", "মোহিতং নাভিজানাতি"। সদ্‌বুদ্ধি না আসা পর্যন্ত —ভগবান অনেক দূরে। এই জগদম্বার অনির্বাচ্যা মায়া যে কি, তা বুঝেও বোঝবার জো নেই। সেজন্য মেধস ঋষি বললেন ঃ "সৈষা প্রসন্না নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" এজন্যই তাঁকে আগে খুশি করা। (২৮।৩।৪৩)

[ক্রমশঃ]

বিশেষ রচনা

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দঃ প্রতিক্রিয়া এবং তাৎপর্য

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজী তারপর বললেনঃ "প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্যের উদ্বোধক। এক চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা। তবে এত পরস্পরবিরোধী ভাব কেন? হিন্দু বলেন —আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপযোগী হবার জন্য এক সত্যই এরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে।"

গীতার দুটি শ্লোকের বক্তব্যকে স্বামীজী তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপিত করেন। শ্লোক দুটি হলোঃ

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥"
(গীতা, ৭।৭)

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্॥"
(গীতা, ১০।৪১)

—হে ধনঞ্জয়, আমার চেয়ে জগতে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। যেমন সূত্রে মণিসমূহ গ্রথিত হয়ে থাকে, তেমনি এই জগতের সবকিছুই আমাতে অনুস্যূত ও বিধৃত হয়ে আছে।

যাকিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা উৎসাহসমন্বিত সে-সবকেই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলে জানবে।

বাইবেলের একটি উক্তিও তিনি বক্তৃতাটির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেনঃ "তাঁরা জগৎপিতাকে দেখেননি, কিন্তু তাঁর পুত্রকে (আদর্শ মানবকে) দেখেছেন। যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে।" বক্তৃতাটির সমাপ্তি অংশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং বর্তমান যুগের উপযোগী বলে তার কিছুটা উদ্ধৃত করছিঃ

"ভ্রাতৃগণ এই হলো হিন্দুদের ধর্মবিষয়ক ধারণাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হিন্দু তার সব পরিকল্পনা হয়তো কার্যে পরিণত করতে পারেনি, কিন্তু যদি কখনো একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তা কখনো কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হবে না; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে সঞ্চারিত হবে, ঐ ধর্মকে তাঁরই মতো অসীম হতে হবে: সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত, খ্রীস্টভক্ত, সাধু-অসাধু—সকলের ওপর সমভাবে কিরণজাল বিস্তার করবে: সেই ধর্ম শুধু হিন্দু বা বৌদ্ধ, খ্রীস্টান বা মুসলমানের হবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টি-স্বরূপ হবে, অথচ তাতে সীমাহীন উন্নতির অবকাশ থাকবে।... সেই ধর্মের নীতিতে কারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকবে না; তাতে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হবে এবং তার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেবস্বভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা করার জন্য সতত নিযুক্ত থাকবে।"

মিসেস বার্ক এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর সারাংশ তিনি চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর একটি মন্তব্য এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ "এই ভাষণটিই আমেরিকার জনগণের কাছে স্বামীজীর প্রথম ভাষণ, যাতে পরবর্তী কালে তিনি যাকিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন তার বীজ নিহিত আছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও মননশীলতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাঁর মূল বক্তব্যগুলির সম্প্রসারণ তিনি পরে করেছিলেন; কিন্তু ঐদিন (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর) তিনি যে শুধু নব-হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাই নয়, পাশ্চাত্যভূমিতে এক নতুন বিশ্বধর্মের সূত্র প্রকাশিত করেছিলেন, যাতে অতীতের ধর্ম-সমূহের পূর্ণতা বিধান করে ভবিষ্যতের জন্য তা এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে। বিশ্ব-জনীনতার বাণী দিয়েই বক্তৃতাটি তিনি শেষ করেছিলেন।" তিনি আরও লিখেছেনঃ "স্বামীজীর ঐ বক্তৃতার শেষ কথাগুলিতে তাঁর গুরুদেব (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস) এবং তাঁর নিজের বাণীই ছিল, যদিও ধর্মমহাসভার প্রশস্তি হিসাবেই তিনি ওগুলি উচ্চারণ করেছিলেন।"

পাশ্চাত্যে স্বামীজীর বাণীর মধ্যে যেগুলি প্রধান এবং আজও অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ তাদের

প্রায় সবকটিই এই বক্তৃতাটিতে চুম্বকাকারে উল্লিখিত হয়েছে, যথা, 'অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞানের মৌলিক সামঞ্জস্য', 'ধর্ম-বিজ্ঞান', 'একটি বিশ্বজনীন ধর্মের ধারণা', 'প্রতিটি ধর্মের সত্যতা', 'মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিভিন্ন স্তর', 'ধর্মের অর্থ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ', 'পূর্ণতালাভই সকল ধর্মের মূল উদ্দেশ্য' ইত্যাদি।

ধর্মমহাসভার দশম দিবসে অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর স্বামীজী একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন রাত ৯টার সময়। ঐদিন অবশ্য তাঁর জন্য কোন পূর্বনির্ধারিত বক্তৃতা ছিল না। তিনিও শ্রোতাদের বলেন যে, তিনি বলবার জন্য আসেননি, শুনতেই এসেছেন; কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী বক্তার (মিঃ হেডল্যান্ড-এর) লিখিত ভাষণ ('Religion in Peking')-এর পরিপ্রেক্ষিতে খ্রীস্টান মিশনারীদের ভারতবর্ষে কার্যকলাপ সম্বন্ধে সামান্য কিছু মৃদু এবং ন্যায্য সমালোচনা করতে চান। এটিই সংক্ষিপ্ত আকারে 'Religion not the Crying Need of India' নামে প্রকাশিত হয়েছে 'Complete Works'-এ (Vol. I, p. 20)। এটিরই দীর্ঘতর বিবরণ মিসেস বার্ক তাঁর পূর্বোল্লিখিত পুস্তকে ('New Discoveries', Vol. I, pp. 123-128) দিয়েছেন। ঐ বিবরণ তিনি সংগ্রহ করেছেন স্বামী যোগেশানন্দের একটি প্রবন্ধ থেকে ('Swami Vivekananda: a New Discovery'—Vedanta for East and West (London), 112, March-April, 1970)। প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বরের 'শিকাগো ইন্টারওসান' পত্রিকায় প্রকাশিত দীর্ঘ বিবরণী থেকে। 'Complete Works'-এর ক্ষুদ্র রচনাটি থেকে এটি আয়তনে অনেক বড় এবং বেশি তথ্যসম্বলিত বলে আমরা এটির ভিত্তিতেই আলোচনা করব।

স্বামীজী ঐ বক্তৃতাতে বলেছিলেন: ভারতের তৎকালীন ৩০ কোটি অধিবাসীর গড়পড়তা মাসিক আয় মাত্র ৫০ সেন্টের (অর্থাৎ ½ ডলার) কিছু বেশি; বছরের পর বছর তাদের অনেকে বুনো ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করে এবং দুর্ভিক্ষ হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়—সেসব তিনি চাক্ষুষ দেখেছেন। খ্রীস্টান ধর্ম-প্রচারকরা এই 'হিদেন'দের 'আত্মার' উদ্ধারের জন্যই ব্যস্ত; তাদের অনাহার ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তাঁরা এযাবৎ কি করেছেন—এই প্রশ্ন তিনি করেন। পিতৃপিতামহের ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলে তবেই তাঁরা সাহায্য করেন, নতুবা নয়। শত শত খ্রীস্টান-গির্জা হিন্দুদের সাহায্যে ভারতে তৈরি হয়েছে; কিন্তু কোন হিন্দু-মন্দিরের জন্য একটি কপর্দকও কোন খ্রীস্টান কখনো ব্যয় করেননি। প্রাচ্যে ধর্মের অনটন নেই, ধর্ম তাদের যথেষ্টই আছে। তাদের যা আশু প্রয়োজন, তা হলো রুটি; বিনিময়ে তাদের দেওয়া হয়—পাথর! অনশনক্লিষ্ট মৃত্যুপথযাত্রীকে দর্শনের উপদেশ দেওয়ার অর্থ তাকে অপমান করা। সুতরাং হিন্দুদের নিকট 'ভ্রাতৃত্ব'ই যদি প্রচার করতে হয়, তবে মিশনারীদের উচিত তাদের এমন কিছু শেখানো যাতে করে তারা ভালভাবে রুজিরোজগার করতে পারে, দার্শনিক ছাইপাঁশ শিখিয়ে নয়।

খ্রীস্টানদের কাছ থেকে হিন্দুদের বিনাশর্তে অর্থসাহায্য পাওয়া যে কত কঠিন ব্যাপার প্রসঙ্গতঃ তিনি তার উল্লেখ করেন। এরপরে শ্রোতাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি হিন্দুদের জন্মান্তরবাদের ব্যাখ্যাও ঐ বক্তৃতাতেই করেন। মিসেস বার্কের বিশ্বাস, স্বামীজী ধর্মমহাসভায় যে-বক্তৃতাগুলি প্রস্তুতিহীনভাবে দিয়েছিলেন, তাদের পূর্ণ বিবরণী অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়নি। তাছাড়া, তিনি আরও বেশিবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং বেশি বিষয়ের ওপরে বলেছিলেন, যা বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। লন্ডনের রেভারেন্ড এইচ. আর. হাউইস (Rev. H. R. Haweis)—যিনি ধর্মমহাসভায় ইংল্যান্ডের গির্জার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন—তাঁর গ্রন্থ 'Travel and Talk'-এ স্বামীজী সম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা উপস্থাপিত করেছেন

যাই হোক, স্বামীজীর 'Complete Works'-এ (Vol. I, pp. 21-24) আমরা আর দুটি মাত্র বক্তৃতাই পাই, যা তিনি দিয়েছিলেন মূল মহাসভার অধিবেশনে শেষের দুদিনে—২৬ সেপ্টেম্বর এবং ২৭ সেপ্টেম্বর। ২৬-এর বক্তৃতাটির নাম—'Buddhism, the Fulfilment of Hinduism' ('হিন্দুধর্মের পরিণত রূপ বৌদ্ধধর্ম')। ২৭-এর বক্তৃতাটির নাম নেই, 'Address at the Final-Session' ('সমাপ্তি অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ') বলে সেটির উল্লেখ আছে।

[ক্রমশঃ]

মাপো আর জপো

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো"—শ্রীশ্রীমায়ের কথা। যার আছে অর্থাৎ যার বিষয়-সম্পত্তি জমি-জিরাত আছে সে সারা জীবন কি করে? কত ধানে কত চাল, সারাটা জীবন ঐ করে যায়। কোথায় টাকা খাটালে কত সুদ, তার হিসাব কষে। সিন্দুক-ভর্তি কোম্পানির কাগজ রোজ বার করে। আর রোদ খাওয়ায়। ডিভি-ডেন্ডের হিসাব কষে।

শ্রীশ্রীমা বলেছেন, ঈশ্বরের কৃপায় যার বিষয়-সম্পত্তি আছে সে 'মাপুক' অর্থাৎ দান করুক।

আবার এ মানেও হতে পারে, ভিতরে যদি আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হয়ে থাকে তাহলে পরিমাপ কর, রোজই তা বাড়ছে কিনা। মানুষের দু-রকমের চলন। এক চলা বাইরের—কলকাতা থেকে কানপুর চলে গেল। আর এক চলা ভিতরের। মন-পথিক! তুমি কতটা এগোলে? সংসার থেকে তোমার দূরত্ব কতটা বাড়ল! তোমার দেহ থাক তোমার মন কি বেরোতে পেরেছে? তুমি কি 'বাবুর বাড়ির দাসী'র মন পেয়েছ? মুখে বলছে বটে আমার কানু, আমার গোপাল, মন পড়ে আছে দেশের বাড়িতে। সেখানে আছে তার নিজের ছেলেমেয়ে, নিজের সংসার। তোমার মন কি নষ্ট-নারীর মতো হয়েছে? সে কি রকম? হেঁসেলে সব কাজই করছে, মন উসখুস করছে, কখন ভেসে আসবে সেই পরপুরুষ—প্রাণের মানুষটির শিস। তখন আমার ঘরেই থাকা দায়।

পড়ে থাক মনের বোঝা ঘরের দ্বারে—
যেমন ওই এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে॥

সেইরকম আমিও ভেসে যাই 'পান্থজনের সখা'র হাত ধরতে। তখন আমি সকলেরই অনেক পর। কে তোমরা? পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা। ঠাকুর বলেছেন, সংসার যদি করতেই হয় তো করবে বাইরে থেকে। 'বাবুর ফুলবাগানের মালি'র মন নিয়ে। আমার পুকুর, আমার আমগাছ। এই দেখুন কেমন ফুলের বাহার লাগিয়েছি। যেদিন বাবু দূর করে দেবেন ঘাড় ধরে, সেদিন গেট পেরিয়ে এসে নিজের ফেলে যাওয়া পোঁটলাটিও নেবার উপায় থাকবে না। মানুষের জীবন-বাগানে যিনি বহাল করে গেলেন, তাঁর হাতে কিন্তু ডিসচার্জের ক্ষমতা নেই। এই বাগানের মালিক হলেন মৃত্যু। তাঁর সেরেস্তায় জীবের নিয়োগ-খাতা। চাকরির মেয়াদের হিসাব তিনিই রাখছেন। তিনিই সই করছেন ডিসচার্জ নোটিস।

ঠাকুর বলছেন, আমি, আমার—এইটি হলো অজ্ঞান। তুমি, তোমার—এই হলো বিজ্ঞান। তাহলে মাপো, সেই জ্ঞান তোমার কতটা হলো! যদি দেখা যায় আসক্তি আছে, তাহলে বুঝতে হবে কষ্টও আছে। ঠাকুর বলছেন, বলদ হাম্বা, হাম্বা করে। হাম-বা। আমি, আমি। চাষা তাকে লাঙলে জুতছে, কলু তাকে দিয়ে ঘানি ঘোরাচ্ছে। পিটছে, কষ্ট দিচ্ছে, গাড়ি টানাচ্ছে। বলদ কেবল হাম্বা, হাম্বা করছে। একদিন তার মৃত্যু হলো, নাড়ি-ভুঁড়ি থেকে তৈরি হলো তাঁত। চড়ল গিয়ে সারেঙ্গিতে, একতারাতে। শব্দ বেরল তুঁহু, তুঁহু। তখন সে উদ্ধার পেয়ে গেছে। জীব জীবনেই যদি ক্লেশমুক্ত হতে চায় তাহলে তাকে ঐ 'তুঁহু' মন্ত্র নিতে হবে—"তুঝসে হামনে দিলকো লাগায়া", "যো কুছ হ্যায় সব তুঁহু হ্যায়॥" সব তুমি। এখন মেপে দেখ, সত্যিই সব ব্যাপারে এই বোধ তোমার পাকা হয়েছে কিনা। মন দেখ। মুখে মানুষ অনেক কথা বলতে পারে। তার কোন মূল্য নেই। নিজেকেই নিজে ফাঁকি দিলে কিছু করার নেই। ঠাকুর বলতেন, এক আনা, দু-আনা নয়—ষোল আনা বিশ্বাস চাই। সেই বিশ্বাস তুমি মাপো; যদি দেখ নেই, তাহলে?

সত্যিই কি নেই। ঠাকুর গল্প বলছেন—মাঝ-রাতে বাবুর ঘুম ভেঙেছে। ইচ্ছা হয়েছে—একটু তামাক খাবেন। সবই আছে—কল্কে, তামাক, টিকে, ঠিকরে। নেই কেবল চকমকি পাথর। টিকে ধরাবেন কিসে। প্রবল বাসনা, তামাক একটু খেতেই হবে। লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে পড়লেন চকমকি পাথরের সন্ধানে। প্রতিবেশীকে ঠেলে তুললেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, সে কি। চকমকি পাথর! আরে আগুন তোমার হাতে। তোমার লণ্ঠনে।

এই হলেন গুরু। 'যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' দর্পণে দেখ নিজের মুখ। কাচ অপরিষ্কার। ঝাপসা দেখাচ্ছে। তাহলে কাচের কাছে মুখ এনে একবার হা কর। তারপর মোছ, সব পরিষ্কার। এই হা হলো জীবের হাহাকার। মার্জনা হলো সৎকর্ম। ঠাকুর বলছেন—গীতায় কি আছে? তাগী, তাগী, তাগী। দশবার বললেই গীতা হয়ে গেল। ত্যাগই আসল। বাইরে ত্যাগ নয়, মনে ত্যাগ। তোমার দু-হাত দিয়ে যা ধরে আছ, যা ধরার চেষ্টা করছ, ছেড়ে দাও। তাঁকে ধরতে দাও তোমার হাত। তিনি ধরলে আলের পথে তোমার আর পড়ার ভয় নেই।

শ্রীশ্রীমা বললেন, তুমি জপো। তোমার ঘোলা জলে জপের নির্মল ফেল। বালতির জলের তলায় একটি স্বর্ণকান্তি মোহর আছে। জল ঘোলা। তাই দেখতে পাচ্ছ না। নির্মল হলেই দেখতে পাবে। ছোট ছোট ঢেউ খেলছে, কামনা-বাসনার ঢেউ, তাই বিম্ব ধরা পড়ছে না। তুমি জপো। মন স্থির কর। জপতে জপতে তৈরি হবে জপের শরীর। তখন তুমি সূক্ষ্মকে ধরতে পারবে। সূক্ষ্মেই সেই বিশালের বিচরণ। অবিশ্বাসী সংসারী মানুষ থেকে, বিষয়ীর কাছ থেকে দূরে থাক। বিশ্বাস পাকা হয়ে গেলে আর কোন ভয় থাকে না।

তবে একটা কথা, খুব রোক চাই। ভোগের নামমাত্র থাকলে তাঁর সঙ্গে যোগ হবে না। জীব ছুঁচ, ঈশ্বর চুম্বক। তিনি টানবেনই; কিন্তু ছুঁচে যদি মাটি লেগে থাকে। চুম্বক টানবে না।

তাহলে জপো। জপে বিশ্বাস। জপে অশ্রু। অশ্রুধারায় নির্মল। কাঠ ২৩ক্ষণ ভিজে ৩৩ক্ষণ আগুনে জ্বলবে না। সোঁ সোঁ শব্দ, ধোঁয়া। যেই ধরে গেল তখন লকলকে শিখা। জপে সেই সংসার-রস মরবে। আধ্যাত্মিকতায় ঝনঝনে খনখনে হবে।

তাই যার নেই সে জপো। "লাগি লগন মীরা হোগই মগন॥" □

প্র

পত্রিকার সঠিক নাম

'উদ্বোধন' পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৯৮) প্রকাশিত 'প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত পুস্তিকা' প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ-বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধাভাজন শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রাসঙ্গিক বহু মূল্যবান তথ্য তুলে ধরেছেন। এর জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। 'The Theistic Quarterly Review' পত্রিকার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে 'চতুরঙ্গ' (মে, ১৯৯১) পত্রিকায় প্রকাশিত আমার চিঠিতে এক জায়গায় লেখা হয়েছে—'The Theistic Quarterly', অর্থাৎ 'Review' শব্দটি বাদ পড়েছে। শঙ্করীবাবু সংশয় প্রকাশ করেছেন, 'Review' শব্দটি অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়েছে কিনা। পত্রিকার নাম যে 'The Theistic Quarterly Review', তা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পত্রলেখকের অথবা প্রেসের ['চতুরঙ্গ' পত্রিকার] অনবধানতাবশতঃ 'Review' শব্দটি বাদ পড়েছে। সেজন্য আমি দুঃখিত। □

কালিদাস মুখোপাধ্যায়
গড়িয়া, কলকাতা-৮৪

মাধুকরী

বুদ্ধানুরাগী

ধর্ম রক্ষিত মহাথের*

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

তিনি শুধু যুগাবতার নন, একাধারে লোকগুরু। যুগদ্রষ্টা ঋষি এবং সর্বোপরি সর্ব-ধর্মসমন্বয়সাধক পরমহংস। তাই তিনি আধ্যাত্মিক জগতের একজন অনন্য গুণাধার বলে সর্বকালে সর্বজনের নিকট পূজিত হচ্ছেন অবতার পুরুষরূপে।

তাঁর সাধনার ক্ষেত্র ও উৎস শুধু একমুখী ও আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরঞ্চ সকল ধর্ম ও দর্শনের মার্গ-পথে বিচরণ করে সাধনজগতের উর্ধ্বতন স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। মুমুক্ষুপ্রাপ্তির গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সাথে কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা ধর্ম-নিচয়ের নির্যাস আপন হৃদয়-কন্দরে সঞ্চয়ন করে মহামানবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি আজ জ্ঞানী। ভক্তমনে শুধু একতাল রক্তমাংসে গড়া মানব নন, তিনি অবতার-পুরুষের করুণাঘন মূর্তিতে সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়ের বেদিমূলে অধিষ্ঠিত।

বর্তমান বিশ্বে ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে যে বিসূচিকা স্নায়ুসংগ্রাম চলছে যুগ যুগ ধরে, এতে মানবজাতি অবক্ষয়ের দিকে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় এগিয়ে যাচ্ছে। মানবতাকে এ নৈরাজ্যের অবস্থা থেকে রক্ষা করে এ রূপময় পৃথিবীতে একটা সুন্দর মানবসমাজ গড়ে তুলতে হলে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ" মহামন্ত্রকে জীবনের পাথেয়রূপে গ্রহণ করলে মন্ত্রৌষধির মতো জীর্ণ-শীর্ণ-অবসন্ন সমাজদেহ দিব্যকান্তিতে পরিপুষ্টি লাভ করবে, যা সর্বৈব সত্য।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমঘন মূর্তি বিভিন্ন ধর্মের নির্যাসে গড়ে উঠেছে বলে তিনি 'অবতারবরিষ্ঠায়'রূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহস্র সহস্র শান্তিপ্রিয় মুক্তিকামী মনীষীদের নিকট শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর এই প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে নির্বাণ-ধর্মের প্রধান উদ্গাতা করুণাঘন বুদ্ধের মহান জীবন-আদর্শের প্রভাব পরমাণুর মতো ক্রিয়াশীল ছিল বলে তিনি আজ আধ্যাত্মিক জগতে সূর্যালোকের ন্যায় দেদীপ্যমান। তাঁর জীবনের এ মহান রূপায়ণ বিভিন্ন সাধকের সাধনার ধারায় অভিষিক্ত, যা অত্যুক্তি নয়। একারণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতাগুচ্ছ নির্মাল্য তাঁর পদতলে অর্ঘ্য দিতে গিয়ে লিখলেন—

> "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,
> ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা ;
> তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
> নতুন তীর্থ রূপ নিল এজগতে,
> দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
> সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।"

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপন্থা বহু স্রোতধারায় প্রবাহিত হয়েছে সত্য, কিন্তু দিগ্-দর্শন নির্ণয়কারী চুম্বকের মতো তাঁর লক্ষ্য ছিল একই। এ লক্ষ্যস্থলকে কেন্দ্রবিন্দু করে তিনি একজন বৈজ্ঞানিকের মতো তাঁর সাধনার বিজ্ঞানা-গারে সকল ধর্মের মৌল বিষয় সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে এর সত্যতা নিজ জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। সবকিছু জানার মধ্যেই যে আপন সাধনপথের পরিপূরকরূপে সহায়তা করতে পারে, তা তিনি দিব্যজ্ঞানে উপলব্ধি করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর বিভীষিকা দর্শনে দুঃখ থেকে মুক্তির অভীপ্সায় সংসার ত্যাগ করেছিলেন। সত্যকে সত্যভাবে জানা এবং তার প্রকৃত তত্ত্বকে উপলব্ধি করার জন্য গৌতম সিদ্ধার্থ ঋষি-আরাঢ় কালাম ও রামরুদ্রক পুত্রের নিকট গিয়েছিলেন। তাঁদের নিকট যোগশিক্ষা করে প্রকৃত মুক্তির সন্ধান খুঁজে পাননি বলে নিজেই বোধিদ্রুম-মূলে পরম সত্য বোধিপ্রাপ্তিতে সম্যক্ সম্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বুদ্ধানুরাগী শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণ নানা পথে সাধনা করেও তিনি আপন

* শ্রীমৎ ধর্ম রক্ষিত মহাথের, সভাপতি, কনকস্তূপ, বৌদ্ধবিহার, কুমিল্লা, বাংলাদেশ।

লক্ষ্যস্থল থেকে কক্ষচ্যুত না হয়ে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রপঞ্চময় বিশ্ব দুঃখার্ণবে নিমজ্জিত। এর থেকে মুক্ত হতে হলে চাই সাধনা। তাই গৌতম সিদ্ধার্থ তাঁর যৌবনের ক্রান্তিলগ্নে বিশাল শাক্য-রাজ্যের অদমনীয় প্রলোভন, দিব্যকান্তির অধি-কারিণী যশোধরার (গোপাদেবী) রূপ-লাবণ্য এবং সদ্যোজাত পুত্র রাহুলের চাঁদবদন তাঁর বিরাগী মনকে কিছুতেই সংসারের প্রতি আকর্ষণ করতে পারেনি। ভগবান বুদ্ধের এ মহৎ শিক্ষাই যেন মুক্তপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শনে বিশেষভাবে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। তাই দেখা যায়, বাল্যকালে 'চাল কলার বিদ্যা' তাঁর মুক্ত জীবনের ভারী ফলকে কালোচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাই তিনি পার্থিব জগতের সব বিদ্যা ত্যাগ করে পারমার্থিক জগতের শিক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। বুদ্ধানুরাগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যেন পারমার্থিক বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। এ যেন মহানির্বাণের উদার ধর্মনীতি। বুদ্ধের মতো তিনি অন্ত্যজ-জাতীয় মহিলা রানী রাস-মণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পুজারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া ব্রাহ্মণের পুত্র হিসাবে প্রথম যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে ধাত্রীমার হাতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করে জাতির নামে যে বজ্জাতি চলছে, তার অন্তর্মূলে কুঠারাঘাত করলেন। ভগবান বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দও চণ্ডালিনী কন্যা প্রকৃতির হস্তে জল পান করে জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণও জাত্যাভিমান যে নিরর্থক, ধর্মের অঙ্গ নয় তা স্বীয় আচরণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন। বুদ্ধের শিক্ষাও এরূপ ছিল।

সর্বভূতে আত্মদর্শনই হচ্ছে মহাত্মাদের জীবনদর্শন। সর্বজীবের মধ্যে বুদ্ধাঙ্কুর রয়েছে, সব জীবই সমান সুখ-দুঃখের ভাগী, ভগবান বুদ্ধের এ মহৎ শিক্ষা যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সার্থক আধ্যাত্মিক জীবনে প্রতিফলিত। ভগবান বুদ্ধের এ মহান বাণীর রূপকাররূপে আমরা শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই, গঙ্গাবক্ষে মাঝিদের লাঠালাঠির আঘাত তাঁর মনকে চৌচির করে । 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু দর্শনের কয়েকটি অক্ষরের মধ্যেই সীমিত রইল না, জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন স্বয়ং বুদ্ধানুরাগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

কামিনী ও কাঞ্চন গ্রহণ ও সংস্পর্শ সাধক-জীবনের প্রধান অন্তরায়। ভারতীয় সাধকেরা এ দুটো বিষয় থেকে বিবর্জিত। ভগবান বুদ্ধের শ্রাবকগণ এ অনুশীলনে ব্রতী হয়ে সর্ব-দুঃখ অন্তঃসাধন করে পরম সুখময় নির্বাণকে প্রত্যক্ষ করছেন স্বীয় বীর্যবলে। তেমনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণও সহধর্মিণী সারদামণিকে অর্ধাঙ্গিনীরূপে লাভ করেও তাঁকে মন্দিরে অধিষ্ঠিতা দেবীর ন্যায় পুজা করেছিলেন। কাঞ্চনের সংস্পর্শ বিষতুল্য মনে হতো তাঁর জীবনে। টাকা আর মাটি, মাটি আর টাকা-এর মধ্যে অভেদ-জ্ঞান জন্মেছিল বলে মাটি-জ্ঞানে টাকা গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান বুদ্ধের ভাবে ভাবিত হয়ে তাঁর অশেষ করুণাধারা আপন হৃদয়কোষে সঞ্জীবিত করে ধ্যানমুখী মুখকে সূর্যমুখীর মতো ঊর্ধ্বগামী করে সাধকজীবনকে সার্থক করেছিলেন। তাই দেখা যায়, যখন তিনি বাহ্যিক জগতের এক-একটি সিঁড়ি অতিক্রম করে আধ্যা-ত্মিক জগতের উঁচু সিঁড়িতে অধিরোহণ করেছিলেন, সেসময়ও তাঁর শয়নকক্ষে ভগবান বুদ্ধের ছবি সংরক্ষিত ছিল। তাঁর বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। বুদ্ধের ভাবের অন্ত-লান্তিকে নিমজ্জিত হয়ে তিনি যেন মৈত্রী-করুণা-মুদিতার অমৃতোপম পীযূষধারায় অবগাহন করে পরম শান্তি পেতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ কৃপায় যাঁর অবহেলিত জীবনের দিব্য পরিবর্তন এসেছিল, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি যখন বুদ্ধ-চরিতে অভিনয় করতেন তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তা দর্শন করে অভিভূত হতেন। বুদ্ধের ভাবে ভাবিত হয়ে ক্ষণিকের জন্য আধ্যাত্মিক তরঙ্গে যেন তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) ভাসমান অবস্থায় নিজের 'আমিত্ব' হারিয়ে ফেলতেন। এ ভাবের দ্বারা একথা অনুমিত হয় যে, তিনি ভগবান বুদ্ধের মহৎ জীবনের প্রতি অতিশয় অনুরাগী ছিলেন।

ভগবান বুদ্ধের জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর ধারণা ছিল অতি সুস্পষ্ট। তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বুদ্ধ

সম্পর্কে বলতেন ঃ "শুধু মুখে বলতে পারেননি এই যা, বুদ্ধ কি জানো? বোধরূপে চিন্তা করে করে তাই হওয়া, বোধস্বরূপ হওয়া। যেখানে স্বরূপের শেষ, যেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা।"

ভগবান বুদ্ধের মহান জীবন ও বাণী আপন জীবনসাধনার দ্বারা তিনি জীবনে রূপায়ণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি ভগবান বুদ্ধের কোন প্রসঙ্গে উদ্দীপিত হতেন। দেখা যায়, তাঁরই প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্র, উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভগবান বুদ্ধের বোধিজ্ঞান লাভের স্থান বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে আসেন, তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বুদ্ধ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে শুনতে ইচ্ছা করলে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন ঃ "ঈশ্বর আছে কি নেই, এ নিয়ে মাথা ঘামাননি বুদ্ধ। তিনি শুধু দয়া দিয়েছিলেন। একটা বাজপাখি শিকার ধরে খেতে যাচ্ছিল তাকে বাঁচাবার জন্য বুদ্ধ বাজপাখিকে তাঁর গায়ের মাংস কেটে দিয়েছিলেন। যাদের কিছু নেই, ঐশ্বর্য নেই, তারা কি ত্যাগ করবে?" বিবেকানন্দের মুখে ভগবান বুদ্ধের এ মহান ত্যাগের কথা শুনে ভাবে অভিভূত হলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। এত বড় ত্যাগধর্মের কথা শুনেও যেন তাঁর প্রাণ ভরল না। স্বামী বিবেকানন্দকে আরও কিছু বলতে বলায় তিনি পুনরায় বুদ্ধ প্রসঙ্গে বললেন ঃ "তপস্যায় সিদ্ধ হয়ে নির্বাণ লাভ করে বুদ্ধ এলেন কপিলাবস্তুতে।... ছেলেকে, স্ত্রীকে, রাজবংশের অনেককে বললেন বৈরাগ্য নিতে। দেখুন, কি মহৎ চিত্তের রাজভাণ্ডার এনেছেন বুদ্ধ। আর এদিকে ব্যাসদেবের কাণ্ডটা দেখুন! শুকদেবকে বারণ করলেন বৈরাগ্য নিতে। বললেন ঃ 'পুত্র! সংসারে থেকে ধর্ম কর।'"

স্বামী বিবেকানন্দের মুখে ভগবান বুদ্ধের এমন মহৎ জীবনের আদর্শের কথা শুনে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিজেকে ভুলে গেলেন। অপলকনেত্রে চেয়ে আছেন শিষ্যের মুখপানে। তাঁর অমল চাহনিতে যেন জানার আগ্রহের ছাপ ফুটে উঠেছে। সে-ভাব দেখে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন ঃ "শক্তি ফক্তি কিছু মানতেন না বুদ্ধ। তাঁর শুধু নির্বাণ। গাছতলায় তপস্যায় বসলেন, বসলেন একাসনে। আর বললেন ঃ 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং। যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাণ লাভ হয়, ততক্ষণ শরীর শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে যাক ; উঠব না আসন ছেড়ে। শরীরই বদমায়েস। ওকে জব্দ না করলে কিছু হবার নয়'।" [শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উক্তিগুলি 'কথামৃত'-এ একটু অন্যরকম। দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় খণ্ড, উদ্বোধন সং, ১৩৯৪, পৃঃ ১১২৮-১১২৯—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন।]

ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যে কিরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের দীক্ষাকালীন ঘটনাটিই এর প্রমাণ করে। এক সময় বিবেকানন্দ তাঁর সহপাঠী তারক আর কালীপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম-মূলে বসেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে বললেন ঃ "নিজেই নিজের মুক্তি, নিজেই নিজের আশ্রয়, নিজের হাতেই নিজের মুক্তির চাবিকাঠি।" ভগবান বুদ্ধের প্রতি এরূপ অনুরাগ উৎপন্ন হলে স্বামী বিবেকানন্দ যেন একটা দিব্যজ্যোতির ঝলকে ক্ষণিকের জন্য ডুবে যান। সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে চেয়েছিলেন সন্ন্যাসীর পরম প্রাপ্তি নির্বিকল্প সমাধি। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণও উপলব্ধি করলেন ভগবান বুদ্ধের অশেষ কৃপায় স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়ভূমি উর্বর হয়েছে। তাঁর দীক্ষার উপযুক্ত কাল সমুপস্থিত। তাই তিনি তাঁরই অন্যতম শিষ্য গঙ্গাধরকে আদেশ দিলেন ঃ "যা, কলকাতা থেকে শঙ্খকুণ্ডল কিনে নিয়ে আয়। তা দিয়ে সাজিয়ে দেব নরেনকে। জানিস, কুণ্ডল ধারণে বুদ্ধ সিদ্ধ হন, নরেনও তেমনি সিদ্ধ হবে।" [উপরোক্ত ঘটনাটির সূত্র লেখক জানাননি। —যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন।]

বুদ্ধ-জীবনে যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা ফুটে উঠেছিল তারই প্রতিধ্বনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। এ-কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ বুদ্ধের প্রতি কত অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য।* □

* উদ্দীপন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃঃ ৭০-৭৩ ; প্রকাশস্থান—ঢাকা, বাংলাদেশ।

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

স্বামী অখিলানন্দ

ভাষান্তর : সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি স্বামী আত্মবোধানন্দের সঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের দর্শন-মানসে বলরামবাবুর বাড়িতে যাই। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ তখন সেখানে ছিলেন। আমরা বলরামবাবুর বাড়ির কাছে গিয়ে দেখি আসন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের আয়োজনের জন্য প্রেমানন্দ মহারাজ বাইরে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করতে তিনি স্নেহমাখা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেন এবং আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য ফিরে এলেন। তিনি আমাদের বললেন : "একদিন মঠে এস, মহারাজ এখন মঠেই রয়েছেন।"

দু-তিনদিন পর শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি দিবসে অপর একজন যুবকের সঙ্গে আমরা দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। কয়েক ঘণ্টা ভবতারিণীর মন্দির ও শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে অতিবাহিত করে নৌকাযোগে আমরা বেলুড় মঠে এলাম, মঠে নেমেই আমরা স্বামী তুরীয়ানন্দজীর দর্শন পেলাম। তিনি বললেন : "মহারাজ এখানেই রয়েছেন, যাও তাঁকে দর্শন কর।"

আমরা মঠবাড়ির কাছে গিয়ে শুনলাম, মহারাজ মন্দিরে আছেন। শুনে আমরাও মন্দিরে গেলাম। সেদিন আমরা এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখলাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে হাওয়া করছেন, ওদিকে পুজো চলছে, মহারাজের সমগ্র মুখমণ্ডল এক দিব্য আনন্দের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। একটু পরে মহারাজ মঠপ্রাঙ্গণে নেমে এলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি উপস্থিত সকলকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর আমরা সকলেই তাঁর সঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। প্রসাদ গ্রহণের সময় তাঁর কাছে বসেছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ।

কয়েকদিন পর শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। ঐদিন খুব ভোরে আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দর্শন করতে এলাম। সেদিন তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। তাঁকে দর্শন করে প্রণাম করলে তিনি দু-একটি করুণামাখা কথা বললেন। সেদিন সেই সাক্ষাতের স্মৃতির সঙ্গে আমার নিজের আচরণের কথা মনে পড়ে হাসির উদ্রেক হয়। যেই একদল নতুন দর্শনার্থী আসে, আমি তাদের সঙ্গে মিশে প্রতিবারই গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করছি। আর যতবারই আমি যাচ্ছি ততবারই মহারাজ করুণাঘন হাসি দিয়ে আমাকে অভিসিঞ্চিত করছেন। এইভাবে চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শেষে একদল সুদক্ষ গায়ক এলেন, তাঁরা ভক্তিমূলক গান গাইছিলেন। গান শুনতে শুনতে মহারাজের ভাবসমাধি হলো।

এই দর্শনের পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুন প্রায় বৎসরাধিক কাল আমাকে দূরে থাকতে হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য এলাহাবাদ যাত্রার প্রাক্কালে আমি কলকাতায় বলরাম মন্দিরে মহারাজকে দর্শন করতে গেলাম। আমার সঙ্গে মহারাজ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন এবং এলাহাবাদে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে দর্শন করতে বলে দিলেন। তারপর একজন প্রাচীন সন্ন্যাসীকে বলে দিলেন আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে দিতে।

একটু সুস্থ হবার পর এলাহাবাদে যাই, সেখানে থাকাকালে প্রায় প্রতিদিনই আমি পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দজীকে দর্শন করতে যেতাম। কলকাতায় ফেরার সময় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ আমায় বললেন, আমি যেন মহারাজের নিকট আমার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি জাগিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা জানাই। আমি তাঁকে বললাম : "আপনি কেন আমার মধ্যে ঐ শক্তি জাগিয়ে দিচ্ছেন না?" উত্তরে তিনি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন : "না।

তুমি মহারাজের কাছে যাও, তিনি অধ্যাত্মশক্তির এক বিরাট উৎস। তাঁর অনুভূতির শেষ নেই।"

কলকাতায় এসেই আমি মঠে গেলাম, পুনরায় আমার প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটল এবং আমি মঠে রাত্রিবাসের জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি তক্ষুণি আমাকে মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। মহারাজ তখন গঙ্গার দিকে মুখ করে একলা বসেছিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করতে প্রেমানন্দ মহারাজ বললেন, আমি মঠে রাত্রিবাস করতে চাইছি। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন এবং প্রেমানন্দ মহারাজ মায়ের মতো যত্ন নিয়ে আমার থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। প্রাচীন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একই ঘরে আমাকে সেদিন থাকতে দেওয়া হলো।

পরের দিনটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। সকালবেলায় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি তা মহারাজকে নিবেদন করলাম। মহারাজ বললেনঃ "তুমি বিজ্ঞানানন্দকেই কেন বললে না তোমার অধ্যাত্মশক্তি জাগিয়ে দিতে?" আমি বললামঃ "বলেছিলাম।" বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ আমাকে যা বলেছিলেন সব তাঁকে বললাম। শুনে মহারাজ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ সেইভাবেই রইলেন। তারপর বললেনঃ "আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত করতে হলে তার প্রস্তুতি প্রয়োজন। তোমায় দীক্ষা নিতে হবে।" আমি তৎক্ষণাৎ বললামঃ "আমার যা যা দরকার আপনিই করে দিন।" আমাকে তিনি প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিলেন এবং পুনরায় উপদেশাদির জন্য কয়েকমাস পরে যেতে বললেন।

নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে আমি মহারাজকে দর্শন করতে কাশী গেলাম। কারণ, তিনি তখন কাশীতে ছিলেন। রাত চারটের কিছু পরে আমি মঠে গিয়ে পেঁছালাম। মহারাজের ঘরের নিকটে যেতে মহারাজ এবং তাঁর সচিব-সেবক স্বামী শঙ্করানন্দ একই সঙ্গে নিজ নিজ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। মহারাজ আমাকে দেখে খুশি হলেন। দিন কয়েক কাশীতে ছিলাম। ঐসময় মহারাজ আমাকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি এবং খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন।

একদিন মহারাজ কাশীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের কথা বলছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, কাশীতে মৃত্যু হলে মৃত্যুর সময় মুক্তিলাভ হয়। আর একদিন মহারাজ বললেন, কাশীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ এমনই যে, এখানে সামান্য ধ্যানাদি করলেই উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হয়। অপর একদিন তিনি বললেন, বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে দিনের বিভিন্ন সময়ে আধ্যাত্মিক তরঙ্গ অনুভূত হয়। একথা যদি কারও জানা থাকে আর সে যদি যখন সেই তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে তখন সাধন-ভজন করে তাহলে সে তাতে ডুবে যেতে পারে।

দিন কয়েক পর কাশী থেকে ফিরে আসি। কয়েক মাসের মধ্যে আবার মহারাজকে দর্শন করতে কাশী যাই দুর্গাপূজার সময়। ঐসময় মহারাজ আমার প্রতি মায়ের মতো যে ভালবাসা দিয়েছিলেন তা কখনো ভুলবার নয়। এবারও তিনি আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন।

কিছুকাল পর আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে কলকাতায় ফিরে আসি। প্রতিদিন বিকাল হতে না হতে মহারাজকে দর্শন করতে যেতাম। আমি চাইতাম না কেউ আমার মঠে যাওয়ার ব্যাপার জেনে ফেলে অসুবিধা সৃষ্টি করে। এই সময় একদিন মহারাজ আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদির জন্য পরদিন যেতে বললেন। আমি মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। উনি হেসে বললেনঃ "আসিস, সব ঠিক হয়ে যাবে।" আমিও হেসে ফেললাম। মহারাজ তাহলে আমার গোপনতার কথা জানেন। বাস্তবিক দেখা গেল, সব কথাই তিনি জানেন। আশ্চর্যের কথা তার পরদিন থেকে এব্যাপারে আমার সব অসুবিধা দূর হলো। কিভাবে মহারাজ আমার পথের সব বাধা দূর করে দিলেন তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না।

আমার দীক্ষার আগে আমি ঘন ঘন মহারাজকে দর্শন করতে যেতাম। একদিন মঠবাড়ির বারান্দায় মহারাজ চুপ করে বসেছিলেন। এমন সময় প্রেমানন্দ মহারাজ তাঁর সামনে এসে মজা করে বললেনঃ "মহারাজ, আপনি এই ছেলেটাকে এত ঘন ঘন আসতে দেন কেন?" মহারাজ একবার আমার

দিকে, একবার প্রেমানন্দ মহারাজের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেনঃ "তুমি কি মনে কর আমি ওকে মঠে আসতে দিই? ও যেমন খুশি আসবে যাবে—এটা ওর নিজের জায়গা।" তারপর দুজনেই মধুর হাসা বিনিময় করলেন। বলা বাহুল্য, মহারাজের কথা শুনে আমার খুবই আনন্দ হলো।

একদিন মহারাজ আমাকে বললেন যে, আমার কলেজের পড়াশুনো শেষ হলে আমি মঠে যোগদান করতে পারব। অবশেষে মহারাজ স্থির করলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির দিন আমার দীক্ষা হবে। ঐদিন খুব ভোরে ফুল ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে কলেজের ছাত্রাবাস থেকে মঠে পেঁছালাম। মহারাজের ঘরে জিনিসগুলি রাখতে গেলে তিনি আমাকে গঙ্গাস্নান করে মন্দিরে যেতে বললেন, ততক্ষণে তিনিও মন্দিরে যাবেন। আমি সবে স্নান করে তৈরি হয়েছি এমন সময় তিনি আমাকে একজন নবীন সাধুকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন। মহারাজ ইতিমধ্যে পুরনো মন্দিরে চলে গিয়েছেন। আমি ছুটতে ছুটতে মন্দিরে এলাম। আমার দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়তেই তাঁর এমন রাজরাজেশ্বর মূর্তি দর্শন করলাম যে বলার নয়। তিনি তখন মূল মন্দিরের বারান্দায় আমার প্রতীক্ষায় পায়চারী করছিলেন। "আয়, বাবা আয়।" বলে তিনি আমায় ডাকলেন। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁকে অনুসরণ করলাম, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। মন্দিরে তখন শুধু আমরা দুজন। আমি তখন একটি খোকা বালক ছিলাম। দীক্ষার পর যে গুরুকে প্রণাম ও গুরুদক্ষিণা দিতে হয়, তা আমি জানতাম না। আমি মন্দির থেকে বের হতে যাচ্ছি এমন সময় তিনিই আমার হাতে একটি ছোট্ট ফুল দিয়ে তাঁর পায়ে দিতে বললেন।

সেদিনের বিশেষ পূজাদির পর স্বামী প্রেমানন্দ এবং মঠের অন্যান্য প্রাচীন সাধুগণ প্রসাদ পেতে বসলেন। আমিও বসলাম। কয়েকশত লোক সেদিন মঠে এসেছিলেন। বিকালের দিকে আমি বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ব ভেবে মহারাজ আমাকে ছাত্রাবাসে ফিরে যেতে বললেন।

১৯১৬ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের অধিকাংশ সময়ই মহারাজ বেলুড় মঠ ও কলকাতায় বলরাম মন্দিরে অতিবাহিত করেন। ঐ সময় আমার মতো আরও কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে এসে তাঁর চরণ-তলে মিলিত হয়। তারাও তখন তাঁকে ঘন ঘন দর্শন করতে আসত। এইভাবে আমাদের একটি দল গড়ে উঠল। আমরা সকলে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলাম। এইভাবে আমাদের সময় কাটতে লাগল। আমি তখন প্রতিদিন বিকেলে কিম্বা সন্ধ্যা নাগাদ তাঁকে দর্শন করতে যেতাম।

আমার জীবনে সেদিনটি ছিল এক পুণ্যদিন, যেদিন আমি মঠে মহারাজ, অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ভক্তকে খাবার পরিবেশন করলাম। তারপর নিজে খেতে না বসে মহারাজকে খাবার সময় বাতাস করতে লাগলাম। মহারাজ অন্যদের উপস্থিতিতে কিছুই বললেন না। কিন্তু হাত-মুখ ধোবার সময় বললেনঃ "তুই খেলি না কেন? তোকে নিয়ে তো এই মুস্কিল!" আমি তাঁর সেই স্নেহমাখা কথা অথচ করুণাসিক্ত অভিব্যক্তি জীবনে ভুলব না। আমার স্বাস্থ্যের জন্য তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। একবার তিনি আমায় বলেছিলেনঃ "ডাক্তারের নির্দেশমত সবকিছু খাবি। তুই তো গোঁড়া পরিবারের ছেলে, কিন্তু একটু গঙ্গাজল খেয়ে নিয়ে সব কিছু খেয়ে ফেলবি।" ছাত্রাবাসে থাকবার সময় মহারাজ আমাকে খাঁটি মাখন ও ঘি খাবার জন্য বারবার বলতেন। তিনি সর্বদা আমার কল্যাণ-চিন্তা করতেন।

সন্ধ্যা হয়ে এলে ধ্যান-ভজনের পর সন্ন্যাসী ও ভক্তরা মহারাজের কাছে আসতেন। তখন কখনো কখনো ভক্তিমূলক গান গাওয়া হতো। কখনো বা গভীর নীরবতা রক্ষা করা হতো। সেসময় আমরা সবাই একসঙ্গে বসে ধ্যান করতাম। সেসব বাস্তবিকই ছিল অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। কেউ প্রশ্ন না করলে এসময় মহারাজ কদাচিৎ কথা বলতেন। যদি আমাদের সাধন-ভজনের কোন ব্যাপারে কোন নির্দেশের প্রয়োজন হতো আমরা খুব সকালের দিকে বা বিকালের দিকে তাঁর কাছে যেতাম। আমরা তাঁর প্রতি এক অনির্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করতাম। মনে হতো, আমাদের সমস্ত সত্তা একটি উচ্চ ও মহিমান্বিত কোন কিছুর দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। [ক্রমশঃ]

নিবন্ধ

শ্রীমা সারদাদেবীর প্রথম গৃহীত আলোকচিত্র

পীযূষকান্তি রায়

শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর নাম শোনেননি বা তাঁর আলোকচিত্র দেখেননি এমন কোন শিক্ষিত মানুষ ভারতবর্ষে আছেন বলে মনে হয় না। মাথায় ঘোমটা, চুল ডান কাঁধ বেয়ে বুকে লুটিয়ে পড়েছে, কোলের ওপর দুই হাত ন্যস্ত, পরণে লাল নরুণ-পাড় শাড়ি, হাতে সে-আমলের জনপ্রিয় 'ডায়মন-কাটা' সোনার বালা, গলায় সোনার হার, দুই পা ঢাকা, শুধু দু-পায়ের বুড়ো আঙুল দেখা যাচ্ছে। তিনি একটি আসনে বসে আছেন, কোমলতার প্রতিমূর্তি। দু-চোখের দৃষ্টিতে স্নেহ যেন ঝরে পড়ছে। শ্রীমা সারদাদেবীর এই আলোকচিত্র আজ ভারতের অগণিত পরিবারের ঠাকুরঘরে ও অন্যত্র দেখা যায়। ভারত ও বহির্ভারতের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের এবং অসংখ্য প্রাইভেট আশ্রমের পূজাবেদিতে প্রতিষ্ঠিত ও নিত্য-পূজিত সেই অতি বিখ্যাত আলোকচিত্রই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

শেষ অসুখে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য দক্ষিণেশ্বর ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির উত্তর-পশ্চিমের যে-ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতেন, সে-ঘর থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ উত্তরে দোতলা নহবতের একতলার ছোট্ট ঘরটিতে অবগুণ্ঠিতা শ্রীমা সারদাদেবী অবস্থান করতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আসেন ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে।[১] তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর। তিনি ছিলেন পল্লীগ্রামের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা ও বধূ। সে-আমলের সমাজ, বিশেষতঃ গ্রামীণ সমাজ ছিল অতিমাত্রায় পর্দানশীন। শ্রীমা ছিলেন আবার অত্যধিক লজ্জাশীলা। ফলে তিনি ঐ নহবতের ছোট্ট ঘরটিতে অবগুণ্ঠিতা হয়ে থাকতেন ও স্বামীর সেবা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী নহবতে আছেন—একথা ভক্তমহলে জানা থাকলেও শ্রীমাকে দেখার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের তদানীন্তন খাজাঞ্চি একদা মন্তব্য করেছিলেনঃ "তিনি এখানে আছেন বটে শুনতে পাই, কিন্তু কখনো দেখিনি।"[২]

সে-সময়ে ব্লাউজ, সেমিজ ও সায়া-সমেত শাড়ি পরার রেওয়াজ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়নি। শ্রীমায়ের ফটো দেখলেই দেখা যায় তাঁর উত্তরচ্ছদ শুধু শাড়ির আঁচল আর বিন্যস্ত চুল। সে-আমলে বাংলার গ্রাম ও শহরে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের আধুনিক বেশবাসের রীতি বা ফ্যাশন প্রচলিত হয়নি এবং মেয়েদের মধ্যে ফটো তোলানোর শখ একেবারেই ছিল না। লজ্জাশীলতাই সম্ভবতঃ তার প্রধান কারণ ছিল। এছাড়া সাধারণের পক্ষে ফটো তোলানো তখন ব্যয়বহুল বিলাস বলেই গণ্য হতো। ভারতীয় রাজন্যবর্গ, জমিদার ও আধুনিক ধনী পরিবারদের মধ্যেই ফটো তোলার শখ দেখা যেত। গ্রামাঞ্চলের প্রাচীনপন্থী সম্পন্ন পরিবারের অন্তঃপুরিকারা এবিষয়ে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। 'পরপুরুষ' ফটোগ্রাফারের সামনে ঘোমটা খুলে, স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও, ক্যামেরার দিকে চেয়ে থাকা

১ Sri Sarada Devi—A Biography in Pictures—Advaita Ashrama, Calcutta, 1st Edn., 1988, Appendix-A, p. 103

২ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা—স্বামী সারদেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৯০, পৃঃ ৩

তাঁরা লজ্জাজনক ঘটনা বলেই মনে করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় যে-তিনটি ফটো তোলা সম্ভব হয়েছিল, তার ব্যবস্থা ও খরচ বহন করেছিলেন তাঁর জনকয়েক অনুরাগী গৃহীভক্ত। এমনকি, মহাসমাধির পরে (১৬ আগস্ট ১৮৮৬) কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে-দুটি আলোকচিত্র গৃহীত হয় তাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর অন্যতম চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও উপস্থিত কতিপয় গৃহীভক্তের চাঁদার সাহায্যে। সে-আমলের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শ্রীমায়ের ফটো তোলা সম্পর্কে কেউ মাথা ঘামাননি বা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। তাছাড়া অর্থব্যয় করে সাহেবপাড়া চৌরঙ্গী, মধ্য কলকাতার রাধাবাজার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট অথবা ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট থেকে কোন পেশাদার ফটোগ্রাফারকে তলব করে বাড়িতে এনে বা সেখানে স্টুডিওতে গিয়ে ফটো তোলানো সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অতএব মার্চ ১৮৭২ থেকে নভেম্বর ১৮৯৮ পর্যন্ত দীর্ঘ সাতাশ বছর ক্যামেরার সাহায্যে শ্রীমায়ের কোন ফটো তোলা হয়নি।

আজ থেকে প্রায় চুরানব্বই বছর আগে শ্রীমায়ের ফটো কলকাতার ১০/২, বোসপাড়া লেনের (বাগবাজার) যে-বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতা ভাড়া থাকতেন সেই বাড়িতে তোলা হয়।[৩] দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের সংলগ্ন শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরের (বিষ্ণুঘরের) রোয়াকে ধ্যানস্থ, আদুড় গায়ে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অতি বিখ্যাত ফটোর মতোই শ্রীমায়ের এই ফটোও অতি বিখ্যাত। বহু প্রতিষ্ঠান তাঁদের ব্যবসার সিদ্ধি, প্রচার ও প্রসারকল্পে এই ফটোর ক্যালেন্ডার ছাপিয়ে বিতরণ করে থাকেন। বহু ভক্তের গাড়িতে, কলকাতা, হাওড়া এবং শহরতলীর বহু বাস, মিনিবাস ও ট্যাক্সি চালকদের আসনের সামনে শ্রীমায়ের এই বিখ্যাত ফটো প্রদর্শিত হতে দেখা যায়। তাঁর এই প্রতিকৃতিসম্বলিত লকেট বর্তমানে বহু ভক্তের কণ্ঠে মাঙ্গলিক প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসম্বরণের বারো বছর পরে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি শ্রীমায়ের অপরিসীম স্নেহ-কৃপা লাভে ধন্যা মিসেস সারা ওলি বুলের কাছ থেকে শ্রীমায়ের ফটো তোলার প্রথম প্রস্তাব আসে।[৪] [মিসেস ওলি বুল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে বিশেষ পরিচিতা। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস সারা ওলি বুল ও মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হন। এঁরাই প্রথম তিন বিদেশিনী, যাঁরা শ্রীমায়ের দর্শনলাভ করেন।[৫] স্বামী বিবেকানন্দ মিসেস বুলকে 'ধীরা মাতা' নামে অভিহিত করতেন।] মিসেস ওলি বুলের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, শ্রীমায়ের একটি আলোকচিত্র প্রতিদিন স্মরণ-মনন ও অনুধ্যানের জন্য তাঁর দেশে (আমেরিকায়) নিয়ে যান। এই ফটো তোলার প্রস্তাবে প্রথমে শ্রীমায়ের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কন্যাসম মিসেস বুলের আন্তরিক অনুরোধ তিনি এড়াতে পারেননি। তিনি রাজি হন বটে তবে তার আগে একটি শর্ত আরোপ করেন। এই শর্ত ও ফটো তোলা প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একাদশ অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা দিয়েছেন: "১৩০৫ সালে [১৮৯৮] শ্রীযুক্তা ওলি বুল মায়ের ছবি তোলাইতে চাহিলে স্টুডিওতে যাওয়া বা অপরিচিত ফটোগ্রাফারের সম্মুখে ঘোমটা খোলা ব্রীড়াশীলা মায়ের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া তিনি প্রথমে অসম্মত হন। কিন্তু পরে ওলি বুলের আকুল মিনতিতে অগত্যা মহিলা ফটোগ্রাফার আনিতে বলিলেন। তাহা যখন সম্ভব হইল না তখন তিনি কোন সাহেবকে আনিতে বলিলেন; কারণ সাহেবদের দেশে মেয়েদের ফটো তোলা নিত্যকার ব্যাপার।

৩ Sri Sarada Devi—A Biography in Pictures, p. 62

৪ শতরূপে সারদা—রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯২, পৃঃ ১৪৯

৫ ঐ, পৃঃ ৩২০

সাহের আসিতেই মা তাঁহার লজ্জাশীলতা কাটাইয়া ফটো তুলিতে বসিলেন।”[৬]

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, লজ্জাশীলা শ্রীমায়ের ফটো নেওয়ার জন্য মিসেস বুলের পক্ষে মহিলা ফটোগ্রাফার যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁকে পুরুষ ইংরেজ ফটোগ্রাফারকে ডাকতে হয়েছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন মনে জাগে, সেসময়ে কলকাতায় কি কোন মহিলা ফটোগ্রাফার আদৌ ছিলেন না? ফটোগ্রাফি সম্পর্কে প্রকাশিত গ্রন্থাদি ও পত্রিকা থেকে জানা গেছে, সে-আমলে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে জনকয়েক পেশাদারী মহিলা ফটোগ্রাফার তাঁদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং প্রাচীনপন্থী অন্তঃপুরিকাদের কাছ থেকে ডাক পেয়ে তাঁরা বাড়িতে গিয়েও ফটো তুলতেন। এর সমর্থন পাওয়া যায় ফটো-বিশেষজ্ঞ সিদ্ধার্থ ঘোষের এক লেখা থেকে: “…পর্দানশীন অন্তঃপুরিকাদের ছবি তোলার জন্য মহিলা ফটোগ্রাফারদের ডাক পড়েছিল। মিসেস ই. মায়ার সম্ভবতঃ প্রথম মহিলা, যিনি ভারতে ১৮৬৩-তে ৭নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কর্নারে স্টুডিও খুলেছিলেন। ১৮৮৫-র ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, বিবি উইন্স নামে এক মহিলা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে মেয়েদের ছবি তুলছেন ও ছবি-তোলা শেখাচ্ছেন। …বাঙালি মহিলাদের মধ্যে প্রথম ফটোগ্রাফিক স্টুডিও স্থাপন করেন সরোজিনী ঘোষ। ১৮৯৮-এ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে ৩২ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে তাঁর ‘মহিলা আর্ট স্টুডিও ও ফটোগ্রাফিক স্টোর্স’-এর কথা জানা যায়।”[৭] এ-অবস্থায় এটা ধারণা করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, মিসেস বুল সম্ভবতঃ জানতেন না যে, সে-সময়ে কলকাতার পেশাদারী মহিলা ফটোগ্রাফার সহজপ্রাপ্য ছিলেন, নইলে তাঁর মতো একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী মহিলার পক্ষে একজন মহিলা ফটোগ্রাফার সংগ্রহ করা মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। যাহোক, মহিলা ফটোগ্রাফারের অভাবে নিবেদিতার আবাসে ইংরেজ ফটোগ্রাফার মিস্টার হ্যারিংটনকে তলব করা হয়েছিল এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর **প্রথম** ফটো তোলা হয় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি।[৮] শ্রীমায়ের এই ফটোগ্রাফই প্রথম [যদিও আক্ষরিক অর্থে দ্বিতীয়], কারণ ঐ একই দিনে, একই আসনে (একা বসে থাকা ভঙ্গিতে) ও একই ক্যামেরাম্যান দ্বারা পর পর দুটি এক্সপোজার নেওয়া হয়।[৯] প্রথম ছবিটির চেয়ে দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক ছিল এবং এই ফটোতে শ্রীমায়ের পায়ের ডগা কিছুটা দেখা যাচ্ছে ও তিনি চোখ খুলে আছেন বলে মিসেস বুল তাঁর প্রয়োজনে প্রথম ফটোটি বাতিল করে দ্বিতীয়টি বেছে নেন। এই বিশেষ ফটো-দুটি তোলার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী গোলাপ-মা, নিবেদিতা, মিসেস বুল ও ক্যামেরাম্যান মিস্টার হ্যারিংটন। বিবেকানন্দ-অনুরাগী মিস ম্যাকলাউডও যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সে-তথ্য পাওয়া যায় প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার এক গ্রন্থ থেকে: “…নভেম্বর মাসের [১৮৯৮] মাঝামাঝি মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড দিনকয়েক বোসপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতার সহিত অবস্থান করেন। মিসেস বুল এই সময়ে শ্রীমার ফটো তুলিবার ব্যবস্থা করেন।”[১০] রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ মহারাজ [জন্মসূত্রে আমেরিকান, পূর্বাশ্রমে জন ইয়েল, গবেষক ও সুলেখক। বর্তমানে ফ্রান্সের গ্রেৎস-এ রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত।] কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এ ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের

৬ শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৩৫

৭ ‘ফোটোগ্রাফি: একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা’—সিদ্ধার্থ ঘোষ, দেশ, ৫৫ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২ জুলাই ১৯৮৮, পৃঃ ৪৬

৮ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৭১৪

৯ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা, ৪র্থ সং, ১৯৭৬, পৃঃ ১২৫

১০ ঐ, পৃঃ ১২৪

২০ মে যে-ভাষণ দিয়েছিলেন[১১] তা থেকে জানা যায় যে, ফটো তোলার আগে শ্রীমাকে একটি সুন্দর আসনে বসানো হয় ও তাঁর সামনে দু-চারটি ফুলের টবও রাখা হয়। নিবেদিতা ও মিসেস বুল শ্রীমাকে আসনের ওপর বসিয়ে তাঁর ঘোমটা ও চুল ঠিকঠাক করে দেন। শ্রীমা লজ্জায় অপরিচিত ও বিদেশী পুরুষ ফটোগ্রাফারের দিকে তাকাতে পারেননি। তিনি কিছুক্ষণ নতদৃষ্টিতে বসে থাকেন এবং সমাধিস্থা হয়ে পড়েন। এই অবস্থায়ই ক্যামেরাম্যান শ্রীমায়ের প্রথম ফটোটি তুলে নেন। এ-কারণেই প্রথম ফটোতে শ্রীমায়ের দৃষ্টি নিচের দিকে। এ-ফটোটিকে বলা হয় 'নত-দৃষ্টি চিত্র' ('Looking down pose')। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ তাঁর ঐ ভাষণে আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম ফটোটি নেওয়ার পর শ্রীমা চোখ তুলে প্রশ্ন করেনঃ "শেষ হয়েছে কি?" এ-সুযোগে সাহেব ফটোগ্রাফার শ্রীমায়ের দ্বিতীয় ফটোটি তুলে নেন। এই দ্বিতীয় ফটোটিই সুপরিচিত 'পূজিত ফটো' ('Worshipped pose')।

[আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীমায়ের জীবনের প্রথম ফটো তোলার সময় তাঁর বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর আর শ্রীরামকৃষ্ণের তোলা শেষ ফটোটিও (১৮৮৩-তে দক্ষিণেশ্বরে তোলা, অর্চিত ফটো) গৃহীত হয়েছিল একই বয়সে।][১২]

শ্রীমায়ের দ্বিতীয় ফটোটি নেওয়ার ঘটনাটি সামান্য বিতর্কমূলক। যেহেতু প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে আজ কেউ বেঁচে নেই, তাই এর মীমাংসার জন্য কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। প্রথম ফটো তোলার পরেই শ্রীমায়ের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই এত অল্প সময়ের ব্যবধানে সাহেব ফটোগ্রাফারের পক্ষে দ্বিতীয় এক্সপোজার নেওয়া সম্ভব হতে পারে না। ফিল্ড ক্যামেরায় কাঁচের নেগেটিভ কাঠের কেসের মধ্যে ঢাকা থাকে এবং প্রতিটি ছবি নেওয়ার পর সেই নেগেটিভ ক্যামেরা থেকে বার করে পরের ছবির জন্য নতুন নেগেটিভ কেসে পরাতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়; সুতরাং এবিষয়ে একমত হওয়া ছাড়া উপায় নেই যে, শ্রীমায়ের প্রথম ফটো নেওয়ার সময় মিসেস বুল নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন যে, ঐসময়ে শ্রীমায়ের শাড়ির অংশে তাঁর পদাঙ্গুলির কোন অংশই দৃশ্যমান নয়। ফলে তিনি, মনে হয়, দ্বিতীয়বার শ্রীমায়ের অনুমতি লাভ করে দ্বিতীয় ফটোর ব্যবস্থা করেন এবং সাহেব ক্যামেরা-ম্যান দ্বিতীয় নেগেটিভের সাহায্যে সাধারণ প্রথানুসারে আর একটি অতিরিক্ত ছবি তুলে নেন। বলা বাহুল্য, অনুমতি লাভের পর দ্বিতীয় ফটোটি তোলার আগে নিশ্চয়ই মিসেস বুল শ্রীমায়ের পায়ের ওপর থেকে শাড়ির অংশ সরিয়ে দেন এবং তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায় ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের মন্তব্য থেকেঃ "ফটো তুলিবার সময়ে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণ পদাঙ্গুলি কাপড়ে ঢাকা ছিল। পদাঙ্গুলি বাহিরে রাখিয়া একখানি ফটো তোলার প্রয়োজন মিসেস বুল অনুভব করেন, দেশে গিয়া পূজা করিবেন বলিয়া। মাকে সেই কথা জানাইয়া, অনেক বলিয়া-কহিয়া দ্বিতীয়বার ফটো তুলাইতে সম্মত করানো হয়। গোলাপ-মার মুখে এই ঘটনা অনেকেই শুনিয়াছেন—তিনি মায়ের সঙ্গে ছিলেন।"[১৩] ফটো তোলার সময় শ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ সহচরী গোলাপ-মা যখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁর মন্তব্য উপেক্ষা করা যায় না। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, মিসেস সারা ওলি বুলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শ্রীমায়ের যে অপূর্ব এবং সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত ও বহুল প্রচারিত এই ফটোগ্রাফটি সর্বকালের জন্য ক্যামেরার সাহায্যে ধরে রাখা সম্ভবপর হয়েছে সেটাই আসল কথা। শ্রীমায়ের এই প্রথম ফটোর জন্য মিসেস বুলের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। [ক্রমশঃ]

১১ Illustrating a New Biography of Ramakrishna—Swami Vidyatmananda, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1965, p. 11

১২ শতরূপে সারদা, পৃঃ ১৪৯

১৩ ঐ, পৃঃ ৭৯৬

।ার কত বিষ খাব?

অমিতাভ ভট্টাচার্য

"আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান।" এ শুধু আজ আর গানের কথা নয়, আমাদের মনের কথাও বটে। জানছি বুঝছি সবই, কিন্তু করার কিছুই নেই। ঘুম থেকে ওঠার পর আপনি যে-টুথপেস্টটি ব্যবহার করেন এবং রাতে শোবার আগে যে-ঘুমের বড়িটি মুখে ফেলেন, এই দুয়েতে এবং মাঝখানে সারাদিন ব্যবহৃত যেকোন জিনিসেই কিছু-না-কিছু ভেজাল থাকতেই পারে। একথা পড়ে যেন চমকে উঠবেন না, বরং প্রশ্ন করতে পারেন এত ভেজাল আর বিষ খেয়ে আমরা বেঁচে আছি কি করে? আমরা কি সবাই তাহলে নীলকণ্ঠ হয়ে গেছি? বোধহয় তাই।

রঙিন খাবার

খাবারে রঙ মেশানো নতুন কোন ব্যাপার নয়। আদিকাল থেকেই খাবারকে আকর্ষণীয় করতে, স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ বাড়াতে নানা প্রাকৃতিক রঙ মেশানো হচ্ছে। এতে খাবারের মান কিন্তু কমেনি। মানুষের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক রঙের জায়গায় এল নানা কৃত্রিম, চটকদার, মনপছন্দ রঙ। দামে যেগুলো সস্তা, দেখতে আকর্ষণীয়, অথচ খেলেই নানা বিপত্তি। লোভের কাছে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করল মানুষের বিবেক-বুদ্ধি।

ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রক এগারোটি রঙকে খাদ্যে মেশানোর জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। যেগুলো খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করলে দেহের কোন ক্ষতি হয় না। এরা হলো—

(১) ইন্ডিগো কারমিন (Indigo Carmine)
(২) ব্রিলিয়ান্ট ব্লু এফ. সি. এফ. (Brilliant Blue F. C. F.)—নীল রঙ করার জন্য।
(৩) পনিসিয়াউ আর (Poniciau R)—লাল রঙ করার জন্য।
(৪) গ্রীন এফ. সি. এফ. (Green F. C. F)
(৫) গ্রীন এস (Green S)।
(৬) টারটাজিন (Tartazine)—হলুদ রঙের জন্য।
(৭) সানসেট ইয়েলো (Sunset yellow)—কমলা রঙের জন্য।
(৮) অ্যামারান্থ (Amaranth)।
(৯) কারমাইসিন (Carmycin)।
(১০) এরিথ্রোসিন (Erythrocin)।
(১১) ফার্স্ট রেড ই (First Red E)।

প্রতি কিলোগ্রাম খাবারে খুব বেশি হলে ২০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত এদের মেশান যাবে। এর বেশি মেশালে সেটাও কিন্তু ভেজাল। অথচ এসব অনুমোদিত রঙের বাইরেও নানা রঙ আকছার মেশানো হচ্ছে খাবারে। যার মধ্যে আছে (১) তুঁতে বা কপার সালফেটের দ্রবণ, (২) ডায়মন্ড গ্রীন, (৩) কঙ্গো রেড, (৪) রোডামিন বি, (৫) অরেঞ্জ টু, (৬) কেশরি রঙ, (৭) লেড ক্রোমেট, (৮) মেটানিল ইয়েলো, (৯) অরমিন, (১০) আয়রন অক্সাইড ইত্যাদি।

বাজারে গেলেই দেখবেন, শাক-সবজিকে তুঁতের দ্রবণে চুবিয়ে তরতাজা দেখানোর চেষ্টা চলছে, বরফঠাণ্ডা মাছের কানকোতে কঙ্গো রেড বা রোডামিন বি দিয়ে লাল রঙ করা হয়েছে। মিষ্টির দোকানে বোঁদে, মিহিদানা, দরবেশ—সবেতেই মেটানিল ইয়েলোর ছড়াছড়ি।

চাল ডাল তেলেও বিষ

ভেজাল—চালে, ডালে এমনকি তেলেও। চালে কাঁকড়, অ্যাসবেস্টসের গুঁড়ো মেশানো ট্যাল্ক আকছার মেশানো হচ্ছে। ট্যাল্কে থাকে ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট, যা অ্যাসবেস্টসের সিলিকেটের সঙ্গে মিশে পাকস্থলীতে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। ডালে মেশানো হয় লেড ক্রোমেট ও মেটানিল ইয়েলো। শুধু তাই নয়, যেকোন খাদ্যশস্য ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করলে বা দীর্ঘদিন গুদামে ফেলে রাখলে তাতে অ্যাসপারজিলাস ফেভাস নামে একধরনের ছত্রাক জন্মাতে পারে, যার থেকে আফলাটক্সিন নামে একধরনের বিষ নির্গত হয়। এর থেকে বাঁচতে গেলে গুদামজাত শস্যকে এমনভাবে রাখতে হবে যেন বাতাসের আর্দ্রতা শতকরা দশের ওপর না ওঠে এবং তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে।

তেল, ঝাল, অম্বল না খেলে আমাদের রসনা তৃপ্ত হয় না। বিপত্তি সেখানেও। তেল নিয়ে তো প্রায়ই হৈচৈ হয়। ট্রাইক্রিসাইল ফসফেট মেশানো ভেজাল রেপসিড অয়েল খেয়ে অনেকেই সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়েছেন, এখবর আমরা জানি। এছাড়া শিয়ালকাঁটার তেল, তিসির তেল, রেড়ির তেল, মিনারেল ওয়াটার, হোয়াইট অয়েল—এসবও সরষের তেলে মেশান হয়। রেপসিড অয়েলে সরষের তেলের মতো ঝাঁঝ আনার জন্য অ্যালাইল থায়োসায়ানেট (Allyl Thiocianate) নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবসায়ীরা মিশিয়ে থাকেন। এর থেকে হাইড্রোসায়ানিক গ্যাস তৈরি হয়, যা থেকে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

রাস্তাঘাটে তেলেভাজা দেখে আমরা আর রসনা সংযত করতে পারি না। কিন্তু একই তেলে বারবার ভাজার ফলে বেনজ পাইরিন (Benz Pyrine) কম্পাউন্ড নামক একটি বিষ তৈরি হয়। কাজেই রাস্তাঘাটে তেলেভাজা খাওয়া মানে বিষ খাওয়া। তালিকা দীর্ঘায়িত করে আর লাভ নেই। এবার বরং আলোচনা করা যাক এসব রঙিন এবং ভেজাল খাবার থেকে আমাদের কি কি অসুবিধা হতে পারে।

কি ক্ষতি হয় ?

রঙিন খাবারের বিষাক্ত রঙ আমাদের অন্ত্রনালীতে বিশোষিত হয়। সেখান থেকে যায় যকৃৎ বা লিভারে। নানা উৎসেচকের ক্রিয়াকলাপের পর দেহ থেকে তা বার হয়ে যায় মল-মূত্রের সঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে এইসব বিষাক্ত রঙ দেহে প্রবেশ করলে লিভারের উৎসেচকের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। বিষাক্ত রঙ দেহেই জমতে থাকে। শুরু হয় নানা ক্ষতি। তাৎক্ষণিক বিপত্তি বলতে হঠাৎ পেট খারাপ, গা-বমি, ক্ষুধামান্দ্য, চুলকানি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। দীর্ঘদিন ডায়মন্ড গ্রীন ও কেশরি রঙ মিশ্রিত খাবার খেলে আমাদের দেহে ক্যান্সার হতে পারে। লেড ক্রোমেট রঙ প্যারালিসিসের কারণ হতে পারে। কঙ্গো রেড মূত্রাশয়ে ঘা ও পাথর সৃষ্টি করতে পারে। রোডামিন বি থেকে মস্তিষ্কে প্রদাহ এবং টিউমার হতে পারে। এছাড়া পেশীর পক্ষাঘাত, রক্তাল্পতা, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর জন্ম, গর্ভপাত, হার্টের অসুখ—কি না হতে পারে এসব বিষ থেকে।

কি করবেন ?

নিজেরা সতর্ক হওয়া ছাড়া এইসব বিষের ছোবল থেকে বাঁচার আর কোন উপায় নেই। চেষ্টা করবেন রঙিন খাবার এড়িয়ে চলতে। শিশুদের কখনো সস্তা রঙিন আইসক্রিম, লজেন্স কিংবা সরবত দেবেন না। বাজার করার সময় রঙ-করা শাক-সবজি বা ফল কিনবেন না। যদি কিনতেই হয়, বাড়িতে এসে গরমজলে বারে বারে ধুয়ে নেবেন। এসব ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়া সরকারি ও বেসরকারি তরফেও নানা উদ্যোগ চাই। রঙিন খাবার খেলে কি কি ক্ষতি হতে পারে, খালি চোখে কিভাবে ভেজাল বোঝা যাবে, সে-সব ব্যাপারে বিভিন্ন সরকারি মাধ্যমে প্রচার দরকার। খাবারে ভেজাল মেশানো রুখতে বিভিন্ন স্থানে ক্রেতা প্রতিরোধ সমিতি তৈরি হচ্ছে, বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থা-গুলোও এগিয়ে আসছেন, এটা খুবই আশার কথা। তবে ভেজাল নিরোধ আইনের খোলনলচে এবং তার প্রয়োগ-পদ্ধতির আশু পরিবর্তন দরকার।

নানা ধরনের ভেজাল

- ☐ শাক-সবজিতে তুঁতে ও ডায়মন্ড গ্রীনের দ্রবণ।
- ☐ আলু ও রাঙা আলুতে কঙ্গো রেড ও রোডা-মিন বি।
- ☐ চিঁড়ে-মুড়িতে আলট্রামেরিন ব্লু।
- ☐ দুধ থেকে ফ্যাট তুলে নিয়ে জল মেশানো হয়। এছাড়া আটাগোলা, কার্বোহাইড্রেট জাতীয় নানা খাদ্য।
- ☐ বিস্কুটে অরেঞ্জ টু বা রোডামিন বি রঙ।
- ☐ আইসক্রিমে স্যাকারিন, মেটানিল ইয়েলো রঙ।
- ☐ চকোলেট, টফি ও ললিপপে রোডামিন বি ও কেশরি রঙ।
- ☐ ঘি-তে বনস্পতি, বাদাম তেল, নারকেল তেল, পশুর চর্বি, আলু ও মিষ্টি আলু।
- ☐ সরষের তেলে শিয়ালকাঁটা, তিসি, রেড়ি, মিনারেল অয়েল।
- ☐ নারকেল তেলে বাদাম তেল, মিনারেল অয়েল ও পচা রেপসিড অয়েল।
- ☐ হলুদে পাথরের গুঁড়ো, চালের গুঁড়ো, নুনের গুঁড়ো, স্টোন সোপ, মেটানিল ইয়েলো রঙ।
- ☐ চায়ে কাঠের গুঁড়ো, পেঁপের বীজ, ব্যবহৃত চায়ের পাতা।

মিষ্টিতে ময়দা, স্টার্চ, শেপস্টোন ইত্যাদি। ☐

গ্রন্থ-পরিচয়

গোস্বামী তুলসীদাসের রামচরিতমানস

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

তুলসীদাসী রামায়ণ ঃ সুবলচৈতন্য ব্রহ্মচারী। পরিবেশক ঃ নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৬৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩। মূল্য ঃ পঁয়ষট্টি টাকা।

ভারতীয় জনজীবনে রামায়ণের প্রভাব যেমন গভীর, তেমন ব্যাপক। রামায়ণের অক্ষয়কীর্তি প্রসঙ্গে পিতামহ ব্রহ্মার উক্তি ঃ "যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয় সরিতশ্চ মহীতলে।/তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥"—সর্বৈব সার্থক হয়েছে।

রামচরিত্র বিশাল ও গভীর। বাল্মীকির রামচন্দ্র কিন্তু আদর্শ মানব—অবতার নন। মানবচরিত্র কতদূর উন্নত হতে পারে, মহর্ষি বাল্মীকি জগৎকে তাই দেখাতে চেয়েছেন। বাল্মীকির রামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, আদর্শ পিতা, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ রাজা, আদর্শ বন্ধু। যেদিক দিয়েই দেখা যাক না কেন রামচরিত্র নিখুঁত। এই কারণেই সহস্র সহস্র বছর ধরে ভারতীয় জনজীবন সেই মহৎ আদর্শের ছাঁচে নিজেদের জীবন গড়ে নেওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত আছে। গোস্বামী তুলসীদাস তাঁর 'রামচরিতমানস' গ্রন্থে দেখালেন যে, শরণাগত ভক্ত হলেই সেই অপূর্ব রামজীবনের মাধুর্য সর্বতোভাবে আস্বাদন করা সম্ভব।

'রামচরিতমানস'-এ ঘটনার বিবরণ কম। ভগবদ্ভক্তি লাভ করে যাতে মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, তুলসীদাস সেদিকে জোর দিয়েছেন। আর ঘরোয়া কথার উপমা দ্বারা সাধারণ মানবমনকে রামপদে আকর্ষিত করতে চেয়েছেন তিনি। সেজন্য 'রামচরিতমানস'-এর এত জনপ্রিয়তা। সাহিত্য দৃষ্টিতেও 'রামচরিতমানস'-এর মান খুব উচ্চে। লোকসাহিত্যের দরবারে তুলসীদাসের রামায়ণ অনুপম একখানি গ্রন্থ। এর ভাষা সহজ, উপমাগুলি সরল ও প্রাণবন্ত। শ্রীরামচন্দ্রের নরদেহ বলে বিভীষণ তাঁর ইষ্টদেবের সদৃশ সকল নরকেই ভক্তি করেছেন, আর যে-কেউ রামচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছেন তুলসীদাস উপমা দ্বারা তাঁর চরণবন্দনা করেছেন। তুলসীদাসের এই কাব্যিক উৎকর্ষ, তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি-দীপ্ত 'রামচরিতমানস'-রূপ ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করে অনেকেই কৃতার্থ হয়েছেন, হন এবং হবেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি গোস্বামী তুলসীদাস রচিত মূল হিন্দি 'রামচরিতমানস'-এর কাব্যছন্দে বাঙলা অনুবাদ করেছেন সুবলচৈতন্য ব্রহ্মচারী। অনুবাদ মূলানুগত হয়েছে, কিন্তু তাতে ভাষা কোথাও আড়ষ্ট হয়নি। ভাব এবং মাধুর্য সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে। ধর্মীয় সাহিত্যে 'রামচরিতমানস'-এর একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। এরকম একখানি গ্রন্থকে অনুবাদ করে বাংলার পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়ার জন্য অনুবাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ।

মুদ্রণে কিছু কিছু ত্রুটি আছে। অবশ্য এই ত্রুটির জন্য বইয়ের প্রকাশকের পক্ষ থেকে আক্ষেপ করা হয়েছে। প্রচ্ছদ সুন্দর এবং বাঁধাইও মনোজ্ঞ। আকারের অনুপাতে বইয়ের দামও বেশি নয়। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ☐

"সুরগুলি পায় চরণ"

নন্দিতা বসু

অনুপমা দে। প্রকাশস্থান ঃ গোবিন্দনগর, বৈদ্যবাটী, হুগলী। দু-খণ্ড। মূল্য ঃ তিন টাকা এবং আট টাকা।

'গীতমঞ্জরী'র রচয়িত্রী অনুপমা দে পেশাদার গীতিকার নন, মনের আবেগে আরও অনেকের মতো তিনি গান লেখেন—প্রধানতঃ ভক্তিমূলক গান। প্রথম খণ্ডে ১০১টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ২০১টি গান সংকলিত হয়েছে। পেশাদারী রচনায় যে নৈপুণ্য আমরা দেখতে অভ্যস্ত তা স্বাভাবিকভাবেই এখানে নেই, তবে লেখিকার যে একটি অনুভূতিপ্রবণ মন রয়েছে—যে-মন তাঁর প্রাণে ভাব-ভক্তি ও প্রেমের হিল্লোল মাঝে মাঝে তোলে এবং তা তাঁকে সময়ে সময়ে আবিষ্ট করে রাখে। প্রতিটি গানেই তা ধরা পড়ে। অনুভূতির প্রবলতায় গানের ভাব ভাষার বাঁধনকে মাঝে মাঝেই অতিক্রম করে ঠিকই, কিন্তু লেখিকার ভাবের ঐকান্তিকতা এতটাই স্পষ্ট যে, মনকে তা স্পর্শ করবেই। ☐

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২৬ জানুয়ারি **বেলুড় মঠে** স্বামী বিবেকানন্দের ১৩০তম জন্মতিথি যথারীতি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ২৫,০০০ ভক্ত নরনারী খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে আয়োজিত জনসভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী পৌরোহিত্য করেন। গত ৬ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম জন্মতিথি এবং গত ৮ মার্চ সাধারণ উৎসব যথারীতি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ৬ মার্চ বিকালে জনসভায় পৌরোহিত্য করেন মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। ঐদিন ২৫,০০০ এবং ৮ মার্চ ৩৫,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ২৬ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত **বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের** বার্ষিক উৎসব ও আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন ২৬ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথিতে পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোম, সঙ্গীত, কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে কয়েক হাজার ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় শিক্ষকগণ কর্তৃক নাটক অভিনীত হয়। দ্বিতীয় দিন বিকালে নির্মল শীলের বাউল গানের পর স্বামী মুমুক্ষানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর ও ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত। পরে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন ভি বালসারা। ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় গীতি-আলেখ্য ও আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রাতঃকালীন বিভাগের ছাত্রগণ কর্তৃক 'ভক্ত প্রহ্লাদ' নাটক অভিনীত হয়। ২৯ জানুয়ারি স্বামী নির্জরানন্দের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা দেবব্রত ঘোষ। পরে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যোগব্যায়াম ও নাটক অভিনয় করে।

বিগত ১৩ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ **জলপাইগুড়ি আশ্রমে** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। তিনদিনই ভোর থেকে বেদপাঠ, ঊষাকীর্তন, ভজন, পাঠ, আলোচনা, বক্তৃতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন (ভক্তিমূলক), প্রসাদ বিতরণ, শোভাযাত্রা (শুধু শেষদিন) প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন রামকৃষ্ণ দিবস, দ্বিতীয় দিন সারদা দিবস, তৃতীয় দিন বিবেকানন্দ দিবস রূপে পালিত হয়েছে। সমাপ্তি দিবসের মহোৎসবে সাড়ে চার হাজার লোক হাতে হাতে প্রসাদ পেয়েছেন। তিনদিনই সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রথম দিন বক্তা ছিলেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা এবং শিবশংকর চক্রবর্তী, দ্বিতীয় দিন বক্তা ছিলেন ডঃ মাধুরী গোস্বামী এবং শিবশংকর চক্রবর্তী। তৃতীয় দিন বক্তা ছিলেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। কলকাতার শিল্পী সুশান্ত দত্ত এবং সন্তোষ চৌধুরী ধর্মসভায় এবং তৃতীয় দিন সকালে আয়োজিত শোভাযাত্রায় ভজন পরিবেশন করেন। স্বাগত ভাষণ দেন আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী প্রভাকরানন্দ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে পরিতোষ চক্রবর্তী, মুকুলেশ সান্যাল এবং দেবকুমার ঘোষ।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে **রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের** প্রাক্‌ ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ১০, ১১ ও ১৩ জানুয়ারি নানা অনুষ্ঠান হয়। ১০ জানুয়ারি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রাক্তন অলিম্পিক ফুটবল খেলোয়াড় নিখিল নন্দী। পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড় তরুণ দে। ১১ জানুয়ারি কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ এবং সঙ্গীত, আবৃত্তি, যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সম্পাদক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩ জানুয়ারি বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, বক্তৃতা,

সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, কত্থকনৃত্য ও নাটক অভিনয় করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী সনাতনানন্দ। অনুষ্ঠানগুলিতে সভাপতিত্ব করেন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী জয়ানন্দ।

রাজকোট আশ্রম গত ১১-১৩ জানুয়ারি তিন-দিনের একটি যুবশিবির পরিচালনা করে। ঐ শিবিরে মোট ৪৫০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল। গত ২৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের গুজরাট পরিভ্রমণের একশো বছর পূর্তি স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। স্মরণিকাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন রাজকোটের মেয়র ভজুভাই বালা।

রায়পুর আশ্রম গত ৪ ফেব্রুয়ারি এক যুব-সমাবেশের আয়োজন করে। ঐ সমাবেশে মোট ২৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রবিশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম. এম. লালোরায়।

উদ্বোধন

করিমগঞ্জ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর-মূর্তি সহ নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ৫-৭ ফেব্রুয়ারি তিনদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র থেকে আগত ১৩২ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং বহু ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে মন্দির উদ্বোধন ও উৎসর্গ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। ঐদিন দুপুরে প্রায় তেরো হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি সকালে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ সহ প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তবৃন্দের এক বর্ণাঢ্য শোভা-যাত্রা করিমগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। উৎসবের প্রথম দুইদিন সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় উৎসবের স্মারকগ্রন্থের প্রকাশ ও আশীর্বাণী প্রদান করেন স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। উভয় দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী ইজ্যানন্দ। বক্তব্য রাখেন স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী মুখ্যানন্দ, স্বামী অমৃতত্বানন্দ, স্বামী উমানন্দ, স্বামী গোকুলানন্দ, স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দ প্রমুখ। কালীকীর্তন, বাউল গান এবং স্বামী দেবদেবানন্দের 'কথায় ও গানে কথামৃত' পরিবেশন ছিল উৎসবের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান।

ত্রাণ

গুজরাট খরাত্রাণ

রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে ভুজ, কচ্ছ ও পঞ্চমহল জেলায় খরাপীড়িত গবাদি পশুর জন্য ৭১,৬০৪ কিলোঃ বিচালি বিতরণ করা হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ অগ্নিত্রাণ

বিশাখাপত্তনম আশ্রম বিশাখাপত্তনমের নিকট-বর্তী ইরাদা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ২০০ জনকে ১০০ শাড়ি ও ১০০ ধুতি বিতরণ করেছে।

চিকিৎসাত্রাণ

গত ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে যে মাঘমেলা ও কল্পবাস অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই মেলায় ২০,৩৫০ জন রোগীর চিকিৎসা করেছে **এলাহাবাদ আশ্রম**।

চশমা বিতরণ

রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গলের ব্যবস্থাপনায় কামার-পুকুরে গত ৪-৯ নভেম্বর '৯১ চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবিরে যে-সকল রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল গত ২৬ ফেব্রুয়ারি '৯২ এক অনুষ্ঠানে তাদের মধ্যে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়। চশমা বিতরণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ ও সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা): গত ৬ মার্চ এই বেদান্ত সোসাইটি ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি এবং ৮ মার্চ শহরের কেন্দ্রস্থলে সাধারণ উৎসব পূজা, ভজন, পাঠ, ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। উভয় জায়গাতেই শতাধিক ভক্তের সমাগম হয়। ২ মার্চ শিবরাত্রি এবং ২২ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। তাছাড়া রবিবারগুলিতে ধর্মীয় প্রসঙ্গ এবং শনিবার-

গ্রন্থলিতে শাস্ত্রের ক্লাস হয়েছে। উল্লেখ্য, এই বেদান্ত সোসাইটির উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি থেকে মাসে একবার করে 'স্টুডেন্টস ডে'-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। জুনিয়র, ইন্টার ও সিনিয়র তিনটি বিভাগে বিভক্ত অধিবেশনটিতে ছাত্রছাত্রীদের যোগব্যায়াম ও স্তোত্র-পাঠ শিক্ষা এবং গোষ্ঠী আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া (স্যানফ্রান্সিস্কো)ঃ গত ৬ মার্চ পূজা, ধ্যান, ভজন, স্তোত্রপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ৮ মার্চ এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর ভাষণ দেন। গত ২ মার্চ পূজা, ভক্তিমূলক সঙ্গীতাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিবরাত্রি উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় শিব সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। তাছাড়া তিনি প্রতি রবিবার ও বুধবার নানা ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্কঃ মার্চ মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে এবং ৮ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর একটি বিশেষ ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ। তাছাড়া তিনি প্রতি শুক্রবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ও প্রতি মঙ্গলবার 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটনঃ গত ২ মার্চ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শিবরাত্রি পালন করা হয়। ৬ মার্চ অনুরূপ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মার্চের রবিবার-গুলিতে ধর্মীয় ভাষণ এবং মঙ্গলবারগুলিতে 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ। গত ১২ মার্চ স্বামী ভাস্করানন্দ 'বেদান্ত সোসাইটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া'-র আমন্ত্রণে কানাডার বঙ্কুবর-এ গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ভাষণ দিয়েছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী দক্ষানন্দ (বসন্ত) গত ৩০ নভেম্বর রাত ৮টায় হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। বার্ধক্যজনিত উপসর্গ ছাড়া তাঁর অন্য কোন বিশেষ অসুখ ছিল না।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী দক্ষানন্দ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ছয় বছর তিনি বেলুড় মঠে ব্রহ্মানন্দ-মন্দিরের পূজারী ছিলেন। তারপর ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন চণ্ডীপুর আশ্রমের কর্মী। তারপর তিনি অবসর নিয়ে বেলুড় মঠে বাস করছিলেন। সদা প্রফুল্ল ও সন্তুষ্টমানস এই সন্ন্যাসী সাধু ও ভক্ত উভয় মহলেই জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

ভ্রম সংশোধন

গত ফাল্গুন সংখ্যার দেহত্যাগ শিরোনামের ১৭ পঙ্‌ক্তিতে 'রামহরিপুর' স্থলে 'বাঁকুড়া' হবে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালনঃ গত ৬ মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ১৮ মার্চ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে এবং ২২ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী দেবস্বরূপানন্দ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। ☐

বিবিধ সংবাদ

জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন

নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে গত ১২ জানুয়ারি '৯২ থেকে নানা অনুষ্ঠান, সেবামূলক কাজ ও প্রতিযোগিতা-মূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস ও জাতীয় যুবসপ্তাহ পালন করা হয়েছে ঃ

বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি (১২৫।১, প্রামাণিক ঘাট রোড, কলকাতা-৩৬)—অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী, স্বামী রমানন্দ, স্বামী নিত্যরূপানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ প্রমুখ।

মতিঝিল নবোদয় সঙ্ঘের (৫১ এইচ/১ সি পটারী রোড, কলকাতা-১৫) অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

বেনিয়াপুকুর বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র (৪।১, বেনিয়াপাড়া লেন, কলকাতা-১৪)।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, স্যাণ্ডেলের বিল (হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগনা)—অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নচিকেতা ভরদ্বাজ এবং অন্যান্যরা।

পানচেৎ শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ (ধানবাদ, বিহার)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ, বিশ্বনাথ চারিয়ালি (শোনিতপুর, আসাম)—ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন বিধায়ক রামচন্দ্র শর্মা, ভাষণ দেন স্বামী দিব্যরূপানন্দ।

বিবেকানন্দ জন্মোৎসব কমিটি (১৩১ সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-১৪)—অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, বিকালের জনসভায় ভাষণ দেন প্রণবেশ চক্রবর্তী।

স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি (দুর্গাপুর-৫)—অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী লোকনাথানন্দ, স্বামী সুহিতানন্দ এবং স্বামী সর্বদেবানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভক্তসংঘ (জামালপুর, বিহার)—অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি ছিলেন স্বামী গিরিশানন্দ। ভাষণ দেন স্বামী ব্রহ্মেশানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (পূর্ণিয়া, বিহার)।

চকগোপাল বিবেকানন্দ পাঠচক্র (মেদিনীপুর)—অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী আপ্তকামানন্দ ; ভাষণ দেন বিমলকুমার দাস। ৪০০ জনকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

সর্বভারতীয় যুবশিক্ষণ শিবির

গত ২৫-৩০ ডিসেম্বর '৯১ পূর্বে কলকাতার বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে **অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের** ২৫তম বার্ষিক সর্বভারতীয় যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ ডিসেম্বর শিবিরের উদ্বোধন করেন মহামণ্ডলের সভাপতি অমিয়কুমার মজুমদার। স্বাগত ভাষণ দেন মহামণ্ডলের সম্পাদক নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মোট ৭২২ জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে যোগদান করেন। ছয়দিনব্যাপী এই শিবিরের বিভিন্ন অধিবেশনে বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাষণ দেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। ২৯ তারিখ এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৭৯ জন রক্তদান করেন। শিবিরের শেষদিন শিক্ষার্থী-দের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে এসে শেষ হয়।

উৎসব

তেলুয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, হুগলী ঃ গত ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর '৯১ এই আশ্রমে হুগলী জেলা ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ তারিখ প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন আশ্রমের বিদ্যার্থী প্রতিনিধিদের নিয়ে নানা প্রতিযোগিতা-মূলক অনুষ্ঠান হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবদেবানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান বলাইকৃষ্ণ রায়। দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর আলোচনা করেন স্বামী অমেয়ানন্দ, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রজমোহন মজুমদার।

সভাপতিত্ব করেন এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী গীতানন্দজী। ২৯ ডিসেম্বর সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং ভাবপ্রচার পরিষদের সাংগঠনিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী দেবদেবানন্দ ও স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ।

গত ২০-২২ ডিসেম্বর '৯১ তিনদিনব্যাপী **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংঘের (কাণ্ঠডাঙ্গা, নদীয়া)** উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সনাতনানন্দ ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ। দুদিন গীতিনাট্য পরিবেশন করেন শঙ্কর সোম ও সম্প্রদায়। শেষদিন রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে 'রানী রাসমণি' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ১ ডিসেম্বর '৯১ **পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (কলকাতা-৩১)** প্রাঙ্গণে পণ্ডিত দিনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে ভগিনী নিবেদিতার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপিকা ডঃ সন্ধ্যা বাগচী। সভায় ভক্তিগীতি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, ভাঙ্গড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা): ১ জানুয়ারি '৯২ ১৪শ বার্ষিক কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, মঙ্গলারতি, প্রভাত-ফেরী, ভক্তিগীতি, স্বামীজীর রচনা থেকে পাঠ, লীলাকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। বিকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভৈরবানন্দ; বক্তব্য রাখেন স্বামী মহাব্রতানন্দ, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ এবং নচিকেতা ভরদ্বাজ। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী সমাত্মানন্দ। প্রায় ৪০ হাজার ভক্ত অনুরাগী উৎসবে যোগদান করেন। ২৫ হাজার নরনারীকে বসিয়ে এবং ৫ হাজার নর-নারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থও এদিন প্রকাশিত হয়।

চক্ষু অস্ত্রোপচার-শিবির

গত ২৪ নভেম্বর '৯১ কলকাতার রোটারী ক্লাব ও **রামপাড়া (হুগলী) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘের** সহযোগিতায় ও আঁইয়া পল্লীমঙ্গল সমিতির পরিচালনায় আঁইয়ার গাঙ্গুলী বাটীতে পাঁচদিনের বিনাব্যয়ে চক্ষু অস্ত্রোপচার-শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ৪১ জন গরিব রোগীর চক্ষুর ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। কলকাতার প্রখ্যাত চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাঃ রণবীর মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহকারিগণ এই অস্ত্রোপচারকার্য পরিচালনা করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **বীরেন্দ্রনাথ রায়** গত ১৯ অক্টোবর '৯১ রাত ২'৪৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। অধুনা বাংলাদেশের যশোর জেলার নড়াইলের জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বীরেনবাবু ও তাঁর অগ্রজগণ বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে আজীবন জড়িত ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে নড়াইল রামকৃষ্ণ আশ্রমের মন্দির তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁদেরই পারিবারিক দানকৃত জমিতে কাশীপুরে নর্থ সুবারবন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর অগ্রজগণ এই হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনিও বেশ কয়েক বছর সহ-সম্পাদক হিসাবে এই হাসপাতাল পরিচালনা করেন। বরানগর গোপাললাল ঠাকুর রোডে অবস্থিত রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমও তাঁদের দানকৃত জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি এই আশ্রমের ও স্কুলের সহ-সভাপতি হন। তাছাড়া তিনি স্বামী অভেদানন্দজী প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের একজন ট্রাস্টী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর আজীবন আগ্রহী পাঠক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **প্রফুল্লকুমার মজুমদার** গত ৯ ডিসেম্বর '৯১ বর্ধমানের বাড়িতে ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি বর্ধমানের নাসিগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং বর্ধমান রামকৃষ্ণ আশ্রমের একজন ট্রাস্টী ছিলেন। □

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

আমেরিকায় ও ব্রিটেনে উদ্ভিদবৎ দীর্ঘকাল জীবনধারণ এবং মরণের অধিকার

যেসব রোগী দীর্ঘকাল উদ্ভিদবৎ জীবনধারণ (persistent vegetative state) করেন তাঁদের মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশ—সেরিব্র্যাল কর্টেক্স (Cerebral Cortex)-এর কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাঁদের দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা পরিবারের, শুশ্রূষাকারীর এবং সমাজের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকায় ঐসব রোগীর আত্মীয়রা আদালতের শরণাপন্ন হন যখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঐ রোগীদের বাঁচিয়ে রাখার ওষুধ বন্ধ করার অনুরোধ না রাখেন। শতকরা আশি ভাগের বেশি ক্ষেত্রে আদালত পরিবারের অনুরোধে রাজি হয়েছেন, কিন্তু মিসৌরি সুপ্রিম কোর্ট পূর্বেকার আদালতের রায়গুলিকে মানতে গররাজি হওয়ায় ইউনাইটেড স্টেটসের সুপ্রিম কোর্টে ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম 'মৃত্যুর অধিকার' (right to die) মামলাটি উঠেছে।

জাপান ও নেদারল্যান্ডের সমীক্ষা অনুযায়ী স্থায়ী উদ্ভিদবৎ জীবনধারণকারী রোগীদের ৪০ শতাংশ মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত। যাঁরা আঘাতপ্রাপ্ত নন, তাদের অধিকাংশের অক্সিজেন সরবরাহ কম হওয়ার জন্য মস্তিষ্কের কর্টেক্স অংশের পচন হয়েছে। এর কারণ হতে পারে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে যাওয়া, নিম্ন রক্তচাপ বা অন্যান্য মেডিক্যাল দুর্ঘটনা (medical accidents)। বাকিদের অসুস্থতার কারণ, ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে শর্করা কম হওয়া (Hypoglycaemic crisis) অথবা মস্তিষ্কের অন্যান্য অসুখ।

স্থায়ী উদ্ভিদবৎ জীবনধারণকারী রোগীদের অধিকাংশ সময় চোখ খোলা থাকে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা একেবারে অচেতন। ব্যথা দিলে শক্ত হয়ে যাওয়া হাত-পা অসাড়ভাবে একটু নড়ে মাত্র, মুখের ভাব কঠোর হয়, আলোর দিকে চোখের তারকা ঘোরে এবং চিৎকার বা গোঙানি করতে শোনা যায়। গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, এঁদের মস্তিষ্কের কার্যকলাপ (Metabolic activity), গভীরভাবে অজ্ঞান-করা (deep anaesthesia) মস্তিষ্কের কার্যকলাপের স্তরের।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, আঘাত পেয়ে যেসব রোগী তিনমাস উদ্ভিদবৎ জীবনধারণ করেন, পরে তাঁরা কেউ স্বাবলম্বী হন না। দু-একজনের জ্ঞান ফিরলেও তাঁরা অক্ষম ও পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন। আঘাতজনিত কারণে তিনমাস যাবৎ স্থায়ী উদ্ভিদবৎ জীবনধারণকারীদের অর্ধেক এক বছরের মধ্যে মারা যান, যাঁরা বেঁচে থাকেন তাঁদের মৃত্যু হয় তিন থেকে ছত্রিশ বছরের মধ্যে।

এইসব রোগীদের 'আমিত্ব' জ্ঞান না থাকায় তাঁদের বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই বলে অনেকে মনে করেন, যে-অবস্থাটা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। রোগীদের কষ্ট বলে কোন জ্ঞান না থাকায় তাঁদের বেঁচে থাকার বোঝা বইতে হয় আত্মীয় ও বন্ধুদের। চিকিৎসকরাও মনে করেন যে, তাঁরা এর জন্য বৃথা খাটছেন এবং অন্যান্য রোগী, যাঁরা উপকৃত হবেন, তাঁদের জন্য খাটলে ভাল হতো।

যাই হোক, আমেরিকায় একটা জনমত গড়ে উঠেছে যে, এইসব রোগীদের বাঁচিয়ে রাখার ওষুধ বন্ধ করা উচিত। আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ১৯৮৬ ও ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের ঘোষণায় বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, এইসব রোগীকে চিকিৎসা বা কৃত্রিমভাবে খাওয়ানো বন্ধ করা যেতে পারে। আমেরিকার বেশির ভাগ আদালত এই অভিমতে একমত এবং সুপ্রিম কোর্টও সম্প্রতি এর পক্ষে রায় দিয়েছে। কিন্তু অক্ষম রোগীর হয়ে কে এটা স্থির করবে এবং রোগীর এবিষয়ে কি ইচ্ছা, তা জানা নিয়ে বিতর্ক চলছে।

ন্যান্সি ক্রুজাম নামে এক মহিলা ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ায় স্থায়ী

উদ্ভিদবৎ জীবনধারী হয়ে পড়েন। এরপর চার বছর ধরে তাঁকে পেট-ফুটোকরা নল দিয়ে খাওয়ানো হতো। ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মা-বাবা খাওয়ানোর নল খুলে নিয়ে মেয়েকে মরতে দেওয়ার অনুরোধ জানায় হাসপাতালকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে আইনের শরণাপন্ন হলে ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে স্টেট কোর্ট রোগীর পরিবারের অনুরোধের পক্ষে মত দেয়। মিসৌরির অ্যাটর্নি জেনারেল সুপ্রিম কোর্টে আপীল করলে কোর্ট আগের কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রায় দেয়। রায়ে বলা হয় যে, সরকারের (স্টেট-এর) দায়িত্ব রয়েছে নাগরিকদের জীবন রক্ষা করার এবং চিকিৎসা বন্ধ করতে তখনই পারা যাবে যখন নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, ন্যান্সি এ-চিকিৎসা বন্ধ করতে চাইছেন। সরকার বছরে ১,৩০,০০০ ডলার হারে ন্যান্সির চিকিৎসায় খরচ দিতে আরম্ভ করল। ন্যান্সির পরিবার ইউনাইটেড স্টেটস সুপ্রিম কোর্টে আপীল করলে ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে এর মৌখিক সাক্ষ্য নেওয়া হয় এবং ঐ রাত্রেই ন্যান্সির ডাক্তার, উকিল, দার্শনিক এবং ধর্মযাজকগণ টেলিভিশনে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে সুপ্রিম কোর্ট অভিমত দেন যে, মিসৌরি কোর্ট ন্যান্সির চিকিৎসা বন্ধ করার আগে তাঁর অভিপ্রায় সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় অন্যান্য সাক্ষীরা এসে জানাতে লাগলেন যে, ন্যান্সি দুর্ঘটনার আগে ঐরকম অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে মিসৌরি আদালত চিকিৎসা বন্ধ করার আদেশ দেন। এর বারোদিন পরে ন্যান্সির মৃত্যু হলো। মৃত্যুর আগে তিনি আট বছর উদ্ভিদবৎ জীবনযাপন করেছেন এবং তাঁর মা-বাবা আটবার আদালতে গিয়েছেন ন্যান্সিকে মরতে দেওয়ার অনুরোধ করে। এমনকি ঐ বারোদিনে যাঁরা এভাবে মরতে দেওয়ার বিরোধী, তাঁরা ন্যান্সির খাদ্য বন্ধ করার বিরুদ্ধে অনেকবার কোর্টে ইনজাংকশন চেয়েছিলেন।

ইউনাইটেড সুপ্রীম কোর্টের এই প্রথম 'মরণের অধিকার' মামলায় রোগীর চিকিৎসা না নেওয়ার অধিকারকে মেনে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রণীত এক আইন অনুযায়ী সমস্ত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি হবার সময় হয় জানাতে হবে যে, দীর্ঘকাল উদ্ভিদবৎ অবস্থা হলে তাঁদের কি করা হবে অথবা তাঁদের আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্য থেকে কারও নাম বলতে হবে, যিনি রোগীর এইরূপ অবস্থাতে তাঁর হয়ে জানাবেন চিকিৎসা বন্ধ করা হবে কিনা।

ব্রিটেনে এই ব্যাপারে আগে থেকে মত দেওয়ার (living will) কোন আইন নেই। ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে কয়েকজনের একটি দল এই বিষয়ে আলোচনা ও অনুসন্ধান করে মতপ্রকাশ করেছেন যে, রোগীর আগে দেওয়া অভিমতকে ডাক্তারদের মেনে চলতে হবে; রোগীর যদি কোন লিখিত মত থাকে অথবা রোগীর 'পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি' প্রাপ্তের মত পাওয়া যায় তবে সেই মতকেই মানতে হবে। ডাক্তারদের 'সবচেয়ে ভাল জানি' মতকে প্রাধান্য দেওয়া হবে না। এখনো পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোন মামলা কোর্টে যায়নি। ব্রিটেনে এখন যা হয়, তা হলো যে, ডাক্তাররা পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করে আদালতে না গিয়ে নিজেরা ব্যাপারটা ঠিক করেন। আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মতো ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন মেনে নেয় যে, রোগীদের চিকিৎসা না নেওয়ার অধিকার আছে এবং কৃত্রিমভাবে রোগীকে খাওয়ানোও চিকিৎসার পর্যায়ে পড়ে। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের আদালতে এবিষয়ে অবশ্য সামান্য মতভেদ আছে। দুই জায়গাতেই আত্মীয়দের প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের হয়ে মত দেওয়া আইনসম্মত বলে ধরা হয় না।

মুশকিল হচ্ছে, এইসব দীর্ঘকাল উদ্ভিদবৎ রোগীদের কাছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই এবং তাঁদের বোঝানোও সম্ভব নয় যে, মৃত্যুই তাঁদের পক্ষে ভাল। ব্রিটেনে এই বিষয়ে খুব একটা আলোচনাও দেখা যায় না। ডাক্তার এবং বিচার-পতিদের মধ্যেও অনেকে মনে করেন যে, ডাক্তারি ব্যাপারে আদালতের নাক গলানো উচিত নয়। এখানে ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এথিকস এই প্রশ্নে ডাক্তার ও জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করে রিপোর্ট দিয়েছেন। □

[British Medical Journal, 25 May, 1991, pp. 1256-1258]

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে।... প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির মৃত্যুও ঘটে।... যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন - যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হতে পারে, সে-বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

Doing good to others out of compassion is good, but the seva (service) of all beings in the spirit of the Lord is better.

Swami Vivekananda

There is no higher virtue than charity. The lowest man is he whose hand draws in receiving ; and he is the highest man whose hand goes out in giving.

Swami Vivekananda

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।... তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভালকাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

Fill the mind with the highest thoughts, hear them day after day, think them month after month. The ideal of man is to see God in everything. But if you cannot see Him in everything see Him in one thing, in that thing which you like best, and then see Him in another. So on you can go.

Swami Vivekananda

Be not a traitor to your thoughts. Be sincere; act according to your thoughts, and you shall surely succeed.

Swami Vivekananda

Each soul is potentially divine.

The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal.

Do this either by work or worship or psychic control, or philosophy—by one or more, or all of these—and be free.

This is the whole of religion. Doctrines or dogmas, or rituals or books, or temples or forms are but secondary details.

Swami Vivekananda

We shall spend no time arguing as to theories and ideals, methods and plans. We shall live for the good of others; we shall merge ourselves in struggle. The battle, the soldier and the enemy will become one.

Sister Nivedita

He who served and helped one poor man seeing Siva in him, without thinking of his caste, creed or race or anything, with him Siva is more pleased than with the man who sees Him only in image.

Swami Vivekananda

The only God to worship is the human soul in the human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of temples. If I cannot worship in that, no other temple will be of any advantage.

Swami Vivekananda

অমৃত কথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতি মাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

No need of looking behind. Forward! We want infinite energy, infinite zeal, infinite courage and infinite patience; then only will great things be achieved.

Swami Vivekananda

What the nation wants is pluck and scientific genius. We want great spirits, tremendous energy and boundless enthusiasm; no womanishness will do. It is the man of action, the lion-heart, that the goddess of wealth resorts to.

Swami Vivekananda

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র ৯৪তম ১৩৯৯

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চুয়াল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঞ্চাশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা ☐ বৈশাখ সংখ্যা থেকে গ্রাহকমূল্য : (ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ) তেত্রিশ টাকা ☐ (সডাক) আটত্রিশ টাকা ☐

বর্তমান সংখ্যার মূল্য ছয় টাকা

উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

☐ আমরা ডাকবিভাগের নির্দেশমত **প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ** (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দিই। এই তারিখটি **সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের** সাধারণতঃ **৮/৯ তারিখ** হয়। ডাকে পাঠানোর **সপ্তাহখানেকের** মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে কখনো কখনো পত্রিকা পেঁছাতে বিলম্বও হয়। অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে আমরা খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের আমরা **একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা** করতে অনুরোধ করি। **একমাস পরে** (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ / পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে **গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে** কার্যালয়ে জানালে আমরা **ডুপ্লিকেট** বা **অতিরিক্ত কপি** পাঠিয়ে দেব।

☐ **বৈশাখ সংখ্যা** থেকে (**পৌষ সংখ্যা** পর্যন্ত) গ্রাহক হলে **গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ :** (By Hand)—৩৩ **টাকা, ডাকযোগে** (By Post) **সংগ্রহ—৩৮ টাকা**।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন : আশ্বিন (শারদীয়া) ১৩৯৯ সংখ্যা

☐ নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারের **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন / সেপ্টেম্বর (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য : ছাব্বিশ টাকা।

☐ **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের** এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না**। তাঁরা নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত প্রতি কপি কুড়ি টাকায় পাবেন ; **৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে তাঁরা প্রতি কপি আঠারো টাকায় পাবেন।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে **সেই সংবাদ** কার্যালয়ে **অবশ্যই** পেঁছানো প্রয়োজন। **৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পেঁছালে পত্রিকা **সাধারণ ডাকেই** যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ **সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে** আমাদের পক্ষে **দ্বিতীয়বার** দেওয়া সম্ভব নয়।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে **রেজিস্ট্রি ডাকেও** আশ্বিন সংখ্যাটি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি ডাক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ **সাত টাকা ৩১ আগস্ট** ৯২-এর মধ্যে **কার্যালয়ে পেঁছানো** প্রয়োজন। **ঐ তারিখের পরে** টাকা কার্যালয়ে পেঁছালে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের **আগামী বছরের** ডাকমাশুল বাবদ জমা রাখা হবে।

☐ ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করবেন তাঁদের **২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ('৯২)** পর্যন্ত কার্যালয় থেকে **আশ্বিন সংখ্যাটি** দেওয়া হবে। গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, যেন তাঁরা **এই সময়ের মধ্যে** তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে **১৩ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে**। কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য ৩১ **অক্টোবরের** ('৯২) পর শারদীয়া সংখ্যাটি **প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না**। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সানুগ্রহ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।

☐ কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত **খোলা** থাকে, রবিবার **বন্ধ**। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। **২৬ সেপ্টেম্বর মহালয়া উপলক্ষে এবং ৩ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে পত্রিকা বিভাগ বন্ধ থাকবে।**

যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯ (১৫ মে ১৯৯২)

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯ মে ১৯৯২ ৯৪তম বর্ষ—৫ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

শ্রীপ্রভু লীলার স্বামী, সঙ্গে মাতাঠাকুরাণী
সনাতনী সৃষ্টির আধার।
বিভিন্ন মাত্র ভৌতিকে, এক আত্মা আধ্যাত্মিকে,
অভ্যন্তরে দোঁহে একাকার ॥
দৈহিক সুখ সম্বন্ধ, প্রভু অবতারে বন্ধ,
পরিণয় মাত্র সংস্কার।
কি বুঝিবে বদ্ধ নর, ইষ্টজ্ঞান পরস্পর,
কে পূজ্য পূজক বুঝা ভার ॥
ঠাকুরে শ্রীমায়ের বিয়ে, ছার জৈব বুদ্ধি দিয়ে,
দেখিলে পড়িবে মহাদায়।
শুন কহি পরিচয়, দেহে দেহে বিয়ে নয়,
পরিণয় আত্মায় আত্মায় ॥

অক্ষয়কুমার সেন

কথাপ্রসঙ্গে

সেই অপূর্ব বিবাহ

বহুপঠিত, বহুশ্রুত এবং বহুজ্ঞাত সেই কাহিনী।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ তাঁহার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ "শুভদিনে শুভমুহূর্তে শ্রীযুত রামেশ্বর কামারপুকুরের দুইক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামে ভ্রাতাকে লইয়া যাইয়া শ্রীযুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম বর্ষীয়া [প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া চার মাসের কিছু অধিক বয়স্কা] একমাত্র কন্যার সহিত শুভ-পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া আসিলেন।··· তখন সন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগ এবং ঠাকুর চতুর্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।"

কামারপুকুরের যুবক গদাধর বা রামকৃষ্ণের সহিত জয়রামবাটীর বালিকা সারদামণির বিবাহ হইল। নানা সূত্রে গদাধরের জননী চন্দ্রাদেবী ও অগ্রজ রামেশ্বরের নিকট সংবাদ আসিয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীমন্দিরে পূজা করিতে করিতে গদাধর অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গিয়াছেন। অপ্রকৃতিস্থ গদাধরকে সুস্থ করিবার সর্বোত্তম কার্যকরী উপায় হিসাবে তাঁহারা তাঁহার বিবাহ দেওয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন বৈরাগ্যবান গদাধর হয়তো বিবাহে 'ওজর-আপত্তি' করিতে পারেন। সেজন্য গদাধরের অজ্ঞাতে পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতেছিল। কিন্তু কোথাও মনোমত পাত্রী না মিলায় চন্দ্রাদেবী এবং রামেশ্বর খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গদাধরের অজ্ঞাতে বিবাহের ব্যবস্থাদি অগ্রসর হইতে থাকিলেও দেখা যাইল ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে গদাধর অনবহিত ছিলেন না। মনোমত পাত্রীর সন্ধানলাভে অসমর্থ ও হতাশ জননী ও অগ্রজকে একদিন গদাধর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেনঃ "অন্যত্র অনুসন্ধান বৃথা। জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে দেখগে, বিয়ের কনে সেখানে কুটো বাঁধা আছে।" পল্লীগ্রামে গাছে বা ক্ষেতে প্রথম ফল আসিলে গৃহস্থ বা চাষী সেরা ফলটি ভগবানকে প্রথম নিবেদন করিবে বলিয়া উহার গায়ে একটি 'কুটো' বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে। রামকৃষ্ণের ঐকথা বলিবার

উদ্দেশ্য—সারদার সহিত তাঁহার বিবাহ পূর্ব-নির্দিষ্ট, সারদা তাঁহার সহধর্মিণীরূপে পূর্ব হইতেই চিহ্নিত হইয়া আছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সারদাও রামকৃষ্ণকে তাঁহার স্বামীরূপে সুনির্দিষ্টভাবে নির্বাচন করিয়াছিলেন। তিনি তখন নিতান্তই শিশু। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী-পার্ষদ অক্ষয়কুমার সেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে রামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের শিহড়ের (সারদাদেবীর মাতা শ্যামাসুন্দরীর পিত্রালয়ও শিহড়ে।) বাড়িতে সংঘটিত সেই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

"জনেক গায়ক তথা গায় একদিন।
শুনে জুটে নর-নারী নবীন প্রাচীন॥
নারীদের মধ্যে এক কন্যা করি কোলে।
শুনে গান একসঙ্গে নারীদের দলে॥

*

অল্পবয়া শিশুমেয়ে কোলে ছিল যাঁর।
গীত-সমাপনে এক আত্মীয় তাঁহার॥
আদরে কহিলা বালিকায় সম্বোধিয়া।
এত লোক কারে চাহ করিবারে বিয়া॥
অমনি দেখান বালা তুলি দুই করে।
সন্নিকটে সমাসীন প্রভু গদাধরে॥"

সুতরাং শুধু রামকৃষ্ণই নহেন, সারদাও নির্বাচন করিয়াছিলেন তাঁহার ভাবী স্বামীকে। রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার জননী ও অগ্রজের নিকট স্ব-নির্বাচিত বধূর পরিচয় ঘোষণা করিয়াছিলেন তখন সাধারণ-দৃষ্টিতে তিনি পূর্ণযুবক হইলেও বিবাহের লৌকিক তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি মোটেই সচেতন ছিলেন না (থাকিলে একটি চব্বিশ বৎসরের পূর্ণযুবক পাঁচ বৎসরের একটি নিতান্ত বালিকাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিত না।) আর শিশু সারদা যখন 'স্বয়ম্বরা' হইলেন তখন লোকদৃষ্টিতে 'বিবাহ' শব্দের তাৎপর্যবোধ তো দূরের কথা, 'বিবাহ' শব্দের অর্থবোধও তাঁহার হয় নাই।

এইসমস্ত ব্যাপার শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর জীবনীপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। তবে অনেকেই যে-বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত নহেন তাহা হইল, বাহ্যতঃ জীবনসঙ্গী নির্বাচনে রামকৃষ্ণ-সারদার প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকিলেও ঐ নির্বাচনে উভয়েরই লৌকিক অর্থে কোন সচেতনতাই ছিল না। পরবর্তী ঘটনাবলীতে বুঝা গিয়াছে, ঐ বিবাহ ছিল অনিবার্য এবং অপরিহার্য। মজার ব্যাপার হইল, চন্দ্রাদেবী এবং রামেশ্বর যখন গোপনে গদাধরের জন্য পাত্রীর সন্ধান করিতেছিলেন তখন জয়রামবাটী গ্রামেরই একটি পাত্রীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল এবং সেই পাত্রীটি ছিল সারদাদেবীরই এক জ্ঞাতি-ভগ্নী। জয়রামবাটীর মুখোপাধ্যায় বংশের সেই কন্যার নাম ভাবিনী। পাত্র পাগল বলিয়া ভাবিনীর পিতা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে সারদাদেবী যখন ভক্তমহলে 'শ্রীমা'-রূপে বহুবন্দিত, তখন বাল্যবিধবা ভাবিনীদেবী সারদাদেবীর নিকট ভক্তগণের প্রেরিত শ্রদ্ধার্ঘ্যসামগ্রী দেখিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিতেন এবং বলিতেন ঃ "আহা, পরমহংসদেবের সঙ্গে প্রথমে আমারই বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। বাবা তখন পাগল ভেবে তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন না। সেই বিয়ে হলে এসব জিনিস আমারই ঘরে আসত।" বস্তুতঃ, অন্য কোন কন্যার সহিত রামকৃষ্ণের বিবাহ সম্ভব ছিল না, সম্ভব ছিল না সারদার সহিত অপর কোন পুরুষের বিবাহও। তাঁহারা ছিলেন একে অপরের জন্য ঈশ্বরনির্দিষ্ট। পার্বতীর কঠোর তপস্যার দুর্মদ তেজঃশক্তিকে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য ছিল শুধু দেবাদিদেব মহাদেবের; আবার সমাধি-লীন যোগেশ্বর দেবাদিদেবের অমিত তপঃশক্তিকে বরণ করিবার ক্ষমতা ছিল দুশ্চর তপস্যায় নিশ্চল ব্রতধারিণী পার্বতীরই। তেমনই রামকৃষ্ণ ও সারদার মধ্যে ছিল পরস্পরের অতুলনীয় জীবন ও সাধনাকে অনুপূরণ ও পরিপূরণ করিবার অনন্য পারঙ্গমতা। বোধ করি সেই ইঙ্গিত দিবার জন্যই রামকৃষ্ণ-সারদার বিবাহের বর্ণনায় পুঁথিকার লিখিয়াছেন ঃ "শিবের বিবাহ মনে পড়ে।" বস্তুতঃ, রামকৃষ্ণের সহিত সারদার বিবাহ সাধারণ বিবাহ ছিল না, উহা ছিল বৈরাগ্যের দেবতা শিবের সহিত মহাতপস্বিনী পার্বতীর বিবাহই। পুঁথিকার রামকৃষ্ণের বিবাহ-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ

"জ্বালিয়া সাতাশ কাঠি বিবাহের কালে।
ঘুরে যবে বরে ঘেরে রমণী সকলে॥
জ্বালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সুতা॥
হরিদ্রা-মাখানো সুতা ছিল বাঁধা হাতে।
অপূর্ব প্রভুর খেলা দেখিতে শুনিতে॥
চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ।
ছলে পুড়াইয়া দিলা অবিদ্যা-বন্ধন॥"

ঘটনার তাৎপর্য হইল এই যে, রামকৃষ্ণের সহিত সারদার বিবাহ বৈরাগ্যের আগুনে পরিশুদ্ধ, তপস্যার তেজোধারায় পরিপ্লুত। লৌকিক বিবাহ-সম্বন্ধের ভোগ ও বাসনার লেশমাত্র তাহাতে নাই। এই বিবাহ শুধু পৃথিবীতে একটি চূড়ান্ত আদর্শ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত। পৌরাণিক কাহিনীর তপস্বিনী পার্বতীই যে এবার সারদার শরীর আশ্রয় করিয়াছেন তাহার ইঙ্গিত রামকৃষ্ণ স্বয়ং দিয়াছেন। বিবাহের দীর্ঘকাল পর যখন রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুর গিয়াছিলেন তখন সারদা চৌদ্দ বৎসরের কিশোরী। রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে গ্রামের পুরনারীদের নিকট উচ্চ অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ করিতেন। কিশোরী সারদা সেসব শুনিতে শুনিতে কখনও কখনও ঘুমাইয়া পড়িতেন। অন্যান্যরা তাঁহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিত। আফশোষ করিয়া তাহারা বলিত: "এমন কথাগুলি শুনলে না, ঘুমিয়ে পড়ল।" রামকৃষ্ণ বলিতেন: "না গো, না, ওকে তুলো না। ওকি সাধে ঘুমোচ্ছে? এসব কথা শুনলে ও এখানে থাকবে না—চোঁ-চাঁ দৌড় মারবে।"

প্রথমবার সারদা যখন দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর নিকট আসেন তখন একদিন স্বামী সারদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "কি গো, তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" অষ্টাদশী সারদা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সহজ ও দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন: "না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।"

স্বামী কি পরীক্ষা করিতেছিলেন সারদাকে? যদি করিয়া থাকেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত উত্তরও তিনি পাইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি দিনে, প্রতি রাত্রিতে তিনি বুঝিয়াছেন তাঁহার নবযৌবনবতী সহধর্মিণী কোন্ উপাদানে গঠিত। আচরণে যাহা অবিসংবাদিতভাবে জানিয়াছিলেন, বাচনিক অঙ্গীকারে তাহার সমর্থন পাইবার অভিলাষ বোধহয় তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। আচরণ এবং বাক্য উভয় ক্ষেত্রেই সারদা বুঝাইয়া দিলেন—কামগন্ধহীন দেহাতীত নিবিড়তম সম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত সম্পর্কিত।

ইহার পর সারদার পালা স্বামীর নিকট হইতে বাচনিক অঙ্গীকার গ্রহণের। তিনিও ইতঃপূর্বে তাঁহার স্বামীর সান্নিধ্যে অবস্থানের প্রত্যেক মুহূর্তে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামী বস্তুতই দেবমানব—ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দেহসর্বস্ব সংসারে তাঁহার পবিত্রতার তুলনা স্বয়ং তিনিই। তবুও তিনি একদিন স্বামীর মুখ হইতে সুস্পষ্টভাবে জানিতে চাহিলেন তাঁহার প্রতি স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত পরিচয়। একদিন পদসংবাহন করিতে করিতে স্বামীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: "আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?" বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া 'জগদম্বার বালক' উত্তর দিলেন: "যে-মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন (রামকৃষ্ণের গর্ভধারিণী তখন নহবতে বাস করিতেছিলেন।), আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।"

ইহার পর আর কোন পক্ষেরই কোন জিজ্ঞাসা থাকিতে পারে না। জিজ্ঞাসা তাঁহাদের কাহারও ছিলও না। তবে লোকদৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ ও সারদার অভূতপূর্ব দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ বুঝিবার জন্য—যদিও উহা বুঝিবার সামর্থ্য সাধারণের নাই—আমাদের ঘটনা দুটি স্মরণ রাখিতে হইবে।

একে অপরকে কিভাবে দেখেন তাহা পরস্পরকে যেমন নিত্যদিনের আচরণে তাঁহারা বুঝাইয়াছিলেন, তেমনই তাহা বুঝাইয়া দিলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষাতেও। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্য—বাস্তবিক, যাহার তুল্য মানবীয় সম্পর্কের প্রকাশ পৃথিবী ইতঃপূর্বে কখনও দেখে নাই—উভয়ে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান করিলেন। আমরা বহুপ্রসিদ্ধ ষোড়শীপূজার কথা স্মরণ করিতেছি। স্ত্রীকে সাক্ষাৎ দেবী ও জগন্মাতারূপে পূজা ও প্রণিপাত করিয়া রামকৃষ্ণ তাঁহার সকল আচরণ ও বাক্যকে বর্ণে বর্ণে প্রমাণ করিলেন। আর সারদা? তিনিও স্বামীর পূজা ও প্রণিপাত নির্বিকারভাবে গ্রহণ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি দেবী এবং জগন্মাতাই, এবং জগতে রামকৃষ্ণের প্রণিপাত গ্রহণ করিবার অধিকার রামকৃষ্ণের গর্ভধারিণী ও গুরু ভিন্ন শুধু তাঁহারই রহিয়াছে। বস্তুতঃ, সেই স্তরেই উভয়ের দাম্পত্য মিলন অহর্নিশ ঘটিত। উহা ছিল সর্ব অর্থেই এক অনন্য সম্পর্ক। ষোড়শীপূজার বর্ণনা করিতে গিয়া পুঁথিকার অপূর্ব ভাষায় লিখিয়াছেন:

"পূজ্য পূজকেতে দুয়ে, ভাবরাজ্য তিয়াগিয়ে,
ভাবাতীতে একত্রে মিলন।
দেহ দুটি পড়ে হেথা, মিলিয়া গিয়াছে সেথা,
বিয়ের বারতা বুঝ মন।

*

বন্ধ মন ইশারায়, প্রভু আর শ্রীশ্রীমায়,
রূপে দুইহ্, আত্মায় অভেদ।
হৃদে চিত্তে প্রাণে মনে, এক ঠাঁই দুই জনে,
তিলেকেও নাহিক বিচ্ছেদ ॥"

সাধারণের ধারণা, দৈহিক সম্পর্কই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীরতম নৈকট্যের প্রকৃত মাধ্যম। রামকৃষ্ণ-সারদার দাম্পত্য জীবন প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত নৈকট্য স্থাপিত হয় দেহাতীত সম্পর্কে—আত্মার সহিত আত্মার মিলনে। তাঁহাদের বিবাহ ছিল বাহ্য অর্থে একটি 'সংস্কার', কিন্তু একের সহিত অপরের ছিল পূজ্য-পূজক সম্পর্ক এবং এইরূপ বিবাহ পৃথিবীতে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। অপূর্ব এবং অনন্য এই পরিণয়। এই পরিণয়ের অতুলনীয় মহিমার জন্য রামকৃষ্ণ যতখানি কৃতিত্বের অধিকারী, সারদার কৃতিত্ব তদপেক্ষা বেশি না হইলেও অন্ততঃ ততখানিই। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় অনবদ্য ভাষায় লিখিয়াছেন ঃ

"[ষোড়শীপূজার পর] রামকৃষ্ণ-চন্দ্রে ষোড়শ-কল-চন্দ্রিকা ফুটিয়া উঠে। ঐ শোভা ইতিহাসে অতি দুর্লভ। অনেক অনেক সাধু-মহাজন সহধর্মিণী ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণের ত্যাগ—ত্যাগ নয়—অঙ্গীকারের পরাকাষ্ঠা।—চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না—তেমতি মা লক্ষ্মী আমাদের—সেই ষোড়শীপূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ-শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।"

বিবাহ শুধু মানুষের আবশ্যিক 'সংস্কারে'র অন্যতম প্রধানই নয়, বিবাহ একটি মহাপবিত্র ধর্মকৃত্যও—এই ধারণা ভারতের শাস্ত্রে, ভারতের আচার্যদের বাণীতে যুগ যুগ ধরিয়া প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, বিবাহকে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির সমাজ-স্বীকৃত উপায় হিসাবেই মানুষ দেখিয়াছে এবং স্ত্রীকে পুরুষমাত্রেই "ভোগমাত্রৈকসহায়া পরাধীনা দাসী"-রূপেই ব্যবহার করিয়াছে। রামকৃষ্ণ-সারদার বিবাহ বিবাহ সম্পর্কে মানুষের এযাবৎ প্রচলিত সকল ধারণাকে নস্যাৎ করিয়া তাহার প্রকৃত তাৎপর্যকে জ্বলন্তভাবে জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছে। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন ঃ "ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভিন্ন বিবাহের যে অপর একটা মহাপবিত্র, মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে—একথা আমরা আজকাল একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি, আর দিন দিন ঐ কারণে পশুরও অধম হইতে বসিয়াছি। নব্য ভারত-ভারতীর ঐ পশুত্ব ঘুচাইবার জন্যই লোকগুরু ঠাকুরের বিবাহ।"

তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, স্ত্রীকে দূরে রাখিয়া ইন্দ্রিয়জয়ের অহমিকা করা যায়; কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বাস করিয়া উভয়ের কাম-গন্ধহীন জীবনযাপনের মধ্যেই রহিয়াছে ইন্দ্রিয়-জয়ের প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা। রোমহর্ষক সেই অগ্নি-পরীক্ষায় কিভাবে রামকৃষ্ণ—এবং সারদাও—অক্ষত-ভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন সে-ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

প্রশ্ন হইবে ঃ যে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ রামকৃষ্ণ-সারদা দেখাইয়াছেন উহা তো চূড়ান্ত আদর্শ—সাধারণ মানুষের পক্ষে উহার অনুষ্ঠান কি অসম্ভব নহে? উত্তরে বলিব ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই উহা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তবে উহার আংশিক অনুষ্ঠান তো সাধারণ মানুষ করিতে পারে এবং ঐ 'আংশিক' অনুষ্ঠানেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ "আমি ষোল টাং করিয়া গেলাম যাহাতে তোমরা অন্ততঃ একটাং করিতে পার।"

রামকৃষ্ণ-সারদার বিবাহ এবং অপূর্ব দাম্পত্য জীবন পৃথিবীতে আদর্শ স্থাপনের জন্য—সকল মানুষের—সকল সমাজের সমূহ কল্যাণের জন্য। স্বামী সারদানন্দ ঐ বিবাহের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ "এ অপূর্ব যুগাবতারের বিবাহ করিয়া,একদিনের জন্যও শরীর সম্বন্ধ না পাতাইয়া, স্ত্রীর সহিত এই অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব প্রেমলীলার বিস্তার কেবল তোমারই জন্য। তুমিই শিখিতে পারিবে বলিয়া যে—ইন্দ্রিয়পরতা ভিন্ন বিবাহের অপর মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে এবং এই উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যাহাতে তুমিও বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্যের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া স্ত্রী-পুরুষে ধন্য হইতে পার এবং মহামেধাবী, মহাতেজস্বী, গুণবান সন্তানের পিতামাতা হইয়া··· সমাজকে ধন্য করিতে পার, সেইজন্য।··· [রামকৃষ্ণ-সারদার জীবনে] আজীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা ও সাধনাবলে উদ্বাহ-বন্ধনের অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র 'ছাঁচ' জগতে এই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছে। এখন,···তোমরা নিজ নিজ জীবন সেই আদর্শ ছাঁচে ফেল, আর [উহাকে] নূতনভাবে গঠিত করিয়া তোল।" □

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

॥ ১ ॥

বৃন্দাবন

৪ ডিসেম্বর (১৯)০৩

প্রিয় কালীকৃষ্ণ,*

তোমার গত মাসের ৩০ তারিখের চিঠি পাইলাম। তুমি পুনরায় অধিকতর সুস্থবোধ করিতেছ জ্ঞাত হইয়া আনন্দিত হইলাম। বাস্তবিক বর্তমানে তুমি যেখানে আছ সেখানেই তোমার থাকার সংকল্প একাধিক কারণে যথার্থ হইয়াছে এবং কৃষ্ণলালকে লেখা তোমার পত্র হইতে আমার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আমাকে তুমি এখানে আসিতে আগ্রহী। সেকারণেই আমি তোমাকে [এখানে আসিতে] বলিয়াছিলাম। যাহা হউক, তুমি সেখানে থাকিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠ। শ্রীশ্রীমা কলিকাতা আসিলেই বোধহয় কৃষ্ণলাল তোমাদের কাছে যাইবে। আমি কোথায় যাইব এখনও কিছু স্থির করি নাই। পরে দেখা যাইবে। সম্প্রতি আমার জ্বর হইয়াছিল, বর্তমানে ভাল আছি—কেবল একটু দুর্বল। সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা জানাইবে। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে।

ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

॥ ২ ॥

কনখল

২১. ১১. (১৯)০৬

প্রিয় রামচন্দ্র*

১৪ তারিখের পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, তুমি স্বামী অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ এবং তাঁহার সহিত তোমার কথা হইয়াছে। তিনি সময়ের অভাবে [এবার] এখানে আসিতে পারেন নাই এবং ফলে আমার সঙ্গেও তাঁহার দেখা হয় নাই। এই মুহূর্তে কোন ব্যথা না থাকিলেও আমার স্বাস্থ্য সন্তোষজনক নয়। আমি দাঁতের যন্ত্রণায় খুবই ভুগিয়াছি। এখন সামান্য ভাল বোধ করিতেছি। তুমি আশাকরি ভালই আছ। তুমি যদি বম্বেতে বেদান্ত সমিতির একটি শাখা শুরু করিতে পার তাহা হইলে খুব ভাল হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সত্যিকারের আগ্রহ থাকিলে শিক্ষকের অভাব হইবে না। এখানকার সকলেই ভাল আছেন। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে।

ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

* **চিঠি দুটি ইংরেজীতে লেখা।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন।**

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ মঠের চতুর্থ পর্যায়

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মিস মুলার শেষবারের মতো মঠে এসেছিলেন ৯ নভেম্বর ১৮৯৮। এ-প্রসঙ্গে ৪ জানুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে মিসেস হ্যামন্ডকে লেখা নিবেদিতার চিঠির একটি অংশ স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেনঃ "Miss Muller has severed all connections with the Movement, and calls this 'giving up Hinduism and returning with joy to Christianity'. It was news to me that any of us had yet left Christianity. The monks have given a delightful proof of characters. I have not heard an unkind word from one of them about her---and she has done all she could to give publicity to her new attitude."[১৩] আর মঠের পক্ষ থেকে স্বামী সারদানন্দ ১৯ জানুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেনঃ "বেচারী মিস মুলার গত মঙ্গলবার তাঁর বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন।...সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভেবেছিলাম তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাব।... শেষ পর্যন্ত আমরা স্থির করলাম নিবেদিতাই আমাদের পক্ষ থেকে দু-চার লাইন লিখবে এবং কালীকৃষ্ণ[১৪] সেই চিঠি, কিছু গোলাপ, ফল ও বাদাম তাঁকে দিয়ে আসবে।"

শ্রীমতী মুলারের অবিবেচকের মতো আচরণে মঠের সংশ্লিষ্ট অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু আলোচ্যকালের অপর একটি বেদনাদায়ক ঘটনায় সকলেই তাঁর মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ বলতেন, যেমন ব্যাসদেবের গণেশ, তেমনি স্বামীজীর 'বিশ্বস্ত' গুডউইন। ২ জুন ১৮৯৮ তারিখে উতকামণ্ডে গুডউইন অকালমৃত্যু বরণ করেছিলেন। দুঃসংবাদ শুনে শোকাহত স্বামীজী মন্তব্য করেছিলেনঃ "আমার ডান হাত চলে গেল। আমার ক্ষতি অপূরণীয়।" তিনি তখন আলমোড়ায়। শোকসন্তপ্তা গুডউইন-জননীকে স্বামীজী লিখে পাঠালেন একটি মর্মস্পর্শী কবিতা 'Requiescat in pace' (শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম)।

এদিকে ভয়াবহ আরেকটি ঘটনার আশঙ্কায় মঠবাসিগণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তপস্যার কঠোরতায় স্বামী যোগানন্দের সুঠাম স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তিনি আমাশয়, জ্বর ইত্যাদিতে শয্যাগত হয়েছিলেন। মঠ থেকে সন্ন্যাসিগণ বাগবাজারে এসে তাঁর দেখাশুনা করতেন, সেবা করতেন। তিনি মঠে শেষবারের মতো এসেছিলেন ২৬ নভেম্বর, ১৮৯৮। পরবর্তী ২৮ মার্চ ১৮৯৯ তিনি ১০।২ বোসপাড়া লেনে তাঁর মরদেহ ত্যাগ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী যোগানন্দের এই অকালপ্রয়াণে মঠবাসিগণ আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে ভাবছিলেন, রামকৃষ্ণ সৌধের একটি বরগা খসে পড়ল!

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ইংরেজ রাজত্ব জেঁকে বসেছিল। পাশ্চাত্যের প্রবল হাওয়াতে রাজধানী কলকাতা স্বকীয়তা হারাতে বসেছিল। এদিকে প্রায় সকলের অজ্ঞাতসারে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামকৃষ্ণ-ভাবতরঙ্গ পানিহাটি থেকে কালীঘাট পর্যন্ত গঙ্গার পূর্ব উপকূলে ছড়িয়ে পড়েছিল। শতাব্দীর প্রত্যন্তে ভাবতরঙ্গের মূল-কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হয়েছিল গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে বেলুড় গ্রামে এবং প্রথম আশ্রয় নিয়েছিল শ্রীমায়ের তপস্যাপূত একটি বাগানবাড়িতে। ছোট একতলা

১৩ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 34

১৪ কালীকৃষ্ণ বসু, জনৈক ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

একটি বাড়ি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে বর্তমান দোতলা বাড়ির আকার ধারণ করেছিল। এসকল পরিবর্তনের নীরব সাক্ষী বিশাল একটি নিমগাছ গঙ্গার ঘাটের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সেদিন পর্যন্ত। এখানে মঠ আসতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের অধিকাংশ উপস্থিত হয়েছিলেন। গৃহীভক্তগণের অধিকাংশই মঠ দর্শন করে গিয়েছিলেন, মঠের সঙ্গে সংযোগ সুগম করে তুলেছিলেন। তাছাড়াও এখানে এসেছিলেন ইংরেজ ও আমেরিকান বেদান্তানুরাগিগণ।

আপাতদৃষ্টিতে কাশীপুর, বরাহনগর ও আলমবাজার মঠের সঙ্গে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ির মঠের মিলের চাইতে গরমিলই বেশি। ফলতঃ এখানে মঠবাসিগণের জীবনবোধ ও আচরণের মধ্যে পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আলমবাজার মঠের শেষ বছরটিতেই নতুন ভাবের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। মঠবাসিগণ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। দু-একজন প্রতিবাদ করলেও কেউই বাধা দেননি। মঠবাসিগণের মধ্যে কখনো কখনো মতান্তর হলেও মনান্তর কখনই ঘটেনি। পরিবর্তনাদি এসেছিল তিনটি ধারায়। প্রথমতঃ, আত্মমুক্তিকামী সন্ন্যাসিগণের সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দ তুলে ধরেছিলেন দ্বৈত-লক্ষ্য—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" এখানে 'চ' বিকল্পার্থক নয়, সমুচ্চয়ার্থক। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এই আপাত দ্বৈত-লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে এক-লক্ষ্যাভিমুখী। নতুন এই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত সন্ন্যাসিগণের সেবাকাজ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সেবাকে স্মরণ করিয়ে দিলেও এদের মধ্যে ছিল পার্থক্য। মঠের সন্ন্যাসিগণ সেবাকে পূজা-উপাসনায় রূপান্তরিত করবার সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতাপ্রিয় সন্ন্যাসিগণকে সংগঠিত করবার জন্য স্বামীজী 'নিয়মাবলী'র প্রবর্তন করেছিলেন। ঘণ্টা বাজিয়ে সময়ের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেন। ব্যক্তি-স্বার্থকে গোষ্ঠী-স্বার্থের নিকট বিসর্জন দিতে হলো। স্বামীজী একটি চিঠিতে স্বামী শিবানন্দকে লিখেছিলেন: "Above all, 'obedience' and 'esprit de corps'—সম্প্রদায়ের হুকুমের অধীনতা ও সম্প্রদায়ের জন্য আপনার ভাবকে বলিদান—এ না হলে কাজ হবে না। 'তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ'।"[১৫] সে-কারণে মঠবাসিগণকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আজ্ঞাবহতার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের শিক্ষা নিতে হলো। তৃতীয়তঃ, পরম্পরার দোহাই মাত্র না দিয়ে যুক্তিবিচারের ভিত্তিতে, গণতান্ত্রিক ভাব অনুসরণ করে মঠজীবনকে পরিচালনার চেষ্টা করা হলো। পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করা হলো গোষ্ঠী-স্বাস্থ্য, বিদ্যাচর্চা ও প্রচারকার্য। উপরোক্ত তিনটি ধারার সম্মিলনে সঙ্ঘের সংহতি দৃঢ়তর হয়েছিল। মঠ-জীবনে 'এক মন, এক প্রাণ' ভাবটি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল।

ভাবাদর্শগত এ-সকল বিবর্তনমুখী পরিবর্তন ছাড়াও এইকালে বেলুড় গ্রামে মঠের জন্য জমি সংগ্রহ, জমির প্রস্তুতি ও নতুন বাড়িঘর তৈরি করে নতুন স্থায়ী মঠের পত্তন হয়েছিল। এ-সকল কাজকর্ম নীলাম্বর-ভবনের মঠজীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বাভাবিক কারণেই অনেকে ভেবেছিলেন, নীলাম্বর-ভবনের মঠ হবে কতকটা 'অস্থায়ী শিবির' (transit camp)-এর মতো। কিন্তু স্বামীজী প্রমুখ প্রবীণগণ এখানে স্থায়ী মঠের কর্মসূচী ও মঠের নিয়মাবলী পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল—মঠবাসিগণের চরিত্র-গঠনের শিক্ষা যেন অব্যাহত ধারায় চলতে থাকে।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে মঠ হলো প্রধানতঃ প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র। চারটি যোগের সমবায়ে চরিত্র গড়ে তোলাই এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা অনুযায়ী মঠের অন্তেবাসীদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সকল বিষয়ে শিক্ষাদান চলেছিল, আবার বিদেশাগত বেদান্তানুরাগিগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। দ্বিতীয় শিক্ষাসূচীর পূর্ণ দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন স্বামীজী স্বয়ং। এই পর্যায়ে তিনি যতদিন বেলুড়ে ছিলেন ততদিন তিনি মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড ও মিস নোবলের জন্য দৈনিক অনেকখানি করে সময় দিয়েছেন, আবার আলমোড়াতে গিয়েও সে-শিক্ষাসূচী অব্যাহত রেখেছিলেন।

১৫ ৯।৭।১৮৯৭ তারিখে লেখা অপ্রকাশিত চিঠি।

একটি সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের জীবনে নানা পরিবর্তন এসে থাকে। প্রায়শঃ পরিবর্তন আসে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। এখানে পরিবর্তন এসেছিল মুখ্যতঃ স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা-টির রূপায়ণের তাগিদে। তিনি ঠাকুরের জীবন ও বাণীর আলোকেই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। সন্ন্যাস-জীবনের যুগোপযোগী নতুন আদর্শ উপস্থাপিত করেছিলেন। পরিবর্তনের টানাপোড়েনে অনেক দ্বিধা, আশঙ্কা ও যন্ত্রণা বিজড়িত। কিন্তু ইতঃপূর্বেই মঠবাসিগণ এমন কিছু সম্পদ অর্জন করেছিলেন যার দ্বারা তাঁরা পরিবর্তনের সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সম্পদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন একটি ভাষণেঃ "বারোটি তরুণ মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলছে, সেই আদর্শ তারা জীবনে বাস্তবায়িত করতে দৃঢ়সংকল্প। সকলেই শুনে হাসত।... ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রবল হয়ে উঠল, আমরাও ততই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম।... দশটি বছর কেটে গেল। সহস্রবার হতাশা দেখা দিল; কিন্তু একটি জিনিস আমাদের সর্বদাই আশান্বিত করে রেখেছিল —সেটি হলো আমাদের পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও গভীর ভালবাসা। প্রায় একশত নরনারী আমার চারপাশে রয়েছে; ভবিষ্যতে যদি আমি একটি শয়তানে পরিণত হই, তারা বলবে, 'আমরা এখনও আছি। আমরা তোমাকে কখনই ত্যাগ করছি না।' এই ভালবাসাই পরম আশীর্বাদ।"[৯৬] শ্রীমাও বলতেনঃ "ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।" পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং প্রতিদানের প্রত্যাশা-বর্জিত ভালবাসা সন্ন্যাসি-গণকে একটি অদৃশ্যপ্রায় নরম রেশমী সুতার বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল। একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করা যাক। মঠ তখন নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে। আমেরিকা-ফেরৎ স্বামী সারদানন্দের সব কাজই তখন কেতাদুরস্ত। তিনি ঘরের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতেন, যেখানে যেটি থাকা দরকার, সেইখানে সেই জিনিসটি রাখতেন। প্রায়ই দেখা যেত, স্বামী অদ্ভুতানন্দ স্বামী সারদানন্দের ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র এলোমেলো করে রাখতেন, কখনো বা স্বামী সারদা-নন্দের ধবধবে সাদা চাদরের বিছানায় তিনি ধুলোশুদ্ধ পায়ে উঠে গড়াগড়ি দিতেন। ব্যাপার কি বুঝতে চান স্বামী সারদানন্দ। অনেক পীড়া-পীড়ি করাতে স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলেনঃ "দেখছি! ওদেশ থেকে এসে তুমি কতোখানি সাহেব বনেছো?" একথা শুনে সারদানন্দ রাগ তো করলেনই না, হেসে উঠলেন।[৯৭] তাঁদের আচরণের মধ্যে পরিস্ফুট তাঁদের বিমল ভালবাসার স্বরূপটি।

আরও একটি সম্পদ ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর 'শ্রীজী'কে বুকে ধরে তাঁরা বরাহনগর থেকে বেলুড়ে এসেছিলেন। 'শ্রীজী' তাঁদের কাছে জীবন্ত, তাঁদের চিরসাথী। তাঁদের চোখের সামনে ভাসত একটি ঘটনা। কাশীপুর বাগানবাড়িতে উপস্থিত বাবুরাম, কালীপ্রসাদ প্রমুখদের লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ "তোদের আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ।" তাছাড়া তিনি বলেছিলেনঃ "তোরা যেন বাঁদর, আর আমি বাঁদরওয়ালা, তোদের কোমরের দড়ি আমার হাতে। বেশি উপদ্রব করলে বাঁদরওয়ালা দড়ি টান দেয়।"[৯৮] ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ বিশ্বাস করতেন, তাঁরা সকলে ঠাকুরের স্নেহের শাসনাধীনে বাঁধা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ঠাকুর তাঁর স্বনির্বাচিত নেতা 'নরেন্দ্র'কে দিয়ে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছিলেন। ভালবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য সন্ন্যাসি-সঙ্ঘকে সম্পন্ন ও সুদৃঢ় করেছিল। উপরন্তু তাঁরা সকলেই বিশ্বাস করতেন, স্নিগ্ধোজ্জ্বল সন্ধ্যাতারার মতো তাঁদের মাথার ওপর রয়েছে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ।

এভাবে দেখা যায়, মঠবাসিগণের পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও গভীর ভালবাসা, আদর্শ রূপায়িত করবার জন্য মঠবাসিগণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য—

৯৬ স্বাঃ বাণী ও রচনা ১০ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৬৪-১৬৭

৯৭ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৬৪

৯৮ স্বামী প্রেমানন্দের ১৫ আগস্ট ১৯১৫ তারিখের চিঠি, পত্রসংকলন, ১৩৫০, পৃঃ ২০

এ-সকল দুর্লভ সম্পদের অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গোষ্ঠী সন্ন্যাসের নবীন আদর্শ বাস্তবায়নের অগ্নিপরীক্ষায় স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। উপরন্তু এই নবীন আদর্শ প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালে উদ্ভূত মঠবাসিগণের চরিত্র-সম্পদ সন্ন্যাসি-সঙ্ঘকে সম্পন্ন করেছিল।

দেবতার উপাসনা করেছিলেন। বাহ্য পরিবর্তনের ঝলক দেখে কোন কোন মঠবাসী কিছুটা বিভ্রান্ত, এটা লক্ষ্য করে স্বামীজী সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন: "জানবি! আমরা এখনো ভুলিনি যে, আমরা গাছতলার সাধু।"[৯৯] বরাহনগর মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ ত্যাগ ও তপস্যার যে-ধুনি
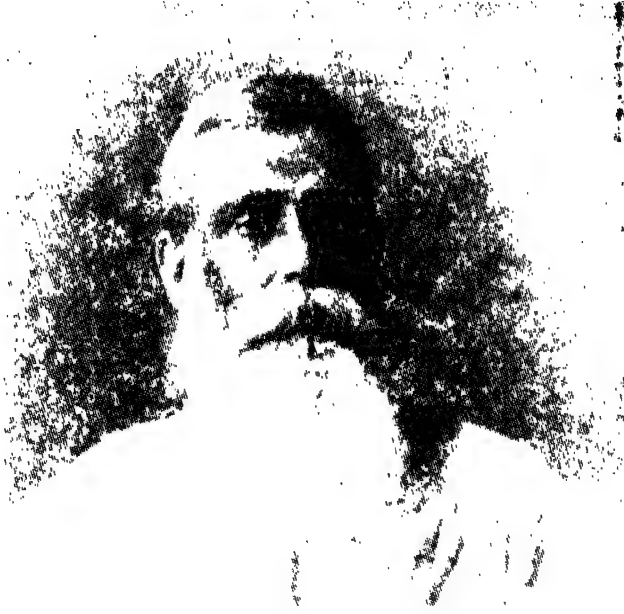
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯২০) সৌজন্য: তপন সিন্‌হা

ওপরে আলোচিত রূপান্তরাদি তুলনামূলকভাবে বাহ্যিক। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রূপান্তরের প্রারম্ভে, মধ্যে ও অন্তে সর্বাবস্থায় সন্ন্যাসিগণ ত্যাগ ও তপস্যার ভাবাগ্নি উজ্জ্বল রেখে তাঁদের জীবন-জ্বালিয়েছিলেন, তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেই নীলাম্বর-ভবনের মঠবাসিগণ অগ্রসর হয়েছিলেন। ত্যাগ ও তপস্যার বাতাবরণেই তাঁরা সন্ন্যাসের নব-আদর্শটি রূপায়িত করেছিলেন। সে-আদর্শে

৯৯ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃ: ৩৩৫

আকৃষ্ট হয়েই গৃহীভক্তগণ ক্রমে ক্রমে মঠ ও মঠ-বাসীকে আপনার করে নিয়েছিলেন। বেলুড়-বালি-উত্তরপাড়ার লোকজনও মঠে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। কিন্তু বালি-উত্তরপাড়ার গোঁড়া ব্রাহ্মণদের একাংশের মধ্যে শোনা যাচ্ছিল মঠের বিরুদ্ধে জল্পনা-কল্পনার কোলাহল।

প্রায় একশো বছর তফাতে সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে আমাদের বিচার করা প্রয়োজন, নেতা স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন কতটুকু রূপায়িত হতে পেরেছিল। নীলাম্বর-ভবনে মঠ স্থানান্তরের কয়েকমাস পূর্বে ৯ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "জোর তিন চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে।··· আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ প্রবলভাবে চালু হয়ে গেছে। আর এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অন্ততঃ ভারতে এমন একটা যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমবো।" আলোচ্য কালের শেষাংশে স্বামীজী তাঁর যন্ত্রটিকে সক্রিয় এবং জগতের হিতে উদ্যোগী দেখতে পেয়ে কতকটা যে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষায় ইতোমধ্যেই দেখা গিয়েছিল, স্বামী বিবেকানন্দ জমি প্রস্তুত করে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদত্ত যে-বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার পল্লবোদ্গম সৃষ্টি করেছে সবুজ জমিখণ্ড যা আগতপ্রায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে স্বাগত জানাচ্ছে। দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী থেকে উৎসারিত ভাবগঙ্গার ক্ষীণধারাটি ইতোমধ্যে খরস্রোতা হয়ে উঠেছিল, ক্রমেই তার বিস্তৃতি প্রসারিত হচ্ছিল। তার কল্যাণময়ী ভূমিকা জনসাধারণের মধ্যে বিপুল প্রত্যাশা জাগিয়েছিল। ❑

[সমাপ্ত]

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির (মাঝে)। পিছনে—বিষ্ণুমন্দির/গোবিন্দজীর মন্দির/রাধাকান্ত-মন্দির। সামনে—কালীমন্দিরের নাটমন্দির ; এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মথুরবাবুকে অনুরোধ করে পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় তিনি বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সমকালীন অগ্রগণ্য সাধক ও পণ্ডিতদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। বিচারসভায় সমবেত সাধক ও পণ্ডিতবর্গ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দিরের (দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছবি অবশ্য প্রচ্ছদে নেই।) অবস্থান বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু হিন্দুদের দিক থেকেই নয়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের দিক থেকেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি তাৎপর্য রয়েছে। মন্দিরের জমির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, বাকি অংশের অনেকটা জুড়ে ছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী-সাহেবের পীরের দরগা। এই যোগাযোগ যেন দৈবনির্দিষ্ট। কারণ, এই ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে যুগাবতার মহাসমন্বয়ের উদার বাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। এই বাণীই আজ শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে। দেশ ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মত ও পথের অসহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে এই বক্তব্য আমরা তুলে ধরতে চাইছি।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

'মুক্তি'

স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ

বাসনার মাঝে প্রাণের তৃপ্তি খুঁজেছি !
মৃত্যুর জালে পেয়েছি নরক যাতনা ।
কাম-কাঞ্চনে দুঃখই শুধু বুঝেছি !
আঁধারে ফেলেছি দীর্ঘশ্বাস কত না ।

তোমাতে আমার অমৃত-সিন্ধু জেনেছি
সেই সিন্ধুর গভীরেতে চাই ডুবিতে !
তোমাতে আমার পারিজাত ফুল দেখেছি
সে ফুল-মধুর আস্বাদ চাই লভিতে ।

খাঁচার পাখির পিঞ্জর দাও ভাঙিয়া !
অসীম শূন্যে এবার মেলুক পাখা সে ।
উষার আলোয় দিগন্ত ওঠে রাঙিয়া !
মুক্তির বাঁশি বাজে ঐ দূরে আকাশে !

পুকুরের মাছ সমুদ্রে যেতে চাহি গো !
কামনার যত বন্ধন যাক টুটিয়া !
দিগ্‌দিগন্তে জল ছাড়া কিছু নাহি গো !
যেখানেতে খুশি সেখানেতে যাই ছুটিয়া ।

অল্পেতে সুখ কখনই তুমি পাবে না !
মানুষের প্রাণে ভূমানন্দের পিপাসা ।
দুধের তৃষ্ণা ঘোলেতে কখনো যাবে না ।
ফাগুনের মতো কেটে যাক যত কুয়াশা ।

তুমি

বিনতা চক্রবর্তী

তোমার পানে চেয়েই তো এসেছি
দীর্ঘ এই পথ ।
সুদূর শৈলশিখরে,
যেখানে পাহাড়ে ঘেরা ঝরনার ধারা
সবুজের বুক চিরে
এনেছিল তোমার আনন্দবার্তা,
আনমনে, খেলাচ্ছলে, প্রথম এ দেহমনে—
তখন জাগেনি কোন উপলব্ধি,
আসেনি কোন অনুভূতি ।
সবার সাথে মিলে মিশে,
শুনেছি তোমার আগমনী,
নেচেছি, গেয়েছি, মেতেছি উৎসবে ।
সাঙ্গ হয়েছে কিশলয়ের সেই খেলা ।
এসেছে যৌবন, তারপর এল প্রৌঢ়ত্ব :
তাও রবে না, ক্রমশঃ বয়ে যাবে বেলা ।
মনে পড়ে, সুখ-দুঃখে ভরা
সেই বিগত দিনগুলির কথা ।
কত বিচ্ছেদ, কত হতাশা,
কত সুখ, কত ভালবাসা—
আশাভঙ্গের নিষ্ঠুর যন্ত্রণায়
কতবার দগ্ধ হয়েছে দেহ মন প্রাণ,
দুঃখের নির্মম দংশনে
কান্নায় বন্ধ হয়েছে আঁখি ;
আবার কতবার কত সুখের মুহূর্তে
প্রাণ-মন গিয়েছে মগ্ন হয়ে ।
সে-সবই আজ স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি ।
আজ বুঝি জীবন ঐ রকমই—
দুঃখ-সুখের আলোছায়া মাখা,
তবে দুঃখই বেশি করে বাজে
আমাদের বুকে ।
তবে সেই বেদনার ক্ষণে
অকস্মাৎ চোখ মেলে দেখি
জ্যোতির্ময় এক বৃত্তের মধ্যে
আমি বসে আছি :
সে বৃত্ত জুড়ে শুধু তুমি,
শুধু তুমি, শুধু তুমি ॥

বিবেকানন্দঃ তোমাকেই খুঁজি

মোহন সিংহ

শতাব্দীর তটপ্রান্তে অবক্ষয়ী কালনাগ জাগে
বস্তুবাদী সভ্যতায় শিরায় শিরায় নীল বিষ
মানুষের মুখে তাই নীলছায়া বড় অসহায়
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ব্যক্তিগত জতুগৃহ জ্বলে।

বারুদের গন্ধ আজও, কামানের প্রচণ্ড বর্ষণ—
ইরাক ইরাণ জ্বলে, জ্বলতে থাকে শ্রীলংকার মাঠ,
ভালবাসা মৈত্রীবাণী বিশ্বশান্তি সব ধূলিসাৎ—
কংকালের স্তূপমালা সকরুণ সাক্ষী হয়ে রয়।

কন্যাকুমারিকা-স্বপ্নঃ 'নূতন ভারত' গড়া চাই,
ভারত গড়ার জন্য জ্বলন্ত বিশ্বাসে দীপ্তিমান
তেজোদ্দীপ্ত যে সন্ন্যাসীঃ শতাব্দীর কালোমেঘ মাঝে
লক্ষ্যচ্যুতা এ পৃথিবী আরবার তোমাকেই খোঁজে ॥

পাপ

ব্রত চক্রবর্তী

ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে দেবতার শরীরে।
একা।

কাঠের সিংহাসনে তেত্রিশ কোটি বিগ্রহ।
মালা পরাতে গেলে হাত কাঁপে, পাছে
দেবতার পবিত্র ত্বক স্পর্শ করে ফেলি।
কিন্তু ইঁদুর অবলীলায় ঘুরছে, লাফাচ্ছে,
ওর পায়ের টোকায় থত্থর দুর্গার খড়্গ,
শিবের ত্রিশূল, কৃষ্ণের সুদর্শনচক্র।
ভয়ডর নেই।

আসলে ইঁদুর জানে
দাঁতের ছোট্ট এক কুটুস ছাড়া
অন্য কোন পাপ নেই ওর!

বাউলরাজ

চণ্ডী সেনগুপ্ত

বাউলের দল অতর্কিতে গান শেষ করে
সন্ধ্যাবেলা চলে গেছে
সুরের মূর্ছনা তবু সকালের গাছে
রয়ে গেছে ছোঁওয়া
নিষ্ঠুর উপেক্ষায় তাকে পারেনিকো মুছে দিতে
অবিশ্বাসী হাওয়া ॥
হে বাউলরাজ!
যে উদাত্ত প্রেমগাথা স্নেহময় স্বরে
বাউলেরা গেয়ে গেছে পূত পুণ্য দক্ষিণেশ্বরে
তোমারই ইঙ্গিতে হে প্রভু!
বাউলের সেই দল
তোমারই প্রতিভূ ॥
হে দয়াল!
অশান্ত অবুঝ এসময়
এখনো কি দানিবে না তোমার প্রসন্ন বরাভয়—
বাউলের গান হয়ে—ফুলে ফলে হাসে?
অপেক্ষায় যায় দিন—
অপার অসীম আশ্বাসে ॥

কবিতায় রামকৃষ্ণ

শান্তি সিংহ

এক রাম, তাঁর হাজার নাম

যাঁকে বলছে 'কৃষ্ণ' জগতের জীব
তিনিই আদ্যাশক্তি-আল্লা-যীশু কিংবা শিব!
যত মত তত পথ—লক্ষ্য একই ধাম
'পানি'-'ওয়াটার'-'জল' একই, ভিন্ন নাম!
রাম-শিব চ্যালাদের দ্বন্দ্ব অকারণ
রামের হাজার নাম করহ স্মরণ!

সূত্রঃ "যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম, তাঁর হাজার নাম। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১৩।৩), □

মধু বৃন্দাবনে

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীবৃন্দাবনে বাসের দিন শেষ হয়ে আসছে। এবার ফিরে যেতে হবে বেলুড় মঠে। তাই যেটুকু দেখার বাকি আছে তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য একা একাই এসে হাজির হয়েছি ভোজনস্থলীতে। বাবাজীর শরীর ভাল যাচ্ছে না, তাই তাঁর সঙ্গলাভ হলো না। তবে তাঁর কথামত এখানে বসে সেই লীলাই স্মরণ করছিলাম।

আজকের এই ভগ্নপ্রায় মন্দিরের কাছেই ছিল কয়েকঘর ব্রাহ্মণের বাস। ব্রজবালকদের সঙ্গে ব্রজেশ্বর রাখালরাজ খেলতে খেলতে ক্ষুধার্ত হয়ে তাঁদের কাছে একদিন অন্নভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বাহ্য অনুষ্ঠানের অহঙ্কারে মত্ত ব্রাহ্মণকুল রাখাল ছেলেদের সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেরা তখন এসে হাজির হয়েছিলেন তাঁদের গৃহিণীদের কাছে—এই জায়গাটায়। ব্রাহ্মণপত্নীরাও ব্রজের এই অতুলনীয় প্রেমবিগ্রহ—কালো ছেলেটার কথা আগেই শুনেছিলেন। কিন্তু জাতের অভিমান ও স্বামীদের ভয়ে নিজেরা তাঁর কাছে যেতে সাহস করেননি। অন্তর্যামী গোপাল ভক্তিমতী এই ব্রাহ্মণপত্নীদের সেবা গ্রহণ করবার জন্য ভিক্ষাচ্ছলে তাঁদের কাছে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণীরাও প্রাণের আরাধ্য ধনকে কাছে পেয়ে পরমাদরে তাঁদের রান্নাকরা খাবার খাইয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। এই স্থানটির নাম তাই 'ভোজনস্থলী'। কোন এক সময় এখানে মন্দির ছিল বোঝা যায়। এখন সেই মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মতো টিলার ওপরেই আর একটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে, তার ভিতরে কানাই-বলাইয়ের রাখালবেশের মূর্তি। দরজা এখন বন্ধ। [illegible] দিয়ে যতটুকু দেখা যায় তা দেখেই যখন নেমে আসছি তখন শুনতে পেলাম—

"কে এসে মোহন বেশে মজালে হে মন,
মন-ভুলানো রূপটি তোমার যোগিজন উচাটন ॥
তুমি বুঝি বৃন্দাবনে খেলেছিলে রাখাল সনে
এই যমুনাপুলিনে গো—চন্দ্রমণির প্রাণধন ॥"

বড় চেনা যেন ঐ গলা! এই নির্জন জায়গায় এমন চেনা গলা শুনে অবাক হওয়ারই কথা। তাকিয়ে দেখি—অমিতানন্দ! আমার কাছে বিদায় নিয়ে বৃন্দাবন ছেড়ে সে গিয়েছিল বর্ষাণায়—শ্রীমতীর আবির্ভাব-ভূমিতে [দ্রঃ উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৯৭]। আমার দিকে তাকিয়ে গান গাইতে গাইতে সে চলে এসেছে আমার সামনে। দুজনেই হতভম্ব। গায়ের উজ্জ্বল রং পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে। পরণে হাঁটু পর্যন্ত একটা চট। খালি গা, শুধু পৈতেটুকু গলায়, আর চোখের চশমার আড়ালে স্বপ্নমাখা দুটি ঢলঢলে চোখ। বহুদিন পরে দেখা। শুনেছিলাম এদিকেই কোথায় সে এখন থাকে। এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি। আমাকে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে থেকে অমিতানন্দ ছুটে উঠে এল টিলার ওপর। একেবারে পায়ের কাছে বসে পড়ে, দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে প্রণাম করে তাকিয়ে রইল মুখের দিকে। গান থেমে গেছে। আমিও শ্রীমানকে এই বেশে দেখে বাক্রুদ্ধপ্রায়। স্তব্ধতা ভেঙে সেই কথা বলল: "আশ্রমে মাঝে মাঝে যাই। সেখানেই শুনলাম, আপনি এখন এখানে আছেন। আজকে যে এইভাবে পেয়ে যাব ভাবিনি। তবে পেয়ে যখন গেলাম তখন আপনার কাছে আমার কিছু জানার আছে, বলবেন কি?"

বুঝলাম কি জানতে চায়; কারণ পূর্বাশ্রমে তার বহু কৌতূহল আমাকে মেটাতে হয়েছে। বললাম: "ঐ যে গানটি হচ্ছিল সেই বিষয়ে তো? বৃন্দাবনে প্রভু এসেছিলেন, মা এসেছিলেন, স্বামীজী এসেছিলেন। তাঁদের ভাবে তুমি এখন মাতোয়ারা বুঝতে পারছি। তাঁদের কথা কিছু জানতে চাইছ তো?"

মাথাটি কাৎ করে শ্রীমান জানাল: "ঠিক তাই, শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজীর বৃন্দাবনলীলার কথা কিছু শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।" ভালই হলো, আমার বৃন্দাবন-বাসের অন্তিম পর্যায় তাঁদের লীলাস্মরণেই

শেষ হবে। অভেদানন্দজীর স্তোত্রে পড়েছিলাম—

"ব্রজবিপিনবিহারে শ্যামলং বাসুদেবং
সুমধুররাসকেলিং গোপিকাপ্রাণনাথম্ ।
মদনমোহনবেশং কংসকালকবীশং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥"

—শ্রীবৃন্দাবনের সেই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যিনি গোপিজন-মোহন, রাসরসেশ্বর মদনমোহন কংসনিসূদন, আবার পরমজ্ঞানী—সেই তিনিই এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ, তিনিই আমার হৃদয়বল্লভ।

ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন বিজ্ঞানানন্দজীকে : "বৃন্দাবনে যিনি গোপীদের নিয়ে লীলা করেছিলেন, আমিই তিনি।" তিনি স্বমুখে স্বামীজীকে বলেছেন : "যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ।" বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই যুগপ্রয়োজনে নেমে এসেছিলেন ধরণীতে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। রাধারানী স্বয়ং মা-ঠাকরুণ, আর স্বামীজী প্রমুখ পার্ষদেরা বৃন্দাবনেশ্বরের সেই পূর্বলীলারই অন্তরঙ্গ সব লীলাসহচর। সুতরাং শ্রীমানের আগ্রহে শুরু হলো আমার আর এক লীলাস্মরণ।

মনে পড়ছিল সেই ঘটনা—শ্রীরামকৃষ্ণ একবার গৌরী-মাকে তাঁর পূজার সিংহাসনে শালগ্রাম শিলার আসনে দেখিয়েছিলেন দুখানি চরণ। অবাক গৌরী-মা শিলার পরিবর্তে এই চরণ-দর্শনে রোমাঞ্চিত হয়ে যখন দিব্যভাবে আকৃষ্ট হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন তখন তাঁর চরণ দুখানি ঐ পূর্বদৃষ্ট চরণের অবিকল আকৃতি দেখে স্থিরনিশ্চয় হন তাঁর ইষ্টদেব নারায়ণই শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই নারায়ণের নরবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধ হয় তাঁর পূর্ব-লীলাস্থান দর্শনে।

আমি শ্রীমানকে বললাম : "১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে মথুরবাবুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কাশী হয়ে শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। এখানে নিধুবনের কাছে মথুরবাবুর পরিচিত সে-সময়ের এক ধনী জমিদারের বাড়ি—'ফৌজদার কুঞ্জে' এসে ওঠেন। সেই বাড়ি কি তুমি দেখেছ? আজও সেটি তেমনি আছে। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকে সামনে কিছুটা খোলা চত্বর, তার ডানদিকে ফৌজদারদের গৃহদেবতা রাধাশ্যামের মন্দির। আর সামনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে প্রথম ঘরখানিই ছিল ঠাকুরের থাকার ঘর। পঙ্খের কাজ করা পুরনো বেশ বড় ঘর। বাড়ির বর্তমান মালিকেরা সেই পুরনো ফৌজদার-দেরই বংশধর। তাঁরাই ঘর খুলে দেখান। তবে ঘরের এখন কোন যত্ন নেই। একটা পুরনো জিনিসের গুদাম হয়ে আছে ঘরটি। দেখে কষ্ট হয়। যাই হোক, এখানেই থাকাকালে ঠাকুর বৃন্দা-বনের নানা জায়গায় বিগ্রহাদি ও লীলাস্থান দর্শন করতেন। পূর্ব অবতারের নানা লীলার স্মরণে তাঁর মন সবসময় খুব উঁচু ভাবের সুরে বাঁধা থাকত। এইকালে বাঁকেবিহারীজীর দর্শনে তিনি বিহ্বল হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করবার জন্য ছুটে যেতেন। কালিয়দমন ঘাট দর্শন মাত্রই তাঁর উদ্দীপন হয়েছিল। হৃদয় তাঁকে ছোট শিশুটির মতো এই ঘাটে স্নান করিয়ে দিতেন। তখনো যমুনা কাছা-কাছিই ছিল। সন্ধ্যার দিকে তিনি বালির চড়ায় বেড়াতেন। যমুনাতীরের কদম গাছ, ছোট ছোট কুটির, গোচারণ শেষে রাখাল বালকের গরুর পাল নিয়ে ফিরে আসা দেখেই দারুণ উদ্দীপনায় ব্যাকুল হয়ে তিনি কাঁদতেন—'কৃষ্ণ কোথায়, কই কৃষ্ণ' বলে। নিধুবনে প্রায় রোজই যেতেন। সেখানেই সখীভাবের সাধিকা গঙ্গামাঈর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। গঙ্গামাঈ তাঁকে দেখে তাঁর বিচিত্র মহাভাবের অবস্থা বুঝে তাঁকে শ্রীমতীর অবতারজ্ঞানে 'দুলালী' বলে ডাকতেন। গঙ্গামাঈ নিধুবনের কাছে একটি কুঠিয়াতে থাকতেন। ঠাকুর তাঁর কাছে প্রায়ই যেতেন। একই ভাবের ভাবী দুজনের মধ্যে নানা সাধন-প্রসঙ্গ হতো। ঠাকুরের খুব ভাল লেগেছিল এই সাধিকার সঙ্গ। গঙ্গামাঈও ঠাকুরকে নানা রকম সুখাদ্য তৈরি করিয়ে খাওয়াতেন। তাঁরও খুব ভাব হতো। একদিন ভাবে গঙ্গামাঈ হৃদয়ের ঘাড়ে চড়ে বসেন। এই স্থানের মাহাত্ম্যে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আর ফিরবেন না এই রকম প্রায় ঠিক হয়ে গিয়ে-ছিল। পেটরোগা ঠাকুরকে গঙ্গামাঈ সেদ্ধ চালের ভাত, ঝোল করে খাওয়াবেন, এইরকম ঠিক হচ্ছিল। শেষে হৃদয় অনেক কৌশল করে গর্ভধারিণী চন্দ্রমণি-দেবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে-যাত্রায় ঠাকুরের মনকে নামিয়ে আনেন। নইলে দ্বাপরলীলার দারুণ আকর্ষণে ঠাকুর ছেড়ে যেতে চাননি শ্রীবৃন্দাবন-ক্ষেত্র।

"আরও মজার কথা, এখানে থাকাকালে ঠাকুর বৈষ্ণবের ভেক নিয়ে তিনদিন বাবাজী হয়েছিলেন। এখানে থাকাকালেই তিনি পালকি করে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড দর্শন করেন। ভাবের আবেশে গোবর্ধন পাহাড় দর্শনমাত্র ছুটে তার ওপর উঠতে গিয়েছিলেন। সেই অবস্থায় সমাধিস্থ হয়ে যান। প্রায়ই নানা অতীত লীলাস্মৃতির উদ্দীপনে চোখ দিয়ে অঝোরে জল পরে জামা-কাপড় ভিজে যেত তাঁর। মনে হতো: 'সবই তো সেইরকম আছে, কিন্তু কৃষ্ণ তুমি কোথায়! তোমাকে তো দেখতে আমি পাচ্ছি না।' রাধারমণ, শেঠের মন্দির, রঙ্গজীর মন্দিরের সোনার তালগাছ—এইসবও দর্শন করেছিলেন। গোবিন্দজীর মন্দিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু কেন জানি না সেখানে তাঁর বিশেষ কোন ভাবোচ্ছ্বাস হয়নি। দ্বিতীয়বার দর্শনেও যাননি। তবে মথুরায় থাকাকালে ধ্রুবঘাটে বসুদেবের কোলে কৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হওয়ার দৃশ্য ভাবনেত্রে দর্শন করে সমাধিস্থ হন। বৃন্দাবন থেকে ফেরার সময় তিনি একমুঠি বৃন্দাবনের রজঃ সঙ্গে করে এনে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে ও কিছুটা সাধনকুটিরের মেঝেতে পুঁতে দিয়ে বলেছিলেন: 'আজ থেকে এই স্থান বৃন্দাবনের মতো পবিত্র হলো।'

"এবার বলি 'জানকী-রাধিকারূপধারিণীং মোক্ষদায়িনীং'-এর বিষয়ে, যিনি নিজেই একবার এক ভক্তকে বলেছিলেন: 'আমাকে রাধা বলেও ভাবতে পার, তবে তখন "মা" বলে ডেকো না।' আরেক জায়গায় শুনেছি তিনি বলেছিলেন: 'আমিই রাধা।' সেই রাধা-সারদার বৃন্দাবনলীলার কথা এবার বলব।"

বৃন্দাবন ছাড়ার আগে শ্রীশ্রীমায়ের বৃন্দাবনবাসের সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলি দর্শন করার ইচ্ছা আমার ছিল। শ্রীমানকে বললাম: "চল মা এসে বৃন্দাবনে যেখানে উঠেছিলেন এবার সেখানে যাই।" যাওয়ার কথা বলতেই শ্রীমান প্রস্তুত। দুজনে এগিয়ে চললাম যমুনার তীর ধরে উত্তরদিকে। যাওয়ার পথে আমরা দর্শন করে নিলাম চামুণ্ডামন্দির। বেশ জঙ্গলের মতো জায়গায় ছোট মন্দিরে সিন্দুরলিপ্ত, হাত দুয়েক উঁচু ত্রিকোণাকৃতি পাথরের বেদির মতো একটি শিলামূর্তি। বৃন্দাবনে প্রচলিত প্রবাদ, এটিও দেবীর পীঠ—'ব্রজে কাত্যায়নীপরা'। আগে আমরা শহরের মধ্যে কাত্যায়নী মন্দির দেখেছি। [দ্রঃ উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৯৮] কেউ কেউ এটিকেই আসল কাত্যায়নী পীঠ বলেন। যাই হোক, আমরা মাকে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চললাম। যমুনার ধার ধরে বংশীবট এলাকায় পৌঁছে পানিঘাটের কাছে যমুনার চড়া ছেড়ে গলি দিয়ে পশ্চিমদিকে একটু উঠতেই ডানদিকে একটি প্রাচীন বাড়ি দেখা গেল—এটিই 'কালাবাবুর কুঞ্জ'। কলকাতার শ্যামবাজারের গুরুপ্রসাদ বসু বৃন্দাবনে এই কুঞ্জ ও শ্যামরায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের আত্মীয়তার সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত বলরাম বসুর ব্যবস্থাপনায় শ্রীশ্রীমা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূলদেহ অপ্রকট হওয়ার পরে তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক ও সেবিকাদের সঙ্গে এখানে আসেন। বাড়ির একতলায় শ্যামরায়ের বিগ্রহ। দোতলায় বাঁদিকের ঘরখানিতে মা থাকতেন। আর ছাদের আর এক প্রান্তে ডানদিকের ঘরে মেয়ে ভক্তেরা এবং নিচের ঘরে যোগেন মহারাজ, লাটু মহারাজ ও কালী মহারাজ প্রভৃতি পুরুষ ভক্তেরা থাকতেন।

এই ঘরে সকলের অগোচরে মায়ের কত ভাবসমাধি হতো। এখানেই তিনি ঠাকুরের দর্শন পান বারবার। বিরহক্লিষ্টা মাকে ঠাকুর এখানেই দেখা দিয়ে বলেন: "হ্যাঁগা, তোমরা এত কাঁদছ কেন? এইতো আমি রয়েছি, গেছি আর কোথায়, এই যেমন এঘর আর ওঘর।" এখানেই তিনি মায়ের জীবনে গুরুভাবের বিকাশ ঘটিয়ে তাঁকে দিয়ে স্বামী যোগানন্দকে প্রথম দীক্ষা দান করান।

এই বৃন্দাবনে মা প্রথমদিকে একেবারে শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শন-জনিত বিরহে ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণবিরহকাতর রাধারানীর মতো উন্মনা হয়ে বিরহ-বিবশ-বেশবাসে যমুনাপুলিনে একা একাই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তেন। দুচোখে অঝোরে বিরহাশ্রু, চোখে উদাসদৃষ্টি, তবে মাঝে মাঝে চারিদিক মন দিয়ে লক্ষ্য করতে করতে যেতেন, যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই ভাব লক্ষ্য করে সঙ্গীরা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে মা প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলতেন: "ও কিছু না—চল, চল।" হয়তো এসব স্থান দর্শনে তাঁর পূর্বলীলার স্মৃতির উদ্দীপন হতো। নিজের ভাব গোপনের

অসাধারণ শক্তিসম্পন্না মা কাউকেই তাঁর মনের ভাব ধরতে দিতেন না।

এই বৃন্দাবনের বিহারীজীর মন্দিরেই মায়ের বিখ্যাত প্রার্থনা—"ঠাকুর তোমার রূপটি বাঁকা, মনটি সোজা, আমার মনের বাঁক ঠিক করে দাও।" আবার রাধারমণ-মন্দিরে গিয়ে আকুল হয়ে পরপর তিনদিন প্রার্থনা করেছিলেন, দোষদৃষ্টি দূর করে দেওয়ার জন্য। ভগবানের কাছে কি চাইতে হয় তা জগতের মানুষকে দেখাবার জন্য তাঁর এই প্রার্থনা। এই রাধারমণ-মন্দিরে তাঁর আর এক দর্শনে তিনি হাওড়ার নবগোপাল ঘোষের ভক্তিমতী পত্নীকে পাখাহাতে ভগবানকে সখীর মতো হাওয়া করতে দেখেন। এখানেই ভাবসমাধিস্থা মায়ের শরীরে ও মনে ঠাকুরের আবেশ হয় এবং যোগেন মহারাজ তাঁকে সেই অবস্থায় কতকগুলি প্রশ্ন করে ঠাকুর যেমন উত্তর দিতেন ঠিক তেমনি উত্তর পান। এমনকি তাঁর খাওয়ার ভঙ্গি পর্যন্ত সেই সময় ঠাকুরের মতো হয়ে যায়। কৃষ্ণময়ী শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণ-ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতেন। এখানে মায়ের জীবনেও তা-ই হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরহে কাতর মায়ের জীবন রামকৃষ্ণ-চিন্তায় ও রামকৃষ্ণ-ভাবে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি রামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবন-লীলায় দ্বাপরযুগের সব ভাব যেন এযুগে ঠাকুর ও মায়ের জীবনে ফুটে উঠেছিল।

শ্রীমানকে নিয়ে মায়ের ঘরে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। এখনো এই ঘরে মায়ের ব্যবহার করা একখানি তক্তপোশ আছে। তাতে মায়ের একটি ছবি সাজিয়ে রাখা আছে।

ফেরার পথে আরও মনে পড়ছিল সেযুগের কৃষ্ণসখা শ্রীদাম সুদামের মতো এযুগের লীলা অনুচরেরাও বৃন্দাবনে এসেছেন লীলার আস্বাদন করতে। পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজীও এখানে এসেছেন। দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রীরাধার মহিমা তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন। আর সেই প্রেমিকপ্রবরের যমুনাপুলিনের অপার্থিব লীলার কথা স্মরণেই পরবর্তী কালে তাঁর সেই বিখ্যাত সঙ্গীত রচনা করেছেন—

"মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া, যানেকো দে,
যানেকো দে রে সেঁইয়া, যানেকো দে।
মেরা বনোয়ারী, বাঁদি তুহারি,
ছোড়ে চতুরাই সেঁইয়া, যানেকো দে।
যমুনাকি নীরে, ভরোঁ গাগরিয়া
জোরে কহত সেঁইয়া, যানেকো দে॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ব্রজের রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দও এখানে এসেছেন। এসেছেন রাধাভাবের মূর্ত বিগ্রহ স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণ। স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী অদ্ভুতানন্দের কথা আগেই বলেছি। এঁদের সাধনে শ্রীবৃন্দাবন-তীর্থ তীর্থীকৃত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাওয়া অধ্যাত্মসম্পদ এখানে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁরা 'বাজিয়ে' নিয়েছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের মতো বৈদান্তিক সন্ন্যাসীও এখানে নিধুবনে শ্রীমতী রাধারানীর বেণীর দর্শন পেয়েছেন। স্বামী বিরজানন্দ এবং পরবর্তী কালে আরও কত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধু এই লীলাতীর্থে এসে ঐশ প্রেমের পরাকাষ্ঠার কষ্টি-পাথরে নিজেদের সাধনজীবন যাচাই করে আনন্দে মগ্ন হয়েছেন।

শ্রীমানকে এইসব কথাই বলছিলাম। তাতে আমার নিজেরই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও তাঁদের সন্তানদের শ্রীবৃন্দাবনলীলা-স্মরণ হচ্ছিল। শ্রীমান বিদায় নিয়ে ফিরে গেল তার ডেরায়। আমি আশ্রমে ফিরে এসে মন্দিরে গিয়ে দেখি বৃন্দাবনবিহারীর পট সাজানো হয়েছে। ঠাকুরকেও সাজানো হয়েছে পীতবসনে। সেদিন পূর্ণিমা। তাই শ্যামনামের আয়োজন হচ্ছে।

পাশাপাশি দুটি বিগ্রহ। দুই বিগ্রহকে দেখে আমার একেরই দুইরূপ বলে মনে হলো।

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্।
বিভ্রদ্বাসঃ কণক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্॥
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্
গোপবৃন্দৈর্বৃন্দারণ্যম্।
স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ॥"

"বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তিপ্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥"

একই তত্ত্বের দুই যুগে দুই রূপে আগমন লীলার কারণে।

"জীবদুঃখেতে কাতর ধরি নরকলেবর।
বারংবার অবতার জগত-ঈশ্বর॥"
"মানবের প্রেম আশে মানুষ সাজিয়া আসে,
পরশি চরণে পূত করে ধরণীরে॥"

শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরামকৃষ্ণের এই অহৈতুকী লীলার কথা স্মরণ করে আমার বারবার মনে হচ্ছিল একটি কথা—

"রূপং রূপাবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন
যৎকল্পিতম্,
স্তুত্যানির্বচনীয়তাঽখিলোগুরো
দূরীকৃত যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যম্ জগদীশ! তদ্ বিকলতাদোষত্রয়ং
মৎকৃতম্॥"

অব্যক্তকে ব্যক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্ষমাপ্রার্থী আমিও। অনন্তকে বোঝার ক্ষমতা আমার নেই, ক্ষুদ্র দেহবুদ্ধি মানব আমি। কত অজ্ঞতা, কত অহঙ্কারভরা এ-জীবন। তোমাদের ধরা-ছোঁয়ার যোগ্যতা আমার কোথায়! তবুও অবোধ শিশুর অলীক কল্পনার মতো তোমাদের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করেছি।

এখন তোমাদের কৃপার ওপর নির্ভর করে তোমাদের প্রসঙ্গ অলোচনা করেছি। যতক্ষণ স্মরণ হয়েছে ততক্ষণ সেটি আনন্দ দিয়েছে প্রচুর। আজ সেই আনন্দেরই জাবর কাটতে কাটতে ঘরে ফিরলাম মনে মনে একটি সুর ভাঁজতে ভাঁজতে—

"তোমারে না ছাড়িব বন্ধু, তোমা না ছাড়িব।
বিরলে পাইয়াছি হিয়া মাঝারে রাখিব॥
রাতি কৈলা দিন বন্ধু দিন কৈলা রাতি।
ভুবন ভরিয়া রৈল তোমার খেয়াতি॥
ঘর কৈলা বন বন্ধু বন কৈলা ঘর।
পর কৈলা আপন বন্ধু আপনি হৈলা পর।
তাই সকলি তেজিয়া আজি লইনু শরণ--
দাস অচ্যুতানন্দ চাহে ও রাঙ্গা চরণ॥ ☐

[সমাপ্ত]

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আলোয়ারে শ্রীবিবেকানন্দ

শ্রীশ্রমণক

[পূর্বানুবৃত্তি]

'শ্রীশ্রমণক' স্পষ্টতঃ প্রবন্ধ-রচয়িতার ছদ্মনাম। মনে হয়, প্রবন্ধটি তৎকালীন উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দের লেখা। শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের নেপথ্যে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এবছর স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ-পূর্তি হচ্ছে। সেকথা স্মরণে রেখে এই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে।

যুগ্ম সম্পাদক

উপস্থিত সকলের সমক্ষে পণ্ডিত মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া মৌলভী মহাশয় কহিলেন: "পণ্ডিতজী, কাল বাবাজী মহারাজকে এ অধমের কুঁড়েতে ভিক্ষে করাব। তাতে আপনার কোন আপত্তি থাকবে না, এমন বন্দোবস্ত করা হবে। বৈঠকখানার সমস্ত আসবাব সরিয়ে ঝুল ঝেড়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে ঘরটি ধোয়াব। ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে পিতলের হাঁড়ি-বাসন ইত্যাদি আনিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে বাজার করিয়ে রসুই করাব। স্বামীজী গিয়ে সেই ঘরে বসে সেবা গ্রহণ করবেন, আর এই সমস্ত ক্ষণ এই অধম যবন দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে আর চরিতার্থ হবে।" করজোড়ে মৌলভী মহাশয় এরূপ আন্তরিক নম্রতার সহিত পূর্বোক্ত কথাগুলি কহিলেন যে, উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়ও হাসিয়া সাদরে তাঁহার করমর্দন করিলেন এবং কহিলেন: "স্বামীজী দরবেশ, ওঁর আবার জাত কি। ত্যাগী মহাত্মার তো ওসব কোনই বিচার থাকে না। আপনার এত করবার কোনও আবশ্যক ছিল না। আমার তো কোনই আপত্তি হতে পারে না, তবে আপনি স্বেচ্ছামত যে-বন্দোবস্ত করেন সে আপনার অভিরুচি।" সকলেই একবাক্যে মৌলভী মহাশয়ের ভক্তি ও অকৃত্রিম দীনতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতজী আবার কহিলেন: "ওরকম বন্দোবস্তে আমারই আপনার বাড়িতে খাওয়ার কোনই আপত্তি থাকে না, তা স্বামীজী তো মুক্তপুরুষ; ওঁর তো আপত্তি হতেই পারে না।" সকলে আরও হাসিলেন এবং মৌলভী মহাশয়কে লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

এদেশের হিন্দুগণের সহিত মুসলমানগণের এতই সদ্ভাব যে, তাঁহারা কোন মুসলমান বন্ধুর বাটীতে যাইয়া ফরাস পাতা উত্তম বিছানায় একত্রে উপবেশন করেন এবং তাঁহাদের উপস্থিতকালে মুসলমান বন্ধু সেই বিছানায় বসিয়া ভোজনাদি করিলেও কোন আপত্তি করেন না। সুতরাং পূর্বোক্ত বন্দোবস্তে পণ্ডিতজীর কোনও আপত্তি জন্মিল না। মৌলভী মহাশয় প্রাণ ভরিয়া সাধুসেবা করিলেন। মৌলভী মহাশয় এই মহাপুরুষের সেবা করিয়াছেন দেখিয়া অপরাপর ঈশ্বরানুরাগী মহাশয় মুসলমানগণও তদ্রূপ সাধুসেবা করিবার জন্য অতি আগ্রহ সহকারে স্বামীজীকে আপনাদের বাটী লইয়া যাইতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশে ধনী বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত নির্ধনের বা নিম্নপদস্থ লোকের বাটীতে গমন করিতে কোন প্রকার অভিমান প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এখানে মানের ভয়েই হউক বা যেকোন কারণেই হউক উচ্চপদস্থ বা ধনী ব্যক্তিকে নির্ধন বা নিম্নপদস্থ লোকের বাটী গমন করিতে প্রায় দেখা যায় না। পণ্ডিত শম্ভুনাথজী অপেক্ষা উচ্চপদস্থ লোকেরা সেইজন্য স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনাদের আলয়ে লইয়া যাইতেন ও সেবা করিতেন। ক্রমে আলোয়ার-রাজের দেওয়ানজী স্বামীজীর কথা লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিয়া একদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। আলোয়ারের মহারাজ মঙ্গল সিংজী, এখনকার মহারাজ জয় সিংজীর স্বর্গীয় পিতা, রাজকার্য অপেক্ষা তত্রস্থ ইংরাজ সেনানিবাসে থাকিয়া ইংরাজদিগের সহিত মিশামিশি করিতে এবং তাহাদের সহিত মৃগয়া করিতে অধিক ভালবাসিতেন।

ইংরাজদিগের সহিত অধিক মিশামিশির দরুন জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা-বিহীন ব্যক্তির যেসকল দোষ উপস্থিত হয়, মঙ্গল সিংজীরও সেই সমস্ত দোষ আসিয়া জুটিয়াছিল। উচ্চপদস্থ নিষ্ঠাবান হিন্দু রাজকর্ম-চারিগণ সেজন্য বড়ই মনঃকষ্টে ছিলেন। দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া অনুধাবন করিলেন যে, মহারাজের গতিগতি সংশোধনের এই এক মহেন্দ্রযোগ উপস্থিত। তিনি মহারাজকে পত্রদ্বারা জ্ঞাত করিলেন যে, রাজধানীতে একজন অগাধ ইংরাজী জানা অদ্বিতীয় সাধু আসিয়াছেন। মহারাজ এই সময়ে দুই-তিন ক্রোশ দূরে একটি নিভৃত প্রাসাদে অবস্থান করিতে-ছিলেন। পত্র পাইয়া তিনি পরদিন রাজধানীতে আসিয়াই দেওয়ানজীর বাটী গমন করিলেন এবং স্বামীজীকে সংবাদ পাঠাইলেন। স্বামীজী তথায় উপস্থিত হইবামাত্র রাজা বেশ শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশন করাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন: "স্বামীজী মহারাজ, শুনেছি আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তা এরকম করে ঘুরে না বেড়িয়ে অনায়াসে তিন-চারশ টাকা রোজগার তো করতে পারেন। তবে কেন এমন করে বেড়ান?"

এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী কহিলেন: "মহা-রাজ, আপনি আমায় বলতে পারেন রাজকার্য ছেড়ে ইংরেজ সহবাস আর মৃগয়া আপনার কেন এত ভাল লাগে?"

মঙ্গল সিংহ একটু ভাবিয়া কহিলেন: "কেন তা বলতে পারিনে। তবে হ্যাঁ, ভাল লাগে।" রাজা যতক্ষণ একটু চিন্তা করিতেছিলেন কি উত্তর করিবেন, তাঁহার কর্মচারিগণ ভয় পাইতেছিলেন যে, স্বামীজীর পক্ষে মহারাজকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়তো অধিক সাহসের কার্য হইয়াছে। কিন্তু রাজা যখন সরল উত্তর করিলেন তখন সকলে বুঝিলেন যে, তাঁহাদের প্রভু প্রশ্নে বিরক্ত হন নাই।

স্বামীজী বলিলেন: "সেই রকম ফকিরী করে ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগে।"

মঙ্গল সিংহ আবার জিজ্ঞাসিলেন: "বাবাজী মহারাজ, এই যে সকলে মূর্তি পূজো করে, আমার তাতে বিশ্বাস নেই। তা আমার গতি কি হবে?"

স্বামীজী একটু বিরক্তি প্রকাশ পূর্বক বলিলেন: "একি ঠাট্টা হচ্ছে?"

মঙ্গল সিংহ কহিলেন: "না স্বামীজী, ঠাট্টা নয়। আমি ও কাঠ মাটি পাষাণ ধাতু ওসবের উপাসনা করতে পারিনি। তা কি আমার সদ্‌গতি হবে না?"

স্বামীজী উত্তর করিলেন: "যাঁর যেমন বিশ্বাস তাঁর তাই ভাল।"

স্বামীজীর এবম্প্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া উপস্থিত অন্যান্য সকল লোকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা সকলেই মূর্তিপূজায় দৃঢ়বিশ্বাসী এবং কৃষ্ণভক্ত। স্বামীজীর কৃষ্ণভক্তি তাঁহারা অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং একদিন তাঁহাকে বিহারী-জীর সমক্ষে প্রেমে বিভোর হইয়া গড়াগড়ি দিয়া অশ্রুজলে ভাসিতেও দেখিয়াছেন। তবে কেন তিনি এরূপ কথা বলিলেন, সকলের মনে এই সমস্যা জাগিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে মহারাজের একখানি ফটো সম্মুখের দেওয়ালে দেখিতে পাইয়া স্বামীজী একজনকে তাহা আনিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। ছবিখানি হস্তে লইয়া স্বামীজী কহিলেন: "আচ্ছা এ কার ছবি?"

রামচন্দ্রজী কহিলেন: "মহারাজের।"

স্বামীজী পুনরায় রামচন্দ্রজীকে কহিলেন: "আচ্ছা, আপনাকে এতে থুতু দিতে অনুরোধ কর্চ্ছি, আপনারা কেউ এতে থুতু দিন। কারণ, দেখুন এটা তো কেবল একটুকরা কাগজ বই আর কিছুই নয়। এতে আপনাদের একটু থুতু দিতে কি আপত্তি?"

দেওয়ান রামচন্দ্র বড়ই বিপদে পড়িলেন। সকলেই স্বামীজীর কথায় ভয়ে জড়সড়; একবার মহারাজের দিকে আবার স্বামীজীর দিকে তাকাই-তেছেন। স্বামীজীর কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি রামচন্দ্রকে সেই ফটোতে থুৎকার দিতে জিদ করিতেছেন।

[ক্রমশঃ]

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ম এবং ২য় সংখ্যা, মাঘ, ফাল্গুন, ১৩১৩, পৃঃ ৭-১০, ৪২

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচক : স্বামী বাসুদেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মশক্তি

প্রশ্ন : সচ্চিদানন্দের স্বরূপ-শক্তি কি ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : অস্তি, ভাতি, প্রীতি —অতি বিশুদ্ধ সত্তা। এঁরা হচ্ছেন ব্রহ্মের বিদ্যা-শক্তি—এঁরাই ভক্তদের ব্রহ্মে নির্মল অচিন্ত্য লীলা-রসাস্বাদ করিয়ে থাকেন—সব চিন্ময় তবুও দ্বৈত। কিন্তু এই স্বরূপ-শক্তি যখন ব্রহ্মে তাদাত্ম্যলাভ করেন তখন একেবারে নির্বাণ, নির্বিকল্প, তূষ্ণীম্ভূত।

প্রশ্ন : আর সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বহিরঙ্গা-শক্তি কি ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : প্রধানা, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা। গুণবৈষম্য হেতু তিনি তমঃপ্রধান হয়ে আবরণ সৃষ্টি করে রজঃশক্তিদ্বারা বিন্দুরূপ আকাশ বিক্ষেপ করেন। সেই রজঃশক্তি প্রবল হয়ে বৈন্দব-গতির বৈচিত্র্যে তন্মাত্র, অপঞ্চীকৃত এবং পঞ্চীকৃত ভূত সৃষ্টি হলো। তারপর তমঃপ্রধান সত্ত্বশক্তি সহায়ে অসম্ভব সম্ভব হলো—নিষ্কলংক সচ্চিদানন্দে জগৎ প্রপঞ্চ প্রকাশিত হলো। সর্বজগৎ-বীজের সংকোচশক্তি হেতু সেই তমঃশক্তি অবিদ্যামায়া বলে পরিচিতা। অজ্ঞান স্বভাবা বলে ইনি কৃষ্ণরূপা মহাকালী। পরমপুরুষের বিশ্ববিমোহিনী এই মায়াই অভিব্যক্ত দেশকাল নিমিত্তের শক্তিভাব ('পোটেনসিয়াল স্টেট')—ভোগ্যশক্তি। এই আবরণ শক্তিই হচ্ছেন জড় প্রপঞ্চের মূল উপাদান কারণ।

আবার তমঃপ্রধান রজঃশক্তিই ঐ অখণ্ডাবরণে মৃদুসত্ত্ব সহায়ে জীব-প্রতিবিম্বের বিক্ষেপ করেন। ইনিই ব্রহ্মের নৈমিত্তিক পরিণাম ক্রিয়াশক্তি বা তটস্থা ব্রহ্মাণ্ডের ভোক্তৃশক্তি বা সমষ্টি জৈবী মায়া—মহালক্ষ্মীঃ ; পঞ্চদশীকার এঁকেই 'মলিন সত্তা' বলেছেন। সৃষ্টি বিষয়ে এঁর প্রকৃষ্ট নৈমিত্তিক-কৃতিত্ব আছে বলেই ইনি প্রকৃতি—'জীবভূতাং মহাবাহো যয়া ইদং ধার্যতে জগৎ'। সেই নিরোধরূপা তামসী চিৎপ্রতিবিম্বরূপ গর্ভধারণ করে রজঃরূপে বিবর্তিত হন। প্রথম দুটি জিনিসের অভিব্যক্তি ঘটে—ব্রহ্মে ভাসমান জ্ঞানাধ্যাস অর্থাৎ জীব কর্তৃ-ভোক্তৃ-ভাব এবং অর্থাধ্যাস, অর্থাৎ ভোগকরণ, ভোগায়তন, ভোগ্য ও ভোগস্থান। আবার এই 'এক'-জৈবীশক্তি স্বিরূপে অভিব্যক্তা হন—একদিকে সর্বভূতান্তর্যামী সাক্ষিচিদাভাস, আর একদিকে তিনিই সর্ব স্পন্দ-পরিবর্তনের পূর্বাপর সম্বন্ধাত্মিকা মহাকাল। এই মহাকালের আবার স্বিরূপ—এক, শেষ-নারায়ণ, 'দ্য-এন্ড', 'ইটারনিটি' আর ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান যাঁর নৃত্যভঙ্গি সেই ব্যবহারিক কাল—যাঁকে আশ্রয় করে প্রকৃতি-পুরুষ অর্থাৎ ভোগ্য ও ভোক্তৃ শক্তির সৃষ্টি বিকাশ। প্রতি ব্যষ্টি-জীবে উর্জিতসত্ত্ব মহোদধি চিত্ত-করণে যিনি ক্ষীরোদশায়ী অন্তর্যামী অধিযজ্ঞ পুরুষরূপে বর্তমান। আর ঐ মহাকাল সহায় অন্তর্যামীর আরও স্থূলরূপ অহমাত্মক শংকর। ইনিও ত্রিধা বিভক্ত—সাত্ত্বিক বা বৈকৃত মনঃআত্মা, রাজস-বুদ্ধি—ইন্দ্রিয়, প্রাণাত্মা এবং তামস—ভোগায়তনাত্মা : এঁর আরও স্থূলরূপ প্রকাশিত হয় ভোগ্যাত্মবোধে।

আবার ঐ মহাশক্তি সত্ত্বপ্রধানা হয়ে এই বিক্ষিপ্ত জীব ও জগতের প্রকাশক এবং জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতির শৃংখলে বদ্ধ করে সর্বজীব ও ভূত প্রপঞ্চকে শাসন এবং পালন করছেন। ইনিই প্রভু হিরণ্য-গর্ভের রক্ষাণিশক্তি। রজঃশক্তি থেকে জাত তন্মাত্রিক দেহ বলে হিরণ্যগর্ভের দেহ লোহিত—এঁর শক্তি মহদ্যোনি বা গায়ত্রী—জগৎ-পালিকা। সত্ত্বগুণা বলে শ্বেতবর্ণা। তমঃশক্তি জাত বলে গর্ভোদশায়ী নারায়ণ নীলবর্ণ, তাঁর সৃষ্টি প্রসবিনী মহালক্ষ্মী রক্তবর্ণা। উজ্জ্বল স্বরূপ-শক্তি প্রতিবিম্বজাত দেহ বলে সংকর্ষণের বর্ণ স্ফটিক কিন্তু তাঁর শক্তি আবরণ-প্রধানা বলে তাঁর অঙ্গমায়া কৃষ্ণবর্ণা।

ত্রিধা বিভক্ত স্বরূপ-শক্তির সাধারণ নাম—যোগমায়া, দুর্গা, কালী, কাত্যায়নী, বিষ্ণুমায়া ইত্যাদি। মহাকালের যিনি সহধর্মিণী তিনি মহাকালী বা নিয়তি। আর যিনি নির্বীজ সমাধির জন্য নিরাবরণা হয়ে ঘোরারূপে মহাকালকেও নিরোধ করেন, তিনিই মহামায়া আদ্যাকালী। আবার তিনিই এই নির্বিকল্প প্রান্তভূমে ভক্তদের অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা লীলাস্বাদ করান বলে ভবতারিণী দক্ষিণা বলে পরিচিতা। বেদান্তের অস্তি ভাতি প্রীতি এবং বৈষ্ণবদের সন্ধিনী সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী একই, অবশ্য ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাবিবর্তকে আশ্রয় করে। (৩।৮।৮।৪৪)।

[ক্রমশঃ]

নিবন্ধ

শ্রীমা সারদাদেবীর প্রথম গৃহীত আলোকচিত্র

পীযূষকান্তি রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

কথামৃতকার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় ফটো নেওয়া সম্পর্কে দিনলিপিতে স্থান, কাল, তারিখ, অকুস্থলে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।[১৪] দুঃখের বিষয়, শ্রীমায়ের ফটো প্রসঙ্গে সে-আমলের কোন গ্রন্থকার তেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কোথাও লিপিবদ্ধ করেননি। অতএব এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর অভাবে নানা সময়ে বিভিন্ন লেখকের বর্ণনা ও মন্তব্যের ওপর নির্ভর করে তথ্যসংগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শ্রীমায়ের এই বিখ্যাত ফটো তোলার জন্য কত খরচ হয়েছিল সে-সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ৫ জানুয়ারি ১৮৯৯-এর এক পত্র থেকে—"...The two negatives are to be 40 Rupees and expenses 3·4—total 43·4..."[১৫] দুখানা ফটোর জন্য সে-আমলের তেতাল্লিশ টাকা চার আনা নিশ্চয়ই মোটা অঙ্ক বলতে হবে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর মন্ত্রশিষ্য ও সেবক স্বামী অরূপানন্দ (রাসবিহারী মহারাজ) শ্রীমাকে তাঁর এই বিখ্যাত ফটো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন (২৫।৯।১৯১০): "মা, এ ফটো কি ঠিক?" উত্তরে মা বলেন: "হাঁ, এটি ঠিক। তবে পূর্বে আরও মোটা ছিলুম। যখন ছবি ওঠায় তখন যোগীনের (যোগানন্দ স্বামীর) খুব অসুখ। তার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে গিছ্‌লে। মন ভাল নয়, যোগীনের অসুখ বাড়ছে তো, কাঁদছি, আবার যোগীন ভাল থাকছে তো ভাল থাকছি। সারা মেম (Sara Bull) এসে এইটি ওঠালে। আমি কিছুতেই দেব না। সে অনেক করে বললে, 'মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজো করব।' তাই শেষে এই ছবি ওঠায়।"[১৬] [স্বামী যোগানন্দ ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত একান্ত সেবক এবং শ্রীশ্রীমা তাঁকে সর্বপ্রথম (১৮৮৬-১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ) মন্ত্রদীক্ষা দান করেন।[১৭]]

নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের দোতলা বাড়ির কোন্ নির্দিষ্ট স্থানে শ্রীমাকে বসানো হয়েছিল এবং এই বিখ্যাত আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়, সে-সম্পর্কে সমর্থনযোগ্য কোন তথ্য কোথাও নথিভুক্ত হয়নি। প্রায় একশো বছর আগে আধুনিক কলকব্জা সমন্বিত ফোল্ডিং বা বক্স ক্যামেরার জন্ম হয়নি এবং সে-আমলে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই ডাগুরের পদ্ধতি অবলম্বন করে শৌখিন ও পেশাদার ফটোগ্রাফারদের একমাত্র ফিল্ড ক্যামেরা (Field Camera) ও কাচের নেগেটিভের (Silver Nitrate মাখানো) ওপর নির্ভর করতে হতো। সাবেকী ফিল্ড ক্যামেরার সঙ্গে সহসা স্ফুরিত হওয়া আলো (Flash Light) থাকত না, ফলে ফটোগ্রাফারদের স্টুডিওর বাইরে (Out-door) উজ্জ্বল ও নিখুঁত ছবি নেওয়ার জন্য কেবল প্রাকৃতিক আলো ও রৌদ্রের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হতো। এ-অবস্থায় বিনা দ্বিধায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শ্রীমায়ের ফটো নিশ্চয়ই নিবেদিতার দোতলা বাড়ির কোন মুক্ত বারান্দায়, উঠানে বা ছাদে তোলা হয়েছিল—যেখানে জোরালো রৌদ্র বা স্বাভাবিক আলোর প্রাচুর্য ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের পূজিত ফটোর অনুকরণে বহু

১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, উদ্বোধন সং, ১ম খণ্ড, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৩ এবং ২য় খণ্ড, ১৯৮৭, পৃঃ ১২০৩

১৫ Letters of Sister Nivedita—Ed. Sankari Prasad Basu, Vol I, 1982, p. 37

১৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সং, ১৩৮০, পৃঃ ৫০

১৭ ঐ, পৃঃ ৩৩৯

মর্মর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীমায়ের এই বিখ্যাত ফটোর আদলে ভারতবর্ষে (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রে) এ যাবৎ মাত্র দুটি মর্মর মূর্তি ও আমেরিকায় একটি ব্রোঞ্জের আবক্ষ-প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি মর্মর মূর্তি জয়রামবাটীতে ৮ এপ্রিল ১৯৫৪-তে প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ। শ্বেতপাথরের মূর্তিটি শ্রীমায়ের মন্ত্র-শিষ্য স্বামী ঋতানন্দের (গগন মহারাজের) অক্লান্ত পরিশ্রম ও ব্যবস্থাপনায় বারাণসী থেকে জয়রামবাটী আনানো হয়। এই জীবন্ত মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছে শ্রীসারদাদেবীর জন্মস্থানের ওপর। তবে বহু সন্ধান করেও বারাণসী থেকে আনা এই শ্বেত-পাথরের মূর্তিটির নির্মাতার নাম জানা যায়নি।[১৮] দ্বিতীয় মূর্তিটি আছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বোম্বাই কেন্দ্রের (খার এলাকায়) পুরনো মন্দিরের দোতলায়। শ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান ও বোম্বাই আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের ব্যবস্থাপনায় ১ জুলাই ১৯৬৫-তে এই প্রাণবন্ত মূর্তিটি বসান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক (পরবর্তী কালে সঙ্ঘগুরু) স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। আনু-ষ্ঠানিকভাবে মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় মূর্তিটির পূজাদি হয় না, শুধু ফুল, মালা ও ধূপ দেওয়া হয়। এই সুন্দর বিগ্রহ মূর্তিটি গড়েছেন কল-কাতার জি. পাল অ্যান্ড সন্স। এই মূর্তিটি অবশ্য জয়রামবাটীর মূর্তির তুলনায় অনেক ছোট। শ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ৪ জুন ১৯৫৪-তে নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টারের প্রার্থনা মন্দিরে শ্রীমায়ের একটি আবক্ষ ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপিত হয়। এই আবক্ষমূর্তিটি তৈরি করেছেন আমেরিকার বিখ্যাত ভাস্কর মালবিনা হফম্যান।

দক্ষিণেশ্বর নহবতের বদ্ধ একতলার ঘরে শ্রীমা সারদাদেবীর উপস্থিতিতে একদা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিজের ফটো পূজা করেছিলেন।[১৯] আর ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমা কোয়ালপাড়ার 'রামকৃষ্ণ যোগাশ্রম'-এ তাঁর নিজের ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো পূজাপূর্বক প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমায়ের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান ও সেবক স্বামী ঈশানানন্দ ('বরদা মহারাজ' নামে অধিক পরিচিত। ইনি শ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের দিন পর্যন্ত দীর্ঘ এগারো বছর শ্রীমায়ের সেবা করবার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।) লিখেছেন: "শ্রীমা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তাঁহার নিজের ফটো দুইটি পর পর মাথায় ঠেকাইয়া ঠাকুরঘরে ছোট সিংহাসনে নিজ হাতে পাশাপাশি বসাইয়া ফুল, চন্দন দিয়া পূজা করিলেন।"[২০] সেই থেকে ঐ মন্দিরের পূজা-বেদির ওপর সিংহাসনে রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের ফটোতে নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্যপূজাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এখানে শ্রীমায়ের এই বিখ্যাত ফটোরই একটি প্রতিলিপি স্থাপিত।

শ্রীমা সারদাদেবীর ফটোর আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে ঔৎসুক্য জাগে, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে একদা গোলাপ-মাকে বলেছিলেন: "ও সারদা, সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।"[২১] শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, সেবক ও সুলেখক স্বামী সারদেশানন্দ লিখেছেন: "মায়ের হস্ততল রক্তাভ ছিল, অনেকেই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। পদতলও ছিল লাল—ঠিক স্থলপদ্মের আভা, সুস্থ অবস্থায় তাঁহার কৃপায় কাহারো কাহারো ভাগ্যে দর্শন মিলিয়াছে। মস্তকের সুদীর্ঘ ঘন কেশ-রাশি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ, যেন সূক্ষ্ম রেশমসূত্র, অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ কুটিল বক্র। সুগঠিত মুখমণ্ডলে

১৮ শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চারজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর (এঁদের মধ্যে দুজন সম্প্রতি দেহত্যাগ করেছেন।) সঙ্গে যোগাযোগ করেও এই মর্মর মূর্তির ভাস্করের নাম জানা সম্ভব হয়নি; জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরের সম্প্রতি প্রয়াত অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমরূপানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও এবিষয়ে আলোকপাত করতে সক্ষম হননি।

১৯ শ্রীশ্রীমায়ের কথা ২য় ভাগ, পৃঃ ৫১

২০ মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সং, ১৩৭৫, পৃঃ ১৭

২১ শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ১৫২

দীর্ঘনাসা সত্যই তিল ফুলের মতো, ডগার দিকে। প্রশান্ত স্থির কৃপাদৃষ্টি, যাহা সকলেরই অন্তরে সর্বদা করুণা বর্ষণ করিত। প্রশস্ত উজ্জ্বল কপাল, প্রসন্ন বদনমণ্ডল—দেখিলেই চিত্ত শান্ত হইত। শ্যাম-গৌর রং প্রথমে ছিল উজ্জ্বল, শেষ বয়সে ম্লান হইয়াছিল। দীর্ঘাবয়ব, হস্ত-পদযুগলও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, একটু বাঁদিকে কাৎ হইয়া চলিতেন ধীরে ধীরে।"[২২]

শ্রীসারদাদেবী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ ঠাকুরের ফটোকে শুধু তাঁর প্রতীক নয়, তাঁর প্রাণময় স্বরূপের জীবন্ত উপস্থিতি বলেই উপলব্ধি করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একদা তাঁর জনৈক সন্ন্যাসীকে ঠাকুরের ফটো দেখিয়ে বলেছিলেন: "ভেব না এটি ছবিমাত্র। এর ভেতরে তিনি রয়েছেন। সব দেখছেন, সব শুনছেন।"[২৩] শ্রীশ্রীমাকে সেবক স্বামী অরূপানন্দ প্রশ্ন করেছিলেন (২৯।১০।১৯১০): "ছবিতে কি ঠাকুর আছেন?" তদুত্তরে শ্রীমা বলেছিলেন: "আছেন না? ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁর ছায়া।"[২৪] বলা বাহুল্য, শ্রীমায়ের ফটো সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তাঁর পূজিত আলোকচিত্রে তিনি স্বয়ং জীবন্তভাবে বিদ্যমান, এ-বিশ্বাস রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সকল সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীর এবং বিশ্বজুড়ে সমস্ত ভক্ত নরনারীর। ☐ [সমাপ্ত]

২২ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৪৭-৪৮

২৩ উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৮৪, পৃঃ ৪৫

২৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৭-৫৮

প্রাসঙ্গিকী

আচার্য শঙ্করের অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র

গত চৈত্র ১৩৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে ('প্রসঙ্গ অর্ধনারীশ্বর') উল্লেখ করা হয়েছে যে, আচার্য শঙ্কর 'অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র' নামে একটি সুন্দর স্তব রচনা করেছিলেন। চৈত্র ১৩৯৮ সংখ্যায় 'দিব্য বাণী'তে ঐ স্তোত্রের কিছু অংশ মুদ্রিতও হয়েছে। সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে: "আচার্য শঙ্কর বিরচিত অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্রটি ভাষা ও ভাবের চমৎকারিত্বে অতুলনীয়। আচার্যের এই স্তোত্রটি সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নহেন।"

আমার অনুরোধ, যদি 'উদ্বোধন'-এ আচার্যের ঐ স্তোত্রটির সমগ্র রূপে বঙ্গানুবাদ-সহ প্রকাশিত হয়, তাহলে আমরা স্তোত্রটির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। বৈশাখ মাস 'শিবাবতার' আচার্য শঙ্করের জন্ম-মাস। উল্লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, অর্ধনারীশ্বর বেদান্তের অদ্বয়তত্ত্বের প্রতীক—যে-অদ্বয়তত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্রবক্তা হলেন আচার্য শঙ্কর। সুতরাং বৈশাখ সংখ্যায় যদি স্তোত্রটি সম্পূর্ণতঃ বঙ্গানুবাদ-সহ প্রকাশিত হয়, তাহলে 'শিবাবতার' আচার্য শঙ্করের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে, তেমনি অদ্বৈতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যকেও তাঁর জন্মমাসে স্মরণ করা হবে। আমি জানি না, এত তাড়াতাড়ি আপনাদের পক্ষে বৈশাখ সংখ্যায় এই পত্রটি প্রকাশ করা সম্ভব হবে কিনা। তবে আমি আশা করি, আপনারা আমার এই অনুরোধটির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে অনুগ্রহপূর্বক বিশেষ গুরুত্ব দেবেন।*

শোভনা ভৌমিক

নবপল্লী, কলকাতা-৭০০০৬৩

* চিঠিটি আমাদের দপ্তরে যখন এসে পৌঁছায় তখন বৈশাখ সংখ্যা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে। ফলে বৈশাখ সংখ্যায় চিঠিটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তবে শঙ্করাচার্যের জন্মতিথি এবার ২৪ বৈশাখ পড়লেও ইংরেজী তারিখটি হলো ৭ মে। উদ্বোধন-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাটি 'মে' সংখ্যাও। আচার্যের 'অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র' পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।—যুগ্ম সম্পাদক

অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র

আচার্য শঙ্কর

চাম্পেয়গৌরার্ধশরীরকায়ৈ কর্পূরগৌরার্ধশরীরকায় ।
ধম্মিল্লকায়ৈ চ জটাধরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ১
কস্তূরিকাকুঙ্কুমচর্চিতায়ৈ, চিতারজঃপুঞ্জবিচর্চিতায় ।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ২
ঝণৎ-ক্বণৎ-কাঞ্চন-নূপুরায়ৈ, পাদাব্জরাজৎ-ফণিনূপুরায় ।
হেমাঙ্গদায়ৈ ভুজগাঙ্গদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩
বিশাল-নীলোৎপললোচনায়ৈ, বিকাশি পঙ্কেরুহলোচনায় ।
সমেক্ষণায়ৈ বিষমেক্ষণায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪
মন্দারমালাকলিতালকায়ৈ, কপালমালাঙ্কিতকন্ধরায় ।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫
অম্ভোধর-শ্যামল-কুন্তলায়ৈ, তড়িৎপ্রভাতাম্রজটাধরায় ।
নিরীশ্বরায়ৈ নিখিলেশ্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬
প্রপঞ্চসৃষ্ট্যুন্মুখলাস্যকায়ৈ, সমস্ত সংহারকতাণ্ডবায় ।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৭
প্রদীপ্তরত্নোজ্জ্বল-কুণ্ডলায়ৈ, স্ফুরন্মহাপন্নগ-কুণ্ডলায় ।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮
এতৎ পঠেদষ্টকমিষ্টদং যো, ভক্ত্যা স মান্যো ভুবি দীর্ঘজীবী ।
প্রাপ্নোতি সৌভাগ্যমনন্তকালং, ভূয়াৎ সদা তস্য সমস্তসিদ্ধিঃ ॥ ৯
ইতি অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ—যিনি অর্ধশরীরে চাঁপাফুলের মতো গৌরবর্ণ ও অর্ধশরীরে কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, যাঁর মাথায় (একপাশে) বদ্ধ বেণী ও (অন্য পাশে) জটারাশি তাঁর উদ্দেশে 'নমঃ শিবয়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়', অর্থাৎ এই দুই শব্দে নমস্কার। যিনি (অর্ধশরীরে) মৃগনাভি, কুঙ্কুম এবং (অর্ধশরীরে) চিতাভস্মে লিপ্ত, যাঁর একাংশ কামদেবকে উজ্জীবিত করেছেন, আরেক অংশ কামদেবকে ভস্ম করেছেন, তাঁর উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' এবং 'নমঃ শিবায়'। যাঁর (এক) পায়ে ঝনঝন শব্দকারী সোনার নূপুর এবং (অন্য পায়ে) সাপের নূপুর বিরাজ করছে ; যাঁর (এক) হাতে সোনার বাজু এবং (অন্য হাতে) সাপের বাজু, তাঁর উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' এবং 'নমঃ শিবায়'। যাঁর এক চোখ বিশাল নীলপদ্মের মতো ও সমসংস্থান, অন্য চোখ প্রফুল্ল (সাদা) পদ্মের ন্যায় ও অসমসংস্থান, তাঁর উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়'। যাঁর (বাম ভাগের) চুলগুলি স্বর্গীয় ফুলে সাজান, (ডান ভাগে) কাঁধে নরমুণ্ডমালা বিলম্বিত, যাঁর (বাম) অঙ্গে দিব্য বস্ত্র এবং (ডান অঙ্গ) দিগম্বর, তাঁর উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়'। যাঁর (বাম ভাগে) চুলের গুচ্ছ কাল মেঘের মতো এবং (ডান ভাগে) বিদ্যুৎবর্ণ, তাম্রাভ জটাজুট, সেই নিরীশ্বরা ও নিখিলেশ্বরের উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়'। যাঁর রমণীসুলভ মৃদু নৃত্য জগৎসৃষ্টির অনুকূলে এবং যাঁর তাণ্ডব সমস্ত বিশ্ব-সংহারের কারণ, সেই জগজ্জননী ও জগজ্জনকের উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়'। যাঁর (এক) কানের দুল জ্বলন্ত রত্নোজ্জ্বল এবং (অন্য কানের দুল) অতি সুন্দর মহাসর্পে তৈরি, যাঁর একাংশ শিবের সঙ্গে যুক্ত এবং অন্য অংশ শিবার সঙ্গে যুক্ত তাঁর উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' এবং 'নমঃ শিবায়'। এই অভীষ্টপ্রদ অষ্টক স্তোত্র যেজন ভক্তি সহকারে পাঠ করে, সে পৃথিবীতে মান্য হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করে ও অনন্তকাল সৌভাগ্যশালী হয় এবং সর্বদা তাঁর সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়। □

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কথামৃতের যুগ

নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' নিশ্চয়ই এক অনবদ্য ভক্তিগ্রন্থ, কিন্তু এরই মধ্যে বিধৃত হয়েছে একটা যুগ, চিহ্নিত হয়ে আছে এই দেশের, বিশেষতঃ কলকাতার যুগ-পরিবর্তনের ইতিহাস। কোন মহৎ গ্রন্থই দেশ-কাল-নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই শ্রীম-কথিত কথামৃতে অজ্ঞাতে ধরা দিয়েছে সমকাল। অন্ততঃ কলকাতাকে কেন্দ্র করে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের চিত্র যেমনভাবে এই ভক্তিগ্রন্থে রূপ নিয়েছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। বিশেষ করে, নিখুঁত পর্যবেক্ষণশক্তির ফলে শ্রীম মাঝে মাঝেই প্রাচীন কলকাতার চিত্র তুলে ধরেছেন অনবদ্য ভঙ্গিতে। সেই কলকাতার সমাজ-সংস্কৃতি ও রূপরঙ মনোযোগী পাঠক এই গ্রন্থ থেকেই খুঁজে নিতে পারেন।

এটা লক্ষণীয় যে, 'কথামৃত' গ্রন্থে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক বিবর্তন এবং তার ফলে মূল্যবোধের পরিবর্তনটা স্পষ্ট করেই শ্রীম তুলে ধরেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের মধ্যে এঁরাই ছিলেন প্রধান। গ্রামের ভূমিনির্ভর জীবিকা ছেড়ে এই শ্রেণীর মানুষ ক্রমে কলকাতা ও তার আশেপাশে ভিড় করেছেন, ইংরেজী-শিক্ষা তাঁদের সামনে জীবিকার নানা পথ খুলে দিয়েছে—ক্রমে নগর-সভ্যতা বদলে দিয়েছে তাঁদের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারাকে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কেউ কেউ হয়েছেন শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। কেউ কেউ যোগ রেখেছেন গ্রামের সঙ্গেও। সরকারি ও বেসরকারী কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে—ডাক্তারি, ওকালতি, ব্যবসায়, শিক্ষকতা প্রভৃতি বৃত্তিতে ছড়িয়ে পড়েছেন তাঁর ভক্ত-শিষ্যরা। এই পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কাঠামোর সুস্পষ্ট চিত্র ধরা পড়েছে এই মহাগ্রন্থেও।

ঠাকুর একদিন বলেছেন: "সেদিন কলকাতায় গেলাম। গাড়িতে যেতে যেতে দেখলাম জীব সব নিম্নদৃষ্টি—সব্বাইয়ের পেটের চিন্তা। সব পেটের জন্য দৌড়ুচ্ছে।" (কথামৃত, ৩।৫৭) আসলে, ঐ সময়টাতে কলকাতার দিকে মানুষ ছুটেছিল নানা জীবিকার সন্ধানে, বিশেষ করে শিল্পায়নের ফলে শিক্ষিত মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ তৈরি হচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই নব্যসৃষ্ট মধ্যবিত্ত ও নগরকেন্দ্রিক মানুষের অভ্যুদয় লক্ষ্য করেছেন। তিনি সন্ধান করেছেন তাদের পরিবর্তিত মানসিকতারও। তাই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, ঐহিক সুখ এবং আধ্যাত্মিক শান্তি—দুটোই এই সদ্য ছিন্নমূল কলকাতাবাসী ও নগরনির্ভর মানুষের কাছে একান্ত দরকার।

ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গেও তিনি টেনে এনেছেন এই বিষয় সংক্রান্ত উপমা। তিনি বলতে চেয়েছেন, ঈশ্বরে ভক্তি এলে সংসার বিদেশ বোধ হয়। উপমাটা এসেছে কিন্তু পরিবর্তনশীল কলকাতা দিয়ে—"যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কিন্তু কলকাতা কর্মভূমি; কলকাতায় বাসা করে থাকতে হয়, কর্ম করবার জন্য।" (ঐ, ১।৮০)

ক্রমে তাঁর ভক্তরাও বিভিন্ন ধরনের জীবিকার মধ্য থেকে এসেছেন। তাঁর পার্ষদ শ্রীম ছিলেন শিক্ষক, এমনকি নট গিরিশচন্দ্রের জীবিকা নিয়েও ঠাকুরের আপত্তি ছিল না। গিরিশচন্দ্র অভিনয় ছাড়তে চাইলে ঠাকুর বলেছেন: "না না, ও থাক—ওতে লোকশিক্ষা হয়।" (ঐ, ৩।১১০) কিন্তু নব্য-উদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওকালতি, দালালী প্রভৃতি জীবিকা তাঁর পছন্দ হয়নি। শ্রীশ পণ্ডিত শান্ত প্রকৃতির হয়েও ওকালতি করেন শুনে তিনি বলেছেন: "এরকম লোকের উকিল হওয়া!" (ঐ, ১।১৩৫) তিনি মনে করতেন ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, দালাল প্রভৃতির সহজে ধর্মলাভ হয় না।[১]

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ৩য় সং, ১৩৭১, পৃঃ ১৭৪

অথচ তাঁর ভক্তদের মধ্যে এঁদের ভিড়ও ক্রমে বেড়ে চলেছিল।

সেই সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রে অভ্যুদয় ঘটেছিল বৈশ্য-সম্প্রদায়েরও। ক্রমে এই শ্রেণীর মানুষদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক বদল এসেছে। দ্রুত শিল্পায়ন এবং দেশী-বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ফলে উচ্চ-বিত্ত শ্রেণী সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে গেছেন। অনেক ডাক্তার এবং কোম্পানির অফিসের বড়বাবুরাও ক্রমে স্বচ্ছল হয়েছেন। পৈতৃক বাড়িতে বা স্বোপার্জিত অর্থে নির্মিত নব্যরুচির বাড়িতে তাঁরা বাস করতেন। কেউ কেউ আবার তৎকালীন বাবু-সংস্কৃতির ধারা অনুসারে বাগানবাড়িও তৈরি করেছেন। 'কথামৃত' গ্রন্থে শম্ভু মল্লিকের বাগান (ঐ, ৪।২৬৭), যদু মল্লিকের বাগানের (ঐ, ১।১৬২) উল্লেখ আছে। রামচন্দ্র দত্তের বাগানের বিস্তৃত বর্ণনা অবশ্য নেই, তবে তুলসীকানন এবং সরোবরের কথা আছে (ঐ, ৫।১০৭)। সুরেশচন্দ্র মিত্রের বাগান-বাড়ির বর্ণনা (ঐ, ১।১১৮): "উদ্যানগৃহমধ্যে প্রধান প্রকোষ্ঠে সংকীর্তন হইতেছে।...এই প্রকোষ্ঠের পূর্বে ও পশ্চিমে একটি করিয়া কামরা এবং উত্তর ও দক্ষিণে বারান্দা আছে। উদ্যানগৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে একটা বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। গৃহ ও পুষ্করিণীর ঘাটের মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিমে উদ্যানপথ। পথের দুই ধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ।" বলা বাহুল্য, ঠাকুরের পদার্পণ উপলক্ষে এই লিপিচিত্র।

বেণী পালের বাগানবাড়ির চিত্রটা এবার দেখা যাক: "দালানে উঠিবার সোপান পর্যন্ত একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।... সারি সারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ।" (ঐ, ১।৫৫) এই বাগানে ঠাকুর যখন দ্বিতীয়বার গেছেন, তখন তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে: "সম্মুখে পূর্ব-পরিচিত সেই সরোবরের স্বচ্ছ সলিল-মধ্যে শরতের নভোমণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানস্থিত রাঙা রাঙা পথগুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্ব-পরিচিত ফল ও পুষ্পের বৃক্ষশ্রেণী।" (ঐ, ১।১৪৭)

দুই বাগানের রূপগত মিলটা বিস্ময়কর হলেও কালের বিচারে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। বাগান-রচনার পরিকল্পনায় যে-সাদৃশ্য, তার উৎস কিন্তু সেই সময়ের বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তের জীবনধারার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। জীবিকা, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতির বিচারে রামচন্দ্র দত্ত, বেণী পাল ও সুরেশ-চন্দ্র মিত্র একই শ্রেণীর—তাঁদের রুচিগত মিলও তাই স্বাভাবিক ছিল। শহরের বাইরে এইসব সুদৃশ্য বাগানবাড়িগুলো ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে এক নতুন শ্রেণীর অভ্যুদয়েরই প্রতীক।

কিন্তু এরই পাশাপাশি বাণিজ্য-প্রসারের সুযোগ নিয়েছিলেন মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ও। নতুন কলকাতা গড়ে তোলার পিছনে এঁদেরও ছিল এক প্রত্যক্ষ ভূমিকা। বিত্তবান বাঙালীদের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কেও শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতে দেখা গেছে। তবে অর্থাগমের সঙ্গে তাল রেখে তাঁরা আদৌ বাবু-কালচারের দিকে ঝোঁকেননি, স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই বহাল রেখেছেন। ঠাকুর এক মাড়োয়ারি ভক্তের বাড়িতে গেছেন। তার বর্ণনা: "মাড়োয়ারিদের বাড়িতে পৌঁছিয়া দেখেন, নিচে কেবল কাপড়ের গাঁট উঠানে পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে গরুর গাড়িতে মাল বোঝাই হইতেছে।" (ঐ, ২।১৯২)

সেই যুগসন্ধির স্বাভাবিক সৃষ্টি অন্য এক-শ্রেণীর মানুষকেও যেন দেখতে পাই। তাঁদের কেউ কেউ সামন্ততন্ত্রের উজ্জ্বল প্রতীক, কেউ আবার ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত করেছেন ভূ-সম্পত্তিও, সামন্তশ্রেণীতে তাঁরা নবাগত। তবে লক্ষ্মীর সাধনায় সাফল্য সত্ত্বেও সারস্বত চর্চাও তাঁরা রেখেছেন অব্যাহত। ইংরেজী-শিক্ষার তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফসল, ফলে গ্রামীণ সহজ-সরল মানুষদের প্রতি কিঞ্চিৎ উপেক্ষার ভাব তাঁদের মধ্যে ফুটে উঠেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দেখতে গেছেন মথুরবাবুর সঙ্গে। মথুরবাবু দেবেন্দ্রনাথের সহপাঠী। কিন্তু এই অযাচিত আবির্ভাবকে দেবেন্দ্রনাথ তেমন সহজভাবে নিতে পারেননি—বিশেষ করে, সঙ্গে ঢিলে-ঢালা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। পরে ঠাকুর বলেছেন: "প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলাম। তা হবে না গা? অত ঐশ্বর্য, বিদ্যা, মান, সম্ভ্রম?" (ঐ, ১।১৭৭) ঠাকুরের সঙ্গে কথা

বলে খুশি হয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু পরে ঠাকুরের গায়ে উড়ানি থাকবে না ভেবে ভদ্রভাবেই যেতে বারণ করেছেন। (ঐ, ১।১৭৭) নিঃসন্দেহে এটা সেই উদীয়মান আভিজাত্যের প্রতীক। অনেকটা এমন চিত্র পাই পাথুরিয়াঘাটার রাজ-পরিবারেও। ঠাকুর তিরস্কারের সুরে কথা বলেছেন রাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সঙ্গে। তিনি 'একটু কাজ আছে' বলে সরে গেছেন। তাঁর ভাই প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের বাড়িতে গিয়ে ঠাকুর প্রথমেই বলেছেন: "তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না, কেননা সেটা মিথ্যা কথা বলা হবে।" তিনিও নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যতীন্দ্রনাথকে ডাকা হলো। সম্ভবতঃ তিনি আগের কথা ভোলেননি। বলে পাঠালেন, "গলায় ব্যথা হয়েছে।" (ঐ, ২।৩)

এগুলো সেই শিক্ষিত সামন্তশ্রেণীর আত্ম-গরিমারই প্রতীক। কিন্তু মানসিকতায় অনেক জ্ঞানি-গুণী মানুষও ছিলেন এই গোত্রের। প্রখ্যাত বাগ্মী ও ধর্মনেতা কেশব সেনের বাড়িতে গেছেন ঠাকুর। কেশবচন্দ্র কি লিখছিলেন,"অনেকক্ষণ পরে" কলম ছেড়ে ঠাকুরের সঙ্গে কথা শুরু করেছেন—অভ্যাগতকে দেখে কিন্তু তখনই সম্ভাষণ করেননি। ঠাকুর বলেছেন: "এখানে মাঝে মাঝে আসত। আমি একদিন ভাবাবস্থাতে বললাম—সাধুর সম্মুখে পা তুলতে নাই।··· তারা এলে আমি নমস্কার করতুম, ক্রমে ওরা ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখলে।" (ঐ, ৫।১৩১)

দেখতে পাই শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতীক বঙ্কিম-চন্দ্রকেও। ঠাকুর ইংরেজী জানেন না, সেটা বুঝেও তাঁর সম্পর্কে বন্ধুদের সঙ্গে ইংরেজীতে একটু কথা বলে নিয়েছেন। ঠাকুর প্রশ্ন করেছেন পরকাল নিয়ে। লঘুভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "সে আবার কি?" ঠাকুর জানতে চেয়েছেন, জীবনের উদ্দেশ্য কি? তেমনি হাল্কাভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "আহার, নিদ্রা, মৈথুন।" (ঐ, ৫।২১০) স্পষ্টই বোঝা যায় যে, গ্রামীণ সারল্যের প্রতীক ঠাকুরকে মর্যাদা দিতে চাইছিলেন না তিনি। সেই যুগের আরেক প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র কৃষ্ণদাস পাল বিখ্যাত বাগ্মী ও জননেতা। "মানষের কর্তব্য কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন: "জগতের উপকার করা।" (ঐ, ২।১৬৯-১৭০) এই একটা কথাতেই ইংরেজী শিক্ষিত ও আত্মগর্বী মানুষটার রজোগুণের পরিচয় পাই।

মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রীকেও স্পষ্ট যেন দেখা যায়। মহাপণ্ডিত মানুষ তিনি, ব্রাহ্মনেতা হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। ঠাকুরের পূত-চরিত্র ও ধর্মীয় উদারতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। অথচ নিজস্ব ব্রাহ্ম-গণ্ডির বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর অসুবিধা ছিল, তেমনি ছিল পাণ্ডিত্য-সচেতনতাও। রেনেসাঁ-সমৃদ্ধ মানসিকতার ফলে তিনি ঠাকুরের ভাবসমাধিকে স্নায়বিক অসুস্থতা বলে মনে করতেন। ঠাকুরও জানতেন সেই কথা। (ঐ, ৩।২৩৮)

'কথামৃত' গ্রন্থে একটা যুগসন্ধির স্পষ্ট চিত্র আছে। ইংরেজী শিক্ষা-সভ্যতার বিস্তারের ফলে তখন খ্রীস্টধর্মের প্রসার শুরু হয়েছে। এর উজ্জ্বল উদাহরণ মধুসূদন, অথচ সেই ধর্মান্তরে তাঁর লাভও হয়নি। 'কথামৃতে' দেখি তাঁর করুণ মূর্তি। তিনি জানিয়েছেন, 'পেটের জন্য' তাঁকে ধর্মত্যাগ করতে হয়েছে। নারায়ণ শাস্ত্রী তাঁকে তিরস্কার করায় তিনি ঠাকুরকে বলেছেন: "আপনি কিছু বলুন।" কিন্তু পেটের জন্য ধর্মত্যাগীর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর মুখ তখন যেন কে চেপে ধরেছে। (ঐ, ৪।১১৩)

অথচ খ্রীস্টধর্মের এই অগ্রগতি রুদ্ধ করার চেষ্টা চলেছে হিন্দুধর্মের ভিতর থেকে। ব্রাহ্মরা জোরালো আন্দোলন করেছেন। প্রচার চালিয়েছেন দয়ানন্দ সরস্বতী। তাঁর রূপটা ঠাকুরের ভাষায় জীবন্ত—"খুব পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষাকে বলত গৌরাণ্ড ভাষা।" (ঐ, ২।১৭২) একটা কিছু করার ইচ্ছা তখন তাঁর মধ্যে প্রবল। তেমনি আরেক চরিত্র শশধর তর্কচূড়ামণি। হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য তিনিও অবিশ্রান্ত চেষ্টা করে চলেছেন। ঠাকুরকে তিনি নিজেই বলেছেন: "আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।" (ঐ, ১।১৩৭)

এই ব্যাপক সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে আছে রাজনীতি-সচেতনতাও। ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছেন: "তুমি কার ভাবে বাঁকা গো?" বঙ্কিম ঝটিতি উত্তর দিয়েছেন: "আর মহাশয়,

জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে।" (ঐ, ৫।২১০)

কিন্তু এইসবের মধ্যেও একটা বিপরীত চিত্র আছে। কলকাতার সেই ক্রম-সমৃদ্ধির যুগে দারিদ্র্য ও জীবনসংগ্রামের চিত্রও দেখি 'কথামৃত' গ্রন্থে। পানওয়ালারা গর্তের মতো একটা ঘরের সামনে দোকান খুলেছে। মাথা নিচু করে সেই ঘরে ঢুকতে হয়। ঠাকুর বলেছেন: "কি কষ্ট। এইটুকুর ভিতর বদ্ধ হয়ে থাকে।" (ঐ, ২।১৯৯) তখনো কলকাতায় ভিখারী ছিল। কেউ কেউ গান গেয়ে ভিক্ষা চাইত। বলরাম বসুর বাড়িতে একজন গান গেয়েছে। নরেন্দ্রনাথ আবার গাইতে বললে ঠাকুর বলেছেন: "থাক, আর কাজ নাই, পয়সা কোথায়।" (ঐ, ২।১৬৬) প্রাচুর্য আর দারিদ্র্যের সহাবস্থানের চিত্র দেখি বড়বাজার থেকে তাঁর ফেরার পথে। "একজন ভিখারিণী, ছেলে-কোলে, গাড়ির সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। ঠাকুর দেখিয়া মাস্টারকে বলিলেন: 'কি গো, পয়সা আছে?' গোপাল পয়সা দিলেন।" (ঐ, ২।১৯৯)

দারিদ্র্যের জ্বালায় কেউ বেশ্যাবৃত্তি নিয়েছে। তারও এক বাস্তব গল্প আছে। সাবি একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে—তার অভাব মিটেছে তখন, কত লোক বশীভূত, আসছে-যাচ্ছে। (ঐ, ৩।১৪৬-১৪৭) একদিকে এই আর্থিক অসহায়তা, অন্যদিকে বাবু-কালচারের বিস্তৃতির ফলে বিত্তবানদের মধ্যে রক্ষিতা রাখার রীতি প্রচলিত হয়ে গেছে। ঠাকুর গল্প দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, এই ধরনের বাবুদের ওপর স্ত্রীর কর্তৃত্ব খাটে না, তাঁদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হলে ধরতে হয় রক্ষিতাকেই। (ঐ, ৩।১৪৯)

সাহেবরাও এইসব বাবুদের কথায় অফিস চালাতেন, অন্যদের নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতি চলত এঁদেরই কথায়। ইতোমধ্যে অবশ্য এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। একজনের কথা ঠাকুর বলেছেন: "সে আপিসে কর্ম করে, তার ২০ টাকা মাহিনা। আর ২০ টাকা কি মিথ্যা (bill) লিখিয়ে পায়।" (ঐ, ৩।৩১)

এই প্রসঙ্গে যদু মল্লিকের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, যদিও তিনি ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। বিত্তবান এই ব্যক্তি থাকতেন মোসাহেব-বেষ্টিত হয়ে। নানা ধরনের লোকের আনাগোনা হতো, নানা বিষয়ে তিনি দাম-দস্তুর করতেন কেনার ইচ্ছে না থাকলেও (ঐ, ২।১৬৫)। আরেক বিত্তবান জয়গোপাল সেন। কিন্তু "গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন—ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ফেরত দ্বারবান—আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।" (ঐ, ৩।৭৩)

এঁরাও সেই নব্য বাংলার নতুন প্রতিনিধি। কত রকম মানুষই ছিলেন এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ইংরেজী-শিক্ষার ফলে নিজেদের যুক্তিবাদী বলে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, অথচ রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে তাঁদের বিস্ময় জাগলেও বুদ্ধি দিয়ে তাঁরা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাননি। এঁদেরই একজন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। যুক্তিবাদী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হয়েও তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাকুরের কাছে বসে থাকতেন, চিকিৎসা করতেন পারিশ্রমিক না নিয়ে। অনবরত তর্ক করতেন অবিশ্বাসীর মতো, অথচ তার উত্তর তিনি বিজ্ঞানেও পেতেন না। ঠাকুর ব্যঙ্গ করে গল্প করেছেন, একজন দেখে এসেছেন একটা বাড়ি ভেঙে পড়তে। কিন্তু অন্যজন তা বিশ্বাস করলেন না, কারণ খবরের কাগজে ঘটনাটা নেই। (ঐ, ১।২১৯) ডাক্তার সরকার নিজের বিরুদ্ধেই যেন ঈশ্বরীয় ভাবে মগ্ন হয়েছেন। বিজ্ঞানের এই অবিশ্বাস অথচ যুক্তি-অতীত এক অনুভূতির স্পন্দন সেই যুগে অনেকেরই ছিল। 'কথামৃত' গ্রন্থে সেই স্বাভাবিক আত্ম-সংঘাত মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই ঠাকুরের কাছে আসতেন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির পর। ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালও ছিলেন ঠাকুরের ভক্ত, তিনি প্রায়ই ঠাকুরকে গান শোনাতেন, শুনতেন তাঁর 'কথামৃত'। তাঁর বিনম্র প্রণতি জানিয়েছেন স্বরচিত গ্রন্থেও।[২] অথচ অনেক সময় তিনিও তর্ক করেছেন, মাঝে মাঝে তাঁরও দ্বিধা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (৩।১৬০-১৬৩) সমাজের অপর নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও তাঁর কাছে বহুবার এসেছেন, শুনেছেন তাঁর কথা। তিনিও লিখেছেন, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও তিনি

২ কেশবচরিত, পৃঃ ১৩২-১৩৩

কেন ঐ নিরক্ষর ব্রাহ্মণের কাছে এসে শ্রদ্ধায় তাঁর কথা শোনেন—এ এক পরম বিস্ময় তাঁর নিজের কাছেই।[৩] কিন্তু দ্বিধা তাঁরও ছিল, যুক্তিবাদী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একজন হিসাবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। এই বিষয়টা 'কথামৃত' গ্রন্থেও আছে। ঠাকুরের কথা শুনে একদিন তিনি বিদায় নিয়েছেন—কথাগুলো প্রতাপের হৃদয়ে কি আঘাত করেছে? শ্রীম প্রশ্ন তুলেছেন: "কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে কি একথা প্রতিধ্বনিত হয় নাই?" (ঐ, ১।১৩২)

এবার তৎকালীন সামাজিক সংস্কারের কথা বলি।

ইংরেজী-শিক্ষা এনে দিয়েছে চিন্তার স্বাতন্ত্র্য, অথচ ঠাকুরের অনেক ভক্তদের মধ্যেও সংস্কার কাটেনি। দু-একটা ঘটনা দিয়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা করা যাক।

রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন কায়স্থ বংশের সন্তান। কিন্তু অধরলাল কৃতবিদ্য ও সফল (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) ব্যক্তি হলেও বংশে সুবর্ণ-বণিক। রাখাল মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতেন বলে কথা উঠেছে—"তাঁর বাড়িতে রাখাল অন্নগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রামবাবু কি বলিয়াছিলেন।··· সেই সব কথা হইতেছে।" (ঐ, ৫।৭৮)

লক্ষণীয় যে, রামবাবু ডাক্তার, বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত; অধরলালও কৃতবিদ্য। বলা চলে দুজনেই নব্য সমাজের প্রতিনিধি। আর্থিক বিচারেও তাঁরা ছিলেন সমপর্যায়ের। অথচ পুরনো ও গ্রামীণ শ্রেণী-বৈষম্য থেকে রামচন্দ্র দত্ত মুক্ত হতে পারেননি।

আরও আশ্চর্যের বিষয়, অধরলাল ছিলেন ঠাকুরের পরমভক্ত। ঠাকুর তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি কৃতার্থ হতেন। ঠাকুরকে তিনি নিয়ে গিয়ে চণ্ডীর গানও শুনিয়েছেন। অথচ তাঁর অনেক ভক্ত অধরলালের ব্যাপারে জাতপাতের প্রশ্ন তুলেছেন। অধরলাল প্রমুখ অনেক তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ নগর-সভ্যতার ফলে জীবনে সাফল্য পেয়েছেন, কিন্তু সেটা অনেক উচ্চবর্ণের মানুষ ভালভাবে নিতে পারেননি।

২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ আলোচনা হচ্ছিল সুবর্ণবণিকদের কথা। তাঁদের কেউ কেউ তত্ত্ব এলে কিছুটা কুটুম্ব বাড়িতে পাঠান। তিনি আবার একটা অংশ পাঠান অন্য কুটুম্বের বাড়ি—এমনি করে একটা ইলিশ ১৫।২০ ঘর ঘোরে। (ঐ, ৫।৭৮)

মণি মল্লিক বিত্তবান হলেও 'নিম্নবর্ণের' মানুষ হওয়ায় উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্তদের কাছে যেন ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে উঠেছেন। জাতপাত তখনকার কলকাতাকে কিভাবে প্রভাবিত করত তার পরিচয় কথামৃতে আমরা পাই।

আশ্চর্যের কথা, ঠাকুরের আরও কয়েকজন ভক্তও অধরের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করতে চাননি। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ মুখার্জী পঙ্‌ক্তিভোজনে যোগ দেননি। ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেছেন: "আজ্ঞা, আমাদের থাক।" ঠাকুর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সহাস্যে বলেছেন: "এঁরা সবই কচ্ছেন, শুধু ঐটেতেই সঙ্কোচ।" (ঐ, ৪।১৩৬)

এবার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলি। ঐ বছরের ১ অক্টোবর তিনি অধরের বাড়ি থেকে না খেয়েই নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিলেন। ঠাকুর তখন বলেছেন, অধরকে না বলে চলে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে। কেদারের উত্তরটা ছিল: "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্; আপনি যেকালে রইলেন, সকলেরই থাকা হলো—আর কিছু অসুখ বোধ হয়েছে···।" তারপরেই এল আসল কথাটা: "আর বিয়ে খাওয়ার জন্য একটা ভয় হয়—সমাজ আছে—একবার তো গোল হয়েছে।"

পরে কেদার ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের বক্তব্যটা ছিল পরিষ্কার: "ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়।" (ঐ, ২।১৬৩)

ভাবতে অবাক লাগে, ঐসব শিক্ষিত মানুষ ছিলেন সংস্কারাচ্ছন্ন, অথচ তিনি ছিলেন এইসব সংস্কারের কত ঊর্ধ্বে! বাল্যকাল থেকেই তিনি বারবার ভেঙেছেন সামাজিক নিষেধের গণ্ডি। প্রচলিত রীতিকে নস্যাৎ করে তিনি ধনী কামারনীর কাছ থেকে ব্রতভিক্ষা নিয়েছেন উপনয়নের সময়; কৈবর্তের মন্দিরে পুরোহিত হয়েছেন, নারীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন। প্রথম দিকে জাতের বিচার কিছুটা তাঁর ছিল, কিন্তু তারপরেই এসেছে সেই ব্যাপক বিশ্ববোধ। মাথার চুল দিয়ে মেথরের

৩ 'The Hindu Saint'—The Theistic Quarterly Review, Oct.-Dec., 1879

বাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করেছেন। কালীবাড়িতে কাঙালীরা খেয়ে গেছে, তাদের পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকিয়েছেন। হলধারী প্রতিবাদ করলে তিনি গালাগাল দিয়েছেন তাকে। (ঐ, ২।১২২) মাঝিরা রাঁধছে দেখে তাদের হাতেই তাঁর খেতে ইচ্ছা হয়েছে। (ঐ) সুফী গুরুর কাছে তিনি যখন 'আল্লা মন্ত্র' নিয়েছেন, তখন তাঁর ইচ্ছা ছিল গো-মাংস খাওয়ার। মথুরবাবু তখন তাঁকে নিবৃত্ত করেছেন। তাঁর রান্নার জন্য মুসলমান পাচক রাখা হয়েছে। সেই পাচকের নির্দেশে মুসলমানী রীতিতে মুসলমানী রান্না হয়েছে তাঁর জন্য।

এতেই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন কুসংস্কারের কত ঊর্ধ্বে। খ্রীস্টভাবে তিনি বিভোর ছিলেন কয়েকদিন। একবার বলেছেন: "মা, খ্রীস্টানরা গির্জাতে তোমাকে কি করে ডাকে, একবার দেখিও।" আবার সঙ্গে সঙ্গে বালকের আতঙ্কে বলছেন: "কিন্তু মা, ভিতরে গেলে… যদি কিছু হাঙ্গামা হয়? যদি কালীঘরে ঢুকতে না দেয়?" (ঐ, ৫।২) এতে প্রতিফলিত হয়েছে সেকালের গোঁড়া হিন্দুসমাজের অনুদার সঙ্কীর্ণতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ জাতপাত মানতেন না। তিনি বলেছেন: "ভক্তের জাতি নাই।… ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়।" (ঐ, ৫।১৮) তিনি আরও বলেছেন, জাতিভেদ কেবল এক উপায়ে উঠতে পারে। সেটি ভক্তি। (ঐ, ৫।২২) অন্য একদিন তিনি বলেছেন: "শূকর-মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে, সে-লোক ধন্য।" (ঐ, ২।১৪২) এই মানসিকতা ছিল বলেই কালীপ্রসাদরা (স্বামী অভেদানন্দ) পীরুর দোকানে মুরগীর মাংস খেয়ে আসায় তিনি তাঁদের মুক্ত মনের জন্য প্রশংসা করেছেন।[৪]

তিনি সহজভাবে ঈশানকে বলেছেন: "বেশি আচার করো না।" (ঐ, ৫।৭৩) হাজরাকে তিনি বলেছেন: "শুচিবাই ছেড়ে দাও।" (ঐ, ৪।৪৮) রাঁধুনী বামুনদের প্রসঙ্গে হাজরা বলতেন: "ওদের সঙ্গে কি আমরা কথা কই?" ঠাকুর এতে বিরক্ত হয়েছেন। (ঐ, ৩।১৬৭) কেশব ইংরেজদের সঙ্গে মিশতেন। ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, সেজন্য কাপ্তেন ঠাকুরকে তাঁর সঙ্গে মিশতে বারণ করতেন। কিন্তু ঠাকুরের উত্তর ছিল: "আমার সে-সবের দরকার কি? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, ঈশ্বরীয় কথা শুনতে যাই।" (ঐ, ১।১৭৮)

আসলে তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে তিনি খুঁজতেন মানুষটাকেই। আর সেই মানুষেই তিনি পেয়েছেন ঈশ্বরকে। এইজন্যই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে সেই মহৎ প্রশ্ন—"মানুষ কী কম গা?" (ঐ, ৫।১৩৮)

অথচ উনিশ শতকের শেষ দিকেও নগর-সভ্যতার সেই শিক্ষা-আলোক নিয়েই তাঁর অনেক ভক্ত গ্রামীণ জাত্যাভিমান ছাড়তে পারেননি। 'কথামৃত' তার প্রমাণ।

এবার অন্য এক সংঘাতের কথা মনে করা যাক।

শিল্পযুগের উদ্ভব ও নগর-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে আঘাত এসেছে এক পুরনো ব্যবস্থায়, ভেঙে পড়তে শুরু করেছে যৌথ পরিবার। দেখা দিয়েছে নানা ধরনের পারিবারিক সমস্যা।

কথামৃতকার শ্রীম নিজেই এই বিপন্ন সময়ের অন্যতম শিকার। পারিবারিক অশান্তির ফলেই তিনি পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে এসে বরানগরে আত্মীয়-বাড়িতে উঠেছিলেন। সেই সময় তিনি আত্মহত্যা করার কথাও ভেবেছেন।[৫] পরে তিনি পৃথক থেকেছেন স্ত্রী ও সন্তানসহ। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল, মহেন্দ্রনাথ পিতৃগৃহে সকলের সঙ্গে থাকুন, একান্নবর্তী পরিবারে ঈশ্বরচিন্তারও সুবিধা। শ্রীম নিজেই লিখেছেন: "কিন্তু ঠাকুর মাঝে মাঝে যদিও ঐরূপ বলিতেন, তাঁহার দুর্দৈবক্রমে তিনি বাটীতে ফিরিয়া যান নাই।" (ঐ, ২।১০৮) ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ এপ্রিল ঠাকুর তাঁকে এই ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন ("কেমন, এইবার তুমি বাড়ি যাবে।") অথচ তা সত্ত্বেও ঠাকুরের চির-অনুগত শ্রীম এই নির্দেশ মানতে পারেননি। তাতে ঠাকুর তাঁকে তিরস্কার করেছেন: "আর তোমায় বলি, বাপ-মা মানুষ করলে, এখন কত ছেলেপুলেও হলো, মাগ নিয়ে বেরিয়ে আসা!" (ঐ, ২।১১৪)

একই দিনে (৫ এপ্রিল, ১৮৮৪) রামচন্দ্র দত্তও বিমাতাকে নিয়ে অশান্তির কথা বলেছেন, তাতে

৪ আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৩, পৃঃ ৯০
৫ 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের উৎস-সন্ধানে'—অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পরিবর্তন, ২৯।১২।১৯৮২

ঠাকুরের বিরক্তি গোপন থাকেনি।

যৌথ পরিবারের সমস্যা এই গ্রন্থে এসেছে বারবার।

প্রেসিডেন্সি কলেজের এক অধ্যাপকের পুত্র নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও এতে আছে। তিনিও পৃথক হয়েছেন। "বাড়িতে বনিবনা না হওয়াতে শ্যামপুকুরে আলাদা বাসা করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া আছেন।" (ঐ, ৫।১২৬) তাঁর প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন: "সাধু কপনি লয়ে ব্যস্ত, সংসারী ব্যস্ত ভার্যা লয়ে। আবার বাড়ির সঙ্গে বনিবনাও নাই, তাই আলাদা বাসা করতে হয়েছে।" এই সুযোগে তিনি শ্রীমকেও খোঁচা দিয়েছেন। তাঁকে দেখিয়ে বলেছেন: "ইনিও আলাদা বাসা করে আছেন। তুমি কে, না আমি বিদেশিনী, আর তুমি কে, না আমি বিরহিণী!" (ঐ, ৫।১৩৫)

এইজন্যই তিনি কাউকে পিতৃঋণ-মাতৃঋণের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন (ঐ, ৪।২৪৫), কাউকে বলেছেন ভাইদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে (ঐ, ৫।১২৫), কাউকে বলেছেন দাদাকে মান্য করে চলতে (৩।১৯১)।

কিন্তু ইংরেজী প্রভাব এবং নগর-সভ্যতার উন্মেষের ফলে যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন ছিল অবশ্যম্ভাবী। 'কথামৃত' গ্রন্থে সেই সমকালীন সমস্যাটাও মাঝে মাঝে উঠে এসেছে।

এভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে, এই গ্রন্থে সমকাল ধরা দিয়েছে নিখুঁতভাবে।

পরিকল্পনাহীনভাবে বাণিজ্যকেন্দ্র বড়বাজার গড়ে উঠছে (ঐ, ২।১৯৩)—এই বর্ণনা যেমন 'কথামৃত'-এ আছে, তেমনি রয়েছে সমৃদ্ধ মধ্য কলকাতার পথ-ঘাটের চিত্র। (ঐ, ২।১৯৯) আছে ইংরেজ পাড়ার সুখ-সমৃদ্ধির আভাস। (ঐ, ১।৫২) রয়েছে যেমন হঠাৎ বাবুদের ইংরেজ কালচারের চিত্র—"বাড়ির আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়িটা চুনকাম করা…।" (ঐ, ১।৫৭) তেমনি আছে বিত্তবানদের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার ভারতীয় স্টাইল অর্থাৎ বাগানবাড়ির কথা, স্টিক-হাতে মোসাহেব বেষ্টিত ছবি। অন্যদিকে আছে পতনোন্মুখ বিত্তবানদের দুঃখময় দৃশ্য—"একজন মল্লিকদের বাড়িতে ঠাকুরকে দেখলুম। পোড়ো বাড়ি, তারা গরিব হয়ে গেছে। এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে ঝুর-ঝুর করে বালি শুরকি পড়ছে।" (ঐ, ১।৯৬)

সেই যুগের কলকাতা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই মহাগ্রন্থে। তখন গড়ের মাঠে বেলুন উড়ত, অনেক লোকের ভিড় হতো, তাতে সাহেবরাও থাকত। (ঐ, ২।৫৫) একটু ইংরেজী পড়লেই লোকের মুখে তখন ইংরেজী কথা বেরুতো। (ঐ, ৩।৪৫) নিধুবাবুর টপ্পার আসর বসাত একটু বিত্তবান হলেই। (ঐ, ১।৭৪) এঁদের মধ্যে থিয়েটার বেশ প্রিয় বিনোদন ছিল। স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করতেন সমাজের পতিতা নারীরাই। ঠাকুরের এক ভক্ত বলেছেন: "বেশ্যারা অভিনয় করে।" (ঐ, ২।১১৯) টাকার আমদানী ও আভিজাত্যবোধ বাড়ায় বক্সেও ভিড় হতো, বেহারা বক্সের পিছনে দাঁড়িয়ে হাওয়া করত। (ঐ, ২।১২৫)

গ্যাস কোম্পানিকে লিখলে বাড়ি বাড়ি গ্যাস পাওয়া যেত। (ঐ, ২।৩৩) মানুষ যাদুঘর দেখতে যেত। (ঐ, ৩।৭১) সার্কাসে মেয়েরাও কঠিন খেলা দেখাত। (ঐ, ৫।১৭) টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ছিল আট আনা। গড়ে উঠছিল ব্যাংক-ব্যবসায়—তবে বেসরকারী স্তরে, যেমন বাঙাল ব্যাংক। (৫।১২৩) প্রসারিত হচ্ছিল বেসরকারী অফিসও, তাদের সাধারণতঃ বলা হতো 'হৌস'। (ঐ, ৫।১৪৪) ট্রামের ভাড়া ছিল চার পয়সা। (ঐ, ২।২০০) 'কথামৃতে' আছে তৎকালীন গ্রামের ছবিও। পল্লীগ্রামে কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা প্রচলিত ছিল, সেইজন্য 'কথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক গল্পে চাষীরাই মূল চরিত্র। গ্রামের কেনা-বেচার চিত্রও 'কথামৃত' গ্রন্থে আছে। (ঐ, ৩।৬০) আছে শাশুড়ীর অত্যাচারে অসহায় বধূর চিত্ররূপ। (ঐ, ৩।৬১) আছে সরকারি আমলার দাপটে গ্রামের ভয়ার্ততার আভাস—"ডিপুটি দেখেছিলাম। মাথায় তাজ। সব হাড়ে কাঁপে।" (ঐ, ৪।১৪৭)

সেইজন্যই বলা চলে, এই গ্রন্থ শুধু ভক্তি-গ্রন্থ নয়। এতে বিধৃত হয়েছে একটা যুগ, বাংলার অস্থির সমকাল।* □

* শ্রীম-র ঠাকুরবাটী থেকে প্রকাশিত 'কথামৃত'-এর নিম্নলিখিত সংস্করণ এই রচনায় উল্লিখিত হয়েছে:
১ম খণ্ড, ১৩৮৬; ২য় খণ্ড, ১৩৭১; ৩য় খণ্ড, ১৩৭০; ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭১; ৫ম খণ্ড, ১৩৭১

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

স্বামী অখিলানন্দ

ভাষান্তর : সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

মাঝে মাঝে দু-একদিন তাঁর কাছে যাওয়া হয়ে উঠত না, তারপর যেদিন যেতাম সেদিনই তিনি বলতেন : "তোকে আজকাল আর দেখা যায় না।" যদি আমি বলতাম : "মহারাজ এই তো সবে পরশু আমি এসেছিলাম।" তিনি বলতেন : "যেমন তুই, তেমনি তোর পরশু।"

একদিন মহারাজ এক ভক্তের বাড়িতে গিয়েছেন—স্বামী অম্বিকানন্দের পিতৃগৃহে (শিবপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে)। আমি ও মহারাজের অপর দুজন মন্ত্রশিষ্য—বর্তমানে স্বামী বিবিদিষানন্দ ও স্বামী তেজসানন্দ তাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা করতে গিয়েছি। মহারাজের সামনে আমরা বসে আছি। এমন সময় একজন অল্পবয়স্ক সাধু এসে আমাকে একজন ভক্তের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ভক্তটি আমাদের ছাত্রাবাসে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি করেছিলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন : "ব্যাপার কি ? কি হয়েছে ?" আমি তখন তাঁকে সংক্ষেপে সব ঘটনা বললাম। তিনি বললেন : "লোকটিকে ছাত্রাবাসের সঙ্গে যুক্ত করবার আগে তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করলি না কেন ?" আমি উত্তর দিলাম : "মহারাজ, আমি ভেবেছিলাম লোকটি ভক্ত, সুতরাং তাকে নিয়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হবে না।" মহারাজ তখন জোরে বলে উঠলেন : "ওরকম ভক্ত আমি অনেক দেখেছি।"

তখন মহারাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও লোকব্যবহার নিয়ে প্রায় একঘণ্টা ধরে বললেন। বললেন : "বাবা, কারও ভালর জন্য তুমি যদি অনেক কিছু কর, আর যদি একটিমাত্র কাজ তার অপছন্দের কর তাহলে সেই একটিই সে মনে রাখবে, আর তার ভালর জন্য যাকিছু করেছ সব ভুলে যাবে। সে তখন সর্বত্র তোমার নিন্দা করে বেড়াবে। সংসারের ধারাই এই। বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্বিচারে একধার থেকে সকলের উপকার করতেন। কিন্তু যারা তাঁর কাছ থেকে উপকার নিত, তাঁর দয়া পেত, তারাই তাঁর নিন্দা করে বেড়াত, তা সত্ত্বেও তিনি পুনর্বার তাদের সাহায্য করতেন। জীবনের শেষদিকে তাঁকে একদিন একজন গিয়ে বলে যে, অমুক আপনার নিন্দা করেছে। শুনে মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে তিনি বললেন : 'কই, আমি তো তাঁর কোন উপকার করেছি বলে মনে পড়ে না যে, সে আমার নিন্দা করছে।' এথেকে তুই সাধারণ মানুষের স্বভাব ধারণা করতে পারবি।"

এর পর মহারাজ আমাকে আর একটি কাহিনী শোনালেন। এক জায়গায় এক নদীর ধারে এক সাধু বসে ধ্যান করছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি কাঁকড়াবিছে জলে ভেসে যাচ্ছে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে। তখন সাধুটি তাকে জল থেকে তুলে তীরে নিয়ে এলেন। বিছেটি তখন তাঁকে কামড়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বিছেটি আবার জলে পড়ে গেল। সাধুটি আবার তাকে জল থেকে তুলতেই সে দ্বিতীয়বার তাঁকে কামড়ে দিল। বিছের কামড়ে সাধুটির খুবই যন্ত্রণা হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সাধুটি দেখলেন, বিছেটির আবার জলে পড়বার উপক্রম হয়েছে। তখন কি করণীয় তিনি ভাবতে লাগলেন। চিন্তা করে তিনি দেখলেন যে, বিছের ধর্ম দংশন করা, আর সাধুর ধর্ম বিপন্নকে ত্রাণ করা। সুতরাং তৃতীয়বারও তিনি বিছেটিকে জল থেকে তুলে তার কামড় খেলেন। এবার তিনি তাকে তুলে নিয়ে নদীর পাড়ে অনেক দূরে ছেড়ে দিলেন, যাতে সে আর জলে পড়তে না পারে।

এই কাহিনীটি বলে মহারাজ প্রকৃত সাধুর ধর্ম ও আচরণ চিরদিনের জন্য আমার মনে অঙ্কিত করে দিলেন।

আমি তখন বি. এ. পড়ছি। মহারাজ আমাকে মাদ্রাজ মঠে গিয়ে যোগ দিতে বলেন। আমাকে তিনি বললেনঃ "এখনই এবিষয়ে কাউকে কিছু বলিস না।" আবার বললেনঃ "আমি তোকে ওখানে পাঠাতে চাইছি, কারণ অবনী (পরবর্তী কালে স্বামী প্রভবানন্দ) প্রভৃতি কয়েকটি তোর মতো অল্পবয়সী ছেলে ওখানে আছে। তোরা পরস্পরের বন্ধু হতে পারবি।"

মঠে যোগ দেবার পর মহারাজের কাছে থাকবার জন্য যখন ভুবনেশ্বরে যাই, মহারাজ তখন অত্যন্ত দয়া ও করুণা দেখালেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ভ্রমণের সময় আমাকে তিনি সঙ্গে নিতেন। অনেক সময়ই কোন কথাবার্তা হতো না। আমি শুধু সঙ্গে থাকতাম। কি করে কয়েক আনা পয়সা মাত্র সম্বল নিয়ে কাশী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালে তা রুগ্ন পরিত্যক্ত ও বৃদ্ধদের সেবার জন্য একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় সে-কাহিনী একদিন আমাকে তিনি শোনালেন। সেদিন মহারাজ ঠাকুরের কাজ কিভাবে প্রসারলাভ করে সেবিষয়ে আমার মনে ধারণা জন্মিয়ে দিলেন।

আমি যখন ভুবনেশ্বর মঠে ছিলাম তখন আমাকে মাঝে মাঝে মহারাজের জন্য রান্না করতে হতো। তিনি ঠাট্টা করে বলতেনঃ "এখানে থাক আর রেঁধে মর।" কিন্তু তাঁর মনে সবসময় এই চিন্তা যে, তিনি আমাকে মাদ্রাজে পাঠাবেন। একদিন আমি মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি একজন প্রাচীন ভক্তকে বললেনঃ "আমি এই ছেলেটিকে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে শেখার জন্য মাদ্রাজে পাঠাতে চাই।" আমি তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, আমেরিকায় কাজ করবার জন্য আমাকে পাঠানো হবে। সেইসময় একদিন কলকাতা থেকে অল্পবয়স্ক এক সাধুর লেখা চিঠি এল। চিঠির মর্ম ছিল এই যে, মঠের সচিব স্বামী সারদানন্দ চান কলকাতাতে একটি নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজে আমি যেন কলকাতায় যাই। একজন ধনী ব্যক্তি কিছু টাকা দিয়েছিলেন। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে মঠে যোগ দিই, সেই সময় অর্থদানের ব্যাপারে আমি কিছুটা যুক্ত ছিলাম। এই প্রস্তাব যেদিন এল মহারাজ চাইলেন সেই রাত্রেই আমি মাদ্রাজ যাই। আমি অবশ্য তাঁর কাছে থাকতে এবং তাঁর সেবা করতেই চাইলাম; কিন্তু তিনি বললেনঃ "তুই কি মনে করিস যে, যেসব ছেলেরা দূরে আছে আর ঠাকুরের কাজ করছে না, তারা আমার সেবা করছে না?" এই কথায় আমার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

বলরামবাবুর ছেলে রামবাবু (রামকৃষ্ণ বসু) পরমভক্ত ছিলেন। তিনি মহারাজকে অনুরোধ করলেন আমাকে আর কয়েকটা দিন রেখে দিতে, যাতে আমি তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে পুরী যেতে পারি। মহারাজ বললেনঃ "না রাম, আমি চাই ও এখনই মাদ্রাজে চলে যাক।" যাবার আগে আমি জানতে চাইলাম, মহারাজ শীঘ্রই মাদ্রাজে আসবেন কিনা। তিনি বললেন যে, তিনি আসবেন। আমি আরও জানতে চাইলাম, অবতারপুরুষ ও সাধুদের সম্পর্কে দেখা স্বপ্ন সত্য কিনা। তিনি বললেনঃ "সত্য"। আমি মাদ্রাজ রওনা হয়ে গেলাম।

মঠের একটি কেন্দ্রে কয়েকটি তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারী কিছু গোলমাল করেছিল। কয়েকজন প্রাচীন সাধু তাদের সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করে দেবার জন্য মহারাজকে বলেন। মহারাজকে প্রাচীন সাধুরা বললেন, ছেলেগুলির চাল-চলন বা সংস্কারাদি আধ্যাত্মিক জীবনের অনুকূল নয়। মহারাজ মন্তব্য করলেনঃ "মানুষের ভুলভ্রান্তির জন্য দরদ ও সহানুভূতি দেখাতে হলে, সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতে হলে বিশেষ গুণ থাকা চাই।" ঐ বিভ্রান্ত তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রতি মহারাজ কি অসীম ক্ষমা ও ভালবাসাই না দেখালেন! পরে এদের তিনি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি বলতেনঃ "কম্বলের রোঁয়া বাছতে আরম্ভ করলে তা আর শেষ করা যাবে না।"

পিছনের দিকে তাকালে দেখি মহারাজ আমার সমগ্র ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন এবং কিভাবে

নানা সমস্যার সমাধান করতে হয়, কিভাবে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আচরণ করতে হয় সেসম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে আমার জীবন গঠন করে দিয়েছিলেন। আমাকে তিনি বলেছিলেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'শ, ষ, স। যে সয় সে রয়। যে না সয় তার নাশ হয়'।" তিনি আরও বলেছিলেনঃ "সর্বদা সত্য বলবে, কিন্তু সবসময় অপরের পক্ষে কল্যাণকর সত্যই বলবে, কখনো নিষ্ঠুর সত্য বলবে না।" এই দুইটি উপদেশ অনেক সংকট মুহূর্তে আমার সহায়তা করেছে এবং ভারতে ও আমেরিকায় আমার নগণ্য জীবনে অনেক সমস্যার সমাধান সহজ করে দিয়েছে।

একদিন আমি মহারাজের ঘরে গিয়ে তাঁর খুব কাছে বসেছি। হঠাৎ কলকাতায় যখন আমার অসুখের সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলাম তখনকার সব কথা তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই দেখে যে, সেসময় একদিন আমি তাঁর জন্য সামান্য যা নিয়ে গিয়েছিলাম সেকথাও তাঁর মনে আছে।

আমার জীবনের অন্যতম বড় ঘটনা আমার সন্ন্যাস। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে আমার সন্ন্যাস হয়। একদিন সকালবেলায় তাঁর ঘরে ঢুকে নীরবে বসে আছি। এমন সময় তিনি আমাকে বললেনঃ "তোকে সন্ন্যাস দিই, কি বল?"

আমি হেসে বললামঃ "মহারাজ, সে আপনার ইচ্ছা।" তখন মহারাজ বললেনঃ "ঠিক আছে। তুই সব আয়োজন কর, আর স্বামী শিবানন্দ ও শর্বানন্দকে জানা।" (স্বামী শিবানন্দ তখন মাদ্রাজ মঠে ছিলেন, স্বামী শর্বানন্দ ছিলেন মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ।)

আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। প্রাথমিক আয়োজন ও অনুষ্ঠানাদি দিনের বেলায় হয়েছিল, পরদিন খুব ভোরে আমি ও স্বামী প্রভবানন্দ সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলাম।

যেদিন মহারাজ মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রাবাসটি ঠাকুরকে উৎসর্গ করলেন সেদিনটি ছিল আর একটি স্মরণীয় দিন। পরম করুণা ও স্নেহের সঙ্গে তিনি পূজানুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য আমাকে পাঠালেন। পরে অন্যান্য সাধু ও ভক্তগণ-সহ মহারাজ শোভাযাত্রা করে মঠবাড়ি থেকে নতুন ছাত্রাবাসে এলেন। প্রায় চার-পাঁচশো লোক হয়েছিল। শোভাযাত্রাটি ছাত্রাবাসের নিকটে এলে আমি কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে শোভাযাত্রাটির সামনে গেলাম। মহারাজ ছিলেন সামনে। মহারাজের কাছে যেতেই আমি এক অনির্বচনীয় অনুভূতি লাভ করলাম। আশ্চর্যের বিষয়, উপস্থিত প্রত্যেকেই সেদিন অসাধারণ কিছু অনুভব করেছিলেন। যেন সকলেই এক উচ্চতর ভূমিতে উন্নীত হয়েছেন। পরদিন সকালে আমি স্বামী শিবানন্দকে প্রণাম করতে গিয়ে বিষয়টি তাঁকে বললাম। তিনি বললেনঃ "একই সঙ্গে বহুলোককে উচ্চতর ভূমিতে তুলে দেওয়ার ক্ষমতা মহারাজ রাখেন।"

মহারাজের উপস্থিতিতে মাদ্রাজ মঠে দুর্গা-পূজার সময়ও অনুরূপ অভিজ্ঞতা সমবেত সকলের হয়েছিল। সেই কয়েকটি মাত্র দিনের কথা কেউ কখনো ভুলতে পারবে না। পূজার শেষ দিনে সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকে এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও আধ্যাত্মিক উচ্চানুভূতি লাভ করেছিলেন।

আমি যখন মাদ্রাজে, তখন একদিন একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা মঠে এলেন। তিনি নিদারুণ মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন। আমি তাঁকে কলকাতায় গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে বললাম। তিনি কলকাতা গেলেন। পরে যখন ভদ্রমহিলা সিংহলের পথে মাদ্রাজে এলেন তখন মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা তিনি আমাকে শোনান। তিনি বললেন যে, তিনি বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে যখন মহারাজের নিকটে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলেন, মহারাজ তখন তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। সেই সময় তাঁর এক অননুভূত উদ্দীপনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হয় এবং তারই ফলে তাঁর সমস্ত কষ্ট দূর হয় এবং তিনি প্রভূত আনন্দ ও শান্তির অধিকারিণী হন। ☐

[সমাপ্ত]

বিশেষ রচনা

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দঃ প্রতিক্রিয়া এবং তাৎপর্য

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজী ধর্মমহাসভায় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কি বলেছিলেন, তা দেখা যাক। ভাষণটির সূচনাতেই তিনি বলেনঃ তিনি নিজে বৌদ্ধ নন, অথচ বুদ্ধানুসারী। চীন, জাপান বা সিংহল—যেখানে ঐ মহান গুরুর বাণীসমূহের অনুগামী, ভারতবর্ষ সেখানে তাঁকে ঈশ্বরের 'অবতার' (দশাবতারের অন্যতম) বলে পূজা করে। ঐ সভায় বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা করার আহ্বান পেয়েছেন তিনি ; কিন্তু যাঁকে তিনি ঈশ্বরের অবতার বলে পূজা করেন, তাঁর সমালোচনা করা তাঁর সাধ্যাতীত। তবে একটি কথা তিনি বলতে পারেন, তা হলো বুদ্ধের শিষ্যরা তাঁকে ঠিকমত বুঝতে পারেননি। হিন্দুধর্ম (অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম) ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বর্তমানে যে সম্পর্ক, তা অনেকটা ইহুদীধর্ম ও খ্রীস্টধর্মের মধ্যে সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয়। যীশুখ্রীস্ট ইহুদী ছিলেন এবং শাক্যমুনি (বুদ্ধ) ছিলেন হিন্দু। ইহুদীরা যীশুখ্রীস্টকে যে কেবলমাত্র পরিত্যাগই করেছিল তা নয়, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার সহায়তাও করেছিল। হিন্দুরা অতদূর যায়নি, কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধধর্মকে ভারত পরিত্যাগ করেছিল ; অপরদিকে বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার বলে গ্রহণ করে তাঁর পূজাও করেছে হিন্দুরা। তিনি বলেনঃ আধুনিক বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুদের ধারণায় বুদ্ধদেবের বাণী—এই দুয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো এই—হিন্দুরা মনে করে, শাক্যমুনি নতুন কিছু প্রচার করেননি। তিনিও যীশুর মতোই—কোন কিছু ধ্বংস করতে আসেননি ; পূর্ণ করতে এসেছেন। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র এই—প্রাচীন ইহুদীরা যীশুকে আদৌ বুঝতে পারেনি, আর বুদ্ধের অনুগামীরাই তাঁর বাণীর যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি। ইহুদীরা যেমন 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর পরিপূর্ণ রূপ 'নিউ টেস্টামেন্ট'কে অনুধাবন করতে পারেননি, বৌদ্ধরা তেমনই হিন্দুধর্মের সত্যসমূহের পরিপূর্ণতা বুদ্ধের বাণীসমূহের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারেননি। বস্তুতঃ বুদ্ধ ছিলেন হিন্দুধর্মের পরিপূর্ণতার প্রতিমূর্তি, তার যুক্তিসঙ্গত উপসংহার এবং পরিণতি।

ঐ প্রসঙ্গে স্বামীজী হিন্দুধর্মের দুটি দিকের উল্লেখ করেন—একটি আনুষ্ঠানিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক দিকটি বিশেষভাবে সাধু-সন্ন্যাসীরাই চর্চা করেন ; সেখানে কোন বর্ণাশ্রম ভেদ নেই। উচ্চতম বর্ণের থেকে নিম্নতম বর্ণের ব্যক্তি পর্যন্ত সন্ন্যাসী হতে পারে। সন্ন্যাসী হলে তারা সমপর্যায়ের হয়ে যায়। সত্যিকার ধর্মের ক্ষেত্রে কোন বর্ণবিভেদ নেই ; বর্ণবিভেদ সামাজিক প্রথামাত্র। শাক্যমুনি নিজে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাঁর গৌরব হলো—তিনি বেদের গুপ্ত সত্যগুলিকে আপামর জনসাধারণের কাছে উন্মোচিত করবার মতো হৃদয়ের ঔদার্য দেখিয়েছিলেন। তিনিই বিশ্বে প্রথম কার্যকরী ধর্মপ্রচারক সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। স্বামীজীর মতে, ধর্মান্তরের ধারণারও প্রথম উদ্ভাবক ছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর বিশেষ অবদান সর্বসাধারণের জন্য, বিশেষ করে অজ্ঞ ও দরিদ্রের জন্য আশ্চর্য সহানুভূতি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন ক্ষত্রিয়। বুদ্ধ যখন তাঁর উপদেশ প্রচার করছিলেন, তখন ভারতে সংস্কৃত আর কথ্যভাষা ছিল না। পণ্ডিতদের গ্রন্থাবলীতেই ঐ ভাষা তখন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধের ব্রাহ্মণ-শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর বাণীগুলিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করতে চান ; কিন্তু তিনি তাদের এই বলে নিবৃত্ত করেনঃ "আমি দরিদ্রের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য ; তাদের ভাষাতেই আমি সব বলে যাব।" ফলে আজ পর্যন্ত বুদ্ধবাণীর অধিকাংশই আমরা তদানীন্তন ভারতের প্রচলিত ভাষা পালিতে পাই।

স্বামীজী বলেন, যতদিন পৃথিবীতে মৃত্যু আছে, মনুষ্যহৃদয়ে দুর্বলতা আছে এবং তাথেকে উৎসারিত ক্রন্দন আছে ততদিন ঈশ্বরবিশ্বাসও থাকবে। যাঁকে সাধারণ আর্তমানুষেরা আকুলভাবে আঁকড়ে ধরে সেই নিত্য-ঈশ্বরকে বুদ্ধ-শিষ্যরা গণমানুষের মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে এবং দর্শনের

সাহায্যে বেদের সনাতন সত্যগুলিকে ভেঙে চুরমার করবার ব্যর্থ প্রয়াস করে। ফল হয় এই—বৌদ্ধধর্ম তার জন্মস্থান ভারতবর্ষেই স্বাভাবিক মৃত্যুর বলি হয়ে যায়। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও বিশেষ ক্ষতি হয়। প্রয়োজনীয় সংস্কারের উৎসাহ সে হারিয়ে ফেলে। বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের মধ্যে যে সহানুভূতি, মৈত্রী ও করুণা আনয়ন করেছিল তাও ভারত থেকে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়।

২৭ সেপ্টেম্বর 'শিকাগো ইন্টারওসান' পত্রিকায় ২৬ সেপ্টেম্বর মহাসভার সান্ধ্য অধিবেশনের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'The Defence of Buddhism'। মূল লিখিত ভাষণটি ছিল সিংহলের বৌদ্ধ প্রতিনিধি ধর্মপালের। ভাষণের শেষে ধর্মপাল স্বামী বিবেকানন্দকে অন্য ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ন্যায্য সমালোচনার জন্য অনুরোধ জানান। স্বামীজীও এই অনুরোধ রক্ষা করেন। বৌদ্ধধর্মের অনুকূলেই তিনি বেশির ভাগ বলেন। মঞ্চস্থ বৌদ্ধ প্রতিনিধিদের নিম্নলিখিত কথাগুলি বলে তিনি তাঁর বক্তৃতাটি শেষ করেন ঃ

"We cannot live without you, nor you without us. Then believe what separation has shown to us, that you cannot stand without the brain and philosophy of the Brahman, nor we without your heart. This separation between the Buddhist and the Brahman is the cause of the downfall of India. That is why India is populated by three hundred millions of beggars, and that is why India has been the slave of conquerors for the last one thousand years. Let us, then, join the wonderful intellect of the Brahmans with the heart, the noble soul, the wonderful humanizing power of the great Master." [আপনাদের ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, যেমন আপনারাও আমাদের ছাড়া। তাহলে বুঝুন, বিচ্ছেদ আমাদের কি করেছে! ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক ও দর্শনশাস্ত্র ছাড়া আপনারা দাঁড়াতে পারেন না, তেমনি আপনাদের হৃদয় ছাড়াও আমরা দাঁড়াতে পারি না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের বিচ্ছেদই ভারতের অধঃপতনের কারণ। ঐ কারণেই ভারত এখন ত্রিশ কোটি ভিক্ষুক দ্বারা অধ্যুষিত এবং একহাজার বছর ধরে বিদেশী বিজেতাদের গোলামি করছে। আসুন, তাহলে আমরা ঐ মহান গুরুর [বুদ্ধের] হৃদয়, উদার আত্মা ও অপূর্ব মানবিকতার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের আশ্চর্য মনীষার সমন্বয় সাধন করি।] (দ্রঃ Vivekananda in the West, Vol. I, p. 132)

শিকাগো ধর্মমহাসভার মূল অধিবেশনের সমাপ্তি দিবস ছিল ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। ঐদিন স্বামীজীর ভাষণ ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। প্রথামাফিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর্ব দিয়ে বক্তৃতাটির শুরু; কিন্তু ওটির শেষের দিকে এমন কিছু কথা আছে, যা আজকের দিনেও খুবই অর্থবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমরা তাথেকে কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি দেব। পরিশেষে, সবগুলি বক্তৃতার মধ্যে সামান্য তুলনামূলক আলোচনা করে তাদের সামগ্রিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করব এবং বর্তমান বিশ্বে স্বামীজীর ঐ বাণীসমূহের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগের যাথার্থ্য পর্যালোচনা করে প্রবন্ধের উপসংহার টানব। বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য সম্বন্ধে স্বামীজী ঐ বক্তৃতাটিতে একটি সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, যার গুরুত্ব আজও অপরিসীম। তিনি বলেছিলেন, কেউ যদি মনে করে থাকেন যে, ঐ ঐক্য স্থাপিত হবে একটি ধর্মের বিজয়ের দ্বারা এবং অপর ধর্মগুলির ধ্বংসের মাধ্যমে, তাহলে সেটি দুরাশামাত্র, তা কখনই হবে না। ভগবান না করুন, কোন খ্রীস্টান যেন হিন্দু না হয় অথবা কোন বৌদ্ধ বা হিন্দু যেন খ্রীস্টান না হয়। বীজ মাটিতে পড়লে জল ও বাতাসই তাকে বৃক্ষে পরিণত করে; কিন্তু বীজ নিজে মাটি, জল বা বাতাস হয়ে যায় না। মাটি, জল ও বায়ু থেকে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ আহরণ করে বৃক্ষ তার নিজের বৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী বাড়ে। ধর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপারই ঘটে। প্রত্যেক ধর্মই অপরাপর ধর্মের থেকে তার প্রয়োজনীয় সারবস্তু গ্রহণ করবে বটে, কিন্তু নিজস্ব ধারায় বেড়ে উঠবে। তাই বলে এক ধর্ম কখনো অপর ধর্ম হয়ে যাবে না।

ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলে তিনি বক্তৃতার সমাপ্তি ঘটান। সেটি হলো এইঃ মহাসভা বিশ্বের কাছে একটি কথা প্রমাণ করেছে—ধার্মিকতা,

পবিত্রতা এবং দয়া কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। প্রতিটি ধর্মেই শ্রেষ্ঠ চরিত্রের নরনারীর আবির্ভাব ঘটেছে। সুতরাং এই বাস্তব সত্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কারুরই এই স্বপ্ন দেখা উচিত নয় যে, তার ধর্মটিই কেবলমাত্র বেঁচে থাকবে, বাদবাকিগুলি সব লুপ্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেছিলেন, এরূপ স্বপ্নচারীর জন্য তাঁর করুণা হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, কালক্রমে প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় লেখা হবে এই কথাগুলি—"Help and not Fight", "Assimilation and not Destruction", "Harmony and Peace and not Dissension" ("সংগ্রাম নয়, সহযোগিতা", "ধ্বংস নয়, আত্মীকরণ", "বিরোধ নয়, মিলন ও শান্তি")।

উপসংহার

স্বামীজীর বাণী ও রচনায় (১ম খণ্ড) ধর্মমহাসভার মূল অধিবেশনে তাঁর প্রদত্ত মাত্র ছয়টি বক্তৃতা প্রকাশিত আছে। ঐ ছয়টিরই বক্তব্য ও তাৎপর্য আমরা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি। ছয়টির মধ্যে দুটি খুবই সংক্ষিপ্ত—দ্বিতীয়টি (১৫ সেপ্টেম্বর) এবং চতুর্থটি (২০ সেপ্টেম্বর)। কিন্তু এদের বক্তব্যের তাৎপর্য কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। দ্বিতীয়টির মূল বক্তব্য—কূপমণ্ডূকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামী, যা আজও বিশ্বে ধর্মীয় বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে যাচ্ছে। চতুর্থটির কেন্দ্রীয় ভাব—ভারতের ধর্মের প্রয়োজনের চাইতে ক্ষুধার্ত মানুষের অন্ন-বস্ত্রের ও রুজিরোজগারের প্রয়োজন অনেক বেশি। একথা বোধ হয় আজ আরও বেশি সত্য; কারণ ভারতের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে, সেই সঙ্গে বহুগুণে বেড়েছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বেকারত্বের পরিমাণ।

আর বাকি চারটি ভাষণের মধ্যে প্রথমটি (উদ্বোধনী ভাষণ—১১ সেপ্টেম্বর) এবং শেষেরটি (সমাপ্তি ভাষণ—২৭ সেপ্টেম্বর) আয়তনে বেশ ছোট; কিন্তু তাৎপর্যের দিক থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'বিশ্বাচার্য' হিসাবে স্বামীজীর মূল বাণীসমূহ ঐ দুটির মধ্যে সংহত অবস্থায় আছে লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বমানবের শান্তি ও কল্যাণ সাধন করতে হলে ঐ দুটি বক্তৃতাতে তাঁর আহ্বান যেমনভাবে আছে তাকে কার্যকরী করতে হবে। বর্তমানে বিশ্বের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এটিই একমাত্র পথ—'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়'।

বাকি দুটি বক্তৃতা (তৃতীয় ও পঞ্চম) দীর্ঘতর। আগেই বলেছি, তৃতীয়টি দীর্ঘতম ('হিন্দুধর্ম')। এপ্রসঙ্গে বলা যায়, স্বামীজীর পাশ্চাত্য-প্রচারের অধিকাংশেরই মূলসূত্র ঐ একটিমাত্র বক্তৃতাতেই সুসংহতরূপে বিধৃত। এটিই একমাত্র লিখিত ভাষণ, যা স্বামীজী মূল মহাসভায় উপস্থাপিত করেছিলেন। এই বক্তৃতাটিতে সনাতন ধর্মের (যাকে বর্তমানে 'হিন্দুধর্ম' বলা হয়) মূল স্বরূপ এবং বিশ্বের যাবতীয় ধর্মের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সুপরিস্ফুট হয়েছে।

পঞ্চম বক্তৃতাটি ('হিন্দুধর্মের পরিণত রূপ বৌদ্ধধর্ম') আকারে ক্ষুদ্র হলেও বর্তমান জগতের পটভূমিকায় অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা এতে স্বামীজীর মতে ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ কী এবং তার ফলে সহস্র বছরের দাসত্বের পরিণামের আলোচনা পাই। একই ব্যাধি আধুনিক ভারতেও বিস্তারলাভ করেছে, তবে ভিন্নতর আকারে ও মাত্রায়। এখন শুধু হিন্দু ও বৌদ্ধের বিরোধ—এই আকারে নয়, হিন্দু ও মুসলমান, হিন্দু ও শিখ প্রভৃতি বহুবিধ আকারে। এই বক্তৃতাটিতে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন বুদ্ধের হৃদয় এবং বৈদান্তিক মস্তিষ্কের মিলনের। পরবর্তী বহু বক্তৃতায় তিনি এরই সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন এই বলে যে, আদর্শ ধর্ম তখনই হবে যখন ইসলাম-দেহের (সংগঠন) সঙ্গে বুদ্ধের হৃদয় ও বৈদান্তিক মস্তিষ্কের সমন্বয় সাধিত হবে। এই প্রশস্ত ভিত্তির ওপরেই একটি বিশ্বজনীন ধর্মের ধারণা তিনি বহু স্থানে বহু বক্তৃতাতেই পরে বিশদভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন।

একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করার যে, প্রায় একশো বছর পূর্বেও স্বামীজীর বিশ্বভাবনা কত স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী ছিল। একারণেই তাঁর 'যুগনায়ক' এবং 'বিশ্বাচার্য' আখ্যা খুবই সার্থক। উপরোক্ত ছয়টি বক্তৃতা আয়তনে ও বিষয়বস্তুতে পৃথক পৃথক হলেও তাদের মধ্যে একটি চমৎকার ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এরাও যেন গীতায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় "সূত্রে মণিগণা ইব।" ☐ [সমাপ্ত]

ভাব-ভালবাসা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কঠিন সমস্যা। ধর্ম আমাদের ফ্যাশান। না, ধর্ম আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। এই রকম কি? জল থেকে মাছকে ডাঙায় তুললে যেরকম ছটফট করতে করতে মরে যায়, আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হলে আমরাও কি ঐ রকম ছটফট করব। ধর্ম কি আমাদের প্রাণবায়ু! কে নাড়ি টিপে বলবেন, জপের নাড়ি তৈরি হয়েছে কিনা। নিজের পরীক্ষা নিজেকেই করতে হবে। অ্যাসিড টেস্ট। সংসার হলো অ্যাসিডের গামলা। তার মধ্যে পড়ে আছি আমি। সংসার আমাকে হজম করে ফেলেছে ; না, পারেনি বলে উগরে দিয়েছে। পরীক্ষা তো নিজেকেই করতে হবে।

ঠাকুর বলছেন, লক্ষ্য কর, তোমার মধ্যে কি কি লক্ষণ ফুটছে। বিষয়-কথায় বিরক্তি আসছে কি? বিষয়ী মানুষের কাছ থেকে কি ছিটকে চলে আসতে ইচ্ছা করছে। যদি করে, তাহলে বুঝতে হবে জমি তৈরি হয়েছে। রুচি আসছে। সময় হয়েছে ধারণ করার। কি ধারণ? বীজ ধারণ। এই মনে বীজমন্ত্র নিক্ষিপ্ত হলে, বিশ্বাসের অঙ্কুর বেরোবে। কোন্ বারি সিঞ্চন করতে হবে। ঠাকুর বলছেন, আমার আগে রামপ্রসাদ তো বলে গেছেন—"ভক্তিবারি তায় সেঁচো না।" ভক্তিই তো সার কথা। ভক্তি কেমন? তারস্বরে চিৎকার। না, ভক্তি হলো, তাঁর কথা শোনামাত্রই, তাঁর চিন্তা মনে উদিত হওয়া মাত্রই বুক ভেসে যাবে চোখের জলে। ভক্তি আর প্রেম অঙ্গাঙ্গী। শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেম একই সঙ্গে উচ্চারিত। একটা টানলে আর একটা আসে।

ঠাকুর বলছেন ঃ "যদি রাগভক্তি হয়—অনুরাগের সহিত ভক্তি—তাহলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। ভক্তি তাঁর কিরূপ প্রিয়—খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়—গবগব করে খায়।" ঠাকুর এইবার স্তর বিভাজন করছেন ঃ "রাগভক্তি—শুদ্ধা ভক্তি—অহেতুকী ভক্তি। যেমন প্রহ্লাদের।" এইবার অহেতুকী ভক্তি কেমন? ঠাকুরের সুন্দর উপমা ঃ "তুমি বড়লোকের কাছে কিছু চাও না—কিন্তু রোজ আস—তাকে দেখতে ভালবাস। জিজ্ঞাসা করলে বল, আজ্ঞা, দরকার কিছু নেই—আপনাকে দেখতে এসেছি। এর নাম অহেতুকী ভক্তি। তুমি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাও না—কেবল ভালবাস।"

উদ্ধব এসেছেন শ্রীবৃন্দাবনে। ব্রজগোপীরা সব ছুটে এসেছেন ব্যাকুল হয়ে—দেখা করবেন। খবর নেবেন সখা কৃষ্ণের। সকলেই জিজ্ঞেস করছেন ঃ "শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন?" "তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন? তিনি কি আমাদের নাম করেন?"

তাঁরা প্রশ্ন করছেন, আর তাঁদের দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে। তাঁরা উদ্ধবকে বৃন্দাবনের নানা স্থান দেখাচ্ছেন। "এইখানে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করে-ছিলেন, এখানে ধেনুকাসুর বধ, এখানে শকটাসুর বধ। এই মাঠে গরু চরাতেন, এই যমুনাপুলিনে তিনি বিহার করতেন, এখানে রাখালদের সঙ্গে খেলা করতেন, এই কুঞ্জে গোপীদের সঙ্গে লীলা।" দেখাচ্ছেন, বলছেন আর কাঁদছেন।

উদ্ধব বলছেন ঃ "আপনারা কৃষ্ণের জন্যে অত কাতর হচ্ছেন কেন? তিনি সর্বভূতে আছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ছাড়া কিছুই নেই।"

গোপীরা তখন বলছেন ঃ "আমরা ওসব বুঝি না। আমাদের লেখাপড়া নেই। আকাট

মূর্খ। কেবল আমাদের বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে জানি, যিনি এখানে নানা খেলা করে গেছেন।" উদ্ধব বলছেনঃ "তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁকে চিন্তা করলে এ-সংসারে আর আসতে হয় না। জীব মুক্ত হয়ে যায়।"

গোপীরা তখন সারকথা বলছেনঃ "উদ্ধব! মুক্তিটুক্তি আমরা বুঝি না। আমরা মুক্তি চাই না। আমরা শুধু আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখতে চাই।"

ঠাকুর গান গেয়ে বলছেনঃ "আমি মুক্তি দিতে কাতর নই। শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো॥"

এমন ভক্তি আসবে কোথা থেকে? এস, বললেই তো আসবে না। তাঁর লীলাচিন্তা করতে হবে। লীলা দেখছি, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। এই সেই মাঠ, এই সেই কুঞ্জ, যমুনাপুলিন, তিনি কোথায়! এই সেই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারা, ঘটি, বাটি, কম্বল। একা ঘুরছি, তিনি কোথায়! লীলা দেখতে দেখতে একটা অভাববোধ।

ঠাকুর বলছেনঃ "তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব-কিতাব করে। কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না।" তাহলে কেমন করে তাঁকে পাওয়া যাবে? যদি সত্যিই তাঁকে পেতে চাই। সেই পিতাকে, প্রিয়কে, সখাকে। ঠাকুর বলছেনঃ "শোন। ভক্তিই সার। ঈশ্বরকে বিচার করে কে জানতে পারবে। আমার দরকার ভক্তি; তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য অত জানবার আমার কি দরকার? এক বোতল মদে যদি মাতাল হই শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, সে-খবরে আমার কি দরকার? এক ঘটি জলে আমার তৃষ্ণার শান্তি হতে পারে; পৃথিবীতে কত জল আছে, সে-খবরে আমার প্রয়োজন নাই।"

তিনি আছেন—"অনলে, অনিলে, ভূধর, সলিলে গহনে।" কিন্তু আমার পাশে নেই, প্রাণে নেই। আমার প্রাণের প্রাণে নেই। এই হলো আমার বিরহ। প্রেম, বিচ্ছেদ, বিরহ, মিলন। এই হলো পথ। অর্থাৎ চিন্তা। অর্থাৎ ভাবে থাকা। ঠাকুর গাইছেন—

"যে ভাব লাগি পরম যোগী,
যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধরে॥"

"তাঁর অভাববোধে চোখে জল আসবে। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণনামে অশ্রু পড়ত।"

ঠাকুর শুধু ভক্তি বলছেন না। বলছেন নিষ্ঠা। "গোপীদের কি নিষ্ঠা! মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে সভায় ঢুকল। দ্বারী কৃষ্ণের কাছে তাদের লয়ে গেল। কিন্তু পাগড়ি-বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তারা হেঁটমুখ হয়ে রইল। পরস্পর বলতে লাগল, এ পাগড়ি-বাঁধা আবার কে! এঁর সঙ্গে আলাপ করলে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হব! আমাদের পীতধড়া, মোহনচূড়া-পরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়। দেখেছ, এদের কি নিষ্ঠা!" ঠাকুর বলছেন, গৃহের বধূটি সকলকেই ভালবাসে, তবে নিজের স্বামীকে সবচেয়ে বেশি। একটু অন্যভাবে। ভক্ত, কবি, গায়ক প্রয়াত মাতুল জহর মুখোপাধ্যায়ের গান স্মরণে আসছে—

"দারা-পুত্র-পরিজন, সকলেরে বাসি ভাল।
তারও চেয়ে বাসি ভাল শ্যামা তোরে সর্বনাশী॥"

মামা গাইতেন আর দুচোখ ভেসে যেত জলে। ঠাকুর বলছেন, এই অশ্রুধারাতেই তিনি আসেন। আর বলতে হয়, দেওয়ার মতো নেই কিছু মোর, আছে শুধু নয়নের জল। দুর্যোধন অনেক রাজ-ঐশ্বর্য দেখালেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু দীন পাণ্ডবপক্ষকেই বেছে নিলেন। তাই তো তিনি দীনবন্ধু। □

এককথায় জ্ঞান-দান

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

শক্তিমান মহাপুরুষগণের শ্রীমুখনিঃসৃত এক-একটি কথা অমোঘ মন্ত্রের মতো কার্য করে। তাঁহাদের উপলব্ধিজনিত উক্তিসমূহ সংকলিত হইয়াই 'শাস্ত্র' নাম ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল কথা প্রত্যক্ষভাবে শুনিবার ফলে প্রকৃত জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জীবন একেবারে পরিবর্তিত হইতে দেখা গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

সম্ভবতঃ ১৩১৩ সালের রথযাত্রার পরে। শ্রীরতিকান্ত মজুমদার তখন ৺পুরীতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের মেডিক্যাল অফিসার। একদিন বিকালে তিনি দেখিতে পাইলেন, চারিজন সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসী স্টেশনের প্লাটফর্মে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দেখিয়া তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল ও অগ্রসর হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'আপনারা এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?' উত্তর হইলঃ 'আমরা অভেদানন্দ স্বামীকে receive (অভ্যর্থনা) করতে এসেছি—তিনি মাদ্রাজ মেলে আসবেন।' মাদ্রাজ মেল তখন পাঁচটায় আসিত। রতিবাবু বলিলেনঃ 'মাদ্রাজ মেল একঘণ্টা লেট আছে, আপনারা এই সেলুনের ভিতর বসুন।'

'আমরা এখানে বসলে যদি কেউ আপত্তি করে?'

'আমি এখানকার রেলের ডাক্তার। আমি বসালে কেউ কিছু বলবে না।'

সকলে সেলুনে বসিলেন। রতিবাবু যাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ। অপর তিনজন—স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও সম্ভবতঃ স্বামী প্রেমানন্দ। অতি শুভক্ষণে রতিবাবু এই জগৎপূজ্য সন্ন্যাসিগণের ক্ষুদ্র সেবাটুকু করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'আপনারা দেখছি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, আপনারা তবে কাঠের তৈরি জগন্নাথ মানেন কেন?' শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) উত্তর দিলেনঃ '**ঐ জগন্নাথকেই আমরা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলে জানি।**'[১]

কথাটি সোজা রতিবাবুর হৃদয়ের অন্তস্তলে গিয়া বিদ্ধ হইল। ব্রাহ্মগণের সঙ্গে মিশিয়া তিনি ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন এবং 'ঈশ্বর কখনো সাকার হইতে পারেন না'—এই ধারণাটাই পাকা করিয়া রাখিয়াছিলেন। যুক্তিতর্ক জীবনে অনেক হইয়া গিয়াছে কিন্তু কিছুতেই সেই ধারণা পালটায় নাই। কিন্তু আজ ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসীর একটিমাত্র কথায় মাটির মূর্তি ও কাঠের জগন্নাথ সচ্চিদানন্দঘনরূপ ধরিয়া এক অপূর্ব অভিনব মূর্তিতে তাঁহার মানসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন; দ্বিতীয় কোন প্রশ্নই আর করিলেন না—করিবার প্রবৃত্তিও হইল না।

জিজ্ঞাসা করিয়া মহারাজ রতিবাবুর সাংসারিক ও পারিবারিক সমুদয় খবর একে একে জানিয়া লইলেন। তিনি বিপত্নীক, পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা বিদ্যমান এবং বয়স ৩৯ বৎসর মাত্র হইলেও দ্বিতীয়বার বিবাহে অনিচ্ছুক জানিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট

১ শ্রীরামকৃষ্ণসংঘে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সংক্ষেপে 'মহারাজ' নামে অভিহিত করা হয়। অতএব এখানে 'মহারাজ' অর্থে স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহাই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।—সম্পাদক, 'বিশ্ববাণী'।

হইলেন। তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে মহারাজ কিছু কথা বলিলেন এবং 'শশী নিকেতনে'—যে-বাড়িতে স্বামীজীরা ছিলেন—ফিরিয়া সেইদিনই তাঁহাকে একখণ্ড 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠাইয়া দিলেন।

মহারাজের সঙ্গ ও সেবাগুণে রতিবাবুর জীবনে পরিবর্তনের স্রোত দ্রুত বহিয়া চলিল। পরের দাসত্ব করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আর রহিল না। রেলের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া তিনি মহারাজকে প্রণাম করিতে আসিলেন। চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছেন শুনিয়াই মহারাজ তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন। মহারাজের আশীর্বাদে তাঁহার প্রাইভেট প্র্যাকটিস খুব বাড়িয়া গিয়াছিল।

একদিন তিনি মনের চাঞ্চল্য দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলেন। পূর্বজীবনে এক যোগী বৈষ্ণব সাধু তাঁহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যুগলমন্ত্র শুনাইয়া দিয়াছিলেন; মহারাজ মন্ত্রটি শুনিয়া লইয়া বলিলেন: 'ঐ মন্ত্রই জপ করতে থাকুন, আর দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নাই।' তারপরে কিভাবে তিনি আসন করিয়া বসেন দেখিয়া লইয়া বলিলেন: 'ঐ আসনেই বসবেন, আর মানসপূজা করে নিয়ে তারপরে জপ করবেন। আর এইভাবে প্রার্থনা করবেন: "হে ভগবান, তুমি চন্দ্রে, তুমি সূর্যে, তুমি নক্ষত্রে—তুমি সর্বত্র বিরাজিত; আমি সাধন-ভজনহীন, আমাকে দেখা দাও"।'

পুরীর একটি ঘটনা রতিবাবু আমাদের কাছে এইরূপে বলিয়াছিলেন:

মহারাজের পুরীতে অবস্থানকালে প্রায় প্রত্যেক রবিবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অটলবিহারী মৈত্রের বাসায় তাঁহার ও আমাদের সকলের খাওয়া হইত। একরাত্রে সেখানে কালীপূজা হইল—শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) পুরীতে আসিয়াছিলেন, তিনিই পূজা করিলেন। পরদিন বিকালে—খাওয়া দাওয়ার পর—সকলে অটলবাবুর বাসার বড় ঘরে বসিয়াছিলেন ও একজন কেহ ভজন গাহিতেছিল। হঠাৎ মহারাজ বলিলেন: 'নাচতে ইচ্ছা হচ্চে।' কিন্তু নাচিতে গিয়াই সমাধিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; শশী মহারাজ অটলবাবুকে শীঘ্র ফুল আনিতে বলিলেন। ফুলটি মহারাজের হাতে দিতেই তাঁহার সমাধি ভাঙিল ও বলিলেন: 'আহা! দেখছিলাম ঠাকুর এখানে বসে আছেন।'

পুরীতে বাসের সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ পায়ে কার্বঙ্কল হইয়া শয্যাশায়ী হইলে অভিজ্ঞ সার্জন রতিবাবু উপর্যুপরি দশবার অস্ত্রোপচার করিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাদের ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আশীর্বাদভাজন হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি কিছুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। সংসারাশ্রমে তাঁহার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ, বলিষ্ঠচিত্ত ও ভজনশীল লোক বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।* □

* **বিশ্ববাণী, কার্তিক ১৩৫৬, ১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৩২-৪৩৩**

সংগ্রহ: নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে। এই উপলক্ষে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে **স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের** সম্পাদনায় একটি **সংকলন**-গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১৯৯১-এর সেপ্টেম্বর থেকে 'উদ্বোধন'-এর প্রতি সংখ্যায় যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলি ঐ **সংকলন-গ্রন্থে** স্থান পাবে। এছাড়া ধর্মমহাসম্মেলন সম্পর্কিত অন্যান্য বহু মূল্যবান সংবাদ ও তথ্য এবং 'উদ্বোধন'-এ পূর্বপ্রকাশিত কিছু মূল্যবান প্রবন্ধও ঐ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হবে।

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯/১৫মে ১৯৯২

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

হৃদ্‌পিণ্ডে শল্যচিকিৎসার একটি আশাপ্রদ দিক

রথীন্দ্রনাথ মিত্র

জীবদেহে রক্তসঞ্চালনের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। এই সঞ্চালনের মাধ্যমে আমাদের সারা শরীরে পরিশ্রুত বিশুদ্ধ রক্ত ছড়িয়ে পড়ে। আবার শরীরের নানা জায়গা থেকে অশোধিত রক্ত এসে আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডে জমা হয়। হৃদ্‌পিণ্ডটি হলো চারটি খোপযুক্ত একটি বিশেষ ধরনের পাম্প, যার সাহায্যেই এই রক্তসংবহন পদ্ধতিটি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। হৃদ্‌পিণ্ডে যে চারটি খোপ বা প্রকোষ্ঠ (chamber) থাকে তাদের দুটি ওপরে ও দুটি নিচে—এই ভাবে ভাগ হয়ে রয়েছে। ওপরের দুটিকে বলা হয় 'অরিকল' (auricle) আর নিচের দুটিকে বলা হয় 'ভেন্ট্রিকল' (ventricle)। ডানদিকের ওপরের ও নিচের খোপগুলিকে যথাক্রমে রাইট অরিকল (right auricle) ও রাইট ভেন্ট্রিকল (right ventricle) এবং বামদিকের খোপগুলিকে লেফ্‌ট অরিকল (left auricle) ও লেফ্‌ট ভেন্ট্রিকল (left ventricle) বলে। ডানদিকের ওপর আর নিচের দুটি খোপেই থাকে অশোধিত রক্ত এবং বামদিকের ওপর ও নিচের খোপ দুটিতে থাকে পরিশোধিত রক্ত। ডানদিকের ওপরের খোপটিতে বা রাইট অরিকল-এ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রক্ত এসে জমা হয়। পরে সেখান থেকে রক্ত তার নিচের খোপটিতে অর্থাৎ রাইট ভেন্ট্রিকল-এ যায়। এরপরে এই অশোধিত রক্ত শোধিত হবার জন্য ফুসফুসে যায় এবং পরিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে এসে লেফ্‌ট অরিকল-এ পৌঁছায়। সেখান থেকে তা যায় লেফ্‌ট ভেন্ট্রিকল-এ। এরপরে লেফ্‌ট ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত উচ্চচাপে ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। এই প্রসঙ্গে একটু বলা প্রয়োজন যে, অরিকল দুটির আয়তন ভেন্ট্রিকল দুটির থেকে তুলনামূলকভাবে ছোট। একটা খোপ থেকে অপর খোপে যেতে যে নির্দিষ্ট ছিদ্র বা পথ রয়েছে সেখানে ছোট ছোট কপাটিকা থাকে। এগুলোর একটা দিক হৃদ্‌পিণ্ডের সাথে লাগানো থাকে, আর একটা দিক থাকে না। কাজেই প্রয়োজনমত এইগুলো খুলে যায়, যার ফলে রক্ত এক প্রকোষ্ঠ থেকে অপর প্রকোষ্ঠে যায়। এই ছোট ছোট কপাটিকাগুলোকেই বলে 'ভাল্ভ' (valve)। হৃদ্‌পিণ্ডে রক্তের প্রবেশ থেকে শুরু করে পরিশুদ্ধ হয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের বাইরে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত সমস্ত পথেই সে এই ভাল্ভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অরিকল থেকে ভেন্ট্রিকল-এ রক্তের যাতায়াতের পথে রয়েছে দুটি 'অরিকিউলো ভেন্ট্রিকিউলার ভাল্ভ'। আবার হৃদ্‌পিণ্ড থেকে বার হওয়া বড় রক্তনালী দুটোর মুখেও এই ধরনের ছোট ছোট ভাল্ভ আছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কোন ভাল্ভ-এর বন্ধ বা খোলার ওপরই আমাদের রক্তসংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory System) নির্ভর করে রয়েছে। মোটামুটিভাবে দেখা গেছে যে, কোন লোকের ওজন যদি পঞ্চাশ কিলোগ্রাম হয় তাহলে তার হৃদ্‌পিণ্ডের ওজন হবে প্রায় তিনশো গ্রাম, অর্থাৎ দেহের মোট ওজনের শতকরা ০.৫৮ থেকে ০'৬০ ভাগ। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সারা দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে এই ছোট পাম্পটি কাজ করেই চলেছে। আমাদের শরীরে মোট সংবাহিত রক্তের পরিমাণ কিন্তু নির্দিষ্ট। তাই একই রক্ত পরিশ্রুত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে, তারপরে আবার সারা শরীর ঘুরে ক্রমে অপরিশুদ্ধ হয়ে হৃদপিণ্ডে এসে জমা হচ্ছে। এইভাবে চক্রাকারে সংবহনের ফলে হৃদ্‌পিণ্ডকে সর্বমোট প্রায় দশটন রক্তকে দৈনিক পাম্প করতে হচ্ছে। আজ পর্যন্ত মানুষ এত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অথচ ছোট পাম্প আবিষ্কার করতে পারেনি।

এই হৃদ্‌যন্ত্রের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য বহু বছর ধরে জীববিজ্ঞানীরা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার এই যন্ত্রটি যদি কোনরকমে খারাপও হয়ে যায় তবে সেটাকে মেরামত করে নিয়ে কর্মোপযোগী করে নেওয়ার চেষ্টাও চলেছে। বিকল হয়ে পড়া হৃদ্‌যন্ত্রাংশ পাল্টানোও শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে। কিন্তু হৃদ্‌বিশেষজ্ঞরা এর দ্বারা যে সকল সমস্যার সমাধানে পৌঁছাতে পেরেছেন, তা নয়। তার কারণ, হৃদ্‌পিণ্ডের অংশগুলির সমান ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রাংশ কৃত্রিমভাবে তৈরি করা এখনো সম্ভব হয়নি, যদিও অনেক ক্ষেত্রে সফল অস্ত্রোপচার রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের মুখেই হাসি ফুটিয়েছে। বর্তমানে 'পেসমেকার' (pacemaker) বসানোর কাজেও ভারত অনেকটা এগিয়েছে। হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞদের মতে হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হবার পিছনে যে নানারকম কারণ থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ভাল্ভ-এর বিকল হওয়া। এর কারণ নিরূপণ করতে বৈজ্ঞানিকেরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানারকম পরীক্ষাও করে ফেলেছেন এবং কৃত্রিম ভাল্ভ তৈরি করাও বর্তমানে সম্ভব হয়েছে।

যেসমস্ত কৃত্রিম ভাল্ভ হৃদ্‌যন্ত্রে বসানো হয়ে থাকে, তাদের সাধারণতঃ দুটো ভাগে ভাগ করা হয়—(১) বায়োলজিক্যাল ভাল্ভ (biological valve), (২) মেকানিক্যাল ভাল্ভ (mechanical valve)। এদেরও আবার প্রকারভেদ আছে। মেকানিক্যাল ভাল্ভগুলো তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধাতব অ্যালয় (alloy) দিয়ে। সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয় 'কেজ অ্যান্ড বল ভাল্ভ' (cage and ball valve)। এটা একটা বিশেষ ধরনের মজবুত ভাল্ভ। নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে এর কার্যকলাপ। একটা বদ্ধ কৌটো বা খোপের মধ্যে একটা বল নির্দিষ্টভাবে নড়াচড়া করে। তারই ফাঁকে রক্ত একদিক থেকে অন্যদিকে যাতায়াত করে। এছাড়া আরও একধরনের মেকানিক্যাল ভাল্ভ থাকে, যেগুলিকে বলে 'টিল-টিং ডিস্ক' ('tilting disc'), অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা খোপে ডিম্বাকৃতি একটা পাত (disc) নির্দিষ্ট-ভাবে ওঠানামা করে। এই ধরনের ভাল্ভ-এরও দুরকম প্রকারভেদ আছে—একটাকে বলে সিঙ্গল লিফলেট (single leaflet), আরেকটিকে বলে ডাবল লিফলেট (double leaflet)। দ্বিতীয়টিতে দুটো ডিস্ক একই ভাবে খোলে বা বন্ধ হয়।

দুধরনের পেশী থেকে বায়োলজিক্যাল ভাল্ভ তৈরি হয়। বাছুরের হৃদ্‌পিণ্ডের বাইরে যে-পর্দাটা থাকে, যাকে বলে পেরিকার্ডিয়াম (pericardium), সেটাকে নিজেদের সুবিধামত ছোট ছোট টুকরো করে কাটা হয়। এই পর্দাটা তখন থাকে অত্যন্ত পাতলা বা নরম। এটাকে একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের (gluteraldehyde) সাহায্যে পরিবর্তিত করা হয়। এর ফলে এই পদার্থটি বেশ একটু শক্ত হয়ে ওঠে। এই রাসায়নিক যৌগটির বিশেষ ধর্ম হলো সংরক্ষণ করা (preservation), যা পদার্থটিকে সহজে পচতে দেয় না। একে বলে বোভাইন টাইপ (bovine type) ভাল্ভ। আরেক রকম বায়োলজি-ক্যাল ভাল্ভ আছে, তাদের বলে পোরসাইন টাইপ (porcine type)। শুয়োরের মাংসকে ছোট ছোট করে কেটে একে কর্মোপযোগী করে নেওয়া হয়।

খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন ওঠে যে, শল্যচিকিৎসকদের কাছে কোন্ ভাল্ভটি গ্রহণযোগ্য —মেকানিক্যাল না বায়োলজিক্যাল? দুধরনের ভাল্ভ-এরই কিছু কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। রোগীর অবস্থা বিচার-বিবেচনা করেই রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডে ভাল্ভগুলোকে বসানো হয়। যেমন ধরা যাক, বায়োলজিক্যাল ভাল্ভ-এর কথা। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এই যে, এটার যান্ত্রিক ত্রুটি খুবই কম। এতে রক্ত ঘনীভূত হওয়ার কোন অসুবিধা হয় না। কাজেই যেসব রোগীর রক্ত ঘনীভূত হওয়াটা স্বাভাবিক, তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভাল্ভ ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার এর একটা অসুবিধাও আছে; তা হলো, এর কার্যকরী ক্ষমতা দশবছর। এই সময়ের পরে এই ভাল্ভগুলো পাল্টে নতুন করে লাগাতে হয়। কেননা এগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম এসে জমে যায়, যাকে পরিভাষায় বলে ক্যালসিফিকেশন (calcification)।

অপরদিকে মেকানিক্যাল ভাল্ভ-এর ক্ষেত্রে কার্যকরী ক্ষমতা বহু বছর ঠিক থাকে। তার ওপর এতে যান্ত্রিক ত্রুটিও কম। আর একটা সুবিধা, এগুলো আয়তনে খুবই ছোট। কাজেই একে

ছোট জায়গায় বসানো যায়। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ভাল্ভ-এর জায়গায় বায়োলজিক্যাল ভাল্ভ ব্যবহৃত হয় বেশি।

এখন কৃত্রিমভাবে তৈরি ভাল্ভকে যদি নষ্ট ভাল্ভের বদলে বসানো হয় তবে আরেক রকম জটিলতা ঘটে। এই নতুন ভাল্ভটি রক্তের সংস্পর্শে এসে তার জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। কৃত্রিমভাবে তৈরি করা ভাল্ভগুলি রক্তের কাছে বিজাতীয় বস্তু, আর তার ফলেই আসে শরীরের অনাক্রম্যতা (immunity) তৈরির চেষ্টা, যার ফলশ্রুতি হলো কৃত্রিম ভাল্ভকে নষ্ট করার প্রবণতা। এই অনাক্রম্যতাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করার জন্য চিকিৎসকরা বহু চেষ্টা চালাচ্ছেন। এর একটি হলো এক বিশেষ ধরনের ওষুধের ব্যবহার। এর দ্বারা প্রতিরোধক্ষমতাকে কমানো যায়।

তবে আশার কথা হলো এই যে, এই ধরনের জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য কয়েক বছর ধরেই সারা পৃথিবীর চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অনলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে এমন ভাল্ভ তৈরি করা যায় যা শরীর বর্জন করতে চাইবে না। বছর দু-তিন আগে রাশিয়ায় কিছু শারীরবিদ্ ও চিকিৎসক যৌথভাবে এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। দেখা গেল যে, শুয়োরের মাংসকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরিবর্তিত করে এমন একটা জিনিস তৈরি করা যায় যা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারায় এবং মানুষের শরীরের পক্ষেও তা গ্রহণীয় হয়। এর সুবিধা হলো, এটা মানুষের শরীরে পরবর্তী সময়ে কোনরকম জটিল উপসর্গ সৃষ্টি করে না এবং রোগীর ক্ষেত্রে স্বস্তিদায়ক সংবাদ হলো, অস্ত্রোপচারের পরে রোগী অল্প কিছু দিন বিশ্রামের পরেই তার স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরে যেতে পারে।

এই কৃত্রিম যন্ত্রাংশ দিয়ে সামান্যভাবে বিকল হওয়া হৃদ্‌পিণ্ডকে পুনরায় নিজস্ব কর্মক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা যায় বটে, কিন্তু গোটা হৃদ্‌যন্ত্রটিই যদি বিকল হয়ে পড়ে তখন খুব একটা কিছু করার থাকে না। তখন পুরনো হৃদ্‌পিণ্ডের বদলে নতুন হৃদ্‌পিণ্ড বসানোর প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু সে-বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। □

গ্রন্থ-পরিচয়

গবেষণা ও সাহিত্যের মেলবন্ধন

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আদি গঙ্গার তীরে ঃ প্রসিত রায়চৌধুরী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা

একসময় ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারগুলি ছিল বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রামাণ্য ইতিহাস, কিন্তু কালক্রমে বেসরকারী উদ্যোগে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব খানিকটা হ্রাস পায়। পরে অবশ্য নতুন তথ্যগুলি সংযোজিত করে গেজেটিয়ারগুলিকে আধুনিক করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

২৪ পরগনা জেলার ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা নতুন নয়। সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগে অনেক কাজ হয়েছে, যার দ্বারা জেলার ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ ক্রমশঃ সর্বসাধারণের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে এমন কথা বলা যায় না। কারণ, ইতিহাসের অনেক উপাদানই এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে। বর্তমানে ২৪ পরগনা জেলা উত্তর ও দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রসিত রায়চৌধুরী প্রধানতঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাসই সংকলন করেছেন তাঁর 'আদি গঙ্গার তীরে' নামক গ্রন্থে। অবশ্য তার মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে উত্তর ২৪ পরগনারও কিছু কিছু সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। লেখক মানচিত্রের সাহায্যে আদি গঙ্গার অববাহিকায় জনপদ চিহ্নিত করেছেন এবং প্রাচীনকালে এই জনপদ কতখানি সমৃদ্ধ ছিল এবং পরবর্তী কালেও (মধ্যযুগ ও আধুনিককালে) এর সমৃদ্ধি কতখানি অব্যাহত, তারই পরিচয় দিয়েছেন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই অঞ্চলে 'গঙ্গারিডি' জাতি ও রাজ্যের কথা জানা যায়, যার কৃতিত্ব বিস্ময়জনক। আচার্য সুনীতি-কুমারের মতে "খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের সৈন্যেরা এই গঙ্গারিডিদের ভয়েই পূর্বভারতের দিকে এগোতে সাহস করেনি।... গঙ্গারিডিদের যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, গঙ্গার মোহনার কাছেই (এখনকার দক্ষিণ ২৪ পরগনা) এই রাজ্যটি ছিল।"

গ্রন্থটি চারটি মূলপর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের সাতটি অধ্যায়ে আদি গঙ্গার অববাহিকার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্ন-তাত্ত্বিক পরিচয়, মনীষী-পরিচিতি, ধর্মসংঘাত ও সমন্বয়ের ইতিবৃত্ত, লোকসাহিত্যে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী বিধৃত। দ্বিতীয় পর্ব প্রধানতঃ সুন্দরবন সম্পর্কে আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় পর্বে রাজপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের পরিচয়, বিশেষ করে নিকট অতীত ও বর্তমানে এখানকার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার যাবতীয় সংবাদ সংযোজিত এবং চতুর্থ ও শেষ পর্বে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানাবিধ সংবাদ, যথা—ফল-ফুল, পশুপক্ষী, মিষ্টান্ন, যানবাহন, পত্র-পত্রিকা, খেলাধুলা প্রভৃতির সঙ্গে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সংস্কৃতি পরিষদ ও গড়িয়া পূর্ণিমা সম্মিলনী এবং আদি গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এককথায় বলা চলে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যই চারটি মূল পর্বের অন্তর্ভুক্ত। পরিশিষ্ট অংশে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'Mementos of Antique Glory', স্মারকপত্রিকা থেকে 'Harinabhi Brahmo Samaj' ও 'ক্যালকাটা অবজার্ভার' পত্রিকা থেকে বলরাম বসুর দৌহিত্রী রাধারানী বসুর 'I have seen Swamiji' প্রবন্ধগুলি উৎকলিত। রাধারানীর স্মৃতিকথাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সঙ্গে স্বামীজীর যোগাযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আছে অনেকগুলি আলোকচিত্র, যা অতীত ও বর্তমানের ইতিহাসের উপাদানস্বরূপ।

এই ধরনের গ্রন্থ-রচনার প্রাথমিক শর্ত লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সজীব অধ্যবসায়। লেখক এই শর্তগুলি কৃতিত্বের সঙ্গে পূরণ করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ নানাভাবে ইতিহাস-চর্চার সঙ্গে জড়িত থেকেছেন, তথ্য সংগ্রহের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, নানাবিধ বিঘ্নের মধ্য দিয়ে গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা স্বোপার্জিত অর্থে

মুদ্রিত করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন, যদিও বর্তমান সমাজে এই ধরনের কর্মপ্রচেষ্টার আর্থিক সম্ভাবনা প্রায় অকিঞ্চিৎকর।

বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্কলন হওয়ায় বিষয়-বিন্যাস কিছুটা শিথিল এবং পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি লেখক সংশোধন করে নেবেন। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটি বিশেষ আকর্ষণীয় এবং আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকদের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে। পরিশেষে বলি, 'আদি গঙ্গার তীরে' বইটি একাধারে মূল্যবান গবেষণাকর্ম এবং চিত্তাকর্ষক সাহিত্যকর্ম—দুয়ের সুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। ☐

স্মরণিকা-সমালোচনা

স্মরণিকায় ও দর্শন

সুলেখা মুখোপাধ্যায়

The Centenary Celebration of the Visit of the Holy Mother Sri Sri Sarada Devi to the Holy Land of Lord Jagannath. Ramakrishna Mission Ashrama, Puri-752001 (Orissa). Rs. 15.00.

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুরীধাম দর্শনের শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মরণিকাটি বেশ কয়েকটি মূল্যবান রচনায় (ইংরেজী এবং উড়িয়া) সমৃদ্ধ। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সারদাদেবী পুরী-ধামে এসেছিলেন। প্রধানতঃ পুরী ও উড়িষ্যার ভক্তবৃন্দের চিন্তা, মনন ও ধ্যানের ক্ষেত্রে এই স্মরণীয় ঘটনাটি নূতন করে আলোকিত করে দেওয়ার জন্য পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

Abhih. Ramakrishna Mission Vivekananda Library, Vivekananda Marg, Bhubaneswar-751002 (Orissa). Rs. 10.00.

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ লাইব্রেরী প্রকাশিত এই স্মরণিকাটিতে ইংরেজী ও উড়িয়া ভাষায় কয়েকটি মনোগ্রাহী রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

Platinum Jubilee Souvenir : 1991. Ramakrishna Mission Calcutta Student's Home, Belgharia, Calcutta-700056. Rs. 25.00.

রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে প্রতিষ্ঠানটি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রাচীন ভারতের গুরুকুল প্রথাকে আধুনিক যুগের প্রয়োজনের উপযোগী করে এই প্রতিষ্ঠান বহু দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে যথার্থ শিক্ষা ও সংস্কৃতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি যেমন এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, তেমনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো আধুনিক ভারতবর্ষের কয়েকজন স্বনামধন্য রূপকারও তার ভূমিকাকে কুণ্ঠাহীনভাবে স্বীকার করেছেন। স্মরণিকাটিতে স্থান পেয়েছে চল্লিশটিরও বেশি সংস্কৃত, বাঙলা ও ইংরেজীতে লেখা প্রবন্ধ, কবিতা এবং স্মৃতিচারণমূলক সুলিখিত নিবন্ধ।

Installation of Marble Plaque at Sasiniketan in Puri : A Commemorative Souvenir. Ramakrishna Math, Chakratirtha, Puri-752002 (Orissa). Rs. 15.00.

শ্রীমা সারদাদেবী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় সকল অন্তরঙ্গ পার্ষদ পুরীতে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহিভক্ত বলরাম বসুর বাড়ি 'শশীনিকেতনে' অবস্থান করেছেন। সেই পুণ্য অবস্থানের স্মারক হিসাবে পুরী রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃপক্ষ ঐ বাড়িটিতে একটি ফলক বসিয়েছেন। সেই উপলক্ষে উল্লিখিত স্মরণিকাটি প্রকাশিত। ইংরেজী ও উড়িয়া ভাষায় কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধ স্মরণিকাটির বিশেষ আকর্ষণ। ☐

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

মন্দির উৎসর্গ

তিরুভাল্লা (তামিলনাড়ু) আশ্রমের নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির উৎসর্গ উপলক্ষে গত ১৭ ও ১৮ মার্চ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দু-দিনের এই উৎসবের অঙ্গ ছিল—বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, নাম-সংকীর্তন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ধর্মসভা। ১৮ মার্চ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মোট ৫২জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং বহুসংখ্যক ভক্তের উপস্থিতিতে মন্দির উৎসর্গ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এ-উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় তিনি পৌরোহিত্যও করেন।

রাজকোট আশ্রম স্বামী বিবেকানন্দের গুজরাট পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গুজরাটের রাজ্যপাল স্বরূপ সিং। তাছাড়া ৮ মার্চ আশ্রমে এক যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মোট ৩২২জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন।

যুবসম্মেলন

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি **বিশাখাপত্তনম আশ্রম** এক যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ঐ সম্মেলনে মোট ৩০০জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপালকৃষ্ণ রেড্ডি।

সালেম আশ্রমে (তামিলনাড়ু) ৯ ফেব্রুয়ারি এক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মোট ২৭০জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। মাদ্রাজ আই. আই. টি-র অধিকর্তা এন. ভি. সি. স্বামী সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

জাতীয় সংহতি-শিবির

ভুবনেশ্বর আশ্রম গত ১৬ মার্চ উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার গোপালপুর কলেজে এক জাতীয় সংহতি-শিবির পরিচালনা করে। উড়িষ্যা, পশ্চিম-বঙ্গ এবং বিহার থেকে মোট ২০০জন যুবপ্রতিনিধি শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল।

উদ্বোধন

গত ২৫ মার্চ **মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোম**-এর নবনির্মিত ত্রিতল-বিশিষ্ট কর্মিভবনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ।

২১ মার্চ তিনি **চিঙ্গেলপত্তু আশ্রমেও** একটি ভবনের নবনির্মিত দ্বিতলের উদ্বোধন করেন।

পরিদর্শন

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসবের দিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সমীররঞ্জন বর্মণ, পরিকল্পনা মন্ত্রী রসিকলাল রায়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বিভা নাথ এবং পূর্তমন্ত্রী সুরজিৎ দত্ত **আমতলী (বিবেকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা) আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের বি. এসসি. পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত **মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের** একজন ছাত্র অংকে প্রথম স্থান এবং দুইজন ছাত্র রসায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

চিকিৎসা-শিবির

গত ৫ মার্চ **পুরী মঠ** এক দন্তচিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। ঐ শিবিরে ৮৩জনের দাঁত তোলা সহ মোট ১৮৯জনের চিকিৎসা করা হয়। ৮ থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত এই আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় এক চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালিত হয়। ঐ শিবিরে ৮ মার্চ ১৫০জন রোগীকে পরীক্ষা করে ৫৭জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয় এবং বাকিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পুনরায় ১২ মার্চ আরও ১০০জন রোগীর চোখ পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করেন কলকাতার বিশিষ্ট চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডি. কে. গুহ এবং তাঁর সহযোগী বিশেষজ্ঞবৃন্দ।

বহির্ভারত

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা : গত ২—৬ মার্চ ঢাকা আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত

হয়। উৎসবের প্রথম দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাদিক হোসেন পুরস্কার বিতরণ করেন। উৎসব উপলক্ষে ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কর্পোরেশনের মেয়র মীর্জা আব্বাস।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা): এপ্রিল মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ, ভি. এন. হ্যাবারমেল এবং সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ। ৪ এপ্রিল কঠ উপনিষদের ক্লাস হয়েছে। ২৫ ও ২৬ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ওপর ভি. ডি. ও-র মাধ্যমে তথ্যচিত্র দেখানো হয়। ১২ এপ্রিল 'বেদান্তের বিশ্বজনীন বাণী' বিষয়ে ভাষণ প্রদত্ত হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো): গত এপ্রিল মাসে বুধবার ও রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। ১ এপ্রিল স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের ওপর ভাষণ দিয়েছেন প্রব্রাজিকা মাধবপ্রাণা। শনিবারগুলিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশাবলী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্ক: এপ্রিল মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ। ৭ এপ্রিল একটি বিশেষ ভাষণ দিয়েছেন বস্টন বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী সর্বগতানন্দ। ১৭ এপ্রিল গুডফ্রাইডে উপলক্ষে গুডফ্রাইডের তাৎপর্য আলোচনা করেছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ। তাছাড়া তিনি প্রতি শুক্রবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (ক্যালিফোর্নিয়া): এপ্রিল মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মীয় ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ ও ডঃ লেটা জেন লুইস। তাছাড়া প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়েছে। বুধবারগুলিতে বেদান্ত শাস্ত্র বিষয়ক ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী প্রপন্নানন্দ। শনিবারগুলিতে তাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা করেছেন। ১১ এপ্রিল রামনবমীর দিন সন্ধ্যায় পূজা, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী নিত্যবোধানন্দ (বালকৃষ্ণণ) গত ২ জানুয়ারি রাত ১২-১৫ মিনিটে কেরালার কালিকট হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তিনি যকৃৎ ও কিডনির রোগে ভুগছিলেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। দেহত্যাগের পক্ষকাল আগে তিনি সর্দি-কাশি, জ্বর ও জন্ডিসে আক্রান্ত হন। পরীক্ষার পর লিভার এবং কিডনির অসুখও ধরা পড়ে। যথাসাধ্য ভাল চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যাচ্ছিল।

স্বামী নিত্যবোধানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ) মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ত্রিচুর আশ্রমে তিনবছর কর্মী থাকার পর তিনি মাদ্রাজ মঠ প্রকাশিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'বেদান্ত কেশরী'র সম্পাদক হন। ফ্রান্সের গ্রীৎস কেন্দ্রের সহকারী প্রধান হওয়ার পূর্বে তিনি যথাক্রমে রেঙ্গুন ও রাজমন্দ্রী আশ্রমের প্রধানরূপে কাজ করেছেন। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি জেনেভা (সুইজারল্যান্ড) কেন্দ্রের প্রধান হন। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতে চলে আসেন এবং তখন থেকে তিনি প্রথমে উলসুরে ও পরে কুইল্যান্ডিতে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। ভদ্র, সদালাপী ও অমায়িক এই সন্ন্যাসী ছিলেন প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ফরাসী ভাষায় তাঁর কিছু রচনাও রয়েছে। জীবনের শেষপর্ব পর্যন্ত তিনি জ্ঞানচর্চায় নিরত ছিলেন।

স্বামী সত্যময়ানন্দ (সুনীল) গত ৫ জানুয়ারি রাত ৯-৪৫ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর।

গত কয়েক বছর যাবৎ তিনি বহুমূত্র ও হৃদ্‌যন্ত্রের গোলযোগে ভুগছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী সত্যময়ানন্দ ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে করিমগঞ্জ আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি শিলং এবং নরেন্দ্রপুর আশ্রমের কর্মী ছিলেন। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠের কর্মী ছিলেন। স্পষ্টবক্তা ও সদা-উৎফুল্ল এই সন্ন্যাসী সহৃদয় ব্যবহারের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, কোয়েম্বাটোর (তামিলনাড়ু)-এর প্রতিষ্ঠাতা **টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম** গত ২১ নভেম্বর '৯১ ৯-১৫ মিনিটে উননব্বই বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। গত দু-বছর যাবৎ তাঁর শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। গত ১৮ নভেম্বর তাঁর অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়। পরদিন তাঁকে একটি বেসরকারী চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। ২০ তারিখ তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি দেখা গেলেও পরদিন তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অবিনাশীলিঙ্গম ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে কোয়েম্বাটোরে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বর্তমানে সাড়ে তিনহাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী প্রাগ্‌বিদ্যালয় স্তর থেকে পি. এইচ. ডি পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করছে। দক্ষিণ ভারতে এটিই রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত সর্ববৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রয়াত অবিনাশীলিঙ্গমই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ মে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর জেলার তিরুপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি দেশসেবায় ব্রতী হন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রাম, দেশে শিক্ষাবিস্তার ও জনসাধারণের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনি প্রথমবার ছয় মাস কারাবরণ করেন। তারপর আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেও বিভিন্ন সময়ে তিনি কারাবরণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি তিনবছর তামিলনাড়ুর শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এবং পরবর্তী কালে ১৯৫১ থেকে ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সংসদ সদস্য ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেও তিনি দীর্ঘকাল (১৯৩৫—১৯৪৬) সেন্ট্রাল লেজিস্লেটিভ এ্যাসেমব্লির সদস্য ছিলেন।

তামিল ও ইংরেজীতে বেশ কয়েকটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন।

অবিনাশীলিঙ্গম তাঁর ব্যাপক কর্মের স্বীকৃতি হিসাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যেসব বিবিধ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, তার মধ্যে আছে—'পদ্মভূষণ', 'নেহেরু লিটারেসি অ্যাওয়ার্ড', 'যমুনালাল বাজাজ পুরস্কার', রাজ্য সরকার এবং মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত পৃথক পৃথক পুরস্কার। তাঞ্জোর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত ডি.লিট প্রদান করে।

দরিদ্রের সেবা, ছাত্র-কল্যাণ, দেশ ও জাতীর উন্নতির চিন্তা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর মনে জাগরূক ছিল। সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত চিরকুমার এই মানুষটির সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন। ☐

বিবিধ সংবাদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (দুর্গাপুর) গত ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর '৯১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, কীর্তন, বাউল গান ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্পর্কে ভাষণ দেন স্বামী লোকনাথানন্দ, স্বামী বামনানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এই সভায় ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দুর্গাপুরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী দু-জন ছাত্র ও দু-জন ছাত্রীকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বই পুরস্কার দেওয়া হয় এবং পাঠচক্রের তরফে রামকৃষ্ণ মিশন রামহরিপুরের দুঃস্থ ছাত্রদের বৃত্তিদানের জন্য ছয়শো টাকার এবং রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের অনাথ ও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য দশহাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট প্রদান করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সমাত্মানন্দ।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে 'কথায় ও গানে কথামৃত' পরিবেশন করেন স্বামী দেবদেবানন্দ। পরে অধ্যাত্মবিষয়ক কত্থক নৃত্য পরিবেশন করে স্থানীয় শিশুশিল্পিবৃন্দ। সবশেষে পুষ্প করের পরিচালনায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে 'ফল-ভোগ' নাটিকা অভিনীত হয়।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ : গত ২৫, ২৬ ও ২৮ ডিসেম্বর '৯১ দিবসত্রয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবজয়ন্তী উৎসব এবং ২৯ ডিসেম্বর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের বার্ষিক শাস্ত্রীয় ও ক্রীড়ানু-ষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। ২৫ ডিসেম্বর শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি হয়। দুপুরে পাঁচ শতাধিক ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে "শ্রীমা সারদা সরণী" উদ্বোধন করেন স্বামী গহনানন্দজী। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পৌরপ্রধান মৃণালেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী গহনানন্দজী এবং বক্তব্য রাখেন স্বামী জয়ানন্দ। রাত্রে 'অমৃতায়ন'-এর শিল্পিবৃন্দ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ২৬ ডিসেম্বর অপরাহ্ণে ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে যুবছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরে ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, বক্তব্য রাখেন ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। রাত্রে 'তারামায়ের ক্ষেপা ছেলে' গীতিনাট্যাভিনয় পরিবেশন করেন হাওড়ার শিল্পীতীর্থ।

২৮ ডিসেম্বর ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। সভায় দুঃস্থদের মধ্যে ৪২টি কম্বল ও ১৫টি শাড়ি বিতরণ করা হয়। ২৯ ডিসেম্বর বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন ডঃ দেবাশিস পাল ও মৃণালেন্দু বন্দ্যো-পাধ্যায়। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ (রামপাড়া, হুগলী)-এর উদ্যোগে গত ৮ ডিসেম্বর '৯১ বিকালে আইয়া জীবন জগন্নাথ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। বক্তা ছিলেন কানাইলাল দে, নিমাই-চন্দ্র মান্না, নন্দলাল মণ্ডল, অনিলকুমার গোস্বামী। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বলরাম দত্ত এবং কমলাদেবী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের শিল্পিবৃন্দ।

গত ৪ ও ৫ জানুয়ারি '৯২ বীরভূম জেলার **পাইকর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ স্মরণোৎসব সমিতির** উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন সকালে প্রভাতফেরী, দুপুরে পাইকর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা' বিষয়ে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভা ও গ্রামের সঙ্গীত-শিল্পীদের দ্বারা লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দিন পাইকর স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও স্থানীয়

মানুষের সহযোগিতায় এক চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করা হয়। চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করেন কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যালের অধ্যাপক ডাঃ অমিয়কুমার হাটি। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই শিবিরে মোট ২১৭জন চর্মরোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। পরে ধর্মসভা ও বাউল গান পরিবেশিত হয়। ধর্মসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন স্বামী মন্ত্রসঙ্গানন্দ।

গত ১ জানুয়ারি থেকে ৩ জানুয়ারি '৯২ **শলপ (হাওড়া) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্রের** পরিচালনায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ কল্পতরু উৎসব পূজা, চণ্ডীপাঠ, প্রভাতফেরী, বসে আঁকো, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ঈশাত্মানন্দ, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। ভক্তিগীতি ও গীতিনাট্য পরিবেশন করেন অমর পাড়ুই এবং শঙ্কর সোম ও সম্প্রদায়। শেষের দিন পাঁচহাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

সম্বলপুর (উড়িষ্যা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ: গত ১ জানুয়ারি '৯২ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব পালিত হয়। উৎসবের বিশেষ আয়োজন ছিল উড়িয়া ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলামৃত। উক্ত লীলামৃত সন্ধ্যা ৭টায় পরিবেশন করেন সচ্চিদানন্দ পট্টনায়ক এবং অজয়কুমার মিত্র।

বারাসত বিবেকানন্দ কেন্দ্র (চন্দননগর হুগলী): স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে ১২ জানুয়ারি প্রভাতফেরী ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ১৯ জানুয়ারি আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, ২৩ জানুয়ারি স্বামীজী ও নেতাজী বিষয়ক আলোচনা এবং ২ ফেব্রুয়ারি প্রসাদ-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির

গত ১২ জানুয়ারি ১৯৯২, রবিবার জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে হুগলী জেলার **গড়বাগ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্রের** পরিচালনায় ও বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় সাতদিনের এক চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালিত হয়। শিবিরে ৩৭জন রোগীর ছানি কাটা হয় এবং ১৭০জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়।

এই শিবির উদ্বোধন করেন ডাঃ বিশ্বনাথ ঘোষ। অস্ত্রোপচার করেন ডাঃ চিন্ময় সরকার ও ডাঃ সঞ্জীব গুহ। সহযোগিতা করেন ডাঃ অতীন ঘোষ। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন অস্ত্রোপচারের পূর্বে জনসমাবেশে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরলোকে

গত ৭ জানুয়ারি '৯২ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিশুদ্ধানন্দ সমিতির আজীবন সভাপতি **রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** অল্পদিন রোগভোগের পর দক্ষিণ কলকাতার 'রিপোজ নার্সিং হোমে' শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। সুদীর্ঘকাল তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। কয়েক বছর আগে প্রয়াতা তাঁর স্ত্রীও ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের কৃপাধন্যা। প্রসঙ্গতঃ, পূজ্যপাদ মহারাজের প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে সস্ত্রীক রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **অঞ্জলি দাস** গত ১৭ অক্টোবর ১৯৯১ রাত্রি ২-১০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৫০ বছর। তিনি কাঁকুড়গাছি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস্-এ প্রায় কুড়ি বছর ধরে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করছিলেন। তিনি উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন। অঞ্জলিদেবী কাশীপুর উদ্যানবাটী, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠ প্রভৃতি স্থানে প্রায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। পরোপকারিতা ও সহৃদয়তা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ☐

বিজ্ঞান-সংবাদ

অ্যাসপিরিন

অক্সফোর্ডসায়ারের রেভারেন্ড মিস্টার এডমান্ড স্টোন ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্টকে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন : "আমার নিজের অভিজ্ঞতায় ইংল্যান্ডের একটি গাছের ছালের খুব সংকোচক (astringent) শক্তি দেখেছি, যার ফলে সেটি কম্পজ্বরে এবং অন্যান্য নানা অসুখের চিকিৎসায় লাগানো যায়।"

মিস্টার স্টোন যা জানতেন না, সেটি হলো এই যে, স্যালিসিলিক অ্যাসিড থেকে প্রাপ্ত স্যালিসাইলেট-ই উপরি-উক্ত কম্পজ্বর এবং গায়ের ব্যথাও সারায়। উইলো গাছের ছালের (bark of the willow tree) সঙ্কোচক শক্তির কারণ হচ্ছে অধিক পরিমাণে থাকা স্যালিসিন নামক বস্তু, যেটি স্যালিসিলিক অ্যাসিডের গ্লাইকোসাইড নামক যৌগ। বর্তমানে যে-স্যালিসাইলেটটি খুব ব্যবহৃত হয়, সেটি হলো অ্যাসিটিল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, যেটির চলিত নাম 'অ্যাসপিরিন'। যন্ত্রণা লাঘবের জন্য আমেরিকানরা প্রেসক্রিপসন ছাড়াই বছরে ৮ কোটি ট্যাবলেটে ১৬,০০০ টন অ্যাসপিরিন খান, যার দাম হলো ২ বিলিয়ন ডলার। মিস্টার স্টোন যা বলে গেছেন তার অনেকটা ঠিক,—দিনে একটির কম ট্যাবলেট খেলে হৃদ্‌পিণ্ডের অসুখের চিকিৎসায় বা প্রতিরোধে তা কাজে লাগে; তাছাড়া মস্তিষ্কের রক্তনালিতে রক্ত জমে যাওয়াও (cerebral thrombosis) বন্ধ করে। প্রতিদিন ২-৬টি ট্যাবলেট (১-৩ গ্রাম) খেলে জ্বর বা যন্ত্রণা কমে। গাঁটব্যথায় বা রিউম্যাটিক জ্বরে, গাউটে এবং রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিসে দিনে ৪-৮ গ্রাম ট্যাবলেট খেলে গাঁট-ফোলা, লাল হওয়া কমে। স্যালিসাইলেট পায়ের আঙুলে কড়া (corn) গলিয়ে দেয় এবং বৃক্ক থেকে ইউরিক অ্যাসিড নির্গমন করায়; অ্যাসপিরিন রক্ত জমে যাওয়া বন্ধ করে এবং বৃক্কের রক্ত থেকে জলীয় পদার্থ নির্গমন বন্ধ করে।

এডমান্ড স্টোনের অর্ধ শতাব্দী পরে ফ্রান্স ও জার্মানির ওষুধ প্রস্তুতকারকরা (ফার্মাকোলজিস্টরা) উইলো গাছের ছালের মধ্যে কার্যকরী বস্তুটি সন্ধান করতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে মিউনিখের ফার্মাকোলজিকেল ইনস্টিটিউটে মিস্টার বুকনার গাছের ছাল থেকে খুব সামান্য মাত্রায় স্যালিসিন নিষ্কাশন করতে সক্ষম হলেন। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের মিস্টার র‍্যাফেল পিরিয়া কার্যকরী জিনিসটির নাম দেন 'অ্যাসিড স্যালিসাইলিক'।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে একটি জার্মান চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকায় এবং ইংল্যান্ডের ল্যান্সেট পত্রিকায় অ্যাকিউট রিউমেটিক জ্বরে স্যালিসাইলেট দিয়ে আরোগ্য হওয়ার খবর বের হয়।

চালু স্যালিসাইটদের মধ্যে অ্যাসপিরিন (১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত) নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বেয়ার কোম্পানিই এর 'অ্যাসপিরিন' নামটি দেয়। অ্যাসিটিল স্যালিসাইলেট এবং অ্যাসিট্যানিলাইড হাড়ের মজ্জার ক্ষতি (bone marrow depréssion) করে এবং রক্তাল্পতা করে বলে এর সমগোত্রীয় ফিনেসিটিন ব্যবহার শুরু হলো।

কিন্তু কিভাবে অ্যাসপিরিন কাজ করে তা ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জানা ছিল না। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে (পরবর্তী কালে) নোবেল পুরস্কার ও স্যার উপাধিপ্রাপ্ত জন আর. ভেন দেখালেন যে, টিস্যুর (tissue) বা শরীরাংশের কোন ক্ষতি হলে, টিস্যু থেকে প্রোস্টাগ্ল্যানডিন (Prostaglandin) নির্গত হয়ে নানা উপসর্গ সৃষ্টি করে; অ্যাসপিরিন বা ঐ জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রোস্টাগ্ল্যানডিন তৈরি বন্ধ করে।

ভেন-এর প্রোস্টাগ্ল্যানডিন প্রকল্প (hypothesis) অ্যাসপিরিনের ব্যাপারে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করলেও অ্যাসপিরিন-এর কার্যপ্রণালী এর দ্বারা পরিপূর্ণ-ভাবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে যা বোঝা যাচ্ছে, তার মূল্যও অপরিসীম। □

[**Scientific American, January 1991, pp. 84—90**]

যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয় চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

সর্বদার তরে জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি— আমি মা থাকতে ভয় কি?... আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণে রেখো যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

Doing good to others out of compassion is good, but the seva (service) of all beings in the spirit of the Lord is better.

Swami Vivekananda

There is no higher virtue than charity. The lowest man is he whose hand draws in receiving ; and he is the highest man whose hand goes out in giving.

Swami Vivekananda

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।... তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভালকাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

Fill the mind with the highest thoughts, hear them day after day, think them month after month. The ideal of man is to see God in everything. But if you cannot see Him in everything see Him in one thing, in that thing which you like best, and then see Him in another. So on you can go.

Swami Vivekananda

Be not a traitor to your thoughts. Be sincere; act according to your thoughts, and you shall surely succeed.

Swami Vivekananda

We shall spend no time arguing as to theories and ideals, methods and plans. We shall live for the good of others; we shall merge ourselves in struggle. The battle, the soldier and the enemy will become one.

Sister Nivedita

He who served and helped one poor man seeing Siva in him, without thinking of his caste, creed or race or anything, with him Siva is more pleased than with the man who sees Him only in image.

Swami Vivekananda

অমৃত কথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতি মাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

The only God to worship is the human soul in the human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of temples. If I cannot worship in that, no other temple will be of any advantage.

Swami Vivekananda

No need of looking behind. Forward! We want infinite energy, infinite zeal, infinite courage and infinite patience; then only will great things be achieved.

Swami Vivekananda

কত সৌভাগ্যে এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটু সময় করে নিতে হয়।··· জপ-ধ্যান করতে করতে দেখবে উনি (ঠাকুর) কথা কবেন, মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুনি পূর্ণ করে দেবেন—কি শান্তি প্রাণে আসবে!

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

What the nation wants is pluck and scientific genius. We want great spirits, tremendous energy and boundless enthusiasm ; no womanishness will do. It is the man of action, the lion-heart, that the goddess of wealth resorts to.

Swami Vivekananda

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

৯৪তম বর্ষ আষাঢ় ১৩৯৯ 1 JUL 1992

সূচিপত্র

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চুয়াল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঞ্চাশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা ☐ বৈশাখ সংখ্যা থেকে গ্রাহকমূল্য : (ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ) তেত্রিশ টাকা ☐ (সডাক) আটত্রিশ টাকা ☐
বর্তমান সংখ্যার মূল্য ছয় টাকা

উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত **ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ** (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দিই। এই তারিখটি **সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের** সাধারণতঃ **৮/৯ তারিখ** হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে কখনো কখনো পত্রিকা পেঁছাতে বিলম্বও হয়। অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের **একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা** করতে অনুরোধ করি। **একমাস পরে** (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ / পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে **গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে** কার্যালয়ে জানালে **ডুপ্লিকেট** বা **অতিরিক্ত কপি** পাঠানো হবে।

☐ যাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) **পত্রিকা সংগ্রহ** করেন তাঁদের পত্রিকা **ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ** থেকে বিতরণ শুরু হয়। **স্থানাভাবের** জন্য **দুটি সংখ্যার** বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা **সংগ্রহ করে নেন**।

☐ **বৈশাখ সংখ্যা** থেকে (**পৌষ সংখ্যা** পর্যন্ত) গ্রাহক হলে **গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ (By Hand)—৩৩ টাকা, ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ—৩৮ টাকা।**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন : আশ্বিন (শারদীয়া) ১৩৯৯ সংখ্যা

☐ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য : ছাব্বিশ টাকা।**

☐ **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের** এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** তাঁরা নিজের কপি ছাড়া **অতিরিক্ত প্রতি কপি কুড়ি টাকায়** পাবেন ; **৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে **অগ্রিম টাকা জমা দিলে** তাঁরা প্রতি কপি **আঠারো টাকায়** পাবেন।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে **সেই সংবাদ** কার্যালয়ে **অবশ্যই** পেঁছানো প্রয়োজন। **৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে **কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পেঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই** যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ **সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে** আমাদের পক্ষে **দ্বিতীয়বার** দেওয়া সম্ভব নয়।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে **রেজিস্ট্রি ডাকেও** আশ্বিন সংখ্যাটি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি ডাক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ **সাত টাকা ৩১ আগস্ট** ৯২-এর মধ্যে **কার্যালয়ে পেঁছানো** প্রয়োজন। **ঐ তারিখের পরে** টাকা কার্যালয়ে পেঁছালে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের **আগামী বছরের** ডাকমাশুল বাবদ জমা রাখা হবে।

☐ **ব্যক্তিগতভাবে** যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করবেন তাঁদের **২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ('৯২)** পর্যন্ত কার্যালয় থেকে **আশ্বিন সংখ্যাটি** দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন **এই সময়ের মধ্যে** তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে **১৩ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।** কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য ৩১ **অক্টোবরের** ('৯২) **পর শারদীয়া সংখ্যাটি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।** আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সানুগ্রহ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।

☐ কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত **খোলা** থাকে, রবিবার **বন্ধ**। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। **২৬ সেপ্টেম্বর মহালয়া উপলক্ষে এবং ৩ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে পত্রিকা বিভাগ বন্ধ থাকবে।**

যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন

১ আষাঢ় ১৩৯৯ (১৫ জুন ১৯৯২)

উদ্বোধন

আষাঢ় ১৩৯৯ জুন ১৯৯২ ৯৪তম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

দিব্য বাণী

গুরুর কাছে [তত্ত্বের] সন্ধান নিতে হয়। গুরুকে মানুষবুদ্ধি করতে নাই। সচ্চিদানন্দই গুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণ

কথাপ্রসঙ্গে

আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা 'গুরুপূর্ণিমা' উপলক্ষে বিশেষ সম্পাদকীয়

হিন্দু-ঐতিহ্যে গুরুর স্থান

'গুরু' বৈদিক শব্দ। উপনিষদে দেখি মহর্ষি অঙ্গিরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু শৌনককে বলিতেছেন ঃ

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

—সেই নিত্যবস্তুকে জানিবার জন্য তাঁহাকে অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে সমিৎপাণি হইয়া (যজ্ঞকাষ্ঠ হাতে লইয়া) শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট অবশ্যই যাইতে হইবে। (মুণ্ডক-উপ., ১।২।১২)

ইহাই শ্রুতিপ্রমাণ অর্থাৎ বেদের নির্দেশ। ইহাই শ্রুতি-নির্দেশিত পরম্পরা। ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যে শ্রুতির নির্দেশই চূড়ান্ত। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের আচার্যগণ, যাঁহারা স্বয়ং ব্রহ্ম বা পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পরবর্তী সকল প্রজন্মের জন্য পরম তত্ত্বের উপলব্ধির প্রথম ও প্রধান শর্তটি সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই শর্ত হইল—'সদ্‌গুরু-সেবনম্'। অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ, তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁহার সেবা। গুরুর নিকট 'সমিৎপাণি'রূপে উপস্থিত হইবার প্রতীকী তাৎপর্য হইল, গুরুর নিকট আশ্রয়গ্রহণ, আত্মসমর্পণ এবং সেবার দ্বারা গুরুর সন্তোষ বিধানের অঙ্গীকার।

গীতায় পরম জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় প্রসঙ্গে ভগবান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিতেছেন ঃ

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

—[তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণকে] বিনম্র প্রণিপাত, বিনীত জিজ্ঞাসা এবং আত্মসমর্পিত সেবার দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিবেন। (গীতা, ৪।৩৪)

গুরুর প্রসন্নতা, যাহা শুধু গুরুর প্রতি আত্মবিলয়ী সেবার দ্বারাই লভ্য, জ্ঞানলাভের অব্যর্থ উপায়। রুদ্রযামল-তন্ত্রে (উত্তর তন্ত্র, পটল ১) বলা হইতেছে ঃ

গুরোঃ প্রসাদমাত্রেণ শক্তিতোষো মহান্ ভবেৎ।
শক্তিসন্তোষমাত্রেণ মোক্ষমাপ্নোতি সম্বশী ॥

কি শ্রুতি, কি গীতা, কি তন্ত্র—সর্বত্রই বলা হইতেছে যে, গুরুর প্রসন্নতা বিধান জ্ঞানলাভের প্রধান শর্ত। কিন্তু গুরু কে? শাস্ত্র বলিতেছেন, একমাত্র তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিই 'গুরু' পদবাচ্য। 'তত্ত্বদর্শী' অর্থাৎ যিনি তত্ত্বকে 'দর্শন' করিয়াছেন, অর্থাৎ তত্ত্বকে জানিয়াছেন—যিনি ব্রহ্মবিদ্, যিনি আত্মবিদ্। হিন্দুশাস্ত্র বলে, দর্শন ও উপলব্ধি যেন ফল। ফুলের মধ্যে থাকে ফলের প্রতিশ্রুতি। অতএব দর্শন বা উপলব্ধির পূর্বস্তর বা পূর্বশর্ত হইল জীবন—আচরণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, 'উপলব্ধি'র অর্থ 'হওয়া'। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মনিষ্ঠ বা ব্রহ্মপরায়ণও হইতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্র 'গুরু' বলিতে সেরূপ ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে আচরণ এবং উপলব্ধিতে যিনি তত্ত্বজ্ঞানকে প্রকট করেন।

হিন্দুশাস্ত্রাদিতে এবং হিন্দু-আচার্যগণের বচনে গুরুর মহিমার শেষ নাই। হিন্দু-ঐতিহ্যে গুরু হইলেন সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্তি। আচার্য শংকর বলিতেছেন, গুরু শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তি, গুরু সর্ববিদ্যার নিধান। গুরুর সান্নিধ্যে জ্ঞান বিচ্ছুরিত হয়। তাঁহার নীরব উপস্থিতিতেই শিষ্যের সকল সংশয় দূর হইয়া যায়। "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।" (দ্রঃ 'দক্ষিণামূর্তি-অষ্টক')

বিশ্বসারতন্ত্রের অন্তর্গত 'গুরুগীতায়' (শ্লোক ২০) বলা হইয়াছে, 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার, 'রু' শব্দের অর্থ সেই অন্ধকারের নিরোধক। [অজ্ঞানরূপ] অন্ধকারকে যিনি নাশ করেন তিনি 'গুরু' নামে অভিহিত হন। একই কথা বলা হইয়াছে কুলার্ণব-তন্ত্রেও (উল্লাস ১৭)।

শ্রুতি বলিতেছে, গুরু শুধু সাক্ষাৎ জ্ঞান-মূর্তিই নহেন, গুরু সাক্ষাৎ ঈশ্বরমূর্তিও:

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

—যাঁহার পরমেশ্বরের প্রতি পরমা ভক্তি এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ ভক্তি গুরুর প্রতিও সেরূপ ভক্তি, সেই শ্রেষ্ঠ অধিকারীর নিকটেই উপনিষদ্-উক্ত তত্ত্বাদি প্রকাশিত হয়। (শ্বেতাশ্বতর-উপ., ৬।২৩)

ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন (ভাগ., ১১।১৭।২৭):

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥

—আচার্য বা গুরুকে আমি বলিয়া জানিবে। কদাপি তাঁহার অবমাননা করিবে না। মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবে না। গুরুই সর্বদেবময়।

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে জ্ঞানলাভ তো হয়ই না, উপরন্তু শিষ্যের চূড়ান্ত দুর্দশাপ্রাপ্তি ঘটে। তন্ত্রের নির্দেশ এবিষয়ে কঠোর এবং দ্ব্যর্থহীন:

গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিং চ মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

—গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে, গুরুদত্ত মন্ত্রকে অক্ষরমাত্র জ্ঞান করিলে এবং প্রতিমাদিকে প্রস্তরমাত্র ভাবিলে নরকে গতি হয়। (কুলার্ণব-তন্ত্র, উল্লাস ১২)

আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন (তত্ত্বোপদেশ, ৮৪-৮৬):

বিচারণীয়া বেদান্তা বন্দনীয়ো গুরুঃ সদা।
গুরূণাং বচনং পথ্যং দর্শনং সেবনং নৃণাম্॥
গুরুর্ব্রহ্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা॥
যাবদায়ুস্ত্বয়া বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ॥

—বেদান্তবাক্যসমূহ সর্বকালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত-রূপে বিচার্য, গুরু সর্বদা বন্দনীয়। গুরুর আদেশ পালন, গুরুকে দর্শন, গুরুর সেবা মানবের পক্ষে পরম কল্যাণপ্রদ। গুরু স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। মুমুক্ষুমাত্রেরই তিনি সেব্য এবং আরাধ্য। কৃতজ্ঞ বিবেকী ব্যক্তি কদাপি গুরুর উদ্বেগ উৎপাদন করিবেন না। বেদান্ত, গুরু এবং ঈশ্বর মন, কর্ম এবং বাক্যের দ্বারা আজীবন সেব্য—ইহাই শ্রুতির নিশ্চিত নির্দেশ।

আচার্য শঙ্করের সমগ্র জীবন এবং সাধনা ছিল 'জীব ও ব্রহ্ম এক এবং অভেদ'—এই অদ্বৈততত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং প্রচারে একান্তভাবে উৎসর্গীকৃত। কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বের সেই মহান আচার্য গুরুর প্রতি শিষ্যের দৃষ্টির ক্ষেত্রে অদ্বৈততত্ত্বকে প্রয়োগ না করিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন (ঐ, ৮৭):

ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ॥

—সর্বদা [এবং সর্বত্র] অদ্বৈতভাবনা অনুশীলন করিতে হইবে, কিন্তু [গুরুর ক্ষেত্রে] ব্যবহারে অদ্বৈতবুদ্ধি কখনও নহে। ত্রিভুবনে (অর্থাৎ সর্বত্র) অদ্বৈতবুদ্ধি এবং অদ্বৈতভাব রাখিতে হইবে, কিন্তু গুরুর সহিত [কদাপি] নহে।

বলা বাহুল্য, অদ্বৈতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তার এই 'ভেদবুদ্ধি' জ্ঞানদাতা গুরুর মহিমারই দ্যোতক। অবশ্য আচার্যের এই নির্দেশ তাঁহার বাস্তবদৃষ্টিরও পরিচায়ক। গুরুর সহিত নিজেকে অভেদ ভাবিলে গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার প্রসঙ্গ অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়; তাৎপর্যহীন হইয়া যায় গুরুর নিকট হইতে জ্ঞান আহরণের প্রশ্নটিও। কে কাহাকে শ্রদ্ধা করিবে? কে কাহাকে প্রণিপাত করিবে? পরিপ্রশ্ন বা সেবাই বা কে কাহাকে করিবে? জ্ঞান কে কাহাকে দান করিবে? বস্তুতঃ, গুরুর সহিত অভেদদৃষ্টি জ্ঞানদৃষ্টি নহে, অজ্ঞানদৃষ্টিরই পরিচায়ক।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সহিত অদ্বৈত বেদান্তের আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথোপকথন।

স্বামীজী—মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।

সারদাদেবী (সহাস্যে)—দেখো দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না!

স্বামীজী—মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়? (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ৭ম সং, ২।৪৯)

বস্তুতঃ, জ্ঞানলাভের জন্য গুরুর ভূমিকা যেমন অপরিহার্য, তেমনই অপরিহার্য গুরুর প্রতি শিষ্যের সশ্রদ্ধ চরম আত্মনিবেদনও। স্বামী বিবেকানন্দ গুরু-শিষ্য প্রসঙ্গে বলিতেছেন: "গুরুই ধর্ম-

শিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন।... গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনয় নম্র আচরণ, তাঁহার নিকট শরণ-গ্রহণ ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্মের বিকাশ হইতেই পারে না।...

"ধর্ম—সর্বোচ্চ জ্ঞানস্বরূপ যে ধর্ম, তাহা ধন-বিনিময়ে কিনিবার জিনিস নহে, গ্রন্থ হইতেও তাহা পাওয়া যায় না। জগতের সর্বত্র ঘুরিয়া আসিতে পার, হিমালয় আল্পস ককেশাস প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে পার, সমুদ্রের তলদেশ আলোড়ন করিতে পার, তিব্বতের চারিকোণে অথবা গোবি-মরুর চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে পার, কিন্তু যতদিন না তোমার হৃদয় ধর্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছে এবং যতদিন না তুমি গুরুলাভ করিতেছ, কোথাও ধর্ম খুঁজিয়া পাইবে না। বিধাতৃনির্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতা লইয়া তাঁহার সেবা কর, তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে দেখ। যাহারা [গুরুর প্রতি] এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান সত্য, শিব ও সুন্দরের অতি আশ্চর্য তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন।" (বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৩০-৩১) একই ধরনের কথা দৃঢ়তার সহিত স্বামীজী অন্যত্রও বলিয়াছেন : "জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর ও পবিত্রতর আর কিছু নাই (তুলনীয় : "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"—গীতা, ৪।৩৮) ; গুরুর মাধ্যমে উহা মানবাত্মায় আবির্ভূত হইয়া থাকে।... গুরু লাভ কর ; সন্তান যেমন পিতার সেবা করে, সেইভাবে তাঁহার সেবা কর, তাঁহার নিকট হৃদয় উন্মুক্ত কর, তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর। গুরু আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।... [সুতরাং] গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সমীপে যাওয়া উচিত। এই ভাব লইয়া আমাদিগকে গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।" (ঐ, পৃঃ ১২৩)

অবশ্য 'সদ্‌গুরু' সম্পর্কেই শাস্ত্র বা আচার্যগণ ঐরূপ মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিতে উপদেশ দান করেন। তাঁহারা বলেন, গুরুর সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের যোগ্যতার প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিষ্যকেও 'সৎশিষ্য' হইতে হইবে। কঠ-উপনিষদে বলা হইয়াছে (১।২।৭) : "আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।"—তত্ত্বের প্রবক্তাকেও যেমন নিপুণ হইতে হয়, উহার গ্রহীতারও তেমনই নিপুণ হওয়া প্রয়োজন। নিপুণ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট নিপুণ শিষ্যই জ্ঞানলাভ করে। সত্যকে গ্রহণ করিতে হইলে তাহার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। নদী হইতে, পাহাড়-পর্বত হইতে, ঝর্ণার শব্দ হইতে, আকাশ হইতে, বাতাস হইতে কবি ও দার্শনিক শিক্ষার বাণী শুনিতে পান, কিন্তু সাধারণ মানুষ কি তাহা পায়? পায় না। প্রকৃতির মধ্যে আলোকশিখা দেখিতে হইলে আগে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টির উন্মীলন প্রয়োজন। শিষ্যের ক্ষেত্রে সেই উন্মীলনের ভূমিকা গ্রহণ করেন গুরু। স্বামীজী খুব সুন্দরভাবে বলিতেছেন : "নদীর উপদেশ শুনিতে পায় কে? —প্রকৃত গুরুর জ্ঞানালোকে যাহার জীবন পূর্বেই বিকশিত হইয়াছে ; হৃৎপদ্ম একবার প্রস্ফুটিত হইলে নদী-প্রস্তর চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে।... কিন্তু যাহার হৃৎপদ্ম এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই, সে শুধু নদী ও প্রস্তরই দেখিবে। একজন অন্ধ চিত্রশালায় যাইতে পারে, কিন্তু তাহার যাওয়া বৃথা ; আগে তাহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে, তবেই সে ঐ স্থান হইতে কিছু শিক্ষা পাইবে। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের নয়ন-উন্মীলনকারী।" (ঐ, পৃঃ ১২২)

জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে গুরুর ভূমিকা যে অপরিহার্য তাহা 'সাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন' মানুষের উদ্দেশে শ্রুতি-মুখে গুরু-পরম্পরায় শুনানো হইয়াছে :

"আচার্যবান্ পুরুষো বেদ"—যে-ব্যক্তি গুরু বা আচার্য প্রাপ্ত হইয়াছে সে-ই জ্ঞানলাভ করে। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ ৬।১৪।২)

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।" —উঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে যাইয়া আত্মাকে অবগত হও। (কঠ-উপনিষদ্, ১।৩।১৪)

লক্ষ্য করিবার বিষয়, গুরুর সহিত জ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং গুরুর সহিত ঈশ্বরের সমার্থকতা 'গুরু' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেই নিহিত। 'গৃ' ধাতুর সহিত 'কু' প্রত্যয় যুক্ত করিয়া 'গুরু' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'গৃ' ধাতুর তিনটি অর্থ (১) দূর করা বা নিরসন করা (তুদাদিগণীয়), (২) গলাধঃকরণ করা বা গ্রাস করা (তুদাদিগণীয়) এবং (৩) উপদেশ দান করা বা শিক্ষা দান করা (ক্র্যাদিগণীয়)। প্রথম অর্থ অনুসারে গুরু হইলেন তিনি, যিনি শিষ্যের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর

করেন, অবিদ্যার নিরসন বা নাশ করেন ('গিরতি')। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে গুরু শিষ্যের অজ্ঞান বা অবিদ্যাকে গলাধঃকরণ করেন বা গ্রাস করেন অর্থাৎ নিঃশেষ করিয়া দেন ('গিলতি')। তৃতীয় অর্থ অনুসারে তিনিই 'গুরু' পদবাচ্য যিনি শিষ্যকে ধর্ম বা জ্ঞান উপদেশ করেন বা শিক্ষা দেন ('গৃণাতি'), যাহার দ্বারা শিষ্যের অজ্ঞান দূর হয়, অবিদ্যা তিরোহিত হয়। অর্থাৎ গুরু এবং জ্ঞান অচ্ছেদ্য।

হিন্দু-ঐতিহ্যে গুরুকে 'শিব' বা 'দক্ষিণামূর্তি' বা 'দাক্ষিণ্যবিগ্রহ' বলা হইয়া থাকে। এই কল্যাণরূপ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুরুর আন্তররূপ। গুরুর আপাত-রূপ কঠোর; কারণ তিনি 'উত্তম বৈদ্য'। হিন্দু ঐতিহ্যে দেবাদিদেব শিব বিনাশের কর্তা, ভাঙ্গনের দেবতা, কিন্তু সেই বিনাশ ও ভাঙ্গনের পশ্চাতে থাকে নূতন সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি। তিনি মহাকাল—তাঁহার করাল গ্রাস হইতে অমঙ্গল ও অকল্যাণের কোনভাবেই অব্যাহতি নাই। আবার জগতের জ্ঞান-গুরুও শিব। অধ্যাত্মজগতে ব্যক্তি-গুরুর ভূমিকা জগদ্‌গুরু শিবেরই অনুরূপ। গুরু ভাঙ্গনের গদা লইয়া শিষ্যের অজ্ঞান ও অবিদ্যাকে চূর্ণ করিয়া দেন, ধর্ম ও জ্ঞানের খড়্গ লইয়া ছিন্ন করিয়া দেন শিষ্যের হৃদয়স্থিত সকল অধর্ম ও অনৈতিকতার কুজ্ঝটিকা। ফলে শিষ্যের মধ্যে নূতন করিয়া জন্মলাভ করে অপর একটি সত্তা, দ্বিতীয় এক ব্যক্তি। ধর্মদেশনার মাধ্যমে জীবের মধ্য শিবকে বাহির করিয়া আনেন গুরু। সুতরাং 'গুরু' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে শিবের সহিত গুরুর অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত গুরুর সাদৃশ্য এবং একার্থকতাও নিহিত।

'গুরু' শব্দের বর্ণভেদ করিয়া (গ্+উ+র্+উ—এই চার বর্ণের দ্বারা 'গুরু' শব্দ সাধিত।) তন্ত্রাদিতে গুরুর যেসকল অর্থ নিরূপণ করা হইয়াছে সেগুলিতেও গুরুর জ্ঞানরূপতা এবং শিবসাযুজ্যের ভাব সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আগমসার'-এ বলা হইতেছে:

গকারো জ্ঞানসম্পত্ত্যৈ রেফস্তত্ত্বপ্রকাশকঃ।
উকারাৎ শিবতাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ॥

—গ-কার জ্ঞানরূপ সম্পদদায়ক, রেফ বা র-কার তত্ত্ব-প্রকাশক, উ-কার শিবতাদাত্ম্য বা ঈশ্বরসাযুজ্য-দায়ক। এই তিন সম্পদদাতা আচার্য 'গুরু' নামে কথিত।

পরম্পরাক্রমে গুরু ভিন্ন হইবেই, তবে, শাস্ত্র বলে, সকল গুরুই মহেশ্বরের এক-একটি রূপ, সকলেই মহেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহেন—"মহেশো এব নান্যথা।" (শক্তিসঙ্গম-তন্ত্র, সুন্দরী খণ্ড, ১।১৩৮-১৩৯)

এইভাবে উপনিষদ্‌, তন্ত্র এবং আচার্য-পরম্পরায় গুরু ও ঈশ্বরকে অভিন্ন স্থান প্রদান করা হইয়াছে। হিন্দুর পূজাবিধিতে প্রথমে গুরুর অর্চনা করিতে হয়, তাহার পর ইষ্টের পূজা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন: "প্রথমন্তু গুরুঃ পূজ্যঃ ততশ্চৈব মমার্চনম্"—প্রথমে পূজা গুরুর, তাহার পর আমার। (শ্রীগুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলিঃ—শ্রীভাগবত-স্বামী সম্পাদিত, পৃঃ ৩) উপনিষদ্‌ এবং প্রাচীন তন্ত্রাদির সূত্রে বুঝা যায় যে, গুরু এবং ঈশ্বরের অভিন্নতার ভাবটি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহার সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরা স্তম্ভলিপিতে (চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী) গুরুর মূর্তি-যুক্ত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিবরণ খোদিত আছে। (দ্রঃ ভারতীয় শক্তিসাধনা—উপেন্দ্রকুমার দাস, ২য় খণ্ড, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৩, পৃঃ ৭২৮)

স্মরণাতীতকাল হইতে গুরুকে যে সমুচ্চ আসন দান করা হইয়াছে তাহা হিন্দুর ধর্ম ও অধ্যাত্ম-চেতনার ঐতিহ্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই ঐতিহ্য এবং ধারার সুযোগ লইয়া সর্বকালেই নানা ভ্রষ্টাচার ও বিকৃতি গুরুকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশলাভ করিয়াছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ভ্রষ্টাচার এবং বিকৃতির জন্য গুরুবাদ বা গুরুসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী নহে, দায়ী স্বার্থান্বেষী মানুষের দুর্বুদ্ধি এবং দুষ্ট মানসিকতা। সদ্‌গুরু বা প্রকৃত গুরুর লক্ষণাদি হিন্দুশাস্ত্রাদিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে এবং যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের জীবনে তাহা সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। হিন্দুর গুরুবাদ বা গুরুসম্পর্কিত দৃষ্টি শুধু সদ্‌গুরু বা প্রকৃত গুরু সম্পর্কেই প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, সদ্‌গুরু সর্বকালেই বিরল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন: "এরূপ গুরু যে সংখ্যায় অতি অল্প, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ গুরু একটিও থাকেন না—এমন কখনও হয় না। যে-মুহূর্তে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে এইরূপ গুরু-বিরহিত হইবে, সেই মুহূর্তেই ইহা ভয়ানক নরককুণ্ডে পরিণত হইবে; ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই গুরুগণই মানব-জীবনের সুন্দরতম প্রকাশ। তাঁহারা [এখনও] আছেন বলিয়াই জগৎ চলিতেছে। তাঁহাদের শক্তিতেই সমাজ-বন্ধন অব্যাহত রহিয়াছে।" (বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৩-১২৪) □

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

মায়াবতী
২৩ জুলাই (১৯)০৫

প্রিয় কালীকৃষ্ণ,*

তোমার ১৫ তারিখের দীর্ঘ পত্র এই সেদিন আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তুমি মঠে যাইবার পর যদিও তোমার নিকট হইতে এই প্রথম পত্র নয়, তবু তোমার পত্র বেশ দীর্ঘদিন পরেই আমি পাইলাম।

অবশ্য তোমার এরূপ দীর্ঘ নীরবতার—যাহাকে তুমি নিজেই রহস্যজনক বলিয়াছ—কারণ অনুমান করিতে পারি নাই।

যাহা হউক, তুমি এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল বোধ করিতেছ তোমার পত্র হইতে তাহা জ্ঞাত হইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার পুনরায় সাধনজীবন অনুসরণের সংকল্প প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ তুমি যখন এবার পরিমিতভাবে এবং পূর্বের অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তার সাহায্য লইয়া একার্যে অগ্রসর হইয়াছ। কিন্তু তুমি রাখাল মহারাজের সান্নিধ্যে থাকিয়া ইহা চেষ্টা করিতেছ না কেন? তিনি তো তোমাকে খুবই স্নেহ করেন এবং পছন্দ করেন। আমার মনে হয় মহারাজের নির্দেশ অনুসারে তাঁহারই সান্নিধ্যে সাধন অভ্যাস করিলেই তোমার পক্ষে সর্বোত্তম হইবে।...

আমি দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে, এখানে আমার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তুমি জান, এখানকার আবহাওয়া খুব ভাল, অথচ আমি এখানে এমনকি কয়েক সপ্তাহও ভালভাবে স্বাস্থ্য ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। সম্প্রতি সারা শরীরেই ছোট ছোট ফোঁড়া হওয়ায় খুবই কষ্ট পাইলাম। এখনও উহাদের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তিলাভ করি নাই।

আমি কখন এই স্থান ত্যাগ করিব এবং কোথায় যাইব সেই বিষয়ে কিছুই বলিতে পারি না, যেহেতু আমি নিজেই তাহা জানি না। শুনিতেছি রাখাল মহারাজ বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশে [এদিকে] আসিতে পারেন, তখন তুমি তাঁহার সঙ্গে আসিতে পার তো?...

ইচ্ছা করিলে তুমি এখানে থাকিতে পার এবং সেই সঙ্গে তোমার সাধনভজন চালাইয়া যাইতে পার। স্থানটি বাস্তবিকই অতি সুন্দর এবং সাধনার পক্ষে পরম অনুকূল। তোমাকে এখানকার সকলেই খুব ভালও বাসে। মা এবার তোমার প্রচেষ্টা সার্থকতায় মণ্ডিত করুন। রাখাল মহারাজ সহ মঠের অন্যান্য সকলে ভাল আছেন জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহাদিগের সকলকে আমার অভিনন্দন ও ভালবাসা জানাইও। এখানকার সকলে ভাল আছে; তাহারা তোমাকে তাহাদের ভালবাসা জানাইতেছে। ভারতী-সম্পাদিকা সরলাদেবী প্রায় একমাস হইল এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা সমগ্র শীতকালটা এখানে অতিবাহিত করেন। এই স্থান তাঁহার খুবই ভাল লাগিতেছে, তিনি বলিতেছেন। বিলম্বে অথবা শীঘ্র তুমি আমেরিকা যাইতে রাজি হইয়াছ জানিয়া আমি খুশি হইয়াছি। তুমি কৃতকার্য হও। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিও।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

* স্বামী বিরজানন্দ। চিঠিটি ইংরেজীতে লেখা।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন।

প্রবন্ধ

'রামচরিতমানস'-এ ভরতের

স্বামী পুরাণানন্দ

অশুভ শক্তিকে দলন করে সমাজে ধর্মস্থাপনের প্রয়োজনে এবং পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনে প্রস্থিত হয়েছেন এবং ক্রমে মুনিজনসেবিত চিত্রকূট পর্বতে এসে সুখে কালাতিপাত করছেন।

এদিকে রামগতপ্রাণ ভরত গুরু বশিষ্ঠের জরুরী তলব পেয়ে শীঘ্র মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় ফিরে উদ্ভূত মর্মান্তিক পরিস্থিতির কথা শুনে নিতান্ত ব্যথিত ও হতবাক্ হলেন। প্রস্তাবিত রাজ্যাভিষেকের স্থানে শ্রীরামের চোদ্দবছরের জন্য বনবাস এবং তাঁর নিজের রাজপদপ্রাপ্তি—উভয়ই ভরতের কাছে একান্ত অসহনীয় ও অকল্পনীয় বোধ হলো।

তাই প্রাণপ্রিয় শ্রীরামচন্দ্রকে বন থেকে ফিরিয়ে আনতে সদলবলে রওনা হয়ে ভরত ক্রমে প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে এসে তাঁকে দর্শন করলেন। মুনিবর ভরতের এই সপ্রেম ও সৌজন্যপূর্ণ প্রচেষ্টায় প্রসন্ন অনুমোদন জানিয়ে বললেন: "ভরত, একথা সত্য জেনো, শ্রীরঘুবরের চরণে প্রেম জগতে যথার্থ কল্যাণের মূল।" মুনিবর আরও বললেন: "সেই শ্রীরামই তো তোমার একমাত্র ধন, তোমার জীবন ও প্রাণতুল্য; তোমার মতো ভাগ্যবান আর কে আছে? আর এও সত্য জানবে যে, জড়বুদ্ধি, অজ্ঞাননিদ্রায় সুপ্ত, বিষয়াসক্ত মানুষের মনে বিষয়-সুখের প্রতি যেমন তীব্র ও দুর্নিবার আকর্ষণ থাকে, শ্রীরামচন্দ্রও তেমনি সুগভীরভাবে তোমার প্রতি স্নেহসম্পন্ন।" অনন্তর ভরত ভরদ্বাজকে প্রণামান্তে বিদায় নিয়ে চিত্রকূট পর্বত অভিমুখে যাত্রা করলেন—সঙ্গে নিষাদরাজ গুহক ও অন্যান্যরা।

রামচিন্তায় তন্ময় ভরতকে চিত্রকূটের পথে এগিয়ে যেতে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র এই ভেবে শঙ্কিত হলেন যে, ভরতের প্রেমাকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে ভক্তবৎসল শ্রীরাম বুঝি বা তাঁর আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য রাবণ-বধ বিস্মৃত হয়ে ভরতের সঙ্গে অযোধ্যায় ফিরে যাবেন। তাই শংকাব্যাকুল হৃদয়ে ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন: "হে প্রভু, এমন কোন উপায় অবলম্বন করুন, যাতে শ্রীরামের সঙ্গে ভরতের মিলন না হয়; কেননা আপনি তো জানেন, শ্রীরাম ভক্তিপ্রিয়, সর্বদা প্রেমের বশীভূত; আর ভরতকে দেখুন, যেন প্রেমপাথার। এযাবৎ আমাদের চেষ্টায় প্রস্তাবিত রামরাজ্যাভিষেক বানচাল করতে যাকিছু করা হয়েছে, সবই তো দেখছি এখন পণ্ড হবার মুখে!"

দেবরাজের কথা শুনে বৃহস্পতি মৃদু হেসে ভাবলেন, সহস্রলোচন থেকেও ইন্দ্র বাস্তবিকই অন্ধ। তিনি বললেন: "দেবরাজ, আমাদের স্বার্থে কৈকেয়ীর বুদ্ধিভ্রংশ করারূপ ছলনা আমরা করেছি। কিন্তু এখন রামচন্দ্রের দর্শনব্যাকুল ভক্ত ভরতের সঙ্গে তাঁর (শ্রীরামের) মিলনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে আমরা নিশ্চয়ই শ্রীরামের কোপভাজন হব। মায়াপতি রঘুনাথের স্বভাব তুমি জ্ঞাত নও দেবরাজ! তাঁর প্রতি কৃত অপরাধের জন্য তিনি রুষ্ট হন না, কিন্তু তাঁর ভক্তাপরাধী তাঁর রোষানলে ভস্মীভূত হয় জেন।

"আরও শোন, সংসারে বুদ্ধিমান, যথার্থ স্বার্থজ্ঞান-কুশল ব্যক্তি 'রাম' নাম জপ করে; আর স্বয়ং শ্রীরাম জপ করেন ভরতের নাম। সত্য জেন দেবরাজ, ভরতের মতো স্নেহাস্পদ রামের আর কেউ নেই। যদিও রাম সমদর্শী, কারও প্রতি অনুরক্ত বা কারও প্রতি বিরক্ত নন তিনি, কারও পাপ-পুণ্যও তিনি গ্রহণ করেন না—তবু শ্রীরাম এই সংসারকে কর্মাধীন করে রেখেছেন, অর্থাৎ কর্মানুযায়ী মানুষ ফললাভ করছে। তবে একথা সত্য যে, ভক্ত ও অভক্তের প্রতি তাঁর আচরণে তারতম্য

দৃষ্ট হয়। তিনি সদা নির্লিপ্ত, মানাপমান-রহিত, সর্বদা একরস এবং ত্রিগুণাতীত, কিন্তু ভক্তের প্রেমের আকর্ষণে তিনি সগুণ হয়েছেন। সুতরাং দেবরাজ, ভরতের বিরুদ্ধে কুটিলাচরণের চিন্তা মনে স্থান দিও না, বরং তাঁর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন কর। শ্রীরাম সর্বদা সত্যের মর্যাদা রক্ষা করেন এবং তিনি দেবতাদের হিতকারী (অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের মুখ্য প্রয়োজন রাবণ-বধ তিনি অবশ্যই সিদ্ধ করবেন)।"

দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশে দেবরাজ ইন্দ্রের অমূলক শঙ্কা দূরীভূত হলো।

এদিকে চিত্রকূটের পথে চলতে চলতে ক্রমে ভরত সদলবলে যমুনাতটে এলেন; যমুনার শ্যাম-বর্ণ জল দর্শনে প্রিয়তমের বিরহ-ব্যথা উদ্দীপিত হয়ে ভরতের নেত্র অশ্রুসিক্ত হলো। তবে অচিরেই তাঁর দর্শনলাভ করবেন—এই ভরসায় তদ্গত চিত্তে তিনি এগিয়ে চললেন। আরও কিছু পথ অতিক্রান্ত হলে নিষাদরাজ গুহক ভরতকে দূর থেকে চিত্রকূট পর্বত দেখালেন, যেখানে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বাস করছিলেন। চিত্রকূট পর্বত দর্শন করে সদলবলে ভরত 'জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্রের জয়' বলে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। সকলেই তখন রাম-স্মরণজনিত প্রেমরসে এমন পুলকিত হলেন, মনে হলো যেন শ্রীরাম তাঁদের সঙ্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করছেন। 'আমি ও আমার'-ভাবে মলিনচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যেমন ব্রহ্মানন্দলাভ সুদূরপরাহত, তেমনি কল্পনা-কুশল কোন কবির পক্ষেও ভরতের সেই সময়ের প্রেমবিহ্বলতার পরিমাপ ও বর্ণনা করা সুদুষ্কর।

ক্রমে চিত্রকূট পর্বতের অনতিদূরে পৌঁছাতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল দেখে ভরত রাত্রের মতো বিশ্রাম করতে যাত্রা স্থগিত করলেন এবং পরদিন প্রভাতে আবার যাত্রা শুরু করলেন।

এদিকে শ্রীরাম চিত্রকূটে নিশাবসানের পূর্বেই জাগ্রত হয়েছেন। গতরাত্রে দৃষ্ট এক স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে সীতা তাঁকে বললেন: "দেখলাম যেন তোমার বিরহতাপে তপ্ত ভরত সদলবলে এখানে এসেছেন, সকলেই যেন বিরহ-ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে রয়েছেন। মায়েদেরও দেখলাম, কিন্তু ভিন্ন বেশে (বৈধব্য বেশে)।" স্বপ্নের কথায় রামের নয়ন অশ্রুসিক্ত হলো। "ভয়ে সোচবস সোচবিমোচন" যে-রাম সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রাতিকূল্য দূর করে শরণাগত ভক্তকে চিন্তামুক্ত করেন, তিনিই আজ স্বপ্ন-বিবরণ শুনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন! লক্ষ্মণকে রাম বললেন: "দেখ লক্ষ্মণ, এ স্বপ্ন শুভ নয়, কোন নিদারুণ দুঃসংবাদ অচিরেই আমাদের শুনতে হবে।" অতঃপর দুই ভাই স্নানান্তে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করে মুনিবৃন্দের পাদবন্দনা করলেন। তারপর আকাশে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, আকাশ ধূলিময় হয়েছে; পশুপাখি সব যেন ত্রস্ত হয়ে তাঁদেরই বাসস্থানের দিকে আসছে। সহসা এ দৃশ্য দেখে রাম কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও ব্যস্ত হয়ে ভাবলেন, এর কারণ কি? এমন সময় পর্বত-নিবাসী কোল-ভীলেরা এসে তাঁকে ভরতের আসন্ন আগমন-বার্তা জানাল। শুনে সস্নেহ প্রসন্নতায় তাঁর চিত্ত পূর্ণ হলো, শরীরে পুলক এবং তাঁর কমলনয়ন প্রেমাশ্রুপূর্ণ হলো। তবে চিন্তিত হয়ে রাম ভাবলেন, ভরত কেন আসছে? এমন সময় একজন এসে বললেন, ভরত একা নন—তাঁর সঙ্গে চতুরঙ্গী সেনাও আসছে। একথা শুনে রাম সবিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ভরতের স্বভাব এবং নিজের বনগমনের উদ্দেশ্য অন্তর্যামী শ্রীরাম ভালই জানতেন; তাই এই ভেবে তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, রাবণ-বধার্থ আমার বনগমন তো অনিবার্য, কিন্তু অযোধ্যায় ফিরে যাবার জন্য ভরতের প্রীতিপূর্ণ আব্দার উপেক্ষা করাও সহজ হবে না নিশ্চয়ই। তবে তাঁর এ ভরসাও ছিল যে, ভরত সর্বদা তাঁর অভিপ্রায়ের মর্যাদা রক্ষা করেন। নিজের আকাঙ্ক্ষার পূর্তি অপেক্ষা সর্বাবস্থায় শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায়-পূর্তি ভরতের কাছে অধিকতর মহনীয় ও তৃপ্তিকর—একথা জানতেন বলে শ্রীরাম স্বস্থমনা হলেন।

এদিকে ভরতের আগমন-সংবাদে রামকে চিন্তান্বিত দেখে লক্ষ্মণ বললেন: "সেবকের ধৃষ্টতায় কুপিত হবেন না প্রভু। কেননা জিজ্ঞাসিত না হয়েও সময়বিশেষে সেবক কিছু বললে তা ধৃষ্টতা বলে গণ্য হয় না। তাই যদিও আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি কিন্তু তবু ভরতের আগমন বিষয়ে কিছু বলছি।" অতঃপর লক্ষ্মণ বললেন:

"হে নাথ, আপনি সকলের সুহৃদ, সরলহৃদয় এবং শীল ও স্নেহের আলয়। সকলেই আপনার স্নেহাস্পদ, বিশ্বাসও করেন সকলকে এবং অপরকে আপনি নিজের মতোই মনে করেন। কিন্তু মোহমুগ্ধ বিষয়ী জীব ক্ষমতা পেয়ে স্বীয় স্বরূপ প্রকট করে। ভরত নীতিপরায়ণ, সাধু ও জ্ঞানী ; আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাঁর অনুরাগও জগৎবিদিত। কিন্তু দেখুন, এখন ভরতও রাজপদ পেয়ে আজ ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন করেছে। আজ দেখুন সে কুটিল হয়েছে। তাইতো আপনার বনবাসের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সদলবলে এখানে আসছে তাঁর সদ্যলব্ধ রাজ্য নিষ্কণ্টক করতে। ভরতের মনে এই কুটিলতাই যদি না থাকবে, তবে সঙ্গে সে এত সেনা কেন এনেছে? অবশ্য শুধু ভরতেরই বা কি দোষ? কেননা রাজপদ পেয়ে, ক্ষমতা লাভ করে কে না সংসারে প্রমত্ত হয়? সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুন, দেবরাজ ইন্দ্র, ত্রিশঙ্কু—এঁদের মধ্যে কার জীবন রাজপদলাভজনিত মত্ততায় কলঙ্কিত হয়নি? এক-দিক থেকে বলতে গেলে ভরত অবশ্য ঠিকই করেছে, কেননা কথায় বলে, শত্রু ও ঋণের অনুমাত্রও শেষ রাখতে নেই। তবে হ্যাঁ, অসহায় ভেবে আপনাকে অনাদর ও অবজ্ঞা করবার দুঃসাহস করে ভরত ভুল করেছে। রণভূমিতে আপনার রোষদীপ্ত বদন দেখে ভরত নিজেই আজ একথা বুঝবে।"

এইভাবে বলতে বলতে লক্ষ্মণের অন্তরে ক্ষত্রিয়োচিত বীররস উদ্দীপিত হলো, শরীরে রোমাঞ্চ হলো। তিনি আবার বলতে লাগলেন: "হে নাথ, আমার কথায় অপ্রসন্ন হবেন না ; ভরত কিন্তু আমাদের কম জ্বালাতন ও অপমান করেনি। আপনি সঙ্গে আছেন, হাতে আমার ধনুর্বাণও আছে। বলুন, জীবন্মৃত হয়ে কত আর সহ্য করব? আমরা ক্ষত্রিয়, রঘুকুলে জন্ম আর আমি আপনার সেবক। সকলেই তা জানে। বলুন, আর কত সহ্য করা যায়? সকলের পদতলে যার স্থান, পথের সেই ধুলোও সজোরে পদাঘাত করলে (যেন প্রতিবাদে) আঘাতকারীর মাথায় ওঠে!"

একথা বলে লক্ষ্মণ বীরভাবের আবেশে দাঁড়িয়ে করজোড়ে শ্রীরামের আজ্ঞা ভিক্ষা করলেন ; মাথার জটা কষে বাঁধলেন, কাঁধে তূণীর এবং হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে বললেন: "আজ আপনার সেবক হবার যশ লাভ করব, ভরতকে সমরে সমুচিত শিক্ষা দেব। শ্রীরামচন্দ্রকে অবজ্ঞা করার অবশ্যম্ভাবী ফল—সমর-শয্যায় চিরশয়ন, ভরত ও শত্রুঘ্ন আজ তা লাভ করবে। মৃগরাজ সিংহ যেমন হস্তীকে পর্যুদস্ত করে, প্রবল বাজপাখী যেমন ক্ষুদ্র পক্ষীকে এক ঝাপটায় স্ববশে আনে, তেমনিভাবে ভরত ও শত্রুঘ্নকে সেনাসমেত সমরভূমিতে অবশ্যই দলন করব। যদি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবও তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন, তবু শ্রীরামের শপথ নিয়ে বলছি, দু-ভাইকে অবশ্যই বিনাশ করব।" লক্ষ্মণের শপথ শুনে সমগ্র জগৎ ভীত হলো এবং তাঁর বিপুল বাহুবলের প্রশংসা করে দৈববাণী হলো—"হে তাত, তোমার প্রতাপ এবং প্রভাব কে বর্ণনা করতে পারে? কিন্তু সকল কাজের ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিবেচনা করে অনুষ্ঠান করলে সেই কর্মী প্রশংসিত হন। অকর্তব্য কোন কর্ম হৃদয়াবেগে সহসা অনুষ্ঠান করে পরে যে পশ্চাত্তাপ করে, জ্ঞানী ব্যক্তি ও শাস্ত্র তাকে পণ্ডিত বলেন না।"

এই দৈববাণী শুনে লক্ষ্মণ লজ্জিত হলেন, কিন্তু রাম ও সীতা সাদরে অভিনন্দন করে লক্ষ্মণকে বললেন: "লক্ষ্মণ, তুমি যথার্থই বলেছ, রাজ্য-লাভজনিত যে মত্ততা, ক্ষমতালাভে মনুষ্য-মনে যে-অহঙ্কার হয় তা সত্যই দুরপনেয়। তবে কখনো যে সাধুসঙ্গ করেনি এমন ব্যক্তিই রাজপদরূপ মদিরায় প্রমত্ত হয়। শোন লক্ষ্মণ, ভরতের মতো উত্তম পুরুষ বিধাতার সৃষ্টিতে কেউ কখনো দেখেওনি, শোনেওনি। অযোধ্যায় রাজসিংহাসন তো তুচ্ছ কথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বরের পদলাভ করলেও ভরতের কখনো অহঙ্কার হবে না জেন। অম্ল জলবিন্দু কি ক্ষীরসমুদ্রকে নষ্ট করতে পারে? মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যকে বরং অন্ধকার গ্রাস করতে পারে, মহাকাশ বরং মেঘে বিলীন হয়ে যেতে পারে, এমনও হতে পারে, গোষ্পদবারিতে মহামুনি অগস্ত্য নিমজ্জিত হয়ে গেলেন, পৃথিবীও তার সহজ ক্ষমা বা সহনশীলতা ত্যাগ করতে পারে, মশকের ফুৎকারে মেরুপর্বত স্থানচ্যুত হলেও হতে পারে, কিন্তু জেন লক্ষ্মণ, ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তিজনিত অহঙ্কার কখনো হবে না। সত্য বলছি, ভরতের মতো পবিত্রহৃদয়

ভাই হয় না। গুণরূপ দুধ ও দোষরূপ জল মিশিয়ে বিধাতা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন সত্য, কিন্তু তিনি সূর্যবংশরূপ সরোবরে ভরতরূপ হংসও সৃজন করেছেন, যে দুধ থেকে জল পৃথক করে দিয়েছে। তাই ভরতের হৃদয়ে ঘৃণ্য, মোহময় স্বার্থপরতার কোন স্থান নেই। একথা নিশ্চিত জেন লক্ষ্মণ।" এইভাবে ভরতের মহিমাকীর্তনরত শ্রীরাম যেন স্নেহরসে মগ্ন হলেন।

দেবতারা ভরতের ওপর রামের সুগভীর প্রীতি-পূর্ণ আস্থা দেখে রামের গুণগ্রাহিতার প্রশংসা করে বললেন: "যদি জগতে ভরতের জন্ম না হতো তাহলে ধর্মনিষ্ঠা, সুনীতিনিষ্ঠা, সদ্ভাব-নিষ্ঠার ভার আর কে বহন করত? হে রঘুনাথ, কবি-কল্পনারও অগম্য ভরতের মহিমা আপনি ছাড়া আর কে জানে?"

এদিকে ভরত সদলবলে মন্দাকিনীর পবিত্র সলিলে স্নান করে শত্রুঘ্ন ও গুহকসহ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হতে চললেন। জননী কৈকেয়ীর নীচতার কথা স্মরণ করে এবং নিজেকে এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত মনে করে ভরতের মনে এই শঙ্কা হচ্ছিল যে, তিনি আসছেন শুনে শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণসহ চিত্রকূট ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাননি তো? ভরত ভাবছেন—"মলিনমনা ভেবে রাম আমায় ত্যাগ করতে পারেন; আবার অনুগামী সেবক জেনে আদরও করতে পারেন—যাই করুন তিনি, তবে আমার তো একমাত্র শরণ শ্রীরামের চরণযুগল।" জননীর দুষ্কৃতির স্মৃতি ভরতের গতি কখনো শ্লথ করে তুলছিল, আবার প্রেমের আকর্ষণ কখনো তাঁর গতিবেগ ত্বরান্বিত করছিল। ক্রমে ভরত শ্রীরামচন্দ্রের কুটিরের কাছাকাছি উপস্থিত হলেন। চিত্রকূট পর্বতের অপরূপ শোভা দর্শন করে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনে হলো, শ্রীরামের অবস্থানের জন্যই এমনটি হয়েছে। ভরত দেখলেন, পর্বতের উঁচু দেশ থেকে সুন্দর নির্ঝরিণীর জল অবিরাম ঝরে পড়ছে, মত্ত হস্তীর ডাক শোনা যাচ্ছে; চখা, চকোর, চাতক, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিকুলের আনন্দমধুর কুজনধ্বনি কানে আসছে। বাঘ, সিংহ, বৃষ প্রভৃতি পশু পরস্পর বৈরীভাব ভুলে নির্ভয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করছে। ভ্রমরের গুঞ্জন, ময়ূরের নৃত্য স্থানের শোভাবর্ধন করছে; বৃক্ষলতাদিও ফলফুলে ভরা। চিত্রকূটের এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরতের হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হলো।

অনন্তর গুহক পর্বতের কিছু ওপরে উঠে ভরতকে বললেন: "হে নাথ, ঐ দেখুন আম, জাম, তমাল বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে নদীতীরে বিশাল এক বটবৃক্ষও নয়নগোচর হচ্ছে; তারই স্নিগ্ধ, শীতল ছায়ায় ঐ দেখুন শ্রীরামের পর্ণকুটির। ঐ বটগাছের নিচে সীতাদেবী কেমন সুন্দর এক বেদি স্বহস্তে নির্মাণ করেছেন, তাও দেখুন। চিত্রকূট-নিবাসী মুনিবৃন্দসহ শ্রীরাম ও সীতাদেবী ঐ বেদির ওপর বসে নিত্য শ্রীহরিগুণগান শ্রবণ করেন।"

সখা গুহকের কথায় ভরত বৃক্ষরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করায় তাঁর নয়ন প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হলো। এগিয়ে যেতে যেতে স্থানে স্থানে রামপদচিহ্ন দেখে ভরত ও শত্রুঘ্ন পরমানন্দ লাভ করলেন—যেন দীন ভিখারি পরশপাথর লাভ করেছে! ঐসকল স্থানের ধূলি উঠিয়ে ভরত মস্তকে ও নেত্রে স্পর্শ করিয়ে যেন শ্রীরামের সঙ্গে মিলনজনিত পরম সন্তোষ লাভ করলেন। ক্রমে সমুদয় মঙ্গলের আলয় শ্রীরামের পর্ণকুটির নয়নগোচর হলো। কুটিরের সম্মুখে আসতেই ভরতের সমস্ত দুঃখদাহ নির্বাপিত হলো—কোন যোগী যেন দীর্ঘকাল-বাঞ্ছিত পরমার্থলাভ করলেন। ভরত দেখলেন, শ্রীরাম বল্কল-বস্ত্র পরিহিত; তাঁর মাথায় জটা, কাঁধে তূণীর, হাতে বাণ ও স্কন্ধে ধনু এবং মুখে সদাপ্রসন্নতার দ্যোতক মধুর হাসি। অদূরেই রাম-সান্নিধ্যে মুনিবৃন্দ তৃপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। তখনো শ্রীরাম ভরত বা নিষাদকে দেখেননি—তিনি লক্ষ্মণের কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন প্রীতিসহকারে।

শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের দর্শনে ভরত সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক বিস্মৃত হলেন এবং "রক্ষা কর নাথ, রক্ষা কর" বলতে বলতে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হলেন। লক্ষ্মণ রামকে বললেন: "ভাই ভরত আপনাকে প্রণাম করছেন।" ভরত এসেছেন শুনেই শ্রীরাম প্রেমে অধীর হয়ে উঠলেন। দণ্ডবৎ পতিত ভরতকে শ্রীরাম জোর করে উঠিয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। সুগভীর প্রেমপূর্ণ এই মিলনের

মাধুর্য অবর্ণনীয়। অনন্তর শ্রীরাম পরম প্রীতির সঙ্গে ক্রমে শত্রুঘ্ন ও গুহককে আলিঙ্গন করলেন। লক্ষ্মণও ভরতকে প্রণামান্তে আলিঙ্গন করলেন। পরে শত্রুঘ্ন ও ভরত আনন্দবিহ্বলতা সহ সীতার চরণে প্রণত হলেন, সীতা সস্নেহে তাঁদের মস্তক স্পর্শ করে প্রাণভরা আশীর্বাদ জানালেন। সীতাকে স্নেহপূর্ণ দেখে ভরত দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন। তখন সকলের মন প্রেমরসাস্বাদনে এমনই নিমগ্ন হলো যে, সকলেই নির্বাক হয়ে রইলেন। নিষাদরাজ গুহক তখন আত্মসম্বরণ করে রামকে প্রণাম করে বললেন: "হে নাথ, আপনার অদর্শনে ব্যাকুল আপনার মাতৃবৃন্দ, অযোধ্যার পুরবাসী, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই মুনিবর বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে এসেছেন।" শ্রীগুরুর নাম শুনে শীলসমুদ্র ধীর শ্রীরাম দ্রুতপদে গুরুদর্শনে চললেন। লক্ষ্মণ সহ শ্রীরাম গুরুপদে দণ্ডবৎ প্রণত হতেই বশিষ্ঠ তাঁদের উঠিয়ে প্রেমালিঙ্গন করলেন। তখন গুহক নিজের নাম বলে বিনয়বশতঃ কিঞ্চিৎ দূরে থেকেই বশিষ্ঠদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। রামসখা জেনে বশিষ্ঠ গুহককেও সপ্রেমে আলিঙ্গন করলেন। অযোধ্যা থেকে আগত সকলকেই দর্শন-ব্যাকুল জেনে করুণাধাম, অন্তর্যামী শ্রীরাম ক্ষণকালের মধ্যেই সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন।

মায়েদের মধ্যে রাম সর্বাগ্রে অনুতপ্ত কৈকেয়ীর সঙ্গে দেখা করলেন ও তাঁর চরণবন্দনা করে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য বিধাতাই দায়ী, তিনি (কৈকেয়ী) নন বলে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর রাম ও লক্ষ্মণ সুমিত্রার চরণবন্দনা করে কৌশল্যার কাছে গেলেন। কৌশল্যা উভয়কেই কোলে টেনে নিলেন, তাঁর অশ্রুজলে রাম ও লক্ষ্মণের গাত্র সিক্ত হলো।

বাঞ্ছিত মিলন ও প্রীতি-বিনিময়ের পর বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে দশরথের স্বর্গারোহণের কঠিন কথা শোনালেন। এই দুঃসংবাদে রাম গভীর মর্মপীড়া বোধ করলেন, লক্ষ্মণ ও সীতাও পিতৃবিয়োগের দুঃসংবাদে শোকে বিলাপ করতে লাগলেন। বশিষ্ঠের সান্ত্বনায় ধৈর্য অবলম্বন করে শ্রীরাম নিরম্বু উপবাসী থেকে যথোচিত নিয়মের অনুষ্ঠান করলেন।

ব্রতাদি পালনের পর দুদিন অতিক্রান্ত হলে শ্রীরাম বশিষ্ঠকে বললেন: "হে নাথ, লোকালয় থেকে দূরে এই নির্জন পর্বতে অযোধ্যা থেকে যাঁরা এসেছেন, সকলেরই নিতান্ত কষ্ট হচ্ছে দেখছি—কন্দ, ফলমূলই তো এখানে একমাত্র আহার্য; শত্রুঘ্ন সহ ভরত এবং মায়েদের দিকে বা অযোধ্যাপুরবাসীদের প্রতি যখন চেয়ে দেখছি তখন মুহূর্তকাল সময় আমার কাছে এক যুগের মতো দীর্ঘ ও দুঃসহ মনে হচ্ছে। তাই প্রার্থনা করি—যদি আপনার অনুমোদিত হয়—তবে সকলকে নিয়ে আপনি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করুন। তাছাড়া আপনি এখানে, রাজা (দশরথ) অমরাবতীতে; অযোধ্যা যে অনাথ হয়ে আছে নাথ।" বশিষ্ঠ বললেন: "রাম, তুমি ধর্মসেতু করুণাধাম, তাই এমন বলছ; কিন্তু দেখ, পুরবাসীদের এখনও তোমার সান্নিধ্যলাভের স্পৃহা তৃপ্ত হয়নি। তাই ভাবছি আরও দিন দুই এঁরা সকলেই এখানে থাকুন।"

এদিকে শ্রীরামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে কিনা—এই চিন্তায় ভরতের রাতে ঘুম নেই, দিনে ক্ষুধা নেই। পুষ্করিণীর জল শুষ্ক হলে কর্দমে আশ্রিত মাছ যেমন জলের অভাবে পীড়িত হয়, ভরতের অবস্থা সেইরূপ হলো। তিনি কেবল ভাবছেন, কি করে রামের রাজ্যাভিষেক হবে? কি করেই বা তাঁকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নেওয়া যাবে?

পরদিন শ্রীরামের কাছে এসে ভরত দেখলেন, সেখানে বশিষ্ঠদেব সহ ব্রাহ্মণ জ্ঞানিগুণিজন এবং অযোধ্যা থেকে আগত মন্ত্রী ও সভাসদেরা উপস্থিত আছেন। বশিষ্ঠ সকলকে সম্বোধন করে বললেন: "সূর্যকুলের সূর্যস্বরূপ রাজা রামচন্দ্র ধর্মধুরন্ধর এবং স্বতন্ত্র ভগবান; তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, বেদমর্যাদার রক্ষক, জগতের মঙ্গলের জন্যই তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি গুরু ও মাতাপিতার আদেশ পালনে তৎপর, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তাঁর ধর্ম। স্বার্থ, পরমার্থ, নীতি ও প্রীতির যথার্থ তত্ত্ব একমাত্র তিনিই জানেন। তাই বলি, শ্রীরামের অভিপ্রায়ানুসারে চলাতেই আমাদের সকলের কল্যাণ নিহিত। আপনারা সকলে জ্ঞানিগুণী—যা উচিত বিবেচনা করেন, তাই করুন। আমরা

সকলেই শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক এবং তাঁর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী; কি করে তা সম্ভব হবে বলুন।"

বশিষ্ঠের কথা সকলেরই মনঃপূত হলো, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূলে কোন উপায় কেউ প্রস্তাব করতে না পারায় করজোড়ে ভরত শ্রীগুরুকে বললেন: "হে নাথ, আপনার প্রসন্ন আশীর্বাদে সমস্ত অমঙ্গল বিধ্বস্ত হয় এবং মানুষ পরম কল্যাণ লাভ করে। আপনার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছার কাছে বিধাতার বিধানও দুর্বল। সেই আপনিও শ্রীরামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আমাদের কাছে উপায় জানতে চাইছেন—এ আমাদের দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই।"

বশিষ্ঠ বললেন: "ভরত তোমার কথা সত্য, কিন্তু জেন, সবই প্রভু শ্রীরামের কৃপায়ই হয়। সঙ্কোচ হলেও একটি কথা বলি, শুনে থাকবে, সর্বস্ব খোয়াবার আশঙ্কা দেখা দিলে পণ্ডিতেরা অর্ধভাগ ত্যাগ করেন বাকি অর্ধভাগ রক্ষার স্বার্থে। তাই ভাবছি, তুমি বরং শত্রুঘ্নকে নিয়ে বনে যাও; আর শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে চলুন।" ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়েই এই প্রস্তাবে বিশেষ প্রসন্ন হলেন এবং ভরত বললেন: "এ আপনার অতি উত্তম প্রস্তাব। চোদ্দবছর কেন আজীবন আমরা দুভাই সানন্দে বনবাস করব।"

অনন্তর বশিষ্ঠ সকলকে নিয়ে শ্রীরামের কাছে এলেন এবং বললেন: "ভরত, মাতৃবৃন্দ এবং প্রজাবর্গের যাতে হিত হয়, এমন কোন উপায় নির্দেশ কর।" শ্রীরাম বললেন: "নাথ, উপায় তো আপনারই হাতে—আপনার ইচ্ছার মর্যাদা রক্ষাতেই তো আমাদের সকলের কুশল নিহিত। আপনি আমায় যা আজ্ঞা করবেন, আমি তাই শিরোধার্য করব।" বশিষ্ঠ বললেন: "তুমি ঠিকই বলেছ রাম, কিন্তু কি জান, ভরতের ভক্তি আমার বিচারবুদ্ধিকে যেন স্তব্ধ করেছে। আমার বিশ্বাস, ভরতের রুচির মর্যাদা রেখে যা করা হবে, তাইতেই সকলের মঙ্গল হবে। তুমি ভরতের সবিনয় নিবেদন সস্নেহে শ্রবণ করে ভেবে দেখ এবং যা সর্বজনহিতকারী ও শাস্ত্রসম্মত, তাই কর।"

নিজের পরম স্নেহাস্পদ ভরতের ওপর গুরু বশিষ্ঠের স্নেহের গভীরতা দেখে শ্রীরাম পরম সন্তোষ লাভ করলেন এবং বললেন: "সত্য বলছি, ভরতের মতো ভাই সংসারে হয় না। তাছাড়া, যার ওপর আপনার এমন প্রসন্ন আনুকূল্য, তার সৌভাগ্যের কথা বলে কে শেষ করতে পারে?"

অনন্তর মুনিবর বশিষ্ঠ ভরতকে বললেন: "সমস্ত সঙ্কোচ ও দ্বিধা ত্যাগ করে কৃপাসিন্ধু ভাইকে হৃদয়ের কথা খুলে বল।" কিন্তু ভরত যখন দেখলেন গুরু ও প্রভু রাম উভয়েই তাঁর প্রতি অনুকূল এবং তাঁরই ওপর শ্রীরামের প্রত্যাবর্তন-বিষয়ক উপায় নির্ণয়ের দায়িত্ব এসে পড়েছে তখন তিনি নির্বাক হয়ে রইলেন। শরীরে পুলক ও আঁখিতে প্রেমাশ্রু দেখা দিল। শুধু বললেন: "শ্রীগুরুই তো আমার বক্তব্য নিবেদন করেছেন, অধিক আর আমি কি বলতে পারি? তবে একথা সত্য যে, সত্যের মর্যাদা রক্ষা করতেই পিতা দশরথ রাম-বিরহে গতাসু হয়েছেন, মায়েরা যেন শোকানলে দগ্ধ হচ্ছেন, পুরবাসী নরনারীও রাম-বিরহে দুঃসহ বেদনায় যেন জীবন্মৃত হয়ে রয়েছেন।"

শ্রীরাম বললেন: "ভরত, তোমাকে আমি ভাল-রূপেই জানি। রাজা (দশরথ) সত্যরক্ষার স্বার্থেই প্রাণপ্রিয় আমাকে ত্যাগ করে স্বর্গবাসী হয়েছেন, তাও জানি; কিন্তু তাঁর থেকেও তোমার দুঃখ আমার কাছে অধিকতর পীড়াকর। তোমায় বলছি ভরত, তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।" ভরত তখন বললেন: "নাথ, আমার মনে হয় আপনার অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনেই সকলের স্বার্থ নিহিত; তবে একথা সত্য যে, আপনার আজ্ঞাপালনেই আমাদের কল্যাণ। অনুমতি করুন, একটি প্রার্থনা নিবেদন করি এবং শুনে যদি উচিত মনে করেন তাহলে আজ্ঞা দিন। আপনার অভিষেকের জন্য যাবতীয় সামগ্রী আমরা সঙ্গে এনেছি, আপনি আদেশ দিলে এ শুভকার্য অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হতে পারি। আর দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, শত্রুঘ্ন সহ আমাকে বনে পাঠিয়ে, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ সহ আপনি অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে সকলকে সনাথ করুন। যদি ফেরা আপনার একান্তই অনভিপ্রেত হয় তবে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে অযোধ্যায় ফিরতে বলে আমাকে আপনার সঙ্গে নিন অথবা আপনার আদেশে আমরা তিনভাই বনে যাই আর আপনি সীতাদেবী

সহ ফিরে যান। তবে হে নাথ, আমার অন্তিম নিবেদন এই যে, আপনি যাতে প্রসন্ন হন তাই করুন। হে প্রভু, ইতি-কর্তব্য বিষয়ে আমার ওপর সব ভার অর্পণ করেছেন আপনি. কিন্তু আমি না বুঝি নীতি, না আছে আমার ধর্মবোধ—আমি শুধু স্বীয় স্বার্থসচেতন ; আর আর্তের পক্ষে বিবেকী হওয়াও তো সহজ নয়, নাথ। হে দয়াল, পরিশেষে আমার এই একমাত্র নিবেদন যে, আপনার যাতে প্রসন্নতা হয়, তাই করুন, আমাদের দিয়েও তা করান।"

তখন ধীর ও ধর্মধুরন্ধর শ্রীরাম বললেনঃ "বৎস ভরত, তুমি ধর্মভার বইবার উপযুক্ত—নীতিবোধেও তুমি প্রবীণ। কর্ম, বাক্য ও মনের নির্মলতায় তুমি অনুপম। সূর্যকুলের ঐতিহ্য, সত্য-প্রতিজ্ঞ পিতার কীর্তি সম্বন্ধেও তুমি অবহিত। এই সঙ্কটকালে আমার এবং তোমার পক্ষে অবলম্বনীয় আচরণ কি—সেবিষয়েও তুমি সংশয়াতীত, আমি নিশ্চিত। দেখ ভরত, পিতার অবর্তমানে সবকিছু শ্রীগুরুকৃপায় রক্ষিত হচ্ছে। জানবে ভরত, রাজকার্যে নিরত গৃহবাসী তোমাকে প্রজাবৃন্দ সহ শ্রীগুরুকৃপাই সতত রক্ষা করবে এবং বনবাসে আমাদের রক্ষাকর্তা শ্রীগুরুদেবই। পিতা-মাতা এবং গুরুর নির্দেশ পালনেই ধর্ম রক্ষিত হয়। বৎস ভরত, তুমি স্বয়ং তাই কর এবং আমাকে দিয়েও তা করাও। সূর্যকুলের মহান ঐতিহ্যের রক্ষক হও। আজ্ঞাপালনরূপে সাধনাই সাধককে সিদ্ধির শিখরে পৌঁছে দেয় ; তাইতেই কীর্তি, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য লাভ হয়। একথা ভেবে চোদ্দবছরের বিরহ-ব্যথার মর্মপীড়া দুঃসহ হলেও কর্তব্যের অনুরোধে প্রজাবর্গকে সুখী কর।"

শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে ভরতের সন্তোষ হলো। শ্রীপ্রভুর প্রসন্নতায় তিনি দুঃখাতীত হলেন— যেন দেবী সরস্বতীর কৃপায় মূক বাণীলাভ করলেন। প্রেমপূর্ণ অন্তরে ভরত শ্রীরামকে প্রণাম করে যুক্তকরে বললেনঃ "হে নাথ, আপনার প্রসাদে বনে আপনার অনুগামী না হয়েও সুখলাভ করলাম। আপনি যেমন আজ্ঞা দিলেন, সযত্নে তা পালন করব। তবে কৃপা করে আমায় এমন কিছু অবলম্বন দিন যার সেবায় নিরত থেকে আপনার অদর্শনের কাল সুখে উত্তীর্ণ হতে পারি।" দ্বিতীয় একটি নিবেদন জ্ঞাপন প্রসঙ্গে ভরত বললেনঃ "যদি আজ্ঞা দেন তবে এই চিত্রকূট পর্বতের পবিত্র তীর্থ, বন, নদী, সরোবর, বিশেষ করে আপনার পদস্পর্শে ধন্য স্থানগুলি অযোধ্যায় রওনা হবার পূর্বে দেখে আসি।" শ্রীরামচন্দ্র সানন্দে সম্মতি দিলে ভরত সদলবলে শ্রীরাম-স্পর্শপূত স্থানসকল দর্শনে নির্গত হলেন।

ভরত অনাবৃত চরণে যাচ্ছিলেন। পথের কাঁকড়, কাঁটা প্রভৃতির জন্য ভরতের কষ্ট যাতে না হয় তা ভেবে পৃথিবীদেবী তাঁর চলার পথ কোমল করে দিলেন। সুশীতল, মৃদুমন্দ, সুগন্ধ সমীরণ প্রবাহিত হতে থাকল। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন এবং আকাশে মেঘসঞ্চার করে প্রখর সূর্যকিরণ থেকে ভরতকে রক্ষা করলেন। পশুরা প্রীতিভরা নয়নে ভরতকে দেখছিল, পক্ষিকুল মধুর কূজন-ধ্বনিতে শ্রীরামগতপ্রাণ ভরতকে আপ্যায়িত করে তাঁর অনন্য রামভক্তির স্বীকৃতি দিল।

চিত্রকূটের তীর্থাদি দর্শনান্তে শ্রীরামের কাছে এসে ভরত করজোড়ে বললেনঃ "প্রভু, আপনি আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করেছেন। আমার জন্য সকলের অনেক কষ্ট হয়েছে, আপনারও দুঃখের কারণ হয়েছি আমি। এবার নাথ, আজ্ঞা করুন এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে চোদ্দবছর অযোধ্যার সেবা করি।" ভরতের পূর্ব-বক্তব্য মনোবাঞ্ছা স্মরণ করে শ্রীরাম তাঁকে একজোড়া পাদুকা দিলে ভরত তা সাদরে মাথা পেতে নিলেন।

যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকালাভে ভরতের এত তৃপ্তি হলো যে, তাঁর মনে হলো শ্রীরাম তাঁর সঙ্গেই অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছেন। পরে একান্ত ভক্তিভরে ভরত শ্রীরামচরণে প্রণত হলে শ্রীরাম তাঁকে উঠিয়ে গাঢ় ও দীর্ঘ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। অনন্তর ভরত সকলকে নিয়ে রওনা হলেন এবং ক্রমে অযোধ্যায় এসে পৌঁছালেন।

অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর শীঘ্রই একদিন শত্রুঘ্নকে নিয়ে ভরত গুরু বশিষ্ঠের গৃহে উপনীত হয়ে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণামান্তে নিবেদন করলেনঃ "হে নাথ, আপনার প্রসন্ন অনুমোদন পেলে ব্রত-নিয়মাদির অনুষ্ঠানসহ আমি এখন জীবনযাপন করতে অভি-লাষী।" বশিষ্ঠ বললেনঃ "বৎস, তোমার চিন্তা,

কর্ম ও ভক্তি জগতে ধর্মের সার বলে বিবেচিত হবে জেন।" শ্রীগুরুর অনুমোদন লাভ করে ভরত জ্যোতিষীদের ডেকে শুভ মুহূর্তের সন্ধান করলেন। তাঁদের পরামর্শানুযায়ী এক শুভদিনে তিনি রামপ্রদত্ত পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করলেন এবং স্বয়ং অযোধ্যার অনতিদূরে নন্দীগ্রামে পর্ণকুটির নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন।

তীব্র মনস্তাপের সঙ্গে ভরত প্রতি মুহূর্তে ভাবছেন যে, তাঁর জীবনসর্বস্ব রাজা রাম, আহার-বিহার ইত্যাদি সর্বব্যাপারে যাঁর পরম স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার কথা, তিনিই আজ দৈবপ্রতিকূলতায় বনে বনে অনাহারে, অনিদ্রায় কতই না ক্লেশের সম্মুখীন হচ্ছেন। এই বেদনাময় ও পীড়াকর চিন্তায়, সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-সুখের প্রতি ভরত একান্ত বীতস্পৃহ হয়ে উঠলেন। ভরতের শিরে তখন জটাজুট, পরিধানে বল্কলবস্ত্র এবং ভূমির ওপর কুশশয্যায় তাঁর শয়ন। শুধু তাই নয়—আহারাদি সর্বব্যাপারে ভরত বনবাসী, মুনিজনোচিত কঠোর জীবনযাপন করতে লাগলেন। দিন দিন তাঁর তনু ক্ষীণ হতে লাগল, কিন্তু রামভক্তিজনিত অন্তরের তৃপ্তিতে তাঁর মুখের প্রসন্নতা অপরিবর্তিতই রইল। গভীর প্রীতির সঙ্গে প্রতিদিন তিনি রাম-পাদুকার অর্চনা করতেন এবং রামের প্রতিভূ-রূপে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। নিরবচ্ছিন্ন রাম-ধ্যানের ফলে তাঁর শরীরে পুলক, জিভে রামনাম, হৃদয়ে শ্রীরাম এবং আঁখিতে প্রেমাশ্রু—এইভাবে তপোনিষ্ঠ হয়ে ভরত চোদ্দবছর কাটিয়েছেন।

তুলসীদাস বলছেন: "এমন ভরতের চরণে প্রণত হয়ে যিনি তাঁর অনুপম রামভক্তিময় জীবনের স্মরণ-মনন করেন, অনুশীলন করেন, তাঁর হৃদয় থেকে মোহজনিত বিষয়রস চিরতরে শুষ্ক হয় এবং তিনি যথার্থ শান্তিলাভের উপায়ভূত বৈরাগ্যধনে ধনী হন।" ☐

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির (মাঝে)। পিছনে—বিষ্ণুমন্দির/গোবিন্দজীর মন্দির/রাধাকান্ত-মন্দির। সামনে—কালীমন্দিরের নাটমন্দির; এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মথুরবাবুকে অনুরোধ করে পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় তিনি বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সমকালীন অগ্রগণ্য সাধক ও পণ্ডিতদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। বিচারসভায় সমবেত সাধক ও পণ্ডিতবর্গ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দিরের (দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছবি অবশ্য প্রচ্ছদে নেই।) অবস্থান বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু হিন্দুদের দিক থেকেই নয়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের দিক থেকেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি তাৎপর্য রয়েছে। মন্দিরের জমির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, বাকি অংশের অনেকটা জুড়ে ছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী সাহেবের পীরের দরগা। এই যোগাযোগ যেন দৈবনির্দিষ্ট। কারণ, এই ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে যুগাবতার মহাসমন্বয়ের উদার বাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। এই বাণীই আজ শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে। দেশ ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মত ও পথের অসহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে এই বক্তব্য আমরা তুলে ধরতে চাইছি।—**যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন**

ধরিত্রীর লক্ষ্মী

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

ধরিত্রীর গর্ভ থেকে
সমুদ্র-মন্থন করে
লক্ষ্মী উঠেছিলেন।
ধরিত্রী ও সমুদ্র কিন্তু লক্ষ্মীকে পায়নি,
দেবতারা তাঁকে মহাসম্মানে
নিয়ে গিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠে।
বৈকুণ্ঠ আলোয় আলো হয়ে গিয়েছিল,
কিন্তু ধরিত্রীর বুকে নেমে এসেছিল অন্ধকার,
সমুদ্রের হৃদয় হয়েছিল ব্যথায় খান্‌খান্‌।

আহা, সমুদ্র সেদিন কত কেঁদেছিল!
সমুদ্রের বুকে উথাল-পাথাল ঢেউ
মাতাল হয়ে উঠেছিল;
সে-ঢেউ আর থামলই না।
আসলে সে-ঢেউ তো কন্যাহারা পিতার
আর্তনাদ আর দীর্ঘশ্বাস।
শুধু কি পিতার?
মাতা ধরিত্রীরও কি কম দুঃখ?
সর্বংসহা ধরিত্রীর হৃদয় নিংড়ানো
দরবিগলিত অশ্রুই তো নিঃশব্দে নেমেছিল
গঙ্গা আর যমুনা হয়ে।

পিতার হাহাকার আর মাতার অশ্রু
দুয়ে মিলে একাকার হয়ে গেল।
তাতে মন্থিত হলো বৈকুণ্ঠ।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ থেকে
নেমে এলেন আমাদের
ধূলিমলিন পৃথিবীতে—
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য নিয়ে নয়,
ধরিত্রীর মাটি মেখে সারদার রূপে—
রূপ ঢেকে অপরূপা।
আমাদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পর্ণকুটিরে
নেমে এল বৈকুণ্ঠ।

সমুদ্রের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম:
"এখনো কেন তোমার বুকে
উথাল-পাথাল ঢেউ,
তুমি তো ফিরে পেয়েছ
তোমার কন্যাকে?"
সমুদ্র বলল: "না গো, এ আমার
আর্তনাদ নয়; এ আমার উচ্ছলতা,
আমি আনন্দে উচ্ছল—
আমার সারদা যে আমার
বুক ভরে রয়েছে।"

গেলাম গঙ্গা আর যমুনার উৎসমুখে।
দেখলাম ধরিত্রীর দু-চোখ বেয়ে
ঝর ঝর ধারা নামছেই।
ধরিত্রীকে বললাম:
"এখনো তুমি কেন কাঁদছ,
তোমার লক্ষ্মী তো
তোমার ঘরেই ফিরে এসেছে?"
ধরিত্রী বলল: "নাগো, এ অশ্রু
হারানোর বেদনায় নয়,
আমার ষোড়শীকে
ফিরে পাওয়ার আনন্দে।
আমার শূন্য ঘর যে
এখন কানায় কানায় পূর্ণ।"

গঙ্গা-যমুনার উৎসমুখ থেকে নেমে আসছি,
হঠাৎ দেখি—সারদা।
হিমালয় থেকেই সে নামছে সমতলে।
পরনে কস্তাপেড়ে শাড়ি,
বাঁ কাঁখে কলস, ডান হাতে সম্মার্জনী।
জিজ্ঞাসা করলাম: "কি করছ গা তুমি?"
ধরিত্রী-কন্যার স্থির গভীর আঁখিপল্লব
ঈষৎ কাঁপল যেন,
শান্ত কণ্ঠে সে বলল:
"সমুদ্র-মন্থনের সময় যে-গরল উঠেছিল
শিব নীলকণ্ঠ হয়েও
তা নিঃশেষ করতে পারেননি,
দেখছ না আজ গোটা পৃথিবীটাকেই তা
গ্রাস করতে চলেছে!

বিষ আজ শিবের কণ্ঠ থেকে
সর্বাঙ্গে প্রসারিত,
সহস্র যোজন বিস্তৃত শিবদেহ হিমালয় তো
সেই বিষেই কালো হয়ে গিয়েছে।
তাই তো শুধু নীলকণ্ঠ নয়, নীল-অঙ্গ হয়ে
সব বিষ শুষে নিয়ে সেদিন তিনি রক্তবমন
করছিলেন কাশীপুরে !
রক্তবমন করতে করতেই
আমাকে তিনি বললেন ঃ
'জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে,
তুমি জগৎকে দেখো।'
তাই তো আমি সম্মার্জনী হাতে
পৃথিবীকে গরলমুক্ত করতে নেমেছি।
সকল অমঙ্গল—আবর্জনা
আমি ঝাঁটিয়ে দূর করব।"
"তোমার কাঁখে কলস কেন ?"
সারদা বলল ঃ "এ হলো অমৃতকুম্ভ।
সমুদ্র-মন্থনের সময় উঠেছিল।
এই কলসের অমৃতবারি পল্লব দিয়ে
চারদিকে ছড়িয়ে পৃথিবীর সকল প্রাণীকে
শান্তি দেব, শীতল করব—
পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করব আমি।"
"তবে কি আমরা সবাই পূর্ণ হয়ে যাব ?
পৃথিবীর সবাই অমর হবে ?"
নীরবতার প্রতিমার ওষ্ঠাধর
মৃদু স্ফুরিত হলো।
অনাহত ওংকার-ধ্বনির মতো উৎসারিত হলো
পেলব অথচ স্পষ্ট কণ্ঠস্বর ঃ
"হ্যাঁ, বাছা, পূর্ণত্বই তো তোমাদের স্বরূপ,
অমৃতই তো তোমাদের সত্তা,
তোমরা তো পূর্ণেরই স্ফুলিঙ্গ,
তোমরা তো অমৃতেরই সন্তান।
মেঘের আড়ালে সূর্য যেমন থাকে ঢাকা,
তোমাদের স্বরূপও তেমনি
অজ্ঞানের আড়ালে রয়েছে ঢেকে।
তোমাদের স্বরূপের সন্ধান দিতে,
তোমাদের সত্তার আবরণ উন্মোচন করে দিতে,
তোমাদের পূর্ণ করতেই যে আমাদের আসা।"

কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শান্তি সিংহ

সংসার-অরণ্যে

সংসার-অরণ্যে যারা এগিয়েই যায়—
চন্দনের বন ক্রমে দেখা তারা পায়।
তাকেও ছাড়িয়ে গেলে রূপার যে-খনি
সেভাবেই ক্রমে আসে সোনা-হীরা-মণি !
অর্থ নয় পরমার্থ—সব সেরা ধন,
গভীর নিষ্কাম তত্ত্ব—প্রেমের কারণ।

সূত্র ঃ কলকাতায় বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়িতে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার হয় ৫ আগস্ট, ১৮৮২। বিকালে প্রায় ৪টা থেকে রাত প্রায় ৯টা অবধি প্রায় পাঁচঘণ্টাব্যাপী তাঁদের আলাপ হয়। বিদ্যাসাগর প্রথমদিকে সপ্রতিভ তির্যক কথা বললেও, তিনি ক্রমশঃ শ্রদ্ধাশীল ছাত্রপ্রতিম শ্রোতার ভূমিকা নেন। তখন 'জ্ঞানী' বিদ্যাসাগরকে 'বিজ্ঞানী'-আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ সহজভাবে বলেন ঃ "তুমি (বিদ্যাসাগর) যেসব কর্ম করছো, এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।...

"এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিছিল ; ব্রহ্মচারী বললে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দন গাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে, তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দনগাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি। আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তারপর কেবল হীরা, মানিক।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১।৬)

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আলোয়ারে শ্রীবিবেকানন্দ

শ্রীশ্রমণক

[পূর্বানুবৃত্তি]

'শ্রীশ্রমণক' স্পষ্টতঃ প্রবন্ধ-রচয়িতার ছদ্মনাম। মনে হয়, প্রবন্ধটি তৎকালীন উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দের লেখা। শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের নেপথ্যে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এবছর স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ-পূর্তি হচ্ছে। সেকথা স্মরণ রেখে এই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হলো।

যুগ্ম সম্পাদক

রামচন্দ্র আশ্চর্য হইয়া কহিলেনঃ "সে কি স্বামীজী? এ যে মহারাজের ছবি! এ আপনি কি বলছেন?"

স্বামীজী উত্তর করিলেনঃ "বেশ, মহারাজ তো আর এর ভিতর নেই। এ তো কেবলমাত্র একটুকরা কাগজ। এতে না আছে মহারাজের মাস, না আছে মহারাজের হাড়, না আছে মহারাজের রক্ত; চাল-চলন, কথা কিছুই তো নেই। এটা কেবল একটুকরা কাগজ আর মহারাজের একটু ছায়া। এই ছায়াটুকুর জন্যে আপনারা ভাবছেন যে, আমি যদি এতে থুতু দিই, তাহলে আপনাদের মনে কষ্ট হবে। ভাবছেন, মহারাজের অপমান করা হবে। এতে থুতু দিলে আপনাদের মনে হয়, যেন মহারাজের গায়েই থুতু দেওয়া হবে, মহারাজকেই অপমান করা হবে। তাই না?"

রামচন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া কহিলেনঃ "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো বটে!"

এইবার স্বামীজী মহারাজের প্রতি তাকাইয়া কহিতে লাগিলেনঃ "মহারাজ, এঁরা আপনার ভক্ত। এই কাগজ টুকরোতে আপনার হাড় মাস রক্ত চামড়া, হাবভাব, চালচলন কিছুই নেই; আপনার মতো এ কাগজটা হুকুমজারিও করে না। তবু এঁরা আপনার ভক্ত কিনা তাই এই কাগজ টুকরোকে ঠিক আপনার মতোই ভাবেন; এই ছায়াটুকু আছে বলে। এটাকে দেখলে আপনাকে মনে পড়ে, এমনকি, এইটাই আপনি মনে হয়। তাই আমি এর ওপর থুতু দিতে চাইলে এঁরা এত ঘাবড়ে অস্থির হয়েছিলেন। তেমনি, মহারাজ, ভক্তেরা যে দেব-দেবীর পাষাণ বা ধাতুমূর্তি গড়ে পুজো করেন, তা তাঁরা ধাতু বা পাষাণের পুজো করেন না। আমি এত দেশ তো বেড়িয়ে দেখলুম, কোথাও কাউকে 'ও পাষাণ, আমি তোমায় পুজো করছি, তুমি আমায় প্রতি সন্তুষ্ট হও'; কি, 'ও ধাতু আমি তোমায় পুজো করছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও'—এ বলে পুজো করতে দেখলুম না। সকলেই সেই চিন্ময় ঈশ্বরের পুজোই করে, ঐ পাষাণ ধাতুমূর্তি দেখলে সেই চিন্ময় কৃষ্ণকে মনে পড়ে, ঐ মূর্তি দেখে ভক্তরা আপনার আপনার ইষ্টকে মনে আনেন আর তাঁরই পুজো করেন। তবে আপনি যদি কোথাও পাষাণ বা ধাতুকে সম্বোধন করে পুজো করতে দেখে থাকেন তো, আমি তা জানি না।"

নিবিষ্টচিত্তে মঙ্গল সিংহ এই সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। স্বামীজীর কথা শেষ হইলে তিনি করজোড়ে কহিলেনঃ "না স্বামীজী, তা আমি কখনো দেখিনি। এসমস্ত এতদিন আমি কিছুই বুঝিনি। আজ আপনি আমায় জ্ঞানচক্ষু দিলেন। তা মহারাজ, আমার গতি কি হবে? আপনি আমায় কৃপা করুন।"

স্বামীজীঃ "কৃপা সেই এক ভগবানই করতে পারেন আর করে থাকেন। তাঁকে জানান, তাঁকে ডাকুন, তিনি নিশ্চয় কৃপা করবেন।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে বিদায় লইলেন। স্বামীজী প্রস্থান করিলে পর মঙ্গল সিংহ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ও স্থির হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেনঃ "দেওয়ানজী, এমন মহাত্মা তো কখনো দেখিনি। আপনার এখানে ওঁকে কিছুদিন রাখতে পারেন না?"

দেওয়ানজী উত্তর করিলেনঃ "বলতে পারি না মহারাজ, বড়ই তেজস্বী পুরুষ। তবে চেষ্টা

করব।" দেওয়ান রামচন্দ্র অনেক মিনতি করায় স্বামীজী তিন-চারিদিন তাঁহার আবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থিতি করিবার পূর্বেই বলিয়াছিলেন ঃ "দেওয়ানজী, আমার কাছে যে-সমস্ত ভদ্রলোকেরা সদাসর্বদা এসে থাকেন, তাঁরা যদি অবাধে এখানে এসে আমার সঙ্গে ইচ্ছামত দেখা-শোনা করতে পারেন তো আপনার ওখানে দু-চার দিন থাকবার আপত্তি নেই। কিন্তু যদি তাঁদের উতলা করে তবে আমার কাছে আসতে হয় তো আমি নাচার, থাকতে পারব না।" দেওয়ান রামচন্দ্র তাহাতেই স্বীকৃত হইলে তবে স্বামীজী তথায় আগমন করেন।

স্বামীজীর উপদেশে অনেকের জীবন একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং সকলেই তাঁহাকে এতই ভালবাসিতে লাগিলেন যে, তিনি স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে অনেকের মুখ বিশুষ্ক হইয়া গেল ; তাঁহারা বলিতে লাগিলেন ঃ "মহারাজ, দয়া করে আর কিছুদিন থাকুন, আপনাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না।" স্বামীজীর হৃদয় পুষ্প হইতেও কোমল, সুতরাং আর তাঁহার যাওয়া হইল না, অথচ এই প্রকারে প্রায় একমাসের অধিক এই স্থানে অবস্থিতি হইতেছে। একজন বৃদ্ধ প্রত্যহই তাঁহার নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন, আর স্বামীজী বলেন ঃ "কৃপা এক ভগবানই করতে পারেন, আমার কি সাধ্য ? আপনি তাঁর শরণাগত হউন।" বৃদ্ধকে যে-সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিতে বলেন, তিনি তাহা না করিয়া প্রত্যহ আসিয়া সেই একই প্রার্থনা করেন। একদিন স্বামীজী দূরে তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন ঃ "আজ একে বিদায় করতে হবে।" এই বলিয়া সেইখানে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে সেই বৃদ্ধ আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ; স্বামীজী কোনই উত্তর করিলেন না। অন্যান্য অনেকে তাঁহার সহিত যে-প্রকার বাক্যালাপ করেন, তদ্রূপ করিতে যাইয়া দেখিলেন, স্বামীজী একবর্ণেরও উত্তর করেন না। অনেকে ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রায় একঘণ্টা অতীত, স্বামীজী সেই একইভাবে উপবিষ্ট আর সেই বৃদ্ধ মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন ঃ "মহারাজ, আমায় কিছু করে দিন, আপনি না করে দিলে আমার কিছুই হবে না। আপনি কৃপা করুন বাবাজী।" স্বামীজী সেই একইভাবে রহিয়াছেন, কোন উত্তর নাই। আরও কিছুক্ষণ বৃদ্ধ ঐপ্রকার করিয়া শেষে স্বয়ং বিরক্ত ও রাগান্বিত হইয়া আপন মনে বকিতে বকিতে প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ প্রস্থান করিলে পর স্বামীজী বালকের মতো খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "বাবাজী, এ বুড়োর প্রতি এত কঠিন হলেন কেন ?"

প্রশ্নকার জনৈক যুবা। স্বামীজী সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন ঃ "বাবা, আমি তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা বালক, যা বলব প্রাণপণে করতে চেষ্টা করবে, আর করতেও পারবে। এরা বুড়ো, জীবনের পনের আনা তিন পাই সময় সংসারের কীট হয়ে থেকে তারপর যা উপদেশ দেব তা এক তিলও করবে না ; পুরুষকার একেবারেই নেই। যার পুরুষকার নেই তাকে কি ভগবান কৃপা করেন ? অর্জুন পুরুষকার হারিয়ে কাপুরুষ হয়ে পড়েছিলেন, তাই না শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা বলে তাঁর পুরুষার্থ জাগিয়ে দিলেন, কর্ম, স্বধর্ম করালেন। যার পুরুষার্থ নেই, সে তো তমোগুণী! তমোগুণীর কি ধর্ম হয় ? তাকে পুরুষার্থ অবলম্বন করে রজোগুণী হতে হবে ; স্বধর্ম পালন, নিষ্কাম কর্ম করতে করতে সত্ত্বগুণী হবে, তবে ধর্ম হবে। যে-গৃহী স্বধর্মই করতে পারে না, কোনপ্রকার নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করে না, তার নিবৃত্তি আসবে কেমন করে ? প্রবৃত্তি না থাকলে কি শেষে নিবৃত্তি আসে ? ও চায় নিবৃত্তি, এদিকে প্রবৃত্তির কোন কাজেরই অনুষ্ঠান করবে না, মহা তমোগুণী। চোর হয়ে চুরি করতেও যে পারে তার পুরুষার্থ আছে, এইজন্যে তার নিবৃত্তিও আসে। সে একদিন সেই দীননাথের কৃপাও পাবে আর তার জ্ঞানেরও উদয় হবে।"* [ক্রমশঃ]

* উদ্বোধন, ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ ১৩১৩, পৃঃ ৪২-৪৫

নিবন্ধ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে দীক্ষার তাৎপর্য

সীতা রায়চৌধুরী

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেখানে দীক্ষার তাৎপর্য বিষয়ে যা বুঝেছি তা-ই এখানে বলব।

কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া অনেকটা বংশগত ধারা। তাছাড়া অনেকেই যাঁর যাঁকে, যে-সম্প্রদায়কে বা যে-ধর্মকে ভাল লাগে সেখানে তাঁরা দীক্ষা নেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রে দেখেছি, যাঁরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এসেছেন তাঁরা যেভাবেই হোক রামকৃষ্ণ, সারদা, বিবেকানন্দকে ভালবেসেছেন। তাঁদের মনে নিশ্চয়ই কোন জিজ্ঞাসা জেগেছে তাই তাঁরা এখানেই দীক্ষাগ্রহণের কথা ভেবেছেন।

কিন্তু দীক্ষা কি, কেন দীক্ষা নিচ্ছি, সে-সম্বন্ধে একটা ধারণা আগে থেকে করা দরকার। উচ্চ আধার বা উচ্চ সংস্কারবান মানুষ যাঁরা, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণ মানুষ আমরা কেন দীক্ষা নিতে উৎসুক হই? এত ব্যাপক হারে দীক্ষাগ্রহণ দেখে অনেকেই এটাকে একটা যুগের 'ফ্যাশন' বলে থাকেন। কিন্তু যাঁরা দীক্ষা নিতে এসেছেন, ধরে নেব তাঁরা ফ্যাশনের স্রোতে ভেসে আসেননি। তাই দীক্ষার আগে প্রকৃত দীক্ষার্থী নিজের মনের গহনে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবেন, কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণ করবেন। কি সেই বিষয়? প্রথমতঃ, কেন এসেছি? জাগতিক কিছু অসুবিধা দূর করা বা সুবিধা লাভ করার আশায় নয় তো? ভাবগ্রাহী জনার্দন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" জাগতিক সুখ-সম্পদের কামনা থাকলে তাও পূর্ণ হবে। কিন্তু সে হবে রাজার কাছে লাউ-কুমড়ো চাওয়া। বেদোক্ত কাম্য কর্মের দ্বারাই সেগুলি লাভ করা যায়, কিন্তু সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দরবারে আসার প্রয়োজন নেই। অন্য সব ছেড়ে কেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছি, তাঁর কাছে কি চাইতে এসেছি—সেইটিই ভাববার।

সমগ্র বেদান্ত দর্শনের সার-সংক্ষেপ—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। গীতার সার—"মামেকং শরণং ব্রজ"। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের সকল উপদেশের কেন্দ্রে একটিই কথা—"জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।" সুতরাং তাঁর নামাঙ্কিত সঙ্ঘে শরণ নেবার একটিই উদ্দেশ্য—ভগবানলাভ। তাই দীক্ষাগ্রহণের আগে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তুমি কেন এসেছ? তুমি কি জেনেছ যে, জীবনে তিনিই শ্রেয়তম? একথা সত্য যে, আমাদের জীবনে প্রেয়বস্তুর সংখ্যা অগণন—তাদের আকর্ষণও প্রবল এবং সেসমস্ত নিয়েই আমি দীক্ষা নিতে এসেছি। যদি সেগুলি ঝেড়ে ফেলেই আসতাম তবে তো তিন-চতুর্থাংশ কাজ এগিয়েই থাকত। তাই মনকে যাচাই করতে হবে—তুমি কি সত্যিই এসবের বাঁধন কাটিয়ে তাঁকেই পেতে চাইছ? যদি তাই চাই তবেই এই সঙ্ঘের দিকে পা বাড়াব এবং তারপর নিজেকে দীক্ষাগ্রহণের যোগ্য করে তোলার প্রয়াস করব। কিরকম প্রয়াস? পুরুষকারে কতটুকুই বা প্রয়াস করা যায়? তাই দীক্ষাভিলাষের মুহূর্ত থেকে অনবরত প্রার্থনা—'তুমি কৃপা করে আমাকে গ্রহণ কর, আমায় তোমার আপন করে নাও, আমার অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ কর। যাতে সর্বতোভাবে নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করতে পারি—সেইভাবে আমাকে প্রস্তুত কর।'

দীক্ষার একটি নির্দিষ্ট দিন থাকে। সেই দিনটি, সেই ক্ষণটির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই সহজ সরল আন্তরিক প্রার্থনাটির যেন বিরাম না থাকে। এই প্রার্থনার ফলে ঘটবে চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্ত নির্মল হলে তবে তা গুরুপ্রদত্ত মহামন্ত্র ধারণ করার যোগ্য হবে। স্বয়ং পরমেশ্বর এই গুরুরূপী মানুষী তনু আশ্রয় করে দীক্ষা দিচ্ছেন—এই ভাবটি সঙ্গে সঙ্গে ধারণা করার চেষ্টা করতে হবে, তবেই আত্মসমর্পণ সহজ হয়।

এর পর আনুষ্ঠানিক মন্ত্রদীক্ষা। দীক্ষালাভের পর প্রথমতঃ জানতে হবে, আজকে যাঁকে আমি আমার জীবনের ইষ্ট বলে জানলাম তিনিই একমাত্র নিত্যবস্তু। আমার সকল প্রিয়জন তাঁর মধ্যে—আমার সকল প্রিয়জনের মধ্যে তিনি। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা নেই ঃ

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ॥"

দ্বিতীয়তঃ, ইষ্টই আমার আদর্শ। আমার সমগ্র জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সেই আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। যেকোন সংশয়ের মুহূর্তে ভাবতে হবে—তিনি হলে কি করতেন? যেমন করে দুটি বাদ্যযন্ত্রের সুর মিলিয়ে নেওয়া হয় তেমনি করে মিলিয়ে নিতে হবে তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে আমার আচরণ। মিলছে তো? কোন সংঘাত হয়নি? কেমন করে মেলাব? ধরে নিই, শ্রীরামকৃষ্ণই আমার ইষ্ট। তাহলে তাঁর জীবন, তাঁর কথামৃতই হবে আমার আচরণের কষ্টিপাথর। এই দুটি পালন করার চেষ্টা করতে করতে আমরা অনুক্ষণ তাঁর কথা ভাবতে বাধ্য হব এবং কাঁচপোকা-তেলাপোকার গল্পের মতোই তদ্গত-তন্ময় যদি নাও হই সেই রূপ ও ভাবে আবিষ্ট তো হব।

তৃতীয়তঃ, সাধ্যমত অন্তঃ ও বহিঃ শৌচ হয়ে গুরুর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে যে-জীবনে এর পর প্রবেশ করেছি, তা সম্পূর্ণ নতুন জীবন—জীবের দ্বিজত্ব—নতুন জন্মই বলা যায়। যে-জীবনধারায় চলছিলাম সেই জীবনধারায় কাজকর্ম তেমনি চলবে —যতদিন না কর্মক্ষয় হয়। একথা সত্য হলেও মন কিন্তু সেই ধারায় আর চলবে না। এখন থেকে নিজের চেতনাকে সর্বক্ষণের জন্য রাখতে হবে মনের পাহারাদার। প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের কাজকর্ম মন দিয়ে অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু সে-মন হবে অনাসক্ত। শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজী তিনজনেই 'উত্তম বৈদ্য'। তুচ্ছতম ঝাঁটাগাছাটি রাখা থেকে আরম্ভ করে সঙ্ঘের পরিচালনা পর্যন্ত প্রতিটি কাজেই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রতিটি কাজই সর্বতোসুন্দর করার জন্য তাঁদের নির্দেশ। কিন্তু তফাৎটি হলো, এখন থেকে ভাবতে হবে যে, সকল কাজই তাঁর ইচ্ছায় করছি, তাঁর জন্য করছি এবং তিনি করাচ্ছেন বলেই করতে পারছি। এইভাবে অনাসক্তির অভ্যাস করতে হবে।

চতুর্থতঃ, পাহাড়ী পথে বাস-ড্রাইভারের জন্য নির্দেশ থাকে ঃ 'সর্বদা সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার হাতে যাতে না পড়েন।' দীক্ষিত ব্যক্তির যাত্রাও তেমনি দুর্গম পথে। তাই দীক্ষার মুহূর্ত থেকে তাকেও সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে যেন ব্রতভ্রষ্ট না হয়। কি সেই ব্রত?—ভগবানলাভ। ভগবানলাভ বলতে কি বুঝি? কথায় বলে, "যেমন ভাব তেমনি লাভ"। সুতরাং আমি যেমন ভাবে চাইব তেমনি ভাবেই পাব। কিন্তু "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই"—হয়ে যেতে পারে। তাই তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা—"প্রভু, তোমার সত্যস্বরূপে তুমি আপনি প্রকাশিত হও। আমার সাধ্য কি তোমাকে ধারণা করার। তুমি স্বয়ং উদ্ভাসিত হও আমার হৃদয়মন্দিরে।" চলতে-ফিরতে খেতে-শুতে এই প্রার্থনা থেকে যেন ভ্রষ্ট না হই। যেন সর্বদা সতর্ক থাকি। অন্য বাসনা যেন আমার চিন্তাকে বিপথগামী না করে।

পঞ্চমতঃ, একমাত্র তাঁর কৃপাতেই তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি যাকে 'বরণ' করেন সে-ই তাঁকে পায়। এইটিই শেষ সত্য। তবু পুরুষকার প্রয়োগ করতেই হবে এবং সেইজন্যই দীক্ষার প্রয়োজন। তাঁর কৃপালাভের সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো জপ—অজপা জপ। গাঢ় জপ মনকে নিয়ে যায় নিবিড় ধ্যানে—যাতে তিনি প্রকাশিত হন। সকল সাধকই বলেছেন, "জপাৎ সিদ্ধিঃ"। তাই দীক্ষিত ব্যক্তির প্রাথমিক কর্তব্য—গুরুনির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আসনে নির্দিষ্ট জপ তো আছেই, তাছাড়া নিরন্তর জপ। গীতায় ভগবান বলছেন ঃ "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ অস্মি।" আগেকার দিনে যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হতো। জপযজ্ঞও বৃষ্টি নামায়। কিসের বৃষ্টি? করুণাবৃষ্টি। তিনি সন্তুষ্ট হন তাঁর নাম জপে, তাঁর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়। তিনি তা বর্ষণ করেন। কি বর্ষণ করেন? কৃপা—যা আমি জপের আগে ও পরে প্রার্থনা করেছিলাম। ☐

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পুণ্যদর্শন

গোষ্ঠবিহারী সাহা

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে আমি প্রথম দর্শন করি। তখন তিনি সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙ এবং শীতকালে কলকাতায় থাকতেন। কলকাতার বিডন স্ট্রীটে একটা বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলে বেদান্ত সোসাইটি সাময়িকভাবে তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিদ্যাসাগর কলেজে বি. এ. ক্লাসে তখন আমি পড়ি। সহপাঠী রাজেন্দ্রমোহন রায়ের সঙ্গে একদিন আমি বেদান্ত সোসাইটিতে যাই। সেখানে গিয়ে শুনি, মহারাজ তখন দার্জিলিঙে আছেন। তাই দুঃখিত মনে সেদিন চলে আসতে হলো। কিছুদিন পরে, অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসব এল। খবরের কাগজে 'সভাসমিতি'র কলামে দেখতে পেলাম, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে বেদান্ত সোসাইটির নবক্রীত জমির ওপর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসব পালিত হবে, আর এই উপলক্ষে, বিকালে সেখানে একটা সভার অধিবেশন হবে, যাতে স্বামী অভেদানন্দ উপস্থিত থাকবেন। খবরটা জেনে আমি ও রাজেন খুবই উৎফুল্ল হলাম এবং ঐদিনটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অবশেষে নির্দিষ্ট দিনটি এল এবং আমরা দুজন যথাসময়ে বেদান্ত সোসাইটির নবক্রীত জমিটিতে উপস্থিত হলাম। তখনও মহারাজ আসেননি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ দেখলাম, একটা মোটরগাড়ি এসে জায়গাটির পাশের রাস্তায় দাঁড়াল। একটু পরেই দেখি, স্বামী অভেদানন্দ গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাথের ওপর দাঁড়ালেন। অপূর্ব মূর্তি। সুগঠিত, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ বপু। গেরুয়া পাঞ্জাবীর ওপর একটা পশমের হাল্কা হাফহাতা সোয়েটার। মাথায় একটা গেরুয়া রঙের টুপি। মুখে অপূর্ব তেজ-লাবণ্যের ছাপ, হাবভাব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়ে অপার শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দঘন মূর্তি। মহারাজ ধীর পদক্ষেপে এসে সভাস্থলে প্রবেশ করলেন। একটু পরেই সভার কাজ আরম্ভ হলো। স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন সভার একমাত্র বক্তা। সামান্য কথায় অতি সাধারণ-ভাবে তিনি শ্রীমায়ের জীবনের কথা ও ঘটনার উল্লেখ করলেন, কোন উচ্চভাব বা শ্রীমায়ের মাহাত্ম্য ও আদর্শ সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। আমরা অনেক উচ্চভাব ও তত্ত্বের কথা শুনব বলে আশা করেছিলাম। মহারাজের কথায় তার উল্লেখ না থাকায় মনঃক্ষুণ্ণও হয়েছিলাম। অবশ্য পরে বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি কেন ঐরূপ সাধারণ কথায় তাঁর আলোচনা শেষ করলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর শিক্ষিত ও জ্ঞানি-গুণী ব্যক্তি সেদিন ছিলেন না বললেই হয়; যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক, আবার তাঁদের মধ্যে ছেলে-ছোকরাই ছিল বেশি। তারা উচ্চভাব ও তত্ত্বের কি বুঝবে? এইভাবে সেদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদ এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে জীবনে প্রথম দর্শন করে ও অন্যান্য দশজনের ন্যায় তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করে বড়ই ধন্য ও তৃপ্ত বোধ করেছিলাম।

মাস দুই পরেই ছিল সরস্বতী পূজা। খবরের কাগজে দেখলাম, বেদান্ত সোসাইটির নবক্রীত ভূমিতে সরস্বতী পূজা হবে, আর এই উপলক্ষে অপরাহ্ণে একটি সভার ব্যবস্থাও হয়েছে, যাতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ উপস্থিত থাকবেন। এবারও সহপাঠী রাজেনের সঙ্গে গেলাম বেদান্ত সোসাইটির সেই সভাস্থলে এবং অভেদানন্দজীকে

দর্শন করে অপার আনন্দ পেলাম। যতদূর মনে পড়ে, আমাদের উভয়ের ছিল মহারাজকে সেই দ্বিতীয় দর্শন। সহজ সরল ভাষায় সেদিন তিনি সরস্বতী সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন, যা আমার মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছিল। প্রতিটি বাক্যের ভিতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান সবাইকে আকর্ষণ করেছিল।

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, আর্যগণ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ লাভ করেন, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে তাঁদের বসতিস্থান ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত হতে হতে সরস্বতী নদীতীর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। এজন্যই বোধহয় জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তাঁরা 'সরস্বতী' নাম দিয়েছিলেন। ধ্যানমগ্ন আর্য ঋষিদের মনে বাগ্‌দেবীর যে-মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তার সবকিছুই বিশেষ অর্থবহ। দেবী সরস্বতীর দেহের বর্ণ শুভ্র, তাঁর বস্ত্র ও গাত্রাবরণ শুভ্র, বাহন শুভ্র বর্ণের রাজহংস, শ্বেতপদ্মের ওপর তিনি বসে আছেন। বলা হয়, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতীক হলো বিভিন্ন রঙ। দেবী সরস্বতী সমস্ত জ্ঞানেরই উৎস। সমস্ত রঙ একসঙ্গে মিশ্রিত করলে শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। তাই সমস্ত জ্ঞানের উৎস দেবী সরস্বতীর গাত্রবর্ণ শুভ্র। কিংবদন্তি, রাজহংস জলমেশানো দুধ থেকে দুধকে পৃথক করে পান করতে পারে। তাই জ্ঞান ও অজ্ঞানে মিশ্রিত এই বিশ্বসংসার থেকে যে জ্ঞান আহরণ করতে পারে সে-ই দেবী সরস্বতীর বাহন বা আরাধনার অধিকারী হতে পারে। জ্ঞানের প্রকাশ হয় শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমে। শব্দের প্রতীক বীণা ও অক্ষরের প্রতীক পুস্তক। তাই দেবী সরস্বতীর হাতে বীণা ও পুস্তক। এমন অনেক কথা দেবী সরস্বতী প্রসঙ্গে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আর শ্রোতৃমণ্ডলী একাগ্র মনে তা শুনেছিলেন। অনেক নতুন কথা শুনে এবং তাঁর পূত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের গভীর প্রভাব হৃদয়ে ধারণ করে সেদিন আমরা সভাস্থল থেকে ফিরে এলাম।

তৃতীয়বার আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে যেদিন দর্শন করি সেদিন তিনি সন্ধ্যার পরে বেদান্ত সোসাইটির প্রাঙ্গণে (যেখানে এখন নাটমন্দির হয়েছে) গীতার ক্লাস নিচ্ছিলেন। এবারও আমরা সংবাদপত্রের 'সভাসমিতি'র কলামে খবরটি পাই। এবারও রাজেনের সঙ্গেই গিয়েছিলাম। তখন বেদান্ত মঠের ঘরবাড়ি নির্মাণ শুরু হয়েছে, মন্দির হয়নি। মহারাজের ঘরও তখন সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি। শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা খুব বেশি না হলেও শিক্ষিত ভদ্রলোক বেশ কয়েকজন ছিলেন। মহারাজ ধীর পদক্ষেপে সভাস্থলে এসে চেয়ারে উপবেশন করলেন। চেয়ারে বসেই কিছুক্ষণ তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির ন্যায় তাঁর সর্বাঙ্গ স্থির, শান্ত; মুখমণ্ডল এক দিব্য আভায় উদ্ভাসিত। অবাক বিস্ময়ে আমরা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছি। কিছুক্ষণ এইভাবে ধ্যানস্থ থাকার পর তিনি অপূর্ব ভাবগম্ভীর সুরে গীতার এক-একটা শ্লোক আবৃত্তি করলেন এবং প্রাঞ্জল ভাষায় তা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর হাতে তখন কোন গীতা পুস্তক ছিল না। বুঝতে পারলাম, সমস্ত গীতাটাই ছিল তাঁর মুখস্থ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়-মনকে আকর্ষণ করে নিলেন এবং অতি সহজেই উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি বহু প্রসঙ্গের অবতারণা করে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাংখ্যযোগের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। শ্রোতাদের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের একটি ছাত্র উপস্থিত ছিল। মহারাজ আত্মার কথা উল্লেখ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করার শুরুতে হঠাৎ সে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করল। মহারাজ এত নিবিষ্ট মনে আলোচনা করছিলেন যে, যুবকটির প্রশ্ন প্রথমবার তিনি শুনতেই পাননি। ছেলেটি যখন পুনরায় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করল, তখন মহারাজ একটু চমকে উঠে বিরক্ত হয়েই বললেন: "আলোচনা বা বক্তৃতার সময় কোন প্রশ্ন করতে নেই; প্রশ্ন করতে হয় বক্তার আলোচনা শেষ হলে। সাধারণ ভদ্র আচরণের এই বিধি তুমি জান না? যাক, তোমার প্রশ্ন কি?" ছেলেটির প্রশ্ন ছিল:

"আত্মা কি? আত্মা কোথায় আছে? আমরা তা দেখতে বা অনুভব করতে পারি না কেন?" মহারাজ ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি কর?" ছেলেটি বলল: "আমি M. Sc. পড়ছি।" স্বামীজী মহারাজ আবার প্রশ্ন করলেন: "তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র, বলতো মানুষ বিজ্ঞানচর্চা করে কেন?" ছেলেটি বলল: "মানুষের জীবনকে সুখকর ও আরামপূর্ণ করতে ও মনুষ্যজীবনের সমস্যাগুলির সহজ সমাধান করতে মানুষ বিজ্ঞানচর্চা করে।" মহারাজ তখন বললেন: "জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা মানুষের জীবনের সুখ ও আরাম বৃদ্ধির উপায় বের করার জন্য বিজ্ঞানচর্চায় মন দেননি। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের কথাই ধর। আপেলটি আকাশের দিকে না গিয়ে পৃথিবীর ওপর পড়ল কেন?—এর কারণ জানতেই তাঁর সমগ্র মননশক্তি তিনি নিয়োগ করেছিলেন, আর তারই ফলে মাধ্যাকর্ষণ সূত্রটির আবিষ্কার হয়। জগতের প্রথমশ্রেণীর বিজ্ঞানীরা সবাই বিশ্বপ্রকৃতি যে-সকল নিয়মে বাঁধা, সেই নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতেই জীবনভর গবেষণা চালিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য হলো বহিঃপ্রকৃতির জ্ঞানলাভ। সেই জ্ঞানলাভই বিজ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য। তেমনি আবার আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ অন্তঃপ্রকৃতির জ্ঞানলাভ করে। ভারতের মুনিঋষি ও সাধকগণ এই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানেরই সাধক। তাঁদের উপায় ভিন্ন। এই জ্ঞান অনুভূতি-লব্ধ—ইন্দ্রিয়াতীত গভীর অনুভূতির সাহায্যেই আত্মার জ্ঞান বা উপলব্ধি সম্ভব। তুমি এই পথে চলতে চেষ্টা করনি। তুমি কিভাবে আত্মার উপলব্ধি করতে পারবে?" যাই হোক, মহারাজ আবার তাঁর পূর্ব-আলোচনা আরম্ভ করলেন। ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষের প্রতিটি কথাই বেদবাক্যের মতোই উপস্থিত সবার হৃদয় স্পর্শ করছিল। অনেকক্ষণ তিনি আত্মতত্ত্বের আলোচনা করলেন। সব কথাগুলি মনে নেই এবং সব কথাগুলির তাৎপর্যও সেদিন বুঝতে পারিনি; তবে সেই ভাবগম্ভীর পরিবেশটি আজও হৃদয়ের অন্তস্তলে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এর কয়েক মাস পরে আর একটি ছোট আকারের সভার অধিবেশন হয়েছিল বেদান্ত সোসাইটির ঐ প্রাঙ্গণেই। সেদিনও অভেদানন্দ মহারাজ সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভাটি কি উপলক্ষে ডাকা হয়েছিল তা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একজন বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও সেই সভায় বক্তা ছিলেন। তখন বেদান্ত সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ভূতনাথ মুখার্জী। তিনিও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সভার প্রথমেই পণ্ডিতপ্রবর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক বক্তৃতা দিলেন; তারপর ভূতনাথবাবু বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল সংক্ষিপ্ত ও কৌতুকপূর্ণ। তিনি বললেন: "আমরা পণ্ডিতজীর গুরুগম্ভীর বক্তৃতা শুনলাম, এর পরেই আমরা স্বামীজী মহারাজের ভাবগম্ভীর আলোচনা শুনব। মাঝখানে আমার এই হাল্কা বক্তৃতাটি হবে একটি 'স্যান্ডউইচ'-এর মতন।" স্বামীজী মহারাজ একথাটা শুনেই শিশুর মতো প্রাণখোলা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লেন। তখন তাঁর চোখ-মুখের ভাবভঙ্গি দেখে সবাই অবাক—উচ্চভাবে সদাতন্ময় অন্তর্মুখী একটা মন হাল্কা হাসিতে কি এমনি করে ফেটে পড়তে পারে? এ যে দেখেনি সে বিশ্বাস করতেই পারবে না। [ক্রমশঃ]

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর আবির্ভাবের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে। এই উপলক্ষে **উদ্বোধন কার্যালয়** থেকে **স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের** সম্পাদনায় একটি **সংকলন-গ্রন্থ** প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১৯৯১-এর সেপ্টেম্বর থেকে **'উদ্বোধন'**-এর প্রতি সংখ্যায় **শিকাগো ধর্মমহাসভা এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে** যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলি ঐ **সংকলন**-গ্রন্থে স্থান পাবে। এছাড়া ধর্মমহাসম্মেলন সম্পর্কিত অন্যান্য বহু মূল্যবান সংবাদ ও তথ্য এবং 'উদ্বোধন'-এ পূর্বপ্রকাশিত কিছু মূল্যবান প্রবন্ধও ঐ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হবে।

কার্যাধ্যক্ষ

১ আষাঢ় ১৩৯৯/১৫ জুন ১৯৯২ **উদ্বোধন কার্যালয়**

পরিক্রমা

মাল্টায় পঞ্চম আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলনে

স্বামী গোকুলানন্দ

১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ইটালীর সেন্ট এগিডিও সম্প্রদায়ের আন্তর্জাতীয় এবং আন্তর্ধর্মীয় শান্তি-সম্মেলনের সভাপতি আমাকে এক চিঠিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুরোধ করেন, মাল্টাতে ৮ থেকে ১০ অক্টোবর যে পঞ্চম আন্তর্জাতীয় শান্তি-সম্মেলন হবে তাতে যেন আমি যোগদান করি। উনি জানান, এই সম্মেলনে আমার উপস্থিতির জন্য মাল্টার আর্চবিশপও এই সঙ্গে আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। চিঠিতে ওঁরা বলেছেন, এই সম্মেলনে পৃথিবীর সত্তরটি দেশের ধর্মীয় প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন।

আমন্ত্রণপত্রে ওঁরা লেখেন: "স্বামীজী, আপনাকে আমরা এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য স্বাগত আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা আপনার মাল্টাতে আসা-যাওয়া, থাকা এবং এখানে অবস্থানকালে হোটেলের আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যয় বহন করব।"

ওঁদের আমন্ত্রণপত্র বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিলাম তাঁদের বিবেচনার জন্য। কর্তৃপক্ষ আমাকে সম্মেলনে যোগদানের অনুমতি দিলেন। কর্তৃপক্ষের শুভেচ্ছা এবং পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ৭ অক্টোবর ভোরবেলা জার্মান বিমান-সংস্থা লুফ্‌ৎহানসার বিমানে দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা হলাম মাল্টার উদ্দেশে। দিল্লী আশ্রমের সাধু ও শুভানুধ্যায়ীদের কয়েকজন আমাকে বিমানবন্দরে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন। আমাকে জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট বিমানবন্দরে বিমান পরিবর্তন করতে হবে। অবশ্য সে-সুযোগে আমি জার্মানি দেশটাকেও একটু দেখতে সুযোগ পাব। ফ্রাংকফুর্ট বিমানবন্দরে যখন আমাদের বিমান অবতরণ করল তখনো সেদেশে ৭ অক্টোবর সকাল।

আমি ফ্রাংকফুর্ট হয়ে যাচ্ছি জেনে প্ল্যানিং কমিশনের সেক্রেটারি ডঃ নীতীশ সেনগুপ্ত ফ্রাংকফুর্টের ইন্ডিয়া ইনভেস্টমেন্ট সেন্টারের তদানীন্তন ডাইরেক্টর বিজয় চ্যাটার্জী আই. এ. এস.-কে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যাতে আমার সঙ্গে ফ্রাংকফুর্ট বিমানবন্দরে দেখা করেন এবং আমার যখন জার্মানির ট্রানজিট ভিসা রয়েছে তখন ফ্রাংকফুর্ট শহরটা যেন আমাকে একটু দেখিয়ে দেন।

ফ্রাংকফুর্ট বিমানবন্দরে ভারতীয় দূতাবাসের একজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে মিস্টার চ্যাটার্জী বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে গাড়িতে নিয়ে তিনি শহরের ভিতরে একটু ঘুরিয়ে আনলেন। গাড়ি থেকে জার্মানির বিখ্যাত মেন নদী দেখলাম। নদীর তীরে একটি পুরনো বিখ্যাত গির্জা রয়েছে। আরও এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রদর্শনীর বাড়ি। এখানে প্রতি বছরে দুটি বিখ্যাত আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যমেলা হয়। আর একটু ঘুরে মিস্টার চ্যাটার্জীর বাড়িতে গিয়ে প্রাতরাশ সেরে আবার বিমানবন্দরে ফিরে এলাম। ফ্রাংকফুর্ট থেকে বিমান পাল্টে লুফ্‌ৎহানসারেরই আর একটি বিমানে চড়লাম রোম যাওয়ার জন্য।

রোমে নেমে মস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হলাম ভাষা নিয়ে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মিস্টার গিনো বাট্টাগ্লিও নামে এক ভদ্রলোক ইতঃপূর্বে দিল্লী এসে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, রোম বিমানবন্দরে আমার অভ্যর্থনার জন্য তিনি থাকবেন। আমার সঙ্গে লাগেজ সামান্যই ছিল। দুটো ব্যাগ দুই কাঁধে ঝুলিয়ে রোম বিমানবন্দরে নামলাম। বিমানবন্দর থেকে বাইরে বেরোবার

আগেই জনৈক ইটালীয়ান ভদ্রলোক আমাকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনিই কি স্বামী গোকুলানন্দ?" আমি জানালাম যে, তাঁর অনুমান সঠিক। তিনি বললেনঃ "আপনাকে স্বাগত জানাতে বাইরে একজন অপেক্ষা করছেন।" উনি আমাকে বাইরে নিয়ে এলেন। দেখি, মিস্টার গিনো। খুশিতে আমার মন ভরে গেল। কাজে কত নিষ্ঠা এঁদের। আমি অভিভূত বোধ করলাম।

বৃষ্টি পড়ছিল। যদিও ঠিক বর্ষণ নয়, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। মিস্টার গিনো তাঁর গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। আমরা দুটি প্রাণী গাড়িতে। যাঁরা রোমে গেছেন তাঁরা জানেন বিমানবন্দর থেকে রোম শহর বেশ খানিকটা দূরে। পথের দুধারে সবুজ মাঠ। খুব ভাল লাগছিল। আমার থাকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এঁরা দিল্লীতে 'ফ্যাক্স' পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন—মাল্টাতে আমার থাকার ব্যবস্থা হবে একটা হোটেলে, যেখানে সব ধর্মীয় প্রতিনিধিরাই থাকবেন। রোমে আমার থাকার ব্যবস্থা হবে 'সেন্ট পল অ্যাবি'তে। এটা একটা খ্রীস্টান মঠ।

মিস্টার গিনো আমাকে নিয়ে এলেন 'সেন্ট পল অ্যাবি'তে। এই মঠটি টাইবার নদীর তীরে। 'অ্যাবি' কথাটার মানে হচ্ছে ধর্মাশ্রম। সেন্ট পল অ্যাবি মহান সেন্ট পলের ব্যাসিলিকার অংশ। সেন্ট পল ব্যাসিলিকা ভাটিকান চার্চের পরই দ্বিতীয় বৃহৎ রোমান চার্চ। ভাগ্যক্রমে সেখানে আমার থাকবার ব্যবস্থা হলো। আমি সেই গির্জায় থাকাকালীন একজন বয়স্ক ধর্মযাজক ফাদার মারিও এসে আমাকে ল্যাটিন ভাষায় সবকিছু বোঝাতে প্রয়াস করলেন। আমি তো তাঁর কথার একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। তখন তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন বই বিক্রির কেন্দ্রে। সেখান থেকে একটা বই নিয়ে তিনি আমাকে উপহার দিলেন। বইটির নাম—'The Basilica of St. Paul'। 'ব্যাসিলিকা' সেইসব চার্চকেই বলা হয় যাদের কয়েক শতাব্দী ধরে উপাসনা-স্থান হিসাবে একটা ঐতিহাসিক এবং সামাজিক মর্যাদা রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, সেন্ট পল যীশুখ্রীস্টের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন না। উনি ছিলেন জাতিতে ইহুদী এবং গোড়াতে যীশুর ধর্মপ্রচারের প্রতিবাদী। তিনি নিজে ছিলেন এক ধরনের ধর্মোন্মাদ। যীশুর নতুন ধর্ম যাঁরা প্রচার করছিলেন সেই প্রচারকদের কয়েক-জনকে সাজা দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন পল। সেসময়ে যীশু স্বয়ং সেখানে আবির্ভূত হয়ে পলকে বললেনঃ "তুমি কি করছ? ওদের কেন সাজা দিতে চাইছ?" যীশুর কথায় হঠাৎ পলের হৃদয় আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর মনে এই ভাবনা এলঃ "ভগবান স্বয়ং আমাকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। আমি এখন থেকে ভগবান যীশুর বাণী প্রচারে আমার জীবন উৎসর্গ করব।" আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে বড়দিনের পূর্ব রাত্রিতে আঁটপুরে আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যীশু এবং তাঁর শিষ্যদের গৌরবময় ত্যাগের জীবন আলোচনা করছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর আঁটপুরে তাঁর যেসব গুরুভাই একত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের তিনি এই কথা বলে উদ্বুদ্ধ করে-ছিলেনঃ আমাদের সকলকে সেন্ট পলদের মতো হতে হবে। আমাদের গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সর্বত্র প্রচার করতে হবে।

সেন্ট পল ব্যাসিলিকা সেন্ট পলের সমাধির ওপরই নির্মিত। এই দ্বিতীয় বৃহত্তম রোমান চার্চের অন্তর্গত বেনিডিক্টিন চার্চে থাকবার সময় দেখেছি, প্রতিদিন শত শত লোক সেন্ট পলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এই চার্চে আসছেন। এই চার্চের স্থাপত্যশিল্পের কাজও অত্যুৎকৃষ্ট। মিস্টার গিনোকে আমি বললামঃ "কাল সকালেই তো আমি মাল্টা চলে যাচ্ছি। আমার হাতে সময় নেই। আমাকে রোম শহরের খানিকটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিন।"

গির্জায় প্রথমেই আমাকে ফাদার মারিওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উনি আমাকে ৫৫নং ঘরের চাবি দিয়ে দিলেন। আমি ওপরে উঠে গেলাম। এই মঠের সাধুদের দৈনন্দিন জীবনের নিয়মকানুনের কথা একটু পরেই বলছি। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলার আগে বলে নিতে হয় খাবার ঘরের কথা। আমাকে ওঁরা খাবার ঘরে

নিয়ে গেলেন। ওখানে খাবার টেবিলে বসেছিলেন আমারই মতন কয়েকজন অতিথি সাধু। ওঁরা দুজন শ্রীলঙ্কা থেকে এবং পাঁচজন জাপান থেকে এসেছেন। ওঁরা সবাই বৌদ্ধ সাধু। ওঁরা মধ্যাহ্নাহারে বসেছেন। আমি বিমানেই দ্বিপ্রহরের আহার সমাপন করে এসেছিলাম। ফাদার মারিও আমার জন্য কিছু আঙ্গুর, পাউরুটি, পানীয় এবং এক পেয়ালা চা নিয়ে এলেন।

আহারাদির পর মিস্টার গিনোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেন্ট পিটার চার্চ দেখতে গেলাম। রেনেশাঁ-উত্তরযুগের ভাস্কর্যশিল্পের এক অপূর্ব কীর্তি এই চার্চ।

কলোসিয়ামের কথা শুনেছিলাম। রোমের বিখ্যাত দর্শনীয় বস্তু। রোম পৃথিবীর অন্যতম সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নগরী—একথা সকলেই জানেন। রোমের আর একটা নাম আছে। রোমকে বলা হয়—'Eternal City'। চিরকালের নগরী। কলোসিয়ামের ভিতরে একটি অতি প্রশস্ত চক্রাকার এম্পিথিয়েটার রয়েছে। এর সম্বন্ধে অনেক বইতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এই এম্পিথিয়েটারে প্রাচীনকালে শিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হতো। তাদের বলা হতো গ্লাডিয়েটর। গ্লাডিয়েটররা বন্য পশুর সঙ্গেও লড়াই করত। শুনে কষ্ট হয়, এই এম্পিথিয়েটারে খ্রীস্টানদের হিংস্র পশুর মুখে ছেড়ে দিয়ে শাস্তিও দেওয়া হতো তাঁদের ধর্মমতের জন্য। বহু লোক ভগবান যীশু এবং তাঁর ধর্ম গ্রহণের জন্য এখানে প্রাণ দিয়েছেন। দর্শকেরা গ্যালারীতে বসে দেখতেন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের অপরাধে মানুষকে সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এম্পিথিয়েটার দেখবার সময় সেসব কাহিনী শুনলাম।

রোম পৃথিবীর একটি অন্যতম সুন্দরী নগরী। এই নগরীতে অনেক স্মৃতিসৌধ, বিরাট অট্টালিকা, বিশাল চার্চ এবং অনেক প্রাসাদ রোমের অতীত গৌরবের কথা ঘোষণা করছে। দুহাজার বছর আগেও রোম সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। প্রাচীন সভ্যতার গৌরবধ্বজাবাহী ঐতিহাসিক রোমনগরীর খানিকটা ঘুরে আমরা চার্চে ফিরে এলাম।

চার্চে আমাকে যে-ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তা বেশ বড়, ভাল ঘরই ছিল। কিন্তু ঘরের সংলগ্ন কোন খোলা বারান্দা ছিল না। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ঘরের সংলগ্ন খোলা বারান্দা থাকে। দিল্লীর সাধুনিবাসেও সাধুদের থাকবার ঘরের সঙ্গে খোলা টানা বারান্দা রয়েছে। কিন্তু ওখানকার ঘরে সব বন্ধ করিডর। বেনিডিক্টিন চার্চের সাধুদের খুব কঠোরতা পালন করতে হয়। উদ্দেশ্য, যেন বাইরের জগৎ-সংসার তাঁদের কোনভাবে প্রভাবিত করতে না পারে। আমার বেশ অবাক লাগছিল। আমার এই বড় ঘরখানাতে একখানাই জানালা, আর এই জানালা দিয়ে আমি শুধু সবজিবাগানটিই দেখতে পাচ্ছিলাম। ঘরের ভিতরে মুখ ধোয়ার বেসিন আছে, কিন্তু সংলগ্ন কোন শৌচাগার নেই। প্রয়োজন হলে করিডর দিয়ে গিয়ে শৌচাগারে যেতে হবে। করিডরেও কোন জানালা নেই। ভেনটিলেটারই জানালার কাজ করছে। জীবনযাপনের নিয়মে প্রচণ্ড কঠোরতা।

মানুষ হিসাবে এঁরা খুবই ভাল। খুব অতিথিপরায়ণ। কোন অভ্যাগত এলে, যেমন আমি এসেছি, এঁরা মনে করেন অতিথি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তি। কাজেই অতিথিকে এঁরা বিশেষ সম্মান করে থাকেন। আমাকে এঁরা কেউ জিজ্ঞাসা করেননিঃ স্বামীজী, আপনি কতদিন এখানে থাকবেন? বরং বলেছেনঃ যতদিন আপনার ভাল লাগে, আপনি থাকুন। চার্চে প্রতিদিনই অতিথির জন্য উদ্বৃত্ত খাদ্য রান্না করা হয়। অতিথির জন্য থাকবার ঘরও রাখা হয়। দেখলাম, আফ্রিকা থেকে একজন আফ্রিকান ফাদার এসেছেন। তিনি ছিলেন ৫৬ নং ঘরে, আর আমি ৫৫ নম্বরে।

রাতের খাবার খেতে গিয়ে দেখলাম, খাবার টেবিলে ফাদার সুপিরিয়র, প্রবীণ ফাদারগণ এবং আর সকলে এসেছেন। একজন বয়স্ক এবং একজন তরুণ এই দুইজন ফাদার গায়ে এপ্রন এঁটে খাবারের ট্রলি নিয়ে খাবার পরিবেশন করছেন। নানারকম খাবার পরিবেশনের জন্য এসেছে। আমি শুধু পাউরুটি এবং ফলের রস নিলাম। লক্ষ্য করার যে, এতগুলি লোক একসঙ্গে ডিনার খাচ্ছেন, কিন্তু কারও

মুখে কোন কথা নেই। খাবার গ্রহণ করতে শুরু করার আগে ফাদার সুপিরিয়র একটি স্মিত হাসি দেবেন। হলঘরের এক কোণে রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা ছোট বক্তৃতা-মঞ্চ আছে। সেখান থেকে একজন ফাদার ল্যাটিন ভাষায় কিছু পাঠ করলেন। পাঠ চলতে থাকল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের আহারপর্ব শেষ হয়। আহারের সময় যদি কিছু প্রয়োজন হয় সেটা চাওয়া যাবে না। 'এখানে একটু ভাত লাগবে', 'একটু ডাল দিন'—এরকম বলা রীতি-বিরুদ্ধ। ওঁরা খাবারের ট্রলি নিয়ে ঘুরবেন। আপনাকে ট্রলি থেকে আপনার প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্তুটি তুলে নিতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার পর দেখে অবাক হলাম, একজন পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ ফাদার আমাদের উচ্ছিষ্ট থালাগুলো উঠিয়ে নিলেন। ট্রলির নিচের তাকে সেগুলো রাখলেন।

খাবার শেষ হলে একটা বেল বাজল। সকলের সঙ্গে আমিও একটা বর্গাকার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গেলাম। একজন ফাদার কিছু বলছেন, অন্যেরা তার পুনরাবৃত্তি করছেন—আমাদের যেমন পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করান। এই অনুষ্ঠান শেষ হলে আমরা খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। নৈশভোজনের পর চার্চে একটা 'সার্ভিস' আছে। তাতে অবশ্য অতিথিদের যাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কেউ ইচ্ছা করলে যেতে পারেন, আবার নাও যেতে পারেন। যেহেতু, আমি চার্চের জীবনধারা জানতে উৎসুক ছিলাম, তাই রাত্রির 'সার্ভিসে' গেলাম। দেখলাম, চার্চের সব সাধুরাই সেখানে এসেছেন। কেউ এলেন না—এরকম হওয়ার উপায় নেই। সকলকেই আসতে হবে। শতকরা একশত ভাগ উপস্থিত থাকতে হবে। সেখানেও কিছু পাঠ করা হলো। শেষের দিকে দুটি মোমবাতি জ্বালানো হলো। ফাদার সুপিরিয়র সমবেত সকলের কাছে এসে পূত বারি ছিটিয়ে দিলেন। এটাও প্রতিদিনের নিয়ম।

সকালবেলাতে ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সকলকে চার্চে থাকতে হবে। এটাও বাধ্যতামূলক সকলের জন্যই। আবার ৬-৩০টা থেকে ৭-৩০টা পর্যন্ত এবং তৃতীয়বারে দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত। সান্ধ্য প্রার্থনার সময় আবার ৫-৩০টা থেকে ৭টা পর্যন্ত সকলকে চার্চে থাকতে হবে। এই চার্চটি পাঁচশ বছরের পুরনো। এই সুদীর্ঘকাল ধরে চার্চের এইসব নিয়ম কঠোরভাবে পালিত হচ্ছে। ফাদারদের মধ্যে একজন কিছুকাল বাংলাদেশে ছিলেন। তিনি কিছুটা বাঙলা বলতে জানেন, ইংরেজী বলেন খুব ভাল। আর এঁদের মধ্যে কেউ ইংরেজী জানেন না। ভাষার অসুবিধার জন্য আমি আলাপ করতে পারছি না কারও সঙ্গে। কাজেই বাংলাদেশ থেকে আসা ফাদারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য সচেষ্ট হলাম। তাঁকে গিয়ে বললাম ঃ "ফাদার, আপনি কি একটু আমার ঘরে আসবেন, অথবা যদি অনুমতি দেন, আমি আপনার ঘরে আসতে পারি। আমাদের সন্ন্যাস-জীবন সম্বন্ধে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমি আপনাদের ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে দুটি-একটি কথা জিজ্ঞাসা করার আকাঙ্ক্ষা করি।"

এবারে তিনি আমাকে অবাক করে বললেন ঃ "স্বামীজী, নৈশভোজের পর চার্চে আমাদের মৌন-ব্রত নিতে হয়।" আমি এটা জানতাম না বলে ক্ষমা চাইলাম। দেখলাম, রাতের আহারের পর প্রার্থনা হয়ে গেলে সকলেই নিঃশব্দে যার যার আস্তানায় চলে গেলেন। আমি উপলব্ধি করলাম, যেন চার্চের চারিদিকে হিমালয়ের স্তব্ধতা বিরাজ করছে। এটা এঁদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, বহুসংখ্যক ফাদার এখানে থাকা সত্ত্বেও সেই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা নীতি-শৃঙ্খলা একই রকম কঠোরভাবে আজও মেনে চলা হচ্ছে।

চার্চের কোথাও কোন টেলিভিশন না দেখে আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ "চার্চের কি কোথাও টিভি সেট নেই?" জবাবে জানলাম যে, নেই। অবাক হয়ে ভাবলাম, আজকের দিনেও এঁরা বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে চার্চ-জীবনে কত কৃচ্ছ্রতা পালন করে থাকেন। বেনিডিক্টিন চার্চের সদস্যগণ পবিত্র ও কঠোর জীবনযাপনের জন্য এবং শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে জগতে খ্যাত। ছাপাখানা চালু হওয়ার আগেই এই চার্চ থেকে অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

এই চার্চটির নাম 'বেনিডিক্টিন চার্চ' কেন? সেন্ট বেনিডিক্ট-এর নাম থেকে চার্চের নাম হয়েছে 'বেনিডিক্টিন চার্চ'। সেন্ট বেনিডিক্ট পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তিনি খুব বড় সাধু ছিলেন। তাঁর ভগবদুপলব্ধি হয়েছিল। তিনি খ্রীস্টগতপ্রাণ ছিলেন। স্বামীজী একবার ভাবোদ্দীপ্ত অবস্থায় বলেছিলেনঃ নীরব সাধনায় অধ্যাত্মশক্তি আহরণ কর। প্রত্যেক মহাপুরুষই, যাঁরা অধ্যাত্মজগতে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্জনে তপস্যা করেছেন। নির্জনে তপস্যা না করে কেউ যদি ভাবেন অধ্যাত্মশক্তির আধার হয়ে যাবেন তবে তিনি ভুল করবেন।

সেন্ট বেনিডিক্ট ঈশ্বরোপলব্ধির উদ্দেশ্যে রোম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে নির্জন গুহার অভ্যন্তরে বছরের পর বছর তপস্যায় কাটিয়েছেন। যখন তাঁর সম্মুখে অধ্যাত্ম-আলোর বিচ্ছুরণ হলো, তখন তিনি দেখতে পেলেন, চার্চে অনেক দুর্নীতি ঢুকে গেছে। তিনি অনুভব করলেন, চার্চের কিছু সংস্কারসাধন প্রয়োজন। কিন্তু যেকোন সংস্থাতেই এমন লোকের অভাব হয় না যাঁরা সংস্কারবিরোধী। কোন প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন করার চেষ্টা হলে এঁরা বিদ্রোহ করেন। সেন্ট বেনিডিক্টের সংস্কার-প্রচেষ্টাকে চার্চের একদল লোক প্রবলভাবে বাধা দিলেন এবং বিদ্রোহ করলেন।

প্রবল বিরোধিতা পেয়ে সেন্ট বেনিডিক্ট দমে গেলেন। ভাবলেন, সংস্কারের চেষ্টা বৃথা। এঁরা সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধিই করছেন না। এঁরা চান অর্থ, এঁরা চান ক্ষমতা, এঁরা চান সম্পত্তি। এঁরা কেউ যীশুকে চান না। বরং গুহাতে পুনরায় ফিরে গিয়ে কঠোর তপস্যায় প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকার চেষ্টাই মঙ্গলজনক হবে। এইসব বিবেচনা করে তিনি আবার নির্জন গুহাভ্যন্তরে তপস্যার জন্য চলে গেলেন। সেন্ট বেনিডিক্টের কিছু অনুরাগীও ছিলেন, যাঁরা তাঁকে তাঁর দেবোপম চরিত্রের জন্য খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। ওঁরা গিয়ে তাঁকে খুঁজে বের করলেন এবং ফিরিয়ে আনলেন।

এইসব অনুরাগী ভক্তদের নিয়ে সেন্ট বেনিডিক্ট নতুন করে চার্চ গড়ে তুললেন। কয়েকজন সাধুকে দিয়ে বারোটি চার্চ তিনি গড়েছিলেন। সেই বারোটি চার্চ তাদের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য বহন করে আজও সগৌরবে বিরাজমান। রোমের চার্চটিতে আটাশ জন ফাদার আছেন। চার্চে বড় বড় বাড়ি রয়েছে, কিন্তু স্নানের ঘর, শৌচাগারের সংখ্যা সীমিত। এঁদের লক্ষ্য গুণগত উৎকর্ষের দিকে, সংখ্যাধিক্যের দিকে নয়। চার্চে সাধুর সংখ্যা কম হোক, কিন্তু সকলেই যেন হন সত্ত্বগুণাশ্রিত এবং আন্তরিক ঈশ্বরানুরাগী। ১৫০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই চার্চে প্রথমে যেসব কঠিন নিয়ম করা হয়েছিল, আজও ইউরোপের সব বেনিডিক্টিন চার্চেই সেগুলি প্রতিপালিত হচ্ছে। ওদের চার্চের নিয়মে চার্চে যোগদানকারীকে একটা সময় শিক্ষানবীশ হিসাবে থাকতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমৃত্যু সে চার্চেই থাকবে। একবার সাধু হওয়ার জন্য এখানে যোগ দিলে আর ঘরে ফিরে যাওয়া যাবে না। ওঁরা যেসব চারিত্রিক গুণাবলী অনুশীলন করার ওপর জোর দেন সেগুলি হলোঃ দারিদ্র্য, নৈতিক পবিত্রতা, আজ্ঞাবহতা ইত্যাদি। আর প্রত্যেক সাধুকে কিছু শারীরিক পরিশ্রমের কাজও করতে হবে। ফাদারদের দেখেছি সবজিবাগানে কাজ করছেন। আর প্রত্যেককে কিছু কিছু স্বাধ্যায়ও করতে হবে। মনকে তো সবসময়ই ঈশ্বরে দিয়ে রাখা যায় না। সারাদিন ধরে প্রার্থনাও করা যায় না। সবসময়ে ধ্যান করাও সম্ভব নয়। ভারতে সাধু-মহাপুরুষেরা যেমন স্বাধ্যায় বা শাস্ত্রপাঠের ওপর জোর দেন সেন্ট বেনিডিক্টও তেমনি অধ্যাত্ম-শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিতেন। তিন-চারবার প্রার্থনা-উপাসনা এবং নিত্যকার একটা রোজনামচা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। দিনের কাজ চলবে সেই রোজনামচা ধরে। তার কোথাও বিচ্যুতি হবে না। নিষ্ঠার সঙ্গে সকলকে সেই রুটিন পালন করতে হবে। [ক্রমশঃ]

প্রাসঙ্গিকী

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং লোককল্যাণ

কারও কারও মনে শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীব-সেবা'র বাণীটি নিয়ে প্রশ্ন বা সংশয় আছে। সে-প্রশ্ন বা সংশয় হলো—

এক ঃ শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা উপদেশচ্ছলে বলে থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ কি এই শিবজ্ঞানে জীবসেবা বা লোককল্যাণের আদর্শকে স্বামী বিবেকানন্দের মতো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন?

দুই ঃ 'কথামৃত' পড়লে মনে হতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বা জগৎকল্যাণের আদর্শকে মুক্তিলাভের জন্য সাধনার সমতুল্য বলে মনে করতেন না, বরং মোক্ষলাভের পথ হিসাবে ঈশ্বর-ভক্তিকেই তিনি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। কেউ মানুষের উপকার করার কথা বললে তিনি বরং বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। 'কথামৃত' থেকে অনেক উদ্ধৃতি তুলে প্রমাণ করা যায় যে, তিনি বরং পরোপকার বা বিভিন্ন জনহিতকর কাজের প্রতি তাঁর অনীহার কথাই ব্যক্ত করেছেন।

এই দুটি প্রশ্ন বা সংশয়ের নিরসনকল্পে সবিনয়ে দু-চার কথা বলতে চাই।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে নানা সদালাপ ও নির্দোষ রঙ্গরসের কথাবার্তা বলছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের কথা উঠল। 'জীবে দয়া' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলেই তিনি হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্য-দশায় ফিরে এসে বলতে লাগলেন ঃ "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, 'ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', ১৩৮৬, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ২৩৯—২৪০]

ভক্তদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথও সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন ঃ "ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐকথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম।... ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।... ভগবান যদি কখনও দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব'।" [ঐ, পৃঃ ২৪০-২৪১]

পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে এই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র তত্ত্বকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাযজ্ঞের মাধ্যমে বাস্তব রূপ দিয়েছেন, সে-ইতিহাস এখন সর্বজনবিদিত।

এখন দেখা যাক, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র এই উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের জীবনে কিভাবে গুরুত্বদান করেছেন এবং গৃহীত ভাবধারাকে কিভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থ পর্যটনে কাশীধামের পথে বৈদ্যনাথধামে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বৈদ্যনাথধামের কোনও এক গ্রামে এসে সেখানকার মানুষের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য দেখে অস্থির হয়ে থমকে দাঁড়ালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মথুরকে ডেকে বললেন ঃ "তুমি তো মার দেওয়ান; এদের এক

মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।" মথুর খরচের কথা ভেবে বিনীতভাবেই বললেন: "বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক, এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় কী বলেন?" লীলাপ্রসঙ্গকার লিখছেন: "সেকথা শুনে কে? বাবার তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, 'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।'

"এই বলিয়া বালকের ন্যায় গোঁ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন! তাঁহার ঐরূপ করুণা দেখিয়া মথুর তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া 'বাবা'-র কথামত সকল কার্য করিলেন। 'বাবা'ও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মথুরের সহিত ৺কাশী গমন করিলেন।" (ঐ, ১ম ভাগ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ১৩৮৩, পৃঃ ২২২) পুঁথিকারও এই ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছেন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, ১০ম সং, পৃঃ ১৪৫-১৪৬)

প্রসঙ্গতঃ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তাঁর একটি প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ আচরণকে ভারতবর্ষে 'সত্যাগ্রহের' প্রথম দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

একই ধরনের আরও একটি ঘটনারও উল্লেখ করেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার। সে-ঘটনার বিবরণ তাঁর ভাষাতেই তুলে ধরছি। লীলাপ্রসঙ্গে তিনি লিখছেন: "মথুরের জমিদারি মহল পরিদর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুর এক স্থানের পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের দুর্দশা ও অভাব দেখিয়া তাহাদিগের দুঃখে কাতর হন এবং মথুরের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, এক-একখানি নতুন কাপড় এবং উদর পুরিয়া একদিনের ভোজন' দান করাইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, রানাঘাটের সন্নিকটে কলাইঘাটা নামক স্থানে পূর্বোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। মথুরবাবু ঐ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় করিয়া চূর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।" (১ম ভাগ, সাধকভাব, পৃঃ ৩৪৪-৩৪৫ এবং গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ২২২-২২৩)। পুঁথিতেও (পৃঃ ১৫৮) ঘটনাটি উল্লিখিত হয়েছে।

ঠাকুর শিবজ্ঞানে জীবসেবার উপদেশ দেবার আগেই সেই ব্রতকে যে নিজের জীবনে গ্রহণ এবং পালন করেছেন উপরোক্ত ঘটনা দুটি তা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট বলেই মনে করি।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'কে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর মতো গুরুত্ব দিতেন কিনা, এ প্রশ্ন বা সংশয় অত্যন্ত অবান্তর এবং হাস্যকর। ঠাকুর আর স্বামীজী কি আলাদা ছিলেন? ঠাকুরের 'নরেন' যে তাঁর নিজেরই আর এক সত্তার নাম, একথা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীপাঠকমাত্রই জানেন। তবুও যদি কারও মনে এব্যাপারে কোন সংশয় থেকে থাকে, তবে তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই ভাল।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ঠাকুর এবং তাঁর প্রাণস্বরূপ নরেনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের এবং অভিন্ন অস্তিত্বের একটি হৃদয়স্পর্শী ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁকে উদ্ধৃত করেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখছেন: "নিদ্রাভঙ্গে বেলা প্রায় ৫টার সময় নরেন্দ্র গৃহমধ্যে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মনে হইল এইবার তিনি তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গা ঘেঁষিয়া একপ্রকার তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, (আপনার শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া) 'দেখছি কি— এটা আমি, আবার এটাও আমি; সত্য বলছি,— কিছুই তফাৎ বুঝতে পারচি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে,— সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে! —বুঝতে পাচ্চ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন?' ঐরূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তামাক খাব'। আমি (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল) ব্যস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া তাঁহার হুঁকোটি তাঁহাকে দিলাম। দুই-এক টান টানিয়াই তিনি হুঁকোটি ফিরাইয়া দিয়া 'কলকেতে খাব' বলিয়া কলকেটি হাতে লইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই-চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন,

'খা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সঙ্কুচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর তো ভারী হীন বুদ্ধি,—তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।' ঐ কথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে তামাকু খাওয়াইয়া দিবার জন্য পুনরায় নিজ হাত দুইখানি তাঁহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া দুই-তিনবার তামাক টানিয়া নিরস্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় তামাকু সেবন করিতে উদ্যত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, হাতটা ধুইয়া তামাক খান।' কিন্তু সে-কথা শুনে কে? 'দূর শালা, তোর তো ভারী ভেদ-বুদ্ধি' এই কথা বলিয়া ঠাকুর উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। খাদ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে যে ঠাকুর উহা উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে কখন খাইতে পারিতেন না, নরেন্দ্রের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাকে অদ্য ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমি (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল) স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্দ্রনাথকে ইনি কতদূর আপনার জ্ঞান করেন।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, 'ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃঃ ২২৬-২২৮)

এব্যাপারে স্বামীজী কি বলছেন? তিনি বলছেনঃ "আমি নিজে যাহা কিছু হইয়াছি, ভবিষ্যতে পৃথিবী যাহা হইবে, তাহার সবকিছুরই মূলে আছেন—আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৫, পৃঃ ৩২৫)

এর পরেও কি আমরা বলব 'জীবসেবা'র বিষয়ে ঠাকুর এবং স্বামীজীর মত আলাদা হওয়া সম্ভব?

এবার আমরা 'কথামৃত' থেকে বিচার করে দেখব, জীবসেবার কর্মকে শ্রীরামকৃষ্ণ মোক্ষলাভের সাধনার তুল্য মর্যাদা দিয়েছেন কিনা। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়ই হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি ইত্যাদি তৈরির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সে কখন? যখন দেখেছেন, সে-কর্ম নিষ্কামভাবে না করে লোকমান্য লাভের জন্যে করার কথা বলা হচ্ছে তখন তার বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের কথায়ঃ "দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়—সে ভাল না, তবে নিষ্কাম করলে ভাল। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন।"

"সাক্ষাৎকার হলে ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করবে যে 'আমি কতকগুলো পুকুর, রাস্তাঘাট, ডিস্পেনসারি, হাসপাতাল—এইসব করব, ঠাকুর আমায় বর দাও।' তাঁর সাক্ষাৎকার হলে ওসব বাসনা একপাশে পড়ে থাকে।"

"তবে দয়ার কাজ—দানাদি কাজ—কি কিছু করবে না?"

"তা নয়। সামনে দুঃখ কষ্ট দেখলে টাকা থাকলে দেওয়া উচিত। জ্ঞানী বলে, 'দে রে, দে রে, এরে কিছু দে'।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম কথিত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৪৪৬)

শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্র বলছেনঃ "যার টাকা আছে তার দেওয়া উচিত। (ত্রৈলোক্যের প্রতি) জয়-গোপাল সেনের টাকা আছে। তার দান করা উচিত। ও যে করে না, সেটা নিন্দার কথা। এক-একজন টাকা থাকলেও হিসেবী (কৃপণ) হয়,—টাকা যে কে ভোগ করবে তার ঠিক নাই।" (ঐ, পৃঃ ৪৭৪)

"কর্ম চাই, তবে দর্শন হয়।… কর্ম না করলে ভক্তিলাভ হয় না, ঈশ্বরদর্শন হয় না। ধ্যান, জপ এইসব কর্ম, তাঁর নাম গুণকীর্তনও কর্ম—আবার দান, যজ্ঞ এসবও কর্ম।" (ঐ, পৃঃ ৭৯৯) এখানে দেখছি ঠাকুর দানকে ধ্যান-জপের তুল্য মর্যাদা দিচ্ছেন।

ভক্ত সুরেন্দ্রকে (সুরেন্দ্রনাথ মিত্র) শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "তুমি আফিসে মিথ্যা কথা কও। তবে তোমার জিনিস খাই কেন? তোমার যে দান-ধ্যান আছে; তোমার যা আয়, তার চেয়ে বেশি দান কর…।"

"তুমি যে দান-ধ্যান কর, খুব ভাল। যাদের টাকা আছে, তাদের দান করা উচিত। কৃপণের ধন উড়ে যায়, দাতার ধন রক্ষা হয়, সৎকাজে যায়।… যে দান-ধ্যান করে, সে অনেক ফললাভ করে; চতুর্বর্গ ফল।" (ঐ, পৃঃ ৮৫৭)

কখনো কখনো দয়া, পরোপকার, হাসপাতাল-ডিস্পেনসারি ইত্যাদি করতে চাওয়া প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব কথা বলেছেন, আপাতদৃষ্টিতে তার বিচার

করে দেখলে মনে হতেই পারে যে, তিনি এসবের বদলে একমন একপ্রাণ হয়ে ঈশ্বরকে ডাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের পাঠকমাত্রই জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা বা স্বামীজী বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে যেসব উপদেশ দিয়েছেন, সেসব উপদেশকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে যে-প্রেক্ষাপটে তাঁরা ঐসব উপদেশ দিয়েছেন, সেই প্রেক্ষাপটেই তার বিচার করতে হয়। অন্যথায় তাঁদের কথাকে অনেক সময়ই স্ব-বিরোধী বলে মনে হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঠাকুর বলছেনঃ "আমি পঞ্চবটীর তলায় গঙ্গার ধারে বসে 'টাকা মাটি', 'টাকা মাটি', 'মাটিই টাকা', 'টাকাই মাটি' বলে জলে ফেলে দিছলুম।" (ঐ, পৃঃ ১২১৩)

তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলছেনঃ "টাকা মাটি। মহাশয় চারটা পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তাহলে দয়া পরোপকার করা হবে না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "দয়া। পরোপকার। তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার কর?"...

"সন্ন্যাসী যদি কারুকে কিছু দেয়, সে নিজে দেয় মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের; মানুষে আবার কী দয়া করবে? দানটান সবই রামের ইচ্ছা।"...

"সংসারী ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যদি কাউকে দান করে, সে নিজের উপকারের জন্য, 'পরোপকারের' জন্য নয়। সর্বভূতে হরি আছেন, তাঁরই সেবা করা হয়। হরিসেবা হলে নিজেরই উপকার হলো। 'পরোপকার' নয়। এই সর্বভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না এরূপভাবে যদি সেবা করে, তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম, অনাসক্ত কর্ম করা হয়। এরূপ নিষ্কাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটি পথ। কিন্তু বড় কঠিন, কলিযুগের পক্ষে নয়।" (ঐ, পৃঃ ১২১৪)

তাহলে স্বামীজী কর্মযোগের ওপর এত জোর দিয়ে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' (নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ)—এই মন্ত্র দিলেন কেন? কারণ, স্বামীজী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবই কলিযুগের শেষ এবং সত্যযুগের শুরু ঘোষণা করেছে। কাজেই বনের বেদান্তকে ঘরে আনার, নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নেবার এই তো সময়।

শিবজ্ঞানই যদি না হয়, অর্থাৎ কিনা সর্বজীবে শিব আছেন,—এই ধারণা যদি না হয়, তাহলে শিবজ্ঞানে জীবসেবা হবে কি করে? জীব-শিব ধারণার জন্ম হয় নিষ্কাম কর্মযোগের মধ্য দিয়েই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "তাই বলছি, যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম করে, দয়া-দান করে, সে নিজেরই মঙ্গল করে। পরের উপকার, পরের মঙ্গল, সে ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র, সূর্য, বাপ, মা, ফল, ফুল, শস্য জীবের জন্য করেছেন। বাপ-মার ভিতর যা স্নেহ দেখ, সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া। নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোনও সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না।" (ঐ)

মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, একথা তো শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন। 'কথামৃতে'র পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে সে-কথা। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিইঃ "প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর মানুষে হবে না?" (ঐ, পৃঃ ৪৮৩) "মানুষকেও আমি ঠিক সেইরূপই দেখি।" (ঐ, পৃঃ ৪৭২) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিবদর্শন করা এবং শিবজ্ঞানে মানুষের সেবা করার কথা তাঁর মতো এমন করে আর কেউ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, যাতে জীবের মধ্যে আমরা শিবকে দর্শন করতে পারি। □

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী
উত্তরপাড়া, হুগলী
পিন-৭১২২৫৮

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচক: স্বামী বাসুদেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সূক্ষ্মশরীর

প্রশ্ন: পূর্বজীবন যদি থাকে, তো তার কথা মনে পড়ে না কেন?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: এই জীবনের জন্মকালের কথাই কারুর মনে থাকে না, তো আবার পূর্বজন্মের। মাতৃগর্ভের কথাও কি আমাদের স্মরণে আসে? এই জীবনের ভুলে যাওয়া বিষয় যেমন মনস্থির করে জানতে হয়, পূর্বজীবনের কথাও খুব মনস্থির করলে জানা যেতে পারে।

প্রশ্ন: পূর্বজীবন ছিল কার? এই শরীরটার? না, এর ভিতরেরও আর একটা কিছুর?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: এই স্থূল শরীরের ভিতর যে একটা সূক্ষ্মশরীর আছে, তার। যেমন, ডিমের ভিতর থেকে পাখিটা বেরিয়ে গেল ডিমটা ভাঙা পড়ে রইল।

প্রশ্ন: তাকে দেখতে পাওয়া যায় না কেন?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: খুব সূক্ষ্ম বলে। দেখতে তো অনেক জিনিসই পাওয়া যায় না, কিন্তু তার লক্ষণ দেখে অনুমান করতে হয়। 'মোশান'টা দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বস্তুর পরিবর্তন দেখে সেটাকে অনুমান করতে হয়।

প্রশ্ন: সেটাও তো শরীর, কাজেকাজেই তাকে জড়ই বলতে হবে, তবে তার আবার কর্মফল ভোগ—এসব কি?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: একটা 'বাল্বে'র ভিতর দিয়ে যে-তারটা, যার কোনও আলোক বিচ্ছুরিত করবার শক্তি নেই, কিন্তু বিদ্যুতের সংস্পর্শে সেইটাই উদ্দীপিত হয়ে ওঠে এবং আলোক দেয়।

প্রশ্ন: তাহলে বিদ্যুৎ দিয়ে যাকে লক্ষ্য করছেন, তিনিই কি কর্তা ভোক্তা?

স্বামী বাসুদেবানন্দ: তিনি কর্তাও নন, ভোক্তাও নন, একটা সর্বজনীন জ্ঞান। সেই অখণ্ড জ্ঞান যখন কোনও একটা বিশিষ্ট সূক্ষ্ম নামরূপের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় তখন তাকে জীব, ব্যক্তি, পুদ্গল প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। যেমন কোন বিশিষ্ট আকারহীন বিদ্যুৎ একটা ঘোড়ার খুরের মতো তারে জড়িত হয়ে একটা অশ্বখুরের আকার ধরে জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনি।

প্রশ্ন: তাহলে জীবের নিত্যতা সিদ্ধ হয় কি করে? কারণ, যে-জিনিসটা দুটোর সংযোগে তৈরি হয় সেটা তো চিরকাল থাকবে না। কাজেকাজেই জীব উৎপত্তি ও বিনাশশীল হলে তার পুনর্জন্ম হতেও পারে, নাও হতে পারে।

স্বামী বাসুদেবানন্দ: জীবের জীবত্ব অর্থাৎ উপাধিটা অনিত্য, কিন্তু তার মধ্যে যে প্রত্যক্ চৈতন্য সেটি অনাম ও অরূপ। সেইটাই নিত্য। জীবস্বরূপ নামরূপ যখন ত্যাগ হয়ে যায় তখন আর জন্ম হয় না। যেমন, তার নষ্ট হলে বিদ্যুৎ অনামরূপ হয়ে রইল। কিন্তু ঐ তারটি, ঐ সূক্ষ্ম শরীরটি তত শীঘ্র নষ্ট হয় না, নষ্ট হতে বহু জীবনের মধ্য দিয়ে অসংখ্য কল্প কেটে যায়। পরিপূর্ণ জ্ঞান হলে ঐ দীপশিখাটির নির্বাণ হবে।

(২৪।১০।৪২) [ক্রমশঃ]

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি-সঞ্চয়ন

চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতার বাগবাজারে স্বর্গীয় ভক্তপ্রবর বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে সেখানে অনেক ব্যক্তি এই ব্রহ্মবিদ্ মহাযোগীকে দর্শন করিতে ও তাঁহার নিকট হইতে ধর্মসাধনার ব্যাপারে উপদেশ শুনিবার জন্য যাইতেন। শ্রীশ্রীমহারাজ যেখানেই থাকিতেন সেখানেই অনাবিল শান্তি ও আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইত। সংসারের শোক-দুঃখে কাতর কোন কোন ব্যক্তিও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে করুণামাখা সান্ত্বনার বাণী শুনিয়া জীবনের জ্বালা জুড়াইতেন। শোক-দুঃখ জর্জরিত সংসার-সন্তপ্ত মানুষেরা তাঁহার পরম প্রশান্ত জ্যোতির্ময় আনন্দমূর্তি দেখিয়া সত্যই সমস্ত দুঃখ-জ্বালা ভুলিয়া যাইত। আবার অল্পবয়স্ক মুমুক্ষু বৈরাগ্যবান অবিবাহিত যুবকেরা মহারাজের প্রত্যক্ষ অনুভূতিময় ও প্রাণপ্রদ উপদেশ-বাণী শুনিয়া ধর্ম-সাধনার ও মুক্তিলাভের সন্ধান পাইতেন। তাঁহার সেই সমস্ত উপদেশ-বাণী এখনও বহু ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ধর্মান্বেষী ব্যক্তিকে অভয় আশা ও আশ্বাস দিতেছে।

একদিন এই সময়ে বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়িতে বিকালবেলায় জনৈক গৃহস্থ ব্যক্তি শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রশ্ন করিলেন ঃ

"মহারাজ! ভগবানই যদি সকল শান্তির মূল, তাহলে লোকে তাঁকে ভুলে গিয়ে সংসারের অসার বিষয়ে মেতে যায় কেন? শান্তিলাভই যদি মানুষের লক্ষ্য—তাহলে বেশির ভাগ লোকে আসল শান্তির মূল ভগবানকে ভুলে থাকে কেন?"

শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার উত্তরে বলিলেন ঃ "ভগবান যে সকল শান্তির মূল সে-কথা ঠিক। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার করেই মানুষ এই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে অমৃতত্ব লাভ করে। কিন্তু সে-কথা বুঝতে পারে কজন? জন্মজন্মান্তরের ভোগপ্রবৃত্তি ও কুবাসনাই ধর্মলাভের প্রধান বাধা। সাধারণ লোকের মনের তলায় ঐসব হীন সংস্কার গাদা হয়ে আছে। তাদের মন তাই মোহগ্রস্ত; সবসময়েই তাদের মন চঞ্চল, খালি ভোগের বিষয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভোগবাসনার সংস্কার আছে বলেই নিত্যবস্তুর দিকে তাদের মন যায় না। দেহের প্রবৃত্তি প্রবল বলেই তাদের বিবেক পাথর চাপা পড়ে আছে। কিসে নিজের কল্যাণ হবে, শান্তি হবে, এ-বোধ তাদের একেবারেই নেই। এইজন্যে তাদের মন সৎস্বরূপের দিকে যায় না। সৎপ্রবৃত্তি তাদের মধ্যে নেই, এইজন্যে তারা ঈশ্বরকে চায় না।

"এই সংসার দুঃখময়। এখানে সুখ একেবারেই নেই। সুখের ছদ্মবেশে এখানে দুঃখ নানা মূর্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ সুখভোগ করতে গিয়ে তাই শুধু দুঃখই পায়। বাসনাই সকল দুঃখের মূল। সংসারের এই ছল-চাতুরীকে ধরে ফেলা ভারী শক্ত। যাদের বিবেক-বৈরাগ্য আছে তারাই বুঝতে পারে যে, সংসারের মধ্যে সুখ-শান্তি মোটেই নেই। অসার বিষয়-সুখের দিকে তাদের মন যায় না। তারা জানে বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি, মান-যশ এসমস্তই বন্ধন। তারা জেনেছে এদের মধ্যে শান্তি নেই, বরং আছে নানা দুঃখ ও অশান্তি। তারা জানে সংসারে সুখ ক্ষণস্থায়ী, সে-সুখ সুখই নয়। এই সুখভোগের পরিণাম বিষময়। এতে শুধু জ্বালা-যন্ত্রণা, অশান্তি আর মনোকষ্ট। শান্তি আর কোথাও নেই। আসল শান্তি আছে শুধু একমাত্র সেই ঈশ্বরে। সমস্ত ভোগবাসনা একেবারে ত্যাগ করে যারা ঈশ্বরকে ধরে পড়ে আছে তারাই শুধু এই দুঃখ-অশান্তি থেকে রেহাই পায়।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ঃ "মহারাজ! এরকম সর্বত্যাগী লোক কোথায়? সংসারে সবাই তো দেখছি চায় টাকাকড়ি, ভোগসুখ, বিষয়-সম্পত্তি। ভগবানকে ঠিক মতন চায় এমন লোক তো কাউকে দেখি না।"

মহারাজ ঃ "সেইজন্যেই তো সংসারী লোকেরা নানা অশান্তিতে জ্বলে মরে। বারবার এত দুঃখ-কষ্ট পায় তবুও সংসারী লোকে ঈশ্বরকে ডাকতে চায় না।

"যারা ঠিক ঠিক ভগবানকে চায় তাদের সংখ্যা খুবই কম। লাখের মধ্যে একজন হয়তো, তবে খুব বেশি হলো। অনেক জন্মের সুকৃতি ও পুণ্য থাকলে তবে বিষয়ভোগে আসক্তি থাকে না। মুমুক্ষু সাধক কি আর যে সে হতে পারে? ভিতরে অহঙ্কার, দম্ভ, স্বার্থপরতা থাকতে ভগবানে মন যায় না। টাকাকড়ি, মান-যশের অহঙ্কারেই বেশির ভাগ লোক ফুলে মরছে। টাকার মালিক হলে মানুষ অহঙ্কারে ফেটে পড়ে। টাকার অহঙ্কার সাংঘাতিক। টাকার দেমাকে মানুষ ধরাকে সরা জ্ঞান করে। আবার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারেও মানুষকে কম অন্ধ করে না। যাদের ভিতরে সার-পদার্থ নেই সেসব লোকই পণ্ডিত হয়ে অপরকে ঘৃণা করে। এছাড়া হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অপরের অনিষ্ট করবার মতলব—এইসব হীনবৃত্তি মানুষকে একেবারে পশু করে রেখেছে।

"মানুষের আকার হলেই তো আর মানুষ হয় না। জ্ঞান, পবিত্রতা, সংযম যার আছে সে-ই ঠিক মানুষ। ভিতরে এই যে সব হীনবৃত্তি, তাদের প্রথমেই জয় করা দরকার। পশুর স্তর থেকে মানুষের স্তরে উঠতে হবে, তবে তো ধর্মভাব আসবে।

"মনের মধ্যে হাজার রকমের হীন প্রবৃত্তি ও কুচুটে ভাব রেখে সাধন করা যায় না। সরলতা, সংযম, সত্যনিষ্ঠা না থাকলে ধর্মজীবনের কোনই দাম নেই। ধর্মজীবন গড়তে হলে দয়া, ভালবাসা, স্বার্থত্যাগ—এসব আগে চাই। মন সরল, পবিত্র না হলে যতই মালা ফেরাও আর নিরামিষ খাও ও-সবই পণ্ডশ্রম। বাইরে ভক্ত সাজলে তো হবে না, মনে-প্রাণে ভক্ত হতে হবে। নোঙর ফেলে হাল টানলে নৌকা এক পাও এগুবে না। অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থপরতা এসব জঞ্জাল আগে দূর করতে হবে। জমিতে আগাছা, কাঁকর এসব থাকলে সেখানে চাষ-আবাদ করার মেহনত একেবারেই বরবাদ যায়। ধর্মলাভ করতে হলে তাই মনকে সরল, পবিত্র, নির্মল করতে হবে। লোভ-লালসা, কুঁড়েমি আর হিংসুটে স্বভাবের জন্য হাজার হাজার লোক সাধু হয়েও ধর্মলাভ করতে পারে না। হিংসুটে, কুঁড়ে আর পেটুক লোকের পক্ষে সাধক হওয়া অসম্ভব।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ঃ "মহারাজ! তাহলে আমাদের মতন লোকের উপায় কি?"

মহারাজ ঃ "দ্যাখ, আসল ধর্মজীবন যাপন করতে হলে ভোগ আর যোগে গোঁজামিল চলে না। বিষয়-বাসনাকে একেবারে ত্যাগ করতে হবে। বাসনার একটিও কণা থাকতে ভগবানে মন বসে না। সরল ও পবিত্র হয়ে ষোল আনা মন-প্রাণ ঢেলে সাধন-ভজনে না মেতে গেলে ধর্মলাভ অসম্ভব; অহংভাবকে একেবারে উপড়ে ফেলতে হবে। সমস্ত সুখভোগের আশা বিসর্জন দিয়ে শুধু ঈশ্বরে ডুবে যেতে না পারলে উপায় নেই। যে-কাজেই উন্নতি করতে চাও সে-কাজেই সবসময়ে ষোল আনা মন দিয়ে লেগে পড়ে থাকতে হয়—তবে সেই ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ হয়। ঈশ্বরকে পেতে হলে তেমনি সমস্ত ভোগের আশা দূর করে দিয়ে শুধু তাঁরই ধ্যানে তাঁর চিন্তাতেই নিজেকে ভুলে যেতে হবে। হিসেবী বুদ্ধি থাকতে এপথে উন্নতি হওয়া মুস্কিল। টাকা জমানো ভারী খারাপ অভ্যাস। সাধু হয়ে যে টাকা জমায় তার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হয়। তাকে আর এগিয়ে (সাধন-পথে) যেতে হবে না। এ-জন্মের মতন তার সব খতম। হয় সংসার, নয় ঈশ্বর—এ দুয়ের একটা নিয়ে থাক—দুই কখনো একসঙ্গে হয় না। বিষয়ে আসক্তি ও ভগবানে অনুরাগ একেবারেই বিপরীত জিনিস, যেমন দিন আর রাত্রি। যেখানে সংসার সেখানে ভগবান নেই—যেখানে ভগবান সেখানে সংসার নেই। 'সংসারের সব সুখ ভোগ করব অথচ ভগবানকেও পাব'—এ কখনই হতে পারে না।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ঃ "মহারাজ! এসমস্ত ত্যাগীদের

পক্ষেই সম্ভব। যারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারে আছে তাদের উপায় কি ?"

মহারাজ: "ঐতো এক কথাই বারবার বলছি। ত্যাগ ভিন্ন মুক্তি হয় না, ভোগ আর যোগের গোঁজামিল করবার জন্যে আমরা (শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বত্যাগী সিদ্ধ শিষ্যেরা) আসিনি। আমরা জানি, ত্যাগ-সংযম ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব। সমস্ত হীন সংস্কারকে জয় করতে হবে, তবে মন নিত্যবস্তুর দিকে যাবে। একেই তো মন চঞ্চল, বিষয়-চিন্তায় থাকলে মন আরও চঞ্চল হয়ে পড়বে। বিষয়ভোগে মনের ঐসব হীন সংস্কার আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ঐসব হীন সংস্কার উপড়ে না ফেললে কি আর উপায় আছে? সংসারে একবার ঢুকলে মনকে আর শুদ্ধ অবস্থায় রাখা যায় না। ছেলেবেলা থেকেই তাই সাধনে লেগে যেতে হয়। অল্পবয়স থেকে সাধন-ভজনে একমনে লেগে থাকলে তবে যদি কিছু হয়। সাধন-ভজনের অধিকারী তারাই—যারা সমস্ত বাসনা-কামনা ত্যাগ করে সবসময়ে নিত্যবস্তুর চিন্তায় ডুবে গেছে। যাদের সৎসংস্কার তারা ছেলেবেলা থেকেই এইদিকে যাবার চেষ্টা করে। তাদের ভিতর থেকেই তাগাদা আসে—কোথায় সদ্‌গুরু আছেন তাঁকে খুঁজে খুঁজে বার করবে। মানুষ-জন্ম বড় দুর্লভ। ভোগসুখের নেশায় মেতে ঈশ্বরকে ভুলে থাকলে মানুষ-জন্ম বৃথা। আসল মানুষ-জন্ম তারই, যে সেই নিত্যবস্তুকে পাবার জন্যে ছেলেবেলা থেকেই প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

"সংসারের সুখ আলুনি (বিস্বাদ) বোধ হলে সেদিকে আর সাধকের মন যায় না। তখন সে খুঁজে বেড়ায় কোথায় আছেন সদ্‌গুরু যিনি স্বয়ং ঈশ্বর-দর্শন করেছেন। তার মন তখন চায় গুরুর কাছে গিয়ে সাধন-ভজনে ডুবে থাকতে। যার তার কাছে দীক্ষা নিলে কি হবে? ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ ভিন্ন অন্য গুরুর দীক্ষা কোন কাজেরই নয়। যে আত্মসাক্ষাৎকার করেনি, ঈশ্বরলাভ করেনি সে তো নিজেই বদ্ধ, সে আবার অপরকে কি ধর্ম শেখাবে? অন্ধ কখনো অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না। গুরুই যার অন্ধ, সে-শিষ্যের কি কখনো সদ্‌গতি হয়?

"তিন জিনিস দরকার—নিজের মুমুক্ষুতা, সদ্‌গুরুর আশ্রয় আর সবসময়ে সত্যতত্ত্বের ধ্যান। ছেলেদের মধ্যে যাদের দেখি সৎসংস্কার ও সাধনের দিকে মন আছে তাদেরই এই সাধন-ভজনের ভিতরকার কথা বলে দিই। যাদের ভিতরে সার-পদার্থ নেই সেই সব তামসিক লোককে উপদেশ দিয়ে লাভ কি! অনেক লোকই তো আসে, কিন্তু দেখি আসল ধর্ম-ভাব দু-একজনেরই আছে। উপদেশ শুনে যে প্রাণ দিয়ে খাটে তাকেই উপদেশ দিতে ভাল লাগে। সাধন-ভজন করে না, এখানে ওখানে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, এসব হাভাতে লোককে তাই কিছু বলি না। অহঙ্কারী, বাচাল আর অতি-বুদ্ধিমান লোকই তো বেশির ভাগ; দু-একজন ভিন্ন আসল বৈরাগ্য আর কারুর মধ্যে তো দেখতেই পাই না। ঠিক ঠিক ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে আর কজন এখানে আসে? বেশির ভাগই ফাজিল, হুজুগে আর বিচারবুদ্ধি-হীন।"

গৃহস্থ ব্যক্তি: "মহারাজ! তাহলে এই যে এতসব লোক মন্দিরে তীর্থে যাচ্ছে, সাধুদের দর্শন করতে আসে তাদের মধ্যে কি তবে ধর্মভাব নেই?"

মহারাজ: "দল বেঁধে হুজুগ করে ধর্মলাভ হয় না। ঠিক ঠিক ধর্ম দু-একজনেরই হয়। ধর্ম একা একারই জিনিস। যার তার সঙ্গে হৈ হৈ করে এখানে সেখানে বেড়ানো সাধকের লক্ষণ নয়। সাধক হবে ধীর, স্থির, একনিষ্ঠ, অন্তর্মুখী।

"আসল ধর্মভাব কোথায় আর আছে? ধর্ম কি এতই সস্তা যে, হাজার হাজার লোক শুধু মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ালেই তা লাভ করে ফেলবে? ধর্ম কি বাজারের আলু পটল যে, দাম দিয়ে কিনে ফেলবে? Mass-এর (অজ্ঞ জনসাধারণের) মধ্যে ধর্ম নেই। ওসব লোক ঘোর তমোগুণী, সাধনে ডুবতে চায় না। ওদের মধ্যে ধর্ম নেই, আছে লোকাচার দেশাচারমাত্র। ভক্তি-বিশ্বাস অনেক জন্মের সাধন থাকলে হয়। লাখ লাখ লোকের মধ্যে মাত্র দু-একজন লোকের মধ্যে ধর্মভাব আছে। এই যে এতলোক এসে উৎসবে মাতামাতি করে, ঠিক ঠিক ভক্তি-বিশ্বাস কি এদের মধ্যে একজনেরও আছে? সংসারের হাজার বাসনা ওদের মনকে জুড়ে বসে

আছে, ওখানে ঈশ্বর ঠাঁই পাবেন কি করে? ঈশ্বরকে একটা প্রণাম করতে গিয়েও ওরা তার সঙ্গে দশটা কামনা জুড়ে দেয়।

"হাজার হাজার লোক তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মন্দিরে মন্দিরে পূজা-পাঠ করছে, কিন্তু সত্যিই কি তাদের ভগবানের দিকে টান আছে? সত্যিই কি তারা ভগবানকে আপনার থেকে আপনার বলে ভালবাসে? উৎসবে এসে প্রসাদ পেলেই ভক্ত হয় না। ভক্ত হওয়া ভারী কঠিন। যার মনে সবসময়ে ভগবানের চিন্তা বয়ে চলেছে সেই লোকই শুধ ভক্ত। যে অবিশ্রান্ত ভগবানের ভজনা করে তাকেই বলে ভক্ত। ভক্তের শুধু এক চিন্তা—ভগবান ভগবান আর ভগবান। ভগবানই তার যথাসর্বস্ব। তার সমস্ত মন শুধু ভগবানেই ডুবে গেছে। এক ভগবান ভিন্ন তার মনে আর কোনই কামনা নেই। আসল ভক্তের কাছে সংসারের সুখ জঞ্জালের গাদা। ভগবানকে ভালবাসা ভিন্ন সে আর কিছু চায না। এমনকি স্বর্গসুখ মুক্তি পর্যন্তও সে গ্রাহ্য করে না। হাজার দুঃখ-কষ্ট পেলেও সে ভগবানকে ভোলে না। যতই দুঃখ-কষ্ট পায় ততই সে ভগবানকে আঁকড়ে ধরে। কারণ, সে জানে ভগবান ভিন্ন ত্রিসংসারে তার আর কেউ আপনার নেই।

"ভগবানের স্বাদ পেলে কি আর কিছু ভাল লাগে? ভগবানে একমন, একপ্রাণ, একধ্যান যার হয়েছে, সে-ই শুধু ভক্ত হতে পারে। এখন এরকম ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য কোথায়? বাইরে ভক্তের সাজ আর ভিতরে বুজরুকি! ভিতরে এককণা ভক্তি-অনুরাগ নেই, এদিকে নিজেকে 'ভক্ত' বলে জাহির করে বেড়ায়। ভগবানে ষোল আনা নির্ভর করে তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা কি যার তার কর্ম? ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বিদুর, শুকদেব, উদ্ধব এইসব মহাপুরুষরাই ভগবানের ভক্ত। ভগবানের প্রতি ভক্তির লক্ষণ কি যদি দেখতে চাও তবে সনাতন গোস্বামীকে দ্যাখ। এরকম ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি, বিশ্বাস কার আছে দ্যাখাতে পার কি? এই যে ঠাকুরের ঐ কজন ত্যাগী সন্তান—ওঁদের মতন ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি, বিশ্বাস আর কোথাও দেখেছ কি?"

গৃহস্থ ব্যক্তি: "মহারাজ! এঁরা কত উন্নত, এঁদের সঙ্গে কি আর সাধারণ লোকের তুলনা হয়?"

মহারাজ: "সে-কথা ঠিক; এই রকম একনিষ্ঠ সর্বত্যাগী হয়ে ভগবানকে ডাকতে না পারলে তাঁকে পাওয়া যায় না। ধর্মসাধনার পথ ভয়ানক কঠিন। মহামায়ার মায়ায় লোকে বিষয়ের ফাঁদে এমন ভুলে থাকে যে, কিছুতেই ভগবানের দিকে যেতে চায় না। পদে পদে কত পরীক্ষা, কত প্রলোভন, কত বাধা, কত বিঘ্ন। এই সমস্ত প্রলোভনের সঙ্গে প্রতিপদে লড়াই করতে হয়। মায়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া ভারী শক্ত। বাড়ি-ঘর ছেড়েও মানুষ মায়ার হাত থেকে রেহাই পায় না। সাধু হয়েও লোকে সাধন-ভজন করতে চায় না। হৃষীকেশে দেখেছি, সাধুরা সবসময়ে বসে বসে গল্প করছে, না হয় ঝগড়া করছে। ভগবৎপ্রসঙ্গ, জপ ধ্যানের নামই নেই! শুধু একখানা গেরুয়া পরে হরিদ্বার কাশীতে থাকলেই কি আর ঈশ্বরলাভ হয়? কুচিন্তা কুপ্রবৃত্তি লোভ-লালসা দূর করে দিয়ে সবসময়ে ব্রহ্মচিন্তায় ধ্যান-ধারণায় লেগে থাকতে না পারলে জীবন ছন্নছাড়া হয়ে যায়। যত বড় মহাপুরুষের কাছেই দীক্ষা নাও নিজেকে ষোল আনা সাধন-ভজনে লাগিয়ে রাখতে হবে। বিনা তপস্যায় ব্রহ্মারও মুক্তি নেই। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে শুধু দীক্ষা নিলেই হবে না, প্রাণপণে সাধন-ভজন করা চাই। সেইজন্যে ছেলেবেলা থেকে সৎচিন্তা, সদ্বিচার, ধ্যান-ধারণায় একমনে লেগে পড়ে থাকতে হয়। কর্মফল বড় সাংঘাতিক। বড় বড় মহাপুরুষের শিষ্য হয়েও তাই অনেকে কিছুই করতে পারে না। ভিতরে সৎসংস্কার না থাকলে গুরু কি করবেন? শুদ্ধ মনে সাধন-ভজনে প্রাণপণে লেগে থাকলে তবে বস্তুলাভ হয়। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য হলে তবেই কাজ হয়। অন্তরের পবিত্রতাই আসল জিনিস। সেইজন্যে শুদ্ধ অন্তরেই আত্মতত্ত্বের প্রকাশ হয়।"* ☐

* বিশ্ববাণী, ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৬, পৃঃ ৩৩৬-৩৪০

সংগ্রহ: নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বিশেষ রচনা

বিবেকানন্দ ও বেদান্ত : শিকাগো ভাষণের প্রেক্ষাপটে

নীরদবরণ চক্রবর্তী

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগোতে যে-বিশ্বমেলা হয়েছিল, ধর্মমহাসভা ছিল সে-উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন। স্বামী বিবেকানন্দ এই ধর্ম-মহাসভার প্রথমদিনে ১১ সেপ্টেম্বর প্রথম বক্তৃতা দেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ধর্ম-মহাসমিতির পঞ্চম দিবসে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ স্ব-স্ব ধর্মের প্রাধান্য-প্রতিপাদনের জন্য বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হলে স্বামীজী কূপমণ্ডুকের গল্প বলে সকলের মুখ বন্ধ করে দেন। ১৯ সেপ্টেম্বর নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ২০ সেপ্টেম্বর দশম দিবসের অধিবেশনে 'খ্রীস্টানগণ ভারতের জন্য কি করতে পারেন'—এই বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ষোড়শ দিবসের অধিবেশনে 'বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ' বিষয়ে তিনি একটি মনোগ্রাহী ভাষণ দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর সমাপ্তী অধিবেশনে তিনি বিদায়ী ভাষণ দেন। ধর্মমহাসভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে স্বামীজী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন :

(১) শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম এবং বেদান্ত দর্শন ২২ সেপ্টেম্বর পূর্বাহ্ন সাড়ে দশটায়।

(২) ভারতের বর্তমান ধর্মসমূহ ২২ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন।

(৩) পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির বিষয় সম্বন্ধে ২৩ সেপ্টেম্বর।

(৪) হিন্দুধর্মের সারাংশ, ২৫ সেপ্টেম্বর।

মোটামুটি এই বক্তৃতাগুলিকেই স্বামীজীর 'শিকাগো বক্তৃতা' বলা হয়।[১]

প্রশ্ন এই যে, স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্ত ধর্ম ও দর্শন প্রচার করেছেন বলে খ্যাত, সে-বেদান্ত ধর্ম ও দর্শনের কোন আভাস এই বক্তৃতাবলীতে আছে কি? শিকাগো বক্তৃতার শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রশ্ন উঠতে পারে।

'বেদান্ত' বলতে উপনিষদ্‌ বোঝায়। বেদান্ত দর্শনের তিনটি 'প্রস্থান'—শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়। এই ক্ষেত্রে শ্রুতি বলতে বেদোপনিষদ্‌, স্মৃতি বলতে ভগবদ্‌গীতা এবং ন্যায় বলতে বাদরায়ণ ব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্র বোঝায়। গীতা উপনিষদ্‌রূপ গাভীর দুগ্ধ। গীতার ধ্যানে বলা হয়েছে : "সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ, পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ"—সকল উপনিষদ্‌ গাভী সদৃশ, গোপালনন্দন বা শ্রীকৃষ্ণ দোগ্ধা, পার্থ বা অর্জুন বৎস, গীতা অমৃতরূপ দুগ্ধ এবং সুধীজন তার ভোক্তা।

বাদরায়ণ ব্যাস উপনিষদের অবিতর্কিত বিষয়গুলি সূত্রাকারে প্রকাশ করেছেন ব্রহ্মসূত্রে। সুতরাং বেদান্ত দর্শনের তিনটি প্রস্থানই আসলে উপনিষদ্‌কেই বোঝায়। সূত্র বলতে সংক্ষিপ্ত, জটিল বাক্যকে বোঝায়। সূত্র সহজে বোঝা যায় না বলে তার ভাষ্য বা ব্যাখ্যা দরকার। ব্রহ্মসূত্রের নানা ভাষ্য বর্তমান। অবশ্য উপনিষদ্‌গুলির এবং গীতারও নানা ভাষ্য আছে। এই সমস্ত বিভিন্ন ভাষ্য অনুসারে বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শংকরের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং মধ্বের দ্বৈতবাদ বিশেষ খ্যাত।

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম দিনের বক্তৃতার শুরুতেই বলেন : "হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ"। এই সম্বোধন বেদান্তের অনুভূতি-ভিত্তিক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২।৫) আছে : "শোন, শোন, অমৃতের সন্তানগণ, শোন দিব্যালোকের অধিবাসিগণ, আমি সেই মহান পুরুষকে জেনেছি। আদিত্যের ন্যায় তাঁর বর্ণ, তিনি সকল অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে ; তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর অন্য পথ নেই।"

আমরা যদি সবাই "অমৃতের সন্তান" হই, তবে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ভ্রাতা-ভগিনীর

১ দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১৩৬৯ সং, পৃঃ ৯-৩৫

সম্বন্ধ। স্বামীজী এই বোধেই আমেরিকাবাসীদের 'ভ্রাতা ও ভগিনী' বলে উল্লেখ করেছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রটি আবৃত্তি করে নবম দিবসের ভাষণে তিনি বলেছেন: অমৃতের সন্তানেরা পাপী হতে পারে না। মানুষ পাপী নয়। এটি একটি বৈদান্তিক প্রত্যয়। বেদান্ত ধর্মের সঙ্গে যুক্ত সন্ন্যাসি-সমাজ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। স্বামীজী এই সমাজের পক্ষ থেকে ধর্মমহাসভায় উপস্থিত সবাইকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রথম ভাষণে তিনি বললেন, বেদান্ত ধর্ম শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করে না, সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে। এই ধর্ম কাউকেই বহিষ্কার বা বর্জন করে না। এই ধর্মের পীঠস্থান ভারতবর্ষ পৃথিবীর সব ধর্মের ও সব জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে এসেছে। ইহুদীদের খাঁটি বংশধরগণের অবশিষ্টাংশ এবং জরথুস্ট্রের অনুগামী মহান পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশ ভারতে বেদান্ত ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে। বেদান্ত ধর্মের বিশ্বাস শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে ভাষা পেয়েছে: "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। / নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"—নানা নদী যেমন শেষ পর্যন্ত এক সমুদ্রে এসে মিলিত হয় তেমনি রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানা পথে চলেও মানুষ একই লক্ষ্যাভিমুখী; ঈশ্বরলাভই তাদের উদ্দেশ্য। বেদান্তের স্মৃতি প্রস্থান গীতায় (৪।১১) বলা হয়েছে: "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। /মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"—যে যে-ভাব আশ্রয় করে আমার উপাসনা করুক না কেন, আমি তাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই অনুবর্তন করে।

বেদান্ত ধর্ম ধর্মান্তরিতকরণে বিশ্বাসী নয়। সেজন্য তা সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও তাদের ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততায় বিশ্বাস করে না। বেদান্ত বিশ্বাস করে, সমস্ত ধর্মের লোকেরাই একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে অসদ্ভাবের কোন সঙ্গত কারণ নেই। স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম দিনের বক্তৃতায় এসমস্ত কথাই বললেন।

স্বামীজী দ্বিতীয় বক্তৃতায় বললেন, ধর্মে ধর্মে মতভেদের কারণ সঙ্কীর্ণতা। কূপমণ্ডুকের মতো আমরা নিজের ধর্মকূপে অবস্থান করে তাকেই একমাত্র সত্যধর্ম বলে মনে করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—আমার ধর্ম ভাল, আর অন্যের ধর্ম খারাপ, এর নাম 'মতুয়ার বুদ্ধি'; এবুদ্ধি অত্যন্ত গর্হিত। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। যত মত তত পথ। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসভায় তাঁর গুরুর কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন।

শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর তৃতীয় বক্তৃতা 'হিন্দুধর্ম' বিষয়ে। এই বক্তৃতায়ও স্বামীজীর বেদান্ত মত প্রকট। তিনি বললেন: "বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের··· মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র।"[২] বেদান্তের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। আসলে বেদান্তও একপ্রকার বিজ্ঞান, তার নাম স্বামীজী বললেন, 'ধর্মবিজ্ঞান'। বিজ্ঞানের সত্য যেমন আমরা পরীক্ষাগারে যাচাই করি, তেমনি বেদান্তের সত্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মতো বেদান্তীদের পরীক্ষাগারে যাচাই হয়েছে দেখতে পাই এবং আমরাও সাধনা করে নিজেদের অভিজ্ঞতায় তা যাচাই করতে পারি।

বেদান্ত বেদের অংশ। স্বামীজীর মতে: " 'বেদ' শব্দ দ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে-আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য-সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও এগুলি থাকিবে।"[৩]

স্বামীজী বললেন, বেদান্ত পূর্বজন্ম স্বীকার করে। তিনি বললেন: "আমরা অস্বীকার করিতে

২ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩

৩ ঐ, পৃঃ ১৪

পারি না, শরীরমাত্রেই উত্তরাধিকারসূত্রে কতকগুলি প্রবণতা লাভ করে, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক। এই দৈহিক প্রবণতার মাধ্যমেই মনের বিশেষ প্রবণতা ব্যক্ত হয়। মনের এরূপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম। বিশেষ কোন প্রবণতাসম্পন্ন জীব সদৃশ বস্তুর প্রতি আকর্ষণের নিয়মানুসারে এমন এক শরীরে জন্মগ্রহণ করিবে, যাহা তাহার ঐ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত, কারণ বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করিতে চায়, অভ্যাস আবার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানের ফল। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, নবজাত প্রাণীর স্বভাবও তাহার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত কর্মের ফল; এবং যেহেতু তাহার পক্ষে বর্তমান জীবনে ঐগুলি লাভ করা অসম্ভব, অতএব অবশ্যই পূর্বজীবন হইতেই ঐগুলি আসিয়াছে।"[৪]

পূর্বজীবনের বিষয় আমাদের মনে থাকে না কেন—এপ্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বললেন, যখন আমরা ইংরেজীতে কথা বলি তখন আমাদের চেতন মনে মাতৃভাষার একটি অক্ষরও থাকে না। কিন্তু, যদি আমরা মনে করতে চেষ্টা করি তবে তা প্রবল বেগে চেতন মনে এসে হাজির হবে। এই ব্যাপারে বোঝা যাচ্ছে যে, মনঃসমুদ্রের উপরিভাগেই চেতন ভাব অনুভূত হয় এবং আমাদের পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা সেই সমুদ্রের গভীরদেশে সঞ্চিত থাকে। চেষ্টা ও সাধনা করলে এগুলি সব ওপরে উঠে আসে এবং আমরা পূর্বজন্ম সম্বন্ধেও জানতে পারি। পূর্বজন্ম সম্বন্ধে এটাই সাক্ষাৎ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ।[৫]

যদিও 'আমি' বলতে 'দেহই আমি' এই ভাব মনে আসে তবু বেদান্ত মতে, বস্তুতঃ, আমি দেহমধ্যস্থ আত্মা, দেহ নই। দেহের জন্ম, মৃত্যু আছে, আত্মার নেই। আত্মাকে তরবারি ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না। জল আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু শুষ্ক করতে পারে না।[৬] এই আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। অথচ দেহাত্মবুদ্ধি হয়। কেন হয়? বেদান্তীর উত্তর—জানি না, অর্থাৎ অজ্ঞান এর কারণ। স্বামীজী বললেন, এর চেয়ে যুক্তিযুক্ত উত্তর আর কি হবে? আত্মার স্বরূপ যথার্থভাবে না জানার জন্যই দেহাত্মবুদ্ধি হয়। আত্মজ্ঞান হলেই 'দেহই আত্মা' এই বুদ্ধি দূর হয়।

বেদান্ত আত্মাকেই ব্রহ্ম বলেন। আত্মা বা ব্রহ্মের জ্ঞান হলেই দেহসংযুক্ত মৃত্যু বা দুঃখ থেকে মুক্তি হয়। আত্মা বা ব্রহ্মের উপলব্ধিতেই মোক্ষপ্রাপ্তি। মোক্ষ নতুন কিছু নয়, প্রাপ্তকেই প্রাপ্তি। যা প্রথম থেকেই ছিল তা অজ্ঞানের আবরণে ছিল আবৃত। জ্ঞান এই আবরণ দূর করে, ফলে আত্মা মেঘমুক্ত সূর্যের মতো স্বরূপে প্রকাশ পায়। স্বামীজী বললেন: "তিনিই [ব্রহ্মই] আত্মার স্বরূপ—নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান, নিরপেক্ষ আনন্দ—সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ।"[৭]

স্বামীজী বললেন: "একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়; এবং যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তখন উহার অগ্রগতি থামিয়া যাইবেই, কারণ এই বিজ্ঞান তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে। যথা—রসায়নশাস্ত্র যদি এমন একটি মূল পদার্থ আবিষ্কার করে, যাহা হইতে অন্যান্য সকল পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে উহা চরম উন্নতি লাভ করিল। পদার্থবিদ্যা যদি এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিতে পারে, অন্যান্য শক্তি যাহার রূপান্তর মাত্র, তাহা হইলে ঐ বিজ্ঞানের কার্য শেষ হইল। ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, যখন তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবন-স্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা···। এইরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই সর্বপ্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।"[৮]

স্বামীজী যা বলতে চেয়েছেন, তা হলো এই যে, 'এক' যেমন জড়বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য, ধর্মবিজ্ঞানের লক্ষ্যও অদ্বৈত বা 'এক'। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ

৪ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬
৬ দ্রঃ গীতা, ২।২৩
৮ ঐ, পৃঃ ২২
৫ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৬
৭ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১

চরম মত, কারণ এখানে এক ব্রহ্ম-তত্ত্ব দিয়ে সব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে অদ্বৈতবাদে পৌঁছাতে হলে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে যাওয়া ভুল নয়। এক বিশেষ দৃষ্টিতে বহু সত্য, অন্য দৃষ্টিতে দুইই সত্য, আরও এক দৃষ্টিতে চিৎ-অচিৎবিশিষ্ট একই সত্য ও সর্বশেষে শুধু চিৎ বা চৈতন্য সত্য এবং তা আনন্দও বটে। সুষুপ্তিতে সৎ-চিৎ-আনন্দের আভাস পাওয়া যায়, সাধক সমাধিতে তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেন।

স্বামীজী বলেন, বেদান্তের দৃষ্টিতে "মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না। পরন্তু সত্য হইতে সত্যে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে।"[৯] এই দৃষ্টিতে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সবই বেদান্ত। স্বামীজী এগুলির কোনটিকেই বেদান্ত বলতে আপত্তি করেননি। তিনি শুধু বলেছেন, অদ্বৈতবাদে উচ্চতম সত্য লাভ করা যায়। অন্য মতে তুলনামূলকভাবে নিম্নতর সত্য বর্তমান।

স্বামীজী বললেন: "বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা।"[১০] বললেন: "নিম্নতম জড়োপাসনা হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরিবার—উপলব্ধি করিবার জন্য মানবাত্মার বিবিধ চেষ্টা। জন্ম, সঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের সাধন-প্রচেষ্টা নিরূপিত হয়।··· প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল-পক্ষীর শাবকের মতো ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে থাকে এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া শেষে সেই মহান সূর্যে উপনীত হয়।"[১১] স্বামীজীর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "যার পেটে যা সয়।" আমাদের দেশে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এর নাম 'অধিকারী ভেদবাদ'। রুচি বা প্রবণতা এবং যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সাধনায় অধিকার জন্মে। সেই অধিকার অনুসারে ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সাধনায় অগ্রসর হয়ে সিদ্ধিলাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলেছেন: "যত মত তত পথ।" শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: সূত্র যেমন মণিগণের মধ্যে, সমগ্র জগৎ সেরূপ আমার মধ্যে অনুস্যূত।[১২] আবার বলেছেন: পৃথিবীতে যাকিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলদায়ী এবং শক্তিপ্রদ, তার মধ্যে আমার শক্তিই ক্রিয়াশীল।[১৩] ভারতবর্ষ স্বীকার করে এসেছে, স্বামীজী বললেন, আমাদের জাতি ও ধর্মমতের সীমানার বাইরেও সিদ্ধপুরুষ রয়েছেন।[১৪]

স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিদায়ী ভাষণে স্পষ্টই বলেছেন: "খ্রীস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীস্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।" তিনি আরও বলেছেন: "সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতিরই মধ্যে অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"[১৫]

বেদান্তের দৃষ্টিতে স্বামীজী ঐ ভাষণে আরও বলেছেন: "যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাঁহার ধর্মই টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাঁহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, তাঁহার ন্যায় লোকেদের বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে: 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।"[১৬]

প্রথম দিনের বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন: "আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।"[১৭] বিদায়ী ভাষণেও তিনি সেই সুরেই কথা বলেছেন। বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে একই সত্যের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং হবে—এই ছিল স্বামীজীর বৈদান্তিক বিশ্বাস।

[ক্রমশঃ]

৯ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫
১০ ঐ, পৃঃ ২৫
১১ ঐ,
১২ দ্রঃ গীতা, ৭।৭
১৩ দ্রঃ ঐ, ১০।৪১
১৪ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬
১৫ ঐ, পৃঃ ৩৪
১৬ ঐ
১৭ ঐ, পৃঃ ৯

বাহাদুর
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যত দিন যাচ্ছে ততই শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে হচ্ছে, ঠাকুর আপনাকে ছাড়া আমার চলবে না। কারণটা কি? শুধু ধর্ম, ঈশ্বর, মুক্তি, মা ভবতারিণী, যাবতীয় অলৌকিকপ্রাপ্তি? অনেক ভেবে দেখলুম, সবচেয়ে বড় কারণ, ঠাকুর ছিলেন এমন এক চাবি, যে-চাবি দিয়ে সব তালা খোলা যায়। এমন এক বন্ধু, যাঁকে সবকথা বলা যায়। এমন এক শাসক, যাঁর সামনে সামান্য বেচাল হলেই অপরাধী বালকের মতো বসে থাকতে হয়। পালাবার উপায় নেই। কারণ, তিনি কান ধরে টেনে আনবেন। এমন এক পিতা, হাত ধরলে যিনি ছেড়ে দেবেন না—আঁচড়ালে, কামড়ালেও নয়। তাঁর নিজের কথাতেই, তিনি ছিলেন 'গোখরো সাপ'। কেন গোখরো সাপ? বলছেন: "ঝাউতলা থেকে ফিরছি, দেখি সাপে ব্যাঙ ধরেছে। ব্যাঙটা ভয়ংকর ডাকছে।" উঁকি মেরে দেখলেন তিনি। দেখে মনে মনে হাসলেন—"ঢোঁড়ায় ধরেছে। তাই এত যন্ত্রণা। গিলতেও পারছে না, ওগরাতেও পারছে না। গোখরোয় ধরলে এমন হতো না। ধরা মাত্রই ব্যাঙ শেষ।" ঠাকুর গোখরো ছিলেন। ধরলে বিষয়লীলা, সংসার-যন্ত্রণা, তামসিকতা, মানুষের ভেকমূর্তি, ব্যাঙের আধুলির নাড়াচাড়া, মতুয়াগিরি সব শেষ। এমন বিষ ঢেলে দেবেন, ব্যাঙবাবু, ব্যাঙ্কবাবু, ইনসিওরেন্সবাবু ডাক্তারবাবু, মি লর্ডবাবু, হ্যাট-ম্যাট-গ্যাটবাবু সকলেরই মনে হবে—বিষয় বিষ। তখন মীরার মতো মন বলবে—

> "মোহে লাগি লগন গুরু-চরণন কী।
> চরণ বিনা মোহে কছু নহী ভাবৈ॥
> জগমায়া সব সপলন কী।
> ভবসাগর সব সুখ গয়ো হ্যায়॥
> ফিকর নহী মোহে তরলন কী।"

ঠাকুর, আপনার চরণই আমার একমাত্র আশ্রয়। আপনি ছাড়া আমার আর কোন চিন্তা নেই। জগতে সবই মায়া সবই স্বপ্ন। কোন সুখ নেই ঠাকুর। আমাকে উদ্ধার করুন।

সেই উদ্ধার কেমন উদ্ধার? আমাকে তিনি লেংটি পরিয়ে, হাতে চিমটে দিয়ে হিমালয়ে পাঠিয়ে দেবেন না। তাঁর প্রেসক্রিপশান ছিল অন্যরকম। ঠাকুর অভিজ্ঞ জননী। পেট বুঝে মাছ পরিবেশন। ভাজা, ঝাল, ঝোল, অম্বল। সবাই তো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হতে পারবে না। সে বড় কঠিন ব্রত! তাহলে? সত্ত্বগুণী সংসারী হও। শিবের সংসার করো। ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলছেন: "ভবনাথ কেমন সরল! বিবাহ করে এসে আমায় বলছে, স্ত্রীর উপর আমার এত স্নেহ হচ্ছে কেন? আহা! সে ভারী সরল! তা স্ত্রীর ওপর ভালবাসা হবে না? এটি জগন্মাতার ভুবনমোহিনী মায়া। স্ত্রীকে বোধ হয় যে পৃথিবীতে অমন আপনার লোক আর হবে না। আপনার লোক, জীবনে-মরণে, ইহকালে পরকালে।"

এই হলেন ঠাকুর। তাঁর সঙ্গে সবকথা চলে। ভীষণ র‍্যাশনাল। ভীষণ বুঝদার। সংসার যে তাঁর। সৃষ্টির সাজঘর থেকে উঠে এসেছিলেন বলেই মানুষকে এমন চিনেছিলেন। সংসারের সব খবরই রাখতেন অথচ নিজে সংসার করেননি। তা না হলে কেমন করে বলেন—ভবনাথের প্রসঙ্গেই বলছেন:

"এই স্ত্রী নিয়ে মানুষ কি না দুঃখ ভোগ করছে, তবু মনে করে যে এমন আত্মীয় আর কেউ নেই। কি দুরবস্থা! কুড়ি টাকা মাইনে—তিনটে ছেলে হয়েছে—তাদের ভাল করে খাওয়াবার শক্তি নেই, বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, মেরামত করবার পয়সা নাই—ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না—ছেলের পৈতে দিতে পারে না—এর কাছে আট আনা,

ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এই চিত্রটি তুলে ধরেন, কিছু না, শুধু ছবিটি আঁকলেন অক্ষরমালায়! চেতনায় এক চাবুক। এই সংসার! নিমেষে যেন বেরিয়ে এলুম সংসারের বাইরে। এই প্রশ্ন নিয়ে—আমার ছলনে ভুলে ওর মধ্যে প্রবেশ করেছি। কেন করেছি? ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলবেন: উপায় কী! ও যে জগন্মাতার ভুবনমোহিনী মায়া। স্বয়ং অবতারও আত্মবিস্মৃত হন। সেই কাহিনী জানো না—“হিরণ্যাক্ষকে বধ করে বরাহ অবতার ছানা-পোনা নিয়ে ছিলেন। আত্মবিস্মৃত হয়ে তাদের মাই দিচ্ছিলেন! দেবতারা পরামর্শ করে শিবকে পাঠিয়ে দিলেন। শিব শূলের আঘাতে বরাহের দেহ ভেঙে দিলেন। তবে তিনি স্বধামে চলে গেলেন। শিব জিজ্ঞেস করলেন: ‘তুমি আত্মবিস্মৃত হয়ে আছ কেন?’ তাতে তিনি বলেছিলেন: ‘আমি বেশ আছি।’ কি জানো—‘পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।’ গোপীরা কাত্যায়নীপূজা করেছিলেন। সকলেই সেই মহামায়া আদ্যাশক্তির অধীন। অবতার আদি পর্যন্ত মায়া আশ্রয় করে তবে লীলা করেন। তাই তাঁরা আদ্যাশক্তির পূজা করেন। দেখ না, রাম সীতার জন্য কত কেঁদেছেন।”

তুমি সাধারণ জীব, তোমাকে তো মায়া আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধবেনই। তপস্বী গেলেন ধর্মব্যাধের কাছে উপদেশ নিতে। গিয়ে দেখলেন, ব্যাধ পশুর মাংস বিক্রি করছেন। তপস্বী ভাবলেন, একে ব্যাধ, তায় সংসারী। আমায় কি ব্রহ্মজ্ঞান দেবেন! কিন্তু সেই ব্যাধ পূর্ণজ্ঞানী। তপস্বী জিজ্ঞেস করলেন, এ কি রহস্য! আপনার দুটো জীবন কেন? তিনি বললেন, একটা আমার প্রারব্ধ, আর একটা আমার অর্জিত। সংসারে থাকো—প্রারব্ধ ক্ষয় করো—জ্ঞান অর্জন করো।

ঠাকুর না হলে কে এমন বলতে পারেন?

“সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীরভক্ত। ভগবান বলেন, যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সে তো আমায় ডাকবেই, আমার সেবা করবেই, তার আর বাহাদুরি কি? সে যদি আমায় না ডাকে সকলে ছি ছি করবে। **আর যে সংসারে থেকে আমায় ডাকে—বিশ মন পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেই-ই ধন্য, সেই-ই বাহাদুর, সেই-ই বীর পুরুষ।”**

ঠাকুর সংসারকে—আমাকে নস্যাৎ করেননি, উপেক্ষা করেননি। স্নেহের চোখে শান্ত কণ্ঠে বলেছেন: সংসার করো। অবিদ্যা মায়াকে বিদ্যা মায়ায় রূপান্তরিত করে সংসার করো। এক হাত রাখো সংসারে, এক হাত তাঁর শ্রীচরণে, কর্তব্য শেষে দুহাত রাখো তাঁর চরণে। তাইতো ঠাকুর আমার অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। অনন্য। □

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশে মায়ের ভূমিকা

মধুরিমা লাহিড়ী

বিখ্যাত সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ড সখেদে উক্তি করেছিলেন ঃ "কোনদিন সুযোগ পেলে আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে চাইব যাতে আমি স্নেহময়ী জননীর মাতৃদুগ্ধ পান করার আনন্দ-উম্মাদনা পেতে পারি।" ("If ever I get a chance I should love to be reborn just to have ecstasy of being refed by the kindly mother.") উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শিশুর সুষম খাদ্য দৈহিক পুষ্টি জোগানো ছাড়াও মানসিক ও সার্বিক চরিত্র গঠন ও বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই ক্রমবিবর্তনের জন্য মায়ের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য।

ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৪২ ভাগ পনেরো বছরের নিম্নবয়স্ক ও শতকরা ১৭ ভাগ পাঁচ বছরের নিম্নবয়স্ক শিশু। আমাদের দেশে বারো কোটি শিশু প্রধানতঃ অপুষ্টিজনিত ব্যাধি ও সংক্রামক রোগের শিকার হয় এবং এই সমস্যার বেশির ভাগ লক্ষিত হয় জন্মকাল থেকে প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে। এই সময় শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠন খুব দ্রুত গতিতে চলে। এইজন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও সুপরিকল্পিত উপায়ে শিশুর লালন-পালনের দিকে নজর দেওয়া উচিত।

শিশুর যত্নের সূচনা হয় গর্ভবতী মায়ের যত্নের মাধ্যমে। গর্ভাবস্থায় প্রথম থেকেই মায়েদের উচিত নিকটস্থ স্বাস্থ্যসংস্থা অথবা মাতৃ ও শিশুমঙ্গল এবং পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রের প্রসূতিরোগ-বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্য-কর্মী ও ধাত্রীবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। সেখানে মায়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, ধনুষ্টঙ্কার রোগের প্রতিরোধক টিকা, লৌহ জাতীয় পদার্থ ও পুষ্টিকর আহার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়। নবজাতকের জন্মের সময় থেকেই মায়েদের স্বাস্থ্য-সম্মত ও সুপরিকল্পিত উপায়ে শিশুর লালন-পালনের পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা জন্মানোর জন্য চিকিৎসক, ধাত্রীবিদ্ ও শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞের বিশেষ ভূমিকা আছে।

পাশ্চাত্যদেশে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভাবী নবজাতকের লালন-পালন সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে প্রত্যেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

আমাদের দেশে শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে মায়েরা অজ্ঞতার মাশুলস্বরূপ অকালে শিশু-মৃত্যুর শোক ও শতসহস্র অপুষ্ট ও রুগ্ন বা পঙ্গু শিশুর বোঝা বয়ে বেড়ান সারাজীবন ধরে। তাই সঠিকভাবে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সমন্বয় ঘটাতে হলে মায়েদের কিছু অবশ্যকরণীয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দিই।

নবজাতকের পুষ্টির প্রথম সোপান হচ্ছে মাতৃদুগ্ধ। প্রকৃতির দান মাতৃদুগ্ধ পরিমিত মাত্রায় সকলপ্রকার খাদ্যের উপাদান ও রোগ-প্রতিরোধক গুণের আকর। মাতৃদুগ্ধ আপনার বাচ্চার পক্ষে শুধু সর্বোত্তমই নয়, স্বল্প ব্যয়সাধ্যও বটে। মাতৃদুগ্ধপানের মাধ্যমে শিশু ও মায়ের মধ্যে নিবিড় স্নেহাবেগযুক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে শিশুর আত্মপ্রত্যয়ও গভীরভাবে জন্মাতে সাহায্য করে।

আজকাল উন্নতশীল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে মায়েদের ভূমিকা অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে সমানভাবে চলেছে। তারই মধ্যে সময় করে মাতৃদুগ্ধ পান করানো উচিত।

বর্তমানে এদেশে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যদেশীয় সভ্যতার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। অধিকাংশ মায়েদের অবসর বিনোদনের অঙ্গ হচ্ছে দূরদর্শন। প্রায়ই দেখা যায়, বহু

বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংস্থা নানারকম টিনের কৌটার দুধ ও শক্ত খাবারের বিজ্ঞাপন ও তার সঙ্গে একটি আকর্ষণীয় হৃষ্টপুষ্ট শিশুর ছবি দিয়ে এই খাদ্যের উপকারিতা বোঝাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার প্রভাব অধিকাংশ মায়েদের ওপর বিশেষভাবে পড়ে। ফলস্বরূপ মাতৃদুগ্ধ পরিহার করে টিনের দুধের দিকে তাঁরা বেশি নজর দিচ্ছেন। এমনকি অনেক সময় আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও তাঁরা ভাবেন, এর থেকে বঞ্চিত হলে শিশুর স্বাস্থ্য-হানি হবে। ফলে, সামর্থ্যের বাইরে হলেও দামী দুধ কিনে তা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে দুধ তৈরি করে শিশুকে খাওয়ানো অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফল হয় ভয়াবহ—শিশুরা ধীরে ধীরে অপুষ্টিজনিত ব্যাধি ও উদরাময় রোগে ভোগে। ক্রমশঃ তারা এগিয়ে চলে অপুষ্টিজনিত রোগ বা প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশান (Protein-energy malnutrition) নামক রোগের দিকে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা সচরাচর মায়েদের মাতৃদুগ্ধ-পানের পদ্ধতি সম্বন্ধে মনে জাগে তা হলো—শিশুর জন্মের কয়েক ঘণ্টা পর থেকেই মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিত কিনা? প্রথম তিনদিন মাতৃবক্ষ থেকে জলীয় পদার্থের মতো যে-দুধ নিঃসৃত হয় তাকে বলে কোলোস্ট্রাম (colostrum)। বস্তুটি পুষ্টিকর এবং রোগ-প্রতিরোধক গুণে ভরপুর। ভ্রান্ত ধারণা-বশতঃ 'ডাইনীর দুধ' বলে অনেক মায়েরা ঐ দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে চান না। কিন্তু এ কুসংস্কার। বাস্তবিক ওটি শিশুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। মাতৃদুগ্ধপানের গুণের তালিকার প্রয়োজন নেই। জানা উচিত যে, শিশুর চাহিদাপূরণের জন্য যা যা প্রয়োজন সব আছে মাতৃদুগ্ধে। প্রথম পাঁচ মাস মায়ের দুধ পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, তারপর ধীরে ধীরে শিশুকে শক্ত খাবার খাওয়ানো দরকার। বিনাকারণে অসময়ে ও তাড়াতাড়ি মায়ের দুধ খাওয়ানো থেকে বাচ্চাকে বঞ্চিত করলে শিশুর অপুষ্টির সূচনা হয়। তাই যতদিন পারা যায় মায়ের দুধ দেওয়া উচিত। ছয় মাস বয়সে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে 'অন্নপ্রাশন' নামক ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের অর্থই হলো, বাচ্চাকে দুধ ছাড়ানো ও শক্ত খাবার খাওয়ানোর সূচনা করা। অনেক সময় দেখা যায়, মায়েরা এই অনুষ্ঠানের পরও বাচ্চাকে শক্ত খাবার দিতে নারাজ। এর সপক্ষে তাদের যুক্তি—'দাঁত ওঠেনি, শক্ত খাবার খেলে হজম হবে না।' অনেক বয়োজ্যেষ্ঠারাও আছেন, তাঁরা উপদেশ দেন—'কলা চলবে না,—সর্দি-কাশি হবে; মিষ্টি খাইয়ো না—কৃমি হবে' ইত্যাদি। কিন্তু এইসব ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। গৃহ-চিকিৎসক, শিশু-বিশেষজ্ঞদের কর্তব্য হবে, ধৈর্য সহকারে এইসব ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে পুষ্টি সম্বন্ধে মায়েদের সম্যক্‌ভাবে উপদেশ দেওয়া।

নিজের আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে সহজলভ্য, সহজপাচ্য ও খাদ্যগুণসম্পন্ন খাবার তৈরি করে শিশুকে খাওয়ানো উচিত; বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত ও অন্যের কুপরামর্শে প্রভাবিত না হওয়াই শ্রেয়। কিছু কিছু 'শিশুখাদ্য' একদম বর্জনীয়। যেমন—সাগু, বার্লি, শটিফুড, যেগুলি শুধুমাত্র শর্করা-জাতীয় খাদ্যগুণে ভরা।

শক্ত খাবার আহার করানোর শুরুতে শিশুদের কাছ থেকে প্রথমে বিশেষ আগ্রহ নাও পাওয়া যেতে পারে। মায়েরা ধৈর্য সহকারে আস্তে আস্তে এই খাবারের প্রতি তাদের আগ্রহ জন্মাবার জন্য চেষ্টা করবেন। শক্ত আহারের শুরুতে নরম পাতলা (গলা-গলা) খাবার যেমন খিচুড়ি, সুজির পায়েস ইত্যাদি চামচে করে বাচ্চাদের প্রথমে খাওয়াতে হবে। পরে তাকে নিজে খেতে সাহায্য করতে হবে। এই সকল খাবারে শিশু অভ্যস্ত হলে তাকে মরসুমের ফল যেমন কলা, পেঁপে, আম ইত্যাদি দিতে পারেন। বাচ্চাকে আহারের পুরো আনন্দ উপভোগ করতে দিন—চামচ দিয়ে নিজে খাওয়া ও চারিপাশ নোংরা করা। এর মধ্য দিয়ে তৈরি হয় নিজের ব্যক্তিত্ব। বাচ্চাদের খাওয়ানো নিয়ে জোর করা বা একবার খাবার প্রত্যাখ্যান করেছে বলে তাকে আর না খাওয়ানো উচিত নয়।

খাবারের পরিমাণ একটি স্বাভাবিক শিশু নিজেই ঠিক করতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেলে সে সন্তুষ্ট হয় ও তার ওজন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়।

প্রায়ই আমরা হাসপাতালের বহির্বিভাগে মায়েদের কাছ থেকে অভিযোগ পাই—'আমার বাচ্চা

কিছুই খায় না'। মনে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর ওজন স্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে ও হাসি-খুশি প্রাণ-প্রাচুর্যে সে ভরপুর থাকছে, ততক্ষণ চিন্তার কারণ নেই। দু-বছর বয়স থেকে প্রাত্যহিক আহারে রুটি, ডাল, চাল, টাটকা শাকসবজি, দুধ, ঘি ইত্যাদি থাকা উচিত। আমিষ আহারের ক্ষেত্রে মাছ, মাংস যেমন প্রোটিনে ভরপুর তেমনি নিরামিষের ক্ষেত্রে ছানা, ছোলা, সয়াবীন, মটর, গম যথেষ্ট প্রোটিনযুক্ত। বাচ্চাকে উপযুক্ত সুষম খাদ্য দিলে **ভিটামিন এবং আয়রন টনিকের প্রয়োজন নেই।**

অকালমৃত্যু ও সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে খাদ্যের সঙ্গে রোগ-প্রতিরোধক টিকাদানের প্রয়োজনীয়তাও আছে। আমাদের দেশে ছয়টি মারাত্মক সংক্রামক রোগ যেমন—যক্ষ্মা, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, পোলিও এবং হামজ্বরের টিকা পাওয়া যায়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা উৎসাহ সহকারে এগিয়ে আসেন এই টিকা দেবার জন্য। মায়েদের উচিত তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা। এছাড়া ঐসব সংস্থা শিশুপুষ্টি, শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের ক্রমোন্নতির তালিকাও তৈরি করে দেয়। আন্ডার ফাইভ ক্লিনিক (Under Five Clinic)—এই নামে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে, পরিবার-কল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে এর ব্যবস্থা আছে। এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে—রোগ-প্রতিরোধ ও স্বল্প রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা করা।

তাই শিশুর সুস্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশের জন্য মায়েদের কর্তব্য ঃ

(১) নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া ও শিশুর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো।

(২) শিশুদের রোগ-প্রতিরোধক টিকা ও পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো।

(৩) সাধারণ স্বাস্থ্যসম্মত নিয়ম পালন, যেমন খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, পানীয় জল ফুটিয়ে খাওয়া ইত্যাদি।

(৪) পরিবার পরিকল্পনা ও শিশুমঙ্গল সংক্রান্ত যথাযথ উপদেশ নেওয়া।

(৫) সাধারণ স্বল্পরোগের প্রাথমিক গৃহস্থালী চিকিৎসা প্রয়োজন। যেমন, উদরাময় রোগে লবণ ও চিনির সমতা বজায় রেখে পানীয় তৈরি করে খাওয়ানো। পরে চিকিৎসকের সঙ্গে সময়মত যোগাযোগ করা।

(৬) প্রাথমিক বিধিমুক্ত শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

এইভাবে যদি প্রত্যেক পরিবারে মায়েরা তাঁদের সন্তান-পালনের প্রাথমিক বিধি মেনে চলেন তবে তাঁরা সুস্থ ও সুখী পরিবার গড়তে পারবেন এবং নিজেরা পাবেন অনাবিল মানসিক ও পারিবারিক সুখ ও শান্তি। ☐

গ্রন্থ-পরিচয়

ভারতীয় সাধনার একটি ধারা

তারকনাথ ঘোষ

নাথ ধর্ম : সমাজ ও সংস্কৃতি : ভবনাথ সরকার। প্রকাশক : হরিদাস সরকার, নববারাকপুর। মূল্য : দশ টাকা।

ভারতে যোগসাধনার ধারা অতি প্রাচীন। সম্ভবতঃ প্রাগ্‌-আর্যযুগের সিন্ধুসভ্যতায় এই সাধনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ঐ যুগের পুরাতত্ত্ব নিদর্শন শিলমোহরে উৎকীর্ণ যোগিমূর্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ যোগসাধনার ধারা নানা শাখায় বিভক্ত হয়েছে, বিভিন্ন সাধনপদ্ধতির সঙ্গে মিশে গিয়ে ভারতের অধ্যাত্মসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে পরিপুষ্ট ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে এই সাধনার রূপান্তর বা বিবর্তন হয়েছে—ক্রমে মূল ধারাটি ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছে।

গ্রন্থকার এই সাধনধারার ঐতিহাসিক পটভূমিকা আর ক্রমবিবর্তনের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটির সীমিত পরিসরের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভবপর না হলেও তিনি বিভিন্ন বৈদিক-অবৈদিক সাহিত্য, আর পরবর্তী কালের গবেষণাগ্রন্থ থেকে প্রামাণ্য উপাদান সঙ্কলন করে বিষয়টি পরিচ্ছন্ন আকারে বিন্যস্ত করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি প্রাচীন ও পরবর্তী যুগের সিদ্ধ আর সাধককুলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও নাথ-সম্প্রদায়ের কয়েকটি মঠ-মন্দিরের পরিচয় দিয়েছেন। নাথ ধর্মের সাধনা ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনাটি মূল্যবান।

এই স্বল্পায়তন গ্রন্থখানি উৎসুক পাঠককে অবশ্যই তৃপ্ত করবে। লেখক বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছেন; কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে বাঙলা গবেষণাসাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন হতে পারে।

মুদ্রণাদি পরিপাটি। আর্টপেপারের মলাটে সাধনসঙ্কেতময় প্রচ্ছদচিত্রটি আকর্ষণীয়।

স্মৃতির আলোকে স্বামী শিবানন্দ

সচ্চিদানন্দ ধর

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর পদপ্রান্তে : করুণাময় মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : গ্রন্থকার। ২৫৬, বি-ব্লক, লেকটাউন, কলকাতা-৭০০০৮৯। মূল্য : পনেরো টাকা।

গ্রন্থকার বাল্যবয়সে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে দীক্ষালাভের পর ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে মহাপুরুষজীর দেহলীলা অবসানের মধ্যে লেখক কয়েকবার বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীকে দর্শন করেন এবং তাঁর বিশেষ সেবা করার অধিকারলাভেও ধন্য হন। গ্রন্থটিতে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে লেখকের কয়েকটি সাক্ষাৎকারের দৃশ্য জীবন্তভাবে বিধৃত হয়েছে।

গ্রন্থটি দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে সংক্ষিপ্ত পরিসরে শিবানন্দ মহারাজের জীবনীটি সুলিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে আছে গ্রন্থকারের 'স্মৃতির আলোকে মহাপুরুষজী মহারাজ'। এই স্মৃতিগুলি লেখকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের বর্ণনা হলেও বর্ণনাগুণে এটি সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষীভূত চিত্রপটেই পর্যবসিত হয়েছে। লেখক মহাপুরুষজীর দর্শন প্রসঙ্গে বেলুড় মঠ এবং কলকাতা ও আশেপাশের রামকৃষ্ণ-তীর্থগুলির যে জীবন্ত চিত্রধর্মী বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে আমরা সেই সব স্থান এবং কালের একটা সুন্দর চিত্র পাই।

বাল্যের স্মৃতিকে হৃদয়ে পোষণ করে বার্ধক্যের প্রান্তে উপনীত হয়ে গ্রন্থকার আমাদের নিকট পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের যে-কয়টি চিত্র উপহার দিয়েছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। ☐

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১ মে '৯২ বাগবাজারের **বলরাম মন্দিরে** তিন-চার হাজার ভক্তসমাগমে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মে যে-ঘরে বসে সন্ন্যাসী এবং গৃহিভক্ত সমন্বয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন, সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত দোতলার হলঘরটিতে বিকালে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রতি বছরের মতো এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বলরাম মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ এবং সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী ভাষণ দেন। শঙ্কর বসুমল্লিক স্বামীজীর রচনা থেকে আবৃত্তি করেন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ কমল নন্দী। সন্ধ্যারতির পর 'কলির ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ সকাল আটটায় **বলরাম মন্দির ও বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (মায়ের বাড়ীর)** যৌথ উদ্যোগে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি-সহ এই শোভাযাত্রাটি বলরাম মন্দির থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর কলকাতার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় বলরাম মন্দিরে ফিরে আসে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সংগঠন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ সহ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুহাজার। পদযাত্রা শেষে সকলকে টিফিন-প্যাকেট বিতরণ করা হয়।

জি. ডি. বিড়লা পুরস্কার

মানবতার সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য জি. ডি. বিড়লা আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে **রামকৃষ্ণ মিশনকে**। গত ২০ এপ্রিল '৯২ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ নুরুল হাসান কলকাতায় এই পুরস্কার প্রদান করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। পুরস্কারের মূল্য একটি প্রশংসাপত্র সহ পাঁচলক্ষ টাকা।

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৬—৮ মার্চ **পুরী রামকৃষ্ণ মঠে** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। ৬ মার্চ বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন আশ্রমের পক্ষ থেকে পুরী সদর হাসপাতাল, টি.বি. হাসপাতাল ও আয়ুর্বেদ হাসপাতালের মোট ৩০০জন রোগীকে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। তিনদিনই সন্ধ্যায় ধর্মসভা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী রাজীবেশানন্দ। সঙ্গীতানুষ্ঠানে উড়িষ্যার বিশিষ্ট সঙ্গীত ও যন্ত্রশিল্পিগণ অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধন

গত ২ এপ্রিল, **বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের** নবনির্মিত সাধুনিবাস ও অতিথি-ভোজনালয়ের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। ৩ এপ্রিল তিনি এই সেবাশ্রমের পুনঃসংস্কৃত বৃদ্ধাবাসেরও উদ্বোধন করেন।

গত ২৪ এপ্রিল **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে** একটি নতুন ৭০০ এম. এ. ডায়াগ্নোস্টিক-৫ এক্সরে ইউনিটের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী এবং প্রবীণ সন্ন্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞান ও শিল্প প্রদর্শনী

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গত ৭—৯ মার্চ তিনদিনের এক শিশু-বিজ্ঞান ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বালকাশ্রমের সম্পাদক স্বামী জয়ানন্দ। ৯ মার্চ সন্ধ্যায় স্বামী দিব্যানন্দের সভাপতিত্বে 'পঠিত বিজ্ঞানের বাস্তব রূপায়ণ' বিষয়ক এক আলোচনা-চক্রেরও আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীতে ছাত্র, শিক্ষক সহ বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির

জলপাইগুড়ি আশ্রম গত ১২ থেকে ১৫ এপ্রিল একটি চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। এই শিবিরে ১৩জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

ত্রাণ

মস্কো দুর্গতত্রাণ

রাশিয়ার মস্কো শহরের আশপাশে দুর্গতদের মধ্যে বিতরণের জন্য ২০০০ কিলোঃ গুঁড়ো দুধ, ২০৪০ কিলোঃ শিশুখাদ্য এবং ২০০০ কিলোঃ চিনি বিমানে করে পাঠানো হয়েছে।

গুজরাট খরাত্রাণ

রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে গুজরাটের পঞ্চমহল জেলার খরাপীড়িতদের মধ্যে ৪৭৬টি ধুতি, ২০৫টি চাদর (শাল) বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া কচ্ছ ও পঞ্চমহল জেলায় খরাপীড়িত গবাদি পশুর জন্য ৫৪,৯৩৯ কিলোঃ ঘাস বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশ

বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামঞ্চিলি মণ্ডলের কোঠাপালেম গ্রামে আশ্রয়গৃহ-সহ রামালয়মের নির্মাণ-কার্য শেষ হয়েছে। গত ১৩ এপ্রিল এই গৃহের উদ্বোধন করেন বিশাখাপত্তনম পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পি. ভি. আর. কে. প্রসাদ।

উত্তরপ্রদেশ

উত্তরকাশী জেলায় ভূমিকম্পে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য পুনরায় উত্তরকাশীতে শিবির খোলা হয়েছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (স্যানফ্রান্সিস্কো) ঃ গত মে মাসের প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। প্রতি শনিবার স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশাবলীর ওপর আলোচনা হয়েছে। এই বেদান্ত সোসাইটির পুরনো মন্দিরে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ যোগসূত্রের ক্লাস করছেন। প্রতি রবিবার দুপুরে ছয় থেকে চোদ্দবছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য একটি ক্লাস হয়। এই ক্লাসে বেদান্তের সর্বজনীন ভাবসমূহ ও বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলির মূলশিক্ষা এবং মহান ধর্মগুরুদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। গত ২ মে বেদান্ত সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় শান্তি আশ্রমে একদিনের বার্ষিক তীর্থবাসানুষ্ঠান হয়। ঐদিন শান্তি আশ্রমে পূজা, জপ-ধ্যান, ভক্তিগীতি, স্তোত্র-পাঠ, ভজন, পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আমেরিকার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শান্তরূপানন্দ, স্বামী অপর্ণানন্দ ও স্বামী প্রপন্নানন্দ।

গত ২৩ থেকে ২৭ মে পর্যন্ত এই আশ্রমের পরিচালনায় পাঁচদিনের সাধন-শিবির মেরিন কান্ট্রির ওলেমায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে জপ-ধ্যান, ভজনাদি ছাড়াও নানা ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ মে ছিল বিশেষ অধিবেশন। ঐদিন প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ধর্ম রেলম্ বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মাস্টার হুয়াং হুয়া এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে ভাষণ দেন স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির প্রধান স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (ক্যালিফোর্নিয়া) ঃ গত ৩ মে ও ১৭ মে রবিবার যথাক্রমে শংকরাচার্য ও ভগবান বুদ্ধের ওপর আলোচনা করেছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ। অন্য রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। ১৬ মে পূজা, আলোচনা, ভক্তিগীতি ও প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে।

৯, ২৩ ও ৩০ মে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া বুধবারগুলিতে উপনিষদের ক্লাস নিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং উদ্ধবগীতার ক্লাস নিয়েছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা): গত ১৬ মে পূজা, ভক্তিগীতি, ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান ও প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। ১৭ মে রবিবার ভগবান বুদ্ধের ওপর ভাষণ দিয়েছেন। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষস্বামী প্রমথানন্দ। অন্য রবিবার-গুলিতে আলোচ্য বিষয় ছিল যথাক্রমে শঙ্করাচার্য, ভগবদ্গীতা ও 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'। তাছাড়া ১০ মে অপরাহ্ণে ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছে। ২ এবং ২৩ মে যথাক্রমে বিবেক-চূড়ামণির ব্যাখ্যা এবং রামনাম সঙ্কীর্তন হয়। ৩০ মে এবং ৩১ মে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দুটি বিশেষ ভাষণ দিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন: গত ১০ ও ১৭ মে রবিবার যথাক্রমে শঙ্করাচার্য ও ভগবান বুদ্ধের ওপর আলোচনা করেছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। অন্য রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে তিনি ভাষণ দিয়েছেন। তাছাড়া প্রতি মঙ্গলবার তিনি 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব নিউইয়র্ক: মে মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি উপলক্ষে ১০ মে 'দি মেসজ অব বুদ্ধ' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী তথাগতানন্দ। প্রতি মঙ্গলবার তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ দি গ্রেট মাস্টার' এবং প্রতি শুক্রবার ভগবদ্গীতার ক্লাস নিয়েছেন। তাছাড়া প্রতি শনিবার ও রবিবার সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়েছে। ১৭ মে অতিথি বক্তা রাবাই আশার ব্লক একটি বিশেষ ভাষণ দেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্ক: মে মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদী-শ্বরানন্দ। প্রতি শুক্রবার ও প্রতি মঙ্গলবার তিনি যথাক্রমে ভগবদ্গীতা ও 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

দেহত্যাগ

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি **স্বামী নৃসিংহানন্দ (সুব্রায়ন)** কেরালার আদুর-এ দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। গত কয়েক বছর যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে ভুগছিলেন।

স্বামী নৃসিংহানন্দ ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে হরিপাদ আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়াও তিনি আল্লে-পাই, তিরুভাল্লা ও ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। উল্লেখ্য, ঐসময় হরিপাদ ও আল্লেপাই আশ্রম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শাখাকেন্দ্র ছিল। গত ৫৮ বছর ধরে তিনি আদুরে হরিজনদের মধ্যে সেবাকাজ করছিলেন। আদুর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে নূরনাদ লেপ্রোসি স্যানাটরিয়ামে তিনি চারদশক ধরে কুষ্ঠ-রোগীদের সেবা করেন। এই সেবাকার্যের জন্য তিনি ঐ অঞ্চলে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ৭ ও ১৬ মে যথাক্রমে ভগবান শঙ্করাচার্য ও ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন। □

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণসংঘে গত ২৬ জানুয়ারি স্বামীজীর শুভ জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা হয় সকাল ৯টায়। অপরাহ্ণ ৫টায় আলোচনা ও পাঠে অংশগ্রহণ করেন সংঘের সদস্যবৃন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বশেষে সরোদ-বাদন পরিবেশন করেন সমর দত্ত।

বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি গত ১২ জানুয়ারি সমিতির বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। ঐদিন ৮-৩০ মিনিটে নতুন প্রার্থনাগৃহে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট স্থাপন করেন যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী, স্বামী রমানন্দ এবং স্বামী নিত্যরূপানন্দ। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল ভক্তিমূলক সঙ্গীত, বাউল গান, গীতি-আলেখ্য, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, দুঃস্থ ছাত্রদেরকে শীতবস্ত্র-বিতরণ, সেতার-বাদন প্রভৃতি। দুপুরে ২৫০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ। বরানগর মঠ সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ ও স্বামী বিমলাত্মানন্দ। উল্লেখ্য যে, ঐদিন 'বিবেকানন্দ ভারত পরিক্রমা কমিটি' ৩৪৭ দিনের পদযাত্রা এই বরানগর মঠ থেকেই শুরু করে।

পুর্বসিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ (কলকাতা-৩০) গত ১০-১২ জানুয়ারি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিনের ধর্মসভায় শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। সন্ধ্যায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিন বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ভাষণ দেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী বিশ্বনাথানন্দ ও হরিপদ আচার্য। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস ও জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও তরুণ-তরুণীদের জন্য নানা অনুষ্ঠান হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

গত ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি, ১৯৯২ **তিলজলা বিবেকানন্দ সেবা সংসদ**-এর উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয় তিলজলা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। দু-দিনের এই উৎসবে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী রমানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, রঞ্জিতকুমার সেন, তাপস বসু, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কীর্তন পরিবেশন করেন ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়। নিত্যরঞ্জন মণ্ডলের পরিচালনায় সংসদের শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই উৎসব উপলক্ষে তিলজলা অঞ্চলের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ গত ২৬ জানুয়ারি প্রভাতফেরী, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মতিথি উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষে গত ২ ফেব্রুয়ারি, অপরাহ্ণে সংঘ-প্রাঙ্গণে পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে স্বামীজীর স্মরণোৎসব-সভা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য।

স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতির (দুর্গাপুর-৫) উদ্যোগে গত ২৬ জানুয়ারি '৯২ স্বামী বিবেকানন্দের ১৩০তম জন্মতিথি-উৎসব বিশেষ পূজা, পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে দুর্গাপুরের কুড়ুরিয়া ডাঙ্গার বস্তি এলাকার অধিবাসীদের জন্য ঐ এলাকায় 'স্বামী বিবেকানন্দ দাতব্য হোমিও চিকিৎসাকেন্দ্র' নামে একটি সেবাপ্রকল্পের সূচনা করা হয়। চিকিৎসা-কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন এস. এস. পাঁজা এবং প্রধান অতিথি ছিলেন গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে হোমিও চিকিৎসা ছাড়াও মাঝে মাঝে

প্রতিষেধক টিকা, দন্ত-যন্ত্র শিবির, রাতকাণা রোগীদের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ইত্যাদি দেওয়া হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতির এই উদ্যোগে সহযোগিতা করে স্থানীয় বিধান স্পোর্টিং ক্লাব এবং হোমাই (হোমিও চিকিৎসকদের একটি প্রতিষ্ঠান)।

বিবেকানন্দ নগর (কোরাপুট, উড়িষ্যা) শ্রীরামকৃষ্ণ সৎসঙ্গ গত ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। দ্বিতীয় দিন পূজা, পাঠ, জপ-ধ্যান, কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ওপর আলোচনা করেন ডঃ অমূল্যরঞ্জন মহাপাত্র, ডঃ কুমারমণি সাহু, সুযশকুমার মাইতি ও পি. ভি. পারিয়াল। উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিও অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছিল।

গত ২৩ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে দক্ষিণ কলকাতার **টালিগঞ্জবাসীদের** উদ্যোগে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সকাল ৭টায় গল্ফ ক্লাব রোড পল্লী থেকে শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। স্বামীজীর বাণী-সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও স্বামীজীর বাণী পাঠ করতে করতে শোভাযাত্রাটি টালিগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। এই শোভাযাত্রায় বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ যোগদান করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ স্বর্গাশ্রম কুটীর, তমালগড় গত ২৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন করা হয়। অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল শোভাযাত্রা, পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, ভক্তিগীতি পরিবেশন, স্বামীজী বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতি। তাছাড়া এদিন কিছু দুঃস্থ বালক-বালিকাকে জামা-প্যান্ট দেওয়া হয় এবং বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সৌজন্যে রোগীদের ঔষধ ও টিকা দেওয়া হয়।

বহির্ভারত

গত ২ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও প্রদেশের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ আন্তর্জাতিক বেদান্ত কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বেদান্ত, যোগ ও স্বামী বিবেকানন্দের ওপর আলোচনা হয়েছে। উক্ত কংগ্রেসে **নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির** অধ্যক্ষ স্বামী তথাগতানন্দ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে ২ এপ্রিল তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৩ সেপ্টেম্বর '৯১ তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

প্রণবরঞ্জন ঘোষের আদি বাড়ি ছিল কুমিল্লায়। তাঁর পিতা চাকরি উপলক্ষে থাকতেন ব্রহ্মদেশে। দেশভাগের সময় তিনি ভারতবর্ষে চলে আসেন এবং লিলুয়ায় বাস করতে থাকেন। প্রণবরঞ্জন ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় বাঙলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর 'বিবেকানন্দ ও বাঙলা সাহিত্য' শীর্ষক গবেষণা-গ্রন্থটির জন্য ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে যাদবপুর ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন। শেষোক্ত স্থানে তিনি বাঙলা বিভাগে বিভাগীয় প্রধানও হয়েছিলেন। যোগ্যতাসূচক ইউ. জি. সি. অধ্যাপকের দায়িত্ব তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পালন করেছেন।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ আজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় যুক্ত ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি উদ্বোধন পত্রিকার আগ্রহী পাঠক, জনপ্রিয় লেখক এবং একজন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের দেওঘর বিদ্যাপীঠে ও পাথুরিয়াঘাটা ছাত্রাবাসে ছাত্র হিসাবে এবং পরবর্তী কালে নরেন্দ্রপুর, ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং উদ্বোধনের সঙ্গে নানাভাবে তিনি যুক্ত থেকেছেন। তিনি উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটির অন্যতম সহ-সভাপতিও ছিলেন। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' গ্রন্থ প্রকাশনায় তিনি অন্যতম সহায়ক ছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি সুধীসমাজে আদৃত। □

বিজ্ঞান-সংবাদ

রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস কেন হয়?

দীর্ঘস্থায়ী (chronic) রোগের অনেকগুলির কারণ জানা আছে, কিন্তু রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস (Rheumatoid arthritis) কি কারণে হয় তা আজও জানা যায়নি। যমজ সন্তানদের এই ব্যাপারে পরীক্ষা করে যা পাওয়া গেছে, তাতে রোগের কারণ হিসাবে বংশানুগতিক নিয়ন্ত্রক উপাদানের (genetic component) সম্ভাবনা ৩০ শতাংশের বেশি নয়। বাকি ৭০ শতাংশের অসুখের কারণ পরিবেশের মধ্যেও আছে বলে মনে হচ্ছে না। মনে হয়, এই রোগের কারণ ভাইরাস। পার্ভোভাইরাস (Parvovirus)-কে সন্দেহ করা হয়েছিল, কিন্তু রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে বা অন্যান্য পরীক্ষা করে এই ভাইরাস বা অন্য কোন ভাইরাসকে কারণ হিসাবে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। বোরেলিয়া বার্গডরফেরি (Borrelia burgdorferi) নামক জীবাণু কমবয়সীদের রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিসের (Juvenile rheumatoid arthritis)-এর মতো অসুখ সৃষ্টি করে, কিন্তু সে-অসুখ একসঙ্গে অনেকের হয়ে ছোট-খাট মহামারীর আকার নেয়; কিন্তু রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস পৃথিবীর কোথাও মহামারী আকারে প্রাদুর্ভূত হয়নি। আফ্রিকাতে দেখা গেছে যে, গ্রামের চেয়ে শহরে এই রোগ বেশি হয়। হয়তো শহরের ঘন বসতিতে রোগজীবাণু ছড়ায় বেশি, তাই এটা হয়।

তবে সময়ের হিসাবে এই রোগ আগের চেয়ে এখন কম হতে দেখা যাচ্ছে—সংখ্যাতেও কম, তীব্রতাতেও কম। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে গত ২৫ বছরে এই কমে যাওয়াটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আগের চেয়ে এখনকার রোগীদের রক্তে 'রিউমেটয়েড ফ্যাক্টর' (rheumatoid facter) কম পাওয়া যায়, হাড় ক্ষয়ে যায় কম এবং হাড়ে আব (nodule) হয় কম। বৃদ্ধাদের এই অসুখে মৃত্যুর হারও কমেছে। অসুখের তীব্রতা কমার কারণ এখনকার কার্যকরী চিকিৎসা-পদ্ধতি।

বিশ বছর আগে ভাবা হতো যে, পরিবেশের বায়ু এখন কম কলুষিত হচ্ছে বলে লোকের রক্তে রিউমেটয়েড ফ্যাক্টর কম পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে আবার এখন বলছেন যে, হয়তো কোন রোগজীবাণুর বাড়া-কমার ওপর এই রোগের বাড়া-কমা নির্ভর করছে। যাই হোক, এখনো পর্যন্ত যা প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয় যে, যদি বংশাণুগতিক কারণে সংবেদনশীল (genetically susceptible) লোক বিশেষ ধরনের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তাতে রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস হবার সম্ভাবনা থাকে। □

[British Medical Journal, 27 July, 1991, p. 200]

এন্টিফ্যাক্টিন
কার্বঙ্কল, শোথ, দুষ্টক্ষতযুক্ত ঘা, পোড়া
বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া
কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।

প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হতে পারে, সে-বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

মানুষ মূর্খের মতো মনে করে—স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে পারে। বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে না; জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে, সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।... তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভালকাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

এই জীবন ক্ষণ-ভঙ্গুর, জগতের ধন, মান, ঐশ্বর্য—সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয় ? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন ? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন ?

স্বামী বিবেকানন্দ

We shall spend no time arguing as to theories and ideals, methods and plans. We shall live for the good of others; we shall merge ourselves in struggle. The battle, the soldier and the enemy will become one.

Sister Nivedita

He who served and helped one poor man seeing Siva in him, without thinking of his caste, creed or race or anything, with him Siva is more pleased than with the man who sees Him only in image.

Swami Vivekananda

পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

অমৃত কথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতি মাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

The only God to worship is the human soul in the human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of temples. If I cannot worship in that, no other temple will be of any advantage.

Swami Vivekananda

কত সৌভাগ্যে এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটু সময় করে নিতে হয়।... জপ-ধ্যান করতে করতে দেখবে উনি (ঠাকুর) কথা কবেন, মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুনি পূর্ণ করে দেবেন—কি শান্তি প্রাণে আসবে!

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচিপত্র

৯৪তম বর্ষ শ্রাবণ ১৩৯৯

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চুয়াল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঞ্চাশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা ☐ বৈশাখ সংখ্যা থেকে গ্রাহকমূল্য : (ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ) তেত্রিশ টাকা ☐ (সডাক) আটত্রিশ টাকা ☐

উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত **ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ** (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দিই। এই তারিখটি **সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের** সাধারণতঃ **৮/৯ তারিখ** হয়। ডাকে পাঠানোর **সপ্তাহখানেকের** মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে কখনো কখনো পত্রিকা পেঁছাতে বিলম্বও হয়। অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের **একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা** করতে অনুরোধ করি। **একমাস পরে** (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ / পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে **গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে** কার্যালয়ে জানালে **ডুপ্লিকেট** বা **অতিরিক্ত কপি** পাঠানো হবে।

☐ যাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) **পত্রিকা সংগ্রহ** করেন তাঁদের পত্রিকা **ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ** থেকে বিতরণ শুরু হয়। **স্থানাভাবের** জন্য **দুটি সংখ্যার** বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা **সংগ্রহ করে নেন**।

☐ **বৈশাখ সংখ্যা** থেকে (**পৌষ সংখ্যা** পর্যন্ত) গ্রাহক হলে **গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ** (By Hand)—**৩৩ টাকা, ডাকযোগে** (By Post) **সংগ্রহ—৩৮ টাকা**।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন : আশ্বিন (শারদীয়া) ১৩৯৯ সংখ্যা

☐ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য : ছাব্বিশ টাকা**।

☐ **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের** এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না**। তাঁরা নিজের কপি ছাড়া **অতিরিক্ত প্রতি কপি কুড়ি টাকায়** পাবেন ; **৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে **অগ্রিম টাকা জমা দিলে** তাঁরা প্রতি কপি **আঠারো টাকায়** পাবেন।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে **সেই সংবাদ** কার্যালয়ে **অবশ্যই** পেঁছানো প্রয়োজন। **৩১ আগস্ট '৯২**-এর মধ্যে **কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পেঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই** যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ **সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে** আমাদের পক্ষে **দ্বিতীয়বার** দেওয়া সম্ভব নয়।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে **রেজিস্ট্রি ডাকেও** আশ্বিন সংখ্যাটি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি ডাক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ **সাত টাকা ৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে **কার্যালয়ে পেঁছানো** প্রয়োজন। **ঐ তারিখের পরে** টাকা কার্যালয়ে পেঁছালে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের **আগামী বছরের** ডাকমাশুল বাবদ জমা রাখা হবে।

☐ **ব্যক্তিগতভাবে** যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করবেন তাঁদের **২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ('৯২)** পর্যন্ত কার্যালয় থেকে **আশ্বিন সংখ্যাটি** দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন **এই সময়ের মধ্যে** তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে **১৩ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে**। কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য ৩১ **অক্টোবরের ('৯২) পর শারদীয়া সংখ্যাটি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না**। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সানুগ্রহ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।

☐ কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত **খোলা** থাকে, রবিবার **বন্ধ**। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। **২৬ সেপ্টেম্বর মহালয়া উপলক্ষে এবং ৩ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে পত্রিকা বিভাগ বন্ধ থাকবে**।

যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন

১ শ্রাবণ ১৩৯৯ (১৭ জুলাই ১৯৯২)

উদ্বোধন

শ্রাবণ ১৩৯৯ জুলাই ১৯৯২ ৯৪তম বর্ষ—৭ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

আমি তোমাদের ইহকালের মা, তোমাদের পরকালের মা। আমি তোমাদের জন্মজন্মান্তরের মা। আমি মা থাকতে তোমাদের ভয় কি ?

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

কথাপ্রসঙ্গে

নিখিল মানবের চিরন্তন রক্ষাকবচ

সেদিনটিও ছিল শ্রাবণেরই এক দিন। ৪ঠা শ্রাবণ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ। সকাল হইতেই সেদিন প্রকৃতির মুখ যেন এক অব্যক্ত বেদনায় থম থম করিতেছিল। বেলা যতই বাড়িতেছিল প্রকৃতির অস্থিরতা যেন ততই বাড়িয়া চলিয়াছিল। প্রকৃতির হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা মাঝে মাঝেই উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল এবং অবিরল ধারায় অবিশ্রান্ত বর্ষণের আকারে উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিতেছিল। এই ক্রন্দন প্রকৃতির, এই ক্রন্দন ধরিত্রীর, এই ক্রন্দন পৃথিবীর সকল নর-নারীর। জগৎ ব্যাপিয়া এই ক্রন্দন কেন ? কারণ, জগৎ সেদিন মাতৃহীন হইতে চলিয়াছিল এবং সেই পরম বিয়োগের মুহূর্তটি এক পা এক পা করিয়া আগাইয়া আসিতেছিল। মাতৃহীন তো জগতের সকলকেই হইতে হয়, কিন্তু সে-মা তো সকলেরই আপন আপন গর্ভধারিণী। কিন্তু এই যে মা—ইনি জগতের সকলের জননী। বিশ্বজননী সারদা।

কয়েকদিন ধরিয়া ভক্ত-অভক্ত বহু নর-নারী দলে দলে আসিতেছে তাহাদের মাকে প্রাণের শেষ প্রণিপাতটুকু নিবেদন করিবার জন্য। অন্তিম দিবসের পাঁচদিন পূর্বে একজন মহিলা আসিয়াছেন। দূর হইতে তিনি মাকে দেখিতেছেন—দরদরধারে অশ্রু তাঁহার গণ্ড বাহিয়া নামিতেছে। করুণাময়ী তাঁহাকে ইশারায় কাছে ডাকিলেন। রোগদুর্বল অতি শীর্ণ দেহ, কথা বলিতে খুবই কষ্ট। তবু স্পষ্টভাবে মা বলিলেন: "জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"

মা যেন নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও 'হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া' দিতেছিলেন। তিনি যে সমগ্র জগতের এবং সমগ্র জগৎ যে তাঁহার, ইহা তো তাঁহার সমগ্র জীবনের নিত্যক্ষণের নিত্যদৃষ্টি। কিন্তু অন্তিম লগ্নের পূর্বে যে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে তাহারই সেই উপলব্ধি হইতেছিল। তাঁহার দৃষ্টিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের, সন্তানের সঙ্গে সন্তানের কোন ব্যবধান ছিল না কোনদিনই। তাঁহার সেই বিখ্যাত উক্তি তো সকলের জানা: "আমার শরৎ যেমন ছেলে, আমজাদও তেমন ছেলে।"

জনৈকা নারী বিপথগামিনী হইয়াছে। সমাজের চোখে সে ঘৃণ্যা, আত্মীয়-স্বজনের কাছে সে উপেক্ষিতা। মায়ের কাছে যখন সে সঙ্কুচিতভাবে উপস্থিত হইয়াছে মা তাহাকে পরম মমতায় গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্যদের বিরোধিতা এবং বক্রোক্তিকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন: "তুমি যে আমার মেয়ে।" জনৈক যুবক একদিন মাকে বলিতেছেন: "মা, সত্যিই আমি এতসব অন্যায় কাজ করেছি যে, লজ্জায় তোমার কাছে বলতে পারি না।" মা পরম স্নেহে সেই পদস্খলিত সন্তানের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন: "মায়ের কাছে ছেলে—ছেলে।" স্নেহের সেই অমৃতস্পর্শে অভিভূত সন্তান বলিল: "এত দয়া তোমার কাছে পেয়েছি বলে যেন কখনো মনে না আসে যে, তোমার দয়া পাওয়া বড় সুলভ।"

সেযুগে গ্রামাঞ্চলে জাত্যাভিমান ছিল ভয়ানক। জয়রামবাটীতে মায়ের সময়ে গ্রামের মানুষের জাত্যাভিমানজনিত সঙ্কীর্ণতার কী আকার ছিল তাহা এযুগে আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু যিনি জগতের মায়ের সর্বপ্লাবী স্নেহ লইয়া আবির্ভূতা তিনি কি সেই জাত্যাভিমানের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন ? ফলে বারবার সেই গণ্ডি

তিনি ভাঙিয়াছেন। ভাঙিবার জন্য ভাঙেন নাই, তথাকথিত 'বিপ্লব' ঘটাইবার জন্য ভাঙেন নাই। তাঁহার অপ্রতিরোধ্য মাতৃত্বের দুর্বার প্রেরণায় এমনিই তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে। ভিন্ন ধর্মের মানুষকে পাশে বসাইয়া স্বয়ং অন্ন পরিবেশন করিয়াছেন, অবশেষে তাহার উচ্ছিষ্ট স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়াছেন। যাহাদের ছায়া মাড়ানোও পাপ বলিয়া উচ্চবর্ণের মানুষেরা মনে করিত সেইসব নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্যদের মা কত আদরে, কত স্নেহে স্বহস্তে অন্ন পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়াছেন। মায়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা তাঁহাকে অনেক বাধা দিয়াছেন, অনেক ভয় দেখাইয়াছেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করা যায় নাই। গ্রামের রক্ষণশীল সমাজপতিরা তাঁহাকে 'একঘরে' করিবার ভয় দেখাইয়াছেন, কয়েকবার জরিমানাও করিয়াছেন। কিন্তু আপন স্বভাব হইতে তিনি বিচ্যুত হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে একদিন ভক্তদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে দেখিয়া তাঁহার জনৈক আত্মীয়া ভয়ে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন: "মা গো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে।" শুনিয়া পরম আবেগের সহিত স্থির কণ্ঠে মা বলিলেন: "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?"

"সব যে আমার"! তিনি জানিতেন, তিনি যে-দৃষ্টির স্বাভাবিক অধিকারিণী, জগতের মানুষের কাছে তাহা অভাবনীয়। কিন্তু তিনি জানিতেন, অপরকে আপন করিবার দৃষ্টি না থাকিলে পরিবার ও সমাজ টিকিতে পারে না। পরিবার ও সমাজে যদি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক প্রীতির বন্ধন না থাকে তাহা হইলে একটি জাতি কিভাবে বাঁচিয়া থাকিবে, কিভাবে মানবসমাজ টিকিয়া থাকিবে? পারিবারিক সকল সম্পর্কের মূলে থাকে একের সহিত অন্যের 'আমিত্বে'র সম্পর্ক-সূত্র। এই সূত্রকেই আমাদের বেদান্ত বলিয়াছে 'আত্মার' সম্পর্ক—'আত্মবুদ্ধি'। মা ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পূর্বে সেই সূত্রটিই জগৎকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, সেই সম্পর্কের মূলমন্ত্রটি পৃথিবীর মানুষের নিকট ঘোষণা করিয়া গেলেন: "কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।"

বৈদিক যুগের ঋষিরা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, পৃথিবী জুড়িয়া যেন একটি 'নীড়', একটি গৃহ হয়, একটি পরিবার হয়, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেককে দেখে 'আমার' সম্পর্কে সম্পর্কিত এই বোধে, এই দৃষ্টিতে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৩) সেই স্বপ্নকে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়া বৈদিক ঋষি বলিয়াছিলেন: "যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ম্।" আজ পৃথিবীর মানুষ একটি ক্রান্তিপর্বে দাঁড়াইয়া আছে। বিজ্ঞানের উদার বদান্যতায় দূরত্বের অবসান ঘটিয়াছে। পৃথিবী আজ অতি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর দশ প্রান্ত আজ পরস্পরের বড় সন্নিকট। কিন্তু বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় দাক্ষিণ্যে এই নৈকট্য আবার অন্যদিক দিয়া পৃথিবীর কাছে অভিশাপ হইয়া উঠিতেছে। অতি-আধুনিক ভয়াবহ বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রসমূহের যে বিরাট ধ্বংসক্ষমতার কথা শুনিতে পাই তাহাতে বৃহৎ শক্তিগুলির যে-কাহারও জিঘাংসায় পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের একটি দেশ মুহূর্তে পৃথিবী হইতে অবলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। শুধু তাহাই নহে। সেই বিধ্বংসী প্রয়াসের পরিণতিতে সমগ্র পৃথিবীর অস্তিত্বও বিপন্ন হইয়া যাইতে পারে। চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে গ্রাম-শহরসহ সকল জনপদ, অরণ্য-সমুদ্র-পর্বতসহ মানুষ এবং সমগ্র প্রাণিজগৎ। তিল তিল করিয়া যে-সভ্যতাকে হাজার হাজার বৎসরের অতন্দ্র প্রয়াসে মানুষ নির্মাণ করিয়াছে, তাহার অন্তিম লগ্ন যেকোন মুহূর্তেই আসিয়া যাইতে পারে।

পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রনায়কগণকে নিজেদের স্বার্থেই আজ তাই ভাবিতে হইতেছে এই ভয়ংকর পরিস্থিতি হইতে পরিত্রাণের উপায়। খুঁজিতে হইতেছে বাঁচিবার পথ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা বা অন্যত্র বিশ্বনেতৃবর্গের প্রয়াসে যে সম্মিলিত সংগঠন বা শীর্ষসম্মেলনগুলি হইতেছে সেগুলি এই আতংক এবং এই আশংকারই ফলশ্রুতি। আজ সমগ্র পৃথিবীর স্লোগান হইল 'এক পৃথিবী' গঠন। কিন্তু এত সংগঠন, এত সম্মেলনের পরে এখনও 'এক পৃথিবী'র স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া গিয়াছে। সংগঠন ও সম্মেলনে সমস্যার সমাধান আসে নাই। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দাঁড়াইয়া আমরা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি, ঐভাবে সমাধান আসিবেও না। কারণ, সম্মেলনে বা সংগঠনে তত্ত্ব থাকে, আদর্শ থাকে—কিন্তু থাকে না তত্ত্ব ও আদর্শকে প্রয়োগ করিবার কোন সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতা। সেখানেও থাকে অধিকতর শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলির নেতৃবর্গ ও প্রতিনিধিবর্গের উন্নাসিকতা, আত্মম্ভরিতা এবং দুর্বলতর রাষ্ট্রগুলিকে নানাভাবে শোষণ করিবার ষড়যন্ত্র। ফলে

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংগঠন এবং শীর্ষসম্মেলনগুলি প্রধানতঃ পর্যবসিত হইতেছে বৃহৎ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাদপীঠ হিসাবে।

এই প্রসঙ্গে মায়ের সেই মোক্ষম কথাগুলি মনে পড়িতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে মা একদিন একটি ভক্ত ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "হ্যাঁ গা, এত বড় যুদ্ধটা হচ্ছিল, তা হঠাৎ থেমে গেল কি করে?" ভক্তটি বলিলঃ "আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন চৌদ্দ দফা শর্ত দিয়ে সন্ধি করে মিটিয়ে দিলেন। তাই সকলে মেনে নেওয়ায় যুদ্ধটা বন্ধ হলো।" মা জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "কি রকম এবং কি কি শর্ত হলো?" সে বলিলঃ "পরস্পর পররাজ্য অনাক্রমণ, প্রীতির সহিত বসবাস, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি কতকগুলি শর্তে।" মা শুনিয়া বলিলেনঃ "এতো খুব ভাল কথা, কিন্তু ওরা যা বলে ওসব মুখস্থ।" ভক্তটি 'মুখস্থ' কথাটির তাৎপর্য বুঝিতে পারে নাই। মা তাই আবার বলিলেনঃ "যদি অন্তঃস্থ হতো তাহলে কথা ছিল না।"

আমেরিকা, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনায়কগণ সেদিন পৃথিবীতে যুদ্ধকে চিরতরে বন্ধ করিবার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপত্র হিসাবে যে-চুক্তিপত্র করিয়াছিলেন তাহার অসারতা এবং অকার্যকারিতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না আপাতদৃষ্টিতে নিরক্ষর এই পল্লীনারীর। তিনি জানিতেন আবার যুদ্ধ হইবে। কারণ, যুদ্ধের মূলে থাকে যে অসহিষ্ণুতা, হিংসা, পররাজ্য-আগ্রাসনের মনোভাব এবং আত্মদৃষ্টির অভাব, কোন চুক্তিপত্রেরই তাহা দূর করিবার সাধ্য নাই। পরবর্তী কালে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে মায়ের কথা ছিল কত অভ্রান্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতি সম্প্রতি তৃতীয় মহাযুদ্ধের একটি মহড়াও হইয়া গেল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'লীগ অব নেশনস', দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 'ইউনাইটেড নেশনস', সাম্প্রতিককালের 'সার্ক' প্রভৃতি সংস্থাগুলি যুদ্ধের সম্ভাবনাকে দূর করিতে সমর্থ হয় নাই। উপরন্তু উহারা প্রায়শই ছোটখাট যুদ্ধগুলিতে বৃহৎ শক্তিবর্গের অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহাদের প্রতিভূ হিসাবেই কাজ করিয়াছে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পারস্পরিক নৈকট্য আনয়ন তো দূরের কথা, উহারা বহু ক্ষেত্রেই পারস্পরিক দূরত্বকে বরং বাড়াইয়া দিয়াছে। শর্ত, আদর্শ, উদ্দেশ্য—সমস্ত কিছুই কয়েক পৃষ্ঠা কাগজের মধ্যে সীমিত রহিয়া গিয়াছে। আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার বার্তা শর্ত ও সম্মেলনে উচ্চারিত হইলেও তাহাতে কোন কাজ হয় না। প্রকৃতপক্ষে উহা 'অন্তঃস্থ' হওয়া চাই। রাষ্ট্রনায়কগণের প্রস্তাবাদি 'মুখস্থ' (মুখে উচ্চারিত অথবা কাগজে লিপিবদ্ধ) বলিয়াই 'এক পৃথিবী' মরীচিকার মতো বাস্তবের সীমার বাহিরে রহিয়া যাইতেছে এবং যাইবে। বচনে ও লেখনীতে 'এক' বলিলে এক হয় না, জীবনে এবং কর্মে 'এক'-কে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। মায়ের অন্তিম উপদেশ ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনেরই প্রতিফলন।

একবিংশ শতাব্দীর বুকে আমরা পা রাখিতে যাইতেছি। কিন্তু চিন্তাশীল মানুষমাত্রেরই আজ এই ভাবনা যে, আমরা পা রাখিতে পারিব তো? তাহার আগেই পৃথিবী নামক গ্রহটি ধ্বংস হইয়া যাইবে না তো? শারীরিকভাবে ধ্বংস না হইলেও মানসিকভাবে কি ইহা তখনও বাসযোগ্য থাকিবে? বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অন্ধ মানুষ কি মানুষ থাকিবে? এক-একটি যন্ত্রদানবে পরিণত হইয়া যাইবে না তো?

বাস্তবিক, পরিস্থিতি যেদিকে দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে তাহাতে আজ মানবসভ্যতা এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মায়ের জীবনে এবং মায়ের অন্তিম বাণীতে জগতকে আপনার করিয়া লইবার যে-আহ্বান আমরা শুনি উহাই প্রকৃত বিশ্ববীক্ষা। মা ছিলেন ঐ বিশ্ববীক্ষার জীবন্ত প্রতিমা। ঐ বিশ্ববীক্ষাই আজ জগৎকে পরিত্রাণের পথ দেখাইতেছে, মানবসভ্যতাকে স্থায়িত্বের মন্ত্র দান করিতেছে।

একটি অল্পবয়সী ছেলে বিদায় লইবার পূর্বে মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতেছেন। মা তাঁহার ডান হাতখানি ছেলেটির মাথায় রাখিয়াছেন। ধীরে ধীরে স্পষ্ট স্বরে তিনি বলিলেনঃ "যখন দুঃখ পাবে, আঘাত পাবে, বিফলতা আসবে তখন নিশ্চিত জেনো আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি। ভয় পেয়ো না, হতাশ হয়ো না, বাবা!…" সেই ছেলেটি পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেনঃ "মাকে সেই আমার শেষ দর্শন। তারপর কত দিন চলে গেল। আজ আমার জীবনের প্রান্তসীমায় এসে বুঝতে পারছি মায়ের সেই আশীর্বাদই আমার জীবনের রক্ষাকবচ। জীবনে বহুবার বহু সঙ্কটে পড়েছি, বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি; কিন্তু যখনই সংকট এসেছে, সমস্যা এসেছে, আমি আমাকে বলা মায়ের শেষ কথাগুলি স্মরণ করেছি। মনে মনে ভেবেছি, আমি মায়ের চরণে মাথা রেখে প্রণাম করছি, আর মা

আমাকে আশীর্বাদ করছেন, আমাকে বরাভয় দিচ্ছেন। জীবনের সকল সংকট, সকল সমস্যা আমি অনায়াসে পার হয়ে এসেছি মায়ের কৃপায়, মায়ের আশীর্বাদের শক্তিতে।"

ঐ ছেলেটিকেই সেদিন মা বলিয়াছিলেনঃ "জেনো, বিধাতারও সাধ্য নাই যে, আমার সন্তানদের কোন ক্ষতি করেন। আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর সর্বদা জেনো যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন তিনি তোমাদের সর্বদা রক্ষা করছেন এবং করবেন। জেনো, তোমাদের মা রয়েছেন।"

মনে পড়িতেছে সেই সামান্য কিন্তু অসাধারণ ঘটনাটি। মা তখন জয়রামবাটীতে। শরীর অসুস্থ—ষাটের উপরে বয়স (৬৭ বৎসর বয়সে মায়ের মহাপ্রয়াণ)। রাত তখন গভীর—একটা-দেড়টা হইবে। মায়ের একজন সেবকের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঘর হইতে দেখিলেন উঠানে আলো দেখা যাইতেছে। অত রাত্রে উঠানে আলো কেন? কৌতূহলী হইয়া তিনি বাহির হইয়া দেখেন—উঠানে লণ্ঠন লইয়া কে যেন মাটিতে কি করিতেছে। কাছে গিয়া দেখেন—মা। তিনি একটি খন্তা লইয়া মাটি হইতে খোলামকুচি, ইঁটের টুকরা তুলিয়া একটি ঝুড়িতে রাখিতেছেন। সেবক অবাক! মা ঐসব কী করিতেছেন? তিনি বলিলেনঃ "মা, এসব কী করছেন আপনি?" ধরা পড়িয়া গিয়া সলজ্জভাবে মা বলিলেনঃ "এই খোলামকুচি, ইঁটের টুকরোগুলি তুলে উঠোনটা পরিষ্কার করে রাখছি।" "কেন মা?"—সেবক বলিলেন। মা বলিলেনঃ "বাবা, আস্তে কথা বল। সকলের ঘুম ভেঙে যাবে।" তাহার পর অনুচ্চ স্বরে বলিলেনঃ "দেখ বাবা, কলকাতা থেকে সব ছেলে-মেয়েরা এসেছে। ওরা শহরের লোক। খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস নাই। এখানে এ-বাড়িতে ওরা সব খালি পায়ে হাঁটে। ঐ তো আজ একজনের খোলামকুচিতে পা কেটে গেল। তাই আমি খোলামকুচি, ইঁটের টুকরোগুলি তুলে উঠোনটা পরিষ্কার করে রাখছি। যাতে বাছাদের পায়ে না লাগে।" সেবক ব্যস্ত হইয়া বলিলঃ "সে তো আমরাই করতে পারতাম। আপনি কেন রাত্রে না ঘুমিয়ে এসব করছেন?" মা বলিলেনঃ "হ্যাঁ বাবা, তোমরা তো করতে পারই। সব কাজ তো তোমরাই কর, তোমরাই করছ। সারাদিন কাজ করে তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছ। আমার তো কোন কাজ নেই। তাই তোমরা ঘুমিয়ে গেলে আমি এটুকু করছিলাম।" সেবক বলিলেনঃ "বেশ, এবার আপনি আমাকে খন্তাটা দিন। আমি করছি, আপনি ঘরে যান—বিশ্রাম করুন।" মা কোমল কণ্ঠে বলিলেনঃ "বাবা, তুমি করলে তো আমার করা হবে না। আমি যে মা। মা ছেলে-মেয়েদের জন্য কত কি করে। আমি তো তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারি না। যাও বাবা, তুমি ঘুমোও গিয়ে, আর হয়ে এসেছে, আমি বাকিটুকু করে নিই।" ইহার পর সেবক আর কি বলিবেন? তাঁহার দুচোখ বাহিয়া তখন অশ্রু পড়িতেছে। তিনি ভাবিতেছেনঃ এই না হইলে সকলের মা। তিনি তো শুধু উঠানের কন্টকই পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন না, তাঁহার সকল সন্তানদের চলার পথের সকল কন্টককেও ঐভাবে অতন্দ্রভাবে পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছেন। চিরকাল রাখিবেন।

*

মায়ের মহাপ্রয়াণের আর দু-একদিন মাত্র দেরি। কথা আর প্রায় বলিতেছেনই না। মায়ের শরীরের অবস্থার কথা শুনিয়া বহু মানুষ, ভক্ত-অভক্ত দলে দলে আসিতেছে কলকাতার বাগবাজারের মাতৃমন্দিরে। মাকে সেবিকারা জানাইতেছেন সেকথা। করুণার্দ্র কণ্ঠে জননী বলিলেনঃ "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে—আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।"

এই বরাভয় চিরন্তন। দুঃখে দীর্ণ, হতাশায় শীর্ণ, বেদনায় বিমর্ষ, জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত পর্যুদস্ত সকল নরনারীর জন্য চিরকালের অভয় আশ্বাস। দুঃখের সমুদ্র পার হইয়া বিশ্বাসের দ্বীপভূমিতে উত্তরণের নিত্য আহ্বান। সর্বযুগের, সর্বদেশের, সর্বজনের চিরন্তন রক্ষাকবচ।

অবশেষে ৪ঠা শ্রাবণ, রাত্রি দেড়টায় মায়ের মরজীবনের দীপটি নিভিয়া গেল; কিন্তু রহিয়া গেল তাঁহার অমর জীবনের চির-উজ্জ্বল জ্যোতিঃপ্রবাহ। উহা অনির্বাণ ধ্রুবনক্ষত্রের মতো কাল হইতে কালান্তরে নিখিল মানবকে দিয়া চলিবে মৃত্যু হইতে অমৃতলোকে উত্তরণের দিব্য আহ্বান, সান্ত হইতে অনন্ত জীবনের অমেয় অঙ্গীকার। মায়ের মহাপ্রয়াণ পৃথিবীর পক্ষে একটি মহাবিয়োগান্ত ঘটনা। কিন্তু এই মহৎ দুঃখের মধ্য দিয়া জগৎ তো পাইয়াছে তাহার স্থায়িত্বের চিরন্তন প্রতিশ্রুতি-মন্ত্র। মহৎ দুঃখের মধ্য দিয়াই তো আসে পরম সত্যের আলোক। □

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্।

মঠ
আলমবাজার
৯।৮।(১৮)৯৭

প্রিয় গঙ্গাধর,[১]

তোমাকে আমি কিছুদিন হইল একখানি পোস্টকার্ড পাঠাইয়াছিলাম, বোধহয় পাইয়া থাকিবে। তোমরা কেমন আছ? সারদা[২] কেমন ও কোথায় আছে এবং কি করিতেছেন? গত শুক্রবার তুলসী[৩] ও খোকা[৪] পশ্চিম [ভারত] যাত্রা করিয়াছে। এইমাত্র ইংলন্ড হইতে এক পত্র আসিল। কালী[৫] আমেরিকা যাইতেছে লিখিয়াছে। (তাহার ভবিষ্যৎ ঠিকানা C/o. Miss Phillips, 19 W. 38 Street New York.) তোমার নামে একটি ৫ পাঁচ টাকার মনি অর্ডারও আসিয়াছে। আমি সই করিয়া লইয়াছি। মনি অর্ডারটি জয়পুরের বাবু ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে আসিয়াছে। ফারসিতে লেখা ছিল। আমরা বুঝিতে পারি নাই। তুমি বোধহয় তাহাকে চিনিতে পারিতেছ। প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া তাহাকে পত্র লিখিও এবং আমি ঐ টাকা রাজার[৬] নিকট জমা দিব। রাজা ও যোগেন[৭] কলিকাতায় ভাল আছেন। আমি গতকল্য কলিকাতার সভায়[৮] গিয়াছিলাম। তাঁহাদের দেখিয়া আসিয়াছি। স্বামীজী আলমোড়া হইতে আম্বালা গিয়াছেন। মিঃ সেভিয়ারেরও তাঁহার স্ত্রীর সহিত Cashmere[৯] (কাশ্মীর) যাইবার সঙ্কল্প আছে। শশী[১০]রা মান্দ্রাজে ভাল আছে। আমাদের মঠে সকলে একরূপ আছে। তুমি আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে এবং সারদাকে[১১] জানাইবে। সুরেনকে[১২] আমার শুভেচ্ছা দিবে।

ইতি
তোমারই
শ্রীহরি

রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় পোঃ অঃ হাওড়া জেলা
৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২

কল্যাণবরেষু,

প্রিয় তেজনারান,[১৩]

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া পাঠে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমিও অনেক সময় তোমাকে পত্র লিখি ইচ্ছা করিয়াও লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। যাহা হউক তোমরা ভাল আছ ও বেশ পড়াশুনা ও কাজকর্ম করিতেছ জানিয়া বাস্তবিকই সুখী হইয়াছি। তোমাদের মঠের বিশেষ বন্ধু কৃষ্ণস্বামী আয়ার অকালে কাল-কবলিত। ইহাতে বড়ই ক্ষতি। তাঁহাকে আমি একবার কনখলে দেখিয়াছিলাম—দু-এক ঘণ্টার জন্য আলাপ-পরিচয় হয়। বেশ বুদ্ধিমান ও সৎ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রামুকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাইবে। রামুকে আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। আমি তাহার প্রেরিত বইগুলি পাইয়াছি, কিন্তু প্রাপ্তি-স্বীকার স্বয়ং করিতে পারি নাই—মহিমানন্দ দ্বারা

১ স্বামী অখণ্ডানন্দ ২ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ৩ স্বামী নির্মলানন্দ ৪ স্বামী সুবোধানন্দ

৫ স্বামী অভেদানন্দ ৬ স্বামী ব্রহ্মানন্দের ৭ স্বামী যোগানন্দ

৮ মনে হচ্ছে, তুরীয়ানন্দজী এখানে প্রতি রবিবার বিকাল চারটার পর বাগবাজারে বলরাম-ভবনে অনুষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভার কথা বলছেন।—যুগ্ম সম্পাদক

৯ Kashmir-এর এই ইংরেজী বানান তখন প্রচলিত ছিল—যুগ্ম সম্পাদক ১০ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

১১ সারদা মহারাজ তখন দিনাজপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ ত্রাণ পরিচালনা করছেন।—যুগ্ম সম্পাদক

১২ স্বামী সুরেশ্বরানন্দ ১৩ স্বামী শর্বানন্দ

করাইয়াছিলাম। তাহাকে ইহা বলিও। আমার শরীর তত ভাল নহে। চক্ষের দোষ আর তত বাড়ে নাই, সেইরূপই আছে। কিন্তু শরীর ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। প্রস্রাব পরীক্ষা করানো হইয়াছিল। ৩১ গ্রেন সুগার ও কিছু ফসফেট দেখা গেছে। আর বিশেষ কিছু নহে। বিপিন ডাক্তারের ঔষধ চলিতেছে। আহারেরও খুব কটকিনা। মিষ্ট একেবারে ছাড়িয়াছি। রুটি-ভাত চলিতেছে। ফল (বেশি মিষ্ট ছাড়া) খাইতে নিষেধ নাই। এইরূপ তো চলিতেছে। এখন প্রভুর ইচ্ছা যেরূপ সেইরূপই হইবে। ভয় ভাবনা বা চিন্তা কিছুই নাই তাঁহার কৃপায়। মহারাজ[১৪] ভাল আছেন। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহার যেরূপ হইত একটু খেঁতখেঁতে ভাব, সেইরূপ চলিতেছে। শিবানন্দ স্বামী ভাল। তবে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করিতেছেন। আমাকেও কার্শিয়াঙে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। যেমন হয় হইবে। তোমাদের ওখানে ঠাকুরঘরের বর্ণনা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। ঠিকই বলিয়াছ। শশী মহারাজের সেবা এইরূপই ছিল। ওরূপ হইবে আশ্চর্য নহে। আর আমাদের ঠাকুর পরম দয়াল কৃপাময়। শ্রীজগন্নাথ-পুরীতে খুব আনন্দে আমরা ছিলাম। মনে হইলেও এখন আনন্দ হয়। এখানেও একরূপ মন্দ কাটিতেছে না তবে ক্লাইমেট তত সুবিধা নহে, বড় ড্যাম্প। গঙ্গাধর মহারাজ স্বামীজীর উৎসবের দিন মঠে আসিয়াছিলেন, আজ পর্যন্ত এইখানেই আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভারি দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাঁহার শরীর সেসময় এত দুর্বল ছিল। এখন কিন্তু বেশ সারিয়াছেন ও দেখিলে আনন্দ হয়। বোধহয় ঠাকুরের উৎসবের পূর্বে চলিয়া যাইবেন। উৎসব আগতপ্রায়। খুব আয়োজন চলিতেছে। সকলেই খুব ব্যস্ত। আমি প্রাতে শচীন, লক্ষ্মণ, চারু প্রভৃতি চার-পাঁচ জনকে গীতা স্বামী শ্রীধরের টীকামত ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাই। আপনিও সময়মত পড়াশুনা করি। কিন্তু বিশেষ কিছু হইয়া উঠে না। এখন এখানে লোকসমাগম ক্রমে খুব বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। যোগীনের ছেলেরা প্রথম প্রথম আর তত আসিত না, কিন্তু দেখিতেছি দু-চার দিন হইতে আবার খুব আসিতেছে। যোগীনও মধ্যে মধ্যে আসে। সে অসুখে অনেক ভুগিয়াছে। কলিকাতায় শ্রীশ্রীমা ভাল আছেন এবং শরৎ মহারাজ প্রভৃতিও স্বচ্ছন্দে আছেন। গিরিশবাবুর কেবল শরীর তত ভাল নহে, খুবই দুর্বল হইয়া গিয়াছেন ও হাঁপানিতে কষ্ট পাইতেছেন। শুনিতেছি জ্বর হইয়াছে। মহারাজ প্রভৃতি অনেকে তাঁহাকে বোধহয় দু-একদিনের মধ্যে দেখিতে যাইবেন। তুমি কিছু চিন্তা করিও না। প্রভু তোমা দ্বারা যাহা করাইবার ঠিক করাইবেন। তুমি কেবল তাঁহার শরণাগত হইয়া আপনাকে প্রস্তুত রাখ। ভার তোমার নহে, ভার তাঁহার। তুমি কেবল হুকুম তামিল করনেওয়ালা মাত্র। কোন প্ল্যান করিবার দরকার নাই। সব প্ল্যান স্বামীজী করিয়া গিয়াছেন। সেসব আপনিই ক্যারেড আউট হইবে নিশ্চয় জানিও। কেবল সময় ও পাত্রের অপেক্ষা। ধন্য সেই যে আপনাকে তাঁহার কার্যের নির্বাহের যোগ্য করিতে পারিবে। আর সেই তাঁহার কার্যনির্বাহের যোগ্য হইবে যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই করিতে পারিবে, এই আমার স্থির বিশ্বাস। স্বল্পমাত্র স্বার্থভাব থাকিলেও তাঁহার কার্য না হইয়া ব্যক্তিগত কার্য হইয়া যাইবে এবং সে-কার্য কখনও পুরুষকে বন্ধন-মুক্ত করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। বাবুরাম মহারাজ[১৫] সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ মনে মঠের যাবতীয় কার্যের পরিদর্শন করিতেছেন। তুমি তাঁহাদের সকলের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। সীতারাম ভাল আছে। তোমাকে পত্র লিখিবে বলিতেছে। কেদারবাবা[১৬]ও ভাল এবং তোমাকে পত্র লিখিয়াছে বলিল। আর আর সংবাদ কুশল। মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

১৪ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৫ স্বামী প্রেমানন্দ ১৬ স্বামী অচলানন্দ

প্রবন্ধ

শ্রীশ্রীমা ঃ অনন্ত মাতৃত্বের চিরন্তনী মূর্তি

স্বামী সনাতনানন্দ

দিগন্তব্যাপী যে-মহাশক্তির উন্মেষ নিছক ক্ষণিক উদ্ভাসনে ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে চমৎকৃত করে না, বরং চৈতন্যের সঙ্গে শক্তির নিত্য মিলনে মহামানবতার উচ্চতম সুরকে দিগন্ত-অতিক্রমী পথের সন্ধানে মুক্তি দেয়, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবী সেই ঐশী শক্তির অধিকারিণী। ঐশী অবতরণ-ধারার চরম পরিণতি মর্ত্যে আবিভূর্তা এই মহাশক্তির মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য, সমগ্র বিশ্বের মানবাত্মার উদ্বোধনের নিমিত্ত যে-শক্তির অবতরণ, তিনিই আত্মপ্রকটিত হলেন অধুনাসভ্যতা-বিচ্ছিন্ন এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে—বঙ্গভূমির সংকীর্ণ এক কোণে জনকোলাহল থেকে ঢের দূরে 'জয়রামবাটী'তে। ক্ষুদ্র জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীকে অঙ্কে ধারণ করে আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠে পরিণত হয়েছে। একদিন শ্রীমা এই ভূমির তুচ্ছ ধূলিকণা মাথায় তুলে নিয়ে বলেছিলেন ঃ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" শ্রীশ্রীমা জননী ও জন্মভূমির গভীরতর সত্যটি অনুধাবন করেছিলেন। আসলে মহান শক্তি মাত্রেই ইতিহাসের ক্ষুদ্র ধূলিকণাকে এইভাবে সমৃদ্ধির গৌরবে পর্যবসিত করেন। শ্রীশ্রীমা তো ছিলেন অনন্ত মাতৃত্বের চিরন্তনী মূর্তি। তাঁর পবিত্র স্পর্শ যে দিগন্তপ্রসারী হবে এতে আর বিস্ময় কী ?

অসংখ্য সমস্যা-মাঝে মহানন্দময়ী

গুণবিবর্জিত নিরাকার ব্রহ্মের পক্ষে জগদ্ব্যাপারে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই নিরন্তর লোককল্যাণসাধনে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম রূপ পরিগ্রহ করে থাকেন এবং যে-ভক্ত যেরূপে তাঁকে স্মরণ করে, তিনি সেই রূপ ও ভাব অবলম্বনেই তার অভীষ্ট তিনি সিদ্ধ করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধা ঋষি রাজা সুরথকে বলেছেন ঃ

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃপুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥

(১২।৩৬)

—হে রাজন, সেই ভগবতী নিত্যা অর্থাৎ জন্মাদিশূন্য হলেও পুনঃপুনঃ এইরূপে আবির্ভূত হয়ে জগতের পরিপালন করেন।

তাই সেই সুদূর অতীত থেকে অদ্যাবধি দেবীর বিবিধ বিগ্রহ পূজিত হয়ে আসছে। তিনি লক্ষ্মী, তিনি সরস্বতী, তিনিই শীতলা, মনসা, চণ্ডী, দুর্গা ইত্যাদি; অর্থাৎ তিনি একেক রূপে কখনো ধনদাত্রী, কখনো বিদ্যাদাত্রী, কখনো বা নিরাময়কর্ত্রী, ত্রাণকারিণী, আবার কখনো বা সংহারিণী গুণে বিরাজিতা। তাই আত্যন্তিক মুক্তির প্রয়াসে আমরা অনাদিকাল থেকে নারীরূপে, শক্তিরূপে, দেবীরূপে, মাতৃরূপে তাঁর পূজা করে আসছি। ভক্তের টানেই স্বর্গের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে তিনি ধূলি-ধূসরিত মর্ত্যের কুটিরে পদার্পণ করেন, ভক্তের ভাঙা বেড়া বেঁধে দিয়ে যান। স্বর্গের দেবীর সঙ্গে ভারতবাসী এমনি করেই কুটুম্বিতা সৃষ্টি করেছে; কিন্তু দেবী তবু দেবীই থেকে যান। মানুষের শরীরে মানুষের গৃহে তিনি বিগ্রহ পরিগ্রহ করেন না। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে দেবী রক্তমাংসের দেহ-বিশিষ্টা। শ্রীরামকৃষ্ণের পূজিতা, ভবতারিণীর সঙ্গে অভিন্না। মর্ত্যের অগণিত সমস্যা-মাঝে তিনি মহানন্দময়ী।

তোমার অমৃত, বহে অবিরত

আমাদের এই মাটির ঘরের 'মা'-জননীর যে অকৃত্রিম বাৎসল্যধারায় উচ্চ-নীচ সমস্ত ভূমি প্লাবিত হয়েছে, সেই প্লাবনধারা আজও বয়ে চলেছে দিগন্তবিস্তৃত সুদূরের পানে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অভিন্না শক্তির হৃদয়ে বিশ্বজননীর

গোপন বাৎসল্য-স্রোতের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিজের সমস্ত সাধনার ফল নিবেদন করেছিলেন তিনি ষোড়শীপূজার অনুষ্ঠানে। পরবর্তী কালে 'লীলা-সম্পূরণকর্ত্রী'কে তিনি স্বীয় 'অসমাপ্ত কার্যভার' গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। আত্যন্তিক আকুতির সঙ্গে বললেন: "তুমি তাদের দেখো"। মাত্র তিনটি শব্দের মধ্যেই বিশ্বকুটুম্বিতার বৃহৎ প্রেক্ষাপটের ভার অবলীলায় শ্রীমাতে হস্তান্তরিত হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন শ্রীমাকে যাদের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, তারা শুধু অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত 'কলকাতার লোকজন'ই নয়, বরং ঠাকুরের ইঙ্গিত ছিল 'বিশ্বলোকসমীপে' মা ছাড়া এই দায়িত্বভার তিনি আর কাকে দেবেন! যুগ যুগ ধরে এই সত্যস্তোত্রই যে ধ্বনিত হয়ে আসছে:

বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

(চণ্ডী, ১১।৩৩)

বস্তুতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, যে-যুগপ্রয়োজনকে সিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে তাঁর আবির্ভাব, তাতে তাঁর লীলাসঙ্গিনী সারদাদেবীর ভূমিকা পরিপূরণের। ঠাকুর জানতেন, অজ্ঞানতার অন্ধকারে যারা কীটের মতো 'কিলবিল' করছে, তাদের মুক্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মাতৃশক্তি—তারপর অন্য শক্তির কথা। মাতৃশক্তি ছাড়া কল্যাণব্রতের বাস্তবায়ন অসম্ভব। তাই তিনি মাতৃরূপা ঈশ্বরীকে ঐশী দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমাও সেই গুরুদায়িত্ব পালনে কখনো পরাঙ্মুখ হননি। তিনি সমস্ত শক্তিকে আত্মীকরণ করে তিমিরান্ধের জীবলোককে লালন-পালন করেছেন; চূড়ান্ত পতনের পরেও পতিতদের কোলে তুলে নিয়ে বলেছেন: "আমি মা, জগতের মা, সকলের মা।" বিশ্বলোকের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে শ্রীশ্রীমা কিভাবে অপূর্ব মধুরিমায়, কোমলতম অনুভূতির তুলিকায় অঙ্কিত হয়েছেন 'জন্মজন্মান্তরের মা'-রূপে, পরমাশ্রয়দায়িনী 'সত্যিকারের মা'-রূপে তা এক অত্যাশ্চর্য ইতিহাস।

তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল

নারীহৃদয়ে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মাতৃত্ববোধ যখন স্বীয়তনু-সম্বন্ধশূন্য অসীম স্নেহরূপে পরিব্যাপ্ত জীবের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং মাতৃদেবীকে অধ্যাত্মভূমির শীর্ষবিন্দুতে উত্তীর্ণ করে তখন সেই অনুপ্রেরণামূলক মাতৃত্বকে নিছক নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই সর্বংসহ, অনুপম, শিশির-স্নিগ্ধ, কুসুমপবিত্র, স্বার্থলেশশূন্য সতত প্রবাহিত শাশ্বত মাতৃত্বের ধারা যুগে যুগে সন্তানকে বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করে। আমরা শ্রীমায়ের অভ্যন্তরস্থ মাতৃত্বের স্বতস্ফূর্ত ফল্গুধারার যে-পরিচয় পাই তা অচিন্তনীয়, অননুভূত ভগবৎ সত্তারই অপূর্ব বিকাশ। ভোগস্পৃহামুক্ত মাতৃত্বের অকৃত্রিম আকুতি কখন শ্রীমায়ের জ্ঞানগোচর হলো, তার সন-তারিখ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতেই পারে। কিন্তু আশৈশব শ্রীমায়ের মর্মগভীরে যে মাতৃত্বের রাগিণীটি নিহিত ছিল, তাকে অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। আমরা জানি, বাল্যকালে শ্রীমা তাঁর ছোট ছোট ভাইবোনদের লালন-পালনের ভার নিজ হাতে নিয়েছিলেন এবং বুভুক্ষুদের পাতে পরিবেশিত তপ্ত অন্ন জুড়োবার জন্য বাতাস করেছেন। শ্রীমায়ের জীবনে মাতৃত্বের অকৃপণ স্পর্শের অসংখ্য উদাহরণ সকলেরই জানা। তবু মনে রাখতে হবে, শ্রীমা ছিলেন একান্ত মাটি-আশ্রয়ী মানবী মূর্তি। তাই সহানুভূতিসম্পন্না প্রতিবেশিনীদের আক্ষেপ তাঁর হৃদয়-গভীরে অনাকাঙ্ক্ষিত স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলত। লোকের মুখে শুনতে শুনতে শ্রীমায়ের মনে কিভাবে সন্তানলাভের স্পৃহা জাগরিত হয়েছিল, তা তিনি স্বয়ং বলেছেন:

"ঐসব কথা শুনতে শুনতে আমার মনে দুঃখু হতো—তাইতো একটা ছেলেও আমার হবে না? দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঐ কথাটা একবার মনে পড়ে। যেদিন মনে হওয়া,—কাউকে কিছু বলিনি,—ঠাকুর আপনা হতে বললেন, 'তোমার ভাবনা কিসের? তোমায় এমন সব রত্ন-ছেলে দিয়ে যাব, মাথা কেটে তপস্যে করেও মানুষ পায় না। পরে দেখবে, এত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হয়ে উঠবে'।"[১]

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ১৬৭

বস্তুতঃ, এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের অভিলষিত যুগধর্ম প্রবর্তন-প্রচেষ্টার সাথে শ্রীমায়ের শক্তিবিকাশের ধারা মাতৃস্নেহের পথ বেয়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। আজ তিনি সহস্র সন্তান মাঝে বিশ্বজননীর আসনে অধিষ্ঠিতা।

কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী নয়নে উঠে গো আভাসি

অভিজাত্য-মুক্ত পুঁথিগত শিক্ষাবিহীনা শ্রীমাকে সম্যক্ উপলব্ধি করা অত সহজ নয়। ভোগৈশ্বর্য-পূর্ণ বর্তমান যুগে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রতায় পরিপূর্ণ এই চরিত্র বোঝা পার্থিব চিন্তনশক্তির বাইরে। স্বামী প্রেমানন্দ যথার্থই লিখেছিলেন ঃ

> "শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশ নাই। ঠাকুরের স্বয়ং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল; কিন্তু মার—তাঁর ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত। একি মহাশক্তি! জয় মা!! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী মা!!! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে, সব মার নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি—অপার করুণা! জয় মা! আমাদের কথা কি বলছিস—স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি। তিনিও কত বাজিয়ে বাছাই করে লোক নিতেন। আর এখানে—মার এখানে কি দেখছিস? অদ্ভুত, অদ্ভুত। সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে। মা! মা! জয় মা!!"[২]

বস্তুতঃ, মহাশক্তিকে শুধু চক্ষুরিন্দ্রিয়ে বাঁধা যায় না, হৃদয়-গভীরে উপলব্ধি করতে হয়। শ্রীমা—যেন মৃত্যুর পটে আঁকা জীবনের জীবন্ত ছবি। যেখানে হতাশা, যেখানে ক্লান্তি, যেখানে অবসাদ, যেখানে অতৃপ্তি সেখানেই তাঁর শ্বেতশুভ্র আঁচলখানির বিশুদ্ধ ঘূর্ণনগতি। তাই মাকে পাবার জন্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না, প্রশ্ন ওঠে শুধু অন্তর্মুখিনতার, আত্মদীক্ষার। □

২ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৫৯২-৫৯৩

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির (মাঝে)। পিছনে—বিষ্ণুমন্দির/গোবিন্দজীর মন্দির/রাধাকান্ত-মন্দির। সামনে—কালীমন্দিরের নাটমন্দির; এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মথুরবাবুকে অনুরোধ করে পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় তিনি বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সমকালীন অগ্রগণ্য সাধক ও পণ্ডিতদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। বিচারসভায় সমবেত সাধক ও পণ্ডিতবর্গ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দিরের (দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছবি অবশ্য প্রচ্ছদে নেই।) অবস্থান বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু হিন্দুদের দিক থেকেই নয়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের দিক থেকেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি তাৎপর্য রয়েছে। মন্দিরের জমির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, বাকি অংশের অনেকটা জুড়ে ছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী সাহেবের পীরের দরগা। এই যোগাযোগ যেন দৈবনির্দিষ্ট। কারণ, এই ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে যুগাবতার মহাসমন্বয়ের উদার বাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। এই বাণীই আজ শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে। দেশ ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মত ও পথের অসহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে এই বক্তব্য আমরা তুলে ধরতে চাইছি।—**যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন**

কবিতা

শুধু এই করুণা দাও

সতীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

মা গো, এই করুণা দাও।
চক্ষু থেকেও অন্ধ মোরা—
যুগান্তরের অন্ধ কারা
এবার ভেঙে দাও।
আকাশ-ভরা আলোর মাঝে
দৃষ্টিহীনের কান্না বাজে
জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে
এবার দেখতে দাও।
দেহের মাঝে প্রাণ দিয়েছ
মন দিয়ে তা বুঝতে দাও
সুস্থ দেহে সরল মনে
তোমায় সেবার শক্তি দাও।
সকল বিভেদ ভুলতে দাও
সবার ভাল করতে দাও
পূজার প্রদীপ সাজিয়ে নিলাম
এবার আলো জ্বালিয়ে দাও।
শুধু এই করুণা দাও,
মা গো, এই করুণা দাও॥

আমরা রামকৃষ্ণের সন্তান

শিশির মুখোপাধ্যায়

জীবনে শুধুই ক্লেশ
কষ্টের কি নেই শেষ?
কেন ভাবো মিছে পাপে ভরে আছে তোমার অন্তর্দেশ?
হয়তো বা আছে হেথা,
কিছু পাপ আর ব্যথা,
তারই তরে কেন মনে কর তুমি শুধুই পাপেরই ক্রেতা?
কেন বল অবিরত
পাপভারে দেহ নত,
কল্পিত ঐ পাপবোধে কেন হয়ে আছ জীবন্মৃত?
এ পৃথিবী পাপময়
তাও কি কখনো হয়?
পাপ-পুণ্যের সমাহারে জেনো জীবন আনন্দময়।
নৈরাশ্যের ধারা
প্রচারে মগ্ন যারা,
হীনম্মন্যতায় আত্মদর্শনে বঞ্চিত হয় তারা।
হেথা আছে হাসি-গান
আছে ধর্ম, আছে প্রাণ,
প্রেরণা লভিতে ভাবো—'মোরা রামকৃষ্ণের সন্তান'।
যদি থাকে মনে দোষ
কেন কর আফশোষ?
শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণেই পাবে মনোমাঝে সন্তোষ।
বিজয়-নিশান নেড়ে
চল চল আগে বেড়ে,
কোন পাপ তাপ স্পর্শে না জেনো রামকৃষ্ণ-আশ্রিতেরে
তিনি অগতির গতি
পদে তাঁর রাখো মতি,
ত্রিতাপ জ্বালা নিবারিতে হও রামকৃষ্ণ-পদে ব্রতী।
তাঁরি পদ কর সার
হবে জয়জয়কার,
রামকৃষ্ণের সন্তানদের ধর্মের অভিসার।

গুরু*

সুকৃতি রায়চৌধুরী

শ্রীগুরুর পদরজঃ হতে পারো যদি
অপার করুণা তাঁর পাবে নিরবধি।
বাসনা কামনা আর কপটতা শত
দূর কর হৃদি হতে শীঘ্র পার যত॥
গুরু তো নিকটে তব করিছেন বাস
তাঁরে কাছে পেতে যদি থাকে কিছু আশ
অহরহ ভাব তাঁকে প্রাণভরে ডাকো।
জ্ঞানরূপ চক্ষু দিয়ে প্রাণ ভরে দ্যাখো॥
তিনি যে সবার বন্ধু, সকলের প্রাণ
তাঁহার প্রেমের স্রোত নিত্য বহমান॥
সকল জ্ঞানের তিনিই যে মূল
তিনিই পরমতত্ত্ব জেনো তা নির্ভুল॥
বলেন সুন্দরদাস, সর্বঘটে যিনি
বিরাজ করেন এক, তিনি এক তিনি॥

* হিন্দিতে রচিত সুন্দরবিলাস অবলম্বনে।

মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু

নচিকেতা ভরদ্বাজ

গুরু তো আমার মধ্যে—
রক্তে মাংসে স্নায়ুতে নিঃশ্বাসে
অবিরল। চেতনার সমস্ত প্রস্ফুট অস্ফুট ফুলের
স্মিত গন্ধ। জীবনের নিরুপাধি সমস্ত নদীর
নীল জল—উদ্ভাসিত অপরূপ আকাশে আকাশে
তারই আলো-ছায়া কাঁপে। জীবনের, মহাজীবনের
সান্বয়ী মোহনায়—দীপ্ত তাঁর হিরণ্ময় আলোর শরীর
বিশ্বরূপে প্রতিভাত ঃ
নিজেকে নতুন করে দেখা ও জানার
অভীপ্সার অন্য নাম গুরু।
তাঁর সম্যক্, সুন্দর অর্হণা
নিজের গভীরে গিয়ে—নিজেকে নতুন করে
ফের আবিষ্কার করা ঃ
এই প্রত্যহের পরাজিত বিধ্বস্ত বিপন্ন নিজেকে
উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া—প্রত্যহের জীবনের চরিত্র-চেতনা
একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে অন্য এক সূর্যের উৎসেক-এ
ফিরে যাওয়া।
আকাশের ওপারে যে আর এক আকাশ
সেইখানে ন্যস্ত করা জীবনের সমস্ত
জিজ্ঞাসা, বিশ্বাস।
জীবন ও জীবতার সব কাজকে
পরিশুদ্ধ শ্বেত পুষ্প করে
তুলতে হবে—সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার
একগাছি মুগ্ধ মালা! সমস্ত সম্পাদ্য কর্ম
চৌত্রিশ অক্ষরে
উচ্চারণ করতে হবে; তাহলেই বরণীয়
গুরুপূর্ণিমার পূর্ণ কৃত্য শেষ হবে।
একই আকাশের গান নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
নির্ভয়ে বাজাতে হবে।
একই সমুদ্রের জলে সমস্ত নদীর
পূর্ণ পরিণাম জেনে
নিজেকে বৃত্তের বাইরে নিয়ে আসতে হবে।
রথের মেলায় ভিড়,
ধুমধাম, বেচাকেনা—সমস্ত সহজ বিশ্বাসে
ক্রমশঃ পেরিয়ে গিয়ে ধরতে হবে অতঃপর
রথের রশির দৃপ্ত শিখা।
অথচ এ যাওয়া-আসা, এই মেলা,
লোকজন সকলই উৎসবে
অবশ্যম্ভাবী ঃ এই জীবনকে মেনে তবু
জীবন পেরিয়ে চলে যাওয়া।
যেরকম চারিদিকে আকাশের পরিব্যাপ্তি,
অনিঃশেষ হাওয়া,
ঠিক তেমনি আমার চারদিকে—আমি
শ্রীগুরুর আশ্চর্য অনন্য প্রতিভায়
পরিপ্লুত হয়ে আছি ঃ
আমাকেই নানারূপে পরিব্যাপ্ত করে
বিশ্বরূপ রচনা করি—প্রত্যহের পবিত্র গুরুবন্দনায়
নিবেদিত। যুক্ত বোধে প্রত্যহের
পরিণত শ্রমের অক্ষরে
আমার গুরুর পায়ে অবিরল শ্বেত পুষ্প ঝরে।

রামকৃষ্ণ হরি

প্রেমকৃষ্ণ সাহা

দুঃখ আমার বুকের মানিক
তাইতো প্রণাম করি,
(আমার) সকল সুখের মূলে তুমি
রামকৃষ্ণ হরি।
দুঃখ যখন আঘাত করে—
দুচোখে মোর অশ্রু ঝরে
তোমার দেওয়া সকল ব্যথা
সইতে যেন পারি।
হাসাও কাঁদাও ভাসাও ডুবাও
(আমি) জানব না গো আর,
আমি সব সঁপেছি তোমার কাছে
ভাল-মন্দের ভার,
দুঃখ দিও আমায় তুমি—
জনম-জনম ধরি।
(আমার) সকল সুখের মূলে তুমি—
রামকৃষ্ণ হরি।

এস, মন্ত্র খুঁজি

তাপস বসু

অশুদ্ধ বাতাস ছুঁয়ে যায় গার্হস্থ্য আকাশ
ক্রমাগত টানাপোড়েন বিষাক্ত শরীরে
সারাদিনের ক্ষোভ জুড়ে মিছিল হয়, সভা বসে
আকাশ আর নক্ষত্রের মুখ চাওয়া-চাওয়ি
কেল্লার বুকে সজীব নেতৃত্বের আস্ফালন
ঘরে ঘরে শিশু কাঁদে ওদনের তরে···
অতর্কিতে শোনা যায় উৎসবের ঘোষণা
ধূপ, ধুনো, ভুল মন্ত্র মুখোশ এঁটে
ছুটে আসে মানুষ
বুক পোড়ে, মুখ পোড়ে, চোখ পোড়ে
অশুদ্ধ থাকে অন্তর ফসলী পোকার উচ্ছিষ্টে

ঢাকা থাকে আহার্য যদি অন্তর শুদ্ধ না হয়
যদি শিশু করে ক্রন্দন
যদি হাওয়ায় না ফোটে শস্য
যদি আকাশ আর খেলার মাঠের
উদারতা না নামে হৃদয়জুড়ে
অকপট মিথ্যের মুখোশ পড়ে কি লাভ তবে!
'ভাবের ঘরে চুরি' করে কতদিন আর চলে।
তাই এস, নতুন মন্ত্র খুঁজি—
আমাদের ঠিক যেমনটি হওয়ার কথা ছিল,
তোমাদের ঠিক যা যা করার কথা ছিল,
এস, আমরা ঠিক তেমনটি হয়ে উঠি।

কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শান্তি সিংহ

রসদৃষ্টি

দিগ্‌দিগন্তব্যাপী পড়ে আছে মাঠ
বিশ্বব্যাপ্ত প্রকৃতির মহারাজ্যপাট।
সামনে পাঁচিল বাধা, গোল ফাঁক আছে
বিশাল প্রকৃতি সেই ফাঁকে আসে কাছে।
গোলাকৃতি সেই ফাঁক স্বয়ং ঠাকুর—
তিনিই মাধ্যম-লক্ষ্য—নিকট ও দূর।

সূত্র: শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার এসব দেখে কি বোধ হয়?

মণি—আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু!—যীশুখৃস্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি—একব্যক্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক এক! এক বই কি। তিনি (ঈশ্বর),—দেখছ না,—যেন এর উপর এমন করে রয়েছে!

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—যেন বলছেন, ঈশ্বর তাঁরই শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন।

মণি—সেদিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল দেখি।

মণি—যেন দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে! ধূ ধূ করছে! সম্মুখে পাঁচিল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না; সেই পাঁচিলে কেবল একটি গোল ফাঁক।—সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—বল দেখি, সে ফাঁকটি কি?

মণি—সে ফাঁকটি আপনি। আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়;—সেই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট, মণির গা চাপড়াতে লাগলেন। আর বললেন, "তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ।—বেশ হয়েছে।"

মণি—ঐটি শক্ত কিনা; পূর্ণব্রহ্ম হয়ে ঐটুকুর ভিতর কেমন করে থাকেন, ঐটি বুঝা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তারে কেউ চিনলি না রে! ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন কাঙালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।"···

(কথামৃত, ৩।১১।৩ : ৮ জুলাই ১৮৮৫)

মাল্টায় পঞ্চম আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলনে

স্বামী গোকুলানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রোমে আমার ভাষার অসুবিধার কথা আগেই বলেছি। মাল্টা থেকে ফেরার পথে যখন রোমে এসেছি তখন আমার খুব জলপিপাসা পেল। ফাদার মারিয়া সেদিন খুব ব্যস্ত ছিলেন। দুটি শব্দ তিনি আমাকে বললেনঃ "Busy—Funeral!" অর্থাৎ কোন মৃতদেহের সৎকার নিয়ে তিনি খুব ব্যস্ত আছেন। জলতৃষ্ণায় কাতর হওয়াতে আমি ভোজন-কক্ষে গেলাম। কোথাও পানীয় জলের সন্ধান করতে পারলাম না। আমার ঘরে অবশ্য একটা হাত ধোয়ার বেসিন আছে। কিন্তু তাতে তো পানীয় জল পাওয়া যাবে না। অপরিস্রুত জল পান করে এখানে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তবে তো মুশ্কিল। পানীয় জলের সন্ধানে ওপরে উঠে গেলাম। সেখানে কয়েকটি লোক কাজ করছিল। মজুর শ্রেণীর লোক বলে মনে হলো। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই দেখে ওরা জিজ্ঞেস করছেঃ "ইটালীয়ান? স্প্যানিশ? ইংলিশ?" আমি ইঙ্গিতে ওদেরকে বোঝাতে পারলাম যে, আমি পানীয় জলের সন্ধান করছি। তখন ওদের একজন ভোজন-কক্ষে গিয়ে পরিস্রুত জলের আধার আমাকে দেখিয়ে দিল এবং একটা গ্লাস হাতে তুলে দিল। জল গড়িয়ে নিয়ে পান করলাম। চারটে বাজতে যথারীতি চায়ের তৃষ্ণা পেল। কিন্তু ভাষার বিপত্তিতে চায়ের কথা বলা হয়ে উঠল না। অবশেষে মিস্টার গিনো এসে আমাকে নিয়ে গেলেন রাস্তার ধারে একটি রেস্তরাঁয়। আমরা দু-কাপ চা ও একটু পটেটো চিপ্‌স নিলাম। মিস্টার গিনো বিল মিটালেন। আমার একটু কৌতূহল হলো। গিনোকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা যে-টাকাটা নিল ভারতীয় মুদ্রায় তার মূল্য কত হবে। গিনোর কথায় চমকে গেলাম। এর মূল্য হচ্ছে, ভারতীয় মুদ্রায় একশো টাকা।

আমরা মাল্টা পেঁাছেছিলাম ৮ অক্টোবর তারিখ 'এয়ার মাল্টা' বিমানে। মাল্টা হচ্ছে ভূমধ্যসাগরে একটি স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র। সিসিলি দ্বীপ থেকে এর দূরত্ব ৬০ মাইল। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির অন্যতম। এক বর্গ-মাইল এলাকায় ২৫০০০ লোক বাস করে। সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থিতির কারণে এবং আন্তর্জাতিক পোতাশ্রয় হিসাবে মাল্টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে মাল্টার স্বীকৃতি হয়েছে ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে। মাল্টার রাজধানী ভেলেট্টা। এদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য-বন্দর। মাল্টায় বিমান অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমাদের উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। গিনো এসে আমাকে বললেন, ডঃ ক্লাউস নামে একজন জার্মান অধ্যাপক সর্বদা আমার সঙ্গে থাকবেন ও দোভাষীর কাজ করবেন। এরকম প্রত্যেক অভ্যাগতের জন্যই ওঁরা একজন যুবক বা যুবতীকে স্বেচ্ছাসেবী দোভাষী ও গাইড হিসাবে নিয়োজিত করেছিলেন। মাল্টা ছেড়ে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ওই তরুণ জার্মান অধ্যাপক আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। ডঃ ক্লাউস আমাকে বাসে বসিয়ে দিলেন। আমাদের বাসের নম্বর ছিল C 2। এরকম অনেকগুলি বাস ছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে তিনশতাধিক প্রতিনিধি এসে-ছিলেন। আমরা এসে উঠলাম সানক্রেস্ট হোটেলে। হোটেল থেকে ভূমধ্যসাগর দেখা যাচ্ছে। আমার রুম নম্বর ছিল ৩০২। আমার ঘর থেকেই পরিষ্কার সাগর দেখা যাচ্ছে। ওরা আমাকে দু-শয্যাবিশিষ্ট ঘর দিয়েছিলেন। কোন দর্শনার্থী এলে কথা বলার জন্য আর একটি বসবার ঘরও ছিল। ঘর থেকেই জানালা দিয়ে বিস্তীর্ণ ভূমধ্যসাগরের লীলায়িত তরঙ্গরাশি দেখে মন আনন্দে ভরে গেল। হোটেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার মধ্যেই

আমাদের বলা হলো তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিতে—সাড়ে চারটায় উদ্বোধন অধিবেশনে যোগ দিতে যেতে হবে বিখ্যাত মেডিটেরেনীয়ান কনফারেন্স সেন্টারে। আমরাও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে রওনা হলাম।

যখন আমরা বাসে করে যাচ্ছি আমার পাশে বসে ছিলেন একজন মাল্টাবাসিনী ভদ্রমহিলা। তিনি কোন এক সময়ে ইংল্যান্ডে ছিলেন। স্পষ্ট ইংরেজী উচ্চারণে ইনি আমাকে বললেন: "স্বামীজী, আমরা মাল্টাতে একটি সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার কেন্দ্র খুলেছি। আমরা এখন শঙ্করাচার্যের বই পড়ছি।" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "কি করে তা সম্ভব হলো?" ভদ্রমহিলা বললেন: "প্রথম দিকে এতে চার্চের বিরোধিতা ছিল। কিন্তু এখন যেহেতু আমরা আন্তধর্মীয় আলোচনাসভা করছি, চার্চও তাই উদার মতাবলম্বী হয়েছেন। ওঁরা আমাদের অনুমতি দিয়েছেন। আমরা একজন সংস্কৃত শিক্ষক নিয়েছি। উনি লন্ডন থেকে এসে আমাদের পড়ান।" ভদ্রমহিলার কথা শুনে আরও অবাক হলাম; আনন্দও হলো যখন তিনি বললেন, তিনি রোজ ভগবদ্গীতা থেকে শ্লোক মুখস্থ করেন। তিনি একটু আবৃত্তি করে আমাকে শোনালেনও: "প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্…"। মাল্টার মতো দেশ যেখানে খ্রীস্টধর্মের মূল খুব সুদৃঢ়, সেখানে একটি ওদেশীয় মহিলা বলছেন, তাঁরা লন্ডন থেকে শিক্ষক এনে মাল্টাতে সংস্কৃত শিখছেন। তিনি হোটেলে এসেও আমার সঙ্গে দেখা করেন, আমাকে কিছু উপহার দেন এবং তাঁর ছেলে রোহনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। মহিলাটি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে খুব উৎসাহী। প্রশ্ন করলাম: "আমি হিন্দু সাধু কি করে জানলেন?" মহিলাটি বললেন, খবরের কাগজে নাম দেখেছেন আর পোশাক দেখে বুঝতে পেরেছেন যে, আমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি। ৮ অক্টোবরের মাল্টার 'The Times' কাগজে এই ধর্মসম্মেলনের সংবাদ ছাপা হয়েছিল। 'Religions For a Sea of Peace', 'অপরাহ্নে ভূমধ্যসাগরের কনফারেন্স সেন্টারে শুভ উদ্বোধন: নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা আনয়নে ধর্মের ভূমিকা' ইত্যাদি। সেই খবরে বিভিন্ন প্রতিনিধির নাম ছিল। আমার নামও ছিল। এই কাগজ থেকে ভদ্রমহিলা জানতে পারলেন যে, আমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি।

এই পঞ্চম আন্তর্জাতিক অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে পোপ জন পল তাঁর বাণীতে বললেন:

"আমরা জানি, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা আমাদের আয়ত্তের বাইরে। এটা হবে ঈশ্বরের দান—শুধু প্রার্থনা দ্বারাই তা লাভ করা সম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি থেকে প্রতিনিধিগণ মাল্টাতে এসে যে প্রার্থনার জন্য মিলিত হয়েছেন তাতে এই অধিবেশনে অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন দেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাসের গভীর মত-পার্থক্য থাকলেও সেই পার্থক্য পরস্পরকে জানবার, বোঝবার কিংবা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে কোন অন্তরায় হয় না। আর এটাই হচ্ছে বিশ্বশান্তির পথ।"

মাল্টা অধিবেশনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল: "পৃথিবীর ধর্ম ও বিশ্বশান্তি"। আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রোমের সন্ত এডিগিয়ো সম্প্রদায় এই সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। মাল্টাবাসীরা, মাল্টার আর্চ বিশপ এবং মাল্টার 'Foundation For International Studies' নামে একটি সংস্থাও এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন। মাল্টা সরকার এবং সেখানকার আরও অনেক সরকারি, বেসরকারি সংস্থা এই ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। কারণ, একাজে অর্থব্যয়ের পরিমাণটাও ছিল প্রচুর।

রোমের সন্ত এডিগিয়ো সম্প্রদায় এই ব্যাপারে কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েকটি অধিবেশনের আয়োজন করেছেন। ১৯৮৭ সনে আসিসিতে, ১৯৮৮ সনে রোমে, ১৯৮৯ সনে ওয়ারসতে অধিবেশন হয়েছিল। ১৯৯০ সনে চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল বারিতে। আর ১৯৯১ সনে মাল্টার এই সম্মেলন—পঞ্চম আন্তর্জাতিক ধর্মসম্মেলন বিশ্বশান্তির সন্ধানে এগিয়ে চলার স্মারকচিহ্ন হয়ে থাকবে।

বিগত বছরের অধিবেশনগুলিতে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল এখানে তার সামান্য

উল্লেখ করে নিতে পারি। ১৯৮৭ সনের অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল—'শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা', ১৯৮৮ সনে বিষয় ছিল—'শান্তির সন্ধানে প্রার্থনাকারী লোকদের ভূমিকা', ১৯৮৯ সনে আলোচ্য বিষয় ছিল—'আর কখনও যুদ্ধ নয়', ১৯৯০ সনে বারির অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল—'পূর্ব থেকে পশ্চিমে শান্তির সাগর'। আর মাল্টার এবারকার (১৯৯১) অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—'শান্তির সাগরে ধর্মের অবদান'। আগেই বলেছি, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের তিনশোর বেশি প্রতিনিধি মাল্টার এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে এসেছেন। এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু আছেন, খ্রীস্টান আছেন, মুসলমান আছেন, বৌদ্ধ আছেন, শিখ আছেন, জরথুস্ত্রীয় আছেন, সিন্টো আছেন, জৈন আছেন, কনফুসিয়ান আছেন, আর আছেন ওরিয়েন্টাল চার্চের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিগণ।

উদ্বোধন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন একজন কার্ডিনেল। মাল্টার রাষ্ট্রপতি আমাদের হার্দিক স্বাগত জানালেন। বলা বাহুল্য, ব্যবস্থাদি অত্যুৎকৃষ্ট ছিল। আমরা অধিবেশনে নিজ নিজ বক্তব্য রাখলাম। আমি ইংরেজীতে বললাম। কেউ আরবী ভাষায় বললেন, কেউ ফারসী ভাষায়, কেউ বা ল্যাটিন ভাষায়। আমাদের বক্তব্যগুলো সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি ভাষায় অনূদিত হয়ে গেল। রাত ৮-৩০-এ অধিবেশন সমাপ্ত হলো। রাতের নৈশ-ভোজের নিমন্ত্রণ মাল্টার রাষ্ট্রপতি ভবনে। রাষ্ট্রপতি অভ্যাগতদের সম্মানে নৈশভোজন প্রদান করেছিলেন। ৯ অক্টোবর সকাল ও বিকাল দুবেলাতেই অধিবেশন চলল। বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনার বিষয়-বস্তুগুলি ছিল নিম্নরূপ:

(১) ইসলাম এবং পৃথিবীর চ্যালেঞ্জ
(২) ধর্ম এবং আফ্রিকার দেশসমূহ
(৩) আমেরিকা এবং আফ্রিকার মধ্যে শান্তির জন্য ধর্ম
(৪) এশিয়ার শান্তির বাণী।

শেষোক্ত 'এশিয়ার শান্তির বাণী' বিষয়টি আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করলাম। যেমন:

(ক) এশিয়া ও ধর্ম
(খ) খ্রীস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে সহাবস্থান
(গ) মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি সম্বন্ধে অধিকতর সমঝোতার ক্ষেত্রে ধর্মের অবদান
(ঘ) ১৯৯০ সনের বারির সম্মেলনের পর কি কাজ হয়েছে
(ঙ) ধর্ম ও সংস্কৃতি।

আমি যে-আলোচনা-সভাতে অংশ নিয়েছিলাম সেটাতে সভাপতিত্ব করেন কিয়োতোর বিশপ তানাকা। আর যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ইসলামিক সংস্থার ডিরেক্টর ডঃ আবদুর রহমান ওয়াহিদ, স্কুইটজার মন্দিরের প্রধান তাইরু ফারুকাওয়া, তাকাইয়ামার সিন্টো মন্দিরগুলির প্রধান পুরোহিত ইজু কুদো, চীন দেশের জিয়ানের বিশপ লি দুয়ান, ইন্দোনেশিয়ার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী মুনাবির সাদাদ আলি। শ্রী-তুলসীর প্রতিনিধি সমনি মধুরপ্রজ্ঞা এবং আমি।

১০ অক্টোবর আমরা সকলে গেলাম শান্তি প্রার্থনায়। রাজধানীর সিটি গেটে আমরা সকলে সম্মিলিত হলাম। তারপর আমরা শোভাযাত্রা করে প্রার্থনার জন্য গেলাম। সিটি গেটে গিয়ে আমরা বাস থেকে নামলাম। আমাদের মধ্যে ছিলেন জৈন, শিখ, মুসলিম ধর্মাবলম্বী এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ষাট জন প্রতিনিধি। আমরা সকলে শোভাযাত্রা করে অগ্রসর হলাম। রাস্তার দুধারে শহরের লোকেরা সমবেত হয়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানালেন। ভিডিও তোলা হচ্ছিল। আমরা প্রার্থনা-স্থলে পৌঁছালে আমাদের যে যার ধর্মের পদ্ধতি অনুযায়ী প্রার্থনা করতে বলা হলো। প্রত্যেক ধর্মের জন্য আলাদা স্থান নির্দিষ্ট ছিল। শিখদের জন্য নির্ধারিত স্থানে শিখরা গেলেন। যেখানে লেখা ছিল 'হিন্দু মতে', আমরা সেখানে প্রবেশ করলাম। এখানে উল্লেখ করে নিই, আমাদের লন্ডন বেদান্ত সেন্টারের অধ্যক্ষ স্বামী ভব্যানন্দও মাল্টার এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি সোজা লন্ডন থেকে বিমানে মাল্টা এসেছেন, আমি দিল্লী থেকে গিয়েছি ফ্রাঙ্কফুর্ট ও রোম ঘুরে। কাজেই আমার সঙ্গে তাঁর সম্মেলনেই প্রথম দেখা

হয়। মাল্টাতে এসে তাঁকে দেখে আমার একই সঙ্গে বিস্ময় ও আনন্দ। হিন্দুমতে প্রার্থনাতে অনেক ইটালীয়ানরাও যোগ দিলেন। এঁরা কিছু কিছু করে বিভিন্ন ধর্মের প্রার্থনাতেই যোগ দিয়েছিলেন। স্বামী ভব্যানন্দ ক্যাসেটে 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' স্তোত্র শোনালেন এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু বললেন। 'ধ্যান' সম্বন্ধে কিছু বলতে বলায় আমি ভক্ত-সম্মেলনাদিতে যেরকম 'guided meditation' করে থাকি তেমনি সমবেত ধ্যানের উদ্যোগ নিলাম। একজন ইংরেজী ভাষা জানা স্বেচ্ছাকর্মীকে ডেকে নিলাম। তিনি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমার প্রতিটি কথা তিনি ওদেশের ভাষায় অনুবাদ করে বললেন। স্পষ্টতই এই রকম সমবেত ধ্যান উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে একটা সাড়া জাগাল। প্রার্থনার পরে ওঁরা এবিষয়ে আমাকে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। প্রার্থনা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আবার সিটি গেটে সম্মিলিত হলাম। সেখানে প্রতিনিধিদের বসবার জন্য একটা বিরাট মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। কে কোথায় বসবেন, সব বসবার জায়গায় লেবেল এঁটে নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল। আমরা সকলে মঞ্চের ওপর নির্ধারিত আসনে উপবিষ্ট হলাম। আমাদের দুই দিকে কিছু মোমবাতি জ্বালানো হলো। সেন্ট এডিগিয়ো সম্প্রদায়ের সভাপতি আমাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে ভাষণ দিলেন। এটাই ছিল সম্মেলনের সমাপ্তি দিবস। সেদিন সম্মেলনের পক্ষ থেকে সমগ্র বিশ্বের কাছে আবেদন করা হয়েছিল—পৃথিবীতে আর যেন যুদ্ধ না হয়, মানুষকে হিংসার পথ পরিহার করতে হবে, বিভেদ ও বিচ্ছেদের নীতি পরিত্যাগ করতে হবে, রক্তপাত বন্ধ করতে হবে। বিশ্বমানবের কাছে এই আবেদনের যে-প্রস্তাব সম্মেলনে গ্রহণ করা হলো তা আবার পাঠ করতে দেওয়া হলো আমাকেই। আবেদনটি সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছিল।

সম্মেলন শেষ হবার আগে প্রত্যেক ধর্ম-প্রতিনিধিকে একটি করে মোমবাতি জ্বালাতে অনুরোধ করা হলো। মোমবাতিটি জ্বেলে প্রত্যেকে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করলেন। আমি মঞ্চ থেকে লক্ষ্য করলাম, যে দশসহস্র নরনারী এখানে সমবেত হয়েছেন এদের প্রত্যেকের হাতে একটি বিশেষ ধরনের মোমবাতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোমবাতিটিতে একটি স্বচ্ছ ঢাকনা দেওয়া আছে, যার ভিতর দিয়ে আলো আসছে অথচ হাওয়াতে বাতিটি নিভে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে সমগ্র সভাস্থলটি যেন আলোর সমুদ্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সেখানে তখন হাওয়া বইছিল, কিন্তু একটা আলোও নিভে যায়নি। দেখে খুব অবাক লাগছিল। আমি কৌতূহল দমন করতে না পেরে আসবার আগে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে একটি বাতি চেয়ে নিলাম। বাতিটা আমি আমার সঙ্গে এদেশে নিয়ে এসেছি। একসঙ্গে দশহাজার মোমবাতি আলো দিচ্ছে, হাওয়াতে একটিও নিভছে না! এতে বোঝা যায়, এর জন্যও উদ্যোক্তারা কতখানি যত্ন নিয়েছেন।

মাল্টা থেকে আবার রোমে ফিরে এলাম। কার্ডিন্যাল আরিঞ্জের সহায়তায় মহামান্য পোপের ভ্যাটিকান সিটিও ঘুরে এলাম।

এবার ফেরার পালা। ১০ অক্টোবর সকালের লুফৎহানসার বিমানে রোম থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট এলাম। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে উইলফ্রেড মারকোয়ারডট নামে একটি জার্মান যুবক আমাকে স্বাগত জানাল। ছেলেটি আমাদের দশম সঙ্ঘগুরু স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর দীক্ষিত। সে ডুসেলডর্ফ থেকে এতটা পথ এসেছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। সঙ্গে আর একটি ভক্ত ছেলেকেও নিয়ে এসেছে। ওর নাম প্যাট্রিক স্কুলজ। ওরা রাত তিনটায় রওনা হয়ে এই পথটা এসেছে। আমার সঙ্গে জার্মানির ট্রানজিট ভিসা ছিল। কাজেই বিমানবন্দরের বাইরে বেরুতে কোন অসুবিধা ছিল না। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমার কয়েকজন ভারতীয় বন্ধু এসেছিলেন। এসেছিল কল্যাণ বসু নামে আমার একটি প্রিয় ছাত্র। কল্যাণ সাহিত্যিক-সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর ছেলে। এবারে আমার হাতে একটু সময় বেশিই ছিল। তাই আমি এদের সঙ্গে বিমানবন্দর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে শহরের ভিতরে চলে এলাম। আমরা যে জাতীয় সড়কটি ধরে এলাম, সেই সড়কটি তৈরি করেছিলেন হিটলার। আমরা একটি ভারতীয় ভক্তের

বাড়িতে এলাম। জার্মান ছেলে দুটি সঙ্গেই ছিল। ভক্ত-পরিবারটি দোরগোড়ায় মঙ্গলঘট বসিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। সুদূর জার্মানিতে ভারতীয় প্রথায় স্বাগত অভ্যর্থনা ভারি ভাল লাগল। একটু স্তোত্রপাঠ হলো। অনুরোধ এল, আমাকে একটু কিছু বলতে হবে। আমি 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বললাম। জার্মান ছেলে দুটিকে নানা বিষয়ে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। ছেলে দুটি ভাল। ওদের আমি কিছু বই উপহার দিলাম। উইলফেডও আমাকে কয়েকটি জার্মান পুস্তক উপহার দিল।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে ১৯৩৩ সনে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজীকে জার্মানিতে পাঠিয়েছিলেন। যতীশ্বরানন্দজী ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বার্লিনে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ভাবধারা এবং বেদান্ত প্রচারে প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন। জার্মানির বিভিন্ন স্থানে এবং পরে জার্মানি থেকে বিস্তারলাভ করে তাঁর প্রচারকার্য সুইজারল্যান্ডে প্রসারিত হয়েছিল। যতীশ্বরানন্দজী জেনেভা, প্যারিস এবং লন্ডনেও গিয়েছিলেন এই কাজে। পরে সিদ্ধেশ্বরানন্দজী মহারাজও একাজে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। প্যারিস থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে গ্রেৎস-এর বেদান্ত সেন্টার তাঁরই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সিদ্ধেশ্বরানন্দজী প্রচারকার্যে পশ্চিম জার্মানির ফুলদাতে প্রায়ই যেতেন এবং সেখানে বেদান্তানুরাগী ভক্তদের নিয়ে একটি নির্জন স্থানে আলোচনাচক্র সংগঠিত করেছিলেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীকে একাধিকবার জার্মানির মিসেস ইলসা বুশ আমন্ত্রণ করেছেন বার্লিনে (পশ্চিম)। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীও তাঁর আমন্ত্রণে বার্লিন ঘুরে এসেছেন।

উইলফেড মারকোয়ারডট, বিষাণ বসু প্রমুখ ভক্তেরা পশ্চিম বার্লিনে একবার রঙ্গনাথানন্দজীকে ধরলেন ডুসেলডর্ফ এবং তার সন্নিহিত কিছু অঞ্চলে ঘুরে যাওয়ার জন্য। রঙ্গনাথানন্দজী রাজি হলেন এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দুশো কিলোমিটার দূরে ডুসেলডর্ফে এলেন। তখন থেকে জার্মানির ডুসেলডর্ফে একটি বেদান্ত সোসাইটি গড়ে উঠেছে। জার্মানির পুনর্মিলনের পর বেদান্ত সোসাইটি সমগ্র জার্মানির ভক্তদের নিয়ে কাজ করছে। কিছুদিন আগে মঠ-মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী ইউরোপে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণকালে জার্মানির ডর্টমান্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে মিশনের ভক্তরা সকলে তাঁকে আবেদন জানান যে, সমগ্র জার্মানিতে যে বেদান্ত সোসাইটি এখন কাজ করছে সেখানে যেন একজন বেলুড় মঠের সাধু পাঠানো হয়। ডর্টমান্ডে যোশী নামে জনৈক ভক্ত গহনানন্দজীকে বলেন: "মহারাজ, আমার একটি ফ্ল্যাট আছে। এই ফ্ল্যাটটি আমি মিশনের সাধুর ব্যবহারের জন্য দিয়ে দেব। আপনি দয়া করে একজন সাধু এখানে পাঠান।" গহনানন্দজী ওখানকার ভক্তদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, ওঁদের আবেদন বিবেচনা করে দেখা হবে। এখন ওঁরা যেন বেদান্ত সোসাইটির কাজ সুন্দরভাবে চালিয়ে যান। তিনি আরও বলেন, ওখানকার কাছাকাছি জেনেভায় ও নেদারল্যান্ডে মিশনের যে-দুটি কেন্দ্র আছে, সেখানকার সাধুদের কেউ যেন মাসে বা পনেরো দিনে একবার করে জার্মানিতে আসেন—এই অনুরোধ তিনি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলিকে করবেন। আমারও মনে হলো, স্বামী যতীশ্বরানন্দজী যে-কাজ শুরু করেছিলেন তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জার্মানিতে একটি মিশন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আশু প্রয়োজন রয়েছে। মনে হচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাতে অদূর ভবিষ্যতেই জার্মানিতে মঠের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হবে। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লী আসার সময় বিমানে বারবার মনে হচ্ছিল দেশে-বিদেশে যত তাঁর ভাবধারা প্রসারিত হবে বিশ্বশান্তির পথ তত প্রশস্ত হবে। ☐

[সমাপ্ত]

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আলোয়ারে শ্রীবিবেকানন্দ

শ্রীশ্রমণক

[পূর্বানুবৃত্তি]

'শ্রীশ্রমণক' স্পষ্টতঃ প্রবন্ধ-রচয়িতার ছদ্মনাম। মনে হয়, প্রবন্ধটি তৎকালীন উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দের লেখা। শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের নেপথ্যে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এবছর স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ-পূর্তি বর্ষ। সেকথা স্মরণে রেখে এই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে।

যুগ্ম সম্পাদক

যেসকল যুবক তাঁহার [স্বামীজীর] নিকট সর্বদা আসিতেন তাঁহারা সকলেই স্বামীজীর উপদেশমত সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের লইয়া স্বামীজী মধ্যে মধ্যে স্বয়ং পড়াইতেন। সংস্কৃত বিদ্যার প্রভৃত চর্চার সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা করিতে স্বামীজী পুনঃপুনঃ বলিতেন। কারণ তিনি বলিতেন, এদেশের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস তো একেবারেই নাই, ইংরাজী ভাষায় যেসমস্ত আধুনিক ইতিহাস আছে, তাহাতে আমাদিগের অধঃপতনের চিত্রই বিশেষভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তৎপাঠে আমরা অধিকতর নির্বীর্য ও অধঃপতিত হইতেছি। বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করিয়া আমাদের প্রকৃত ইতিহাস প্রস্তুত করিতে হইবে। ইংরাজ পণ্ডিতমণ্ডলীর চেষ্টায় যে কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহা পক্ষপাতদোষদুষ্ট, কারণ তাঁহারা আমাদের ধর্ম, আচার, ব্যবহার কিছুই বোঝেন না ও মানেন না। তজ্জন্য সেই সমস্ত অনুসন্ধান নিরপেক্ষভাবে করা হয় নাই। তন্মধ্যে অনেক অলীক বিষয়ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এসমস্ত আমাদেরই কার্য, আমাদেরই করা চাই, তবেই বিশুদ্ধ নির্ভুল ইতিহাস হইবার সম্ভাবনা। যদিও ইংরাজ পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে ঐসকল তত্ত্বানুসন্ধানের চেষ্টা না করিয়া কেবল তাঁহাদেরই মতো অন্ধের ন্যায় পরিচালিত হই, তবে তাহাতে আমাদের সর্বনাশেরই অধিক সম্ভাবনা। প্রকৃত-পক্ষে বৈদিক সময় হইতে বুদ্ধদেবের পর সহস্র বৎসর পর্যন্ত আমাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু আজকাল বিদ্যার সাহায্যে কত দেশের লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার হইয়াছে এবং হইতেছে। আমাদের সেই লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে প্রত্যেক ভারত ভারতীর যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। কাহারও শিশুসন্তান হৃত হইলে সে যেরূপ মমতা ও অধ্যবসায়ের সহিত সেই হৃত শিশুর উদ্ধার সংকল্পে ধাবমান হয়, প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের সেইরূপ মমতা ও অধ্যবসায়ের সহিত ভারতের সেই লুপ্ত গৌরব-ছবির পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, তবে আমাদের জাতীয় শিক্ষা পাইবার উপায় হইবে এবং এইরূপ জাতীয় শিক্ষা হইতে থাকিলে ক্রমে জাতীয়তার বিকাশ হইবে।" স্বামীজী এই যুবক-গণকে আপনার প্রাণসম ভালবাসিতেন ও এইরূপ উত্তেজক বাক্যসকল দ্বারা তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষা পাঠে প্রবৃত্ত করিতেন। তাঁহার এই সমস্ত কথা ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে হয়।

একদিন স্বামীজী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আলোয়ার রাজধানীতে কোন সাধু আছেন কিনা। তিনি কহিলেন যে, একজন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী অনতিদূরে আছেন। স্বামীজী কহিলেন: "তবে আমাকে সেখানে নিয়ে চল, তাঁর দর্শন করিয়ে দাও।" দুইজনে সেই ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গমন করিলেন। স্বামীজী তাঁহার নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ব্রহ্মচারী কহিতে লাগিলেন: "তুই গেরুয়া পরেছিস কেন? আমি গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীদের দুচক্ষে দেখতে পারি না।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীকুলে অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া তৎপরে আবার স্বামীজীকে কহিলেন:

"আচ্ছা তা হোক তুই কিছু খাবি? আমার তোর ওপর তেমন রাগ নেই।"

স্বামীজী করজোড়ে কহিলেন: "আজ্ঞে এইমাত্র ভিক্ষা করে আসছি, এখন আর কিছু আহারের আবশ্যক নাই। আপনি অনুগ্রহ করে কিছু তত্ত্বকথা বলুন, আমি শুনি।"

ব্রহ্মচারী ঠাকুর বিষম ক্রোধ প্রকাশপূর্বক কহিলেন: "তবে যা দূর হ, কিছু খাবি না তো দূর হ।" স্বামীজী পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। যে-ব্যক্তি তাঁহাকে সাধু-দর্শন করাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি স্বামীজীর এতদ্রূপ অবমাননায় অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ভীত হইয়া মনে করিতেছেন, স্বামীজী হয়তো তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। কিন্তু এই ব্যাপারে স্বামীজীর অসন্তোষের পরিবর্তে বরং এত আমোদ বোধ হইয়াছিল যে, তাঁহার অত্যন্ত হাসি পাইয়াছিল। যাহা হউক, যতক্ষণ ব্রহ্মচারী ঠাকুরের নিকট ছিলেন ততক্ষণ অতি কষ্টে উচ্চহাস্য সম্বরণ করিয়াছিলেন, রাস্তায় খানিকদূরে আসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, এমন হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার সহচরটি হাসির কারণ কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে না পারিয়াও সেই স্রোতে পড়িয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে আরও কিছুদূরে আসিয়া স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন: "আচ্ছা সাধু দেখালে বাবা, কি গালাগালির চোট রে বাবা!" এই বলিয়া পুনরায় হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সেই ব্রহ্মচারীর মতো নকল করিয়া আপনি হাসিতে লাগিলেন ও তাঁহার সঙ্গীটিকেও ততোধিক হাসাইতে লাগিলেন।

তাঁহার অসীম ঈশ্বরপ্রেম, অপার অবিচ্ছিন্ন আনন্দ এবং সকলের প্রতি অগাধ ভালবাসা সকলকেই মুগ্ধ করিল। যেসকল লোক তাঁহার নিকট প্রতিদিন আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি একদিন একজন অনুপস্থিত হইতেন তো স্বামীজী তাঁহার জন্য ভাবিয়া অস্থির হইতেন। সে কেন আইসে নাই, তাহার তো কোন বিপদ হয় নাই? এইরূপ চিন্তা তাঁহাকে কাতর করিত। কাহারও দ্বারা সেই ব্যক্তির প্রকৃত সন্ধান লইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। একদিন একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক তথায় আসিয়া উপস্থিত। তাহার উপনয়নের বয়স প্রায় পার হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, পেটের অন্নই জোটে না, তা উপনয়ন-সংস্কার কিরূপে হইবে। স্বামীজীর আর অন্য চিন্তা নাই, যিনি তাঁহার নিকট আগমন করেন, তাঁহাকেই বলেন: "আমার একটি ভিক্ষা আছে।" তৎপরে সেই ব্রাহ্মণ বালকের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া যাহাতে সকলে একটা চাঁদা তুলিয়া তাহার উপনয়ন দেওয়াইতে পারেন, তাহার প্রস্তাব করিলেন। একদিন সকলে উপস্থিত হইলে কহিলেন: "দেখুন, গৃহস্থ বলেই এইটি আপনাদের বিশেষ কর্তব্যকর্ম। চাঁদা করে ছেলেটার পৈতে দিন। ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খ হয়ে বেড়ায় সেটা ভাল নয়। যদি বিদ্যাশিক্ষারও কিছু বন্দোবস্ত করে দেন তো বড় ভাল হয়।" এই ঘটনার কিছু পরেই স্বামীজী আলোয়ার পরিত্যাগ করিয়া যান, কিন্তু একমাস পরে আবু পর্বত হইতে আলোয়ারে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে[১] যে প্রথম পত্র লিখেন তাহা পড়িলে দেখা যায়, তিনি উক্ত ব্রাহ্মণ বালকটির কথা ভুলেন নাই। উক্ত পত্রটির কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।[২]

মাউন্ট আবু
৩০ এপ্রিল, ১৮৯১

'বৎস

"আশা করি তোমরা আলোয়ারে সুস্থ আছ। এই আবু স্থানটি অতি সুন্দর, তবে এখানকার পানীয় জল অত্যন্ত খারাপ। আমি টিকেদার অফিসের (vaccination) প্রধান কেরানী শ্রীযুক্ত মুরলীলালের বাসায় আছি। ইনি তোমাদের ডাক্তারবাবুর একজন বিশেষ বন্ধু, আর সেজন্যে ইনি আমাকে এত আদর যত্ন করে রেখেছেন। ডাক্তারবাবুকে একথা জানাবে আর আমার সহস্রাধিক সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ দেবে। তোমাদের ডাক্তারবাবু যথার্থই একজন উৎকৃষ্ট ভদ্রলোক।

১ পত্রপ্রাপকের নাম লালা গোবিন্দ সহায়।—যুগ্ম সম্পাদক

২ মূল পত্রটির অংশবিশেষ স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডের (৯ম সং, ১৯৭২) অন্তর্ভুক্ত (পৃঃ ২৪৪-২৪৫)।
—যুগ্ম সম্পাদক

"সেই ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন দিয়েছ? তুমি সংস্কৃত পড়ছ? কেমন, কত দূর পড়া হলো? বোধ হয় এতদিনে প্রথম ভাগ শেষ হয়েছে? তোমার ভ্রাতৃদ্বয় কেমন আছে? নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে শিবপূজা করছ তো? না কর তো করবার চেষ্টা কর। প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যে অন্বেষণ কর, আর যা কিছু আবশ্যক তোমার সব আসবে। আগে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা কর, উপরন্তু ধন মান পাবে।...

"বৎস, ধর্ম মতমতান্তরে নয়, ধর্ম অনুষ্ঠানে। সৎ হওয়া ও সৎকর্ম করা—এছাড়া ধর্ম বলতে আর কিছুই বোঝায় না। যিনি কেবল 'হে প্রভু, হে প্রভু' বলে চিৎকার করেন, তাঁকে প্রকৃত ধার্মিক বলা যায় না—যিনি সেই পরম পিতার আদেশ পালন করেন; তিনিই যথার্থ ধার্মিক।

"তোমরা আলোয়ারী যুবকদলটি বেশ। আশা করি তোমরা অচিরেই সমাজের ভূষণস্বরূপ [হবে] এবং যে-দেশে তোমরা জন্মেছ, তার পক্ষে এক মহা কল্যাণস্বরূপ হবে।...

ইতি
তোমাদেরই
বিবেকানন্দ"

স্বামীজী এই পত্রে প্রত্যেকের নাম করিয়া কে কেমন আছেন এবং কি প্রকার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু সকলের অগ্রে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন হইয়াছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।*

ক্রমশঃ

* উদ্বোধন, ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৩, পৃঃ ৪৫-৪৮

শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

জীবন্মুক্তিবিবেকঃ

বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : গত বৈশাখ সংখ্যার পর]

অতঃপর কহোল-ব্রাহ্মণ থেকে বিদ্বৎ সন্ন্যাসের পক্ষে বাক্য আহরণ করা হয়েছে—

কহোলব্রাহ্মণেঽপি বিদ্বৎসন্ন্যাস আম্নায়তে "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি" ইতি।

অন্বয়

কহোল-ব্রাহ্মণে অপি (বৃহদারণ্যক উপনিষদের কহোল-ব্রাহ্মণেও), বিদ্বৎসন্ন্যাসঃ (বিদ্বৎ সন্ন্যাস প্রসঙ্গ), আম্নায়তে (পঠিত হয়)—

তম্ এতম্, (এই সেই), আত্মানং বৈ (আত্মাকেই), বিদিত্বা (জেনে), ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণেরা), পুত্রৈষণায়াঃ চ (পুত্রকামনা থেকে), বিত্তৈষণায়াঃ চ (বিত্তকামনা থেকে), লোকৈষণায়াঃ চ (লোককামনা থেকে), ব্যুত্থায় (উত্থিত হয়ে), অথ (অনন্তর), ভিক্ষাচর্যং (ভিক্ষাবৃত্তি), চরন্তি (অবলম্বন করেন)।

বঙ্গানুবাদ

বৃহদারণ্যক উপনিষদের কহোল-ব্রাহ্মণেও (৩।৫।১) পঠিত হয়—

'এই সেই আত্মাকেই জেনে ব্রাহ্মণেরা পুত্রকামনা, বিত্তকামনা, স্বর্গাদি লোককামনা থেকে ব্যুত্থিত হয়ে অনন্তর ভিক্ষাবৃত্তি অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।'

ন চৈতদ্বাক্যং বিবিদিষাসন্ন্যাসপরমিতি শঙ্কনীয়ম্। পূর্বকালবাচিনো বিদিত্বেতি ক্ত্বাপ্রত্যয়স্য ব্রহ্মবিদ্বাচিনো ব্রাহ্মণশব্দস্য চ বাধপ্রসঙ্গাৎ। ন চাত্র ব্রাহ্মণশব্দো জাতিবাচকঃ। বাক্যশেষে পাণ্ডিত্য-বাল্যমৌনশব্দাভিধেয়ৈঃ শ্রবণমননিদিধ্যাসনৈঃ সাধ্যং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমভিপ্রেত্যাথ ব্রাহ্মণ ইত্যভিহিতত্বাৎ।

অন্বয়

এতৎ বাক্যং চ (এই বাক্যকে কিন্তু), বিবিদিষা-সন্ন্যাসপরম্ (বিবিদিষা সন্ন্যাসমূলক), ইতি (এরূপ), ন শঙ্কনীয়ম্ (শঙ্কা করা উচিত নয়)। বিদিত্বা (জানিয়া), ইতি (এই পদের), ক্ত্বাপ্রত্যয়স্য (ক্ত্বা প্রত্যয়ের), পূর্বকালবাচিনঃ (পূর্বকালবাচিত্ব), চ (এবং), ব্রাহ্মণশব্দস্য (ব্রাহ্মণ শব্দের), ব্রহ্মবিদ্-বাচিনঃ (ব্রহ্মবিদ্‌বাচিত্ব), বাধপ্রসঙ্গাৎ (বিঘ্নিত হয়)। অত্র (এখানে), ব্রাহ্মণশব্দঃ (ব্রাহ্মণ শব্দ), জাতিবাচকঃ চ (জাতিবাচকও), ন (নয়)। বাক্য-শেষে (শ্রুতির বাক্যশেষে), অথ ব্রাহ্মণঃ (অনন্তর ব্রাহ্মণ), ইতি পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনশব্দাভিধেয়ৈঃ (পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনশব্দাভিহিত), শ্রবণমনন-নিদিধ্যাসনৈঃ (শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন সাধনত্রয় দ্বারা), সাধ্যম্ (সাধনীয়), ব্রহ্মসাক্ষাৎকারম্ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকে), অভিপ্রেত্য (অভিপ্রায় করে), অভিহিতত্বাৎ (অভিহিত হয়)।

বঙ্গানুবাদ

বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদন করাই পূর্বোক্ত বাক্যের তাৎপর্য—এরূপ শঙ্কা করা কারও উচিত নয়। কারণ, 'বিদিত্বা' এই শব্দের 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের পূর্বকালবাচিত্বের বিঘ্ন ঘটে এবং ব্রাহ্মণ শব্দের ব্রহ্মবিদ্ অর্থেরও বিঘ্ন ঘটে। এখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ জাতিবাচকও নয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতির বাক্যশেষে 'অথ ব্রাহ্মণঃ' (অনন্তর ব্রাহ্মণ) এইরূপ শব্দ পাণ্ডিত্য বাল্য ও মৌন এই তিন শব্দের দ্বারা সূচীত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন সাধনত্রয়সম্পন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারীকে অভিপ্রায় করেই বলা হয়েছে।

বিবৃতি

'বিদিত্বা' পদের 'ক্ত্বা' প্রত্যয় প্রয়োগবশতঃ 'জেনে' এরূপ অর্থে পূর্বকালের কিছু ঘটনার নির্দেশ করে

এবং ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয়—যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন (ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ)। উপনিষদে কথিত ব্রাহ্মণ শব্দ ক্ষুদ্র জাতিগত অর্থেও প্রয়োগ হয়নি। মহাভারতেও ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছে ঃ

"নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারস্তুতিম্।
অক্ষীণং ক্ষীণকর্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

—যিনি বাসনাশূন্য, ক্রিয়ারহিত, নমস্কার ও স্তুতি-রহিত, যাঁর কর্মক্ষয় হয়েছে কিন্তু নিজে অক্ষয়, তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলে। (১২'২৬৯।৩৪)

তাছাড়া উক্ত শ্রুতিবাক্যটি যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে, তা এই শ্রুতি-বাক্যের শেষাংশের পাণ্ডিত্য, বাল্য, মৌন—এই তিনটি শব্দের অর্থ থেকেই জানা যায়। বাক্যটির শেষাংশ হলো ঃ "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ।" পাণ্ডিত্য অর্থ আত্মবিজ্ঞান, বাল্য অর্থ আত্মবিজ্ঞানজনিত বল। মৌন অর্থ 'আমি আত্মা পর-ব্রহ্ম, আত্মা থেকে ভিন্ন কিছুই নেই'—এরূপ বিচার। উক্ত বাক্যটির সম্পূর্ণ অর্থ হলো ঃ ব্রাহ্মণ নিঃশেষে আত্মবিদ্যা লাভ করে আত্মবিদ্যারূপ বল অবলম্বনে অবস্থান করতে ইচ্ছা করবেন। নিঃশেষে আত্মবিদ্যা লাভ করে অতঃপর মননশীল হবেন। শেষে মৌন ও অমৌনকে (আত্মজ্ঞানের ও অনাত্মপ্রত্যয় দূরীকরণের ফলকে) নিঃশেষে জেনে ব্রাহ্মণ হবেন।

সুতরাং এরূপ ব্রাহ্মণ বিবিদিষা সন্ন্যাসীর পর্যায়ে পড়ে না, বিদ্বৎ সন্ন্যাসের পর্যায়েই পড়ে। সেজন্য এই বাক্যটি বিবিদিষা সন্ন্যাসের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত—এরূপ শংকা অমূলক।

অতঃপর এ ব্যাখ্যার বিপক্ষে শংকা উত্থাপিত হয়েছে—

ননু তত্র বিবিদিষাসন্ন্যাসোপেতঃ পাণ্ডিত্যাদৌ প্রবর্তমানোঽপি ব্রাহ্মণশব্দেন পরামৃষ্টঃ। "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিতি" চেৎ।

অন্বয়

ননু (আচ্ছা, প্রশ্নে), তত্র (এস্থলে), বিবিদিষাসন্ন্যাসোপেতঃ (বিবিদিষা সন্ন্যাসযুক্ত), পাণ্ডিত্যাদৌ (পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌন), প্রবর্তমানঃ অপি (প্রবৃত্ত ব্যক্তিই), ব্রাহ্মণশব্দেন (ব্রাহ্মণশব্দ-দ্বারা), পরামৃষ্টঃ (সূচিত হয়)। তস্মাৎ (সেইহেতু), ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ), পাণ্ডিত্যং (পাণ্ডিত্য) নির্বিদ্য (অভ্যাসপূর্বক), বাল্যেন (বাল্যের সহিত) তিষ্ঠাসেৎ (অবস্থান করবেন), ইতি চেৎ (এরূপ যদি বলা হয়)।

বঙ্গানুবাদ

(শংকা)—আচ্ছা, এস্থলে পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনে অর্থাৎ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ সাধনে প্রবৃত্ত বিবিদিষা সন্ন্যাসযুক্ত ব্যক্তিই 'ব্রাহ্মণ' শব্দ দ্বারা সূচিত হয়েছে এবং "সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য অর্থাৎ শ্রবণরূপ সাধন অভ্যাসপূর্বক বাল্যের সঙ্গে অর্থাৎ অনাত্মদৃষ্টি দূরীকরণে সামর্থ্যরূপ জ্ঞানযুক্ত হয়ে অবস্থান করবেন" যদি এরূপ বলা হয় ?

[এই শংকা নিরসনকল্পে সিদ্ধান্তী বলছেন ঃ]

মৈবম্। ভাবিনীং বৃত্তিমাশ্রিত্য তত্র ব্রাহ্মণশব্দস্য প্রযুক্তত্বাৎ। অন্যথা কথমথ ব্রাহ্মণ ইতি সাধনানুষ্ঠা-নোত্তরকালবাচিনমর্থশব্দং প্রযুঞ্জীত।

অন্বয়

এবম্ (এরূপ), মা (না)। তত্র (সেখানে), ভাবিনীং বৃত্তিম্ (ভবিষ্যৎ বৃত্তিকে), আশ্রিত্য (গ্রহণ করে), ব্রাহ্মণশব্দস্য (ব্রাহ্মণ শব্দের), প্রযুক্ত-ত্বাৎ (প্রয়োগহেতু)। অন্যথা (নতুবা), অথ ব্রাহ্মণঃ (অনন্তর ব্রাহ্মণ), ইতি (এরূপ), সাধনা-নুষ্ঠান-উত্তরকালবাচিনম্ (সাধনানুষ্ঠানোত্তরকাল-বাচী) অথ শব্দম্ (অথ শব্দ), কথম্ (কেন), প্রযুঞ্জীত (প্রযুক্ত হবে)।

বঙ্গানুবাদ

(সমাধান) না, এরূপ নয়। কারণ, সেখানে ভবিষ্যতে ব্রহ্মবিদ্ হবেন এরূপ ভবিষ্যদ্বৃত্তিকে গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। নতুবা 'অনন্তর ব্রাহ্মণ' এরূপ সাধনানুষ্ঠানোত্তরকালবাচী 'অথ' শব্দ কেন প্রযুক্ত হবে ? [ক্রমশঃ]

বিবেকানন্দ ও বেদান্ত : শিকাগো ভাষণের প্রেক্ষাপটে

নীরদবরণ চক্রবর্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

২০ সেপ্টেম্বর দশম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী বললেন : "ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো, তাহাকে অপমান করা।"[১৮] স্বামীজীর বেদান্ত ধর্ম ও দর্শনে এটি একটি বিশিষ্ট বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" ত্যাগিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীতে বিবেকানন্দ অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। দেহ যদি না থাকে বা দেহ যদি রুগ্ন হয় তবে আধ্যাত্মিক সাধনা সম্ভব নয়। দেহের জন্যই খাদ্য দরকার। আবার খাদ্যের জন্য অর্থ দরকার। স্বামীজী স্পষ্টই বলেছেন, দরিদ্র দেশবাসীর জন্য আমেরিকানদের কাছে তিনি সাহায্যলাভের আশায় গিয়েছিলেন। একসময় ভারতবর্ষে অন্নাভাব ছিল না। তখন ভারত নিশ্চিন্ত মনে আধ্যাত্মিক সাধনা করে শাশ্বত সত্য আবিষ্কার করেছে। সেই সাধনা অব্যাহত রাখতে গেলে ভারতীয়দের অন্নাভাব দূর হওয়া দরকার। ভারতে যদি অধ্যাত্ম-সাধনা অব্যাহত থাকে তবে বিশ্বের কল্যাণ হবে, কারণ, বিশ্ববাসী ভারতের কাছ থেকে পরাবিদ্যা লাভ করে শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ পাবে। এই ছিল স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি।

উপনিষদ্ বা বেদান্ত প্রথমতঃ অন্নকেই ব্রহ্ম বলেছেন[১৯] ("অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ") ; "অবশ্য সর্বশেষে বলা হয়েছে, আনন্দই ব্রহ্ম[২০] ("আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ")। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বেদান্তের সঙ্গে অন্নের কোন বিরোধ নেই।

শিকাগো বক্তৃতায় ষোড়শ দিবসের অধিবেশনে 'বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ' আলোচনা-কালে স্বামীজী বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত করেছেন। স্বামীজী মনে করতেন, উপনিষদের জ্ঞানের দিককে গুরুত্ব দিয়েছেন শঙ্কর আর বুদ্ধদেব গুরুত্ব দিয়েছেন তার নৈতিকতায়।[২১] উপনিষদ্ বা বেদান্তের তাত্ত্বিক আলোচনায় শঙ্করাচার্যের যে ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রকাশিত তার তুলনা নেই। আবার বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গে উপনিষদের যে নৈতিকতা প্রকট তাও তুলনাহীন। অবশ্য বুদ্ধদেবের করুণাঘন হৃদয়, মানুষের জন্য ক্রন্দন, পশু-পাখির জন্য মমতা—তারও তুলনা বিরল। স্বামীজী তাঁর ষোড়শ দিবসের শিকাগো ভাষণের উপসংহারে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন : "অতএব, আমরা ব্রাহ্মণের [শঙ্করাচার্যের] অপূর্ব ধী-শক্তির সহিত লোক-গুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান আত্মা এবং অসাধারণ লোককল্যাণশক্তি যুক্ত করিয়া দিই।"[২২]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে, যদিও অদ্বৈত বেদান্তী শঙ্করাচার্যকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলা হয় তথাপি তিনি কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে (২।২) বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত খণ্ডিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের বেদান্ত অনেক উদার—তা বুদ্ধ-মত পরিহার করে না। শঙ্করাচার্যের মতে বেদ সকলের পাঠ্য নয়। বিবেকানন্দ জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্যই বেদ-বেদান্তের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এতদিন যে-বেদান্ত সন্ন্যাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা জনসমাজে, খেতে খামারে, কলকারখানায়—জীবনের সবক্ষেত্রে প্রচারের প্রয়াস পেয়েছিলেন বিবেকানন্দ। বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্যকার অনেক উপনিষদ্-বাক্যের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলে তিনি সরাসরি অভিযোগ করেছেন।

১৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১৩৬৯ সং, পৃঃ ২১

১৯ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।২

২০ ঐ, ৩।৬

২১ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১৩৬৯ সং, পৃঃ ১০৩

২২ ঐ, ১ম খণ্ড, ১৩৬৯ সং, পৃঃ ৩২

তাঁর মতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি ও উপদেশের আলোতে বেদান্ত বুঝতে হবে।[২৩]

আমরা এই পর্যন্ত শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর বক্তৃতায় যে-বেদান্তমত প্রকাশিত হয়েছে তা-ই মুখ্যতঃ আলোচনা করেছি। তাঁর অন্যান্য বক্তৃতায় ও আলোচনায় বেদান্তের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, তাঁর বেদান্ত ভাবনার মূলসূত্র তিনি শিকাগোয় প্রদত্ত 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ভাষণেই দিয়েছেন।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মার্চ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ফিলজফিক্যাল সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন: "আজকাল যাহাকে সাধারণভাবে 'বেদান্তদর্শন' বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে ভারতের বর্তমান বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির সবই তার অন্তর্গত। সেজন্য নানাভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং আমার মনে হয়, ক্রমোন্নতির ধারায় অগ্রসর হইয়া দ্বৈতবাদে সেগুলির আরম্ভ এবং অদ্বৈতবাদে পরিসমাপ্তি হইয়াছে।"[২৪] স্বামীজীর বেদান্ত-ভাবনার এটি একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর চিন্তার এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান। আমরা ইতঃপূর্বে বলে এসেছি যে, স্বামীজী তাঁর 'হিন্দুধর্ম' নামক শিকাগো ভাষণে বলেছেন, হিন্দুর সকল উপাসনাই বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত—বেদান্তের এক-একটি স্তর এবং অদ্বৈতবাদ হলো সর্বোচ্চ স্তর।[২৫] স্বামীজীর ভাষায়—"প্রত্যেকটি সাধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা"[২৬] এবং অদ্বৈতবাদ সেই সাধনার সর্বোচ্চ স্তর যার পর আর ধর্মবিজ্ঞান অগ্রসর হতে পারে না।[২৭]

স্বামীজীর এই কথায় দুটি মূল্যবান লক্ষণীয় বিষয় পাওয়া গেল। প্রথমতঃ ভারতের বর্তমান বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তি বেদান্তদর্শন।[২৮] দ্বিতীয়তঃ বেদান্ত দ্বৈতবাদ দিয়ে শুরু, অদ্বৈতবাদে শেষ। এই যাত্রায় 'ক্রমোন্নতি' আছে। এই দুটি বিষয়ের একটিও অন্য সব বেদান্তীরা স্বীকার করবেন না। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যদের বাদ দিলেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসম্প্রদায় বেদান্তভিত্তিক, একথাও অনেকেই স্বীকার করেন না। কারণ, বৌদ্ধ ও জৈন নাস্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং বেদান্ত আস্তিক দর্শন। 'হিন্দুধর্ম' ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, বুদ্ধদেব বেদের কর্মকাণ্ড-বিরোধী হলেও জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্-বিরোধী নন। সুতরাং বৌদ্ধধর্মকে বেদান্ত-ভিত্তিক বলতে আপত্তি কি? তিনি আরও বললেন,

২৩ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৩৬৯ সং, পৃঃ ১৬১-১৬২; ২৪৭ ২৪ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪১

২৫ দ্রঃ উদ্বোধন, ৯৪তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ (আষাঢ় ১৩৯৯) সংখ্যা, পৃঃ ৩০০

২৬ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১৩৬৯ সং, পৃঃ ২৫ ২৭ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২২

২৮ স্বামীজী স্পষ্টই বলেছেন: "বেদান্ত এক বিশাল পারাবার বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত-মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী—একজন পৌত্তলিক বা এমনকি একজন নাস্তিকের সহিতও সহাবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাহাই নয়, বেদান্ত-মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, পার্শী সব এক—সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান।" (বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১৩৬৯ সং, পৃঃ ৩১৮)

পরবর্তী কালে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে পৃথিবীতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমত কেমন করে বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত মতের অঙ্গীভূত হয় তা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে জরথুস্টীয় ধর্ম, ইহুদীধর্ম, খ্রীস্টধর্ম এবং অন্যান্য যেসমস্ত ধর্ম ব্যক্তি-ঈশ্বরের আরাধনায় বিশ্বাসী তারা দ্বৈতবেদান্তের অন্তর্গত। যেসমস্ত ধর্মমত ঈশ্বরকে সর্বগত (immanent) আবার সর্বাতীত (transcendent) বলে তারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অঙ্গীভূত। তারা বলে: "ঈশ্বর আমাদের মধ্যে এবং বহির্জগতে আছেন, তিনি আত্মার আত্মা, 'আমরা সবাই এক বিরাট অংশীর অংশরূপ।'" বেদান্তের অদ্বৈতবাদ সর্বশ্রেষ্ঠ। অদ্বৈত ধর্ম মানব ও বাহ্যজগতের আত্যন্তিক অভিন্নতায় বিশ্বাসী। এই ধর্ম বিশ্বের আধ্যাত্মিক ঐক্যের কথা বলে। বিজ্ঞান, দর্শন এবং অধিবিদ্যার গভীরতম সমস্যাবলী এই ধর্মই ব্যাখ্যা করতে পারে। কেন যে 'আমি এবং আমার পিতা এক ও অভিন্ন' তা একমাত্র এই ধর্মমতেই ব্যাখ্যা করা যায়। (দ্রঃ স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ১ম সং, ১৩৯৪, পৃঃ ২০৪)

বৌদ্ধ ও জৈনরা মানুষের ভিতর দেবত্ব বিকাশের দিকেই সকল শক্তি নিয়োগ করেছেন।[২৯] মানুষের ভিতর দেবত্ব প্রচ্ছন্ন, এটা বেদান্ত মত। 'তত্ত্বমসি' একটি উপনিষদ্‌বাক্য। শঙ্করাচার্য এই বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন, 'তৎ' (তিনি বা ব্রহ্ম) এবং 'ত্বম্' (জীব) স্বরূপতঃ বা চৈতন্যের দিক থেকে অভিন্ন। রামানুজের মতে এই বাক্যের অর্থ—'ত্বম্' (জীব) 'তৎ'-এর (ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের) অংশ।[৩০] বিবেকানন্দ বললেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ব্রহ্ম বা দেবত্ব প্রচ্ছন্ন। এই হলো ঐ উপনিষদ্‌বাক্যের অর্থ। বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "যত্র জীব তত্র শিব।"

দ্বৈতবাদ দিয়ে বেদান্তের শুরু এবং অদ্বৈতবাদে শেষ—একথা অদ্বৈতবাদী অংশতঃ মানলেও দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী একেবারেই মানবেন না। দ্বৈতবাদীরা বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত কোন মতেরই প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। বিশিষ্টাদ্বৈত দ্বৈতবাদী মত মানেন না। শঙ্কর এই তিন মতের ক্রমোন্নতি স্বীকার করেও অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতের সত্যতাকে অস্বীকার করেন। বিবেকানন্দ এই ক্ষেত্রে অনেক উদার বেদান্তী। তিনি বললেন, অদ্বৈত সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মিথ্যা নয়। আমরা যখন ছবি তুলে তুলে সূর্যের দিকে অগ্রসর হই তখন সূর্যের নানা ছবি পাই, সব ছবিই সূর্যের সত্য ছবি, কোনটাই মিথ্যা নয়। তেমনি রুচি ও প্রবণতার ভিন্নতার জন্য দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী সত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করে, কিন্তু সব প্রকাশই সত্যেরই প্রকাশ, কোনটাই মিথ্যা নয়।[৩১]

বেদান্তদর্শনে 'মায়া' কথাটি খুবই বিখ্যাত। এই বিষয়ে নানা আলোচনা বেদান্ত-সাহিত্যে পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদীরা সাধারণতঃ মায়া ও অবিদ্যা প্রায় সমার্থক বলে মনে করেন। বিক্ষেপ যেখানে প্রধান সেখানে মায়া, আবরণ যেখানে প্রধান সেখানে অবিদ্যা—এমন কথা বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। মায়ার জন্য সৃষ্টি, আবরণের জন্য বা অবিদ্যার জন্য একমাত্র সত্য ব্রহ্ম আবৃত হয়। অদ্বৈতবাদী সদানন্দ 'বেদান্তসার' গ্রন্থে অবিদ্যার লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ "সদসদভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান বিরোধী ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি।" অবিদ্যা সৎ নয়, অসৎ নয়—অনির্বচনীয় ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণাত্মক ; ভাবরূপ, কারণ তা জগতের উপাদান কারণ, অভাব কারও কারণ হতে পারে না ; জ্ঞান-বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞান হলে আর অবিদ্যা বা অজ্ঞান থাকে না। অদ্বৈতমতে যা কোন কালে বাধিত হয় না, অর্থাৎ নেই এমন হয় না, তা-ই সৎ। এই অর্থে একমাত্র ব্রহ্মই সৎ। অজ্ঞান বা অবিদ্যা যেহেতু জ্ঞানের দ্বারা নাশ হয়, সুতরাং তা সৎ নয়। আবার অবিদ্যা অসৎ নয়, কারণ অসৎ (বন্ধ্যাপুত্র) কখনো প্রতিভাত হয় না, অবিদ্যার কার্য জগৎ প্রতিভাত হয়। সৎ বা অসৎ কোন কথা দিয়েই নির্বচন করা যায় না বলে অবিদ্যা অনির্বচনীয়। যা এমন অনির্বচনীয়, অদ্বৈতমতে তা মিথ্যা। সুতরাং এই মতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বা মায়া মিথ্যা।

রামানুজের মতো ভক্তিবাদী বেদান্তীরা মায়াকে মিথ্যা বলেন না। তাঁদের মতে মায়া ব্রহ্মের শক্তি। রামানুজ বিচিত্রার্থসর্গকারী শক্তিকে মায়া বলেছেন। এঁদের মতে সৃষ্টি-শক্তি মায়া এবং সৃষ্ট জগৎ উভয়ই সত্য।

এবার দেখা যাক, বিবেকানন্দ কি বলেন। তিনি প্রথমতঃ 'মায়া' শব্দটি কি কি ভিন্ন অর্থে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে, তা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ "বৈদিক সাহিত্যে 'কুহক' অর্থেই মায়া-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাই মায়া-শব্দের প্রাচীনতম অর্থ। কিন্তু, তখন প্রকৃত মায়াবাদের অভ্যুদয় হয় নাই। বেদে আমরা এইরূপ বাক্য দেখিতে পাই, 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'—ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানা রূপ ধারণ

২৯ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১৩৬৯ সং, পৃঃ ২৭

৩০ রামানুজ-মতে 'তৎ' বলতে বোঝায় সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান বিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্ম ; 'ত্বম্' বলতে বোঝায় অচিৎবিশিষ্ট জীব বা শারীরিক ব্রহ্ম এবং তৎ ও ত্বমের অভেদ বলতে বোঝায় কতগুলি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের সঙ্গে অন্য কতগুলি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ।

৩১ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২১

করিয়াছিলেন।"[৩২] তিনি আরও বললেন: "অনেক পরবর্তী কালে অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে মায়া-শব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়।...আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাঠ করি, 'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্'—মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। মহাত্মা শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ এই 'মায়া'-শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয় মায়া-শব্দ বা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের হস্তে ইহা অনেকটা বিজ্ঞানবাদে [বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, এই মত] পরিণত হইয়াছিল এবং 'মায়া' কথাটি এইরূপ অর্থেই এখন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দু যখন বলেন, 'জগৎ মায়াময়', তখন সাধারণ মানবের মনে এইভাব উদিত হয় যে, জগৎ কল্পনামাত্র। বৌদ্ধ দার্শনিকদের এইরূপ ব্যাখ্যার কিছু ভিত্তি আছে, কারণ একশ্রেণীর দার্শনিক বাহ্যজগতের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বেদান্তোক্ত মায়ার শেষ পরিপূর্ণ রূপ বিজ্ঞানবাদ, বাস্তববাদ (realism) বা কোন মতবাদ নয়। আমরা কি এবং সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনামাত্র।"[৩৩]

স্বামীজীর মতে বেদান্তের সর্বশেষ অবস্থায় মায়া-শব্দ প্রকৃত ঘটনার বিবরণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত ঘটনার যথার্থ বর্ণনা কি? স্বামীজীর মতে তা এই যে, ঘটনা দেশ-কাল-নিমিত্তাধীন। অর্থাৎ, ঘটনার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই, যে-অস্তিত্ব আছে তা সাপেক্ষ। স্বামীজী স্পষ্টই বলেছেন: "'এই জগতের অস্তিত্ব নাই' একথা বলার অর্থ কি? ইহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই, ইহাই অর্থ। আমার, তোমার ও অপর সকলের মনের সম্বন্ধেই ইহার আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে।"[৩৪]

স্বামীজী বলেছেন: "মায়া সংসার-রহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত একটি সংবাদ নহে; সংসারের ঘটনা যেভাবে চলিতেছে, মায়া তাহারই বর্ণনামাত্র, অর্থাৎ ইহাই বলা যে, বিরুদ্ধভাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি; সর্বত্র এই ভয়ানক বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি। যেখানে মঙ্গল, সেখানেই অমঙ্গল। যেখানে অমঙ্গল, সেখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন, সেইখানেই ছায়ার মতো মৃত্যু তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসিতেছে, তাহাকে কাঁদিতে হইবে। যে কাঁদিতেছে, সে হাসিবে। এ অবস্থার প্রতিকারও সম্ভব নয়।"[৩৫]

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল, স্বামীজীর মতে মায়া কোন মতবাদ নয়—ঘটনার বর্ণনা ('statement of fact'), দেশ-কাল-নিমিত্তাধীনতাই মায়া, বিরুদ্ধভাবই মায়ার ভিত্তি। এই ব্যাখ্যা অদ্বৈতমতানুসারী হলেও এর অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। দেশ-কাল-নিমিত্তাধীনতা—মায়া ও অদ্বৈতের এমন বোধগম্য, সহজ অথচ নতুন ব্যাখ্যা আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

অদ্বৈতমতে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—একথা প্রতিনিয়ত বলা হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, 'জগৎ মিথ্যা'—একথার অর্থ কি? 'জগৎ মিথ্যা'—একথার অর্থ কি 'জগৎ অসৎ'? বিবেকানন্দ বললেন: 'জগৎ মিথ্যা' কথার অর্থ জগতের অস্তিত্বসাপেক্ষ; ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে জগতের অস্তিত্ব নেই। তিনি বললেন: "বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চায় না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, তেমন আর কোথাও নাই, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ 'জগতের ব্রহ্মভাব'—জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন জানি, উহা যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ কর এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখ—বস্তুতঃ উহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই কারণেই আমরা প্রাচীনতম উপনিষদে—বেদান্ত সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকে—দেখিতে পাই, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' (ঈশ উপনিষদ্)—জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।"[৩৬]

[ক্রমশঃ]

৩২ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১৩৬৯ সং, পৃঃ ৩ ৩৩ ঐ, পৃঃ ৩-৪
৩৪ ঐ, পৃঃ ৬ ৩৫ ঐ, পৃঃ ১০ ৩৬ ঐ, পৃঃ ১৬৮

নিবন্ধ

অবক্ষয়ের পথে মালদহের লোকসংস্কৃতি

রাধাগোবিন্দ ঘোষ

লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। ইদানীং লোকসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারা, গতি ও প্রকৃতি নিয়ে পণ্ডিতমহল বহুধাবিভক্ত। সহজ কথায় বলা যায়, লোকসম্বন্ধীয় সংস্কৃতিই 'লোকসংস্কৃতি'। এই লোকসংস্কৃতিতে 'লোকে'র ভূমিকাই মুখ্য।

মালদহের লোকসংস্কৃতি নিয়ে কিছু আলোচনা করার আগে বলে রাখা ভাল যে, এখানকার অধিবাসীদের প্রায় শতকরা ৮৮জনই বিভিন্ন স্থান থেকে আগত। স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে নাগর, ধানুক, চাঁই বাদে বিন্দ, কাহার, দোষাদ, মাহারা, ঘোষ, মৈথিল, রাজপুত, ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মাড়োয়ারী, খেরিয়া, জালিয়া, কৈবর্ত—এরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে। ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থানের ফলে মালদহে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই সংস্কৃতির প্রকাশ শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয়—পুজা, পার্বণ, আচার, অনুষ্ঠান, ধর্মীয় সংস্কার, বিবাহ, লোকাচার প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই অনুভূত হয়। রাজবংশী সম্প্রদায় যেসব আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলে তা তাদের একান্তই নিজস্ব। সেই অনুষ্ঠান কিছুটা রূপান্তরিত অবস্থায় পুণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও পালিত হতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দাল্লা, বুলবুলচণ্ডী, খোঁচাকান্দর প্রভৃতি এলাকায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের যেমন বসতি আছে, পুণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়েরও সেরকম বসতি আছে। সুদীর্ঘকাল ধরে উভয় সংস্কৃতির পাশাপাশি অবস্থানের ফলে এক বর্ণের সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য বর্ণের সংস্কৃতির এক অদ্ভুত সমন্বয় হয়েছে। জোর করে কোন বর্ণই সেই সংস্কৃতিকে তাদের একান্ত নিজস্ব বলে দাবি করতে পারবে না।

মালদহ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকে ঘিরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারকমের অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়। অমৃতি, দারশাল্লা, মোহনপুর প্রভৃতি এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে ভাজৈ উৎসব পালনের যেমন রেওয়াজ আছে, তেমনি হবিবপুর, বামনগোলা, সিংহাবাদ, বেগুনবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে কৃষিকে ঘিরে নানা রকমের ধর্মীয় সংস্কার, পুজো-পার্বণ পালন করার রীতি প্রচলিত। ইঁদপুজো, ডালপুজো, করমা ধরমা সবই সেগুলির দৃষ্টান্ত।

আবহমানকাল ধরে চলে-আসা এই সংস্কৃতি আজ দ্রুত অবলুপ্তির পথে। আবার কিছু কিছু লোক-ঐতিহ্য ক্রমে এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। মালদহের প্রাণের সম্পদ গম্ভীরা কি তার স্বকীয় স্বরূপ নিয়ে চলতে পারছে? গম্ভীরা উৎসব পালনের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, বিধি আছে, আছে নানা প্রকার পালনীয় কর্তব্য। কিন্তু বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের গম্ভীরা উৎসব, এমনকি শহরের গম্ভীরা উৎসব পালনের ধরনধারণ দেখে ব্যথিত হতে হয়। গম্ভীরা উৎসবের সেই নিয়মবিধি, সেই সংযম, সেই শ্রদ্ধা, সেই ভক্তি কোথায় গেল? গম্ভীরা কি এতই সহজ-পালনীয় উৎসব? গম্ভীরার সুর নিয়ে অনাবশ্যক বাহাদুরি বন্ধ হবে কবে? গম্ভীরা সুরকারদের একটি বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার যে, গম্ভীরা আলকাপ পঞ্চরস নয়। চটকী হিন্দী গানের অন্তর্ভুক্তিতে পঞ্চরসের আসরে লোককে আকৃষ্ট করা যাবে সত্য, কিন্তু গম্ভীরার মধ্যে পঞ্চরসের সুরের অনুপ্রবেশে গম্ভীরার বেগবতী প্রাণধারাকে ভিন্ন খাতে বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুধু নিন্দনীয় নয়, মালদহের এই সর্বজনচিত্তহরা প্রাচীন সংস্কৃতির মূলে তা হবে কুঠারাঘাতেরই সামিল। এই নিন্দনীয় প্রচেষ্টার অনাবশ্যক অনুধাবন যত কম হয়, ততই মঙ্গল। পুরুলিয়ার ছো নৃত্য অবলুপ্তির পথে চলে যায়নি অথচ মালদহের গম্ভীরা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে। দেশের লোকসংস্কৃতির পক্ষে এ এক চরম উদ্বেগের কারণ।

মালদহ-সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার ভাষা-বৈচিত্র্য। একক একটি জেলায় এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষাবৈশিষ্ট্য পশ্চিমবঙ্গের আর অন্য কোন জেলায় আছে কিনা সন্দেহ। এর মূল কারণ, আগেই বলেছি, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সুদীর্ঘ দিন ধরে একত্র সহাবস্থান। কিন্তু মালদহ তার অননুকরণীয় এই ভাষার বৈচিত্র্য ক্রমশঃ হারাতে বসেছে। ভাষা প্রবহমানা নদীর স্রোতের মতো স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্না। ফলে তারও পরিবর্তন হয়, রূপান্তর ঘটে। গ্রহণ এবং বর্জন ভাষার ধর্ম। বহু নতুনকে সে গ্রহণ করে আবার অনেক পুরনোকে সে বাদ দেয়। বস্তুতঃ, ভাষা চিরদিন একই রূপে নির্দিষ্ট ধাঁচে বয়ে চলে না। নদী যেমন একূল ভেঙে ওকূল গড়ে, ভাষাও তেমনি রূপান্তরের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু একটি গতি-সম্পন্ন ভাষা যখন তার স্বকীয় রূপটিকে হারাতে বসে তখনই শংকা জাগে। মালদহ জেলার আনাচে কানাচে মোট তেত্রিশ রকমের ভাষা আছে। ভালুকার গণেশ সম্প্রদায়ের মানুষ যে-ভাষায় কথা বলে, কুম্ভীরার শেখ সম্প্রদায়ের মানুষ সে-ভাষায় কথা বলে না। শোভানগরের মৈথিল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ যে-ভাষায় কথা বলে, আইহোর পুণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষ সে-ভাষায় কথা বলে না। ভূতনী দিয়ারার চাঁইমণ্ডল সম্প্রদায়ের একটি শিশু যে-ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে, কালাইবাড়ির ঘোষ সম্প্রদায়ের একটি শিশু সে-ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করে না। বস্তুতঃ, এই ভাষাগত বৈচিত্র্যই মালদহ জেলাকে অন্য জেলা থেকে বিশেষ একটি স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করে রেখেছে। ভাষার এই গৌরব আছে বলেই ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে মালদহ একটি পরম কৌতূহলের জেলা বলে পরিগণিত।

কিন্তু মালদহ জেলার এই বৈশিষ্ট্য আর কতদিন বজায় থাকবে তা বলা মুস্কিল। শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে। শিক্ষা মানুষের মনে আনে বিপ্লব। আর সচেতনতা যত বাড়ে ততই পরিবর্তন লক্ষিত হয় দিকে দিকে। শিক্ষাগত দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মালদহ আজও সবচেয়ে অনগ্রসর। কিন্তু তাই বলে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের প্রবণতা যে আসেনি—একথা বলা যাবে না। এই প্রবণতা যত বাড়বে সমাজদেহ তত পুষ্ট হবে। সামাজিক কুসংস্কার দূর হবে, মানুষের মনের সংকীর্ণতা কাটবে। অজ্ঞতা, অনাচার বিদায় নেবে। সমাজ গড়ে উঠবে সুষ্ঠুভাবে। এই সৌন্দর্য সকলেরই কাম্য। কিন্তু একজন ভাষাবিদের কাছে সমাজদেহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাদেহের আমূল পরিবর্তন শংকার ভাব জাগায়। এর কারণ, মানুষের মধ্যে শিক্ষার হার যত বাড়বে মানুষ তত তার প্রাচীন ভাষা পরিত্যাগ করবে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুপরিস্ফুট হবে।

শোভানগর, আড়াইডাঙ্গা, বাঙ্গীটোলা, ধরমপুর, খানপুর, একবর্ণা প্রভৃতি অঞ্চলের মৈথিল সম্প্রদায়ের লোক আরশুলাকে বলে 'ওসরাস' ফড়িংকে বলে 'টুকনি', কাঁথাকে বলে 'গেদলা', মাটির তৈরি কলসীকে বলে 'খাইলা'।

মানিকচক থানার সৈদপুর, কাঁকরীবান্ধা কিংবা ইংরেজবাজার থানার মাদিয়া, ফুলবারিয়া, ভবানী-পুর প্রভৃতি এলাকার রাজপুত-ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় ধবধবে সাদা অর্থে 'উজরা', দুর্বল অর্থে 'লেল-পেনুয়া', হলুদ শাড়ি অর্থে 'হলদিয়া ভুন্নি', পাতলা মানুষ অর্থে 'পেনাহি আদমী' শব্দ ব্যবহার করে। কুশিদা এলাকার গণেশ সম্প্রদায়ের লোক নিচু জমি অর্থে 'নীচা খোটুয়া', দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মানুষ অর্থে 'শিকচাকাঠি' কিংবা প্রচণ্ড শীত অর্থে 'ব্যাজায় ঠক্কুর' শব্দ ব্যবহার করে।

শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত আটপৌরে শব্দগুলি ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসছে। একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায় যে, তারা নিজেদের মধ্যে বংশানুক্রমে ব্যবহৃত ঐ শব্দগুলি সযত্নে পরিহার করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত মার্জিত এবং শিষ্টগুণসমন্বিত শব্দ-গুলি ব্যবহার করতে প্রয়াস পাচ্ছে। ভাষা-বিজ্ঞানীদের কাছে এ এক পরম বেদনার বিষয়।

আজ থেকে ৫০ বছর আগে যে-শব্দগুলির সহজ প্রচলন লক্ষ্য করা যেত, ৫০ বছর পর সেই শব্দগুলি অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হবে—এমন কথা জোরগলায় বলতে কেউ অগ্রসর হবে না। মালদহের ভাষা ক্রমেই অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

এবার আসি মালদহের 'গীত'-এর কথায়।

বিবাহ মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিবাহে মানুষ পরম আনন্দে মেতে ওঠে। বিবাহে আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধের যেন অন্ত নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অজস্র নিয়ম। কিন্তু বিবাহে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান পালনেও বোধহয় ভাটা পড়েছে। দিন যত যাচ্ছে, সমাজজীবন যত জটিল হচ্ছে বিধি-নিষেধের বেড়াও তত শিথিল হচ্ছে। মালদহে বিবাহকে কেন্দ্র করে অপূর্ব সুরে 'গীত' গাইবার রীতি আছে। বরপক্ষ আসার সঙ্গে সঙ্গে বরপক্ষকে কেন্দ্র করে নানা সুরে, নানা ছন্দে 'গীত' গাওয়া শুরু হয়। সাতপাকে ঘোরার সময়, কন্যার মাথায় সিঁদুরদানকালে, কন্যা-বিদায়ের সময় গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঘটা করে 'বিয়ের গীত' গাইবার রীতি প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ, বিবাহকে কেন্দ্র করে এই গীত বিবাহের অন্যতম আকর্ষণীয় অঙ্গ বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু দিনে দিনে বিবাহকে কেন্দ্র করে গীত গাইবার এই রেওয়াজ ক্রমশই আজ অবলুপ্তির পথে। এককালে যা ছিল অত্যন্ত প্রশংসিত, এখন তা হচ্ছে উপেক্ষিত, ক্ষেত্রবিশেষে নিন্দিত। 'সেকেলে রীতি' বলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই সুন্দর সংস্কৃতিকে আজ ভুলতে বসেছে। মালদহের লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে একে এক চরম অবক্ষয়ই বলব। শিক্ষার প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করে আবহমান কাল ধরে বয়ে যাওয়া সনাতন রীতিনীতিকে বিসর্জন দিতে শিখেছি। এর চেয়ে চরম দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে?

মালদহের শোভানগর অঞ্চল থেকে বহু কষ্টে সংগৃহীত একটি বিবাহ বিষয়ক গীতের পরিচয় দিয়ে প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি টানব। গীতটি বিচ্ছেদকাতরা কন্যাকে বিদায় দেবার সময় গাওয়া হয়ে থাকে।

মায়ের উক্তি : খায়ে লেগে বেটী গে
ইহোরে দহি রে ভাত
তোরে লাউটায়ে দেবো
সাত নদী পার।

মেয়ের উক্তি : ক্যাইসে লোটায়েবে গে হাম
সাত নদী পার
আচারহি নহি গোঠিয়া
হাতে হি নহি লাঠিয়া
সঙ্গে হি নহি সহোদর ভাইযা।

মায়ের উক্তি : হাতে হি দেবো লাঠিয়া
আচারহি দেবো গোঠিয়া
সঙ্গে হি লাগায়ে দেবো
সহোদর ভাই।
মঙ্গল হি গে বেটী
হোইয়ে সাত নদী পার
শাসু বচন গে বেটী
ন কর উত্তর
হোয়ে ত মায়ে বাপক বড়াই।

বিয়ে শেষ হয়ে গেছে। এবার কন্যার বিদায় নেবার পালা। আজন্ম পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্য কন্যা চলে যাবে শ্বশুরালয়ে। স্বভাবতই শেষ মুহূর্তে মা মেয়েকে আদর করে একটু দৈ-ভাত খেয়ে যেতে বলছে। মেয়ে বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হয়ে বলছে, কেমন করে সে দূর দূরান্তরের পথ অতিক্রম করে যাবে? তার কাছে পয়সা নেই, হাতে লাঠি নেই, নেই পরম আদরের সহোদর ভাই। মা সান্তনা দিয়ে বলছে, হাতে লাঠি, সঙ্গে পয়সা, সহোদর ভাই সবই দেব। তুমি মঙ্গলমত থেকো। শাশুড়ীর কথা অমান্য করবে না। আপন ব্যবহারে তুমি বাবা-মার গর্বের কারণ হবে। মায়ের এবং মেয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে অপরিচিত পরিবেশ ও পরিজনদের মধ্যে বিদায় গমনোদ্যতা কন্যা এবং কন্যাবিরহে কাতর মাতৃ-হৃদয়ের রসসিক্ত করুণ রূপটি বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই গীতটিতে।

ব্যথা, বেদনা, বিরহ, দুঃখ মানুষের স্বভাবজাত আন্তরধর্ম। সীমাবদ্ধ গণ্ডির মাঝে থাকলেও হৃদয়সঞ্জাত দুঃখ বুকের পাঁজর ভেদ করে বাইরে আসতে চায় সব মানুষেরই। শোক-তাপে দগ্ধ গ্রামাঞ্চলের মানুষের মাঝেও এই বেদনা আছে, আছে দুঃখ-দহনের জ্বালা। শত দারিদ্র্যের মাঝেও বিরহ-সঙ্গীতের সেই অনুরণন হৃদয়-সঙ্গীতের রূপ নিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতোই অনুরণিত হতে থাকে।

দুঃখ হয় মালদহের এই সমস্ত স্নিগ্ধ-মধুর স্বকীয় ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি আজ উপেক্ষা ও অনাদরে বিস্মৃতি এবং অবলুপ্তির পথে। □

স্মৃতিকথা

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পুণ্যদর্শন

গোষ্ঠবিহারী সাহা

[পূর্বানুবৃত্তি]

বেশ কিছুদিন চলে গেল। মহারাজ কখনো কলকাতায় কখনো বা দার্জিলিঙে থাকেন। ইতিমধ্যে বেদান্ত মঠে তাঁর ঘরটি তৈরি হয়েছে। একটি সাময়িক মন্দিরও তৈরি হয়েছে টিন কাঠ ইত্যাদি দিয়ে। এই সময় আমাদেরই অতি পরিচিত পূর্ব-বঙ্গের ১৪/১৫ বছরের একটি ছেলে আমাদেরই এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ কলকাতায় এল। তার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা, মহারাজের কাছে সে দীক্ষা নেবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি ও আমার বন্ধু মহারাজের পদপ্রান্তে উপস্থিত হলাম। এত অল্প বয়সের ছেলে হলেও মহারাজ তাকে দেখে দীক্ষা দিতে রাজি হলেন। ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে দীক্ষার দিন আমরা বেদান্ত মঠে উপস্থিত হলাম। মঠের মন্দিরে দীক্ষা হলো। আমি ও আমার বন্ধু মন্দিরের উত্তর পাশে একটা অস্থায়ী টিনের চালাঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দীক্ষার সময় মহারাজের গুরু-গম্ভীর শ্লোক ও মন্ত্র উচ্চারণের অস্পষ্ট ধ্বনি আমাদের কানে আসছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর আমাদের হৃদয়-মনকে অভিভূত করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে তিনি মন্দির থেকে বাইরে এলেন; পরনে গেরুয়া রঙের বহির্বাস, একটা গেঞ্জি ও গেরুয়া রঙের চাদর। তাঁকে দেখা মাত্রই আমরা উভয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম। আমাদের দেখাদেখি আরও অনেকে, যাঁরা আশেপাশে ছিলেন, এসে মহারাজকে প্রণাম করতে লাগলেন। তখন বেলা ১১/১২টা হবে; বেশ প্রখর রৌদ্র। স্বামীজী মহারাজের মুখমণ্ডল রৌদ্রের তাপে রক্তিম হয়ে উঠেছে, শরীরও ঘর্মাক্ত হয়েছে। অতি স্নেহ ও কোমল স্বরে তিনি বললেন: "এ রোদ্দুরের মধ্যে আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে, 'এখন ঘরে যাই, কি বল?" একথা বলে তিনি ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

তাঁর নবনির্মিত ঘরে তিনি যখন বাস করতে লাগলেন, তখন আমরা মাঝে মাঝেই তাঁকে দর্শন করতে, হয় সকালে নয় সন্ধ্যায় যেতে লাগলাম। কখনো কখনো একাকীও যেতাম। বহু ভক্ত আসতেন, নানা বিষয়ের আলোচনা হতো, অনেকে নানা প্রশ্নও করতেন। মহারাজের গম্ভীর ভাব দেখে আমরা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বা কোন কথাবার্তা বলতে সাহস পেতাম না, তবে একেবারেই কোন কথা যে বলিনি তাও নয়।

মহারাজ তাঁর বসবার ঘরে টেবিলের উত্তর পাশে দক্ষিণমুখী হয়ে বসতেন। সর্বদা মেরুদণ্ড সোজা করে চেয়ারে বসতেন, হেলান দিয়ে বসতে তাঁকে কখনো দেখিনি। টেবিলের ওপর এক পাশে সাজানো থাকত কিছু বই, কিছু কাগজ-পত্র, লেখবার কলম, পেপার-ওয়েট প্রভৃতি। সর্বদাই দেখা যেত তাঁর মুখমণ্ডল গম্ভীর ও জ্ঞানোজ্জ্বল—একটা শক্তির আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি বসে আছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল অতি প্রবল। মাঝে মাঝে তাঁর চক্ষুদ্বয় অর্ধনিমীলিত হতো, দৃষ্টি অতি কোমল। আর তাঁর মন মধ্যে মধ্যেই একটা গভীর চিন্তার আকর্ষণে ডুবে যেতে চাইত, একটু জোর করেই যেন বহির্মুখী হয়ে উপস্থিত ভক্তদের সাথে কথা বলতেন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে তিনি আপন চিন্তায় ডুবে থাকতেন; মিনিটের পর মিনিট চলে যেত, যেন তাঁর কোন হুঁশ নেই। আবার কেউ প্রশ্ন করলে যেন একটু চমকে উঠেই তার সাথে আলাপাদি করতেন। এমনিভাবে তাঁর উপস্থিতিতে একটা গম্ভীর অথচ শান্ত ও আনন্দ-পূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হতো। আমরা যদিও কদাচিৎ কথা বলতাম তবে ঐ পরিবেশের মধ্যে বসে থাকতে বড় ভাল লাগত, চলে আসতে ইচ্ছা হতো না।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে মহারাজকে প্রণাম করে এসে বসলেন এবং একটু পরেই জিজ্ঞাসা করলেনঃ "মহারাজ, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?" মহারাজ তখনই উত্তর দিলেনঃ "He who has seen the Son, has seen the Father also." একটু থেমেই আবার বললেনঃ "ঐতো আমার পিছনে দেওয়ালের গায়ে ঠাকুরের ছবি রয়েছে—জ্যান্ত মূর্তি, জীবন্ত ঠাকুর, সাক্ষাৎ ভগবান বসে আছেন; বিশ্বাস করতে পার? এই তো ভগবানদর্শন।" ভদ্রলোক অবাক বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে বসে রইলেন; আমরাও যারা মেঝেতে বসে ছিলাম সবাই তাঁর মুখের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। সবাই মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবছিলেন, মহারাজ এমনিভাবে নিশ্চয়ই ঠাকুরকে—ভগবানকে ছবির ভিতর দিয়ে জীবন্ত দেখতে পান।

আরেক দিনের কথা। আর এক ভদ্রলোক তাঁর বালিকা কন্যাকে নিয়ে মহারাজের ঘরে প্রবেশ করলেন, মহারাজ মেয়েটিকে দেখেই ভদ্রলোককে বললেনঃ "ওকে আমার সামনে দাঁড়াতে বল তো।" মেয়েটির চেহারা বড় সুন্দর ছিল, চোখে-মুখে সারল্য ও লাবণ্য ফুটে উঠছিল। মেয়েটি এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। মহারাজ কয়েক সেকেন্ড মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন; মনে হলো তিনি যেন মেয়েটির ভিতর কাউকে দেখতে পাচ্ছেন। সাক্ষাৎ জগজ্জননীকে কি দেখছিলেন? একটু পরেই বললেনঃ "বেশ, এখন তোমার বাবার কাছে যাও।" তাঁর মনে যে কি ভাব খেলে গেল, আমরা শুধু দেখলামই, বুঝতে পারলাম না কিছুই।

এই সময় একদিন সন্ধ্যার একটু আগে বেদান্ত মঠে গিয়েছি মহারাজকে দর্শন করতে, সঙ্গে আমার জেঠতুতো ভাই রোহিণীও ছিল। দুজনে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ঢুকেই দেখি, একটা ছোট সভার ব্যবস্থা হয়েছে মহারাজের ঘরের পিছনে উত্তরের উন্মুক্ত আঙ্গিনায়। তখন ঐ জায়গাটা ফাঁকাই ছিল, কোন বাড়ি-ঘর তৈরি হয়নি। আমরাও অন্যান্য সবার মাঝে গিয়ে বসলাম। অল্পক্ষণ পরেই মহারাজ সভায় এলেন। সেদিনের সভায় তিনিই ছিলেন এক-মাত্র বক্তা। কি উপলক্ষে সভার আয়োজন হয়েছিল, তা প্রথমতঃ বুঝতে পারিনি, পরে অবশ্য মহারাজের বক্তৃতা শুনে সভার উদ্দেশ্য ধারণা করতে পারলাম। আশ্রমটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বানের উদ্দেশ্যেই এই সভার আয়োজন হয়েছিল। সেদিনকার তাঁর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর আহ্বানের আবেগ ঐ উচ্ছ্বাস আজও আমার মনে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। আলোচনা প্রসঙ্গে মঠ-প্রাঙ্গণের চারিদিকের পরিবেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেনঃ "আমাদের এই আশ্রমের পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছে 'রূপবাণী' সিনেমাগৃহ, আর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্থাপিত হয়েছে 'বিশ্বরূপা' থিয়েটার হল। আপনারা এতে বিচলিত হবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা চলছে, তা কিভাবে চলবে, কিভাবে রূপ নেবে তা এখন কেউ ধারণা করতে পারবে না। আপনারা এগিয়ে আসুন, মনেপ্রাণে সহযোগিতা করুন; তাঁর কাজ তিনিই করবেন। এত আবেগের সঙ্গে তিনি সেদিন সবাইকে আহ্বান করেছিলেন যে, সভায় উপস্থিত সবাই অপার প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করেছিল।

১৯৩৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী দেহত্যাগ করেন। মহারাজ খবরটা পাওয়া মাত্রই ভাবাপ্লুতভাবে বেলুড় মঠে চলে গেলেন এবং অনুপম প্রেম-ভালবাসা নিয়ে সেই পবিত্র শুদ্ধ শবদেহের দিকে সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে থেকে পরমশ্রদ্ধাভরে তাঁর শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ্য দিলেন। জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার প্রতি তাঁর প্রেম-ভালবাসার গভীরতা সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। এর কিছুদিন পর কলকাতার এলবার্ট হলে প্রয়াত মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি-সভার ব্যবস্থা হলো। অভেদানন্দজী মহারাজকে সভাতে উপস্থিত থাকবার জন্য যথারীতি আমন্ত্রণ করা হলো। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সে-সভায় উপস্থিত থাকবার। হলঘরটি লোক-সমাগমে ভর্তি ছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখার্জী সভাপতি ছিলেন। সভামঞ্চে বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বসেছিলেন। বক্তারা সবই এসে গেছেন, কিন্তু মহারাজ তখনো উপস্থিত হতে পারেননি। শোনা গেল, রাস্তায় জ্যামে তাঁর

গাড়ি বিলম্বিত হচ্ছে। কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল, তিনি পূর্বদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে এসে দোতলার হলে প্রবেশ করছেন ও অতি দ্রুত শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ের মধ্য দিয়ে মঞ্চের দিকে আসছেন, সঙ্গে তাঁর সেবক রবি মহারাজ। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সবাই সশ্রদ্ধভাবে উঠে দাঁড়ালেন, বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখার্জীও। মহারাজকে মঞ্চের সম্মুখভাগে একটা চেয়ারে বসান হলো; বসেই তিনি চোখ বুজে গম্ভীরভাবে ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। সভার কাজ আরম্ভ হলো। সভাপতি মহারাজকেই সর্বপ্রথম ভাষণ দিতে অনুরোধ করলেন। মহারাজজী উঠেই অতি গম্ভীর ও সুমধুর সুরে একটা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে তাঁর জীবনযাপনের সুখ-স্মৃতির অনেক ঘটনার উল্লেখ করলেন। সেই ঘটনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বুদ্ধগয়ায় তাঁদের ধ্যান করার ঘটনাটি। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ ও স্বামীজী মহারাজ কাশীপুরের উদ্যানবাটী থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে না বলেই চলে গিয়েছিলেন বুদ্ধগয়ায় ধ্যান-সাধনা করতে। সন্ধ্যাকাল থেকে অনেকক্ষণ বুদ্ধদেবের মন্দিরের কাছে এক নির্জন জায়গায় তাঁরা ধ্যান করেছিলেন। তাঁরা ওখানে গিয়ে উঠেছিলেন ওখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধমঠে। তাঁরা যখন সেই নির্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন রাত্রের আহারের সময় হওয়ায় মঠের একজন সন্ন্যাসী অতি উচ্চকণ্ঠে যেসকল সাধু-সন্ন্যাসী বিভিন্ন স্থানে ধ্যান-তপস্যা করছিলেন, তাঁদের আহ্বান করলেন এই বলে ঃ "ভো, ভো, মহাপুরুষা…।" আহ্বান শুনে তাঁদের ধ্যান ভগ্ন হলো এবং পরস্পরকে তাঁরা ঠাট্টা করে বলছিলেন ঃ "চল মহাপুরুষ, আহারে চল।" তারপর নিজেদের 'মহাপুরুষ' বলে কিছুদিন ধরে আহ্বান করা চলল; পরে স্বামী শিবানন্দজীর নামের সঙ্গে 'মহাপুরুষ' শব্দটি প্রচলিত হয়ে গেল। অবশ্য অন্য একটি কারণেও স্বামী শিবানন্দজীকে 'মহাপুরুষ' বলে স্বামীজী আখ্যাত করেছিলেন। 'মহাপুরুষ' শব্দটি শিবানন্দজী মহারাজের নামের সাথে যুক্ত হওয়ার পিছনে এই ঘটনাটিরও যে অবদান আছে তা অভেদানন্দজী মহারাজের কথায় সেদিন শুনলাম। এপ্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন ঃ "স্বামী শিবানন্দজী যে সত্যিই মহাপুরুষ ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই; তাঁর ঐ নামটি যথার্থই হয়েছে

আর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। ফরিদপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শিশিরবাবু হঠাৎ একদিন মহারাজের ঘরে এলেন। আমরা অনেকে ঘরের মেঝেতে বসে তাঁর কথা শুনছিলাম। অধ্যাপক মহাশয় স্বামীজী মহারাজের জন্য একটা বেশ বড় ভাল কাঁসার থালা ও আরও কিছু বাসনপত্র নিয়ে এসেছেন। জিনিসগুলির প্যাকেটটা স্বামীজী মহারাজের টেবিলের ওপর রেখে তিনি অতি ভক্তি-ভরে প্রণাম করলেন। তারপরে, অতি সন্তর্পণে জিনিসগুলি প্যাকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলেন; দেখলাম মহারাজ খুবই প্রীত হয়েছেন এবং স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে শিশিরবাবুর দিকে চেয়ে আছেন। শিশিরবাবুরও ভক্তি-শ্রদ্ধা যেন উপচে পড়ছে। তাঁর ঐ সুন্দর ভাবটি আমাদের আকৃষ্ট করল। পরে জানলাম, শিশির-বাবু মহারাজের একজন প্রিয় শিষ্য, তিনি সময় পেলেই কলকাতায় ছুটে আসেন গুরু মহারাজকে প্রণাম করতে।

আর একদিন বেশ কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে আমরাও তাঁর সামনে মেঝের ওপর বসে আছি; নানা প্রশ্নের উত্তর তিনি অতি সহজভাবে দিচ্ছেন; এমন সময় কথাপ্রসঙ্গে সম্মুখের দেওয়ালে টাঙানো 'কালী তপস্বী'র ফটোখানা দেখিয়ে বলতে লাগলেন ঃ "ঐ দেখ কালী তপস্বীর ছবি। ঐটি অনুসরণ কর; ত্যাগ ও তপস্যার পথ ধরে চলতে থাক, চেয়ারে বসা এই অভেদানন্দকে অনুসরণ করো না। কালী তপস্বীকে অনেক জপ-তপ, ধ্যান-সাধনার পথে যেতে হয়েছে। ঐ পথে তোমরাও পরম শান্তি লাভের অবস্থায় আসতে পারবে। এখন তো home comfort পাচ্ছ; তপস্যার ঝড়ের ভিতর দিয়ে সারাটা জীবন চলে এসেছে; কোন comfort-এর প্রশ্নই ছিল না। এই দেহটা ঠাকুর খুব খাটিয়ে নিয়েছেন। জীবন তো এভাবেই গঠিত হয়।"

[ক্রমশঃ]

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি-সঞ্চয়ন

চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

একদিন শনিবার বিকালবেলায় প্রায় চারিটার সময়ে বাগবাজারে বলরামবাবুর সদরবাড়ির দোতলায় উঠিয়া গিয়া দেখিলাম পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ হলঘরে দক্ষিণ মুখে বসিয়া আছেন। ধীর স্থির গম্ভীর তাঁহার মূর্তি—যদিও উপস্থিত কয়েকজন ব্যক্তির সহিত তিনি কথাবার্তা কহিতেছেন, তবুও শান্ত অন্তর্মুখী ও আত্মসমাহিতভাবে তিনি অবস্থিত। তাঁহার প্রশান্ত মুখে অপূর্ব একটি জ্যোতি, গাম্ভীর্য ও প্রসন্নতার অপূর্ব সমাবেশ। সেই নিত্যমুক্ত ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষকে ভক্তিভরে প্রণামান্তে আমি সেইখানে একপাশে বসিয়া রহিলাম।

জনৈক গৃহস্থ ভদ্রলোক শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রশ্ন করিলেন: "মহারাজ! আপনারা বলেন, 'সমস্ত বাসনা কামনা ত্যাগ করে ষোল আনা মন দিয়ে সাধনে ডুবে না গেলে ঈশ্বরলাভ হয় না।' যাঁরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী শুধু তাঁরাই এই কঠোর সাধনার উপযুক্ত। কিন্তু আমরা গৃহী, স্ত্রী-পুত্র বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আমাদের থাকতে হয়। সংসারে নানা ঝঞ্ঝাটে আমাদের জীবনের সব সময় খরচ হয়ে যায়। কাজেই আমরা কখনই বা ভগবানকে ডাকি? তাহলে আমাদের উপায়ই বা কি?"

মহারাজ: "ষোল আনা মন দিয়ে সবসময়ে সাধনে লেগে থাকতে না পারলে কখনই ঈশ্বরলাভ হয় না। বাসনার একটি কণামাত্র থাকতে এপথে উন্নতি হবার জো নেই। যারা সমস্ত ভোগসুখ ত্যাগ করে এক-মনে সাধনে লেগে আছে তারাই ঈশ্বরলাভ করবে। ত্যাগ সংযম পবিত্রতা ভিন্ন কখনই ধর্মলাভ হয় না। ছেলেদের মন নির্মল। সংসারের ভোগ-বাসনার ছাপ তাদের মনে এখনো পড়েনি। তাদের জন্যেই ঐ রকম যোগসাধনের উপদেশ আমি দিই। গেরস্থদের সাধন-পথ আলাদা। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তাদের সংসারে থাকতে হয়। সংসার চালাবার জন্যে তাদের টাকা রোজগার করতে হয়। তাদের সময় খুবই অল্প। কাজেই যোগ ধ্যান প্রাণায়ামের উপদেশ গেরস্থদের দিলে কোনই ফল হবে না। একথা ঠিক যে, ষোল আনা ত্যাগ-বৈরাগ্য না থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তবে গেরস্থদেরও উচিত মনকে যতটা সম্ভব ভগবানের চিন্তায় লাগিয়ে রাখা। কাজের মধ্যে থাকলেও ভগবানকে স্মরণ করা চাই। আর তাছাড়া সারাদিনের মধ্যে খানিকটা সময় ভগবানের চিন্তায় লাগিয়ে দেওয়া উচিত। রোজ খানিকক্ষণ ভগবানের চিন্তা করতে করতে ক্রমেই মনে একটা সৎসংস্কার দাঁড়িয়ে যায়। ভগবানের কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে সত্যিই তিনি মানুষকে সংসারের ঝামেলা থেকে শেষকালে রেহাই দেন।"

ঐ গৃহস্থ ব্যক্তি বলিলেন: "মহারাজ! আমাদের মন এত চঞ্চল ও অস্থির যে, ভগবানের চিন্তায় তাকে বসানো মুশকিল। ভগবানের ওপর আমাদের অনুরাগ কৈ? আমাদের মন এমনি যে, ভগবানের দিকে যেতেই চায় না। একে সংসারে বাস করি, তার ওপর মন সবসময় সুখের আশায় ঘুরছে। এই অবস্থায় তাহলে আমাদের উপায় কি? আমাদের কি কোনই আশা নেই?"

মহারাজ: "মনের অবস্থা এখন যতই চঞ্চল হোক তবুও রোজ ভগবানের নাম করে যেতে হবে। রোজ নিয়মমতন খানিকক্ষণ নাম-জপ করতে করতে কিছুকাল বাদে তারপর এদিকে একটা টান আসবেই। ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় সময়ে অসময়ে যেভাবেই ভগবানের নাম করা হোক না কেন তার একটা ফল আছেই। মন চঞ্চল অস্থির আছে বলে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? এখন থেকেই লেগে যাও।

রোজ খুব সকালে উঠে অন্ততঃ দু-এক ঘণ্টা ভগবানের নাম জপ করো। প্রথম প্রথম অবশ্য ভাল লাগে না। কিন্তু রোজ অভ্যাস করে গেলে কিছুদিন বাদে তার ফল ফলবেই। একটু নিয়ম করে রোজ ভগবানকে ডাকলে তখন দেখবে মনে ক্রমেই আনন্দ আসছে। ভগবানের নামের এমনি শক্তি যে, ঐ নাম-জপের ফলে ক্রমেই মনের ময়লা দূর হয়ে যায়। যে-মন এখন এত চঞ্চল সেই মনই আবার আপনা থেকে জপ করতে চাইবে।"

গৃহস্থ ভক্ত : "মহারাজ! আপনার কথা ঠিক। তবে ইচ্ছে করলেও অনেক সময়েই আমরা ভগবানকে ডাকতে পারি না। সংসারের এমন এক একটা কাজ এক এক সময়ে হঠাৎ এসে পড়ে যে, তাইতে ভগবানকে ডাকা মাথায় উঠে যায়। একাজ সেকাজ করতে করতেই সারাদিন চলে যায়—এমন সময় পাই না যে, দুদণ্ড স্থির হয়ে ভগবানকে ডাকি। এঅবস্থায় কি করি?"

মহারাজ : "সে কথা ঠিক। তবে কি জানো? ইচ্ছে থাকলেই ভগবানকে ডাকার সময় করে নেওয়া যায়। ভিতরে ঠিকমতন ইচ্ছে থাকলে ভগবানকে ডাকার সময় পেতে অসুবিধে হয় না। আসল কথা কি জানো, ঠিক ঠিক অনুরাগ না এলে ভগবানকে ডাকবার চেষ্টাই হয় না। ভজন-সাধনে উৎসাহ নেই বলেই তোমাদের কখনো (সাধন-ভজনের) সময় হয় না।"

গৃহস্থ ভক্ত : "মহারাজ! কাজের পাকে জড়িয়ে পড়ে আমাদের এমন করে রেখেছে যে, হাজার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারি না।"

মহারাজ : "ঐ তো তোমাদের এক lame excuse (অজুহাত)। একবার নিজেকে পরীক্ষা করো দিখিনি। সংসারের কাজ করতে তোমাদের যত উৎসাহ তার হাজার ভাগের এক ভাগও উৎসাহ কি ভগবানের জন্যে আছে? ভগবানের দিকে টান না থাকলে হাজার ফুরসুৎ (অবকাশ) পেলেও লোকে তাঁকে ডাকতে চায় না। লোকে সাফাই দেয়—'সময় পাই না কখন ডাকি?' কিন্তু দেখেছি বাজে আড্ডা ইয়ার্কি দিয়ে, দিনে ঘুমিয়ে, তাস-পাশা খেলে সময় নষ্ট করতে তাদের মনে লাগে না। সংসারের কাজ-কর্ম করেও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। ঐ সময়টাতে যদি ভগবানকে ডাকে কিংবা সৎগ্রন্থ পড়ে তাহলেও যথেষ্ট উন্নতি হয়। কিন্তু কালের গুণে মানুষের স্বভাব এমনি হয়ে পড়েছে যে, হাজার ফুরসুৎ পেলেও লোকে ভগবানে মন দিতে চায় না। স্ত্রী-পুত্রকে দেখতে হবে—সেটা তোমার কর্তব্য। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কি এমন এক ঘণ্টাও সময় হয় না যে, ভগবানকে ডাকতে পারো?

"অবশ্য সব গেরস্থ যে দিনরাত সংসারে মেতে আছে তা বলছি না। গেরস্থদের মধ্যেও কোন কোন লোক আছে যারা ঠিক ঠিক বিশ্বাসী ও ভক্তিমান। সংসারে হাজার কাজের মধ্যে থাকলেও তারা সব সময়ে নজর রাখে কখন ভগবানকে ডাকতে পাবে।"

গৃহস্থ ভক্ত : "মহারাজ! সংসারে থেকেও যাঁরা ভগবানে মন রেখেছেন তাঁরা আর কজন? এরকম লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।"

মহারাজ : "ভালর সংখ্যা চিরদিনই কম। শুধু গেরস্থ কেন—সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যেই বা কজন ঠিক মতন সাধন-ভজন করে? একখানা গেরুয়া কাপড় পরলেই কি অমনি মুক্তপুরুষ হয়ে যাবে? ষোল আনা বৈরাগ্যের অধিকারী আর কজন হতে পারে? মহামায়ার এমনি মায়া যে, বাড়ি-ঘর ছেড়ে এসে সাধু হয়েও অনেকে সাধন-ভজনে মন দেয় না, হৈ হৈ করে সারাদিন বেড়ায়। গেরস্থদের অবস্থা তো আরও হীন। ষোল আনা মন দিয়ে কজন ভগবানকে ডাকছে? সাধন-ভজন কি চালাকির ব্যাপার? মুখে সবাই 'ভগবান ভগবান' করছে—কিন্তু সাধন-ভজনের চেষ্টা কে করতে চায়? সাধন-ভজনে লেগে থাকা যার তার কর্ম নয়। অনেক জন্মের সৎসংস্কার থাকলে তবে লোকে একাসনে দশ-বারো ঘণ্টা ধ্যান করতে পারে। আসল সাধক লাখের মধ্যে একজন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

"মানুষ যদি শান্তি পেতে চায় তবে তাকে ভগবানের শরণাগত হতেই হবে। ভগবান ছাড়া শান্তির উপায় নেই। ভগবানকে যদি ধরে থাকো শান্তি পাবে। ভগবানকে ভুলে থাকলে কোনদিনই শান্তি পাবে না। টাকাকড়ি তোমার অভাব অভি-যোগ ঘোচাতে পারে, টাকায় মান সম্মান খাতির হয়। কিন্তু আসল শান্তি পেতে হলে ভগবানকে আশ্রয় করা ভিন্ন উপায় নেই।

"একথা ঠিক, একদিনেই মানুষ সাধক হয়ে যেতে পারে না। সবই অনেক কালের সাধনফল। ভগবানে মন লাগাতে অভ্যাস করলে তবে তো ক্রমে তাঁর ওপর মন বসবে। মনের অবস্থা যেমনই থাক এখন থেকেই অভ্যাস করো। তোমরা গেরস্থ লোক —বয়স হয়ে গেছে। কঠোর সাধন করবার মতন শক্তি ও সময় নেই। ভগবানের নামের এমনি শক্তি যে, ঐ নামের জোরেই মানুষের সমস্ত বন্ধন ঘুচে যায়। ঈশ্বরের দয়া কখন কার ওপর কি করে আসে কে বলতে পারে? হাজার হাজার মহাপাপী ঐ নামের জোরে অল্পদিনেই উদ্ধার হয়ে গেছে, আর তোমাদের গতি হবে না? যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন মিছেমিছি অনুতাপ করে কোনই লাভ নেই। এখন থেকে রোজ তাঁকে ডাকতে আরম্ভ কর। ধর্মের একটুও ভাল। সামান্য মাত্র ধর্মতেও অনেক পাপ কেটে যায়। যদি আন্তরিক ইচ্ছা থাকে তাহলে চেষ্টা করতে করতে সত্যিই ভক্তি বিশ্বাস এসে পড়বে। আন্তরিক হয়ে কাতর প্রাণে ডাকলে মনের ময়লা দূরে হয়ে যায়। একথা মনে করা ভুল যে, গেরস্থদের কোনই গতি হবে না। যে ভগবানকে একমনে ডাকবে তারই গতি হবে।

"ওসব weakness (দুর্বলতা) ছেড়ে দাও। যেমন করে পারো সবসময়ে ভগবানের চিন্তা করবে। মনে বল আনবে, 'আমি তাঁকে ডাকছি আমার উপায় হবেই'। 'আমি তাঁর নাম করছি আমার গতি হবেই'—এই রকমে মনের বল আনো। তাঁর ওপর দাবি করো, বলো—'আমি তোমার আশ্রিত, তুমি না দয়া করলে আমি কোথায় যাবো?' এইরকম ভাবে তাঁকে ডাকো, তাঁর নামে মেতে যাও। তিনি দয়াময়। আন্তরিক হয়ে ডাকলে উপায় হবেই।"

অন্য একদিনের কথা

জনৈক গৃহস্থ ভক্ত: "মহারাজ! মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য কি? সংসারে সবাইকেই তো দেখি ভোগ-সুখ নিয়েই ব্যস্ত। ভোগসুখ ছাড়া কি মানুষের জীবনে আর কিছু করবার নেই?"

মহারাজ: "শুধু ভোগসুখ নিয়ে থাকা পশুর লক্ষণ। ভোগপ্রবৃত্তিতে পশুরাই মেতে থাকে। এই ভোগপ্রবৃত্তিকে জয় আর আত্মজ্ঞান লাভ করে বলেই মানুষ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান, পবিত্রতা এসব আছে বলেই মানুষ অন্য সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মানুষ-জন্ম পাওয়া অতি দুর্লভ। মানুষ ছাড়া আর কোন জীবকে আত্মজ্ঞান লাভ করবার শক্তি ভগবান দেননি। দেবতারাও আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন না। আত্মজ্ঞান লাভের জন্যে দেবতাদেরও মানুষ-জন্ম নিতে হয়। এই আত্মজ্ঞান লাভ করবার চেষ্টা যার নেই তার মানুষ-জন্ম বৃথা। আত্মজ্ঞান হলে মানুষ প্রকৃতির বন্ধন থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে যায়। এই আত্মজ্ঞান লাভ করাই মানুষ-জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

"শুধু আহার নিদ্রা আর নানারকম ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ যে করে—তার মতন দুর্ভাগা আর কেউ নেই। এই ভববন্ধন থেকে, অবিদ্যা থেকে মুক্ত হবার জন্যেই মানুষ-জন্ম। মানুষ হয়ে যদি শুধুই দেহের সুখেই মেতে থাকে তবে পশুদের সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়? শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি নিয়ে থাকলে কখনই দুঃখ অশান্তি ঘুচবে না। সরল হতে হবে, পবিত্র হতে হবে। স্বার্থপরতাই বন্ধন। স্বার্থপরতাকে, কুবাসনাকে যে ত্যাগ করেছে সে-ই মানুষ। শুধু নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ভালবাসা বন্ধনের কারণ। সবাইকে সমানভাবে ভালবাসলে বন্ধন ঘুচে যায়।

মানুষ-জীবন তারই সার্থক—যার ভিতরে হিংসা স্বার্থপরতা নেই। যে সবাইকে প্রাণখুলে ভালবাসে, যার আপন-পর ভেদ নেই সে-ই ঠিক সাধুপুরুষ। সমস্ত মানুষকে ভালবাসাই সাধুত্ব। মানুষকে ভাল না বাসলে মানুষের ভিতরে যিনি আছেন তাঁকে পাওয়া যায় না। যেখানে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সরলতা, পবিত্রতা সেখানেই ভগবান আছেন। ভগবানকে লাভ করতে হলে নিজের প্রাণটা ভালবাসায় পবিত্রতায় ভর্তি করে ফেলতে হবে। মহাপুরুষ তিনিই—যিনি সবাইকে সমান ভালবাসেন। দয়া ভালবাসা যেখানে নেই, সেখানে ধর্মও নেই।"

গৃহস্থ ভক্ত: "মহারাজ! লোকে তো নিজের বাপ-মা, ছেলেমেয়ে, বন্ধুবান্ধবদের এত ভালবাসে, একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করে, তবুও কেন তাদের মন পবিত্র হয় না? ভালবাসা না থাকলে কি করে তারা একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করছে?"

মহারাজ ঃ "সংসারী লোকদের ভালবাসা একটা কথার কথা। ওর মধ্যে একটুও আন্তরিকতা নেই। ও ভালবাসাই নয়। ও হচ্ছে মোহ কিংবা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে ভালবাসার ভান মাত্র। সংসারী লোকে কখনো কাউকে প্রাণ খুলে ভালবাসতে পারে না। নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে ভালবাসার মুখোস পরে থাকে। যতক্ষণ স্বার্থসিদ্ধি ততক্ষণই ওসব লোকের ভালবাসা। যেই নিজের স্বার্থে ঘা পড়ল অমনি তার ভালবাসা চলে গেল। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, বন্ধুবান্ধব—কারুর ওপরই ওসব লোকের ভালবাসা নেই। যে-স্ত্রীর জন্যে এত কষ্ট করছে সেই স্ত্রীরই একটা শক্ত অসুখ হলে তার দিকে একবার ফিরেও চাইবে না। স্ত্রী মারা গেলে দুদিন বাদে তাকে ভুলে গিয়ে আবার একটা বিয়ে করে বসে। ছেলেমেয়েকে বাপ-মার ভালবাসাও ঐরকম। বুড়োবয়সে দেখাশোনা করবে তাদের—এই স্বার্থ আছে। সেইজন্যে তারা ছেলেমেয়েকে ভালবাসে। ছেলেও তেমনি, বিয়ে হলে বাপ-মাকে আর গ্রাহ্য করে না। বৌকে নিয়েই তখন শুধু ব্যস্ত থাকে। যে বাপ-মা ছেলেবেলা থেকে খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করলে, সেই বাপ-মাকে একমুঠো ভাত দিতেও নারাজ! বন্ধুবান্ধব পাড়াপড়শীর ভাল-বাসাও ঐ একই রকম। যতক্ষণ নিজের দরকার আছে ততক্ষণই বন্ধুত্ব। দরকার মিটে গেলে আর কেউ কাউকে মনে রাখে না। এই তো সংসার! এই কি ভালবাসা? এখানে আসল ভালবাসা কোথায়? শুধু দোকানদারী আর দুনিয়াদারী। মুখে বলে 'ভালবাসি'—অথচ ভিতরে ঘৃণা হিংসা। অথচ এমনি মায়া যে, লোকে মনে করে সংসারেই শুধু সুখ। সুখ যে কত—হাড়ে হাড়ে জ্বলে পুড়েও তা বুঝতে পারে না। সংসারে এক কণাও সুখ নেই। এখানে সুখের বেশে দুঃখ বাসা বেঁধে আছে। যেখানে সুখ, সেখানে দুঃখও আছে। ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে গেলে সুখ-দুঃখের পারে যেতে হবে। সবাইকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে না পারলে দুঃখ অশান্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।"

গৃহস্থ ভক্ত ঃ "মহারাজ!, তবে কি ঠিক মতন ভালবাসবার লোক কেউ নেই? যদি সত্যিকার ভালবাসা না থাকে তাহলে মানুষ বাঁচবে কি করে?"

মহারাজ ঃ "ঠিক ঠিক ভালবাসতে কে পারে? বাপ-মা, ভাই, বন্ধু সবাই তো যে যার স্বার্থ নিয়ে ফিরছে। ভালবাসতে পারেন শুধু সদ্‌গুরু—যিনি সমস্ত মোহ-মায়াকে জয় করেছেন। মহাপুরুষের কাছে আপন-পর ভেদ নেই। এ দুনিয়ার সমস্ত লোকই তাঁর আপনার। তিনি কোনও গণ্ডিতে বাঁধা থাকেন না। সমস্ত ভেদবুদ্ধি থেকে তিনি চিরমুক্ত। নিজের স্বার্থ বলে তাঁর কিছুই নেই। তিনি সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখতে পান—এই জন্যে তাঁর মধ্যে ঘৃণা অহংকার ভেদবুদ্ধি থাকে না। তাঁর দয়া ভালবাসার শেষ নেই। সবাইকে অকারণেই তিনি ভালবাসেন। সবাইকে ভালবেসেই তাঁর আনন্দ। এই ভালবাসার জন্যে তিনি কখনো কোন প্রতিদান চান না। কিসে মানুষ শান্তিতে থাকে, কিসে তাদের কল্যাণ হয়, এরই জন্যে মহা-পুরুষেরা আজীবন তপস্যা করেন। তাঁদের স্নেহ দয়ার তুলনা হয় না।"

গৃহস্থ ভক্ত ঃ "মহারাজ! এরকম মহাপুরুষকে চিনতে পারে কজন? নিজের ভিতরে মলিনতা আছে বলে লোকে আসল মহাপুরুষদেরও সন্দেহের চক্ষে দেখে, তাঁদের নিন্দা করে দোষ খুঁজে বেড়ায়।"

মহারাজ ঃ "আসল মহাপুরুষকে চিনতে পারা যার-তার কর্ম নয়। নকল নিয়েই বেশির ভাগ লোক মেতে যায়, আসল মহাপুরুষকে চায় কে? শুদ্ধ আধার না হলে সত্যিকারের মহাপুরুষকে চিনতে পারা যায় না। সাধারণ সংসারী লোক ভোগে আসক্ত তমোগুণী, তাদের অন্তর মলিন। আরশিতে ময়লা জমে থাকলে তাতে মুখ দেখা যায় না। যাদের মনের ভিতরে পাপের ময়লা, অবতার কিংবা সিদ্ধ মহাপুরুষকে তারা চিনবে কি করে? এরকম লোক হাজারবার কোনও মহাপুরুষকে দেখলেও তাঁকে বুঝতে পারে না। শুধু বাইরের চেহারাটা দেখলে কি হবে? তাঁর ভিতরে কি আছে দেখবার জন্যে চোখ থাকা চাই। শুদ্ধ পবিত্র না হলে ভিতরের দৃষ্টি খোলে না। ঠিক ঠিক সিদ্ধ-মহাত্মাকে অতি বড় আত্মীয়লোকেরাও বুঝতে পারে না। পাড়াপড়শী কত লোক তাঁকে বারবার দেখেও তাঁর মাহাত্ম্য খুঁজে পায় না।"

গৃহস্থ ভক্ত : "আজ্ঞে হ্যাঁ। চিনবে কি করে? সাধন-ভজন থাকলে তবে তো?"

মহারাজ : "হ্যাঁ। যাদের ভিতরে কোনও শুদ্ধ ভাব নেই তারা অবতার কিংবা সিদ্ধপুরুষদের চিনবে কি করে? মানুষকে কৃপা করবার জন্যে তাঁরা সব সময়েই ব্যস্ত। কিন্তু সেই কৃপা নেবার গরজ কজনের আছে? সাধন-ভজনে যারা অনেক এগিয়ে গেছে তারাই ঠিকভাবে মহাপুরুষদের সঙ্গ করতে পারে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) তো হাজার হাজার লোকে দেখেছে। কিন্তু তাঁর ভাব নিতে পেরেছে ক-জন? মাত্র ঐ ক-জন তাঁর ত্যাগী সন্তান। সংযমী ও পবিত্র না হলে সে-আধারে মহাপুরুষদের ভাব খেলে না। যাদের ভিতরে ভোগবাসনা তারা মহাপুরুষকে দেখলে কিছুই বুঝতে পারে না—তাঁর ভাব নেওয়া তো দূরের কথা। উপদেশ তো অনেকেই শোনে, কিন্তু সেই উপদেশ পালন করে কে?

"যারা ঠিক ঠিক মুমুক্ষু, বৈরাগ্যবান তারাই শুধু মহাপুরুষদের সঙ্গ করতে পারে। সঙ্গ করার মানে তাঁর ভাবকে জীবনে ফুটিয়ে তোলা। অনেক সাধন-ভজন করে করে যাদের বুদ্ধি একেবারে সাফ হয়ে গেছে তারাই আসল শিষ্য। এই রকম শিষ্যের ভিতরেই সিদ্ধ সদ্‌গুরুর শক্তি কালে প্রকাশ হয়। যত বড় মহাপুরুষের কাছেই দীক্ষা নাও নিজে সাধন-ভজন না করলে কিছুই হবে না। সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা পেলেই মনে করো না যে, সব হয়ে গেল। বিবেক বৈরাগ্য ধ্যান-ধারণা চাই। কৃপা নিতে হলে সেই রকম যোগ্য আধার হওয়া চাই। মহাপুরুষের কৃপা হজম করা ভারী শক্ত। খুব উচ্চ আধার না হলে কেউই ঐ কৃপা হজম করতে পারে না।"

গৃহস্থ ভক্ত : "মহারাজ! তবে যে অনেকে বলে 'গুরুর কৃপা না হলে কিছুই হবে না'?"

মহারাজ : "তার মানে এই নয় যে, তুমি দীক্ষা নিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে, আর গুরু তোমায় কাঁধে করে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। মানুষ মোহের ঘোরে দিশেহারা হয়ে জন্ম জন্ম ধরে ঘানির গরুর মতন এই সংসারে খালি ঘুরে মরছে। হাজার চেষ্টা করেও মুক্তির রাস্তা খুঁজে পায় না। সদ্‌গুরু এসে তাকে সেই পথ ধরিয়ে দেন। কিন্তু তুমি ঐ পথে এগিয়ে যেতে চেষ্টা না করলে গুরু কি করবেন? নিজে প্রাণপণে সাধন না করলে ভগবানের দয়া, গুরুর কৃপা কিছুই ফলে না। সূর্য তো আলো দিচ্ছেই, কিন্তু আরশি ময়লা থাকলে আলোর reflection (প্রতিফলন) পড়বে কি করে? ছুঁচের গায়ে মাটি থাকলে তাকে চুম্বকে টানতে পারে না। ভিতরে ভোগবাসনার মাটি জমে আছে বলে তাই তোমাদের মধ্যে গুরুর কৃপা ফলছে না। যিনি যথার্থ সদ্‌গুরু তিনি চান তাঁর সমস্ত শিষ্যই মুক্ত হয়ে যাক। কিন্তু শিষ্যদের যার যেরকম আধার তার সেই রকম উন্নতি হয়। যে যেমন খাটবে সে সেই রকম ফল পাবে। নিজে না খাটলে গুরু কি করবেন? হুজুকে ছটফটে লোকে সদ্‌গুরুর কাছে অনেক বছর থেকেও কোন উন্নতি করতে পারে না। এক-মন এক-প্রাণ হয়ে লেগে পড়ে থাকলে তবে উন্নতি হয়। সমস্ত মন ভগবানে দিয়ে দিলে তবে তো উন্নতি হবে, এ পথে এগিয়ে যাবে।"

গৃহস্থ ভক্ত : "সাধন-ভজনে সবসময় না লেগে থাকলে যদি কোন উন্নতি না হয়, তবে আমাদের উপায় কি? একটু আধটু জপ করলে আর কি হবে?"

মহারাজ : "বারবার তো বলেছি, ঐ সামান্য একটু একটু অভ্যাস করলেও অনেক ফল হয়। বাজে আচার-নিয়ম আর ঐসব ভড়ং ছেড়ে দাও। মন কিসে ভগবানে লেগে থাকে শুধু সেই দিকে লক্ষ্য রাখবে। ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় নাম করে গেলেও একদিন ঐ মনই ভগবানের দিকে চলে যাবে। হতাশ হবার কি আছে? যেরকম করেই হোক সাধনে লেগে থাকতে হয়। কে জানে কখন কার ভিতরের গাঁট খুলে যাবে? ভগবানের নামের জোরে সব পাপতাপ ধুয়ে যায়। ভয় কি? তাঁর শরণাগত হও। ডাকো তাঁকে দিনরাত। কাতর হয়ে ডাকলে সে-ডাক বৃথা যায় না। ভগবানের নাম নিয়ে পড়ে থাকো। নাম আর নামী অভেদ। ঐ নামেই তিনি আছেন। ঐ নামের নেশায় মেতে যাও। তিনি দয়াময়, নিশ্চয়ই দয়া করবেন।"* □

* বিশ্ববাণী, ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬, পৃঃ ১৭২-১৭৬

সংগ্রহ : নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচক : স্বামী বাসুদেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শেষজন্ম

প্রশ্ন : ঠাকুর অনেকের 'শেষজন্ম' বলেছেন, তার মানে কি ?

স্বাঃ বাঃ : ভগবানের কথার রহস্য অতি গভীর, আমি তার কি-ই বা অর্থ করব বলুন ? তবে আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে যতটুকু ধারণা করেছি, তাই বলছি। জীবোদ্ধারের জন্য শ্রীভগবান নর-শরীরে আবির্ভূত হয়েছেন, কৃপাতে সব উদ্ধার হবে।

প্রশ্ন : যারা অসৎ কর্ম করেছে তারাও ?

স্বাঃ বাঃ : যদি কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাগত হয়, তাহলে 'সাধুরেব স মন্তব্য'। পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে সাক্ষাৎ ভগবৎ-বিগ্রহের দর্শন হয় ?

প্রশ্ন : বহু লোক তাঁর কাছে গেছে, কিন্তু তাদের তাঁকে ঈশ্বর বলে বোধই হয়নি।

স্বাঃ বাঃ : তাদের কাছে তিনি 'যোগমায়া সমাবৃতম্'। তাদের সুকৃতি নেই বলে যোগমায়া তাদের বুঝতে দেননি।

প্রশ্ন : তাহলে আর কৃপার স্থান কোথায়, যদি সুকৃতি মানতে হয় ?

স্বাঃ বাঃ : গিরিশবাবুর সঙ্গে স্বামীজীর এই নিয়ে তর্ক হয়েছিল। স্বামীজী বলেছিলেন : "কৃপার মধ্যেও একটা 'ল' অর্থাৎ আইন আছে।" সকলেরই যে একই রকমের গতি হয় তা নয়, তবে সকলেরই অভ্যুদয় হবেই, ভগবদ্দর্শন কি কখনো নিষ্ফল হয় ? মথুরবাবুর সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন : "এবার একটা রাজা-টাজা হয়ে জন্মাবে।" কেশববাবুকে বলেছিলেন : "মস্ত লোক হয়ে জন্মাবে, মস্ত গাছের গুঁড়ি, হাতি বাঁধলেও টলবে না।" যাদের শেষজন্ম বলেছিলেন, তাঁরা বোধহয় শ্রীবুদ্ধ-কথিত ব্রহ্মলোক-বাসী 'সকৃদাগামিনঃ'। ব্রহ্মলোকের দ্বিতীয় স্তরের দেবতারা, তাঁদের সেখানে একমাত্র দুঃখ—জীবদুঃখ-কাতরতা। ভাগবতে শুকদেবও একথা বলেছেন।

প্রশ্ন : ব্রহ্মলোকবাসী 'সকৃদাগামিনঃ' শব্দের অর্থ কি ?

স্বাঃ বাঃ : ব্রহ্মলোককে ভগবান বুদ্ধ দুভাগে বিভাগ করেছেন—রূপ-ব্রহ্মলোক আর অরূপ-ব্রহ্মলোক। তার মধ্যে রূপ-ব্রহ্মলোকের আঠারোটা বিভাগ। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসও এ-সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। পূর্বোক্ত আঠারোটা স্তরের শেষ পাঁচটি হচ্ছে 'অনাগামিনঃ' অর্থাৎ সেখানকার দেবতারা 'অপুনর্ভবঃ'—আর তারা ফেরেন না—অরূপ-ব্রহ্মলোকের চারটি স্তর অতিক্রম করে তাঁরা ক্রমে ব্রহ্মলীন হন। আর ঐ পাঁচটা স্তরের আগের চারটে হচ্ছে 'এক-ভবঃ' অর্থাৎ একবার তাদের পৃথিবীতে আসতে হয়। এখানে একটি দুঃখ আছে, শুকদেব বলেছেন (ভাগবত, ২।২।২৭) :

> "ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু-
> র্নার্তির্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ।
> যচ্চিত্ততোঽদঃ কৃপয়াঽনিদংবিদাং
> দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥

সেখানে আর কোন দুঃখ নেই, শোক নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, আর্তি নেই, উদ্বেগ নেই; কেবল কৃপা হেতু যোগমার্গ অবিদদের দুরন্ত দুঃখ প্রভবানুদর্শন করে যে দুঃখ, অর্থাৎ জীবদুঃখ-কাতরতা। তাঁদেরই অর্থাৎ জীবদুঃখকাতর ঐ অতি উর্ধ্বলোকস্থ দেবতাদেরই শ্রীভগবান নরলীলা প্রকট-কালে লোক-সংগ্রার্থ নিয়ে আসেন এবং তার ভিতর দিয়ে তাঁদের প্রারব্ধ ক্ষয়ের দ্বারা মুক্তি ফলদান করেন। তবে ঈশ্বর যা খুশি তাই করতে পারেন, তিনি অরূপ-ব্রহ্মলোক থেকেও স্বামীজীকে নিয়ে এলেন। আবার যিনি কখনো সংসার দেখেননি এমন যে পূর্ণ, তাঁকেও নিয়ে এলেন। তবে তিনি ঠাকুরের কাছে ইচ্ছা করে সংসার দেখতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন ভাঙতেও পারেন।

স্বাঃ বাঃ : ঈশ্বরের যদি সর্বশক্তিমত্তাই স্বীকার করলাম, তখন এও আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন, তিনি ছুঁচের ছ্যাঁদার ভিতর দিয়ে উট হাতি গলাতে পারেন, লাল জবার গাছে রাতারাতি সাদা জবা ফোটাতে পারেন। (২৮।১১।৪২) [ক্রমশঃ]

আমার কুরুক্ষেত্র

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

জীবন যখন শুকিয়ে আসে, তখন কে বর্ষণ করবেন করুণাধারা? আমি তো আর কাউকে চিনি না ঠাকুর, আপনাকেই আমি চিনি। আপনি আমার পরম ভরসা। আপনিই আমার সাহস, শক্তি। আপনিই আমাকে সংসার চিনতে শিখিয়েছেন। বলেছিলেন: "বদ্ধজীবেরা সংসারে··· বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা। আবার মনে কর যে, সংসারেতেই··· সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চললে, আমার কি করে গেলে?' আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বলালে বদ্ধজীব বলে, 'তেল পুড়ে যাবে সলতে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে। বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।"

আমি যা করতে পারি আপনি তা জানেন। আমার মন জানেন, আমার স্বভাব জানেন, আমার সংস্কার জানেন। আপনি আমাকে চেনেন। যা করে আমি দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে যাব, ক্রমশই বদ্ধ হব, শেষ হওয়ার আগেই নিঃশেষ হয়ে যাব, আপনি তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমি শোধরাতে না পারি, বেরোতে না পারি, অসুখটা আমার জানা গেছে। আপনাকে আমি ভালবাসি, আমার সবচেয়ে আপন-জন বলে মনে করি, মনেপ্রাণে চেষ্টা করি আপনার নির্দেশিত পথে চলতে। পারি না, কারণ আমি দুর্বল। আমার রোখ নেই। আমার তেজ নেই। সেকথাও আপনি বলেছেন—সংসারী মানুষের রোখ থাকে না। বলেছেন, বড় বড় কথা বলবে, হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা। কথার কোন দাম নেই। এই বললে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিলুম, তিন-দিন পরেই ফিসফ্রাই চেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো। হঠাৎ মনে হলো ভয়ংকর বৈরাগ্য এসে গেছে, সংসার ছাড়লেই হয়, মন শামুকের মতো গুটিয়ে নিবৃত্তির খোলে ঢুকে গেছে, পরমেশ্বরের ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছি, সারা শরীরে ত্যাগ চিনচিন করছে; কিন্তু সংসার-ত্যাগ আর হয় না ঠাকুর। সেই আপনার কথা—'দক্ষিণে কলাগাছ, উত্তরে পুঁই, একলা কালো বিড়াল, কি করব মুই।' সংসারে ভোগ তেমন নেই, সবটাই দুর্ভোগ, তবু ঐ যে-বেড়াল যে-বাড়িতে অভ্যস্ত, সেই উঠনেই ম্যাও ম্যাও করে ঘুরবে ল্যাজ তুলে—ঝাঁটাই খাক আর লাথিই খাক।

তবু, আপনি আমার দুর্বলতা ধরিয়ে দেওয়ায় জ্ঞানপাপী হতে পেরেছি। আমার একটা লজ্জা এসেছে। বোলচাল সংযত করতে শিখেছি। আমি যে কতটা বদ্ধ, কি পরিমাণ নির্বোধ সেটা বুঝতে শিখেছি। ভিতরে একটা অবিরত সংগ্রাম চলছে, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তিতে। একটা ইচ্ছা জেগেছে। দেরি হলেও চেষ্টা করতে দোষ কী! বিচার তো এসেছে। সংসারকে চিনতে তো শিখেছি। 'আমার কি করে গেলের'-দল আমাকে ঘিরে আছে। তেল পোড়ার চিন্তায় বিমর্ষ। নির্জনতায় নিজের সরে আসার কৌশল আয়ত্তে আসছে। আত্মসমর্পণের মাধুর্য আমি উপলব্ধি করতে পারছি। অহংকারের ল্যাজামুড়ো কাটতে না পারলেও কিছুটা ছাঁটতে পেরেছি। আপনি আমাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন: "সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ, নৌকা দহে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই। সেঁকুল কাঁটার মতো এক ছাড়ো তো আর একটি জড়ায়। গোলোকধান্দায় একবার ঢুকলে বেরুনো মুশকিল, মানুষ যেন ঝলসা পোড়া হয়ে যায়।"

দগ্ধ মানুষের কাতর প্রার্থনায় আপনাকে সাড়া দিতেই হবে। আপনি বলেছেন, উপায় আছে। সে-উপায় হলো—সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা। সাধুসঙ্গ

বলতে আমি বুঝি আপনার সঙ্গ। প্রার্থনা বলতে বুঝি আপনার নির্দেশ পালন। আপনি বলেছেন, সাধুসঙ্গে একটি উপকার হয়, সদসৎ বিচার আসে। সৎ কি? না নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। এও বুঝি, অনিত্যের টান খুব বেশি। কারণ সবসময় বিচার কাজ করে না। তখন আপনি আমাকে বলে দিয়েছেন, বিচারের ডাঙশ মারতে। মন মত্তকরী। তার ওপর উপবিষ্ট বিচারক মন-মাহুতটিকে চিনতে হবে। হাতি পরের কলাগাছ খেতে গেলে, শুঁড় বাড়ালে মাহুতে ডাঙশ মারে। মনের শুঁড় যেই অনিত্যের দিকে ছুটবে অমনি বিচার দিয়ে তাকে ঠেঙাবে। প্রার্থনা করবে। সাধুসঙ্গ ও সর্বদা প্রার্থনা। তাঁর কাছে কাঁদতে হবে। চোখের জল একমাত্র পথ। হম্বি-তম্বি, লাফালাফি, কোস্তাকুস্তিতে কিছু হবে না। বেদ-বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ্‌, ভাগবত পড়লেও কিছু হবে না। আপনার সেই ভাগবত-পাঠকের গল্পটি মনে আছে—

একজন রাজা ছিল। একটি পণ্ডিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুনত। প্রত্যহ ভাগবত পড়ার পর পণ্ডিত রাজাকে বলত, রাজা বুঝেছ? রাজাও রোজ বলত, তুমি আগে বোঝ। ভাগবতের পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে রোজ ভাবে যে, রাজা রোজ এমন কথা বলে কেন। আমি রোজ এত করে বোঝাই আর রাজা উলটে বলে, তুমি আগে বোঝ। একি হলো। পণ্ডিতটি সাধন-ভজন করত। কিছুদিন পর তাঁর হুঁশ হলো যে, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব—গৃহ, পরিবার, ধন, জন, মানসম্ভ্রম সব অবস্তু। সংসারের সব মিথ্যা বোধ হওয়াতে সে সংসার ত্যাগ করল। যাবার সময় কেবল একজনকে বলে গেল, রাজাকে বলো যে, এখন আমি বুঝেছি।

এখানে একটি কথা পেলুম ঠাকুর—'হুঁশ'। ঈশ্বরে হুঁশ। বস্তুতে হুঁশ। অবস্তু, সংসারে বেহুঁশ। সার চিনেছি, অসারে আর মন লাগে না। কবীরদাস বলছেন :

"পানী বিচ মীন পিয়াসী,
মোহি' সুনসুন আবত হাঁসী।
ঘরমে' বস্তু নজর নহি আবত,
বন বন ফিরত উদাসী।
আতমজ্ঞান বিনা ভাগ ঝুঁঠা,
ক্যা মথুরো ক্যা কাসী॥"

—মাছ তুমি জলে আছ, তাও বলছ তৃষ্ণার্ত। শুনে আমার হাসি আসছে। তোমার নিজের ঘরেই বস্তু রয়েছে, তুমি সেই বস্তুর সন্ধানে উদাসী হয়ে অরণ্যে-অরণ্যে ঘুরছ। শোন, মথুরাতেই যাও আর কাশীতেই যাও, আত্মজ্ঞান না হলে—সব ঝুঠ হ্যায়। এলে আর গেলে। মাঝখানে পড়ে রইল ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো একটুকরো জৈব বেঁচে থাকা।

ঠাকুর সেই হুঁশটা আপনি লাগিয়ে দিয়েছেন। আপনি খুব সাংঘাতিক। আপনার কাছে এলেই রঙ ধরে যায় মনে। ভয়ঙ্কর এক চুম্বক। বই-পত্র, বেদ-বিচার সব চুলোয় যাক। ব্যাকুল কান্না। কাঁদলে মনের ময়লা ধুয়ে যাবে। পরিষ্কার ছুঁচ। তখন আপনাতে চিরলগ্ন। আমার সংগ্রামের এলাকা কোনটা, আমার কুরুক্ষেত্র কোথায় আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন। মায়ার ঘেরাটোপে আমার অবস্থান। আপনি বলছেন, সেটাই স্বাভাবিক। বলছেন : "তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে অবিদ্যাও আছে। অন্ধকারেরও প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাকলে আলোর আরও মহিমা প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিস বটে, তবে তিনি দিয়েছেন কেন? মহৎ লোক তয়ের করবেন বলে।"

এইবার আপনি আমার প্রধান শত্রুকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার জীবন-কুরুক্ষেত্রের সখা কৃষ্ণ। আপনি বলছেন : "পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি।" —কার সঙ্গে তোমার সংগ্রাম তাকিয়ে দেখ—তোমার ইন্দ্রিয়। আপনার কথা মনে পড়ছে : "ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ হয়। জিতেন্দ্রিয় কি না করতে পারে।"

"জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥"

আপনি বললেন : জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্ত হও। জ্ঞান কী?—তিনি আছেন। বিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞান হলো, তাঁকে দেখেছি। তুমি নির্বিকার হও, জিতেন্দ্রিয় হও। মাটি, পাথর, সোনা সব তোমার কাছে এক বস্তু। তখন তুমি যোগারূঢ়। যোগী। তার আগে নও। তোমার সংগ্রাম বাইরের শত্রুর সঙ্গে নয়। তোমার কুরুক্ষেত্র ভিতরে। তোমার সংগ্রাম দুঃশাসন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে। ❑

প্রাসঙ্গিকী

প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'-এর শতবর্ষ এবং স্বামীজীর একটি চিঠি

৯৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকা একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত আর কোন পত্রিকা এই দুর্লভ গৌরবের অংশীদার নয়। সম্ভবতঃ সারা ভারতবর্ষেও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত আর কোন সাময়িকপত্রের এই গৌরব এবং ঐতিহ্য নেই। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'উদ্বোধন' যে-ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তার গুরুত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্বীকার করে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙলার এম. এ. পরীক্ষার প্রথম পত্রে 'উদ্বোধন' সম্বন্ধে প্রশ্ন এসেছিল। প্রশ্ন আসাটা গুরুত্বপূর্ণ নয় 'উদ্বোধন'-এর কাছে, তবে অনেকে এই সংবাদটি জানেন না বলেই উল্লেখ করলাম। প্রসঙ্গতঃ বলি যে, 'উদ্বোধন'-এর ৯০তম বর্ষ-পূর্তিকে দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বর্তমান প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছিল। 'দেশ'-এ পূর্ণ দুপৃষ্ঠার সচিত্র একটি বিশেষ প্রতিবেদনের কথা অনেকের মনে পড়বে (১৩।২।৮৮)। মনে পড়বে 'উদ্বোধন'-এর এপিক পুরস্কার পাওয়ার কথাও (৪।৭।৯০)।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে উদ্বোধন-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর ঠিক সাড়ে ছয় বছর পরেই 'উদ্বোধন' পত্রিকা শতবর্ষে পদার্পণ করবে। দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত পাঠক হিসাবে উদ্বোধন-কর্তৃপক্ষের কাছে সে-উপলক্ষে আমাদের বিনীত প্রস্তাব—

(১) উদ্বোধন-এ একশো বছর ধরে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির একটি নির্বাচিত সঙ্কলন শতবর্ষেই প্রকাশিত হোক, (২) শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীকে নিয়েও অনুরূপ দুটি পৃথক সংকলন প্রকাশিত হোক এবং (৩) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামীজী সম্পর্কে প্রকাশিত কবিতাগুলি থেকে নির্বাচিত একটি সঙ্কলন আলাদাভাবে প্রকাশ করা হলেও খুব ভাল হয়। এইসঙ্গে (৪) একশো বছর ধরে প্রকাশিত নানা বিভাগের পুনর্মূল্যায়ন করে শতবর্ষ সংখ্যাতে প্রবন্ধ লেখা হোক। 'দেশ' পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে এইভাবে নির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা 'উদ্বোধন'-এর পাঠকরাও দুই মলাটের মধ্যে বাংলার কৃষ্টিজগতের একশো বছরের চিন্তার পরিচয় পেয়ে যাব। পেয়ে যাব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের এক-একটি মূল্যবান দলিল, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যা প্রজ্ঞা ও মননশীলতার স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হলো যে, গত ফাল্গুন (১৩৯৮) সংখ্যার উদ্বোধন পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'শিকাগো বিশ্বধর্মসম্মেলন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি চমৎকার—তথ্যবহুল এবং মনোজ্ঞ। কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দিয়ে স্বামীজীকে বিশ্ববন্দিত করে তুললেন, নিপুণ বিশ্লেষণে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তা তুলে ধরেছেন। এজন্য তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় শিকাগোয় স্বামীজীর সাফল্য প্রসঙ্গে সমসাময়িককালে লেখা স্বামীজীর বেশ কয়েকটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরে তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা এবং সে-প্রসঙ্গে স্বামীজীর অভিমত তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অনেকগুলি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিলেও ধর্মমহাসম্মেলনের অব্যবহিত পরে ২ অক্টোবর, ১৮৯৩ তারিখে অধ্যাপক জন হেনরী রাইটকে লেখা স্বামীজীর চিঠি থেকে কোন উদ্ধৃতি উদ্ধার

করেননি। 'প্রিয় অধ্যাপকজী' সম্বোধনে লেখা ঐ দীর্ঘ চিঠিতে আমরা দেখি, স্বামীজী তাঁর সাফল্যের কারণস্বরূপ তাঁর আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করেছেন মোট চারবার। (দ্রঃ পত্রাবলী, ১৩৮৪, পৃঃ ৮৭-৮৯) শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁর পিছনে থেকে সবকিছু করাচ্ছেন—একথা স্বামীজী সানন্দে সেখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ, সেই চারটি প্রসঙ্গ আমরা উত্থাপন করছি ঃ

(১) "প্রিয় ভ্রাতা, সেই মহাসভায়, যেখানে সারা পৃথিবীর বিশিষ্ট বক্তা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উপস্থিত, সেখানে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে ও বক্তৃতা দিতে আমার যে কী ভয় হচ্ছিল। কিন্তু প্রভু আমাকে শক্তি দিয়েছেন। প্রায় প্রতিদিন আমি বীরের মতো সভাকক্ষে শ্রোতাদের সম্মুখীন হয়েছি। যদি আমি সফল হয়ে থাকি, তিনিই শক্তিসঞ্চার করেছেন···।"

(২) "প্রিয় ভ্রাতা, জীবনের প্রতিটি দিনে আমি যেভাবে প্রভুর করুণা পাচ্ছি, আমার ইচ্ছা হয়, ছিন্নবস্ত্রে ও মুষ্টিভিক্ষায় যাপিত লক্ষ লক্ষ যুগব্যাপী জীবন দিয়ে তাঁর কাজ করে যাই—কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর সেবা করে যাই।"

(৩) "প্রভু আমাদের সকলকে পবিত্র থেকে পবিত্রতর করুন, যাতে আমরা এই পার্থিব দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার আগেই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে পারি।"

(৪) "আর যদি তিনি যখন আমার পাশে সত্যি এখানে না থাকেন, তাহলে নিশ্চিত ধরে নেব, তিনি চান যে, এই তিন মিনিটের মাটির শরীর আমি যেন ছেড়ে দিই ;—হ্যাঁ, তাহলে তাই তিনি চান, এবং আমি তো সানন্দে পালন করবার ভরসা রাখি।"

চিঠিগুলির এই অংশবিশেষ থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারি, তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্বামীজীর কী অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি যে স্বামীজীকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন, স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে তা স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতো আমরাও জোরের সঙ্গে বলব, শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর যোগদান এবং সাফল্য, যা তাঁকে বিশ্ববন্দিত করে তুলল, তার কেন্দ্রে আছেন একজনই, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

তাপস বসু
কলকাতা-৩৯

পত্রলেখকের শতবার্ষিকী সঙ্কলনের প্রস্তাব প্রসঙ্গে উদ্বোধনের বক্তব্য

অধ্যাপক তাপস বসুকে ধন্যবাদ। তাঁর অবগতির জন্য জানাই যে, আমরা বিষয়টি আগেই ভেবেছি এবং আমাদের ভাবনাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য প্রাথমিক প্রয়াস শুরু হয়েও গিয়েছে।

যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

পত্রলেখকের বক্তব্য প্রসঙ্গে প্রবন্ধ-লেখকের বক্তব্য

অধ্যাপক তাপস বসুর পত্রের জন্য ধন্যবাদ। প্রবন্ধটি তাঁর ভাল লেগেছে জেনে আনন্দিত হলাম। অধ্যাপক রাইটকে লেখা স্বামীজীর ২ অক্টোবর, ১৮৯৩ তারিখের যে-চিঠির কথা তাপসবাবু উল্লেখ করেছেন, প্রবন্ধ রচনার সময় সে-চিঠি আমিও দেখেছি। প্রবন্ধ রচনার সময় স্বভাবতই কিছু তথ্য বাছাই করতে হয়েছে। অধ্যাপক রাইটের কাছে লেখা স্বামীজীর মূল ইংরেজী চিঠিতে যে কয়েকবার 'Lord' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সদ্যলব্ধ ঘনিষ্ঠ খ্রীস্টান-বন্ধু অধ্যাপক রাইটকে লেখা চিঠিতে 'Lord' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ' সমার্থক কিনা—এবিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। কিন্তু গুরুভাই, এদেশীয় বন্ধু বা শিষ্যদের কাছে লেখা চিঠিতে 'প্রভু' অথবা 'Lord' অভ্রান্তভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণকেই বোঝায়। একারণেই রাইটের চিঠিটা ব্যবহারের ঝুঁকি নিইনি।

যাই হোক, তাপসবাবু ক্লেশস্বীকার করে চিঠিটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমি কৃতজ্ঞ। □

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩৬

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

অমিয়কুমার দাস

ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদির মতো কুষ্ঠ একটি সংক্রামক রোগ (যেসব রোগজীবাণু একজন থেকে অন্যজনকে আক্রমণ করে)। কুষ্ঠরোগের জীবাণুর নাম মাইকোব্যাক্‌টিরিয়াম লেপ্রি (Mycobacterium lepræ বা M. lepræ)। কুষ্ঠ-জীবাণু দেহের ঠাণ্ডা জায়গা পছন্দ করে, চামড়া ও চামড়ার নিচের নার্ভে প্রথমে বাসা বাঁধে ; দেহের কুষ্ঠরোগ-প্রতিরোধক্ষমতা না থাকলে প্রতি কুড়ি দিনে জীবাণু সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়। সংক্রামক কুষ্ঠ-রোগীদের কুষ্ঠ-প্রতিরোধক্ষমতা থাকে না, তাই সারা দেহে কুষ্ঠ-জীবাণু দ্রুত ছড়ায়। কুষ্ঠরোগে রোগী মরে না ; আক্রান্ত নার্ভ ধ্বংস হওয়ায় হাত-পা ও মুখ বিকৃত হয়, অসাড়তার জন্য ও অযত্নে হাত-পায়ে ঘা হয়।

প্রায় ৯৬ শতাংশ ভারতীয়দের দেহে কুষ্ঠ-প্রতি-রোধক্ষমতা যথেষ্ট থাকে তাদেরকে লেপ্রমিন স্কিন টেস্ট পজিটিভ (Lepromin skin test+++ Positive) বলে। কুষ্ঠ-জীবাণু তাদের দেহে প্রবেশ করলেও কুষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রায় ৩ শতাংশ লোকের কুষ্ঠ-প্রতিরোধক্ষমতা কিছু কম (Lepromin test++Positive)। কুষ্ঠ-জীবাণু এদের দেহে প্রবেশ করলে এক বা দু-তিনটি দাগ হতে পারে। এই দাগ চুলকায় না, ঘামে না। দাগে চুল থাকে না—স্থানটি শুকনো খসখসে। এর তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম ও এই শরীরাংশে ব্যথার অনুভূতি কম বা থাকে না। দাগের সীমানা সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ ভাঙা নয় ; দেহের কুষ্ঠ-প্রতিরোধক্ষমতা সুস্থ চামড়ায় যেন একটা প্রাচীর সৃষ্টি করে রোগ-আগ্রাসনে বাধা দেয়। দাগের নিকটবর্তী নার্ভ বা স্নায়ুশিরা মোটা দড়ির মতো হয় ও নার্ভে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন দাগ না থেকেও স্থানটি শুধু অসাড় হয়, নার্ভ মোটা হয় ও চাপ দিলে ব্যথা বোধ হয়। এদের অসংক্রামক কুষ্ঠ (Pauci-Bacillary Leprosy বা পি. বি. কুষ্ঠ) বলা হয়। সমস্ত কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে এরা সংখ্যায় প্রায় শতকরা আশি ভাগ। এরা সাধারণতঃ রোগ ছড়ায় না। এসব রোগীদের চামড়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করলে কুষ্ঠ-জীবাণু প্রায়ই পাওয়া যায় না। তবে ভাল হয়ে যাওয়া কুষ্ঠ-রোগীরও অসাড়তা, চুলকানি-হীন অসাড় দাগ ও মোটা নার্ভ থাকতে পারে। কারণ, নষ্ট হয়ে যাওয়া নার্ভ সক্রিয় হতে ও চামড়ার রঙ (Melanin Pigment) ফিরে আসতে সময় লাগে।

রোগের সক্রিয়তা থাকলে অর্থাৎ অসাড়তা, দাগ হওয়া ও নার্ভ-স্ফীতি বাড়তে থাকলে, মোটা নার্ভে চাপ দিতে ব্যথা বোধ হলে এবং পরীক্ষায় কুষ্ঠ-জীবাণু পাওয়া গেলে চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।

অধিকাংশ লোকের কুষ্ঠ-প্রতিরোধক্ষমতা থাকলেও প্রায় এক শতাংশ লোকের এই ক্ষমতা খুব কম (Lepromin Test Result Negative)। কুষ্ঠ-জীবাণু এদের দেহে প্রবেশ করলে সংক্রামক কুষ্ঠ (Multi-Bacillary বা এম. বি. কুষ্ঠ) হয়। এদের লক্ষণ—দেহের নানা স্থানে চামড়ায় ছোট-বড়-মাঝারি লালচে ফোলা ভাব থাকে। এগুলিতে চুল থাকে ও ঘামে। স্থানটি তেলতেলে চকচকে মসৃণ (Smooth, Oily, Shiny—S. O. S.)। দাগের সীমানা ভাঙা হয় (প্রতিরোধক্ষমতা না থাকায় চামড়া আক্রান্ত হয়েই চলে)। কানের লতি মোটা ও বড়, কানের পিছনে ও সামনে গুটি হয়। ভ্রূর চুল পড়ে যেতে পারে। আক্রান্ত শরীরাংশ ঠাণ্ডা এবং সেখানে ব্যথার অনুভূতি কমতে পারে। নার্ভ মোটা হয় ও চাপ দিলে ব্যথা হতে পারে। আক্রান্ত চামড়ার রস ও নাকের শ্লেষ্মা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে তাতে প্রচুর জীবাণু দেখা যায়। কুষ্ঠরোগীদের

১৫-১৬ শতাংশ এই শ্রেণীভুক্ত। এরা কুষ্ঠ-রোগজীবাণু ছড়ালেও বর্তমানে প্রচলিত বহু-ঔষধ চিকিৎসায় (Multi-Drug Treatment বা MDT) রিফ্যাম্পিসিন (Rifampicin), ক্লোফাজিমিন (Clofazimine) ও ড্যাপসোন (Dapsone)—এই তিনটি ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় বিশেষজ্ঞ-নির্দেশিত নিয়মে খেলে সত্বর রোগ-সংক্রমণক্ষমতা নষ্ট হয় ও দু-তিন বছর ধরে চিকিৎসা করালে নীরোগ হয়। তবে নীরোগ না হওয়া পর্যন্ত শিশুদের রোগীর নিকটে রাখা বা রোগীর সন্তান হওয়া বর্জনীয়।

কুষ্ঠ-রোগজীবাণু রোগী থেকে কিভাবে ছড়ায় ও কোন্ পথে সুস্থ মানবদেহে প্রবেশ করে তা সকলের জানা প্রয়োজন ঃ

(ক) শ্বাসপথে—হাঁচি-কাশির শ্লেষ্মার সঙ্গে যক্ষ্মা, হাম, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাম্পস, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি রোগের জীবাণুর মতো কুষ্ঠ-জীবাণুও ছড়ায় ও পাশের লোকের শ্বাসপথে প্রবেশ করে। সেজন্য হাঁচতে কাশতে (বিশেষতঃ শিশু-কোলে) নাকে মুখে চাপা দেওয়ার অভ্যাস করা দরকার ; ঘরে এবং বাসে লোকসংখ্যা বেশি হলে জানালা খোলা রাখা দরকার।

(খ) চর্মপথে—দাদ, পাঁচড়া, চুলকানির মতো কুষ্ঠ ছড়ায়। নাপিতের ক্ষুরে কামালে, কামানো অংশে নাপিতের বহুজন-ব্যবহৃত ফটকিরি না দিয়ে ডেটল-জল বা সাবান দিয়ে ধুলে কুষ্ঠ সহ অনেক চর্মরোগ নিবারিত হয়। তবে কুষ্ঠরোগীর ব্যবহৃত পোশাক ও আসবাব, ইনজেকশনের সূঁচ এবং মশা ও ছারপোকার মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ ছড়াবার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

(গ) খাদ্য মাধ্যমে—ডায়েরিয়া, আমাশয় ও রক্ত-আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা, জন্ডিস্, পোলিও ইত্যাদির জীবাণু রোগীর মল-মূত্রের সাথে নির্গত হয় এবং তা জল, খাদ্য, পানীয় ও মাছি বাহিত হয়ে সুস্থ দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু জল ও খাদ্যের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ ছড়ায় না।

কুষ্ঠরোগ বংশগত নয়, অর্থাৎ মায়ের এই রোগ থাকলেও শিশু কুষ্ঠ নিয়ে জন্মায় না। পাপ বা অভিশাপে কুষ্ঠ হয় না। কুষ্ঠ সারে, তাই এই রোগের অজুহাতে চাকরি যায় না বা বিবাহ-বিচ্ছেদও হয় না। কুষ্ঠরোগীদের ঘৃণা করা বা এক-ঘরে করা উচিত নয় ; তাতে তারা রোগ গোপন করে, অচিকিৎসায় ও কুচিকিৎসায় সেই রোগ ছড়ায় এবং রোগীদের অঙ্গবিকৃতি হতে পারে। কুষ্ঠের টিকা নেই। শুরুতে রোগ নির্ণয় এবং সুচিকিৎসায় সব রোগই সেরে যায়। আমাদের সকলেরই মাঝে মাঝে দেখা উচিত, দেহে কোথাও চুলকানি-হীন দাগ বা অসাড়তা আছে কিনা। সন্দেহ হলে স্বাস্থ্যকর্মী বা কুষ্ঠরোগ-সেবীদের দেখানো উচিত। কুষ্ঠের চিকিৎসা সারা দেশে বিনা খরচে দেওয়া হয়। ভারতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গে চার লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে।

জাতীয় কুষ্ঠ উচ্ছেদ প্রকল্পে (National Leprosy Eradication Programme—N. L. E. P.) প্রতি চার-পাঁচ লাখ জনে একটি করে কুষ্ঠ-চিকিৎসাকেন্দ্র (Leprosy Control Unit) আছে। এখানে একজন ডাক্তার, এক থেকে চারজন পরিদর্শক (Non-Medical Supervisor—N. M. S.), কুড়িজন কর্মী (Para-Medical Worker—P. M. W. যাদের Health Assistant Leprosy-ও বলে), একজন ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ান (Laboratory Technician) থাকেন। এঁরা সকলেই কুষ্ঠ বিষয়ে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত। এঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন কুষ্ঠকেন্দ্রে কাজ করেন, স্কুলে ও ক্লাবে যান, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুষ্ঠ-প্রতিরোধ শিক্ষা দেন। এঁদের কাজ হলো রোগী অনুসন্ধান করে রোগ সম্বন্ধে শিক্ষাদান ও চিকিৎসাদান (Survey, Education, Treatment—S. E. T.)। প্রতি ইউনিটে মাইক্রোস্কোপ ও গাড়ি আছে।

অবশ্যই জানা উচিত, দাগ হলেই তা কুষ্ঠ নয়। ছুলি, দাদ, অন্যান্য চর্মরোগ, অপুষ্টি এবং পেটে কৃমির জন্য দাগ হতে পারে। জনগণের কোন অসুবিধা হলে আঞ্চলিক বা জেলার কুষ্ঠকেন্দ্রের অফিসার (Zonal or District Leprosy Officer), (C. M. O. H.), পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কুষ্ঠকেন্দ্র বা তাদের জন-প্রতিনিধিকে সরাসরি কিংবা পোস্টকার্ডে জানাতে পারেন। □

গ্রন্থ-পরিচয়

বেদান্তের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী

অণিমা ধর

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী ও বেদান্ত বচন : স্বামী বেদান্তানন্দ। প্রকাশক : উমাপদ মিত্র, রোড নং ৮/এ, রাজেন্দ্র নগর, পাটনা-৮০০০১৬। মূল্য : ছয় টাকা।

আলোচ্য পুস্তিকাটির শিরোনাম হইতেই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সনাতন ধর্মই নবরূপে মূর্ত হইয়া বর্তমান বিশ্বমানবকে আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করিবার প্রেরণা দিতেছে। এই সনাতন ধর্মের মূল হইল বেদ এবং ইহার চরম উপলব্ধি বেদান্ত বা উপনিষদ্। ভারতের বেদ-ভিত্তিক সকল দার্শনিক গোষ্ঠীই তাঁহাদের নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে বেদান্তের বচনের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সাধনা এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতি যে বেদ-বেদান্তের উপলব্ধিরই অনুরূপ তাহা আমরা তাঁহার উদার ভাবময় দিব্যজীবন এবং সেই সকল ভাবপ্রকাশক বাণীসমূহ হইতে বুঝিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যতঃ শাস্ত্রপাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার দিব্য অনুভূতিই ছিল শাস্ত্রে প্রতিফলিত সত্যের সহিত অভিন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি-প্রসূত বাণী বেদান্তের বাণীর সহিত যে অভিন্ন তাহাই এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর, ব্রহ্ম, মায়া, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্ন্যাস, কর্মযোগ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, পাপ-পুণ্য, অবতার, পরমহংস প্রভৃতি বিষয়ে যেসব উক্তি করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিই বেদ-বেদান্তের কোন-না-কোন স্থানে উল্লিখিত আছে। তাহাই দেখাইয়া গ্রন্থকার স্বামী বেদান্তানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর বেদান্ত-ভিত্তিকতাকে প্রমাণ করিয়াছেন।

পুস্তিকাটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার সূত্র ধরিয়া সুদীর্ঘ গবেষণা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর উৎস-সন্ধানে গ্রন্থকারের প্রয়াস প্রেরণাপ্রদ এবং আমাদের ন্যায় সাধারণ পাঠকের নিকট আনন্দদায়ক ও কল্যাণকর হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর অনুধাবনে ও আধ্যাত্মিক মূল্যায়নে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম।

অধীর মুখোপাধ্যায়

মণিমঞ্জুষা : ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার সঙ্কলিত। প্রকাশক : নরেশচন্দ্র মিত্র, ১৮ পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলকাতা-২৯। মূল্য : দশ টাকা।

লেখক বহু ধর্মগ্রন্থ থেকে ২১১টি মূল্যবান শ্লোক চয়ন করেছেন। প্রতিটি শ্লোকের মূল সংস্কৃত এবং তার অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। অনুবাদ সহজ ও বোধগম্য। প্রতিটি শ্লোক কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, তা জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট আকর-গ্রন্থের নাম, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা দিয়ে। তবে উৎসগ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত নাম বিদ্বান পাঠকের বুঝতে অসুবিধা না হতে পারে, কিন্তু সংকলনের প্রথমে বা শেষে 'গ্রন্থগুলির (সংক্ষিপ্ত নাম ও সম্পূর্ণ নাম-সহ) একটি তালিকা দিলে সাধারণ পাঠকের সুবিধা হতো।

সংকলনের শ্লোকগুলি খুবই সুন্দর। তবে বিষয় অনুযায়ী (বিষয় উল্লেখ করে) সাজানো হলে মনে রাখবার ও খুঁজে নেবার পক্ষে আরও সুবিধা হতো।

সংস্কৃত শ্লোকের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এরকম ছোট পুস্তকের খুবই প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে যখন সংস্কৃত না জানা বিদ্বানের সংখ্যা ক্রমশই দেশে বাড়ছে।

বেদান্তের একটি প্রকরণ গ্রন্থ

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

শ্রীশ্রীশান্তিগীতা : রামপদ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : অনিলহরি চট্টোপাধ্যায়। ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭-বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২। মূল্য : চল্লিশ টাকা।

পাণ্ডব-বংশধর মহারাজ শতানীক মন্ত্রিগণ পরিবেষ্টিত হয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় মহামুনি শান্তব্রত রাজসভায় উপস্থিত হলে তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে তিনি পাদ্য-অর্ঘ্যাদি প্রদান করলেন। উভয়ের কুশলাদি বিনিময়ের পর রাজা শতানীক ঋষি শান্তব্রতকে বললেন : হে মুনে, পূর্বে একবার আপনার মুখে সুধামাখা তত্ত্বকথা শুনেছিলাম, এখন আবার আপনার মুখে এমন তত্ত্বকথা শুনতে ইচ্ছা করি যা শুনে আমার জীবন সার্থক হবে। মুনি রাজার তত্ত্বকথা শোনার আন্তরিক ইচ্ছা দেখে আত্মতত্ত্বপূর্ণ 'শান্তিগীতা' তাঁকে শুনিয়েছিলেন।

এই শান্তিগীতা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অভিমন্যু-বধে যখন অর্জুন অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের শোক নিবারণের জন্য যে-সকল উপদেশ দিয়েছিলেন তা-ই 'শান্তিগীতা'। শান্তব্রত মুনি এই গীতা তাঁর গুরুর নিকট শুনেছিলেন। গ্রন্থের এই পটভূমিকা থেকে মনে হতে পারে 'শান্তিগীতা' মহাভারতের অংশ। কিন্তু তা নয়। এটি কোন পুরাণের অন্তর্ভুক্তও নয়। শান্তিগীতা অদ্বৈতবেদান্তের একটি স্বতন্ত্র প্রকরণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অনুবাদক রামপদ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থের মুখবন্ধে এবিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছেন : "শান্তিগীতা অদ্বৈতবেদান্তের অতি উপাদেয় প্রকরণ গ্রন্থ। মনে উদয় হইয়াছিল যে, উহা হয়তো কোন পুরাণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও উহার মূল খুঁজিয়া পাই নাই। সম্ভবতঃ ইহা কোনও পুরাণের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ।" এই 'শান্তিগীতা'ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতো শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে কথোপকথনের ছলে রচিত। এই গীতার মূল রচয়িতা কে তা-ও জানা যায় না।

'শ্রীশ্রীশান্তিগীতা' অদ্বৈতবেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ হওয়ায় এর বিষয়বস্তু হলো—ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু। আর দৃশ্যমান জগৎ মায়ার দ্বারা অভিব্যক্ত প্রাতিভাসিক সৎ মাত্র। সুতরাং জগতের অন্তর্গত শোক-মোহ, সুখ-দুঃখ সবই পরমার্থতঃ মিথ্যা। দেহাত্মবোধরূপ ভ্রান্তিবশতই জীবের শোক-মোহ, সুখ-দুঃখের উৎপত্তি। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মার স্বরূপ জ্ঞানেই মিথ্যা শোক-মোহাদি নিবারিত হয়।

উক্ত তত্ত্ব মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও আত্মার স্বরূপ, মায়া বা অজ্ঞানের স্বরূপ, জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভের উপায় (সাধন), জীবন্মুক্তের ব্যবহার, কর্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি নিয়েও সুন্দর আলোচনা আছে। এই দুরূহ বিষয়গুলির সুন্দর ও সরল ব্যাখ্যা করেছেন অনুবাদক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। যদিও বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সাধুভাষায় লেখা হয়েছে তথাপি ভাষার সারল্যে তা পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য মনে হবে না। কঠিন বিষয়গুলিও পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন। ব্যাখ্যায় নানা শাস্ত্রগ্রন্থ ও উপনিষদ্ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি থাকায় ব্যাখ্যার সৌকর্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকও এতে বিশেষ লাভবান হবেন। স্থানে স্থানে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রয়েছে। তবে পুস্তকের শেষাংশে একটি 'শুদ্ধিপত্র' সংযোজিত হওয়ায় সেই প্রমাদ অনেকটা স্খালন হয়েছে। পুস্তকের বাঁধাই ভাল। তবে গ্রন্থের আকার অনুযায়ী মূল্য একটু অধিক বলে বোধ হয়। □

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৫ মে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন **জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের** প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন বিশেষ পূজা, হোম ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে ৭০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর আশ্রমের কর্মিবৃন্দ কর্তৃক 'মানুষের ঠাকুর' যাত্রা অভিনীত হয়।

গত ১০ থেকে ১২ মে **নারায়ণপুর আশ্রম (মধ্যপ্রদেশ)** মধ্যপ্রদেশ সরকারের উপজাতি কল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে তিনদিনের এক কর্মশালা পরিচালনা করে। এই কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, লোককাহিনী প্রভৃতি রচনা ও চিত্রাঙ্কন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। মধ্যপ্রদেশের উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলিরাম কাশ্যপ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

গত জুন মাসে **গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে** ধর্মীয় আলোচনা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা করেছেন ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শিবজীবন ভট্টাচার্য এবং স্বামী রসজ্ঞানন্দ। এছাড়া বিভিন্ন দিনবিশেষ ভাষণগুলি দিয়েছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সীতানাথ গোস্বামী এবং দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য। গত ৬ জুন ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণীর ওপরে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং মস্কোর ভারততত্ত্ববিদ্ ডঃ আর. বি. রিবাকভ। এছাড়া গত ১৩ এবং ২৭ জুন বিবেকানন্দ পাঠচক্রের দুটি নিয়মিত অধিবেশন পরিচালনা করেন সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী।

রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন শাখাকেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার **শিকড়া-কুলীনগ্রামে** রামকৃষ্ণ মিশনের একটি নতুন শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। শাখাকেন্দ্রটির নাম **'রামকৃষ্ণ মিশন, শিকড়া-কুলীনগ্রাম'**। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শিকড়া-কুলীনগ্রামে স্বামী ব্রহ্মানন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

পরিদর্শন

গত ৭ মে উড়িষ্যার রাজস্বমন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ নায়েক শংকরজয়ন্তী উপলক্ষে **পুরী রামকৃষ্ণ মিশন** পরিদর্শন করেন। ঐদিন তিনি পুরী মঠ কর্তৃক পরিচালিত গত চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবিরে যেসকল রোগীর ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, তাদের চশমা বিতরণ করেন।

গত ১১ মে ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা **বিবেকনগর (আমতলী)** আশ্রম এবং গত ১৩ মে ত্রিপুরার রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডি আগরতলা আশ্রম পরিদর্শন করেন।

ত্রাণ

মস্কো দুর্গতত্রাণ

মস্কো শহর ও তার আশপাশের দুর্গতদের মধ্যে বিতরণের জন্য দ্বিতীয় দফায় প্রেরিত ১০০০ কিলোঃ গুঁড়ো দুধ, ৯৬০ কিলোঃ শিশুখাদ্য এবং ৯০০ কিলোঃ চিনি বিমানযোগে মস্কোতে গিয়ে পৌঁছেছে। এই নিয়ে মস্কোতে প্রেরিত দ্রব্যের মোট পরিমাণ ঃ গুঁড়ো দুধ—৩ টন, শিশুখাদ্য—৩ টন এবং চিনি ২.৯ টন।

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিত্রাণ

বাঁকুড়া আশ্রমের মাধ্যমে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের জোরথল, রামপুর ও শিউলিবনা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ২১টি পরিবারকে ৭০০ কিলোঃ চাল এবং ৩৬১ কিলোঃ অন্যান্য দ্রব্য দেওয়া হয়েছে।

রাজস্থান খরাত্রাণ

খেতড়ি আশ্রম গত ২৪ এপ্রিল থেকে ১৭টি শিবিরের মাধ্যমে দৈনিক ১২০৯ জন শিশুকে (বয়স ১—৫) দুগ্ধ বিতরণ করছে।

পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গ

জলপাইগুড়ি জেলার রায়গঞ্জ ব্লকে গত ঘূর্ণি-ঝড়ে যেসব বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' প্রকল্পের মাধ্যমে সেসব বাড়ির পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে।

উত্তরপ্রদেশ

উত্তরকাশী জেলায় ভূমিকম্পে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত বহু পরিবারের জন্য বসতবাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাড়িগুলি এমন নক্সায় তৈরি হবে যাতে এদের নির্মাণ-খরচ অত্যধিক না হয় অথচ এগুলি ভূমিকম্প-প্রতিরোধক হয়।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া (স্যানফ্রান্সিস্কো): গত মে মাসের প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। প্রতি শনিবার স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশাবলীর ওপর আলোচনা হয়েছে। ২৭ জুন রাত ৮টায় ভক্তি-গীতির অনুষ্ঠান হয়েছে। বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে ৭ জুন এই বেদান্ত সোসাইটির নতুন মন্দিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রতি শুক্রবার রাত ৮টায় পুরনো মন্দিরে স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ যোগ-সূত্রের ক্লাস নিচ্ছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন: গত ৭ ও ১৪ জুন রবিবার ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ এবং ২১ ও ২৮ জুন রবিবার ভাষণ দিয়েছেন শিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির স্বামী চিদানন্দ। ১৯ জুনের অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন অবলম্বনে শিশু-শিল্পীরা অভিনয় করে। মঙ্গলবার-গুলিতে 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী ভাস্করানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস: গত জুন মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মীয় ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ। প্রতি মঙ্গলবার তিনি মুণ্ডক উপনিষদের ক্লাস নিয়েছেন এবং প্রতি বৃহস্পতিবার 'শ্রীরামকৃষ্ণ দ্য গ্রেট মাস্টার' পাঠ ও আলোচনা করেছেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্ক: মে মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ। প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার তিনি যথাক্রমে ভগবদ্গীতা ও 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা): জুন মাসের প্রথম রবিবার সাধুসঙ্গ সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় রবিবার যুবক-যুবতীদের জন্য আলোচনা-চক্র ও প্রশ্নোত্তর পরিচালনা, তৃতীয় রবিবার গীতা এবং চতুর্থ রবিবার 'গস্‌পেল অব রামকৃষ্ণ' বিষয়ে আলোচনা করেছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি যুবক-যুবতীদের জন্য যে বিশেষ বিভাগটি শুরু হয়েছে তা ক্রমেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভারতীয় দর্শন এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন সম্পর্কে এই বিভাগে নিয়মিত আলোচনা হচ্ছে। ৬ জুন সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় এক উচ্চাঙ্গের নৃত্যানুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন আচার্য গঙ্গাধর প্রধান ও ডঃ মিনতি মিশ্র। ১৩ জুন বিবেকচূড়ামণি ও ২৭ জুন কঠ উপ-নিষদের ক্লাস নিয়েছেন স্বামী প্রমথানন্দ। ২০ জুন রামনামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন। ☐

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ত্রিগুণাতীত সেবাশ্রম, নাওরা (পোঃ বোদরা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব এবং আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। নগর পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, যুবসম্মেলন প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বামী পুরাতনানন্দ। মোট ৪০০ ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে যোগদান করেছিল। বিকালে স্বামী সৎপ্রেমানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন স্বামী পুরাতনানন্দ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ, কৃষ্ণকান্ত দত্ত ও আলপনা মণ্ডল। উৎসব উপলক্ষে ঐদিন সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী এই আশ্রম পরিদর্শন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম, কোতরং (হুগলী)ঃ গত ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী ও আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন শোভাযাত্রা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন পূজা, পাঠ, হোম, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন নতুন মন্দিরে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করেন স্বামী জিনানন্দ। দুপুরে প্রায় দু-হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শেখরানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, স্যাণ্ডেলের বিল (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ২ ফেব্রুয়ারি '৯২ এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের ১৩০তম জন্মোৎসব ও আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনব্যাপী উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল পূজা, গোষ্ঠী আলোচনা ও ধর্মসভা। বিভিন্ন গোষ্ঠী আলোচনা পরিচালনা করেন রামগোপাল বিশ্বাস, শ্যামল সরদার, ডঃ শশাঙ্ক মণ্ডল, ডঃ সুরেশ কুইতি এবং ডঃ অরুণ দাশ। অপরাহ্ণে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুশান্ত দত্ত (সুরপীঠ, কলকাতা)। বিকালে ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী দিব্যানন্দ। সন্ধ্যায় 'লোকজননী সারদা' নাটিকাটি পরিবেশন করে কনকনগর সৃষ্টিধর ইনস্টিটিউশানের ছাত্রীগণ। প্রায় তিনহাজার নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন ও বসে প্রসাদ পান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদাসঙ্ঘ, রামপাড়া (হুগলী)ঃ গত ১২ জানুয়ারি সঙ্ঘের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রভাতফেরীর আয়োজন করা হয়। সকাল ৮টায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদাসঙ্ঘের প্রাঙ্গণ থেকে পরিক্রমা আরম্ভ হয় এবং বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে বেলা ১১টায় শেষ হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের সম্পাদক নিমাইচন্দ্র মান্না, ডঃ প্রফুল্লশঙ্কর ধর, পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। শোভাযাত্রায় ৩০২ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। সভাশেষে অংশ-গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের জলখাবার দেওয়া হয়।

জাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (জেলা—কটক, উড়িষ্যা)ঃ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সপ্তম বার্ষিক উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কোস্টাবনিয়া হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভা, বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ। পনেরোটি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা স্বামীজী বিষয়ক বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করে। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন অধ্যাপক তত্ত্বকন্দর মিশ্র। শরৎচন্দ্র জেনা স্বাগত ভাষণ দেন। সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ। এই দিন জাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের কোস্টাবনিয়া শাখার উদ্বোধন করা হয়। পরদিন জাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের সহযোগিতায় জাজপুর শহরের সন্নিহিত বপাশী গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। সভায় স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, শরৎচন্দ্র জেনা প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর ওপর ভাষণ দেন। এই উৎসবে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘঃ গত ১৩-১৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক স্মরণোৎসব বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম ও তৃতীয় দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন যথাক্রমে প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত যুবোৎসবে অংশগ্রহণকারী ৪৬ জন প্রতিযোগীকে ঐদিন পুরস্কার প্রদানও করেন। উৎসবের শেষদিন প্রায় ছয় হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উৎসব উপলক্ষে সেবা সঙ্ঘের সেলাই প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রের দুঃস্থ ছাত্রীদের তৈরি পোশাকের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ১৯ জানুয়ারি **বিজয়গড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রমের** উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনে তিনটি অধিবেশনে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দ, স্বামী ভৈরবানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ এবং স্বামী বলভদ্রানন্দ। বৈকালিক অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পরিচালনা ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের পরিচালনায় সমবেত সঙ্গীত এবং সেবাশ্রমের সদস্যাদের দ্বারা ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়।

গত ১৫, ১৬ এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি '৯২ **শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘের (বোকারো স্টিল সিটি, বিহার)** আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিহার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী সুহিতানন্দ, স্বামী আত্মাবিদানন্দ, স্বামী উমানন্দ এবং স্বামী নির্লেপানন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাইভেট আশ্রমগুলির সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ যোগদান করেন। প্রথম দিন ভক্তসম্মেলনে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন, কর্মযোগ প্রভৃতির ওপর আলোচনা হয়। 'ভাবপ্রচার এবং ভাবপ্রচার কার্যে প্রাইভেট আশ্রমগুলির ভূমিকা' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান বিভিন্ন আশ্রমের সদস্যগণ। দ্বিতীয় দিন যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। বোকারো স্টিল প্ল্যান্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম. আর. আর. নায়ার সঙ্ঘের কল্যাণ ভবনের শিলান্যাস করেন। শ্রীমতী নায়ার পুরস্কার বিতরণ করেন। তৃতীয় দিনে বোকারো সঙ্ঘ পরিচালিত অনৌপচারিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্কুলের পরিচ্ছদ, ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করেন স্বামী প্রভানন্দ। তিনি তাঁর ভাষণে ভাবপ্রচার পরিষদের ইতিহাস ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ও পরিষদের আহ্বায়ক সমরেশকুমার নিয়োগী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, হালিশহরঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি '৯২ প্রভাতফেরীর মাধ্যমে বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণোৎসবের সূচনা হয়। সকাল ৮টায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও হোম, দুপুর ১২টায় প্রায় ৮০০ জন নর-নারীর মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ ; বিকালে অমর পড়ুই ও সম্প্রদায় কর্তৃক সমবেত সঙ্গীত ও পরে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন স্বামী কমলেশানন্দ এবং বক্তা ছিলেন ডঃ তাপস বসু। সন্ধ্যারতির পরে হাওড়ার শিবপুর প্রফুল্ল তীর্থ গীতিনাট্য পরিবেশন করে।

গত ৩-৭ জানুয়ারি কলকাতার হাজরা রোডের মহারাষ্ট্র নিবাসে **শ্রীসারদা সঙ্ঘের** ২৮তম সর্ব-ভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩ জানুয়ারি বিকাল ৫টায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের বিবেকানন্দ হলে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ ধর্মশীলা ভয়ালকা। সভানেত্রী ছিলেন শ্রীসারদা সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভানেত্রী স্নেহময়ী মহাপাত্র। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীসারদা সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদিকা সুভদ্রা হাজারা। ৪ ও ৫ তারিখের অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তভাবনা বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে প্রব্রাজিকা অচিন্ত্যপ্রাণা ও ডঃ জয়শ্রী ব্যানার্জী। দুদিনই সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান হয়। ৬ ও ৭ তারিখ প্রতিনিধিগণকে বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কামারপুকুর, জয়রামবাটী প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানের ৩১টি শাখা থেকে মোট ১৮৮ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এই উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়।

নিবেদিতা পুরস্কার

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম গত ২৯ এপ্রিল এক অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদারকে নিবেদিতা পুরস্কার প্রদান করে। শ্রীমজুমদার দীর্ঘদিন ধরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিমলাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণ করেন বিমল ঘোষ, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষ, অসীম দত্ত, বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, শংকরীপ্রসাদ বসু প্রমুখ। এই উপলক্ষে 'বসে আঁকো' চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগিদেরও পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারের সুদৃশ্য ফলকটি নির্মাণ করেন শিল্পী অধ্যাপক নিত্যানন্দ ভকত।

গত ১ মার্চ এই আশ্রম বিবেকানন্দ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বিশিষ্ট অস্থিচিকিৎসক ডাঃ এম. এস. ঘোষকে তারাপদ বসু পুরস্কার প্রদান করে। অনুষ্ঠানে 'তারাপদ বসু ভাষণ' দেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, বিমল ঘোষ প্রমুখ।

চিকিৎসা-শিবির

শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে (রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, উত্তর ২৪-পরগনা) গত ২৯ মার্চ এক বিনাব্যয়ে চিকিৎসা-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শল্য, চক্ষু, নাক-কান-গলা, মেডিকেল ও স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শ, ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ দেওয়া হয়। প্রয়োজনবোধে দুঃস্থ রোগীকে বিনাব্যয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হয়। ডাঃ কমলকৃষ্ণ দাঁ, ডাঃ অনিলকুমার আঢ্য, ডাঃ হারাধন মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ নীলিমা মাইতি শিবির পরিচালনা করেন। আশ্রমের সভাপতি ডাঃ সুধীরকুমার রাহা ও স্বেচ্ছাসেবী আশ্রম-সদস্য ডাঃ নির্মল কর্মকার চিকিৎসাকার্যে সক্রিয় সহায়তা করেন। আশ্রমের অন্যান্য কর্মিবৃন্দ শিবির পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। মোট ১৭১জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। শিবিরের উদ্বোধক স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবাদর্শে অনুষ্ঠিত এই দাতব্য চিকিৎসা-কর্মসূচীর প্রশংসা করেন। এটি ছিল এই আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত দশম চিকিৎসা-শিবির। উল্লেখ্য, সপ্তাহে তিনদিন হোমিওপ্যাথি এবং প্রতি রবিবার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র-সহ বিনাব্যয়ে ঔষধ দেওয়া হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **সতীশচন্দ্র তালুকদার** নদীয়া জেলার রাধানগরে (কৃষ্ণনগর) গত ২২ নভেম্বর '৯১ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সেবামূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **দীনেশচন্দ্র মজুমদার** তাঁর ভদ্রেশ্বরের সারদাপল্লীস্থ বাসভবনে গত ৩০ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত প্রয়াত মজুমদার রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু সন্ন্যাসীর, বিশেষতঃ স্বামীজীর শিষ্য জ্ঞান মহারাজের স্নেহধন্য ছিলেন। ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লীতে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **মহাদেব সাহা** গত ১ নভেম্বর '৯১ ৫৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বস্ত্রশিল্প ব্যবসায়ী সমিতি এবং হরিদাস মার্কেট হকার্স এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি একজন ক্রীড়াপ্রেমী ও জনদরদী ব্যক্তি হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **সাবিত্রী দাস** গত ২৩ সেপ্টেম্বর '৯১ কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রায় পাঁচবছর ধরে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তাঁর স্বামী গৌরীশংকর দাসও একই গুরুর নিকট দীক্ষালাভ করেছেন। □

বিজ্ঞান-সংবাদ

যেসব শারীরিক ব্যাধি চিকিৎসাশাস্ত্রে ধরা যায় না

ডাক্তারের কাছে প্রায়ই এমন রোগী আসেন, যাঁদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে অসুখের কোন কারণ ধরা পড়ে না। যেসব লক্ষণ নিয়ে রোগীরা সাধারণতঃ আসেন, সেগুলি হলো—পেটে ব্যথা, পাতলা দাস্ত, মাথাধরা, পিঠে ব্যথা, গাঁটে ব্যথা, বুকে ব্যথা, বুক ধরফর করা এবং ক্লান্তি। এইসব লক্ষণগুলিকে 'ফাংকশন্যাল' (functional —দেহাংশের ক্রিয়াবৈগুণ্যজাত, মৌলিক গঠনজনিত নয়) বা ঐরকম কোন নামে অভিহিত করা হয়।

এই ধরনের বেশির ভাগ রোগীকে লক্ষণ অনুযায়ী (symptomatic) চিকিৎসা করা হয়। এইসব লক্ষণগুলির অধিকাংশই সাময়িক এবং সাধারণ চিকিৎসায় সেরে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ডাক্তারি অনুসন্ধানে বেশ কিছু রোগীর কোন রোগ ধরা পড়ে না এবং তাঁদেরকে বোঝানো সত্ত্বেও বহুদিন ধরে তাঁরা ভুগতে থাকেন। এই 'রোগনির্ণয় ধাঁধা'গুলির (diagnostic puzzles) চিকিৎসা সত্যিই কঠিন। ঐসব রোগ ও রোগীদের পিছনে যথেষ্ট অর্থব্যয় হলেও কিছু ফললাভ হয় না। রোগীদের অধিকাংশ খুব খরচসাপেক্ষ অশাস্ত্রীয় চিকিৎসা নিতে আরম্ভ করেন কিন্তু তাতেও কিছু সুবিধা হয় না।

এই ধরনের অধিকাংশ রোগীদের রোগলক্ষণ সাধারণতঃ একটিই থাকে, কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যকের লক্ষণ অনেকগুলি থাকে এবং তাঁরা বহুদিন ধরে বহু চিকিৎসকের কাছে যাওয়া-আসা করেন।

অনেকদিন ধরে এইসব রোগীকে লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, রোগের প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসক যদি কোন সাংঘাতিক ধরনের কারণ না পান, তাহলে পরেও এঁদের দেহে তা পাবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য ডাক্তারদের সবসময় চিন্তা থাকে, পাছে অন্তর্নিহিত কোন কারণ নির্ণয় করতে তাঁরা অক্ষম হয়ে থাকেন। কিন্তু এঁদের রোগনির্ণয় করা খুব বাড়াবাড়ি ধরনের হয় এবং লক্ষণগত চিকিৎসাও খুব বেশি হয়। যদি অসুখের কোন দেহগত কারণ ধরা পড়ে সাধারণতঃ তা সামান্য ধরনের—যেমন বুকে ব্যথার কারণ কণ্ঠনালীর স্ফীতি (aesophagastis)। কারও কারও রোগের কারণ মানসিক উদ্বেগ বা সামান্য কিছু হওয়াকে বড় করে দেখা, ক্লান্তি, হৃৎপিণ্ডের অধিক গতি, আগে হয়ে যাওয়া অসুখের ভীতি প্রভৃতি। চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাত্রার চাপ—এগুলিও রোগের কারণ হিসাবে আসে। পরিবারে আগে কারও হৃৎপিণ্ডের অসুখ হয়ে থাকলে বুকে সামান্য ব্যথাকেও বড় করে দেখা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। আবার বিপরীতভাবে, অন্তর্নিহিত সাংঘাতিক অসুখের ওপরের লক্ষণ [যেমন করোনারি অসুখে বুকে অস্বাভাবিক (a typical) ব্যথা] এই পর্যায়ে পড়তে পারে।

রোগের কারণ অনুসন্ধান না করে রোগীকে এ-ডাক্তার ও-ডাক্তারের কাছে পাঠান এবং অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ানো না হওয়াই ভাল।

এই ধরনের রোগীকে খোলাখুলি ভাবে বোঝানো হলে, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করলে এবং রোগ ভাল হওয়ার আশ্বাস দিলে তাঁরা খুশি হন। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এঁদেরকে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতেই হয়, তবে মুশকিল হচ্ছে যে, কোন কোন মনোরোগবিশেষজ্ঞ দৈহিক রোগলক্ষণ সম্বন্ধে তত অভিজ্ঞ নাও হতে পারেন।

এই ধরনের রোগীরা খানিকটা অবহেলিত হয়েছেন। এঁদের সংখ্যাধিক্য, শারীরিক অক্ষমতা এবং এঁদের জন্য প্রচুর খরচ—এসব বিষয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে এবং সে-ধরনের চিন্তা এখন হচ্ছেও। ☐

[**British Medical Journal, 7 September 1991**]

স্বামীজীর প্রত্যাশা

আমরা নিজেরা উদ্বোধনের গ্রাহক হলাম—এটাই বড় কথা নয়; আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—সকলেই যাতে উদ্বোধনের গ্রাহক হতে পারে, সে-বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। কারণ, এটাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাশা। তিনি চেয়েছিলেন, বাঙালীর ঘরে ঘরে উদ্বোধন পড়া হোক।

উদ্বোধনের এখন ৯৪তম বর্ষ চলছে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই উদ্বোধন শতবর্ষে পদার্পণ করবে। শতবর্ষপূর্তি বর্ষে উদ্বোধন সম্পর্কে স্বামীজীর সেই প্রত্যাশার কতখানি আমরা পূর্ণ করতে পারব, তারই পরীক্ষা।

উদ্বোধন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আসুন, আপনি, আমি, আপনারা, আমরা সমবেতভাবে স্বামীজীর প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করি।

বিনীত

জনৈক ভক্ত

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে।... প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির মৃত্যুও ঘটে।... যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

সর্বদার তরে জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি?… আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিত হয়ে থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণে রেখো যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

মানুষ মূর্খের মতো মনে করে—স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে পারে। বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে না; জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে, সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।... তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভালকাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

এই জীবন ক্ষণ-ভঙ্গুর, জগতের ধন, মান, ঐশ্বর্য—সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

অমৃতকথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয় ? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন ? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন ?

স্বামী বিবেকানন্দ

He who served and helped one poor man seeing Śiva in him, without thinking of his caste, creed or race or anything, with him Siva is more pleased than with the man who sees Him only in image.

Swami Vivekananda

পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

The only God to worship is the human soul in the human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of temples. If I cannot worship in that, no other temple will be of any advantage.

Swami Vivekananda

জগতের ইতিহাস হইল—পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস। আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—অনুভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাত। যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচিপত্র

৯৪তম বর্ষ ভাদ্র ১৩৯৯

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ চুয়াল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঞ্চাশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ এক হাজার টাকা ☐ বৈশাখ সংখ্যা থেকে গ্রাহকমূল্য : (ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ) তেত্রিশ টাকা ☐ (সডাক) আটত্রিশ টাকা ☐

বর্তমান সংখ্যার মূল্য ছয় টাকা

উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত **ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ** (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দিই। এই তারিখটি **সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের** সাধারণতঃ **৮/৯ তারিখ** হয়। ডাকে পাঠানোর **সপ্তাহখানেকের** মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে কখনো কখনো পত্রিকা পেঁছাতে বিলম্বও হয়। অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের **একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা** করতে অনুরোধ করি। **একমাস পরে** (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ / পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে **গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে** কার্যালয়ে জানালে **ডুপ্লিকেট** বা **অতিরিক্ত কপি** পাঠানো হবে।

☐ যাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) **পত্রিকা সংগ্রহ** করেন তাঁদের পত্রিকা **ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ** থেকে বিতরণ শুরু হয়। **স্থানাভাবের** জন্য **দুটি সংখ্যার** বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা **সংগ্রহ করে নেন**।

☐ **বৈশাখ সংখ্যা** থেকে (**পৌষ সংখ্যা** পর্যন্ত) গ্রাহক হলে **গ্রাহকমূল্যঃ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ (By Hand)—৩৩ টাকা, ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ—৩৮ টাকা**।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধনঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৩৯৯ সংখ্যা

☐ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্যঃ ছাব্বিশ টাকা।**

☐ **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের** এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** তাঁরা নিজের কপি ছাড়া **অতিরিক্ত প্রতি কপি কুড়ি টাকায়** পাবেন ; **৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে **অগ্রিম টাকা জমা দিলে** তাঁরা প্রতি কপি **আঠারো টাকায়** পাবেন।

সাধারণ ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে **সেই সংবাদ** কার্যালয়ে **অবশ্যই** পেঁছানো প্রয়োজন। **৩১ আগস্ট '৯২**-এর মধ্যে **কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পেঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই** যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে আমাদের পক্ষে **দ্বিতীয়বার** দেওয়া সম্ভব নয়।

সাধারণ ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে **রেজিস্ট্রি ডাকেও** আশ্বিন সংখ্যাটি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি **ডাক ও আনুষঙ্গিক** খরচ বাবদ **সাত টাকা ৩১ আগস্ট** '৯২-এর মধ্যে **কার্যালয়ে পেঁছানো** প্রয়োজন। **ঐ তারিখের পরে** টাকা কার্যালয়ে পেঁছালে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের **আগামী বছরের** ডাকমাশুল বাবদ জমা রাখা হবে।

☐ **ব্যক্তিগতভাবে** যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করবেন তাঁদের **২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ('৯২)** পর্যন্ত কার্যালয় থেকে **আশ্বিন সংখ্যাটি** দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন **এই সময়ের মধ্যে** তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা **সম্ভব না হলে ১৩ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।** কার্যালয়ে **স্থানাভাবের** জন্য **৩১ অক্টোবরের** ('৯২) **পর শারদীয়া সংখ্যাটি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।** আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সানুগ্রহ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।

কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত **খোলা** থাকে, রবিবার **বন্ধ**। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। **২৬ সেপ্টেম্বর মহালয়া উপলক্ষে এবং ৩ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে পত্রিকা বিভাগ বন্ধ থাকবে।**

যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন

১ ভাদ্র ১৩৯৯ (১৮ আগস্ট ১৯৯২)

উদ্বোধন

ভাদ্র ১৩৯৯ আগস্ট ১৯৯২ ৯৪তম বর্ষ—৮ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

গীতায় ভগবান বলিতেছেন, যাহা তোমার শরীর-মনকে দুর্বল করে, তাহাই পাপ। এই দুর্বলতা পরিত্যাগ কর।

স্বামী বিবেকানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমাঃ কিছু নিরুদ্দিষ্ট সূত্রের সন্ধানে

বিবেকানন্দ-তিলক সাক্ষাৎকার কবে?

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা পর্ব বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। তাহার কতটুকুই বা আমাদের গোচরে আসিয়াছে? বস্তুতঃ যাহা আসিয়াছে তাহা অতি সামান্যই। পরিক্রমা-কালে বহু ঘটনা ঘটিয়াছে, বহু মানুষের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন। একদিন হয়তো দরিদ্রের পর্ণকুটিরে তাঁহার আশ্রয় ও আহার জুটিয়াছে, পরের দিনই হয়তো ধনীর গৃহে অথবা রাজপ্রাসাদে সম্মানিত অতিথি হিসাবে তিনি সমাদৃত হইয়াছেন, তাহারই পরের দিন অথবা পর পর কয়েকদিন হয়তো অনাহারে, অর্ধাহারে এবং নিরাশ্রয় অবস্থায় অথবা চরম সঙ্কটের মধ্যে তাঁহার কাটিয়াছে। কোথায় (স্থান) এবং কখন (সন-তারিখ) উক্ত অভিজ্ঞতাসমূহ তাঁহার হইয়াছে তাহার কিছু কিছু অবশ্যই তাঁহার জীবনীতে অথবা অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বহু স্থান এবং বহু সন-তারিখ সেই-সমস্ত প্রকাশিত বিবরণেও অনুল্লিখিত রহিয়া গিয়াছে। বর্তমান ইংরাজী বর্ষের (১৯৯২) শেষে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা রাখিব এবং কিছু নিরুদ্দিষ্ট সূত্রের অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব।

কোন মানুষেরই, তিনি যত বড় ও বিখ্যাত মানুষই হউন না কেন, জীবনের সকল ঘটনা জানা সম্ভব নহে। কিন্তু বিবেকানন্দ এমনই একজন মানুষ যাঁহার জীবনের যত বেশি জানিতে পারা যাইবে ততই আমাদের জীবন সমৃদ্ধতর হইবে। 'আমাদের' বলিতে শুধু ভারতবর্ষের মানুষের কথাই বলা হইতেছে না, সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কথাই বলা হইতেছে। জার্মানীর একটি যুবকের সহিত কয়েক বৎসর আগে পরিচয় হইয়াছিল। যুবকটি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি' দর্শন করিতে, সেই পথ চুম্বন করিতে যে-পথে তিনি হাঁটিয়াছেন, সেই ভূমি বা স্থান স্পর্শ করিতে যে-ভূমিতে বা যে-স্থানে সামান্য ক্ষণের জন্য হইলেও তাঁহার অবস্থানের স্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সে বলিত: "I regret to miss any lane or road which Swami Vivekananda walked on. I cherish to kiss it. It is so dear to me. I regret to miss any land or place with which Swami Vivekananda's memory is associated. I cherish to touch it. It is so holy to me. I am prepared to go to any length of your country, no matter where it is located or how long he had been there or how often he used to visit it."

বস্তুতঃ কী এক অপূর্ব "সোনার মানুষই" না ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন! শতবর্ষ পূর্বে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র দেশের মানুষের কানে কানে চারণ সন্ন্যাসীর বেশে তিনি অবিশ্রান্তভাবে শুনাইয়াছিলেন নিদ্রা হইতে উত্থানের সঙ্গীত। তাঁহার দীর্ঘ পরিক্রমা-পথে কত ঘটনাই ঘটিয়াছে! যখন ঘটিয়াছে তখন উহাদের ভাবী তাৎপর্য কয়জনই বা অনুধাবন করিতে পারিয়াছে? হয়তো সামান্য ক্ষণের জন্য দর্শন, হয়তো দুই-চারটি কথা। উহাতেই কত জীবন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, কত মানুষ পাইয়াছে নূতন আলোকের সন্ধান! একটি শতাব্দীর ব্যবধানে কত সূত্র এখন হারাইয়া গিয়াছে, কত সূত্র চিরতরে

লুপ্ত হইয়াও গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু বিবেকানন্দ-প্রেমী, কিছু নিষ্ঠাবান গবেষক বিভিন্ন জ্ঞাত, অজ্ঞাত এবং বিস্মৃত সূত্র হইতে কিছু কিছু উপাদান এখনও সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছেন। আর ইহার ফলে আজও আমরা জানিতে পারিতেছি স্বামীজীর জীবনের বহু অপ্রকাশিত এবং অজ্ঞাত কথা ও কাহিনী। বলা বাহুল্য, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গবেষণাই এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যে-পরিমাণ উপাদান তিনি সংগ্রহ এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। তবে তাঁহার গবেষণা-কর্মের সূত্রেই দেখা যাইতেছে যে, এখনও অনেক উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে এবং সংগৃহীত হওয়া জরুরীও।

দৃষ্টান্তস্বরূপে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গবেষণার সূত্র ধরিয়াই স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমাকালে সংঘটিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটি শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে ঘটিয়াছিল ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই-আগস্টে—অর্থাৎ এই নিবন্ধ যখন লেখা হইতেছে তখন হইতে ঠিক একশত বৎসর আগে। ঘটনাটি বহু পূর্বে স্বামীজীর ইংরাজী জীবনী ('The Life of Swami Vivekananda' by His Eastern and Western Disciples), প্রাচীন বাঙলা জীবনী ('স্বামী বিবেকানন্দ'—প্রমথনাথ বসু) এবং উদ্বোধন পত্রিকায় (১৯তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) উল্লিখিত হইয়াছিল। তবে কোনখানেই ঘটনাটির সঠিক সময় নিরূপণ করা হয় নাই। পরবর্তী কালে স্বামীজীর ইংরাজী জীবনী এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত বাঙলা জীবনী 'যুগনায়ক বিবেকানন্দে'র পরিমার্জিত ও সংশোধিত সংস্করণগুলিতে ঘটনাটির মোটামুটি কাল নিরূপণ করা হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা হইতেছে যে, তাহার সহিত শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সিদ্ধান্ত মিলিতেছে না। এখানে উল্লেখ্য যে, শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গবেষণাকর্মের ভিত্তিতে স্বামীজীর ইংরাজী ও বাঙলা জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণগুলি সংশোধিত এবং পরিমার্জিতও হইয়াছে। সুতরাং প্রাথমিক বিচারে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গ্রন্থেই সাম্প্রতিক গবেষণার ফল প্রত্যাশিত।

ঘটনাটি হইল বোম্বাইয়ে বাল গঙ্গাধর তিলকের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ এবং পুনায় তিলকের বাড়িতে স্বামীজীর অবস্থান। স্বামীজীর ইংরাজী ও বাঙলা জীবনীতে স্বামীজী-তিলক প্রসঙ্গটি তিলকের নিজস্ব স্মৃতিচারণে উদ্ধৃত করিয়া উপস্থাপিত হইয়াছে। উহার অতিরিক্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বামীজীর কোন জীবনীতেই নাই। কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থে (৫ম খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯২) একটি দীর্ঘ অধ্যায় (৩৭তম) রহিয়াছে 'বিবেকানন্দ ও তিলক' শিরোনামে (পৃঃ ৪১৯-৪৫৭)। ইহা ছাড়া ঐ গ্রন্থের প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডেও প্রাসঙ্গিকভাবে বিবেকানন্দ-তিলক প্রসঙ্গ আসিয়াছে। সুতরাং বিবেকানন্দ-তিলক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা শঙ্করীপ্রসাদ বসুই করিয়াছেন। তিলক-বিবেকানন্দ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখিতেছেনঃ "১৮৯২, জুলাই বা আগস্ট মাসে তিলকের সঙ্গে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ এবং তিলকের পুনা-ভবনে বিবেকানন্দের কয়েকদিনের অবস্থান।" ('বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৯)

খাণ্ডোয়া হইতে স্বামীজীর বোম্বাইয়ে আগমন, বোম্বাইয়ে ট্রেনে পুনার পথে স্বামীজীর সহিত তিলকের সাক্ষাৎ, তিলকের বাড়িতে স্বামীজীর অবস্থান-বিষয়ে কোন বিতর্ক নাই। বিতর্ক হইতেছে সাক্ষাৎ ও অবস্থানের তারিখ লইয়া। স্বামীজীর ইংরাজী জীবনী অনুসারে স্বামীজীর সহিত তিলকের সাক্ষাতের সময় ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে ; বাঙলা জীবনীর মতে, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বরের পরের কোন দিন। প্রাচীন বাঙলা জীবনীর মতে, ১৮৯২-এর জুলাই-এর শেষ সপ্তাহ হইতে কয়েক সপ্তাহ পরে।

স্বামীজীর প্রাচীন বাঙলা জীবনীতে বলা হইয়াছে ঃ "১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীজী [খাণ্ডোয়া হইতে] বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেন।... কয়েক সপ্তাহ বোম্বাইয়ে থাকিয়া তিনি পুনায় গমন করিলেন। স্বামীজী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাইতেছিলেন। সেই গাড়িতে বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন।... তিলক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুনায় নিজ বাটিতে লইয়া গিয়া একমাস রাখিলেন।" ('স্বামী বিবেকানন্দ'—প্রমথনাথ বসু, ১ম ভাগ, ৪র্থ সং, ১৯৭৫, পৃঃ ২২১)

স্বামীজীর ইংরাজী জীবনীতে বলা হইতেছেঃ "[From Khandwa] he [Swamiji] left for Bombay by train. ... He reached Bombay in the last week of July 1892. ... The Swami remained in Bombay for about two months, and then went to Poona. ... At the station, when the Swami was leaving Bombay, he was introduced to Lokamanya Bal Gangadhar Tilak, the renowned scholar and patriot, who happened to be his fellow passenger." (Vol. I, 6th Edn., 1989, pp. 305-306)

স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিতেছেনঃ "জুলাই মাসের [১৮৯২] শেষ সপ্তাহে [খাণ্ডোয়া হইতে] বোম্বে পৌঁছিয়া...[স্বামীজী] বোম্বেতে দুই মাস (জুলাই-এর শেষ হইতে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত) কাটাইয়াছিলেন।... ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি বোম্বেতে ছিলেন।... বোম্বে হইতে পুনা যাইবার পথে...লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের নাম [স্বামীজীর] সহযাত্রীরূপে জড়িত রহিয়াছে।" ('যুগনায়ক বিবেকানন্দ', ১ম খণ্ড, ৫ম সং,১৯৯১, পৃঃ ২৮৮-২৯০)

খাণ্ডোয়া হইতে স্বামীজীর বোম্বাইয়ে আগমন ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে—এবিষয়ে স্বামীজীর তিনটি প্রধান জীবনীই একমত। লক্ষণীয়, শঙ্করীপ্রসাদ বসুও ঐমত মানিয়াছেন। (দ্রঃ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ১ম খণ্ড, ৫ম মুদ্রণ, ১৯৮৭, পৃঃ ৮১)

এখন প্রশ্ন হইল, কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে ইংরাজী এবং বাঙলা জীবনীতে বলা হইতেছে স্বামীজী সেপ্টেম্বরের শেষে অথবা ২০ সেপ্টেম্বরের পরে পুনা যান? ইহার ভিত্তি বোম্বাই হইতে লিখিত স্বামীজীর দুইটি চিঠি। প্রথম চিঠির তারিখ ২২ আগস্ট ১৮৯২, দ্বিতীয় চিঠির তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯২। (দ্রঃ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, 5th Edn., 1971, pp. 288-289 & Ibid., Vol. V, 10th Edn., 1973, pp. 4-5) প্রথম চিঠির ভিত্তিতে বলা যায় যে, স্বামীজী ২২ আগস্ট ১৮৯২ পর্যন্ত বোম্বাই ত্যাগ করেন নাই। ঐ চিঠিতে তিনি জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে লিখিয়াছিলেনঃ "After remaining here for 15 to 20 days I would proceed toward Rameswaram, and on my return would surely come to you." (এখানে পনেরো-কুড়ি দিন থাকিয়া রামেশ্বর যাইতে পারি। ফিরিয়া আপনার নিকট অবশ্যই যাইব।) কিন্তু স্বামীজীর ভ্রমণসূচী যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐসময় স্বামীজীর রামেশ্বর বা জুনাগড় কোথাও-ই যাওয়া হয় নাই। স্বামীজীর ২০ সেপ্টেম্বরের চিঠি হইতে জানা যায় যে, তিনি অন্ততপক্ষে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বোম্বাইয়ে অবস্থান করিয়াছেন।

স্বামীজীর সকল জীবনীর মতেই তিনি বোম্বাই হইতে পুনা যান এবং ঐসময়েই তাঁহার সহিত বোম্বাই রেলস্টেশনে বাল গঙ্গাধর তিলকের সাক্ষাৎ এবং অতঃপর তিলকের পুনার বাসভবনে স্বামীজীর অবস্থান। সাক্ষাৎকার ও অবস্থান প্রসঙ্গে স্বয়ং তিলক নিজস্ব স্মৃতিচারণেও ঐ তথ্য জানাইয়াছেন। সুতরাং তিলকের সহিত স্বামীজীর পরিচয় এবং তিলকের পুনা-ভবনে স্বামীজীর অবস্থান ১৮৯২-এর জুলাই-আগস্টের ঘটনা বলিয়া শঙ্করীপ্রসাদ বসু যে-মন্তব্য করিয়াছেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতেছে। উপরি-আলোচিত তথ্যাদির ভিত্তিতে বরং একথা সংগত কারণেই বলা যায় যে, ঐ ঘটনা ১৮৯২-এর ২০ সেপ্টেম্বরের পরেরই ঘটনা। শঙ্করীপ্রসাদ বসু কোন্ তথ্য বা তথ্যাদির ভিত্তিতে তাঁহার সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন তাহা জানান নাই। তবে তাঁহার ন্যায় পরম নিষ্ঠাবান এবং প্রাজ্ঞ তথ্য-সন্ধানী গবেষক যখন কোন সিদ্ধান্তে আসেন তখন তাহার পিছনে অবশ্যই যথেষ্ট যুক্তিসংগত ভিত্তি থাকিবে। আমরা জানি, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে স্বামীজীর সম্পর্কে তথ্যসন্ধানের জন্য তাঁহাকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। আমরা আশা করিব তিনি আমাদের জিজ্ঞাসার নিরসন করিবেন।

আমরা দেখিয়াছি, তিলকের সহিত স্বামীজীর পরিচয় এবং তাঁহার পুনার বাড়িতে স্বামীজীর কয়েকদিন অবস্থান (সঠিক তথ্যের অভাবে প্রমথনাথ বসুর প্রাচীন বাঙলা জীবনীতে 'এক মাস' অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে। দ্রঃ পৃঃ ২২১) ১৮৯২-এর ২০ সেপ্টেম্বরের পরের ঘটনা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয় নাই কোন্ তারিখে স্বামীজীর সহিত তিলকের প্রথম সাক্ষাৎ হয় অর্থাৎ কোন্ তারিখে স্বামীজী পুনার উদ্দেশে বোম্বাই ত্যাগ করেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বলিতে পারি যে, স্বামীজীর বোম্বাই হইতে পুনা যাত্রা এবং পুনায় অবস্থান ১৮৯২-এর ২১ সেপ্টেম্বর হইতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল।

তিলকের স্মৃতিকথা [স্বামীজী সম্পর্কে তিলকের দুটি স্মৃতিকথা পাওয়া গিয়াছে। একটি 'Reminiscences of Swami Vivekananda' গ্রন্থে (এই স্মৃতিকথাটি প্রথমে 'Vedanta Kesari' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।), অন্যটি প্রহ্লাদনারায়ণ দেশপাণ্ডের 'লোকমান্য তিলক যাঁচ্য়া আঠবণী ওয়া আখ্যায়িকা' শীর্ষক মারাঠী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে। (এই স্মৃতিকথাটি দেশপাণ্ডে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তিলকের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ১ম খণ্ড ও ৫ম খণ্ডে উহার প্রাসঙ্গিক অংশের বঙ্গানুবাদ আছে।)] অনুসারে পুনায় দিন দশেক অবস্থানের পর স্বামীজী পুনা ত্যাগ করেন। পুনা ত্যাগ করিয়া স্বামীজী কোথায় যান তাহা তিলক জানান নাই। (প্রহ্লাদনারায়ণ

দেশপাণ্ডে সংগৃহীত তিলকের স্মৃতিকথা অনুসারে, স্বামীজীর পরবর্তী গন্তব্যস্থল তিলকের জানা ছিল না।) এবিষয়ে স্বামীজীর প্রকাশিত চিঠিপত্র বা আলাপাদি হইতেও কোন তথ্য পাইতেছি না। শুধু স্বামীজীর শিষ্য হরিপদ মিত্রের স্মৃতিকথা হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৮ অক্টোবর ১৮৯২ স্বামীজী বেলগাঁও-এ জনৈক স্থানীয় উকিলের বাড়িতে অতিথি হিসাবে ছিলেন। ১৯ অক্টোবর স্বামীজীকে উকিল ভদ্রলোকের বাড়ি হইতে হরিপদ মিত্র তাঁহার বেলগাঁও-এর বাসায় লইয়া আসেন। স্বামীজী হরিপদ মিত্রের বাড়িতে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ছিলেন। ২৭ অক্টোবর স্বামীজী বেলগাঁও ত্যাগ করেন। প্রসঙ্গতঃ ঐ স্মৃতিকথা হইতে জানা যায় যে, ২৫ অক্টোবর হরিপদ মিত্র সস্ত্রীক স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অনেক কষ্টে স্বামীজীকে রাজী করাইয়া ২৬ অক্টোবর স্বামীজীর ফটো তুলান। [দ্রঃ 'উদ্বোধন', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩১০, ১৫ চৈত্র, পৃঃ ১৬৩—১৭৮ ('স্বামীজীর সহিত দুই-চারিটা দিন')। ছাপার ভুলে 'বেলগাঁও'-এর স্থলে 'সোলাপুর' হইয়াছিল। 'উদ্বোধন'-এর ৬ষ্ঠ বর্ষের ৯ম সংখ্যায় (১৩১১, ১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়) হরিপদ মিত্র 'স্বামীজীর কথা' শিরোনামে তাঁহার স্মৃতি-নিবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে সেই ভুল সংশোধন করিয়া দেন। (পৃঃ ২৫৭)] স্মৃতিকথা লিখিবার সময় হরিপদ মিত্র ['উদ্বোধন'-এ পূর্বোক্ত দুটি সংখ্যায় মুদ্রিত 'হরিদাস মিত্র', পরবর্তী ও শেষ পর্যায়ে ('উদ্বোধন', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ১৩১১, ১৫ শ্রাবণ, পৃঃ ৪৩৬) মুদ্রিত হয় সঠিক নাম 'হরিপদ মিত্র'।] ছিলেন সোলাপুরের ফরেস্ট অফিসার। স্বামীজী যখন বেলগাঁও-এ যান তখন তিনি বেলগাঁও-এ সাবডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার ছিলেন। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার লোক। হরিপদ মিত্রের স্মৃতিকথাটি সম্পূর্ণতঃ স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র ৯ম খণ্ডে পরবর্তী কালে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এখন কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক যে, বেলগাঁও-এ স্বামীজী কবে আসিয়াছিলেন? ইহার উত্তর হরিপদ মিত্রের স্মৃতিকথায় নাই, আছে হরিপদ মিত্র যে উকিল ভদ্রলোকের বাড়ি হইতে স্বামীজীকে নিজের বাসায় লইয়া আসেন তাঁহার পুত্র জি. এস. ভাটে-র (G. S. Bhate) স্মৃতিকথায়। (স্মৃতিকথাটি প্রথমে 'Prabuddha Bharata' পত্রিকার জুলাই ১৯২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, পরে 'Reminiscences of Swami Vivekananda' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।) জি. এস. ভাটে-র স্মৃতিকথা হইতে জানা যায় যে, বেলগাঁও-এ আগমনের পর হইতে স্বামীজী সেখানে একটি সাড়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বাড়িতে স্বামীজীর কথা শুনিবার জন্য "প্রতিদিন" প্রচুর গণ্যমান্য মানুষের সমাগম হইত। উহা হইতে মনে হয়, ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় হরিপদ মিত্রের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পূর্বে স্বামীজী বেলগাঁও-এ সপ্তাহখানেক অতিবাহিত করিয়া থাকিবেন। অর্থাৎ বেলগাঁও-এ স্বামীজী অন্ততঃ ১৫ অক্টোবর (১৮৯২)-এর পূর্বে অবশ্যই আসিয়াছিলেন। ইংরাজী জীবনী (পৃঃ ৩০৮) এবং বাঙলা জীবনী (পৃঃ ২৯২) উভয়ের মত ইহাই। ভাটে-র স্মৃতিকথা হইতে আরও জানা যায় যে, স্বামীজী একদিন সকাল ছয়টা নাগাদ কোলাপুর হইতে বেলগাঁও-এ আসিয়া পৌঁছান। কোলাপুরের মহারাজার 'খাঙ্গী কারভারী' (ম্যানেজার বা প্রাইভেট সেক্রেটারী) গোলওয়ালকর ভাটে-র পিতার নিকট স্বামীজী সম্পর্কে একটি পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। গোলওয়ালকর ছিলেন ভাটে-র পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কোলাপুরের রানী স্বামীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানাইয়াছেন, তিনি স্বামীজীর শিষ্যা ছিলেন। ('বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৭) বেলগাঁও-এ আসার পূর্বে স্বামীজীর কোলাপুরে অবস্থানের কথা হরিপদ মিত্রের বিবেকানন্দ-স্মৃতিতেও পাই। কোলাপুরের রানী অনেক চেষ্টা ও অনুরোধ করিয়াও অপরিগ্রহ ব্রতধারী স্বামীজীকে দুইখানি গেরুয়াবস্ত্রের বেশি কিছু গ্রহণ করাইতে সমর্থ হন নাই বলিয়া হরিপদ মিত্র জানাইয়াছেন ('উদ্বোধন', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ১৭২)।

স্বামীজীর ইংরাজী ও বাঙলা জীবনীর মতে স্বামীজী পুনা হইতে গিয়াছিলেন কোলাপুরে। ইহার ভিত্তি অবশ্য ভাটে-র স্মৃতিকথা। কোলাপুরে স্বামীজীর অবস্থান কতদিনের তাহা জানা যায় না, তবে কোলাপুরের বিখ্যাত মারাঠী পত্রিকা 'গ্রন্থমালা'-র সম্পাদক বিজপুরকর স্বামীজীর কোলাপুরে অবস্থান সম্পর্কে যে-তথ্য দিয়াছেন ('গ্রন্থমালা', জুলাই ১৯০২ সংখ্যা) তাহা হইতে অনুমান হয় যে, স্বামীজী সেখানেও দিন কয়েক থাকিয়াছেন। ইংরাজী জীবনীর মতে কোলাপুরে স্বামীজীর অবস্থান ছিল "সংক্ষিপ্ত" ("a short stay", p. 308)। যদি এই অবস্থান সপ্তাহখানেক হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বামীজী পুনা ত্যাগ করেন অক্টোবরের (১৮৯২) প্রথম সপ্তাহেই। অর্থাৎ তিলকের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ এবং পুনায় স্বামীজীর অবস্থানকাল ১৮৯২-এর সেপ্টেম্বরের ২৭/২৮ তারিখ হইতে অক্টোবরের ৬/৭ তারিখের মধ্যে হওয়াই সম্ভব। □

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীহরিঃ শরণম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম
লক্ষা, বেনারস সিটি
২৭।১১।(১৯)১২

প্রিয় সুরেশ,[১]

অনেকদিন পরে তোমার এক পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। আজ প্রাতেই তোমায় লিখতে ইচ্ছা হইল তাই লিখিতেছি। কিন্তু তোমার প্রশ্ন সকলের যথাযথ উত্তর দেওয়া পত্রদ্বারা বড়ই কঠিন। এসব প্রশ্নের উত্তর সম্মুখে হইলেই ভাল হয়। তথাপি চেষ্টা করিতেছি। যেমন বীজে বৃক্ষের ভাবী উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং ফুলফলাদির আবির্ভাব নিহিত থাকে, সেইরূপ যে-শব্দ সহায়ে সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতির শক্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে চরম উৎকর্ষপ্রাপ্তি করায় তাহাই বীজমন্ত্র। মহাজন বলিয়াছেনঃ "মন রে কৃষিকাজ জান না। / এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ কল্লে ফলত সোনা। / কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না, / সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না। / গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেঁচে দে না, / একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।" জীবনজমি, গুরুদত্ত বীজ, বীজ রোপণ, ভক্তিজল সেচন আর কালী নামের বেড়া দেওন—এইরূপে সাধন করে আপনাকে পর্যন্ত নিবেদন ; এই হলো সংকেত। ঠাকুর বলতেনঃ "রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না"। মানে অহংবুদ্ধি—'আমি রামপ্রসাদ' অথবা অমুক এপর্যন্ত ভুলে যাওয়া—একেবারে ইষ্টে তন্ময়ত্ব লাভ করা—এই হলো সাধনের পর্যবসান। ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি-প্রকাশিত মূর্তি মাত্র, ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। সাধকের অভীষ্ট পূরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকাশিত, সুতরাং বীজও ভিন্ন ভিন্ন হইবে না কেন? তন্ত্রশাস্ত্রে এবিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত হিন্দু-মত এক বেদকেই আশ্রয় করিয়া স্থিত আছে ; সুতরাং কোন মতই অর্থাৎ পুরাণ-তন্ত্র প্রভৃতি কিছুই অবৈদিক নহে। ইহাদের সকলেরই ভিত্তি বেদে। সাধকের বুঝিবার সুবিধার জন্য কেবল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঋষিরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও সাধন-পদ্ধতি বাঁধিয়া দিয়াছেন এই মাত্র। শাস্ত্রপ্রণেতারা বলেন, বেদেই তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ আছে। আমরা সমস্ত বেদ না পড়িয়া এসব বেদে নাই—এরূপ বলিলে অন্যায় করিব সন্দেহ নাই। শব্দ মাত্রই যখন প্রণব-সম্ভূত তখন সমস্ত বীজই যে প্রণবোত্থ তাহাতে আর কথা কি? অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় শুনিয়াছি। বীজমন্ত্রও জ্যোতি অক্ষরে দৃষ্ট হয় ও কখনও কখনও শ্রুতও হইয়া থাকে। বীজ প্রণবে মিলিত হইয়া যায় কিনা জানি না, তবে মন্ত্র ও দেবতা অভেদ—ইহা শুনিয়াছি। মন্ত্র তো দেবতার শরীরের অধিষ্ঠানস্বরূপ। এসব ব্যাপার কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া সিদ্ধান্তিত হয় না। সাধন করিতে হয় এবং গুরুকৃপায় ক্রমে উপলব্ধি হইয়া থাকে। ঠাকুরের কথা—সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে নেশা হয় না, সিদ্ধি আনিয়া তাহাকে ধুইতে, পরে বাটিতে হয়। তৎপরে পান করিলে তবে নেশা হয়, তখন 'জয় কালী জয় কালী' বলিয়া আনন্দ কর। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন, হেতুনিষ্ঠ হওয়া ভাল নহে। অবশ্য বুঝিবার জন্য কিছু কিছু প্রশ্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু সাধন করিতে করিতেই ক্রমে সকল প্রশ্ন আপনি উপরত হইয়া যায়। সাধন বিনা প্রশ্নের বিশ্রাম অসম্ভব। সমস্তই ভিতরে। প্রশ্নও যেমন ভিতর হইতে হয়, সেইরূপ সাধন করিয়া তত্ত্ব নিশ্চয় হইলে তবে ভিতরেই সকল সন্দেহের অবসান হইয়া যায় এবং ইহারই নাম শান্তি বা বিশ্রান্তি লাভ। ভগবদ্‌কৃপায় যাহার হয় সেই জানিতে পারে। নচেৎ প্রশ্ন করিয়া কোন কালে কাহারও

১ স্বামী যতীশ্বরানন্দ

সে-অবস্থা লাভ হয় না—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শত শত শাস্ত্র-বচন ইহার প্রমাণ। লেগে যাও খুব, প্রভুর কৃপা হইবেই। তখন 'জয় কালী জয় কালী' বলিয়া কেবলই আনন্দ করিবে। এখানকার খবর সমস্তই পাইয়া থাক। সম্প্রতি রাসে খুব আনন্দ হইয়া গেল। রাসধারীরা লীলা করিয়াছিল। মা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ধন্য নৃপেনবাবু ও তাঁহার পরিবার-বর্গ, মনের আনন্দে চুটিয়ে সেবাভক্তি করিয়া লইতেছেন। মহারাজ প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। আশা করি তোমরাও সকলে ভাল। মহিমানন্দকে আমার ভালবাসাদি জানাইবে। মা বোধহয় দু-এক মাস থাকিতে পারেন। মহারাজ ও আমরাও সেইরূপ। এখন প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে। তোমরা আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। এখন এই পর্যন্ত।

শ্রীতুরীয়ানন্দ

শ্রীহরিঃ শরণম্

কনখল
১৪।১০।(১৯)১৪

প্রিয় সুরেশ,

তোমার ৺বিজয়ার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম ও আমার ৺বিজয়ার স্নেহ সম্ভাষণাদি ও উক্ত পত্র প্রাপ্তিস্বীকার আমি ইতঃপূর্বে শ্রীমান শর্বানন্দের পত্রে জ্ঞাপন করিয়াছি। তোমরা সব ভাল আছ ও বেশ সাধন-ভজন করিতেছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। আমার শরীর শীত পড়ায় একটু ভাল বোধ করিতেছি অর্থাৎ গাত্রদাহে যে-যাতনা হইত তাহা এখন কমিয়াছে। অন্য সব উপদ্রব কিন্তু সমানই রহিয়াছে। এখানকার আর সকলে এখন বেশ ভালই আছে। চামারদের ঘর-দ্বার তাহারা আপনিই উঠাইয়া লইয়াছে। আমরা বিশ ত্রিশ টাকা সাহায্য করিয়াছিলাম মাত্র। মিশন হইতে শরৎ মহারাজ[২], আমি তাঁহাকে লেখায়, তিনশত টাকা পাঠাইয়াছিলেন। সেই টাকায় চামারদের পল্লীতে একটি কূপ খনন করাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। উহা সম্পন্ন হইলে তাহাদের এক প্রধান অভাব (জলকষ্ট) নিবারিত হইবে। তবে "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।" কতদূর ঘটিয়া উঠিবে তাহা বলা যায় না। এখানকার অন্যান্য সংবাদ ভাল। ৺কাশীতে শ্রীশ্রীকালীপূজা হইবে। মহারাজ[৩] আমাকে সেখানে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। বোধ হয় আমি আগামী শুক্রবার ৺কাশী রওনা হইব। কেদারবাবা[৪] আমার সঙ্গে যাইবে। দেখা যাক প্রভুর ইচ্ছায় কিরূপ ঘটিয়া ওঠে। শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজ[৫] ৺কাশী আসিয়াছেন। তুলসী মহারাজও[৬] আছেন। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে এবং শর্বানন্দ ও গোকুলানন্দকে জানাইবে। আর একটি কাজ করিবে। দেরাদুনের একটি ভদ্রলোক একখানি Gospel of Sri Ramakrishna চান। আমার নিকট দাম দিয়াছেন। তুমি একখানি Gospel of Sri Ramakrishna শ্রীমান কল্যাণানন্দের নামে V. P. P.-তে পাঠাইয়া দিও। আমি কল্যাণের নিকট দাম রাখিয়া যাইব। শীঘ্র পাঠাইও। কল্যাণ উহা উপরি-উক্ত ব্যক্তিকে দিয়া দিবে। ভুলিও না। মনে করিয়া নিশ্চয় V. P. P.-তে পাঠাইয়া দিও। যত শীঘ্র হয় চেষ্টা করিও।

ইতি
শ্রীতুরীয়ানন্দ

২ স্বামী সারদানন্দ ৩ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৪ স্বামী অচলানন্দ
৫ স্বামী প্রেমানন্দ ৬ স্বামী নির্মলানন্দ

প্রবন্ধ

অনন্যা নিবেদিতার অনন্য পত্রাবলী

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

ভগিনী নিবেদিতা চিঠি লিখতে ভালবাসতেন। তাঁর ৪৪ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে অজস্র চিঠি তিনি লিখেছেন অক্লান্তভাবে। সেইসব চিঠি প্রয়োজনে যত না লিখতেন, ভালবাসায় লিখতেন তার ঢের বেশি। প্রিয়জনদের কাছে লেখা তাঁর সেই ভালবাসায় ভরা চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে আছে দেশপ্রীতি তথা ভারতপ্রীতি আর ঈশ্বরপ্রীতিরই নিদর্শন। ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রীতির কোন নামগন্ধই নেই তাঁর কোন চিঠিপত্রে। কয়েক বছর হলো নিবেদিতার সেইসব চিঠিপত্রের একটা বড় অংশ দু-খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'লেটার্স অব সিস্টার নিবেদিতা' নামে। সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত গবেষক-লেখক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। চিঠিগুলি ভাব ও ভাষায় নিঃসন্দেহে 'ক্লাসিক' পর্যায়ভুক্ত। চিঠিগুলির ঐতিহাসিক মূল্যেও অপরিসীম, বিশেষতঃ ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। ঐতিহাসিক নিমাইসাধন বসুর মতে—"নিবেদিতার চিঠিগুলি ঐতিহাসিকদের কাছে স্বর্ণখনি বলে বিবেচিত হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের শেষ কয়েক বছরের ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার' ('ক্ষমতা হস্তান্তর') নামক গ্রন্থে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। এই আকরগ্রন্থ না পড়ে ঐসময়ের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত ভগিনী নিবেদিতার এই চিঠিগুলিকে 'ট্রান্সমিশন অব পাওয়ার' (শক্তিসঞ্চার) আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যে অসাধারণ প্রেরণা জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নিবেদিতা সঞ্চার করেছিলেন তার প্রমাণ বহন করছে এই চিঠিগুলি। ঐযুগের ইতিহাস রচনায় নিবেদিতার চিঠিপত্রের মূল্য অপরিসীম।"[১]

নিবেদিতার তথ্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় চিঠিগুলিতে নিবেদিতার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। সেইসব চিঠিতে কখনো তিনি বিপ্লবীদের উপদেষ্টা, কখনো তিনি স্নেহবৎসলা সেবিকা, কখনো বা শত্রুপক্ষের কাছে বিপ্লবীদের আপসহীন সমর্থক ও সুহৃদ্। মনে পড়ে, নিবেদিতাকে স্বামীজী ছোট একটি কবিতায় আশীর্বাদ করেছিলেন। কবিতাটির নামও 'আশীর্বাদ' ('Benediction')। তার শেষ স্তবকটি হলো ঃ

"Be thou to India's future son,
The mistress, servant and friend in one."
—"ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, গুরু—তুমি একাধারে।"[২]

ঐ কবিতায় স্বামীজী নিবেদিতাকে ভারতের মানুষের কাছে লোকমাতারূপেও দেখতে আকুতি ব্যক্ত করেছিলেন। তাই মনে হয়, নিবেদিতা ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়লে বিবেকানন্দ-কথিত তাঁর সেই 'সেবিকা বান্ধবী গুরু'-রূপটি কখনোই চাক্ষুষ করা যেত না। তিনি না থাকলে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের স্রোত হয়তো অন্য খাতে প্রবাহিত হতো। বিপ্লবীদের চরম সংকট মুহূর্তে বহুবার সেই আন্দোলনের হাল অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ধরে রেখেছেন এবং বিপ্লবীদের প্রেরণা যুগিয়েছেন। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী লেডি অবলা বসু নিবেদিতাকে মেনকা-নন্দিনী 'হৈমবতী-উমা'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মর্ত্য-লোকে উমাই তো অসুরদলনী স্নেহময়ী জননী—একাধারে নমনীয়তা কমনীয়তা আবার প্রচণ্ড পৌরুষশক্তির অভিব্যক্তি তিনি। নিবেদিতার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বও তাই। আমরা জানি তিনি কিভাবে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে নিজের জীবন বিপন্ন করে রক্ষা করেছিলেন এবং অবধারিত ফাঁসি বা

১ দ্রঃ ১৩. ৭. ১৯৮৬ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় (পৃঃ ৭) 'Letters of Sister Nivedita' (2 Vols.) গ্রন্থের সমালোচনা।

২ লোকমাতা নিবেদিতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১৯৬৮, পৃঃ ১৬-১৭

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের দ্বন্দ্বের সময় উভয়দলে সমঝোতা আনতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে তিনি অসীম মমতায় স্বমতে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। আবার মহাদাম্ভিক স্বৈরাচারী লর্ড কার্জনের কার্যকলাপে ফুঁসে উঠেছেন এই বলে: "একদল ডাকাত ভারত আক্রমণ করে ভারতভূমি ধ্বংস করছে। ডাকাতরা কী শেখাতে পারে? ভারত থেকে তাদের বিতাড়ন করতেই হবে।" সেইসঙ্গে শুনি তাঁর আপসহীন রণহুঙ্কার: "কবে এক হাতে গীতা আর এক হাতে তরবারি নিয়ে মাতৃভূমি জাগবে?" এসব কথাই চিঠিপত্রে উল্লিখিত এবং তা আজ ও আগামীকালের গবেষণার বিষয়। বিপিনচন্দ্র পাল নিবেদিতার কথাকে মনে করতেন 'ডিনামাইট'। নিবেদিতার বহু চিঠি পড়ে মনে হয়, সত্যিই তা ছিল বিস্ফোরক ডিনামাইট-ই। তা বুঝে আশঙ্কিত ইংরেজ সরকার একসময় নিবেদিতার চিঠিপত্র 'সেন্সার' করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু নিবেদিতা দমে যাওয়ার পাত্রী ছিলেন না। এক সময় তিনি 'নীলাস' (Nealous) ছদ্মনাম নিয়েও সমানে তাঁর রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। নিবেদিতার সাংবাদিক-বন্ধু মিস্টার র‍্যাটক্লিফের কাছে লিখিত চিঠিপত্রে তাঁর ভারতপ্রীতি ও ইংরেজ-বিদ্বেষ সমানভাবেই প্রকাশ পায়। রাশিয়ার বিপ্লবী-নেতা ও পৃথিবীর ইতিহাসে 'mutual aid'-এর মতবাদের প্রবক্তা প্রিন্স ক্রপটকিনের ভাবে অনুপ্রাণিতা নিবেদিতা বোমা তৈরি পর্যন্ত করতে শিখেছিলেন। আবার তিনি আইরিশ বিপ্লবী 'সিনফিন'দের 'টেকনিক' পর্যন্ত রপ্ত করেছিলেন। কতগুলি চিঠিতে তাঁর অকুতোভয় রণরঙ্গিণী মূর্তিই প্রকটিত। সেইসব চিঠির একটি: "আমাদের মৃত্যুভয় জয় করতেই হবে। কাপুরুষ বলে আমাদের যে অখ্যাতি তা আমরা ধুয়ে-মুছে ফেলব আমাদের শক্তি দ্বারাই।" যারা মৃত্যুভয়ে ভীত তাদের তিনি ভালয়-ভালয় তফাৎ যেতে বললেন। পরাধীনতার বিষবৃক্ষ উৎপাটনে তখন তিনি নির্মম—অসুরদলনী-রণরঙ্গিণী।

প্রিয়জনদের মধ্যে মিস ম্যাকলাউডকেই নিবেদিতা চিঠি লিখেছিলেন সবচেয়ে বেশি। তাঁর অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত-দ্বন্দ্বের কথাও তিনি অসঙ্কোচে তাঁর কাছে খুলে বলতেন। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতে নারীরা যেন প্রত্যেকে এক-একটি সিংহিনী হয়ে ওঠে। নিবেদিতাকে ভারতে আনার পিছনে তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে তিনি তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। রাজনৈতিক কাজে কেন নিবেদিতা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তা তিনি খোলাখুলিভাবে চিঠিতে লিখেছেন তাঁর প্রিয় বান্ধবীকে। স্বামীজী সমগ্র ভারতে যে 'জাতীয় চেতনা'র উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, পুরুষদের মতো সমস্ত নারীসমাজেও সেই জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত করাই সেসময় নিবেদিতা তাঁর মহত্তম কাজ বলে মনে করেছিলেন। মিস ম্যাকলাউডকে (২৪ জুলাই, ১৯০২) লিখছেন: "আমার কাজ জাতিকে জাগানো, কয়েকটি নারীকে প্রভাবিত করা নয়। একটি মানুষ (স্বামীজী) এসে আমাকে দেখিয়েছেন—কিভাবে সেকাজ করতে পারি।...

"হ্যাঁ, আমার কাজের কথা। আমি সফল নাও হতে পারি। আমি যেভাবে অনুভব করছি তুমি সেভাবে অনুভব করতে পারবে না—কদাপি ভাবতে পারবে না যে, কী অসম্ভব সেই কাজ, আর কতই না আমার অসামর্থ্য। কিন্তু তাতে কি কোন তফাৎ হবে? আমি কি কাজ ছেড়ে দেব? মাতৃসমুদ্রে আমরা কি ঝাঁপ দিয়ে পড়ব না? কোনোদিন তটে উত্তীর্ণ হতে পারব কিনা, সে-ব্যাপারটা কি মায়ের হাতে ছেড়ে দেব না?

"কেন তিনি (স্বামীজী) ঠিক এই সময়টিতে নিজেকে সরিয়ে নিলেন? তা কি প্রতিটি পরমাণু যাতে তাঁকে যন্ত্রণা না দিয়ে অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে পারে, সেইজন্য নয়? তাঁর জীবনপ্রবাহ যে বিরাট ভবিষ্যতের দিকে আমাদের চালিত করছে তাকে যাতে পেতে পারি সেইজন্য কি নয়? তোমার কি মনে পড়ে না তাঁর কথা—'যখন একজন মহাপুরুষ তাঁর কর্মীদের তৈরি করে ফেলেন, তখন তাঁর সেই স্থান ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। কারণ তাঁর উপস্থিতিতে তারা কখনই স্বাধীন হতে পারে না।'... শেষ রবিবার তিনি বলেছিলেন, ভারতে বিধবা এবং অনাথদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার প্রয়াস নিবুদ্ধিতা। এতে তাদের ভালর চেয়ে

মন্দই হবে বেশি।"[৩]

ভারতের জাতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ ছিল তাঁর প্রিয়তম স্বপ্ন। তাঁর ধারণা—"I sometimes think that our greatest work in modernising India might be done through Art, instead of through the Press or the Universities."[৪]

কোন ব্যাপারেই নিবেদিতা পিছিয়ে পড়বার পাত্রী ছিলেন না। স্বামীজী বলতেন, ভারতকে তুলতেই হবে বিশ্বের জনসমক্ষে। ভারতকে আবার 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' লাভ করতেই হবে নিজের হৃত-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, কোন কাঙালিপনা করে নয়, সবক্ষেত্রে নিজের প্রতিভা প্রদর্শন করেই। তাই নিবেদিতা এসে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসুর পাশে। অসহায় জগদীশচন্দ্র। বিদেশী সরকার তাঁর প্রতিভাকে অবদমিত করতে চায় নানা রকম কলাকৌশলের দ্বারা। নিবেদিতা ফুঁসে উঠলেন। বিদেশী শাসকের মুখোশ খুলে দিয়ে দেশের গুণিজন ও তাঁর প্রিয়জনদের চিঠিপত্র লিখে জনমত গঠন করতে লাগলেন জগদীশচন্দ্রের হয়ে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য।

জগদীশচন্দ্রের বিষয়ে নিবেদিতা মিস ম্যাক-লাউডকে লিখছেন (৩ মার্চ, ১৯০৯):

"ডঃ বসু সম্বন্ধে নতুন পরিকল্পনার কথা যে-চিঠিতে লিখেছ, তা আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি, কেবল তাঁর বিষয়ে উল্লেখ আছে এমন দুটি চিঠি পেয়েছি। তোমার 'আইডিয়া' কি তা অনুমান করতে পারছি না, কিন্তু যদি কোনভাবে তাঁর কোন সাহায্য করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়—সেক্ষেত্রে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতাই হবে আমার একমাত্র অনুভূতি।"[৫]

জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগারের নাম পর্যন্ত শুনলে সরকার তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। যারা তাঁকে গবেষণাই করতে দিতে নারাজ, তারা আবার গবেষণাগার করতে সাহায্য করবে? সরকারের ঐ ব্যবহারে সরকার সম্পর্কে নিবেদিতা কিরকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে (৩ এপ্রিল ১৯০৯) তারই প্রকাশ আমরা দেখি।[৬]

পরাধীন ভারতমাতা ও তাঁর সন্তানগণের দুঃখ বিমোচনে যে-নিবেদিতা ছিলেন আপোসহীন, সেই নিবেদিতাই আবার আরেক মায়ের কাছে যেন ছোট্ট খুকিটি, শান্ত, অচঞ্চল, স্নিগ্ধ। 'নিবেদিতা' নাম সার্থক করতেই যেন মাতৃচরণে নিবেদিত একটি অনাঘ্রাত কুসুম। নিবেদিতার সেই মা ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। মৃন্ময়ী জগজ্জননীকে চিন্ময়ী মূর্তিতে দেখতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। সে-সাধ তাঁর মিটেছিল সারদাদেবীর সান্নিধ্যে এসে। তাঁর সেই 'সাধের মা' এবং 'সাধনার মা' আরেকজনের অভাবও পূরণ করেছিলেন—যিনি ছিলেন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে ছেড়ে আসা তাঁরই গর্ভধারিণী মা—তাঁর আদরের 'ছোট মা'।

কী পেয়েছিলেন নিবেদিতা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে? নিবেদিতা তাঁর প্রিয় বান্ধবীদের বহুবারই নিষেধ করেছিলেন সেসব কথা বলতে যাঁদের কাছে তিনি মনের দুয়ার খুলে দিতেন ঝর্নাধারার মতো। কত চিঠিই না তিনি লিখেছিলেন মিস ম্যাকলাউড, মিসেস ওলি বুল, মিসেস নেল হ্যামন্ড প্রমুখকে। এঁরা ছিলেন নিবেদিতার কাছের মানুষ। বিবেকানন্দ-আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁরা। তাই তাঁদের সঙ্গে অবিশ্রান্তভাবে চলত নিবেদিতার ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া পত্রালাপ। এঁদেরই কাছে লেখা নিবেদিতার সেইসব চিঠিতে দেখি, শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আবেগ-জনিত কিছু বলে ফেলেই নিবেদিতা যেন মুখে আঙুল ঠেকিয়ে তাঁদের বলতে চাইতেন— "চুপ। এবিষয়ে নীরব থেকো। কেউ যেন না জানতে পারে এসব কথা।" কারণ, সে যে নিবেদিতার বড়ই বিশ্বাসের বস্তু—তাঁরই আত্মার আলোতে উদ্ভাসিত। সেই আলোতেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অপরূপ মূর্তিখানি দেখতে পেতেন সর্বদা, এমনকি সুদূর আমেরিকাতে বসেও। তাঁর প্রাণের ভাষায় লিখিত সেইরকমই একটি চিঠি—অনবদ্য, ক্লাসিক। আবার চিঠিটি লেখা স্বয়ং শ্রীশ্রীমাকেই (১১ ডিসেম্বর, ১৯১০)। তারই সংক্ষিপ্ত অনূদিত রূপ:

৩ Letters of Sister Nivedita—Ed. Sankari Prasad Basu, 1982, Vol. I, pp. 482-483

৪ Ibid., p. 714

৫ Ibid., Vol. II, p. 955

৬ Ibid., p. 959

"প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরূপ স্তোত্র কিংবা প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু জানি, সেও যেন তোমার তুলনায় অত্যন্ত শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে। সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র—যে-স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গিয়েছেন যারা ছিল তখন নিঃসঙ্গ, যারা নিঃসহায়। আমরা তোমার কাছে খুব শান্ত হয়ে চুপটি করে বসে থাকব। তবে মজা করবার জন্য একটু-আধটু গোলমাল করব বৈকি। সত্যিই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে,—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।..."[৭]

শ্রীমা সম্বন্ধে নিবেদিতা আরেকখানি অনুভূতি-পূর্ণ ক্লাসিক পত্র লিখেছেন (২২ মে, ১৮৯৮) বান্ধবী মিসেস হ্যামন্ডকে আর তাতে নিবেদিতার পূজারিণী মূর্তিটিই ফুটে উঠেছে—

"অসীম মাধুর্যে ভরপুর ইঁনি (শ্রীশ্রীমা)। কী স্নিগ্ধ ভালবাসা এঁর। অথচ বালিকার মতোই হাসি-খুশি।... আর কী যে মিষ্টি তিনি। আমাকে বলেন, 'আমার খুকি'।..."[৮] আরেকটি চিঠিতে (২ মে, ১৮৯৯) নিবেদিতা লিখেছেনঃ "চারিদিকে ঘণ্টা বাজছে, সুর ভেসে আসছে, এখন যে সন্ধ্যা-রতির কাল। ছাতের ওপরে উঠে যাব এখন, চুপ করে শুয়ে দেখব তারকাদের ফুটে ওঠা আকাশ-অঙ্গনে। একে আমি বলি শান্তিলগ্ন।... সন্ধ্যাদীপ সবে জ্বলতে শুরু হয়েছে... অন্তঃপুরের মহিলারা প্রণত হয়েছে দেবতার পট বা বিগ্রহের সামনে, এই সময়ের কিছু আগে থেকেই সারদাদেবীর গৃহে মহিলাদের অনেকে নিঃশব্দে জপমালা ঘুরিয়ে চলেছেন।..."[৯]

পূজারিণী নিবেদিতার আর এক সাধ ও সাধনা ছিল তীর্থদর্শন বা তীর্থপরিক্রমা। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও তিনি হিমালয়-পরিভ্রমণ করেছেন, দর্শন করেছেন তাঁর আচার্যদেবকে তুষার-তীর্থ অমরনাথে। আর ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের মে/জুন মাসে শেষবার গিয়েছিলেন কেদারবদরী। সেবার তাঁর সঙ্গী ছিলেন সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু। রুদ্রপ্রয়াগ থেকেই এই যাত্রার প্রতিটি সংবাদ তিনি পাঠাতে থাকেন প্রিয়জনদের। ১২ জুন ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে মিসেস উইলসনকে লেখেনঃ "হরিদ্বার নামক মনোরম এক ক্ষুদ্র পুরনো শহর থেকে আমরা যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম এবং তীর্থযাত্রার পথ অনুসরণ করে পাহাড়ে উঠেছিলাম। প্রথমে কেদারনাথ দর্শন। সে অংশ সমাপ্ত হয়েছে। এটাই কঠিনতম যাত্রা। এখন আবার বদরীনারায়ণের তুষারের অভিমুখে...।"[১০]

ঐ চিঠিতেই মিস ম্যাকলাউডকে লেখেনঃ "আমরা বদরীনাথের পথে। পথের দৃশ্য অপূর্ব। অবশ্য রাস্তায় অসুবিধাও অনেক। মিসেস বোস আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবে আমরা যাত্রা বন্ধ রাখিনি। অমরনাথের মহান স্মৃতি আমার মনে সদাই জাগরূক।"[১১]

অসুস্থ বসু-জায়াকে সঙ্গে করেই নিবেদিতা তাঁর তীর্থযাত্রা শেষ করলেন ২৯ জুন, ১৯১০। চড়াই শেষে এবার উতরাই। সম্পূর্ণ মানসিক পরিতৃপ্তি নিয়েই ঐদিন নিবেদিতা লিখছেন মিস ম্যাক-লাউডকেঃ "আমাদের অপূর্ব তীর্থযাত্রা সমাপ্ত। স্বামীজী নিশ্চয় চাইতেন, আমরা এই তীর্থভ্রমণ করি। আগামীকাল ভাগ্যে কি আছে কে জানে। কিন্তু এ এক অমর সম্পদ—এমনভাবে রক্ষিত ও পুণ্যাশিসপূত যে এমন কি খোকাও [নিবেদিতার স্নেহধন্য জগদীশচন্দ্র] পর্যন্ত তার মহিমা মেনে নিয়েছে। ভালভাবে নামছি আমরা। কী স্বস্তি।"[১২]

ভগিনী নিবেদিতার তীর্থ-পরিক্রমা শেষ। এবার পত্র-পরিক্রমাও শেষ হয়ে এল। এ পৃথিবীর প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নেবার ঘণ্টা তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। এরপর আর মাত্র একবছর তিনি জীবিত ছিলেন। বয়স হয়েছিল মাত্র চুয়াল্লিশ বছর। কয়েক বছর আগেই তিনি নিজের মৃত্যুর পরোয়ানা ঘোষণা করেছিলেন মিস ম্যাকলাউডকে

৭ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, pp. 1168-1169
৮ Ibid., Vol. I, p. 1
৯ Ibid., Vol. I, p. 134
১০ Ibid., Vol. II, p. 1101
১১ Idid., p. 1103
১২ Ibid., p. 1104

লেখা পত্রে—সম্ভবতঃ তিনি ৪২ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে মারা যাবেন। "আমার মনে হচ্ছে আমি ১৯১২ সালে মারা যাব।"[১৩] তিনি দেহত্যাগ করলেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে (১৩ অক্টোবর)। মৃত্যুকে তাঁর আহ্বান করতে ভয় ছিল না, কিন্তু আফসোস ছিল স্বামীজীর ব্রত উদ্‌যাপন করে যেতে পারলেন না ভেবে।

এ কী তাঁর আফসোস, না গুরুর কাছে জবাবদিহি করবার জন্য এমনি এক দীনতার ছদ্মবেশে পুনর্মিলনের আকুতি? নিবেদিতার জীবনের সাফল্য-অসাফল্যের খতিয়ান সব যে তাঁরই কাছে। মৃত্যুপথযাত্রী প্রিয় বান্ধবী আমেরিকায় মিসেস রোয়েথলিসবারজারকে (নিবেদিতা তাঁকে 'সেন্ট ডোরা' বলে ডাকতেন) সেই বার্তাই পাঠালেন এক বিষাদ-মধুর চিঠিতে (২৩ এপ্রিল, ১৯০৩):

"প্রিয় সেন্ট ডোরা, যদি তুমি সত্যিই এত শীঘ্র ছেড়ে চলে যাও এবং যদি তুমি তার পরে তাঁর সাক্ষাৎ পাও (পাবেই জানি), যাঁর উদ্দেশে আমার সকল প্রার্থনা নিবেদিত, তাঁকে বলো, তিনি যেন আমার হৃদয়ের গভীরে দৃষ্টিপাত করে দেখেন, সেখানে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততার কোন হানি ঘটেছে কিনা—যে-বিশ্বাস তিনি পূর্ণভাবে ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁকে অন্ততঃ একথা বলো—একমাত্র তিনিই ভাঙেন বা ভাঙতে পারেন। এই আশিসই তাঁর কাছ থেকে পেতে চাই। তাঁকে আরও শুধিয়ো, অবতারই তো শুধু পৃথিবীকে বলতে পারেন—আমাকে যেভাবে পার ভালবাস, আমাকে ভালবাসাই মুক্তি।" (এই কথা স্বামীজীও একবার বলেছিলেন নিবেদিতাকে)।[১৪]

না, জীবনে লাভ-লোকসান এবং সাফল্য-অসাফল্য নিয়ে নিবেদিতার কোন দুর্ভাবনাই কোনদিন ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর কর্মাকর্ম ধর্মাধর্ম সবকিছুই তিনি তাঁর গুরুর কাছে সঁপে নিশ্চিন্ত ছিলেন আজীবন। তাঁর পরম আকুতি ছিল শুধুমাত্র একটি বিষয় নিয়েই, তা হলো তাঁর পরম প্রাপ্তি বিষয়ে—বিবেকানন্দ-সাযুজ্য! মরণের পরে সেই আনন্দলোকের (বা বিবেকানন্দ-লোকের) অনির্বচনীয় আনন্দের কথা কল্পনা করে প্রিয়তমা বান্ধবী মিস ম্যাকলাউডকে লিখে জানালেন ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫ তারিখে লেখা চিঠিতে তাঁর হৃদয়ের সেই গভীরতম আকুতি ও মধুরতম প্রার্থনা: "প্রিয়তমা য়ুম (বান্ধবীকে স্নেহ-সম্ভাষণ), আমার কেমন মনে হচ্ছে, তুমি হয়তো ভারতে আর আসবে না, আমি হয়তো যাব না পাশ্চাত্যে। যদি তাই হয়—আমরা আর কখনো মিলব না! [প্রকৃত ঘটনাও সেইরকম। নিবেদিতা যখন ভারতের দার্জিলিং শহরে মহাপ্রয়াণ করেন মিস ম্যাকলাউড তখন আমেরিকায়]। অদ্ভুত! অদ্ভুত। পৃথিবী রইল, জীবনও রইল, তবু তোমার সাক্ষাতে এলাম না—বিচিত্র বটে! তবু তা ঘটতেই পারে। তবু মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুপারের জীবন সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কতই সহজ হয়ে আসে! মৃত্যুর একেবারে পূর্ব পর্যন্ত স্বামীজী কিভাবে তাঁর 'বুড়ো লোকটি'র [শ্রীরামকৃষ্ণ] সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার ভাবে থাকতেন, আমি তা দেখেছি। তা যদি সত্য হয়—সত্য না হবে কেন—অন্যদের ক্ষেত্রেও পুনর্মিলন বা হিসাব-নিকাশ থাকবে না কেন?...

"আমি নিশ্চিত অনুভব করি, তিনি (স্বামীজী) যা ছিলেন আরও বেশি করে তাই হয়ে উঠবেন। কতখানি, তা সহজে কল্পনা করা শক্ত। তাঁর মধ্যে ছোটখাট জিনিসগুলি তাঁর চরিত্রের গভীরতম, বিশিষ্টতম লক্ষণ।..."[১৫]

এই চিঠির শেষাংশ বাস্তবিকই অনন্য—'ক্লাসিক'। নিবেদিতা যেন সত্যসত্যই সেই পুণ্যলোকে 'আলোকের ঝর্নাধারায়' অবগাহন করে উঠে এসে মর্ত্যবাসীর কাছে রাখলেন একটি সুন্দর অমৃতবার্তা:

"কিন্তু ওঃ প্রিয় য়ুম! মনে হয় আরও কোথাও না কোথাও আসফোডেল এবং ক্রোকাসের প্রান্তর থাকবে, তার মধ্য দিয়ে জলধারা প্রবাহিতও হয়ে যাবে—সেখানে তুমি এবং আমি তাঁর জ্যোতির্মণ্ডলে বাস করব, আর তাঁরই সঙ্গে ঘুরব ফিরব!..."[১৬]

অনন্যা নিবেদিতার অনন্য চিঠিপত্রগুলি আমাদের কাছে সেই অনির্বচনীয় জ্যোতির্লোকের দ্বারও উন্মোচন করেছে এবং ভাষায় ও ভাবের মাধুর্যে তা নিঃসন্দেহে সাহিত্যরসোত্তীর্ণ ক্লাসিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। □

১৩ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 636 ১৪ Ibid. p. 562 ১৫ Ibid. Vol. II, p. 721 ১৬ Ibid.

কে

শ্রীঅরবিন্দ

ভাষান্তর : অমলকুমার দে

আকাশের নীলিমায়, অরণ্য-শ্যামলে,
চিত্রিত করেছে প্রভা কার সেই পাণি ?
তেজোবহ গর্ভে যবে নিদ্রিত পবন,
কে জাগাল, আদেশিল বহিতে কি জানি ?

অন্তরে সংগুপ্ত তিনি, প্রকৃতি-গহনে,
মস্তিষ্কের কর্ম তাঁর চিন্তার নির্মাণ ;
পুষ্পদলে গাঁথা তিনি বৈচিত্র্যে স্ফুটনে,
নক্ষত্র আনায় মাঝে ধৃত দীপ্তিমান।

পুরুষের শৌর্যে আর রমণীর অপরূপ রূপে,
বালকের শুচি হাস্যে, বালিকার লজ্জার মাধুরী ;
যে-পাণি নির্দেশে বৃহস্পতি ঘূর্ণ্যমান মহাকাশে,
চিকুর কুঞ্চন গড়ে তার নানা অপূর্ব চাতুরী।

এই তাঁর কর্মভার গুণ্ঠন ও প্রতিবিম্বরাশি ;
কোথায় অস্তিত্ব তাঁর ? কোন্ নামে তাঁর পরিচিতি ?
ব্রহ্মা তিনি কিংবা বিষ্ণু, নর তিনি কিংবা তিনি নারী ?
শরীরী না অশরীরী ? যমজ না এককেই স্থিতি ?

আছে আমাদের প্রেম কৃষ্ণকান্ত উজ্জ্বল বালকে,
ঈশ্বরী মোদের নারী, নগ্নিকা চণ্ডিকা তাঁরে চিনি।
পর্বততুষার মাঝে ধ্যানমগ্ন দেখেছি তাঁহাকে,
দেখিয়াছি কর্মরত ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়েও তিনি।

জানাব বসুধা জুড়ি বিধি তাঁর লীলা ও কৌশল :
নিষ্ঠুর উল্লাস তাঁরি কামনা ও বেদনা সম্ভারে ;
দুঃখভারে হর্ষ তাঁর, তাই ভাসি মোরা অশ্রু-নীরে,
লুব্ধ হই পুনরায় রসে তাঁর মঞ্জিমার হারে।

সম্পূর্ণ সঙ্গীত তাহা শুধু তাঁর হাস্যের কল্লোল,
সকল সৌন্দর্য তাঁর আবেগে উল্লাসে হাস্যময়ী ;
এজীবন হৃদয়স্পন্দন তাঁর, হর্ষ সম্মেলন
শ্রীরাধাকৃষ্ণের, সে-চুম্বনে মর্ত্যপ্রেম চিরজয়ী।

তীব্র ঐশী শক্তি তিনি তুরীভেদী শব্দে উচ্চকিত,
আরোহী শকটে তিনি হানিছেন নিত্য বর্শাপাত ;
অন্তরে কারুণ্যঘন হত্যাকারী নিষ্কলঙ্ক তিনি ;
বিশ্ব লাগি যোদ্ধা দেন কালের অন্তিম করাঘাত।

যুগান্তের ঊর্মিশীর্ষে শব্দশৃঙ্খলের পরিবাহে,
অব্যক্ত, বিপুল শক্তি, সামর্থ্যগরিষ্ঠ, পরিপূত,
যোগিরাজ ধ্যানগম্য শেষশৃঙ্গ তাহারো অতীত,
বিরাজিত সিংহাসনে জয়ীকাল সেথা পরাভূত।

মানবের প্রভু তিনি, তিনি তার অসীম প্রেমিক,
অন্তরে রহিলে দৃষ্টি দেখিতাম চিত্তে চিরদিন ;
অস্মিতায় অন্ধ মোরা, আবেগের আড়ম্বরে আর,
বদ্ধ মোরা চিন্তা দিয়ে সেই রাজ্যে আমরা স্বাধীন

বর্ষহীন মৃত্যুহীন আদিত্যে তাঁহার স্বপ্রকাশ,
মধ্যরাত্রি অন্তরালে ভাসিতেছে প্রতিবিম্ব তাঁর ;
অন্ধ ছিল অন্ধকার নিমজ্জিত তিমির গভীরে,
অন্তরে নিষন্ন তিনি বিরাটের একক বিস্তার।*

* **'Who'—Collected Poems : Sri Aurobindo, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 4th Imprn., 1986, p. 40**

একমাত্র ভরসা

কমল নন্দী

সহস্র বন্ধনযুক্ত এ জীবনে
অনন্ত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা
প্রকাশের পায় না ভাষা।

যত খুঁজি আলো
লক্ষ কামনার কানা গলিতে
প্রতিপদে যাই হারিয়ে
গভীর বেদনায় গুমরে মরে মন।

বাসনার অন্তহীন পথে
সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার দোলায়
শতধা বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বেও
একমাত্র ভরসা
আমারও একজন 'মা' আছেন॥

চিরসুন্দর

গীতি সেনগুপ্ত

সত্য সুন্দর, সুন্দর ফুল—গান,
সুন্দর ধরা, সুন্দর ভগবান॥

ভোরের বেলায় গান গায় পাখি
প্রাণে প্রাণে বাঁধা মিলনের রাখি
সবুজ মাঠে হাওয়ায় দোলে
সোনার বরণ ধান।
সুন্দর ধরা, সুন্দর ভগবান॥

দেবতার দুটি আঁখি জেগে রয়
তাই শান্তি, তাই নির্ভয়।

রাতের বেলায় ধরণী নিঝুম
সবার নয়নে নেমে আসে ঘুম
পৃথিবীর বুকে চাঁদের আলোক
জ্বলে যে অনির্বাণ।
সুন্দর ধরা, সুন্দর ভগবান॥

মা, তোমার নাম

প্রসিত রায়চৌধুরী

মা, তোমার নাম,
মনের শান্তি, প্রাণের আরাম,
যেজন শরণ লয়,
কাটে তার ভবভয়,
কলুষমুক্ত চিত্ত সহসা
হয়ে যায় আলোময়।
মা, তোমার সারদা নাম,
আর্ত-আতুর দুঃখীজনেরা
জপিতেছে অবিরাম॥

প্রতীক্ষা

নিবেদিতা আদিত্য

বাউল বেশে আসবে তুমি
কথা দিয়েছিলে—
দেখব তোমায় বসে আছি
আকুল নয়ন মেলে।

মুমুক্ষুকে মুক্তি দিতে
আসবে তুমি কবে?
সেই আশাতে আছে বসে
ভক্ত-সাধু সবে।

চরণরেণু কুড়িয়ে নিয়ে
রাখব মাথার পরে।
দেবে না কি ধরা তুমি
একটি বারের তরে?

হৃদয়মাঝে কে যেন গো
বলছে বারে বারে—
'এই জনমেই পাবে আমায়
পরিপূর্ণ করে।'

বিশেষ রচনা

বিবেকানন্দ ও বেদান্ত : শিকাগো ভাষণের প্রেক্ষাপটে

নীরদবরণ চক্রবর্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজী বললেন : "বেদান্ত বলে না যে, জগৎ কেবল দুঃখময়। এরূপ বলাই ভুল। আবার এই জগৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ, এরূপ বলাও ঠিক নহে।... জগৎ এই দ্বৈতভাবপূর্ণ ভাল-মন্দের খেলা। বেদান্ত আবার ইহার উপর আর একটি কথা বলে : মনে করিও না যে, ভাল-মন্দ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, বাস্তবিক উহারা একই বস্তু। সেই এক বস্তুই বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন আকারে আবির্ভূত হইয়া একই ব্যক্তির মনে বিভিন্ন ভাব সৃষ্টি করিতেছে।"[৩৭]

স্বামীজীর মতে ভাল-মন্দ নিয়ে জগৎ, তবে ভাল-মন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়, একই বস্তু কখনো ভাল কখনো মন্দরূপে প্রতিভাত হয়। যে-গান সুখের সময় ভাল লাগে, দুঃখের সময় সেই গানই লাগে মন্দ। অর্থাৎ, একেরই বিভিন্ন প্রকাশ। এখানেও মূল কথা—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এই মত অনুসরণ করে মঙ্গলময় ঈশ্বর আছেন, অথচ জগতে অমঙ্গল আছে- এই কথার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা হয়।

বিবেকানন্দ বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ অদ্বৈতবাদ প্রচার করে বললেন যে, জীবাত্মাই পরমাত্মা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "অতীতে যে-সকল দেবতা ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন মানবাত্মাকে, যে-আত্মা সূর্য-চন্দ্র অপেক্ষা বৃহত্তর, স্বর্গ অপেক্ষাও উচ্চতর, এই বিশাল জগৎ অপেক্ষাও বিশালতর। যে-আত্মা জীবাত্মারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার মহিমা কোন গ্রন্থ, কোন শাস্ত্র, কোন বিজ্ঞান কল্পনাও করিতে পারে না। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমময় দেবতা, যিনি চিরদিন বিরাজমান; তিনিই একমাত্র দেবতা, যিনি অতীতেও ছিলেন, বর্তমানেও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন।"[৩৮]

এই মত অনুসারে আত্মবিশ্বাসই ঈশ্বরে বিশ্বাস, কারণ, জীবাত্মাই ঈশ্বর। জীবাত্মারূপী ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ সম্ভব নয়। কারণ, কোন সন্দেহকর্তাই নিজেকে সন্দেহ করতে পারেন না।

জীবাত্মাই ঈশ্বর—এই বৈদান্তিক ধারণা থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ গৃহীত হয়েছে। একদিন কথা-প্রসঙ্গে তিনি 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা'ই প্রকৃত ধর্ম', একথা বলেছিলেন। স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবনে সুযোগ এলে তিনি এই ভাব জগতে প্রচার করবেন। পরবর্তী কালে এই ভাবের ভিত্তিতেই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মধ্যে অদ্বৈতবেদান্তের কর্মে পরিণতি বা বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়। একে 'কর্মে পরিণত বেদান্ত' বলা হয়। স্বামীজীর বেদান্তের সঙ্গে এই ভাবই যুক্ত।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বৌদ্ধ ভিক্ষু বা রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের সেবাভাব থেকে যে স্বতন্ত্র, তা উপলব্ধি করতে হবে। বৌদ্ধ বা খ্রীস্টানদের সেবা করুণা বা দয়া ভাব ভিত্তিক এবং এখানে সেব্য ও সেবকের দ্বৈতভাব স্বীকৃত। কিন্তু, স্বামীজীর সেবাব্রতে করুণা বা দয়ার ভাব নেই, দ্বৈতভাবও নেই। অদ্বৈতবোধ ভিত্তিক বলে স্বামীজীর সেবার ক্ষেত্রে সেবক সেব্যের সেবা করে নিজেরই সেবা করে। কারণ, অদ্বৈতমতে সেব্য ও সেবকের মধ্যে একই আত্মা বর্তমান বলে তারা স্বরূপতঃ অভিন্ন। শিবজ্ঞানে জীবসেবা আসলে আত্মসেবা। যদিও বা সেবক ও সেব্যের মধ্যে ব্যবহারিক ভেদ করা হয়, তবু বলতে হবে যে, সেব্য কোন অংশেই সেবকের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়, সেবক সেবা করার সুযোগ পেয়ে

৩৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৪

৩৮ ঐ, পৃঃ ৩০৫

নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, প্রতিমায় যদি ঈশ্বরের পূজা হয় তবে জীবদেহে ঈশ্বরের পূজা হবে না? শিবপূজা করার সময় পূজক শিব হয়ে পূজো করেন। তেমনি সেবক সেব্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করবে। কোন জীব যখন এই ভাবে অন্য জীবের সঙ্গে একাত্ম হয় তখন সে তার বিশেষ দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

শিবজ্ঞানে জীবসেবা সাধারণ কর্মযোগ নয়। এটি একটি নতুন সাধনা যাতে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও রাজযোগ সমন্বিত হয়েছে। যেকোন একটি যোগ থেকে এই যোগসমন্বয় দ্রুততর ফলপ্রসূ। এই সাধনায় জ্ঞানযোগের সাহায্যে জীবকে শিব বলে জানতে হবে, শিবকে সমস্ত জীবাত্মা বলে প্রণিধান করতে হবে রাজযোগের সাহায্যে। ভক্তিযোগের সাহায্যে জীবরূপী শিবকে ভালবাসতে হবে এবং নিষ্কামভাবে তার সেবাকর্ম চালাতে হবে। এই সেবাকর্মে সেব্য ও সেবকের দ্বৈতভাব নেই, তাদের আধ্যাত্মিক ঐক্য বা অভিন্নতা উপলব্ধ এবং এখানে অদ্বৈত ভাবেরই প্রকাশ।

এই সাধনায় মানুষকেই দেবতা বলে স্বীকার করা হয়েছে। মানুষের এমন মর্যাদা অন্য কোন মত দিতে পারে না। সাধারণ মানবতাবাদ থেকে এটা উন্নততর, কারণ এখানে মানুষকে মানুষ বলে মূল্যবান মনে না করে মানুষকে দেবতা বলে মূল্যবান মনে করা হয়েছে।

সমাজে যে যেখানে যে-কাজ করছে সে যদি সে-কাজ সেবার দৃষ্টিতে গ্রহণ করে তবে সেই কাজ অনেক ভাল হবে এবং এর ফলে সমাজের উপকার হবে। বেদান্ত যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে তা মানুষের ভয় দূর করে এবং যেকোন কাজই সাহসের সঙ্গে করার ব্রত নিতে প্রেরণা দেয়।

শঙ্করাচার্য জ্ঞানকেই মুক্তির সাধন বলেছেন। কর্ম ও ভক্তি চিত্তশুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু কর্ম বা ভক্তি না হলেও চলতে পারে, জ্ঞানই যথেষ্ট। ভক্তিবাদী বেদান্তীরা ভক্তিকেই বিশেষ করে মুক্তির সাধন বলেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ রুচি ও প্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন যোগ-সাধনা—জ্ঞান বা কর্ম বা ভক্তি বা রাজযোগ বা এদের সমন্বয় অনুসরণ করার কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তি : "আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য বা অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।"[৩৯]

বিবেকানন্দের বেদান্ত কারও বিশেষ অধিকার স্বীকার করে না। বেদান্ত মতে সর্বত্রই যদি একেরই অবস্থান তবে কোন বিশেষ লোক কোন বিশেষ সুযোগ বা সুবিধা দাবি করতে পারে না। স্বামীজী বলেছেন : "বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার ধারণা মনুষ্যজীবনের কলঙ্কস্বরূপ। দুইটি শক্তি যেন নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে; একটি বর্ণ ও জাতি-ভেদ সৃষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা ভাঙ্গিতেছে। অন্যভাবে বলিতে গেলে একটি সুবিধার সৃষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা ভাঙ্গিতেছে। আর যতই ব্যক্তিগত সুবিধা ভাঙ্গিয়া যায়, ততই সে-সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি আসিতে থাকে। এইরূপ সংগ্রাম আমরা আমাদের চতুর্দিকে দেখিতে পাই। অবশ্য প্রথমে আসে পাশব সুবিধার ধারণা—দুর্বলের উপর সবলের অধিকার চেষ্টা। এই জগতে ধনের অধিকারও ঐরূপ। একটি লোকের অপরের তুলনায় যদি বেশি অর্থ হয়, তাহা হইলে যাহারা কম অর্থশালী, সে তাহাদের উপর একটু অধিকার স্থাপন বা সুবিধাভোগ করিতে চায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অধিকার-লিপ্সা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক অন্যদের তুলনায় বেশি জানে শোনে, সেইজন্য সে-অধিকতর সুবিধার দাবি করে। সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকার হইল আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার। ইহা নিকৃষ্টতম, কেননা ইহা সর্বাধিক পরপীড়ক।... বৈদান্তিক কাহাকেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ অধিকার দিতে পারেন না, একেবারেই নয়। একই শক্তি তো সকলের মধ্যেই বর্তমান; কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ, কোথাও বা কিছু অল্প প্রকাশ। একই

৩৯ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৫

শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে। অধিকারের দাবি তবে কোথায় ?"[৪০]

স্বামীজীর বেদান্ত মানুষের বিচারশক্তিকে বিশেষ স্বীকৃতি দেয়, যদিও এতে বুদ্ধির অতীত এক সত্তার, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বীকৃতি বর্তমান। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন না, বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলেছেন, ব্রহ্ম অবাঙ্-মনসগোচর—তবে শুদ্ধ মনের গোচর। শাস্ত্রে তাঁর কথা শোনা (শ্রবণ) যায়। আমরা পরে এই বিষয়ে মনন করতে পারি (বিচার-বুদ্ধির দ্বারা); কিন্তু নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করে তাঁর সাক্ষাৎ-কার লাভ করতে হয়। সাক্ষাৎকার হলে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের ভেদ থাকে না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান। এই অবস্থা বুদ্ধির অতীত, কিন্তু বুদ্ধি-বিরোধী নয়। আসলে বুদ্ধি এপর্যন্ত পেঁছাতে পারে না। বুদ্ধির সীমা আছে।

স্বামীজী বলেন, নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি একমাত্র বৈদান্তিকই আবিষ্কার করতে পারেন। তিনি বলেছেন: "যদিও সকল ধর্মসম্প্রদায়ই 'হত্যা করিও না, অনিষ্ট করিও না, প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাস' ইত্যাদি নীতিবাক্য শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি কেহই তাহাদের কারণ নির্দেশ করেন নাই। 'কেন আমি আমার প্রতিবেশীর ক্ষতিসাধন করিব না ?'—এই প্রশ্নের সন্তোষজনক বা সংশয়াতীত কোন উত্তরই ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দুরা শুধু মতবাদ লইয়া তৃপ্ত না থাকিয়া আধ্যাত্মিক গবেষণা-সহায়ে ইহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। হিন্দু বলেন, আত্মা নির্বিশেষ ও সর্বব্যাপী, এবং সেইজন্য অনন্ত। অনন্ত বস্তু কখনও দুইটি হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে এক অনন্তের দ্বারা অপর অনন্ত সীমাবদ্ধ হইবে। জীবাত্মা সেই অনন্ত সর্বব্যাপী পরমাত্মার অংশবিশেষ ; অতএব প্রতিবেশীকে আঘাত করিলে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই আঘাত করা হইবে। এই স্থূল আধ্যাত্মিক তত্ত্বটিই সর্বপ্রকার নীতিবাক্যের মূলে নিহিত আছে।"[৪১]

স্বামীজী বেদান্ত দর্শন ও ধর্মকে বলেছেন—নৈর্ব্যক্তিক। এর উদ্ভবের জন্য এ কোন ব্যক্তি বা ধর্মগুরুর কাছে ঋণী নয় ; কোন ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে এ গড়ে ওঠেনি। অথচ যেসব দর্শন বা ধর্মমত ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাদের কারও বিরুদ্ধে এর কোন বিদ্বেষ নেই।[৪২]

বিবেকানন্দের বেদান্ত সর্বশেষ স্তরে বা অদ্বৈত অবস্থায় 'বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব নয়, বিশ্বাত্মার ঐক্য' প্রকাশ করে। ঈশ্বরকে পিতা কল্পনা করে আমরা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কথা বলি। বেদান্তের এক স্তরে একথা সত্য, কিন্তু বোধে ও উপলব্ধিতে আরও অগ্রগতি হলে সমস্ত কিছুই এক ব্রহ্ম—এই জ্ঞান হয় এবং তখন বিশ্বাত্মার ঐক্য অনুভব করা যায়।

ঈশ্বর ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে বেদান্তীদের মধ্যে মতভেদ আছে। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে নির্গুণ ব্রহ্ম একমাত্র সত্য ; ঈশ্বর মায়ার উপাধিতে উপহিত, মিথ্যা। রামানুজ প্রভৃতি ভক্তিবাদীদের মতে ব্রহ্মই ঈশ্বর। কিন্তু শিকাগোয় 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ভাষণে বিবেকানন্দ বলেছেন, আমরা নিম্ন সত্য থেকে উচ্চ সত্যে যাই। কারও কাছে ব্রহ্মই ঈশ্বর হতে পারেন। তিনি সগুণ সাধনা করেন, মূর্তিপূজাও করতে পারেন। তাঁকে নিন্দা করার কিছু নেই। তবে কেউ মূর্তি ত্যাগ করতে পারেন, তাঁর তাতে দরকার নাও থাকতে পারে, তিনি নির্গুণ সাধনা করেন। স্বামীজী হিমালয়ের ওপরে মায়াবতীতে নির্গুণ সাধনার ব্যবস্থা করে-ছিলেন, যেখানে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ।

বিবেকানন্দ শঙ্করের মতোই জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি—দুইই স্বীকার করতেন। বুদ্ধদেবও করতেন। তবে রামানুজ বিদেহমুক্তিই মেনেছেন, জীবন্মুক্তি মানেননি। জীবিত অবস্থায় যে-মুক্তি, তাকে বলে জীবন্মুক্তি। এই রকম মুক্ত পুরুষেরা 'লোক সংগ্রহার্থে' বা লোককল্যাণের জন্য কাজ করেন। বুদ্ধ, শঙ্কর, বিবেকানন্দ—এঁরা সকলেই ছিলেন জীবন্মুক্ত। দেহাবসানে যে-মুক্তি, তাকে বলে বিদেহ-মুক্তি। বিদেহমুক্তের দেহ থাকে না বলে তাঁর পক্ষে কোন কাজই সম্ভব নয়।

অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা একজীববাদী, অর্থাৎ তাঁরা বহুজীব স্বীকার করেন না, স্বীকার করেন এক জীব। তাঁদের মতে কোন ব্যক্তিরই আলাদাভাবে মুক্তি হতে পারে না,

৪০ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬ ৪১ ঐ, পৃঃ ৩২০-৩২১ ৪২ ঐ, পৃঃ ৩২৩-৩২৪

মুক্তি হবে সকলের একসঙ্গে। জনৈক পণ্ডিত অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী বক্তৃতায় বলেছিলেন, স্বামীজী নাকি একজীববাদী এবং সকলের একসঙ্গে মুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আমরা স্বামীজীর বাণী ও রচনাবলীতে এর সমর্থন পাইনি। আমাদের ধারণা, বিবেকানন্দ প্রত্যেকেরই আলাদাভাবে মুক্তিলাভ সম্ভব বলেই মনে করতেন, নইলে "কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—ইহার মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও"—একথা বলবেন কেন? মঠ ও মিশনের আদর্শ 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'ই বা হবে কি করে?

বেদান্তের ব্রহ্ম 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'। তিনি 'আনন্দরূপম্', 'অমৃতম্'। তিনি 'রসো বৈ সঃ'। তাতে দুঃখ নেই, নিরানন্দভাব নেই, শুষ্কতা নেই। তাঁকে যিনি লাভ করেন তিনিও আনন্দ ও রস উপলব্ধি করেন। কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলার মধ্যে দিয়েও 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' উপলব্ধি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সঙ্গীত-প্রীতির কথা তো সকলেরই জানা। উভয়ই কাব্য, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনুরাগী ছিলেন। বিবেকানন্দের বেদান্তের সঙ্গে এই সমস্ত ললিতকলার অবিরোধ বর্তমান।

স্বামীজীর মতে বিশ্বপ্রেমের ভিত্তি বেদান্ত। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, প্রেমে দ্বৈতবোধ আছে; দুজনের মধ্যে সাধারণতঃ প্রেম হয়। কিন্তু উপনিষদ্ বলেছেন: "আত্মনাস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি"—আত্মার জন্যই সবকিছু প্রিয় হয়। অর্থাৎ, সমস্ত কিছুর সঙ্গেই আত্মার জন্য আত্মার একাত্মতা। আমি আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। আমার 'পাকা আমি' সকলের মধ্যে বর্তমান বলেই আমি সবাইকে ভালবাসতে পারি। আমার আত্মাই সর্বভূতাত্মা। আত্মপ্রেম এবং সর্বভূতপ্রেম সমার্থক।

আমরা বিবেকানন্দের বেদান্ত নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি, এবং তার প্রকৃতির একটি রূপরেখা দেবার চেষ্টা করেছি। অনেকে বলেন, নব্যন্যায় যেমন প্রাচীন ন্যায় থেকে স্বতন্ত্র তেমনি বিবেকানন্দের বেদান্ত বা নববেদান্ত প্রাচীন বেদান্ত থেকে স্বতন্ত্র। এখানে প্রশ্ন হবে, 'স্বতন্ত্র' কথার অর্থ কি? স্বতন্ত্র যদি হয় সম্পূর্ণ স্বাধীন, তবে বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রাচীন বেদান্ত থেকে স্বতন্ত্র—একথা বোধ হয় বলা যাবে না। নব্যন্যায় এই অর্থে নিশ্চয়ই প্রাচীন ন্যায় থেকে স্বতন্ত্র নয়। কারণ, নব্যন্যায় প্রাচীন ন্যায়ের অনেক সিদ্ধান্ত স্বীকার করে, তবে নতুন কথাও কিছু বলে। স্বামীজী অতীতের ভিত্তিতে বর্তমান গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি অতীতচারী নই, তবে আমি অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে চাই। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান গড়ার কথা তিনি বলেননি। বিবেকানন্দের বেদান্ত সনাতন বেদান্তের ভিত্তিতেই গঠিত। তবে তাঁর ব্যাখ্যায় নতুনত্ব অবশ্যই আছে। এই জন্যই তিনি দার্শনিক। আমাদের দেশের দার্শনিকেরা ভাষ্যকার নামে পরিচিত। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রমুখ মনীষিগণ বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন। এই সমস্ত ভাষ্যকারদের অনুগামীরা আবার ভাষ্যের নতুন টীকা করেছেন। পদ্মপাদাচার্য এবং বাচস্পতি মিশ্র শাঙ্কর ভাষ্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে যথাক্রমে বিবরণ এবং ভামতী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। এরা অদ্বৈতবাদী হলেও এদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিবেকানন্দও ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া, জগৎ, জীব, মুক্তি, মুক্তির উপায় প্রভৃতির যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পূর্বগামী বেদান্তীদের বক্তব্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন বলা যেতে পারে। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত—বেদান্তের এই তিন সম্প্রদায়ই পরম্পরাক্রমে সত্যের দিকে এগিয়েছে—এই ছিল স্বামীজীর বিশ্বাস। অদ্বৈতবাদ তাঁর মতে সর্বোত্তম বেদান্ত। তবে অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যায় তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকেই পথপ্রদর্শক বলে গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর অদ্বৈতবাদী মত-ব্যাখ্যায় নতুনত্ব এসেছে। এর জন্য তাঁকে 'নববেদান্তী' বা 'নব-অদ্বৈতবাদী' বলা হয়। এটি অযৌক্তিক নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁর বেদান্ত প্রাচীন বেদান্ত বা প্রাচীন অদ্বৈতের ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করে না। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয়, যে, স্বামীজী শুধু উপনিষদের 'ভাষ্য' করেননি, তিনি সত্যকে দর্শনও করেছেন। এই অর্থেও তিনি দার্শনিক। □

[সমাপ্ত]

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আলোয়ারে শ্রীবিবেকানন্দ

শ্রীশ্রমণক

[পূর্বানুবৃত্তি]

'শ্রীশ্রমণক' স্পষ্টতঃ প্রবন্ধ-রচয়িতার ছদ্মনাম। মনে হয়, প্রবন্ধটি তৎকালীন উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দের লেখা। শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের নেপথ্যে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এবছর স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ-পূর্তি বর্ষ। সেকথা স্মরণ রেখে এই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে।

যুগ্ম সম্পাদক

স্বামীজী আলোয়ারে প্রায় দুই মাস অবস্থিত করিয়াছেন, আর এখানে থাকিবেন না। ইহা শুনিয়া তাঁহার জনৈক মন্ত্রশিষ্য তাঁহাকে আপন আলয়ে ভিক্ষা করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজী তাঁহার বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলেন, শিষ্য তখন স্নান করিতেছিলেন। স্বামীজী উপবিষ্ট হইলে শিষ্য প্রশ্ন করিলেনঃ "বাবাজী, তেল মাখায় কি কোন উপকার আছে?"

স্বামীজী কহিলেনঃ "আছে বৈকি। এক ছটাক তেল ভাল করে মাখলে এক পোয়া ঘি খাওয়ার কাজ করে।"

আহারাদির পর নানা কথাপ্রসঙ্গে শিষ্য প্রশ্ন করিলেনঃ "স্বামীজী মহারাজ, আপনি বলেন চরিত্রের দিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখা চাই—সত্যনিষ্ঠ, সরল (sincere), পরোপকারী, কর্মঠ আর অসীম সাহসী হওয়া চাই ; এসব না থাকলে গৃহস্থ স্বধর্ম করতে পারে না, চিত্তশুদ্ধি হয় না। কিন্তু চাকরী করা তো দাসত্ব, তাতে এসব ভাব আসে না দেখছি। তাই ভাবি, আমাদের তো অর্থোপার্জন করতে হবে, নইলে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান কেমন করে করব? আজকালকার ব্যবসা যেরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে এতে তো অনেক মাচকোফের আছে। আমার মনে হয়, এতে অনেক অর্থের আবশ্যক, তারপর সরলতা থাকে না। তা মহারাজ, কোন্ কাজ করলে সব দিক বজায় থাকে?"

স্বামীজী উত্তর করিলেনঃ "দেখ, এবিষয়ে আমিও অনেক ভেবেছি। কিন্তু দেখতে পাই চরিত্র বজায় রেখে অর্থ উপার্জন করতে কেউ বড় চায় না, এ-বিষয়টা নিয়ে কেউ ভাবে না, কারুর মনে একটা সমস্যা ওঠে না, আমাদের শিক্ষার দোষেই এটা দাঁড়িয়েছে। যাহোক আমি তো ভেবে চিন্তে চাষবাস করাটা বড়ই ভাল মনে করেছি। চাষবাসের কথা বললেই এখন মনে হয়, তবে লেখাপড়া কেন শিখলাম? চাষবাসের কথা বললেই প্রথমেই মনে হয়, দেশশুদ্ধ লোককে কি আবার চাষা হয়ে দাঁড়াতে হবে? দেশশুদ্ধ লোক তো চাষা আছেই, তাই না আমাদের এত দুর্গতি। তা নয়, মহাভারত পড়ে দেখ। জনক ঋষি এক হাতে লাঙ্গল দিচ্ছেন আর এক হাতে বেদ অধ্যয়ন করছেন। আমাদের দেশে ঋষিরা সকলেই ঐ কাজ করেছেন। আবার আজকাল দেখ, আমেরিকা চাষবাস করেই এত বড় হয়েছে। নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষবাস নয়, বিদ্বান বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে। পল্লীগ্রামের ছেলেরা দুপাতা ইংরেজী পড়ে শহরে পালিয়ে আসে। গ্রামে হয়তো অনেক জায়গা-জমি আছে, তাতে তাদের পেট ভরে না, মনের তৃপ্তি হয় না। শহুরে হতে হবে, চাকরী করতে হবে। অন্যান্য জাতের মতো আমাদের হিন্দুজাতটা তাই বেড়ে উঠতে পারছে না। আমাদের মৃত্যুসংখ্যা এত বেশি যে, যদি এরকমভাবে জন্ম-মৃত্যু চলতে থাকে, তাহলে তো আমরা মরতে বসেছি। এর একটা কারণ, উৎপন্ন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না, শহরে বাস করার ঝোঁক বেশি, আর একটু পড়াশুনা করেই চাষার ছেলে স্বধর্ম ত্যাগ করে গোরার গোলামী করতে দৌড়ায়। পল্লীগ্রামে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, রোগ তো প্রায় হয় না। ছোটখাট খারাপ গ্রামগুলো ভাল হয়ে ওঠে, লেখাপড়া জানা লোকে পল্লীগ্রামে বাস করলে, আর চাষবাসটা বিজ্ঞানসাহায্যে করলে উৎপন্ন বেশি

হয়, চাষাদের চোখ খুলে যায়, তাদেরও একটু আধটু বুদ্ধি খোলে, লেখাপড়া করতে ইচ্ছা হয়, আর যেটা আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বেশি আবশ্যক তাও হয়।"

শিষ্য আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "সেটা কি স্বামীজী?"

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেনঃ "এই ছোট জাতে আর বড় জাতের মধ্যে একটা ভাই-ভাই ভাবে মেশামিশি হয়, যদি তোমাদের মতো লোকেরা কিছু লেখাপড়া শিখে পল্লীগ্রামে থেকে চাষবাস করে, আর চাষালোকদের সঙ্গে আপনার মতো ব্যবহার করে, ঘৃণা না করে, তো দেখবে তারা এতই বশীভূত হয়ে পড়বে যে, তোমার জন্য জান দিতে প্রস্তুত হবে। যেটা আমাদের এখন অত্যাবশ্যক—জনসাধারণকে শিক্ষা (mass education), ছোট জাতের মধ্যে ধর্মের উচ্চ উচ্চ ভাব দেওয়া, পরস্পর সহানুভূতি, ভালবাসা, উপকার করতে শেখানো, তাও অতি অল্প আয়াসেই আরম্ভ হবে।"

শিষ্য আবার কহিলেনঃ "সে কেমন করে হবে?"

স্বামীজী বলিলেনঃ "কেন, দেখ না পল্লীগ্রামে ছোট জাতের সঙ্গে একটু মেশামিশি করলে তারা কেমন আগ্রহের সঙ্গে ভদ্রলোকের সঙ্গ করতে চায়। জ্ঞানপিপাসা যে সকল মানুষের ভিতর রয়েছে। তাই না তারা একজন ভদ্রলোক পেলে তাঁকে ঘিরে বসে, তাঁর কথা গিলতে থাকে। তাঁরা সেই সুযোগে যদি নিজের বাড়িতে ঐরকম তাদের সব জড়ো করে সন্ধ্যার সময় গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন তো রাজনৈতিক আন্দোলন করে হাজার বছরে যা না করতে পারা যাবে, তার শতগুণ বেশি ফল দশ বছরে হয়ে পড়বে।"

শিষ্য ক্ষণেক চিন্তা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "তা মহারাজ, এরকম লোকেরও তো অনেক দরকার তাহলে?"

স্বামীজী কহিলেনঃ "লোক তো অনেকেই আছে—কেবল শিক্ষিত লোকদের মাথার ভিতর এইটে ঢুকিয়ে দেওয়া চাই; কেবল খবরের কাগজে রাজনৈতিক হুজুক মাচালে কি তা হয়? যাঁরা ঐ আন্দোলনই কেবল করেন, তাঁদের এই সমস্ত জানাও চাই আর যুবসম্প্রদায়কে এটুকুও বুঝিয়ে দেওয়া চাই, আর তারা যাতে ঐরূপ কার্য করে তার ফিকির করা চাই, নইলে একটা আন্দোলনের সময় এল তো দু-দশ কথা বক্তৃতা ঝাড়লুম তারপর যা হয় হবে, আমি তো বাহবা নিয়ে এলুম, তাহলে কি কোন উন্নতি হয়? তারপর তাঁদের মধ্যে এক-আধজনকে ঐরকম কার্যও আরম্ভ করে দেখানো চাই। Practicality যে বড়ই দরকার। সেইটে যে এদেশে নেই, কেবল আন্দোলনে যে সেটা আসবার উপায় নেই। লোকে কাজ দেখে কাজ করতে শেখে, না, কেবল কথায় কাজ করতে শেখে? যে কেবল কথায় কাজ করাতে চায়, সে তো গোলামের ওপর গোলাম বানাতে চায়। যে যেরকম শিক্ষা দিতে চায় তাকে সেই রকম কাজ করে দেখাতে হয়, তবে লোকে শেখে; এই হচ্ছে জগতের নিয়ম।"

শিষ্য বলিলেনঃ "ঠিক মহারাজ, তাই এদেশের লোকে বক্তৃতা শুনে শুনে কেবল বক্তৃতা দিতেই শিখেছে; কেননা রাজনৈতিক আন্দোলনে কেবল-মাত্র কাজ হচ্ছে বক্তৃতা ঝাড়া আর কাগজ লেখা; আর কিছুই নয়।"

শিষ্য কিছু চিন্তা করিয়া আবার কহিলেনঃ "আমি ভেবে দেখছি, চাকরী নিয়ে মহা অন্যায় করেছি। সময়ে সময়ে বড়ই ভুল করেছি বলে কষ্ট হয়।"

স্বামীজী কহিলেনঃ "দেখ, জীবনসংগ্রামে যে হেরে যায়, সে-ই পিছন দিকে তাকায়। পিছন দিকে তাকালে কি হবে, কেবল সামনের কিছুই দৃষ্ট হবে না। তাই ক্রমাগত সামনে নজর রাখা চাই, ক্রমাগত এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা চাই। যদি একজন একটা পাপ করে থাকে, তো তাই ভেবে কাঁদলে কি ভাল হবে? তাকে ভাল কার্যের অনুষ্ঠান করতে হবে। হার তো আছেই, যার হার নেই তার কোন শিক্ষাও নেই, তাই হারটা একেবারে নিষ্ফল না ভেবে তাতে যেটুকু শিক্ষা আসে সেটুকু নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। আর ভেবে চিন্তে বেশ বুঝে-সুজে যে-কাজটা ভাল বলে বিশ্বাস হবে, তার সাধনের জন্য প্রাণপণ করে সেই কার্যে লেগে যেতে হয়। আবার সেই কার্য করতে গিয়ে প্রথমেই যদি একটা-আধটা জোর ধাক্কা খাওয়া যায় তো হেরে পালিয়ে আসা বড়ই দোষ, মহা

পাপ। আবার, আরবারও যদি তাতে হার হয়, যদি তাতে সর্বস্বান্ত হয়ে শেষে প্রাণ যায়, তাও ভাল। এই পণ করে কার্যে নামতে হয়, তবে তার কার্য সিদ্ধ হয়।"

পরদিন ২৮ মার্চ স্বামীজী আলোয়ার হইতে বিদায় লইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ অনেকেই অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলেন। ছয়-সাত ঘণ্টা রথযাত্রা করিয়া আট-নয় ক্রোশ দূরে পাণ্ডুপোল নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে হনুমানজীর এক প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, তথায় প্রতি বৎসর হনুমানজীর একটা বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। হনুমানজীর দর্শন করিয়া সেই রাত্রি সেই মন্দিরেই অবস্থিতি করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে স্বামীজী পদব্রজে চলিলেন। পথ অতিশয় দুর্গম, চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণী এবং শ্বাপদসঙ্কুল বন, সঙ্গে দুই-চারিজন আলোয়ারনিবাসী বন্ধু স্বেচ্ছায় স্বামীজীর সহিত কিছুদূর পর্যন্ত পরিভ্রমণার্থ গমন করিতেছেন। স্বামীজী চলিতে চলিতে কখনো গান করিতেছেন কখনো বা গল্প বলিয়া সকলে উচ্চ হাস্যে বন প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। এইরূপে ষোল মাইল গমন করিয়া টাহলায় নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন ও দর্শনাদি করিয়া সেই রাত্রি তথায় যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে চলিতে আরম্ভ করিয়া নয় ক্রোশ দূরে নারায়ণীতে এক দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে প্রতি বৎসর একটি সুবৃহৎ মেলা হইয়া থাক এবং রাজপুতনার অনেক দূরদূরান্তের লোক আসিয়া এই জাগ্রত দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। পরদিন আরও সাত-আট ক্রোশ চলিয়া বসওয়া রেলস্টেশনে পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে রেলে জয়পুর গমন করিলেন। আলোয়ারের পূর্বোক্ত শিষ্যটি তাঁহার জন্য বান্দি-কুইতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ট্রেন তথায় আসিলে তিনি স্বামীজীর গাড়িতে উঠিলেন এবং জয়পুরে গমন করিয়া অগ্রে স্বামীজীকে অনেক বুঝাইয়া তাঁহার একখানি ফটো তুলাইয়া লইলেন। * □

[সমাপ্ত]

উদ্বোধন, ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৩, পৃঃ ৪১-৫১

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির (মাঝে)। পিছনে—বিষ্ণুমন্দির/গোবিন্দজীর মন্দির/ রাধাকান্ত-মন্দির। সামনে—কালীমন্দিরের নাটমন্দির; এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মথুরবাবুকে অনুরোধ করে পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় তিনি বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সমকালীন অগ্রগণ্য সাধক ও পণ্ডিতদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। বিচারসভায় সমবেত সাধক ও পণ্ডিতবর্গ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দিরের (দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছবি অবশ্য প্রচ্ছদে নেই।) অবস্থান বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু হিন্দুদের দিক থেকেই নয়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের দিক থেকেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি তাৎপর্য রয়েছে। মন্দিরের জমির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, বাকি অংশের অনেকটা জুড়ে ছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী সাহেবের পীরের দরগা। এই যোগাযোগ যেন দৈবনির্দিষ্ট। কারণ, এই ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে যুগাবতার মহাসমন্বয়ের উদার বাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। এই বাণীই আজ শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে। দেশ ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মত ও পথের অসহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে এই বক্তব্য আমরা তুলে ধরতে চাইছি।—**যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন**

স্মৃতিকথা

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পুণ্যদর্শন

গোষ্ঠবিহারী সাহা

[পূর্বানুবৃত্তি]

মহারাজের কাছে যাতায়াত করছি বেশ কিছু-দিন হয়ে গেছে,—প্রায় দুবছর হয়েছে। একদিন তাঁর বসবার ঘরে টেবিলের খুব নিকট মেঝেতে বসে আছি; খবে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই চলে গেছেন। আমি আর সুধন্য মহারাজ (স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ) শুধু ছিলাম। সেসময় মহারাজের বক্তৃতা ও লেখাগুলি আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেছি। মহারাজকে নিরিবিলিতে পেয়ে আমি সাহস করে বললাম: "মহারাজ, আপনার অনেক বক্তৃতা এখনো ছাপানো হয়নি। সেগুলি ছাপিয়ে, আপনার সব লেখা ও বক্তৃতা 'Complete Works'-রূপে প্রকাশ করলে আমরা সবাই পড়তে পারতাম ও আপনার ভাবের সাথে পরিচিত হতে পারতাম—আগামী দিনের মানুষ আপনাকে জানতে বুঝতে পারত। লোকেরা কত উপকৃত হতো।" কথাটি শুনে মহারাজ একটু গম্ভীর হয়ে সুধন্য মহারাজকে বললেন: "দেখ, ছেলেটি কি বলছে। তোমরা উঠে পড়ে লাগ, লোকে চাচ্ছে। বড়ই দেরি হয়ে গেল।"

একদিন তাঁর বসবার ঘরে তাঁকে প্রণাম করতে গেছি। কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত আছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করছেন। আমিও একটি প্রশ্ন করলাম: "মহারাজ, আপনার 'স্তোত্র-রত্নাকর' বইটাতে সংস্কৃত স্তোত্রগুলির যে পদ্যে বঙ্গানুবাদ আছে, সেই অনুবাদগুলি কি আপনি নিজেই করেছেন?" আমার জানার আগ্রহ ছিল যে, মহারাজ সংস্কৃত কবিতার মতো বাঙলা কবিতাও রচনা করেন কিনা। অনুবাদগুলি আমার খুব ভাল লেগেছিল, তাই ঐরূপ আগ্রহ হয়েছিল। শুনে কিন্তু তিনি একটু বিরক্ত হয়েই বললেন: "আমি করিনি, তবে কি ভূতে করেছে?" তাঁর বিরক্তির মধ্যেও আমি তাঁর স্বভাবসুলভ স্নেহের স্পর্শ পেলাম। তিনি যে বাঙলা কবিতাও রচনা করেন, তা জেনে সেদিন আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। পরে তাঁর রচিত 'মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব-বিবেকানন্দ' গানটি শুনে বুঝেছিলাম বাঙলা রচনাতেও তিনি কত দক্ষ ছিলেন।[১]

কিছুদিন পর সন্ধ্যার সময় একদিন বেদান্ত মঠে গিয়েছি মহারাজকে দর্শন করার আশা নিয়ে। দোতলায় উঠবার সিঁড়ির কাছে যেতেই দেখি, মহারাজ সিঁড়ি দিয়ে অতি ধীরে ধীরে নেমে আসছেন। তাঁকে এরূপ অবস্থায় ইতঃপূর্বে আমি কখনো দেখিনি। শরীরের ব্যালান্স যেন রাখতে পারছেন না, টাল খেয়ে খেয়ে রেলিং ধরে ধরে নামছেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, চারিদিকের কিছুই যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি। একটা দিব্য আবেশে অতি ধীরে নেমে আসছেন তিনি। ভয় ও সম্ভ্রমে আমি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম; তিনি আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে একতলার সিঁড়ির মুখের কাছের ঘরটিতে গিয়ে বসলেন। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বেদান্ত মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভদ্রলোকও বসে আছেন। বুঝতে পারলাম, বেদান্ত মঠের গভর্নিং বডির মীটিং হবে। তাই আমি ফিরে এলাম। সেদিন আর মহারাজের শ্রীচরণের পাশে বসে তাঁর কথামৃত পান করা হলো না; তবে মহারাজের যে-রূপটি আজ দেখার সৌভাগ্য হলো তা অন্তরের গভীরে চিরদিনের জন্য গ্রথিত হয়ে রইল। দেখলাম, জগতের সমস্ত আসক্তি ছিন্ন করে

১ বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত গানটির রচয়িতা হিসাবে স্বামী অভেদানন্দের নাম থাকলেও গানটি স্বামী অভেদানন্দের রচনা নয় বলে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ আমাদের জানিয়েছেন। গানটির রচয়িতা স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য জিতেন্দ্রনাথ সরকার। এবিষয়ে অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 'বিবেক ভারতী' পত্রিকায় (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৭, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৬০-১৬২) একটি প্রবন্ধে ঐ একই তথ্য জানিয়েছেন। জিতেন্দ্রনাথ সরকার নিজেও কয়েকবছর আগে জানিয়েছিলেন যে, গানটি তাঁরই লেখা এবং পরে তিনি সেটি স্বামী অভেদানন্দের কাছে পাঠান। গানটি অভেদানন্দজীর প্রশংসা অর্জন করে।—**যুগ্ম সম্পাদক**

মানুষের মন যখন ভাবমুখী হয়, ভগবদ্ভাবে ডুবে যায় তখন তাঁর হাবভাব, চালচলন, গতিবিধি, দৃষ্টি ও মুখাবয়বের ভিতর দিয়ে দুর্লভ এক স্বর্গীয় ভাবের আভাস পাওয়া যায়।

আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। যথারীতি সন্ধ্যার সময় তাঁর বৈঠকখানাঘরে গিয়ে দেখি, মহারাজ তাঁর টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে আছেন ও গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। ঘরে মেঝের ওপর কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত বসে আছেন, আমিও একপাশে বসলাম। দেখলাম, স্বামীজী মহারাজ বেশ উদাসীন, অন্যমনস্ক—গড়গড়ায় ধূমপান করছেন। মনে হলো, খেতে হয় তাই খাচ্ছেন, নিতান্ত অনিচ্ছায় যেন খাচ্ছেন। মাঝে মাঝে বলছেন: "এ আর ভাল লাগছে না।" একথা বলে আরও দু-একবার গড়গড়ার নলটা মুখে লাগালেন ও প্রতিবারই বলছেন: "না ভাল লাগছে না", বলেই নলটি রেখে দিলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, দৃষ্টি বড়ই উদাসীন; কোন এক অতি উচ্চ বিষয়ের দিকে যেন মনটা আকৃষ্ট—বড়ই অন্তর্মুখী। আজ শ্রীশ্রীঠাকুর যেন আমায় দেখিয়ে দিলেন, কাকে বলে নির্বাসনা; নির্বাসনা এলে কিরূপ মনের ভাব হয়, আচরণই বা কেমন হয়।

আর একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ছে। সম্ভবতঃ এটি ১৯৩৭ সনের কথা। তখন স্যার নলিনীরঞ্জন সরকার কলকাতা করপোরেশনের মেয়র। কোন এক বিশেষ উপলক্ষে বেদান্ত মঠে এক সভার অধিবেশন হবে। উপলক্ষটা এখন আর মনে পড়ছে না। সংবাদটা শুনে বিকালবেলা আমরা গিয়েছি। স্যার নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতিত্ব করবেন। দেখলাম, তিনি নির্দিষ্ট সময়ে এলেন। তাঁকে সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হলো। মহারাজ তখন ছিলেন তাঁর দোতলার ঘরে। একটু পরে তিনিও সভাস্থলে গেলেন। সভাস্থলে প্রবেশ করার পূর্বে স্যার নলিনীরঞ্জন মহারাজের সঙ্গে দেখা করেননি বা সভাস্থলেও তাঁর সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলে পরিচিত হলেন না। মহারাজ এটি লক্ষ্য করেই কিনা জানি না, কিছুক্ষণ পরে তাঁর আসনের পাশে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট স্যার নলিনীরঞ্জনের দিকে বার দুই তাকালেন। কিন্তু নলিনীরঞ্জনবাবু কোন কথা বললেন না। সভার কাজ আরম্ভ হলো। প্রথমেই সভাপতি মহারাজকে কিছু বলবার অনুরোধ করলেন। মহারাজ বেশ একটা দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। একটা ভাবোদ্দীপক সংস্কৃত শ্লোক অতি গম্ভীর অথচ সুমিষ্ট সুরে প্রথমেই তিনি আবৃত্তি করলেন। তারপর ধর্ম কি এবং ধর্ম বলতে সত্যিকারের কি বোঝায়, তা অতি সবিস্তারে কিন্তু প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করতে লাগলেন। প্রসঙ্গক্রমে মনুসংহিতা, মহাভারত, উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করে বক্তব্য-বস্তু আরও স্পষ্ট ও যুক্তিভিত্তিক করলেন। আলোচনাটি বেশ দীর্ঘ ও হৃদয়গ্রাহী হলো। পরে সভাপতির ভাষণে নলিনীরঞ্জন সরকার মহারাজের আলোচনার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন: স্বামীজীর আলোচনা শুনে আমার ধর্ম সম্বন্ধে ধারণাই আমূল পরিবর্তিত হলো, ধর্মের আদর্শ ও ভাব যে এত উদার আমি তা জানতাম না। স্বামীজীর কথায় বুঝতে পারছি যে, আমরাও স্ব-স্ব কর্তব্য করে ধর্মের কাজই করে যাচ্ছি। ভাব ও আদর্শ সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হয়ে আপন কর্তব্য করতে পারলে সবাই ধর্ম-জীবন যাপন করতে পারে। ধর্ম এত উদার ও মহান যে, সাধারণ লোকের তা ধারণা নেই এবং সেজন্যেই জগতে এত হিংসা, ঝগড়াবিবাদ ও অশান্তি চলছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐ উদার ধর্মমতের বহুল প্রচার হলে দেশের ও জগতের সত্যিকার কল্যাণ হবে।

ঐবছর (১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ) অক্টোবর মাসে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার সময় 'গোষ্ঠাষ্টমী' তিথির দিন মহারাজ অহৈতুকী করুণাবশে আমায় কৃপা করলেন। অপ্রত্যাশিত ও অপ্রার্থিত সে-কৃপার কাহিনী হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে আমি সযত্নে পোষণ করছি, ভাষায় তার বিস্তৃত বিবরণ ব্যক্ত করতে মন চায় না। এরপর তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। তাঁকে দেখবার, তাঁর কাছে বসে থাকবার আকাঙ্ক্ষা খুবই বেড়ে গেল। তাঁর কথা শোনার চেয়েও তাঁকে দেখতে ও তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকতেই যেন আমি বিশেষ করে বেদান্ত মঠে যেতে লাগলাম।

১৯৩৮ সনের একটি ঘটনা। একদিন সন্ধ্যায়

মহারাজকে দর্শন করতে গিয়েছি, কিন্তু এদিনের পরিবেশটি বড়ই মর্মস্পর্শী। এদিন তাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানসিক অবস্থায় দেখতে পেলাম—খুব গম্ভীর, অন্যমনস্ক এবং বিষণ্ণ—যা পূর্বে কখনো আমি দেখিনি। দর্শনার্থী ভক্তের সংখ্যাও সেদিন খুব কম ছিল। যতদূর মনে পড়ে, দু-তিনজন বোধহয় ছিলেন। মহারাজের খুব কাছে গিয়েই মেঝেতে বসলাম। তিনি খুব বিষণ্ণভাবে চেয়ারের বাঁদিকের হাতলের ওপর ঝুঁকে মাথা নিচু করে আপন মনে মৃদু শব্দে বলছিলেনঃ "আর ভাল লাগছে না, কোন কাজ আর করবার আছে বলে তো বুঝতে পারছি না। এখন জগতের কিছুই যে আর ভাল লাগছে না—ঠাকুর এই দেহটাকে খুব খাটিয়ে নিয়েছেন, আর কোন কাজ এই দেহ দিয়ে করাবেন বলেও তো বোধ হচ্ছে না।" কথাগুলি খুব ব্যাকুলতায় ভরা; মনের আবেগেই তিনি বলেছিলেন—কাকেও শোনাতে নয়, তবে খুব কাছে বসেছিলাম তাই শুনতে পাচ্ছিলাম। বেশ পরিষ্কার বোধ হলো, তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও তো তাঁর লীলাপার্ষদদের একে একে টেনে নিয়ে কোলে তুলে নিচ্ছেন। ঘটনাটি তাঁর অনুরাগী ভক্তদের কাউকে কাউকে আমি তখন বলেছিলামও; তাঁরা সবাই একই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন।

ঐবছরের শেষ দিকে এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে মহারাজকে একদিন প্রণাম করতে গিয়েছি। দেখলাম, মহারাজের একজন প্রিয় ভক্ত তাঁর ছেলেকে নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন। ছেলেটির কয়েকদিন আগেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে; তাই সেও তার বাবার সঙ্গে এসেছে স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করবে বলে। সে প্রণাম করলে ভক্তটি বললেনঃ "মহারাজ, ওকে আশীর্বাদ করুন যেন ভালভাবে পাশ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ হাত তুলে আশীর্বাদের মুদ্রায় বললেনঃ "আমি আশীর্বাদ করছি ওর মঙ্গল হবে।" কথাটা শুনে আমারও ইচ্ছা হলো যে, আমিও তো পরীক্ষা দিয়েছি, আমিও কেন আশীর্বাদ চাইছি না! আর ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলেও ফেললাম। মহারাজ শুনে একটু হাসলেন। বললেনঃ "কেন খারাপ লিখেছ নাকি?" আমি বললামঃ "না মহারাজ, তবুও আপনার আশীর্বাদ চাই।" মহারাজ তখন চেয়ার থেকে উঠে পড়েছেন শোবার ঘরে যাবেন বলে। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়েই চলে গেলেন। তখন আমার মনে একটু খটকা এল; কিন্তু পরক্ষণেই মনে খুব জোর এল, ভাবলামঃ মহারাজকে তো বলেছি, ব্যাস, আমার আবার ভাবনা কি? যথাসময়ে এম.এ. পরীক্ষার ফল বেরল; ফল আমার আশানুরূপই হয়েছিল। তখন আমি আমাদের দেশের বাড়িতে ছিলাম। তাই মহারাজকে সংবাদটা চিঠিতে জানালাম। অসুস্থতার জন্য তিনি নিজের হাতে তখন আর চিঠি লিখতেন না, তাই তাঁর সেবক লিখেছিলেনঃ "আপনার পরীক্ষার ফলের সংবাদ পেয়ে মহারাজ খুব খুশি হয়ে আশীর্বাদ করছেন।"

তারপর বেশ কিছুদিন চলে গেল। নানাভাবে দেশের বাড়িতে ব্যস্ত থাকায় মহারাজকে প্রণাম করতে অনেকদিন আমি যেতে পারিনি। অবশেষে একদিন কলকাতায় এসে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি তাঁর শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ; পেটে ও হাত-পায়ে জল জমেছে, শরীরও ফুলে গেছে ও খুবই দুর্বল হয়েছে। তিনি তাঁর বসবার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন; চোখের চাউনি অতি কোমল ও শান্ত, মুখে মৃদু মৃদু অপার্থিব হাসি। মুখমণ্ডল থেকে একটা উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে; কণ্ঠস্বর ক্ষীণ কিন্তু স্নেহ ও করুণায় ভরা। কথা খুব কম বলেন। স্পষ্টই বোধ হচ্ছিল, তাঁর হৃদয়দেবতার চরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তিনি সেই রোগশয্যায় শুয়ে আছেন মায়ের কোলে শিশুটির মতো। আরও অনেকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁকে দর্শন করলাম। তারপর প্রণাম করে চলে এলাম। এটাই যে আমার তাঁকে শেষ দর্শন, তা তখনো আমি বুঝতে পারিনি। কয়েকদিন পরে দেশের বাড়িতে চলে এলাম। শীঘ্র আর কলকাতা যাওয়া হলো না। কিছুদিন পরে অকস্মাৎ একদিন দুঃসংবাদটা পেলাম—মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করেছেন। শেষ দর্শনের দিন দেখা তাঁর সেই দিব্যমূর্তি আমার মনে এমন উজ্জ্বলভাবে ভেসে উঠেছিল যে, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তাঁর পার্থিব শরীরে মহারাজকে আমি আর দেখতে পাব না। ☐ [সমাপ্ত]

নিবন্ধ

"সম্ভবামি যুগে যুগে"

কমলা সেন

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। মহাবীর অর্জুন যুদ্ধকামী আত্মীয়-বন্ধুগণকে দেখে সহসা বিষাদগ্রস্ত হয়ে বললেন, স্বজন-হত্যায় কোন মঙ্গল তিনি দর্শন করছেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম পালনই মনুষ্যধর্ম বলে তাঁর অজ্ঞানজনিত মোহ দূর করতে চাইলেন এবং ভক্ত-সখা অর্জুনকে অবতারত্বের গূঢ় রহস্যকথা জানালেন :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

দুষ্কৃতীদিগের বিনাশ, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান বিষ্ণুর যুগে যুগে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার এই প্রতিশ্রুতি মহাভারত, পুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বারবার পরিলক্ষিত হয়। মহাভারতের বনপর্বে মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে বিষ্ণু বললেন, হিংসাপরায়ণ ও সুরগণের অবধ্য দৈত্য-রাক্ষসগণ উৎপন্ন হলে তিনি নরদেহ ধারণ করে তাদের দমন করে সকলকে শান্ত করেন। শান্তি-পর্বে দেখা যায়, পরমভক্ত নারদকে ভগবান বলছেন, দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে দুরাত্মা কংসের বিনাশ সাধনের জন্য তিনি মথুরাপুরীতে জন্ম নেবেন। ভীষ্মপর্বে আছে, স্বয়ং ব্রহ্মা প্রার্থনা করছেন : আপনি বাসুদেব নামে বিখ্যাত হয়ে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করুন এবং অসুর সংহারের নিমিত্ত অবনীতলে অবতীর্ণ হোন। মুনিশাপে মৃত্যু-পথযাত্রী মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট হরি-কথা শ্রবণ করছেন : অসুরভারপীড়িতা বসুধা ব্রহ্মার শরণাগত হলে ব্রহ্মা ও দেবগণের কাতর প্রার্থনায় বিষ্ণুবাণী ধ্বনিত হলো—জগন্নাথ নারায়ণ সবকিছুই অবগত আছেন। পৃথিবীকে রক্ষার জন্য তিনি শীঘ্রই নরদেহে আবির্ভূত হবেন।

কিন্তু এপ্রার্থনা কি শুধু দেবগণেরই? না, এপ্রার্থনা সমগ্র বিশ্বলোকের। অধর্ম-তাপিত মানুষ যখন একান্তভাবে তাঁরই শরণাগত হয়ে পরিত্রাণের জন্য প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা জানায়, তখনই আর্তশরণ পাপহারী নারায়ণ আর থাকতে না পেরে নরবিগ্রহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন ব্যথিত ধরণীতলে। অবতারগণ যুগপ্রয়োজনে নানা অলৌকিক দৈবকার্য সাধন করায় তাঁদের ঈশত্ব প্রকাশ হয়ে পড়লেও তাঁরা মানুষেরই হাসি-কান্নার মাঝে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে আপনার লীলারস আস্বাদন করে পরম তৃপ্তিলাভ করেন। ভক্তসাধকগণের কাছেও তাঁর ঐশ্বর্য অপেক্ষা মাধুর্যরসই মধুর হয়ে ওঠে। তাঁর ভাগবত ঐশ্বর্য ক-জন যথার্থ উপলব্ধি করতে পারেন? ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সঠিক চিনেছিলেন মাত্র দ্বাদশজন ঋষি। শিশু কৃষ্ণ কংস-প্রেরিত রাক্ষসী ও অসুরগণকে অবলীলায় সংহার করলেন। কিন্তু জননী যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্যরস এমনই যে, ঈশ্বরের করুণায় পুত্রের অমঙ্গল কেটে গেছে ভেবে তিনি প্রতিবার নিশ্চিন্ত হলেন।

ভগবানের মাধুর্যরস আস্বাদন করার আকাঙ্ক্ষাতেই বুঝি সাধক, ভক্ত-কবি কাব্যে ও পুরাণে ঈশ্বরীয় তত্ত্বের সঙ্গে লীলাময়ের মধুর লীলাকাহিনী ভক্তি-ভালবাসায় রঞ্জিত করে এঁকে গেছেন। আর সেই কাহিনী যুগ যুগ ধরে প্রেমরসে ও ভক্তিরসে সিঞ্চিত করেছে মানব-হৃদয়কে, দিয়েছে ধর্মের পথে প্রেরণা। তাই কৃষ্ণকথা কোনদিন পুরনো হয়ে যাবে না। আজও ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষের কাছে কৃষ্ণকথা তাঁদের প্রাণের কথা।

*

ঘন মেঘের কৃষ্ণচ্ছায়া কালিন্দীজলে। সুপ্তিমগ্না ব্রজপুরী। সুষুপ্তা যশোমতীর শ্রীমুখে

কিসের এক আনন্দবিভা। যমুনার ওপারে মথুরা-পুরী। উগ্রসেনকে বন্দী করে তাঁর মদগর্বিত দুর্বিনীত পুত্র কংস রাজা হয়েছেন। এই পাপকর্মের প্রতিবাদ করে শুভানুধ্যায়িগণকে ভোগ করতে হয়েছে কারাবাস, মৃত্যুদণ্ড। নিপীড়িত প্রজাগণ আর্ত হাহাকার করছে। কংসের এ যেন আনন্দ বিলাস। এই কংসই ভগিনী দেবকীকে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। বসুদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়ে রাজরথে বরবধূকে প্রাসাদে আনছিলেন। কংসই স্বয়ং সারথি। এমন সময়ে আকাশপথে ধ্বনিত হলো সেই দৈববাণী :

যাহারে বহিস অরে অবোধ রাজন্।
ই'হারই অষ্টম গর্ভে তোমার মরণ ॥

মুহূর্তে সুগভীর স্নেহ পরিণত হলো নিষ্ঠুর ক্রোধে। ভগিনীকে হত্যা করতে উদ্যত কংস বসুদেবের পুত্রার্পণের প্রতিশ্রুতিতে ক্ষান্ত হলেন। কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবকী-বসুদেবের স্থান হলো কংস-কারাগারে কঠোর প্রহরায়।

দিন যায়, বছর যায়। নিজের মৃত্যুর সকল সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে কংস একে একে দেবকীর কোল আলো করা ছটি সন্তানকেই বধ করলেন। সপ্তম সন্তানকে বিষ্ণুমায়া দেবকীর গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে বসুদেব-ভার্যা ব্রজবাসিনী রোহিণীর কোলে দিলেন। সেই পুত্রের নাম সঙ্কর্ষণ বা বলরাম।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষ—অষ্টমী তিথি। সন্তান-জন্মের শুভক্ষণ সমাগত। এবারে কারাবাসে ক্লিষ্টা দেবকীর দীপ্তরূপ ও অঙ্গতেজে কংসও ভীত। কংসভয়ে শঙ্কাতুরা হয়েও দেবকীর অন্তরে পরম আনন্দ। সহসা দেবকী প্রসববেদনা অনুভব করলেন। তবে কি তাঁর আবির্ভাবের লগ্ন এল। সম্মুখে দেখলেন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্যামতনু কমলনেত্র পীতবাস নারায়ণ। এ কী বিশ্ববিমোহন রূপ। কোটি চন্দ্রপ্রভার ন্যায় দেহপ্রভা। পদ্মগন্ধে সুরভিত কারাগৃহ। রোমাঞ্চিত বসুদেব-দেবকী প্রণত হলেন। আনন্দ-বিস্ময়ে দেবকী চেতনা হারালেন। চেতনা ফিরতেই দেখলেন—কোলে শুভদর্শন দিব্য শিশুপুত্র। নারায়ণই পুত্ররূপে এসেছেন অন্ধকারায়। মধুর গম্ভীর কণ্ঠে নিনাদিত হলো : "যাও বসুদেব, আমাকে নন্দালয়ে যশোমতীর কাছে রেখে তাঁর শিশুকন্যাকে নিয়ে এস।"

হঠাৎ খসে পড়ল শৃঙ্খল। লৌহ-অর্গল খুলে গেল। প্রহরীরা নিদ্রায় অচেতন। ভগবান যখন আসেন তখন সকল বন্ধনই খুলে যায়। জনহীন অন্ধকার পথে বসুদেব চলেছেন শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে। সামনে উত্তাল যমুনা। মাথার ওপরে ভাদ্রের অশান্ত বারিধারা। বাসুকি সহস্রফণার ছত্র মেলে ধরলেন বসুদেব-কোলে সদ্যোজাত শিশুকে বৃষ্টির ঝাপটা থেকে রক্ষা করার জন্য। শৃগাল যমুনার তরঙ্গরাশির মধ্য দিয়ে অন্ধকারে বসুদেবকে পথ দেখিয়ে চলেছে। বসুদেব জলে নামলেন। হঠাৎ পুত্র পড়ে গেলেন জলে। ব্যাকুল পিতা অতি কষ্টে জল থেকে তুলে পরম মমতায় তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন। যমুনারও বুঝি সাধ হয়েছিল শিশু নারায়ণের অঙ্গের পরশ পেতে।

নিশুতি রাত। ঘুমন্ত নন্দপুরী। বসুদেব পরম যত্নে কৃষ্ণকে যশোমতীর পাশে রেখে কন্যাটিকে বুকে করে ফিরে এলেন কারাগৃহে। প্রবেশমাত্রই মহামায়ার মায়ায় লৌহদ্বার রুদ্ধ হলো। অঙ্গে লগ্ন হলো শৃঙ্খল। শিশুর কান্নায় জাগ্রত প্রহরী ছুটল কংসের নিকট। মহাক্রোধে উন্মত্ত, মহাভয়ে ভীত কংস দুরন্তবেগে এসেই জননীর বক্ষ থেকে কন্যাটিকে ছিনিয়ে নিয়ে আছড়ে ফেললেন। পাষাণ স্পর্শ করার পূর্বেই কন্যা জ্যোতির্ময়ী যোগমায়া-রূপে আকাশপথে উঠে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন : "তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।"

রাত পোহাল। দীপ্তরশ্মি সবিতৃদেব উদিত হলেন। দিকে দিকে বাজল মঙ্গল-শঙ্খ। জাগল ব্রজপুরী। নন্দরানী যশোমতী সুপ্তিভাঙা নয়নে দেখলেন—পাশে শায়িত নীল কমলের ন্যায় কৃষ্ণকান্তি দিব্য লাবণ্যময় পুত্র। বুকে তুলে নিতেই কোমল অঙ্গের স্পর্শে অঙ্গে অঙ্গে জাগল পুলক শিহরণ। নয়নে আনন্দাশ্রু। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। পুত্রমুখ দর্শনে তিলেক বিচ্ছেদও আর সয় না। শতবার মুখচুম্বন করেও হৃদয় অতৃপ্ত। মাতৃহৃদয়ের আনন্দ শতধারে ঝরে পড়ল। স্নেহরসে বিহ্বল গোপনারীগণ শিশুকে বুকে নেবার জন্য অধীর। গোপগণও নয়নানন্দ শ্রীনন্দ-নন্দনকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল। ভগবানকে না চিনেও

তাঁর প্রতি এ কী দুর্দম আকর্ষণ। কৃষ্ণপ্রেমে আত্মসুখ-ধন-জন তুচ্ছ হয়ে যায়। হৃদয়ে জেগে থাকেন শুধু কৃষ্ণচন্দ্র। এমনি করেই কি নারায়ণের আবির্ভাব হয় মর্ত্যধূলিতে।

চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়েন কৃষ্ণ-বলরাম। ব্রজবাসীর নয়নের মণি যশোদা-দুলাল। প্রেমে, রঙ্গক্রীড়ায়, বীর্যে, চাঞ্চল্যে তাঁরা সকলকে ভুলিয়ে রাখেন। কংসের চক্রান্ত কত সহজেই ব্যর্থ করেন কৃষ্ণ। দুরাত্মা কংস এবারে মল্লক্রীড়ায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান কৃষ্ণ-বলরামকে। মহা আনন্দে দু-ভাই আসেন মথুরাপুরীতে। তাঁদের রূপলাবণ্যে, বিক্রমে মুগ্ধ মথুরাবাসীর প্রাণে আশা জাগে। দুষ্ট কংসের আর বিলম্ব সয় না। রঙ্গভূমিতে এলেন কৃষ্ণ-বলরাম, দুর্ধর্ষ মল্লযোদ্ধাদের হেলায় সংহার করলেন। এরপরে দুষ্টচক্রী ক্ষিপ্ত কংসকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে নিধন করলেন শ্রীকৃষ্ণ, মহাভয় থেকে, অত্যাচার থেকে ত্রাণ করলেন জনগণকে।

*

ভগবান অবতার হয়ে এমনি করেই আসেন এক এক যুগে এক এক রূপে। 'পূর্ণ অবতার' শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর বহু যুগ কেটে গেছে। ঘোর কলিতে মানুষ আবার অধর্মে ক্লিষ্ট, পথভ্রান্ত। ঐহিক সুখের জন্যই ধর্ম ও সত্যের পথে, ঈশ্বরলাভের পথে যাত্রাই যে ধর্মসাধনা তা ভুলে মানুষ প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে মত্ত। ভাবগ্রাহী নারায়ণ অসহায় মানুষের অন্তরের বেদনাকে উপলব্ধি করে আবার আবির্ভূত হলেন নরদেহে। কিন্তু কলিযুগের এই অবতারের সবই বড় বিচিত্র, মধুর, অভিনব। তাঁর জন্মও অলৌকিক। কিন্তু তাঁর জন্ম রাজার ঘরে নয়, অন্ধকারায় নয়, স্তম্ভ বিদীর্ণ করেও তাঁর আবির্ভাব নয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণের দীন কুটিরে দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর কোল আলো করে তিনি এবার এলেন। জন্মেই সাজলেন ভস্ম-ভূষিত শিশু সন্ন্যাসী। তাঁর জীবনের আলো সহস্রধারায় বিচ্ছুরিত। গৃহে থেকেও, তথাকথিত নিরক্ষর হয়েও তিনি মহাজ্ঞানী। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে যোগ্যাযোগ্য চিনেও আপামর সকলের প্রতি তাঁর মায়ের মতো করুণা। ঈশ্বরকে কেমন করে ডাকতে হয়, তাঁর জন্য কি রকম কাঁদতে হয়, তা নাস্তিককেও শেখালেন। অনুতাপের অশ্রুজলে ভেসে তাঁর নাম করতে পারলেই, তা যে-নামেই ডাকা হোক আর যেকোন রূপের ধ্যান করেই হোক, তাঁর প্রতি সরল ঐকান্তিক প্রেমের আগুনে বাসনা ও আসক্তির খাদ পুড়িয়ে একমনা হয়ে ডাকতে পারলেই তিনি সাড়া দেন। তাঁর প্রাণকাড়া, সবখোয়ানো আর্তক্রন্দনে পাষাণময়ী জগজ্জননী তাঁকে চিন্ময়ীরূপে দেখা দিলেন।

অপর অবতারগণ নানা অস্ত্রে—নখরে, ধনুর্বাণে, চক্রে পৃথিবী-পীড়ক শুভনাশক দানবকে সংহার করে ধর্মসংস্থাপন করেছেন। কিন্তু এই অবতার দেখলেন, মানুষ আজ বাইরের শত্রুর দ্বারা নয়, নিজের অন্তরের শুভনাশী রিপুর তাড়নেই পীড়িত, পথভ্রষ্ট। এই রিপুকে—মিথ্যার কালিমালিপ্ত রিপুকে দমনের আশ্চর্য এক অস্ত্র—সত্যরূপ অমোঘ অস্ত্রে ভূষিত হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন: "সত্য-ই কলির তপস্যা।" যে-মানুষ স্বরূপতঃ ঈশ্বর, সে-মানুষ আপনাকে ভুলে অসত্যের পথে চলেছে। কাঙালের বেশে কাঙালকে করুণা করতে তিনি মনুষ্যত্বের শুদ্ধ আদর্শ প্রকাশ করলেন। অধ্যাত্ম শুদ্ধতা অর্জন করে মানুষ 'আত্মদীপ' হবে, 'মান-হুঁশ' হবে সত্যকেই একমাত্র আশ্রয় করে। আর সকলকে তিনি শেখালেন প্রেমধর্ম। সকল মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখে শ্রদ্ধা করতে হবে—ভালবেসে নারায়ণরূপী মানুষকে দয়া নয়—সেবা করতে হবে, "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র পূজা। তবেই অন্তরের নারায়ণ জাগ্রত হবেন। প্রাণ-ঐশ্বর্যে পূর্ণ, সর্বজনবোধ্য সরল-সহজ ভাষায়, সকলের পরিচিত সাধারণ ঘটনার দৃষ্টান্তের আলোয় তিনি কুসংস্কার ও মিথ্যাচারের কালিমা ঘুচিয়ে দিলেন। দুঃখী অবোধজন জানল, তাদেরও একজন আছেন—যিনি তাদের জন্য আকুল হয়ে কাঁদেন।

এই অবতার—যুগাবতার—'অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সকল ধর্মমতের সুকঠোর সাধনা করে পরমত-অসহিষ্ণুতার মূলে আঘাত করলেন এবং নবীন অথচ চিরন্তন ধর্মমত প্রবর্তন করলেন—"যত মত তত পথ" যার মন্ত্র, "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" যার সাধনপথ। ভ্রান্তি-মলিন, অসত্য-পীড়িত মানুষকে তিনি মুক্তির আলো দেখালেন। যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ তিনিই এবার শ্রীরামকৃষ্ণ। □

গীতার সাংখ্যযোগ ও গীতাতত্ত্ব

কৃষ্ণা সেন

মানুষ সামাজিক জীব। আত্মীয়-স্বজনের গণ্ডির মধ্যে স্নেহ-ভালবাসায় ভরা মন নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়াই মানুষ তার জীবনের একমাত্র কাম্য বলে ধরে নেয়। নিজস্ব কিছু হলেই তার ওপর স্বাভাবিক মমত্ববোধ জন্মায়। কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয়ের মনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শোচনীয় পরিণাম কি হতে পারে সে-কথা মনে পড়ল। স্বজনবধ অনিবার্য। ভারাক্রান্ত অর্জুনের মন আজ চঞ্চল—অধর্মের উচ্ছেদ-চিন্তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে স্বজনবিয়োগ-চিন্তা। ভক্তের প্রতি ভগবানের অসীম কৃপা। অতএব অশ্রুপূর্ণলোচন বিষণ্ণ দিগ্‌ভ্রান্ত অর্জুনকে যথার্থ শ্রেয়ের পথ দেখালেন শ্রীমধুসূদন। 'সাংখ্য' অর্থ জ্ঞান এবং 'যোগ' অর্থ এখানে কর্ম। জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অথবা পৃথগ্‌রূপে 'জ্ঞানযোগ' ও 'কর্মযোগ' বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে বলেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'সাংখ্যযোগ'।

প্রাণিমাত্রেরই ধর্ম'' দয়া ও মায়া। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, সর্বভূতে সমান ভালবাসা দয়া। আত্মীয়ের প্রতি মমতা—মায়া। মায়াতে জীব অজ্ঞান ও আবদ্ধ হয়, কিন্তু দয়াতে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং ক্রমে বন্ধন-মুক্তি হয়। অর্জুনের মন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। অর্জুন অস্ত্রত্যাগ করলে হৃত পাণ্ডবরাজ্য পুনরুদ্ধার অসম্ভব। মোহাচ্ছন্ন অর্জুন দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়েছেন—বুঝতে পারছেন না যে, তাঁর মতো বীরের পক্ষে এই ক্লীবত্ব কতটা হাস্যকর। চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হলেই মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। অজ্ঞানীর চিত্তই দুর্বল, কিন্তু জ্ঞানী তাঁর লক্ষ্যে স্থির থাকেন। তাই জ্ঞানীর চিত্ত সবল। অর্জুন বীরশ্রেষ্ঠ—শরীরে বা মনে তাঁর দুর্বল হওয়ার কথা নয়। পিতামহ ভীষ্ম বা অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে আহত করতে অর্জুনের মন রাজি নয়। একদিকে স্নেহ-মমতা, অন্যদিকে কর্তব্য। যুদ্ধ না করলে রাজ্যহীন পাণ্ডবদের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে, কিন্তু জয়ী হলে সমস্ত ভোগের সামগ্রী রুধিরাক্ত হয়ে যাবে। কাজেই জয় বা পরাজয় কোন্‌টি শ্রেয়স্কর? কর্মের যথার্থ মানদণ্ড বা নীতি স্থির করতে না পেরে অর্জুন শিষ্যভাবে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছেন: কর্মের একটা স্পষ্ট নীতি আমাকে দাও, আমি তা হারিয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। এমন পথ দেখাও, এমন শিক্ষা দাও যেন আমি নিশ্চিত মনে কর্মের পথে অগ্রসর হতে পারি। স্বজন-বিয়োগাশঙ্কায় অস্থিতচিত্ত তৃতীয় পাণ্ডব উপলব্ধি করেছেন যে, অর্থ, কাম বা স্বর্গের আধিপত্যলাভেও তাঁর বিকল ইন্দ্রিয়ের শোক প্রশমিত হবে না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অমৃতভাষের মধ্য দিয়ে ধর্ম, জ্ঞান, কর্তব্য, অকর্তব্য স্থির করে দিলে তবেই তিনি সংশয়মুক্ত মনে যুদ্ধে অগ্রসর হতে পারবেন।

শরণাগত বিষাদাচ্ছন্ন অর্জুনকে মহাকর্মযজ্ঞে দীক্ষিত করতে পরমানন্দময় মাধব প্রসন্নচিত্তে এগিয়ে এলেন। মানুষ যখনই ঐকান্তিক ভক্তি নিয়ে ভগবানের শরণ নেয় তখনই সে ভগবানের বাণী শোনে। ঋষির তপোবন বা নিভৃত গুহাই কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের স্থান নয়; যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে মহাকোলাহলের মধ্যেও ভগবান ভক্তহৃদয়ে প্রকট হন এবং তাকে ধর্ম ও কর্তব্যের পথে পরিচালিত করেন। যুদ্ধবিমুখ অর্জুনের চিত্তকে বশে আনতে হলে শোক ও মোহের মূলোৎপাটন করতে হবে আত্মিক তত্ত্বের মাধ্যমে। যাঁদের মৃত্যু-আশঙ্কায় অর্জুন মুহ্যমান, তাঁদের জন্য শোক করা কেন? মৃত্যুতে কেবল দেহের বিনাশ; দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর এবং অনিত্য কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থিত আত্মা নিত্য এবং অবিনাশী। যথার্থ পণ্ডিত বা জ্ঞানী

গতাসু অথবা অগতাসু কারও জন্যেই শোক করেন না। অজ্ঞ মানুষ দেহকেই আত্মা মনে করে দেহের জন্য দুঃখশোক প্রকাশ করে। 'মৃত্যু' শব্দের অর্থ দেহনাশ, কিন্তু আত্মা জন্মমরণহীন। মৃত্যুই সর্বশেষ কথা নয়—মৃত্যু দেহান্তরমাত্র। আমরা অন্য রূপে অন্য নামে ছিলাম আবার ভবিষ্যতেও থাকব—'আসব যাব চিরদিনের সেই আমি'। ত্রিকালজ্ঞ ভগবান বাসুদেব কর্মফলদাতা—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের অধীশ্বর। ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয়, ইহলোকে আগমন, পরলোকে গতি, বিদ্যা, অবিদ্যা কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নয়। এই সর্বেশ্বর পরমাত্মা যেমন নিত্য, জীবাত্মাও তেমন নিত্য। জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ বলেই নিত্য। শংকরাচার্য বলছেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, অতএব নিত্য। দ্বৈত বা অদ্বৈত যেকোন মতই ধরা হোক না কেন জীবাত্মার নিত্যত্ব সকলেই স্বীকার করেন। সকল জীবকেই বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধত্ব—এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সেই রকম মৃত্যুর পর অন্য দেহধারণও জীবের একটি অবস্থান্তর-প্রাপ্তি। পণ্ডিতরা মৃত্যুকে দেহের একটি পরিবর্তন জানেন বলেই শোকপ্রাপ্ত হন না।

হিন্দুধর্মের দুটি প্রধান তত্ত্ব—আত্মার অবিনাশিত্ব এবং পুনর্জন্ম। জীব তার কৃতকর্মানুসারে স্বর্গভোগের পর আবার জন্মগ্রহণ করে। জীবিতকালে আমাদের দেহের পরিবর্তন আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু দেহনাশের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের পূর্বদেহের কোন অনুভূতি থাকে না। জাতিস্মরের দৃষ্টান্ত খুবই অকিঞ্চিৎকর। তবে পূর্বজন্মের কথা স্মরণে আনতে না পারলেও একটা অস্ফুট সংস্কার অনেক সময়ে আমাদের মনে উদয় হয়। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে আছে—"সুন্দর দৃশ্য দর্শন এবং মধুর শব্দ শ্রবণ করে সুখী প্রাণীরও চিত্ত যে উৎসুক হয়, তার কারণ এই যে, নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের অস্পষ্ট কিন্তু ভাবস্থির কোন সৌহৃদ্যের কথা তার স্মৃতিপটে উদিত হয়।" ক্ষীণমেধা বলেই হয়তো সাধারণ লোক পূর্বজন্মের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না।

দেহান্তরপ্রাপ্তি এবং পুনর্জন্মবাদ মেনে নিলেও যে-দেহ আমার প্রিয়, যে-রূপে আমি আমার স্বজনকে ভালবাসি, সেই দেহ ও রূপের বিনাশে জীবাত্মার কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের স্পর্শ-যোগে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হবেই। এটি সহ্য করতেই হবে। তবে এই অনুভূতি আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুখ-দুঃখের বেদনা ক্ষণস্থায়ী। সুখ বা দুঃখকে উপেক্ষা করতে পারলে বা তাকে মেনে নিলে অনুভূতির তীব্রতার লাঘব হয়। দুঃখের থেকে সুখকে মেনে নেওয়া কিন্তু আরও কঠিন। সুখ মানুষকে আচ্ছন্ন করে ধর্ম ও মুক্তির পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আঘাতের মধ্য দিয়ে দুঃখের অমানিশা ভেদ করে ভগবানের স্পর্শ আসে। সুখ বা দুঃখকে অবিচলিত চিত্তে ভগবানের দান বলে মেনে নিতে হবে। আত্ম-জ্ঞানের উদয় হলে জ্ঞানী সুখ বা দুঃখকে সমজ্ঞান করে উভয় অবস্থাতেই সমভাবাপন্ন থাকেন। তাঁর সুখে হর্ষ বা দুঃখে বিষাদ নেই। এরূপ ব্যক্তিই অমৃতত্বের অধিকারী।

আত্মার স্বরূপ কি? তিনিই একমাত্র সৎ বস্তু। তিনিই আছেন—অস্তি; তিনিই প্রকাশমান—ভাতি; এবং যেহেতু তিনি সকলের অন্তরতম সেহেতু আত্মাই আমাদের একমাত্র প্রিয়। আমাদের এই স্পর্শকাতর দেহে শীত, তাপ ইত্যাদি তাদের অনুভূতির ছায়া ফেলে। কিন্তু এসব অনুভূতিই অসৎ—এদের অস্তিত্ব বিলীয়মান। অসৎ পদার্থে অভাববোধ আছে কিন্তু সৎ পদার্থে অর্থাৎ আত্মায় অভাববোধ আসতে পারে না। অভাব চার প্রকারের। কোন কিছুর উৎপত্তির পূর্বে যে-অভাববোধ থাকে, তাকে বলে 'প্রাগভাব'। কোন কিছুর বিনাশ বা ধ্বংস হলে যে-অভাববোধের সৃষ্টি তাকে বলে 'ধ্বংসাভাব'। যে-বস্তু একস্থানে বিদ্যমান অন্যস্থানে তার অভাব, তাকে বলে 'অত্যন্তাভাব'। আবার দুটি বস্তু কখনো অভিন্ন বা একপ্রকারের হতে পারে না। দুটি বৃক্ষ ভিন্ন হতে বাধ্য। যমজ সহোদরও ভিন্ন হয়। এই বিভিন্নতাজনিত অভাবকে বলে 'অন্যোন্যাভাব'। এই বিভিন্ন প্রকার অভাববোধ আত্মাতে কখনোই বিদ্যমান থাকে না। সৎস্বরূপ আত্মা বিশ্বময় ব্যাপ্ত। এই আত্মা অব্যয়, অক্ষয়, বৃদ্ধিহীন, নিত্য অপরিবর্তনীয়, অপরিচ্ছিন্ন। নিত্য এবং পরিবর্তনহীন

হেতু আত্মা অবিনাশী। যা কখনো থাকে, কখনো থাকে না তাকে প্রতিপাদন করার জন্য প্রমাণের আবশ্যক হয়, কিন্তু আত্মা স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বপ্রকাশ—অতএব অপ্রমেয়। আত্মা নিজেই জ্ঞাতা এবং নিজেই প্রমাতা। এই সর্বব্যাপী আত্মাই শরীর গ্রহণ করে বিভিন্ন জীবের মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করেন। দেহের বিনাশে আত্মা দেহান্তর গ্রহণ করেন। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে শ্রুতিতে আছে—"চন্দ্র, সূর্য, তারকাদি এবং বিদ্যুন্মালা তাঁকে প্রকাশিত করতে অসমর্থ। কাজেই অগ্নি তাঁকে কি আলোক দান করবে? তিনি প্রকাশিত বলেই জগৎ প্রকাশিত এবং তাঁর আলোকে নিখিল জগৎ আলোকিত।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মাদির দেহমাত্রেরই বিনাশ হবে, কিন্তু তাঁদের দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মার বিনাশ হবে না।

আত্মার ধর্ম কি? সুখ-দুঃখ বা অপরাপর ইন্দ্রিয়ানুভূতি আত্মার ধর্ম নয়, তা অন্তঃকরণের ধর্ম। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার—এগুলি মিলিয়েই অন্তঃকরণ। নিজস্বরূপ আচ্ছাদিত থাকে বলেই জীব সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। আচার্য শঙ্কর বলেছেনঃ "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম। অদ্বৈতমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্ম এক, জীব বহু। ব্রহ্মই জীব-জগৎরূপে প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেনঃ "বেলের ওজন জানতে হলে খোলা, বিচি, শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। যার শাঁস, তারই খোলা ও বিচি। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।" এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদীর মতে ঈশ্বর জীব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন—জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন। ঈশ্বরদর্শনেই জীবের মুক্তি। এই মুক্তি হয় সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য। সালোক্য অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে এক-লোকে বাস; সার্ষ্টি অর্থাৎ ভগবানের সমান ঐশ্বর্য লাভ, সামীপ্য অর্থাৎ ভগবানের সান্নিধ্যে অবস্থিতি; সারূপ্য অর্থাৎ ভগবানের সমান রূপপ্রাপ্তি এবং সাযুজ্য অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে অভিন্নত্ব।

আত্মা নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন। তিনি নির্লিপ্ত সাক্ষিমাত্র। অভিমানবশতঃ জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। আত্মা হননও করেন না, হতও হন না। আত্মা জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অবক্ষয় এবং মৃত্যু রহিত অর্থাৎ আত্মার ষড়্‌বিকার নেই। নিরাবয়ব চৈতন্যস্বরূপ এই আত্মাকে শস্ত্রাঘাত করা যায় না। মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নববস্ত্র পরিধান করে; তেমনি শরীর জীর্ণ বা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে জীবাত্মাও নতুন শরীর পরিগ্রহ করেন। অস্ত্রে বা বার্ধক্যে দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার কোন ক্ষতিসাধন হয় না। আত্মা অগ্নিদগ্ধ, জলার্দ্র বা বায়ু দ্বারা শুষ্ক হতে পারেন না। আত্মা অচ্ছেদ্য—আকাশের মতো নিত্য ও সর্বব্যাপী, বৃক্ষের ন্যায় স্থির, সনাতন, ক্রিয়াহীন এবং প্রশান্ত। কাজেই দেহের মৃত্যুতে অনুশোচনা না করে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি নিজেকে শোকোত্তীর্ণ করেন।

তবে আমাদের মতো অজ্ঞ মানুষের মনে সহসা আত্মতত্ত্বের উদয় হওয়া অসম্ভব। আমরা দেহ ও আত্মার পার্থক্য করতে না পেরে মনে করি, আত্মা জন্ম-মৃত্যুর অধীন। আত্মা দেহাতিরিক্ত নয়। পঞ্চভূতের মিশ্রণেই দেহের উৎপত্তি এবং দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ। একথা যদি সত্যি হয়, তাহলেও আত্মার জন্য শোক অকর্তব্য; কারণ, ক্ষণস্থায়ী বস্তুর জন্য শোক করে লাভ কি? যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবেই, আবার যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও নিশ্চিত। জন্ম-মৃত্যুর এই প্রাকৃতিক নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জীবকে এই জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহের মধ্য দিয়ে আসা-যাওয়া করতেই হয়। স্বীয় কর্মফলানুসারে জীব জন্ম নেয়। দেবতারাও এই নিয়মের অধীন। জন্মের পূর্বে আমরা কোথায় ছিলাম তা আমাদের অপরিজ্ঞাত, সেই রকম মৃত্যুর পরে কোথায় যাব তাও আমরা জানি না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী অবস্থাই কেবলমাত্র আমাদের কাছে প্রকটিত। এই মধ্যবর্তী সময়টুকুতে যে-বন্ধন স্থাপিত হয় তা পান্থশালায় পথিক-সম্মেলনের মতো। জাগতিক সম্বন্ধ ক্ষণিকের। শ্রীধর স্বামী বলেন, প্রকৃতিতে যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ -এই তিন গুণ সমভাবে থাকে তখন সৃষ্টি হয় না। যখন মূল প্রকৃতিতে গুণবিক্ষোভ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও

তমের বিক্রমভাব উপস্থিত হয় তখনই সৃষ্টির শুরু এবং সৃষ্টিপ্রবাহ চলতে থাকে। প্রলয়ে সৃষ্টির অবসান এবং মূল প্রকৃতিতে সৃষ্টি লীন হয়।

আত্মতত্ত্ব অতি জটিল ও দুর্বোধ্য। জগতের কোন বস্তুর সঙ্গেই আত্মার সাদৃশ্য নেই। এই দুর্বোধ্য আত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি আত্মাকে অতি আশ্চর্যরূপ বলে অনুভব করেছেন। আত্মা "অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—অণু থেকেও অণু আবার মহৎ বা বৃহৎ থেকেও মহৎ বা বৃহৎ। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে"—তিনি চলেন, চলেনও না, তিনি দূরে, আবার তিনিই নিকটে। আত্মা ধর্ম এবং অধর্ম, কার্য ও কারণরূপ জগৎ এবং ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান থেকে স্বতন্ত্র। আত্মাতে পরস্পরবিরোধী গুণসকলের সমন্বয়। এজন্যই শ্রুতিতে আছে—"যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।"—আত্মা অবাঙ্মনসোগোচর। এই আশ্চর্য আত্মাকে উপলব্ধি করতে না পেরে অজ্ঞ ব্যক্তি আত্মাকেই দেহ বলে মনে করে। জাগতিক মানুষ জগতের অতিরিক্ত কিছুকে স্বীকার করে না। শ্রবণ, প্রকাশ বা দর্শনেও আত্মার সম্যক্ উপলব্ধি প্রায় অসম্ভব।

অর্জুন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ। ধর্মরক্ষার জন্য যে-যুদ্ধ তা ধর্মযুদ্ধ আর জিগীষা, জিঘাংসা, পরস্ব অপহরণের জন্য যে-যুদ্ধ তা অধর্মযুদ্ধ। শাস্ত্রমতে ধর্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্মজনক। দুর্যোধনের পাণ্ডব-বিদ্বেষই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে ডেকে এনেছে। দুর্যোধন পরস্বাপহারক। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাণ্ডবরা ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত। স্বধর্মপালন করে মানুষ চতুর্বর্গ ফল অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম এমন-কি মোক্ষলাভ পর্যন্ত করে থাকে। এই ধর্মযুদ্ধই অর্জুনের পক্ষে শ্রেয়ের পথ। পাণ্ডবপক্ষ এযুদ্ধের অবতারণা করেননি, বরং যুদ্ধবন্ধের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। এযুদ্ধে বীরগতি প্রাপ্ত হলে স্বর্গলাভ অনিবার্য, কারণ এযুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। এই ধর্মযুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলে অর্জুন স্বধর্মচ্যুত হবেন এবং বিপুল কীর্তি ও গৌরব থেকে বঞ্চিত হবেন। স্বধর্মানুযায়ী কর্ম থেকে বিরত থাকলে সমাজে মানুষ হেয় হয় এবং শত্রুরাও সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে। সম্মানিত ব্যক্তির যশোহানি মৃত্যুতুল্য। অতএব সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয় সমজ্ঞান করে কর্তব্যপথে অগ্রসর হতে হবে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই সনাতন বৈদিক ধর্মের দুটি সাধন-পথ প্রচলিত। একটি জ্ঞানের পথ ও অন্যটি কর্মের পথ। একটি নিবৃত্তিমার্গ, অন্যটি প্রবৃত্তিমার্গ। কর্ম আবার দু-রকম। সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম কর্ম সুসম্পন্ন না হলে নিষ্ফল হয় এবং অঙ্গহানি হলে প্রত্যবায় ঘটে। কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগের অল্প অনুষ্ঠানও ফলদায়িনী। তা মৃত্যুভয় দূর করে সাধককে পরম শান্তি দান করে। কাম্যকর্ম অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম বিধিমতে সম্পন্ন না হলে যজ্ঞের আরব্ধ কার্য নিষ্ফল হয় এবং যজমানের প্রত্যবায় ঘটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাম্যকর্ম আয়াস ও আড়ম্বরসাপেক্ষ। পক্ষান্তরে নিষ্কাম কর্মের আংশিক সাধনেও মানুষ নির্ভয় হয়। নিষ্কাম কর্মে গুরু-লঘু কিছু নেই। নিজ নিজ ক্ষেত্রে রাজা, শ্রমিক, ব্রাহ্মণ, শূদ্র—সকলের কর্মই স্বধর্ম। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিজ কর্ম করলে শূদ্রও মুক্তিপথে অগ্রসর হবেন। নিষ্কাম কর্মযোগী ভগবানে নিবদ্ধমন এবং একনিষ্ঠ। কামনা দ্বারা চালিত বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয়। মনে যে-বাসনার উদ্ভব হয়, বুদ্ধি তাকেই তখন শ্রেয় বলে গ্রহণ করে।

বেদের দুই কাণ্ড—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। আবার চারভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ নিয়ে কর্মকাণ্ড। আরণ্যক ও উপনিষদ্ নিয়ে জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে বিবিধ যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা এবং ঐসব কর্মের ফলও শ্রুতিতে রয়েছে। ষড়্দর্শনের মধ্যে পূর্বমীমাংসা কর্মমতাবলম্বী এবং উত্তরমীমাংসা জ্ঞানমার্গী। পূর্বমীমাংসাতে যজ্ঞাদিই একমাত্র ধর্ম এবং স্বর্গাদি-লাভই একমাত্র পুরুষার্থ। ধর্মকর্ম বলতে সাধারণতঃ লোকে এসব সকাম যাগযজ্ঞাদি কর্মকেই বোঝে। কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানে ভোগবাসনা না কমে আরও বেড়ে যায়। ভোগবাসনায় বিক্ষিপ্ত চিত্ত

ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হতে পারে না। নিষ্কাম কর্মই একমাত্র চিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখী করতে পারে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণদ্বারা প্রকৃতি জীবকে সংসারে বন্ধ করে রেখেছে। আসক্তিই এই বন্ধনের কারণ। 'নিস্ত্রৈগুণ্য' অর্থাৎ নিষ্কাম হলে, জীব নিত্য সত্ত্বগুণে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে লোককল্যাণ নিমিত্ত নিষ্কাম কর্মে ব্রতী হয়। নিত্যসত্ত্বস্থ ব্যক্তি শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ সকল অবস্থাকেই সমজ্ঞান করে দ্বন্দ্বাতীত বা নির্দ্বন্দ্ব হন। যাঁর চিত্ত সততঃ ঈশ্বরে যুক্ত এবং যিনি পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাঁর অপ্রাপ্তবস্তু অর্জনের চেষ্টা বা প্রাপ্তবস্তু রক্ষণের প্রয়াসে আবশ্যক নেই। এই নিবেদিতপ্রাণ সাধকের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের ভার ভগবান নিজেই গ্রহণ করেন। নিষ্কাম কর্মের সাধক ভূমানন্দের আস্বাদলাভে পূর্ণকাম হন। অধিক সকাম কর্ম অপেক্ষা অল্প নিষ্কাম কর্ম বেশি ফলপ্রসূ।

মানুষের অধিকার কর্মে—কর্মের ফলে নয়। ফলের আকাঙ্ক্ষা করে কর্মে প্রবৃত্ত হলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রচেষ্টাও কর্ম, কিন্তু তাও করতে হয় নিষ্কামভাবে। তবেই হবে চিত্তশুদ্ধি। শুদ্ধ চিত্ত ঈশ্বরের বাসভূমি। শুদ্ধচিত্তে নির্বাসনা হয়ে কাজ করলে সে-কাজ বন্ধনে জড়িয়ে না ফেলে মুক্তির উপায়স্বরূপ হয়। তাই কর্মযোগীকে ফলাকাঙ্ক্ষা এবং কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমজ্ঞান করে ঈশ্বরে সর্বকর্মফল সমর্পণ করতে হয়। তাই অর্জুনকে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

> যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
> যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

জপ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা সবকিছুরই পরমা গতি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাত্ত্বিক কর্ম সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন : "তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম, সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়, দয়ার জন্য যে-কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্র বলছেন : "কর্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা করতে হয়, 'হে ঈশ্বর আমার কর্ম কমিয়ে দাও। আর যেটুকু কর্ম রেখেছো, সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হয়ে করতে পারি'।"

"যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি।"—যোগযুক্ত হয়ে কর্ম কর। এটিই নিষ্কাম কর্মের আসল কথা। প্রত্যেক কর্মেরই কারণ থাকে—কখনো স্বীয় অভিলাষ পূরণের জন্য, কখনো বা ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে মানুষ কর্ম করে। ভগবদিচ্ছার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে কর্ম করলে সমত্ববুদ্ধির উদয় হয়, তখন মনে আসক্তি এবং কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। ভগবদিচ্ছার সঙ্গে নিজেকে এক করে দিয়ে কর্মসাধনের নাম বুদ্ধিযোগ। "আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি রথ তুমি রথী"—এই মন্ত্র হৃদয়ে অহরহঃ ধ্যান করলে সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়কে একভাবে গ্রহণ করা যায়। ব্যবসায়াত্মিকা ও বাসনাত্মিকা বুদ্ধির মধ্যে প্রথমটিই মানবমনকে উচ্চমার্গে তোলে।

শুভবাসনা-প্রণোদিত কর্ম সুকৃত, আবার অশুভ বাসনা দ্বারা পরিচালিত কর্ম দুষ্কৃত। বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি উভয়কেই ত্যাগ করেন। তিনি শান্ত এবং নিশ্চিন্ত, তাঁর সব প্রচেষ্টাই সুসম্পন্ন হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : "যোগস্থ হইয়া যে-কর্ম করা যায় তাহা শুধু সর্বোচ্চ নহে তাহাই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত। সাংসারিক ব্যাপারেও এরূপ কর্মই অধিক শক্তিসম্পন্ন ও কার্যকরী, কারণ সর্বকর্মের যিনি অধীশ্বর তাঁহার ইচ্ছা ও জ্ঞানের আলোকে এরূপ কর্ম আলোকিত। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'।" সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্মানুসারে মানুষ বারে বারে সংসারচক্রে আবর্তিত হয়, কিন্তু নিষ্কাম কর্মী কর্মবন্ধন এবং জন্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। তিনি দেহাবসানে চিরশান্তি চির আনন্দের ব্রাহ্মী-স্থিতি প্রাপ্ত হন। যোগস্থ ব্যক্তির মন অবিবেকরূপ গহন বন অতিক্রম করে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মোহাচ্ছন্ন মানুষ আত্মার সন্ধান পায় না বলে দেহকেই 'আমি' মনে করে—তাই সে অনিত্য ভোগসুখের পিছনে ধাবিত হয়। নিশ্চলভাবে ধ্যেয় বস্তুতে মন স্থির হলে যোগের চরম ফল স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয়। তবে চঞ্চল মন ও বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিকে লক্ষ্যে স্থির করার জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন।

অভ্যাসের ফলে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী সর্বকামনামুক্ত হয়ে শ্রীভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট রাখেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আপনাতে আপনি তৃপ্ত। তিনি দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে আসক্তিহীন। তাঁর অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে। ইনি প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয়ে উদাসীন। শরীর রুগ্ন হলে বা জরা-ব্যাধি-কবলিত হলে বিষয়ভোগশক্তি হ্রাস পায় কিন্তু আকর্ষণ থেকেই যায়। এই ইন্দ্রিয়াকর্ষণ মানুষকে পরমার্থের পথ থেকে বিচ্যুত করে। যত্নশীল বিচারবান পুরুষ ইন্দ্রিয়পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু বলশালী তস্করের মতো ইন্দ্রিয়গণ সতর্ক প্রহরা ভেদ করে বিবেকী মনকেও পথভ্রষ্ট করে। তবে মানুষের উপায় কি? উপায় অনন্যা শরণাগতি। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হলে সমস্ত মন-প্রাণ তাঁতে গত হয়। খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। তিন টান এক হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর আর সতী নারীর পতির উপর টান।... এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শনলাভ হয়।"

বিষয়াসক্ত মানুষের প্রাপ্তি ব্যাহত হলে ক্রোধ হয়। ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিবিলোপ। স্মৃতিভ্রংশের ফলে বিবেক-বুদ্ধির নাশ এবং মানুষের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ক্রোধ মানুষকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে—মানুষ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই যে বিষয়াসক্তি যা প্রতিহত হলে মানুষ ক্রোধের বশীভূত হয় তার কারণ কি? এই আসক্তির মূল কারণ মমত্ববোধ। কাজেই সংসারে থাকতে হয় বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো। দাসী সংসারের সব কাজ সযত্নে করে কিন্তু তার মনটি পড়ে থাকে নিজের দেশের বাড়িতে। মুক্ত পুরুষ যেন পানকৌড়ি। গায়ে জল লাগলে তখনি তা ঝেড়ে ফেলেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সদাপ্রসন্ন—তাঁর সর্বকর্ম পরার্থে। প্রসন্নচিত্ত শুদ্ধ পুরুষ শীঘ্রই উপাস্য ব্রহ্মে গতিলাভ করেন। সংযত ও নির্মল চিত্তই প্রকৃত সুখকে জীবনে আনতে পারে। কোন মানুষের সমস্ত কামনা কখনো পূর্ণ হতে পারে না। একজনের কামনা পূর্ণ হলে অন্য একজনের কামনা ব্যাহত হয়। একজনের ধনবৃদ্ধি অপরের দারিদ্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচ্য আদর্শ অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করে সুখ-দুঃখের অতীত হওয়া। যে ঈশ্বরচিন্তা করে না তার চিত্তে শান্তি নেই, আবার অশান্ত চিত্তে সুখ থাকতে পারে না। এলোমেলো হাওয়া যেমন জলস্থিত নৌকাকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে তেমনি যোগীর মন অসাবধান হলে ইন্দ্রিয়সকল সেই যোগীকে বিষয়ে ঘূর্ণায়িত করে তার বিবেক-বুদ্ধিকে নষ্ট করে। বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়কে সংযত করা যায় অভ্যাসযোগ দ্বারা। সংসারের কাজকর্ম করেও অভ্যাস বজায় রাখা যায়। যাঁরা সংসারে আছেন তাঁদের পনের আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত, আর এক আনায় অন্যান্য কর্ম করা।

যোগীর চিত্ত সমুদ্রের মতো সীমাহীন, বিশাল ও গভীর। সমুদ্র যেমন নদ-নদী বৃষ্টিধারা খোঁজে না, যোগীও তেমনি কোন কামনাজাত সুখ খোঁজেন না। সমুদ্র স্বতই পূর্ণ, যোগীর চিত্তও ভূমানন্দে পূর্ণ। বাইরের জলধারা সমুদ্রকে উচ্ছলিত করে না—কামনার বিষয়সমূহ যোগীর চিত্তে প্রবেশ করলেও সেখানে কোন বিকার উৎপন্ন হয় না। ব্রহ্ম সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। ভূমানন্দ থেকেই সব আনন্দের অভিব্যক্তি। অতএব যিনি ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত তিনি সব অবস্থাতেই ধীর, স্থির, প্রশান্ত ও আনন্দময়। কোন অবস্থাতেই এই আনন্দ থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটে না।

এই অবস্থা বা ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হলে জীব আর মোহগ্রস্ত হয় না। মৃত্যুকালেও এই অবস্থাপ্রাপ্ত হলে মোক্ষ লাভ হয়। শ্রুতি বলেছেন: "ন স পুনরাবর্ততে, ন স পুনরাবর্ততে।"—সে পুনরাবর্তন করে না, সে পুনরাবর্তন করে না। একেই বলে কৈবল্যমুক্তি। "তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" কবি বলছেন: "তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি, মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার অন্য পথ নাহি।" □

পরিক্রমা

সোভিয়েত রাশিয়াতে যা দেখেছি

স্বামী ভাস্করানন্দ

প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে লেখকের আজ থেকে তিন বছর আগের অভিজ্ঞতায় অনেক অজানা বিষয় জানা যাবে।—যুগ্ম সম্পাদক, **উদ্বোধন**

১২ আগস্ট, ১৯৮৯। লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরের ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে বাইরে তাকিয়ে এরোফ্লট এয়ারলাইনের একটি সুন্দর ছিমছাম গড়নের বিমানকে দেখছিলাম। এর আগে এই মডেলের বিমান আমি দেখিনি। বিমানটি দেখতে 'বোয়িং ৭২৭' মডেলের মতো, কিন্তু কিছু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

এই বিমানটি আমাদের মস্কো নিয়ে যাবে। অতীতে ছাত্রাবস্থায় কিছুকাল আমাকে এরোপ্লেনের ডিজাইন সম্পর্কে পড়তে হয়েছিল। সে-আমলে ভাল যাত্রিবাহী বিমান ছিল 'সুপার কনস্টেলেশন'। এরপর ক্রমে ক্রমে আমেরিকার 'বোইং' ইত্যাদি কোম্পানির বিভিন্ন উন্নত ধরনের বিমান পৃথিবীর বাজার ছেয়ে ফেলে।

কিন্তু যে-বিমানটি আমি দেখছিলাম তা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এটি সোভিয়েত রাশিয়াতে তৈরি। 'টুপোলভ ১৫৪' মডেলের যাত্রিবাহী বিমান। বিমানটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একারণে যে, সোভিয়েত রাশিয়া এধরনের বিমান তৈরি করতে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ থেকে কোন রকম সাহায্য নেয়নি।

অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, বিমান-প্রযুক্তিবিদ্যায় রাশিয়ার অবদান অসাধারণ। সিকোরস্কি, টুপোলভ ও ইলিউশিন—এই তিনজন রুশ ইঞ্জিনীয়ার অথবা ডিজাইনারের বিমান-প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে পৃথিবীতে অবদান অসাধারণ। এঁরা সবাই নিজ নিজ অবদানে প্রখ্যাতনামা।

সিকোরস্কি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম 'লে গ্রান্দ' নামে একটি চার ইঞ্জিন-যুক্ত বিমান তৈরি করেন। সে-বিমানটির ডিজাইন অনুকরণ করে পরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেক বোমারু ও মালবাহী বিমান তৈরি হয়েছে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে সিকোরস্কি সর্বপ্রথম ব্যবহারযোগ্য হেলিকপ্টার তৈরি করেন।

টুপোলভ তাঁর জীবৎকালে একশোটিরও বেশি বিভিন্ন ধরনের বিমানের ডিজাইন করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—পৃথিবীর সর্বপ্রথম শব্দের চেয়ে অধিক গতিবেগসম্পন্ন যাত্রিবাহী জেটবিমান 'টুপোলভ ১০৪'।

ইলিউশিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ জঙ্গী-বিমান তৈরি করেছিলেন। 'ইলিউশিন ২' মডেলের এই জঙ্গী-বিমানটির নাম ছিল 'স্টারমোভিক'। জার্মান সেনারা কালো রঙের এই বিমানটির নাম দিয়েছিল 'কালো মৃত্যু'। আনুমানিক ৩৬,০০০ 'স্টারমোভিক বিমান' দ্বিতীয় বিশ্বযুধে ব্যবহৃত হয়েছিল।

সোভিয়েত রাশিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে প্রতিটি নতুন বিমানের পূর্ণাকৃতি মডেলকে 'উইন্ড-টানেলের' ভিতর রেখে বিমানটির উড়বার ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়। ফলে রাশিয়াতে তৈরি বিমানগুলির আকাশে উত্থান, উড়ন এবং ভূমিতে অবতরণ উৎকৃষ্ট মানের হয়।

সে যাহোক বেলা ছটা নাগাদ আমার ও অন্যান্য প্রতীক্ষমাণ যাত্রীদের প্লেনে ওঠার সময় হলো। কিন্তু প্লেনের ভিতরে আমাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই পেলাম এক অপ্রত্যাশিত চমক!

দেখলাম এক ঝাঁক মাছি প্লেনের ভিতরে এদিক ওদিক ভনভন করে উড়ছে। এছাড়াও প্লেনটির দেয়ালে ও ভিতরের ছাদেও বহু মাছি বসে রয়েছে।

আমি বহুবার বহু দেশের ও বহু এয়ারলাইনের বিমানে চড়েছি; কিন্তু এর আগে যাত্রিবাহী কোন আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের বিমানে মাছি দেখিনি। পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে রহস্য করে 'Aeroflot' এয়ারলাইনকে 'Aeroflop' এয়ারলাইন বলা হয়। এরোফ্লট এয়ারলাইনে এই প্রথমবার চড়ার সময় যেভাবে মক্ষিকাকুলের অভ্যর্থনা পেলাম তাতে

বোঝা গেল কেন এই এয়ারলাইনটিকে 'এরোফ্লপ' এয়ারলাইন বলা হয়।

কিন্তু আরও কিছু জানার আমার প্রয়োজন ছিল। বেলা সাড়ে ছটায় প্লেনটি আকাশে ওড়ার পর ক্রমে ক্রমে তা জানা গেল। এই রুশ যাত্রিবাহী বিমানটির সামগ্রিক ডিজাইন চমৎকার হলেও ক্রমে দেখতে পেলাম যে, বসবার আসনগুলি এবং বিমানটির শীতাতপনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা নিকৃষ্টমানের। বিমানটির ভিতরের দেয়ালে ও সিলিং-এ যে-প্যানেলগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের যত্ন করে জোড়া দেওয়া হয়নি। জোড়ার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাঁক থেকে গেছে। বাথরুমগুলি নোংরা; খাবার যা দেওয়া হলো প্রথমতঃ তা মক্ষিকা-অধ্যুষিত, দ্বিতীয়তঃ তার মান নিম্নস্তরের।

একদিকে বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্‌দের প্রচেষ্টায় উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার ফলশ্রুতি ও অপরদিকে নিচুতলার কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে একান্ত অনীহা ও গাফিলতি—এই উৎকট বৈপরীত্য সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারি এয়ারলাইন এরোফ্লটের বৈশিষ্ট্য বলে আমার মনে হয়েছিল। দেশ হিসাবে পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়াকে যদি কোনও প্রতীকের সাহায্যে বর্ণনা করতে আমাকে বলা হয় তাহলে আমি বলব সে-প্রতীক 'এরোফ্লট এয়ারলাইন'।

মহাকাশ-বিজ্ঞান, রকেট ও বিমান সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা, ভারী যন্ত্রপাতি ও আধুনিক মারণাস্ত্র নির্মাণের ক্ষমতা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উৎকর্ষ-সাধন ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের অবদানে সমৃদ্ধ পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া বাস্তবিকই ছিল এক বিচিত্র ও বৈপরীত্যপূর্ণ দেশ!

মস্কো, লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি গোটা কয়েক দেখন-সই শহর ছাড়া সমগ্র সোভিয়েত রাশিয়াকে দেখে আমার তখন মনে হয়েছিল—জীবনযাত্রার মানদণ্ডে তৃতীয় বিশ্বের দেশ। দেশের সর্বত্র নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের তীব্র অভাব দেখেছি। ভোগ্যপণ্য যা পাওয়া যায় তার মানও অতি নিম্নস্তরের। জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য খাদ্যদ্রব্য, যেমন রুটি, দুধ, ডিম, ইত্যাদি সরকার-নিয়ন্ত্রিত স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়। এধরনের খাদ্যের সরবরাহ অপ্রচুর নয়, কিন্তু ফলমূল, বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জি, মাছ ও মাংসের সরবরাহ অপ্রচুর।

সামরিক দিক দিয়ে মহাশক্তিধর অথচ জীবন-যাত্রার মানের দিক দিয়ে অনগ্রসর—এই ধরনের বৈপরীত্যপূর্ণ দেশ হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া। ক্রমে ক্রমে এই নিবন্ধের পাঠকদের সোভিয়েত রাশিয়ার এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আরও অবহিত করা যাবে।

মস্কোর সময় রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আমাদের বিমান মস্কোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাল। কিন্তু সেখানে আমাদের ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হলো মালপত্রের জন্য।

পরে জানতে পারা গেল যে, বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের প্রতিটি ব্যাগ, বাক্স ও সুটকেস এক্সরে করার পর আবার তা সুশিক্ষিত কুকুর দিয়ে শোঁকানো হয়। উদ্দেশ্য ঃ হেরোইন ইত্যাদি মাদক-দ্রব্য অথবা গোপনে আনীত অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান করা। এজন্য মালপত্র পেতে এত দেরি হয়।

সোভিয়েত রাশিয়াতে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য আমদানী করা অমার্জনীয় অপরাধ। কোন পর্যটক এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তার অন্ততঃ পাঁচ বছর কারাদণ্ড হবে। একারণে মস্কোর অনতিদূরে পর্যটক-দের জন্য একটি বিশেষ ধরনের জেলও রয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্কদের সোভিয়েত রাশিয়া সফর করতে হলে সে-দেশের সরকারি পর্যটন সংস্থা 'ইনটুরিস্টের' সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। ইনটুরিস্ট-ই সোভিয়েত রাশিয়ার ভিসা সংগ্রহ, সে-দেশ সফরকালে হোটেল রিজার্ভ করা এবং ট্রেন, ট্যুরিস্ট বাস অথবা এরোফ্লটের বিমানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে থাকে।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'স্পুটনিক' বলে অনুরূপ একটি সরকারি পর্যটন সংস্থা রয়েছে। স্পুটনিক সাধারণতঃ ছাত্রছাত্রীদের 'ইউথ ক্যাম্প' ইত্যাদিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে।

ইংল্যান্ড থেকে আমি রাশিয়া সফরে যাই একটি বিশেষ কারণে। আমেরিকার একটি এয়ারলাইনে বহুবার যাতায়াত করায় সে-এয়ারলাইনটি আমাকে ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্য একটি ফ্রি রিটার্ন টিকিট দিয়েছিল। ফলে ইংল্যান্ডের একটি ট্র্যাভেল এজেন্সীর মাধ্যমে আমি সোভিয়েত রাশিয়াতে

'প্যাকেজ ট্যুরে' যাওয়ার জন্য টিকিট কিনি। প্রথমবার রাশিয়া-ভ্রমণের জন্য 'প্যাকেজ ট্যুরে' যাওয়াই সবচেয়ে সুবিধাজনক। প্রথমতঃ এধরনের ভ্রমণে খরচা অনেক কম পড়ে; দ্বিতীয়তঃ পর্যটক-দের ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু ব্যবস্থাই করতে হয় না, 'ইনট্যুরিস্ট'ই সবকিছুর ভার নেয়। পর্যটক-দের রুশভাষা শেখারও কোন প্রয়োজন হয় না। ইংরেজী বলতে পারেন এমন একজন রাশিয়ান ট্যুরিস্ট গাইড সোভিয়েত রাশিয়াতে প্রবেশ করার পর থেকে সে-দেশ না ছাড়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ পর্যটকদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এবং তাঁদের দেখাশোনা করেন।

আমি যে 'প্যাকেজ ট্যুর'টিতে গিয়েছিলাম তার নাম 'ট্র্যান্স ককেশিয়ান ট্যুর'। দু-সপ্তাহের ট্যুর। মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ শহর ও ককেশাস অঞ্চলের বেশ কিছু গ্রাম ও শহর এতে দেখা যায়। আমাদের দলে জনা তিরিশেক পর্যটক ছিলেন। আমার সঙ্গে আমাদের শিয়াটল আশ্রমের জনৈক ভক্ত সঙ্গী হিসাবে গিয়েছিলেন। আমরা দুজন ছাড়া আমাদের দলের বাকি সবাই ইংরেজ।

মস্কো বিমানবন্দরে যখন আমরা আমাদের মাল-পত্রের জন্য অপেক্ষা করছি তখন একটি মধ্যবয়সী মহিলা আমাদের কাছে এলেন। এসে বললেনঃ "আমার নাম আল্লা লেভিতিনা। 'ট্র্যান্স ককেশিয়ান ট্যুরে' আমি আপনাদের গাইড হবো।"

মালপত্র পাওয়ার পর ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের দরজা পার হয়ে আমরা বাইরে অপেক্ষারত ইন-ট্যুরিস্টের বাসে যখন গিয়ে বসলাম তখন রাত প্রায় আড়াইটা বাজে। আমাদের আগেই জানানো হয়েছিল যে, মস্কোতে সেসময় একটি বড় সরকারি কনফারেন্স হবে বলে সেখানকার কোন হোটেলে আমাদের স্থান হবে না। আমাদের মস্কোয়া নদীর ওপর নোঙর করা একটি দোতলা ক্রুইজবোটে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্রুইজবোটে এসে শুতে শুতে আমাদের রাত সাড়ে তিনটা হয়ে গেল।

এই ক্রুইজবোটগুলি কিন্তু রাশিয়াতে তৈরি নয়, অস্ট্রিয়াতে তৈরি। এই দোতলা ক্রুইজবোট-গুলি বেশ বড়। বোটের বহু সংখ্যক কেবিনে অনেক লোক থাকতে পারে। আমি ও আমার সঙ্গীর একটি কেবিনে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কেবিনটি স্বল্পপরিসরের হলেও সুন্দর। বাথরুমটি ঝকঝকে তকতকে; বিছানাপত্র ভাল। ক্রুইজবোটে ভাল ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার দেওয়া হতো। খাবার ঘর অথবা রেস্তোরাঁ দোতলায়, এবং তা মক্ষিকা-বর্জিত। বাইরের পরিবেশ সুন্দর; জানালা দিয়ে মস্কোয়া নদীর মনোরম দৃশ্য নজরে পড়তো।

প্রাতরাশের পর আমাদের ট্যুরিস্ট বাসে করে মস্কোর বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থল দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের গাইড চমৎকার ইংরেজীতে প্রয়োজন-মত সেসব জায়গার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন।

*

সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হতে হলে সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক ও অন্যান্য তথ্য জানা প্রয়োজন। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশ। এক কোটি ষাট লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের এই দেশটি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের চেয়েও বড়। এই বিরাট দেশের লোকসংখ্যা প্রায় ২৯ কোটি। সোভিয়েত রাশিয়ায় একশোটির মতো জাতির বাস, যাদের নিজ নিজ ভাষা, বেশভূষা ও সংস্কৃতি অন্যদের থেকে আলাদা। দেশটি ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও ঐতি-হাসিক দিক দিয়ে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের সঙ্গে এর তুলনা করা কঠিন। একমাত্র "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান"-সমন্বিত ভারতবর্ষের সঙ্গেই সোভিয়েত রাশিয়ার আংশিক তুলনা হতে পারে।

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশটির ইতিহাসও বেশ জটিল। বহু শাসকের উত্থান ও পতন এবং অসংখ্য রাজনৈতিক সংঘাত ও সংগ্রাম রাশিয়ার ইতিহাসের উপজীব্য। মাত্র একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে এদেশের ইতিহাস সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেওয়া সম্ভব নয়।

রাশিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, যীশুখ্রীস্টের জন্মের পূর্বে রাশিয়া বলে কোন দেশের অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমান মধ্য-রাশিয়ার 'স্টেপ' অঞ্চলের বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত এলাকায় ছিল 'স্লাভ' গোষ্ঠীর বসতি। উত্তরাঞ্চলে 'বাল্ট' ও অন্যান্য দু-একটি জাতির বাসস্থান।

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া থেকে 'খাজার' বলে তুর্কী-মঙ্গোলীয় শাখার একটি যাযাবর উপজাতি এসে রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চল এবং দক্ষিণে ককেশাস পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। খাজাররা ইহুদীধর্ম গ্রহণ করেছিল ; তৎসত্ত্বেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্ব স্ব ধর্মপালনের স্বাধীনতা সে-রাজ্যে ছিল। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে 'ভারাঙ্গিয়ান'দের আক্রমণে খাজার রাজ্যের পতন হয়।

খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে ভারাঙ্গিয়ানরা স্ক্যানডিনেভিয়া থেকে এসে প্রথমে পশ্চিমাঞ্চলের শ্লাভ-অধ্যুষিত এলাকায় একাধিক ছোট ছোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরা ছিল স্ক্যানডিনেভিয়ার 'ভাইকিং' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ভারাঙ্গিয়ানরা 'রুশ' (Russ) নামেও পরিচিত ছিল। অনুমান, এদের নাম থেকেই পরে 'রাশিয়া' শব্দটির সৃষ্টি হয়। ভারাঙ্গিয়ান শাসকরা, যাদের 'প্রিন্স' বলা হতো, কিয়েভ শহর ও উত্তরে নভগরোদ শহরকে কেন্দ্র করে মুখ্যতঃ দুটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। ক্রমে কিয়েভের উত্তর-পূর্বে মস্কো ইত্যাদি শহরেও এদের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্টাব্দে কিয়েভের পরাক্রান্ত ভারাঙ্গিয়ান শাসক প্রিন্স ভ্লাদিমির প্যাগান-ধর্ম ত্যাগ করে অর্থোডক্স খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং বলপ্রয়োগ করে তাঁর রাজ্যের অধিবাসীদেরও সে-ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন।

১২৩৭ খ্রীস্টাব্দে মঙ্গোলিয়া থেকে আগত তাতারদের আক্রমণে কিয়েভের ভারাঙ্গিয়ান শাসকদের পতন হয় এবং তৎকালীন রাশিয়ার ছোট ছোট রাজ্যগুলি দুর্ধর্ষ তাতারদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

১৩৮০ খ্রীস্টাব্দে মস্কোর প্রিন্স দিমিত্রি দনস্কয় কুলিকোভোর যুদ্ধে তাতারদের পরাজিত করেন। রুশদের কাছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাতারদের এই প্রথম পরাজয়। ফলে মস্কোর প্রিন্সদের প্রভাব ও প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। প্রিন্স দিমিত্রি দনস্কয়ের পৌত্র ইভান নিজেকে 'জার' (Tsar) বলে ঘোষণা করেন। 'জার' শব্দটি রোমান 'সিজার' শব্দের সমতুল্য। উভয় শব্দের অর্থ 'সম্রাট'।

ইভানের আমলে মস্কোর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রুশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়। রাশিয়ার প্রথম জার ইভানই বলতে গেলে রুশ জাতীয়তাবোধের স্রষ্টা। রাশিয়ার ইতিহাসে তাই তাঁকে 'ইভান দ্য গ্রেট' বা মহামতি ইভান বলা হয়। ইভান দ্য গ্রেটের নাতির নামও ইভান। তিনি রাশিয়ার তৃতীয় জার। তাঁর আমলে রুশ সাম্রাজ্যের আরও প্রসার ঘটে। কিন্তু তিনি ইতিহাসে 'ইভান দ্য টেরিবল' বা ভয়ঙ্কর ইভান নামে কুখ্যাত। ইভান তাঁর রাজদণ্ড দিয়ে তাঁর ছেলেকে স্বহস্তে হত্যা করেন। তাঁর আদেশে রুশ অর্থোডক্স চার্চের 'মেট্রোপলিটান' ফিলিপের প্রাণদণ্ড হয়। তাঁর রাজত্বকাল হত্যা ও সন্ত্রাসের নিষ্ঠুর ইতিহাস।

১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে ইভান দ্য টেরিবলের মৃত্যুর পর উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে রাশিয়াতে চূড়ান্ত দুঃসময় আসে। দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতা-ক্লিষ্ট রাশিয়ার এই দুঃসময়ে সুযোগ পেয়ে লিথুয়ানিয়া, সুইডেন এবং পোল্যান্ড রাশিয়া অধিকার করার চেষ্টা করতে থাকে। সাময়িকভাবে মস্কো পোল্যান্ডের করতলগত হয়। শেষ পর্যন্ত রুশ অর্থোডক্স চার্চের ধর্মযাজক হেরমোগেনের প্রেরণায় এবং রুশ প্রিন্স দিমিত্রি পোঝারস্কি ও অন্যান্য অনেকের সম্মিলিত চেষ্টায় মস্কো পোল্যান্ডের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়।

১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে অভিজাত রোমানভ বংশের মিখাইল রোমানভ নামক ইভান দ্য টেরিবলের এক বংশধরকে সর্বসম্মতিক্রমে রাশিয়ার জার বা সম্রাট-পদে মনোনীত করা হয়। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে বলশেভিক বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত তিনশো চার বছর ধরে এই রোমানভ বংশ রাজত্ব করে।

রোমানভ বংশের শাসকদের মধ্যে প্রখ্যাতনামা হচ্ছেন 'পিটার দ্য গ্রেট' (জন্ম ঃ ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দ ; মৃত্যু ঃ ১৭২৫ খ্রীস্টাব্দ)। পিটার দ্য গ্রেট রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ আধুনিকীকরণের জন্য বিখ্যাত। তিনিই সর্বপ্রথম রুশ সামরিকবাহিনীকে আধুনিক রূপ দেন। তাঁর রাজত্বকালে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রুশ সাম্রাজ্যের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। রাশিয়াতে প্রথম দৈনিকপত্রের প্রবর্তন, ডাকবিভাগে ডাক-টিকিটের প্রচলন এবং রাশিয়ার প্রথম আদমসুমারী তাঁর আমলেই হয়েছিল। [ক্রমশঃ]

অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র ঃ পাঠান্তর ?

গত জ্যৈষ্ঠ (১৩৯৯) সংখ্যায় যে 'অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র'টি মুদ্রিত হয়েছে, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত 'স্তবকুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে 'হরগৌর্যষ্টকম্' নামে অনুরূপ একটি স্তোত্র আছে। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত শংকরাচার্য রচনাবলীর ১ম খণ্ডে 'অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র'টি যেখানে মুদ্রিত আছে সেখানে তার পাদটীকায় উল্লিখিত আছে যে, 'হরগৌর্যষ্টক-স্তোত্র'টি এই স্তোত্রেরই পাঠান্তর। বস্তুতঃ, ভাবের দিক দিয়ে দুটি স্তোত্রেরই খুব মিল থাকলেও শ্লোকের শব্দচয়নের ক্ষেত্রে এবং শ্লোকবিন্যাসের ক্ষেত্রে পাঠভেদ লক্ষিত হয়। সুতরাং 'হরগৌর্যষ্টক-স্তোত্র' ও 'অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র' দুটি পৃথক স্তোত্র অথবা একই স্তোত্রের ভিন্ন নাম কিনা তা জানার জন্য আগ্রহ জেগেছে। সেজন্য বিনীত অনুরোধ, প্রকৃত তথ্য উদ্বোধনের পরবর্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

জয়ন্তী সিংহ
নিউ আলিপুর
কলকাতা-৭০০৫৩

প্রকৃত তথ্য

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত শংকরাচার্যের গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ৭৯-৮১) 'অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র'-এর পাদটীকায় ঠিকই বলা হয়েছে যে, 'অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র' এবং 'হরগৌর্যষ্টক-স্তোত্র' "প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র স্তোত্রের নামভেদ, কয়েকটি স্থলে পাঠভেদ এবং শ্লোকবিন্যাসে পৌর্বাপর্যভেদ আছে।" সুতরাং স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত 'স্তবকুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে আচার্য শংকর বিরচিত 'হরগৌর্যষ্টকম্' নামে যে-স্তোত্রটি মুদ্রিত হয়েছে সেটি এবং 'উদ্বোধন'-এর জ্যৈষ্ঠ (১৩৯৯) সংখ্যায় প্রকাশিত আচার্য শংকরের 'অর্ধনারীশ্বর-স্তোত্র'টি একই স্তোত্র।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, স্বামী বিবেকানন্দেরও খুব প্রিয় ছিল এই স্তোত্রটি। প্রায়ই তিনি এটি আবৃত্তি করতেন। ভারতে প্রথম পদার্পণের পর বেলুড়ের গঙ্গাতীরস্থ ছোট বাড়িতে থাকাকালীনও ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীকে ঐ স্তোত্রটি আবৃত্তি করতে শুনেছেন। (দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ ২৬৬ ; পাদটীকায় স্তোত্রটি 'অর্ধনারীশ্বরস্তোত্রম্—শংকরাচার্য' বলে উল্লিখিত হয়েছে)।

আবার ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে নিবেদিতা প্রমুখকে নিয়ে স্বামীজী যখন কাশ্মীর-ভ্রমণ করছেন তখন শিবক্ষেত্র হিমালয়ের চিরতুষাররাশি দেখে অথবা পর্বতরাজির পাদমূলে বসে জগৎপিতা মহেশ্বর ও জগন্মাতা পার্বতীর কথা তাঁর মনে পড়েছে এবং উদাত্ত কণ্ঠে উদ্দীপ্ত স্বামীজী স্তোত্রটি আবৃত্তি করেছেন। ভগিনী নিবেদিতার ডায়েরী জাতীয় গ্রন্থ 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' (মূল ইংরেজী নাম 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda') সেকথা আমরা পাই। (দ্রঃ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৩-৩০৪) নিবেদিতা লিখছেন ঃ "একাধারে হরগৌরীমিলন-স্বরূপ সেই অদ্ভুত হিন্দুভাবটি কথিত হইল। তাহার কথাগুলি এখানে দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরের অভাবে কথাগুলি কিরূপ প্রাণহীন মনে হইতেছে। তাহা ছাড়া তখনকার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য কি অপরূপ ছিল।—ছবিখানির মতো শ্রীনগর—লম্বার্ডি দেশ-সুলভ সমুন্নতশির পপলার গাছগুলি এবং দূরে চিরতুষাররাশি। সেই নদীগর্ভ উপত্যকায় মহান পর্বতরাজির পাদমূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে তিনি আবৃত্তি করিলেন ঃ 'কস্তুরিকাচন্দন-লেপনায়ৈ…'।" ☐

যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন

মুখে বলি 'হরি'
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পরীক্ষা দু-রকমের—থিওরিটিক্যাল আর প্র্যাকটিক্যাল। আমি পড়েছি, জেনেছি, শিখেছি, তত্ত্ব ও তথ্য আমার অধিগত হয়েছে। না, সেটাই যথেষ্ট নয়, এবার আমাকে হাতেনাতে করে দেখাতে হবে। ধর্ম হলো করে দেখানোর জিনিস—লোক-দেখানো নয়, নিজেকে দেখানো। পরীক্ষক আমি নিজে। আমার 'কাঁচা আমি' 'পাকা আমি' হয়েছে কিনা, আমি ছাড়া কে জানতে পারছে। আমি মুখে 'হরি' বলছি—সে কোন্ 'হরি'। ঠাকুর মজা করে বলছেন: সেই যে সেকরাদের গল্পে আছে—একজন বলছে 'কেশব', একজন বলছে 'গোপাল', একজন বলছে 'হরি', একজন বলছে 'হর'। সে 'গোপালের' মানে গরুর পাল। সবই হেঁয়ালির ভাষায় প্রশ্ন। কে সব? প্রশ্নকারী ভিতরে। প্রদীপ জেলে টুকটুক করে সোনার কাজ করছে। টের পেয়েছে, একদল খদ্দের ঢুকেছে। তারা কারা? বাইরে বসে আছে কর্মচারী। সে বলছে, গোপাল—গোয়ালারা এসেছে। তাহলে 'হরি'? সোনা-দানা মারি? ভিতর থেকে অনুমতি এল, সে আর বলতে! 'হর, হর'। মেরে ফাঁক করে দাও। অনেকে হাই তোলার সময় আড়া-মোড়া ভেঙে বলে, হা মা। ওটা মাকে ডাকা নয়। একটা আক্ষেপ, বিক্ষেপও বলা চলে। বাতাস টানার মুদ্রা। অনেকে দেখা হলেই বলেন, 'জয় ঠাকুর'। অভ্যাস, মুদ্রাদোষ। ভিতরে খেলা করছে অন্য ভাব। হয়তো কারও সর্বনাশ করতেই যাচ্ছেন। কোর্টে যাচ্ছেন মামলা দায়ের করতে। মুখে বলছেন, 'জয় ঠাকুর'। যে মারতে যাচ্ছে সেও বলছে, 'জয় ঠাকুর'। যে মরতে যাচ্ছে সেও বলছে, 'জয় ঠাকুর'। এখন ঠাকুর কাকে সাহায্য করবেন!

ঈশ্বর মন দেখবেন। মুখের কথায় কিছু হবে না। 'আমি' না 'তুমি'। আমি করছি? না, তুমি করাচ্ছ বলে আমি করছি। নীচ আমি, অহং আমি চলে গেলে নিজের কর্ম বলে আর কিছু থাকবে না। 'তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।' যিনি জেনেছেন, তিনিই জ্ঞানী। ঠাকুর একেবারে সাফ কথা বলছেন, 'আমি, আমার'—এইটা অজ্ঞান। 'তুমি, তোমার'—এইটা জ্ঞান। যে জ্ঞানী সে জানে, দৃঢ়ভাবে জানে,—আমি নয় তুমি। সে জানে, "এক আধার থেকে গ্যাস আসছে, নানা জায়গায় নানা বাতি জ্বলে উঠছে।" ঠাকুর বলছেন, সেই ঈশ্বরই হলেন এক অখণ্ড চেতনা, অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র, দেশে দেশে, জনে জনে তাঁর প্রকাশ। ভাল-মন্দের বিচারের প্রশ্ন নেই। প্রয়োজনও নেই। তাঁর সৃষ্টিতে সবই থাকবে। সৎ, অসৎ, সাধু, তস্কর। মনে রাখতে হবে, "মানুষ যেন বালিশের খোল। কোনটা সাদা, কোনটা কাল, কোনটা রাঙা, কিন্তু সব খোলের ভেতরেই সেই এক তুলো।" কিন্তু মনে রাখতে হবে, জল মাত্রই নারায়ণ হলেও নর্দমার জল পান করা যায় না। পবিত্র জলই পানের যোগ্য। নিজের দিকে তাকাও। ঠাকুর বলছেন, ছিদ্র আবিষ্কার কর। অন্যের ছিদ্র নয়, নিজের ছিদ্র। একজন সারাদিন ধরে তার আখের খেতে জল সেঁচলে। সন্ধ্যাবেলা দেখলে, এত কাণ্ড করেও সামান্য একটুও জল দাঁড়ায়নি। ব্যাপারটা কি হলো! খোঁজপাতি করে দেখা গেল, গোটা তিন-চার বড় বড় গর্ত দিয়ে সব জল বেরিয়ে গেছে। খুব সাধন-ভজন করছি, আমার ধারণা; কিন্তু কই! কিছুই তো হচ্ছে না, জল দাঁড়াচ্ছে না কেন? ঠাকুর তো বলেছেন, লক্ষণ ফুটবে। নিশ্চিত লক্ষণ। যেমন বসন্ত হলে গুটি বেরোয়। ঠাকুর বলেছেন, এটা করলে ওটা হবে। ন্যাকড়ার পুতুল জলে

পড়ুল ভিজবে, নরম হয়ে যাবে। পাথরের পুতুলের কিছু হবে না। আর নুনের পুতুল হলে জলে গলে যাবে। পাথরের পুতুল হলো বদ্ধ জীবের উপমা। শত ধর্মকথাতেও মন ভেজে না। মুলো খেয়ে বসে আছে। সন্দেশ খেলেও সেই মুলোর ঢেঁকুর। রসুনের বাটি, যা রাখা যাচ্ছে তাইতেই বিষয়ের গন্ধ ধরে যাচ্ছে। ঈশ্বরও যেন পরাস্ত। হবে না তো হবেই না। ন্যাকড়ার পুতুল হলো মুমুক্ষু সংসারীর উপমা। সচ্চিদানন্দ-সলিলে পড়লে ভিজে থসথসে হয়, অবশ্য আকার বা বাঁধন হারায় না—সংসারীই থাকে, কিন্তু ভিজে থাকে। চুর হয়ে থাকে। আর নুনের পুতুল হলো মুক্ত জীবের উপমা। সে গলে যায়। তার আর পৃথক কোন সত্তা থাকে না। এবার মেলাতে বসি। নিজেকে মেলাই। জল কি দাঁড়িয়েছে! সত্তা কি ভিজেছে! গলে গেলে তো আর বিচার থাকবে না। হলো কি হলো না। আমি নেই, বিচারও নেই। আমি তোমাকে চাই—যতক্ষণ এই বোধ ততক্ষণ 'আমি' আছে, বিচার আছে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আছে। নিজের সামান্য জ্ঞান দিয়ে তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার-অস্বীকারের টানাপড়েন আছে। ভক্তি আর যুক্তির লাঠালাঠি আছে। অহং একটা বড় ছেঁদা। কাম আর কাঞ্চনে আসক্তি আরও বড় ছেঁদা। আমিটা তবু সাধনের কাজে লাগে। ভক্ত আমি, দাস আমি, কিন্তু বাকি দুটো! সবচেয়ে বড় শত্রু। মুখে বলা সহজ, কাম-কাঞ্চন বিজয়ী। প্রকৃত হওয়া খুব শক্ত। আবার এটা না হলে ওটা হবে না। এদিক থেকে মন না তুললে ওদিকে মন যাবে না। এক আনা-দু আনা নয়, তিনি ষোল আনা চান! নিজের কাছে কিছু রাখলে চলবে না। সবটা তাঁকে দিতে হবে। দিয়ে রিক্ত হতে হবে। ঠাকুর বলছেন, সবচেয়ে বড় সাধনা হলো রোদন। আকুল কান্না। ভীষণ একটা অভাববোধ। একটা শূন্যতা। মানুষ যাকে বলে সব, সেসব থেকেও আমার কিছু নেই।

সংসারী ও বিষয়ী মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। দুধ আর জল পাশাপাশি থাকলে মিশে যাবেই। যতক্ষণ না মাখন হচ্ছে ততক্ষণ সংসারে থাকব অথচ ভেসে থাকব—সেটি হচ্ছে না। তাহলে নির্জনে, নিরালায় সরে যাও। ঠাকুর বলছেন, দই পাততে হবে। নাড়ানাড়ি হলে দই বসবে না। সংসারী লোক, বিষয়ী লোক, অবিশ্বাসী লোক মন নাড়িয়ে দেবে। ভাবের দম্বল বৃথাই হবে। দই বসবে না। দই না বসলে ঘোল হবে না। ঘোল মন্থন করলে তবেই মাখনের দলা ভেসে উঠবে। সাধন কোথায় হবে? মনে, বনে, কোণে। ঠাকুর বলছেন: "অন্ধকারের ধর্মই খাঁটি ধর্ম, আলোকের ধর্ম প্রকৃত ধর্ম নয়। যদি কেউ নির্জন স্থানে সুন্দরী যুবতীকে দেখে ঈশ্বরভয়ে তাঁর প্রতি কুদৃষ্টি না করেন, তিনিই যথার্থ ধার্মিক। কিন্তু যে-ব্যক্তি প্রকাশ্যে ধর্মাড়ম্বর করে, তাকে ঠিক ধার্মিক বলা যায় না।" ঠাকুর বলছেন, একটা নরুন দিয়ে আত্মহত্যা করা যায়। অন্যকে মারার জন্যে ঢাল, তরোয়ালের প্রয়োজন হয়। নিজেকে মারার জন্যে একটা নরুনই যথেষ্ট। অন্য লোককে ধর্মশিক্ষা দিতে অনেক শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তির প্রয়োজন, কিন্তু নিজের জন্যে একটি সত্য সাধন করলেই হতে পারে।

নির্জনে, নিরালায়, সাবধানে, সন্তর্পণে এগিয়ে চল। চল বিষয়ের কাঁটাবন, শর ও হোগলার বন দুহাতে সরাতে সরাতে। আর চাই সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ হলো চালধোয়া জল। চালধোয়া জলে নেশা ছুটে যায়। সেইরকম সাধুসঙ্গে সংসারমদে মত্ত লোকের নেশা বিদূরিত হয়। □

শুভ মহালয়ার দিন উদ্বোধন কার্যালয় থেকে বিশ্বজননী শ্রীমা সারদাদেবী ('শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম থেকে দক্ষিণেশ্বরে আগমন-পর্ব") নামে সঙ্গীতালেখ্যের একটি ক্যাসেট প্রকাশিত হবে।

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়

১ ভাদ্র ১৩৯৯

বিশেষ রচনা

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও ধর্মমহাসম্মেলনের

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

॥ ১ ॥

ভারতবর্ষের ধনরাশির প্রাণকেন্দ্র বোম্বাই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সুরম্য অট্টালিকা, কোথাও সুদৃশ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ গৃহ। মধ্যে মধ্যে সমুন্নত বৃক্ষ। সুদীর্ঘ সমুদ্রতীর। আরব সাগরের সুনীল জলোচ্ছ্বাস। অদূরে সদা ব্যস্ত পোতাশ্রয়। বিভিন্ন দেশের নানান শ্রেণীর মানুষের সতত আনাগোনা। করাচী বন্দর থেকে এক জাহাজ এসে পৌঁছাল বোম্বাই বন্দরে। দুজন জাহাজ-যাত্রী তরুণ সন্ন্যাসী ধীর পদক্ষেপে অবতরণ করলেন। দুজনেই সুন্দর সুঠাম কান্তিমান। বৈরাগ্যমণ্ডিত তাঁদের অবয়ব। তাঁরা দুজনেই তপঃপ্রভাবে সমুজ্জ্বল, সাধন-দীপ্তিতে প্রভাবিত, অন্তর্লোক অন্তর্জ্যোতিতে আলোকিত, আপন ভাবে ভাবিত। সমাগত যাত্রিকুলের বহুজনের দৃষ্টি ঐ দুই যুবা সন্ন্যাসীর প্রতি। ভ্রূক্ষেপহীন দুই সন্ন্যাসী পথ চলতে আরম্ভ করলেন। একজন অসুস্থ—পথশ্রমে ক্লান্ত। এই দুই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আরেক তরুণ সন্ন্যাসীর অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হলো। শেষোক্ত সন্ন্যাসী রাজোচিত দীর্ঘদেহী; পদ্মপলাশ নয়ন তাঁর। তিনি ব্রহ্মজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, উচ্চকোটির সন্ন্যাসী। তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডলে তপস্যালব্ধ পরিব্রাজক-জীবনের অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট চিহ্ন। সাক্ষাৎমাত্রেই তাঁরা পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। তাঁরা তিনজনেই পরম আনন্দে আনন্দিত, তাঁদের কপোল বেয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত। প্রায় তিন-তিনটি বছর পরে তাঁদের সাক্ষাৎলাভ। তাঁরা তিনজনই একই গুরুর শিষ্য। দীর্ঘ অদর্শনের পর ঐ আনন্দ তাই খুবই স্বাভাবিক। পরস্পরের মধ্যে কত কথা, কত সংবাদের আদান-প্রদান, কত অভিজ্ঞতার বিনিময়। বহু সময় অতিক্রান্ত! শেষোক্ত তরুণ সন্ন্যাসী হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অপর দুজন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ। সময় ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভ।

পরিব্রাজক স্বামীজী তখনো ভারতে অখ্যাত, অজ্ঞাত, অপরিচিত এক সন্ন্যাসী। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গ ও কয়েকজন অনুরাগী শিষ্যদের কাছে তিনি পরিচিত। স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমায় তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি, গীতা ও 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'; আর চিরসাথী বুভুক্ষা ও অনিশ্চয়তা। তিনি ছিলেন কপর্দকশূন্য। কিন্তু স্বামীজীর চিত্তে সর্বদা ছিল অদম্য ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ভারতবর্ষের প্রতি অসীম ভালবাসা।

বোম্বাইতে স্বামীজী ছিলেন এক মারাঠী পণ্ডিতের বাড়িতে। পরে তিন গুরুভাই অবস্থান করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহিশিষ্য কালীপদ ঘোষের ('দানাকালী' নামে ভক্তমহলে পরিচিত) বাড়িতে। এখানে স্বামীজীকে দর্শন করে তুরীয়ানন্দজীর এক অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল: "আমেরিকা-যাত্রার পূর্বে [বোম্বাইয়ে] স্বামীজীর ভাস্বর মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইয়াছিল, তিনি সাধনা শেষ করিয়াছেন এবং জগতের নিকট গুরুর বাণী প্রচার করিবার জন্য যাইতেছেন।"[১] অন্যসময়ে বোম্বাইতে স্বামীজীর সঙ্গে অপর এক গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দেরও দৈবক্রমে সাক্ষাৎ হয়। তখন স্বামীজীকে দর্শন করে অভেদানন্দজীরও এক অননুমেয় উপলব্ধি হয়েছিল: "এসময় স্বামীজীর হৃদয়টা যেন অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় হয়েছিল—আর কোন চিন্তা নেই, কেবল কি করে প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, অহর্নিশ এই ভাবতেন। তখন স্বামীজীকে দেখলেই একটা প্রকাণ্ড ঝঞ্ঝাবাত বলে মনে হতো।"[২]

১ স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ২৯

২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৩৭৩, পৃঃ ৩৫৬

বোম্বাইয়ে স্বামীজী গভীর অন্তরানুভূতিকে প্রকাশ করেছিলেন তুরীয়ানন্দজীর কাছে। বলেছিলেনঃ "হরিভাই, এত তপস্যাদি করলুম, তবু ধর্ম-টর্ম তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। তবে দেখছি, ভারত ভ্রমণ করে আমার heart (হৃদয়টা) খুব বেড়ে গেছে। দেশের দীন-দুঃখীদের জন্য প্রাণটা কাঁদছে। সকলের জন্য খুব feel (সমবেদনা অনুভব) করছি। তাই, আমেরিকায় যাচ্ছি। দেখি, এদের জন্য সেখানে কি করতে পারি।"[৩]

স্বামীজী যখন আবেগমথিত কণ্ঠে উপরোক্ত কথাগুলি বলছিলেন, তখন তাঁর দুটি নয়নে অশ্রুধারা। তুরীয়ানন্দজীও বিচলিত, বিহ্বল। তাঁরও আঁখি দুটি অশ্রুসিক্ত। তুরীয়ানন্দজীর অনুভব হয়েছিল—"বুদ্ধও কি ঠিক এমনি অনুভব করেননি, আর এমনি কথা বলেননি ?··· আমি যেন ঠিক দেখছিলাম যে, জগতের দুঃখে স্বামীজীর হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে—তাঁর হৃদয়টা যেন তখন একটা প্রকাণ্ড কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে রেঁধে একটা প্রতিষেধক মলম তৈরি করা হচ্ছিল।"[৪] ঐসময় স্বামীজী আরেকটি চমকপ্রদ কথা বলেছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছেঃ "হরিভাই, আমেরিকা যাচ্ছি। ওখানে যাকিছু হচ্ছে শুনছ, সব (নিজের বুক চাপড়াইয়া) এর জন্য। এর জন্যই সব হচ্ছে।"[৫] পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছিল, স্বামীজীর সেই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে ছিল।

দীর্ঘ ভারত-পরিক্রমায় স্বামীজী ভারতাত্মার গভীর পরিচয় লাভ করেছিলেন। লাভ করেছিলেন অভিনব মানব-চেতনার অভিজ্ঞান। নগর-শহর থেকে ক্ষুদ্রতম নগণ্য পল্লীর প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করে, দীনতম ভারতবাসীর আর্থিক ও সামাজিক জীবনের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে, ভারতের প্রধানতম সমস্যা দারিদ্র্য-অশিক্ষা-অস্পৃশ্যতায় বিপর্যস্ত জনজীবনের রূপ দর্শন করে স্বামীজী গিয়েছিলেন পাশ্চাত্যে। স্বামীজী তাঁর বাস্তব অথচ দিব্য দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের অবনতির কারণ ধর্ম নয়, বরং ধর্মই যুগ যুগ ধরে ভারতের সংস্কৃতিকে গঠন ও সুদৃঢ় করেছে, ভারতকে গ্রথিত করেছে একতা-সূত্রে ; দারিদ্র্য ভারতবাসীর ধর্ম ও ভগবৎ-বিশ্বাসকে কোনদিনই প্রভাবিত করতে পারেনি। স্বামীজীর মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল—ধর্মকে আশ্রয় করে ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করবে। পরবর্তী সময়ে প্রতীচ্যের মানুষের কাছে সেকথা তিনি সগর্বে বলেছেন। স্বামীজীর হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হয়েছিল ভারতের সনাতন সত্যের চিরন্তন বাণী, যা বেদ, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে বিধৃত হয়ে রয়েছে। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দেশের উচ্চবর্ণ এবং পুরোহিত সম্প্রদায় তাদের যুগে যুগে শোষণ করেছে। তাদের নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়নে শিহরিত স্বামীজী বুঝেছিলেন, ভারতের সনাতন জ্ঞানের ভাণ্ডার পৌঁছে দিতে হবে অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে। কিন্তু ক্ষুধিত ও দুর্বল শরীর ধর্ম-দর্শনের গভীর তত্ত্বকথা ধারণে অক্ষম ; তাই তাদের প্রথমে দিতে হবে অন্ন। দেশের সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে হলে প্রয়োজন পাশ্চাত্যের উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তা। তাই তিনি ভারত-পরিক্রমাকালে পাশ্চাত্যযাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, আমেরিকার ধর্মমহাসম্মেলনে পাশ্চাত্যের সামনে তিনি ভারতের বক্তব্যকে তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। তবে তিনি ভিক্ষুকের বেশে পাশ্চাত্যের দ্বারে দাঁড়াবেন না, তিনি নিয়ে যাবেন ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্ম-সম্পদ।

এরই পাশাপাশি, ভারত-পরিক্রমাকালে স্বামীজীর হৃদয়ে ক্রিয়া করেছিল এক 'দৈবপ্রেরণা' যা তিনি অনুভব করেছিলেন। আবার পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনেরাও বিশেষ শক্তির আবিষ্কার করেছিলেন স্বামীজীর মধ্যে। গাজীপুরের (উত্তর প্রদেশ) জেলা জজ পেনিংটন সাহেব স্বামীজীর মুখে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শুনে স্বামীজীকে অনুরোধ করেছিলেন ইংল্যান্ডে প্রচার করতে যেতে (জানুয়ারি, ১৮৯০)।[৬] জুনাগড়ের (গুজরাট) দেওয়ান-

৩ স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ২৮-২৯

৫ স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ২৮-২৯

৪ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৮

৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৬

অফিসের ম্যানেজার সি. এইচ. পাণ্ড্যকে মুগ্ধ করেছিল স্বামীজীর শিল্প-বিজ্ঞানের গভীর জ্ঞান, উদার মত এবং প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতা। তাঁর কাছে স্বামীজী তাঁর বিদেশযাত্রার অস্ফুট ইচ্ছার কথা আভাসে ব্যক্ত করেছিলেন (নভেম্বর, ১৮৯০)।[৭] এই সময়ে পোরবন্দরের দেওয়ান, প্রখ্যাত বেদ-শাস্ত্রবিদ্ শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ অভিভূত হয়েছিলেন স্বামীজীর মেধা, উদারতা ও মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয়ে। তিনি স্বামীজীকে বলেছিলেন: "আমার মনে হয়, আপনি এদেশে বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারবেন না। আপনার বরং পশ্চিম দেশে যাওয়া উচিত, সেখানকার লোকেরা আপনার ভাবরাশি ও আপনার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে পারবে। সনাতন ধর্মপ্রচার করে আপনি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য কৃষ্টির যাত্রাপথে প্রচুর আলোকসম্পাত করতে পারবেন।"[৮]

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি শিকাগো ধর্ম-মহাসভার প্রস্তুতি-সংবাদ বিস্তৃতভাবে ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।[৯] স্বামীজীও তা শুনেছিলেন নিশ্চয়। ধর্মমহাসভায় যোগদানের আকাঙ্ক্ষা স্বামীজীর হৃদয়কন্দরে অঙ্কুরিত হয়েছিল। স্বামীজীর এই আকাঙ্ক্ষা-অঙ্কুর বর্ধিতাকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল খাণ্ডোয়াতে (জুলাই, ১৮৯২)। খাণ্ডোয়ার উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে স্বামীজী তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম জানিয়েছিলেন: "কেউ যদি আমার যাতায়াতের খরচ দেয় তো সব ঠিক হয়ে যাবে এবং আমি যেতে প্রস্তুত।"[১০] বেলগাঁও-তে স্বামীজী তাঁর শিষ্য হরিপদ মিত্রকে একদিন (অক্টোবর, ১৮৯২) বলেছিলেন: "তোমার সহিত জঙ্গলে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা। কিন্তু শিকাগোর ধর্মমহাসভা হইবে, যদি তাহাতে যাইবার সুবিধা হয় তো সেখানে যাইব।"[১১] মহীশূরের (নভেম্বর, ১৮৯২) মহারাজা চামরাজেন্দ্র উদীয়ার এবং তাঁর দেওয়ান স্যার শেষাদ্রি আয়ারকে স্বামীজী তাঁর নিজের অভিপ্রায় সম্বন্ধে খোলাখুলি বলেছিলেন: যদিও ভারতের বিশেষত্ব বলতে দর্শন ও ধর্মকে বোঝায়, তবুও যুগ-প্রয়োজনে তাকে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান অর্জনে ও সামূহিক সমাজ-সংস্কারে আশু তৎপর হতে হবে। ভারতকে আজ এর বিনিময়ে নিজ বিশেষ সম্পত্তিটি বিশ্বমানবের কল্যাণে বণ্টন করে দিতে হবে। সেইসঙ্গে স্বামীজী জানালেন যে, উপযুক্ত সুযোগ পেলে তিনি স্বয়ং আমেরিকায় গিয়ে বেদান্তপ্রচার করতে প্রস্তুত আছেন।[১২] এধরনের মনোভাবও স্বামীজী ব্যক্ত করেছিলেন ত্রিবান্দ্রামে (ডিসেম্বর, ১৮৯২) সুন্দর-রাম আয়ারের কাছেও।[১৩] রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতিও স্বামীজীকে বারংবার অনুরোধ করেছিলেন ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য। কন্যা-কুমারীতে স্বামীজী আমেরিকা যাবার নির্দেশ পেয়েছিলেন এবং আলাসিঙ্গা পেরুমল প্রভৃতি মাদ্রাজী ভক্তেরা যে ঐবিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন—একথা সর্বজনবিদিত।[১৪] আবার হায়দ্রাবাদে (১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩) পণ্ডিত রতনলালের সভাপতিত্বে মহবুব মহাবিদ্যালয়ে প্রায় একহাজার শ্রোতার (শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেক ইউরোপীয়ও ছিলেন।) সম্মুখে স্বামীজী ইংরেজীতে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন—'আমার পাশ্চাত্য গমনের উদ্দেশ্য'।[১৫] সুতরাং ভারত-পরিক্রমাকালে স্বামীজীর মনে আমেরিকার ধর্মমহাসভায় যোগদানের আকাঙ্ক্ষা বীজাকারে উত্থিত এবং তাঁর ভারত-পরিক্রমার অন্তেই তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। [ক্রমশঃ]

৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০-৩৪১ ৮ ঐ

৯ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৮২, পৃঃ ২০-২৪
সংবাদপত্রগুলির নাম: 'হিন্দু', 'মাদ্রাজ টাইমস', 'মাদুরা মেল', 'হারভেস্ট ফিল্ড', 'মাদ্রাজ খ্রীস্টান কলেজ ম্যাগাজিন', 'কর্ণাটক', 'লাইট অব দ্য ইস্ট', 'ইউনিটি অ্যান্ড দ্য মিনিস্টার', 'সখা', 'সঞ্জীবনী' এবং 'মারাঠা'।

১০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২ ১১ ঐ, পৃঃ ৩৬৭

১২ ঐ, পৃঃ ৩৭৫ ১৩ ঐ, পৃঃ ৩৮৫ ১৪ ঐ, পৃঃ ৩৯৩-৩৯৫ ১৫ ঐ, পৃঃ ৪০৯

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

আকুপাঙ্কচার বা সূচী-চিকিৎসা

হরিপদ চক্রবর্তী

আকুপাঙ্কচার বা সূচী-চিকিৎসা এক প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি। আমাদের দেশের আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মতো চীনদেশে বহুদিন থেকেই এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যার উৎপত্তি কবে, কোথায়—তার কোন ইতিহাস নেই। তবে সাধারণের মতে এই চিকিৎসার সুফলের জন্য কালক্রমে এর বিস্তৃতি ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের অথর্ববেদে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উল্লেখ পাই। চীনদেশে 'হুয়াং ডি নাই জিং' নামে এক প্রাচীন পুস্তকে এই চিকিৎসাপদ্ধতির উল্লেখ পাই। 'হুয়াং ডি নাই জিং'-এর অর্থ 'পীতবর্ণ সম্রাটের অন্তর্দেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতি' (The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine)। এই পুস্তক উৎসর্গ করা হয়েছিল হুয়াং ডি নামে এক চীন সম্রাটকে, যিনি ২৬৯৭-২৬৯৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়।

প্রাচীন চীনা চিকিৎসাপদ্ধতির চারটি শ্রেণী দেখা যায়ঃ (১) হার্ব্যাল থেরাপি—লতাপাতা বা শিকড় ইত্যাদির দ্বারা চিকিৎসা (২) মক্সিবুশন—শরীরের বিশেষ অংশ পুড়িয়ে মক্সা পাতা চূর্ণের প্রলেপ দেওয়া (৩) আকুপাঙ্কচার বা সূচী-চিকিৎসা (৪) সার্জারী বা শল্য চিকিৎসা।

আকুপাঙ্কচার শব্দের ল্যাটিন অর্থ হলো 'Acus'—সূচী; 'Puncture'—বিদ্ধ করা। আকুপাঙ্কচার ও মক্সিবুশন বা প্রলেপ চীনা চিকিৎসাপদ্ধতির দুটি প্রাচীন ধারা। চীনদেশে বহুকাল যাবৎ এই পদ্ধতির দ্বারা 'নগ্নপদ চিকিৎসকগণ' ('Bare-footed Doctors') গ্রামে-গঞ্জে সর্বসাধারণের সুফলদায়ী চিকিৎসা করতেন। আকুপাঙ্কচার দ্বারা শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে সূচ বিদ্ধ করে রোগ নিরাময় করা হয়। এই নির্দিষ্ট অংশগুলিকে 'আকুপাঙ্কচার পয়েন্টস' বলা হয়। কিন্তু নির্ভুলভাবে এই পয়েন্টস বা বিন্দুগুলি নির্ণয় করা বিশেষ অভিজ্ঞতা ছাড়া সম্ভব নয়। প্রায় ৬০০০ বছর আগেও এই প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি চীনদেশে প্রচলিত ছিল।

চীনদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের চিন্তাভাবনায় 'ইন' ও 'ইয়াং'-এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। চীনাদের মতে মানুষের জীবনে এই দুই বিপরীত শক্তির সুখকর সমন্বয় সব বিষয়ে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। চীনা চিকিৎসাপদ্ধতিতেও এই সূত্র মেনে মনে করা হতো যে, মানুষের শরীরে 'ইন' ও 'ইয়াং'-এর সুষম প্রক্রিয়া মানুষকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখে। শরীরের যেকোন ব্যাধি এই সুষম প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রমের জন্যই হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশকে 'ইন' ও 'ইয়াং'-এর অংশ বলে মনে করা হয়। সাধারণ-ভাবে শরীরের ভিতরের অংশকে মনে করা হয় 'ইয়াং', বাইরের বা ওপরের অংশকে মনে করা হয় 'ইন'। ভিতরে 'ইন' ও 'ইয়াং'-এর চ্যানেল রয়েছে। শরীরের 'ইন' ও 'ইয়াং'-এর সুষম বিন্যাস ও রক্ষণ সম্ভব হয় এক অতি প্রয়োজনীয় জীবনীশক্তি দ্বারা, যাকে বলা হয় 'চি' (chi)। এই শক্তি অনবরত শরীরের মধ্যে সুবিন্যস্ত ধমনী বা চ্যানেলের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে এবং তার মধ্যেই আছে আকু-পাঙ্কচার-বিন্দুগুলি। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের মধ্যবিন্দু এমনভাবে যুক্ত আছে যে, 'ইয়াং'-এর মধ্যবিন্দু 'ইন'-এর সঙ্গে এবং 'ইন'-এর মধ্যবিন্দু 'ইয়াং'-এর সঙ্গে যুক্ত। যখনই 'ইন' ও 'ইয়াং'-এর মধ্যে ঐ প্রবাহ বন্ধ বা বিঘ্নিত হয় তখন শরীর অসুস্থ হয় এবং ঐ অসুস্থতা বা রোগ সেরে যায় ঐসব আকুপাঙ্কচার-বিন্দুতে সূচীবিদ্ধ করে 'চি'-র জীবনদায়ী শক্তি-প্রবাহকে পুনরুদ্ধার করে আবার চালু করলে। প্রাচীনকালে চীনদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে শরাহত সৈনিকদের ক্ষত নিরাময় করার জন্য এই আকুপাঙ্কচার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো এবং তাতে সুফল লাভ হতো।

প্রাথমিক অবস্থায় আকুপাঙ্কচার পদ্ধতিতে ছোট কাঠের শলাকা ব্যবহার করা হতো। পরে কাঁটা ও ক্রমে লোহা ও ব্রোঞ্জের শলাকার ব্যবহার শুরু হয়। দেখা গেল যে, বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন রকম শলাকা ব্যবহারে বিভিন্ন রকম ফল হচ্ছে। কোন রোগের

চিকিৎসায় উত্তেজক ভাব (stimulating effect) দরকার, আবার কোন রোগের চিকিৎসায় তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবের (sedative effect) দরকার। এর অর্থ, বিভিন্ন প্রকার রোগে শরীরের ধমনীতে যে জীবন-দায়ী শক্তি বয়ে যায় তা কখনো বাড়ে বা কমে। ঐ জীবনদায়ী শক্তিপ্রবাহের অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য একটি বিশেষ আকুপাংকচার-বিন্দুতে শলাকা বা সূচ বেঁধানো হয়। চীনারা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিলেন যে, জীবনীশক্তি বা প্রাণ শরীরের যে-সকল ধমনীর মধ্য দিয়ে চলাচল করে, সেগুলি প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে যুক্ত এবং কোন্ আকুপাংকচার-বিন্দু কোন্ রোগের নিরাময়ের জন্য আকুপাংকচারের উপযোগী তাও তাঁরা বিশেষভাবে স্থির করেছিলেন। পূর্বোক্ত 'হুয়াং ডি নাই জিং' পুস্তকে এসম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি ভালই ফল দিচ্ছিল। তারপরে প্রথম অহিফেন যুদ্ধের সময় ১৮৩৭-১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে চীনারা পশ্চিমী চিকিৎসাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়। কিন্তু চীনদেশের জনসাধারণ পশ্চিমী চিকিৎসাপদ্ধতিকে সহজভাবে মেনে নেয়নি। মূলতঃ অবিশ্বাস এবং পশ্চিমী অধীনতার গ্লানিই ছিল তার কারণ। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে চীনে রিপাব্লিক পার্টি প্রথম ক্ষমতায় আসে এবং সান ইয়াৎসেন চীনদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তাঁর সময়ে এবং পরবর্তী কালে চিয়াং কাইশেকের সময় পর্যন্ত (১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ) প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক বলে অবহেলা করা হয়েছিল। কিন্তু মাও সে তুং-এর 'পিপলস রিপাব্লিক' ক্ষমতায় আসার পর (১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে) 'দ্য ফার্স্ট ন্যাশনাল হাই-জিন কনফারেন্স'-এ (১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে) চীনের প্রাচীন রোগনিরাময় পদ্ধতিটি আবার মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয় এবং পরবর্তী প্রায় চার দশকে চীনের মাও সে-তুং-এর সরকারের আমলে আকুপাংকচার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W. H. O.) দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে পৃথিবীর নানা দেশে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিতে এই স্বল্প খরচের চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রসার ঘটতে থাকে।

বর্তমানে আকুপাংকচার চিকিৎসাপদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির মিলন ঘটানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এই পদ্ধতিতে রোগনিরাময় হয় এবং পদ্ধতিটি যথেষ্ট ফলপ্রসূও। ফলে এটি এখন বেশ প্রসারলাভ করছে। এই চিকিৎসার খরচও অল্প।

আকুপাংকচার চিকিৎসাপদ্ধতিকে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতিতে উন্নীত করা হয়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে। এখন আবার আকুপাংকচারের সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতির মিলন ঘটানোর চেষ্টা চলছে, যা 'হোমিওপাংকচার' নামে প্রসিদ্ধ। সুইডেনের স্টকহোমে তৃতীয় আকুপাংকচার সিম্পোসিয়াম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে। এতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অংশগ্রহণ করে। যেসব রোগ আকুপাংকচার পদ্ধতিতে সারানো সম্ভব বা সারানো হয়েছে তার একটি তালিকা আকুপাংকচার-চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়।

বর্তমানে এই আকুপাংকচার চিকিৎসাপদ্ধতি পৃথিবীর বহু বিখ্যাত হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল স্কুল বা কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়। এবিষয়ে আলাদা বিভাগও গঠন করা হয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠানে।

আকুপাংকচারের বিশেষজ্ঞগণ দাবি করেন যে, এই পদ্ধতিতে স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে বহু দুরারোগ্য ব্যাধিরও নিরাময় হয় এবং অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের চিকিৎসায় যেমন এক অসুখ সারার পর আরেকটি অসুখের সম্ভাবনা থাকে এই চিকিৎসা-পদ্ধতি তা থেকে মুক্ত। চীন বা ভারতের মতো বিশাল দেশে যেখানে শহর থেকে গ্রামাঞ্চল বেশি এবং গ্রামাঞ্চল থেকে শহরের দূরত্ব বেশি, সেখানে স্বল্প খরচের সুফলদায়ী চিকিৎসার প্রসার হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা, বলা বাহুল্য।

কলকাতাতেও এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা করেন এবং এখানে এই চিকিৎসাপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত কোর্স শিক্ষা দেওয়াও হয়। এই চিকিৎসাপদ্ধতি কলকাতাতে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রচলিত আছে। কলকাতার আকুপাংকচার-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেন যে, সায়াটিকা, স্নায়ুতন্ত্রের নানা বৈকল্য, হাঁপানি, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগে এই চিকিৎসা করে তাঁরা সাফল্য পেয়েছেন। □

গ্রন্থ-পরিচয়

গীতার একটি সরল বাঙলা সংস্করণ

অনিমা ধর

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। প্রকাশক : পরেশচন্দ্র বর্ধন ও নীহার লাহা। (ঠিকানা গ্রন্থে মুদ্রিত হয়নি।) মূল্য : পঞ্চাশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি বাঙলাভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য গীতা সংস্করণের মধ্যে মূল্যবান সংযোজন। বাঙলাভাষায় সহজবোধ্য এবং সুলভ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। নব্বই বৎসর বয়স্ক এই জ্ঞানতাপস তাঁহার জীবনের প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে গীতার মর্মবাণীকে বর্তমান গ্রন্থের মাধ্যমে সর্ব-সাধারণের নিকট সহজবোধ্য করার যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ।

আলোচ্য গ্রন্থটি ব্রহ্মচারী মহারাজের দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময়ের গবেষণা, সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফসল। এই গবেষণার উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য প্রদর্শন নহে; কিভাবে গীতাকে, গীতার মর্মবাণীকে সহজ-সরলভাবে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ও জীবনগ্রাহ্য করা যায় তাহারই আন্তরিক প্রচেষ্টা। এই বিষয়ে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গ্রন্থটিতে আছে প্রতিটি শ্লোকের অন্বয়, প্রতি-শব্দার্থ, সরল অনুবাদ, মর্মার্থের অনুধ্যান, প্রতি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ও তাৎপর্য এবং যেখানে আপাতবিরোধী ভাবের কথা আছে সেইগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নির্দেশ করিয়া তিনি অন্তর্নিহিত সমাধানটি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। সব মিলাইয়া গ্রন্থখানি যাঁহারা সংস্কৃতভাষা জানেন না এবং যাঁহারা সংস্কৃতভাষা ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত—তাঁহাদের সকলের পক্ষেই সমভাবে অতি উপাদেয় হইবে সন্দেহ নাই। সহজবোধ্য এই গীতা সংস্করণটি প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার একটি বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার বহুল প্রচার এবং পাঠকজীবনে ইহার সমন্বয়ধর্মী আধ্যাত্মিক ভাবের সঞ্চার আমরা কামনা করি।

প্রসঙ্গ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

তাপস বসু

রামকৃষ্ণ মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ : মুকুল সেনগুপ্ত। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মূল্য : পঁচিশ টাকা।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের পরই যাঁর নাম উচ্চারিত হয় তিনি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, 'রাজা মহারাজ' বা 'মহারাজ' নামেই যিনি অধিক পরিচিত। সেই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নিয়ে মুকুল সেনগুপ্ত এই মনোজ্ঞ বইটি লিখেছেন। দশটি অধ্যায়ে লেখক গ্রন্থটিকে সাজিয়েছেন। অধ্যায়-গুলি হলো যথাক্রমে 'মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ', 'কথামৃতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ', 'স্মৃতির দর্পণে স্বামী ব্রহ্মানন্দ', 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ', 'প্রেমিক পুরুষ ব্রহ্মানন্দ', 'ব্রহ্মানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি', 'সঙ্গীত সাধক স্বামী ব্রহ্মানন্দ', 'কর্মযোগী স্বামী ব্রহ্মানন্দ', 'সঙ্ঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ' এবং 'ব্রহ্মানন্দ বাণী'।

ব্রহ্মানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : "মা ইচ্ছা করে, একটি ত্যাগী ভক্ত ছেলে আমার কাছে সর্বক্ষণ থাকে। একদিন দেখি মা একটি ছেলে এনে আমার

কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন—এইটি তোমার ছেলে। আমি তো শিউরে উঠলাম। মা আমার ভাব দেখে হেসে বললেন—সাধারণ সংসারিভাবের ছেলে নয় ত্যাগী মানসপুত্র। রাখাল আসতেই চিনতে পারলাম, এই সেই।" প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্বাশ্রমের বিবরণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আসার প্রসঙ্গটি ব্যক্ত হয়েছে।

আমরা দেখেছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপস্থিতি। ব্রহ্মানন্দজীর সেই উপস্থিতি নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়টি রচিত। 'স্মৃতির দর্পণে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সন্ন্যাসী ও গৃহিভক্তদের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে আমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্বরূপটি উদ্ভাসিত হতে দেখি। স্মৃতিচারণ করেছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, যোগীন মা, দেবেন্দ্রনাথ বসু, স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ, স্বামী গৌরীশানন্দ, স্বামী বরদানন্দ, স্বামী শ্যামানন্দ, স্বামী দেবানন্দ প্রমুখ।

'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ' অধ্যায়টি তথ্যপূর্ণ। স্বামীজীর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দজীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি এই অধ্যায়ে উঠে এসেছে। স্বামীজীর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দজীর পত্রবিনিময় প্রসঙ্গ এবং বেলুড় মঠ প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হয়েছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রকৃত স্বরূপ, তাঁর প্রেমিক স্বভাব, অধ্যাত্মজগতে তাঁর অনায়াস নিরন্তর অবস্থান —এসব পরিচয় পাই পঞ্চম অধ্যায় 'প্রেমিক পুরুষ ব্রহ্মানন্দ' অধ্যায়ে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে ব্রহ্মানন্দজীর ছবি কতটা প্রগাঢ়ভাবে উঠে এসেছে তার অনবদ্য পরিচয়ও পাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

আমরা জানি স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্গীতরসিক ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতপ্রীতির বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে 'সঙ্গীত সাধক ব্রহ্মানন্দ'। লেখকের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়ঃ "যেসব সঙ্গীত ত্যাগ ও বৈরাগ্যে, সুরে ও স্বরে ভরপুর সেই সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ ছিল অধিক।" শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তাঁরও সঙ্গীত শ্রবণের মাধ্যমে ভাবসমাধি হতো, তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন।

অষ্টম অধ্যায় জুড়ে আছে কর্মযোগী স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরিচয়। কি বেলুড় মঠে, কি ভুবনেশ্বর মঠে আমরা কর্মযোগী স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্বরূপটি দেখতে পাই। স্বামীজী চেয়েছিলেন সহজাত নেতৃত্ব ও রাজবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা মহারাজ যথার্থ কর্মযোগীর আদর্শ স্থাপন করুন। প্রথম সঙ্ঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্ঘনেতা স্বামীজীর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন।

সঙ্ঘগুরুরূপে এক বিরাট ভূমিকায় আমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখতে পেয়েছি। স্বামীজীর নির্দেশিত পথে দীর্ঘদিন সঙ্ঘের হাল ধরে সঙ্ঘকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ঠাকুর বলতেনঃ "রাখালের মধ্যে রাজবুদ্ধি আছে। ও একটা রাজ্য চালাতে পারে।" স্বামীজীও তাই 'ট্রাস্ট' গঠনের পর সঙ্ঘগুরুর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে। অবশ্যই এসবের পিছনে ছিল শ্রীশ্রীমায়ের অনুমোদন এবং আশীর্বাদ।

শেষ অধ্যায়টি চিহ্নিত হয়েছে 'ব্রহ্মানন্দ বাণী'-রূপে। স্বামীজী বলেছিলেনঃ "আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে বড়।" সেই আধ্যাত্মিকতা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে, তাঁর বাণীতে, তাঁর কর্মে। যেমন সেই জীবন, তেমনই সেই বাণী—আনন্দময়, মঙ্গলময় এবং চৈতন্যময়।

বিশেষ আন্তরিকতা নিয়ে গ্রন্থটি রচিত। সহজ সরল ভাষায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনের নানাদিক বিস্তৃতভাবে লেখক তুলে ধরেছেন। এজন্য লেখককে আমাদের ধন্যবাদ। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট এবং মুদ্রণও সুন্দর। গ্রন্থটির প্রচার আমরা বিশেষভাবেই আশা করব।

প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক চিন্তায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঃ বুদবুদ। 'বীক্ষণ', তমলুক, মেদিনীপুর। মূল্যঃ ষোল টাকা।

বিবেক ঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ। নলডাঙা, ব্যান্ডেল, হুগলী। মূল্যঃ তিরিশ টাকা। এটি একটি উপন্যাস—দুটি পর্বে বিভক্ত। ☐

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে আয়োজিত ২৩ অক্টোবর '৯১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি '৯২ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। বিগত ২৩ অক্টোবর '৯১ তারিখে 'বিদ্যামন্দিরের পঞ্চাশ বছর—একটি সমীক্ষা' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধন করেন সারদাপীঠের তৎকালীন সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দ। এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী শিবময়ানন্দ। সমাপ্তি ভাষণ দেন স্বামী মুমুক্ষানন্দ।

২৭, ২৮, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর, '৯১ বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনার পর্যায়ের উদ্বোধন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। অংশ-গ্রহণকারী বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী ভজনানন্দ, স্বামী অসক্তানন্দ প্রমুখ। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বহু সন্ন্যাসী ও শিক্ষকবৃন্দ এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ৩১ তারিখের সেমিনারে (ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কে অনুষ্ঠিত) উদ্বোধনী ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ-শিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী এবং সমাপ্তি ভাষণ দেন অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত। ১৯ জানুয়ারি '৯২ তারিখে 'সুবর্ণ জয়ন্তী সপ্তাহ'-এর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বামী ভব্যানন্দ, অধ্যাপক শিবজীবন ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়।

২০ জানুয়ারি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রথীন্দ্রনারায়ণ বসু এবং অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু।

২২ জানুয়ারি বিদ্যামন্দিরের শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিড়লা শিল্প সংগ্রহশালার অধিকর্তা সুখময় গোস্বামী এবং হাওড়ার সাংসদ অধ্যাপক সুশান্ত চক্রবর্তী।

২৪ জানুয়ারি 'অভিভাবক দিবস' পালিত হয়। প্রায় ৪৫০ জন অভিভাবক এই দিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অভিভাবকদের সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্বামী মুমুক্ষানন্দ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় মন্ত্রী সরল দেব।

২৫ জানুয়ারি সারদাপীঠ ও বিদ্যামন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সারদাপীঠের অন্তর্গত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে স্থানীয় অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন।

২ ফেব্রুয়ারি পুনর্মিলন উৎসব পালিত হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে আন্তঃ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উমাপতি কুমার এবং শৈলেন মান্না।

গত ৮ জুন **আলং আশ্রমের** রজত জয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী আর. কে. খ্রিমে। এই অনুষ্ঠানে তিনি রজত জয়ন্তী উৎসবের স্মারকগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন।

উদ্বোধন

গত ২১ জুন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ **পুনা আশ্রমে** 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-স্মৃতি ভবন' নামে একটি নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন করেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১০ জুন **পুরী রামকৃষ্ণ মঠের** সাধুনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী

মহারাজ। ঐদিন তিনি এই আশ্রমের হীরক জয়ন্তী উৎসবেরও সূচনা করেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

চেরাপুঞ্জি আশ্রম-ছাত্রাবাসের একজন উপজাতি ছাত্র মেঘালয় বোর্ড পরিচালিত এইচ. এস. এল. সি. পরীক্ষায় সার্বিক মেধা তালিকা অনুযায়ী ৬ষ্ঠ স্থান এবং উপজাতিদের মধ্যে মেধা তালিকা অনুযায়ী ৩য় স্থান লাভ করেছে।

চিকিৎসা-শিবির

খেতড়ি আশ্রম গত ১৪ জুন এক চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ২৪০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

ভুবনেশ্বর আশ্রম গত ২৭ মে থেকে একটি ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিট চালু করেছে।

চেরাপুঞ্জি আশ্রম গত ১৫ জুন থেকে ইছামতী গ্রামে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকার্য আরম্ভ করেছে।

ত্রাণ

মহারাষ্ট্র খরাত্রাণ

বোম্বাই আশ্রমের মাধ্যমে সালালপুর জেলার ববশী তালুকের ছয়টি গ্রামের পাঁচশো লোককে ২৬০০ কিলোঃ জোয়ার এবং ৩৬০টি পরিবারের ১৮০০ গৃহপালিত পশুর জন্য ৩৬,৩০০ কিলোঃ পশুখাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।

রাজস্থান দুর্গতত্রাণ

খেতড়ি আশ্রম তার আশপাশের কয়েকটি গ্রামের দুঃস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে ৭৭৩টি পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করেছে।

বাংলাদেশ ঝঞ্ঝা ও বন্যাত্রাণ

ময়মনসিংহ আশ্রমের মাধ্যমে ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও সাহেরপুর—এই ছয়টি জেলার ৩৭৩৭টি দুর্গত পরিবারের মধ্যে ২২৩৪টি শাড়ি, ২১৫১টি লুঙ্গি, ৫৪টি ধুতি, ১২টি চাদর, ৪৭১টি শিশুদের পোশাক, ১০১১টি কম্বল এবং ৩০০ প্যাকেট হাই-প্রোটিন বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে।

বাগেরহাট আশ্রমের মাধ্যমে বাগেরহাট সদর ও মোড়ালগঞ্জ মহকুমায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৫০০ শাড়ি, ৫০০ লুঙ্গি ও ৪০০ কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

দিনাজপুর আশ্রমের মাধ্যমে এই জেলার পাঁচটি মহকুমায় কুড়িটি গ্রামের ৫৪১টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৪৮৭টি শাড়ি, ৩১৬টি লুঙ্গি, ২৩৪টি ধুতি এবং ৩৪৬টি কম্বল দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গ

জলপাইগুড়ি জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের ৪টি ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত কলোনিতে 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' প্রকল্পের মাধ্যমে পনেরো দিনে ১০০ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। ১৫টি পরিবারকে তাদের আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত পাকাবাড়ি মেরামত করার জন্য মাল-মশলা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১০২টি শাড়ি, ৯৮টি ধুতি ও ৮০০ শিশুদের পোশাক এবং ১০০ সেট শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ছবি বিতরণ করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ

উত্তরকাশী জেলার ভাতওয়ারি তহশিলের নেতালি গ্রামে ৫০টি ভূমিকম্প-প্রতিরোধী পাকা-বাড়ি নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে ৪৩টি বাড়ির মাল-মশলা সংগ্রহ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দ গত ২ মে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে ভবানী মন্দিরের সন্নিকটে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতির উদ্দেশে একটি ফলক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ৫ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দ চন্দ্রনাথ-তীর্থ দর্শন করতে গিয়েছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে স্থানীয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগীরা সমবেত হয়েছিলেন। স্বামী অক্ষরানন্দকে তাঁরা জানান যে, ঐ অঞ্চলে তাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে পরিচালিত একটি আশ্রম স্থাপন করতে আগ্রহী। ১৬ মে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে বুদ্ধ-জয়ন্তী পালিত হয়। সন্ধ্যায় স্বামী অক্ষরানন্দ বুদ্ধের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। এছাড়াও ১৫ মে তারিখে কমলাপুর বৌদ্ধবিহারে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের উপস্থিতিতে স্বামী অক্ষরানন্দ বুদ্ধের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ১৮ মে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্কৃতি-ভবনে বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পী ওস্তাদ সাগিরুদ্দিন খাঁ উচ্চাঙ্গ

সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন : জুলাই মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গ হয়েছে। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় রামনাম সংকীর্তন এবং ইংরেজী, হিন্দী ও বাঙলাতে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। ২১ জুলাই 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'র ক্লাস নিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। স্বামী ভাস্করানন্দ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনলুলু বেদান্ত সোসাইটির আমন্ত্রণে গত ১ জুলাই সেখানে ধর্মীয় ক্লাস ও আলোচনাদি করেছেন। এই বেদান্ত সোসাইটি স্নোহোমিশ কান্ট্রিতে মাসিক সাধন-শিবির পরিচালনা করেছে গত ১৮ জুলাই। শিবিরে পাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই বেদান্ত সোসাইটির পরিচালনায় প্রতি রবিবার বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত একটি সাপ্তাহিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষা, শিষ্টাচার, অসাম্প্রদায়িক প্রার্থনা প্রভৃতি শেখানো হচ্ছে এবং বই-পত্র, অডিও-ভিশুয়্যাল-এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

দেহত্যাগ

স্বামী বরেশানন্দ (রমানাথ) গত ১০ জুন রাত ১'৩০ মিনিটে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। হৃদ্‌যন্ত্রে গোলযোগের দরুন তাঁকে গত ৯ এপ্রিল সেবাশ্রম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি গত কয়েক বছর ধরে উচ্চ রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে তাঁর দেহকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর

স্বামী বরেশানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তিনি ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে পোনামপেট (কর্ণাটক) আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি কনখল সেবাশ্রম ও কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি মাদ্রাজ মঠ, বারাণসী সেবাশ্রম, মায়াবতী, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম ও দিল্লী আশ্রমের কর্মী ছিলেন। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বারাণসী সেবাশ্রমের সাধুনিবাসে বাস করছিলেন। কঠোর পরিশ্রমী ও সদাপ্রফুল্ল স্বামী বরেশানন্দ ছিলেন একজন স্নেহশীল ব্যক্তি।

স্বামী বেদান্তানন্দ (অনুকূল মহারাজ) গত ২১ জুন রাত ৩টায় বারাণসী সেবাশ্রমে কিডনির রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। মূত্রাশয়ে সংক্রমণ হওয়ায় গত ১৪ জুন তাঁকে সেবাশ্রম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর মরদেহও গঙ্গায় সলিলসমাধি দেওয়া হয়েছে। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী বেদান্তানন্দ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে সরিষা আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রাঁচি স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন স্যানাটোরিয়ামের প্রধান। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি পাটনা আশ্রমের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি প্রথমে পাটনা ও পরে বারাণসী সেবাশ্রমে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। কঠোর সাধুজীবনের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ২৮ জুলাই শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যায় তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী কমলেশানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন। ☐

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব গত ১৫ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি, '৯২ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারির বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। ১৬ ফেব্রুয়ারি ছিল সাধারণ উৎসব। ঐদিন ভোরে মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ইত্যাদি হয়। উপনিষদ্ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সর্বদেবানন্দ ও স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। দুপুরে প্রায় ছয় হাজারের মতো ভক্ত প্রসাদ পায়, অপরাহ্ণে সেবাসঙ্ঘের প্রস্তাবিত আশ্রমভবন তথা সাধুনিবাসের শিলান্যাস করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। তিনি বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন এবং ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সর্বদেবানন্দ। উৎসবের উভয় দিনেই সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, কোতলপুর (বাঁকুড়া) গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম আবির্ভাব-স্মরণোৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রায় সঙ্গীত পরিচালনা করেন 'ডোমজুড় ভক্তদল'-এর অমর পাড়ুই ও সম্প্রদায়। দুপুরে প্রায় তিনহাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দ। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় ভক্ত-সম্মেলন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী অমেয়ানন্দ। সম্মেলনের সকাল ও বিকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে স্বামী দেবদেবানন্দ ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। সম্মেলনে পাঁচশতাধিক ভক্ত যোগদান করেন। ধর্মসভা ও ভক্তসম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, স্বামী মেধসানন্দ প্রমুখ। উভয় দিনই দুপুরে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন নিত্যরঞ্জন মণ্ডল ও সহশিল্পিবৃন্দ। সন্ধ্যারতির পর প্রথম দিন পদাবলীকীর্তন পরিবেশন করেন শিখা ঘোষ ও সহশিল্পিবৃন্দ এবং দ্বিতীয় দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও সহশিল্পিবৃন্দ।

সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, মাহেশ (হুগলী)ঃ গত ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় শ্রীশ্রীহরিসভা প্রাঙ্গণে সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বিশোকাপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা নিখিলপ্রাণা। ২১ তারিখ শোভাযাত্রা, গীতি-আলেখ্য পরিবেশন, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী দেবদেবানন্দ ও স্বামী ঈশাত্মানন্দ। ধর্মসভার পর স্বামী দেবদেবানন্দ 'সঙ্গীতে কথামৃত' পরিবেশন করেন। এই উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। গত ৫ মে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এই সঙ্ঘের অফিসঘর ও ঠাকুরঘর শ্রীরামপুরের ৫৭ খাসবাগান লেনে স্থাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শংকর সোম, বিষ্ণুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ অসিত দত্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ, রামপাড়া (হুগলী)ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি এই সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় কাশীপুর গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিমলাত্মানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী ভৈরবানন্দ। সভায় সঙ্ঘের সম্পাদক নিমাইচন্দ্র মান্না বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে ঘুরে স্মরণসভার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ও সভাপতি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাষণ দেন। সভায় প্রায় ৫০০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘের পুরুলিয়া (বাঁকুড়া) শাখার উদ্যোগে গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি '৯২ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম শুভ জন্মজয়ন্তী

পালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, ভজন, বাউল গান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় দিন ধর্ম-সভা ও যুবসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বামনানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী।

গত ১ মার্চ **কটক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-প্রচার সমিতির** উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম জন্মতিথি পালন করা হয় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সকালে পূজানুষ্ঠান হয় এবং সমিতির সভাপতি প্রণবকুমার দাসের পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ এবং স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। বিকালের সভায় আলোচনা করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। ঐদিন দুপুরে প্রায় দেড়হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি **নদীয়া জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার পরিষদ ও তৎসংলগ্ন 'ডি' অঞ্চলের** দ্বিতীয় সম্মেলন বাদকুল্লা ইউনাইটেড ক্লাব-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অঞ্চলের বারোটি প্রতি-ষ্ঠান থেকে দেড়শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ-দান করেছিলেন। প্রথম অধিবেশনে আশ্রমের প্রতি-নিধিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্য রাখেন। 'যুগধর্ম' ও শ্রীরাম-কৃষ্ণ' বিষয়ে আলোচনা করেন নচিকেতা ভরদ্বাজ।

দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রকাশ্য ধর্মসভায় সভা-পতিত্ব করেন স্বামী দিব্যানন্দ। বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও নচিকেতা ভরদ্বাজ। তাছাড়া সদস্য সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরি-বেশিত হয়। এই সম্মেলনের আয়োজনে বাদকুল্লা ইউ-নাইটেড ক্লাবের সদস্যবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ডিগবয় (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সহ-সভাপতি **সুখময় রায়** স্বল্পকাল রোগভোগের পর করজপরত অবস্থায় গত ৪ ডিসেম্বর '৯১ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। ডিগবয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি এই আশ্রমের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, **হিমাংশুশেখর রায়** গত ৩০ ডিসেম্বর প্রায় ৮৮ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। অকৃতদার হিমাংশুবাবুও ডিগবয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং নিয়মিত পাঠ-আলোচনাদিতে যোগদান করতেন। প্রয়োজনে মুক্তহস্তে দান করা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

আগরতলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, রামকৃষ্ণ মিশনের ঘনিষ্ঠ অনুরাগী এবং বেলুড় মঠ ও অন্যান্য অনেক কেন্দ্রে সুপরিচিত-ভক্ত **গৌরচন্দ্র সাহা** গত ৩০ জানুয়ারি, ১৯৯২ কলকাতার বেলেঘাটা আই. ডি. হাসপাতালে বেলা ১০টা নাগাদ ৬০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। পরদিন ৩১ জানুয়ারি তাঁর মরদেহ বিমানে আগরতলায় আনা হলে এক বিশাল শোকমিছিল মরদেহকে অনুগমন করে। রামকৃষ্ণ মিশনের ঢাকা, আগরতলা এবং অন্যান্য কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত গৌরবাবু শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধা-নন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পরোপকার, অকৃপণ দান এবং জনসেবা তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রভূত সম্পত্তির মালিক গৌরবাবু গরিব-দুঃখীর পরম বন্ধু ছিলেন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও তিনি কলকাতা ও আগরতলায় বিভিন্ন ক্রীড়া ও জনস্বাস্থ্যমূলক সংস্থাসহ নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগরতলায় বাজার, দোকান, এমনকি সাইকেল-রিক্সা চলাও বন্ধ হয়ে যায় এবং সমস্ত শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

গত ১ জানুয়ারি কল্পতরু উৎসবের দিন প্রত্যূষে তিনি কলকাতার নিজ বাসগৃহ থেকে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী, কাশীপুর উদ্যানবাটী, দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠে যান। ঐদিনই তিনি অসুস্থবোধ করেন এবং ৪ জানুয়ারি আগরতলায় ফিরে যান। ৯ জানুয়ারি শেষবারের মতো হাসপাতালে ভর্তির জন্য কলকাতায় রওনা হওয়ার পথে আগরতলা আশ্রমের প্রার্থনা-মন্দিরে প্রণাম করে যান। এবার যে-কদিন তিনি আগরতলায় ছিলেন অসুস্থতা উপেক্ষা করেও প্রায় প্রতিদিনই আশ্রম-মন্দিরে এসে প্রণাম করার দৈনন্দিন কর্মসূচীটি বজায় রেখেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ তাঁর জীবনে বিশেষ লক্ষণীয় ছিল। □

বিজ্ঞান-সংবাদ

মৃতদেহকে ‘মমি’ করা

প্রাচীনকালে মিশরে ‘মমি’ (mummy) তৈরি করতে বিটুমেন (bitumen—আলকাতরা-জাতীয় খনিজ পদার্থ)-এর ব্যবহার নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক এতদিন চলছিল, মনে হয় তার এখন অবসান হয়েছে। বিটুমেন যে শুধু এই কাজে ব্যবহৃত হতো তা নয়, এই দ্রব্যটি কোথা থেকে যোগাড় করা হতো, তাও দেখিয়েছেন ভূরসায়নবিদ্ কোন্নান ও ডেসর্ট তাঁদের একটি প্রবন্ধে। ‘মমি’ শব্দটি এসেছে পারসি কথা ‘মামিয়া’ থেকে, যার অর্থ হলো বিটুমেন অথবা পিচ (pitch)। পারস্য দেশের ‘মামি পর্বত’ থেকে বিটুমেন-জাতীয় দ্রব্য নির্গত হয় এবং তা নানা ঔষধ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রক্ষিত মমিগুলির রঙ সবই কালো; আগে ধরা হতো যে, মৃতদেহগুলি বিটুমেনে ডোবানো থাকত। সম্প্রতি মমি-বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, মৃতদেহের ওপরে রজন (resin) লাগানো হতো যা পরে কালো হয়ে যায়। আশির দশকে কোন্নান ও ডেসর্ট মমির দেহাংশ নিয়ে পরীক্ষা করে বিটুমেন পেয়েছেন। এই বিটুমেনের ধরন দেখে মনে হয়, এটি ‘ডেড সী’ (Dead sea) থেকে সংগৃহীত। অন্যত্র এই ধরনের পরীক্ষার ফলাফল দেখে বলা যেতে পারে যে, টোলেমাইক (Ptolemaic) ও রোমক যুগের (খ্রীস্টপূর্ব ৪০০ বছর থেকে ৩০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) মমিতে বিটুমেন ব্যবহৃত হতো। কোন্নান ও ডেসর্ট পরে দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের যুগ (খ্রীস্ট-পূর্ব ১২০০ অব্দ) থেকে রোমক যুগ পর্যন্ত আরও বারোটি মমিতেও এইরকমই সাক্ষ্য পেয়েছেন। অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, বিটুমেন তখন নানা মলমে ব্যবহৃত হতো। বিটুমেন তখন প্রধানতঃ দু-জায়গা থেকে সংগৃহীত হতো: প্রথম—ডেড সী, যেখানে আলকাতরা-জাতীয় দ্রব্যের বিরাট বিরাট টুকরো ভাসে; দ্বিতীয়—ইরাকের হিট-আবু-জির, যেখান থেকে ব্যাবিলনে এটি চালান যেত ইঁটের দেওয়াল করার আস্তরণ (mortar) হিসাবে ব্যবহারের জন্য।

বিটুমেন পচন-নাশক (antiseptic) এবং সংরক্ষক (preservative) হিসাবে ব্যবহৃত হতো। মৃতদেহে এটা লাগানো হতো, কারণ তখনকার বিশ্বাস ছিল যে, এর সঙ্গে পুনর্জন্মের সম্পর্ক আছে। মিশরে পুনর্জন্মকে কালো রঙে চিহ্নিত করা হয়। কোন্নান ও ডেসর্ট এখন চেষ্টা করছেন খ্রীস্টপূর্ব ২৬০০ অব্দ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দ পর্যন্ত মমিতে এটি ব্যবহৃত হতো কিনা তা দেখার। ☐

[**News & Views Nature, 12 March, 1992, p. 109**]

শ্রীঘৃত
ভারতী ঘি
শ্রীলক্ষ্মী ঘি
শ্রী মধু
শ্রীহনফুড
SREE HONEY
SREEHONFOOD
প্রস্তুতকারক—অশোক চন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিমিটেড
২৬, কটন স্ট্রীট ● কলকাতা ৭০০০০৭, ফোনঃ ৩৮-২২৪৭

প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হতে পারে, সে-বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে না; জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে, সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ

মানুষ মূর্খের মতো মনে করে—স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে পারে। বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

We shall spend no time arguing as to theories and ideals, methods and plans. We shall live for the good of others; we shall merge ourselves in struggle. The battle, the soldier and the enemy will become one.

Sister Nivedita

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।... তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভালকাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয় ? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন ? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন ?

স্বামী বিবেকানন্দ

He who served and helped one poor man seeing Siva in him, without thinking of his caste, creed or race or anything, with him Siva is more pleased than with the man who sees Him only in image.

Swami Vivekananda

পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

DUNLOP
'Dunlop is Dunlop.' Always

অমৃতকথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

কত সৌভাগ্যে এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটু সময় করে নিতে হয়।... জপ-ধ্যান করতে করতে দেখবে উনি (ঠাকুর) কথা কবেন, মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুণি পূর্ণ করে দেবেন—কি শান্তি প্রাণে আসবে!

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

জগতের ইতিহাস হইল—পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস। আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—অনুভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাত। যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ।

স্বামী বিবেকানন্দ

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

৯৪তম বর্ষ আশ্বিন ১৩৯৯ শারদীয়া সংখ্যা

[পরের পৃষ্ঠায়]

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ **এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়— প্রথম কিস্তি একশো টাকা)** ☐ **সাধারণ গ্রাহকমূল্য** ☐ **আশ্বিন থেকে পৌষ সংখ্যা** ☐ **ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ** ☐ **ত্রিশ টাকা** ☐ **সডাক** ☐ **পঁয়ত্রিশ টাকা** ☐ **বর্তমান সংখ্যার মূল্য ছাব্বিশ টাকা**

কবিতা

নিয়মিত বিভাগ

প্রচ্ছদ

বিশ্ব-চরাচরে সর্বানুস্যূতা আদ্যাশক্তি জগৎকল্যাণের জন্য দেবী দুর্গারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'দুর্গা-সপ্তশতী' বা 'চণ্ডী'তে দেবীর সেই আবির্ভাবের রোমহর্ষক উপাখ্যান অপূর্ব ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। সেই অসুরনাশিনী দেবীর পাদপদ্মে তাঁর মহাপূজার মাহেন্দ্রলগ্নে আমরা বারম্বার প্রণতি ও পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করছি।

রক্ত ও পীতবর্ণের পুষ্প দেবীর প্রিয়। নীল অপরাজিতাও তাঁর প্রিয়। দেবীর একটি নামও 'অপরাজিতা'। 'চণ্ডী'র যে সুপরিচিত শ্লোকটি (৫।৩৪) প্রচ্ছদে উদ্ধৃত হয়েছে তা ব্রহ্মাদি দেবগণকৃত স্তবের (৫।৯-৮০) অন্তর্ভুক্ত। এই স্তবটি 'অপরাজিতা-স্তব' নামেও অভিহিত। তন্ত্রমতে স্তবটি 'দেবীসূক্ত' নামেও কথিত হয়ে থাকে।

দেবী যেন একখানি মহাগ্রন্থ। সেই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যেন একটিই সত্য উদ্ভাসিত : মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গাদি সমস্ত জীবের মধ্যে তাঁরই শক্তি নিহিত। তিনিই বিশ্ব-চরাচরের সকল প্রাণীর মধ্যে, সকল বস্তুর মধ্যে চৈতন্যশক্তিরূপে বিদ্যমান।

দেবীর স্বরূপ অনন্ত। তাই তুলট কাগজের যে-পৃষ্ঠাটিতে দেবীর স্বরূপ কীর্তিত হয়েছে সেটি এমন একটি ভূমির ওপর স্থাপিত যা কোন দিকেই গণ্ডিবদ্ধ নয়।—**যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন**

অলঙ্করণ : 'ট্রিনিটি'র শিল্পিগোষ্ঠী

মহিষাসুরমর্দিনী

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি(ন্ধ) তরসে নমঃ॥

শিল্পী : নন্দলাল বসু

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় মহানারায়ণ উপনিষদ্, ২।২

শারদীয়া উদ্বোধন

আশ্বিন ১৩৯৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ ৯৪তম বর্ষ—৯ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। (চণ্ডী, ১০।৫)

(দেবী বলিলেন) এই পৃথিবীতে একমাত্র আমিই বিদ্যমান, আমি ভিন্ন অন্য দ্বিতীয় আর কে আছে?

কথাপ্রসঙ্গে

এ পূজা কাহার?

দুর্মদ মহিষাসুরের নিষ্ঠুর অত্যাচারে ত্রিভুবন প্রপীড়িত। সাত্ত্বিকস্বভাব দেবগণ মহিষাসুরের দৌরাত্ম্যে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় কোনক্রমে টিকিয়া আছেন। দেবতাদের দুর্গতির ইতিবৃত্ত অবগত হইয়া দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু এবং দেবাদিদেব শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। উভয় দেবতার প্রচণ্ড ক্রোধ অমিত শক্তিশালী তেজরূপে উভয়ের বদন হইতে নিঃসৃত হইল। ইন্দ্রাদি সকল দেবতার শরীর হইতেও সুবিপুল তেজ নির্গত হইতে থাকিল। ক্রমে সেই সম্মিলিত তেজঃপুঞ্জ দিগন্তবিস্তৃত জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় প্রকটিত হইল। দেবগণ বিস্মিত ও হতবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান। অকস্মাৎ সেই বিরাটাকার জ্বলন্ত পর্বতসদৃশ তেজোরাশি হইতে এক অতুলনীয়া নারীমূর্তি আবির্ভূতা হইলেন।

শিবের তেজে তাঁহার মুখ, বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহুসমূহ, যমের তেজে তাঁহার কেশপাশ, ইন্দ্রের তেজে তাঁহার শরীরের মধ্যভাগ, ব্রহ্মার তেজে তাঁহার পদযুগল, সূর্যের তেজে তাঁহার পদাঙ্গুলিসমূহ, অগ্নির তেজে তাঁহার ত্রিনেত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। শিব তাঁহাকে দিলেন তাঁহার কালান্তক ত্রিশূল, বিষ্ণু দিলেন তাঁহার অমোঘ চক্র, বরুণ দিলেন তাঁহার ভীমনাদ শঙ্খ, অগ্নি দিলেন তাঁহার অব্যর্থ শক্তি, বায়ু দিলেন তাঁহার ত্রিদিবজয়ী ধনু এবং বাণপূর্ণ দুটি অক্ষয় তূণীর, ইন্দ্র দিলেন তাঁহার দুর্নিবার বজ্র, যম দিলেন তাঁহার সর্বজয়ী কালদণ্ড, সূর্য দিলেন তাঁহার সুতীক্ষ্ণ তেজোরাশি, বিশ্বকর্মা দিলেন তাঁহার খরশান কুঠার এবং অভেদ্য বর্ম, হিমালয় দিলেন বাহনস্বরূপ তাঁহার কালানল-সদৃশ সিংহ। অন্যান্য দেবগণও তাঁহাদের অমোঘ অস্ত্রাদি দান করিলেন। এইরূপে সকল দেবগণের বিশেষ অস্ত্র ও শক্তিতে বিভূষিতা হইয়া সেই অমিত-তেজসম্পন্না নারী বারম্বার অট্টহাস্য করিতে করিতে মুহুর্মুহু হুঙ্কার দিতে শুরু করিলেন। সেই বিশাল গর্জনে সমগ্র দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল এবং সর্ব চরাচরে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল। উহাতে চতুর্দশ ভুবন সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং সপ্ত সমুদ্র সহ পৃথিবী ও পর্বতসমূহ কম্পিত হইয়া উঠিল। ত্রিলোকত্রাস মহিষাসুর সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত অনুচর সহ সেই নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সেই নারী অবলীলাক্রমে সমস্ত অনুচর সহ মহিষাসুরকে বিনাশ করিলেন।

সকল দেবগণের তেজঃসম্ভূতা, সকল দেবশক্তির সমষ্টিভূতা মহিষাসুরমর্দিনী সেই নারীই দেবী দুর্গা—আদ্যাশক্তি, পরমাপ্রকৃতি। 'চণ্ডী'তে এবং অন্যত্র তাঁহারই জয়গাথা বর্ণিত হইয়াছে। যুগে যুগে অসুরবিনাশের নিমিত্ত তিনি আবির্ভূতা হন। তাঁহার স্বমুখ-উৎসারিত সেই অভয়বাণী 'চণ্ডী'তে আমরা শুনি:

> ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
> তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥
>
> (চণ্ডী, ১১।৫৪-৫৫)

—এইভাবে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ (ধর্ম ও ন্যায়ের কণ্ঠরোধ, উৎপীড়ন, অত্যাচার প্রভৃতি) বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া বিঘ্নোৎপাদক শত্রুগণকে নিঃশেষে নাশ করিব।

শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণে দেবাসুর সংগ্রামের কাহিনীর ছড়াছড়ি। পুরাকালে নাকি

উহা ঘটিত। আধুনিক কালের মানুষ, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর বিজয় অভিযানের যুগের মানুষ তাহার যুক্তি ও বুদ্ধিতে পুরাকালের ঐ সমস্ত কাহিনীকে কল্প-কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দেয়। একালের দার্শনিক ও আস্তিক বিজ্ঞজনেরা উহাদের মধ্যে শুভ ও অশুভের চিরন্তন দ্বন্দ্বের সংঘর্ষ ও সংগ্রামের রূপক-কাহিনীর সন্ধান পান। কিন্তু প্রকৃত সত্য উহাদের কোনটিতেই সম্পূর্ণতঃ নাই। উহা রহিয়াছে উহাদের উভয়ের মধ্যে। অর্থাৎ ঐসকল কাহিনীর সবটুকুই কল্প-কাহিনী যেমন নহে, তেমনি সবটুকুই আবার রূপক-কাহিনীও নহে। বাস্তব-সত্য এবং রূপক-সত্য এই উভয় সত্যকে লইয়াই উহারা গঠিত।

শুধু যে ভারতবর্ষেই ঐরূপ কল্প-কাহিনী বা রূপক-কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে বা গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রাচীন লোক-ঐতিহ্যে এবং পুরাকাহিনীতে অনুরূপ কাহিনীর সাক্ষাৎ মিলিবে। বস্তুতঃ যুগে যুগে দেশে দেশে এমন কিছু মহৎ নারী ও পুরুষ আবির্ভূত হন যাঁহারা মূলতঃ অপরিমেয় আত্মিক শক্তির অধিকারী, যাঁহারা নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্তে সমাজকে চূড়ান্ত নৈরাজ্য হইতে রক্ষা করেন, মানুষকে চরম অধঃপতন ও অবক্ষয় হইতে উত্তোলন করেন। ঐতিহাসিক যুগের পূর্বেও উহা ঘটিয়াছে এবং ঐসকল ব্যক্তিত্ব পুরাকাহিনীর চরিত্র হইয়া গিয়াছেন এবং সত্য ও কল্পনা সেখানে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, খ্রীস্ট, মহম্মদ হইতে শুরু করিয়া মার্টিন লুথার, নানক, চৈতন্য, জোয়ান অব আর্ক প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হইলেও উঁহাদের জীবনীতেও বহু কল্পনা মিশিয়াছে। এমনকি সাম্প্রতিক কালের রামকৃষ্ণ,সারদা, বিবেকানন্দ প্রমুখের কর্ম ও জীবন সম্পর্কেও কত কাল্পনিক কাহিনী ইতিমধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে।

প্রাকৃতিক কারণেই অশুভ কখনও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় না, তেমনই শুভও কখনও নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় না। শুভ ও অশুভের সংঘর্ষ ও সংঘাতের মধ্য দিয়াই জীবন ও সমাজ চলে। সকল দেশের প্রাচীন কাহিনীগুলিতে সেই সংঘর্ষ ও সংঘাতের যেমন বাস্তব ঘটনার ভিত্তি আছে, তেমনই উহাদের মধ্যে রূপক ও কল্পনার ছায়াপাতও ঘটিয়াছে। মানুষকে অশুভের দুষ্ট প্রভাব এবং শুভের নিত্য কল্যাণশক্তি সম্পর্কে অবহিত করাইবার জন্যই দেশে দেশে কালে কালে আমাদের পূর্বজগণ ঐসকল কাহিনী ও ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল সমাজকল্যাণ—ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বুদ্ধসদৃশ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বগণের প্রভাব দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, দৈহিক শক্তি অপেক্ষা আত্মিক শক্তি বহুগুণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

প্রশ্ন জাগে যে, আত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে সমাজে প্রভাব বিস্তার করা কঠিন না হইতে পারে, কিন্তু পুরুষপ্রধান সমাজকে প্রাকৃতিক কারণে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল, মৃদু স্বভাবসম্পন্না নারী কিভাবে প্রভাবিত করিতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নটির যথার্থতা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু বাস্তব দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলেই বুঝিব যে, প্রশ্নটি শুধু অর্থহীনই নহে, প্রশ্নটি নির্বুদ্ধিতারও পরিচায়ক। আমরা আমাদের প্রতিটি গৃহে, প্রতিটি সংসারে প্রত্যেক দিন কী দেখি? স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি পুরুষদেহধারীদের কে বা কাহারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে? স্ত্রী, জননী, কন্যা অথবা ভগিনী নয় কি? বাহিরে দোর্দণ্ড-প্রতাপ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী, কঠোর ন্যায়াধীশ, প্রবলপ্রতাপ প্রশাসক, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে তিনিই আবার স্ত্রী অথবা জননী অথবা কন্যা অথবা ভগিনীর নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পিত। এই সমর্পণ যে শুধু প্রেম বা স্নেহ-প্রীতির সূত্রে তাহা নহে, স্ত্রী, জননী, কন্যা বা ভগিনীর ব্যক্তিত্বের জন্যও বটে। কারণ প্রত্যেক নারীর মধ্যে রহিয়াছে আদ্যাশক্তির অংশ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহজ অথচ সুপরিচিত দৃষ্টান্তে বলিতেছেন: "কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই—বর-বোকাটি পিছনে বসে থাকে? কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।" (কথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৭১) "যত স্ত্রীলোক, সকলে শক্তিরূপা। সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী [নারী] হয়ে স্ত্রীরূপ [নারীরূপ] ধরে রয়েছেন।" (ঐ, পৃঃ ৩৮১)

নারী শক্তিরূপিণী বলিয়াই নারীর অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত হয় এক-একটি পরিবার, এক-একটি সংসার। দৈহিক দিক দিয়া সে অবশ্যই পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ বা পুরুষদের অপেক্ষা দুর্বল, কিন্তু তাহার বা তাহাদের উপর প্রভাবের ক্ষেত্রে সে অধিকতর শক্তির অধিকারিণী—ইহা আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই জানি।

নারী যে জগৎপালিকা শক্তির অংশস্বরূপিণী তাহা প্রথম জগৎকে শুনাইয়াছেন একজন নারীই। আজ হইতে কয়েক সহস্র বৎসর (দশ-বারো সহস্র

বৎসর হওয়াও বিচিত্র নহে পূর্বে বাক্ নামে এক ঋষিকন্যা দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ "... আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, আমি ধনদাত্রী এবং শক্তিদাত্রী। যজ্ঞের দ্বারা যাঁহাদের অর্চনা করা হয় আমি তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। জগৎ-চরাচররূপে আমিই নানাভাবে প্রকাশিতা। আমি সর্বভূতে অন্তর্যামিনীরূপে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। সর্বদেশে দেবতা দানব মনুষ্য নানাভাবে আমারই আরাধনা করে।..." (ঋগ্বেদ, ১০।১০।১২৫)

রামায়ণের সীতার মধ্যে যে তেজস্বিতা মহর্ষি বাল্মীকির বর্ণনায় পাই তাহা দেখিয়া আমরা স্তব্ধ হই। ত্রিলোকত্রাস দশাননের সহস্র প্রলোভন, ভীতি-প্রদর্শন, অপরিমেয় মানসিক নির্যাতনকে অকম্পিত-ভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন রামগতপ্রাণা সীতা। দেবতা-দানব-গন্ধর্বজয়ী রাবণকে এক নিরস্ত্র ও সহায়হীন নারীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। আবার অপরপক্ষে ঐ রাবণের উপর মাত্র একজনের ব্যক্তিত্বই ক্রিয়াশীল ছিল, কখনও কখনও তাঁহারই কথায় রাবণ দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেন। তিনিও একজন নারী—রাবণ-মহিষী মন্দোদরী।

মহাভারতের নায়িকা দ্রৌপদীর কথা আমাদের এপ্রসঙ্গে স্মরণে আসিতেছে। প্রবল-পরাক্রান্ত, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী তাঁহার পঞ্চস্বামীর উপর দ্রৌপদীর কী অপরিমেয় প্রভাব ছিল তাহা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করেন নাই, কিন্তু কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের নেপথ্যে তাঁহার ভূমিকাকে অস্বীকার কে করিবে? সমকালীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কৃষ্ণেরও পাঞ্চালীর ব্যক্তিত্বের প্রতি ছিল সমুচ্চ শ্রদ্ধা। গান্ধারী তাঁহার অবাধ্য ও দুর্বিনীত জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হন নাই সেকথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য দুর্যোধন তাঁহার পরম ব্যক্তিত্বময়ী জননীকে প্রচণ্ড সমীহ ও ভয় করিতেন। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ব্যক্তিত্বকে সর্বসময় অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন কুরুরাজমহিষী গান্ধারী। মহাভারতে কুন্তী, জনা, বিদুলা, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, দময়ন্তী, সাবিত্রীর যে প্রবল চরিত্রশক্তি ও তেজস্বিতার পরিচয় পাই তাহা এককথায় অনন্যসাধারণ। জনা, বিদুলা, দময়ন্তী ও সাবিত্রীর কাছে তাঁহাদের স্বামী অথবা পুত্রগণ তেজস্বিতা ও চরিত্রশক্তিতে একান্তই নিষ্প্রভ।

ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধের পালিকা-জননী গৌতমী এবং বুদ্ধ-পত্নী যশোধরা বৌদ্ধ সঙ্ঘে বুদ্ধের জীবনকালেই ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনার শক্তিতে মহোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আচার্য শঙ্কর মহাপণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের বিদুষী পত্নী উভয়ভারতীর অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া যেমন বিস্মিত হইয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার চরিত্রের উদার ঐশ্বর্যও তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে আচার্য শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রের ন্যায় শক্তিধর প্রতিপক্ষ আর দ্বিতীয় কাহাকেও পান নাই। মণ্ডন মিশ্রকে তর্কে পরাজিত করিতে আচার্যকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু শিবাবতার আচার্যকে ততোধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয়ভারতীর যুক্তি ও বিচারকে খণ্ডন করিতে।

মোগল-রাজপুত-মারাঠা-ব্রিটিশ শাসনের ইতি-হাসেও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে কিছু তেজস্বিনী ও বীরাঙ্গনার নাম। চরিত্রের তেজে, এমনকি সামরিক শক্তিতেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমকালের শ্রেষ্ঠ পুরুষদেরও নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন। 'জ্যান্ত দুর্গা' সারদাদেবীর অপূর্ব নেতৃত্বের ইতিহাস তো সর্ব-জনবিদিত। সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে কয়েকজন নারী অসাধারণ ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। সারা পৃথিবীই তাঁহাদের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে অবহিত। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশের জন-সাধারণকে বলিতে শুনা গিয়াছেঃ "সমগ্র দেশে পুরুষ তো ঐ একজনই।" মন্তব্যটি কতখানি যথার্থ সেবিষয়ে বিতর্ক থাকিতে পারে, তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পুরুষপ্রধান সমাজে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতার শীর্ষস্থানটি তাঁহাদের অধিকার করিতে হইয়াছে নিজ নিজ যোগ্যতার চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়াই। তাঁহারা সকলেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন নেতৃত্ব, দক্ষতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, শক্তি ও সাহসের নিরিখে নিজ নিজ দেশে তাঁহারা তাঁহাদের যেকোন পুরুষ পূর্বসূরী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন।

শক্তির আধার নারী নিজেই। নারীর মধ্যে অপরকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি সহজাত। অনেক সংসারে দেখা যায়, জননী অসুস্থ হইলে অথবা অকালে মৃত্যুকবলিত হইলে একটি কিশোরী কন্যা তাহার পিতা, বয়োজ্যেষ্ঠ বা বয়ঃকনিষ্ঠ ভাইবোনদের ভার লইয়াছে এবং সদ্যপরিণীতা এক তরুণী বধূ অনুরূপ অবস্থায় একটি নূতন পরিবারের কর্তৃত্ব আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে।

ইহা হইতে কি বুঝা যায় না যে, প্রকৃতিই কর্তৃত্বের বল্গাটি নারীর হাতে দিয়াই তাহাকে পৃথিবীতে লইয়া আসে? দেবী দুর্গা কর্তৃক মহিষাসুর প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত দানবগণের বিজয়-উপাখ্যানে ঐ তত্ত্বটিই নিহিত রহিয়াছে। দুর্গাকে সকল দেবতার তেজ ও শক্তি প্রদানের তাৎপর্য হইল এই যে, তিনিই সকল দেবতার তেজ ও শক্তি-স্বরূপিণী, তাঁহাতেই সংহত রহিয়াছে সকল দেবতার তেজ ও শক্তি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ইন্দ্রাদি পুরুষ দেবতাগণ সৃষ্টিকে বিপদ্মুক্ত করিতে বারম্বার তাঁহারই মুখাপেক্ষী।

পুরুষের দ্বারা নারীর পূজা চিরকালীন ঘটনা। সভ্যতার সূচনাই হইয়াছে নারীকে পুরুষের পূজা নিবেদনের মধ্য দিয়া। কোথাও সেই পূজা কামের মাধ্যমে, কোথাও প্রেমের মাধ্যমে, কোথাও বা প্রণামের মাধ্যমে প্রকাশের পথ খুঁজিয়াছে। কোথাও রতি, কোথাও প্রীতি, কোথাও প্রণতিতে সেই পূজার সম্পর্ক পর্যবসিত হইয়াছে। পুরাকালে দানব প্রধানতঃ উহা করিয়াছে কামের দ্বারা, দেব ও মানব করিয়াছে প্রীতি ও প্রণতির দ্বারা। আজও সেই ধারা দেশে দেশে, কালে কালে চলিতেছে। সূচনালগ্ন হইতে এপর্যন্ত সভ্যতার যে-ইতিহাসের সহিত আমরা পরিচিত, তাহাতে বলা যাইতে পারে নারীর প্রতি পুরুষের যে-দৃষ্টিতে প্রীতি ও শ্রদ্ধা সমন্বিত থাকে সেই দৃষ্টিতেই নিহিত থাকে সভ্যতার সত্যিকারের প্রগতির বীজ, সভ্যতার প্রকৃত কল্যাণকর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীতে প্রতিটি নূতন প্রাণের ধারকও কিন্তু নারীই—পুরুষ নহে। সুতরাং সভ্যতার চিরন্তন কৃতজ্ঞতা নারীর নিকট। নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিতে যদি প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা না মিশ্রিত থাকে, যদি তাহা নিছকই কামনার দৃষ্টি হয় তাহা হইলে উহা মনোবিকৃতির নামান্তর মাত্র—উহা অপরাধ, উহা অভিশাপ। আবার শুধুই প্রীতি বা কৃতজ্ঞতা বা সম্ভ্রম বা শ্রদ্ধাই নহে, নহে 'শিভ্যালরি' নামক নারীর প্রতি নিছক শিষ্টাচার ও সৌজন্যের বহুশ্রুত পাশ্চাত্য মনোভাবও। প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার মিলিত ভাবের দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত নারী সম্পর্কে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি।

সভ্যতার যে-ইতিহাস আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত তাহা প্রধানতঃ পুরুষের জয়যাত্রারই ইতিহাস। তাহাতে একটি সত্য অনুল্লিখিত। তাহা হইল এই যে, প্রত্যেক পুরুষের সাফল্যের পিছনে থাকে একজন নারী—সে-নারী জননী হউক, পত্নী হউক, কন্যা হউক, ভগিনী হউক অথবা অন্য কিছু হউক। এইপ্রসঙ্গে নজরুলের 'নারী' কবিতার সেই অপূর্ব ছত্রগুলি মনে পড়িতেছে:

জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে!
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি', কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনকালে এক হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।

জননী, জায়া, প্রিয়া, কন্যা, ভগিনীকে কেন্দ্র করিয়াই পুরুষের সকল আবেগ ও কর্ম আবর্তিত হয় এবং সেই আবেগ ও কর্মের ফলশ্রুতিতে গড়িয়া উঠে সভ্যতা। তবে পুরুষের দর্শনে, চিন্তা ও প্রেরণায় জায়া, প্রিয়া, কন্যা ও ভগিনী সকলের মধ্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে থাকিয়া যান জননী জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে পুরুষ তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনুসন্ধান করে জননীকেই—স্বামীজীর অপূর্ব ভাষায়, "সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্যক্ষমাশীলা জননী।" (বাণী ও রচনা, ৫।৪৩১)। এমনকি, পিতার মধ্যেও অজ্ঞাতে জননী আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কোন সন্ন্যাসী পার্ষদ তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ভাবিতেন। বস্তুতঃ, ভারতের যে সহস্র সহস্র বৎসরের ধর্মধারণা, অধ্যাত্মসাধনার ঐতিহ্য তাহার মূলেও রহিয়াছে ঈশ্বর সম্পর্কে মাতৃত্বের ভাবাবেগ। স্বামীজী বলিতেছেন: " 'নারী'-শব্দ হিন্দুর মনে মাতৃত্বকেই স্মরণ করাইয়া দেন। ভারতে ঈশ্বরকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করা হয়।" (ঐ, পৃঃ ৪৩০)

এই যে দুর্গার পূজা, ইহাতে আসলে ভারতবর্ষের সেই সনাতন ঐতিহ্যেরই মর্মকথাটি নিহিত রহিয়াছে। জগতের সর্বনিয়ন্ত্রী হইয়াও দুর্গা আমাদের ঘরের 'মা'-টি হইয়াছেন। আমাদের হৃদয়ের সমগ্র আবেগ, সমগ্র স্নেহ, সমগ্র প্রীতি, সমগ্র শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম, সমগ্র কৃতজ্ঞতা যেন উজাড় করিয়া দিবার জন্য আমরা একটি রূপের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। দুর্গার মধ্যে আমরা পাইয়াছি আমাদের সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত রূপ এবং তাঁহার পায়েই নিবেদন করিয়া দিয়াছি আমাদের প্রাণের পূজা, আমাদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি। □

ভাষণ

স্মরণ-মনন

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

রামপ্রসাদ বলছেন ঃ

"মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবা নিশি জপ করে ॥"

দৈনন্দিন কর্মের মধ্যেও তাঁকে স্মরণ-মনন করা দরকার। স্মরণের দ্বারা মনের সঙ্গে ভগবানের যোগ স্থাপন করা যায়। এটাই বড় সাধনা। যখন যে-অবস্থায় থাকা যায়—আহারে বিহারে তাঁর স্মরণ করা। রাজসিক মন বহির্মুখী—সর্বদা কাজ খুঁজে বেড়ায়। সাত্ত্বিক মন অন্তর্মুখী—সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তায়, আত্মচিন্তায় নিযুক্ত থাকতে চায়। প্রত্যেক কর্মেরই শুভাশুভ ফল আছে। এই কর্মফল থেকে মুক্ত হতে হবে। গীতায় ভগবান বলেছেন ঃ কর্মফল আমাকে সমর্পণ কর। রাজসিক ভাবাপন্ন আমরা ভগবানের পূজো করি না, আমিত্বের পূজো করি। কর্ম দুই প্রকার—শুভ কর্ম আর অশুভ কর্ম। আমরা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা নিজেদের পূজো করি। ফলে গুটিপোকার মতো সংসারে বন্ধ হয়ে আছি। পারে যেতে হবে। পাপ আর পুণ্য এই উভয় কর্মের পারে গেলে ভগবানলাভ হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন ঃ অনিত্য সংসারকে নয়, দুঃখময় সংসারকে নয়, একমাত্র আমাকেই ভালবাস, আমাকে ডাক। আমাতে আসক্ত হও এবং আমাকেই আশ্রয় কর। ভগবানের নিজের মুখের কথা ঃ

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"
(গীতা, ৯।৩৩)

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।"
(গীতা, ৭।১)

আমাদের মধ্যে কাম-কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি রয়েছে। এই আসক্তি দ্বারা, ভোগের দ্বারা আসল শান্তি পাওয়া যায় না। ভোগের ক্ষুধা-পিপাসার অন্ত নেই। বিষয়ভোগের মাধ্যমে, ইন্দ্রিয়সুখের পথে মানুষের ভোগবাসনার উপশম হওয়া সম্ভব নয়। উপশম হতে পারে একটিই মাত্র উপায়ে—তা হলো বৈরাগ্যের দ্বারা। জগৎ-সংসার, আত্মীয়-পরিজন, ধন-ঐশ্বর্য, যশ-প্রতিষ্ঠা কোনকিছু স্থায়ী নয়—এই সত্য ভাবনা অন্তরে জাগ্রত রাখলে বৈরাগ্য আসবে। বৈরাগ্যের সহজ সাধন হলো ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ বিষয়ে বিরাগ আর ঈশ্বরে অনুরাগ। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এলে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ আপনা আপনি কমে যায়। সংসারকে আর ভালবাসতে ইচ্ছা হয় না। যখন এরকম হবে তখন বুঝতে হবে যে, শান্তির সমীপবর্তী হচ্ছি। মানুষের পরাশান্তি লাভের আগে সংসার 'আলুনি' বোধ হয়। তখনই তাঁর দরজায় ধাক্কা দিতে হয়। "Knock and it shall be opened unto you."—যীশুখ্রীস্ট বলছেন। কি উপায়ে ধাক্কা দেবে? স্মরণ একটা উপায়। গীতাতেও স্মরণের কথা রয়েছে। ভগবান বলছেন ঃ

"মামনুস্মর।" (গীতা, ৮।৭)

—আমাকে সর্বদা স্মরণ কর। এই স্মরণের দ্বারাই মানুষ পরমা গতি লাভ করে—"স যাতি পরমাং গতিম্।" (গীতা, ৮।১৩) স্মরণের প্রভাবে মন শুদ্ধ ও পবিত্র হবে। ঠাকুর যেমন বলছেন—পাপ চাই না, পুণ্যও চাই না, মা। তখন নির্ভরতা আসবে। শুচি নিলেই অশুচি আসবে, পুণ্য নিলে পাপ আসবে, জ্ঞান নিলে অজ্ঞান আসবে। পাপ মানে অপবিত্রতা, আর পুণ্য মানে পবিত্রতা। সকামভাবে কোন কাজের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধাক্কা কোথায়? হৃদয়-মন্দিরে। তাঁকে পেতে হলে হৃদয়-মন্দিরের দরজায় ঘা দিতে হবে। নিজের সব ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ, ভগবানকে অর্পণ করতে হবে। গীতায় ভগবান বলছেন ঃ

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"
(গীতা, ১৮।৬৬)

ঠাকুর পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, শুচি-অশুচি, জ্ঞান-অজ্ঞান মায়ের পায়ে দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বললেন ঃ "সমস্ত দিয়ে দিলেন?" ঠাকুর বললেন ঃ "সব দিয়েই তো মাকে পেলাম।" ভগবান বলছেন ঃ তুমি যাকিছু

করছ সব আমাকে অর্পণ কর—"তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।" এখানে অর্পণ করার সরল অর্থ তাঁকে স্মরণ। রাজসিক ভাব একটি আবরণ—সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে। যেমন দড়িকে সাপ বলে মনে করা। আমিত্বটা রয়েছে বলে দেহটাকে সর্বস্ব মনে করছি। তিনি যেন দেহের বাইরে আছেন বলে মনে হচ্ছে। টর্চ ফেলে দেখলে যেমন সাপের ভ্রম কেটে গিয়ে দড়িটার আসল রূপ প্রকাশ পায় তেমনি অজ্ঞান 'আমি'—রাজসিক 'আমি'কে আশ্রয় করে আমরা মিথ্যাকে অর্থাৎ দেহ-সুখ ও জাগতিক আনন্দকে ধরে আছি। তাই অন্তর্মুখী হয়ে 'ধাক্কা' দিতে হবে। রাজসিক ভাবযুক্ত বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করতে হবে। মানুষের মন স্বাভাবিক-ভাবেই বহির্মুখী, খুবই বিরল শ্রেণীর মানুষের মন অন্তর্মুখী। ঠাকুর বলছেনঃ "খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।" শান্তির সন্ধান মানুষ পায় তখনই যখন সে বাইরের দিকে প্রসারিত দৃষ্টি নিজের অন্তরের দিকে পরিচালিত করে। উপনিষদে খুব সুন্দরভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"

(কঠ উপনিষদ্, ২।১।১)

—ঈশ্বর মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করেই সৃষ্টি করেছেন। এটা মানুষের ওপর তাঁর বিশেষ কঠোরতা—নির্মমতা। [কারণ তিনি চান মানুষ নিজের সাধন ও অধ্যবসায় প্রয়োগ করে বহির্মুখী ইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করে।] ফলে মানুষ শুধু বাইরের ভোগ্যবিষয়ই দেখে [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়।], অন্তরাত্মাকে দেখে না। কদাচিৎ কোন বিবেকী ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রিয়গুলিকে ভোগ্যবিষয় থেকে নিবৃত্ত করে প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।

ঠাকুর বলছেনঃ বিদ্যাশক্তি আর অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তি ঈশ্বরলাভে সাহায্য করে। অবিদ্যাশক্তি—রাজসিক ভাব, ভগবান থেকে দূরে নিয়ে যায়। অর্জুনকে দেখি—তিনি যখন বিদ্যাশক্তি আশ্রয় করলেন কৃষ্ণকে সখা নয় গুরুরূপে গ্রহণ করে বললেনঃ "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" তখন ভগবান একহাতে অর্জুনের মনের 'রাশ' আর এক হাতে অশ্বের 'রাশ' ধরলেন। অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগ শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেনঃ অনন্যচিত্ত হয়ে ভগবানের স্মরণ করতে হবে। (গীতা ৮।১৪)—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

আমাদের অন্তরেই তিনি রয়েছেন। রামপ্রসাদের গানে আছেঃ

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে রে মন
চারিফল কুড়ায়ে পাবি।"

রামপ্রসাদ বলছেনঃ

"ডুব দে রে মন কালী বলে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।"

কোথায় 'বেড়াতে' যাবে? "কালী কল্পতরু মূলে।" সেটা কোথায়? আমার হৃদয়-মন্দিরে। কোথায় 'ডুববে'? নিজের 'হৃদি রত্নাকরে'। বস্তুতঃ, হৃদয়েই তো সব আছে। তাঁকে পেতে হলে স্মরণ-মনন করতে হবে। জীবনের লক্ষ্য চাই, উদ্দেশ্য চাই। সেটাই তো আমাদের হারিয়ে গেছে। আগে উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে। ত্যাগ, ত্যাগ। ত্যাগই আদর্শ। 'ত্যাগ' মানে কি? সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া? তা নয়। আসক্তি ত্যাগ। কিসের জন্য ত্যাগ? গ্রহণের জন্য। কিসের গ্রহণ? স্বামী-পুত্র-স্ত্রী সব কিসের জন্য? সংসারের সবকিছু তাঁর—ভগবানের। তিনি আমার। আমিত্বের ত্যাগ করে ভগবানকে—অন্তরে যিনি আছেন তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। "ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব"—হে দেবদেব, তুমিই আমার সর্বস্ব। যাকিছু আমার, সব তোমারই। এই ভাবটি গ্রহণ করতে হবে। আগে মা, তারপর সংসার—এটা যেন ভুল না হয়। ঠাকুর বলছেনঃ এককে ধরে তারপর শূন্য বসাও। কিন্তু আমরা কি করছি? এককে মুছে ফেলে কেবল শূন্য বসিয়ে যাচ্ছি। তাই তো আমাদের শান্তি নেই।* □

* গত ২৫ নভেম্বর ১৯৫৭ তারিখে মেদিনীপুর আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ।

সংগ্রহঃ ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়

অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ

স্বামী নির্বাণানন্দ

ভক্তিতে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। ভক্তি দু-প্রকার। বৈধী ভক্তি ও পরাভক্তি। পরাভক্তি না হলে ভগবানলাভ হয় না। বৈধী ভক্তি সাধন করতে করতে পরাভক্তি আসে। তীর্থযাত্রা, দেব-মন্দির দর্শন, উপবাস, ব্রত, পূজা-পাঠ, জপ-পুরশ্চরণ, তাঁর নামশ্রবণ, তাঁর নামকীর্তন, তাঁর স্মরণ-মনন ইত্যাদিতে কিছু সময়ের জন্য ভক্তি হয়। কিন্তু সে-ভক্তি আবার চলে যায়, স্থায়ী হয় না। এসব হলো বৈধী ভক্তির সাধন। বৈধী ভক্তির সাধন আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই। তবে পরাভক্তি না আসা পর্যন্ত বৈধী ভক্তি নিত্য-নিয়মিত সাধন করতেই হবে। তাতে মনে ক্রমে ভগবানের প্রতি স্থায়ী ভাব-ভক্তি সঞ্চারিত হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, বিষয়-বাসনা গেলে তবেই ভগবানে ভালবাসা আসে। এই ভালবাসা বা প্রেমাভক্তি অতি দুর্লভ জিনিস। তবে ভগবানের কৃপাতে সবই সম্ভব। শ্রুতি বলছেন ঃ

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" (কঠ উপনিষদ্, ১।২।২৩) —তিনি যাকে কৃপা করেন, সে-ই তাঁকে লাভ করে। কাকে তিনি কৃপা করেন? যে ব্যাকুল প্রাণে তাঁকে চায়। পাত্রভেদে তাঁর কৃপার তারতম্য হয়। কারও যোগ্যতা বেশি, কারও যোগ্যতা কম। যোগ্যতা অনুসারে কৃপার প্রকাশে তারতম্য হয়। যেমন সব বাল্বেই বিদ্যুৎ রয়েছে। কোন বাল্ব ২৫ ওয়াটের, কোনটি ৬০ ওয়াটের, কোনটি ১০০ ওয়াটের, আবার কোনটা হয়তো ১০০০ ওয়াটের। সবগুলিতেই এক বিদ্যুৎ প্রবাহিত আছে, কিন্তু এক-একটির নেবার ক্ষমতার ওপর এক-একটির উজ্জ্বলতা কম-বেশি হচ্ছে। তেমনি সকলের মধ্যে এক ঈশ্বরের শক্তি থাকলেও পাত্রভেদে তার বিভিন্ন প্রকাশ ঘটে।

রাজা মহারাজ বলতেন ঃ "দেখ। যুগাবতার এলে একটা শক্তি জাগ্রত হয়। ঠাকুর যুগাবতার, তাঁর আগমনে একটা বিশেষ শক্তি জাগ্রত হয়েছে। এই সুযোগ নাও। আর এ-জন্মে যদি না হয়, তবে বহু জন্ম লেগে যাবে। কাজেই উঠে পড়ে লাগ, এ-জন্মেই হয়ে যাবে।"

তিনি মাঝে মাঝেই বলতেন ঃ "বল বুদ্ধি ভরসা, ত্রিশ পেরোলেই ফরসা। যাকিছু করার এই বেলা করে নাও। পরে বয়স যত বাড়বে দেহের জোর কমে যাবে, মনের জোরও কমে যাবে। মনের জোর যদি বা থাকল তো দেহের দুর্বলতার জন্য কিছু করতে পারবে না। আজ বাত, কাল অনিদ্রা, পরশু বদহজম। এসব লেগেই থাকবে। ছোটখাট হোক, বড়সর হোক অসুখ-বিসুখ অল্পবয়সে হলেও শরীরের শক্তিতে ওগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পার, দাবিয়ে রাখতে পার ; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের জোর কমতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনের জোরও কমবে। ইন্দ্রিয়ের ওপর মনের প্রভুত্ব করার ক্ষমতাও কমবে। সাধারণ অসুখ-বিসুখেই তখন মানুষ সহজেই কাবু হয়ে যায়।

"ভগবানকে ডাকার, ধর্মলাভ করার প্রশস্ত সময় হলো প্রথম বয়স। যারা বলে ধর্মলাভ, ভগবানলাভ বুড়োবয়সের ব্যাপার, তারা ভুল বলে। বুদ্ধকে দেখ, শংকরকে দেখ, চৈতন্যকে দেখ, ঠাকুরকে দেখ, স্বামীজীকে দেখ—যাকিছু করার সব প্রথম জীবনেই করেছেন। আমরাও প্রথম বয়সেই যাকিছু করে নিয়েছি। এখন তো আমরা, ঠাকুরের ভাষায়, 'পেন্সিল' (পেনসন) খাচ্ছি। ঐ আগে-করার জোরেই এখনে সব চলছে।"

বাস্তবিক, ভক্তিলাভ, ধর্মলাভ, ভগবানলাভের পথ হলো জীবনের সবচেয়ে কঠিন পথ। সে-পথে চলার জন্য যেমন মনের শক্তি দরকার, তেমনি দরকার স্বাস্থ্যের শক্তিও। "শরীরম্ আদ্যং খলু ধর্ম-সাধনম্।"—ধর্মসাধনার জন্য প্রথমেই চাই শরীরের

সুস্থতা। ধর্মসাধনা কি মুখের কথা? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য সকলেরই শরীর খুবই সবল ছিল। স্বামীজীর শরীর ছিল অত্যন্ত শক্ত-সমর্থ। ঠাকুরের শরীর যদিও শেষের দিকে ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁরও শরীর যথেষ্টই সবল ছিল, নইলে ঐ অতুলনীয় তপস্যার তোড় কি সইতে পারত তাঁর দেহ। মহারাজেরও (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) শরীর ছিল খুবই সবল। কতদিন গিয়েছে ওঁদের দুবেলা খাবার জোটেনি। কোনদিন একবেলা কোনরকমে জুটেছে তো, আরেক বেলা উপবাস। কিন্তু শরীরের ক্ষমতার জোরেই অনাহার, অর্ধাশন তাঁদের কিছু করতে পারেনি। 'শরীর ভাল' করা মানে পালোয়ানের শরীর করতে বলা হচ্ছে না। কিন্তু সাধন-তপস্যার তোড় সইতে পারে সেরকম সুস্থ শরীর ধর্ম-জীবনে অপরিহার্যই। শরীর শক্ত হলে মনের শক্তিও বাড়ে। সেজন্যেই স্বামীজী মঠে শরীরচর্চা আবশ্যিক করতে চেয়েছিলেন। নিজেও নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন।

অন্য একদিন মহারাজ আর একটা বিরাট আশার কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন। মহারাজ আছেন বলরাম মন্দিরে। কথামৃতকার মাস্টারমশায় এসেছেন। মহারাজের সঙ্গে ঠাকুরের বিষয়ে নানা প্রসঙ্গ হচ্ছে। মহারাজ যেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন। ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি। যেন কোন এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করছেন। সহসা বলে উঠলেন: "দেখুন মাস্টারমশায়, এবার ঠাকুর এসে জীবলোক ও শিবলোকের মধ্যে একটা ব্রিজ তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এবার সহজেই মানুষ ভগবানের কাছে যেতে পারবে।" অসাধারণ কথা। কখনো কখনো মহারাজকে বলতে শুনেছি: "ঠাকুরের জীবন হলো পরলোক আর দেবলোকের সেতু। একই মানুষ হাসছেন, হাসাচ্ছেন, ফষ্টিনষ্টি করছেন, আমাদের সঙ্গে ফচকামি করছেন। তখন আমাদের মতোই একজন বলে তাঁকে মনে হচ্ছে, আবার হঠাৎ সেই মানুষটাই যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ দিয়ে তখন যেসব কথা বেরুচ্ছে তা শুনে সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছে। কী কথা! যেন বেদ-বেদান্ত। বেদ-বেদান্তকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যখন সমাধিতে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছেন তখন এই জগৎ, আশপাশের পরিবেশ-পরিমণ্ডল সবকিছু ছাড়িয়ে, ছাপিয়ে তিনি কোন্ রাজ্যে চলে গিয়েছেন। আবার সেখান থেকে নেমে আসছেন। কখনো মেঘমন্দ্র স্বরে বলছেন, 'এই দেহে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ—তিনিই এই শরীরে এবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন।' কতবার এসব আমরা নিজের চোখে দেখেছি, নিজের কানে শুনেছি। পৃথিবী এবং স্বর্গ, নর এবং নারায়ণ, জীব এবং শিব—একসঙ্গে, এক আধারে!"

ঠাকুরের মহিমার কথা বলতে গিয়ে বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দের) একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি (বাবুরাম মহারাজ) মঠের ঘাটের পোস্তার ধারে একদিন দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে দেখে সেখানে গেলুম। তিনি আবেগভরে বলে উঠলেন: "এখানে দাঁড়িয়েই একদিন দেখেছিলাম (ভাবে দর্শন) সমস্ত জগতে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। চারিদিক আগুনে আগুন। আর এখানে এসে সব নিভে গেল, সব শান্ত হয়ে গেল।" তাঁর এই কথাগুলি শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। 'এখানে' কথাটি বলে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা তাঁর কাছে জানবার কথা তখন আমার মনে মোটেই আসেনি। আমার মনে হয়েছিল ঠাকুরকে লক্ষ্য করেই তিনি 'এখানে' কথাটি বলেছিলেন। অর্থাৎ জগতে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, কাটাকাটি চলেছে—একমাত্র ঠাকুরকে আশ্রয় করলেই, তাঁর ভাবকে গ্রহণ করলেই এর সমাধান হয়ে যাবে। সূক্ষ্ম অর্থে নিশ্চয়ই তাই। তবে যদি স্থূল অর্থে নিই তাহলে অবশ্যই বলতে পারি যে, তিনি (বাবুরাম মহারাজ) 'এখানে' বলতে বেলুড় মঠকেও বোঝাচ্ছিলেন। বেলুড় মঠ ঠাকুরের মহা-অধিষ্ঠানক্ষেত্র। এখান থেকেই তাঁর সমন্বয়ের বাণী, শান্তির বার্তা দেশে দেশে, কালে কালে প্রচারিত হবে। জগৎকে তা শান্তির পথ দেখাবে, আনন্দের সন্ধান দেবে। * ❑

* বেলুড় মঠে নবীন ব্রহ্মচারীদের কাছে অর্ধ-সাপ্তাহিক অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ। কাল: ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দ

অনুলিখন: বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভায় আমাদের জীবন আলোকিত হোক

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কথা বলতেন : "আমি ছাঁচ তৈরি করে রেখে গেলাম, তোরা নিজেদের জীবনকে সেই ছাঁচে ঢেলে নে, আমি আগুন জ্বেলে গেলাম, তোরা আগুন পুইয়ে নে, আমি রান্না করে রেখে গেলাম, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা।" প্রত্যেকটি কথাই অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ।

আমরা অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার-রূপে পূজা করি। 'অনেকেই' বলছি এই কারণে যে, আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকতে পারেন, যাঁরা সেই দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেন না। কাজেই তাঁকে অবতাররূপে না দেখলেও তাঁকে পূর্ণাঙ্গ মানবরূপে দেখার চেষ্টা সকলেই করতে পারেন। ঈশ্বর যখন অবতাররূপে মর্ত্যে আগমন করেন, তখন তাঁর সকল ঐশ্বর্য তাঁর মানবরূপের আড়ালে ঢেকে রাখেন। তিনি সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন; কখনো কখনো মানুষের স্বাভাবিক অসুস্থতার লক্ষণও তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি—এ-গুলি মানবজীবনের অপরিহার্য অবস্থা। অবতারকেও এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তবু আমরা তাঁকে বলি 'ঈশ্বর'। এই হলেন অবতার, যাঁর মধ্যে ঘটেছে মানব ও ঈশ্বরের একত্র সমাবেশ। মানুষের স্বাভাবিক গুণাগুণ তাঁর মধ্যে সহজাত; কিন্তু মানুষের মাপকাঠিতে যখন তাঁকে বিচার করতে যাই, তখন দেখি, ঐ মাপকাঠিতে তাঁকে কুলোচ্ছে না। তাই তাঁকে বলা হয় 'অতিমানব'। তবে কি আখ্যায় তাঁকে ভূষিত করব, সেটা বড় কথা নয়; মনে রাখতে হবে, তাঁর দৃষ্টান্ত থেকেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে হবে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করতে হবে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রেরণা তাঁর কাছ থেকেই আমরা লাভ করব এবং সেই পথের নির্দেশও তাঁর জীবন থেকেই আমরা পেয়ে যাব। এই পথের সন্ধান দিতেই এই পৃথিবীতে মানবরূপে তাঁর অবতীর্ণ হওয়া।

ঈশ্বর যদি সর্বনিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই থাকতেন, তাতে আমাদের কি লাভ হতো? তিনি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যেতেন। সাধারণ মানুষ আমরা। অত অসাধারণ যে-ব্যক্তিত্ব, তাঁকে আমরা ধারণা করতে পারি না। কাজেই ভগবান যখন দেখেন, মানুষ তাঁর কাছ থেকে একেবারে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে, জগতের ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলছে অথচ তাঁর যে প্রেরণাদায়ক অমৃতরস তার আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ছে, তখন তিনি মর্তে অবতীর্ণ হন যাতে মানুষ তাদের অভীষ্ট পথের সন্ধান পায়, তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করতে পারে এবং এই অনন্ত শক্তিকে তাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে অনুভব করতে পারে। সাধারণ মানুষ ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে কখনই পারে না। ভাগবতে একটা বর্ণনা আছে—চাঁদ জলের ওপর প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মাছেরা চাঁদের সেই প্রতি-বিম্বকে মনে করেছে তাদের মতোই এক জলচর প্রাণী। তাকে নিয়েই তারা খেলা করছে। ঠিক সেই রকম ভগবান যখন আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন তখন তিনি মানুষরূপেই আসেন, তাঁর ব্যবহার দেখে মনে হয় তিনি যেন আমাদের খেলার সাথী, আমাদের একান্ত আপনজন। তাঁর কাছে আমাদের কোন সঙ্কোচ নেই, ভয় নেই। তাঁর সঙ্গে আমরা আমাদের সমগ্র জীবনটা অতিবাহিত করতে পারি।

ভগবানের কাছে এরূপ মানবদেহ ধারণের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর এই অবতরণের অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি তিনি এভাবে দেহধারণ করে কখনো না আসতেন, তবে ভগবানের সম্বন্ধে বা উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণাই হতো না। যদি কেউ বলেন ঃ 'কেন? এইসব তথ্য কি শাস্ত্রে লেখা নেই?' তবে বলা যায়, ভগবান যদি আমাদের মধ্যে অবতাররূপে না আসতেন, তবে শাস্ত্রগুলো কাগজের স্তূপ বলে মনে হতো। আমাদের জীবনকে তা স্পর্শ করতে পারত না। ভগবান এসে সেই শাস্ত্রের ভিতর প্রাণসঞ্চার করেন। শাস্ত্র তখন প্রেরণাপ্রদ ও সজীব হয়ে ওঠে। তাঁর বাণীকে প্রাঞ্জলরূপে উপস্থাপিত করতে শাস্ত্রগুলি তখন জীবন্ত হয়ে ওঠে। অবতার যখন আসেন তখন তিনি তাঁর প্রভায় বেদকে আলোকিত করেন, তাঁর জীবন দিয়ে আমাদের অধ্যাত্মজীবনকে অনুপ্রাণিত করেন, আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে তিনি তাঁর দিকে আমাদেরকে আকৃষ্ট করেন এবং আমাদের জীবনে প্রেরণা দান করেন। তাঁকে পথপ্রদর্শকরূপে সামনে রেখে আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। আলোকস্তম্ভ যেমন জাহাজের দিক-নির্দেশে সাহায্য করে, সেইরকম অবতার তাঁর আলোকবর্তিকা দিয়ে আমাদের অধ্যাত্মসমুদ্রে দিগ্-দর্শন করান। এই হলো ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য। মানুষকে তিনি তাঁর অতিমানব স্বরূপে নিয়ে যাবার জন্য আসেন। সেই কারণে তিনি মানুষের আকার ধারণ করেন এবং মানুষের সমস্ত গুণাগুণ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা শ্রেষ্ঠ মানুষ কিংবা অবতার —যেকোন রূপে দেখতে পারি। কারণ, ঈশ্বর এবং মানুষ—এই দুটি ভাবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটে অবতারপুরুষের জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা যখন মানুষরূপে দেখি তখন দেখতে পাই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোকে আমাদের সঙ্গে তাঁর কোন তফাৎ নেই। অক্ষয়ের মৃত্যুতে তিনি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করলেন; তাঁর মনে হলো, গামছা নিংড়ানোর মতো তাঁর হৃদয় যেন কে নিংড়াচ্ছে। এই যে অবতারপুরুষের লীলা, এতে তাঁকে আমরা মানব-রূপে দেখি। আর তাঁকে মানবরূপে দেখেই তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা করার একটা সাহস হয়, তাঁকে আমাদের মনের কথা খুলে বলতে পারি। আমাদের মনের অবস্থা ইনি বুঝবেন। কাজেই এঁর কাছ থেকে আমাদের অধ্যাত্মজীবনে চলার উপায় খুঁজে পাব। শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে আমাদের কাছে একটা দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছেন, যাতে মানুষের মধ্য দিয়েই ভগবানকে আমরা আমাদের ভক্তি ও ভালবাসা নিবেদন করতে পারি এবং তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) মধ্য দিয়ে ভগবানকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

অল্পদিন আগে (১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে) শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের দেড়শো বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। এখন চারদিক তাঁর প্রভায় আলোকিত। সকলে যেন তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করছেন। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না এলেও তাঁর পার্ষদ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য কারও কারও হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাতেই আমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের প্রতিদিনকার ঘটনাবলী যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার আগে আর কোন অবতারের ক্ষেত্রে তা হয়নি। শ্রীশ্রীমা ভারি সুন্দর-ভাবে বলতেন যে, ঠাকুরের মুখের কথাগুলি কথামৃতকার মাস্টারমশায় অবিকল ধরে রেখেছেন। তাঁর 'কথামৃত' পড়লে মনে হয় তিনি যেন স্বয়ং কথা বলছেন। এরকমভাবে কোন অবতারের কথা কি কখনো ধরে রাখা হয়েছে? আবার তাঁর ফটোও তুলে রাখা হয়েছে। সেটাও অন্য অবতারে হয়নি। বাস্তবিক এসমস্তই বিচিত্র ঘটনা। কত অলৌকিক জীবন আমরা পুরাণের গল্পের মধ্যে দেখতে পাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সবার চেয়েও সহজবোধ্য, প্রাণবন্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন যে-কেউ তুলতে পারে। আবার তাঁদের জীবনের অনেক ঘটনার বাস্তবতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা নিয়ে কখনো প্রশ্ন উঠবে না। তাঁর জীবনের ঘটনা নিয়ে অবাস্তবতার সংশয় ওঠারও অবকাশ নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা আমাদেরকে লক্ষ্যে নিয়ে যাবে? শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবের এক অপূর্ব সমন্বয়-সাধক। মানব-হৃদয়ের বিশেষতঃ সত্য-সন্ধানীর হৃদয়ের সকল ভাব প্রতিফলিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এবং তাঁর মধ্য দিয়েই ভাবগুলি পরিস্ফুট ও বোধগম্য হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কেউ আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কোন সংশয় নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলতেন: দেখ, আমারও এরকম হতো, তখন আমি এইরকম করেছিলাম; তাতে আমার সেই সংশয় বা সেই অসুবিধা দূর হয়েছে। এর চেয়ে সুন্দর করে মানুষকে সাহস দিয়ে বলবার আর কোন পথ নেই। তিনি তাঁর জীবনে সকল প্রকার সংশয়ের সম্মুখীন হয়েছেন এবং নিজের অভিজ্ঞতায় তিনি সেই সবকিছুর সমাধান করে দিয়েছেন। এই হলো 'ছাঁচ তৈরি' করে যাওয়া।

আধ্যাত্মিক জীবনে কত বিচিত্র রকমের সাধনা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এত রকম সাধনা করলেন তা আমরা জানি না। সত্যকে জানবার জন্য মানুষ সাধনা করে। সত্যে পৌঁছানোর জন্য যেকোন একটা পথ দিয়ে গেলেই মানবজীবনের সার্থকতা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এত বিচিত্র রকমের সাধনা, এত বিচিত্র অনুভবের প্রয়োজন ছিল কি? যিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, তাঁর তো এসবের প্রয়োজন নেই। এর উত্তর হচ্ছে যে, যত রকমের সাধনা সম্ভব হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সেগুলিকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে গেলেন, যাতে সকলে তাঁর জীবন থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ পেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।"

সকল সাধনার ধারাই তাঁর মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। বিভিন্ন নদী যেমন বিভিন্ন পথ ঘুরে শেষে সমুদ্রে এসে মিলিত হয়, সেইরকম বিভিন্ন আধ্যাত্মিক চিন্তাসমূহ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আধ্যাত্মিক ভাবসমুদ্রে আপন গন্তব্যস্থল খুঁজে পেয়েছে। সেখানেই সব নদীর উৎস এবং নদীর সঙ্গমস্থল। তাঁর মধ্যে সকল ভাবের উৎপত্তি এবং তাঁর মধ্যেই তাদের চরম পরিসমাপ্তি। যখন তাঁর জীবনকে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি তখন তাঁর এই অসাধারণত্ব আমরা বুঝতে পারি। কত রকমের সাধক, কত রকমের সাধারণ মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেছেন। যুবক, বৃদ্ধ, মহিলা—সকলেই তাঁকে ঘিরে থেকেছেন এবং ফিরে গেছেন পরম তৃপ্তিলাভ করে। শিশুদের কাছে তাঁর আচরণ শিশুর মতো, যুবকদের কাছে তিনি যেন যুবক; আবার প্রবীণদের কাছেও তিনি সর্বপ্রকারে পরিণত মানুষ। তাঁর মধ্যে কত অদ্ভুত ভাবের সমন্বয়। স্বামী সারদানন্দ তাই ঠাকুরকে বলছেন 'ভাবরাজ্যের সম্রাট'। যত রকমের ভাব আছে, তিনি তার নিয়ন্তা, তার অন্তিম পরাকাষ্ঠাও তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন সাধন-পথের দীপস্বরূপ। ঈশ্বরানুভূতির পথকে তিনি আলোকিত করে রয়েছেন। সে-আলো সাধারণ মিটমিটে আলো নয়। সে-আলো প্রখর সূর্যের আলো। সমগ্র বিশ্বের ধর্মজগৎকে তিনি তাঁর দীপ্ত প্রভায় আলোকিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কত ভক্ত-সাধক এসেছেন—কেউ অদ্বৈতবাদী, কেউ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কেউ দ্বৈতবাদী কিংবা কেউ জ্ঞানী, কেউ ভক্ত, কেউ যোগী—সকলেই তাঁর কাছে এসে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কথাপ্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন: "অন্য জায়গায় ছিটেফোঁটা, এখানে এসে ঢেউঢেউ।" শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের সাগর। এখানে এসে জীবন ভরে যায়, উপচে পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে গ্রহণ করে আমরা যদি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই, তবে দেখব তিনি আধ্যাত্মিক পথযাত্রায় আমাদের আহ্বান করছেন, যদিও আমাদের পথ ভিন্ন ভিন্ন। একটা কথা আমরা খুব জোর দিয়ে বলতে পারি যে, তাঁর কথার ভিতরে কোন হতাশার ভাব নেই। হতাশার কথা তিনি কখনো বলেননি। সকলের জন্যই তিনি আশার কথা শুনিয়েছেন। এজগতে কেউ চিরকালের জন্য ঈশ্বরের রাজ্য থেকে নির্বাসিত নয়। সন্ন্যাসী, গৃহী, যোগী, জ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র—সকলকেই তিনি পরম আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন। কাউকেই তিনি বাদ দেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা বহুমুখী। জীবের বিভিন্ন অবস্থার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, জীব চার প্রকার—বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব এবং নিত্য জীব। তিনি বদ্ধ জীবের যে-বর্ণনা দিচ্ছেন, তার সঙ্গে আমাদের জীবন হুবহু মিলে যায়। বদ্ধ জীব ভগবানের সম্বন্ধে কিছু জানতে চায় না। সে বন্ধনের মধ্যে পড়ে থাকে, কিন্তু বন্ধনের কোন যন্ত্রণা সে অনুভব করে না। সে যেন জালের মধ্যে আটকে পড়া মাছের মতো। মাছ জালকে মুখে করে কাদায় নিশ্চিন্তে পড়ে আছে। সে জানে না, জেলে তাকে এখনই হিড়হিড় করে ডাঙায় তুলবে আর তার প্রাণ যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বদ্ধ জীবের আরও উপমা দিচ্ছেন—বদ্ধ জীবেরা বিষ্ঠার কৃমির মতো; তাকে বিষ্ঠা থেকে তুলে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, সে মরে যাবে। ভাল জায়গা তার সহ্য হবে না। সেরকমই বদ্ধ জীব ঈশ্বরের কথা শুনতে ভালবাসে না। বিষয়ের কথাই তার একমাত্র ভাল লাগে। এইভাবে তিনি বদ্ধ জীবের বর্ণনা করে যাচ্ছেন। এসব কথা শুনে একজন শ্রোতার মনে যেন এক দারুণ ভীতির সঞ্চার হলো। সভয়ে সে ঠাকুরকে প্রশ্ন করছে: "মশায়, তাহলে বদ্ধ জীবের কি আর কোন উপায় নেই?" শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু বললেন না যে, "হ্যাঁ, পথ আছে"; বরং বললেন: "থাকবে না কেন, পথ আছে বৈকি।" কত জোর দিয়ে তিনি বলছেন একথা। তারপর তিনি পথ-নির্দেশ দিয়ে দিলেন—ভগবানের নামগুণগান, সাধুসঙ্গ এবং নির্জনে গিয়ে তাঁর স্মরণ-মনন। প্রথমে তিনি বললেন—ভগবানের নামগুণগান। এ করলে কি হবে? ক্রমশঃ মনের শুদ্ধি হবে, মন তখন তাঁর দিকে আকর্ষণবোধ করবে। এরপর বলছেন সাধুসঙ্গের কথা। সাধুসঙ্গ মানে, যাঁরা ভগবানের ভক্ত এবং ভগবানকে লাভ করার জন্য যাঁদের ঐকান্তিক সাধনা, তাঁদের সঙ্গ করা। সাধু-সঙ্গ করলে কি হবে? সাধুসঙ্গের ফলে আমাদের ধারণা হবে যে, ভগবানকে কেন্দ্র করে কিভাবে আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মাঝে মাঝে নির্জনে বাস এবং নামগুণগান ও সাধুসঙ্গ করে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণা হলো তার জাবর কাটতে হবে, অর্থাৎ যা শুনলাম ও যা দেখলাম তা মনের মধ্যে পুনঃপুনঃ আলোচনা করতে হবে। বারবার এরকম করতে করতে পরিশেষে আমাদের মনই শুদ্ধ হবে। মন শুদ্ধ হলে কি হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সাধকের কাছে ভগবানের স্বরূপ প্রকাশিত হবে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবান নিজেকে প্রকাশিত করবেন।

ভগবান ভক্তের হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করবেন বলেই তো তাঁর এই বিরাট ব্যবস্থা। এই সংসারে তিনি ভক্ত করেছেন, তাঁর পথে যাওয়ার উপায়স্বরূপ শাস্ত্র সৃষ্টি করেছেন, এই পথে যাওয়ার প্রেরণাও তিনি দিচ্ছেন। এমনকি আমাদের দুঃখের পর দুঃখও দিচ্ছেন—এও একই কারণে। এত আঘাত পেয়ে যদি মানুষ তাঁর দিকে একটু যায়। ঈশ্বরকে যে চিরকাল ভুলে থাকে, তাকে দরকার হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হয়। আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, আমাদের জাগাতে হবে। মা কত কৌশল করে ছেলেকে জাগান। দরকার হলে মা তাকে নাড়া দেন, এমনকি চিমটি কেটেও জাগিয়ে দেন। মা এগুলি করেন কেন? কারণ, ছেলে সবসময় ঘুমিয়ে থাকলে সে ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন হয়ে পড়বে। মা তা চান না। তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে খেলতে চান। তিনি কখনো চান না যে, ছেলে তাঁকে ভুলে থাকুক। তিনি চান, তাঁর প্রতি তাঁর ছেলেদের আকর্ষণ বাড়ুক, তাঁর প্রভাবের মধ্যে তারা চলে আসুক, সংসারে যত দুঃখ-যন্ত্রণা আছে তার প্রতি-কারের উপায় তারা জানুক।

সংসার-তাপদগ্ধ মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য জগজ্জননী নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা সর্বগ্রাহী। তাঁর মধ্যে সংকীর্ণ মানসিকতা বা একদেশদর্শিতার কোন স্থান ছিল না। এমন কেউ নেই যে, তাঁর শিক্ষার আওতায় আসছে না। সমাজে যারা ঘৃণিত অবহেলিত, সমাজ যাদের বিষের মতো পরিত্যাগ করেছে—তাদের জন্যও শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় থেকে করুণাধারা প্রবাহিত হয়েছে। এদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্যও তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। সংসারে অবহেলিত, মাতাল, ব্যাভিচারী

বা নানারকম দুষ্কৃতকারী—কেউই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অবজ্ঞার নয়। এদের জন্যও তাঁর হৃদয় থেকে রক্ত ঝরেছে। তাপিত আত্মার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এই সর্বগ্রাহী এবং সর্বব্যাপী করুণাধারা তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। কিন্তু কত অপবিত্র ও অশুদ্ধ মানসিকতার ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে এসে সমস্ত কুকর্মের এবং তা থেকে পরিত্রাণের সকল দায়-দায়িত্ব তাঁর কাছে অর্পণ করেছে এবং তিনিও তা গ্রহণ করেছেন। যার পক্ষে যে-পথটি উপযুক্ত, তাকে তিনি সেই পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ঠাকুরের একটি শিক্ষা—কারও ভাব নষ্ট করতে নেই। যার যে-ভাব, তাকে সে-ভাবে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হয়। সর্বভাবময় ঠাকুরের পক্ষে এটা যেমন সহজ ছিল, এমন আর কারও পক্ষে নয়। কারণ, তিনি সব ভাবের রাজা। প্রত্যেককে তিনি তাদের ভাব অনুযায়ীই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যেমন সন্ন্যাসীদের আদর্শ, তেমনি তিনি গৃহীদেরও আদর্শ।

যখন তিনি ত্যাগের কথা বলছেন, তখন তার ভিতরে কোন আপোস নেই। বলছেনঃ "ত্যাগ ছাড়া কিছু হবেনি বাপু।" সংসারে যে যে-ক্ষেত্রেই থাকুক না কেন, ত্যাগ ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। কেউ এতে সংশয় প্রকাশ করে বলতে পারেনঃ 'আমরা সংসারী মানুষ। আমাদের সব ত্যাগ করার উপায় কি?' তখনই এল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যুত্তরঃ "তোমাদের বাইরে ত্যাগ করতে হবে না; তোমাদের ভিতরে ত্যাগ করলেই হবে।" "ত্যাগ ছাড়া কিছু হবে না" কথাটির সঙ্গে "ভিতরে ত্যাগ করলেই হবে" কথাটির কোন আপোস নেই, আমাদের মনে রাখতে হবে। ত্যাগ ছাড়া ঈশ্বর-উপলব্ধি হবে—এমন কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো বলেননি। বরং এর বিপরীত কথাই তিনি বলেছেন—কারও পক্ষে অন্তরে বাইরে ত্যাগ, কারও পক্ষে শুধু অন্তরেই ত্যাগ।

কত রকম জীবনের দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে গেছেন। যে-জীবন তিনি যাপন করে গেছেন, তার মধ্যে যেমন আদর্শ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, তেমনি আত্মীয়-স্বজন সকলকে নিয়ে একজন আদর্শ গৃহীর যেভাবে সংসার করা উচিত তার নিদর্শনও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মায়ের সেবা করতেন, যাতে তাঁর কোন কষ্ট না হয়। এই কারণেই তিনি সন্ন্যাস গোপনে নিয়েছেন, যাতে তাঁর মায়ের মনে কোন ব্যথা না লাগে। ঠাকুর বৃন্দাবন গেছেন। সেখানে গঙ্গামায়ী নামে এক সাধিকার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। তাঁর ভক্তিভাব দেখে ঠাকুর মুগ্ধ হন। আর গঙ্গামায়ীও ঠাকুরকে দেখে মুগ্ধ। এই উচ্চভাবের সাধিকা শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীরাধা-জ্ঞানে 'দুলালী' বলে ডাকতেন। বৃন্দাবনে বাসকালে ঠাকুর একদিন বললেনঃ "আমার পেটে সব খাবার সহ্য হয় না। আমি এখানে থাকলে আমাকে খাওয়াবে কে?" গঙ্গামায়ী বলেনঃ "আমি তোমাকে রান্না করে খাওয়াব।" ঠিক হলো, ঠাকুর বৃন্দাবনে গঙ্গামায়ীর কাছেই থাকবেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ঠাকুরের মনে পড়ে গেল, দক্ষিণেশ্বরের নহবতে তাঁর মা একা রয়েছেন। তিনি যদি বৃন্দাবনে থাকেন তবে কে তাঁর মায়ের দেখাশোনা করবেন? তাই বৃন্দাবনে থাকা তাঁর আর হলো না, ফিরে এলেন মায়ের কাছে। এই যে মায়ের জন্য এত টান, একি সন্ন্যাসীর কাজ? এর উত্তর হলো এই যে, সন্ন্যাসী হলে তার হৃদয় যে শ্মশান হবে, তা তো নয়। হৃদয় তার থাকবে, কিন্তু সেই হৃদয় কেবল একটি জায়গায় বিক্রি হয়ে যাবে না। সেই হৃদয় কোথাও সীমিত হয়ে থাকবে না, বরং সকলকে গ্রহণ করার জন্য তা উন্মুক্ত হয়ে থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা তাই দেখতে পাই, তাঁর ভালবাসা ছিল সর্বগ্রাহী। অন্যের দুঃখে তিনি দুঃখ অনুভব করেছেন, আবার অন্যের সুখে সুখ অনুভব করেছেন। যে-অধ্যাত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন—সাধারণ মানুষ তার নাগালই পায় না। সকলের কাছে তা প্রকাশ করার জন্য, সকলকে তার নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সমস্ত জীবনভোর তাঁর কি ঐকান্তিক চেষ্টা। তাঁর এই জীবন, তাঁর এই চেষ্টা, তাঁর এই শিক্ষা—এগুলিই আমাদের গ্রহণ করতে

হবে। যদি এগুলি আমাদের জীবনকে ঠিক পথে চালিত করতে না পারে, তবে বুঝতে হবে, আমরা বদ্ধ জীবেরও অধম হয়েছি। তাঁর জীবন এবং তাঁর শিক্ষা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তবে দেখব, কত সম্পদ ছড়িয়ে আছে কথামৃতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। তার মধ্য থেকেই আমরা আমাদের জীবনের সব রসদ পেয়ে যাব। ধর্মজীবনের কত গূঢ় রহস্য তিনি কত সহজ সরল ভাষায় উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি বলছেন: ঈশ্বরের প্রতি তুমি যদি আকর্ষণ অনুভব কর, তাঁর জন্য তোমার প্রাণ যদি কাঁদে তাহলেই যথেষ্ট। আর কিছুর দরকার নেই। একমাত্র কাতর হয়ে তাঁকে ডাকা—এই হলো সাধনের পরাকাষ্ঠা। তারপরেও যে যত ইচ্ছা সাধনা করতে পারো, তার জন্যও তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার খোলা আছে। তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন কত রকমের সাধনা। ভক্তির সাধনা, জ্ঞানের সাধনা, তন্ত্রের সাধনা, বেদের সাধনা—সব রকমের সাধনা তাঁর মধ্যে। কত ভাবে তিনি ভগবানকে ডেকেছেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি। কোথাও এর সীমা নেই। তাঁর শিক্ষা সকলের কাছেই সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

মনে রাখতে হবে, তিনি হলেন ছাঁচ—কেবল আমার একার জন্য নয়—সকলের জন্যে। কাউকেই নিজের ভাবকে বিকৃত করে সেই ছাঁচে নিজেকে ঢালতে হবে না। প্রত্যেকেই তাঁর মধ্যে নিজের আদর্শের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাবে। এই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বৈশিষ্ট্য, যার জন্য তাঁকে আমরা 'সর্বধর্মস্বরূপ' বলছি। যে যে-ভাবেরই ভাবুক হোক, তার আদর্শের পরাকাষ্ঠা তাঁর ভিতর দিয়েই সে দেখতে পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: তুমি তোমার ভাব নিয়ে থাক, কিন্তু আর একজনের ভাব সম্বন্ধে সমালোচনা করার কোন অধিকার তোমার নেই। তুমি তোমার নিজের ভাব সম্বন্ধে কতটুকু জান যে, অপরের সমালোচনা করতে তুমি সাহস কর? তিনি আরও বলছেন: ভগবানের ভাবের কখনো ইতি করা যায় না। তিনি এই পর্যন্ত হতে পারেন, আর কিছু হতে পারেন না—এরকম কখনো বল না। তাঁর ভাব অনন্ত। কেউ তার সীমা করতে পারে না।

সকলের প্রতিই শ্রীরামকৃষ্ণ সহানুভূতিপূর্ণ এবং আদর্শস্থানীয় হয়ে আছেন। লীলাপ্রসঙ্গের মধ্যে এটি বিশেষ করে বলা আছে যে, বিভিন্ন সাধকরা তাঁকে দেখে তাঁকে তাঁদেরই পথের পথিক বলে মনে করতেন; শুধু পথিক নয়—তাঁদের ভাবের চরম অবস্থাটি তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এটি তাঁর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, কোন্‌টি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য—তিনি জ্ঞানী না ভক্ত? তিনি দ্বৈতবাদী না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী? আমরা তবে এককথায় বলতে পারি, তিনি সকল ভাবের। কোন ভাবকেই তিনি অগ্রাহ্য করেননি। সব জায়গায় তিনি রাজা, তিনি ভাবের সম্রাট। স্বামী সারদানন্দ বলছেন, তিনি "ভাবরাজ্যের সম্রাট"।

আমরা যদি ব্যাকুল অনুরাগের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তন করি, আমরা যদি তাঁকে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করতে পারি তবে তাই হবে যথেষ্ট। আমাদের সকলের জীবন তাঁর প্রভায় আলোকিত হবে। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই, তাঁর আলোক আমাদের জীবনকে আলোকিত করুক। তাঁর প্রভাব আমাদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করুক। তাঁর করুণা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক। আমাদের জীবনে তাঁর অবতীর্ণ হওয়া অর্থবহ হয়ে উঠুক, আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হোক।* □

*** পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৭ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ।**

টেপরেকর্ড থেকে অনুলিখন: ননীগোপাল সরকার (পুরী)

নিবন্ধ

প্রসীদ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

'**প্রসীদ**' কথাটি যে কাতর প্রার্থনা, অকপট অনুশোচনা, ক্ষমাভিক্ষা ও ব্যাকুল আশা প্রকাশ করে তাহা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১১শ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জুন ২৫ শ্লোকে বিশ্বরূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে ভয়ে কাতর হইয়া বলিতেছেনঃ "প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস"—হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, সকল দেবতার অধিপতি, তুমি প্রসন্ন হও। কালানলসদৃশ দংষ্ট্রাকরাল তোমার একাধিক মুখমণ্ডল দেখিয়া কোন্ দিকে পালাইব বুঝিতেছি না। তুমি আমাকে দিব্যচক্ষু দিয়া তোমার বিশাল রূপ দেখাইতে চাহিয়াছিলে। ভাবিয়াছিলাম কত না আনন্দ পাইব। বিশ্বরূপ যে এত ভয়ংকর তাহা কি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিলাম? তোমার এই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া মনের সব শান্তি চলিয়া গিয়াছে। অতএব প্রসীদ। প্রসন্ন হও।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কিছু বাকি আছে। অর্জুন দেখিলেন যাহা কিছু ঘটিবে আসন্ন কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে, রথী-মহারথীরা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে—শুধু কৌরবপক্ষে নয়, পাণ্ডবপক্ষেও। কৌরব-পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ সহ পাণ্ডবপক্ষেরও অনেক মহাবীর নদীসমূহ যেমন তীব্রবেগে সমুদ্রে লীন হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কোথায় সেই সখা শ্রীকৃষ্ণ? কোথায় সেই বিশ্ববন্ধু দেবকীপুত্র নন্দদুলাল যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ। অতএব অর্জুন আবার সকাতরে বলিলেনঃ "প্রসীদ"। বল, তুমি কে? কি তোমার অভিপ্রায় দয়া করিয়া বল (গীতা, ১১।৩১)।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর—আমি সর্বসংহারক মহাকাল। তোমরা কয়েকজন ছাড়া আর সকলকেই এই যুদ্ধে গ্রাস করিব। যাহারা এই যুদ্ধে মরিবে তাহাদিগকে আগেই আমি মারিয়া রাখিয়াছি। আমিই কর্তা—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আমারই ইঙ্গিতে ঘটিতেছে। এইটি জানিয়া, বুঝিয়া তুমি তোমার কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ কর। সর্বদা বল—"নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু"।

অর্জুন বুঝিলেন। গদগদ কণ্ঠে স্তব করিলেনঃ "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা" ইত্যাদি। (গীতা, ১১।৩৬) পরে আবার বলিলেনঃ "প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।" (গীতা, ১১।৪৫) এবারকার 'প্রসীদ'-এ আনন্দ ও ব্যাকুল আশা ঝরিয়া পড়িতেছে। শংখচক্রগদাধারী শ্রীকৃষ্ণের সৌম্য মূর্তি দেখিয়া অর্জুন আশ্বস্ত হইয়াছেন। না, কৃষ্ণ বদলান নাই। যে-সখা সেই সখাই আছেন। যাহা আমাদিগের নিকট ভয়ংকর তাহা তাঁহার নিকট নহে। তিনি যে পরমপুরুষ, পরব্রহ্ম। সৃষ্টি তাঁহা হইতে, ধ্বংসও তাঁহা হইতে। "মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।" (গীতা, ১০।৩৪)—তিনি সর্বহর মৃত্যু, তিনিই আবার ভবিষ্যতে যাহা আসিবে তাহার উৎপত্তির কারণ। মৃত্যুকে বাদ দিয়া জীবন সম্ভবপর নয়। ভবিষ্যৎকে না ভাবিয়া বর্তমানে থাকা চলে না।

ঋগ্বেদে নানা দেবতার কথা, তাঁহাদের শক্তির কথা আছে। তাঁহাদের প্রসন্নতার জন্য নানা প্রার্থনাও সেখানে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। ঋগ্বেদে ৮ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তটি অগ্নি, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও ইন্দ্রের মাহাত্ম্যের বর্ণনা করিয়া স্তোতাকে তাঁহাদের প্রসন্নতা ভিক্ষার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। যথাযথ যজ্ঞ দ্বারা দেবতারা প্রসন্ন হন। তাঁহারা প্রসন্ন হইলে মানুষের নানা কাম্যবস্তু লাভ হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১০, ১১, ১২—এই তিনটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ

প্রজাপতি একইসঙ্গে মানুষ এবং যজ্ঞকে (বেদবিহিত নিয়মে দেবতার আরাধনা) সৃষ্টি করিয়াছেন।

যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের ভাবনা কর, দেবতারাও যজ্ঞ দ্বারা তৃপ্ত হইবেন এবং অভীষ্ট বিষয় দান করিবেন। দেবতা ও মানুষের মধ্যে যজ্ঞের মাধ্যমে একটি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। পরিণামে উভয়েই পরম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। মানবজীবনের লক্ষ্য যেমন মুক্তি, দেবতাদেরও শ্রেষ্ঠ কাম্য—সকল সীমা অতিক্রম করিয়া জন্মহীন, মৃত্যুহীন, পরিবর্তনহীন ব্রহ্মসত্তার সহিত মিলন।

*

প্র-সদ্ ('প্র' উপসর্গ যুক্ত সদ্ ধাতু) ধাতুর নানা রূপের প্রয়োগ আমরা বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রচুর দেখিতে পাই। 'প্রসীদ' শব্দটির ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ—প্র-সদ্ লোট্-হি। প্রসন্ন হও। এই ধাতু হইতে উৎপন্ন শব্দগুলিতে ক্ষমা, শরণাগতি, শান্তি, করুণা, অনুকম্পা, তৃপ্তি, বিনয়, সন্তোষ, গাম্ভীর্য প্রভৃতি ভাব প্রকাশ পায়। 'প্রসাদ' কথাটির নানা প্রয়োগ আমাদের সুপরিচিত। ভক্ত দেবতাকে পূজা করিতেছেন। পূজা নানা আড়ম্বরে সম্পন্ন করা যায়। নানা মন্ত্র নানা স্তব-স্তুতি পূজায় ব্যবহার করা চলে। আবার সাদা-সিধাভাবেও পূজা করা যায়। পূজার শ্রেষ্ঠ তত্ত্বটি অতি সরল, উহা আরাধ্য দেবতাকে প্রাণের সহিত বলা—'প্রসীদ'। পূজক বলেন, 'হে প্রভু, তোমার পূজার জন্য যে সামান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি উহা যদি তুমি গ্রহণ কর তবে আমার পূজা সার্থক। এই বিশ্বজগতে চাহিবার তো কত সামগ্রী আছে—আমি সেসব কিছুই চাই না। আমি চাই তোমার প্রসন্নতা। পূজার পর ভক্ত একটু চরণামৃত পান করেন। কয়েক টুকরা নিবেদিত ফল-প্রসাদও হয়তো গ্রহণ করেন। এই প্রসাদ গ্রহণে তাঁহার অন্তর অপূর্ব শান্তিতে ভরিয়া যায়।

*

লৌকিক জগতে নানা অবস্থায় মানুষকে অপরের প্রসাদ ভিক্ষা করিতে হয়। শান্তিবাবু পাশের বাড়ির অবস্থাপন্ন বন্ধু প্রবীরবাবুকে একদিন বলিলেন: 'ভাই বড় বিপদে পড়িয়াছি। দুটি ছেলের মাহিনা দিতে পারিতেছি না। স্কুল হইতে তাড়া দিয়াছে। যদি দয়া করিয়া পঞ্চাশটি টাকা ধার দাও তো এই বিপদ হইতে রক্ষা পাই।' প্রবীরবাবু শুনিয়া আন্তরিক সহানুভূতি দেখাইয়া পাঁচখানি দশটাকার নোট শান্তিবাবুর হাতে গুঁজিয়া দিলেন। শান্তি-বাবুর চোখ এই অনুকম্পা ও কৃতজ্ঞতায় ভিজিয়া গেল। বন্ধু বলিলেন, 'ভাই, তোমার এই দুঃসময়ে তোমার জন্য এই সামান্য কিছু করা তো আমার ভাগ্যের কথা। যখন পার শোধ দিও। আমি তাড়া দিব না।' শান্তিবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া যুক্ত করে ভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিলেন। বলিলেন, 'প্রসীদ'।

*

দরিদ্র ঘরের ছোট ছেলে তপন রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রন্ধন-ব্যাপৃতা মাকে বলিতেছে, 'সকালবেলায় যে এক ছোট বাটিতে মুড়ি ও দুটি বাতাসা দিয়াছিলে তাহা পেটে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। বড় ক্ষুধা পাইয়াছে মা, তোমার পায়ে পড়ি, আরেক বাটি মুড়ি দাও—বাতাসা নাই বা দিলে।' মা গৃহের সঙ্গতি জানেন। শিশু তপন কি করিয়া বুঝিবে? কিন্তু খোকার মিনতিতে মা উঠিলেন। খোকাকে কোলে লইয়া বলিলেন, 'এত ক্ষুধা পাইলে চলিবে কেন?' মুড়ির কৌটাটি ঝাড়িয়া যাহা কিছু ছিল ছোট বাটিতে ঢালিয়া খোকার হাতে দিলেন। বলিলেন, 'আর "খিদে খিদে" করিসনি বাবা, এবার খেলা কর।'

এই গল্প কত ঘরে ঘটিতেছে। কত ক্ষুধার্ত শিশুকে মার কাছে কাঁদিয়া বলিতে হইতেছে—মা, 'প্রসীদ'। শিশুর কাছে মা সর্বশক্তিময়ী অন্নপূর্ণা।

দারুণ খরা। বৃষ্টির নামগন্ধ নাই, সব দিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। চাষীরা বারবার আকাশের দিকে চাহিতেছে যদি মেঘের কোন চিহ্ন দেখা যায়। দিনের পর দিন স্ত্রী-পুরুষ সকলে গ্রামের মন্দিরে মন্দিরে, মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করিতেছে: হে মেঘের রাজা, হে খোদা, হে আল্লা—'প্রসীদ'। শত শত মানুষের এই দারুণ বিপদে কিছু মেঘ

সৃষ্টি কর। মেঘ গলিয়া আকাশ হইতে ধরাতলে জল নামিয়া আসুক। হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তি ভগবান শুনেন, আবার কখনো শুনেন না। কখনো অকস্মাৎ আকাশে মেঘ জমে, বৃষ্টি নামে। গাছ-পালা মানুষ প্রাণী অনাবৃষ্টিতে মরে না। কখনো খরা চলিতে থাকে, ভগবানের কানে ভূতলের প্রার্থনা পৌঁছায় না—পৌঁছাইলেও তিনি কিছু করেন না। শত শত জীবজন্তু মারা পড়ে। মানুষ ভগবানের মতি-গতি কি করিয়া বুঝিবে? সে শুধু শেষ পর্যন্ত বলিয়া চলে—'প্রসীদ, প্রসীদ'।

আবার অপর দিকে দারুণ বৃষ্টি। বন্যার ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত। যে-শক্তি প্রায় মরা নদীতে এত জল আনিতেছে সেই শক্তির উদ্দেশে নদীর পাড়ে বা কাছাকাছি যাহারা থাকে তাহাদের ব্যাকুল প্রার্থনা উঠে—'প্রসীদ, প্রসীদ'। হে নদী, এত ফুলিও না। কূল ছাপাইও না, বাড়ি-ঘর সব ভাসিয়া যাইলে আমাদের কি দশা হইবে?

জানা-অজানা কত বিপদই না মানুষকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। কখনো কখনো সে একেবারে নিরুপায়। জরা, রোগ, মৃত্যু তো আছেই, তাহা ছাড়া অর্থহানি, অপমান, পারিবারিক অশান্তি এসবের জন্য আমাদিগকে কত না কষ্ট ভোগ করিতে হয়। বিশ্বাস করি বা না করি, দেবদেবীদের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়—'প্রসীদ, প্রসীদ'।

চণ্ডী গ্রন্থের মধ্যম চরিত। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধের অন্ত নাই। একবার একশত বর্ষব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছে। মহাপরাক্রান্ত অসুরগণ দেবগণকে স্বর্গলোক হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। বিপন্ন মানুষের মতো দেবতারা এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অবশেষে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গিয়া দেবতারা নিজেদের দুঃখ নিবেদন করিলেন। যদিও প্রজাপতি ব্রহ্মা অসুরদের অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী, তবুও এক্ষেত্রে তাঁহার নিজের একা অসুরদের ধমকাইতে সাহস হইল না। দেবতাদের লইয়া তিনি স্বয়ং শিব ও বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অসুরদের অত্যাচারের কথা নিবেদন করিলেন। বিশ্বের পালনকর্তা নারায়ণ এবং সংহার-কর্তা মহাদেবের প্রাণ গলিল। মধুসূদন বিষ্ণু এবং ত্রিপুরারি শিব উভয়েই ভ্রূকুটি করিয়া মহাকোপান্বিত হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মাও সেই কোপে যোগ দিলেন। তাহার পর কি ঘটিল তাহা চণ্ডীপাঠকের অজানা নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতাদের 'সুমহত্তেজ' একত্রিত হইল এবং ত্রিলোক-ব্যাপিনী নারীমূর্তিতে মহাশক্তি প্রকাশিত হইলেন। সেই মহাশক্তির নানা বিক্রমে অসুররাজ মহিষাসুর বিধ্বস্ত হইলেন।

দেবী দেবতাদের একটি বর দিতে চাহিলেন। দেবতারা বলিলেন, কি আর চাহিব? এই বর দিন, আবার যদি অসুররা উৎপাত করে আমরা তখন আপনাকে 'প্রসীদ দেবি' বলিয়া স্মরণ করিব এবং আপনি আমাদিগকে বিপন্মুক্ত করিবেন, অসুরদের অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। "ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ। / তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ॥" (চণ্ডী, ৪।৩৯) দেবতাদের শরণাগতি ও বিনয়ে প্রসন্ন হইয়া জগন্মাতা ভদ্রকালী 'আচ্ছা তাহাই হইবে' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। দেবীর আবির্ভাব এবং অসুর-দলন শুধু দেবতাদের জন্য নয়, অখিল জগতের হিতের জন্য।

অনেক যুগ কাটিয়া গেল। এবার চণ্ডীর উত্তর চরিতের কাহিনী। শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই প্রবল পরাক্রান্ত অসুর। শচীপতি ইন্দ্রের তিন লোকের অধিকার তাঁহারা কাড়িয়া লইয়াছেন এবং অন্যান্য দেবতাদের যজ্ঞভাগও অপহরণ করিয়াছেন। এখনকার দিনের সামরিক অভ্যুত্থানের মতো সূর্য, চন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, পবন এমনকি অগ্নিকেও স্বীয় স্বীয় পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ নিজেরাই এই সব দেবতাদের কাজ চালাইতে লাগিলেন। দেবতাদের স্মরণ হইল—অপরাজিতা মহাদেবী তো আমাদিগকে বর দিয়াছিলেন—'বিপদে পড়িলে আমাকে ডাকিও। যত বড় বিপদই হউক না কেন আমি আসিয়া তোমাদের সঙ্কটমোচন করিব।'

দেবতারা তাহাই করিলেন। হিমালয় পর্বতের জাহ্নবীতটে দাঁড়াইয়া হৃদয়ের সকল ব্যাকুলতা দিয়া

সমবেত আকুল স্বরে দেবীর স্তুতি আরম্ভ করিলেন। "নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।/ নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥" (চণ্ডীর উত্তর চরিতের ৫ম অধ্যায়ের ৯ম শ্লোক হইতে আরম্ভ, ৮২ শ্লোকে সমাপ্ত) দেবী তখন হিমালয়ের গিরিরাজকন্যা হইয়া জন্মিয়াছেন। বালিকা গঙ্গায় স্নান করিতে আসিয়াছেন। দেবতাদের বেদনাভরা জলদগম্ভীর স্তব শুনিতে পাইলেন। আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, 'কাহারা এত কাতর স্বরে কাহাকে ডাকিতেছে?' নিজেই উত্তর দিলেন, 'ও, আমাকেই ডাকিতেছে। আমার বালিকারূপের পিছনে যে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী মাতৃশক্তি রহিয়াছে এই স্তব তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া। উপায় নাই। দেবতাদের কথা দিয়াছি, যখনই বিপদে পড়িয়া আমাকে ডাকিবে তখনই আমি আসিব, তোমাদের বিপদভঞ্জন করিব।'

কি করিয়া জগন্মাতা শুম্ভ ও নিশুম্ভকে দমন করিয়াছিলেন চণ্ডীর উত্তর চরিতে দৃশ্যের পর দৃশ্যে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ভক্ত পড়িতে পড়িতে স্তম্ভিত হন, আনন্দে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হয়। শুম্ভাসুরের নিধনের পর দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত অগ্নিকে সম্মুখে লইয়া পুনরায় একটি প্রাণস্পর্শী স্তব গাহিলেন। দেবী সামনে দাঁড়াইয়া। দেবতাদের ভয় কাটিয়া গিয়াছে। মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্তর কৃতজ্ঞতা ও আশায় ভরপুর।

দেবি প্রপন্নার্তিহরে **প্রসীদ**,
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং,
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥

—বিপন্নের আর্তিহরা হে বিশ্বজননী, প্রসীদ—প্রসন্না হও। হে চরাচর অখিল জগতের ঈশ্বরি **প্রসীদ**—প্রসন্ন হও। (চণ্ডী, ১১।৩)

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥

—হে অনন্তবীর্যে, বিশ্বকারণ বৈষ্ণবীশক্তি তুমি সমস্ত জগৎকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি যদি প্রসন্না হও তবে পৃথিবীতে মুক্তিলাভ সম্ভবপর। নতুবা নহে। (চণ্ডী, ১১।৫)

অতএব আমরা সততঃ তোমার প্রসন্নতা কামনা করি। হংস দ্বারা বাহিত বিমানে চড়িয়া তুমি ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী। সেই বিমান হইতে তুমি কুশ দিয়া বিশ্ববাসীকে শান্তিজল সিঞ্চন কর। হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।

শিবের বাহন বিপুলকায় বৃষভ তোমারও বাহন। ত্রিশূল, চন্দ্র এবং সর্প শিবের ভূষণ—তোমারও ভূষণ। হে মাহেশ্বরী-স্বরূপিণি, প্রণাম, তোমাকে প্রণাম।

দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র বাহন তোমারও বাহন—ময়ূর ও কুক্কুট। হে কৌমারীরূপধারিণি নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর মহাশক্তি বৈষ্ণবীরূপিণি নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।

বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মহাশক্তি বারাহীরূপিণি নারায়ণি তোমাকে প্রণাম। বিষ্ণু নৃসিংহ-রূপ ধরিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিধন করিয়াছিলেন। তুমি বিষ্ণুর সেই লীলায় তাঁহার সহচরী। হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।

অসুর বৃত্র স্বর্গ আক্রমণ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাহার প্রাণ সংহার করেন। তুমি কিরীট যুক্তা মহাবজ্রধারিণী ইন্দ্রশক্তি ইন্দ্রাণী। হে নারায়ণি ইন্দ্রাণীরূপিণি, তোমাকে প্রণাম।

(চণ্ডী, ১১।১৩-১৯)

উপনিষদে ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সগুণ দুইই। যখন সগুণ তখন তাঁহার নাম, রূপ ও লীলার শেষ নাই। তিনি কখনো পুরুষ কখনো প্রকৃতি। নানা শাস্ত্রে আমরা সগুণ ঈশ্বরের নানা নাম, নানা রূপ ও নানা কার্যের বিষয় জানিতে পারি। এইসব শুনিয়া শ্রোতার প্রাণে ভক্তি জাগে। রুচি অনুসারে তাঁহাকে পিতা বা মাতা বলিয়া উপাসনা করিবার ইচ্ছা জাগে। ঐ উপাসনার প্রধান মন্ত্র—**'প্রসীদ' 'প্রসীদ' 'প্রসীদ'**। □

কবিতা

ধুলোয় ঘামে সোনার সোনা

তরুণ সান্যাল

চৈত্য ছিল সোনায় মোড়া, সেই সোনাতেই গড়া
রাজরানীদের টায়রা বা পাঁয়জোর,
গয়না ভেঙে মঠের চূড়ায় ফের বসানো ঘড়া
সোনা রে তাই বিষম গরব তোর!
কলস ভেঙে বাদশা বানান মসজিদে পিলসুজ
সাজার ঘরের জাফরি আঁকিবুকি,
নকসা ভেঙে কল্কা ভেঙে গড়েছে গম্বুজ
সাগরপারের গির্জা গগনমুখী,
মানুষ নিয়ে সে আর ভাবে? তাদের রক্তে নদী
ইস্পাতে ঝকমক সামশের-ছুরি,
শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবে আর ইশাই-মোহাম্মদীর
সে-ইস্পাতেই বড়াই বাহাদুরী।
দেশ ভেঙে যায় রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, ঘরভাঙানী ঘানি
মানুষ পেষে, মানুষ ভিটেছাড়া,
যোগবাশিষ্ঠ প্রায় ঠোঁটস্থ রায়বাঘিনী রানীর
তার গেরুয়ার সঙ্গী খুনি খাঁড়া!
ঠাকুর, তুমি চার ঘাটে চার পিয়াসী দেখেছিলে?
হরেক নামের জল খেয়েছে এসে।
রঙবাহারী বহুরূপীর রঙ দেখে লাল-নীলে,
মতুয়া মাতে বিতর্কে, বিদ্বেষে।
নেইতো চৈত্য মসজিদে মন্দিরে বা গির্জায়
ঐ চলেছেন পরম মানবদেহ,
মধ্যে যিনি বসত করেন অরূপরতন সাঁই
অলখ আরশি নগরবাসী সে-ও।
দ্রাবিড়-আর্য-গ্রীক-সারাসেন কোন্ ধনে হয় ধনী?
আগ্রাসনের এক চেতনাই তাজা—
কেউ সোনা চায় দেবতা জ্ঞানে, কেউ বা স্পর্শমণি,
বা টাঁকশালের মুন্ডু-খোদাই রাজা!
মান-হুঁশে এক বিশ্বভুবন, মানুষ বিশ্বদীপ
সে-ই তো নদী বনস্পতি মাটি,
ধুলোয় ঘাসে সোনার সোনা জীবকে জানা শিব
সেই জেনেছে সব সাধনায় খাঁটি॥

ছায়া

জয়নাল আবেদীন

আমার তো কিছু নেই, শুধু এই খাঁচা—
তুই বিনে আমার সাধ্য কি বাঁচা!
জানিস তো সবকিছু, কিরকম আছি,
যেভাবে বাঁচাস তুই সেভাবেই বাঁচি।
তাকালে তাকাই আমি খাওয়ালেই খাই,
যেখানে বলিস যেতে সেখানেই যাই,
চাইলেই ঘাম মুছে প্রাসাদটা গড়ি,
কখনো বা ভুল করে তোর পায়ে পড়ি।
আমার তো কিছু নেই, আছে এই খাঁচা,
যেভাবে পারিস তুই সেভাবেই নাচা।
আমার ভিতর তুই, তুই নই আমি—
এভাবেই হয়েছিস জগতের স্বামী।
আমি তো করুণ ছায়া তুই বড় গাছ,
আমার ভেতর তুই নাচ নাচ নাচ,
যেভাবে চালাস তুই চলি টিক টিক,
যত বাধা পেরিয়েই নিবি ঠিক ঠিক।

সত্যের বিকল্প নেই কোন

নিভা দে

সবকিছু দূরে সরে যায়... ভেঙে যায়
একদিন সব তাজমহল—সময়ের শ্যাওলায়
কুরে খায় ভিতর বাহির বাঁচা তবে কি নিয়ে?
সব নিয়েও যেতে যেতে যদি থেকে যায়
কিছু চির অবশেষে হয়তো
সত্যের অভিলাষ নাম তার—
পতন উত্থানে বন্ধুরা নানা পথ বেয়ে বেয়ে
যেতে যেতে ফুরিয়ে যেতে যেতে
সত্যের সন্ধানে এগিয়ে যাওয়া তবু—
সত্যকে পাওয়া তো সহজ নয় কিছু,
তাই এই রক্তিম অশ্রুপাত প্রতিদিন,
তাই এত যন্ত্রণার শপথ ঠোঁট ভেঙে নেমে আসে
গরল উল্লাসে—সত্যকে পেতে পেতে বুক ক্রমে
হয়ে ওঠে শ্বেত মর্মর তুহিন হিম।
তবুও সত্যের অধিষ্ঠান হোক সেই
নগ্ন ভয়াল শুভ্রতার মাঝে—সত্যই সত্য
শিব সুন্দর—সত্যের বিকল্প নেই কোন।

অনুবোধ

নিমাই মুখোপাধ্যায়

আমার সোনালী সকাল ফিরিয়ে দাও
এখন সব রোদ্দুর হয়ে গেছে।
এই জ্বলন্ত রোদ্দুরে পুড়তে পুড়তে
আমি আনন্দের গান গাইছি।
সকালের সোনা-ঝরা রোদ
মধ্যাহ্নে মানুষকে পোড়ায়।
আবার রুপোলী চাঁদের আলোয় সে স্নিগ্ধ
হয়ে যায়।
এই জীবন, এই পথচলা, এই আনন্দ।
যারা সকালের এই সোনা-ঝরা রোদে স্নান করেছে
তাদের মধ্যাহ্নের রোদ পুড়িয়ে ছাই করে দিতে
পারে না।
কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে সকালের রোদের
রঙবদলের খেলা
এরা সারাজীবন ভুলতে পারে না।
অফুরন্ত হেঁটে চলে এইসব মানুষের দল
হেঁটে চলে অনন্তের পথে।
সন্ধ্যা হয়ে গেলে
আকাশ কোলে তুলে নেয়।

অবিস্মরণীয়

শান্তিকুমার ঘোষ

[২৭ জানুয়ারি, ১৮৯৯ (১৫ মাঘ, ১৩০৫) বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার আবাসে রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার স্মরণে]

চা-পানের আসর বসেছে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।
আসরে এখন গান ধরেছেন কবি—
'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' ;
আর সেই সুরের ধারা পান করছেন বীর-সন্ন্যাসী।
দেখছেন আলোর স্বপ্ন জেগে কি দুজনে!
যেন দুই জ্যোতিষ্ক ঘুরতে-ঘুরতে নিজেদের
কক্ষপথে একবারে মুখোমুখি ঃ
স্তম্ভিত মুহূর্ত সেই ... অনন্ত মুহূর্ত
এক সৃজনের ... ঋদ্ধ সমুজ্জ্বল!
উপাসিকা মাথা নুয়ে।
একে একে সন্ধ্যাদীপ জাগলো কুটিরেঃ
আরতির আয়োজন ভিতর-দেউলে॥

সাধন-ভজন-পূজন ফেলে

শেখ সদরউদ্দীন

সাধন-ভজন-পূজন ফেলে
পথে পথে ঘুরছি ভাই—
যদি কোথাও মনের মতন সত্যি একটি মানুষ পাই।
উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে
যাই চলে যাই অনেক দূর—
পথের ধারে মাঠের পারে
চাই মানুষের গানের সুর।
এত খুঁজি হায়রে হায়,
কোথাও কেন মানুষ নাই—
সাধন-ভজন-পূজন ফেলে
পথে পথে ঘুরছি ভাই!
মানুষ লাভের জন্যে হাঁটি,
হয় না আমার শাস্ত্র পড়া,
মালিক কি আজ ভুলে গেছেন
মাটির খাঁটি মানুষ গড়া!
চারদিকেতে আছে যারা
তাদের মাঝে মানুষ কই?
করে দ্বন্দ্ব-হানাহানি,
স্বভাব দেখে অবাক হই।
ইচ্ছা করে সমাজ ছেড়ে
বনের মাঝেই চলে যাই—
সাধন-ভজন-পূজন ফেলে
পথে পথে ঘুরছি ভাই

বাগেশ্রী

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

শিল্পী, তোল ঝঙ্কার তোমার বীণায়,
বাজাও সকরুণ বাগেশ্রীর সুর!
লাগাও সঠিক কোমলগান্ধার ও কোমল নিখাদ,
তবেই তোমার সুরে মিশবে আমার সুর,
আমার বেদনা, আমার সত্তা।
আজ রাতের নীরবতায়
কাতর হয়েছে প্রাণ।
নিঃসীম আকাঙ্ক্ষায় বুভুক্ষু হৃদয় কারে যেন চায়,
কোথা পাব তারে?
আজ খুঁজি তারে
তোমারি সুরের মাঝে,
হৃদয়ের অনুভবে।

বাঁশি

প্রবীর মিত্র

ওরে বাঁশি, তোর
ছোট দেহখানি ঘিরে
বিরহমিলন সুখবেদনার বাণী
রাত্রি প্রভাতে বেজে চলে নিজসুরে।
যন্ত্রের সাথে যন্ত্রীর যোগ কোথা?
একথা জানিতে
ফুরালো জীবনবেলা
গোধূলি আকাশে
হেরিয়া রঙের মেলা
শ্রান্ত পথিক ভাবে যন্ত্রীর কথা।
সুরের রাগিণী বহে
তার বাণী গানে
ভিতরে বাহিরে প্রকাশের লাগি
তব জাগরণ প্রাণে।
মনের তারেতে প্রাণের প্রান্তে
বেদনারে ঘিরি সুখের অন্তে
তব সুরে সুর মিলাবে
যখন জগদ্‌বীণার তার।
প্রাণের পেয়ালা মধুরে বিধুরে
ভরিয়া তুলিবে অতলে গভীরে
অর্ঘ্যের থালা জীবনের পানে
প্রকৃতির সম্ভার।
সুরকণাগুলি খুঁজে ফেরে ভাষা
সার্থক হবে এইটুকু আশা
ছোট বাঁশিটার সীমার অন্তে
বৃহতের আহ্বান
আকাশের সীমা ডাক দেয় যবে
ঘরে ধরে না তো প্রাণ।
বাঁশি ডাক শুনে বাজে
নিজ দেহখানি ভেঙে বারে বারে
হর্ষে বিষাদে জগতের মাঝে
শিহরণ তোলে ঝড়ে।
এসুরের নাহিকো শেষ
এরে ধরিবার লাগি পাত্রের মোহ
ধরিলে বিষম ক্লেশ।
বাঁশি তুমি বাজ জগৎ ব্যাপিয়া
যন্ত্রীর করে তা নিজেরে সঁপিয়া
সীমার বাহিরে অসীমের খোঁজে
মনের গভীরে আকাশের নীলে
তোল মহাসংগীত।

মা দুর্গার মুখ

শুভ্রা মজুমদার

কাশফুলের হিন্দোলে যখন বেজে ওঠে আগমনী গান
টইটম্বুর খালে বিলে জলে আঁকা হয় শরৎ মেঘের আলপনা
শিউলিঝরা আঙিনায় যখন নড়ে ওঠে ঢাকের কাঠি
আমাদের চোখের সামনে তখনই ভেসে ওঠে মা দুর্গার মুখ।
পত্রপুষ্পে নববস্ত্রে শুদ্ধ চিত্তে যখন নিজের মধ্যে ডুব দিই
প্রবাসী পরিজন যখন ছুটে আসেন, মাতেন আনন্দযজ্ঞে
ভুবনমোহিনীর আলোর মালায় উদ্ভাসিত হয় নানান দিক
আমাদের চোখের সামনে তখনই ভেসে ওঠে মা দুর্গার মুখ।
নিষ্ঠুর নবমী রাতে মেনকার কারুণ্য-নিষিক্ত চিত্তের মতো
আমাদের আর্দ্র কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়—
'যেয়ো না রজনী আজি লয়ে তারাদলে...'
বেদনার ম্লানিমায় তখনো ভেসে ওঠে মা দুর্গার মুখ।
দশমীর অপরাহ্ণে সিক্ত চক্ষে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জিতা হয় দেবী-প্রতিমা,
আরও একটি বছরের অপেক্ষায়, 'বিজয়া'র সম্ভাষণেও ভেসে ওঠে—সেই মা দুর্গার মুখ॥

ঊর্ধ্বায়িত পুষ্পিত বিস্ময়ে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

ঊর্ধ্বায়িত পুষ্পিত বিস্ময়ে
জীবনকে জানো, দ্যাখো
চেতনার সমস্ত আলোক জ্বালিয়ে
নন্দিত মহৎ নির্ভয়ে।
অপাবৃত হও তুমি সমর্পিত শান্ত অনুধ্যানে
জীবন রচনা কর—প্রত্যহের পরিচিত জীবন পেরিয়ে
বিনিদ্র গোলাপের মতো
বিদ্রোহে ব্যথায় অভিজ্ঞানে
সম্পন্ন প্রণতঃ
মাটিতে বিস্তৃত হও, আকাশের স্থির অভিমুখী
শিশির-স্বপ্নের অনুরাগে
দৃপ্ত সূর্যমুখী।
বিপরীত তরঙ্গের অজস্র দুরূহ বিপাকে
বিপন্ন হয়ে তবু হৃদয়ের সবটুকু রঙ
উদ্ভাসিত করে তোল
আকাশের দিকে।
আকাশের গ্রহ-তারা জেনো ঠিক তোমাকেও ডাকে
সমুদ্র পর্বত,—
প্রিয় পদাবলী তবু সূর্যের সম্পন্ন স্বস্তিকে,
বাজে নহবত।
কোথাও স্থগিত আছে—
অন্তরালে অপেক্ষিয়া থাকে।
যদিও চলিয়া গেছে সবগুলি পথ
ধীরে, মহাপ্রস্থানের দিকে—
তবু জানবে হৃদয়ের অন্তরালে
বহু শ্বেতপদ্ম ফুটে থাকে।

আমার স্বপ্নঃ ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বামী বিবেকানন্দ

মঞ্জুভাষ মিত্র

ক্যালিফোর্নিয়ায় আগত সন্ন্যাসিপ্রবর স্বামী বিবেকানন্দের
এক সুন্দর দুর্লভ ছবি সম্প্রতি দেখেছি। দুটি বড় বড় স্বপ্ন-দেখা চোখ
কবিদের অনুরূপ কুঞ্চিত ঈষৎ-দীর্ঘ কেশদাম, দুই ওষ্ঠপুটের
প্রগাঢ় দৃঢ়তা আমাকে আবিষ্ট করে দিল, মনে হলো যেন বিশ্বলোক
এক মহৎ কম্পনে পূর্ণ; পদ্মের ভিতরে বজ্র . মনে হলো তাঁকে—
এই দেশ সাগরচুম্বিত সূর্যের উদার আলো ঢালা, নিকটেই হলিউড—
দক্ষিণের বাগিচায় প্রাচুর্যের সুখস্বাদ আপেল আঙুর দৃশ্যময়তাকে
সুন্দর ও রসাপ্লুত করে তোলে। সুগঠন মানব-মানবী, আনন্দের কণাখুদ
এই স্থানে স্বর্ণ হয়ে ঝরে—তাকে পাওয়ার আশায় সত্তা আজ হয়েছে উন্মন
গ্রীষ্মের মরমী দুপুরবেলায় পাঠ করি ক্যালিফোর্নিয়ায় দত্ত সন্ন্যাসিভাষণ
কৃষ্ণ বলেছেনঃ 'সবলে আঁকড়ে ধর উৎসব, গ্রন্থ, রূপ-অবয়ব যাকে কাছে পাও
আন্তরিক যদি হও তুমি যদি শক্ত করে ঐ যোগসূত্র ধরে থাক, তাকে পাবে যাকে তুমি চাও
এভাবেই তুমি গৃহকোণ ছেড়ে ভ্রাম্যমাণ হবে, সুন্দরের কেন্দ্র হবে তুমি।'
একা জেগে স্বপ্ন দেখি—আমার সত্তাকে ডেকে যায় সুন্দরের স্পর্শধন্য বিদেশের ভূমি।

আকাশ ছুঁতে চেয়ে

শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

মা, তুমি বলেছিলে—তোরা পায়ের নিচে
মাটি খুঁজে নে—নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ,
তুমি বলেছিলে—অপমান আর অসম্মানের কাছে
তোরা আত্মসমর্পণ করিস না।
তোমার মেয়েরা তাই মাথা উঁচু করে
আকাশ ছুঁতে চেয়েছে
তোমার চাওয়ার সেই আকাশটা—
সেকি দিগন্তবিস্তৃত নীল? নাকি সাদা?
সেকি শুধু ঝড়ের? মেঘের আর বিদ্যুতের?
অথবা রুপোলী নক্ষত্রের?
সেই আকাশের স্বপ্নে তোমার মেয়েরা আজও
মগ্ন আছে ঘনঘোর যুদ্ধে—শুধু জানা হলো না
আজও—ঐ একটানা ধূসর আকাশটার
যথাযথ রঙটা কি!

আবহমান প্রবহমান

দেবীপ্রসাদ মৈত্র

কে বলে আকাশ অনন্ত স্থির শূন্য?
কোটি গ্রহ তারা নাচিছে গাহিছে গান,
আকাশকণার ভিতরেও সেই স্পন্দ
জড় পদার্থে জড়ো হয়ে আছে প্রাণ।
পশু পাখি কীট মানুষের কোষে রন্ধ্রে
এবং বস্তু অণু-পরমাণু ঘিরে—
যে-প্রাণপ্রবাহ অনাদিকালের ছন্দে
গতিতরঙ্গ ধ্বনিতরঙ্গ জুড়ে।
সেই তরঙ্গ আলোকজ্যোতিতে দৃশ্য,
সেই আলোকের তাপই প্রাণের শক্তি—
সৃষ্টি করেছে বিশ্বের নাভিমূলে
বস্তু ও জীবে একই প্রবাহ, সত্যি।
এ জীব যখন প্রাণবিমুক্ত, মৃত—
প্রাণাধার ক্রমে বস্তুতে পরিণতি;
পুনরায় প্রাণপ্রবাহের মূলে সেই
বস্তুকণার বিকাশোন্মুখ গতি।
বিশ্বের প্রাণ উৎসের দিকে ছুটছে—
শব্দ ও আলো—এ দুই প্রবাহে ব্যক্ত,
পঞ্চেন্দ্রিয় পার হয়ে বহুদূরে
যোগীরা যেখানে মহাপ্রাণে হয় যুক্ত।

শাশ্বত

হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী

জড়াবো বলেই যায় না জড়ানো,
ছাড়বো বলে কি ছাড়ানো যায়?
বৃথা অহমিকা ঝরানো সহজ,
হাল্কা কথাও ছড়ানো যায়॥

মাটি দিয়ে খাঁটি সরানো মানেই
বাছাই চালেতে ভরানো ধানেই।
ভাল দিলে ভাল প্রতিদানে আসে,
বিষ নিরাময়ে বিষেরে চায়॥

ঘোলা জল ঘেটে হয় ঘোলা আরও,
যদি দুধ ছানো ননী পেতে পারো।
খারাপে খারাপ সহজেই বাড়ে,
ভাল বিনিময়ে ভালরে পায়॥

অনুযোগ

প্রীতম সেনগুপ্ত

চাহিদা তো বেশি ছিল না,
ছোট্ট একটা টালির ঘর হলেও চলত।
মোটা ভাত, মোটা কাপড়,
আর কিছু গান, কিছু কবিতা।
সুন্দর স্বচ্ছ জীবন— ঈশ্বর ভরসা,
ঈশ্বরের নামে বিশ্বাস, বল।
প্রার্থনা করা, কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকা
কান্নার মধ্যে তাঁকে অনুভব করার আনন্দ।
মাঝে মাঝে বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট দর্শন,
পুণ্যাত্মাদের সঙ্গ—
আর সবের পিছনে
একান্ত একটি ঠাকুরঘর।
যেখানে আমার সবকিছু পাওয়া, না পাওয়া
চাওয়া, না চাওয়া।
ধূপ, ধুনা, কাঁসর, ঘন্টা; ফুল, ফল
ঠাকুর তাই আনন্দ করে নিতেন।
আর দৈনন্দিন জীবন হতো প্রিয়জনের
ভালবাসার চোখ দিয়ে ঢাকা...
আর কিছু তো চাই না।
চাহিদা তো কোনদিনই বেশি ছিল না।

উন্মোচিত চেতনার কূলে

সন্তোষকুমার অধিকারী

যতই ফেরাতে চাই
ভেসে যায় ডিঙি দাঁড় ভেঙে ;
জোয়ারের স্রোত নাচে উদ্দাম, উত্তাল।
পেশিতে ধরেছে টান, ব্যথা দুই হাতে,
দুই হাঁটু ভেঙে পড়ে, ক্লান্তিতে আনত দেহভার ;
চোখ জুড়ে ছানির কুয়াশা,—
হারিয়েছে দিশা, বলো, কি করে ফেরাব
স্রোত ঠেলে নাও বন্দরেতে!
নদীতে উদ্বেল ঢেউ, টলোমলো কাঁপে ডিঙি
উচ্ছ্বল স্রোতের টানে ভেসে যায়
জীবন, চেতনা।
কোথায় তীরের মাটি,
ঘূর্ণির আবর্ত শুধু নাচে
যতই দাঁড়াতে চাই ভেসে যায় স্থিতির পরিধি ;
ভেঙে যায় বৈঠা হাতে
যায় না ফেরানো নাও
উন্মোচিত চেতনার কূলে।

অনন্তের ঘরে

ব্রত চক্রবর্তী

আজ সকালে অন্তর বড় প্রীতিময়।
একটি নশ্বর সকালকে আমি
অনন্তের ঘরে পৌঁছে দেব।
মৃত্যুকে বললুম, যাও।
হাওয়া ঘাই দিয়ে আরও গভীর
হাওয়ায় চলে যাচ্ছে।
বললুম যাও, হাওয়া, সঙ্গে নাও।
একটি ফুলের গায়ে হাত দিয়ে
মনে হলো, একটি পুষ্পও যদি
রচনা করতে পারি, ধন্য হব।
কয়েকটি পুরনো মুখ শ্যাওলা সরিয়ে
জোড়া দিলুম, একদা ভেঙেছি।
রোদ্দুরের গা থেকে বিভা বের করে
একটি শালিক দিচ্ছে একটি চড়ুইকে।
আমি এই নশ্বরতা বুকে বয়ে
অনন্তের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি আজকে সকালে।
অন্তত একটি সকাল।
মৃত্যুকে বললুম—যাও।

কোন্ দিকে যাবে ?

কৃষ্ণা বসু

কোন্ দিকে যাবে ?...
দক্ষিণের দিকে যাবে নাকি তুমি ?
দক্ষিণবাহিনী নদী, তার তীরে শ্মশান রয়েছে,
সেইখানে কাপালিক আছে,
মৃত হাড়, ধূসর করোটি,
মরা পোড়ানোর কাঠ, আধপোড়া চিতাটির
নিভন্ত আগুন,
সেই আগুনের অভিশাপ আর
প্রলাপের মতো সঙ্গীহীন
বসন্ত-বাতাস ঘোরে দক্ষিণ প্রান্তরে।

শীতল উত্তর দিক টানে কি তোমায় ?
পাতালের থেকে আসে উন্মাদ বাতাস ;
শান্ত সাদা তুষার-মানব হিমচোখে
চেয়ে আছে, তোমার ভিতর অবধি নিচ্ছে দেখে
তার ঠাণ্ডা দুচোখের রঞ্জনরশ্মিতে।

তুমি কি পশ্চিমে যাবে ?
পশ্চিমের দিকে আছে ফাঁকা মাঠ, কেউ নেই,
সকলেই চলে গেছে ব্যক্তিগত উৎসবের দিকে,
কেউ বসে নেই। তোমাকে নেবে না ডেকে কেউ,
অতিথি আসনখানি কেউ দেবে না তো পেতে।
দরজা জানালা হাটখোলা, ধুলোয় ভরেছে ঘর,
বহুদিন ব্যবহারহীন ঠাণ্ডা শয্যা, বিছানা বালিশ ;
সাদা, মৃতের হাড়ের মতো সাদা ;
দূর থেকে উৎসবের বাজনা আসে ভেসে,
ওখানে তোমার কোন আমন্ত্রণ নেই,
তোমার জন্যই কেউ ভোরবেলায় কান পেতে নেই!

পূর্বদিকে যাবে ভাব ?
বহুকাল আগে তৈরি ছোটঘর,
তোমার মাঠের চেয়ে ছোট,
তোমাকে ধরবে না, পূর্বদিকে মানুষেরা আছে,
তারা সব তোমার অচেনা, ছোটঘর, মাথা নিচু করে
সেই ঘরে ঢোক যদি ...
তেমন নুয়ে পড়া কি তোমাকে মানায় ?
কোন্ দিকে যাবে তুমি ? কোন্ দিকে ?
বলো কোন্ দিকে ?...

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

বেলুড় মঠ স্থাপিত হওয়ার পর নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজী কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচার-নিষ্ঠা সর্বথা প্রতিপালিত হয় না এবং ভক্ষ্য-ভোজ্যাদির বাচ-বিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তখন সর্বত্যাগী, আব্রাহ্মণ-চন্ডালে সমদৃষ্টি, গুণত্রয়াতিক্রান্ত সন্ন্যাসিগণের কার্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। আহিরী-টোলা ঘাট হইতে বালি উত্তরপাড়ার চলতি নৌকার আরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা-তামাসা, এমন কি সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামীজীর অমল-ধবল চরিত্র আলোচনাতেও কুণ্ঠিত হইত না। নৌকায় করিয়া মঠে আসিবার কালে শিষ্যও সময়ে সময়ে ঐরূপ তীব্র সমালোচনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইত না! শিষ্যের মুখে স্বামীজী কখন কখন ঐ সকল সমালোচনা শুনিয়া বলিতেনঃ "হস্তী চলে বাজার মে, কুত্তা ভুকে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাব নহি, যব নিন্দে সংসার॥" কখনো বলিতেন ঃ "দেশে কোন নূতন ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীন-পন্থাবলম্বিগণের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্মসংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে।" আবার কখনো বলিতেনঃ "Persecution (অন্যায় অত্যাচার) না হইলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।" সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ, অশ্লীল সমালোচনাকে স্বামীজী তাঁহার নবভাবপ্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন—কখনো উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না বা তাঁহার পদাশ্রিত গৃহী বা সন্ন্যাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। পরন্তু সর্বদা সকলকে বলিতেনঃ "ফলাভিসন্ধি-হীন হয়ে কার্য করে যা, একদিন উহার ফল নিশ্চয়ই ফলবে।" স্বামীজীর শ্রীমুখে একথাও সর্বদাই শুনা যাইতঃ "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

হিন্দুসমাজের এই তীব্র সমালোচনা স্বামীজীর লীলাবসানের পূর্বেই কিরূপে অন্তর্হিত হয়, আজ সেবিষয়েই কিছু লিপিবন্ধ হইতেছে। ১৯০১ সনের জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে শিষ্য একদিন মঠে আসিয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে দেখিয়াই বলিলেনঃ "ওরে, একখানা রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব শিগ্‌গির আমার জন্য নিয়ে আসবি।"

শিষ্য—আচ্ছা, মহাশয় ; কিন্তু রঘুনন্দনের স্মৃতি—যাহাকে কুসংস্কারের ঝুড়ি বলিয়া বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া আপনি কি করিবেন?

স্বামীজী—কেন? রঘুনন্দন তদানীন্তন কালের একজন দিগ্‌গজ পন্ডিত ছিলেন—প্রাচীন স্মৃতিসকল সংগ্রহ করে হিন্দুর দেশকালোপযোগী নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবন্ধ করে গেছেন। সমস্ত বাংলাদেশ তো তাঁর অনুশাসনেই আজকাল চলছে। তবে তৎকৃত হিন্দুজীবনের গর্ভাধান হতে শ্মশানান্ত আচার-প্রণালীর কঠোর বন্ধনে সমাজ উৎপীড়িত হয়েছিল। শৌচ প্রস্রাবে—খেতে শুতে —অন্য সকল বিষয়ের তো কথাই নাই, সবাইকে তিনি নিয়মে বন্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সময়ের পরিবর্তনে সে-বন্ধন বহুকাল স্থায়ী হতে পারলে না। দেখতে পাচ্ছিস না, সর্বদেশে সর্বকালে ক্রিয়াকান্ড, সমাজের আচার-প্রণালী সর্বদাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। একমাত্র জ্ঞান-কান্ডই পরিবর্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখতে পাবি, ক্রিয়াকান্ড ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানপ্রকরণ আজ পর্যন্তও একভাবে রয়েছে। তবে তার Interpreters (ব্যাখ্যাতা) অনেক হয়েছে—এইমাত্র।

শিষ্য—আপনি রঘুনন্দনের স্মৃতি লইয়া কি করিবেন?

স্বামীজী—এবার মঠে দুর্গোৎসব করবার ইচ্ছা হচ্ছে। যদি খরচার সংকুলান হয় তো মহামায়ার পুজো করব। তাই দুর্গোৎসব-বিধি পড়বার ইচ্ছা হয়েছে। তুই আগামী রবিবারে যখন আসবি তখন ঐ পুঁথিখানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসবি। বুঝলি?

শিষ্য—যাহা আজ্ঞা।

পর রবিবারে শিষ্য রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব ক্রয় করিয়া স্বামীজীর জন্য মঠে লইয়া আসিল। গ্রন্থখানি আজিও মঠের লাইব্রেরীতে রহিয়াছে। স্বামীজী পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই খুশি হইলেন, এবং ঐদিন হইতে উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া ৪/৫ দিনেই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন। শিষ্যের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা হইবার পর বলিলেনঃ "তোর রঘুনন্দনের স্মৃতি সব পড়ে ফেলেছি। যদি পারি তো এবার মাকে রুধির দিয়ে পুজো করব। রঘুনন্দনও বলেছেনঃ 'নবম্যাং পুজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্'।"

শিষ্যের সহিত স্বামীজীর উপরোক্ত কথাগুলি ৮পূজার দুই-তিন মাস পূর্বে হয়। পরে ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথাই মঠের কাহারও সহিত কহেন নাই। পরন্তু তাঁহার ঐ সময়ের চাল-চলন দেখিয়া শিষ্যের মনে হইত যে, তিনি ঐ সম্বন্ধে আর কিছুই ভাবেন নাই। পুজার ১০/১২ দিন পূর্ব পর্যন্তও মঠে যে প্রতিমা আনয়ন করিয়া এ বৎসর পুজা হইবে, একথার কোন আলোচনা বা পুজা সম্বন্ধে কোন আয়োজন শিষ্য মঠে দেখিতে পায় নাই। স্বামীজীর জনৈক গুরুভ্রাতা ইতিমধ্যে একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, মা দশভুজা গঙ্গার উপর দিয়া দক্ষিণেশ্বরের দিক হইতে মঠের দিকে আসিতেছেন! পরদিন প্রাতে স্বামীজী মঠের সকলের নিকট পুজা করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলে তিনিও তাঁহার নিকট স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। স্বামীজীও তাহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেনঃ "যেরূপে হোক এবার মঠে পুজা করিতেই হইবে।" তখন পুজা করা স্থির হইল এবং ঐদিনই একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া স্বামীজী, স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল বাগবাজারে চলিয়া আসিলেন; অভিপ্রায়—বাগবাজারে অবস্থিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া তাঁহার ঐবিষয়ে অনুমতি এবং তাঁহারই নামে সংকল্প করিয়া ঐ পুজা সম্পন্ন হইবে, ইহাই প্রার্থনা করা। কারণ, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের কোনরূপ পুজা বা ক্রিয়া 'সংকল্প' করিয়া করিবার অধিকার নাই।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী স্বীকৃতা হইলেন এবং মঠের পুজা তাঁহারই নামে 'সংকল্পিত' হইবে, স্থির হইল। স্বামীজীও ঐজন্য বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ঐদিনেই কুমারটুলিতে প্রতিমার বায়না দিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বামীজীর পুজা করিবার কথা সর্বত্র প্রচারিত হইল এবং ঠাকুরের গৃহীভক্তগণ ঐকথা শুনিয়া ঐবিষয়ে আনন্দে যোগদান করিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপরে পুজোপকরণ সংগ্রহের ভার পড়িল। কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী পুজক হইবেন স্থির হইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতৃদেব সাধকাগ্রণী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তন্ত্রধারক-পদে ব্রতী হইলেন। মঠে আনন্দ ধরে না। যে-জমিতে এখন ঠাকুরের জন্মমহোৎসব হয় সেই জমির উত্তর ধারে মণ্ডপ নির্মিত হইল। ষষ্ঠীর বোধনের পূর্বদিনে কৃষ্ণলাল, নির্ভয়ানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ নৌকা করিয়া মায়ের প্রতিমা মঠে লইয়া আসিলেন। ঠাকুরঘরের নিচের তলায় মায়ের মূর্তিখানি আনিয়া রাখিবামাত্র যেন আকাশ ভাঙিগয়া পড়িল—অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ হইতে লাগিল। মায়ের প্রতিমা নির্বিঘ্নে মঠে পৌঁছিয়াছে, এখন জল হইলেও কোন ক্ষতি নাই ভাবিয়া স্বামীজী নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের যত্নে মঠ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। পুজোপকরণের কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই দেখিয়া স্বামীজী আনন্দে অধীর হইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মঠের দক্ষিণের বাগানবাটীখানি, যাহা পূর্বে নীলাম্বরবাবুর ছিল, একমাসের জন্য ভাড়া করিয়া পুজার পূর্বদিন হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে আনিয়া রাখা হইল। অধিবাসের সান্ধ্যপুজা স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরের

সম্মুখস্থ বিল্বমূলে স্বামীজীর আদেশানুসারে সম্পন্ন হইল। তিনি ঐ বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া পূর্বে একদিন যে-গান গাহিয়াছিলেন—"বিল্ব-বৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন" ইত্যাদি, তাহা এতদিনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অনুমতি লইয়া ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ সপ্তমীর দিনে পূজকের আসনে উপবেশন করিলেন। কৌলাগ্রণী তন্ত্রমন্ত্রকোবিদ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আদেশে সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্বাহিত হইল। কেবল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অনভিমত বলিয়া মঠে
হইল না। বলির অনুকল্পে স্তূপীকৃত মিষ্টান্নের রাশি প্রতিমার উভয়পার্শ্বে শোভা পাইতে লাগিল।

গরিব দুঃখী কাঙ্গাল দরিদ্রদিগকে দেহধারী ঈশ্বরজ্ঞানে পরিতোষ করিয়া ভোজন করান এই পূজার প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বেলুড়, বালি ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তদবধি মঠের প্রতি তাঁহাদের পূর্ববিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া তাঁহাদের ধারণা জন্মে যে, মঠের সন্ন্যাসীরা যথার্থ হিন্দুসন্ন্যাসী।

সে যাহাই হউক, মহাসমারোহে দিনত্রয়ব্যাপী মহোৎসবকল্লোলে মঠ মুখরিত হইল। নহবতের সুললিত তান-তরঙ্গ—গঙ্গার পরপারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাক-ঢোলের রুদ্রতালে কলনাদিনী ভাগীরথী নৃত্য করিতে লাগিল। "দীয়তাং নীয়তাং ভোজ্যতাং"—এই কথা ব্যতীত মঠবাসী সন্ন্যাসিগণের মুখে ঐ তিনদিন আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যে-পূজায় সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী স্বয়ং উপস্থিত, যাহা স্বামীজীর সংকল্পিত, দেহধারী দেবসদৃশ মহাপুরুষগণ যাহার কার্যসম্পাদক, সে-পূজা যে অচ্ছিদ্র হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? দিনত্রয়ব্যাপী পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। গরিব দুঃখীর ভোজনতৃপ্তিসূচক কলরবে মঠ এই তিনদিন পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

মহাষ্টমীর দিন রাত্রে স্বামীজীর সামান্য জ্বর হইয়াছিল। সেজন্য তিনি ঐদিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু সন্ধিক্ষণে উঠিয়া তিনি জবাবিল্বদলে মহামায়ার শ্রীচরণে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। নবমীর দিন তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব নবমীরাত্রে যেসকল গান গাহিতেন, তাহার দুই-একটি স্বয়ং গাহিয়াও ছিলেন। মঠে সে-রাত্রে আনন্দের তুফান বহিয়াছিল।

দশমীর দিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বারা যজ্ঞ দক্ষিণান্ত করা হইল। যজ্ঞের ফোঁটা ধারণ করিয়া স্বামীজী সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সংকল্পিত পূজা সমাধা করিয়া স্বামীজীর মুখমণ্ডল দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দশমীর দিন সন্ধ্যান্তে মায়ের প্রতিমা গঙ্গাতে বিসর্জন করা হইল এবং তৎপরদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও স্বামীজী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে আশীর্বাদ করিয়া বাগবাজারে পূর্বাবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

দুর্গোৎসবের পর স্বামীজী মঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্যামাপূজাও প্রতিমা আনাইয়া ঐ বৎসর যথাশাস্ত্র নির্বাহিত করেন। ঐ পূজাতেও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তন্ত্রধারক এবং কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজক ছিলেন।

শ্যামাপূজান্তে স্বামীজীর জননী মঠে একদিন বলিয়া পাঠান যে, বহু পূর্বে স্বামীজীর বাল্যাবস্থায় তিনি 'মানত' করিয়াছিলেন যে, একদিন স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটে গিয়া মহামায়ার পূজা দিবেন। অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে স্বামীজীর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলেও মাতার নিরতিশয় অনুরোধে তিনি একদিন কালীঘাটে যাইতে স্বীকৃত হন। নিজ জননীর সহিত কালীঘাটে পূজা দিয়া মঠে ফিরিয়া আসিবার দিনে শিষ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তথায় কিভাবে পূজাদি দেন, তাহাও শিষ্যকে বিশেষভাবে বলেন। সাধারণের অবগতির জন্য তাহাও এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

স্বামীজী বলিয়াছিলেন, ছেলেবেলায় তাঁহার

একবার বড় অসুখ করে। তখন তাঁহার জননী মানত করেন যে, স্বামীজী ভাল হইলে কালীঘাটে তাঁহাকে লইয়া যাইয়া মায়ের বিশেষ পূজা দিবেন ও শ্রীমন্দিরে তাঁহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইয়া লইয়া আসিবেন। ঐ 'মানতের' কথা এতকাল কাহারও মনে ছিল না। স্বামীজীর অসুখ করায় ইদানীং তাঁহার গর্ভধারিণীর ঐকথা স্মরণ হয় এবং তাঁহাকে ঐকথা বলিয়া কালীঘাটে লইয়া যান। কালীঘাটে যাইয়া স্বামীজী কালীগঙ্গায় স্নান করিয়া মাতার আদেশে আর্দ্রবস্ত্রে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীকালীমাতার পাদপদ্মের সম্মুখে গড়াগড়ি দেন। তৎপরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। পরে নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। অমিত বলবান তেজস্বী সন্ন্যাসীর সে-যজ্ঞসম্পাদন দর্শন করিতে মায়ের মন্দিরে সেদিন খুব ভিড় হইয়াছিল। শিষ্যের এক বন্ধু কালীঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি শিষ্যের সঙ্গে বহুবার স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিয়াছিলেন, স্বামীজীর ঐ যজ্ঞ স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুনঃ পুনঃ ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া সেদিন স্বামীজী দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন বলিয়া গিরীন্দ্রবাবু আজিও বর্ণন করিয়া থাকেন।

মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীজী শিষ্যের সঙ্গে দেখা হইবার পর তাহাকে বলিয়াছিলেনঃ "কালীঘাটে এখনও কেমন 'উদার' ভাব দেখলুম। আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত 'বিবেকানন্দ' বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই দেননি। বরং পরম সমাদরে আমাকে মন্দির-মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজা করতে সাহায্য করেছিলেন।"

জীবনের শেষভাগে স্বামীজী এইরূপে হিন্দুর অনুষ্ঠেয় পূজা-পদ্ধতির প্রতি আন্তরিক ও বাহ্যিক বহু মান্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা স্বামীজীকে কেবল একজন বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া নির্দেশ করেন এই পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহাদিগের ভাবিবার বিষয়। "আমি শাস্ত্রমর্যাদা নষ্ট করিতে আসি নাই—পূর্ণ করিতেই আসিয়াছি"—"I have come to fulfil and not to destroy"—উক্তিটির সফলতা স্বামীজী নিজ জীবনে বহুধা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তকেশরী শ্রীশঙ্করাচার্য বেদান্তনির্ঘোষে ভূলোক কম্পিত করিয়াও যেমন হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই—বহুবিস্তার স্তবস্তুতি রচনা করিয়াছিলেন, স্বামীজীও যে তদ্রূপ পূর্বোক্ত অনুষ্ঠান-সকলের দ্বারা হিন্দুধর্মের প্রতি বহুমান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বাগ্মিতায়, শাস্ত্রব্যাখ্যায়, লোককল্যাণকামনায়, সাধনায় ও জিতেন্দ্রিয়তায় স্বামীজীর তুল্য সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী মহাপুরুষ বর্তমান শতাব্দীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ বংশাবলী ইহা ক্রমে বুঝিতে পারিবে। আমরা তাঁহার সঙ্গ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এই শঙ্করোপম স্বামীজীকে বুঝিবার জন্য আমরা জাতিবর্ণনির্বিশেষে জগতের যাবতীয় নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। জ্ঞানে শঙ্কর, সহৃদয়তায় বুদ্ধ, ভক্তিতে নারদ, ব্রহ্মজ্ঞতায় শুকদেব, তর্কে বৃহস্পতি, রূপে কামদেব, সাহসে অর্জুন এবং শাস্ত্রজ্ঞানে ব্যাসতুল্য স্বামীজীর সম্পূর্ণতা বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীস্বামীজীর জীবনই যে বর্তমান যুগে আদর্শরূপে একমাত্র অবলম্বনীয় তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। এই মহাসমন্বয়াচার্যের সর্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যার তমোভিন্ন কিরণজালে সসাগরা ধরা আলোকিত হইয়াছে। চক্ষু থাকে তো পূর্বাকাশে এই তরুণারুণচ্ছটা দর্শন করিয়া জাগ্রত হও। প্রাণ থাকে তো এই স্পন্দন অনুভব কর। আমরা স্বামীজীর দাসানুদাস। তাঁহার শ্রীমূর্তি অনুধ্যান করিতে করিতে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ভূয়োভূয়ঃ মস্তক অবনত করিতে করিতে জীবনলীলা সাঙ্গ করিতে পারি তো নরজন্ম সার্থক বলিয়া মনে করিব! * □

* উদ্বোধন, ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩১৮, পৃঃ ৫৭৭-৫৮৩

মাধুকরী

দুর্গাপূজা

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শরতে বাংলায় দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। এই পূজা কাহার পূজা? হিন্দু সেই দুর্গাদেবীর প্রতীকরূপে প্রতিমা গড়ে, আর সেই প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া তাহার উপাস্য দেবতাকে এই বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেঃ

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

—মা গো! তুমি অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবী শক্তি! অতএব তুমিই এই বিশ্বের বীজস্বরূপা পরমা মায়া! হে দেবি, এই চরাচরবিশ্বে যাহাকিছু আছে, তুমিই তাহাদিগের সমস্তকেই সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছ, তুমি যদি প্রসন্না হও, তাহা হইলে তুমিই এই মোহগর্ত হইতে মুক্তির হেতুস্বরূপ হইয়া থাক।

তাহার পর আবার সেই প্রতিমাকে প্রণতি-পূর্বক বলিয়া থাকেনঃ

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥

—অষ্টাদশ বিদ্যা উপনিষদাদি ব্রহ্মজ্ঞানোদ্দীপক শাস্ত্র অন্ধকার-নাশক। প্রদীপের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকার-নাশক বিবেক এবং আদি বাক্য বেদ থাকিলেও আপনি ভিন্ন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এই নিবিড় অন্ধকারময় মমতাপূর্ণ গর্তে (মহাবিলে) আর কে বারবার ঘুরাইতে সমর্থ হইয়া থাকেন?

ইহার বিস্তৃত অর্থ এই যে, মনুষ্যগণ নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নির্মল বিবেকবুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করিলেও, বেদাদি অধ্যয়ন করিলেও তোমারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মমতা-বুদ্ধি পরিহার করিতে সমর্থ হয় না। কাজেই তাহারা এই মোহান্ধকারময় সংসারচক্রে বারংবার পরিভ্রমণ করিতে থাকে, কিছুতেই এই মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ জীব স্বশক্তিতে এই মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারে না, তবে যদি তুমি কৃপা কর, তাহা হইলেই জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে। অর্থাৎ তোমারই কৃপা এই মায়াময় সংসার হইতে জীবের নিস্তার পাইবার একমাত্র হেতু।

এখন মনে স্বতই এক প্রশ্ন উদিত হয়, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই স্তব করা হইতেছে? ঐ স্তবেই এক স্থানে বলা হইয়াছেঃ

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

—তুমি সৃষ্টিকার্যে পালনকার্যে এবং সংহারকার্যে শক্তিরূপেই আত্মপ্রকাশ করিতেছ। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে; তুমি ত্রিগুণময়ী ও সনাতনী। তোমাকে নমস্কার।

সুতরাং এই পূজা শক্তিরই পূজা। এই শক্তি কাহার শক্তি? হিন্দু কিজন্য তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে?

এ-শক্তি পরমব্রহ্মেরই শক্তি। ব্রহ্মই এই বিশ্বের আদি সত্তা। তিনি চৈতন্যস্বরূপ এবং অদ্বিতীয়। গোড়ায় তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাঁহার সত্তামাত্র আমরা অনুভব করিতে পারি, কিন্তু তিনি কিরূপ, তাহা আমরা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করিতে (comprehend) পারি না। যিনি অসীম বা অনন্ত, তাঁহাকে সসীম বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করাই সম্ভবে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তিনি বাক্য এবং মনের অতীত। সেই পরব্রহ্মের যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল,

তখন তিনি তাঁহা হইতেই শক্তির আবির্ভাব করিয়া দিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য এইরূপঃ

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥

—মাকড়সা যেমন অন্য কোন উপাদানের বা নিমিত্তের সহায়তা ব্যতিরেকে স্বীয় দেহ হইতেই সূত্রাদি সৃষ্টি করে, ধরিত্রী যেমন নিজ দেহ হইতে উদ্ভিজ্জাদি বিকাশিত করিয়া থাকেন, মনুষ্যের দেহ হইতে যেমন কেশ ও লোম উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই পরব্রহ্ম আপনা হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্র বলিতেছেনঃ

উর্ণনাভাদ্ যথা তন্তুর্জায়তে চেতনাজ্জড়ঃ।
নিত্যপ্রবন্ধাৎ পুরুষাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিস্তথা ॥

—মাকড়সা হইতে যেমন লূতাতন্তু জন্মে, সেইরূপ চৈতন্য হইতেই জড়বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেইরূপ নিত্যপ্রবন্ধ ব্রহ্মপুরুষ হইতে প্রকৃতি আবির্ভূত হইয়াছেন।

এই প্রকৃতির মূলেই শক্তি। শক্তি ব্রহ্ম হইতেই বহির্গত। তবে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতে শক্তি (energy) জড়। হিন্দুরা বলেন, শক্তিও চৈতন্যময়ী বা চৈতন্যরূপিণী। হিন্দু এই শক্তির পূজা করে কেন? পরব্রহ্ম হইতে যে-শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই আদ্যাশক্তি। যিনি অনন্তের অংশ তিনিও অনন্ত, সুতরাং মানুষ সেই অনন্ত শক্তিকেও ধারণা করিতে সমর্থ নহে। সেই আদ্যাশক্তি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্রহ্মা রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু সত্ত্বগুণ দ্বারা প্রতিপালন করেন এবং শিব তমোগুণ দ্বারা সংহারকার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং ইঁহারা গুণময়ী প্রকৃতি হইতে জাত বলিয়া গুণময়। ব্রহ্মাতে রজোগুণের আধিক্য, বিষ্ণুতে সত্ত্বগুণের আধিক্য এবং শিবে তমোগুণের আধিক্য। প্রত্যেকেরই এক-একটি শক্তি আছে, সেই শক্তির সহায়তায় তিনি স্বীয় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং এই বিশ্ব-ব্যাপারে শক্তিই সব। সকল শক্তিই আদ্যাশক্তি হইতে উদ্ভূত। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, ঐ সকল শক্তিকে পরিচ্ছিন্নভাবে কল্পনা করা যাইতে পারে। সেই জন্য সেই সকল শক্তিই মানবের ধ্যান-ধারণার মধ্যে আসে। হিন্দু সেই পরিচ্ছিন্ন শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই মহাশক্তির পূজা করিয়া থাকে।

মানুষ পদে পদে সাক্ষাৎভাবে শক্তির সহিত পরিচিত হইয়া থাকে। এই জগতে কোথায় শক্তি নাই, সর্বত্রই তো শক্তির খেলা—শক্তির লীলা। প্রভঞ্জনের প্রমত্ত তাণ্ডবে, জলধির প্রবল তরঙ্গ-তাড়নে, বৈশ্বানরের প্রলয়-হুঙ্কারে, অশনির ভৈরব আরাবে, ধরিত্রীর সর্বগ্রাসী কম্পনে যেমন শক্তির প্রচণ্ড প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গমে, বৃক্ষলতা হইতে নবকিশলয়-বিকাশে, তরঙ্গিণীর তরলিত কলনাদে, বিহঙ্গের শ্রুতিমধুর কূজনে, মাতঙ্গের বৃংহণে, পতঙ্গের পক্ষ সঞ্চালনেও শক্তির লীলা প্রকট দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তি নাই কোথায়? দিগ্‌দাহী মহামরুস্থলীতে, চিরতুহিনাবৃত মেরু-প্রদেশে, দুরারোহ পর্বতকন্দরে, দুরবগাহ সাগরগর্ভে, সিংহশার্দূল সমাকুল বনকান্তারে, আকাশে, বাতাসে, মহাশূন্যে সর্বত্রই শক্তির খেলা। শক্তিহীন হইয়া কোন কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। জীবের সকল চেষ্টাই শক্তির অধীন। সুতরাং শক্তির সহিতই মানবের, বুদ্ধিমান জীবমাত্রেরই পরিচয় অবশ্যম্ভাবী। এই শক্তির ক্রোড়েই জীব আবির্ভূত এবং লালিত-পালিত। তাই হিন্দু এই শক্তিকেই জগজ্জননী বলিয়া পূজা করে। ধূম দেখিয়া যেমন অগ্নির অস্তিত্ব অনেক সময় অনুমান করা হয়, সেইরূপ এই শক্তি দেখিয়াই শক্তিমান ব্রহ্মের অনুমান করা হইয়া থাকে। সৃষ্টি দেখিয়াই তো স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। তাই শক্তিকে ধরিয়াই সর্ব-শক্তিমানের সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা পাইতে হয়। তান্ত্রিকরা সেইজন্য বলিয়া থাকেন, বাবাকে পাইতে বা চিনিতে হইলে মায়ের কৃপা লাভ করিতে হয়। সেই মায়ের কৃপালাভার্থই শক্তির উপাসনা।

যেখানেই শক্তির প্রকাশ, সেখানেই সেই শক্তিকে আবেষ্টন করিয়া শক্তির আরাধনা করা

যাইতে পারে। জলে-স্থলে, অনলে-অনিলে, কেদারে-কান্তারে, আকাশে-বাতাসে যখন শক্তির বিকাশ, তখন উহার যেকোন কিছু ধরিয়াই শক্তির আরাধনা করা সম্ভবে। কিন্তু যেক্ষেত্রে দৈবী শক্তির বিশেষ বিকাশ হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে প্রকট শক্তিকে ধরিয়া মহাশক্তির আরাধনা করিলে সেই আরাধনা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়া থাকে, মায়ের কৃপা শীঘ্র লাভ করা যায়। তাই মহাশক্তি যখন মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তখনকার সেই মূর্তিই,—সেই দুর্গামূর্তিই হিন্দু পূজা করিয়া থাকেন।

দুর্গামূর্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ বর্ণনা আছে ঃ

একদা মহিষাসুর প্রবল হইয়া দেবগণকে পরাজিত এবং ইন্দ্রত্ব লাভ করে। পাশব শক্তি প্রবল হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয়। পরাজিত দেবগণ তখন ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া বিষ্ণু ও শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। মহিষাসুরের আচরণের কথা শুনিয়া বিষ্ণুর এবং শিবের ক্রোধ জন্মে। তখন তাঁহাদের দুই জনের বদন হইতে মহৎ তেজ আবির্ভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের দেহ হইতে তেজ নির্গত হইয়াছিল। তখন দেবতারা দেখিতে পাইলেন যে, সেই তেজোরাশি শিখা দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া প্রজ্বলিত পর্বতের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। অনন্তর সেই তেজঃসমূহ সম্মিলিত হইয়া এক নারীমূর্তি পরিগ্রহ করে। সেই নারীমূর্তিই দুর্গা। তিনি স্বীয় প্রভাবে মহিষাসুরকে বধ করিয়া দেবতাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হিন্দু সেই নারীমূর্তিরই পূজা করিয়া থাকেন। মহাশক্তি যে-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পশুবলকে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন, ইহা সেই মূর্তিরই পূজা।

এখন হিন্দুর পূজা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। অন্যান্য জাতির পূজা হইতে হিন্দুর পূজার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। হিন্দু যে-দেবতার পূজা করে, সেই দেবতাকে তাহার প্রতিমায় যে কেবল প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা আকর্ষণ করে তাহা নহে, অধিকন্তু একটা বিশিষ্ট ভাবের দ্বারাই সেই দেবতাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। একই দেবতার প্রতিমায় সকলে একই ভাবে তাঁহাদের ইষ্টদেবতাকে আকর্ষণ করেন না। অধিকারভেদে ভিন্ন ব্যক্তি একই প্রকারের দেবপ্রতিমায় বিভিন্ন ভাবে একই দেবতাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য কি, তাহা অগ্রে বলা আবশ্যক। প্রথমে দেবতার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতেই হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাহাদের অধিকার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সেই সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। যথা, শাস্ত্র বলিতেছেনঃ "আদৌ সম্বন্ধসংস্কারঃ কর্তব্যো-হতিপ্রযত্নতঃ।" অর্থাৎ গোড়ায় আরাধ্য দেবতার সহিত বিশেষ যত্ন সহকারে একটা সম্বন্ধসংস্কার বা সম্বন্ধবুদ্ধি স্থাপনা করিতে হইবে। অর্থাৎ পার্থিব ব্যাপারে আমাদের পরিবারের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের যেরূপ এক-একটা সম্বন্ধ আছে, ঠিক সেইরূপ কোন একটা সম্বন্ধ আরাধ্য দেবতার সহিত পাতাইতে হয়। উহা অতীব যত্নের সহিত করিতে হয়, তাহার কারণ, সকলে একই ভাবে সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। অধিকারভেদে, নিজ নিজ প্রকৃতিভেদে সেসম্বন্ধের ভিন্নতা ঘটে। কারণ, শাস্ত্র বলিতেছেন ঃ

স চ যোঢ়া ভবেৎ রাজন্। মাতৃত্বাদিবিভেদতঃ।
মাতৃত্বং জনকত্বঞ্চ প্রভুত্বং সখিতা তথা॥
কান্তভাবোঽপত্যভাব ইত্যেবং ষড়্‌বিধো মতঃ।
যস্মিন্ যেনাধিকঃ স্নেহো মাত্রাদিষ্বনুভূয়তে॥
স চ তেনৈব ভাবেন যোজয়েৎ পরদেবতাম্॥
সদা তদ্ভাবনিয়তস্তদ্ধেতুপরিচিন্তকঃ॥
দৃঢ়ীকুর্যাৎ তথাভাবং যথাদৃষ্টসুতাদিষু॥
এবং কৃতোঽধিকারঃ স্যাৎ পূজায়াং নরপুঙ্গব।
পূজা চ তৎ স্নেহভাবাৎ পরিচর্যাদিকা ক্রিয়া।

—পূজকের সহিত আরাধ্য দেবতার মাতৃত্বাদিভেদে ছয় প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। যথা—মাতৃসম্বন্ধ, পিতৃসম্বন্ধ, প্রভু-সম্বন্ধ, সখিতাসম্বন্ধ, স্বামিসম্বন্ধ আর অপত্যসম্বন্ধ—এই ছয়টি সম্বন্ধ। এই ছয়টি সম্বন্ধ মধ্যে যাঁহার প্রকৃতিতে যে-ভাব সর্বাপেক্ষা

প্রবল, তিনি সেই ভাব লইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। অর্থাৎ যাঁহার মনে মাতৃভাব বা মাতৃভক্তি প্রবল, সেই সাধক তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে মাতৃভাবে সাধনা করিবেন; যাঁহার কন্যাভাব প্রবল, তিনি কন্যাভাবেই তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে পূজা করিবেন। স্ত্রীদেবতাকে এই দুই ভাবেই পূজা করিতে হয়। পুরুষদেবতাকে পিতৃভাবে, প্রভুভাবে, স্বামিভাবে অথবা পুত্রভাবে পূজা করা বিধেয়। যাঁহার পিতৃভক্তি প্রবল সেই সাধক পিতৃভাবে, যাঁহার প্রভুভক্তি প্রবল সেই সাধক প্রভুভাবে, যাঁহার স্বামিভক্তি প্রবল সেই সাধক স্বামিভাবে এবং যাঁহার পুত্রস্নেহ প্রবল তিনি পুত্রভাবে তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে দেখিয়া সেই ভাবে তাঁহার পূজা বা সেবা করিবেন। যাঁহার মনে বা প্রকৃতিতে যে-ভাব খুবই প্রবল, তিনি সেইভাবে সর্বদা নিরত থাকিয়া এবং সেই ভাবটির বিষয় বারবার চিন্তা করিয়া সুতাদির প্রতি সেই ভাব যেরূপ প্রকাশ পায়, তাহা আরও দৃঢ় বা প্রবল করিয়া তুলিবেন। এই প্রকারে ভাব-বিশেষকে দৃঢ় করিলে তবে পূজায় অধিকার জন্মিবে। তখন সেইরূপ স্নেহভাব এবং তদনুরূপ সেবার দ্বারা সাধক তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে পূজা করিবেন। প্রতিমায় বিভিন্ন সাধকের ভাবগত বৈষম্য হেতু একই প্রতিমায় অনেক সময় সকলের পূজা করা সমীচীন নহে।

দুর্গাদেবীকে সাধকগণ দুইভাবে পূজা করিয়া থাকেন। কেহ মাতৃভাবে আর কেহ কন্যাভাবে দেবীকে পূজা করিয়া থাকেন। উভয় পূজার মধ্যে ভাবগত পার্থক্য বিদ্যমান। সংসারে জননী সন্তানের জন্য কষ্ট করেন, কত যন্ত্রণা সহেন, তাহা মাতৃভক্তিসম্পন্ন পুত্র সকল সময়েই বুঝে। তাই তাহার হৃদয় মাতৃভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়। সে মা-পাগলা ছেলে হইয়া দাঁড়ায়। মাকে খাওয়াইতে, মাকে পরাইতে পারিলেই সেই ছেলের যেমন সুখ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। সে ভাল বস্তু পাইলে মায়ের জন্যই তাহা সংগ্রহ করে। সেইরূপ যিনি মাতৃভাবে পরদেবতার সাধনা করেন, তাঁহার মনে সদাই এই ভাব জাগ্রত থাকে যে, জগদম্বা আমাকে সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিতেছেন। আমার প্রতি তাঁহার দয়া অসীম, স্নেহ অপার। তিনি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই। তিনিই আমাকে সকল বিপদ, সকল দুঃখ, সকল আপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন। তাঁহার এই অপার স্নেহের জন্য সংসারে আমি টিকিয়া আছি। অতএব পৃথিবীতে যাহা কিছু ভাল দ্রব্য আছে, আমি তাহাই এই পরা জননীকে নিবেদন করিয়া দিব এবং আমি প্রসাদরূপে তাঁহারই ভুক্তাবশেষ খাইব। সন্তান-রূপী ভক্তের তৃপ্তির জন্য দেবতাকে শয্যাদি দান প্রভৃতির ব্যবস্থা সেইজন্য বিহিত আছে। পার্থিব জননীর সেবা যে-প্রকারে করিতে হয়, মাতৃভাবের সাধক সেই প্রকারেই দুর্গাদেবীর সেবা করিয়া থাকেন। শিশু মায়ের নিকট যাইলে যেমন তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, সে মাতৃভাব-সুধায় গলিয়া যায়, মাতৃভাবের সাধক সেইরূপ তাঁহার পরদেবতার উপাসনাকালে সংসারের সকল জ্বালা ভুলিয়া ভক্তিরসে গলিয়া যান।

কিন্তু কন্যাভাবের সাধনা স্বতন্ত্ররূপ। যাহার কন্যার উপর মমতা সর্বাপেক্ষা প্রবল, তাহার হৃদয় যেমন কন্যাকে দেখিলে আনন্দে আপ্লুত হয়, কন্যার আব্দার ও অত্যাচার সে যেমন অম্লান-বদনে সানন্দে সহ্য করে, কিসে কন্যা সুখী হইবে সেই ভাবনাই যেমন সকল সময়ে ভাবিতে থাকে, সেইরূপ যে-ব্যক্তি কন্যাভাবের সাধক সে সংসারের সকল জ্বালা, সকল দুঃখ, সকল প্রতিকূলতা সহ্য করিয়া আনন্দ সহকারে জগদম্বার সেবা করিয়া থাকে। তাহার সেবা নিঃস্বার্থ। মায়ের নিকট যেমন কিছু পাইয়াছে এবং পাইবে বলিয়া সন্তান প্রসূতির নিকট কৃতজ্ঞ থাকে—কন্যার কাছে পিতা-মাতার তেমন কৃতজ্ঞ হইবার কোন কারণ জন্মে না। কন্যার সেবা কেবল বাৎসল্যের খাতিরে। প্রতিদান পাইবার আশাশূন্য সেই সেবা। আত্মতৃপ্তির জন্য সেবা,—মন সেবা করিতে চাহে বলিয়া সেবা। কন্যা স্বামিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিলে পিতার কত আনন্দ! পিতা-মাতার যতদূর শক্তি, ততদূর ভাল ভাল জিনিস আনিয়া কন্যাকে দিয়া তৃপ্তি

লাভ করেন। আবার কন্যার স্বামিগৃহে যাইবার সময় সেই বিজয়ার দিন সেকালের প্রথায় কন্যা পাঠাইবার মতো পান্তাভাত, কচুশাক প্রভৃতি খাওয়াইয়া পাঠানো হয়; গৃহকর্ত্রী কাঁদিয়া মাটি ভিজায়, আবার যাইবার সময় দুর্গার কানে কানে জননীর ন্যায় বলিয়া দেন: "আর কাঁদিসনে মা, আবার সম্বৎসর পরে তোকে আনিব।" এই কন্যাভাবের সাধনা বড়ই কঠিন। মাতৃভাবের সাধক যেমন মায়ের নিকট আব্দার করিতে পারেন, বর প্রার্থনা করিতে পারেন, কন্যাভাবের সাধক তাহা ঠিক পারেন না। তিনি জানেন যে, কন্যা তাঁহার সর্বশক্তিশালিনী, কিন্তু তথাপি কন্যার সেবাতেই তাঁহার অপার আনন্দ। কন্যার নিকট কিছু চাহিতে নাই, কর্তব্যবোধে কন্যাকেই দিতে হয়। সুতরাং ভাবরসের পার্থক্য কোথায়, পাঠক তাহা ভাবিয়া দেখুন। মাতৃভাব ও কন্যাভাব উভয়ভাবই নিষ্কাম হইতে পারে, কিন্তু কন্যাভাব স্বতঃস্ফূর্ত ও পরিণামের প্রতি দৃষ্টিহীন।

এইভাবে বাহ্যপূজারই অঙ্গীভূত সকল দেবতাকে সমানভাবে পূজা করা যায় না। যথা—শিবকে কেবল পিতৃভাবেই বা স্বামিভাবেই, বালগোপালকে কেবল পুত্রভাবেই পূজা করিতে হয়। এইরূপ কতগুলি দেবতাকে কতগুলি বিশেষ বিশেষ ভাব ধরিয়া পূজা করিতে হয়। সকল দেবতার সকল ভাব ফুটাইয়া তোলা যায় না। সে-সকল বিষয় বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে।

বাহ্যপূজায় প্রতিমা বা প্রতীকের প্রয়োজন। অধিকারভেদে সে-প্রতিমারও তারতম্য আছে। যথা—

শালগ্রামে জলে বাঽপি প্রতিমায়াং ঘটেপটে
যন্ত্রে বা যন্ত্রপুষ্পে বা লিঙ্গে বাঽপি প্রপূজয়েৎ ॥
কুমার্য্যাং বাঽপি পীঠে বা মন্ত্রে বা কবচেঽপি বা।
গুরৌ বা গুরুশক্ত্যাম্বা পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ॥

—সাধকগণ শালগ্রামশিলায়, জলে, প্রতিমায়, প্রতিষ্ঠিত ঘটে, পটে, যন্ত্রে, যন্ত্রপুষ্পে, শিবলিঙ্গে, মহাপিঠ এবং উপপীঠাদিতে, মন্ত্রে, কবচে, গুরুতে অথবা গুরুপত্নীতে দেবতাবুদ্ধি স্থাপনা করিয়া তাহাকেই অবলম্বনপূর্বক উপহারাদির দ্বারা অর্চনা করিবে, ইহা বাহ্যপূজারই অঙ্গ।

এই বাহ্যপূজাই আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম সোপান। * □

* মাসিক বসুমতী, ১১শ বর্ষ ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ১০৬২-১০৬৪

সংগ্রহ: আলপনা ভট্টাচার্য

প্রবন্ধ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তবচতুষ্টয়

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

শক্তিসাধনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিশেষ করিয়া এই বঙ্গভূমিতে শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা উপলক্ষে সর্বত্র চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে এবং তাহা এই পূজার অপরিহার্য অঙ্গ। সেই কারণেই মনে হয় চণ্ডীর অপর একটি নাম দুর্গা-সপ্তশতী। আমরা বাঙালীরা যেমন চণ্ডীপাঠ বলিয়া থাকি, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তনিবাসীরা ইহাকে দুর্গা-পাঠ বলিয়া থাকেন। অনেক সময় অশুভ নিবারণের জন্য, রোগাদি প্রশমনের জন্যও চণ্ডী-পাঠ করানো হইয়া থাকে। দেবী শক্তিস্বরূপিণী, সুতরাং তিনি প্রসন্না হইলে তাঁহার শক্তিদ্বারা সমস্ত অমঙ্গল নিবারণ করিয়া দিতে পারেন—এই বিশ্বাসেই চণ্ডীপাঠ করা হয়।

আমাদের পুরাণে নানা দেব-দেবীর বর্ণনা, তাঁহাদের স্বকীয় মহিমা-কীর্তন, পূজার্চনার প্রক্রিয়া-বর্ণন সব দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে সেইসব দেব-দেবীর নামে নানা পুরাণ চিহ্নিত হইয়া আছে। যেমন বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, দেবীপুরাণ ইত্যাদি। কখনও কখনও কোন ঋষির নামেও পুরাণ প্রচলিত আছে, যেমন বশিষ্ঠপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি। এই মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত তেরোটি অধ্যায়ের নামই দুর্গা-সপ্তশতী বা চণ্ডী।

এই তেরোটি অধ্যায়ে দেবী দুর্গার যেন একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলিয়া ধরা হইয়াছে; তাই ইহার এত সমাদর। পুরাণে সবকিছু তত্ত্বই কাহিনী বা গল্পের মাধ্যমে বিবৃত বা উদ্ঘাটিত। সাধারণ মানুষের কাছে বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব পৌঁছাইয়া দিবার জন্য এই সহজ সুলভ আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে আকর্ষণীয় কাহিনী-বর্ণনা পুরাণের লক্ষ্য। পুরাণকে সেইজন্য 'পঞ্চম বেদ' আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা মূল চারি বেদের দুরূহ দুরধিগম্য তত্ত্বকে সমস্ত জনগণের কাছে অনায়াসগম্য করিয়া দিয়াছে। এক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ যে বনের বেদান্তকে ঘরে আনিতে চাহিয়াছেন, পুরাণ যেন সেই কর্মেই চিরদিন ব্রতী হইয়া আছে, তাহাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছে বলা চলে।

পুরাণের মূল লক্ষ্য দেবতার স্বরূপ উদ্ঘাটন। তাহা করিতে গিয়া সেই দেবতার নানা ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দ্বারা যেমন তাঁহার অলৌকিক শক্তির মহিমা সকলের গোচর করিতে হইয়াছে, তেমনি তাঁহার নানা স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহার যথার্থ স্বরূপ বা তত্ত্বও উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পুরাণের মূল বা প্রাণ নিহিত আছে এইসব স্তবে। কাহিনী সেখানে স্তবের উপলক্ষ মাত্র। কাহিনীতে এক-একটি ঘটনা শেষ হইতেছে, তাহার পরই স্তব আরম্ভ হইতেছে। সর্বত্র, প্রায় সমস্ত পুরাণে এই একই রীতি লক্ষ্য করা যায়। পুরাণের এই বিশিষ্ট ধারার অনুকরণে গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার রচিত অনুপম গ্রন্থ, অবধী ভাষায় রচিত 'রাম-চরিত মানস'-এ শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র জীবন-কাহিনীতে বারংবারই নানা অভিনব ছন্দে স্তুতি রচনা করিয়া এই গ্রন্থের গৌরব-বর্ধন করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে গ্রন্থটি এক-দিকে যেমন শ্রুতিসুখকর অন্যদিকে তেমনি ভাবোদ্দীপক হইয়া সকলের কাছে হৃদ্য ও আস্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই তেরোটি অধ্যায়ে নানা অসুরের সঙ্গে দেবীর নিরন্তর সংগ্রামের কাহিনীই মূলতঃ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মূল প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হইয়াছে চারিটি স্তবের মধ্য দিয়া। আবার আর একটি আশ্চর্য বিষয় একটু লক্ষ্য করিলে উদ্ঘাটিত হয় যে, এই চারিটি স্তবের শ্লোক-সংখ্যা

হইল একশো সাত। তাই কি ইহার নাম সপ্তশতী? অর্থাৎ সপ্তোত্তর শত, না সপ্তগুণিত শত, কোন্‌টি সপ্তশতীর তাৎপর্য? সন্দেহ এই কারণেই আরও ঘনীভূত হয় যখন দেখি 'ঋষিরুবাচ' বা 'নমস্তস্যৈ' —এই দুইটি মাত্র শব্দকেই এক-একটি শ্লোক ধরিয়া লইয়া যেন টানিয়া-বুনিয়া কোনক্রমে সাতশত শ্লোকে চণ্ডী সম্পূর্ণ, ইহা দেখানো হইয়াছে।

একশত সাত শ্লোকে সম্পূর্ণ স্তবগুলিই যে চণ্ডীর মূল বা প্রাণ ইহার আরও প্রমাণ পাই যখন দেখি দ্বাদশ অধ্যায়ে সমগ্র চণ্ডীর উপসংহারের প্রারম্ভেই স্বয়ং দেবী ভগবতী বলিতেছেন:

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং নাশয়িষ্যাম্যসংশয়ম্‌॥

তাহার পর তিনি মধুকৈটভাদি নাশ, মহিষাসুর-বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভবধ ইত্যাদির কীর্তনের কথা পৃথগ্‌ভাবে বলিয়াছেন এবং সেইসব বর্ণনামূলক অংশের পাঠ ও শ্রবণের ফলও জানাইয়াছেন।

প্রত্যেকটি স্তবই অগাধ রহস্যে পরিপূর্ণ, যাহার মধ্য দিয়া দেবী দুর্গার নানা বিভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। স্তবগুলি তাই গভীর প্রণিধান সহকারে বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রথম স্তবটি ব্রহ্মার কণ্ঠে উদ্গীত মহাকালীর উদ্দেশে, যিনি সমস্ত দেববৃন্দকে আপন তমোগুণের দ্বারা নিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন। দ্বিতীয় স্তবটি শক্রাদিস্তুতি নামে পরিচিত, যেখানে শক্র বা ইন্দ্রাদিপ্রমুখ দেবগণ মহালক্ষ্মীর উদ্দেশে স্তবগানে মুখর। কাব্যগুণে, ছন্দের সুষমায়, অলঙ্কারের বৈচিত্র্যে এই স্তবটি চণ্ডীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও সুন্দর এবং জনপ্রিয়ও বটে। প্রায় সর্বত্রই দেবীর আরাত্রিকাদির পর এই স্তবটি মুখ্যতঃ গীত হইয়া থাকে। শেষের দুটি স্তবই মহাসরস্বতীর উদ্দেশে নিবেদিত। উদ্গাতা সমস্ত দেববৃন্দ। যদিও সব শেষেরটি, যেটি নারায়ণী স্তুতি নামে পরিচিত, সমস্ত দেববৃন্দের দ্বারা উদ্গীত হইলেও 'বহ্নিপুরোগমাঃ' অর্থাৎ অগ্নিকে দলপতিরূপে সম্মুখে রাখিয়াই উচ্চারিত, যেমন দ্বিতীয় স্তবটি শক্র বা ইন্দ্রকে প্রধান করিয়াই দেবগণ কর্তৃক গীত।

এইরূপে চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে একটি, মধ্যম চরিত্রে একটি এবং উত্তর চরিত্রে দুইটি স্তব স্থান পাইয়াছে। স্তবচতুষ্টয়ে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী ভগবতী মহামায়ার তমোময়ী, রজোময়ী এবং সত্ত্বময়ী ত্রিবিধ বিভাবেরই স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হইয়াছে এবং তমোময় অন্ধকার হইতে জাগরিতা দেবী পরম প্রকাশময়ী সমুজ্জ্বলা মূর্তিতে যেন প্রকট হইয়া উঠিয়াছেন। সেই কারণে মনে হয় এই স্তবচতুষ্টয়ের মধ্যেই যেন সমস্ত অধ্যাত্মসাধনার ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীপাঠের পূর্বে ও পরে যে-দুইটি বৈদিক সূক্ত পাঠ করার বিধি আছে, তাহার মধ্যেও এই ইঙ্গিত। রাত্রিসূক্তে প্রারম্ভ এবং অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবীসূক্তে পরম অহংময় প্রকাশে পরিসমাপ্তি। □

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং **শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর আবির্ভাবের শত-বার্ষিকী** উপলক্ষে **উদ্বোধন কার্যালয়** থেকে **স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের** সম্পাদনায় একটি **সঙ্কলন-গ্রন্থ** প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। **'উদ্বোধন'**-এর বিভিন্ন সংখ্যায় **স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা** এবং **শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ** সম্পর্কে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে সেগুলি ঐ **সঙ্কলন-গ্রন্থে** স্থান পাবে। এছাড়াও উভয় ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মূল্যবান সংবাদ এবং তথ্যও ঐ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হবে।

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়

১ আশ্বিন ১৩৯৯/১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

দেবী দুর্গাঃ বিবর্তনের পথে

প্রগতি রায়

বাঙালীর একান্ত কাছের নাম দুর্গা। কোন দেবীকে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে এমন করে ঘরের মেয়ের মতো স্নেহ করা, ভালবাসার দৃষ্টান্ত নিতান্তই দুর্লভ। পুরাকালে একসময় অসুরদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে দেবী দুর্গা দেবতাদের জিতিয়ে দিয়েছিলেন—সেকথা স্মরণে রয়েছে আজও। কৃতজ্ঞতার সে-অনুভূতি ক্রমে ক্রমে ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে।

'দুর্গা'। মাত্র দু-অক্ষরের নাম। তার অর্থের গভীরতা কিন্তু অনেক—'দুঃসাধ্য গমন' অর্থাৎ আয়াসসাধ্য যেসব কাজকর্ম, তাতে প্রবৃত্ত হওয়া। দেবতাদেরও অসাধ্য হয়ে পড়েছিল যে-কাজ অর্থাৎ মহিষাসুরের হাত থেকে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন এই প্রবল শক্তিরূপিণী নারী।

কিন্তু এ তো হলো পৌরাণিক কল্পনা। বস্তুতপক্ষে দুর্গা-ভাবনা কত প্রাচীন? পুরাণের যুগে হঠাৎ একজন দেবী সম্পর্কে এত যশোগাথা, এত মহিমা প্রচারের অবশ্যই কোন পশ্চাৎপট ছিল যা থেকে ধীরে ধীরে পুরাণ-মহাকাব্যের যুগে তাঁর প্রাধান্য এত বিস্তৃতি লাভ করেছে।

পিছন ফিরে তাকানো যাক। আজ থেকে অন্ততঃ চার-পাঁচ হাজার বছর আগেকার সাহিত্য —পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য বৈদিক সাহিত্যের দিকে। সেখানে চার বেদের মধ্যে কেউই সরাসরি দুর্গা নামের উল্লেখ করেননি। বস্তুত-পক্ষে বেদের সমাজ পুরুষশক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছে বেশিমাত্রায়। তবে তার মধ্যেই নারী-শক্তির গভীরতা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল আভাসে ইঙ্গিতে।

পৃথিবীর সুপ্রাচীন সাহিত্যকীর্তি এই বেদ। অত প্রাচীনযুগে এমন বিস্তৃত সাহিত্যসৃষ্টির দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না। মানব-সভ্যতার উষালগ্নের একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় এই বেদ থেকে, যেসময় মানুষ প্রকৃতির হাতে খেলার পুতুল। ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলানোর দৃশ্য দেখে সে সচকিত, কখনো বা উচ্ছ্বসিত। যখন প্রকৃতির ভীষণ ভয়াল রূপ তাদের সন্ত্রস্ত করেছিল তখন করজোড়ে সেই অতিমানবিক সত্তার কাছে প্রার্থনা জানাত তারা। এমনি করেই সৃষ্টি হয়েছিল বজ্রের দেবতা ইন্দ্র বা বৃষ্টির দেবতা পর্জন্য কিম্বা প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা-বাত্যার অধিষ্ঠাতৃ রুদ্রদেবতার। কখনো আবার নিতান্ত ভালবেসে দৈনন্দিনের অতি পরিচিত আগুনের মধ্যে অগ্নিদেবতার কল্পনা করলেন ঋষিকবিরা। অনুরূপে সূর্যদেব কিম্বা জলের দেবতা বরুণের কল্পনা। সূর্যকে ভালবেসে কত না রূপে তাঁকে এঁকেছিলেন বৈদিক যুগের ঋষিকবিরা। দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূর্যের যে নানারকম চেহারা—তার প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছিলেন তাঁরা। সূর্য কখনো নয়নমনোহারী স্ত্রীরূপধারিণী উষা, কখনো অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কখনো রুদ্র, কখনো ভগ, কখনো সবিতা, কখনো আবার পূষা কিম্বা বিষ্ণু। রাত্রি হলেও সূর্য অস্ত যায় না, সে-সূর্যের নাম বরুণ—এমন বাস্তব কল্পনাও করেছিলেন তাঁরা।

বেদে পুরুষদেবতাদেরই খুব প্রাধান্য ছিল। পাশে পাশে স্ত্রীদেবতাদের সংখ্যা বা গুরুত্ব—দুই-ই ছিল নামমাত্র। সরস্বতী এবং উষা—স্ত্রী-দেবতাদের মধ্যে উজ্জ্বল। তাছাড়া ছিলেন দেবমাতা অদিতি, ইন্দ্রাণী, বাক্, অপ্, ইলা, সরণ্যু কিম্বা সরমারা। মজার কথা, এই স্ত্রী-দেবতারা অনেকেই কিন্তু একই ধরনের সত্তা-বিশিষ্ট, শুধুমাত্র বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছেন। একটু

ব্যাখ্যা করে বলা যায়, উষা, সরস্বতী, বাক্, অপ্ অদিতিদের যেসব বৈশিষ্ট্য কল্পনা করা হয়েছে সেগুলি অনেক সময়েই একে অপরের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অন্যভাবে বলা যায়, একই প্রাকৃতিক ঘটনা বা বস্তুকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে বিভিন্ন নামকরণ করেছিলেন বৈদিক ঋষিরা।

বেদে প্রায় প্রত্যেক দেবীর কাছেই একটা নির্দিষ্ট প্রার্থনা করেছেন ঋষিরা। তাঁরা বলছেন, দেবী যেন তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে অন্ধকার থেকে তাঁদের আলোর পথে নিয়ে আসেন, জ্ঞানের আলো দান করে অন্ধকার থেকে মুক্তিদান করেন।

দেবী উষার কথা ধরা যাক। বাস্তবে তিনি রাতের অন্ধকারকে অপসারণ করে দিনের আলোর আভাস বয়ে আনেন। ঋগ্বেদের কবি, কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষির ভাষায় উষার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছেঃ হে স্বর্গদুহিতে! সকলের আহ্লাদকর জ্যোতির সাথে প্রকাশিত হও! প্রতিদিন আমাদের প্রভূত সৌভাগ্য এনে দাও এবং অন্ধকার দূর কর—"উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ দুহিতর্দিবঃ। আবহন্তী ভূর্যস্মভ্যং সৌভগং ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু।" উষা সকল প্রাণীকে চেতনাযুক্ত করেন—"উষা উচ্ছন্তী বয়ুনা কৃণোতি।" অজ্ঞান অবস্থা থেকে পুনরায় সকলকে জ্ঞানালোক দান করেন। উষা সুনৃত অর্থাৎ সুন্দর বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কারণ, উষার আগমন হলে জীবকুল জেগে উঠে কথা বলা শুরু করে।—"ভাস্বতী নেত্রী সুনৃতানাম্ অবেতি..."—আমরা প্রভাসম্পন্না সুনৃতবাক্যের নেত্রী বিচিত্র উষাকে জানি...।

আসলে যে-গূঢ়তত্ত্বটি এর মধ্যে নিহিত আছে তা হলো, উষার উদয়ে যজ্ঞের শুরু, মন্ত্রপাঠের সূচনা। তাই উষা যেন সুন্দর স্তোত্র-বাক্য মন্ত্রের প্রকাশ করে দেবতাদের জাগরিত করেন। অতএব, উষা তাঁদের জননীস্বরূপা; দেবমাতা অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী। "...মাতা দেবানামদিতেরনীকং যজ্ঞস্য কেতুর্বৃহতী বি ভাহি...।" বাক্যের সঙ্গে জ্ঞানের সরাসরি যোগাযোগ। সেই পরম্পরায় দেবী উষা জ্ঞান ও সুবুদ্ধির উন্মেষ করেন, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেন।

উষার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য দেবী সরস্বতীর কল্পনাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। বৈদিক যুগে উত্তর ভারতের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ নদী সরস্বতী মানুষের কাছে ছিল মাতৃতুল্যা। 'সরঃ' অর্থ জল, যা থেকে সরোবর কথাটা এসেছে। সরস্বতীর জলে দৈনন্দিন যাগযজ্ঞ, জীবনযাত্রা—সকল কার্য নির্বাহ করা হতো। সরস্বতীর কাছে বৈদিক যুগের মানুষ তাই অত কৃতজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে কৃতজ্ঞতা থেকে এল ভালবাসা—একেবারে ঘরের একমাত্র আদরিণী কন্যা। তিনি প্রবাহিত হয়ে প্রচুর জল সৃষ্টি করেছেন এবং জ্ঞান উদ্দীপন করেছেন। বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি বলছেন একথা। "...মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।"

সরস্বতী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী এবং সুবুদ্ধির শিক্ষয়িত্রী—"...চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং...।" একটা নদীকে কেন এমন বলা হচ্ছে—সেজন্য পশ্চাৎপটটা দেখা যেতে পারে। সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করার জন্য আগুন জ্বালানো হয়েছে। যজ্ঞের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। অন্যদিকে স্বচ্ছসলিলা নদীও কুলুকুলু ধ্বনির মাধ্যমে তার মনের ভাব, মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করছে। দুপক্ষের এই যে কথোপকথন অর্থাৎ বাক্যের আদানপ্রদান—এসবের মধ্যে দিয়েই কোন এক সময় তিনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—বাগ্‌দেবীতে পরিণত হয়েছেন। তিনি যেহেতু সুনৃত অর্থাৎ সুন্দর বাক্যের অভিমানী দেবতা, সেজন্য কুৎসিত বাক্য পরিহার করেন। হে সরস্বতী! তুমি দেবনিন্দুকগণকে বধ করেছ...।—ভরদ্বাজ ঋষির উক্তি। তিনি বলছেনঃ যাঁর দীপ্তিতে পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশ পূর্ণ হয়েছে, সেই দেবী সরস্বতী যেন নিন্দুকদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেন। "সরস্বতী নিদস্পাতু।"

জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অপ্। তিনি প্রভূত ক্ষমতার আধার। বাস্তবক্ষেত্রে জীবনধারণের জন্য

জল অপরিহার্য। বেদ তাই তাকে 'অমৃত' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। কবষ ঋষি বললেনঃ "আপো। রেবতীঃ ক্ষায়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ। ভদ্রং বিভৃতামৃতং চ..."— হে জলাশয়গণ! তোমরা ধনদায়ী এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন কর এবং অমৃত আহরণ কর। বিশ্বভুবন ধারণ ও রক্ষণের মতো মহান ক্ষমতা আছে জলের। ঋগ্বেদে সেকথা বারবার বলা হয়েছে। বিশেষ করে দার্শনিক ভাবনা রয়েছে যেসব সূক্তগুলিতে—সেখানে প্রায়শই সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে জলের একটা প্রধান ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন হিরণ্যগর্ভ ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হলোঃ "আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্"—ভূরিপরিমাণ জল সমগ্র বিশ্বভুবনকে আবৃত করে রেখেছিল...। সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে প্রজাপতি ঋষি বললেনঃ "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।" অর্থাৎ সৃষ্টির একেবারে শুরুতে অন্ধকারের দ্বারাই অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক ছিল জলময়।

সুতরাং সকল মন্ত্রকর্তাই একমত যে, জল জননীস্বরূপিণী। জল থেকেই সৃষ্টির সূচনা। এইভাবে দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীশক্তির অপরিসীম ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু কিছু চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটেছে ঋগ্বেদের সময় থেকেই—বিশেষতঃ দশম মণ্ডলের বেশ কিছু সূক্তে তার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। তবু এতসব উদাহরণ সত্ত্বেও বৈদিক যুগের মানুষ যেহেতু যোদ্ধা জাতি ছিল, তাদের অনবরত অন্যান্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হতো। সেজন্য তাদের সেই পুরুষপ্রধান সমাজে স্ত্রী দেবতাদের চেয়ে পুরুষ দেবতাদেরই ছিল প্রাধান্য।

এহেন পুরুষপ্রধান সমাজে নারীশক্তি সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ ঘটে কিভাবে? এর পিছনে কিছু কারণ ছিল। বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী বেশ কিছু সভ্যতা এই উপমহাদেশে বর্তমান ছিল। তাদের মধ্যে প্রায়শই শক্তি-সাধনার একটা ঐতিহ্য বর্তমান ছিল। তা থেকে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বৈদিক যুগের মানুষেরা—এটা ধরে নিলে অস্বাভাবিক কিছু হবে না।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল তার প্রমাণও দেয়। এপ্রসঙ্গে বলা যায়, মোট দশটি মণ্ডলের মধ্যে প্রথম এবং দশম—এই দুটি মণ্ডল অনেক পরের যুগের রচনা। আসলে ঋগ্বেদ কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে তৈরি হয়নি। বহু যুগ ধরে শ্রুতিপরম্পরায় এর সৃষ্টি। এর দ্বিতীয় মণ্ডল হিসাবে আমরা যেটা পাই, প্রকৃতপক্ষে সেটাই সবচেয়ে প্রাচীন। অর্থাৎ আসল ঋগ্বেদ ওখান থেকেই শুরু। পরের যুগে প্রথম মণ্ডলকে দ্বিতীয়ের আগে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই হিসাবে দশম মণ্ডলের সময় সভ্যতা অনেক অগ্রসর হয়ে গেছে। চিন্তাভাবনার মধ্যে পরিণতি এসেছে। সমাজে নারীর একটা স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে এবং এই দশম মণ্ডলেই প্রথম শোনা যাচ্ছে নারীকণ্ঠের দৃপ্ত ঘোষণাঃ "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ / অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।" —আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সাথে বিচরণ করি। আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং অন্যান্য সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি। আমি মিত্র-বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমিই ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অবলম্বন করি।... অম্ভৃণ ঋষির কন্যা, ব্রহ্মবিদুষী বাক্ এই সূক্তের দ্রষ্টা। তিনি নিজেকে ব্রহ্মের সাথে অভিন্না কল্পনা করে বললেন যে, বিশ্বজগতের সমস্ত কিছুই তাঁর থেকে উৎপন্ন।—আমি দ্যুলোক এবং ভূলোকে আবিষ্ট হয়ে আছি।... আমি পিতৃস্থানীয় আকাশকে প্রসব করেছি।—"অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ... অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্...।"

দশম মণ্ডলের বেশ কিছু সূক্তের দেবতা এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ঋষিরা অনেক সময়ই আড়ালে থাকতে চেয়েছেন। পুরূরবা এবং উর্বশীর মধ্যে কথোপকথন-মূলক একটি সূক্ত রয়েছে দশম মণ্ডলে। সেখানে তাঁরাই সূক্তের দেবতা, আবার তাঁরাই ঋষি। একশো একান্নতম সূক্তেও শ্রদ্ধা দেবতা, শ্রদ্ধা ঋষি। এছাড়া এরকম আরও কিছু কিছু আছে। তবে বাক্ ঋষির সূক্তের দেবতা পরমাত্মা এবং

ঋষির নাম বাক্-ই রয়েছে সেখানে। কিন্তু সূক্তের মধ্যে ঋষি পরমাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলে কল্পনা করেছেন, অর্থাৎ সূক্তের দেবতার সংগে একাত্ম হয়ে গেছেন সূক্তের ঋষি। অন্যভাবে বলা যায়, ঋষি বাক্ গৌরববশে সরস্বতী বাক্-এর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছেন। নদী সরস্বতী ঐসময় বাক্য-বুদ্ধি-প্রজ্ঞার অভিমানী দেবত্বে পরিণতি পেয়েছিলেন। সৃষ্টির মূল কারণ জ্ঞান। তিনি বললেন, আমিই সকলকে রক্ষা করি। আমি সকল ভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর ন্যায় অগ্রসর হই।—"অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা।..."

বাক্ ঋষি-প্রণীত এই সূক্তটিই হলো ঋগ্বেদের বিখ্যাত দেবীসূক্ত। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা-কল্পনার বীজ এখানেই নিহিত ছিল বলে মনে করা হয়েছে। পরবর্তী কালে দুর্গা সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তাভাবনা এই মূলভিত্তিকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। দেবীসূক্তে অম্ভৃণ-দুহিতা ঋষি বাক্ নিজেকে সর্বশক্তিমান সত্তারূপে ঘোষণা করেছেন, যিনি দেবতাদের সকলের মিলিত শক্তি অপেক্ষাও বহুগুণ শক্তিবিশিষ্টা। পুরাণের দুর্গায় এই চিন্তারই একটু অদলবদল ঘটেছে মাত্র। সেখানে তিনি দেবতাদের মিলিত শক্তি থেকে উদ্ভূতা।

সুতরাং ঋগ্বেদে দেখা যাচ্ছে, দুর্গার ভাবনা একটা আবছা রূপ মাত্র। সরস্বতী-উষা-অপ্-অদিতিদেবীদের মধ্য দিয়ে নারীর অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে যে-চেতনার উন্মেষ ঘটছিল দেবীসূক্তে তারই বিকাশ ঘটল।

যজুর্বেদ তাঁকে অন্যভাবে বর্ণনা করলেন। হে আদিত্য! শ্রী এবং লক্ষ্মী তোমার পত্নী-স্থানীয়া।—শুক্লযজুর্বেদ বললেন। শ্রী অর্থে সকলের আশ্রয়যোগ্য যিনি, তাঁকে বোঝাচ্ছে। আর লক্ষ্মী অর্থে সকলেই যাঁকে লক্ষ্য করেন। দেবীসূক্তের দেবীর এ এক ভিন্ন রূপ। এখানে শ্রেষ্ঠত্বের ঝঙ্কার নয়—দেবীর শ্রীময়ী কল্যাণী মূর্তিই পরিস্ফুট হয়েছে।

বেদের সংহিতা অংশের পরে এল আরণ্যক-সাহিত্য। এই সাহিত্য প্রায়শই বেদের গম্ভীর দার্শনিক দিকটা নিয়ে আলোচনা করেছে। এই আরণ্যক-সাহিত্যের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের উপনিষদ্ অংশে প্রথম 'দুর্গা' নামের উল্লেখ পাওয়া গেল। তার আগে আরণ্যক-অংশে জলের দেবী 'অপ্'কে নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে স্তুতি করা হয়েছিল।—অপ্ আমাদের জীবনকে রক্ষা করেন। সর্বপ্রকার বিপদ থেকে উদ্ধার করেন—রাক্ষসদের হাত থেকে, ভয়ঙ্কর অগ্নির প্রকোপ থেকে। "দেবীর্ভুবন-সূবরীঃ।" সমগ্র ভূতজাত পদার্থের প্রেরণকর্ত্রী তিনি। "দেবীঃ পর্জন্যসূবরীঃ।" পর্জন্য অর্থাৎ মেঘসমূহের প্রদায়িনী। জলের মহিমা এইভাবে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কীর্তিত হয়েছে।

আরণ্যকের পরবর্তী অংশ উপনিষদ্। বেদের অন্তর্গত বলে উপনিষদ্ও বৈদিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। উপনিষদে ব্রহ্ম-জগৎ-সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশের সমাহার। পূর্বোল্লিখিত তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত উপনিষদের নাম নারায়ণ উপনিষদ্। বৈদিক সাহিত্যে ইনিই প্রথম দুর্গার নাম ঘোষণা করলেন। "কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।" কাত্য রুদ্রের নামান্তর। রুদ্র থেকে উদ্ভূতা যে-দুর্গা, তিনি কন্যাকুমারী। কুমারী, কেন না—"কুৎসিতমনিষ্টং মারয়তি নিবারয়তীতি"—আমাদের পক্ষে যা কুৎসিত বা অনিষ্টকর তাকে তিনি মারেন—তিনি নিবারণ করেন।

অন্যত্র তাঁর রূপেরও বর্ণনা দিলেন নারায়ণ উপনিষদ্। "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।/দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥"—আমি সেই পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপে শত্রুদহনকারিণী, কর্মফলদাত্রী দুর্গাদেবীর শরণাগত হই। হে সুষ্ঠুত্রাণকারিণি দেবি, তোমাকে নমস্কার। উপনিষদ্ এই দুর্গতিনাশিনী দেবীকে অগ্নির তুল্য শক্তিসম্পন্নারূপে ঘোষণা করলেন। অগ্নিসমবর্ণা দুর্গা তেজেও অগ্নি-

সমা। তপস্যার ফলে যে-তেজ উদ্ভূত হয়েছে, তা দিয়ে তিনি আমাদের শত্রুসমূহকে দহন করেন। স্বীয় দীপ্তিতে স্বয়ংপ্রকাশিতা দুর্গা। তাই পরমাত্মার সঙ্গে তিনি অভিন্না।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে যে-শক্তি দৃপ্তকণ্ঠে স্বীয় জয়গান ঘোষণা করেছিলেন, ধীরে ধীরে কালের নিয়মে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। বৈদিক সাহিত্যের শেষ ভাগের বহু অংশে বিভিন্ন ভঙ্গিতে, বিভিন্ন মহিমায়, বিভিন্ন নামে তাঁকে আমরা দেখেছি। যেমন, এই নারায়ণ উপনিষদেই দেবীর অম্বিকা, উমা নাম পরিলক্ষিত হয়—"নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যপতয়ে অম্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে নমো নমঃ॥" পরবর্তী কালে ভাষ্যরচনার সময়ে সায়ণাচার্য 'অম্বিকা' এবং 'উমা' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় বললেনঃ '...অম্বিকা জগন্মাতা পার্বতী...তস্যা এবাম্বিকায়া ব্রহ্মবিদ্যাত্মকো দেহ উমা শব্দেনোচ্যতে॥" বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যের এহেন ব্যাখ্যা দেখে মনে করা যায়, দেবী দুর্গার পর্বতকন্যা রূপ-বর্ণনার ধারণা বহু পূর্বেই এসে গেছে। তিনি বলছেন, জগন্মাতা অম্বিকার যে স্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাত্মক দেহ তা উমা শব্দবাচ্য।

কেন উপনিষদ্ দেবীশক্তির মহিমা বোঝানোর জন্য এই ব্রহ্মাত্মিকা উমাকে নিয়ে একটা গল্পও বললেন। একবার দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তি দ্বারা দেবতাদের বিজয়লাভ হলো। দেবতারা মনে করলেন, বুঝি বা তাঁরাই তাঁদের স্বীয় বাহুবলে জয়লাভ করেছেন। ব্রহ্ম দেবতাদের এই আত্মাভিমান জানতে পেরে তাঁদের মঙ্গলের জন্যই তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা দেখলেন সেই মূর্তি, কিন্তু ব্যক্তিটি যে কে—তা বোধগম্য করতে পারলেন না।

তখন সকলে মিলে অগ্নিকে বললেন, হে জাতবেদ! সর্বজ্ঞ অগ্নিদেব! আমাদের সামনে স্থিত এই মূর্তিটি কোন্ পূজনীয় ব্যক্তির তা আপনি সম্যগ্‌রূপে জেনে আসুন। অগ্নি যেতে সম্মত হলেন।

অনন্তর সেই মূর্তির সামনে গেলে মূর্তি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি কে?" "অগ্নির্বা অহমস্মি ইত্যব্রবীৎ জাতবেদাঃ।"—আমি প্রসিদ্ধ অগ্নি। আমি জাতবেদা।—অগ্নি সগর্বে উত্তর করলেন। 'জাতবেদা' শব্দের অর্থ সমস্ত জাত অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ বিষয়ে যিনি বিদিত আছেন এবং যিনি সর্বজ্ঞ।

অগ্নির উত্তর শুনে ব্রহ্ম আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমার মধ্যে কোন্ প্রসিদ্ধ গুণযুক্ত শক্তি আছে?" অগ্নি বললেনঃ "এই পৃথিবীতে আমি দগ্ধ করতে পারি।" ব্রহ্ম তখন অগ্নির সামনে একটি তৃণখণ্ড রেখে বললেনঃ "একে দগ্ধ কর।" পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে দারুণ গতিতে অগ্নি তৃণের কাছে গেলেন, কিন্তু তাকে দগ্ধ করতে পারলেন না। নতমস্তকে ফিরে গেলেন অগ্নি।

দেবতারা এবার বায়ুকে অনুরোধ করলেনঃ "বায়বেতদ্ বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি"—সম্মুখস্থ এই মূর্তিটি কে তা সম্যগ্‌রূপে জেনে এস। বায়ু গেলেন।

এবারেও অনুরূপ প্রশ্ন রাখলেন ব্রহ্ম। অগ্নির মতো বায়ুও গর্বভরে উত্তর করলেন ঃ "আমি প্রসিদ্ধ বায়ু। আমিই মাতরিশ্বা। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আমি গ্রহণ করতে অর্থাৎ উড়িয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম।" বায়ুর সামনে আবার সেই তৃণখণ্ড স্থাপন করলেন ব্রহ্ম এবং বায়ু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সেই তৃণখণ্ডটি একচুল নড়াতে পারলেন না।

এবারে স্বয়ং ইন্দ্র এলেন ঘটনাস্থলে। তিনি যথার্থ জিজ্ঞাসু ছিলেন। তাই তাঁকে পরীক্ষা করা অপ্রয়োজনীয়—এই ভেবে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হলেন এবং উমারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যাকে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জানার একাগ্রতার ফলেই ইন্দ্রের সামনে ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব ঘটল। ইন্দ্র তখন সেই বহুশোভমানা হৈমবতী-উমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ঐ পূজনীয় ব্যক্তি কে ছিলেন?" উমা ইন্দ্রকে বললেন ঃ "উনিই ব্রহ্ম"

—"সা ব্রহ্মেতি হোবাচ।" "অসুরদের সঙ্গে সংগ্রামে ওঁর সহায়তাতেই তোমরা বিজয়লাভ করেছ। কিন্তু স্বাভিমান এবং অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেরা নিজেদের মহিমান্বিত বোধ করছ। বস্তুতঃ ব্রহ্মের শক্তিতেই তোমরা শক্তিমান। ব্রহ্মই সকলের সকল শক্তির উৎস।"

বহুর মধ্যে এক—এই যে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব, এরই বীজ লুকানো ছিল দেবীসূক্তে। ঋষি বাক্ নিজেকে সৃষ্টি-স্থিতির একমাত্র কারণরূপে যে ঘোষণা করেছেন তাতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মের ধারণই আসে। কেন উপনিষদে সেই ধারণা সুপরিস্ফুট হলো। ঋগ্বেদে দেবী নিজেকে তিন ভুবনের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্রী বলে ঘোষণা করেছিলেন —তা-ও সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। আর কেন উপনিষদ্ সেই ব্রহ্মাত্মিকা দেবীর রূপটি সরাসরি তুলে ধরল। ব্রহ্মবিদ্যাকে কেন উপনিষদে বহুশোভমানা স্বর্ণালংকারভূষিতা 'উমা' নামে আখ্যায়িত করা হলো। কারণ, এবিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ। ওংকারধ্বনি বা 'ওঁ' ব্রহ্মের প্রতীক। হয়তো তাথেকে বিবর্তনবশে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী 'উমা' নামের অবতারণা হয়েছে। ধ্বনিগত সাদৃশ্যের বিচারেও 'ওম্' এবং 'উমা' এক কথাই মনে হয়।

একই প্রসঙ্গ আসে দুর্গার অম্বা-অম্বিকা নামের ক্ষেত্রেও। ধ্বনিতত্ত্ব এসে পড়ে এখানেও। নিতান্ত শৈশবে শিশু তার মাতাকে যেভাবে ডাকে—সেই শব্দ থেকেই বিবর্তিতরূপে অম্বা-অম্বিকা নামের উৎপত্তি ধরা যায়।

বৈদিক যুগের মানুষ প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধবিলাসী জাতি ছিলেন। সেজন্য তাঁদের সমাজ ছিল পুরুষপ্রধান সমাজ। শৌর্য-বীর্য-বাহুবলের ছিল জয়জয়কার। তবু ধীরে ধীরে, কালের বিবর্তনে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরও মিলিত শক্তির তাৎপর্যটিকে তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তার কিছু প্রমাণ ঋগ্বেদে দেখা গেছে। লক্ষণীয়, প্রকৃতিকে প্রায়শই পুরুষের অংশ বা পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধিত করে দেখানো হয়েছে। দেবীরা প্রায়ই কোন-না-কোন দেবতার মাতা কিম্বা ভগিনী কিম্বা দুহিতা অথবা জায়া, প্রণয়িনী। লৌকিক সম্বন্ধ থেকে এধরনের কল্পনার উদ্ভব হয়েছিল—এটা স্বাভাবিকভাবে ধরা যায়। "অদিতির-খণ্ডণীয়া বা পৃথিবী দেবমাতা বা।" দেবী অদিতি বন্দিত হয়েছেন দেবমাতারূপে। আবার দ্যুলোককে পিতা এবং তাঁর পত্নী পৃথিবীকে মাতা কল্পনা করেছেন ঋষিকবি—"দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।" বেদে উষাদেবীকেও বারবার দেব-দুহিতা, স্বর্গদুহিতা বলে বর্ণনা করেছেন ঋষি-কবিরা—"সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিত-র্দিবঃ।" তিনি সূর্যের প্রণয়িনী, স্ত্রী আবার কখনো কখনো জননীও হয়েছেন।—"সূর্যস্য যোষা। চিত্রামঘা রায় ঈশে বসুনাম্।" সূর্যের গৃহিণী, বিচিত্র ধনবতী উষা ধন ও বসুর ঈশ্বরী হয়েছেন।

কিন্তু অবশেষে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের শেষভাগে এসে একাকী নারীকণ্ঠের দৃপ্ত জয়গান শোনা গেল ঋষি বাক্ প্রণীত দেবী-সূক্তে—"আমি সকলের অধীশ্বরী।"

এহ বাহ্য! দেবীকেও ধীরে ধীরে পুরুষের শক্তিরূপে কল্পনা করা শুরু হয়েছে। ঋগ্বেদের শেষভাগে দেবী তাঁর বিপুল মহত্ত্ব সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, কিন্তু ঋক্-পরবর্তী বৈদিক-সাহিত্যে তাঁকে সমসাময়িক প্রধান দেবতার পত্নীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ দেবী বাক্ হয়েছেন রুদ্র বা শিবজায়া দুর্গা, পার্বতী, গৌরী। ঋগ্বেদের সময়ে দেখেছি ইন্দ্র-অগ্নি-সূর্য-বরুণ দেবতাদের একচ্ছত্র প্রাধান্য। পরবর্তী বেদের সময়ে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের পাশে পাশে অন্যান্য বেশ কিছু অপ্রধান দেবতা উজ্জ্বল হচ্ছিলেন। যেমন রুদ্র, শিব, বিষ্ণু যজুর্বেদে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছিলেন। ঋগ্বেদে রুদ্রের অস্তিত্ব ছিল অন্যভাবে। সেখানে তিনি অপ্রধান দেবতা। ঝড়ের অধিপতি। ঋগ্বেদের পর থেকে চিত্রটা বদলাতে শুরু করল। পুরাণের যুগে এসে রুদ্র বা শিব সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই ত্রয়ী দেবতার ধারণার মধ্য দিয়ে।

সাধারণতঃ রুদ্র বা শিব বললে নীলকণ্ঠ শিবের শান্ত সুন্দর মূর্তি বা দক্ষযজ্ঞ বিনাশকারী ধ্বংসাত্মক রুদ্রের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু সে হলো পৌরাণিক কল্পনা। ঋগ্বেদে রুদ্রের একেবারে ভিন্ন স্বরূপ। আর 'শিব' নামটি মাত্র একবারই উচ্চারিত হয়েছে সারা ঋগ্বেদে—শার্যত ঋষির কণ্ঠে। "যেভিঃ শিবঃ স্ববাঁ এবয়াবভির্দিবঃ সিষক্তি স্বযশা নিকামভিঃ।" ঋগ্বেদে রুদ্র ঝড়ের দেবতা। দারুণ গর্জনে তিনি রোদন করেন বা রোদন করান। এই ধারণা থেকে 'রুদ্' ধাতু নিষ্পন্ন 'রুদ্র' শব্দ। পরের দিকে ধীরে ধীরে রুদ্রের প্রাধান্য বেড়েছে। ঋক্-পরবর্তী সাহিত্যে তিনি পশুদের অধিপতি এবং কল্যাণকর, মঙ্গলকারী দেবতা হয়েছেন। তিনি ক্ষেত্রপতি, দিক্‌সমূহের অধিপতি, বনের পতি ; এমনকি তস্করদেরও অধিপতি—"স্তেনানাং পতয়ে নমঃ তস্করাণাং পতয়ে নমঃ। শুধু তাই নয়, "জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাং পতয়ে নমঃ।"—হত্যা করে ধন আহরণ করে যারা অর্থাৎ সেসময়কার ছিনতাইবাজ দলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নমস্কার।

দেখা যাচ্ছে, ঋক্-পরবর্তী যুগে রুদ্রের দ্বৈত সত্তার ধারণা এসেছে। একদিকে তাঁর মঙ্গলময় শিবমূর্তি, অন্যদিকে ধ্বংসাত্মক রুদ্রমূর্তি। অবশেষে পুরাণের যুগে রুদ্রের এই প্রাধান্য চরমে উঠেছে। সেখানে তাঁর প্রশান্তসুন্দর ধ্যানী-মূর্তি।

ঋক্-পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য বা পুরাণ-সাহিত্যের এই যে রুদ্র কিম্বা শিব—ইনি আসলে ঋগ্বেদের অগ্নি দেবতা। স্বয়ং ঋগ্বেদ বলেছেন একথা—"জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্।"—হে অগ্নি, তুমি স্তুতি দ্বারা জাগরিত হও, ভিন্ন ভিন্ন যজমানকে অনুগ্রহ করে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করার জন্য যজ্ঞে প্রবেশ কর। তুমি রুদ্র। তোমাকে নমস্কার করি। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য বললেনঃ "রুদ্রায় ক্রুরায় অগ্নয়ে"। রুদ্র অর্থে নিষ্ঠুর অগ্নি। আর অগ্নির রুদ্র নাম হওয়ার প্রসঙ্গে কৃষ্ণযজুর্বেদ একটা গল্প বললেন। দেবতারা একবার অসুরদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।—"দেবাসুরা সংযত্তা আসন্।" সে-যুদ্ধে জয় হলো দেবতাদের। তাঁরা কাছ থেকে লুণ্ঠিত ধনরত্ন নিয়ে এসে অগ্নির কাছে গচ্ছিত রাখলেন। অগ্নি ওদিকে ভাবলেন, এই ধন আমার একার হোক না কেন ? ধন নিয়ে তিনি চম্পট দিলেন। দেবতারাও ছাড়বেন না। ধন উদ্ধারের জন্য তাঁরা অগ্নির পশ্চাদ্ধাবন করলেন। পালাবার সময় অগ্নি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেছিলেন বলে তাঁর নাম 'রুদ্র' হয়েছিল।

আসল প্রাকৃতিক তত্ত্ব যেটা তা হলো বজ্র-বিদ্যুৎ-অগ্নি অভিন্ন। বিদ্যুদাগ্নির ধ্বংসাত্মক শক্তি আছে। আবার সূর্যাগ্নি বা লৌকিক অগ্নিরও ধ্বংসকারী ক্ষমতা আছে। অন্যপক্ষে, ঝড়ও বিধ্বংসী এবং ঝড় সৃষ্টির কারণ সূর্যাগ্নির প্রচণ্ড তাপ। সেই হিসাবে ঝড়ের দেবতা এবং সূর্যাগ্নি পিতাপুত্র সম্বন্ধে স্বাভাবিক-ভাবেই অভিন্ন। আর অগ্নির শব্দকারী লেলিহান শিখা যখন ভয়ঙ্কর রৌদ্ররূপ ধারণ করে তখন সেই অগ্নি হলেন রুদ্র।

রুদ্রের অন্য নাম শিব। 'শিব' শব্দের অর্থ মঙ্গলময়। অগ্নির ধ্বংসাত্মক রূপের পাশে পাশে তাঁর মঙ্গলকারী রূপটিও বর্তমান। সেখানে তিনি জগতের পালক, বিশ্বসংসারের নিয়ন্তা। কেননা সূর্যাগ্নি থেকেই তো বিশ্বসৃষ্টি। অতএব অগ্নিকে সৃষ্টির কারণ এবং এক ও সত্তা মনে করা হয়েছে। ঋগ্বেদের ঋষি বাক্ নিজেকে জগতের একমাত্র স্রষ্টা বা অধীশ্বরী বলে ঘোষণা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁকে রুদ্র বা শিবরূপী সূর্যের শক্তি অর্থাৎ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পুরুষশক্তির স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। নারায়ণ উপনিষদ্ তাই তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিবর্ণারূপে বর্ণনা করলেন।—"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীম্।" তিনি রুদ্রের পত্নী রুদ্রাণী বা শিবানী। শুক্লযজুর্বেদ আবার দেবীরই আরেক নাম 'অম্বিকা'-কে রুদ্রের ভগিনী বললেন। আর আগেই দেখেছি, কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যক রুদ্রকে

অম্বিকাপতি বলেছেন। "নমো হিরণ্যবাহবে... অম্বিকাপতয়ে নমো নমঃ।"

দেবী নিজেকে অনন্ত অসীম বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে সে-অনন্তের ধারণা আমরা করতে পারি না। তাই অসীমকে সীমিত করেছেন বৈদিক যুগের ঋষিকবিরা। তাঁরা কল্পনা করলেন, সেই অপরিসীম শক্তি সকলপ্রকার অমঙ্গলের বিনাশকারিণী, অশেষ দুর্গতির ত্রাণ-কারিণী। তাই তিনি দুর্গা—দুর্গতিনাশিনী। তাঁর মহিমা অপরিসীম। ব্রহ্মসমশক্তিসম্পন্না তিনি, তাই তিনি ব্রহ্মবিদ্যাত্মিকা—তিনি দেবী।

বেদ-পরবর্তী পুরাণ ও মহাকাব্যের যুগে দুর্গাকে ঘিরে নানাবিধ আখ্যান-উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণাদিতে দেবী দুর্গার কল্পকথার বিস্তার ঘটেছে। রচিত হয়েছে দেবী-মাহাত্ম্য, দেবীপুরাণ। দেবীর তামসী দিকটিকে বিষয় করে কালিকাপুরাণ। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে দেবীর পূজাপদ্ধতি, মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাছাড়া আরও নানাবিধ পুরাণগ্রন্থ দেবী দুর্গার বিষয়ে আখ্যানগাথা রচনা করেছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত 'দেবীমাহাত্ম্য' বা 'চণ্ডী' দুর্গাপূজায় অবশ্যপাঠ্য। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত তেরোটি অধ্যায়ে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। দুর্গাহোমে সাতশো আহুতি দেবার জন্য এখানে সাতশো মন্ত্র আছে। তাই 'চণ্ডী'র আরেক নাম 'দুর্গা-সপ্তশতী'।[১] চণ্ডীতে বলা হলো—শিবোপরি সংস্থিতা ত্রিনয়না ও রক্তবসনা মহাদেবীকে নিত্য ধ্যান করবে। ইনি আগমশাস্ত্র-প্রতিপাদ্যা অর্থাৎ বেদ-প্রতিপাদ্যা দেবী। দেবী মহামায়াকে এখানে বহু নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে—চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, নারায়ণী, কালী, দুর্গা, গৌরী, পার্বতী এবং আরও অনেক নামে। এই দেবী মহামায়া বিভিন্ন রূপ ধারণ করে রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ ও অন্যান্য বহু অসুরকে নিধন করেছেন। দেবতারা কৃতজ্ঞচিত্তে যখন তাঁর কৃতকর্মের জন্য তাঁকে স্তব করলেন, দেবী তখন আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেনঃ "...তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।/তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।/দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥" (চণ্ডী, ১১/৪৯-৫০)—আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করব বলে দুর্গাদেবী নামে আমি প্রসিদ্ধা হব। এই দেবী মহিষাসুর-মর্দিনী, মধুকৈটভনাশিনী, রক্তবীজবিনাশিনী, চণ্ডমুণ্ডসংহারিণী। চণ্ডীতে দেবী মহামায়া বর্ণিত হলেন নানাভাবে।

দেবী দুর্গা তিনরূপে প্রকাশিতা—সাত্ত্বিকী-রাজসী-তামসী। সাত্ত্বিকীরূপে তিনি মহা-সরস্বতী। রাজসীরূপে দেবী হয়েছেন মহালক্ষ্মী। তামসীরূপে তিনি মহাকালী। সচ্চিদানন্দময়ী দেবী ব্রহ্মরূপে অভিন্না। তাই মহাসরস্বতী অংশে চিৎরূপা, মহালক্ষ্মী অংশে সৎরূপা এবং মহাকালী অংশে আনন্দরূপা।

পুরাণ-সাহিত্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা দেবী দুর্গা বা মহামায়ার মাহাত্ম্য রামায়ণ-মহাভারতেও প্রকীর্তিত হয়েছে। দেবী সেসময় স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হয়ে গেছেন। তাই রামায়ণের রাম কিম্বা মহাভারতের অর্জুন তাঁদের প্রতিপক্ষকে জয় করার জন্য দুর্গা দুর্গতিনাশিনীর শরণ নিয়েছেন, তাঁর কৃপালাভ করার জন্য দুর্গার স্তব করেছেন। দেবীকে আরাধনা করার জন্য রামচন্দ্র অকালে অর্থাৎ প্রচলিত বসন্ত ঋতুর বদলে শরৎকালে দেবীর বোধন করলেন। রাবণপুত্র মেঘনাদও দুর্গার ভক্ত ছিলেন। কিন্তু রামের স্তুতিতে প্রীত হয়ে দুর্গা রাবণপক্ষ ত্যাগ করে রামকেই আশ্রয় দিলেন।

মহাভারতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। ভীষ্ম-পর্বে দেখছি, রণসজ্জায় সজ্জিত অর্জুন কৃষ্ণের পরামর্শে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে রণভূমিতেই দুর্গার স্তব করছেন। ভগবান বাসুদেব দুর্যোধনের সৈন্যগণকে সমরোদ্যত দেখে অর্জুনের হিতার্থ বললেনঃ হে মহাবাহো! শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত পবিত্র হয়ে দুর্গার স্তব কর।

১ এসম্পর্কে পূর্ববর্তী প্রবন্ধে গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় একটি নতুন মত উপস্থাপন করেছেন।—যুগ্ম সম্পাদক

বলা বাহুল্য, অর্জুন বাসুদেবের উপদেশ অনুসারে রথ থেকে অবতরণ করে দুর্গাকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করে স্তুতির মাধ্যমে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। দেবী ভগবতীও অচিরেই সেখানে আবির্ভূতা হলেন এবং বিজয়লাভের বর দান করলেন।

অন্যদিকে মহাভারতেরই বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠিরও দুর্গার স্তব করেছিলেন। বারোবছর বনবাসের অন্তে একবছর অজ্ঞাতবাসে যাবার আগে অজ্ঞাতবাস যাতে সফল হয় সেজন্য পান্ডবরা দুর্গা দুর্গতিনাশিনীর স্তব করলেন। সেই স্তবে যুধিষ্ঠির দেবীকে মহিষাসুরনাশিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, মদমাংসবলিপ্রিয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন।

যুধিষ্ঠির-কৃত দুর্গার এই স্তবের মধ্যে তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতে তান্ত্রিক সাধনার ঐতিহ্যও অনেক প্রাচীন। বৈদিক যুগে বা তারও আগে থেকে পাশাপাশিভাবে এই সংস্কৃতি বর্তমান ছিল অন্ত্যজ জাতিদের মধ্যে। সেখানে শক্তিবাদেরই ছিল বহুল প্রাধান্য। তারই কিছু কিছু প্রভাব পরবর্তী কালের বৈদিক বা বৈদিকোত্তর পুরাণ-মহাকাব্যের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পড়েছে। যেমন দেবী দুর্গার দশ মহাবিদ্যার রূপ—কালী, তারা, ষোড়শী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী প্রভৃতি ধারণা তন্ত্র-সাহিত্য থেকে ধার করা। একইভাবে দুর্গাকে হিমালয়কন্যা পার্বতীরূপে কল্পনার মধ্যে পাহাড়িয়া জাতিদের ধ্যান-ধারণার কোন প্রভাবও হয়তো ছিল।

যাই হোক, বৈদিক ধ্যান-ধারণায় নারীশক্তির মহিমাখ্যাপনের যে ধারা সূচিত হয়েছিল, কালের বিবর্তনে ধীরে ধীরে তা আরও বিকশিত হয়েছে। তার কারণস্বরূপ নিশ্চয়ই সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমান ছিল—এটা ধরা যায়। সেই কারণেই নানা বৈচিত্র্যে ভরে উঠেছে ভারতের শক্তিসাধনা এবং দেবী দুর্গার ধারণার মধ্য দিয়ে তার অন্যতম প্রকাশ ঘটেছে। □

নিবন্ধ

সেবাধর্মে নারী

আশাপূর্ণা দেবী

'সেবাধর্ম' অবশ্যই মানুষমাত্রেরই ধর্ম। মানবিক সকল গুণের মধ্যে সেবার প্রেরণাই বোধ করি শ্রেষ্ঠ গুণ—স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। তবু আমাদের চিরন্তন সংস্কারে আর চিরকালীন সংস্কৃতিতে 'সেবা' শব্দটির সঙ্গে 'নারী' শব্দটি যেন একান্তভাবে জড়িত। যেন ঐ নারী শব্দটিই মূর্তিমতী সেবা, মূর্তিমতী করুণা। আমাদের ভাষার ভান্ডারে স্ত্রীজাতি সম্পর্কে অনেক প্রতিশব্দই তো রয়েছে, কিন্তু এই শব্দটির মধ্যে যে-লালিত্য, যে-সুষমা, যে-মর্যাদার ব্যঞ্জনা তেমনটি বুঝি আর কোনটিতেই নেই। এ যেন মায়া দয়া স্নেহ মমতা করুণা সান্ত্বনার একটি প্রতীকী নাম।

আমাদের চিন্তায় ও চেতনায় মানবিক সমস্ত গুণগুলির রূপকল্পনাও তো নারীরূপে। দয়া ক্ষমা শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ। আবার ঐশ্বর্যরূপেও। নারী লক্ষ্মী, নারী অন্নপূর্ণা।

হয়তো বলা হতে পারে, এসব কবি-কল্পনা। ভাবুকের ভাবাবেগের ফসল। কিন্তু সত্যিই কি শুধু তাই? ভাল করে ভেবে দেখলে কি বোঝা যায় না, নারী হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার একটি একান্ত যত্নের সৃষ্টি? এটিকে তিনি একটি বিশেষ অভিপ্রায়ে বিশেষভাবে গড়ে তুলেছেন। তাই তার ওপরেই তাঁর একান্ত বিশ্বাস আর আস্থা। নারীর কাছেই তো গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা জীবজগতের প্রথম প্রাণ-স্পন্দনটুকু। নারী সেই স্পন্দনের রক্ষয়িত্রী, পালয়িত্রী।

কেবলমাত্র মানবসমাজেই তো নয়, সমগ্র জীবজগতের মধ্যেই তো সৃষ্টিকর্তার এই নিয়মটি বিদ্যমান।

এই নিয়মটিকে কার্যকরী করে তুলতে এবং অব্যাহত ধারায় চালু রাখতে মেয়ে জাতটির মধ্যে বেশ ভালভাবেই তিনি ঠেসে ভরে দিয়ে রেখে-ছিলেন মমতা আর সেবার প্রেরণা। সেবা হচ্ছে নারীর সহজাত প্রবণতা। বাল্য থেকেই তাদের মধ্যে এই প্রবণতার বিকাশ দেখা যায়। ঘরে ঘরেই দেখা যায়—"জননীর প্রতিনিধি অতি ছোট দিদি"।

অবশ্য আজকের দিনে নেহাত আধুনিক নাগরিক জীবনে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সন্তানের ব্যবস্থায় এই দৃশ্যটি বিরল হয়ে আসছে, কিন্তু ঐটুকুই তো সমগ্র সমাজ নয়। গ্রামে গঞ্জে সাধারণ গৃহস্থ সংসারে এই দৃশ্যটি নিতান্ত পরিচিত। পাঁচ-সাত বছরের মেয়েটিও জননীর কর্মভার লাঘব করতে ছোট্ট ভাইবোনকে দেখাশোনা করছে, আগলাচ্ছে, ভিজে কাঁথা বদলে দিচ্ছে। আবার আপন স্নেহ সাধে তাকে টিপ কাজল পরিয়ে, চুল আঁচড়ে দিয়ে সাজাবার চেষ্টায় আলোড়িত হচ্ছে।

ছেলেদের মধ্যে কি এমন প্রবণতা দেখা যায়?

গরিবের বাড়িতে একটি মাতৃহীন সংসারে এমন দৃশ্য বিরল নয় যে, একটি বছর আষ্টেকের মেয়েও তার অপটু হাতে বাপ ভাইয়ের জন্য ভাত রাঁধছে, খাবার জল রাখছে, সাধ্যমতো যত্ন করছে। অথচ তার দশ-বারো বছরের দাদাটি হয়তো এর ওপরও মেয়েটার ত্রুটি ধরছে, ফরমাস করছে। মেয়েটি তবুও 'দাদা'র আরাম-আয়েসের ব্যবস্থায় সচেষ্ট সযত্ন। খেটে-খাওয়া গরিব বাপটি গৃহস্থালীর ব্যাপারে ঐ আট বছরের মেয়েটার ওপরই নির্ভরশীল। মেয়েটার আগ্রহ আর দায়িত্ববোধই তাকে নিপুণতার শিক্ষা দেয়।

মেয়েরা সহজাতভাবেই ধরে নেয়, পরিবার-পরিজনদের সেবা করবার, যত্ন করবার আর ব্যবস্থাপনার নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার দায়িত্বটি

তারই। এটি যে সবসময় জোর করে বা শাসন করে তার ওপর চাপানো হয়, তা নয়। স্বভাব-ধর্মেই এ ভার সে নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়।

বিত্তবানদের ঘরে অবশ্যই ছবিটি আলাদা। আর যে-ঘরে গৃহিণী নিজেই খুব করিতকর্মা, একাই একশো, সে-ঘরে বালিকা কন্যার হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনটি হয়তো বিকশিত হবার সুযোগ পায় না। তবু বাড়ির কেউ যদি এক গ্লাস জল চায়, তাহলে বাড়ির ছোট্ট মেয়েটিই জলের গ্লাসটি এনে তার হাতে ধরে দেয়—মেয়েটির থেকে বড় তার দাদাটি নয়। মেয়েটিও ভাবে না, 'দাদা দিক'।

যে তুলনাগুলি দেওয়া হলো সেগুলি অবশ্য নেহাত ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘরোয়া। আসলে বলতে হয়, এই ভাবধারা আমাদের ভারতীয় জীবনের ভাবধারা। আমাদের মেয়েদের মানসিকতাই শৈশব-বাল্য থেকে এই দায়িত্ববোধের অনুপ্রেরণা জোগায়। আর ঐ 'বালিকা-মূর্তিতে স্নেহ-করুণা সেবার আধার' ভাবতে গেলেই মনে ভেসে ওঠে, মা সারদাদেবীর সেই মূর্তিটি—

দুর্ভিক্ষের সময় বাবার দাতব্যছত্রে ক্ষুধার্তদের সামনে গরম খিচুড়ি ধরে দেওয়া হচ্ছে দেখে ছোট্ট হাতে তালপাতার পাখা নিয়ে সেই খিচুড়িকে ঠাণ্ডা করার প্রয়াস।

এই সেবাময়ী মূর্তিই নারীর আদর্শ। সৃষ্টি-কর্তা তাকে সেইভাবেই গড়েছেন। সেবাই নারীর প্রকৃত ধর্ম।

কিন্তু এযুগে—সর্ববিষয়েই যেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে আর সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে একটা জেহাদ ঘোষণাই সমাজজীবনে একটি প্রধান কর্ম বলে বিবেচিত হচ্ছে। হয়তো বা বিরুদ্ধতা করার জন্যেই করা। পরিণামটি শুভ কি অশুভ, সে-চিন্তা না করেই। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর অবিশ্বাস্য সাফল্যের উল্লাসে উল্লসিত মানবসমাজ নিজেকে সৃষ্টিকর্তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে যে উন্মত্ত লড়ালড়ি চালিয়ে চলেছে তার শেষ পরিণাম 'বিশ্বধ্বংস' কিনা কে জানে! যে-বিজ্ঞানীরা সাফল্য অর্জনের জন্য পৃথিবীর সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ লুঠ করে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করে ছেড়ে আপন আপন বিজয় পতাকা ওড়াচ্ছেন, তাঁদেরই কেউ কেউ এখন হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন: "বিজ্ঞানের এই শুভাশুভবোধহীন স্বেচ্ছাচারিতার ফলে আজ আকাশে দূষণ, পাতালে দূষণ, সমুদ্র-গর্ভে দূষণ, পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে দূষণ। এ চলতে থাকলে পৃথিবীর শেষদিন আসন্ন হয়ে আসবে।"

কিন্তু এপ্রসঙ্গ থাক। আমাদের পূর্ব প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। তবু একথা বলা যায়, আমাদের আজকের সমাজজীবনেও অনেক ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ফ্যাশনের খাতিরেই যে নারী-হৃদয়ের সহজাত ধর্মকে ত্যাগ করে একটি বিকৃত আদর্শকে ডেকে আনবার প্রবণতা নারীসমাজকে বেশ বিভ্রান্ত করে তুলছে তাতে কি সংশয় আছে?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ কখনোই এক ছিল না। হওয়া সম্ভবও নয়। এই বিপরীত দুই মেরুর দেশের মধ্যে আর্থিক, সামর্থিক, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক এবং মানসিক—সর্ববিধ পরিবেশেরই আকাশ-পাতাল তফাৎ। কাজেই সমাজজীবনেও আদর্শের তফাৎ থাকবেই।

স্বামীজীর উদাত্ত ভাষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বৈপরীত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা আমাদের সামনে ধরা আছে। অবশ্য সেই তুলনামূলক সমালোচনায় তিনি কখনোই কোন পক্ষের আদর্শকে "একমাত্র এবং শেষ আদর্শ" বলে ঘোষণা করেননি। পক্ষপাতশূন্য নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখিয়েছেন, কোন্ সমাজে কোথায় কি ত্রুটি, কোথায় কি ভুল, আর কোন্‌খানে কাদের শুভ-বুদ্ধির প্রকাশ। তবে তাঁর পক্ষপাতশূন্য দৃঢ় বলিষ্ঠ বক্তব্যের মধ্যে ঘোষিত হয়েছে, নারীধর্মের পরম আদর্শই হচ্ছে—সেবাধর্ম। যে-ধর্মটি 'মাতৃ-ধর্ম' বলেই বিবেচিত। কারণ 'মা' মানেই তো একটি সর্বংসহা আত্মস্বার্থবোধহীন স্নেহ আর সেবার প্রতিমূর্তি। 'মা' যেন কল্যাণ আর মঙ্গলের একটি ভাবরূপ। সন্তানের কল্যাণই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান। তাঁর প্রার্থনার মন্ত্রই হচ্ছে সন্তানের শুভ কামনা। বলা হয়—"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা

কখনো নয়।" পুত্র শত অন্যায়কারী, শত অত্যাচারী নিষ্ঠুর নির্মায়িক হোক, মা কখনোই তার অনিষ্ট চিন্তা করতে পারেন না। ('পুত্র' অর্থে এখানে ছেলে নয়, 'পুত্র' অর্থে সন্তান। ছেলেই হোক অথবা মেয়েই হোক—শত অপরাধ করলেও মা কখনোই সন্তানের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না।)

স্বামীজী বলেছেন: "ভারতীয় নারীর বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে মাতার আদর্শই শ্রেষ্ঠ, স্ত্রী অপেক্ষা তাঁহার স্থান উচ্চে। স্ত্রী-পুত্র হয়তো কখনো পুরুষকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু মা কখনো তাহা করিতে পারেন না।... মায়ের ভালবাসায় জোয়ারভাটা নাই, কেনাবেচা নাই, জরা-মরণ নাই। ...মাতৃপদই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ। কারণ উহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থপর শিক্ষা, নিঃস্বার্থপর কার্য করিবার অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায়।"[১]

স্বামীজী বলেছেন: "আমি বলিতেছি না যে, আমাদের সমাজের নারীগণের বর্তমান অবস্থায় আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকার কেবলমাত্র তাহাদিগের শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।"[২]

সে-যুগে যখন দেশে সনাতনপন্থীরা 'স্ত্রী-শিক্ষা'কে আদৌ সুনজরে দেখতেন না এবং 'প্রয়োজনীয়' বোধ করতেন না (অনেক পণ্ডিতজনও না), তখন স্বামীজীর হৃদয়ের একান্ত চিন্তা—মেয়েদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা। উচ্চশিক্ষা। উপযুক্ত শিক্ষা। স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা। মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রসর হতে না পারলে যে জাতির অনগ্রসরতা ঘুচবে না, এচিন্তার প্রতিফলন দেখা যেত স্বামীজীর নারীজাতি সম্পর্কে সকল উপদেশের মধ্যেই। মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাক। সত্যকার শিক্ষা পাক।

আজকের সমাজ অবশ্যই নারীজাতিকে সে-সুযোগ দিয়েছে। ঢালাও সুযোগই দিয়েছে। দেশের দারিদ্র্য, অসামর্থ্য, অসুবিধা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকে যার ভাগ্যে যতটুকু জুটুক, অধিকারহীনতার প্রতিবন্ধকতা কোথাও নেই। আইন এবং সমাজ আজকের নারীকে বেঁধে রাখেনি কোথাও।

কিন্তু স্বামীজীর সেই স্বপ্ন কি সফল হয়েছে? নিজেদের সমস্যা কি তারা নিজেরা একটুও সমাধান করে উঠতে পেরেছে, বা পারছে?

"সমাজ এখনো পুরুষশাসিত" বলে আক্ষেপই দেখতে পাওয়া যায়। সেই শাসনটি যদি নিতান্তই অপশাসন হয় তো তা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টার শক্তি দেখা যায় কই? কিছু আধুনিক চিন্তাসম্পন্ন মেয়ের তো মুখের ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ বুলিই হচ্ছে—"মনু বলে গেছেন—'মেয়েরা বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকুক।' এসব মেয়েদের পায়ে দলার ষড়যন্ত্র।" এই নিয়ে সেই কোন্ আদ্যিকালের বুড়ো ভদ্রলোকের ওপর আক্রোশের শেষ নেই এঁদের। অথচ কেন কী সূত্রে আর কোন্ পরিবেশে এই অনুশাসন রচিত হয়েছিল তা ভেবে দেখবার ধৈর্য নেই। আর এচিন্তারও খেয়াল নেই, এখনো সেই অনুশাসন মেনেই বা চলছি কেন আমরা? না মানলে কি সেই 'মনু' এসে শাস্তিবিধান করতে বসবেন?

আসলে, মূলে একটু ভুল রয়ে গেছে। শিক্ষা এসে গেছে। কিন্তু "নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করবার" চিন্তায় দীক্ষা আসেনি। তার বদলে প্রবল দীক্ষা এসে যাচ্ছে পশ্চিমী সমাজ থেকে। সেটি শুভকারী কি অশুভকারী তা ভেবে দেখা হচ্ছে না। পুরো দেশটাই যে আমাদের শত সমস্যায় দীর্ণ, কোটি কোটি জন যে বঞ্চনা, অবিচার আর অবহেলার শিকার। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সে-কথাটি মাথায় না রেখে নিজেদেরকে পৃথক একটা সমস্যার বোঝা করে তোলা হয়ে চলেছে 'শিক্ষিত' নারীসমাজের ভ্রান্ত চিন্তার ফলে।

সেদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ক্ষুব্ধচিত্তে আক্ষেপ জানাচ্ছিলেন: "সমান অধিকার। সমান অধিকার।

১ ভারতীয় নারী—স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০শ সং, ১৩৯৮, পৃঃ ১৮

২ ঐ, পৃঃ ৪৭

তো সমানটা কোথায় ? তোমরা মেয়েরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে জায়গা দখল করতে পার। কারুর কিছু বলার নেই। কিন্তু একটা বুড়ো মানুষ নিরুপায় হয়ে রেলগাড়িতে একটা লেডিস কামরায় উঠে পড়ায় একপাল মেয়ে ঝাঁপিয়ে এসে বুড়োকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে নামিয়ে দিলে। এটা কি সমান অধিকারের নমুনা ? নেহাত কপাল জোর ছিল তাই পৈত্রিক প্রাণটা বেঁচে গেছে। অন্য কোন সভ্যদেশে এমনটা হতে পারবে ?”

শুনে সত্যিই বড় দুঃখ আর লজ্জাবোধ হয়েছিল।

‘সমান অধিকারের’ সীমানা নির্ণয় হবে কোন্ মাপকাঠিতে ? এই যে ‘সমান অধিকারের’ দাবিতে সোচ্চার বেশ কিছু মেয়ে দাবি তুলছেন—ঘর-সংসারের গৃহস্থালীর কাজটাজ ভাগাভাগি করে পুরুষরাও করুক। সেই ক্ষেত্রে ‘বিদেশের’ নজির দেখিয়ে দাবি জোরালো করতে যান এঁরা। আর সেই ছাঁচে ঢালাই হতে চেয়ে নিজেরা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন, ‘সেবা’ মানে দাস্যবৃত্তি। সংসারে স্বামী-পুত্র পরিজনের সেবা মানে ‘দাসীত্ব’। এই নিয়ে আন্দোলনে নামারও পরিকল্পনা চলে সম-চিন্তাধারিণী বান্ধবীমহলে।

এও কিন্তু সেই ফ্যাশনের খাতিরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়ার ভ্রান্ত চেষ্টা। প্রিয়জন আপনজনকে সেবা করা, যত্ন করা নারীর সহজাত প্রকৃতি। তাই হয়তো খোঁজ নিলে দেখা যাবে, পুরুষরা তাঁদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ঘরকন্নার কাজ করতে এলেই বরং তাঁরা দারুণ অস্বস্তিবোধ করবেন এবং স্বামীকে প্রায় তাড়া দিয়েই রান্নাঘর ছাড়া করে ছাড়বেন।

স্বামী এবং স্ত্রী দুজনে একই সময় অফিস থেকে ফিরেছেন, দুজনেই সমান ক্লান্ত। তবু যে মহিলাটি তৎপর হয়ে খাবার বানানোর ব্যবস্থায় হাত লাগাতে ছোটেন, সে কি পুরুষের শাসনে ? তাঁর নিজের ভিতরকার মমতা আর সহজাত দায়িত্ববোধই তাঁকে ঠেলে পাঠায়।

মুখে যতই ‘দাসীত্ব বাঁদীত্ব’ বলে তাঁরা রাগারাগি দেখান কখনোই দেখা যায় না যে, এমন ক্ষেত্রে মেয়েটি নিজে বিছানায় এলিয়ে পড়ে (পুরুষের মতো) প্রত্যাশা করছেন ঐ কর্মভারটি সম্পন্ন করতে স্বামীই এগিয়ে যাবেন (ব্যতিক্রম বাদে)।

আমাদের মেয়েরা মুখে যতই ঐসব প্রগতি-মার্কা কথা বলুক বা কাগজে কলমে ঝাঁজালো ভাষায় লিখুক, ভিতরে কিন্তু সেই সাবেকি ভারতীয় নারী। যার মধ্যে এই সংস্কারটি বদ্ধমূল —পরিবার-পরিজনের যত্ন, তদ্বির, সেবা, পরিচর্যা তারই করণীয়।

ছেলেমেয়ের অসুখ করলে মা-ই দেখাশোনা করেন, বাবা নয়। তার জন্যে কর্মস্থলে ছুটি নিতে হলে, নেহাত অন্য পরিস্থিতি না ঘটলে. ছুটি নেন মা-ই, বাবা নন। অসুস্থ সন্তানের সেবা-পরিচর্যার ভারটি নিজে না নিতে পারলে স্বস্তি আছে নাকি ?

যদিও বাইরের জগতে মুক্তি আন্দোলনের শরিক সখীদের কাছে খুব উত্তেজিত আলোচনা হয় এই নিয়ে। সংসারজীবনে নারী-পুরুষের এই বৈষম্যের ব্যবস্থাকেও ‘দাসীত্ব’ ‘বাঁদীত্ব’ বলেই অভিহিত করা হয়। আসলে কিন্তু নারী যা-কিছু করে আপন হৃদয়ের অনুশাসনেই করে। তবে যেহেতু পুরুষের বিরুদ্ধে একটি জেহাদ জিইয়ে রাখা আধুনিকতা, তাই মুখে এসব বলতেই হয়। না বললে মানায় না। ‘শত কাজের মধ্যে রান্নায় এত পারিপাট্য কেন ?’ প্রশ্ন করলে মহিলা অবশ্যই ঝংকার দিয়ে উঠবেন—‘না হলে বাবুর মুখে রুচবে ?’ ‘না রুচলে তোমার কী বয়ে গেল ?’—এপ্রশ্নের উত্তর কি ?

শুধু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই নয়, শুধু মাতা-পুত্রের সম্পর্কই নয়, সকল ক্ষেত্রেই নারী আত্ম-শাসনেই সংসারের সেবা-পরিচর্যা করে মরে। এখ না দেখা যায়, হয়তো সংসারে আর দ্বিতীয় কেউ নেই —পুরুষটি ও তার কোন একটি বৃদ্ধা বিধবা পিসি বা মাসি ছাড়া। সেই বৃদ্ধাই বকুনি খেয়েও যাকে বলে ‘মরে মরে’ সেই ছেলেটার খাওয়া-শোওয়ার তদ্বির তদারক না করে ছাড়ছেন না—গঞ্জনা খেয়েও না। মনোভাব এই—‘আহা এটুকুতে আর আমার এত কী কষ্ট ? অভ্যাসের হাত। কিন্তু

নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে হলে বাছার কষ্টের একশেষ।'

এই মমতা নারী-হৃদয়ের চিরন্তন ধর্ম। বাল্য থেকেই যার বিকাশ।

কিন্তু এই চিরন্তন নারী-হৃদয়ের সহজ প্রবণতাকে পাথর চাপিয়ে রুদ্ধ করে ফেলতে হবে কেবলমাত্র একটি বিভ্রান্তিকর মতবাদে আক্রান্ত হয়ে? একান্ত আপনজনের—প্রিয়জনের সেবা-পরিচর্যাও 'দাসত্ব' বলে গণ্য করতে হবে?

তাই যদি হয় তো ব্যক্তিগত জীবনের অপরিসর ক্ষেত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে জীবনকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবার, নিজেকে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ-কর্মের শরিক হতে পারার উদার চেতনা আসবে কোথা থেকে?

অথচ আজকের মেয়েদের কাছে সে-প্রত্যাশা ছিল। প্রত্যাশা ছিল—'আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার' পাওয়া নারী নিজেকে বিস্তৃত করতে শিখবে, বিকশিত করতে শিখবে সেবায় কর্মে মহত্ত্বে উদারতায়। সে-প্রত্যাশা পূরণের অঙ্গীকার কোথায়? কতটুকু?

শুভবোধহীন বিশেষ কোন একটি মতবাদের অন্ধ অনুসরণও কি একরকম 'দাসত্ব' নয়?

সেবাকর্মের মধ্যেই তো আসে হৃদয়ের শুদ্ধতা। সেবার মধ্য দিয়েই আসে ভালবাসা।

সামান্য একটি গাছকেও যদি নিত্য পরিচর্যা করা যায়, সেই গাছটির প্রতি পরম ভালবাসা এসে যায়। একটি পাখি, জীব-জন্তুকেও যদি শখের ছলে নিত্য একটু আহার দেওয়া হয়, তাদের ওপর মমতা ভালবাসা আসবেই। হয়তো অর্থের বিনিময়েও, কেবলমাত্র 'করণীয় কাজ' হিসাবেও যদি নিত্য একটি বিগ্রহ সেবা করতে হয়, কি একটি মন্দির মার্জনা করতে হয় তাহলে সেই জড়বস্তুর ওপরও একটি বিশেষ ভালবাসা জন্মে যায়। সেবা এমনই পবিত্র সুন্দর কাজ যে, ক্রমশই কর্ম থেকে তা ধর্মে উন্নীত হয়ে ওঠে।

অবশ্যই কেবলমাত্র নারীজীবনের জন্যই নয়। সেবাধর্ম নারী-পুরুষ সকল জীবনের জন্যই—মনুষ্যজীবনমাত্রেই।

কিন্তু সেই সেবাধর্মটি কেবলমাত্র কিছু মার্কা-মারা সমাজসেবামূলক সঙ্ঘ-সমিতি, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মানবধর্ম-চেতনাশ্রয়ী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমেই অনুশীলিত হয়ে চলবে? আর কারো কোন দায় নেই?

সাধারণ সংসারীজনের মধ্যেও কি এই চেতনা আসতে পারবে না—'আমিও এই নিখিল বিশ্বের একজন। আমারও কিছু করবার আছে?'

ক্ষমতার সীমিত সীমায় কারো কোন বিশেষ ভাল করতে না পারলেও ভালবাসতেও তো পারা যায়? ভালবাসাও তো একটি সেবা। স্নেহ, সহানুভূতি, সান্ত্বনা, করুণা, একটুখানি হৃদয়ের স্পর্শ। হতাশ হৃদয়ের কাছে আশার কথা শোনানো, নিরুৎসাহ জীবনে উৎসাহ এনে দেবার চেষ্টা, ব্যর্থ জীবনের কাছে নতুন জীবনের প্রেরণা এনে দিতে পারার চেষ্টা, আর উত্তেজিত অশান্ত বিক্ষুব্ধ বিধ্বস্ত জীবনের কাছে শান্তির স্নিগ্ধতা নিয়ে এসে দাঁড়ানো—এগুলি তো সেবাই; যে-সেবাটি বিক্ষিপ্ত চিত্তের মর্মমূলে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। এমন সেবাটি নারীই পারে অনায়াসে—অবলীলায়।

নারী কল্যাণরূপা, সেবারূপা, মাতৃরূপা। তাই নারী-হৃদয়ই সহজে পৌঁছাতে পারে জগতের যত তাপিত হৃদয়ের কাছাকাছি, যে-পৌঁছানোটা ব্যথিতজনের কাছে পরম সেবাস্বরূপ। সে-সেবা তাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছেই গিয়ে পৌঁছায়। সকল ভালবাসা, সকল সান্ত্বনা, সকল সেবা তো তাঁর কাছ থেকেই আসে। আবার তাঁর কাছেই গিয়ে পৌঁছায়। ☐

বিনোদিনী, রঙ্গমঞ্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

কলকাতার একটি নামী কলেজের অধ্যক্ষ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। একটি লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ "স্টার থিয়েটার যাব কোন রাস্তা দিয়ে?" অধ্যক্ষ ক্ষুব্ধভাবে বললেনঃ "জানি না।" বলে হনহন করে এগিয়ে চললেন। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে তাঁর মনে হলো, তিনি জেনেও "জানি না" বলেছেন, অতএব অন্যায় করেছেন। তাড়াতাড়ি লোকটিকে ডাকলেন। লোকটি ফিরে আসতে তাঁকে অধ্যক্ষ বললেন ঃ"জানি, কিন্তু বলব না।"

এ আখ্যান বহুশ্রুত। কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছে এটি। থিয়েটার সম্পর্কে শিক্ষিত ভদ্র-লোকদের মানসিকতার স্পষ্ট একটা পরিচয় আছে এই ঘটনাটিতে। এই ধারণা দীর্ঘকাল ধরে একই রকম ছিল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পরে, গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হলে 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ "সম্প্রতি বঙ্গের অনেকগুলি সাহিত্যিকের দেহান্ত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন সুপরিজ্ঞাত নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। আমরা তাঁহার কোন নাটক পড়ি নাই, বাঙ্গলা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোন থিয়েটারেও কখনও যাই নাই। এইজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।"

১৯১২ খৃীস্টাব্দে একথা বলছেন সাংবাদিক-শিরোমণি রবীন্দ্র-ঘনিষ্ঠ প্রাজ্ঞ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হবার চল্লিশ বছর পরেও এই অবস্থা। এই থেকে গোড়ার যুগের অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যায়। সেযুগে নাট্য-বিমুখতা ছিল তীব্র। বিরুদ্ধ-লেখাও হয়েছে অগণ্য। এই বিরোধিতার কারণ স্পষ্ট বোঝা যাবে, এমন একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার'-এ (১ পৌষ, ১২৮১) লেখা হয়েছিল ঃ "যাত্রার পরিবর্তে নাটক অভিনীত হইতে দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, এত দিনের পর বিশুদ্ধ আমোদ আস্বাদ করিবার উপায় হইল। কিন্তু সে-আশায় ছাই পড়িল। বেশ্যা দ্বারা অভিনয় করাইলে নাট্যমন্দির আর বিশুদ্ধ আমোদের স্থল রহিল না।... বেশ্যার অভিনয়ে দুইটি দোষ। যে-সকল পুরুষ বেশ্যার সঙ্গে অভিনয় করেন তাঁহাদের চরিত্র ভাল রাখা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা বেশ্যার অভিনয় দেখেন তাঁহাদেরও মন কলঙ্কিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। সুতরাং বেশ্যার অভিনয় অবাধে প্রচলিত হইলে ভারতের আর একটি সর্বনাশের দ্বার খোলা হইবে। ভারতের মঙ্গলের জন্য যাঁরা অর্থ দিয়া, শরীর দিয়া, প্রাণ দিয়া যত্ন করেন তাঁহারা কি এই বেশ্যার অভিনয় প্রচলিত হইতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? যে-ভারতের প্রাচীন আচার্যেরা 'মাতৃবৎ পরদারেষু' এই উন্নত নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, সেই ভারত-সন্তানেরা কি বেশ্যা লইয়া আমোদ করিবেন? শুনিলাম কতকগুলি সুশিক্ষিত লোক নাকি বেশ্যার অভিনয়ে উৎসাহ দিয়া থাকেন। যে-সুশিক্ষার ফল বেশ্যার আমোদ, সে-সুশিক্ষার মুখে আগুন। যদি ভদ্র-পরিবারের স্ত্রীলোকরা বেশ্যার অভিনয় দেখে, তাহা হইলে তাহাদের যে কি সর্বনাশ হইবে তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না। এসকল কথা কি মনে পড়ে নাই? ভারতের অস্থিচর্মসার এ অবস্থায় নির্দয়-রূপে ভারতমাতার মর্মে আর আঘাত করিও না ...। দেশ ডোবে, আর কুনীতি বিস্তার করিও না।"

দেখা যাচ্ছে এঁদের মঞ্চ-বিমুখতার প্রধান কারণ নটী-সংসর্গ। অভিনেতারা তাদের দৈনন্দিন সংসর্গে এসে কুপথগামী হবে। দর্শকরাও অভিনয়-রত নটীদের দেখে ভ্রষ্ট হবে। বাংলা মঞ্চের একেবারে গোড়ার যুগে এইসব প্রশ্ন উঠেছিল। নারী তথা নটী নিয়ে অভিনয় করা উচিত হবে কিনা? মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমর্থন করে-

ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমর্থন করেননি, বাধাও দেননি। নিজে সরে এসেছিলেন।

অভিনেতার সঙ্গে অনেকে মেয়ের বিয়ে দিতে আপত্তি করতেন। এমন একটি ঘটনার কথা বলেছেন 'সুলভ সমাচার' (২৩ বৈশাখ, ১২৮১)। এক ডেপুটি-কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ এসেছিল একজন অভিনেতার সঙ্গে। কন্যা নিজেই সেই বিয়েতে আপত্তি জানায়। 'সুলভ সমাচার' খুশি হয়ে মন্তব্য করেছেঃ "...শিক্ষার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

অভিনেত্রীদের বিয়ে দিয়ে সমাজে স্থান দেওয়া যেতে পারে কি? তেমন চেষ্টা করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। সুকুমারীর (গোলাপসুন্দরী) সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন গোষ্ঠবিহারী দত্তের। তিনি এঁদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজের একটা বড় অংশ তা চায়নি। গোষ্ঠবিহারী দত্ত শেষে সুকুমারীকে ফেলে পলাতক হন। 'সুলভ সমাচার' (১২ ফাল্গুন, ১২৮১) এবিষয়ে মন্তব্য করে। মন্তব্যটি অনুকূল নয়। অন্যান্য কাগজের সুরও এই ধাঁচেরই ছিল।

তাহলে কী উপায়?

প্রাচীন অনেক শাস্ত্র ও অনেক ব্যক্তি তো নারী মাত্রকেই "নরকের দ্বার" বলেছেন। তাহলে বারবনিতারা বৃহত্তর দ্বার। কারণ তারা পণ্য। নগদ মূল্যে লভ্য। কিন্তু বাইজী-বিলাস তো সেকালের আভিজাত্যের অঙ্গ। তাছাড়া পতিতা-বৃত্তিও নিষিদ্ধ ছিল না। তাহলে থিয়েটারে আপত্তি কেন আপত্তির কারণ, বাইজী-বিলাস বা পতিতা-সংসর্গ ধনী লোকের 'প্রাইভেট' ব্যাপার। কিন্তু থিয়েটার সুলভ মূল্যের 'পাবলিক' ব্যাপার। সংসর্গের মাত্রা এখানে খুবই কম। দৃষ্টি-সংযোগ মাত্র। তবু সমাজপতিদের মনে হলো, নরক এতদিন আবদ্ধ ছিল কতগুলি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে। এখন মঞ্চ-মাধ্যমে তা ছড়িয়ে গেল সর্বত্র। এই আশঙ্কায় চেঁচামেচি শুরু হয়েছিল উচ্চকণ্ঠে।

তাহলে কী উপায়? সমাজপতি ও পত্রিকার একটা বড় অংশ নারীকে তথা নটীকে দিয়ে অভিনয়ের বিরুদ্ধতা করেছে। কিন্তু কোন উদ্ধার-পথ বাতলায়নি। মেয়েদের ভূমিকায় পুরুষদের নামিয়েছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু সেইসব থিয়েটারে দর্শক আসেনি। তাথেকে জনমত কোন্ দিকে তা বোঝা যায়। প্রশ্নটা এভাবে এসে গেলঃ হয় মেয়ে নিয়ে অভিনয়, নয়তো মঞ্চ-লোপ। কিন্তু মঞ্চ-লোপ তখন কি আর সম্ভব? বা উচিত? ঔচিত্য নিয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সম্ভব-অসম্ভবের ব্যাপারে একটাই উত্তরঃ 'সম্ভব নয়।' কেন নয়? নবজাগ্রত বাঙালীর ধমনীতে তখন আর্টের তৃষ্ণা, কারুর বা প্রমোদের তৃষ্ণা। বিদেশী শাসকদের মুখের ওপর পালটা জবাব দিতে হবে—'জাতীয়' জবাব। আর এসবকে নিয়ে, এসবকে ছাড়িয়ে, চারদিকে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি ব্যাপার। তার নাম ব্যবসা। মুদ্রা-অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ থিয়েটার থাকবে। আর থিয়েটার যদি অভিনেত্রী ছাড়া না চলে, তাহলে অভিনেত্রীও থাকবে। কোন নিয়মই তাদের মঞ্চ থেকে হটাতে পারবে না। এটাই বাস্তব অবস্থা। তাহলে একটাই পথ—'নরকের কীট'দের 'মানুষ' হতে সাহায্য করা। মানুষের মর্যাদা দিয়ে তাদের মধ্যে যে-ভালটুকু তখনো আছে তাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা। তার নারীত্বকে এবং তার মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করা। তাকে সম্মান দেওয়া। তাকে মানুষের মর্যাদা দেওয়া।

মাতৃসাধক, মাতৃসেবক শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক এই কাজটি করেছিলেন। 'মা' তাঁর আরাধ্যা। এই মায়ের জাতকে তিনি ঘৃণা করেননি। যখন থিয়েটারকে কুৎসিত স্থান বলে মনে করা হতো, যেখানে 'ভদ্র' লোকেরা যেতে চাইতেন না, যেখানকার ঠিকানা শিক্ষিত লোকেরা জানলেও বলতেন না, বলাটা অন্যায় বলে গণ্য করতেন, সেখানে তিনি উপযাচক হয়ে গিয়েছিলেন। 'চৈতন্যলীলা' দেখতে। যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে গেলেন সেদিন তিনি আমন্ত্রিত ছিলেন না। তিনি নাটকটির কথা শুনেছিলেন এবং গিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অতিথি'র আসন দিতে রাজি হলেন, কিন্তু তাঁর

সঙ্গীদের টিকিট কাটতে হলো।

এর পরেও তিনি এসেছেন ; দেখেছেন—নিমাই সন্ন্যাস, প্রহ্লাদচরিত্র, বৃষকেতু, বিবাহবিভ্রাট প্রভৃতি নাটক। কোন ঘৃণা নিয়ে আসেননি। স্নেহ নিয়ে এসেছেন, ভালবাসা নিয়ে এসেছেন। নটীকে দিয়েছেন শিল্পীর সম্মান, দিয়েছেন মানুষের সম্মান। 'মা'-র এই ভক্তসেবক মায়ের জাতের কাউকে নিন্দা করেননি। ঘৃণার সূত্রে আত্মপ্রশংসার দরকার ছিল না তাঁর। তিনি বারবনিতাকে বলেছেন 'মা', বলেছেন 'আনন্দময়ী'। মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেছেন 'হরি গুরু গুরু হরি'। প্রমাণ করেছেন, সব পবিত্রতায় তাদের অধিকার আছে। পদস্পর্শ করতে দিয়েছেন তাদের, নিজে তাদের মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেছেন, বলেছেনঃ "চৈতন্য হোক"। গিরিশচন্দ্রের কথা অনুযায়ী "অনেক পর্বত-গহ্বরবাসী এ আশীর্বাদের প্রার্থী।" বিনোদিনী ছদ্মবেশে অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে গেলে তিনি বিরক্ত হননি, প্রসন্ন হাস্যে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিনোদিনীকে চৈতন্যের ভূমিকায় দেখে বলেছেনঃ "আসল নকল এক দেখলাম"। এটি তাঁর অভিনয় সম্পর্কে প্রশংসা তো বটেই, হয়তো আরও কিছু বেশি।

বিনোদিনীকে এবং সেই সূত্রে সকল নটীদের ও নটদের তিনি হীনতাবোধ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বিনোদিনী লিখেছেনঃ "এ নরকের কীটকে ক্ষমার জন্য তিনি সতত আগুয়ান।" এক জীবনের মধ্যেই বিনোদিনীর জন্মান্তর হয়ে যায়।

আমাদের মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'-র কথাঃ

মা। জাত লুকোসনি? বলেছিলি যে তুই চণ্ডালিনী?

প্রকৃতি। বলেছিলেম। তিনি বললেন, মিথ্যে কথা। তিনি বললেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ। তিনি বললেন, নিন্দে কোরো না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়েও বেশি।

মা। তোর মুখে এসব কী শুনছি! তোর কি মনে পড়েছে পূর্বজন্মের কোন কাহিনী?

প্রকৃতি। এ কাহিনী আমার নতুন জন্মের।

মা। হাসালি তুই। নতুন জন্ম! ঘটল কবে?

প্রকৃতি। সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত বসন তাঁর। বললেন, 'জল দাও'। প্রাণটা উঠল চমকে। শিউড়ে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ভোর বেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ। বললেম, 'আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ।' তিনি বললেন, 'যে-মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ ; সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে।' প্রথম শুনলুম এমন কথা, প্রথম দিলুম এক গণ্ডূষ জল, যাঁর পায়ের ধুলোর এক কণা নিতে কেঁপে উঠত বুক।

মা। ওরে অবোধ মেয়ে, হঠাৎ এত বড় হলো তোর বুকের পাটা! এ পাগলামির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। জানিসনে কোন্ কুলে তোর জন্ম?

প্রকৃতি। কেবল একটি গণ্ডূষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হলো সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।

মা। তোর মুখের কথা শুদ্ধু বদলে গেছে যে! জাদু করেছে তোর কথাকে। কী বলিস নিজে বুঝতে পারিস কিছু?

প্রকৃতি। সমস্ত শ্রাবস্তীনগরে আর কি কোথাও জল ছিল না মা! এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে? একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা। এই মহাপুণ্যই খুঁজছিলেন। যে-জলে ব্রত হল পূর্ণ সে-জল তো আর কোথাও পেতেন না, কোন তীর্থেই না। তিনি বললেন, বনবাসের গোড়াতেই জানকী এই জলেই স্নান করেছিলেন, সে-জল তুলে এনেছিলেন গুহক চণ্ডাল। সেই অবধি নেচে উঠছে আমার মন, গভীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি দিনরাত—দাও জল, দাও জল।

বিনোদিনীদেরও এমনি জন্মান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বাংলা গদ্যেরও সে এক জন্মান্তরের সূচনা। □

প্রবন্ধ

বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

সেই বরাহনগর মঠ থেকে মা দুর্গা আরাধিতা—কখনো ঘটে-পটে, কখনো বা প্রতিমায়। মঠে এখনো সেই ঐতিহ্যের স্রোতোধারা প্রবহমান। কিন্তু যখন মহামায়ার অর্চনায় দিব্যদেহধারী শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদরা মাতোয়ারা হতেন তখন—সে-দৃশ্য আমাদের মননা-লোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—তাঁরা গভীর ভাবে হতেন বিভোর, নৃত্যে তাঁদের অবয়ব অপূর্ব ভঙ্গিমায় আন্দোলিত, সঙ্গীতের সুমধুর মূর্ছনায় তাঁরা অন্তঃরাজ্যে মগ্ন। বাস্তবিক, সে এক আনন্দঘন স্বর্গীয় পরিবেশ। চলুন, আমরাও সেই আনন্দের জোয়ারে ডুব দিই, অবগাহন করি আনন্দ-সমুদ্রে, পান করি আনন্দ-বারি, আহরণ করি আনন্দ-মন্ত্রারাশি।

'কলকাতার বালক' বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরেছেন। বহুকাল তিনি মায়ের পূজো-দর্শন থেকে বঞ্চিত। আশা ছিল সেবারই (১৮৯৭) বঙ্গভূমিতে তথা মঠে দুর্গাপূজোয় প্রাণভরে আনন্দ করবেন তিনি। কিন্তু বিধি বাম। শারদোৎসবে সদলে তিনি পরিভ্রমণ করছেন ভূস্বর্গ কাশ্মীর। পরের বছর তাঁর আক্ষেপ—"৯ বৎসর যাবৎ ৺দুর্গা-পূজো দেখি নাই"[১] দূর হলো। মঠের দুর্গাপূজোয় স্বামীজী আনন্দে মেতে উঠলেন। মঠ তখন নীলাম্বর-বাবুর বাগানবাড়িতে (বর্তমানে 'পুরাতন মঠ')। মঠে ঘটে-পটে মা দুর্গার পূজোর আয়োজন। চণ্ডী-পাঠ হলো নবরাত্রিব্যাপী। মহাসপ্তমীতে স্বামীজী স্বয়ং হোম করলেন। এই শুভদিনে তিনি তাঁর রচিত গভীর ভাবদ্যোতক 'Kali the Mother' কবিতাটি আবৃত্তি করে সবাইকে শোনালেন। মহাষ্টমীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শিষ্য স্বামী বিমলানন্দ সহ স্বামীজী বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ-দর্শনে গেলেন। মহানবমীতে মঠে 'সপ্তশতী' হোম হলো। সকলের সঙ্গে স্বামীজীও যোগ দিলেন। মহানন্দে স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা মঠের দুর্গাপূজোয় অতিবাহিত করলেন।[২]

বেলুড়ে মঠের স্থায়ী আস্তানা হয়েছে। স্বামীজী মঠ প্রতিষ্ঠাও করেছেন (৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৮)। তারপরেই তাঁর দ্বিতীয়বার বিদেশ-যাত্রা। ফিরে এসেছেন বেলুড় মঠে। "যদি খরচায় সঙ্কুলান হয় তো মহামায়ার পূজো করব"[৩]—স্বামীজীর এই শুভ ইচ্ছা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে। বেলুড় মঠে প্রতিমায় প্রথম মহামায়ার অর্চনা। উদ্যোক্তা স্বামীজী নিজেই। তত্ত্বাবধায়ক তাঁর আদরের 'রাজা' স্বামী ব্রহ্মানন্দ। উভয়েরই ভাবচক্ষে দর্শন হয়েছিল মা দুর্গার। মঠে আনন্দের শতধারা। শতধারা সহস্রধারে পরিণত হলো 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীশ্রীমার দিব্য উপস্থিতিতে।[৪] তিনিই মঠে এই শক্তিপূজোর অনুমতি প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর নামেই পূজোর সঙ্কল্প। এ ছিল মণিকাঞ্চন যোগ। স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা—মহামায়ার পূজোয় ছাগবলি হোক, রক্তের স্রোত প্রবাহিত হোক গঙ্গা অবধি। কিন্তু "শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর অনভিমত বলিয়া পশু-বলিদান হয় নাই।"[৫]

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৪৯

২ ব্রহ্মানন্দ চরিত—স্বামী প্রভানন্দ, ১৯৮২, পৃঃ ১৬০

৩ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬

৪ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: শারদীয়া 'উদ্বোধন', আশ্বিন ১৩৯৮, পৃঃ ৫৩৫-৫৩৯

৫ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬

প্রত্যক্ষদর্শী স্বামীজী-শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর দুর্গাপূজার স্মৃতি : "কলিকাতা কুমারটুলী হইতে প্রতিমা আনা হইল। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল পূজক, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা সাধক ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য তত্ত্বধারক হইলেন। যে বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া স্বামীজী একদিন গান গাহিয়াছিলেন, 'বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন'—সেইখানেই বোধনাধিবাসের সান্ধ্যপূজা সম্পন্ন হইল। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্বাহিত হইল,…।"[৬] স্বামীজীর আরেক শিষ্য স্বামী অচলানন্দের (কেদার বাবা) স্মৃতি : "১৯০১ খ্রীস্টাব্দে শারদীয়া পূজার ষষ্ঠীর দিন আমি বেলুড়ে উপস্থিত হই।… সপ্তমীর দিন পূজা বিশেষ আড়ম্বরে সম্পন্ন হলো।… প্রথমদিনের পূজায় স্বামীজী খুব আনন্দ করেছিলেন। অষ্টমীর দিন তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি সর্বদা আনন্দ ও হাস্য-পরিহাস করতেন, বিশেষ কষ্ট হলে কেবল খানিকটা চুপ করে থাকতেন।… নবমীর দিন 'নল-দময়ন্তী' নাট্যাভিনয়ের সময় তিনি কতই রঙ্গ ও হাস্য-পরিহাসাদি করছেন।… দশমীর দিন বিসর্জনের সময় প্রতিমা মুন্সীদের নৌকায় তুলে পূজনীয় রাখাল মহারাজ বৃন্দাবনী আঁচলা পরে মা দুর্গার সামনে ব্যান্ড বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সুমধুর নৃত্য করেছিলেন, তা দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। মনে হলো শ্রীকৃষ্ণ যেন মায়ের সম্মুখে লীলায়িত ভঙ্গিতে নৃত্য করছেন। স্বামীজী মঠের বারান্দা থেকে মহারাজের সেই অপূর্ব নৃত্য উপভোগ করেছিলেন।"[৭] স্বামীজীর শরীর অসুস্থ হলেও "সন্ধিক্ষণে উঠিয়া মহামায়ার চরণে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। নবমী রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া দু-একটি গান গাহিলেন।"[৮] মণ্ডপে স্বামীজী কুমারীপূজা এবং 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীশ্রীমায়েরও পূজা করেছিলেন।

এই দুর্গাপূজার সংবাদ স্বামীজী প্রেরণ করেছিলেন তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যাদ্বয়কে—ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিস্টিনকে[৯] : "আমরা এনেছিলাম মায়ের মাটির প্রতিমা। তাঁর দশ হাত ; সিংহের ওপর তাঁর এক চরণ ; অন্যটি অসুরের ওপর। তাঁর দুই কন্যা—একজন ঐশ্বর্যের দেবী এবং অন্যজন বিদ্যা ও গীতবাদ্যের দেবী। দু-জনেই কমলাসনা। তাঁদের নিচের সারিতে মায়ের দুই পুত্র—শৌর্য ও জ্ঞানের দেবতা।… হাজার হাজার মানুষ আনন্দ করেছিল।" "দুর্গাপূজার সময় থেকেই আমি অসুস্থ। তাই তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। চারদিনব্যাপী আমাদের এখানে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা হয়ে গেল। কিন্তু হায়, ঠিক ঐ সময়ে আমি জ্বরে শয্যাগত। আমাদের প্রতিমা ছিল বৃহৎ ও পূজা ছিল জাঁকজমকপূর্ণ।" বেলুড় মঠে এই দুর্গাপূজাই ছিল স্বামীজীর প্রথম ও শেষ দুর্গাপূজা।

আরও দুবার (১৯১২ এবং ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে) শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে মঠের দুর্গাপূজায় শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদরা আনন্দোৎসব করেছিলেন। দুবারই পূজার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন "মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি" স্বামী প্রেমানন্দজী। মঠে সঙ্গিনীসহ শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন হলে বাবুরাম মহারাজ স্বয়ং 'জয়গুরু, শ্রীগুরু' বলতে বলতে ভাবে তন্ময় হয়ে শ্রীশ্রীমার গাড়ি টেনে মঠের ভিতর এনেছিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! এঘটনা ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের দুর্গাপূজায়। দ্বিতীয়বারে পূজার সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশ সমাজপতি মঠে এসেছিলেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনিও প্রসাদ পাচ্ছেন। বাবুরাম মহারাজ তদারক করছেন। শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য শ্রীশ ঘটকের স্মৃতিতে এই ঘটনা ধরা আছে : "তাঁহাদের কেহ কেহ 'মুগের ডাল' বলিয়া হাঁকিতেছেন, ডালটি নাকি উপাদেয় হইয়াছে। সমাজপতির দিকে চাহিয়া

৬ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬

৭ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পাদিত), ১৯৯০, পৃঃ ৫২-৫৩

৮ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬-২২৭

৯ The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, Vol. II, 1981, p. 609
চিঠি দুটির তারিখ ১২ নভেম্বর ১৯০১। প্রথম চিঠিটি ভগিনী ক্রিস্টিন এবং দ্বিতীয়টি নিবেদিতাকে লেখা।

বাবুরাম মহারাজ কহিলেন: 'আপনার অভ্যর্থনা করতে পারি তেমন সম্বল—ভাব-ভাষা কোথায় পাব? রসকস নেই। আপনার কলমের ডগায় রস টসটস করে।' সমাজপতি সহাস্যে উত্তর দিলেন: 'আপনার কথায় আপনিই ঠকলেন। স্বীকার করলুম আমার কলমের ডগায় রস আছে, কিন্তু রস আপনার কথায়, কাজে, দেহে, প্রাণে।' সমাজপতির কথা শেষ না হইতেই বাবুরাম মহারাজ সরিয়া পড়িলেন।"[১০]

এই দুবার পূজার কোন এক সময়ের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন শ্রীশবাবু: "মঠে দুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীমা আছেন পাশের বাগানবাড়িতে। রাত্রে ঈশানকোণের ঘরে বাবুরাম মহারাজ সহ ধুম কীর্তন চলিয়াছে—'আমায় দে মা পাগল করে'। হঠাৎ বাবুরাম মহারাজ বলিলেন: 'যা, শরৎ মহারাজকে নিয়ে আয়।' শরৎ মহারাজ কহিলেন: 'আমার ওসব হবে না। মুটিয়ে গেছি, নাচতে পারব না।' বাবুরাম মহারাজ সেকথা শুনিয়া বলিলেন: 'তোরা না বাঙ্গাল? যা না, ধরে নিয়ে আয়। নয়তো পাঁজাকোলা করে নিয়ে আয়।' শরৎ মহারাজকে বলিলাম: 'চলুন, নয়তো পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাব।' তখন ঐ গম্ভীর প্রকৃতি মানুষটির প্রতি একটুও ভয় ছিল না। 'নিতে পারবি?' বলিয়া আমাদের টানাটানিতে তিনি উঠিয়া চলিলেন।"[১১]

বেলুড় মঠে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের দুর্গাপূজা। অক্টোবর মাস। এবার পূজার তত্ত্বাবধায়ক স্বামী শিবানন্দ। বাবুরাম মহারাজ অসুস্থ। তিনি বলরাম মন্দিরে। শরীর একটু ভাল বোধ হওয়ায় তিনি একদিন নৌকা করে মঠে পূজা দেখতে গিয়েছিলেন। স্বামী সন্তোষানন্দের স্মৃতিতে এপূজার ভাবঘন দৃশ্য: "১৯১৭ সালের দুর্গাপূজা। মহানবমীর সন্ধ্যা···। দেখলাম মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা মহানন্দে নৃত্যগীতে মগ্ন। একদল গাইছেন, 'জয় শিব, জয় জগৎপিতা', অন্যদল গাইছেন, 'জয় দুর্গা, জয় জগন্মাতা'। আরও দেখলাম যে, সাধু-ব্রহ্মচারীদের একপাশে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজও গান গাইছেন ও নৃত্য করছেন। তাঁর একটি হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত আর তিনি সঙ্গীতের দুটি পদই সমানভাবে গাইছেন।··· ভাব ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে লাগল। মনে হলো যেন আনন্দের বন্যা উঠেছে। বোধ হলো যেন—এই সাক্ষাৎ কৈলাসধাম। ···মনে হলো যেন আমাদের পরিচিত স্থূল জগৎ তাঁর দৃষ্টি থেকে কোথায় লোপ পেয়ে গেছে।"[১২]

"মঠে কেবল পূজা হইয়া গিয়াছে। মহারাজের অসুখের জন্য প্রতিমা আনা হয় নাই; কিন্তু মঠে পূজা হওয়ায় আনন্দের কিছু কসুর ছিল না"—স্বামী তুরীয়ানন্দ লিখেছেন।[১৩] কাল ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাস। এবারের পূজা সম্পর্কে স্বামী গোপেশ্বরানন্দের স্মৃতি: "২৪ আশ্বিন ছিল মহাষ্টমী। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর মঠের উঠানে মহাপুরুষজী কয়েকজন সাধু-ভক্তসহ খোল-করতালযোগে মায়ের গান আরম্ভ করলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।"[১৪]

পরের বছর (১৯১৯) মঠে মহামায়ার পূজায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপস্থিতিতে আনন্দের মাত্রা আরও বর্ধিত হয়েছিল। মহানবমীতে স্বামী সারদানন্দ মঠে এলেন। আর শিবানন্দজী তো ছিলেনই। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে পূজার কদিন আনন্দের ঢল নেমেছিল। স্বামী অপূর্বানন্দের স্মৃতি: "মহানবমীর দিন রাতে এক অভাবনীয় কাণ্ড। কালী-কীর্তনের আসর বসেছে মণ্ডপের পাশের বারান্দায়। রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ সকলেই কীর্তনে যোগ দিলেন। একটা দিব্য গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হলো, খুবই জমজমাট ভাব। পরে মহারাজের আদেশে যখন 'সমরে নাচেরে কার এ রমণী, নাশিছে তিমির তিমিরবরণী' গানটি গাওয়া হচ্ছিল তখন ভাবের আতিশয্যে প্রথমে রাজা মহারাজ দাঁড়িয়ে পড়লেন নৃত্য করতে করতে, সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষজী; শরৎ মহারাজও দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তালে তালে মধুর নৃত্য করতে

১০ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৯৭৫, পৃঃ ১২০-১২১

১১ স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৩৬২, পৃঃ ২৬০-২৬১

১২ শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ—স্বামী অপূর্বানন্দ (সঙ্কলিত), ১ম খণ্ড, ১৩৮৬, পৃঃ ৭১

১৩ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, ১৩৭০, পৃঃ ৩১২

১৪ শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ, ২য় ভাগ, ১৩৮৯, পৃঃ ২৮১

লাগলেন। মনে হচ্ছিল তিনটি দেববালক মাতৃনাম-গানে মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য করছেন।... তাঁদের ঐ ভাবময় নৃত্য ও মাতৃনামগানে মাতোয়ারা ভাব স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। অনেক রাত পর্যন্ত চলেছিল ঐ আনন্দ, নৃত্য, গান।"[১৫]

"মঠে পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতিমা অতি সুন্দর হইয়াছিল। স্বামী বাসুদেবানন্দ তন্ত্রধারক ও ভরত (পরবর্তী কালে স্বামী সন্তোষানন্দ) নামে করপোরেশন স্ট্রীট রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের (পরবর্তী কালে যা 'কলকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম' নামে পরিচিত হয়।) একটি শিক্ষিত ছেলে পূজক ছিল। ললিত চণ্ডীপাঠ করিয়াছিল। আরও অনেকে চণ্ডীপাঠ করিয়াছিল। অতি সুন্দর ভক্তিভাবে, গাম্ভীর্য এবং আনন্দের সহিত মায়ের পূজা হইয়া গিয়াছে।"[১৬] স্বামী শিবানন্দ এসব একটি চিঠিতে লিখেছেন (১।১১।১৯২০)। এবছরের (১৯২০) পূজায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠে উপস্থিত ছিলেন।

কাল ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। এইবারের পূজাতেও ত্রিধারার সম্মিলন হয়েছিল—শিবানন্দজী, সারদানন্দজী ও অভেদানন্দজী। স্বামী দিব্যাত্মানন্দ সেবছর মঠে প্রথম এসেছেন। তাঁর লেখনীতে বিধৃত হয়েছে এই বছরের পূজার সুন্দর এক চিত্র: "মঠ-বাড়ির নিচে বারান্দায় মহামায়া শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিমা গড়া হইতেছে;... মহামায়ার পূজার আয়োজনে খুব ধুমধাম চলিয়াছে। সকলেই যেন এক অপূর্ব আনন্দে ভাসিতেছেন।... ব্রহ্মচারীর নাম 'প্রীতি মহারাজ'—এবারের দুর্গাপূজার পূজারী।... চতুর্থী ও পঞ্চমীর দিন নারিকেল নাড়ু হইল। ষষ্ঠীর বৈকালে সপ্তমীর তরকারি কাটা হইল,... অষ্টমীর দিন পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী উদ্বোধন কার্যালয় হইতে বেলুড় মঠে আসিলেন মাকে দর্শন করিতে।... সন্ধ্যার পূর্বে দেখিলাম আরও একজন মহারাজ কলিকাতা হইতে আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইনি স্বামী অভেদানন্দজী (কালী মহারাজ)।... মহামায়ার পূজাদি বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইল। নিত্য সন্ধ্যারতির পর সন্ন্যাসিগণ মায়ের সামনে কালীকীর্তন করিতেন। মহাপুরুষ মহারাজ প্রতিদিন পূজা দর্শন করিতে নিচে আসিতেন। সন্ধিপূজার সময় মায়ের সামনে বসিয়া ধ্যান করিতেন।... মায়ের ভোগ নিবেদন করার পর ভক্তদের বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়।... সপ্তমীর দিন সাদা ভাত, শুকতো, ভাজা মুগের ডাল, তরকারি (ডালনা), চচ্চড়ি, চাটনি, দই ও বোঁদে। অষ্টমীর দিন খিচুড়ি, তরকারি, চচ্চড়ি, চাটনি, পাঁপর ভাজা, দই ও বোঁদে। নবমীর দিন সাদা ভাত, শুকতো (চালকুমড়া, নালতে পাতা ও নারিকেল সহ) অরহরের ডাল, ওলের ডালনা, চচ্চড়ি, চাটনি, দই ও বোঁদে প্রভৃতি হইয়াছিল। সপ্তমীর দিন প্রায় দুই হাজার, অষ্টমীতে প্রায় তিন হাজার, নবমীর দিনও প্রায় তিন হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান।... ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর প্রতিমা আমতলায় আনা হইল। সেখানে আলপনা দেওয়া ছিল। মাতৃবরণ, পূজারতি, ভোগ নিবেদনের পর হাতে পান দেওয়া হইল। মায়ের সম্মুখে নৃত্য ও ভজন হইল,... বহুক্ষণ এইরূপ নৃত্যগীতের পর ধীরে ধীরে প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হইল। তারপর সকলে আসিয়া পূজামণ্ডপে বসিলেন। পূজারী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শান্তিবারি দিলেন। সকলে বেলপাতাতে দুর্গানাম লিখিয়া বেদিতে রাখিল, পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণামের পর নিচে পরস্পর প্রণাম ও কোলাকুলি হইল।... মায়ের মণ্ডপে কালীকীর্তন হয়।"[১৭]

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। মহামায়ার পূজা সমাগত। শিবানন্দজীর শরীর অসুস্থ। তা সত্ত্বেও মায়ের পূজায় মঠে খুব ধুমধামের কমতি ছিল না। মহাপুরুষ মহারাজ আরামকেদারায় করে নিচে এসে মহামায়ার পূজা দর্শন করেন। সন্ধিপূজার সময়ও এসেছিলেন মণ্ডপে। নিচে আসা-যাওয়ার অসুবিধা বলে তাঁর দোতলার ঘরের পশ্চিমদিকে একটি টালির ছাদের বারান্দা তৈরি করা হয়েছিল। সেখান থেকেই তিনি পূজাদি দর্শন করতেন। এই বছর থেকেই পূজার সময় নহবত বাজাবার ব্যবস্থা হয়।

১৫ সেবালোকে—স্বামী অপূর্বানন্দ, ১৯৯১, পৃঃ ৪৩-৪৪

১৬ মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পৃঃ ১৭১

১৭ দিব্যপ্রসঙ্গে—স্বামী দিব্যাত্মানন্দ, ১৩৮৫, পৃঃ ৯-১২

পুজোর কদিন 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' শব্দে মুখরিত ছিল। মঠে যেন আনন্দের হাট বসেছিল।[১৮]

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের আশ্বিন মাস। পুণ্য জন্মাষ্টমীর দিনে মঠে 'কাঠাম-পুজো' হয়।[১৯] ঐদিন থেকেই মহাপুরুষ মহারাজ মাতৃনামে আত্মহারা হতেন। দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। তিনিও আনন্দে মাতোয়ারা। সপ্তমীতে জনৈক সন্ন্যাসী মায়ের গান গাইছিলেন, মহাপুরুষ মহারাজ শুনছিলেন। ভাবে বিভোর তিনি। গায়ককে কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ "যা, যা—পালা পালা। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলে !..." প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। মণ্ডপে যাবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। চেয়ারে করে তাঁকে নিচে আনা হলো। "মায়ের শিশু করজোড়ে কম্পিতকলেবরে মায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান ! সে বিহ্বল তন্ময়ভাব বলিয়া বুঝাইবার নহে। পরে বলিয়াছিলেনঃ 'দেখলাম সবই মা—স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'।"[২০]

স্বামী শিবানন্দের শেষ দুর্গাপুজো দর্শন ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে। সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত তিনি। চলনশক্তিহীন, বাকশক্তি-রহিত। তবুও শারদীয়া পুজো আগমনে তাঁর প্রাণ আনন্দে নেচে উঠেছে, মুখ-চোখে সেই অব্যক্ত আনন্দের অভিব্যক্তি। "অষ্টমী পুজোর দিন সকাল হতেই তিনি ভাবে ও ইঙ্গিতে নিচে পুজামণ্ডপে যাবার খুব আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন।... অতি সাবধানে আরামকেদারায় বসিয়ে পুজামণ্ডপে আনা হইল।... পুজামণ্ডপে গিয়ে তিনি স্থির হয়ে দেবীকে দর্শন করতে লাগলেন; দুচোখে প্রেমাশ্রুধারা।"—স্বামী অপূর্বানন্দ স্মৃতি-চারণ করেছেন।[২১]

এই বছরের পুজোয় মঠে এসেছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। পুজোর কয়েকদিন আগে থেকে তিনি ভোররাত্রে স্বামীজীর ঘরের কাছে বসে মায়ের নাম করতেন ও বলতেনঃ "স্বামীজীকে শোনাচ্ছি।" ষষ্ঠীর রাত্রে তাঁর এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন হলো। স্বামীজী তাঁকে বলছেনঃ "গ্যাঞ্জেস ! [স্বামীজী তাঁকে ঐ নামে বা 'গঙ্গা' বলে সম্বোধন করতেন।] আমার কাপড়-চোপড়ে ন্যাপথলিনের গন্ধ কেন রে ? আমাকে আজকের দিনে নতুন কাপড় দিবিনি ?" ঘুম ভেঙে গেল অখণ্ডানন্দজীর। তিনি পুজারীকে ডাকলেন ও একটা নতুন কাপড় আনতে আদেশ করলেন। স্বামীজীর ঘর খুলে ধুপ দেওয়া হলো। পরে তিনি স্বহস্তে অগুরুবাসিত নতুন কাপড় স্বামীজীকে নিবেদন করলেন। পুজারীকে বললেনঃ "মঙ্গলারতি কর।" পুজক বললেনঃ 'মহারাজ, এখন রাত আড়াইটে !" অখণ্ডানন্দজী বললেনঃ "আজ আড়াইটেই চারটে মনে কর।" পুজারী আদেশ পালন করলেন। মহামায়ার পুজায় স্বামীজীকে নতুন বস্ত্র পরিয়ে অখণ্ডানন্দজী মনে পরম শান্তি ও আনন্দ অনুভব করলেন।[২২]

মঠে কোন এক দুর্গাপুজোয় মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদরা মণ্ডপে ধ্যানমগ্ন। সন্ধ্যারতির পর মায়ের সম্মুখে ধুনুচি-নৃত্য হচ্ছে। মহাপুরুষ মহারাজ ও শরৎ মহারাজ দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করলেন। যেন মাতৃভাবে মাতোয়ারা দুটি দেববালকের নৃত্য। বাস্তবিক স্বর্গীয় সেই দৃশ্য।[২৩]

১৮ দিব্যপ্রসঙ্গে, পৃঃ ৫২-৫৩

১৯ কাঠ, বাঁশ, খড় প্রভৃতি দ্বারা গঠিত প্রতিমার কাঠামোকে 'কাঠাম' বলা হয়। সাধারণতঃ কাঠের পাটাতনের ওপর বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে এটি তৈরি করা হয়। এই কাঠামোকে পুজো করা হয়।

২০ মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, ১৩৭৭, পৃঃ ২৫৯

২১ দেবলোকে, পৃঃ ২৭২-২৭৩

২২ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, ১৯৮২, পৃঃ ২৮২

২৩ শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৪-১৪৫

॥ ৪ ॥

বিজয়া দশমী। মা কৈলাসে চলে যাবেন। আনন্দের যতিচিহ্ন পড়বে এবার। প্রতিমা বিসর্জনের জন্য গঙ্গার ঘাটের নিকট রাখা হয়েছে। ভজন হচ্ছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন নিচে গঙ্গার দিকে বেঞ্চে বসে তা শ্রবণ করছেন এবং মাকে দর্শন করছেন। এমন সময় বিজ্ঞান মহারাজ এলেন। তাঁকে দেখেই রাজা মহারাজ বললেন: "পেসন, মা যাচ্ছেন, তাঁর কানে কানে বলে এসো, 'মা, তুমি আবার এসো'।" স্বভাবগম্ভীর বিজ্ঞান মহারাজ তাই করলেন। রাজা মহারাজ ছাড়বার পাত্র নন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "কি বলেছ পেসন?" ছোট্ট বালকের মতো বিজ্ঞান মহারাজ বললেন: "বলেছি, 'মা, তুমি আবার এসো'।"[২৪]

আরেক বিজয়ার দিনে ঘাটের কাছে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বামী সারদানন্দ সাধু ও ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করছেন, এমন সময় বাবুরাম মহারাজ হঠাৎ উপস্থিত হয়ে নতশিরে তাঁকে প্রণাম করবার উপক্রম করলেন। সারদানন্দজী অমনি খপ করে তাঁকে ধরে ফেললেন এবং দুহাতে এমনভাবে শূন্যে উঠালেন যে, তাঁর পদযুগল শরৎ মহারাজের কপালে ঠেকে গেল। "কেমন, এবার হয়েচে তো?"—শরৎ মহারাজ বললেন। বাবুরাম মহারাজ যুক্তকরে নমস্কার করলেন।[২৫]

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে বিজয়ার দিনে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর প্রেমানন্দজীর নির্দেশে একজন প্রাচীন সন্ন্যাসীকে শিব সাজানো হয়েছিল। সেই সন্ন্যাসী শিব সেজে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলে বাবুরাম মহারাজ স্বহস্তে তাঁকে মাল্যভূষিত করলেন। প্রাচীন ও নবীন সন্ন্যাসীরা শিবকে ঘিরে ঘিরে আনন্দময় শিবনৃত্যে মেতে উঠলেন।[২৬] এ যেন সাক্ষাৎ কৈলাস। যেন শিব সহ শিবানীর কৈলাসে প্রত্যাবর্তনে শিবপার্ষদদের আনন্দসাগরে অবগাহন।

বেলুড় মঠে একবার বিজয়া দশমীর দিন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মঠের দুর্গাপূজার তন্ত্রধারককে জিজ্ঞাসা করলেন: "মায়ের বিসর্জন কোথায় হবে?" তন্ত্রধারক উত্তর দিলেন: "কেন? গঙ্গায়, যেমন বৎসর বৎসর হয়।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন: "না, না, হৃদয়ে মাকে বিসর্জন দিতে হয়। হৃদয়ে মায়ের নিত্যাধিষ্ঠান। হৃদয়স্থ দেবতাকে প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত করে পূজা হয়েছিল। পূজান্তে তাঁকে আবার হৃদয়ে রাখতে হবে।"[২৭]

বিজয়ার দিনে একটি বিল্বপত্রে শ্রীশ্রীদুর্গানাম লিখে মায়ের বেদিতে রাখা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত। এর আসল রহস্য কি? স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন: "একটি বিল্বপত্রে তিনটি পাতা রয়েছে—ঐ প্রত্যেকটি পাতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়-এর বা ত্রিতত্ত্বের (trinity) জ্ঞাপক। আর সমগ্র বিল্বপত্রটি ভগবানের মাতৃভাবের প্রতীক। সেইজন্যই তাতে শ্রীদুর্গানাম আলতা দিয়ে লিখতে হয়।"[২৮]

উপসংহারে আমরা শ্রবণ করি মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ কথিত বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার মাহাত্ম্য: "দেখ, মঠে মায়ের পুজো যেমন হয় তেমনটি আর কোথাও হয় না। এখানকার পুজো ঠিক ঠিক ভক্তির পুজো। আমাদের কোন কামনা নেই, আমরা কেবল মায়ের প্রীতির জন্য এই পুজো করি। আমাদের একমাত্র প্রার্থনা—'মা, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমাদের ভক্তি-বিশ্বাস দাও আর সমগ্র জগতের কল্যাণ কর।'... এখানে মায়ের যেমন প্রকাশ তেমনটি আর কোথাও পাবে না, বাবা, বলছি।... মা এখানেই সদা বিরাজমানা।"[২৯] ☐

২৪ পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, ১৯৭৭, পৃঃ ৮৩-৮৪

২৫ প্রেমানন্দ-প্রেমকথা, পৃঃ ২০৩

২৬ ঐ, পৃঃ ২০৫

২৭ প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—সুরেশচন্দ্র দাস ও জ্যোতির্ময় বসুরায় (সম্পাদিত ও সংকলিত), ১৩৮৪, পৃঃ ৩১৭

২৮ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ (সংকলিত), ১৯৮৪, পৃঃ ১৩৯

২৯ শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, ১৩৮৭, পৃঃ ১৭৯-১৮০

রম্যরচনা

আঁটি

স্বামী গোপেশানন্দ

ভক্তেরা ঠাকুর-দেবতার পূজায় নৈবেদ্য নিবেদনের পর প্রসাদ পেয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন। সব প্রসাদ, প্রসাদ হলেও নৈবেদ্যের প্রকারভেদ আছে। কথায় বলে, "যে দেবতার যে নৈবেদ্য"। মা-কালীর চাই পাঁঠা, যদি না বৈষ্ণবদের হাতে পড়ে মা আমার নিরামিষাশী হয়ে থাকেন। শিবঠাকুরের চাল-কলা, সাথে সিদ্ধি থাকলে আপত্তি নেই। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষীর-ননী, শ্রীরামকৃষ্ণের সুপার ফাইন লুচি ও নামমাত্র তণ্ডুলমিশ্রিত পরমান্ন, সাথে জিলাপী থাকলে উত্তম। শ্রীরামচন্দ্রের তথা রঘুবীরের চাই আম।

রঘুবীরের কেন আম চাই এবিষয়ে গবেষণার আগে একটা অতি পুরনো গল্প আপনাদেরকে শোনাই—বীর হনুমান তো তড়িঘড়ি এক লম্ফে সাগরপাড়ি দেবার সময় সাথে খাবার নিয়ে যেতে ভুলে গেছিলেন। এত বড় শরীর নিয়ে অত বড় লম্ফ দেবার জন্যে যে প্রচণ্ড খিদের উদ্রেক হলো তা নির্বাপিত হবে কি করে? তখন তো ওখানে আমাদের হাইকমিশনারের অফিস ছিল না যে, খাবার কিছু মিলবে। নিরুপায় বীর হনুমান যত্রতত্র গাছপালার মুণ্ডুপাত করে যা পেলেন তা গবাগব ভক্ষণ করতে লাগলেন। এটা-ওটা সাবাড় করতে করতে হঠাৎ অতি সুস্বাদু অমৃত ফল পেয়ে তাঁর পরম 'অমৃতের' কথা মনে পড়ল। ইচ্ছা হলো, এ-ফল এখনই জানকীনাথকে খাওয়াই। যেমন ভাবা তেমন কাজ। একটার পর একটা গাছের সকল আম সাবাড় করে এলোপাতাড়ি আম ছুঁড়তে লাগলেন। যাতে অন্ততঃ কয়েকটা গিয়ে রঘুপতির ক্যাম্পে পড়ে। পড়েও ছিল এবং ভগবান রামচন্দ্র স্বয়ং সেই আম ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হয়ে ইচ্ছা করলেন—"ফলুক এ সুন্দর ফল সমগ্র ভারতে"। আর সেবক হনুমানকে আশীর্বাদ করলেন—'কৃত-কৃত্যোভব, জয়োঽস্তু তে' বলে। তবে বড় বড় আনগুলো কেন যে কেবল মালদায় এসে পড়েছিল—সেকথা এ-গল্পে নেই।

হনুমানের এই কাণ্ড-কারখানা এবং ভারতে তথা বাংলাদেশে এমনভাবে এই আমের আবির্ভাব-কাহিনীকে নেহাত গালগল্প মনে করলেও একথা কিন্তু বলা যায় যে, রঘুবীর আম খেয়েছেন এবং শুধু খাননি, বালকরূপী রঘুবীর ওরফে গদাই আম খেয়ে প্রসাদী আঁটি তাঁদেরই বৈঠকখানার প্রবেশ-দ্বারের একপার্শ্বে রোপণ করেছিলেন। কেন রোপণ করেছিলেন? এই মনে করে কি—এই আঁটি থেকে গাছ হবে, আম হবে এবং রঘুবীরের ভোগ হবে? উনি যাই মনে করে এ-কাজ করে থাকুন, ঐ গাছ এখন পল্লবিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করে প্রতি বছর রঘুবীরকে আম দিয়ে আসছে। বিশ্বাস না হয় কামারপুকুরে গিয়ে দেখুন। দেখবেন, ভক্তেরা ঐ গাছকে হাত বুলিয়ে সেবা করছেন। আবার যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা সুবিধামত ঐ গাছের আঁটি নিয়ে নিজ নিজ গৃহে গিয়ে রোপণ করছেন। কেন এমন করছেন?

করবেনই তো। কেন করবেন তা অনুসন্ধান করবার আগে আমাদের আরও কিছু জানতে হবে।

আমাদের মধ্যে কেউ পড়েছি, কেউ শুনেছি শ্রীভগবান আমাদের ভালবাসেন বলেই কৃপাপরবশ হয়ে একাধিকবার নররূপ ধারণ করে আমাদের মাঝে এসেছেন এবং মোটামুটি মানুষ ভাবেই মানুষদের মধ্যে বিরাজ করেছেন। মোটামুটি বলছি এই কারণে যে, পুরোপুরি মানুষের মতো বলতে আমরা যে যাই বুঝি না কেন, তার জন্যে তাঁর আসবার দরকার নেই—সেকথা পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেই বোঝেন। নররূপে তিনি ধারণ

করেন ; কিন্তু সেই স্থূল শরীর দেখতে কেমন তা আমরা জানতাম না ফটো তোলার ব্যবস্থা না থাকায়। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন এলেন তখন ফটো তুলে রাখবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে কিন্তু তখন তো আর কাঁধে কাঁধে এত ক্যামেরা শোভা পেত না। তাই কেমন করে তিনি চলতেন, কেমন করে নাচতেন, কেমন করে ফুল তুলতেন, কেমনভাবে পূজা করতেন ইত্যাদির কোন ছবিই আমরা পাইনি। তবে বর্তমান যুগের মানুষের পরম সৌভাগ্য যে, তাঁর গোটা কয়েক স্টিল ছবি অন্ততঃ পাওয়া গেছে। তবে সে-ছবিগুলোতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানুষ-ভাবের নিতান্ত অভাব। কারণ, তিনি তখন সমাহিত, ঈশ্বরের সাথে একীভূত। সত্যিই ঈশ্বরের ছবি এই প্রথম মানুষ পেল। আর কি বলা যায়, ঈশ্বর শুধুই নিরাকার? এই রকম এক ছবি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন—'এ ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে।' মন্দিরে-মন্দিরে, মসজিদে-মসজিদে, চার্চে-চার্চে না বলে ঠাকুর শুধু 'ঘরে ঘরে' বললেন কেন, সে স্বতন্ত্র কথা। প্রশ্ন হচ্ছে, ভক্তের মন কি শুধু ফটোতে ভরবে? তাহলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র অতি যত্নসহকারে ও ততোধিক সংগোপনে রক্ষা করা হচ্ছে কি শুধু তাঁর সন্ন্যাসি-সন্তানদের জন্য? গৃহিভক্তরা কি শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত কোন কিছুই পাবেন না? এ কি কখনো সম্ভব? শ্রীভগবান নিজ মুখে বলেছেন: 'ভক্ত বলে বোকা হবি কেন'? তাই তাঁর 'বুদ্ধিমান' ভক্তরা কৌশল করে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তরোপিত আমগাছের আঁটি সংগ্রহ করছেন ও যথাসময়ে তা পুঁতে ফলও পাচ্ছেন। এখন কৌশলটি কি সেকথা আপনাদেরকে খোলসা করে বলি।

বীজে প্রাণ আছে। বীজ সে-খবর রাখে কিনা অথবা বীজ চেতন বস্তু কিনা তা খোঁজ করবার এখন দরকার নেই। তবে সেই বীজই বড় গাছ হয়, ফলও হয়। ওর থেকে আবার বীজও হয়। প্রথম গাছটা কালে পঞ্চভূতে মিশে গেলেও অন্য গাছে তার প্রাণ রয়ে যায়। একেই বলে বংশরক্ষা। প্রাণী মরে যায়, কিন্তু প্রাণকে রেখে যায়। তবে সব প্রাণীরই যে চেতনা আছে সেটা বলতে পারি না। আমার প্রাণ আছে। কিন্তু যে-চেতনা থাকলে আমি নিজেকে জানতে পারব, সে-চেতনার হদিস আমি এখনও পাইনি। এজীবনে সে-চেতনা চেতিয়ে উঠবে কিনা তাও জানি না। কিন্তু প্রাণ আছে—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন 'বুদ্ধিমান' ভক্তরা যে-আঁটি নিজের নিজের বাড়িতে বা জায়গায় রোপণ করেছিলেন তা থেকে যে-গাছ হচ্ছে বা হবে সেই গাছের যে-আঁটি, তাতে ঠাকুরের শ্রীহস্তে রোপিত আদি বৃক্ষের প্রাণের ধারা বর্তমান। সুতরাং এই গাছের আঁটি ভক্তেরা রোপণ করবেনই। উপযুক্ত সেবা-পরিচর্যার পর সময় এলে এও পল্লবিত হয়ে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করবে—যেমন গুরুদত্ত বীজমন্ত্রে সেই জগদ্‌গুরুর শক্তির ধারা বর্তমান থাকে, সময় হলে সেই অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ পায়। সুতরাং হতে পারে এটা আঁটি, কিন্তু সর্বদা মনে রাখতে হবে—এ হচ্ছে সেই মহান বৃক্ষেরই আঁটি। আশা করি, এতেই ফল ফলবে। □

স্মৃতিকথা

শ্রীমা সারদাদেবীর পদপ্রান্তে

সুধীরচন্দ্র সামুই*

আমি অতি শৈশব থেকে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার স্মৃতি থেকে কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। আমার বাবার নাম সতীশ সামুই। আমার ঠাকুরমা (পিতামহী) মায়ের কাছে 'সতুর মা' নামে পরিচিতা ছিলেন। মায়ের 'নতুন বাড়ি' তৈরি হবার পর থেকে আমার ঠাকুরমা মায়ের বাড়ির পরিচারিকার কাজ করতেন। প্রতিদিন সকালে তাঁর মাটির মেঝের ঘরগুলি প্রলেপ দেওয়া ও তাঁর নৈশব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধৌত করার কাজ আমার ঠাকুরমা করতেন। সেই সুবাদে প্রায় প্রতিদিন আমি ঠাকুরমার সঙ্গে তাঁর কাছে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। শ্রীশ্রীমাও আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। মায়ের আদেশে পূর্বরাত্রির ঠাকুরের ভোগের কিছু প্রসাদ আমার জন্য তোলা থাকত। সেই লোভেই আমি ঠাকুরমার সঙ্গে মায়ের বাড়িতে প্রায়ই যেতে অভ্যস্ত হই।

আমার বাবা নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু একজন দক্ষ চাষী হিসাবে গ্রামে পরিচিত ছিলেন। মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমা আমাদের বাড়িতে আসতেন। প্রায়ই তরি-তরকারির প্রয়োজন হতো। তিনি বলতেন: "আমার কয়েকজন ছেলেমেয়ে এসেছে। কি কি তরকারি (কাঁচা সবজি) কিনতে পাওয়া যাবে?" প্রয়োজন মতো সবজির কথা বলে তিনি বলতেন: "সতুর মা, তোমার নাতিকে দিয়ে ওগুলি আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।" আমিও সানন্দে সেগুলি নিয়ে পৌঁছে দিয়েছি। বাবা নিরক্ষর হওয়াতে সব জিনিসের দাম ঠিক হিসাবমত নিতে পারতেন না। লোকে তাঁকে প্রায়ই ঠকাত। সেজন্য শ্রীশ্রীমা আমার ঠাকুরমাকে বলতেন: "সতুর মা, তোমার নাতিকে লেখাপড়া শিখিও। ওর লেখাপড়া হবে।" এই বলে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর অসীম আশীর্বাদ না পেলে নিরক্ষর পিতার পুত্র হয়েও যে আমি জয়রামবাটী গ্রাম থেকে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তা কোনদিনই সম্ভব হতো না।

শ্রীশ্রীমার এক পায়ে বাত ছিল। সেজন্য তিনি হাঁটু মুড়ে বসতে পারতেন না। তিনি আমাদের বাড়িতে এলে তাঁকে মাটির দাওয়ায় কম্বল পেতে দেওয়া হতো। তিনি পা ঝুলিয়ে বসতেন। আমি দেখেছি, তিনি তাঁর নতুন বাড়ির ঘরে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন, আর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁর পায়ে পদ্মফুল দিয়ে পূজা করছেন। তখন অবাক হয়ে শিশুসুলভ মনোভাব নিয়ে শুধু ভাবতাম কে তিনি? কেন তাঁকে মহারাজ সাধু-সন্ন্যাসী হয়েও পূজা করছেন? কিছু বুঝবার মতো ক্ষমতা ও বুদ্ধি তখন আমার ছিল না।

তখন গ্রামে পাঠশালা ছিল না। সেজন্য শ্রীশ্রীমা গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করান। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বেতন দেবার ব্যবস্থাও তিনি করেন। তখন বাঁকুড়া থেকে বিভূতি ঘোষ মহাশয় প্রায়ই জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে আসতেন। তিনি বিভূতিবাবুকে 'কালো মাণিক' বলে স্নেহ করে ডাকতেন। গ্রামের দরিদ্র চাষীদের প্রতি তাঁর অসীম দরদ ছিল। শ্রীমাকে বলতে শুনেছি: "বিভূতি আমোদর নদীতে বাঁধ বেঁধে ঐ জল আহেরে (বর্তমানে মায়ের দীঘিতে) এনে দিলে গ্রামের গরিব চাষীরা উপকৃত হবে। প্রায়ই খরাতে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তুমি চেষ্টা করে জলের ব্যবস্থা করে দিলে অনেকে উপকৃত হবে।" সেই সময়

* লেখকের বাড়ি জয়রামবাটী। ডেওপাড়া চম্পামণি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক। বর্তমানে বয়স ৮৫ বছর।—যুগ্ম সম্পাদক

বদনগঞ্জ স্কুলের প্রধানশিক্ষক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই প্রতি শনিবার মায়ের কাছে আসতেন এবং রবিবার অপরাহ্নে স্কুলে ফিরে যেতেন। সঙ্গে তাঁর অনেক ছাত্রকেও আসতে দেখেছি। তাদের মধ্যে ছিলেন 'রামময়' নামে এক অল্পবয়সী ছাত্র। এই রামময় শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ স্নেহভাজন হন। পরে ইনিই স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ মহারাজ হয়েছিলেন। তিনি যখন সংসার ত্যাগ করার কামনা নিয়ে মায়ের কাছে আসেন তখন তাঁর পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসে তাঁকে সংসারে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে কান্নাকাটি করেন। শ্রীশ্রীমা তাঁদের বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এই দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখার সুযোগ পাই।

ডাকাত আমজাদ মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসত। তাকে দেখে আমাদের খুবই ভয় হতো। কিন্তু শ্রীশ্রীমা তাকে আদর করে বাড়িতে ডেকে তার আঁচলে খাবার দিয়েছেন বহুবার, আমি দেখেছি।

গ্রামে তখন পানীয় জলের কোন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। একই পুকুরে স্নান ও সেই পুকুরের জলই পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হতো। সেজন্য তিনি পূজনীয় শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দকে) বলে জয়রামবাটী গ্রামে একটি পাকা কূপ-খননের ব্যবস্থা করেছিলেন।

জগদ্ধাত্রীপূজার সময় প্রতি বছর শ্রীশ্রীমা গ্রামবাসীদের সকলকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করতেন এবং নিজে সব ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন। প্রতিটি গ্রামবাসীর প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসার সীমা ছিল না।

শ্রীশ্রীমা যখন তাঁর ভাইদের বাড়িতে থাকতেন তখন আমার খুবই অল্প বয়স। কাজেই ও-বাড়িতে আমার যাতায়াত কমই ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে যখনই গেছি তখনই প্রায় নজরে পড়েছে, ক্ষেপী-ঠাকুরানী (রাধুর মা) শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ঝগড়া করছেন। তাঁর মাথায় ছিট ছিল। সেজন্য সকলেই তাঁকে 'ক্ষেপী' বলত। তিনি শ্রীশ্রীমাকে নানা কটুকাটব্য বলে গালাগালি দিতেন। শ্রীশ্রীমা সবই হাসিমুখে সহ্য করতেন। কিন্তু একবার তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হয়। ক্ষেপী ঠাকুরানী সেদিন একটা বড় কাঠ নিয়ে শ্রীশ্রীমাকে মারতে এসেছিলেন। অসতর্ক মুহূর্তে তিনি ক্ষেপী ঠাকুরানীকে অভিশাপ দিয়ে ফেলেন। বলেন: "তোমার ঐ হাত খসে পড়বে একদিন!" কিন্তু পরক্ষণেই গভীর অনুতাপের সঙ্গে বলেছিলেন: "এ আমি কি করলাম!" এই ঘটনার কথা আমার চাক্ষুষ বা স্বকর্ণে শোনা ব্যাপার নয়। এটি আমি পূজনীয়া ইন্দুবালা দেবীর (শ্রীমায়ের সেজভাইয়ের স্ত্রী) মুখে শুনেছিলাম। পরবর্তী কালে আমি দেখেছি, ঐ ক্ষেপী ঠাকুরানী দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পেয়েছেন।

ইতোমধ্যে প্রায়ই বহু ভক্ত ও সাধুদের আগমন-বৃদ্ধিতে শ্রীশ্রীমায়ের পক্ষে ভাইদের বাড়িতে বসবাস করা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সেজন্য তাঁর জন্য পৃথক বাড়ি তৈরির প্রয়োজন বোধ করলেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ। কাছেই রামশরণ কর্মকারের পতিত বাস্তুভিটা কেনার ব্যবস্থা এবং সেখানে একটি মাটির বাড়ি তৈরি আরম্ভ হলো। ঐ কাজের তদারক করার জন্য রাসবিহারী মহারাজ ও জ্ঞান মহারাজ (তখন উভয়েই ব্রহ্মচারী) নিযুক্ত হলেন। বাড়ি তৈরি শেষ হলে শ্রীশ্রীমা, রাধুদি এবং নলিনীদি মায়ের নতুন বাড়িতে বাস করতে এলেন। তখন থেকেই আমার ঠাকুরমা ঐ বাড়িতে পরিচারিকা হিসাবে কাজ করতেন এবং আমি প্রায় প্রতিদিন ঐ বাড়িতে যেতে অভ্যস্ত হই।

শ্রীশ্রীমা প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হতেন। তাঁর অসুখের সংবাদ পেলেই উদ্বোধন থেকে শরৎ মহারাজ ডাক্তার কাঞ্জিলালকে নিয়ে কলকাতা থেকে এখানে আসতেন। অসুখে ভুগে ভুগে শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ায় তাঁর দুধ খাবার প্রয়োজনবোধে একটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করা হয়। ঐ গাভীটির রাখালি করার জন্য আমার ছোট মামা রামেন্দ্র ঘোষকে নিয়োগ করা হয়। সে ভাদ্র মাসের সময় একদিন মাঠ থেকে ঘাস কেটে আনতে গেলে তার বাঁহাতের তর্জনীতে বোড়া সাপে কামড়ে দেয়। বাঁকুড়ার বিভূতিবাবু ও একজন ডাক্তার তার হাতে বাঁধন দিয়ে হাতের আঙুলে ছুরি দিয়ে চিরে রক্ত বার করে দিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমা এই সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বলেন: "ও বিভূতি, ওসব

কেন করছ? ওকে সিংহবাহিনীর মাড়োতে দিয়ে এস এবং মায়ের স্নানজল খাইয়ে দাও এবং ক্ষতস্থানে মায়ের স্থানের মাটির প্রলেপ দিয়ে দাও। ভাল হয়ে যাবে।" তাই করা হলো। ২/৩ দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে মামা বাড়ি ফিরে এল।

রাধুদিদি ও নলিনীদিদির প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ-ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাজপুরের জমিদার-বাড়ির ছেলে রাধুদিদির স্বামী মন্মথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহ-ভালবাসা লাভ করেছিলেন। তৎকালে তিনি প্রায়ই জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নতুন বাড়িতে আসতেন ও বেশ কিছুদিন ওখানে থাকতেন। তাঁর কিছু কিছু কুঅভ্যাস ছিল। তিনি গাঁজা খেতেন এবং সন্ধ্যার পর গ্রামাফোন সহযোগে একটা আড্ডার ব্যবস্থা করতেন। এক রাত্রে গ্রামাফোনে গান হচ্ছে। রাত অনেক হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীমা নিজে লণ্ঠন হাতে এসে ডাকছেনঃ "ও মন্মথ। অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি তোমার খাবার নিয়ে বসে আছি।" এই কথা শুনে মন্মথবাবু দ্রুত প্রস্থান করলেন। এই দৃশ্য আমি নিজে দেখেছি।

নলিনীদিদির আচরণ ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ বিধবার। তিনি শ্রীশ্রীমার উদার আচরণ সহ্য করতে পারতেন না এবং প্রায়ই শ্রীশ্রীমার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতেন। শ্রীশ্রীমা তদুত্তরে বলতেনঃ "দেখ আমি তো আমার ছেলেমেয়েদের প্রতি দুই দুই আচরণ করতে পারি না। আমার ছেলেমেয়ে সব সমান।"

ঐ বাড়িতে থাকাকালীন শ্রীশ্রীমার আরেক ভাইঝি মাকুদিদির একটি শিশুপুত্র হঠাৎ ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ মারা যায়। সংবাদ শুনে আমরা ছুটে দেখতে যাই। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি মাকুদিদির বাবা, নলিনীদিদি ও অন্যান্য আত্মীয়রা খুবই কান্নাকাটি করছেন। ছেলেটিকে শ্রীশ্রীমা খুবই স্নেহ করতেন। তাঁকেও একটু ব্যথিত ও শোকগ্রস্ত দেখলাম। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিতে ও আশ্বস্ত করতে লাগলেন। তাঁর সহনশীলতা দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম।

জয়রামবাটীর বিশ্বাস-পরিবারের বাল্যবিধবা ভানুপিসির সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের প্রীতি ও সখীত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে দু-চার কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি লক্ষ্য করতাম, ওঁরা দুজনে প্রায় সবসময় একসাথে থাকতে চাইতেন। উভয়ে একত্রে বাড়ুজ্যে পুকুরে প্রতিদিন স্নান করতে যেতেন। বিশেষ পালপার্বণে ওঁরা দুজনে প্রতিবেশিনীদের নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে আমোদর নদীতে স্নান করতে যেতেন। চাষীদের মাঠে কাজ করতে দেখে তিনি বলতেনঃ "এরা কত কষ্ট করে তবু দুটি পেট পুরে খেতে পায় না!" শ্রীমা নদীর যে-ঘাটে স্নান করতেন সেই ঘাট বর্তমানে বাঁধানো হয়েছে এবং 'মায়ের ঘাট' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

অবসর সময়ে ঐ দুই সখী একসঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করতেন। তাঁরা যেসব কথা বলতেন তা ঠিক বুঝতাম না। তবে তাঁদের কথার দু-চারটি যা এখন মনে আছে তা থেকে পরবর্তী কালে বুঝেছি যে, ওঁরা পরমার্থ বিষয়ে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী। ঘটনাটি আজ থেকে ৭৫-৭৬ বছর আগের। সন-তারিখ আমার মনে নেই। তবে সেদিনটি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের অনুষ্ঠিত জগদ্ধাত্রীপূজার দিন। পূজানুষ্ঠান শ্রীশ্রীমার বড় ভাই প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ও বরদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এজমালি বৈঠকখানায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামবাসীদের সকলকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। এই পূজা উপলক্ষে প্রতিবছর শ্রীশ্রীমা গ্রামবাসীদের সকলকে একদিন নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করতেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়ানোর জন্য মায়ের মেজভাই কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সংলগ্ন পতিত জমিতে সামিয়ানা খাটিয়ে ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মায়ের পুরনো বাড়িতে স্থানাভাবের জন্য বিহারীলাল ঘোষের বাড়িতে রন্ধনাদি কার্য করা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃপুরুষের কুলগুরু পাকমাজিট্যা গ্রামনিবাসী পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্মৃতিতীর্থ তন্ত্রধারকের কাজ করছেন এবং পুখুরিয়া গ্রামনিবাসী মায়ের পিতৃপুরুষের

কুলপুরোহিত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য স্মৃতিতীর্থ পূজো করছেন। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর বিহিত পূজো শেষ হয়েছে। হোম, আরতি তখনো শেষ হয়নি। মধ্যাহ্ন অতীত। মধ্যাহ্নভোজনের সময় প্রথমে ব্রাহ্মণভোজন, তারপর ব্রাহ্মণ-মহিলাদের ভোজন করানো হবে। তারপর ঐ স্থান পরিষ্কার করে ব্রাহ্মণ ভিন্ন উচ্চবর্ণের লোকদের এবং শেষে অন্যান্য বর্ণের লোকদের খাওয়ানো হবে। কাজেই ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা পঙ্‌ক্তিতে বসে পড়েছেন। তাঁদের পাতায় ভাত পরিবেশন করা হয়েছে। তরকারি পরিবেশন করা হচ্ছে। ব্রাহ্মণগণ আচমনান্তে আহারে বসেছেন। এমন সময় দুজন ব্রহ্মচারী তরকারি পরিবেশন করার জন্য পঙ্‌ক্তিতে বালতি নিয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁদের দেখে ব্রাহ্মণগণ হৈ হৈ করে উঠলেন। তাঁরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন: "ওরা কোন জাত? ওদের কে পরিবেশন করতে বলল? আমাদের জাত যাবে। আমরা খাব না।" এই বলে সকলে একযোগে অর্ধভুক্ত অবস্থায় পঙ্‌ক্তি থেকে উঠে পড়লেন। এই দৃশ্য দেখে শ্রীশ্রীমা অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ব্যথিত হৃদয়ে সকলের কাছে মিনতি ও অনুরোধ করতে লাগলেন যাতে ব্রাহ্মণগণ অভুক্ত অবস্থায় চলে না যান। শ্রীশ্রীমার সে কি আকুলি-বিকুলি! কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কোন কথা শুনতে রাজি নন। মা তখন ভানুপিসির জ্ঞাতি ভাই যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের কাছে গেলেন। তাঁর বাড়ি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির খুব কাছেই এবং তিনি শ্রীশ্রীমায়ের ভাইদের যজমানও বটেন। আবার দেখলাম, শ্রীশ্রীমা গ্রামের বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিদের অন্যতম রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে যাচ্ছেন অনুরোধ করতে। এইভাবে তিনি সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছেন যাতে এই গণ্ডগোল মিটে যায় এবং ব্রাহ্মণগণ পুনরায় আহার করেন এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের আহারে ব্যাঘাত না ঘটে। অল্পক্ষণ মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বৈঠকখানায় গ্রামের প্রধানদের মজলিস বসে গেল। তখন গ্রামে পাঁচ-জন মুখ্য ব্যক্তি ও জমিদারদের এক প্রতিনিধি মিলে সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি ও বিচার করতেন। ঐ দিনের মজলিসে জিবটা গ্রামের জমিদার-পরিবারও নিমন্ত্রিত ছিলেন। ঐ মজলিসে জমিদারদের প্রতিনিধি হিসাবে শম্ভুনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ঐ মজলিসে ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন।

অনেক আলোচনার পর সমাজপতিরা ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা কি চান। কি হলে তাঁরা সকলে পুনরায় আহারে সম্মতি জানাবেন। তাঁরা সকলে বললেন, শ্রীশ্রীমাকে জরিমানা দিতে হবে। শ্রীশ্রীমাকে সেকথা জানানো হলে তিনি জরিমানা দিতে রাজি হলেন। অবশেষে স্থির হলো, শ্রীশ্রীমাকে ২৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে। কেউ কেউ বলেন, "জয়রামবাটী গ্রামের চাষারা শ্রীশ্রীমাকে জরিমানা করেছিল।" কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের জরিমানা করেনি।*

বর্তমানে আমি জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছি। কবে ওপার থেকে ডাক আসবে তার অপেক্ষায় আছি। তবে এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে, আমি যখন শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও পদস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য পেয়েছি তখন মৃত্যুর পর আমার মুক্তি অবধারিত। কেউ তা রোধ করতে পারবে না। ☐

* এই ঘটনাটি কিছুটা ভিন্নভাবে স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে (দ্রঃ ৫ম সং, ১৩৯৬, পৃঃ ৩৩ : পাদটীকা)। স্বামী ঈশানানন্দ ঘটনাটি স্বামী কেশবানন্দের কাছে শুনেছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থেও (৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ৩৬০) ঘটনাটি উল্লিখিত হয়েছে। স্বামী গম্ভীরানন্দের বিবরণের সূত্র অবশ্য স্বামী ঈশানানন্দের বর্ণনা। তবে স্বামী ঈশানানন্দের গ্রন্থ অনুসারে পঙ্‌ক্তি থেকে উঠেছিলেন জিবটার জমিদারগণ (জাতিতে সদ্‌গোপ) এবং স্বামী গম্ভীরানন্দের গ্রন্থ অনুসারে উঠেছিলেন ব্রাহ্মণ জমিদারগণ।—যুগ্ম সম্পাদক

উদ্বোধনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার: স্বামী অমেয়ানন্দ, অধ্যক্ষ, মাতৃমন্দির, জয়রামবাটী।

স্বামীজীর একটি স্মৃতি

স্বামী বোধানন্দ

[১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ যখন মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে তরুণ সন্ন্যাসী ছিলেন, তখন তিনি স্বামীজীর শিষ্য স্বামী বোধানন্দের কাছে নিচের ঘটনাটি শোনেন এবং ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ১৯১২ থেকে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বামী বোধানন্দ নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ সম্প্রতি প্যারিস ভ্রমণকালে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের কাগজপত্রের মধ্যে এই মূল্যবান স্মৃতিকথাটি পান এবং ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে 'উদ্বোধন'-এর জন্য পাঠান।—**যুগ্ম সম্পাদক**]

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিচারণ করতে অনুরুদ্ধ হয়ে স্বামী বোধানন্দ বললেনঃ "আমি তোমাদের একটি ঘটনা বলব। বেলুড় মঠে একদিন স্বামীজী বললেন যে, সেদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করবেন। আমরা সবাই স্বামীজীর পূজা দেখবার জন্য ঠাকুরঘরে গিয়ে বসলাম। স্বামীজীর আনুষ্ঠানিক পূজা দেখার জন্য আমাদের দারুণ কৌতূহল। স্বামীজী প্রথমে যথারীতি পূজার আসনে বসে ধ্যান শুরু করলেন। আমরাও ধ্যান করতে থাকলাম। বেশ কিছু সময় পরে আমার মনে হলো, কে যেন আমাদের চারপাশে ঘুরছেন। ব্যক্তিটি কে তা দেখবার জন্য আমি চোখ খুললাম। দেখলাম স্বামীজী। তিনি ইতোমধ্যে ঠাকুরের পুষ্পপাত্র হাতে নিয়ে পূজার আসন থেকে উঠে পড়েছেন। ঠাকুরকে ফুল নিবেদন না করে তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং ফুলে চন্দন মাখিয়ে আমাদের সকলের মাথায় একটা করে ফুল দিলেন।

"আনুষ্ঠানিক পূজা-পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে এটি ছিল রীতিবিরুদ্ধ কর্ম। যে-ফুল দেবতার উদ্দেশে নির্দিষ্ট ছিল, তা স্বামীজী শিষ্যদের অর্পণ করলেন। সাধারণতঃ পূজার পর যদি কোন উদ্বৃত্ত ফুল থাকে তা নষ্ট করে ফেলা হয়। কিন্তু তা না করে স্বামীজী পুষ্পপাত্রের উদ্বৃত্ত ফুল বেদিতে ঠাকুরকে নিবেদন করলেন এবং চিরাচরিত বিধি অনুযায়ী পূজা করলেন। তারপর তিনি ইঙ্গিত করলেন যে, তখন ভোগ নিবেদন হবে। প্রথা অনুযায়ী ভোগ-নিবেদনকালে পূজারী ছাড়া কেউ ঠাকুরঘরে থাকবে না। তাই আমরা সবাই উঠে পড়লাম এবং ঠাকুরঘরের বাইরে থেকে শুনলাম, স্বামীজী ঠাকুরকে আহ্বান করে বলছেনঃ 'বন্ধু, খাও।' তারপর তিনি ঠাকুরঘর থেকে বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ভাবে তাঁর চোখ দুটি ছিল রক্তিম বর্ণ।"

স্বামী বোধানন্দ ঘটনাটি বর্ণনাকালে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি বেশ কয়েক মিনিট নির্বাক হয়ে যান। তারপর জনৈক ব্যক্তি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করেনঃ "মহারাজ, স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের এভাবে পূজা করার মধ্যে কি রহস্য আছে?"

স্বামী বোধানন্দ বললেনঃ "প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের পূজা করেননি। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় একটি করে ফুল দিয়ে স্বামীজী বাস্তবিক প্রতি শিষ্যের ভিতর যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরাজমান, তাঁর পাদপদ্মে পুষ্প অর্পণ করেছিলেন। ঐভাবে তিনি আমাদের মধ্যে ঠাকুরকে উদ্বোধিত করেন। তাঁর আবির্ভাব আমাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। কারও ভক্তির প্রবণতা জেগেছিল, কারও মধ্যে জ্ঞানের ভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বামীজী পূজার মাধ্যমে আমাদের দেবত্ব বিকশিত করে দিয়েছিলেন। পুষ্পপাত্রের বাকি ফুলগুলি উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়নি। কারণ, বেদিতে ঠাকুরের ছবিতে স্বামীজী ঈশ্বরের যে আবির্ভাব দেখেছিলেন, ঠিক সেই একই ঈশ্বরের আবির্ভাব তিনি শিষ্যদের মধ্যেও দেখেছিলেন। তাই তিনি বাকি ফুলগুলি বেদিতে ঠাকুরকে নিবেদন করেন। ইষ্টের সঙ্গে স্বামীজীর ছিল সখ্যভাবের সম্পর্ক। সেজন্য ভোগ-নিবেদনকালে তিনি ঠাকুরকে 'বন্ধু' সম্বোধনে আহ্বান করেছিলেন।" ☐

নিবন্ধ

উনিশ শতকের পটভূমিকায় শ্রীমা সারদাদেবী

কণা বসুমিশ্র

উনিশ শতকের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীমা সারদাদেবীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার নবজাগরণে তাঁর অবদান অপরিসীম। অবশ্য তিনি চিহ্নিত বিশেষ কোন শতকের নন, দেশ-কালের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত নারীসমাজের কাছেই তিনি চিরকালের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবেন তাঁর জীবনদর্শনের মাধ্যমে। ঘোমটা-টানা, গ্রাম্য, লজ্জাশীলা যে বঙ্গবালা বিংশ শতকের শেষ দশকের শিক্ষিতা নারীসমাজেরও প্রেরণা, তিনি কিন্তু বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগটি শেষ করে দ্বিতীয় ভাগের প্রথম লাইনের 'ঐক্য, মাণিক্য ও কুবাক্য' পর্যন্ত শুধু পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র। কারণ, ভাগ্নে হৃদয় তাঁর হাত থেকে বই কেড়ে নিয়েছিলেন মেয়েদের বেশি লেখাপড়া ভাল নয় বলে। সেই আক্ষরিক অর্থে বিদ্যাহীন 'মধ্যযুগীয়' এই নারী আজ সারা বিশ্বের বিস্ময়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের নারীসমাজ ছিল অবহেলিত। সেই অবহেলিত নারীসমাজের প্রতিনিধি শ্রীমা সারদাদেবী এলেন "ভারতে পুনরায় মহাশক্তি জাগাতে"। আমাদের যেন আবার মনে পড়ল বৈদিক যুগকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"[১]

স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী যোগানন্দকে বলেছিলেন: "আমাদের মা আধ্যাত্মিক শক্তির এক বিশাল আধার, যদিও বাইরে গভীর সমুদ্রের মতো প্রশান্ত। তাঁর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছে। যে আদর্শসমূহ তিনি তাঁর জীবনচর্যায় রূপায়িত করেছেন এবং অপরকে আচরণ করতে অণুপ্রাণিত করেছেন, তা শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নারীর বন্ধন মুক্তির প্রচেষ্টাকেই অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত করবে না, সমগ্র পৃথিবীর নারীজাতিকে তা প্রভাবিত করে তাদের হৃদয় ও মানসলোকে অনুপ্রবিষ্ট হবে।"[২]

শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে আমরা দেখেছি অপূর্ব বিশ্বমানবতাবোধ। তাঁর মধ্যে দেখেছি অতুলনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তা। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল কোমলতার সঙ্গে কঠোরতার অনবদ্য সংমিশ্রণ। বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন। বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি ব্যক্তি-স্বাধিকারের সমর্থন করেছেন। নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা সম্বন্ধে ভেবেছেন। তাঁর মধ্যে ছিল যুক্তিনিষ্ঠা ও সমাজচেতনার বিস্ময়কর সমাবেশ। সন্ন্যাসি-সংগঠনের নেপথ্য পরিচালিকা হিসাবে তাঁর যে কৃতিত্ব তাও এককথায় বিস্ময়কর। বলা বাহুল্য, এসব কিছুই উনিশ শতকের পটভূমিকায় বাংলার নবজাগরণে নারীসমাজের মূল্যবান পাথেয়।

সারদাদেবীর চরিত্রের এসব বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটির ওপর আলো ফেলে যদি আমরা তাঁকে উনিশ শতকের পটভূমিকায় দেখি, তাহলে প্রথমেই বিশ্বমানবতার প্রসঙ্গ বলতে হয়। ত্যাগ ও তপস্যার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে পরের জন্য উৎসর্গ করে ভালবাসার যে মিলনসেতু তিনি রচনা করেছেন, উনিশ শতকের নবজাগরণের সেটি একটি বিশেষ দিক। তিনি জীবন ও জগৎকে আপন করে নিয়েছিলেন তাঁর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। বিশ্বমৈত্রীর মধ্যে তিনি বপন করেছিলেন বেদান্তের অন্বয়মন্ত্রের বীজ। শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, জীব-জগতের প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই দেখেছিলেন সেই অন্বয়শক্তির প্রকাশ। বিশ্বচেতনার এই উপলব্ধিই সারদাদেবীকে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে 'সকলের মা'

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৩৮০, পৃঃ ৭৬

২ দ্রঃ 'মাতা ঠাকুরানী: স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে'—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, শতরূপে সারদা, ১৯৮৫, পৃঃ ২৫

হবার অধিকার দিয়েছিল। তাই তিনি বলতে পেরেছেন: "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।"[৩]

ইংরেজদের সম্পর্কে তিনি বলতে পেরেছেন: "তারাও তো আমার ছেলে।"[৪] তিনি বলেছেন, ইতর জীবজন্তুরও তিনি মা।[৫] তাঁর উদার দৃষ্টিতে বিদেশী, স্বদেশী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডালের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি বলেছেন: "জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।"[৬]

মার্গারেট (নিবেদিতা), ম্যাকলাউড, সারা বুল—স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট যে তিন বিদেশিনী ভক্ত পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে নিজেদের সামিল করেছিলেন, হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতার প্রাচীর ঠেলে সারদাদেবী প্রথম দর্শনেই তাঁদের বুকে টেনে নিয়েছেন। এই গ্রহণের মধ্যে যে স্নেহ, মাধুর্য এবং উদারতা ছিল, তাতে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। নিবেদিতার লেখায় পাই—"আচারবিচারে বরাবরই রক্ষণশীল— সবকিছু সরিয়ে দিলেন যখন প্রথম দুটি [প্রকৃতপক্ষে তিনটি—নিবেদিতাকে নিয়ে] বিদেশী মেয়ে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড তাঁর কাছে এলেন। এঁদের সঙ্গে তিনি খেলেন পর্যন্ত।... এঁর দ্বারা আমরা জাতে উঠেছি এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে, যা অন্য কিছুতে হতে পারত না।"[৭] মিসেস বুল অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারকে সারদাদেবী প্রসঙ্গে লিখেছেন: "দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্যের ব্রত তিনি নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন গর্ভধারিণী জননীর সাধারণ আনন্দ, কিন্তু হয়ে উঠেছেন বহু সন্তানের আধ্যাত্মিক জননী।"[৮] ঈস্টার দিবসে সারদাদেবী নিবেদিতার মুখে খ্রীস্টান ধর্মসঙ্গীত শুনে অভিভূত হয়েছেন। নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের মুখে ইউরোপীয় বিবাহ-পদ্ধতির বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। মিসেস সারা বুলের অনুরোধে ইংরেজ পুরুষ ফটোগ্রাফারের সামনে ফটো তুলেছেন।

বস্তুতঃ তাঁর মধ্যে যে উদার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তা একালের অতি আধুনিকাদেরও জীবন সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে শেখায়। সারদাদেবীর নির্ভেজাল উদারতার সঙ্গে যে বিচার-বুদ্ধি ও বাস্তববাদী মানসিকতার সংমিশ্রণ এসব ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়, তার মধ্যেই তাঁর আধুনিকতার পরিচয়। সাধু, ব্রহ্মচারীদের তিনি ইংরেজী শিখতে বলেছিলেন। আবার অভারতীয় খ্রীস্টান মহিলাদের যেমন কন্যাসম গ্রহণ করেছেন, তেমনি আবার গরিব মুসলমান ডাকাত আমজাদের এঁটো নিজের হাতে পরিষ্কার করে তারও মা হয়েছেন। বলেছেন: "আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে।"[৯]

সারদাদেবীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোমলতার সঙ্গে কঠোরতার সংমিশ্রণ নারীদের আর একটি শিক্ষণীয় বিষয়। মেয়েরা কিভাবে ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হবে, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি তার উদাহরণ দিয়েছেন। পাগলা হরিশের পাগলামী চরমে উঠলে তিনি নিজেই কিভাবে তাকে শায়েস্তা করেছিলেন সেকথা আমরা জানি। সিন্ধুবালার ঘটনাপ্রসঙ্গে শ্রীমা সারদার তেজোদৃপ্ত মূর্তি দেখি: "এটা কি কোম্পানীর আদেশ, না পুলিশ সাহেবের কেরামতি?... এমন কোন ব্যাটাছেলে কি সেখানে ছিল না, যে দু-চড় দিয়ে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারতো?"[১০]

যা অন্যায়, অপরাধ, অমানবিক তার বিরুদ্ধে সারদাদেবী সর্বদাই প্রতিবাদে মুখর। তার প্রমাণ বারে বারেই পাই তাঁর চরিত্রে। উদ্বোধনের বাড়ির উল্টোদিকের বস্তিতে এক পুরুষ তার স্ত্রীকে প্রচণ্ড মারধার করছিল। মারের চোটে মেয়েটি কোলের ছেলেকে নিয়ে উঠোনে গড়িয়ে পড়লে জপের মালা ফেলে বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিনি গর্জে উঠলেন: "বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে

৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১০ম সং, পৃঃ ৩৭১ ৪ ঐ, পৃঃ ১৮৪ ৫ ঐ, পৃঃ ৪
৬ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬৬১
৭ নিবেদিতা লোকমাতা—শংকরীপ্রসাদ বসু, ১ম সং, ১৯৬৮, পৃঃ ১৭৯ ৮ ঐ, পৃঃ ১৭৭
৯ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪৭৯
১০ মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, ২য় সং, ১৩৭৬, পৃঃ ৫৩

মেরে ফেলবি নাকি?"[১১] সেই রুদ্রাণী সারদার মধ্যেই কোমলরূপে ব্যক্তিত্বের আরেক প্রকাশ। কোন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের পথভ্রষ্টা নারীকে সস্নেহে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছেন: "এস মা, এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। ভয় কি?"[১২] তাঁর ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দের ওপরে পর্যন্ত আরোপিত হলো। মনে পড়ে, চুরির অপরাধে সেই চাকরটিকে স্বামীজী মঠ থেকে তাড়িয়ে দিলে বাবুরাম মহারাজকে ডেকে শ্রীশ্রীমায়ের সম্রাজ্ঞীর মতো আদেশ—"আমি বলছি, নিয়ে যাও।" মায়ের আদেশ বিবেকানন্দও মেনে নিয়েছেন নির্দ্বিধায়।[১৩] স্বামীজী যখন আমেরিকায় যাবেন কি যাবেন না, এই দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন তখন তিনিই স্বামীজীকে সর্বসংশয় থেকে মুক্ত করে আমেরিকায় যেতে উৎসাহিত করেছিলেন। শুধু স্বামীজীকেই নয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকেও প্রভাবিত করেছে।

বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম, নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা সারদাদেবীর ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্রের আরেকটি দিক। দক্ষিণেশ্বরের নহবতের তেরো বছরের জীবনসাধনায়, শ্যামপুকুরের ছোট ভাড়া-বাড়িতে, কাশীপুরের বাগানবাড়িতে, জয়রামবাটীর গ্রাম্য পরিবেশে, কামারপুকুরের অভাবগ্রস্ত জীবনে, কলকাতার নাগরিক জীবনে 'যখন যেমন তখন তেমন' ভাবে নিজেকে সর্বত্র মানিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে বারবার ধৈর্য ও সহনশীলতায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন: "ভ্রাতাদের স্বার্থবুদ্ধি, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের পরস্পর হিংসা, নলিনীদিদির শুচিবাই, রাধুর বাতুল সদৃশ আবদার এবং ছোটমামীর পাগলামি—এই সকল মিলিয়া যে অবর্ণনীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি হইত, তাহাতে একমাত্র ধৈর্যময়ী শ্রীমায়ের পক্ষেই শান্তভাবে সংসারে কাজ করা সম্ভব ছিল। এই সমস্ত লইয়াই শ্রীমায়ের পারিবারিক জীবন।"[১৪] সংসারে থেকেই সংসার থেকে মুক্ত হবার সাধনা করেছেন মা। তাই তিনি সাংসারিক প্রতিকূল পরিবেশে আত্মস্থ থেকে জীবনে চলার পথকে সহজ করেছেন, নারীসমাজের কাছে যা একান্ত শিক্ষণীয়।

সারদাদেবীর যুক্তিনিষ্ঠা ও সমাজচেতনার পরিচয় তাঁর চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠাই তাঁর সমাজচেতনার ভিত্তি। সেই তথাকথিত অশিক্ষিতা গ্রাম্য নারীর মধ্যে আমরা শুনি: "যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা চাই।"[১৫] এই যুক্তিনিষ্ঠার ফলে বহু তুচ্ছ আচারকে উপেক্ষা করে তিনি অন্যান্যদের সত্যের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। দেশাচারকে তিনি মেনেছেন, কিন্তু কুসংস্কার কিংবা অনর্থক যে দেশাচার পদে পদে জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, তিনি তা কখনই মেনে নেননি। তিনি বলেছেন: "বহু পাপ, মহা পাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয়? শুচিবাই। মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না।... শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে।"[১৬]

সারদাদেবী সেকালের বিধবা নারীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সমাজের অনুশাসনকে মোটেই প্রশ্রয় দেননি। বালবিধবা শবাসনাদেবীকে নির্জলা উপোস করতে দেখে বলেছিলেন: "আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি বলছি, তুই জল খা।"[১৭] বিধবা সুরবালা দেবীকে বলেছিলেন: "আত্মা যদি কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে অপরাধ হয়।"[১৮] বালবিধবা ক্ষীরোদবালাকে বলেছিলেন: "বাছা, অনেক কঠোর করেছ। আমি বলছি, আর করো না। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলেছ। দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে, মা?"[১৯] আজ থেকে কত যুগ আগে গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ বিধবার মুখে শুনি: "যে যা বলুক, ঠাকুরকে স্মরণ করে যেটা হিতকর বুঝবে, তা-ই করবে।"[২০]

১১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১১শ সং, পৃঃ ৬০ ১২ ঐ, পৃঃ ১৫১
১৩ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪৭৭ ১৪ ঐ, পৃঃ ৪২২
১৫ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, ১৩৬৩, পৃঃ ৩৪৮
১৬ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৫৯৯ ১৭ ঐ, পৃঃ ৬০২ ১৮ ঐ
১৯ ঐ, পৃঃ ৬০১ ২০ ঐ, পৃঃ ৬০৭

তিনি বিশ্বাস করতেন, সংযম আসে নিজের লোভকে মানুষ যখন দমন করতে পারে। কড়া নিষেধের কোন নীতিশাসন চাপিয়ে সংযমকে বাঁধ দেওয়া যায় না। তাই মা বলেছিলেনঃ "ওদের (বালবিধবাদের) আকাঙ্ক্ষা থাকে কিনা। না হলে চুরি করে খাবে। যখন বুঝতে পারবে এটা সমাজবিরুদ্ধ, তখন ছেড়ে দেবে।"[২১] নারীমুক্তির পথ-প্রদর্শক শ্রীমা সামাজিক জীবনের বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করে নারীর মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন।

তাঁর উদারতা ছিল মানবাত্মার মুক্তির ব্যাপারে। তিনি জাতিভেদ প্রথাকে কোনদিন সমর্থন করেননি। শ্রীশ্রীমা মুসলমান ডাকাত আমজাদের এঁটো থেকে শুরু করে সর্বজাতির এঁটো নিজ হাতে কুড়োতেন। নলিনীদিদি বলেছিলেনঃ "মাগো, (বামুন হয়ে) ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে।" তার উত্তরে মা বলেছিলেনঃ "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?"[২২] আবার ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রসঙ্গে গোলাপ-মা জাতবিচারের পক্ষে বললে মা দ্বিধাহীনভাবে বলেছেনঃ "শূদ্দুর কে গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?"[২৩] জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সারদাদেবীর এই প্রতিবাদ উনিশ শতকের পটভূমিকায় নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক ব্যাপার। জাতিভেদ প্রথার প্রতি তাঁর এই বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদারেরা তাঁকে অর্থদণ্ডে পর্যন্ত দণ্ডিত করেছে। তবু নির্ভীক মায়ের যুক্তিবাদী মন মাভৈঃ বলে এগিয়ে গেছে। নিজের মত থেকে তিনি কিছুতেই সরে যাননি।

মানুষের জ্ঞান এবং চরিত্রকে তিনি জাতপাতের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। তাই রাধুকে কায়স্থের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিয়েছেন।[২৪] আবার শ্রীশ্রীমায়ের উদার সংস্কারমুক্ত মন সেকালের রক্ষণশীলতার প্রাচীর ভেঙে সমাজের তথাকথিত চরিত্রহীনদের প্রতিও সহানুভূতি দেখিয়েছে। কোয়ালপাড়া গ্রামের সেই ডোমের মেয়েটির উপপতি তাকে ত্যাগ করলে লোকটিকে ডেকে মায়ের ভর্ৎসনাঃ "ও তোমার জন্য সব ফেলে এসেছে; এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ; এখন ওকে ত্যাগ করলে তোমার মহা অধর্ম হবে—নরকেও স্থান পাবে না।"[২৫]

উনিশ শতকের নবজাগরণে সারদাদেবীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং মননশীলতা সমাজের সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে মুক্ত মানবাত্মার জয়গান গেয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজের তর্জনীকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি নারীকে নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকারের পথ দেখিয়ে গেছেন।

ঐ গ্রাম্য অশিক্ষিত মহিলা যিনি ঘড়িটি পর্যন্ত দেখতে জানতেন না, সেই তিনিই নারীশিক্ষা, নারীর সমান অধিকার, নারীমুক্তির কথা ভেবেছেন। উনিশ শতকের পটভূমিকায় শ্রীশ্রীমায়ের এই ভাবনার এখনো মূল্যায়ন হয়নি। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় নারীদের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও সে-স্বাধীনতা যেন ছিল পুরুষের পাশে যোগ্যতা অর্জনের স্বাধীনতা। কিন্তু মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাধীন চিন্তা ও কাজে নারীকে নিয়োজিত করার পথ দেখিয়েছেন শ্রীশ্রীমা। নারীকে স্বাধীন সত্তার অধিকারিণী হিসাবে, পুরুষের সাহায্য না নিয়েই এগিয়ে চলার পথ দেখিয়েছেন তিনি। মনে রাখা প্রয়োজন, গৌরী-মায়ের সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠার পিছনে মায়ের ভূমিকা ছিল বিরাট। তিনি গৌরী-মাকে বলেছিলেনঃ "মেয়েদের বুঝিয়ে দিও, তারা কেবল থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড় করতে (এ জগতে) আসেনি।"[২৬] সারদেশ্বরী আশ্রমের কিশোরী দুর্গার ইংরেজী পড়া নিয়ে আপত্তি উঠলে মা গৌরী-মাকে ডেকে বলেছিলেনঃ "আমার মেয়ে কিন্তু ইংরেজি পড়বে।"[২৭] এক ভক্ত মহিলা মেয়ের বিয়ে দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলে মা বলেছিলেনঃ "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও—লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।"[২৮]

নিবেদিতার স্কুলে দুটি অবিবাহিতা মাদ্রাজী মেয়েকে দেখে শ্রীমা বলেছিলেনঃ "আহা! তারা

২১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৫৪
২২ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৪৬২
২৩ ঐ, পৃঃ ২৬৬
২৪ ঐ, পৃঃ ৬৯৮
২৫ ঐ, পৃঃ ৪৭৭
২৬ সারদা-রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী দেবী, ১৩৬৮, পৃঃ ৪১৭
২৭ ঐ, পৃঃ ৩৪৬
২৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৬০৫

সব কেমন কাজকর্ম শিখেছে। আর আমাদের। এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছর হতে না হতেই বলে—'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও'।"[২৯] রাধুরই বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারে একজনকে বলেছিলেন : "আমি কখনো কাউকে বন্ধনে ফেলবার জন্য বলতে পারব না।"[৩০] উনিশ শতকের নবজাগরণে নারীমুক্তির কথা চিন্তা করেছিলেন রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা কালি-কলম, সংবাদপত্র, সাহিত্যের মধ্যেই বেশি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করে নারীমুক্তির, নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক সব বিষয়ে সমান অধিকারের তথা নারীশিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে উনিশ শতকের নবজাগরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। স্বয়ং নারীর আত্মশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে এই আন্দোলনকে নৈতিক ও সক্রিয় সমর্থন দিয়েছেন সারদাদেবী। নারীর শিক্ষা, ত্যাগ, সেবা, মননশীলতা, সহনশীলতা সব কিছু মিলিয়ে মানবতাবোধেরই উদ্বোধন করেছেন তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যখন সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের তিনি নেত্রী হন, তখন তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণে তিনি সন্ন্যাসীদের পরিচালনা করেছেন। স্বামীজী পর্যন্ত তাঁর কথাকেই 'হাইকোর্টে'র রায় হিসাবে শিরোধার্য করেছেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

বেলুড় মঠের দুর্গাপুজোয় শ্রীশ্রীমায়ের নামে সঙ্কল্প করেছিলেন স্বামীজী। তিনি রুধির দিয়ে পুজো করতে চেয়েছিলেন মা-দুর্গাকে। কিন্তু মায়ের আদেশেই বলি বন্ধ হয়। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন : "হ্যাঁ, বাবা, মঠে দুর্গাপুজো করে শক্তির আরাধনা করবে বৈকি। শক্তির আরাধনা না করলে জগতে কোন কাজ কি সিদ্ধ হয়? তবে বাবা, বলি দিও না, প্রাণিহত্যা করো না। তোমরা হলে সন্ন্যাসী, সর্বভূতে অভয়দানই তোমাদের ব্রত।"[৩১]

কলকাতায় যখন প্লেগ মহামারীর রূপ ধারণ করল সেবাকাজের জন্য অর্থের অভাবে স্বামীজী বেলুড় মঠ বিক্রি করতে চাইলেন। শ্রীমা সেদিন দৃঢ়তার সঙ্গে স্বামীজীকে বলেছিলেন : "সেকি বাবা, বেলুড় মঠ বিক্রি করবে কি?... বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তাঁর কত কাজ। ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এইভাবে চলবে।"[৩২]

মায়াবতীর আশ্রমে ঠাকুরের পটপুজোর বিরুদ্ধে স্বামীজীর আপত্তিকে শ্রীমা তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের গুণেই সমর্থন জানিয়েছিলেন : "আমাদের গুরু যিনি, তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য—তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি—তোমরা অবশ্য অদ্বৈত-বাদী।"[৩৩] আবার সঙ্ঘের কর্মযোগকে তিনি সমর্থন করেছেন দৃঢ়তার সঙ্গে। জনৈক সন্ন্যাসি-সন্তান মঠ ছেড়ে কিছুদিন তপস্যার জন্য বাইরে যেতে চাইলে মা বলেছেন : "সেকি গো, ঠাকুরের কাজ করছ। একি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে? হাওয়া গুণতে কোথায় যাবে?"[৩৪] স্বামী স্বরূপানন্দকে মা বলেছিলেন : "কাজ করবে না তো দিনরাত কি নিয়ে থাকবে?... মঠ এমনিভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।"[৩৫]

তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে তাঁর আত্মবিলয়ী ত্যাগের মধ্যে তিনি নারীকে বাঁচবার পথ দেখালেন নতুন করে। নিজের জীবন-তপস্যার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, ভোগে শান্তি নেই—শান্তি ত্যাগে। যে-ত্যাগ ভারতবর্ষের নারী চিরকাল দেখিয়েছে জননীরূপে, ভগ্নীরূপে, কন্যারূপে, পত্নীরূপে। তিনি বুঝিয়ে গেলেন, এই জগতের কর্মযজ্ঞে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার। উনিশ শতকের নবজাগরণে শ্রীমা সারদাদেবী বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নারী-ব্যক্তিত্ব। তিনি আজ শুধু ভারতেরই নন, সারা বিশ্বের নারী-সমাজের কাছে প্রেরণা ও পাথেয়ের চির-অনির্বাণ ধ্রুবতারা। ☐

২৯ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৬০০
৩০ ঐ, পৃঃ ৩২৯
৩১ 'শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী'—স্বামী ঈশানানন্দ, উদ্বোধন, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃঃ ২০১-২০২
৩২ ঐ, পৃঃ ২০২
৩৩ দুঃ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৭৮৪-৭৮৫
৩৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩২৩
৩৫ ঐ, পৃঃ ৯৭

নর্মদে হর্

স্বামী কমলেশানন্দ

'নর্মদে হর্'।—আমাকে দেখে এক যাত্রী দুহাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে কথাগুলি বলল। খাণ্ডোয়া থেকে মিটারগেজের ট্রেন—আজমীর লোকালে যাচ্ছি। ট্রেন ছেড়েছে ভোর চারটেয়। অবশ্য ছাড়বার কথা শুনেছিলাম তিনটেয়। ছোট ছোট বগি। ভিড়ে ঠাসা। বেশির ভাগই গ্রামের মানুষ। পোটলা-পুটলি, লাঠি নিয়ে চলেছে ওঙ্কারেশ্বরজীর দর্শনে। ভিড়ের মধ্যে কোনরকমে বসার জায়গা করেছি। রাত বারোটায় খাণ্ডোয়া স্টেশনে আসবার কথা ছিল হাওড়া-বোম্বে মেলের। দুঘণ্টা দেরিতে রাত দুটোয় এল। বাকি রাতে আর ঘুম হয়নি। আগের দিন রাত আটটায় হাওড়া থেকে রওনা হয়েছিলাম।

ভোর ছটা নাগাদ ওঙ্কারেশ্বর রোড স্টেশনে পৌঁছালাম। ছোট স্টেশন। টিকিট চেকার কেউ নেই। যাত্রীদের পিছন পিছন আমিও স্টেশনের বাইরে বাসস্ট্যান্ডে এসে বাসে উঠে পড়লাম। শুনলাম, এটাই প্রথম বাস ওঙ্কারেশ্বর যাচ্ছে। ছোট বাস—মানুষে ঠাসা। দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পিছনের সিটে বসা একজন সাধু ডেকে আমাকে বসতে দিলেন। উনি আসছেন রাজস্থান থেকে। বাস ছাড়ল সাড়ে ছটায়। ওঙ্কারেশ্বর পৌঁছালাম সাতটায়। ভাড়া নিল দুটাকা, কিন্তু কোন টিকিট দিল না। বাসস্ট্যান্ডের পাশেই ডাকঘর, আর বাজারের মধ্য দিয়ে এই রাস্তাই সোজা নর্মদার তীরে চলে গেছে। এখানে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়ে চলেছে নর্মদা। নদীর ওপর পায়ে চলার ঝুলন্ত সেতু। সেতুর ওপর গাড়ি চালানো নিষেধ। সেতু পেরিয়ে উত্তর প্রান্তে এলাম। ডানদিকেই ওঙ্কারেশ্বরজীর মন্দির। চারপাশে বহু মন্দির এবং দোকান-পসার। ভাবলাম, প্রথমেই দর্শনাদি করে নিই তারপর থাকার জায়গায় যাব। কিন্তু প্রভু বলেছেন, সাধু কুঠরী পাকড়ে গাঁটরী রেখে তবেই শহরে রঙ দেখতে বেরোবে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, নদীর ধার দিয়ে পশ্চিমমুখো যে-রাস্তা গেছে সেই দিকে গেলে 'সফেদ কোঠী'। ওঙ্কারেশ্বরের 'রামকৃষ্ণ সাধন কুটির'-এর অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দকে আগে চিঠি লিখেছিলাম আসব বলে। উনি জানিয়েছিলেন, 'রামকৃষ্ণ সাধন কুটির' এখানে 'সফেদ কোঠী' বলেই বেশি পরিচিত। বহু দূর থেকে এবং নর্মদার ওপার থেকেও এই সাদা রঙের কুঠিয়াটি দেখা যায়।

নর্মদা এখানে বেশ গভীর। সেতু তৈরির সময় নাকি জল মাপতে গিয়ে আড়াইশো ফুট গিয়েও তল না পাওয়ায় ঝুলন্ত সেতু করতে হয়েছে। নিচে কোন স্তম্ভ দেওয়া যায়নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় খুবই ধীর শান্ত নদী, কিন্তু মাঝে মাঝে বড় বড় চাঁই পড়ে থাকায় সেগুলি অতিক্রম করার সময় জলের শব্দ হয় এবং বেগের তীব্রতা অনুভব করা যায়।

নর্মদার দক্ষিণ তট সাতপুরা পাহাড়ের রেঞ্জ আর উত্তর তট বিন্ধ্যপর্বতের রেঞ্জ। ছোট একটি পাহাড়ের চারপাশ নদী দিয়ে ঘিরে একটা দ্বীপের আকার নিয়েছে। দ্বীপের পূর্বপ্রান্তে কাবেরী ও নর্মদা মিলে এক হয়ে আবার দুই ভাগ হয়ে উত্তরদিক দিয়ে কাবেরী এবং দক্ষিণদিক দিয়ে নর্মদা নামে প্রবাহিত হয়ে দ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে মিলিত হয়েছে।

আটটার মধ্যেই রামকৃষ্ণ সাধন কুটিরে পৌঁছে গেলাম। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ বিশেষ কাজে একটু বেরিয়েছেন। ব্রহ্মচারী বিমাণ সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। স্নানাদি করে সামান্য জলযোগ সেরেই একজনকে সঙ্গে নিয়ে ওঙ্কারেশ্বরজী দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম।

পূর্বমুখ হয়ে পাহাড়ী চড়াই-উতরাই রাস্তা ধরে নর্মদা-মাঈকে ডানহাতে রেখে এগিয়ে চললাম। সাধন কুটিরের পশ্চিমদিকে আনন্দময়ীমায়ের আশ্রম—তিনতলা বাড়ি। কোন লোকজন আছে বলে মনেই হয় না। পূর্বদিকের রাস্তা ধরে এগোলে প্রথমেই চতুর্দশ শতাব্দীর একটি ছোট শিবমন্দির। মন্দির-দ্বারে এক বৃদ্ধা ভীল-রমণী বসে থাকেন। ওঙ্কার-দ্বীপ পরিক্রমাকালে কোন যাত্রী প্রণামী দিলে তা তিনি সংগ্রহ করেন। কিন্তু পূজা করেন সীতারাম-দাস ওঙ্কারনাথ আশ্রমের এক নেপালী সাধু। আরও কিছুটা এগোলে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মঠ। এবার রাস্তাটা প্রায় নদীর কিনারায় নেমে এসেছে। আমরা সেতুর কাছাকাছি এসে গেলাম। সেতুর পূর্বপ্রান্তেই ওঙ্কারেশ্বরের মন্দির।

পতিতপাবনী শিবসুতা মা নর্মদাকে প্রণাম এবং তাঁর স্বচ্ছ শীতল জলে স্নান করে ওঙ্কারেশ্বর-জীকে দর্শন ও পূজা করাই রীতি। বিন্ধ্য এবং সাতপুরা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নদীরূপে এখানে বয়ে চলেছেন মাতা নর্মদা। শুধু স্থানীয় অধি-বাসীরাই নয় সারা ভারতেরই লোক নর্মদাকে গঙ্গার মতো পবিত্র মনে করেন। এমনকি বলা হয়, গঙ্গা স্পর্শনে পাপনাশ, আর নর্মদা দর্শনেই পাপনাশ।

নর্মদার দক্ষিণতীরকে ব্রহ্মপুরী এবং উত্তর-তীরকে শিবপুরী বলা হয়। এই উত্তরতটেই বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে শ্বেতশুভ্র ওঙ্কারেশ্বর মহাদেবের মন্দির। স্নানঘাট থেকে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই প্রথমে পড়বে আদি শঙ্করা-চার্যের গুরু গোবিন্দপাদের গুহা। স্থানীয় এক প্রবীণ ভক্তের কাছে জানলাম, এটি আগে কালীগুম্ফা (কালী গুহা) নামে পরিচিত ছিল। বছর কয়েক আগে কাঞ্চীপুরমের শঙ্করাচার্য এটি এক সাধুর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে অধিগ্রহণ করেন এবং আদি শঙ্করাচার্যের গুরুর একটি ছোট মূর্তি স্থাপন করে প্রাচীন কালীমূর্তিটি গুহার বায়ুকোণে স্থাপিত করেন। এই গুহার নৈঋত কোণ থেকে একটি সুড়ঙ্গ পথ নিচে নর্মদাতট পর্যন্ত চলে গেছে। সেটি পুরাতত্ত্ব বিভাগ এখন বন্ধ করে দিয়েছে। আর ঈশান কোণ থেকে আর একটি সুড়ঙ্গ পথ ওপরে মূল মন্দিরের দিকে চলে গেছে, সেটিও পুরাতত্ত্ব বিভাগ বন্ধ করে দিয়েছে। খুবই পুরনো এই গুহাকে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা চলছে। নর্মদাতটে স্নানঘাটের পূর্বদিকে আদি শঙ্করাচার্যের সন্ন্যাসস্থলে একটি ছোট শিবমন্দির রয়েছে। কিন্তু সেটি দেখাশোনার কেউ না থাকায় খুবই অপরিষ্কার অবস্থায় আছে। তার পাশেই ওপরের গুহায় যাবার রাস্তাটি বন্ধ।

উত্তরতটে প্রতি সোমবার ওঙ্কারেশ্বরজীর পূজা হয়। এখানেই দুগ্ধেশ্বর প্রভৃতি শিবলিঙ্গ আছে। এই ঘাটকে কোটিতীর্থ বলা হয়—এখানে স্নান করলে নাকি কোটিতীর্থস্নানের পুণ্যফল পাওয়া যায়।

যাই হোক নর্মদাসলিলে স্নানের পর তীর্থ-যাত্রীরা গোবিন্দপাদের গুহা দর্শন করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠেন ওঙ্কারেশ্বর-মন্দিরে। প্রথমেই পড়বে পঞ্চমুখী গণেশের মন্দির। কথিত আছে, রাজা মান্ধাতার পিতা যুবনাশ্ব একবার যজ্ঞকালে সিদ্ধি-দাতা গণেশকে আহ্বান করলে তিনি পঞ্চমুখী গণেশরূপে তাঁকে দর্শন দেন। পঞ্চমুখী গণেশের মন্দিরেই সম্প্রতি বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর শ্বেত পাথরের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মূর্তির পাঁচ মুখ, দশ হাত এবং তিন পা। প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর বসা। এরপর মূল মন্দিরের প্রবেশমুখে বিশাল বৃষভ মূর্তি। বৃষভ—শিবের বাহন নন্দী।

ওঙ্কারেশ্বর শিবের প্রণবলিঙ্গ মূল মন্দিরের দক্ষিণদিকে রয়েছে। তার বিপরীতে এক গুহার মধ্যে একটি মূর্তি আছে। কেউ কেউ বলেন এটি শুকদেবের মূর্তি। লিঙ্গের দক্ষিণে মাতা পার্বতীর একটি সুন্দর মূর্তি আছে। মন্দিরে প্রবেশপথে অনেক ঘণ্টা ঝুলছে। এই ঘণ্টা বাজানোর কারণ—ঘণ্টার নাদে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয় এবং তাতে বাইরের কোন শব্দ আর ভক্তজন শুনতে পান না। মন তখন একাগ্র হয়ে আসে। গর্ভমন্দিরে ঘৃত-প্রদীপের এক অখণ্ডজ্যোতি প্রজ্বলিত আছে। শিবলিঙ্গের বেদি রূপোর আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা এবং তার ওপরে চাঁদোয়া টাঙানো আছে। অন্য সময় খুব একটা ভিড় হয় না; কিন্তু পর্বকালে খুবই ভিড় হয়।

কথিত আছে, দেবর্ষি নারদ শিবোপাসনা

করার জন্য একবার বিন্ধ্যপর্বতে আসেন। বিন্ধ্য-পর্বত নারদকে ভক্তির সঙ্গে অভ্যর্থনা করে বলেন: 'আমার কি সৌভাগ্য। এখানে আপনার কোন অসুবিধাই হবে না। এখন বলুন আপনার কি সেবা আমি করতে পারি?' নারদের মনে হলো, বিন্ধ্যের এই বিনয়াবৃত কথা আসলে দম্ভোক্তি। নারদ তাঁর অহংকার দূর করার জন্য ক্ষণকাল শ্বাসরুদ্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। বিন্ধ্য নারদের ক্রোধ দেখে বললেন: 'মুনিবর! আমার কিছু ত্রুটি হয়ে থাকলে বলুন।' বিন্ধ্যের কথা শুনে নারদ বললেন: 'তোমার এখানে কোন জিনিসের অভাব নেই ঠিকই, কিন্তু তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ নও। কারণ তোমার শিখর সুমেরুপর্বতের শিখরের মতো দেবলোক পর্যন্ত পৌঁছায়নি।' এই বলে নারদ চলে গেলেন।

নারদের এই কথা শুনে বিন্ধ্যের আত্মগ্লানি উপস্থিত হলো এবং দুঃখিত অন্তঃকরণে এই ন্যূনতা থেকে মুক্তির উপায়স্বরূপ শিবের প্রসন্নতালাভের জন্য তীব্র তপস্যা শুরু করে দিলেন। বিন্ধ্যের কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে আশুতোষ ভগবান শংকর বিন্ধ্যকে তাঁর দেবদুর্লভ দিব্যস্বরূপে দর্শন দান করলেন। ভক্তিবিভোর বিন্ধ্য প্রার্থনা জানালেন: 'হে ভক্তবৎসল! আমাকে এমন বর দিন যাতে সর্বসিদ্ধি লাভ করি।' ভগবান শঙ্কর তাঁকে বর দিলেন: 'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।' বিন্ধ্য যেখানে তপস্যা করেছিলেন সেই স্থানটি 'ওঁ'-এর আকার বলে এখানকার নাম হয় ওঙ্কারেশ্বর এবং বিন্ধ্যপূজিত লিঙ্গ জ্যোতির্লিঙ্গরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পুণ্যতীর্থ ভারতভূমিতে বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। তার মধ্যে কাবেরী ও নর্মদা সঙ্গমে 'ওঁ'-আকৃতি পর্বতে ওঙ্কারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ অন্যতম। যুগ যুগ ধরে কত তপস্বী, কত মহাত্মা এখানে সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছেন। আদি শংকরাচার্যের গুরু শ্রীমৎ গোবিন্দপাদ হাজার বছর এখানেই সমাধিস্থ ছিলেন বলে লোকপ্রসিদ্ধি।

শিবলিঙ্গ দুই প্রকারের—প্রণব বা জ্যোতির্লিঙ্গ এবং পার্থিবলিঙ্গ। যে-শিবলিঙ্গ স্বতঃপ্রকট হয়, কারও দ্বারা যেটি প্রতিষ্ঠিত নয়—সেই লিঙ্গ জ্যোতির্লিঙ্গ, আর যে-শিবলিঙ্গ বালি, মাটি দিয়ে তৈরি হয় এবং পূজার পর বিসর্জিত হয় তা পার্থিবলিঙ্গ।

ওঙ্কারেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি পঞ্চতল। প্রথমে ওঙ্কারেশ্বর এবং তার ওপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন তলায় আছেন—মহাকালেশ্বর, সিদ্ধনাথ, গুপ্তেশ্বর এবং ধ্বজাধারী। দোতলায় মহাকালেশ্বর মন্দিরের বাইরে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় যেতে হয় এবং সেখান থেকে সুড়ঙ্গ পথের মতো সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দুটি মন্দিরে যাবার পথ। ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতীকরূপে এখানে এগারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ বিদ্যমান। মন্দিরের বিভিন্ন স্তম্ভে বহু দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত এবং চিত্রিত আছে, যা প্রাচীন যুগের স্থাপত্যকলার আশ্চর্য নিদর্শন। ওঙ্কারেশ্বর-মন্দির থেকে রাজপরিবারের কুলদেবী আশাপুরী মাতার মন্দিরে যাবার পথ। পথে দ্বারকাধীশের বিশাল মন্দির। দ্বারকাধীশের মূর্তির শান্ত চোখদুটি ভক্তের মনকে খুব আকর্ষণ করে। মূল মন্দিরের কাছ থেকে এক রাস্তা ওপরের পাহাড়ে রাজমহলের দিকে চলে গেছে। পাথরের তৈরি এই রাজমহল ভূতপূর্ব রাজপরিবারের নিবাসগৃহ। রাজমহলের উত্তরে ওঙ্কার মান্ধাতা গ্রাম। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই ক্ষেত্র নথু ভীল-এর অধিকারে ছিল এবং এই বংশের অধস্তন ত্রিংশতম পুরুষ ভারত-সিংহ চৌহান-এর শাসনাধীন ছিল। বর্তমানে অন্যান্য রাজপরিবারের মতো এঁরাও ভারতীয় যুক্তরাজ্যে যোগদান করেছেন। এখন মন্দির দেখাশোনার জন্য অছিপরিষদ গঠিত হয়েছে।

ওঙ্কারেশ্বরে প্রতি বছর কার্তিক-পূর্ণিমায় এবং ফাল্গুন-শিবচতুর্দশী তিথিতে মেলা হয়। এই সময় মন্দিরে খুব ভিড় হয়। মধ্যপ্রদেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ওঙ্কারেশ্বরের মেলা বিখ্যাত। অনেকে পুরো শ্রাবণ মাস এখানে এসে বাস করেন।

নর্মদার দক্ষিণতট ব্রহ্মপুরী নামে খ্যাত। সেখানেও অনেক দেবদেবীর মন্দির এবং মঠ আশ্রম প্রভৃতি আছে। রেলপথ ও মোটরপথে নর্মদার দক্ষিণতটে এলে কাছেই পড়বে বিষ্ণুপুরী। এখানে আধুনিক ঘাট তৈরি হয়েছে। রাস্তা থেকে

নর্মদা তটে যাবার পথে দেখা যায় গোমুখ থেকে নর্মদার জল পড়ছে। একে কপিলধারা বলা হয়। এর ওপরেই ব্রহ্মপুরী অবস্থিত। গোমুখের কিছু ওপরে পাহাড়ের ওপর পঞ্চতলবিশিষ্ট অমরেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের অন্তর্ভাগে শিবমহিম্ন-স্তোত্র উৎকীর্ণ আছে। এখানে প্রতিদিন সওয়া লক্ষ পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজো হয়। অত্যন্ত প্রাচীন পুরাকীর্তি বলেই এটি এখন পুরাতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্গত। বিষ্ণুপুরীতে গয়াশীলা নামে একটি চাতাল আছে। যাত্রীরা এই শিলা-চত্বরে গড়াগড়ি দেন। এখান থেকে সামান্য দূরে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম। তার কাছেই অন্নপূর্ণার মন্দির। তার প্রবেশদ্বারে দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীতে অদ্ভুত শিল্পকলার নমুনা। এখানে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর মূর্তি আছে। অন্নপূর্ণা যোগাশ্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ মূর্তির বাহান্ন ফুট উঁচু একটি প্রতিমা আছে। আধুনিক মূর্তি-কলার এটি এক সুন্দর নিদর্শন। কাছেই নির্বাণী আখড়ায় ভগবান বিষ্ণুর অতি সুন্দর পাষাণমূর্তি আছে। মন্দিরের বহির্ভাগের শিল্পকলা দৃষ্টি-শোভন।

ওঙ্কারেশ্বরের তীর্থযাত্রীরা এই মন্দিরময় ক্ষুদ্র দ্বীপটি পরিক্রমা করেন। মূল মন্দিরের সামনে যে ছোট বাজার আছে সেই পথ ধরেই পশ্চিমমুখো হয়ে পরিক্রমা শুরু হয়। চড়াই-উতরাই নিয়ে মোট এগারো কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে। যাত্রীরা খুব সকাল সকাল এই পথে পরিক্রমা শুরু করেন।

শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ১৫০৮ খ্রীস্টাব্দে এখানে প্রথম আসেন এবং গোদরশাহ নামে এক ফকির গুরু নানককে পর্বত পরিক্রমার সঙ্গে পরিচিত করান। সেই স্মৃতিতে এখানে একটি 'গুরুদ্বার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পথ ধরে এগোলে পাহাড়ের ওপর থেরাপতি হনুমান, মল্লি-কার্জুন, কেদারনাথ প্রভৃতি মন্দির আছে। তবে অধিকাংশ যাত্রী আজকাল নর্মদার এই উত্তরতটের রাস্তা ধরেই পরিক্রমা করেন। এই পরিক্রমার পথে আজকাল অনেক নতুন নতুন আশ্রম ও মন্দির গড়ে উঠেছে। দ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে কাবেরী-নর্মদা সঙ্গম। অনেকে এখানে স্নানাদি সেরে নেন। তারপর পূর্বমুখ হয়ে পরিক্রমা শুরু করতে হয়। প্রথমেই ঋণমুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দির। সাংসারিক ঋণমুক্তির জন্য এখানে ভক্তরা ছোলা দিয়ে শিবের পূজো করেন।

কাবেরীর তট দিয়ে গেলে জীর্ণাবস্থায় মুচকুন্দ কিলা দেখা যায় শুনলাম। কিন্তু আমরা সেই কিলা আর খুঁজে পেলাম না। পশ্চিমমুখো এই পরিক্রমা-পথটি ধীরে ধীরে পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে। খুব নির্জন এই পথ, কিন্তু বড় মনোহর। বনের মধ্যে বানরদল যাত্রীদের কাছে খাবারের জন্য ছেঁকে ধরে। অবশ্য লাঠি দেখালেই পালিয়ে যায়। বনের মধ্যে অনেক ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওঙ্কার-পুরীতে পশ্চিমদিক থেকে ঢুকতে অনেক প্রাচীন ফটকের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। বাঁধানো সিঁড়ি ধরে পাহাড়ী চড়াই অতিক্রম করে এবার উপস্থিত হলাম গৌরী-সোমনাথ মন্দিরে। সুবিশাল ও সুন্দর এই শিবলিঙ্গের সঙ্গে অনেক কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে।

কালো রঙের সুন্দর বিশাল শিবলিঙ্গ নাকি আগে সাদা ছিল এবং এর মধ্যে মানুষের পূর্বজন্ম এবং ভবিষ্যৎ জন্মের মূর্তি ফুটে উঠতো। এর সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এখানে এলে তাঁর অপ্রীতিকর পূর্বজন্ম এবং প্রতি-কূল ভবিষ্যতের ছবি ফুটে ওঠায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে এই মন্দিরে আগুন জ্বালিয়ে দেন। তখন থেকেই নাকি এই শিবলিঙ্গের ঐ বৈশিষ্ট্যটি লোপ পায়।

ত্রিতলবিশিষ্ট এই অতি পুরাতন শিবমন্দিরটি এখন পুরাতত্ত্ব বিভাগ অধিগ্রহণ করেছেন। অবশ্য একজন মাইনে করা পূজারী রোজ এসে পূজো করে যান। মন্দিরের পাশেই পুরাতত্ত্ব বিভাগ বালি ও পাথরের তৈরি অনেক দেবদেবীর মূর্তি সংরক্ষণ করে রেখেছেন। বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, এককালে এই শিবমন্দিরটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে স্থাপত্যকলার এক সুন্দর নিদর্শন হয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক ছিল। সংরক্ষিত মূর্তিগুলির মধ্যে হরগৌরী, বিষ্ণু, কালী, শিব, গণেশ এবং সূর্যের মূর্তি আছে। মন্দির দর্শন করে বাইরে এলে মহাবীরের (হনুমানের) এক

বিশাল শায়িত মূর্তি আছে। এই হনুমানমূর্তির পাশ দিয়ে পরিক্রমার পথ চলে গেছে।

এবার উপস্থিত হলাম সিদ্ধনাথ মন্দিরে। এটিও অত্যন্ত পুরনো এবং স্থাপত্যকলার এক সুন্দর নিদর্শন। গভীর স্রোতস্বিনী-বেষ্টিত এই পাহাড়ের চূড়ায় এই বিরাট শিবমন্দির তৈরি করতে কত কাল আগে কত বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল, তা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। এই সিদ্ধনাথ মন্দিরের স্তম্ভের স্থাপত্য-সৌন্দর্য দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের ওপর কবিতা ক্ষোদিত রয়েছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কাছে চিরায়ত প্রথামত এখানেও নন্দীমূর্তি আছে। একজন প্রাচীন সাধু এখানেই কাছে এক কুঠিয়ায় থাকেন। তিনিই নিত্য পূজা করেন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং শিল্পসুষমামণ্ডিত এই ভগ্নপ্রায় মন্দিরটিও মধ্যপ্রদেশ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ অধিগ্রহণ করেছেন। দ্বাদশদ্বারবিশিষ্ট এই সিদ্ধ-নাথ মহাদেবের মন্দিরটি ভূমি থেকে আট ফুট উঁচু চাতালের ওপর অবস্থিত এবং এই আট ফুট দেওয়ালের গায়ে যূথবদ্ধ হাতির মূর্তি ক্ষোদিত আছে। এই মনোহর মূর্তি সহজেই মনকে আকর্ষণ করে।

ওঙ্কারেশ্বরের প্রাচীন ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সুরজদরয়াজা (সূর্যদ্বার) তার নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে আজও বিরাজমান। আশাপুরী দেবীর মন্দির এবং সিদ্ধনাথ শিবের মন্দিরের মধ্যে এই দ্বার অবস্থিত। ওঙ্কারপুরীতে প্রবেশের জন্য পাহাড়ের চারপাশেই এরকম অনেক ফটক আছে। এখন অবশ্য দেখলে মনে হয় কিছু খোদাই করা পাথর পর পর সাজানো আছে মাত্র।

ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের ওপর পাহাড়ে রাজ-পরিবারের কুলদেবী আশাপুরী মাতার মন্দির। চতুর্ভুজ সিংহবাহিনী মাতৃমূর্তি। কিংবদন্তী, এখানে সশ্রদ্ধ চিত্তে পূজা দিয়ে যা প্রার্থনা করা যায় তাই পূরণ হয়।

দ্বীপের পূর্বসীমানায় সীতাদেবীর মন্দির। অতি জীর্ণদশা। পূজাও হয় না। এই একই রকম অবস্থায় আছে ভীমেশ্বর শিবের মন্দিরটিও। আর আছে কুন্তী ও অর্জুনের মূর্তি। প্রচলিত প্রবাদ, এখানেই কিরাতবেশী শিবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছিল।

পূর্বপ্রান্তে এখানেই কাবেরী-নর্মদার প্রথম সঙ্গম। পাহাড়ের ওপর থেকে নিচের কাবেরী-নর্মদার দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর। জলও এখানে খুব গভীর। আগে এই পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে নর্মদাসলিলে দেহত্যাগ করত লোকে। এখানে প্রাণ বিসর্জন দিলে নাকি জন্মচক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এখন অবশ্য আইন করে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমমুখী হয়ে নর্মদাতট ধরে আমরা ওঙ্কারেশ্বরজীর মন্দির অভিমুখে চলেছি। পাহাড়ী চড়াই-উতরাই পথের বামদিকে নর্মদা প্রবাহিত আর ডানদিকে খাড়াই বিন্ধ্যপর্বত। জলপ্রবাহে পাহাড়ের গায়ে অনেক গুহা সৃষ্টি হয়ে আছে। প্রাচীনকালে এসব গুহায় সাধু-সন্ন্যাসীরা তপস্যা করতেন। আজও মাঝে মাঝে গুহাগুলিতে সাধুদের দেখা যায়। এসব গুহার মধ্যে ভৈরব-গুহাই সুন্দর এবং প্রসিদ্ধ—তবে সাপের উপদ্রব আছে। এখানে গ্রীষ্মকালে যেমন গরম আবার শীত-কালে তেমনি ঠান্ডা। কার্তিক মাসেই আবহাওয়া বেশ অনুকূল থাকে। নর্মদার তীর ছেড়ে আবার চড়াই পথ ধরে আমরা একেবারে ওঙ্কারেশ্বরজীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম এবং আমাদের পরিক্রমা সম্পূর্ণ হলো।

এখানকার প্রাচীন সাধুর মুখে শুনেছি, 'তপঃ কুর্যাৎ নর্মদাতটে, দেহং ত্যাজেৎ জাহ্নবীকূলে।' ওঙ্কারেশ্বর ছেড়ে চলে আসার সময় সত্যিই দুঃখ হয়। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন সুন্দর, আধ্যাত্মিক পরিবেশও তেমনই গাম্ভীর্যপূর্ণ।

মাসখানেক পর একদিন ওঙ্কারেশ্বর-বাসের দিন শেষ হলো। ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে একদিন বেরিয়ে পড়লাম পরবর্তী তীর্থ উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীর তীরে মহাকাল মন্দিরের উদ্দেশে। এখনো কানে বাজছে শেষরাত্রির অন্ধকারে আশ্রমদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে স্বরূপানন্দজীর বিদায়-সম্ভাষণ—"নর্মদে হর্।" □

পরমপদকমলে

ধর্মকর্ম

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমরা বলি, এইবার একটু ধর্মকর্ম করো, বয়স তো হচ্ছে।

'ধর্ম করো'—এই বাক্যটিই লক্ষণীয়। করো—শুধু ভাবলে হবে না, শুধু পড়লেও হবে না। ধর্ম করার জিনিস। প্রথমে ইচ্ছা অর্থাৎ আমি একটা মানুষ। আমার স্বভাব-চরিত্র-ভাব-অনুভূতি আমাকে তেমন তৃপ্তি দিতে পারছে না। মানুষের যে-আদর্শ এই পৃথিবীতে তৈরি হয়ে আছে, আমি তার ধারেকাছে পৌঁছাতে পারছি না। আদর্শের কাছে আমি পরাজিত। মানুষ হয়েও আমি 'মানুষ' হতে পারিনি।

এই আদর্শ-মানুষের ধারণাটা এল কোথা থেকে? আদর্শটা তৈরি করে দিল কে! মানুষই তৈরি করেছে মানুষের আদর্শ। যুগ যুগ ধরে মানুষের বেঁচে থাকাই তৈরি করেছে সে-আদর্শ। একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে মানুষ। এই দুই শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে করতে মানুষ খুঁজে পেয়েছে তার সীমাবদ্ধতা। দেহের শক্তির তুলনামূলক দুর্বলতা। নিজের বোধ ও বুদ্ধির চঞ্চলতা। মানুষ দেখেছে—তার সসীম দেহের কোথায় যেন আর একটা মানুষ বসে আছে। যার বোধ-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিচার অনেক বেশি। স্থির, স্থিতধী, জ্ঞানী, বিবেচক। সে যেন পিতার মতো, অভিভাবকের মতো, শিক্ষকের মতো, বন্ধুর মতো, মাতার মতো। সেই সত্তাটি বড় উজ্জ্বল। মানুষ যখন বিচারে ভুল করে, ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে নিজের পতন, পরাজয়, সর্বনাশ ডেকে আনে তখন তার অন্তঃসত্তা নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ভুলটা ধরিয়ে দিতে চান, দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেন, উচিত-অনুচিতের বিভাজন করেন।

ঈশ্বর কোথায়! বাইরে কোথাও নেই। বসে আছেন মানুষের ভিতরে। ঐ সমুজ্জ্বল অন্তঃসত্তাই ঈশ্বর। আমাদের আত্মশক্তি। আমরা প্রশ্ন করতে পারি—যদি আমাদের ভিতরেই আছেন, তাহলে তিনি আমাদের স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণে আনেন না কেন, যে-কাজ করা উচিত নয়, সে-কাজ করি কেন? কামনা-বাসনা-অহঙ্কার প্রভৃতি তমোগুণে কেন ডেকে আনি ভয়, সংশয়, যাবতীয় গ্লানি। নিজের জীবন কেন নিজের হাত-ছাড়া হয়ে যায়!

এরই নাম আত্মবিস্মৃতি। ঈশ্বর কোন অলৌকিক চরিত্র নন। তাঁর আলাদা কোন স্বর্গীয় বাসস্থান নেই। আমাদের মনেই তাঁর অবস্থান। তিনি আমাদের আত্মপুরুষ। সেই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়াই যোগ, আর সেই যোগই হলো সাধনা। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে সুন্দর একটি উপমা আছেঃ

> দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
> সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
> নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

ধরা যাক, এই দেহ একটি বৃক্ষ। সেই দেহবৃক্ষে আশ্রয় নিয়ে আছে দুটি পাখি। তারা বসে আছে একই শাখায়, পাশাপাশি, গায়ে গা লাগিয়ে। এই দুটি পাখি কিসের উপমা! একটি পাখি জীবাত্মা, অন্যটি পরমাত্মা। জীবাত্মা কি করছে? সে ঐ গাছের ফল পরমানন্দে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। সে-ফল আবার কি ফল? পূর্ব-জন্মের কর্মফল! সেই সব ফলের স্বাদও বিচিত্র। পরমাত্মারূপী পাখিটি কিন্তু কিছুই করছে না। তার কোন ভোগ নেই। সে সাক্ষিস্বরূপ। সে কেবল দেখছে। সে খাও বলছে না, আবার খেয়ো না-ও বলছে না। পরমাত্মার এইটিই স্বভাব।

উপনিষদ্ এইবার জীবের কি করণীয় সেই উপদেশ করছেন। বলছেনঃ

> সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
> নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
> জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্
> অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

একই দেহবৃক্ষে জীব পরমাত্মাকে নিয়েই বাস করছেন। পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু জীবাত্মা শক্তিহীন। শক্তির উৎসটিকে চিনতেও পারছেন না, ধরতেও পারছেন না। শক্তির অভাবে শোকে

কাতর হয়ে দুঃখভোগ করছেন। পরিত্রাণের উপায়—পরমাত্মার উপাসনা, তাঁর সেবা, তাঁর মহিমাদর্শন। তাহলেই রোগ-শোক-দুঃখ-জরার ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। লাভ করা যায় আনন্দ। এরই নাম যোগ। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যোগ। গীতায় ভগবান বলছেনঃ

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

শ্রীভগবান জীবনের কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন। কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে নয়। 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটি কৃ-ধাতু সম্পন্ন। 'কৃ' মানে করা। জীবের কর্মক্ষেত্র, বিচরণক্ষেত্রই কুরুক্ষেত্র। সংগ্রাম কুরুবংশীয়দের সঙ্গে। যারা জীবকে টেনে আনে হীনকর্মে। দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ আমাদের ইন্দ্রিয়—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যাদি ষড়্‌রিপু মানুষকে আচ্ছন্ন করে। পরমাত্মা থেকে জীবাত্মাকে সরিয়ে আনে। অসীমকে সসীম করে। তুচ্ছকে বিশাল করে দেখে, বিশালকে তুচ্ছ। নিত্যকে অনিত্য করে, অনিত্যকে নিত্য। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'! যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নেই।

এখানে একটি কথা আছে—ঈশ্বরের কৃপা। সেই কৃপা কদাচিৎ কারও জীবনে অযাচিত এলেও আমাদের ধর্তব্যের বাইরে। জীবের পুরুষকারের এলাকার বাইরে—একান্তই ভাগ্য-নির্ভর। কৃষ্ণরূপী ভগবান জীবরূপী বীর সংসার-কুরুক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে ভাগ্য-নির্ভর, স্বনির্ভর হতে বলেননি। অর্জুন বলতে পারতেন, আপনি যার সারথি, তাকে আবার কষ্ট করে যুদ্ধ করতে হবে কেন? এইখানেই লুকিয়ে আছে সারকথা—বীর অর্জুন, আমি তোমার অভীষ্ট ইষ্ট নই। আমি তোমার চালক। হয়তো আমিই তোমার পরমাত্মা; কিন্তু তোমার জীবাত্মার শৌর্য ও বীর্যের অহঙ্কার দিয়ে তোমাকে আগেই বলিয়ে নিয়েছি—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।

—হে অচ্যুত! হে কৃষ্ণ! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। তুমি দেখবে, বিশাল সমরাঙ্গনে কারা সমবেত হয়েছেন। আমি নয়, তুমি নিরীক্ষণ করবে। কারণ এখনো তুমি আমার সঙ্গে যুক্ত হওনি। যোগের পথ উত্তীর্ণ হয়ে এখনো তুমি লীন হওনি আমাতে। আমাকে চিনতে পারনি তোমার পরমাত্মারূপে। এখনো তুমি বলনি—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" জীবের 'আমি'র মায়া-আঁচল এখনো দুলছে তোমার চোখের সামনে। এখনো তোমাকে বলার সময় আসেনি ঃ

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

সব আমাতে অর্পণ করার কথা আমাকে বলতে হবে না। তুমি যোগের পথে নিজেই আসবে সেই বোধে। সেই কৃপাটুকু তোমাকে করে পেতে হবে। করে পাওয়ার নামই কৃপা। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলতেনঃ

"ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—

এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না—মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায় তাহলে ঈশ্বরদর্শন হয়।

এই মায়া সরবে বিচারে, সরবে নিয়ত যুক্ত থাকার চেষ্টায়, গুরুর কৃপায়। শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিচ্ছেন—'আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, মধ্যে সীতারূপিণী মায়ার ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই।'"

আমাদের অন্তরস্থ পরমাত্মাকে আমরা দেখতে পাই না কেন? জীবাত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে এই মায়ার ব্যবধান। জীবাত্মার দেহকোষের অহংধূমে সব আচ্ছন্ন। আমি, আমি করে 'ক্ষুদ্র আমি' শৃগালের মতো মনোরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই 'কাঁচা আমি' না গেলে 'পাকা আমি'-র দেখা মিলবে না। আবার মজাটা এই—এই 'কাঁচা আমিই' খুঁজতে খুঁজতে সেই 'পাকা আমি'র দরবারে গিয়ে হাজির হবে। শুধু অনুসন্ধানের ধারাটা পাল্টাতে

হবে। বাইরের ওপর নির্ভর করলে হবে না। ইচ্ছাটা ভিতর থেকে আসা চাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ

আমি কে, এইটি খুঁজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া যায়। আমি কি মাংস, না হাড়, না মজ্জা, না মন, না বুদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় যে, আমি এসব কিছুই নই। 'নেতি', 'নেতি'। আত্মাকে ধরবার ছোঁবার জো নাই। তিনি নির্গুণ নিরুপাধি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। কাঁদিয়ে বললেন—শোন সখা!

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥

বিশ্বরূপ সংবরণ করে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীতে মানুষ অনেক কাণ্ড করতে পারে। যেমন, চতুর্বেদ অধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ, যজ্ঞবিজ্ঞান নাড়াচাড়া, দানধ্যান, হোম প্রভৃতি শ্রৌতকর্ম বা চান্দ্রায়ণাদি কঠোর তপস্যা; কিন্তু এই বিশ্বরূপদর্শন সম্ভব হবে না। একমাত্র তুমিই দেখলে।

প্রশ্ন হলো—কেন অর্জুন একা দেখবেন? তাহলে আমরা কি হতাশ হব! কৃপা ছাড়া যদি দর্শন সম্ভব না হয় হলে যাগযজ্ঞ, সাধন-ভজনের কি প্রয়োজন! বিশ্বরূপ মানেটা কি? কি দেখলেন অর্জুন! সেই সত্যকে, যা দেখতে চেয়েছিলেন উপনিষদের ঋষি তাঁর বিনীত প্রার্থনায়—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

আমি সাধক। আমার দর্শনকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে চাই। হে জগৎকারণ সূর্য। জীবমাত্রেই তোমার কিরণস্পর্শে উদ্ভাসিত। তোমার কাছে সাতিশয় ঋণী। তোমার উদ্ভাসটুকুই তারা দেখে, তোমার তেজকে সমীহ করে। তাতে তাদের স্বভাব পাল্টায় না। তুমি তোমার মতো, দূর আকাশে দীপ্ত বলয়। আর আমরা আমাদের মতো—তোমার সৃষ্টিতে বিচরণশীল। কেউ জাগে হিংসা নিয়ে, কেউ জাগে প্রেম নিয়ে, কেউ জাগে ভীরুতা, নীচতা নিয়ে, কেউ জাগে জ্ঞান-বিজ্ঞান-ত্যাগ-তিতিক্ষা নিয়ে। স্ব স্ব ভাবে জাগরিত হয় তোমার উদার কিরণে। বাইরে তোমার প্রকাশ একটিমাত্র সত্যে—সে হলো উত্তাপ, জ্যোতি, দীপ্তি। যারা তোমার কাছে আসতে চায় তোমার দেওয়া শরীর নিয়ে তারা মুহূর্তে দগ্ধ হয়ে যাবে। এ কেমন পিতা! বহু যোজন দূরে থেকে সৃষ্টিকে পালন করছেন। জ্যোতির্বলয়ে নিজের মুখ আচ্ছাদন করে রেখেছেন। সে-মুখ হলো এক মহাসত্যের মুখ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্তার মুখ। বিশ্বরূপ। আমি সাধক। অন্তরে তোমার প্রকাশ দেখতে চাই। বাইরে তোমার জ্যোতি তো দেখছিই, অন্তরে দেখতে চাই জ্ঞানপদ্মের উন্মেষ। দেহে তোমাকে ধারণ করা যাবে না। নামরূপ নিয়ে তোমার সত্যসদনে পৌঁছান যাবে না। তুমি আসলে একটি স্নিগ্ধ পদ্ম। তুমি জীবন, তুমিই মরণ।

ভগবান যখন বলছেন—বিশ্বরূপ একমাত্র তুমিই দেখলে তখন সেই দর্শন রূপান্তরিত হলো জ্ঞানে। জ্ঞান [illegible] নই হয় যখন সত্য-দর্শন একটি পাত্রে ধৃত হয়। আধার চাই। যেকোন একজন মানবকে ধরতে হবে। ধারণ করতে হবে। অর্জুন হলেন সেই রিপোজিটারি অব

আমরা অর্জুন না হয় নাই হলাম। বিশ্বাসী হলে তো ক্ষতি নেই।

উপনিষদের ঋষি যখন বলছেন নিজের মুখমণ্ডল থেকে তোমার জ্যোতির্বলয় সরাও, আমি তোমার সত্য মুখচ্ছবি দর্শন করতে চাই! সেই প্রার্থনা নিজের উন্মোচনের প্রার্থনা। অহং-এর সীমাবদ্ধতা থেকে আমাকে মুক্তি দাও—তত্ত্ব, তথ্য, সত্য, জ্ঞানে। উপাধি থেকে নিরুপাধিতে।

ঠাকুর বলছেন—একটা সুন্দর দেশ আছে। কেউ সেখানে গেছে, কেউ সেখানে যায়নি। এইবার যে গেছে সে বর্ণনা দিচ্ছে। সেই শোনাতেই আর একজনের যাওয়া হয়ে যাচ্ছে। শর্ত একটাই। বিশ্বাস। অবিশ্বাসী হলে হবে না। তার্কিক হলে হবে না। তর্ক হলো তমো। নারদ যাচ্ছেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো ভগবানের কাছ থেকে আসছেন, তিনি এখন কি করছেন দেখে এলেন। নারদ বললেন, দেখে এলাম, তিনি ছুঁচের

ফুটোর মধ্য দিয়ে হাত গলাচ্ছেন। অবিশ্বাসী বললো, যাঃ! তা কি করে সম্ভব। বিশ্বাসীর চোখে জল এসে গেল। বললো, তা তো হতেই পারে। তাঁর পক্ষে তো কিছুই অসম্ভব নয়।

বিশ্বাস আর অনুভূতি যোগশরীরের দুটি পা। অনুভূতি কি রকম। মনের সুর সেই সুরে বাঁধা হয়েছে। কবীর দাস বলছেন ঃ

সাধো ইহ তনঠাঠ তম্বুরে কা
পাঁচ তত্ত্ব কা বনা তম্বুরা
তার লগা নব তুরে কা।
পেঁচে তার মরোরত খুঁটি
নিকসত রাগ হুজুরে কা।

এই দেহের কাঠামো তম্বুরার মতো। পঞ্চ তত্ত্বে তৈরি তম্বুরায় নতুন তার লাগান হয়। খুঁটির সঙ্গে সেই তার পেঁচিয়ে খুশিমত রাগ তৈরি করা যায়। 'নিকসত রাগ হুজুরে কা।' মন তৈরিই হলো সাধনের প্রধান শর্ত। সাধন করবে দেহ নয় মন। মনের ধারক দেহ, সেই কারণেই হঠযোগ। সুস্থ, নির্মল দেহে অনুভূতিপ্রবণ মন। কেমন অনুভূতি? ভক্তমালে আছে ঃ রতিবন্ত বাই-এর কথা। "রতিবন্ত নামে এক বাই পুরুষোত্তমে। বাল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে মাত রমে॥ গ্রামে শ্রীভাগবত পাঠ হয়। রতিবন্তর ছেলে রোজ শুনতে যায়। আর যা শোনে তা-ই এসে মাকে শোনায়। একদিন উদূখলবন্ধন-আখ্যান শুনে এসে মাকে বলছে। মা যশোদা চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলের সঙ্গে দাড়ি দিয়ে বেঁধেছেন। রতিবন্ত শুনছেন। দুচোখে জল। "হা হা হেম সুকুমার কমলনয়ানে।/কেমনে বান্ধিল রানী দয়া নৈল মনে।/ইহা কহি অচেতন হইয়া পড়িলা।/পড়িতেই অইমনি প্রাণ ছুটি গেলা॥" রতিবন্তর এমনই সূক্ষ্ম অনুভূতি, বালক কৃষ্ণের বন্ধনদশার যন্ত্রণা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। প্রাণত্যাগ করলেন।

কেমন অনুভূতি! ঠাকুর বলছেন—চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থভ্রমণ করছিলেন দেখলেন, একজন গীতা পড়ছে। আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে—কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এসব বুঝতে পারছ? সে বললে, ঠাকুর! আমি এসব শ্লোক কিছু বুঝতে পারছি না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কেন কাঁদছ? ভক্তটি বললে আমি দেখছি অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্ছেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি।

অহঙ্কার থেকেই অবিশ্বাস। 'কুজ্ঝা তোমায় কু বোঝায়। রাইপক্ষে বুঝায় এমন কেউ নাই।' 'নীচ আমি' সদা সর্বদাই বোঝাতে চায়, তোমার বোঝাটাই ঠিক। এই আমিটাকে তাড়াতে হবে। কিভাবে? ঠাকুর বলছেনঃ "আমি তো যাবার নয়। তবে থাক শালা দাস আমি হয়ে। সেব্য-সেবক ভাবই ভাল।" সে কেমন? ঠাকুর বলছেনঃ "রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি আমায় কিভাবে দেখ? হনুমান বললে—রাম! যখন 'আমি' বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি প্রভু, আমি দাস। আর রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।"

বিশ্বরূপ এইটাই—স্রষ্টার সঙ্গে মিশে আছি আমি। অর্জুন ভগবানেই রয়েছেন। বিশ্বরূপের এক রূপ। ঠাকুরের অসাধারণ উপমায়—'জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ হলেও জল। সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ—আবার তির্যগ্‌গতি হয়ে এঁকেবেঁকে চললেও সাপ। বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে-ব্যক্তি—যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি। জীব-জগৎকে বাদ দেবে কেমন করে! তাহলে যে ওজনে কম পড়ে। বেলের বিচি, খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না।'

বেল আর বেলের বিচি, বড় সুন্দর উপমা। স্রষ্টার গর্ভেই সৃষ্টির লীলা। বিচির অহঙ্কারই 'আমি'। আমি বিচি; কিন্তু জড়িয়ে আছি বেলের গর্ভে। যে-মুহূর্তে চেতনা এল দেখা গেল—

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি
শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব-চরাচর।
অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ 'অহং' স্রোতে নিরন্তর।
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল
বহে মাত্র 'আমি আমি' এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারাও বন্ধ হলো শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসগোচরম্' বোঝে প্রাণ বোঝে যার॥

এই অনুভূতি স্বামীজীর। □

নিবন্ধ

সতীপীঠ বর্ধমানের ক্ষীরগ্রাম

প্রণবেশ চক্রবর্তী

কবি কৃত্তিবাসের 'যোগাদ্যা-বন্দনা' পড়েছিলাম প্রথম যৌবনে। তখনই জেনেছিলাম, হনুমান অহিরাবণ ও মহীরাবণকে বধ করে তাদের উপাস্য দেবী ভদ্রকালীকে পিঠে করে নিয়ে এসেছিলেন বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামে।

গ্রামের নাম ক্ষীরগ্রাম। কিন্তু সতীপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'যোগাদ্যা'র নাম অনুসারে এই গ্রামের নামও আজ হয়ে গেছে 'যুগাদ্যা'। লোকমুখে এই নামটিই বেশি প্রচলিত। 'শিবচরিতে' একান্ন সতীপীঠের যে-বর্ণনা দেওয়া আছে, তাতে বলা হয়েছে, দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হওয়ার পর প্রলয় নাচনে উন্মত্ত শিবের স্কন্ধে শায়িতা সতীর দেহটি বিষ্ণুচক্রে একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং একান্নটি স্থানে পড়ে সৃষ্টি করে একান্নটি সতীপীঠ। কালীঘাটে পড়েছিল সতীর ডানপদাঙ্গুলী এবং ক্ষীরগ্রামে পড়েছিল সতীর ডানপদাঙ্গুষ্ঠ। সতীপীঠ ক্ষীরগ্রাম তাই মহাপীঠে পরিণত।

এই ক্ষীরগ্রামের পশ্চিমে লিগনগ্রামে আছেন 'লিঙ্গেশ্বর'। আবার গীধগ্রামে আছেন 'গীধেশ্বর'। দক্ষিণে অবস্থিত পুইনীপলাশীতে 'পাতিলেশ্বর' এবং উত্তরে অবস্থিত শীতলগ্রামে বা সিল্বলগ্রামে 'সিদ্ধেশ্বর' নামে চারটি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ আছেন। স্থানীয় মানুষের ধারণা এবং যুগ যুগ ধরে লালিত-পালিত কিংবদন্তী হচ্ছে যে, ক্ষীরগ্রামের সতীপীঠ রক্ষার জন্য চারপাশে চার গ্রামে চারজন অনাদী শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই কিংবদন্তীর সত্যাসত্য নিয়ে হয়তো চুলচেরা বিতর্ক চলতে পারে, হয়তো বিস্তার করা যেতে পারে যুক্তিজাল, কিন্তু চার গ্রামের চার শিবলিঙ্গের উপস্থিতি হলো ঘটনা।

ক্ষীরগ্রামে 'যোগাদ্যা-বন্দনা' নামে একটি পুঁথি পাওয়া যায়। পুঁথিটির রচয়িতা হচ্ছেন বাঞ্ছারাম বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য। তিনি এই পুঁথিতে বলেছেন :

বন্দিব যোগাদ্যা যুগ-আদ্যাশক্তি মাতা।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুবর্গ দাতা॥
ভয়ংকর ঘোর মূর্তি তীক্ষ্ম খড়্গ হাতে।
উগ্রচণ্ডা নামে দেবী আছিলা লংকাতে॥

পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে লংকেশ রাবণ ছিলেন এই উগ্রচণ্ডা দেবীর উপাসক। রামের বনবাসকালে রাবণ সীতাকে হরণ করেন। হনুমান সীতা অন্বেষণে লংকায় যান।

তার পরের ঘটনা জানতে আমরা আবার 'যোগাদ্যা-বন্দনা'-কে অনুসরণ করতে পারি—

সীতাহারা হয়ে রাম বনে পেয়ে শঙ্কা।
অন্বেষণে হনুমানে পাঠাইল লঙ্কা॥
হনুমানে স্বর্ণলঙ্কা সমর্পণ করি।
পাতালে মহীর ঘরে গেলেন শঙ্করী॥
রাবণতনয় সেই মহীরাবণ নাম।
পাতালে হরিয়া নিল লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥
হনুমান গেল তথা রামের উদ্দেশে।
রামেরে উদ্ধার কৈল বধিয়া রাক্ষসে॥
সঙ্গে করি নিয়া হরি আনিল দশভুজা।
ক্ষীরগ্রামে আসিয়া দেবীর কৈল পূজা॥
বিশ্বকর্মা রামাজ্ঞায় হয়ে আগুয়ান।
বিচিত্র দেউল এক করিল নির্মাণ॥
মহাপীঠে মহামায়া করিয়া স্থাপনা।
যোগাদ্যা বলিয়া নাম করিল ঘোষণা॥
হরিদত্ত নামে রাজা আছিল শুইয়া।
স্বপ্নেতে কহিল মাতা শিয়রে বসিয়া॥

কত নিদ্রা যাও রাজা হয়ে অচেতন।
কৈলাস ছাড়িয়া আইনু তোমার ভবন॥
তোমারে সদয় আমি দেবী ভদ্রকালী।
মোর পূজা কর নিত্য দিয়া নরবলি॥
বহু স্তুতি করে রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে।
করিব তোমার পূজা নিজ মুণ্ড দিয়ে॥

রাজা হরিদত্তের ছিল সাত পুত্র। তিনি পরপর সাত দিন সাত পুত্রকে বলি দিয়ে দেবী ভদ্রকালীর পূজা করলেন। প্রচলিত জনশ্রুতি সেই কথাই বলে।

তখন থেকেই প্রথা অনুসারে প্রতিদিন একটি করে নরবলি দেওয়া হতো দেবীর তৃপ্তিবিধানে। রাজার আদেশ—কেউ সে-আদেশ অস্বীকার করতে পারলেন না। আর সেই আদেশেই ক্ষীরগ্রামে ও তার চারপাশের তাবৎ গ্রামের সকল লোককেই নিজের নিজের পালা এলে নরবলি দিতে হতো। এসব কাহিনী আজও লোকমুখে ক্ষীরগ্রামে এবং সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচারিত।

এভাবেই একদিন এল দেবীর পূজারীর পালা। ঐ পূজারী ব্রাহ্মণের ছিল একমাত্র পুত্র। ব্রাহ্মণ তাঁর একমাত্র পুত্রকে দেবীর কাছে বলি দিতে রাজি নন। কি করেই বা নিজের হাতে তিনি তাঁর একমাত্র বংশধরকে বিসর্জন দেবেন? তাই শেষ পর্যন্ত তিনি স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাবেন বলে ঠিক করলেন। গোপনে রাতের অন্ধকারে তিনি সপরিবারে পালালেনও।

পথে ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হলো এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন: ব্রাহ্মণপুত্র হয়ে এত রাত্রে এভাবে প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছ কেন? কিসের এত ভয়? কেনই বা তুমি পালাতে চাও? বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর সেই প্রশ্ন 'যোগাদ্যা-বন্দনা'-তে বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

দ্বিজের নন্দন হয়ে কেন এসময়।
এতরাত্রে কোথা যাও প্রাণে পেয়ে ভয়॥
কিবা রাজপীড়া হইল তোমার শরীরে॥
কি হেতু পলাইয়া যাও সত্য কহ মোরে॥
ব্রাহ্মণ বলেন মাতা কহিতে ভয় রাসি।
যোগাদ্যা নামেতে এক এসেছে রাক্ষসী॥
প্রাণরক্ষা নাহি পাই ক্ষীরগ্রামী হয়ে।
স্ত্রী-পুত্র লয়ে তাই যাই পলাইয়ে॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন কাত্যায়নী।
যার ভয় পাইয়াছ সেই দেবী আমি॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ তবে অতি ভয় পেয়ে।
বহু স্তুতি করে তাঁকে কৃতাঞ্জলি হয়ে॥
তুমি ভগবতী মাতা প্রত্যয় না হয়।
ছলনা করিয়া কেন ভণ্ডাহ আমায়॥
আশ্বিনে অম্বিকা মূর্তি যদি দেখিবারে পাই।
তবে সে প্রত্যয় হয়ে ঘরে ফিরে যাই॥
ভকতবৎসল মাতা দেবী কাত্যায়নী।
হইলেন বিপ্র অগ্রে মহিষমর্দিনী॥
সিংহপৃষ্ঠে শোভা পায় দক্ষিণ চরণ।
বামাঙ্গুষ্ঠে করিয়াছে মহিষ মর্দন॥
বিগলিত কুন্তল শোভিছে পৃষ্ঠোপরে।
কণককিরীট শোভে মস্তক উপরে॥
ভালে শোভে চারুচন্দ্র চন্দ্রচূড় ধারা।
দানবদলনী মাতা বিশ্ব মনোহরা॥
কোটিচন্দ্র জিনি রূপ শ্রীমুখমণ্ডল।
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু করে ঝলমল॥

ক্ষীরগ্রামে ভানুদত্ত নামে এক শাঁখারির কাছে ধামাচে নামে দীঘির পাড়ে এক ঘাটে বসে দেবী যোগাদ্যা শাঁখা পরেছিলেন। এই শাঁখারির বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে। ভানুদত্তের বংশধররা এখনো এই গ্রামে বসবাস করছেন।

কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, এই ধামাচে পুকুরেই দেবী যোগাদ্যা আগে অবস্থান করতেন। সেই পুকুরটি এখন আর নেই। পরবর্তী কালে বর্ধমানের মহারাজার ক্ষীরদীঘি নামক পুকুরে দেবী যোগাদ্যাকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেবী যোগাদ্যা সারা বছরই জলের নিচে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকেন। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিনই শুধু তাঁকে জল থেকে তোলা হয়। সেইদিনই শুধু তাঁর পূজা হয়। পূজার পরে আবার তাঁকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। এই উপলক্ষেই ক্ষীরগ্রাম হয়ে ওঠে জনারণ্য। ভক্তিপ্রাণ

মানুষের সমাগমে জমে ওঠে মেলা, গ্রামটি হয়ে যায় জনতীর্থ।

ইংরেজ আমলে ক্ষীরগ্রামের নরবলি প্রথা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তবে তার পরেও দু-একটি নরবলি হয়েছে বলে লোকমুখে শোনা যায়। তবে সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

যোগাদ্যার পূজা হয় শ্রীশ্রীদ ির ধ্যানমন্ত্র অনুযায়ী।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য এবং তা হলো এই যে, ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যার যে আদি মূর্তি ছিল তা ভেঙে যাওয়ার ফলে সেই আদি মূর্তির অনুকরণে বর্ধমানের মহারাজা উদ্যোগী হয়ে বর্ধমান জেলার দাঁইহাট-নিবাসী বিখ্যাত ভাস্কর নবীনচন্দ্র ভাস্করকে দিয়ে তুন মূর্তি তৈরি করান। নতুন মূর্তির বয়সও প্রায় শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলল।

২ ॥

ভারতের আসমুদ্রহিমাচলে বিস্তৃত একান্নটি সতীপীঠ নির্ণয়ের যে-তালিকা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, অষ্টাদশ পীঠ হলো যুগাদ্যায়। বর্ণনাটা হচ্ছে এরকম :

ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডকঃ।
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদো মম॥

এই বর্ণনা থেকে জানা যায়, বর্ধমানের যুগাদ্যাতে পড়েছে মহামায়ার দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ। ভৈরব সেখানে ক্ষীরখণ্ডক।

কিন্তু অন্নদামঙ্গলের কবি এধরনের বর্ণনা মেনে নিতে আদৌ রাজি নন। তিনি শ্লোকটির কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন। তাঁর মতে শ্লোকটা হয়েছে এরকম :

ক্ষীরগ্রামে মহাদেবঃ ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডকঃ।
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদো মম॥

অন্নদামঙ্গলের কবি শ্লোকটির বঙ্গানুবাদও দিয়েছেন। এখানে সেটাও তুলে ধরা হলো :

ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব।
যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব॥

এই দুটি শ্লোকের মধ্যে বর্ণনাগত পার্থক্য যা-ই থাকুক না কেন, এবিষয়ে কেউই ভিন্ন মত পোষণ করেননি যে, বর্ধমানের যুগাদ্যা বা ক্ষীরগ্রামে দেবীর ডানপায়ের অঙ্গুষ্ঠ পড়েছে। এখানে দেবীর নাম যোগাদ্যা, ভৈরবের নাম ক্ষীরখণ্ডক।

স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখন যেটা ক্ষীরদীঘি, কথিত আছে, তারই দক্ষিণদিকে মধ্যস্থলে সতীর দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের একটি খণ্ড পড়েছিল। দেবী এখনো যোগাদ্যা বটে, তবে ভৈরবকে লোকে বলে ক্ষীরেশ্বর। ক্ষীরদীঘি থেকে কিছুদূরে ঈশাণ কোণে আছে ক্ষীরেশ্বরের মন্দির।

স্থানীয় লোকেরা বলেন, মন্দিরে আগে কোন মূর্তি ছিল না। ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদত্তকে দেবী দেখা দিয়েছিলেন উগ্রচণ্ডী মূর্তিতে। মূর্তিটি কষ্টিপাথরের তৈরি। সিংহবাহিনী—দশভুজা।

বর্ধমান জেলার বর্ধমান-কাটোয়া ন্যারো গেজ রেললাইনে (বি. কে. আর) কর্জনা পেরিয়ে কৈচর স্টেশন। সেখান থেকে গ্রামের পথ ধরে প্রায় আড়াই মাইল গেলেই একান্ন সতীপীঠের এক পীঠ ক্ষীরগ্রাম।

সতীপীঠ নির্ণয়ের ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। নানা গ্রন্থে আছে নানা বর্ণনা। এই নিয়ে কিছু কিছু মতভেদও আছে।

যেমন 'তন্ত্রচূড়ামণি'তে যে একান্ন পীঠের বর্ণনা আছে, তাতে দেখি, বিংশতিতম স্থানে উল্লিখিত হয়েছে যুগাদ্যার নাম। বলা হয়েছে, এখানে সতীর দক্ষিণাঙ্গুলি পড়েছিল এবং দেবীর নাম ভূতধাত্রী এবং ভৈরব হচ্ছেন ক্ষীরখণ্ডক। আবার 'শিবচরিতে' যে একান্ন পীঠের বর্ণনা আছে, তাতে দেখি ৪৭ নম্বরে ক্ষীরগ্রামের উল্লেখ আছে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙলাভাষার অভিধানে সতীপীঠ নিয়ে বিস্তর বিচার-বিশ্লেষণ করা

হয়েছে এবং তারপর দেওয়া হয়েছে একান্ন পীঠের তালিকা। তাতেও ৪৭ নম্বরে দেওয়া হয়েছে ক্ষীরগ্রামের নাম। বলা হয়েছে, বর্ধমান স্টেশন থেকে ২০ মাইল উত্তরে এই গ্রাম—যেখানে পড়েছিল সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ এবং এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা ভৈরবী হচ্ছেন যোগাদ্যা এবং ভৈরব হচ্ছেন ক্ষীরকণ্ঠ।

বর্ধমান শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যেমন মা সর্বমঙ্গলা, তেমনি ক্ষীরগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন যোগাদ্যা। আর এই তীর্থস্থানটি যে একান্ন সতীপীঠেরই একটি সেবিষয়ে সর্বজনই একমত।

আগে যোগাদ্যা দেবীর পূজা-অর্চনা এবং বৈশাখী সংক্রান্তির মেলা সংগঠনের যাবতীয় ব্যয়ভার বর্ধমানের মহারাজাই বহন করতেন। শুধু তাই নয়, মহারাজাই বর্তমান মন্দির, গম্ভীরা প্রভৃতি তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিংবদন্তীর 'বিশ্বকর্মা-নির্মিত' মন্দিরের কোন চিহ্ন আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী অনুসারে পাতাল থেকে যে-সুড়ঙ্গ দিয়ে হনুমান দেবীকে তুলে এনেছিলেন, সেই বহুকথিত সুড়ঙ্গের মুখটি এখন একটি বড় পাথর দিয়ে চাপা রয়েছে। কেউ কেউ বললেন, আগে এই মন্দিরে নরবলি দেওয়ার পর খণ্ডিত নরদেহ ঐ সুড়ঙ্গে ফেলে দেওয়া হতো। মনে হয়, এটাই যুক্তিসঙ্গত।

আগেই বলা হয়েছে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির সময় ক্ষীরগ্রামে বিরাট মেলা বসে। যদিও দেবীর পূজা একদিনেই হয় এবং পূজার পরই দেবীকে আবার জলের নিচে ডুবিয়ে রাখা হয়, এই উপলক্ষে আয়োজিত মেলা কিন্তু চলে বেশ কয়েকদিন ধরে। বাংলার অন্যান্য বড় মেলার মতোই এই মেলাতেও অনেক দোকান বসে। পিতল-কাঁসা ও মিষ্টির দোকানেই বিক্রিবাটা বেশি হয়।

এই পূজা ও মেলা উপলক্ষে ক্ষীরগ্রামের প্রতি বাড়িতে অতিথি এবং আত্মীয়-স্বজনের ভিড় লেগে যায়। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসে বাপের বাড়িতে। প্রতি বাড়িতেই যেন মেলা বসে যায়। মেলা মানেই তো মিলন।

পূজার দিন হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। মন্দিরে হয় যজ্ঞ হয় মহিষ-বলি। তারপর ক্ষীরদীঘির আশেপাশে শুরু হয়ে যায় পাঁঠাবলি। এসময় নাকি এখানে দুহাজার পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

এই পূজা এবং মেলার সূচনা ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদত্তের সময়েই হয়েছিল বলেই মনে হয়। রাজা হরিদত্তের আমলেই নরবলির প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর এই পূজা ও সেবার ভার কার হাতে অর্পিত হয়েছিল সেবিষয়ে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কৃষ্ণনগরের ও পাটুলীর রাজাদের হাতেও বহুদিন সেবা-পূজার ভার ছিল। পরবর্তী কালে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের আমল থেকে দেবী যোগাদ্যার সেবার ভার অর্পিত হয় বর্ধমানের মহারাজাদের হাতে।

বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন উষালগ্নে দেবীমূর্তিকে তোলা হয় ক্ষীরদীঘির কাকচক্ষু জল থেকে। আবার সেদিনই রাত্রে তাঁকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। জল থেকে তোলার পর ক্ষীরদীঘির পূর্বপারে 'উত্থান মন্দির'-এ তাঁকে স্থাপন করার পরই প্রথমে সেবক-রাজাদের নামে পূজা ও বলিদান দেওয়া হয়। এরপর 'মচ' বা মণ্ড পূজা। দুটি মণ্ড আছে একটি নতুন, অপরটি পুরনো। এখন নতুন মণ্ডেই পূজা হয়। খুব উঁচু যজ্ঞবেদিতে স্থাপিত হয় যজ্ঞকুণ্ড। বাজতে থাকে নানা রকমের বাজনা। চলতে থাকে নাচ-গান।

ক্ষীরগ্রামের প্রাণ সেদিন জেগে ওঠে। নতুন বেশ ধারণ করে গোটা গ্রাম। ঘরে ঘরে বসানো হয় মঙ্গলঘট, দ্বারে দ্বারে কলাগাছ, উঠোনে, বারান্দায় আঁকা হয় আলপনা।

দেবী আসবেন তাই ক্ষীরগ্রামের মানুষ ঘর সাজিয়ে মন রাঙিয়ে উন্মুখ হয়ে সেদিন অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে আসেন দেবী—আসন জুড়ে বসেন অগণিত ভক্ত নরনারীর হৃদয়ে। □

সারদাদেবীঃ "পৃথিবীর মহত্তমা নারী"

নীহার মজুমদার

মাকে ভালবাসে না এমন মানুষ বিরল। মায়ের নাম নিয়েই বাল্যে আমাদের বোল ফোটে। জননীর স্নেহ, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা, মমতায় স্নান করে আমরা ভূমিষ্ঠ হই। এই ঋণ কারও পক্ষেই জীবদ্দশায় পরিশোধ অসম্ভব। বৈদান্তিক ভারত 'মাতৃপ্রেমিক' দেশ। আর, সারদামাতা সেই শাশ্বত ভারতের সার্থক জননী।

একজন সাধারণ বঙ্গবধূ কিভাবে 'সর্বজননী' হয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সুখে দুখে সকলের আশ্রয়দাত্রী হতে পারেন তা সারদাদেবীর জীবন-চরিত অনুসরণ না করলে জানা অসম্ভব। যাঁরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সম্বন্ধে সম্যগ্‌ভাবে অবহিত নন, তাঁরা এই মাতৃদেবীর অসাধারণ ভূমিকা সম্পর্কেও অবহিত নন।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জায়াকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলে আজীবন পূজা করে এসেছেন। সারদা-দেবীর চরিত্রটি আমাদের কাছে রহস্যাবৃত। আপাতদৃষ্টিতে পল্লীর এক সাধারণ নারী। সর্বদা কর্মব্যস্ত, পতিপ্রাণা, আশ্রিতবৎসল। সকলের প্রতি তাঁর করুণা, বিশেষ করে যারা দুর্বল ও অক্ষম। সবাই তাঁর আপনার জন। তথাকথিত নীচজাতি, বিধর্মী ও বিদেশীরাও তাঁর সন্তান। যেমন মানুষের প্রতি ভালবাসা, তেমন ইতর প্রাণীর প্রতিও তাঁর নির্বাধ করুণা। সর্বদা অদোষ-দর্শিতা। সর্বদা সন্তোষ। সংসারের মধ্যেও তিনি অসংসারী। ঈশ্বরপ্রাণ তাঁর জীবন। শান্ত, কোমল, স্বল্পবাক্‌ কিন্তু প্রয়োজনবোধে দৃঢ়, অনমনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সম্ভ্রম করেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সিদ্ধান্তের সম্মুখে নতশির হন, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সামগ্রিকভাবে তাঁরই আশ্রিত।

পরমপুরুষ সারদামণির মধ্যে দেবী জগদম্বাকে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন নারীর ছায়ায় দেবিশ্রেষ্ঠাকে। তাই বাস্তবক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজ পত্নীকে দেবীরূপে পূজা করতে দেখি। ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপা সারদাদেবীকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যথোচিত মর্যাদায় আরাধনা করে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন —হে দেবি, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী, জগতের কল্যাণে উন্মোচন কর এর সিদ্ধির দ্বার। এই বিগ্রহে তুমি আবির্ভূতা হও। তাঁকে বলতে শুনি—"যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন, সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" "ও সারদা—সরস্বতী। জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" "ও জ্ঞানদায়িনী, মহা বুদ্ধিমতী। ও কি যে সে ! ও আমার শক্তি !"

যিনি সদা-শক্তিধর, যিনি স্বয়ং অবতারশ্রেষ্ঠ —তাঁর কাছে যিনি প্রেরণাদাত্রী, শক্তিদায়িনী—সেই নারীমূর্তিধারিণী যে কত উচ্চকোটির হতে পারেন তা আমাদের ধারণার অতীত। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর মাতাঠাকুরানী যেভাবে রামকৃষ্ণ সংঘকে পরিচালনা করেছিলেন, যেভাবে পরমপুরুষের ভাব ও আদর্শকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

স্বামীজীর বিদেশযাত্রা থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গঠন ও পরিচালনে সারদাদেবীর নির্দেশ ও প্রেরণার ভূমিকা নেপথ্যচারিণীর, কিন্তু প্রকৃত সম্রাজ্ঞীর। শতকরা একশো ভাগ গ্রাম্য পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা কোন অশিক্ষিতা নারীর পক্ষে এত বড় গুরুদায়িত্ব নেওয়া তখনই সম্ভব যদি তাঁর ওপর ঐশ্বরিক শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে।

আজ জগৎ জুড়ে রামকৃষ্ণ-পরিবার। সারা বিশ্বে আজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিস্তৃতি। এই সঙ্ঘের মূলে রয়েছেন অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু শ্রীমা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণেরই অপর বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব গ্রহণ করে, তাঁকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে, সর্বদিকে চোখ খুলে রেখে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁর সন্তানদের কাছে, দুর্দিনে আশা জাগিয়েছেন তাঁদের ভিতরে। আর তারই ফলে আজ রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে উঠেছে। শ্রীমা তো দু-চারদিনের বা দু-দশ বছরের জন্য আসেননি ; তাঁর সাধনার ফল, তাঁর ভাবধারা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হবে—মানুষের মনে জাগাবে অনুপ্রেরণা।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জনক শ্রীরামকৃষ্ণ এবং জননী শ্রীমা সারদাদেবী। তাঁদেরই দ্বারা চিহ্নিত সঙ্ঘের নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুরের নির্দেশিত পথে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি আধুনিক ভারতের চিন্তা ও চেতনায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর কাছে শুধু অবতারবরিষ্ঠই নন, অবতারগণ যাঁর ঐশ্বর্য নিয়ে অবতরণ করেন পৃথিবীতে, সেই ভগবানেরও তিনি 'বাবা'। আর সারদাদেবী তাঁর কাছে 'জ্যান্ত দুর্গা'। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা থেকে মহাপুরুষ মহারাজকে স্বামীজী লিখছেন: "বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গাপূজো করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন। দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজো দেখাব তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে সেইদিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব।... রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের ওপর ভক্তি নাই তাকে ধিক্কার দিও।"

স্বামীজী জানতেন যে, ভারতের উন্নতি ও কল্যাণময়তার বীজ লুকিয়ে আছে নারীজাতির বিকাশের মধ্যে। স্ত্রীজাতিকে যথোচিত মর্যাদা না দিলে কোন জাতি উঠতে পারে না। তিনি বললেন, সারদাদেবীকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষে মহীয়সী নারীরা আবির্ভূত হবেন। ভারত আবার জাগবে।

শ্রীশ্রীমা সকলের জননী। এ শুধু কথার কথা নয়, তিনি তাঁর জীবনকালে জাতপাত ভুলে, ধর্মাধর্ম পিছনে সরিয়ে অজ্ঞাতকুলশীল সকলের মাতারূপে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। ডাকাত, মদ্যপায়ী, পদস্খলিতা, বিদেশিনী, কুলি-মজুর, সাধু-পাপী, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—সবাই তাঁর সন্তান। সকলের জননী তিনি। সকলের আশ্রয় তিনি।

ধর্মের কথা, ঈশ্বরতত্ত্বের কথার বলে নয়, শুধু তাঁর 'গণ্ডিভাঙা' ভালবাসার বলে নিজে সন্তানবতী না হয়েও মাতৃত্ববোধের বিপুল ঐশ্বর্য তিনি নিজ জীবনে বিকাশ করেছিলেন, বাৎসল্যে অভিভূত হয়ে যেকোন মানুষের কাছে তারই মাতৃরূপকে তিনি প্রকট করেছিলেন। এ এক বিরলতম দৃষ্টান্ত। সারদাদেবী সেদিক দিয়ে পৃথিবীর সকল নারীর ওপরে। গার্হস্থ্য করণীয় যাকিছু আছে তা করার পরও তাঁর সমাজকল্যাণে বিশ্বপ্লাবী কল্যাণময়ী রূপধারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা-বিশেষ।

মায়ের পার্থিব শরীরে বাস হয়েছিল ৬৭ বছর। প্রায় ৬ বছর বয়সে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ, কিন্তু কল্যাণময়ী মা-এর সমাজযাত্রার শুরু চৌদ্দ বছর বয়সে (মে, ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে পঞ্চমবার স্বামীর ঘরে যাওয়া এবং তাঁর কাছে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ)। এপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলছেন: "হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে। ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"[১] এর পরের ইতিহাস এখন সকলেরই জানা। প্রথমে অলক্ষ্যে, পরে সঙ্ঘজননীরূপে মানুষের মধ্যে ঐশী চিন্তার উন্মেষসাধনের ক্ষেত্রে সারদাদেবী

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, সাধকভাব, ১ম ভাগ ১৩৫৮, পৃ: ৩৪৩

যে-ভূমিকা পালন করেছেন তা ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের অভিনব এক সনাতন সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের সঙ্ঘ যে ক্রমে এক বিশ্বপ্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠল তার মূলে রয়েছেন এই মহীয়সী নারী। মাকে সামনে রেখে, তাঁর পরামর্শ নিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যাত্রাপথ অচিরেই বহুমুখী হয়। শুধু সঙ্ঘকে জননীর স্নেহ দিয়েছিলেন বলেই সারদাদেবী সঙ্ঘজননী ছিলেন না, সঙ্ঘকে ধ্রুব ও সত্য পথে চালিয়েছেন তিনি তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তাই তিনি সঙ্ঘজননী। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দ সহ সঙ্ঘের সকল সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তের মানসিক ও আধ্যাত্মিক আশ্রয়দাত্রী ছিলেন তিনি। শুধু ধর্মজগতেই নয়, সমগ্র মানবজগতের ইতিহাসে এরূপ বিস্ময়কর চারিত্রিক মহিমায় মণ্ডিত নারী-ব্যক্তিত্ব কখনো এসেছেন কিনা সন্দেহ।

শ্রীমা সারদাদেবীর সর্বশেষ উপদেশ হলো অন্যের দোষ দর্শন না করা। তিনি বলেছিলেন: "যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো, কেউ পর নয়—জগৎ তোমার।"[২] শ্রীমা সারদাদেবীর এই উপদেশ শুধু তাঁর মুখের কথা ছিল না। তাঁর সমগ্র জীবনটিই ছিল তাঁর অন্তিম উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ। তিনি বলতেন: 'মানুষ নিজের মনটি আগে দোষী করে নিয়ে তবে পরের দোষ দেখে। পরের দোষ দেখলে কি হয়?—নিজেরই ক্ষতি। আমার ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস যে আমি কারও দোষ দেখতে পারতুম না। ...মানুষের দোষ দেখা! মানুষের কি দোষ দেখতে আছে? ওটি শিখিনি। ক্ষমারূপ তপস্যা।"[৩]

সারদাদেবীর জীবন ছিল বাস্তবিক অসাধারণ। একদিকে সন্ন্যাসিনী, অন্যদিকে গৃহিণী। একদিকে পত্নী, অন্যদিকে মহা বৈরাগিণী। একদিকে নিঃসন্তান, অন্যদিকে অগণিত সন্তানের জননী। একদিকে ঐহিক মায়ার আবেষ্টনীতে আবদ্ধ, অন্যদিকে পরম অনাসক্তির মূর্ত প্রতিমা। গিরিশচন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কিরকম মা?" তৎক্ষণাৎ সহজ সরল অথচ গভীর কণ্ঠে সারদাদেবী বললেন: "আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।"[৪] ভগিনী নিবেদিতা সারদা-দেবীকে প্রথম দর্শনের পর ইংল্যান্ডে তাঁর এক বান্ধবীকে লিখছেন: "অনেকবার ভেবেছি, তোমাকে সেই মহিলা সম্পর্কে কিছু লিখি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী। তাঁর নাম সারদা। একজন হিন্দু বিধবার মতোই তাঁর পরিচ্ছদ শুভ্র। এই শুভ্র শাড়িটি তাঁর সারা দেহ বেষ্টন করে মাথা পর্যন্ত ঢেকে রাখে। যেন পাশ্চাত্যদেশের সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন।... তাঁকে ভালভাবে জানলে তুমি বুঝবে তাঁর মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার কী চমৎকার প্রকাশ।... তিনি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি—এত শান্ত, নম্র, স্নেহময়ী, আবার ছোট বালিকার মতোই সদা উৎফুল্ল। অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।"[৫] কয়েক বছর সারদাদেবীকে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে দেখা ও জানার অভিজ্ঞতায় নিবেদিতা তাঁর আরেকজন ইংরেজ বান্ধবীকে লিখছেন: "খুব সাদাসিধে হিন্দু রমণী তিনি, কিন্তু তবু আমার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।"[৬]

নিবেদিতার উপলব্ধিতে বিধৃত হয়েছিল যে-সত্যটি তা শুধু বর্তমানের জন্যই প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য ভাবিকালের জন্যও। শ্রীমা শুধু তাঁর সমকালেরই নন, ভাবিকালেরও মহত্তমা নারী। ☐

২ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৮৪ (পুনর্মুদ্রণ), পৃঃ ৫৫৬

৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সং, ১৩৮০, পৃঃ ১২০-১২১

৪ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২০৬

৫ Letters of Sister Nivedita—Ed. Sankari Prasad Basu, Vol. V, 1982, pp. 9-10

৬ Ibid., Vol. II, p. 585

বিশেষ রচনা

দূষণমুক্ত পৃথিবীর প্রথম আহ্বান

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম দিবসের বৈকালিক অধিবেশনে ধর্মমহাসভার সাধারণ সমিতির সভাপতি জন হেনরী ব্যারোজ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় করিয়ে দেবার পর স্বামীজী ভাষণ দিতে উঠলেন। প্রথমেই 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' সম্বোধন করায় এক মুহূর্তেই স্বামীজী সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন, একথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাঁর প্রথম দিনের এই অভ্যর্থনার উত্তর কেন আমেরিকাবাসীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং কি কারণেই বা তিনি তাঁদের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন তা আমরা গভীরভাবে কেউই অনুসন্ধান করে দেখিনি। প্রায় একশো বছর ধরে আমরা সকলেই একথা বলে আসছি যে, স্বামীজী সেদিন সভাস্থ সকলকে 'ভগিনী ও ভ্রাতা'রূপে সম্বোধন করায় তাঁরা বিপুল উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিলেন। 'ভগিনী ও ভ্রাতা'রূপে সম্বোধনের মধ্যে শ্রোতৃবৃন্দ সত্যই কি একটি অভিনবত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন? ঐ সম্বোধন আজও আমরা করি, আগেও অনেকে করেছেন। কেবল এটুকু কার্যকারণের ব্যাপার যদি এই সম্বোধনের পিছনে থাকত তাহলে ঐদিনের উচ্ছ্বসিত করতালিতেই তার সমাপ্তি ঘটত, সকলেই সভার শেষে যে যাঁর বাড়ি ফিরে যেতেন এবং অন্যান্য গতানুগতিক বক্তৃতার ক্ষেত্রে সর্বত্র যা ঘটে থাকে এখানেও তার ব্যতিক্রম হতো না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামীজীর সেদিনের বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল যে, তা এখন একটি কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছে। কেন এই অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল এবং কী তার তাৎপর্য তা আমরা এখন অনুসন্ধান করব।

আসলে স্বামীজী সেদিন ধর্মমহাসভায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে ঐ সম্বোধনে সকলকে এক মুহূর্তের মধ্যে একটি ভারমুক্ত নির্মল অকপট পরিবেশের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর কথায় সেদিন সকলে উপলব্ধি করেছিলেন যে, আমরা সকলে এক ঈশ্বরের সন্তান। পরম পিতার সন্তানরূপে দেশে দেশে নানা ভাবে, নানা অবস্থায় বিচিত্র পরিবেশে অবস্থান করছি মাত্র। এই অবস্থার উপলব্ধি আমাদের অধিকাংশের মধ্যেই অনুপস্থিত থাকে। সেদিন অন্যান্য যাঁরা তাঁর আগে ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁদের ভাষণ মনোগ্রাহী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও এই 'ঐক্য উপলব্ধি'র বিষয়টি সেখানে অনুপস্থিত ছিল। বলা বাহুল্য, বক্তারা প্রত্যেকেই অনুভব করছিলেন যে, তিনি হয় খ্রীস্টধর্মের অথবা ইসলামধর্মের প্রতিভূ অথবা অন্য যেকোন একটি ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সকলেই ভাবছিলেন, তাঁরা স্ব-স্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে এসেছেন এবং তাঁদের অস্তিত্ব সেই সেই ধর্মের মধ্যেই বিশেষ করে রক্ষিত ও সীমাবদ্ধ। এর বাইরে তাঁদের আলাদা কোন বিশেষ অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আসনে যেন বসেছিলেন:চূড়ান্ত গাম্ভীর্যে এবং তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকাররূপে। কেউ কারও সঙ্গে বিশেষ একটা যোগাযোগও রাখছিলেন না। সমস্ত মঞ্চটি যেন হয়ে উঠেছিল একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রভূমি। প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ সাজসজ্জা, ব্যক্তিত্ব, অভিব্যক্তি ইত্যাদি নিয়ে এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অবস্থান করছিলেন সেখানে।

মঞ্চের ওপর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবর্গ মানুষ হিসাবে যেমন নিজ নিজ আসনে পৃথক পৃথক সত্তার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি শ্রোতৃবর্গের সঙ্গেও তাঁদের একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই দূরত্ব ছিল নিরবচ্ছিন্ন ও ক্রমবর্ধমান। শ্রোতারা মঞ্চোপবিষ্ট ধর্মনেতাদের দেখে একটা শ্রদ্ধা, সমীহের ভাব পোষণ করছিলেন হয়তো, কিন্তু প্রেম, মৈত্রী ও সহজ একাত্মতা অনুভব করতে পারছিলেন না। সেদিন 'কলম্বাস হল'-এ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত কয়েক হাজার উৎসুক শ্রোতৃবৃন্দের মনে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল। স্বামীজীর 'ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' সম্বোধন সেদিন শ্রোতৃমণ্ডলীকে এক মুহূর্তে পৌঁছে দিয়েছিল

মিলনের পরম ভূমিতে যেখানে সেখানকার প্রত্যেকটি নরনারী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—আমরা কেবল পরস্পরের ভগিনী ও ভ্রাতাই নই, আমরা একই বিশ্বস্রষ্টার পুত্র-কন্যাও।

প্রত্যেকটি মানুষের মনে সেদিন যে 'ক্যাথারসিস্' বা বিমোক্ষণের সূচনা ঘটেছিল তা হলো সমস্ত 'ইগো', সমস্ত আমিত্ববোধ, সমস্ত স্বার্থকৌশদ্রকতা থেকে মুক্তি। সেদিনের শ্রোতৃমণ্ডলী সেই মুহূর্তে ভয়াবহ 'মনুষ্য-দূষণ' থেকে মুক্ত হয়ে মনুষ্যত্ববোধের স্বর্গীয় অনুভূতিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন: "যখনই তিনি (স্বামীজী) সরল ভারতীয় সম্বোধনে আমেরিকাবাসিগণকে 'ভগিনী ও ভ্রাতা' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, যখনই প্রাচ্য সন্ন্যাসী তিনি—**নারীকে প্রথম স্থান দিয়া—সমগ্র জগৎকে নিজ পরিবার** বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন সেই মহাসম্মেলনে আনন্দের যে শিহরণ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা শ্রোতৃবর্গের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি। তাঁহারা বলেন, **'আমাদের স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি এভাবে সম্বোধন করার কথা ভাবিতে পারিল না।'** সেই মুহূর্ত হইতেই বোধহয় তাঁহার নিশ্চিত সাফল্যের সূত্রপাত হইয়াছিল।"[১]

স্বামী বিবেকানন্দ 'আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীবৃন্দ' বলেও সম্বোধন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি বললেন—"আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ"। কারণ, প্রাচ্যের মানুষ হিসাবে তিনি জানতেন, যেকোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীর প্রতি তার ব্যবহার। সর্বপ্রথম 'ভগিনী' সম্বোধনের মাধ্যমে সমগ্র আমেরিকায় পরিবারের কেন্দ্রে যে নারীর অবস্থান তা স্বামীজী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ শুধু আমেরিকা কেন, সমগ্র জগতের ক্ষেত্রেও যে তা-ই তাও স্বামীজী তাঁর সম্বোধনের মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন। 'ভগিনী'র পর 'ভ্রাতৃ' সম্বোধনের তাৎপর্য হলো এই বোধ যে, আমরা একই বিশ্বপিতার সন্তান। সেদিন স্বামীজী দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছিলেন। একটি হচ্ছে 'শিবমহিম্ন' স্তোত্রের সেই বিখ্যাত শ্লোক, যেখানে বলা হয়েছে—"বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাহাদের জলরাশি ঢালিয়া মিলাইয়া দেয়, তেমনি হে ভগবান, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানা পথে যাহারা চলিয়াছে, তুমিই তাহাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।" বস্তুতঃ এই বাণীতে ভারতবর্ষের চিরন্তন উপলব্ধির প্রকাশ হয়েছে। সেদিন উপস্থিত মানুষগুলির মনের দরজায় ঘা দিয়ে স্বামীজী যেন তাঁদের এমন একটি অনুভবের রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন যেখানে তাঁরা সব ভাব এবং ভাবনার অবরুদ্ধতার অবসান ঘটিয়ে ভাবতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা যে-লক্ষ্যপথেই চলুন না কেন, যে-বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা তাঁদের থাকুক না কেন, পরম পিতা তাঁদের সকলেরই একমাত্র গন্তব্য। তাঁরা যে একই জগৎপিতার সন্তান, তারা যে একই পরিবারভুক্ত, বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের লক্ষ্য যে এক ও অভিন্ন—সেটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন গীতায় ভগবানের বাণী উদ্ধৃত করে স্বামীজী বলেছিলেন: "যে যে-ভাব আশ্রয় করে আসুক না কেন আমি তাহাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলিয়া থাকে।"

কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবী জুড়ে যে 'মনুষ্য-দূষণ' শুরু হয়েছিল যা আজকে চূড়ান্তরূপে 'পরিবেশ-দূষণে' রূপান্তরিত হয়ে মাতৃসম আমাদের প্রিয় বসুন্ধরাকে বিনষ্ট ও নিঃশেষ করতে উদ্যত হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দের সেদিনের ঐ 'ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' সম্বোধন এবং প্রথম দিনের অভিভাষণের মধ্যে তার ইঙ্গিত ছিল এবং আগামী-দিনের 'দূষণমুক্ত বসুন্ধরা' কল্পনার জন্মলাভও ঘটেছিল তখনই। এই 'দূষণমুক্তি' হচ্ছে মনুষ্য-দূষণমুক্তি এবং প্রাকৃতিক-দূষণমুক্তি, যার ফলে সকল মানুষ নিজেদের 'পরমপিতার সন্তান'—এই অনুভবে অভিস্নাত হয়ে 'এক বিশ্ব-পরিবারের' সন্তানরূপে হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থপরতামুক্ত এক নির্মল পৃথিবীতে বিচরণ করবে। শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজীর প্রথম ভাষণে সেই আহ্বানই ছিল:

"সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহু

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১৩৬৯, 'ভূমিকা', পৃঃ ৫

কাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমস্ত জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এইসকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত; এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্বাধিক ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনী-মুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।"[২]

স্বামীজী চেয়েছিলেন মানুষকে সেখানে স্থাপন করতে যার ভিত্তিতে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে মানবসভ্যতার বিকাশের ধারা বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে গড়ে উঠেছে, যার মধ্য দিয়ে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে মানবিক গুণের অসামান্য বৈশিষ্ট্যগুলি যা ক্রমশঃ মানুষকে আরও উন্নত স্তরে পৌঁছে দিতে পারে—পারে দেবতার স্তরে নিয়ে যেতে। কিন্তু মানুষের আগ্রাসী মনোভাব, দম্ভ, পরমত-অসহিষ্ণুতা, লোভ, হিংসা, ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতা বারবার মানুষের এই সভ্যতার সৌন্দর্যকে, ইতিবাচক মানবিক গুণগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছে। তাই বারবার পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে যুদ্ধ, এসেছে বঞ্চনার অভিশাপ এবং নানা ধরনের শোষণ ও নিপীড়ন। কবিকে অনুসরণ করে বলা চলে, "সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করেছে আপন নির্লজ্জ অমানুষতাকে, পঙ্কিল হয়েছে ধূলি মানুষের রক্তে অশ্রুতে মিশে।"—ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবসভ্যতার অধঃপতন এবং তার দূষণের চেহারাটা ক্রমেই বড় প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছিল। তারই নির্লজ্জ প্রকাশ আমরা দেখেছি বিংশ শতাব্দীতে পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধে। এখন আবার বৃহৎ শক্তিগুলি ভয়াবহ মারণাস্ত্রের আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সাম্প্রতিককালে মধ্য এশিয়ার যুদ্ধে আধুনিকতম মারণাস্ত্রের পরিবেশ-দূষণের মাত্রাহীন ক্ষমতার পরিচয় যেমন আমরা পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি মানুষের হিংসা, মানুষের লোভ, মানুষের দম্ভ, মানুষের অসহিষ্ণুতা কোন্ ভয়াবহ মনুষ্যদূষণ করতে পারে তার পরিচয়ও। সুতরাং একথা স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে, আজকে যে আমরা প্রাকৃতিক দূষণ, নৈসর্গিক ভারসাম্যহীনতা, আবহাওয়ার বিপজ্জনক গতি পরিবর্তনের প্রকৃতি প্রভৃতি লক্ষ্য করছি গত কয়েক দশক ধরে, তার সূচনা হয়েছে মানুষের প্রেমহীনতা থেকে। পরিবেশ-দূষণের অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে মনুষ্য-দূষণ এবং তার বিরুদ্ধেই আজ থেকে একশো বছর আগে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন ক্রান্তদর্শী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ।

আজকে পৃথিবীর পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা বিশ্বের মানুষকে এক কঠিন ভয়াবহ বাস্তব সমস্যার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলছেন যে, কয়লা, পেট্রল, ডিজেল ইত্যাদি জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহারে প্রতি বছর পৃথিবীর বাতাস পাঁচ হাজার টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসে পরিপূর্ণ হচ্ছে। পৃথিবীর তাপ-মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ওজন-স্তরে বাতাবরণ পাতলা হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে সূর্যের আলট্রা-রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করে ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। তাঁরা খবর দিচ্ছেন যে, পৃথিবীতে প্রতি বছর এগারো লক্ষ হেক্টর বনভূমি কমছে। পর্বতন শস্যশ্যামলা অঞ্চল মরুভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বৃক্ষহীন পৃথিবীর বহু অংশ প্রতিদিন বৃষ্টিহীন হয়ে পড়ছে। সাগরকে পরিণত করা হচ্ছে আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থের স্তূপের আধার হিসাবে। প্রতি বছর আমরা সাগরবক্ষে ৬৫ লক্ষ টন বর্জ্য পদার্থের স্তূপ নিক্ষেপ করছি। আমাদের আগ্রাসী লোভ ও ক্ষুধার জন্যে প্রতিদিন বিলুপ্ত হচ্ছে একশোটি বিরল জাতির প্রাণী। এই যে প্রাকৃতিক জগতে আমরা প্রতিদিন পাপ করে চলেছি এর মূলে রয়েছে মনুষ্য-দূষণ। দিনের পর দিন নীতিহীন, বোধহীন, চিন্তাহীন মানুষ পৃথিবীকে দূষণে পরিপূর্ণ করছে। এর ভয়াবহ ফলশ্রুতি হচ্ছে পৃথিবীর শেষের ভয়ঙ্কর দিনের জন্য অপেক্ষা।

এখন প্রশ্ন একটি। কেন এমন হলো? উত্তরও একটি—পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার

২ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০

মানসিকতা। বিচ্ছিন্নতাবোধ একটি মানসিক দূষণ, যা মানুষকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তার ফল হয় বিষময়। খণ্ডিত চূর্ণ-বিচূর্ণ মনুষ্যত্বের ক্ষয়িষ্ণু ভূমি থেকে জন্ম নেয় স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা। নিজের ভাল, নিজের সুখ, নিজের লাভ, কোন কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব গণ্ডি বা শুধুমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের ভাল চিন্তা প্রধান হয়ে দেখা দেয়। এই জাতীয় মনুষ্য-দূষণ পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের যে ক্ষতিসাধন করে স্বামী বিবেকানন্দ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করতে বা বাঁচতে পারে না। তাঁর কাছে সমাজের অর্থ গৃহের সমষ্টি মাত্র নয়—সমাজের অর্থ পরস্পরের সঙ্গে সংবন্ধ, একের সুখ-দুঃখে অন্যের সুখ-দুঃখের বোধ-সমন্বিত মানুষের সহাবস্থান। যখনই তার অভাব ঘটে, তখনই হয় মানব-দূষণের সূচনা। স্বামীজী জীবনদর্শনের মূলসূত্র আহরণ করেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে, যিনি তাঁকে এই বোধে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের পরম প্রকাশ। তাই এযুগের একমাত্র ধর্ম ও কর্ম হচ্ছে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন তত্ত্ব, আর স্বামী বিবেকানন্দ দিলেন সেই তত্ত্বকে বাস্তব রূপ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যটন করে শ্রীরামকৃষ্ণের 'জীব-শিব' তত্ত্বটির স্বরূপসন্ধান করেছিলেন তিনি এবং মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ তাও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। কৃষকের ক্ষেতে, শ্রমিকের ঝুপড়িতে তিনি ঈশ্বরকে দেখেছিলেন। মানুষের ত্যাগে, সেবায়, ধৈর্যে, সহিষ্ণুতায়, কর্মে ও প্রেমে মানুষের মধ্যে দেবতার, নরের মধ্যে নারায়ণের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। এসম্পর্কে তাঁর মৌল দার্শনিক উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর বিভিন্ন ভাষণে, রচনায় এবং পত্রাবলীতে। শিকাগো সম্মেলনের কয়েক বছর পরে তাঁর মৌলিক রচনা 'বর্তমান ভারত'-এ তিনি বিষয়টিকে এভাবে তুলে ধরেছিলেন: "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতি যোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রম মৃত্যু—পালনে অমরত্ব।"[৩]

স্বামী বিবেকানন্দের এই উপলব্ধির স্বরূপটিকে নতুন করে অনুধাবন করার এখন সময় এসেছে। স্বামীজীর মতে সমষ্টিকে বাদ দিয়ে ব্যষ্টির অস্তিত্ব কেবল অসম্ভবই নয়, ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্রিত জীবন একটি অনন্ত সত্য এবং জগতের মূল ভিত্তি। মানুষ একা যেমন বাঁচতে পারে না, তেমনি অন্যকে বাদ দিয়ে একা বর্ধিত হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যক্তি-মানুষ কিভাবে অনন্ত সমষ্টি বা বৃহত্তর সমাজ-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হবে তার একটি সার্থক ফরমুলাও তিনি উপরোক্ত বক্তব্যে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দূষণপূর্ণ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমাদের বলতে চেয়েছিলেন—সমষ্টির সুখে তোমাদের সুখ, সমষ্টির দুঃখে তোমাদের দুঃখ। আমরা যদি সমস্ত পৃথিবীর মনুষ্যসমাজকে একসঙ্গে করে দেখতে না পারি, আমরা যদি নিজেদের ধর্ম-ভাষা-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়-সমাজ-রাষ্ট্র-বর্ণ ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতার ভাবধারায় আবন্ধ করে রাখি, তাহলে মনুষ্যসমাজ, জীবকুল, প্রকৃতি ও পরিবেশসহ আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। তাই আমাদের বাঁচতে হবে স্বামীজী-নির্দেশিত সকলের বাঁচার অভিমন্ত্রটি গ্রহণ করে।

স্বামীজীই আধুনিক যুগের প্রথম মানুষ, যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—মনুষ্য-দূষণের একমাত্র কারণ সমষ্টির থেকে ব্যষ্টির বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা। এই মানসিকতাই ব্যবধান রচনা করে গরিব মানুষের সঙ্গে বড়লোকের, ছোটজাতের সঙ্গে উঁচুজাতের, কৃষ্ণবর্ণের সঙ্গে শ্বেতবর্ণের, এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের, গরিব রাষ্ট্রের সঙ্গে ধনী রাষ্ট্রের। এরই ফলে মানুষ হয় স্বার্থপর, রাষ্ট্র হয় দাম্ভিক, সমাজ হয় অহংকারী। দেখা দেয় শোষণ, অবিচার, লুণ্ঠন, যুদ্ধ, আক্রমণ, অধিকার, আগ্রাসন। শুরু হয় বঞ্চনা, অবিচার, ব্যাভিচার, হিংস্রতা, বিদ্বেষ। ক্রমশঃ দূষণে ভরপুর হয়ে ওঠে মনুষ্যজগৎ।

৩ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৮

স্বামীজী বললেনঃ "উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন তিনি জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।"[৪] লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামীজী কখনো মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছেন না। তিনি বলছেন, সমাজের ভিতরে ভালবাসা এবং নিঃস্বার্থ মানসিকতা আজও আছে। দরকার শুধু তাকে জাগিয়ে তোলার—উদ্বোধিত করার, অর্থাৎ তাকে দূষণমুক্ত করার। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তমোগুণে আচ্ছন্ন হলে 'পাশবপ্রকৃতি' প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দূষণযুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তর্নিহিত শক্তির বলে সে আবার ফিরে আসতে পারে তার সহজাত গৌরবের ভূমিতে। সেই আশার বাণীই স্বামীজী শোনালেন শিকাগোর বিশ্বধর্মসম্মেলনেঃ " 'অমৃতের পুত্র'। কী মধুর ও আশার সম্বোধন! ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই।··· তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী! মানুষকে 'পাপী' বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। উঠ, এস সিংহ-স্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ। এই ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির আনন্দময়।"[৫]

দূষিত মানুষকে দূষণমুক্ত করার বার্তা নিয়ে স্বামীজী সেদিন বিশ্বমানবের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শিকাগোর বিশ্বধর্মমহাসভায়। দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন—মূলতঃ একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর সকল মানুষের মধ্যে সর্ববিধ অসম্ভাবের সম্পূর্ণ অবসান হোক। আগামী প্রজন্মের মানবসমাজ প্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, পারস্পরিক সহানুভূতির বন্ধনে নতুন করে আবদ্ধ হোক। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রেম ও সৌন্দর্যের দর্শনে স্বামীজীর বিশ্বাস শিকাগো-যাত্রার আগেও আমরা দেখি। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২২ মে জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে তিনি লিখেছিলেনঃ "কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, এজগতের সবকিছুই মূলতঃ সৎ—উপরের তরঙ্গমালা যে-রূপেই হউক, তাহার অন্তরালে, গভীরতম প্রদেশে প্রেম ও সৌন্দর্যের এক অনন্ত বিস্তৃত স্তর বিরাজিত। যতক্ষণ সেই স্তরে আমরা পেঁাছিতে না পারি, ততক্ষণই অশান্তি; কিন্তু যদি একবার শান্তি-মণ্ডলে পেঁাছানো যায়, তবে ঝঞ্ঝার গর্জন ও বায়ুর তর্জন যতই হউক—পাষাণ-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত গৃহ তাহাতে কিছুমাত্র কম্পিত হয় না।"[৬]

যিনি জগতের সবকিছুর মধ্যেই মূলতঃ সৎ-এর অস্তিত্বকে বিরাজিত দেখেছেন, যিনি মানবের গভীর অন্তস্তলে প্রেম ও সৌন্দর্যের এক অনন্ত বিস্তৃত স্তর পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনিই তো চাইবেন দূষণমুক্ত এক উদার, স্বার্থপরতা-লেশহীন সহৃদয় প্রেমপূর্ণ মানবসমাজ। বাইরে ধরিত্রীর ওপর ঝঞ্ঝার গর্জন, বায়ুর তর্জন যাই ঘটুক না কেন, মানুষকে তার জীবনসত্যে ফিরিয়ে আনতে পারলে বাইরের পরিবেশ-দূষণকে অনেকটাই সীমাবদ্ধতার স্তরে আনতে পারা যাবে। শিকাগোর সম্মেলনে কুয়োর ব্যাঙের লোককথাটি উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করে তিনি বলতে চাইলেন যে, আমরা প্রত্যেকে নিজেদের নিজ নিজ কূপের ক্ষেত্রভূমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগৎ গড়ে তুলে সেটাকেই সমগ্র জগৎ বলে মনে করছি। স্বামীজী বললেন, আজ সময় এসেছে "এই ক্ষুদ্র জগৎগুলির বেড়া ভাঙার।"[৭]

ধর্মমহাসভার সমাপ্তি দিবসের ভাষণেও স্বামীজীর কণ্ঠে নিনাদিত হলো সেই একই আহ্বানঃ "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"[৮]

বস্তুতঃ এই আহ্বানকে বাস্তবে রূপায়িত করতে না পারলে কোনদিনই পৃথিবী দূষণমুক্ত হবে না। শুধু পরিবেশ-দূষণরোধ করাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন—সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনুষ্য-দূষণরোধ। এবং আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দই পৃথিবীর মানুষের কাছে সর্বপ্রথম সেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। □

৪ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৮ ৫ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮-১৯ ৬ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৪১
৭ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২ ৮ ঐ, পৃঃ ৩৪

নাট্যকাব্য

"প্রাণঃ প্রাণেন যাতি"

হর্ষ দত্ত

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ উপলক্ষে এই নাট্যকাব্যটি রচিত।

চরিত্রলিপি ঃ স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর)। জনৈক পথিক। স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্র)। বৃদ্ধ ফকির (প্রবেশ ক্রম-অনুসারে)।

সূত্র ঃ "আলমোড়ার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী ক্ষুধা ও পথশ্রমে এমন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, আর চলিতে না পারিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। নিরুপায় অখণ্ডানন্দ জলের সন্ধানে গেলেন। সম্মুখেই মুসলমানদের গোরস্থান ছিল এবং নিকটেই একজন ফকির পর্ণকুটিরে বাস করিতেন। স্বামীজীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইল এবং তিনি এক ফালি শশা আনিয়া স্বামীজীকে খাইতে দিলেন। ইহা খাইয়া তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আলমোড়ায় এক বক্তৃতা-সভায় ঐ ফকিরকে উপস্থিত দেখিয়া স্বামীজী কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া সকলের সম্মুখে এই বলিয়া পরিচয় করাইয়া দেন যে, ইনিই তাঁহার প্রাণরক্ষক। ফকির অবশ্য স্বামীজীকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু স্বামীজী ঠিক চিনিয়াছিলেন এবং প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে কিছু অর্থও দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "লোকটি বাস্তবিক সেদিন আমার প্রাণরক্ষা করেছিল, কারণ আমি আর কখনো ক্ষুধায় অতটা কাতর হইনি।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৭৩, পৃঃ ২৮৩-২৮৪)

দৃশ্যপট ঃ দেওদার ও পাইন গাছ অধ্যুষিত হিমালয়ের একটি সানুদেশ। সময় দ্বিপ্রহর। দূরে কয়েকটি গিরিশৃঙ্গ অস্পষ্ট দৃশ্যমান।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ॥ হে অভ্রভেদী গিরিশ্রেষ্ঠ,
হে নগাধিরাজ, হে তুষারশুভ্র!
আপনি তো এমন নিষ্করুণ, কঠিন পাথর নন,—
আপনি সজীব, আপনি সুন্দর,
আপনি দেবতাত্মা।
আপনার সারা শরীর জুড়ে মাধুর্যের লীলা,
প্রকৃতির অকৃপণ দানের উৎসভূমি আপনি !
কিন্তু এ কী কৌতুক আপনার !
আমি কোথাও একফোঁটা তৃষ্ণার জল
খুঁজে পাচ্ছি না কেন ?
কোথায় গেল সেই সব অবারিত জলধারা—
যারা কখনও গম্ভীর, কখনও নৃত্যচঞ্চল,
দুরন্ত শিশুর মতো নিয়ত নেমে আসছে
ধেয়ে আসছে মৃত্তিকা-মাতার কোলে !
হায়, চারিদিকে শুধু পাথর আর পাথর
আর নির্বাক নিষ্ঠুর বনানী
চারিদিকে শুধু রৌদ্রের তীক্ষ্ম বর্শার
মারণোৎসব।
জল কোথায় ? জল ! জল !
আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কণ্ঠস্বর,
আমার প্রার্থনা !
আমি উদ্‌ভ্রান্ত, এই মুহূর্তে আমি পরাজিত।
শুনুন, হে হিমাদ্রি, আমার জন্যে নয়,
একবিন্দু জলের সন্ধানে এই কাতর অনুনয়,
এই নতজানু ভিক্ষা
আমার এক প্রাণাধিক ভাইয়ের জীবনরক্ষায়।
সে ঐ দূরে ঐ সমাধিস্থলের সন্নিকটে,
কৃষ্ণবর্ণ পাথরের বুকে লুটিয়ে পড়ে আছে।
মূর্ছিতপ্রায়, শ্রান্তি আর অনন্ত পথযাত্রার
ক্লান্তিতে

সে অবসন্ন, মৃতপ্রায়।
আমি আর ভাবতে পারছি না।
এতক্ষণে না জানি কী ঘটে গেছে
আমার দুর্ভাগ্যের পথ বেয়ে!
আপনি দয়া করে বলে দিন,
সামান্য ইঙ্গিতে জানিয়ে দিন
কোথায় গেলে পাব প্রাণদায়ী নির্ঝর!
আরও কষ্ট স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত,
এই ছিন্ন গৈরিকবসন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি,
এক গণ্ডূষ জলের জন্য আমি পাতালের
অন্ধকারে নামতেও দ্বিধা করব না।
বলি দেব এই তুচ্ছ প্রাণ!
আপনি শুধু একটিবার বলুন, একটিবার...

[একটু স্তব্ধতা। কেবল প্রখর মধ্যাহ্নের বাতাসের শব্দ ভেসে এল। স্বামী অখণ্ডানন্দ ব্যর্থতার গ্লানিতে ভেঙে পড়লেন। জনৈক পথিকের প্রবেশ।]

পথিক ॥ প্রণাম মহারাজ।
স্বামী অখণ্ডানন্দ ॥ কে, কে তুমি?
পথিক ॥ আমি পথিক। গ্রাম থেকে
চলেছি আলমোড়ার দিকে।
সাধুজী, তুমি কি পথ হারিয়েছ?
বল, তোমার গন্তব্যস্থল, আমি সঙ্গ দেব।
তোমার সেবা আমার পূজা, হে মহারাজ!
স্বামী অখণ্ডানন্দ ॥ তুমি শতজীবী হও।
তোমার জীবন পূর্ণ হোক।
না, আমি পথ হারাইনি। পথ আমার সখা।
সে সঙ্গে আছে নিরন্তর।
পথিক ॥ তাহলে!
স্বামী অখণ্ডানন্দ ॥ একটুখানি জলের
সন্ধানে আমি সেই তখন থেকে
ঘুরে মরছি। ওগো পথিক,
এক্ষুণি, এক বিন্দু জল না পেলে
আমার প্রিয় ভাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।
সে আমারই মতো সন্ন্যাসী। নাম তার নরেন্দ্র।
আমাদের অন্তরতম গুরুদেবের
মাথার মণি সে। গুরুপত্নী, আমাদের মা,
ওর যাত্রাপথের সব দায়িত্ব
তুলে দিয়েছেন আমার হাতে।
এ আমার পরম সৌভাগ্য।
এতদিন বহু বহু যোজন পথ ওকে আমি
দুহাতে পাখির ডানার মতো
আগলে নিয়ে চলেছি। কিন্তু আজ
আমার পরাণের যেন অনিবার্য হয়ে উঠছে।
শুধু এক বিন্দু জল, এক কণা জীবনের জন্য
আমি হেরে যাচ্ছি। আমার চোখের সামনে
স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে জীবনের স্পন্দন।
তুমি কি জানো, এখানে কোথায় আছে
নির্ঝরিণী? কোথায় লুকনো আছে
তরল প্রাণ?
পথিক ॥ মহারাজ, সবিনয়ে বলি, এ বড়
কঠিন প্রশ্ন।
ঐ প্রচণ্ড সূর্যের তীব্র তাপে দগ্ধ হয়ে
পর্বত এখন ক্রুদ্ধ। জলের উৎস সব লুকিয়ে
রেখেছে সে; নয়তো শুকিয়ে গেছে
তারা রোদের তাড়নায়।
এখন দৈব আশীর্বাদের মতো হঠাৎ হঠাৎ
পাথরের বুক চিরে নেমে আসে জলের প্রবাহ।
খুঁজতে খুঁজতে আচমকা তার কলধ্বনি
শুনতে পাই আমরা। তারপর করতল
ভরে নেওয়ার পালা।
স্বামী অখণ্ডানন্দ ॥ আমি তো অনেক
খুঁজেছি পথিক!
তবু কেন পাচ্ছি না!
ভাগ্যের দেবতা আমাকে নিয়ে কেন
মেতেছেন মরণ খেলায়!
পথিক ॥ জানি না মহাত্মা, দেবতার কী ইচ্ছা!
তুমি সন্ন্যাসী, তুমি ত্যাগী।
দেবপদে সমর্পিত।
মায়ার খেলায় তুমি যে অচল—একথা কি
দেবতা জানেন না! হায়, তোমার ভাইয়ের জন্য
প্রাণ কাঁদছে। চল আমার সঙ্গে।
দুজনে মিলে খুঁজি,
ভরে নিয়ে আসি প্রাণের কলস।
জয় হোক জীবনের।

[স্বামী অখণ্ডানন্দ ও পথিকের প্রস্থান।]

দৃশ্যপট : ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের গোরস্থান। দূরে কয়েকটি সমাধিস্তম্ভের আভাস। একটি উঁচু কালো প্রস্তরখণ্ডের ওপর স্বামী বিবেকানন্দ শায়িত। তাঁর সমগ্র অবয়বে নিদারুণ পথশ্রমের চিহ্ন। স্বামী বিবেকানন্দের মাথায় কাছে ফকির দণ্ডায়মান। হাতে একটি পাত্র। তাতে শশার ফালি।

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ আমি কোথায় ? কে আপনি ?
আমাকে স্পর্শ করলেন...

ফকির ॥ আমি সামান্য ফকির। নামহীন,
পরিচয়হীন অতি সাধারণ মানুষ।

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ কিছুই স্পষ্ট করে
দেখতে পাচ্ছি না কেন ?
এ আমি কোথায় শুয়ে আছি ?
গঙ্গাধর, আমার ভাই, সে কোথায় ? তাকে
দেখছি না কেন ? চারিদিকে
ধূসর স্বপ্নের মতো
এরা কারা দাঁড়িয়ে আছে ?
আমি কি তবে চলেছি মৃত্যুর পথে !

ফকির ॥ না, বাবা, ওসব কিছুই নয়।
পথশ্রান্ত তুমি। ধীরে ধীরে জ্ঞান
হারিয়ে ফেলছিলে। তোমার চেতনার ওপর
সুপ্তির কালো ওড়না নেমে আসছিল।
অদূরের মাটির কুটির থেকে তোমাকে
দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছি বাছা !
এই সামান্য ফলটুকু গ্রহণ কর !
তৃষ্ণার অসহ্য চাবুক তোমাকে
বিবশ করে দিয়েছে। আহা !

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ ফকির, তুমি কি মানুষ !
না, না, তুমি কোন দেবদূত—
এসেছ স্বর্গ থেকে নেমে।
এই সবুজ জলসিক্ত শশার খণ্ডগুলি যেন
জীবনের চিরন্তন বাণী। দাও দাও,
আমার এই দুর্বল অশক্ত করপুটে
প্রাণ ঢেলে দাও।
তৃষ্ণা, বড় তৃষ্ণা। ওগো ফকির,
আমায় জীবন দান কর।

[স্বামী বিবেকানন্দ শশার টুকরো ব্যগ্রতার সঙ্গে খেলেন।]

আঃ, প্রাণ ! প্রাণ ! ফকির আমি স্পষ্ট
শুনতে পাচ্ছি—
মৃত্যুর পদশব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।
অন্ধকার নেই, শুধু আলো।
আলোর সহস্রধারা।
ফকির, তোমাকে নমস্কার।
কোটি কোটি নমস্কার
তোমার শরণ্য দেবতাকে। আভূমি নমস্কার
তোমার হৃদয়মন্দিরের দুয়ারে !

ফকির ॥ বাবা, আমি সামান্য ফকির।
এসবের যোগ্য নই। তুমি সন্ন্যাসী,
পরিব্রাজক।
তোমার ধর্ম আলাদা। আমি ফকির, বিধর্মী।

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ ছিঃ, ছিঃ, এ তুমি কি বললে,
হে মহাপ্রাণ !
যে-তুমি এই মুহূর্তে আমার প্রাণ ফিরিয়ে
নিয়ে এলে মরণের দ্বারপ্রান্ত থেকে,
যে-তুমি মৃত্যুর অমানিশা সরিয়ে দিলে
চোখের ওপর থেকে, তার ধর্মাধর্ম
বিচার করতে বসব !
তুমি কি জানো না মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের,
তৃষিত, তাপিত, পীড়িত মানুষের
কোন ধর্ম নেই !
আর যে এগিয়ে আসে তাদের সেবায়, দয়ায়
উৎসর্গ করে নিজের জীবন, সে-ও সমস্ত
ধর্ম-অধর্ম-বিধর্মের ঊর্ধ্বে !
ফকির, তুমি প্রেম !
আবার তোমাকে নমস্কার।

ফকির ॥ এবার তুমি আমার চোখে
আলো জ্বালিয়ে দিলে। অন্তরে জমে থাকা
অনেক অন্ধকার দূর হয়ে গেল এক লহমায় !
হে দীপ্র, দৃপ্ত যুবক সন্ন্যাসী,
তুমি আমার আনত অভিবাদন গ্রহণ করো।

[আদাব জানিয়ে ফকিরের প্রস্থান। স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রবেশ।]

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ গঙ্গাধর, গঙ্গাধর !
এতক্ষণ কোথায় তুই ছিলি ?
কোন্ অন্তর্লোকে ? অদৃশ্য আড়ালে।
এ কি, তোর আয়ত চোখের তলে
কেনরে কালিমা !
কেন তুই আহত-বিস্ময়ে এমন বিমূঢ় ?
কথা বল, কথা বল !

স্বামী অখণ্ডানন্দ ॥ ভাই, তুমি বেঁচে আছ !
এ কী স্বপ্ন ! মায়া !
না কি মতিভ্রম ! এ কী সত্য !

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ কেন ভাই, কি হয়েছে ?
আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না !
গঙ্গাধর, রহস্যের ঢাকনা খুলে দে।
আমি বেঁচে আছি। সশরীরে বর্তমান
তোর সম্মুখে।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ॥ এই দেখ, মুমূর্ষু
তোমাকে ফেলে গেছিলাম জলের সন্ধানে।
ফিরে এসেছি শূন্য হাতে।
ভেবেছিলাম, গিয়ে দেখব, পথের প্রান্তরে
নিষ্ঠুর পাথরে শেষশয্যা নিয়েছে—
আমাদের মাতাঠাকুরানী যাকে বলেছিলেন—
"আমাদের সর্বস্ব",
আমাদের ভালবাসার ঠাকুর যাকে বলতেন,
"নরশ্রেষ্ঠ" !
শঙ্কিত হৃদয়ে আমি ফিরে এসেছিলাম।
কিন্তু এ কি ! তুমি সেই দিব্য শাশ্বতসত্তা—
অজর, অমর, অনন্ত বিভায় উদ্ভাসিত
তোমার মুখ !
তুমি আর মহাপ্রস্থানের যাত্রী নও।
কী করে সম্ভব হলো এই অসম্ভব অধ্যায় ?

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ ওরে, সে এক
আশ্চর্য কাহিনী।
তোকে বলব, বলব সব তার আগে
নিশ্চুপে শোন, দেবদূতের পায়ের শব্দ।
প্রেমের সুগন্ধ ছড়িয়ে ধীরে ধীরে
ঐ তিনি চলে যাচ্ছেন স্বর্গলোকে।
এই গোরস্থানের স্তব্ধ নিঃসীম যেন
শান্ত সমাহিত নিবিড়
অনন্তের চিরন্তন আলয়।
গুরুদেব বলতেন ঃ "তুই বীর !"
ভাই, তোর কাছে
অবিদিত নয় আমার অকুতোভয় চৈতন্য।
নৃত্যময়ী মৃত্যুরূপা মায়ের মুখোমুখি হতে
সদা আমি নির্ভয়। তবু, কেন জানি না,
আজ তৃষ্ণার রাক্ষসী আমায় করেছিল
পরাভূত—অকস্মাৎ।
অন্ধকারের আবরণে ঢেকে গেছে
পৃথিবী তখন। তারপর কোথা থেকে
কি যে হলো,
দ্বার খুলে গেল হঠাৎ।
আচ্ছন্ন আমি চোখ মেলে
দেখলাম—অবিনাশী প্রাণ, দীপ্যমান প্রাণ
অবতীর্ণ আমার সম্মুখে।
এক জ্যোতির্ময় আলো সমস্ত মানুষের
অন্তরের পথ দিয়ে চলে গেছে
সুদূর কোন লোকে !
আরও আছে। না, না, এখন নয়,
তোকে পরে বলব—
আয়, তার আগে প্রণাম করি
সেই বিরাট, স্বরাট
প্রিয়তম প্রাণের দেবতাকে। নমস্কার করি তাঁর
দশদিগন্তব্যাপী বিপুল মহিমময়
সত্তার উদ্দেশে—

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

তামাকের নেশা থেকে ক্যান্সার

অমিতাভ ভট্টাচার্য

কোন নেশাই যে শরীরের পক্ষে ভাল নয় তা আজ আর কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। মজার কথা হলো, নেশা ক্ষতিকর জেনেও আমরা তার সঙ্গ পরিত্যাগ করি না, তাকে নিয়েই ঘর করি। অর্থাৎ আমরা সবাই জ্ঞানপাপী, 'জেনে শুনেই বিষ পান' করি। দীর্ঘদিন নেশা করলে নানা ধরনের অসুখের পাশাপাশি ক্যান্সারের কথাও আজকাল খুব শোনা যাচ্ছে। বিশেষতঃ তামাকের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত।

ভারতবর্ষে তামাকের ব্যবহার শুরু হয় সম্রাট আকবরের সময়ে ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে। একজন পর্তুগীজ নাবিক ব্যবসাসূত্রে এদেশে প্রথম তামাক নিয়ে আসেন। সেই শুরু। এদেশে তামাকের চাষ আরম্ভ হলো তারপরেই। এখন সেটা প্রতিবছর ৫ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বে ভারতবর্ষ এখন তৃতীয় তামাক-উৎপাদনকারী দেশ। তামাক ও তামাকজাত নানা পদার্থ আমরা বিভিন্ন নেশার জন্য গ্রহণ করি। সবথেকে জনপ্রিয় মাধ্যম হলো ধূমপান। সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, চুট্টা, গড়গড়া, হুঁকো নানাভাবেই ধূমপান চলে তামাক পুড়িয়ে। অনেকে আবার সরাসরি তামাককে মুখ বা নাকে গ্রহণ করেন। জর্দা, দোক্তা, খৈনি, গুড়াকু সবই মুখে রেখে খাওয়া হয়। তামাকের মিহি গুঁড়ো নস্যি হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাকে।

তামাক আমরা যেভাবেই গ্রহণ করি না কেন, তা দেহের কোন উপকারে লাগে না। এতে বহু ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে যার মধ্যে ৪৩টি কার্সিনোজেন অর্থাৎ তারা ক্যান্সার তৈরি করতে পারে। এদেশে ৮ থেকে ১০ লক্ষ লোক প্রতিবছর তামাক সেবনের ফলে নানা অসুখে ভুগে মারা যায়।

ধূমপান

সিগারেট কিংবা বিড়িতে টান না দিয়ে অনেকেই দিন শুরু করতে পারেন না। কেন ধূমপান করি, তার কারণ অনুসন্ধান করছেন মনস্তত্ত্ববিদরা। তাঁরা স্নায়বিক নির্ভরতার নানা স্তরের কথা বলেছেন। তবে চোখ-কান খোলা রাখলে ধূমপানের কয়েকটি কারণ আমরা নিজেরাই খুঁজে বার করতে পারি। দেখা যায়, স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পা দিয়েই অধিকাংশ ছেলেরা ধূমপান শুরু করে বন্ধনহীন মুক্তির আনন্দে, হঠাৎ করে বড় হয়ে যাবার আনন্দে, অভিভাবকদের চোখ রাঙানির বাইরে স্বাধীন জগতে বিচরণের আনন্দে অথবা স্মার্ট দেখাতে। সেই যে সিগারেট পানের অভ্যাস তৈরি হয়, পরবর্তী জীবনে অনেক চেষ্টা করেও তা ছাড়া যায় না। ধূমপায়ীরা ধূমপানের স্বপক্ষে বেশ কিছু যুক্তি খাড়া করেন। এই যুক্তিগুলো আদৌ কোন যুক্তি নয়, তার চেয়ে ভাল যুক্তি হলো—ভাল লাগে তাই খাই, না খেয়ে পারি না। এই ভাল লাগা বোধ ছাড়তে না পারার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে স্নায়বিক নির্ভরতা।

সিগারেটে বিষ থাকে

৫০০ মিলিগ্রাম ওজনের একটা সিগারেটে গ্যাসীয় পদার্থ থাকে ৯০ শতাংশ, বস্তুকণা ৮ শতাংশ। এর মধ্যে নিকোটিন থাকে প্রায় ১ মিলিগ্রাম, যার মধ্যে ক্যান্সার-উদ্দীপক বেন্‌জপাইরিন থাকে। কার্বন মনোক্সাইড থাকে ২০ মিলিগ্রামের মতো। এছাড়া থাকে হাইড্রোজেন সায়ানাইড, অ্যামোনিয়া, অ্যাক্রিলিন, ফরম্যালডিহাইড, নাইট্রোসামাইন, পলোনিয়াম ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটিই শ্বাসপথ ও ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সিগারেটের বস্তুকণার মধ্যে ২৭-২৮ মিলিগ্রাম টার বা আলকাতরা থাকে, যার ১৩ ১৪ মিলিগ্রাম ধোঁয়ার সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে ক্যান্সার-উদ্দীপক হিসাবে

কাজ করে। যাদের ফুসফুস বা শ্বাসপথে ক্যান্সার হয় তাদের শরীরে 'এরিল হাইড্রোকার্বন হাইড্রক্সিলেজ' নামে একটি উৎসেচক বেশি থাকে, যা টার-এর সঙ্গে মিশে এমন এক রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে যা ক্যান্সার-উদ্দীপক।

সিগারেট খেলে কি ক্যান্সার হবেই ?

এই প্রশ্ন প্রায় সব ধূমপায়ীরাই করেন। 'উনি অমুক তো জীবনে সিগারেট খাননি তবে তাঁর ক্যান্সার হলো কেন' কিংবা 'উনি তো সারাজীবন সিগারেট খেয়েও নব্বই বছর পর্যন্ত দিব্যি বেঁচে আছেন' এমন প্রশ্নের মুখোমুখি ডাক্তারদের হামেশাই হতে হয়। উত্তর বলি — ক্যান্সার-সৃষ্টির পিছনে সিগারেট ছাড়াও আরও বহু কারণ রয়েছে। কাজেই অমুক যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তার কারণ সিগারেট নয়, হয়তো অন্য কোন ক্যান্সার-উদ্দীপক পদার্থ। আর সিগারেট খেয়েও অনেকে যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হন না তার কারণ মনে হয়, এঁদের দেহের ক্যান্সার-প্রতিরোধক্ষমতা বেশি। জন্মসূত্রে অর্জিত এই ক্ষমতা এক এক জনের এক এক রকম।

কাজেই সিগারেট খেলেই যে ক্যান্সার হবে এমন কথা বলা হচ্ছে না। 'হতে পারে'—এই পর্যন্ত। এবং এই হওয়াটা ব্যক্তির বয়স, দেহের রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা, পরিবেশ এবং কতদিন তিনি ধূমপান করছেন তার ওপর নির্ভর করে। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ধূমপায়ীদের মধ্যে ক্যান্সারের প্রবণতা অ-ধূমপায়ীদের থেকে দশগুণ বেশি। তাছাড়া সিগারেট খেলে তো আর দেহের সবস্থানে ক্যান্সার হয় না। প্রধানতঃ ফুসফুস এবং শ্বাসনালীই আক্রান্ত হয়। সরাসরি ধূমপান না করেও ধূমপায়ীদের নির্গত ধোঁয়ায় অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একে বলে প্যাসিভ (অ-প্রত্যক্ষ) স্মোকিং Passive smoking

দীর্ঘদিন সিগারেট খেলে ক্যান্সার না হলেও অন্যান্য রোগ কিন্তু সহজেই হতে পারে। এখানে সেসব বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, তবে বহুলাংশে স্বীকৃত কয়েকটি তথ্য এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি। যদি ৩৫ বছর বয়সের কোন সুস্থ ব্যক্তি দৈনিক নিয়মিত ১৩ থেকে ১৫টা সিগারেট খান, তবে তাঁর আয়ু ৬৫ বছর পার হবার আশা ২২% কমে যায়। দৈনিক ১৫ থেকে ২৫টা সিগারেট এই আশা ২৫% কমায়। দৈনিক ২৫টির বেশি সিগারেট খেলে এই আশা ৪০% কমে। ধূমপানের ফলে সারা বিশ্বে প্রতি ১৩ সেকেন্ডে একজন মারা যান এবং একটি সিগারেট আমাদের গড় আয়ু পাঁচ মিনিট করে কমায়।

দক্ষিণ ভারতের বহু অনগ্রসর ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার সিগারেট বা বিড়ির জ্বলন্ত দিকটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে টানার রেওয়াজ আছে। এটি আরও মারাত্মক অভ্যাস। এর ফলে মুখমণ্ডলে যে অতিরিক্ত তাপের উৎপত্তি হয় তাথেকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বা মিউকাস মেমব্রেন পুড়ে যেতে পারে, ঘা দেখা দিতে পারে এবং দীর্ঘদিন এভাবে চললে ঐ পর্দার একটা স্থায়ী পরিবর্তন দেখা যায়, যাকে বলে 'লিউপ্লাকিক চেঞ্জ' যা হলো ক্যান্সারের প্রাক্ অবস্থা। এছাড়া তালু বা টাকরাতে এর ফলে এক ধরনের ক্যান্সার দেখা দেয়, যাকে বলে 'চুট্টা ক্যান্সার'। এটা আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

পান-সুপারি-জর্দা-খৈনি-নস্যি

সুপারি, চুন, খয়ের এবং জর্দা দিয়ে সাজানো একখিলি পান মুখে ফেলার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই আছে এবং এই অভ্যাসের ইতিহাসও বহু প্রাচীন। কিন্তু এর প্রত্যেকটি উপাদানই মুখমণ্ডলের পক্ষে খারাপ। এরা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে উত্তেজিত করে, জিভে এবং দাঁতের ক্ষত করে, দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে গলা ও তালুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শক্ত হয়ে যায়, দাঁত ধারালো হয়ে পড়ে এবং জিভের সঙ্গে ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে ঘা দেখা দেয়। গালের ভিতরে ছোপ পড়ে যার থেকে ভবিষ্যতে ক্যান্সার হতে পারে। অতিরিক্ত পান, জর্দা, গুড়াকু ও খৈনি ব্যবহারের ফলে মুখের ভিতর ক্যান্সারের প্রবণতা সবথেকে বেশি দেখা যায়। এগুলো মুখে রাখলে তামাকের সঙ্গে মুখের ভিতরের আবরক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সরাসরি সংস্পর্শ হয়, ফলে কোষের পরিবর্তন হতে পারে

খুব প্রবৃত্ত। খৈনি ব্যবহারকারীদের নিচের ঠোঁটের ভিতরের দিকে যেখানে খৈনির দলাকে রাখা হয়, সেখানেই কখনো কখনো ক্যান্সারের ক্ষত তৈরি হয়। একে বলে 'খৈনি ক্যান্সার'। এছাড়া অতিরিক্ত তামাক ব্যবহারজনিত নানা অপকারিতা দেখা দেয় এদের দেহে। নস্যি অর্থাৎ তামাকের মিহি গুঁড়ো নাক দিয়ে টেনে নেবার অভ্যাস অনেকেরই আছে। এই গুঁড়ো নাক, শ্বাসপথ ও সাইনাসের মধ্যে জমে থেকে যে প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে তাকে বলে সাইনুসাইটিস। দীর্ঘদিন নস্যি ব্যবহারের ফলে সাইনাসে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

মুখের পক্ষে আরেকটি ক্ষতিকর পদার্থ হলো চুন। অথচ পানের সঙ্গে চুন ও খয়ের মিশিয়ে প্রায় সবাই খান, শুধু পান পাতা আর কে চিবোন? চুন থেকে 'প্যারা অ্যালিল ফেনল' নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় যা ক্যান্সার-উদ্দীপক।

পানমশলা

পানমশলা যদিও তামাকজাত নয়, তবু নেশার দিক দিয়ে এটি একই ধরনের বলে এখানে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নেশার জগতে এই কনিষ্ঠতম অতিথিটি এখন ঘরে ঘরে সাদরে সমাদৃত হচ্ছে। চিত্রতারকাদের দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারের দৌলতে এই ব্যবসার এখন রমরমা অবস্থা। ব্যবসায়ীদের মধ্যে এটি বেশি জনপ্রিয়। পানমশলার ৭০ থেকে ৮০ ভাগই সুপারি। এছাড়া এতে খয়ের, চুন, কার্ডামম ও সুগন্ধী থাকে। আমেদাবাদের ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কোম্পানীর পানমশলা নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন, এটি দেহকোষের ক্রোমজোমের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে পারে, বংশগতির ধারক ও বাহক 'জিন'-এর ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে সেই কোষ ক্যান্সার-কোষে পরিবর্তিত হতে পারে। ব্যবহারকারীরা রোজ প্রায় ৬ থেকে ৮ গ্রাম পানমশলা খেয়ে থাকেন অথচ মাত্র ১·১ মিলিগ্রামই ক্রোমজোমের পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। এছাড়া পানমশলার পিক না ফেলে গিলে ফেলা হয় বলে সরাসরিই তা রক্তে মিশে যাওয়ায় মুখের ভিতরে ক্যান্সার ছাড়াও দেহের অন্যান্য অংশে ক্যান্সারের আশঙ্কা বাড়ে। কাজেই পানমশলা থেকে শত হস্ত দূরে থাকুন।

শেষ কথা

কোন নেশাকেই আজ আর নিরীহ ভাবার কারণ নেই। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ থেকে রোজ যে-পরিমাণ বিষ আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি সেখানে সাধ করে বাড়তি বিষটুকু কি না নিলেই নয়, যেখানে বিশেষ করে এই বিষ দীর্ঘদিন গ্রহণ করার ফলে যখন ক্যান্সারের মতো বিপত্তি দেখা দিতে পারে? ☐

গ্রন্থ-পরিচয়

রামকৃষ্ণদেব ও সারদাদেবী অন্যরূপে

তাপস বসু

রঙ্গনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ : তারকনাথ ঘোষ। প্রকাশক, ৮২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা।

কবি সারদা : কবিতা সিংহ। ভস্তক, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মূল্য : বারো টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন 'রসেবশে' থাকতে। শুকনো সন্ন্যাসী হতে তিনি চাননি কখনো। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রঙ্গরসে ভরা তাঁর সারাজীবন। ছোটবেলা থেকেই আমরা তাঁকে দেখে এসেছি আনন্দের ঐশ্বর্যের মধ্যে বড় হয়ে উঠতে। ঢেঁকিশালে জন্মেই উনুনে ঢুকে ছাই মেখে যে-রঙ্গলীলার শুরু, কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে "শালা ঠিক ধরেছে!" ইত্যাদির মাধ্যমে দেখছি জীবনের অন্ত্যলীলাপর্বেও তা একইভাবে অব্যাহত। **রঙ্গনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ** গ্রন্থে তারকনাথ ঘোষ সেই 'রসেবশে' থাকা রঙ্গনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের রূপচ্ছবিটি তুলে ধরেছেন।

প্রধানতঃ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'—এই দুটি আকরগ্রন্থের সাহায্যে লেখক হাস্য-পরিহাসে মুখর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটি তুলে ধরেছেন। হাসি বা কৌতুকেরও নানা রূপ, নানা প্রকাশ আছে, যেমন—উইট, হিউমার ইত্যাদি। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে উইট এবং হিউমারের অজস্র প্রকাশ লক্ষ্য করেছি। 'উইট' অর্থাৎ বাগ্-বৈদগ্ধ্যের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা ; আর 'হিউমার' হলো অনাবিল হাসির সঙ্গে অন্তর্নিহিত করুণরসের অবস্থান। লেখক এই দুয়েরই নানা উজ্জ্বল নিদর্শন তুলে ধরেছেন। বস্তুতঃ নানা ভাবে, নানান দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'রঙ্গপ্রিয়' ছবিটি তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। মাস্টার মশায়ের সঙ্গে কথা দিয়ে 'কথামৃতের' শুরু, মাস্টার মশায়ের সঙ্গে কথাতেই তার সমাপ্তি। গৃহী, সন্ন্যাসী, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানসাধক, ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ, ইয়ংবেঙ্গল, গৃহবধূ—সমাজের সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়েছেন। আর তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যে-উপদেশ দিয়েছেন তাতে উপমা, অলংকারের যে-বর্ণচ্ছটা ধরা পড়েছে তার মধ্যে রঙ্গনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা দেখতে পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ কত মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, যাকে যেমনটি বলার তেমনটি বলেছেন। তাঁর রঙ্গপ্রিয় কথাগুলির মধ্যে বেদ-বেদান্তের নানা তত্ত্ব যেমন নিহিত থাকত, তেমনি সাধারণ জীবনের উপযোগী কথাও থাকত। এসবের মাঝে মাঝে চলমান জীবনের নানা ঘটনা তুলে ধরে তিনি হাসির ঝিলিক তুলতেন। কখনই তাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়নি। বিদ্যাসাগর, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশ-চন্দ্রের সঙ্গে যে-রঙ্গরসের পরিচয় লেখক তুলে ধরেছেন তা অনবদ্য।

নানা প্রসঙ্গ সংগ্রহ করে লেখক চৌত্রিশটি অধ্যায়ে সেগুলি বিন্যস্ত করে একটি জরুরী কাজ করেছেন। এর আগে শংকরীপ্রসাদ বসু 'সহাস্য বিবেকানন্দ' লিখে বিবেকানন্দের রঙ্গপ্রিয়তার ছবিটি তুলে ধরে-ছিলেন ; তারকনাথ ঘোষ এবার রঙ্গনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি তাঁর গ্রন্থে আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট সুন্দর, তবে ছাপার অক্ষর অতিমাত্রায় ছোট। বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ আছে। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটি রামকৃষ্ণচর্চায় একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন বলে গণ্য হবে।

পঞ্চাশের দশকেই কবি হিসাবে কবিতা সিংহ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ক্রমে বাঙলা কাব্যে তিনি একটা নিজস্ব স্থান করে নিয়েছেন। **কবি সারদা** গ্রন্থে শ্রীমতী সিংহ শ্রীমা সারদাদেবীর কিছু কথা নির্বাচন করে কবিতার আকারে সাজিয়ে দিয়েছেন। নিজে কবি হওয়ার ফলে সারদাদেবীর যে-কথাগুলির মধ্যে কবিতার লক্ষণ—শব্দ, ছন্দ, অলংকার, চিত্র-কল্প ইত্যাদি—খুঁজে পেয়েছেন সেগুলি তিনি নির্বাচন করেছেন। সারদাদেবীর আরও অনেক কথা ঐভাবে নির্বাচন করা যেত, তবে এটিকে তিনি একটি

প্রাথমিক 'মডেল' হিসাবে প্রস্তুত করতে চেয়েছেন। কবিতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে উৎসও নির্ণয় করে দিয়েছেন তিনি।

১৯১০-এর ১১ ডিসেম্বর ভোরবেলা ভগিনী নিবেদিতা আমেরিকার বস্টনে গির্জায় গিয়েছিলেন মিসেস সারা ওলি বুলের জন্য প্রার্থনা জানাতে। সারা বুল তখন মৃত্যুশয্যায়। সেখানে গিয়ে তাঁর যা মনে হয়েছিল নিবেদিতা সারদাদেবীকে কেম্ব্রিজ (ম্যাস.) থেকে লেখা চিঠিতে তা জানাচ্ছেন :

"সেখানে
সকলেই যীশু জননী মা মেরীকে
চিন্তা করছিলেন
কিন্তু
আমার মনে হঠাৎ তোমার চিন্তা এল
তোমার সেই প্রিয় মুখখানি
তোমার হাতের সেই বালা দুগাছি
তোমার স্নেহ-টলমল দৃষ্টি
তোমার শুভ্র শাড়িখানি
এ সবই যেন আমার চোখের সামনে মা…।"

নিবেদিতার চিঠিটি যেন একটি নিটোল কবিতা। কবিতার আকারেই কবিতা সিংহ তাকে সাজিয়েছেন 'অমল নীরবতা' নামক কবিতায়। এই কবিতা দিয়েই তিনি শুরু করেছেন তাঁর গ্রন্থের।

এরপরে এক-এক করে মোট ছাব্বিশটি (সূচীপত্রে আছে অবশ্য তেইশটি) কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলির মধ্যে একটা ক্রমানুসরণ লক্ষ্য করা যায়—সবই সারদাদেবীর কথা থেকেই সংকলিত।

"ছেলেবেলা গলা সমান জলে নেমে
গরুর জন্যে দলঘাস কেটেছি।
আমি রাঁধতাম বাবা ভাতের হাঁড়ি
নামিয়ে দিতেন…।" ('ছেলেবেলা')

"একবার কি দুর্ভিক্ষই লাগল
কত লোক যে না খেতে পেয়ে চলে আসত
আমাদের আগের বছরের ধান মরাই বাঁধা
বাবা সেই ধানের চাল দিয়ে
কড়াইের ডাল দিয়ে
হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি
রাঁধিয়ে রাখতেন…।" ('আকাল-১')

এইসব কথাগুলির মধ্যে অসাধারণ এক চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে—যা কিনা আধুনিক কবিতার প্রাণ। সারদাদেবীর অপরূপ সারল্যের ছবি ফুটে উঠেছে 'কলকাতার জলের কল' কবিতাটিতে। দক্ষিণেশ্বরের জীবনের নানা কথা অকপট আন্তরিকতায় সারদাদেবী উচ্চারণ করেছেন। সেই কথাগুলি স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই কবিতাগুলিতে—'সোনার মানুষ', 'নহবতের জীবন', 'রূপানুভূতি', 'যেমন জেনেছি তাঁকে', 'ঐশ্বর্য'। তাঁর সব কবিতাতেই ফুটে উঠেছেন একজন—শ্রীরামকৃষ্ণ।

কবিতাগুলির মাধ্যমে সারদাদেবীর বৈচিত্র্যময় জীবনের নানা ছবি যেমন ধরা পড়েছে তেমনি তাঁর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক রূপচ্ছবিটিও উজ্জ্বল হয়েছে 'দর্শন', 'মনেতেই সব', 'পথ অনেক', 'শান্তি-অশান্তি' ইত্যাদি কবিতায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কঠিন অসুখের সময়ে সারদাদেবীর ভাবনা ধরা আছে 'রুদ্র বৈরাগ' কবিতায়। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর সারদাদেবীর ভাবনার সাক্ষ্য রয়েছে 'চিন্ময় স্বামী' কবিতাটিতে। তাঁর সর্বপ্লাবী মাতৃরূপে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি 'আমি সত্যি মা', 'আমার ছেলেরা', 'পারমার্থিক সম্পর্ক' ইত্যাদি কবিতাগুলিতে।

কবিতা সিংহ যথার্থই লিখেছেন : "মাতৃভাব সারদার কবিতার শ্রেষ্ঠ ভাব। বাৎসল্য রস এখানে আছে। কিন্তু তা পারমার্থিক। মৌখিক প্রদর্শনীর গভীরে সেই পারমার্থিক সম্বন্ধ বিধৃত।" শ্রীমতী সিংহ সারদার নিজের মুখেই—সারদার কবিতায়—শুনিয়েছেন সেই অপরূপ আত্ম-উন্মোচনের অমৃত-কথা :

"আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক
পারমার্থিক।
এতে মায়া নেই, এ বড় টান।…"

শ্রীমতী সিংহ তাঁর কাব্যমন নিয়ে আত্মপ্রত্যয় ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে চরণগুলি নির্বাচন করে যেভাবে কবিতার আকারে সাজিয়ে দিয়েছেন তাতে আমরা সারদাদেবীর অপরূপ এক রূপের মুখোমুখি হই, যে-রূপের কথা আমাদের এতকাল জানা ছিল না। গ্রন্থটির সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ☐

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

উত্তর কলকাতার বাগবাজারে **শ্রীরামকৃষ্ণের** অন্তরঙ্গ গৃহিভক্ত **বলরাম** বসুর বাড়িতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কাঠের তৈরি সুসজ্জিত ছোট্ট রথটির রজ্জুর আকর্ষণ করে দোতলার বারান্দায় কীর্তনীয়া ও ভক্তদের সাথে নৃত্য করেছিলেন। সেই পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করে আজও **বলরাম মন্দিরে** রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে

গত ২ জুলাই ঠাকুরের 'দ্বিতীয় কেল্লা' **বলরাম মন্দিরে** সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রথযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে বিশেষ পূজা, হোম, আরাত্রিক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে সেই পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত ঠাকুরের স্পর্শধন্য রথটির রজ্জু প্রথম আকর্ষণে রথযাত্রার সূচনা করেন স্বামী বন্দনানন্দ, স্বামী গীতানন্দ, স্বামী ভজনানন্দ, স্বামী প্রমেয়ানন্দ এবং অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারিবৃন্দ। দক্ষিণেশ্বরের কীর্তনীয়া দল (সন্তোষ চৌধুরী ও সম্প্রদায়) কীর্তন করেন। গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য গৌরাঙ্গ-নৃত্য পরিবেশন করেন। রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত দীর্ঘ লাইনে প্রায় ৭-৮ হাজার ভক্ত সারিবদ্ধ-ভাবে রজ্জু আকর্ষণ করেন। প্রত্যেককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

একইভাবে ৯ জুলাই বিকালে রথের পুনর্যাত্রার সূচনা করেন স্বামী নির্জরানন্দ। ঐদিনেও বহু ভক্ত পবিত্র রথটির রজ্জু আকর্ষণে যোগদান করেন।

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দের বোম্বাই ভ্রমণের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে **বোম্বাই আশ্রমে** বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ।

বিশাখাপত্তনম আশ্রমের চিকিৎসাকেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পরিষেবা বিভাগ খোলা হয়েছে। গত ২০ জুলাই এই বিভাগের উদ্বোধন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ-মন্ত্রী কে. রসাইয়া।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ২০ জুলাই **চেরাপুঞ্জি আশ্রমের** উচ্চ-মাধ্যমিক বিভাগের বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

পরিদর্শন

গত ২৬ জুন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল সত্যনারায়ণ রেড্ডী **মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

ত্রাণ

গুজরাট বন্যাত্রাণ

রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে কচ্ছ জেলার নখতিরাণা, ভুজ ও দয়াপুর তালুকের তেরোটি জলমগ্ন গ্রামের ৫২৪টি পরিবারকে ১৯৫০ কিলোঃ চাল, ১৩২১ কিলোঃ পেঁয়াজ, আলু ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে।

গুজরাট খরাত্রাণ

রাজকোট আশ্রম গত জুন ও জুলাই মাসে নিম্নরূপ ত্রাণকার্য করেছে :

(ক) জামনগর জেলার ভনবদ তালুকের কালেশ্বরের আশপাশে ২২টি গ্রামের ৩১৬টি পরিবারকে ৬০০০ কিলোঃ বাজরা, ৩০০০ কিলোঃ পেঁয়াজ, ৩০০০ মিটার পুরুষ ও মহিলাদের কাপড়, ১০০ সেট শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

(খ) সুরেন্দ্রনগর জেলার মুলি সায়লা তালুকের ৫৭টি গ্রামের ৭০০ পরিবারকে ১০,০০০ কিলোঃ বাজরা, ৫০০ শাড়ি, ৫০০ চাদর, ১০০ মিটার কাপড় বিতরণ করা হয়েছে।

(গ) পঞ্চমহল জেলার ঝালাদ তালুকের চারটি গ্রামের ৪০০ পরিবারকে ৬০০০ কিলোঃ খাদ্যশস্য, ৪০০ শাড়ি ও ৪০০ চাদর বিতরণ করা হয়েছে।

(ঘ) রাজকোটে ৩৫০টি গৃহপালিত পশুর জন্য ৩৫০০ কিলোঃ ঘাস বিতরণ করা হয়েছে।

রাজস্থান দুর্গতত্রাণ

খেতড়ি আশ্রম দু-মাস ধরে ২০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫৫৮জন শিশুকে দুগ্ধ বিতরণ করেছে এবং

গরিব ছাত্রদের মধ্যে ৫০০ খাতা ও পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছে।

তামিলনাড়ু দুর্গতত্রাণ

সালেম আশ্রম সালেমের আশপাশের বস্তি অঞ্চলে ৩২০০ দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে ৩২০০ সেট তৈরি-পোশাক বিতরণ করেছে। তাছাড়া উক্ত অঞ্চলের ৫২৭ জন গরিব ছাত্রছাত্রীকে খাতা ও স্লেট দেওয়া হয়েছে॥

বহির্ভারত

মরিশাস আশ্রম গত ৩ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। ৩ জুলাইয়ের অনুষ্ঠানে মরিশাসের প্রেসিডেন্ট বীরস্বামী রিঙ্গাড়ু যোগদান করেন এবং ৪ জুলাইয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী অনিরুদ্ধ জগন্নাথ। ঐদিন তিনি আশ্রমের নবনির্মিত পাঠাগার-সহ পাঠগৃহ এবং পুস্তক বিপণন বিভাগেরও উদ্বোধন করেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন : গত আগস্ট মাসের দ্বিতীয় রবিবার 'গীতার বাণী', তৃতীয় রবিবার 'ভারতীয় সন্তগণ', চতুর্থ রবিবার 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' এবং পঞ্চম রবিবার 'আত্মপ্রবঞ্চনা জয়' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। তাছাড়া প্রতি মঙ্গলবার তিনি 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্নিয়া : জুলাই মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস-এর অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ ও স্বামী প্রপন্নানন্দ। ১১ জুলাই স্বামী প্রপন্নানন্দ এবং ১৮ ও ২৫ জুলাই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা করেছেন। ১৪ জুলাই ভক্তিগীতি, পুষ্পাঞ্জলি, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা-তিথি পালন করা হয়েছে। অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ২১ আগস্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি (জন্মাষ্টমী) পালন করা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো) : গত ১৪ জুলাই পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা-তিথি পালন করা হয়েছে। সন্ধ্যা ৯-১৫ মিনিটে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ।

গত ২২ আগস্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষেও অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়। ঐদিন সকাল ১০-৩০ মিনিটে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী আলোচনা করেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ।

দেহত্যাগ

স্বামী মিত্রানন্দ (ননীগোপাল) গত ২২ জুন বিকাল ৪'৩০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি গত পাঁচবছর যাবৎ ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

স্বামী মিত্রানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে জামশেদপুর, বেলুড় মঠ, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজ মঠের কর্মী ছিলেন। তিনি জলপাইগুড়ি, কাটিহার, দেওঘর এবং আসানসোল কেন্দ্রের প্রধানও ছিলেন। ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি অবসর জীবনযাপন করছিলেন। অমায়িক ও দয়ালু এই সন্ন্যাসী সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১৩ আগস্ট শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি এবং গত ২১ আগস্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি (জন্মাষ্টমী) উপলক্ষে সন্ধ্যায় তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী কমলেশানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। □

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণসংঘে গত ৬-৮ মার্চ ঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা। বিভিন্ন দিনে ধর্মীয় আলোচনা করেন ডঃ শশাঙ্ক-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক দীপক গুপ্ত ও সঙ্ঘের সভ্য-সভ্যাবৃন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং বাণী ভট্টাচার্য।

ঝামাপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে (কলকাতা-৯) গত ৬-৮ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। উৎসবের তিনদিনই বিশেষ পূজা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে বক্তব্য রাখেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা, প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা, স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ, বিচার-পতি সত্যব্রত মিত্র, বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ধর্মসভার শেষে অনুষ্ঠিত ভক্তিগীতির অনুষ্ঠানগুলিতে বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বিবেকানন্দ পাঠচক্র, পান্ডু (আসাম) গত ৬ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম জন্মতিথি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে। এ-উপলক্ষে ১৩-১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মসভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়। ধর্মসভাগুলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী সুমেধানন্দ, স্বামী বাণেশানন্দ, স্বামী কাশীনাথানন্দ, এ. কে. দেববর্মণ, এন. বিশ্বাস প্রমুখ। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন যতীন্দ্রমোহন দত্ত এবং ১৪ ও ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন ঋষিবর বাউল। ১৫ তারিখ প্রায় চারহাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মজঃফরপুর (বিহার) গত ৬ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম আবির্ভাব-উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এদিন প্রায় তিনহাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এ-উপলক্ষে ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী নিখিলাত্মানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মেশানন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দীক্ষিত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কামেশ্বর মিশ্র। ৯ ও ১০ মার্চ সন্ধ্যারতির পর রাম-চরিত-মানস গান ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী নিখিলাত্মা-নন্দ এবং ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী ব্রহ্মেশানন্দ।

গত ২১-২৪ মার্চ **হাতা (বিহার, জেলা-সিংভূম) মাতাজী আশ্রমে** শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৭তম জন্মোৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজাদি সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পাঠ, কীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী কৃষ্ণানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ (গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬) গত ৪-৭ মার্চ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করেছে। ৬ মার্চ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশেষ পূজাদি সহ নানা অনুষ্ঠান হয়। এদিন প্রায় দু-হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অন্যান্য দিন সন্ধ্যায় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উৎসবের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অসীম অধিকারী।

তেলুয়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (তেলো-ভেলোর চটি, হুগলী)ঃ গত ১৪-১৬ মার্চ তিনদিন-ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রসাদ-বিতরণ, আলোচনা-সভা, বিদ্যার্থি-সম্বর্ধনা প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। প্রথম দিন প্রায় আড়াই হাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিনের আলোচনা-সভা ও বিদ্যার্থি-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী কমলেশানন্দ। আলোচনায় স্থানীয় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ ও জনশিক্ষা'। অনুষ্ঠানে আরামবাগ মহকুমার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায়

বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ২০ জন বিদ্যার্থীকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। উৎসবের শেষদিন 'শিবপুর কল্পতরু' সংস্থা গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে।

গত ২২ মার্চ **পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (বর্ধমান)** নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৭তম জন্মোৎসব পালিত হয়। কথামৃত পাঠ এবং ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী কমলেশানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতুল চৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নীলকমল মুখোপাধ্যায়। শ্রুতিনাটক পরিবেশন করে বড়শুল সংস্কৃতি পরিষদের শিল্পিবৃন্দ।

গত ৮ মার্চ ১৯৯২ কলকাতার **রসা রোড (টালিগঞ্জ) কথামৃত সংঘ** শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, পূজা, হোম, ধর্মসভা ও গীতি-আলেখ্যের মাধ্যমে পালন করেছে। উৎসবে সন্নিহিত অঞ্চলের ভক্ত নরনারী বিপুল উৎসাহে অংশগ্রহণ করেন। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। তাঁর ভাষণের বিষয় ছিলঃ 'বর্তমান সমাজে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা'। ধর্মসভার পরে বরানগরের 'ত্রিশরণ' গোষ্ঠী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর ওপর গ্রথিত একটি মনোজ্ঞ গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে।

সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘে (উত্তর ২৪ পরগনা) গত ১৩-১৫ মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ মার্চের অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা। ১৪ মার্চ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পরে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন অর্চনা ভট্টাচার্য। ১৫ মার্চ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জয়ানন্দ ও নচিকেতা ভরদ্বাজ।

বিকিহাকোলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা কেন্দ্র (হাওড়া)ঃ গত ২১ থেকে ২৩ এপ্রিল নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নতুন মন্দিরও উদ্বোধন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সনাতনানন্দ, স্বামী ধ্যানেশানন্দ, ভূপতিচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় বসু।

কল্যাণী রামকৃষ্ণ সোসাইটি (এ-ব্লক) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি তাদের দ্বাদশবর্ষ স্মরণোৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবের প্রথম দিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা ও অধ্যাপিকা নমিতা দত্ত এবং দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী জয়ানন্দ। দ্বিতীয় দিন পাঁচশতাধিক ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

[illegible]-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পাঁশকুড়া, (মেদিনীপুর)ঃ গত ২২ ও ২৩ মার্চ এই নব-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের শিলান্যাস উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন শিলান্যাস করেন তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ। ঐ দিন বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, কথামৃতপাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১৬০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ, স্বামী সনাতনানন্দ, রতিকান্ত ভট্টাচার্য শাস্ত্রী ও দিলীপকুমার দত্ত। স্বাগত ভাষণ দেন আশ্রমের সম্পাদক অধ্যাপক সুভাষ-চন্দ্র মান্না। সন্ধ্যায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন প্রণতি মাইতি ও সম্প্রদায়। দ্বিতীয় দিন ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্বামী ভবেশ্বরানন্দ ও স্বামী হরিদেবানন্দ।

আনন্দধারা (গোচারণ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) আয়োজিত গত ৫ জানুয়ারি '৯২ স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক তাপস বসু, পৌরোহিত্য করেন স্বামী সুপর্ণানন্দ। স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সম্পাদিকা লিপিকা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের অন্যান্য আকর্ষণ ছিল স্বামীজী বিষয়ক কবিতা পাঠ এবং সঙ্গীত।

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে ১ ডিসেম্বর '৯১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি '৯২ পর্যন্ত নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ

১ ডিসেম্বর '৯১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪৫ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

১৫ ডিসেম্বর 'নিঃস্বার্থ-কর্ম' বিষয়ে এক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিকাশকলি বসু; বক্তব্য রাখেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

২৬ ডিসেম্বর '৯১, ২৬ জানুয়ারি ও ৬ মার্চ '৯২ যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-তিথি পূজাদি অনুষ্ঠান ও তাঁদের জীবনী আলোচনার মাধ্যমে পালিত হয়েছে। জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে দীপ্তিকুমার শীল, ডঃ কমল নন্দী, ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিনে একটি শোভা-যাত্রা স্বামীজীর জন্মস্থল পর্যন্ত গমন করে।

৯ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনা-নন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথির ভাষণ দেন ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 'বিবেকানন্দ-সাহিত্য-পরিক্রমা' অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনের এই আলোচনা-সভার উদ্বোধন করেন স্বামী নির্জরা-নন্দ। সভার বিভিন্ন অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন স্বামী শিবময়ানন্দ, প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা ও স্বামী অমলানন্দ। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভাষণ ও প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি 'লোকেন্দ্রনাথ ঘোষ স্মারক বক্তৃতা' দেন স্বামী মুমুক্ষানন্দ এবং ২১ মার্চ 'নিতাইচন্দ্র রায় স্মারক বক্তৃতা' দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উল্লেখ্য, দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুঃস্থদের কাপড় ও জামা এবং শীতকালে কম্বল বিতরণ করা হয়। বিতরণ করেন সোসাইটির সভাপতি স্বামী নির্জরানন্দ।

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৭ ডিসেম্বর '৯১ থেকে ২২ মার্চ '৯২ পর্যন্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

২৭ ডিসেম্বর বিশেষপূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। ১২ জানুয়ারি '৯২ স্বামীজীর জন্মদিনে রক্তদান শিবিরে মোট ২৯ জন রক্তদান করেন। স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয় এবং ২৬ জানুয়ারি বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি ও বিকালে যোগাসন ও ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়। ৬ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়। ২১ ও ২২ মার্চ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠান ও সন্ধ্যারতির পর স্বামী দেবদেবানন্দ কর্তৃক 'সঙ্গীতে কথামৃত' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দিন শোভাযাত্রা, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বিমলাত্মানন্দ ও নচিকেতা ভরদ্বাজ।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **প্রভাতকুমার শেঠ** গত ৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ৫-২০ মিনিটে তাঁর বরানগরের বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার প্রয়াত প্রভাতবাবু দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ কাল বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে অবৈতনিক অধ্যাপনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সন্ন্যাসি-শিষ্যের তিনি সঙ্গলাভ করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য **শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়** গত ২৩ জানুয়ারি সকালে তাঁর বরানগরের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর পিতা বদনগঞ্জ স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাতা সুগন্ধাবালা দেবী ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য। আবাল্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় লালিত প্রয়াত শিবপ্রসাদবাবু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজ ও বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন তিনি। বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতির সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। উদ্বোধন পত্রিকার দীর্ঘদিনের গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী, সাহিত্যরসিক শিবপ্রসাদবাবু কর্ম-থেকে অবসরগ্রহণের পর উদ্বোধন কার্যালয়ে কিছু সময় স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি লেখা ও অনুবাদ উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সৌজন্যে স্বামী সারদানন্দের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্রও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। □

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

বরফে রক্ষিত প্রায় সাতহাজার বছর আগের মানুষ

যাদুঘরে রক্ষিত মিশর দেশীয় মমি থেকেই আমরা দু-আড়াই হাজার বছর আগের মানবদেহ সম্বন্ধে ধারণা পাই। কিন্তু আসলে তা কালো চামড়ায় আবৃত কংকাল মাত্র। কিন্তু তার চেয়েও বহু পুরনো গোটা মানবদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে সম্প্রতি, যার ওপর সমস্ত গবেষণা শেষ হলে ছ-সাত হাজার বছর আগেকার মানুষ ও তখনকার পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।—যুগ্ম সম্পাদক

কংকাল নয়, চামড়া এবং ভিতরের দেহাংশ (internal organs) সমেত গোটা মানবদেহ। ইটালি ও অস্ট্রিয়ার মাঝে যে হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার আছে তার মধ্য থেকে পাওয়া গেছে এই দেহ। এই আবিষ্কার প্রাচীন যুগের মানুষ, তার জীবন-যাত্রার প্রণালী এবং তার সময়ের জগৎকে জানবার একটি অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। এই দেহটি রাখবার মালিক কে বা কোন্ দেশ, এই নিয়ে রাজনৈতিক মনোমালিন্য এতদিন বৈজ্ঞানিকদের এই ব্যাপার থেকে দূরে রেখেছিল। এখন সে-সমস্যার খানিকটা সমাধান হয়েছে। আল্পস পর্বতের যে-অংশে একে পাওয়া গিয়েছিল তার নামানুসারে, লোকটির নাম দেওয়া হয়েছে আর্টসি। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে দুজন জার্মান ভ্রমণকারী সমুদ্রতল থেকে ৩২০০ মিটার উঁচু গিরিপথে জমে যাওয়া এই মৃতদেহটি দেখতে পায়। হেলমন্ট সাইমন ও তাঁর স্ত্রী এরিকা তখন ভেবেছিলেন যে, দেহটি হয়তো কয়েক বছর মাত্র আগেকার। তাঁরা আল্পস পর্বতের একটি নিকটবর্তী আশ্রয়স্থানের ম্যানে-জারকে খবরটি দিলে ম্যানেজারের মন খারাপ হয়ে যায়, কারণ কিছুদিন আগেই পর্বত-ভ্রমণকারীরা ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে হারিয়ে যাওয়া এক দম্পতির দেহাংশ আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু অন্যান্য পর্বতারোহণ-কারীরা মৃতদেহের কিছু কিছু অংশ দেখে বুঝতে পারলেন যে, সিমিলন হিমবাহ গলে তার মধ্য থেকে অস্বাভাবিক কিছু একটা বের হয়ে পড়েছে। দেহটির গলার চারিদিকে যেসব যন্ত্র ঝুলছে, সেগুলি অ-সাধারণ। তখন পর্বত-আরোহণকারীরা ইন্‌সব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেনসিক বিজ্ঞানী (Forensic Scientist) রাইনার হেনকে ডেকে পাঠালেন। হেন এসেই বুঝতে পারলেন কি অপূর্ব সম্পদ তার সামনে রয়েছে। তিনি দেহটি বরফে মুড়ে নিয়ে হেলিকপ্টারে করে ইনস্‌ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে চললেন। সেখানে কনরাড স্পিন্ডলার দেহটি দেখেই বললেন: "টুটান-খামেনের মমি দেখে কার্টারের যেমন মনের অবস্থা হয়েছিল, আমার সেইরকম।" স্পিন্ডলার ইন্‌সব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাগৈতিহাস ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান এবং আর্টসির দেহের যাকিছু প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসের অনুসন্ধান হচ্ছে সেই দলের প্রধান। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি জানালেন যে, বরফে আজ পর্যন্ত যেসব মনুষ্যদেহ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এটি প্রাচীনতম এবং বোধহয় খ্রীস্টপূর্ব দু-হাজার বছর আগেকার ব্রোঞ্জ (bronze) যুগের। অর্থাৎ এটি এমন সময়ের যখনকার কোন কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ নেই। আজ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ঐ যুগের যাকিছু অস্থি পরীক্ষা করেছেন তা কবর খুঁড়ে পাওয়া গেছে। তাতে কবর দেওয়ার তদানিন্তন রীতি সম্বন্ধে জানা যায়, কিন্তু তখনকার জীবনধারা সম্বন্ধে জানা যায় না। এখানে আর্টসিকে কবর দেওয়া হয়নি। তার দেহের চামড়া ও শরীরাংশ (organs) শুধু ভাল অবস্থায় আছে তা নয়, তার সঙ্গে যেসব হস্তানির্মিত জিনিস (artefacts) পাওয়া গেছে, সেগুলিও অক্ষত আছে। যন্ত্রগুলির হাতে ধরবার কাঠ পর্যন্ত অদ্ভুত ভাল অবস্থায় আছে।

কিন্তু ব্যাপারটির জের গড়াতে লাগল। অস্ট্রিয়ার এই ঘোষণাতে ইতালীয়রা দাবি করলেন যে, দেহটি যখন ইতালী-অংশে পাওয়া গেছে, তখন সেটি তাঁদের। তাঁরা আরও বললেন যে, ইন্‌সব্রুকের বৈজ্ঞানিকরা যেভাবে দেহটিকে রেখেছেন, তাতে মৃতদেহ জীবাণু-সংক্রামিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইন্‌সব্রুকের বৈজ্ঞানিকরা সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-দের কাছে এব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। ঠিক হলো যে, যে-অবস্থায় দেহটি পাওয়া গিয়েছিল সেই অবস্থায় এটি রাখতে হবে, অর্থাৎ $-6°C$ তাপমাত্রায় (বরফের তাপমাত্রার ছয় ডিগ্রি নিচে) এবং হাওয়ায়

আর্দ্রতা থাকবে শতকরা ১০০ ভাগ-এর কাছাকাছি। যাই হোক, দেহটি নিয়ে দুই দেশের যে দাবি, তা চুকে গেছে; ইটালীয় বৈজ্ঞানিকগণ দেখে বলেছেন যে, দেহটির সংরক্ষণ ব্যাপারে যেসব সাবধানতা নেওয়া হয়েছে তা পর্যাপ্ত। স্টকহোমের ছত্রাক-বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, তিনি দুবার দেহটি পরীক্ষা করে ছত্রাক সংক্রমণের কোন চিহ্ন পাননি। এরপর যে সংক্রমণ হবে, তারও সম্ভাবনা নেই। ইউরোপের ৬০ জন বিশেষজ্ঞ দলের হয়ে প্লাটজার বলেছেন, অস্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে যে দেশভিত্তিক বিরোধ হয়েছিল, তা এইভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে যে, আগামী চারবছর মৃতদেহটি গবেষণার জন্য ইন্সব্রুকে থাকবে। তারপরে দেহটি ইটালীতে ফেরত যেতে পারবে। কি কি অনুসন্ধান চলবে তারও একটি তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলি হলো: আর্টসির পোশাক ও অন্যান্য যাকিছু পাওয়া গেছে, শরীর পরীক্ষার সঙ্গে সেগুলির ওপরেও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চলবে। এর জন্য ইউরোপের একদল পরীক্ষক কাজে লেগেছেন। এইসব পরীক্ষা চলছে জার্মানির মেঞ্জ শহরের প্রাচীন যাদুঘরে। জিনিসগুলির মধ্যে আছে—একটি কুঠার যার হাতলটি ধাতুনির্মিত, একটি ছোরা যার ফলাটি চকমকি পাথরের, আগুন জ্বালাবার চকমকি পাথর ও খড়কুটো এবং একটি তীরভরা তূণীর। যন্ত্রগুলির কাঠের বাঁটগুলি অক্ষত আছে; চামড়ার থলে, যাতে চকমকি আছে এবং চামড়ার বেল্ট, যাতে যন্ত্রগুলি ঝুলছিল—তাও অক্ষত আছে। কুঠারটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে, আর্টসি যে ব্রোঞ্জ যুগের লোক, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ব্রোঞ্জ যুগের বাঁটবিহীন এই ধরনের অনেক জিনিস তাঁরা পূর্বে ব্রোঞ্জ যুগের কবরে পেয়েছেন। কুঠারটির ধাতু বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এর ৯৯ শতাংশই তামা। আর্টসির পিঠে কাঠের ঝোলান ফ্রেমের মধ্যে একটি ব্যাগ ছিল। এটি টুকরো টুকরো হয়ে মৃতদেহের চারিদিকে ছড়ানো ছিল। তার চামড়ার প্যান্টটা ভাল অবস্থাতেই আছে, চামড়ার প্যান্টের মধ্যে শুকনো ঘাস ভরা (শীত নিবারণের জন্য)। তার গলায় ঝোলান একটি হার যা পাথরের টুকরো দিয়ে গাঁথা; এটিতে হয়তো মন্ত্রপূত কবচের মতো কিছু ছিল। মনে হয় লোকটি অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ছিল এবং পাহাড়ের ওপর কয়েক দিন বা কয়েক মাস থাকবার মতো জিনিসপত্র সঙ্গে রাখত। তূণীরটি এক্সরে করে পাওয়া গেছে যে, এতে ১৪টি তীর আছে, প্রতিটি এক মিটার লম্বা। আর্টসি একটি ধনুক তৈরি করছিল, যেটি শেষ হবার আগে তার মৃত্যু হয়েছিল। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, আর্টসির উল্কি (tatoo), যা আজ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে পুরনো উল্কি। উল্কিগুলি আছে পিঠে—চারটি নীল দাগ। হাঁটুতে ও গোড়ালির গাঁটেও (ankle) এরকম আছে। এগুলি মনে হয়, কোন উদ্ভিজ্জ কালি দিয়ে আঁকা অথবা সূচ দিয়ে ফোটানো। হয়তো সূচ ফোটানো, কারণ এই কাজে ব্যবহৃত সূচ কবরের মধ্যে আগেও পাওয়া গেছে। এইসব পাওয়া তথ্যগুলি সামগ্রিকভাবে বিচার করে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আশা করেন যে, আর্টসি জীবনের শেষ কয়দিনের এবং কেন সে ওধারে গিয়েছিল, সেবিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব হবে। সেকালে ইউরোপে নানা বাণিজ্যপথ খুলেছিল এবং অন্ততঃ তার একটি পথ আল্পস পর্বতের এধার থেকে ওধারে বিস্তৃত ছিল। সে যাই হোক, আর্টসি ব্যবসায়ী, পর্বতযাত্রী, কি শিকারী ছিল কিংবা সে ঝড়ঝঞ্ঝা ও তুষারপাতে পড়েছিল, এবিষয়ে নিশ্চিত তথ্য হয়তো কোনদিন পাওয়া যাবে না।

প্লাটজার জোর দিয়েই বলেছেন যে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অজুহাতে দেহটিকে কাটাকাটি করা হবে না। এক মিলিগ্রাম শরীরাংশ থেকে দেহটি কতদিনের পুরনো তা আজকাল জানা সম্ভব, যা জানতে আগে ৩০ গ্রাম দেহাংশ লাগত। এবিষয়ে যে-পরীক্ষা চালান হয়, তার নাম "কার্বন ডেটিং" (carbon dating)। জন্তু ও বৃক্ষাদির শরীরের কোষ আবহাওয়া থেকে তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ পায়। আবহাওয়াতে কার্বন-১৪ এবং কার্বন-১২-এর অনুপাত অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ একই রকম থাকে। কিন্তু কার্বন-১৪ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলে পুরনো শরীরাংশে এই দুটির অনুপাত হিসাব করে শরীরাংশের বয়স বলে দিতে পারা যায়। এখনো পর্যন্ত প্যারিস ও সুইডেনের আপসালা থেকে বৈজ্ঞানিকগণ এই পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে, মৃতদেহটি খ্রীস্টপূর্ব ৪৬০০ থেকে ৪৮০০

বছরের পুরনো। "হয়তো দেহটি ব্রোঞ্জ যুগের গোড়ার দিকের নয়, নিওলিথিক যুগের শেষ দিকের"—স্পিন্ডলার বলেছেন। আরও অনেক ধরনের পরীক্ষা করে জানা যাবে—আর্টসি কত বয়সে মারা গিয়েছিল (এখন ধরা হয়েছে যে, ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে), তার খাদ্য কি ছিল এবং তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা কি ছিল। কিভাবে সে মারা গিয়েছিল, তা হয়তো জানা যাবে না। এমন হতে পারে, সে পথ হারিয়েছিল এবং আল্পসে রাত্রের —10° থেকে —15°C ঠাণ্ডায় তুষারপাতে মারা গিয়েছিল। বৈজ্ঞানিকগণ তার খাদ্য সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিত খবর পাবেন। মৃতদেহটির আশে-পাশে জন্তু-জানোয়ারের হাড় পড়ে ছিল। শস্যকণা, শুকনো ফলও (যার মধ্যে কুল জাতীয়ও ছিল) পাওয়া গিয়েছে। অন্ত্রের মধ্যে থাকা খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করে আরও খবর পাওয়া যাবে, কারণ অন্ত্র অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে।

ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডনের ইন্‌স্টিটিউট অফ আর্কিওলজির ডন ব্রথওয়েল বলেছেন যে, শরীর ব্যবচ্ছেদ করে অন্ত্রের শেষাংশে এবং পাকস্থলীতে খাদ্যের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যেতে পারে। ইংল্যান্ডের চেসায়ার-এ প্রাপ্ত রোমান যুগের মৃতদেহ ('লিন্ডো ম্যান'—Lindow Man) পরীক্ষা করার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। তিনি আরও বলেছেন যে, অন্ত্রে খাদ্যের শাকাংশ পরীক্ষা করে মৃত মানুষের খাদ্যের মিশ্রণ জানা যাবে। যদি খাদ্যে পরাগ (pollen) পাওয়া যায়, তা থেকে লোকটি বছরের কোন্ সময়ে মারা গিয়েছিল, তা বলা যাবে। চুলে খনিজদ্রব্য জমা হয়, যাথেকে লোকের খাদ্য সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে। চুল ধীরে ধীরে বাড়ে; সেজন্য চুলের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে তার জীবিতকালে খাদ্যের পরিবর্তনও বলা সম্ভব। অন্য এক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, আর্টসির এত দিনের পুরনো কংকাল পরীক্ষা করে কংকালের মাপ সম্বন্ধে অন্য এক নতুন তথ্য জানা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে যে, শরীরের নরম মাংস নষ্ট হয় ধীরে ধীরে এবং সেই সঙ্গে কয়েক বছরে কংকালও ছোট হতে থাকে। কংকালাবশিষ্ট থেকে মানুষের উচ্চতা সম্বন্ধে যে-হিসাব বর্তমানে চলে আসছে, তা কতদূর সত্য, তা আর্টসির শরীর পরীক্ষা করে জানা যাবে। প্লাটজার ও তাঁর সহকর্মীরা আর্টসির কংকাল এক্সরে, ক্যাটস্ক্যান (CAT scan) প্রভৃতি করে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ সংক্রান্ত (three dimensional) ছবি তৈরি করার চেষ্টা করছেন যাতে আর্টসির মুখের একটা প্রতিকৃতি পাওয়া যায়।

প্লাটজার মনে করেন যে, অন্ত্রে কৃমি পাওয়া গেলে জানা যাবে, সেগুলি এখনকার মতো না অন্য ধরনের ছিল। যদি সে মাংস খেয়ে থাকে, অন্ত্রে তাদের চুল থেকে জানা যাবে কি ধরনের জন্তু সে খেয়েছিল। যদিও আর্টসির মাথায় চুল ছিল না, দেহের চারপাশে ছড়ান চুল ইন্‌সব্রুকের বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করেছেন। এর কংকাল পরীক্ষায় আরও খবর পাওয়া যাবে। ঐ যুগের কংকালে দেখা গেছে যে, তাদের দাঁতগুলি ক্ষয়ে গেছে। "ব্রোঞ্জ যুগের ৪০ থেকে ৫০ বছরের লোকের দাঁতগুলি ক্ষয়িষ্ণু, কারণ তারা কাঁচা মাংস বা গোটা শস্যদানা খেতো; তাদের শস্যদানায় অনেক কাঁকর ছিল, কারণ শস্যদানা গুঁড়াবার জায়গার কাঁকড় খাবারে এসে যায়"—বলেছেন ব্রথওয়েল। কংকাল থেকে পরিবেশ দূষণেরও আঁচ পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিসা শরীর থেকে না বেরিয়ে শরীরে জমা হয় এবং আর্টসির শরীরের সিসা আমাদের থেকে অন্যরকম হতে পারে। হাড় ও হাড়ের চারিধারের অন্যান্য শরীরাংশ (connective tissue) পরীক্ষা করে এও জানা যাবে যে, লোকটির আথ্রাইটিস বা অস্টিওপোরোসিস (হাড়ের মধ্যে জালি জালি হওয়া) ছিল কিনা। রক্তের যেসকল শ্বেতকণিকা বেশ অক্ষত অবস্থায় আছে তা পরীক্ষা করে লোকটির রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা (immune status) সম্বন্ধে আঁচ পাওয়া যাবে। প্লাটজার বলেছেন যে, এই পরীক্ষা থেকে এখনকার দিনের রোগ সেসময়ে বর্তমান ছিল কিনা তা জানা যাবে। হয়তো বা ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া জীবাণুও পাওয়া যেতে পারে। আর্টসির জীবকোষের ডি. এন. এ টুকরা পরীক্ষা করে বর্তমান ইউরোপীয়দের সঙ্গে তার সম্পর্কেরও হদিস পাওয়া যেতে পারে।

আশা করা যাচ্ছে, এই দশকের মধ্যেই আর্টসির জীবনধারা ও তার সময়ের জগৎ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। ☐

[**New Scientist, January, 1992, pp. 17-18**]

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়. ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে।... প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির মৃত্যুও ঘটে।... যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক
এই বাণী।

শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

এন্টিব্যাক্‌ট্রিন
কার্ব্বঙ্কল, পোষ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া
বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া
কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।
বিনা কাটা বিনা অস্ত্র চিকিৎসা
এন্টিব্যাকট্রিন কলিকাতা-৬

শ্রীঘৃত
ভারতী ঘি
শ্রীলক্ষ্মী ঘি
শ্রী মধু
শ্রীহনফুড
ভারতী ঘৃত
SREE HONEY
SREEHONFOOD
শ্রীলক্ষ্মী ঘৃত
প্রস্তুতকারক—অশোক চন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিমিটেড
২৬, কটন স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০০৭, ফোনঃ ৩৮-২২৪৭

সর্বদার তরে জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি?… আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণে রেখো যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে না; জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে, সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ

মানুষ মূর্খের মতো মনে করে—স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে পারে। বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

We shall spend no time arguing as to theories and ideals, methods and plans. We shall live for the good of others; we shall merge ourselves in struggle. The battle, the soldier and the enemy will become one.

Sister Nivedita

যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয় চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।... তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভালকাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

এই জীবন ক্ষণ-ভঙ্গুর, জগতের ধন, মান, ঐশ্বর্য—সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয় ? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন ? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন ?

স্বামী বিবেকানন্দ

He who served and helped one poor man seeing Siva in him, without thinking of his caste, creed or race or anything, with him Siva is more pleased than with the man who sees Him only in image.

Swami Vivekananda

পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

লোকে অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করেছি—তাঁর (ভগবানের) উপর নির্ভর করে না। যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাঁকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

অমৃতকথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

The only God to worship is the human soul in the human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of temples. If I cannot worship in that, no other temple will be of any advantage.

Swami Vivekananda

দেশটাকে এখন তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। তবে তোদের এবং দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ

পূর্ব রেলের শারদ অঙ্গীকার
সকলের তরে সুন্দর যাত্রার
শিউলি ঝরা পথে পথে,
নীল আকাশে মেঘের রথে,
কাশের বনের দোলনাতে —
আগমনীর সুর,
এমন ছুটির অবকাশে,
মন না যে মন ঘরে বসে,
রেলগাড়ী তো তৈরী আছে—
যাবই চলে দূর।
আপনার এই দূর যাত্রার বিশ্বস্ত সাথী রূপে পূর্ব রেল পুরোপুরি প্রস্তুত।
যথাযথ টিকিট কেটে, নিজের নামে আসন সংরক্ষণ করে বেরিয়ে পড়ুন — দার্জিলিং, সিমলা, মুসৌরি, নৈনিতাল, দিল্লী কিংবা হরিদ্বার—যেদিকে মন চায় ....
আপনার এ যাত্রা হোক
নির্বিঘ্ন এবং আনন্দময়
পূর্ব রেলওয়ে
ER 8950

Many are known to do great work under the stress of some strong emotion. But a man's true nature is known from the manner in which he does his insignificant daily task.

Sri Sri Ma Sarada Devi

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

The mind, the forest and the retired corner are the three places for meditation.

Sri Ramakrishna

Faith, sympathy, fiery faith and fiery sympathy! Faith, faith, faith in ourselves, faith, faith in God— this is the secret of greatness.

Swami Vivekananda

He who has a pure mind sees everything pure.

Sri Ma Sarada Devi

We cannot say that God is gracious because He feeds us, for every father is bound to supply his children with food ; but when He keeps us from temptations He is truly gracious.

Sri Ramakrishna

সকল বস্তুর অগ্রভাগ দরিদ্রদিগের প্রাপ্য—অবশিষ্ট অংশ আমাদের অধিকার। প্রথম পূজা বিরাটের পূজা; তোমার সম্মুখে—তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা; ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, পূজা শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

As a lamp cannot burn without oil,
so a man cannot live without God.

Sri Ramakrishna

The sun's light falls equally on all surfaces, but only bright surfaces like water, mirrors and polished metals can reflect it fully. In like manner, although God abides in all. He manifests Himself in the hearts of the pious.

Sri Ramakrishna

(1) **Live in the world, but be not worldly.**
Sri Ramakrishna

(2) **The mind becomes impure if one eat food without offering it first to God.**
Sri Sarada Devi

(3) **Unselfishness is more paying, only people have not the patience to practise it.**
Swami Vivekananda

Let New India rise—out of the peasant's cottage, grasping the plough ; out of the huts of the fishermen, the cobbler and the sweeper.

Swami Vivekananda

Religion is realisation; not talk, nor doctrine, nor theories, however beautiful they may be. It is being and becoming.

Swami Vivekananda

সরল না হলে চট করে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

'The Shramana who looks at a woman as a woman or touches her as a woman has broken his vow and is no longer a disciple of the Shakyamuni (Buddha).

The Buddha

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? কি চাইতে কি চাইবে। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা ভাল; তিনি যেমন যেমন দরকার, তেমন তেমন দেবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্যে এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

Everything is produced by ignorance and dissolves in the wake of knowledge.

Sri Sankaracharya

প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হলো।

শ্রীমা সারদাদেবী

সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাইরে ত্যাগ নয়। জোর করে সংসার থেকে চলে আসা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

Hatreds never cease by hatreds in this world. By love alone they cease. This is an ancient law.

Lord Buddha

সন্তোষের সমান ধন নাই,
সহ্যের সমান গুণ নাই।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

প্রয়াত মহাদেব সাহার
স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত

করুণা সাহা

১৬/৩এ, বাগবাজার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৩

কত সৌভাগ্যে এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটু সময় করে নিতে হয়।... জপ-ধ্যান করতে করতে দেখবে উনি (ঠাকুর) কথা কবেন, মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুণি পূর্ণ করে দেবেন—কি শান্তি প্রাণে আসবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণ পদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে ; ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নাই। হিন্দু মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না ছোঁব না' বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়েছে। এঁদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে—'তোরাও আমাদের মতো মানুষ, তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে।' বুঝলি ?

স্বামী বিবেকানন্দ

He is born to no purpose who, having the rare privilege of being born a man, is unable to realise God in this life.

Sri Ramakrishna

Blessed are those servants, whom the Lord when he cometh shall find watching; verily, I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them.

The Christ

দাস তব দোঁহাকার
সশক্তিক নমি তব পদে।

স্বামী বিবেকানন্দ

Believe me, there is much talking in other lands, but the practical man of religion, who has carried it into his life is here and here alone.

Swami Vivekananda

Consider that you have a 'mother' to look up to, if none else. Has not the Master declared that in their last moments He will reveal Himself to all who have been accepted by me?

Sri Ma Sarada Devi

I bow down to Him who bestows on the sages, direct knowledge of ultimate truth. I bow to the Teacher of the three worlds, the Lord himself, who dispels the misery of birth and death.

Sri Sankaracharya

ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন। মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ শোক তাপ এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্তা—এটি সর্বদা মনে রাখবে। এটি ভুললে সব ভুল।
যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও বিচ্ছিন্ন হয় না।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্তগুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিবাদ নয়, সহায়তা ; বিনাশ নয়,
পরস্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়,
সমন্বয় ও শান্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ

He who leaveth home in search of knowledge, walketh in the path of God.

Prophet Muhammad

পৃথিবীর মতো সহ্য গুণ চাই। পৃথিবীর ওপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইছে; মানুষেরও সেই রকম চাই।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

Never talk about the faults of others, no matter how bad they may be. Nothing is ever gained by that. You never help one by telling about his faults, but you do him an injury, and injure yourself as well.

Swami Vivekananda

The calmer we are and the less disturbed our nerves, the more shall we love and the better will our work be.

Swami Vivekananda
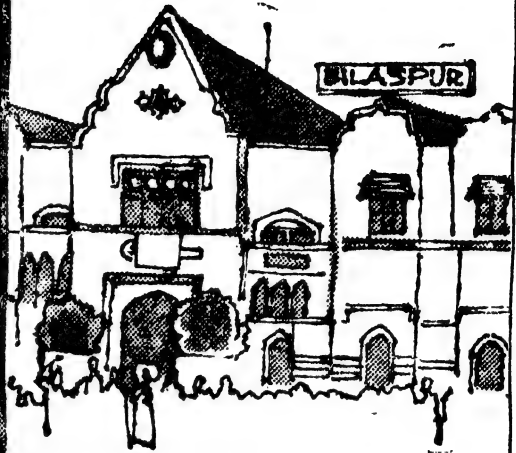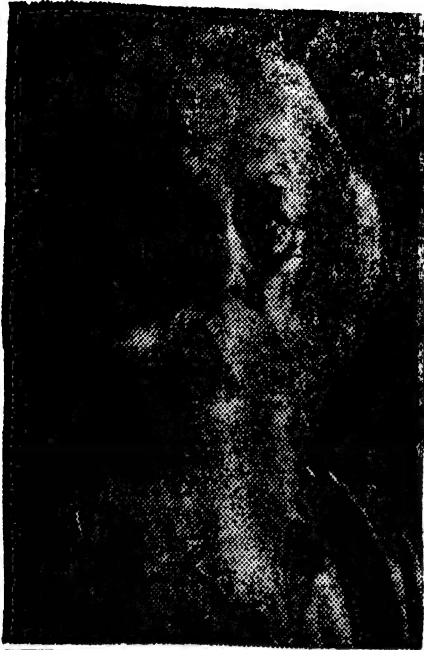
Women whether naturally good or not, whether chaste or unchaste should always be regarded as image of the Blissful Divine Mother.

Sri Ramakrishna

জলে নৌকা থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকায় যেন জল না থাকে। তেমনি সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধকের ভেতরে যেন সংসার না থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

Follow the path of duty ; show kindness to thy brothers and free them from suffering.

Lord Buddha

He who performs actions dedicating them to the Lord and giving up attachment, is not touched by sin, as a lotus leaf by water.

Sri Krishna

The truth is the best as it is. No one can alter it ; neither can any one improve it. Have faith in the truth and live it.

Lord Buddha

ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন।
মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে।
ভগবান সত্য আর সব মিথ্যা।

শ্রীমা সারদা দেবী

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামী বিবেকানন্দ

বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাংলা

● স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	৩০.০০	ঈশ্বরদর্শনের উপায়	১২.০০
আমার জীবনকথা (১ম ও ২য়)	৬০.০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৭.৫০
মরণের পারে	২০.০০	স্বামী বিবেকানন্দ	২.০০
যোগশিক্ষা	২০.০০	হিন্দুনারী	১২.০০
পুনর্জন্মবাদ	১০.০০	স্তোত্ররত্নাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা-পদ্ধতি	১২.০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২০.০০	আত্মজ্ঞান	২২.০০
মনের বিচিত্র রূপ	১২.০০	কর্মবিজ্ঞান	১০.০০
যোগদর্শন ও যোগসাধনা	২২.০০	আত্মবিকাশ	৯.০০
দেবী দুর্গা	৩.০০	যুগে যুগে যাদের আগমন	২৮.০০
মুক্তির উপায়	৬.০০	বিংশ শতাব্দীর ধর্ম	৫.০০

● স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবী ভাবনা	৪.০০	তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা	৪০.০০
বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায়		তন্ত্রতত্ত্ব প্রবেশিকা	৪০.০০
মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা	১০.০০	সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ	৮.০০
তীর্থরেণু	২৬.০০	সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	৩৮.০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস		রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা	২০.০০
(তিন খণ্ডে)	১৯০.০০	মন ও মানুষ (তিন খণ্ডে)	৭৮.০০
রাগ ও রূপ (তিন খণ্ডে)	১৩০.০০	অভেদানন্দদর্শন	৩২.০০
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫.০০	পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস	৩৫.০০
স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন	৩৬.০০	বাণী ও বিচার (১ম—৭ম)	২৮০.০০
ভারতীয়-সঙ্গীত—ঐতিহাসিক ও		মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	১৪.০০
সাংস্কৃতিক রূপরেখা	৩৪.০০	মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গা	৩০০.০০

● বিবিধগ্রন্থ

শ্রীশ্রীচণ্ডী	১৬.০০	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২০.০০
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব	১৮.০০	কালী-তপস্বী	৮.০০
শ্রীশ্রীমা সারদা	৮.০০	আচার্য অভেদানন্দ	৫.০০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮.০০	বিশ্বরূপিণী মা সারদা	২০.০০
স্বামী অভেদানন্দের অভিভাষণ	২.০০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	২৮.০০
স্বামী অভেদানন্দের উপদেশ	১.০০	অর্চনা	১.০০
পত্র-সংকলন	১৬.০০		

'বিশ্ববাণী'র সাধারণ ও আজীবন গ্রাহকদের জন্য যথাক্রমে ১০% এবং ২০% ছাড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

পুস্তক-প্রচার-বিভাগ

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন : ৩৩-৮২৯২ / ৩৩-৭৩০০

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র
বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

৯৪তম বর্ষ কার্তিক ১৩৯৯ সংখ্যা

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ আশ্বিন থেকে পৌষ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ ত্রিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঁয়ত্রিশ টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ছয় টাকা

উদ্বোধন

কার্তিক ১৩৯৯ | অক্টোবর ১৯৯২ | ৯৪তম বর্ষ—১০ম সংখ্যা

দিব্য বাণী

আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্রত আছে।...এ-ব্রত পরিপূর্ণ করবার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি—আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা। দেশে আধ্যাত্মিকতা অতিশয় ম্লান হয়ে গেছে আর সর্বত্র রয়েছে বুভুক্ষা। ভারতকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে এবং আধ্যাত্মিকতার বলে জগৎ জয় করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

[এই কথাগুলি পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন হাতরাসে। কাল ঃ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ।]

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধন-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভ ৺বিজয়ার আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ঃ কিছু নিরুদ্দিষ্ট সূত্রের সন্ধানে

প্রসঙ্গ ঃ বিবেকানন্দ-তিলক প্রথম সাক্ষাৎকার

স্বামী বিবেকানন্দ এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রথম সাক্ষাৎ সমকালীন ভারত-ইতিহাসে কোন প্রভাব ফেলিয়াছিল কিনা সেবিষয়ে কোন গবেষণা হয় নাই। তবে উভয়ের পরিচয়, পারস্পরিক সম্পর্ক—বিশেষতঃ স্বামীজী সম্পর্কে তিলকের সমুচ্চ ধারণা, উভয়ের পরবর্তী তথা শেষ সাক্ষাৎ এবং তিলকের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা ও কর্মের উপর স্বামীজীর প্রভাব লইয়া গবেষণার সূচনা করিয়াছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু (দ্রঃ 'সমকালীন', ৫ম খণ্ড, ৩৭তম অধ্যায়)। আমাদের আলোচনা যেহেতু স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমাপর্বে সীমিত, সে-কারণে আমরা এখানে স্বামীজীর সঙ্গে তিলকের প্রথম সাক্ষাতের প্রসঙ্গটিই আলোচনা করিব। স্বামীজীর সঙ্গে তিলকের দ্বিতীয় এবং শেষ সাক্ষাতের ঘটনাটি ঘটিয়াছিল বেলুড় মঠে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে অর্থাৎ স্বামীজীর দেহান্তের (৪ জুলাই, ১৯০২) মাস ছয়েক আগ। তিলক ঐসময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অবশ্য উভয়ের শেষ সাক্ষাৎপর্বটি একবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অথবা একাধিকবারে বিস্তৃত সে-বিষয়ে বিতর্ক আছে। স্বামীজীর প্রধান জীবনী-গ্রন্থগুলিতে এবং তিলকের নিজস্ব স্মৃতিকথায় শেষ সাক্ষাৎপর্বে একবার সাক্ষাতের কথা থাকিলেও প্রত্যক্ষদর্শী স্বামীজীর মারাঠী শিষ্য এবং তিলকের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত স্বামী নিশ্চয়ানন্দের সূত্রে জানা যায়, শেষ সাক্ষাৎপর্বে তিলক কলিকাতা হইতে একাধিক দিন বেলুড় মঠে স্বামীজীর সকাশে আসিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান' পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের জবানীকে শঙ্করীপ্রসাদ বসু গুরুত্ব-সহকারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহা "ভিত্তিহীন না হওয়াই সম্ভব"। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪৪০)

তিলকের সহিত স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎকার বিষয়ে বেশ কয়েকটি বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে দুটি বিবরণ স্বয়ং তিলকের নিকট হইতে প্রাপ্ত, একটি বিবরণ প্রমথনাথ বসু লিখিত স্বামীজীর প্রাচীন বাঙলা জীবনীতে এবং একটি 'উদ্বোধন'-এর ১৯তম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত। ইহা ভিন্ন স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী ও স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত বাঙলা জীবনীতে এবং মহর্ষি শ্রীশুদ্ধানন্দ ভারতীর একটি প্রবন্ধে ঐ সাক্ষাতের উল্লেখ পাই। শ্রীশুদ্ধানন্দ ভারতী তাঁহার রচনায় (প্রকাশকাল ১৯৬৪) উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্বয়ং তিলকের মুখেই ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বামীজীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাতের কথা শুনিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশুদ্ধানন্দ ভারতী লিখিয়াছেন যে, শৈশবে তিনি পরিব্রাজক স্বামীজীর সাক্ষাৎ, স্পর্শ এবং আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। এই সৌভাগ্যের প্রভাবেই পরবর্তী কালে তাঁহাকে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

কালানুক্রমের বিচারে বিবেকানন্দ-তিলক প্রথম সাক্ষাৎকারের পরোক্ষ উল্লেখ অবশ্য সর্বপ্রথম পাওয়া যায় তিলক-সম্পাদিত মারাঠী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কেশরী'-র ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭ তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধে। স্বামীজী তখন সদ্য পাশ্চাত্য হইতে স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সর্বত্র তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা জাগ্রত হইয়াছে। আবেগাপ্লুত 'কেশরী' সম্পাদক সেই সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন ঃ

"রামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর বিবেকানন্দ কিছুদিন হিমালয়ে কাটান। তাহার পর তিনি ভারত পর্যটন করেন। চার বৎসর আগে তিনি পুনায় আসিয়াছিলেন। [পুনা তিলকের নিজের শহর।] তিনি [পুনার] ডেকান ক্লাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে কিছু লোক আলোচনা-সভা করিতেছিলেন। বিবেকানন্দ সেখানে প্রাণপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা আনন্দ ও উন্মাদনার সৃষ্টি করেন। পুনাবাসিগণ হয়তো সেই ঘটনার কথা ভুলিয়া যান নাই।..." [দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪২২] 'কেশরী'-র উল্লিখিত সম্পাদকীয়টি যে স্বয়ং তিলকের রচনা সেবিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ তিনিই তখন উহার সম্পাদক।

ভারত-পরিক্রমাকালে স্বামীজীর পুনা-আগমন সম্পর্কে পরবর্তী উল্লেখ আছে তিলকের বিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'মারাঠা'-র ৭ মে ১৮৯৯ তারিখের সম্পাদকীয়তে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দ'। প্রসঙ্গতঃ পরিব্রাজক বিবেকানন্দের পুনা-আগমন প্রসঙ্গে ঐ সম্পাদকীয়তে লেখা হইয়াছিল ঃ "পুনার খুব কম লোকই সম্ভবতঃ জানেন—প্রায় সাত বৎসর আগে এক তরুণ সুদর্শন সন্ন্যাসী পুনায় আসিয়া এখানকার সর্বাধিক পরিচিত নাগরিকদের একজনের সদাশিবপেটের [পুনার একটি সম্ভ্রান্ত পল্লী, যেখানে তিলকের আবাস ছিল।] বাড়িতে ছিলেন।... পুনায় থাকাকালে ... পুনার বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনাসভায় মিলিত হইবার সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল—সেখানে সন্ন্যাসীর ইংরেজী ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি এবং বাক্যালাপের শক্তি সমবেত নাগরিকদের মনে অতি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪২৯)

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দুই বৎসর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পক্ষে ছিল একটি দুর্যোগময় কাল। প্লেগ-মহামারী, ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক দমন ও পীড়ন নীতি, তিলক প্রমুখ নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ প্রভৃতি ঘটনা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মানুষের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল। উল্লিখিত সম্পাদকীয়র সূচনাংশে সুগভীর ভাবাবেগের সঙ্গে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে স্বামীজীর পুনরাগমন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়া বলা হইল ঃ "এখনও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই। কিন্তু যদি তাহা সত্ত্বেও স্বামীজীকে ভারতের এই অংশে আনয়ন করা সম্ভব হয়, তাহা অত্যন্ত মঙ্গলজনক হইবে। কারণ, স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণাময় আধ্যাত্মিকতার স্পর্শই এই প্রেসিডেন্সীর মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নিরাময়ের প্রলেপ।" সম্পাদকীয়র উপসংহারে পুনরায় ঐ ব্যগ্রতা প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ "স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ যেদিন রূপায়িত হইবে তাহা হইবে মহাসুখের দিন। তাহার পূর্বে আমরা শুধু এই আশাটুকু পোষণ করি—স্বামীজী বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে পুনশ্চ আমাদের আহ্বানে আসিয়া উপস্থিত হউন, এবং জনসাধারণের মনকে অর্থহীন কোলাহল হইতে সরাইয়া নিরাময়কারী এবং স্বাস্থ্যকর জগতে উত্তোলন করুন।" (দ্রঃ ঐ) রচনাটি হয় তিলক স্বয়ং লিখিয়াছিলেন নতুবা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এন. সি. কেলকার লিখিয়াছিলেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু মনে করেন, যদি কেলকার উহার রচয়িতা হইয়া থাকেনও তাহা হইলে উহা যে "তিলকের সঙ্গে পরামর্শ-ক্রমে রচিত" সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪২৮)

তিলক ও স্বামীজীর শেষ সাক্ষাৎকার তিলকের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহা ঘটিবার কয়েক বৎসর আগে সংঘটিত স্বামীজীর সহিত তিলকের প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি যে তিলকের মনে বিশেষ রেখাপাত করিয়াছিল 'কেশরী' এবং 'মারাঠা' পত্রিকার উপরি-উল্লিখিত রচনাগুলিতে তাহার পরিচয় পাই।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিলক ও বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকার সম্পর্কে তিলকের নিজের দুটি স্মৃতিকথা ভিন্ন আরও দুটি বিবরণ পাওয়া

গিয়াছে। সেই দুটির মধ্যে কালানুক্রমের বিচারে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত বর্ণনাটি প্রথম। নিবন্ধকার ভুবনমোহন হাওলাদার লিখিয়াছেন ঃ "একদা স্বামীজী ট্রেনে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাইতেছিলেন। সেই গাড়িতে মহামতি তিলক ও একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্যারিস্টার ছিলেন। ব্যারিস্টার ও তিলকের মধ্যে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বহু তর্ক-বিতর্ক হইতেছিল। ব্যারিস্টার হিন্দুধর্ম, বেদ-বেদান্ত অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। তিলকও যথাসাধ্য স্বীয় মত সমর্থন করিতেছিলেন। স্বামীজী নাকে মুখে একখানা কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া তাঁহাদের তর্ক-বিতর্ক শুনিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, তিলক আর ব্যবহারজীবীর সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন মুখের কম্বল ফেলিয়া সিংহবিক্রমে উঠিয়া বসিয়া ব্যারিস্টারের সহিত হিন্দুধর্ম বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ব্যারিস্টার অবাক হইয়া রহিলেন। পরে তিলক শিকাগোর মহাসম্মেলনে হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তৃতা পাঠ করিয়া ঐ ব্যারিস্টারকে বলিয়াছিলেন, 'এই সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন, গাড়িতে যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলাম, তিনিই এই ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এরূপ লোক ভারতে ইদানীং জন্মায় নাই'।"

বর্ণনাটি নাটকীয়, কিন্তু বিবরণে কিছু ফাঁক-ফোকর রহিয়াছে। প্রথমতঃ, স্বামীজী ঐ সময়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নহে। স্বামীজী বোম্বাই হইতে পুনা যাইতেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিলক-বিবেকানন্দের আলাপাদি সম্পর্কে এই বিবরণে প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত তিলকের স্মৃতিকথা হইতে জানা যায় যে, ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে স্বামীজীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর সংবাদপত্রে তাঁহার ছবি দেখিয়া তিলক স্বামীজীকে পূর্ব-পরিচিত বলিয়া বুঝিতে পারেন। সুতরাং উল্লিখিত বিবরণের সর্বশেষ বক্তব্যটিতে কালানুক্রমের দোষ রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, ভুবনমোহন হাওলাদার তাঁহার তথ্য কোথা হইতে পাইয়াছেন? ইহার উত্তর ঐ লেখায় নাই। অনুমান করিতে পারি লোকশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তিনি বিবরণটি উপস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই লোকশ্রুতির সূত্র কি?

তিলক-বিবেকানন্দ প্রথম সাক্ষাৎকার সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবরণটি পাই প্রমথনাথ বসুর সুপরিচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে (১৩২৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে)। প্রধানতঃ বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত এবং স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী বিরজানন্দের চেষ্টা ও তত্ত্বাবধানে চার খণ্ডে সঙ্কলিত স্বামীজীর সুবিখ্যাত ইংরেজী জীবনী অবলম্বনে এই গ্রন্থটি লিখিত। তবে প্রমথনাথ বসু তাঁহার গ্রন্থে অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ ও সূত্র হইতেও উপাদান সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বয়ং গ্রন্থটি পড়িয়া এবং প্রয়োজনে সংশোধন ও সংযোজন করিয়া উহাকে 'যথাসম্ভব' নির্ভুল করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থটি সাধারণতঃ 'স্বামীজীর প্রাচীন বাঙলা জীবনী' নামে অভিহিত হয়। এই গ্রন্থে তিলক-বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাতের যে-বিবরণ পাই তাহা স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে অনুপস্থিত, সেখানে শুধু বোম্বাইয়ে স্বামীজীর সহিত তিলকের প্রথম সাক্ষাৎ, আলাপ এবং অতঃপর তিলকের পুনার বাড়িতে স্বামীজীর অতিথি হিসাবে দশদিন অবস্থানের উল্লেখ রহিয়াছে। (দ্রঃ The Life of the Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples, Advaita Ashrama, Mayavati, Vol. II, Ist Edn., 1913, p. 178)

প্রমথনাথ বসু প্রদত্ত বিবরণটি নিম্নরূপ ঃ

"১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীজী বোম্বাই শহরে পদার্পণ করিলেন।··· কয়েক সপ্তাহ বোম্বাইয়ে থাকিয়া তিনি পুনায় গমন করিলেন। স্বামীজী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাইতেছিলেন। সেই গাড়িতে বাল গঙ্গাধর তিলক ও আর কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন। স্বামীজীকে দেখিয়া ঐ ভদ্রলোকেরা ইংরেজী ভাষায় পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীদের দ্বারাই ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, স্বামীজী ইংরেজী জানেন না, সেইজন্য খুব স্বাধীনভাবে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করিতেছিলেন, আর তিলক সন্ন্যাসীদের পক্ষ লইয়া তাঁহার সম্মান করিতেছিলেন। স্বামীজী প্রথমটা চুপ করিয়া ইঁহাদের বাদ-প্রতিবাদ শুনিতেছিলেন, শেষে ইঁহাদের কথায় যখন যোগ দিলেন তখন সকলে স্বামীজীর অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিলক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুনায় নিজ বাটিতে লইয়া গিয়া একমাস রাখিলেন। এই প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ

পণ্ডিতের সহিত বহু বিষয়ে আলাপ করিয়া স্বামীজী বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিয়াছিলেন।" (স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ২২১)

প্রথম বিবরণে পুনায় তিলকের বাড়িতে স্বামীজীর অবস্থানের উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় বিবরণে আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণের সংবাদ-সূত্র কি তাহা গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই।

বিবেকানন্দ-তিলক প্রথম সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে স্বামীজীর নিকট প্রত্যক্ষভাবে শ্রুত কোন বিবরণের সংবাদ পাওয়া যায় নাই, যাইলেও আমরা তাহা এখনও অবগত নহি। তবে, পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, স্বয়ং তিলকের এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে দুটি প্রত্যক্ষ স্মৃতিকথা রহিয়াছে। প্রথমটি 'রেমিনিসেন্সেস অফ স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত (এটি তিলকের মৃত্যুর পূর্বে সংগৃহীত হয় এবং 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়), দ্বিতীয়টি প্রহ্লাদনারায়ণ দেশপাণ্ডের 'লোকমান্য তিলক যাঁচ্য়া আঠবণী ওয়া আখ্যায়িকা' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত। প্রহ্লাদনারায়ণ দেশপাণ্ডে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তিলকের নিকট হইতে তাঁহার স্মৃতিকথাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

'রেমিনিসেন্সেস অফ স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে তথা 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় তিলক বলিতেছেন ঃ

"১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে বা ঐরূপ কোন একসময়ে, অর্থাৎ শিকাগোর বিখ্যাত বিশ্বমেলার অন্তর্গত ধর্মমহাসভার পূর্বে আমি একদিন বোম্বাই হইতে পুনাতে ফিরিতেছিলাম। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে একজন সন্ন্যাসী আমি [ট্রেনের] যে-কামরায় ছিলাম, তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জনকয়েক গুজরাটী ভদ্রলোক তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা আমার সহিত তাঁহাকে যথারীতি পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তিনি যেন পুনায় অবস্থানকালে আমার বাড়িতেই থাকেন। আমরা পুনা পৌঁছিলে সন্ন্যাসী আমার সহিত আট-দশ দিন বাস করিলেন। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনি একজন সন্ন্যাসী মাত্র।... তাঁহার নিকট পয়সা-কড়ি মোটেই ছিল না; সম্পত্তির মধ্যে ছিল একখানি মৃগচর্ম, একটি কমণ্ডলু ও দু-একখানি গেরুয়া বস্ত্র। তাঁহার ভ্রমণকালে কেহ না কেহ গন্তব্য স্টেশন পর্যন্ত টিকিট কিনিয়া দিত ..." (অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ২৯০)

প্রহ্লাদনারায়ণ দেশপাণ্ডে তিলকের যে-স্মৃতিকথা সংগ্রহ করিয়াছেন সেখানে তিলক তাঁহার সহিত স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত তিলকের পূর্বোক্ত স্মৃতিকথার কোন পার্থক্য নাই তবে দেশপাণ্ডের বিবরণে দু-একটি অতিরিক্ত তথ্য রহিয়াছে। দেশপাণ্ডে সংগৃহীত তিলকের স্মৃতিকথার প্রাসঙ্গিক অংশ ঃ

"১৮৯২-তে আমি বোম্বাই হইতে ফিরিতেছিলাম। **সেকেণ্ড ক্লাসে** বসিয়াছিলাম। একজন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার কামরাতেই উঠিয়া বসিলেন। কয়েকজন গুজরাটী ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন তাঁহাকে বিদায় দিতে। **তাঁহারাই সন্ন্যাসীর টিকিট কাটিয়া দেন।** সন্ন্যাসীর পুনায় চেনা-জানা কেউ ছিল না বলিয়া গুজরাটী ভদ্রলোকেরা আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন, এবং **আমার বাড়িতে তাঁহাকে আশ্রয় দিতে বলেন।** পুনায় আসিয়া সন্ন্যাসীকে আমি **বসতবাড়ি হইতে বিচ্ছিন্ন আলাদা একটি ঘরে থাকিতে দিলাম।** সেখানে তিনি প্রায় দশদিন ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটি মৃগচর্মের আসন, **দণ্ড**, কমণ্ডলু, দুটি কাপড় ও **কয়েকটি বই**।..." (দ্রঃ 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, ৫ম মুদ্রণ, পৃঃ ৮৪)

তিলকের দুটি স্মৃতিকথার কোনটিতেই পূর্বোক্ত নাটকীয় ঘটনাদুটির উল্লেখ নাই। কিন্তু 'উদ্বোধন' এবং প্রমথনাথ বসুর 'স্বামীজীর প্রাচীন বাঙলা জীবনী'তে যখন ঘটনাদুটি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তখন বলা যায়, উৎস নির্দেশিত না হইলেও উহাদের বাস্তব ভিত্তি অবশ্যই ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁহার স্বামীজীর জীবনীর সাম্প্রতিক ('৯১) সংস্করণে প্রাচীন বাঙলা জীবনীতে উল্লিখিত ঘটনাটিকে স্থান দিয়াছেন। এখন সমস্যা হইল, এতকাল পরে কিভাবে সেই ভিত্তির সন্ধান মিলিবে?

বিবেকানন্দ-তিলকের দ্বিতীয় এবং শেষ সাক্ষাতের পর বিবেকানন্দ মাস ছয়েক মাত্র নরদেহে ছিলেন, কিন্তু তিলক জীবিত ছিলেন দীর্ঘ দুটি দশক। এই দুই দশকে তিলক সমগ্র ভারতবর্ষে এক সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চিন্তা ও কর্ম সমকালীন ভারতবর্ষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু একথা হয়তো অনেকেই জানেন না যে, তিলকের চিন্তা ও কর্মের পশ্চাতে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব, চিন্তা ও কর্মসাধনার প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যমান ছিল। এবং সেই প্রভাবের প্রত্যক্ষ সূচনা শিকাগো ধর্মমহাসভার পর হইতে হইলেও পরোক্ষ সূচনা হইয়াছিল উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় হইতেই। ☐

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

॥ ৩১* ॥

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
কনখল
১৯ আগস্ট, (১৯)১২

প্রিয় রামচন্দ্র,

তোমার নিকট হইতে পরম প্রত্যাশিত পত্রটি দীর্ঘকাল বাদে মাত্র গতকালই পাইয়াছি। চিঠির বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া আমি যে কত খুশি হইয়াছি তাহা তুমি কল্পনাও করিতে পারিবে না। অবশ্য পরোক্ষভাবে মধ্যে মধ্যে তোমার সংবাদ আমাদের স্বামী কল্যাণানন্দের[১] নিকট হইতে পাইতাম। কিন্তু তাহাতে তোমার নিকট হইতে সরাসরি সংবাদ পাইলে যে আনন্দ পাই তাহার অর্ধেকও আনন্দ আসে না। সে যাহা হউক, জানিয়া খুশি হইয়াছি যে, তুমি পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক ভাল অবস্থায় আছ, যদিও তোমাকে বিনা অপরাধে বরোদা ত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং চাকুরিও গিয়াছে। মা যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন, ইহা আমরা জানি বা না জানি—ইহা খুবই সত্য। অন্য কাহারও সহানুভূতি বা ভ্রূকুটি গ্রাহ্য না করিয়া সুখে দুঃখে যেভাবেই অবস্থান করি না কেন সর্ববিষয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হওয়া উচিত।[২] গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রায়ই তোমার সময় খারাপ যাইতেছে, কিন্তু তোমার জীবনের সেই কঠিন সময়ে তুমি এই মনোভাব অবলম্বন করিয়া চলিতেছ দেখিয়া আমার খুব আনন্দ হইতেছে। মানুষের বিবেকবোধ পরিষ্কার রাখা অপেক্ষাও [সঙ্কট মুহূর্তে] প্রফুল্লতা বজায় রাখা মানুষের পক্ষে বেশি জরুরী এবং তোমার মধ্যে ঐ ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। সুতরাং হতাশ বা ভগ্নোদ্যম কিছুই তোমাকে হইতে হইবে না। [জানিয়া রাখিও] শেষ পর্যন্ত জয় তোমার হইবেই। মা তোমাকে সকলপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা হইতে রক্ষা করুন।

তুমি বিবাহ করিয়াছ শুনিয়া আমি একটু অবাকই হইয়াছি, তবে লোভ ও প্রলোভনপূর্ণ জীবন-যাপন অপেক্ষা বিবাহিত জীবনযাপন যে তুমি শ্রেয় ভাবিয়াছ তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। সর্বোত্তম জীবন যখন যাপন করা হইল না তখন তোমার পক্ষে ইহাই দ্বিতীয় পরবর্তী উত্তম ব্যবস্থা জানিবে। মন খারাপ করিও না। কিছু করিবার ইচ্ছা থাকিলে বিবাহিত জীবনেও তাহা তুমি করিতে পারিবে।

মা তোমাকে আশীর্বাদ করুন। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা তোমার প্রতি সর্বদা থাকিবে, ইহা তুমি ভাল করিয়াই জান—জান না কি? তোমার বন্ধু গিরিধর এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু দিন পাঁচেক হইল চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে সে হৃষীকেশে গিয়াছে। তবে আমার মনে হয় সে বাড়ি ফিরিয়া যাইলেই ভাল হইত। আশা করি সে শীঘ্র তাহাই করিবে।

আমার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ সুস্থ নহে। আমি ডায়াবেটিস এবং আনুষঙ্গিক উপসর্গাদিতে ভুগিতেছি। এখন অবশ্য কিছু ভাল আছি। অন্যান্যরা ভালই আছেন। বোধ করি কল্যাণানন্দের নিকট হইতে মাঝে মাঝে এখানকার সংবাদ পাও। আমার ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা জানিও। ইতি

প্রভুপদাশ্রিত
তুরীয়ানন্দ

* চিঠিটি ইংরেজীতে লেখা। গত আশ্বিন ১৩৯৮ থেকে ভাদ্র ১৩৯৯ পর্যন্ত স্বামী তুরীয়ানন্দের মোট তিরিশটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে।—যুগ্ম সম্পাদক

১ স্বামী কল্যাণানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ। উল্লেখ্য যে, স্বামীজীর প্রত্যক্ষ প্রেরণাতেই স্বামী কল্যাণানন্দ সেবাশ্রমের পত্তন করেছিলেন।—যুগ্ম সম্পাদক

২ কঠোর অদ্বৈত বেদান্তী স্বামী তুরীয়ানন্দের এই মাতৃশরণাগতি লক্ষণীয়। জ্ঞান এবং ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় তাঁর জীবনে দেখা গিয়েছিল।—যুগ্ম সম্পাদক

বিশেষ রচনা

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের আধ্যাত্মিক পটভূমি ও তাৎপর্য

অজিতনাথ রায়

শিকাগো ধর্মমহাসভা ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। এই ধরনের ধর্মমহাসভা আগে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা আর ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বহির্জগতে এই প্রথম শোনালেন এক ভারতবাসী। একশো বছর ধরে সারা পৃথিবী স্বামীজীর সেইসব কথা শুনছে আর বলছে। নিবেদিতা বলেছেন, গুরু, শাস্ত্র ও মাতৃভূমি—এই তিনটি সুর মিলিয়ে স্বামীজী এক মহাসঙ্গীত রচনা করেছেন। শিকাগো ধর্মমহাসভায় সেই সঙ্গীত সহস্র সহস্র নরনারী শুনেছেন। স্বামীজীর সেই সঙ্গীতের সুর ও বাণী বিগত একশো বছরে সারা পৃথিবীতে পৌঁছে গিয়েছে।

স্বামীজীর ধর্মমহাসভায় যাওয়ার মূল কারণ আধ্যাত্মিক। জগতের আধ্যাত্মিক জাগরণ ছিল তাঁর লক্ষ্য। আমেরিকা যাওয়ার আগে স্বামীজীর ভারত-পর্যটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে স্বামীজীর 'পাশ্চাত্য মিশন'-এর ক্ষেত্রে। ভারতের মানুষ ও মাটি, দেশ ও সমাজকে দেখা ও জানা ছিল তাঁর ভারত-পর্যটনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় বুঝলেন, ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। তাঁর মনে এই ভাব স্পষ্ট হলো যে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রভাবে ভারতবর্ষ একসময়ে বিভিন্ন ধর্মের মিলনক্ষেত্র হয়েছিল, আবার সেই আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভারতের ঐতিহ্য ও গৌরব ফিরে আসবে। তাঁর হৃদয়ে বেজে উঠেছিল এই ধ্বনি: "আমাদের জাতটা নিজের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে।" তিনি বলতেন, সেই জাতীয় বিশেষত্বের পুনর্বিকাশই হলো একমাত্র শক্তি যা দেশ ও মানুষকে তুলবে। আমাদের ধর্ম হলো সেই শক্তি আর বেদান্ত হলো আমাদের সেই ধর্ম। ধর্মমহাসভায় যাবার আগে স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে ভারতের ভাব ও আদর্শ বিনিময় দরকার। এর ফলে উভয় দেশের কল্যাণ নিশ্চিত। পাশ্চাত্যে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শের প্রচার হলে ভারতের প্রতি জগতের সম্ভ্রম জেগে উঠবে।

স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়া হঠাৎ ঘটেনি। আগেই বলা হয়েছে যে, এর কারণ ও ভিত্তি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। কেন আধ্যাত্মিক তা বোঝার জন্য আমাদের জানতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য দর্শন, দিব্য অনুভূতি ও দিব্য উক্তি, শ্রীমায়ের দিব্য দর্শন, দিব্য অনুভূতি ও দিব্য উক্তি এবং স্বামীজীর নিজের দিব্য দর্শন, দিব্য অনুভূতি আর দিব্য উক্তি।

॥ ১ ॥

স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' শ্রীরামকৃষ্ণজগতের একটি মূল গ্রন্থ। শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামীজীর স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য দর্শন সেখানে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে: "একদিন দেখিতেছি মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে··· সেখানে এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান··· খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে··· মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল··· দিব্য জ্যোতির্ঘনতনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন।··· এমন সময়ে দেখি··· জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেবশিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল।··· ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন··· দেবশিশু··· তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত

যাইতে হইবে।'… নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম এ সেই ব্যক্তি।''[১] স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে একসময়ে তাঁরা জেনেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণই ঐ দেবশিশুর রূপ ধরেছিলেন। এই দিব্য দর্শন দুটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে। প্রথম—শ্রীরামকৃষ্ণ দৈবশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ মানবলীলায় পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। দ্বিতীয়—স্বামীজী হলেন সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি—শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত অন্তরঙ্গ—জগৎকল্যাণে অবতরণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন যে, স্বামীজীর মতো উচ্চ অধিকারী আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিরল। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে, শ্রীশ্রীজগদম্বা যুগপ্রয়োজন সাধনের জন্য যে-কাজে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিযুক্ত করেছেন তাতে বিশেষ সহায়তার জন্য স্বামীজীর জন্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন যে, সব গুণ বা শক্তি একটি বা দুটির অধিকারী হয়ে লোকে সংসারে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করে, স্বামীজীর ভিতর ঐরকম আঠারোটি শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, যদি স্বামীজী ঐ বিপুল শক্তি সম্যগ্‌রূপে আধ্যাত্মিক পথে নিযুক্ত না করতে পারেন তাহলে ফল বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। তিনি হয়তো অন্য এক নতুন মত ও দলের সৃষ্টি করে নেতাদের মতো খ্যাতিলাভ করবেন, কিন্তু বর্তমান যুগপ্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপলব্ধি ও প্রচার দরকার যাতে জগতের যথার্থ কল্যাণসাধন হবে, তা তাঁর দ্বারা সম্ভবপর হবে না। সেইজন্য স্বামীজী যাতে সম্পূর্ণভাবে তাঁর সমগ্র শক্তিকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন সে-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম আগ্রহ ছিল। যতদিন না শ্রীরামকৃষ্ণ স্থিরনিশ্চয় হয়েছিলেন যে, স্বামীজীর ঐ শক্তি বিপথে যাবার সম্ভাবনা নেই ততদিন পর্যন্ত তাঁর উদ্বেগ যায়নি।[২]

আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর ভিতর এত গুণ এবং স্বামীজীর স্বরূপ জানা সত্ত্বেও কেন এই পরীক্ষা করলেন? তার উত্তরে স্বামী সারদানন্দ বলছেন: "মায়ার অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া দেহধারণ করিলে সাধারণ মানুষের কা কথা ঠাকুরের ন্যায় দেবমানবদিগের দৃষ্টিও ভ্রান্ত হইতে পারে। স্বল্পবিস্তর পরিচ্ছিন্ন হইয়া দৃষ্ট বিষয়ে ভ্রমসম্ভাবনা উপস্থিত করে।"[৩] স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন আপনার শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর বারবার দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখছি কি—এটা আমি আর এটাও আমি। সত্য বলছি কিছু তফাৎ বুঝতে পারছি না। যেমন গঙ্গার জল একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই—একটাই রয়েছে—বুঝতে পাচ্চ?' তা মা ছাড়া আর কি আছে বল—কেমন?"[৪] যিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি ঠাকুরের ঐরূপ মন্তব্য এবং সেই অনুযায়ী আচরণও করতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে "কতদূর আপনার জ্ঞান করেন।"[৫] আসলে এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর ভিতরের সত্তাকে জাগ্রত করলেন। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে দুদিন দুটি মহাবাক্য বলেছিলেন। একদিন তিনি একখানি কাগজে লিখে দিলেন: "নরেন শিক্ষে দিবে।" নরেন্দ্র তাতে বলেছিলেন যে, তিনি ওসব পারবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বলেছিলেন: "তোর হাড় করবে।"[৬] স্বামীজীর শক্তি যাতে জগতের কল্যাণে নিযুক্ত হয় সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যত্ন করে তাঁকে শিক্ষা দিতেন। স্বামীজীর অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি সঠিক পথে থেকে যাতে আত্মবিকাশ করে এবং লোককল্যাণাভিমুখী হয় সেই দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের আগ্রহ, আশা এবং আকাঙ্ক্ষার অন্ত ছিল না।

মহাসমাধির তখন তিন-চারদিন বাকি। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নরেন্দ্রকে ডেকে সামনে বসালেন। তারপর একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। স্বামীজী পরে বলতেন, তখন তাঁর

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ১৩৫৮, 'ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৯১-৯২

২ ঐ, ৫ম অধ্যায়, পৃঃ ১০১-১০৩ ৩ ঐ, পৃঃ ১১১ ৪ ঐ, ৮ম অধ্যায়, পৃঃ ২১২ ৫ ঐ, পৃঃ ২১৩

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩। পরিশিষ্ট ২; যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৭৩, পৃঃ ১৯৯

অনুভব হয়েছিল যেন ঠাকুরের দেহ থেকে তড়িৎ-কম্পনের মতো একটা সূক্ষ্ম তেজোরাশি তাঁর দেহমধ্যে প্রবেশ করছে। সেই সময় তিনিও বাহ্য-জ্ঞান হারিয়েছিলেন। পরে জ্ঞান হলে তিনি দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। অবাক হয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "আজ যথা সর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি—কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।"[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য দর্শন, দিব্য অনুভূতি ও দিব্য উক্তি হইতে তিনটি বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। প্রথম—স্বামীজীর আধ্যাত্মিক শক্তি জগতের কল্যাণে লাগানোর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রস্তুত করলেন। দ্বিতীয়—শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে যুগধর্ম সংস্থাপনের জন্য শ্রীজগদম্বার আদেশে অবতরণ করেছিলেন এবং তিনি দেখেছিলেন যে, স্বামীজীও সেইজন্য জগতে এসেছেন। তৃতীয়—শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর ভিতর শক্তি সঞ্চার করেছেন এবং জগতের কল্যাণের জন্য স্বামীজীর ভিতর থেকে কাজ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর দুটি কথা মনে রাখা দরকার। একটি হলো: "আমার পাশ্চাত্যে একটি বাণী দিতে হবে যেমন বুদ্ধ দিয়েছিলেন প্রাচ্যে।" দ্বিতীয়টি হলো: "আমি নিরাকার ধ্বনি।" এই দুটি কথার তাৎপর্য গভীর। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ করেছেন। একসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি।"[৮] শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর মধ্যে কোন ভেদ নেই। তাঁরা অভিন্ন। স্বামীজী আরও বলেছেন যে, যাকিছু তিনি বলেছেন সব শ্রীরামকৃষ্ণই বলিয়েছেন। আমেরিকায় সংবাদপত্রে একমাত্র স্বামীজীর সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—তিনি ঋষি ও ভগবৎপ্রেরিত পুরুষ। কেন স্বামীজী বলেছেন, তিনি "নিরাকার ধ্বনি"? শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মধারা স্বামীজীর পবিত্র হৃদয়ে সঞ্চিত হয়েছিল এবং ধর্মমহাসভার মাধ্যমে তা জগতের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

॥ ২ ॥

এবার আমরা দেখব শ্রীমা স্বামীজী সম্বন্ধে কি বলেছেন। শ্রীমা বললেন: "নরেন হলো ঠাকুরের হাতের যন্ত্র।" একসময়ে শ্রীমা দেখেন, সম্মুখের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আর তাঁর পিছনে যাচ্ছেন নরেন্দ্র, বাবুরাম, রাখাল প্রভৃতি তাঁর পার্ষদবৃন্দ। শ্রীমা আরও দেখলেন, ঠাকুরের পাদপদ্ম থেকে জলের উৎস নির্গত হয়ে তরঙ্গাকারে সম্মুখে সবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তিনি ভাবলেন, "দেখছি, ইনিই তো সব, এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা।" যোগীন-মাকে শ্রীমা এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেছিলেন: "শেষে দেখলুম ঠাকুর নরেনের দেহে মিলিয়ে গেলেন।" শ্রীমায়ের এই দিব্য দর্শন কামারপুকুরে।[৯]

আরেক বারের কথা। শ্রীমা তখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে ছিলেন। এক পূর্ণিমার রাত্রিতে গঙ্গার সিঁড়িতে বসে আছেন তিনি। অকস্মাৎ দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পিছন থেকে এসে গঙ্গায় নেমে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই চিন্ময় দেহ ভাগীরথীর পাপহারী পবিত্র জলে মিশে গেল। এই দৃশ্য দেখে শ্রীমায়ের সমস্ত অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্তম্ভিত হয়ে অপলক চোখে তিনি চেয়ে আছেন। এমন সময় স্বামীজী এসে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলতে বলতে দুই হাতে সেই ব্রহ্মবারি নিয়ে চারিদিকে অগণিত নরনারীর উদ্দেশে সিঞ্চন করতে লাগলেন। শ্রীমা দেখলেন, অগণিত মানুষ সেই জলস্পর্শে সদ্যমুক্তি লাভ করছে।[১০] এই অলৌকিক দর্শন মায়ের মনে এই উপলব্ধি এনে দিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ এবার জগৎকে মুক্তির পথ দেখাবে, আর স্বামীজী হলেন সেই মুক্তির বার্তাবহ। তাই সম্ভবতঃ শ্রীমা স্বামীজীকে "আমাদের সর্বস্ব" বলেছিলেন।[১১]

স্বামীজী শ্রীমাকে জগন্মাতারূপে বন্দনা করতেন। শ্রীমার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি: "ও আমার শক্তি।" শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার সন্তানেরা তাঁদের ব্রহ্ম

৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ১৩৭৪, পৃঃ ১৯৫
৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫।১৬।২
৯ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩৯১ সং, পৃঃ ১৮৭
১০ ঐ, পৃঃ ১৮৯-১৯০
১১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭২

ও শক্তিরূপে দেখেছেন। এই দর্শন দিব্যচক্ষু স্বারা সম্ভব, যা আমাদের ধারণার বাইরে। আমেরিকা যাবার কথা তখন চলছে, কিন্তু স্বামীজী তখনো দ্বিধায়। একদিন রাত্রিতে স্বামীজী স্বপ্নে দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন আর তাঁকে অনুসরণ করতে স্বামীজীকে আদেশ করছেন। এই দিব্য দর্শনে স্বামীজীর মন শান্তি ও আনন্দে ভরে উঠল। তথাপি শ্রীমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তিনি চিঠি লিখলেন। কারণ তিনি ভাবলেন, শ্রীমা তো ঠাকুরেরই অংশরূপিণী। তিনি যা বলবেন তাই করব। শ্রীমা স্বামীজীর স্বরূপ অবহিত থাকলেও চিন্তিত হলেন, মা হয়ে কি করে ছেলেকে সাগরপারে যেতে বলবেন। শ্রীমাও স্বপ্নে দেখলেন, ঠাকুর যেন তরঙ্গের ওপর দিয়ে হাঁটছেন এবং স্বামীজীকে অনুসরণ করতে তাঁকে বলছেন। মা তখন নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করে স্বামীজীকে উত্তরে লিখলেন আমেরিকা যেতে, কারণ তা-ই শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত। স্বামীজী সেই চিঠি পেয়ে বললেনঃ "এতক্ষণে সব ঠিক হলো। মারও ইচ্ছা আমি যাই।"[১২]

বস্তুতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা স্বামীজীর দেহে প্রবেশ করেছিল। নরেন্দ্রনাথের দেহ অবলম্বন করে স্বীয় আরব্ধ ব্রত সম্পাদনের জন্য ফিনিক্স পাখির মতো শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নতুনভাবে নতুন দেহ ধারণ করেছিলেন।

॥ ৩ ॥

ভারত-পরিক্রমাকালে স্বামীজী দেখেছিলেন, ভারত-সভ্যতার পথকে আলোকস্তম্ভের মতো চিহ্নিত করে রেখেছে ভারতের ধর্ম। সমাজের সমস্ত স্তরের লোক—রাজা, কৃষক, অস্পৃশ্য, পতিত, সাধু, তস্কর, পণ্ডিত, নিরক্ষর—সব মানুষকে তিনি দেখলেন, তাদের কথা শুনলেন। বিভিন্ন প্রদেশের আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন চিন্তার লোকের জীবন-যাত্রার ভাব আর বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণকে তিনি দেখলেন। দেখলেন, এই বিচিত্র সমাজ কয়েকটি মূল নীতির ওপর স্থাপিত ও রক্ষিত। স্বামীজী দেখলেন, এই বৈচিত্র্যের ভিতরেই একত্ব নিহিত। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতেও তিনি এই সত্য দেখলেন। দেখলেন, সমস্ত নীতি এক সার্বিক আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

ভারত-পর্যটনের সময় স্বামীজীর তিনটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে আলমোড়ার কাছে স্বর্ণোজ্জ্বল অক্ষরে মন্ত্র-দর্শন।[১৩] ভারত-পর্যটনকালেই স্বামীজী তাঁর এক অপূর্ব দর্শনের কথা ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেনঃ "সন্ধ্যা হইয়াছে; আর্যগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদতীরে পদার্পণ করিয়াছেন। ইহা সেই যুগের সন্ধ্যা। দেখিলাম, বিশাল নদের তীরে বসিয়া এক বৃদ্ধ। অন্ধকার তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতেছে, আর তিনি ঋগ্বেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তারপর আমি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু প্রাচীনকালে আমরা যে সুর ব্যবহার করিতাম, ইহা সেই সুর।"[১৪] "আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে'॥" আর্য ঋষিদের গীত, ছন্দ ও সুর স্বামীজী ঐ অপূর্ব দর্শন মাধ্যমে পেলেন। স্বামীজী আরও বলেছেন, শঙ্করাচার্যের স্তব ও স্তোত্রেও সেই ছন্দ সেই সুর। বৈদিক ধ্বনি আমাদের জাতীয় তান।[১৫] মনে হয় স্বামীজী ভারতের আত্মগীত আত্মছন্দ আত্মতান —সব মিলিয়ে ভারতাত্মার মর্মবাণী সেদিন শুনেছিলেন।

দ্বিতীয় অনুভূতি আলমোড়ার পথে কাকড়ি-ঘাটে এক অশ্বত্থ গাছের নিচে ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। ধ্যানের পর সঙ্গী স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী বললেনঃ "দ্যাখ গঙ্গাধর, এই বৃক্ষতলে একটা মহা শুভ মুহূর্ত কেটে গেল—আজ একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বুঝলাম সমষ্টি ও ব্যষ্টি

১২ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৮১-৩৮২

১৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২

১৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ২৮৮

১৫ ঐ, পৃঃ ২৮৯

(বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণুব্রহ্মাণ্ড) একই নিয়মে পরিচালিত।”[১৬] কি ছিল সেই অনুভূতি? তা ছিল এই : “সৃষ্টির আদিতে ছিলেন শব্দব্রহ্ম।

“বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণুব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে সংগঠিত। ব্যষ্টি জীবাত্মা যেমন একটি চেতন দেহের দ্বারা আবৃত, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতনাময়ী প্রকৃতির মধ্যে বা দৃশ্য জগতের মধ্যে অবস্থিত। শিবা শিবকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। ইহা কল্পনা নয়। এই একের দ্বারা অপরের আলিঙ্গন যেন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের সদৃশ। তাহারা উভয়ে অভিন্ন এবং শুধু মানসিক বিশ্লেষণ সাহায্যেই উহাদিগকে পৃথক করা চলে। শব্দ ভিন্ন চিন্তা অসম্ভব। অতএব সৃষ্টির আদিতে ছিলেন শব্দব্রহ্ম।

“বিশ্বাত্মার এই বিবিধ প্রকাশ অনাদি। অতএব আমরা যাহাকিছু দেখি বা অনুভব করি সবই সাকার ও নিরাকারের মিলনে সংগঠিত।”[১৭]

এই হলো বেদান্তের সার, ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা। মর্মের গভীরে উপলব্ধি করে স্বামীজী তা ধর্মসভায় এবং জগতে শিক্ষা দিলেন। পরমাত্মা সকলের ভিতর। পরমাত্মারই ইচ্ছায় এই সৃষ্টি। অণু আবার মহৎ। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি। এক এবং বহু। তাই সব উপাসনা এক, সর্বকর্ম-পদ্ধতি সেই এক সত্যকে প্রকাশের নানা প্রয়াস, নানা ভঙ্গি। অদ্বৈতবাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে স্বামীজী জগৎকে শোনালেন ‘এক’-এর বাণী।

স্বামীজীর তৃতীয় অনুভূতি কন্যাকুমারীতে। স্বামীজী তখন জগন্মাতা আদ্যাশক্তি দেবী কুমারী এবং দেবাদিদেব শিবের চিন্তায় নিমগ্ন। দেবী কুমারীর মন্দিরের সম্মুখে ভারতের সর্বশেষ শিলাখণ্ডে স্বামীজী ধ্যানে বসেছিলেন। এই ধ্যান ভারতের ভাগ্যবিধাতার ধ্যান, সেই সঙ্গে ভারতের ধ্যান। মাতৃভূমির কল্যাণচিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন তিনি—ভারতের গৌরবময় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে ভারত কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামীজীর চিত্তে একালে তিনটি বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। প্রথম—আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রভাবে ভারত বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধর্মের জন্মভূমি ও মিলনক্ষেত্র হয়েছিল একমাত্র সেই অনুভূতিবলেই ভারতের গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। দ্বিতীয়—আমাদের জাতটা নিজের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেজন্য ভারতের এই অধঃপতন। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয় তাই করতে হবে। আবার তাদের উঠবার যে শক্তি তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আনতে হবে। নীচ জাতিকে তুলতে হবে। ধর্মের কোন দোষ নেই—দোষ ধর্মকে জীবনে প্রয়োগের ব্যর্থতায়—দোষ মানুষের। তৃতীয়—ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ পাশ্চাত্যের সর্বত্র বিতরণ করে পাশ্চাত্যের কর্মোদ্যমের সঙ্গে প্রাচ্যের ভগবৎ-ধ্যানের মিলন ঘটাতে হবে। কন্যাকুমারীতে তাঁর ভাবী পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেল। স্বামী গম্ভীরানন্দও সেকথা লিখেছেন : “সেদিন তাঁহার (স্বামীজীর) সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল—তিনি সাগর অতিক্রম করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে আমেরিকায় যাইবেন, তাঁহারই নির্দেশে পরিচালিত হইবেন এবং সাফল্যমণ্ডিত হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে ব্রতী হইবেন। ভগবান তখন তাঁহার নিকট সুদূর স্বর্গে অবস্থিত পিতা, মাতা, ন্যায়াধীশ বা অন্য কোনরূপে অনুভূত না হইয়া সর্বতোব্যাপী নারায়ণরূপেই প্রতিভাত হইলেন—‘সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।/ সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥’ তাঁহারই পূজায় আত্মোৎসর্গ করিতে তিনি এখন সমুৎসুক। এ পূজার তুলনায় আপনার মুক্তি চেষ্টাও অকিঞ্চিৎকর, নির্বিকল্প সমাধিও তুচ্ছ।

“ধ্যানোত্থিত সন্ন্যাসী অতঃপর পদব্রজে দণ্ডকমণ্ডলু-হস্তে রামনাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।”[১৮]

সেই যাত্রারই ক্রমে পরিসমাপ্তি ঘটে শিকাগোয়।

[ক্রমশঃ]

১৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩
১৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ২৮৩
১৮ ঐ, পৃঃ ৩১২-৩১৩

নিবন্ধ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ঃ প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলির আলোকে

অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

"শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত"-র আবেদন ক্রমবর্ধমান। ব্যবসায়ীর কাছে এর মূল্য কম নয়, সেটা সম্প্রতি বোঝা গেছে 'কথামৃত'-র কপিরাইট-সীমা শেষ হলে। শুধু কলকাতার কলেজ স্ট্রীট এলাকা থেকেই বেশ কিছু প্রকাশক হাজার হাজার কপি ছাপিয়েও পাঠকের চাহিদামত সরবরাহ করতে পারেননি। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে এই গ্রন্থ যেমন অমূল্য, বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী ভোগী মানুষের কাছেও এই গ্রন্থের মূল্য আছে ; তাই তাঁরা হৈচৈ করে সংগ্রহ করেছেন, এখনো করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

কথামৃত এযুগের গীতা বা গীতার সটীক মুগ্ধবোধ সংস্করণ। বেদান্তের সার নিয়ে গীতা। সেই গীতাও আবার অনেকের রোচে না। যাঁদের বেদ-বেদান্ত তথা গীতাও হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাঁদের জন্য কথামৃত অপরিহার্য।

কিন্তু যাঁরা ধর্মের নাম শুনলে কানে আঙুল দেন, সাধু-সন্ন্যাসীর ছোঁয়া লাগলে স্নান করে দেহ পবিত্র করতে চান, যথেষ্ট পাণ্ডিত্য থাকলেও যাঁরা হিন্দুধর্মের স্পর্শ-কলুষতার জন্য রাম ও কৃষ্ণ নাম মুখে আনেন না, তাঁদের কাছে 'কথামৃত'-র কোন মূল্য আছে কি? এঁরা গণশক্তিমান। এঁদের নির্দেশে আজ জড়জগৎ গতিময় হয়ে ওঠে। সে-কারণে তাঁদের মুখস্থ বাণীর সঙ্গে 'কথামৃত'-র অন্তঃস্থ বক্তব্যের কোন আত্মীয়তা আছে কিনা দেখতে হবে।

এযুগের জ্ঞানিমানীদের বহু বাণীর একটি হলো 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'। তাঁরা সোনার সঙ্গে পিতলের, লোহার সঙ্গে রুপোর, টিনের সঙ্গে দস্তার সংমিশ্রণ দেখাতে চান। বাঘ-সিংহ, ভেড়া-ছাগলের সঙ্গে একত্রে চরলে বা ঘাস খেলে রাখালের সুবিধা অনেক। তাঁদের চেষ্টায় সোনা-পিতলের মিশ্রণ হতে পারে, কিন্তু অভেদ একত্রীকরণ হয় না। 'মিথ্যাচার' হয়, কিন্তু 'কমপাউন্ড' বা যৌগ হয় না। মিশ্রণের ফলে তেল জলের ওপর একত্রে থাকলেও দুটির পৃথক অস্তিত্ব বোঝা যায়। যেকোন সময় তারা পৃথক হতে পারে এবং খুব সহজেই। সে-কারণে ভেদ-এর পরিবর্তে অভেদ দর্শনের বাসনা থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে মন লাগাতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্প্রীতি-চিন্তা অন্যরকম। একে অপরের সঙ্গে রক্তমাংসের মতো নিবিড়ভাবে যুক্ত। পৃথক করা মুশকিল, যদিও মাংস এক জিনিস, রক্ত আর এক। ঠাকুরের একত্রীকরণ বা সংপৃক্তকরণ হৃদয়ের গবেষণাগারে ; তাঁর সম্প্রীতি-চিন্তা গভীর অনুভূতির ফসল, মুখের নয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, যেকোন মৌলিক পদার্থ কিছু পরমাণুর সমষ্টি। এই পরমাণুর মধ্যস্থ নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন-এর পরিমাণ বা ক্রমাঙ্কের পরিবর্তনেই মৌল পদার্থের পরিবর্তন ঘটে থাকে। প্লাটিনামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক ৭৮কে পরিবর্তন করে যদি ৭৯ করা যায় তবে তা আর প্লাটিনাম থাকে না—হয়ে যায় সোনা। আবার অনুরূপভাবেই ৭৯কে ৮০ করতে পারলে সোনা হয়ে যায় পারদ। আরও একটু পরিবর্তন করলে অর্থাৎ পরমাণু ক্রমাঙ্ক ৮২ করলে পারদ হয়ে যায় সীসা। তবেই দেখা যাচ্ছে, এই ভিন্ন নামের পদার্থের ভেদ কেবল পরমাণুর ক্রমাঙ্কভেদে। মূলতঃ ঐসব পদার্থ একই পরমাণু দিয়ে তৈরি।

কথামৃত হলো একটি মৌলিক উপাদান বা পরমাণু, যার পরিমাণ কমিয়ে বা বাড়িয়ে বাইবেল অথবা কোরান প্রস্তুত করা যেতে পারে। অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত হলো এমন একটি গ্রন্থ যার মধ্যে সকলধর্মের মৌল উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে

আছে। পরিমাণের তারতম্য ঘটলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকে শ্রীমহম্মদকথামৃত, শ্রীবুদ্ধকথামৃত বা যিশুকথামৃত মনে হতে পারে।

সকল ধর্মগ্রন্থের 'মেড-ইজি' বা 'ডাইজেস্ট' হলো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, যা সাম্প্রদায়িক ভেদ-রোগের উত্তম ফলদায়ী, ভেদ-নিবারক 'ডাইজেস্টিভ কমপাউন্ড'-রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে যেহেতু এটি জার্মানি, রাশিয়া বা আমেরিকায় তৈরি নয়—এককথায় 'ফরেন মেড' নয়, সম্পূর্ণ বঙ্গজ 'প্রোডাক্ট'; তাই সুফলদায়ী হলেও গ্রহণের পূর্বে গভীর চিন্তার প্রয়োজন।

গীতা, ধম্মপদ, বাইবেল ও কোরানের মধ্যে যেমন কথামৃতের সুর শোনা যায়, কথামৃত-র মধ্যেও ঐ সকল ভিন্ন ধর্মের সুর ও পর্দার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। বস্তুতঃ এদের সকলের মধ্যেই একটা প্রচ্ছন্ন ঐকতান বর্তমান। উদারা, মুদারা, তারায় পাকানো সাত সুরের সূত্রতেই সব রাগ বাঁধা। তবু বিশেষ সুরের অনুপস্থিতিতে হয় রাগভেদ। মধ্যম নিখাদ বর্জিত হলে যে-রাগকে ভূপালি বলি, গান্ধার ধৈবত বর্জনে তা হয় বৃন্দাবনী সারেঙ্গ। সামান্য পরিবর্তনে নামের ও প্রকৃতির পরিবর্তন। অবশ্য গান বোঝার জন্য যেমন উপযুক্ত কানের প্রয়োজন ধর্মবাণী বোঝার জন্যও তেমন শিক্ষিত মনের প্রয়োজন।

কিরকম শোনা যায় তার কিছু নমুনা পেশ করাই হলো এই নিবন্ধের লক্ষ্য।

খ্রীস্টানগণ টেন কমান্ডমেন্টস, বৌদ্ধগণ অষ্টাঙ্গিকমার্গ, জৈনগণ চতুর্যাম, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শিক্ষাষ্টক ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত। এসব তাঁদের আপন আপন ধর্মপথের পথ-নির্দেশিকা। শ্রীরামকৃষ্ণ সে-ধরনের কোন বাঁধাধরা পথের কথা না বললেও এমন কয়েকটি বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যা অন্য ধর্মগ্রন্থেও পেয়ে থাকি।

বোধ করি কথামৃতের প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত তিনি অহংকার ও কাম-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলেছেন। অমনোযোগী ছাত্রকে যেমন প্রতিমুহূর্তে পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়; 'পড়-পড়' বলে খেলা থেকে মনকে পড়ার দিকে ঘোরাতে হয়; সংসারী মানুষকেও ধর্মপথে চলার জন্য বারবার বলতে হয়—ওহে, 'আমি', 'আমার', কামনা-বাসনা, সংশয়, কপটতা ইত্যাদি ছাড়; পরিবর্তে সত্য, সততা, গুরু, নাম, বিশ্বাস ইত্যাদির পরিচর্যা কর।

প্রথমেই ধরা যাক অহংকারের প্রসঙ্গটি। 'আমি' ও 'আমার' চিন্তাই হলো স্বার্থপরতার নামান্তর, অহংকারের মূল উপাদান বা নিউক্লিয়াস। ঠাকুর বলেছেন, 'আমি'বোধই দুঃখের কারণ। "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" "আমি আর আমার—এইটির নাম অজ্ঞান।"[১] আমি কর্তা, আর আমার এই সব স্ত্রী-পুত্র, বিষয়, মান—এই ভাব অজ্ঞান না হলে হয় না। আমি এতো পণ্ডিত—এই বোধের নাম অহংকার। অহংকার ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হও—সব পাবে। যতক্ষণ অহংকার, ততক্ষণ অজ্ঞান। অহংকার থাকলে মুক্তি নেই। আমি কর্তা, আমি গুরু—এই ভাবনা ত্যাগ করে 'কাঁচা আমি' বা আমিত্বকে শেষ করতে হবে। 'পাকা আমি' বা আমি তাঁর দাস বা সেবক—এই বোধ থাকলে ক্ষতি নেই। তাঁর শরণাগত দাস হও। সোঽহম্ নয়, দাসোঽহম্। "সব তাঁর। আমি কেবল তাঁর দাস।"[২]

আমি, আমার—এই অহংকারসূচক মনোভাবকে নিন্দা করে ধম্মপদে বলা হয়েছে—

"পরে চ ন বিজানন্তি মযমেত্থ যমামসে
যে চ তত্থ বিজানন্তি, ততো সম্মন্তি মেধগা॥"[৩]

—পৃথিবীটা কেবল তাঁরই, আর কারো নয়। অজ্ঞেরা জানে না যে, তারা চিরকাল এই সংসারে থাকবে না। যাঁরা জানেন তাদের সব কলহের শান্তি হয়।

"পুত্তমত্থি ধনমত্থি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি,
অত্তাহি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো ধনং?"[৪]

—আমার ধন, আমার পুত্র—এই চিন্তা করে অজ্ঞলোক দুঃখ ডেকে আনে। সে যখন নিজেই তার নিজের নয় তখন পুত্র বা ধন কি করে তার নিজের হবে? বস্তুতঃ, এই চিন্তা অহংকার, অজ্ঞতারই নামান্তর।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১০।৭
২ ঐ, ২।১৫।২
৩ ধম্মপদ, যমকবগ্গ,৬
৪ ঐ, বালবগ্গ, ৩

"সব্বসো নামরূপস্মিং যস্‌স নত্থি মমায়িতং,
অসতা চ ন সোচতি স বে ভিক্‌খূতি বুচ্চতি ॥"[৫]

বুদ্ধদেব আরও বলেছেন—নামরূপময় সকল বস্তুতে যাঁর মমত্ববোধ ('আমার' এই ধারণা) নেই, এদের অভাবে যিনি শোক করেন না তিনিই 'ভিক্ষু' নামে অভিহিত হন।

বাইবেল-এ অনুরূপ কথাই আছে। অহংকার ও 'আমি'বোধকে নিন্দা করে নম্রতা, দীনতাকেই শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

"Professing themselves to be wise they become fools."—নিজেদের যারা জ্ঞানী বলে জাহির করে তারাই মূর্খ। আরও আছে—"And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all."—তোমাদের মধ্যে যে প্রধান হতে চায় তাকে সকলের দাস হতে হবে।[৬]

"Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven."—ধন্য যারা নম্র স্বভাব। কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।[৭] "God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble."—ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু বিনম্রদের অনুগ্রহ প্রদান করেন।[৮]

কোরানেও বলা হয়েছে এধরনের কথা। সেখানেও অহংকারকে নিন্দা করে নম্রতা, বিনয়ভাব ও নিজেকে ঈশ্বরের দাস ভাবা—এই চেতনাকে প্রশংসা করা হয়েছে—

"বালিল্লা-হা ফাবুদ অকুম মিনাশ্বা-কিরীন।"[৯]
—হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের দাসত্ব করতে বলছ? তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর এবং কৃতজ্ঞ হও।

"অলা তুছায়্যির খদ্দাকা লিন্না-ছি
অলা-তামশী ফিল
আর্দ্বি মারাহা, ইন্নাল্লা হা লা-য়ুহিব্বু
কুল্লা মুখতা লিন ফাখুর।"[১০]

—গর্বভরে তুমি মানুষকে অবহেলা করো না, সংসারে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।

কোরানে আরও বলা হয়েছে উদ্ধত অহংকারীদের বিরুদ্ধে—

"আল্লা-হু লা-ইউহিব্বু কুল্লা
মুখতা-লিন ফাখুরি।"[১১]
—আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালবাসেন না।

"ফাদখুলু—আবওয়াবা জাহান্নামা
খা-লিদীনা ফীহা :
ফালাবিছা মাছঅল মুতাকাব্বিরীন।"[১২]
—অহংকারীদের স্থায়ী আবাস হলো নিকৃষ্টতম জাহান্নাম।

এখন দেখা যাক, গীতামুখে ভগবান অহংকার সম্পর্কে কি বলছেন। তিনি বলছেন :

"অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।"[১৩]
—অহংকারবশে বিমূঢ়জন নিজেকে কর্তা মনে করে।

অহংকারের সঙ্গে ত্যাগ করতে হবে কামনা-বাসনা। কামনা-বাসনার নিবৃত্তি হলো ঈশ্বরলাভের প্রথম ও প্রধান শর্ত। ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরভক্তি ব্যতীত আর সকল কামনাই পরিত্যাজ্য। ধন-মান-ভোগ-সুখ সবই ত্যাগ করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : "একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।"[১৪] "কামনা থাকতে, যত সাধনা কর না কেন সিদ্ধিলাভ হয় না।"[১৫]

শেষকথা ও সারকথা হলো—ত্যাগ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : "ত্যাগ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।"[১৬]

ঠাকুর বলছেন : "বেটুয়াটা করে পান আনবার যো নেই···কাশী চলে যাব মতলব হলো। ভাবলুম কাপড় লব—কিন্তু টাকা কেমন করে লব? আর কাশী যাওয়া হলো না। সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু ওগুলোর জন্য অতো ভেবো না—যদৃচ্ছা লাভ এই ভাল। সঞ্চয়ের জন্য অতো ভেবো না।"[১৭]

৫ ধম্মপদ, ভিক্‌খুবগ্গ, ৮
৬ বাইবেল : মার্ক, ১০।৪৪
৭ ঐ, ম্যাথিউ, ৫।৩
৮ ঐ, জেকব, ৪।৬
৯ কোরান, ৩৯।৬৬
১০ ঐ, ৩১।১৮
১১ ঐ, ৫৭।২৩
১২ ঐ, ১৬।২৯
১৩ গীতা, ৩।২৭
১৪ কথামৃত, ২।১৪।২
১৫ ঐ, ৩।১৫।১
১৬ ঐ
১৭ ঐ, ৪।১৬।৩

বুদ্ধদেবও সংযত জীবন ও কামনা-বাসনা ত্যাগের কথা বলেছেন। সংযম ও ত্যাগ হলো প্রকৃত সুখলাভের চাবিকাঠি। চিত্তকে বিষয়ের বাসনা থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। বুদ্ধদেব বলছেন ঃ

"তত্রাভিরতিমিচ্ছেয্য, হিত্বা কামে অকিঞ্চনো,
পরিয়োদপেয্য অত্তানং চিত্তক্লেসেহি পণ্ডিতো।"[১৮]

—কামনা পরিহার করে যিনি চিত্তকে সমস্ত মলিনতা থেকে মুক্ত করেন তিনি পণ্ডিত বা জ্ঞানী।

"অনিক্কসাবো কাসাবং যো বত্থং পরিদহেস্সতি
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি।
যো চ বন্তকসাবস্স সীলেসু সুসমাহিতো,
উপেতো দমসচ্চেন, স বে কাসাবমরহতি।"[১৯]

—কামাসক্তিতে যার হৃদয় মলিন, সে কাষায়বস্ত্র পরার যোগ্য নয়। যিনি কাম, রাগ ইত্যাদি দোষ-মুক্ত, শীলসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংযমী, সত্যনিষ্ঠ তিনিই কাষায়বস্ত্র পরার উপযুক্ত।

যীশু বলছেন, যাদের ধন আছে তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর, যারা ধনের ওপর নির্ভর করে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে চায় তাদের পক্ষেও দুষ্কর। ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট যাওয়া সহজ।[২০]

কামনার অসারতার কথা বলা হয়েছে কোরানে। বলা হয়েছে, আত্মসংযমই পাথেয়। (কোরান, ২।১৯৭)

"মান কা না ইউরীদুল আ-জিলাতা আজ্জলনা-লাহু ফীহা-মা-নাশা। উ লিমান্নুরীদ ছুম্মা জলা আলনা লাহু জাহান্নামা, ইয়াছলা-হা-মাজমুমাম্মাদহুরা।"[২১]

—যে-ব্যক্তি পার্থিব সম্পদের কামনা করে, আমি তাকে তাই দিই। অতঃপর জাহান্নাম তার জন্য নির্ধারিত, সেখানে সে অপদস্থ অবস্থায় প্রবিষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন ঃ

"ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥"[২২]

—ভোগপ্রাপ্তি ও ঐশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের এবং তদ্দ্বারা বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণের নিশ্চয়াত্মিকা বিবেক-বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না।

ঈশ্বরলাভের জন্য মানুষকে যেমন কোন কোন কাজ না করার বা বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনই বলা হয়েছে কিছু কিছু কাজ করতে, যা ঈশ্বরলাভে সহায়ক। তেমন একটি উপদেশ হলো হিংসা ছেড়ে এই পৃথিবীর সকলকে অন্তর থেকে ভালবাসতে হবে। কারো নিন্দা করা চলবে না।

কথামৃতে ঠাকুর বলেছেন ঃ "কারো নিন্দা করো না, পোকাটিরও না, যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে—যেন কারো নিন্দা না করি।"[২৩]

"ঝগড়া-বিবাদের ভেতর থেকো না।—যখন বাইরের লোকের সঙ্গে মিশবে সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষ আর রাখবে না। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে।"[২৪]

অহিংসা, প্রেম ও ভালবাসা দিয়েই বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি। বুদ্ধদেব বলেছেন ঃ

"সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো,
বেরিনেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিনো।"[২৫]

—শত্রুর প্রতি শত্রুতায় বিরত হয়ে এস, আমরা সুখে কালাতিপাত করি। হিংসাকারীদের মধ্যে এস অহিংস হয়ে, সুখে জীবনযাপন করি।

"ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং,
অত্তনোব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ।"[২৬]

—অপরের পরুষ বা কর্কশ কথায় কান দিও না। অপরে কি করছে বা করেনি তাও দেখার দরকার নেই। নিজের কাজ করা হয়েছে না হয়নি সেইটাই দেখা প্রয়োজন।

যীশুখ্রীষ্ট বলছেন ঃ "Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?"[২৭]

১৮ ধম্মপদ, পণ্ডিতবগ্গ, ১৩
১৯ ঐ, যমকবগ্গ, ৯-১০
২০ বাইবেল ঃ মার্ক, ১০।২৩-২৫
২১ কোরান, ১৭।১৮
২২ গীতা, ২।৪৪
২৩ কথামৃত, ৪।১৫।২
২৪ ঐ, ১।১২।১
২৫ ধম্মপদ, সুখবগ্গ, ১
২৬ ঐ, পুপ্ফবগ্গ, ৭
২৭ বাইবেল ঃ ম্যাথিউ, ৭।৩

—আগে নিজের চোখের কড়ি-কাঠটা বের করে তুমি তোমার ভাইয়ের চোখের কুটো তুলতে পারবে।

"Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. But I say unto you, Love your enemies...."[২৮]

—তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে—তোমরা প্রতিবেশীকে ভালবাসবে এবং তোমার শত্রুকে দ্বেষ করবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাসবে··· ।

কোরানেও অনুরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে : "ইয়া—আইয়ুহাল্লাজীন আ-মানু লা-ইয়াছ্খাব ক্বাউমুম্মিন কাউসিন আছা··· আইয়াকুন্না খাইরাম্মিনহুম্মা অলা-তালমিযু আনফুছাকুম অলা তানাবাযু বিল আলকাব।—

আয়ুহিব্বু আহাদুকুম আঁইয়াকুলা লাহমা
আখীহি মাইতান ফাকারিহতুমুহু।"[২৯]

—হে বিশ্বাসিগণ, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করবে না। এটা বিচিত্র নয়, ওদের চেয়ে তারা ভাল হতে পারে। তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না, যারা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকে তারাই জালেম। হে ইমানদারগণ, তোমরা অপরের গোপন তথ্য খুঁজো না, পশ্চাতে কারো নিন্দা করো না। কেউ কি মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে? যে অন্যের নিন্দা করে তোমরা তাকে ঘৃণা করো।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

"অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
···মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥"[৩০]

—যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"[৩১]

—অপরের কল্যাণকারীর কখনো দুর্গতি হয় না।

"আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥"[৩২]

—হে অর্জুন, যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

কথামৃতে ঠাকুর বলেছেন : "বিশ্বাস চাই।" বলছেন : "বালকের মতো বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন—ও তোর দাদা। বালকের অমনি বিশ্বাস যে, ও আমার ষোল আনা দাদা।"[৩৩]

ধম্মপদে বলা হয়েছে :

"বিস্সাসপরমা ঞাতী।"[৩৪] —বিশ্বাসই পরম আত্মীয়।

যীশুখ্রীস্ট বলছেন : "Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God ?"[৩৫]

—আমি কি তোমাকে বলিনি যে, যদি বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরীয় মহিমা দেখতে পাবে ?

কোরানে বলা হয়েছে : "অবাশ্বিরিল্লাজীনা আ-মানু অ আমিলুচ্ছা-লিহা-তি আন্না লাহুম জন্নান্না।"[৩৬]—যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে, স্বর্গ তাদের জন্য।

"আল্লাজীনা ইয়াজুন্নুনা আন্নাহুম মুলা-কু রাব্বিহিন অআন্নাহুম ইলাইহি রা-জিঊন।"[৩৭]

—যারা বিশ্বাস রাখে নিশ্চয়ই তাদের রব্বের (ঈশ্বরের) সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে এবং তাঁর কাছে ফিরবে।

গীতায় বলা হচ্ছে : "নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।"[৩৮] —সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহলোকও নেই পরলোকও নেই এবং ঐহিক সুখও নেই।

দেখা যাচ্ছে, 'কথামৃত' এবং অন্যান্য সব ধর্মগ্রন্থ একই কথা বলছে। পথ আলাদা হতে পারে, মত আলাদা হতে পারে, কিন্তু সবাই এক তত্ত্বের কথাই বলছে, এক সাধারণ নীতির কথাই বলছে। □

২৮ বাইবেল : ম্যাথিউ, ৫।৪৩।৪৪
২৯ কোরান, ৪৯।১১-১২
৩০ গীতা, ১২।১৩-১৪
৩১ ঐ, ৬।৪০
৩২ ঐ, ৬।৩২
৩৩ কথামৃত, ২।১২।২
৩৪ ধম্মপদ, সুখবগ্গ, ৮
৩৫ বাইবেল : যোহন, ১১।৪০
৩৬ কোরান, ২।২৫
৩৭ ঐ, ২।৪৬
৩৮ গীতা, ৪।৪০

সোভিয়েত রাশিয়াতে যা দেখেছি

স্বামী ভাস্করানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : ভাদ্র, ১৩৯৯ সংখ্যার পর]

শাসক হিসাবে পিটার ছিলেন খুব কঠোর। পিটারের আদেশে তাঁর ছেলে এবং উত্তরাধিকারী জারেভিচ আলেক্সিসকে হত্যা করা হয়। পিটার রুশ অর্থোডক্স চার্চকে তাঁর কর্তৃত্বাধীনে আনার চেষ্টা করছিলেন বলে আলেক্সিস নাকি তাঁর বাবার বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এই অপরাধে আলেক্সিসকে প্রথমে কারাদণ্ড ও পরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সেন্ট পিটার্সবার্গ, যা এই সেদিনও 'লেনিনগ্রাদ' নামে পরিচিত ছিল, পিটার দ্য গ্রেটই সে-শহরটির প্রতিষ্ঠাতা।

পিটার দ্য গ্রেটের পর ক্রমবর্ধমান রুশ সাম্রাজ্য যাঁরা শাসন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট' বিখ্যাত। তিনি জার্মান; বিবাহের পূর্বে তিনি ছিলেন প্রিন্সেস অব আনহল্ট জেরবস্ট। তৎকালীন জার পিটারকে (ইনি পিটার দ্য গ্রেট নন; তাঁর বংশধর) বিবাহ করার পর তিনি রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী হন। বিবাহের কিছুকাল পরে নিরঙ্কুশ ক্ষমতালাভের আশায় ষড়যন্ত্র করে তিনি তাঁর দুর্বলচিত্ত স্বামীকে হত্যা করিয়েছিলেন।

১৭৬২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তাঁর শাসনকাল। নৃশংস ও ক্ষমতালিপ্সু হলেও ক্যাথেরিন বিদুষী ও অতি বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পোল্যান্ডের অধিকাংশ রাশিয়ার অধিগত হয়; ক্রিমিয়াকে তুর্কীদের কবল থেকে উদ্ধার করা হয় এবং রুশ নৌবাহিনীকে আবার ঢেলে সাজানো হয়। রুশ সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি, নানা যুদ্ধে জয়লাভ এবং ইউরোপে রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য ক্যাথেরিনকে 'ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট' বলা হয়। ক্যাথেরিনের ছেলে পল ও নাতি আলেকজান্ডারের রাজত্বকালে রুশ সাম্রাজ্যের সীমা আরও সুদূর-প্রসারী হয়েছিল।

১৮১২ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ এবং মস্কো অধিকার রাশিয়ার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রুশদের হাতে পরাজিত না হয়েও শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার তীব্র শীত সহ্য করতে না পেরে ফ্রান্সে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে বলশেভিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়াতে রোমানভ বংশের রাজত্ব শেষ হয় এবং কম্যুনিস্ট শাসন চালু হয়।

কম্যুনিস্ট আমলে পরপর লেনিন, স্ট্যালিন, মালেনকভ, ক্রুশ্চভ, ব্রেজনেভ, আন্দ্রোপভ, চেরনেনকো এবং গরবাচভ সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন। গরবাচভের 'গ্লাসনস্ত' বা 'উন্মুক্ততার নীতির ফলে কম্যুনিস্ট আমলের বহু গোপন ঐতিহাসিক তথ্য জানা গিয়েছিল যা গরবাচভের পূর্বসূরীরা লৌহ-যবনিকার অন্তরালে সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এখন জানা যাচ্ছে যে, লেনিন মৃত্যুর পূর্বে পার্টিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যাতে স্ট্যালিন শাসনক্ষমতা না পান। কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন একে একে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর নিজ দখলে আনেন। ট্রটস্কী, বুখারিন, কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ প্রভৃতি বলশেভিক বিপ্লবের প্রথম সারির নেতাদের ক্ষমতা-চ্যুত অথবা হত্যা করে স্ট্যালিন সমগ্র রাশিয়াতে এক সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করেন। শোনা যায়, স্ট্যালিন ইভান-দ্য-টেরিবলের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্ট্যালিনের নির্দেশে সোভিয়েত রাশিয়াতে চাষীদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে লৌহহস্তে 'সামূহিক চাষপ্রথা' (Collective Farming) চালু করা হয়।

এই সংস্কারমূলক চাষপ্রথা চালু হবার পূর্বেই সমস্ত জমি ও অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা আইন করে রদ করা হবে জেনে চাষীরা ভয় পেয়ে অধিকাংশ গবাদি পশু, ভেড়া, শুয়োর ইত্যাদি খেয়ে ফেলেছিল। এছাড়া জমির ব্যক্তিগত মালিকানা লুপ্ত হওয়ার পর চাষীদের কৃষিকার্যে একান্ত অনীহা সৃষ্টি হওয়ার ফলে ফসলের পরিমাণও অত্যন্ত কমে যায়। এজন্য সামূহিক চাষপ্রথা চালু হওয়ার অব্যবহিত পরে রাশিয়াতে তীব্র দুর্ভিক্ষ হয় এবং বহু লোক খাদ্যাভাবে মারা যায়। চাষের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি চালু করা সত্ত্বেও চাষীদের গাফিলতির জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনও উন্নতি এখনো পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন হিটলারের সৈন্যবাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করে তখন কম্যুনিস্ট শাসনে তিতিবিরক্ত বাইলোরুশিয়া এবং ইউক্রেইনের বহু চাষী সেই জার্মান সৈন্যদের পরিত্রাতা হিসাবে অভিনন্দিত করেছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু স্বল্পকাল পরেই জার্মান সৈন্যদের উন্নাসিকতা এবং নাৎসীদের দুর্ব্যবহারে রাশিয়ার জনসাধারণ জার্মান সৈন্যদের প্রতি একান্ত বিরূপ হয়ে ওঠে এবং স্ট্যালিনের সংগ্রাম-প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত হিটলারের অতি আধুনিক এবং আপাত-অপরাজেয় সৈন্যবাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করে তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করার জন্য ক্রমে ক্রমে স্ট্যালিন সোভিয়েত রাশিয়াতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তৎসত্ত্বেও শোনা যায় যে, রুশ জেনারেল ভ্লাসভের নেতৃত্বে তিন লক্ষেরও বেশি রুশ যুদ্ধবন্দী জার্মানির পক্ষ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজি হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাফল্যের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত শ্রমজীবীদের কাছে স্ট্যালিন জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও সোভিয়েত রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা তাঁর সন্ত্রাস ও উৎপীড়নের নীতিকে সমর্থন করেননি। অনেকের মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সেনার হাতে যত রাশিয়ানের মৃত্যু হয় স্ট্যালিন নাকি তার চেয়েও বেশিসংখ্যক স্বদেশবাসীর মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন। নাস্তিকতায় বিশ্বাসী স্ট্যালিনের আমলের সোভিয়েত রাশিয়ার বহু সহস্র গির্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়কে হয় বন্ধ অথবা ধ্বংস করা হয়েছিল এবং সন্ত্রাসনীতির মাধ্যমে সমগ্র সোভিয়েত দেশটিকে 'পুলিশ-স্টেটে' পরিণত করা হয়েছিল।

স্ট্যালিনের মতো ধর্মদ্বেষী হলেও স্ট্যালিনের পরবর্তী ক্ষমতাসীন নেতা ক্রুশ্চভ স্ট্যালিনের আমলের সন্ত্রাসের আবহাওয়া বহুলাংশে দূর করে রাশিয়াতে কতগুলি নতুন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা চালু করেন। তাঁর প্রবর্তিত 'স্ট্যালিনের প্রভাব দূরীকরণের নীতি' অনুসরণ করে দেশের বহু স্থান থেকে স্ট্যালিনের মূর্তি বা ছবি সরিয়ে ফেলা হয়। ক্রুশ্চভের আমলে মস্কোর রেড স্কোয়ারে স্থিত সমাধিস্থল থেকে লেনিনের মরদেহের পাশে শায়িত স্ট্যালিনের দেহ সরিয়ে অন্যত্র কবর দেওয়া হয়। ক্রুশ্চভের আমলে মহাকাশ-বিজ্ঞানে রাশিয়ার সাফল্য পৃথিবীর সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের মাধ্যমে রুশ বিজ্ঞানীরা সুপ্রমাণিত করেছিলেন।

ক্রুশ্চভের পরবর্তী ক্ষমতাসীন নেতা ব্রেজনেভ ধর্মের ব্যাপারে সহনশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁর আমলকে অনেকে বলেন 'বাতায়ন-সজ্জার যুগ'। ব্রেজনেভের সময়ে সরকারি মহলে দুর্নীতির মাত্রা চরমে ওঠে। বাইরের চাকচিক্য এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেলেও দেশের প্রায় সর্বত্র নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের অভাব দেখা দেয়। সেই অভাব এখনো রয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার প্রায় আট-দশকব্যাপী কম্যুনিস্ট শাসনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পার্টির নীতি অনুযায়ী সেদেশের অর্থনৈতিক শোণিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা হয়েছে। ফলে যেসব দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে সেসব দিক পুষ্ট হয়েছে কিন্তু অন্যান্য দিক অপুষ্টই থেকে গেছে। পার্টির নীতি যাঁরা নির্ধারণ করেছেন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বিধানের জন্য যা করা প্রয়োজন ছিল তা তাঁরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারেননি। ভারি ইঞ্জিনীয়ারিং, প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, শিক্ষা, ব্যায়ামাগার ও বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়াসংক্রান্ত শিক্ষা, জনসাধারণের জন্য পার্ক তৈরি করা ইত্যাদি খাতে প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু

নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য, হাসপাতাল ইত্যাদির একান্ত অবহেলা করার জন্য সেসব ক্ষেত্রে দেশটি অনগ্রসর থেকে গেছে। ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তি সরকারের করায়ত্ত হওয়া এবং সরকারের ব্যুরোক্র্যাসির ফলে রাশিয়ার প্রায় সর্বত্র সাধারণ কর্মীদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে একান্ত অনীহা ও উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান গরবাচভ তাঁর প্রবর্তিত 'পেরেস্ত্রৈকা' বা 'পুনর্গঠন নীতির' মাধ্যমে রাশিয়ার কর্মীদের এ-মানসিকতা দূর করার ঐকান্তিক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উচ্চস্তরের ক্ষমতাসীন কিছু লোকের কায়েমী স্বার্থের পরিপন্থী বলে 'পেরেস্ত্রৈকা' বা পুনর্গঠন নীতিকে যথেষ্ট বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

*

মস্কোতে আমরা ছিলাম মাত্র দুদিন। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই 'ইনট্যুরিস্টের' মাধ্যমে মস্কোর বহু দ্রষ্টব্যস্থল আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছিল।

মস্কোকে রুশ ভাষায় 'মস্কোয়া' বলা হয়। এটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। তাই এ-মহানগরীটিকে প্রায়ই রাশিয়ার অন্যান্য শহর ও নগরের জননী বলা হয়। এর বর্তমান লোকসংখ্যা হচ্ছে প্রায় নব্বই লক্ষ এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় এটিই ছিল সবচেয়ে বড় শহর।

১১৪৭ খ্রীস্টাব্দে মস্কো নগরীর পত্তন হয়। সে-বছর প্রিন্স দোলগোরুকি গভীর অরণ্যাবৃত নাতিউচ্চ একটি পাহাড়ের ওপর তাঁর শিকার কুঠি তৈরি করেছিলেন। পরে তা দুর্গে রূপান্তরিত হয়। রুশ ভাষায় 'Krieml' শব্দের অর্থ 'দুর্গ'। এই শব্দটি থেকেই 'ক্রেমলিন' শব্দের উৎপত্তি। 'ক্রেমলিন'কে কেন্দ্র করেই মস্কোর সৃষ্টি। অনেকের মতে 'মস্কোয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'অন্ধকার অরণ্য' (Dark Forest)।

ক্রেমলিন ছিল প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র। তাই সর্বপ্রথম আমাদের ক্রেমলিন ও তার চারপাশের ঐতিহাসিক গির্জা, প্রাসাদ বা সৌধগুলি দেখাতে ট্যুরিস্ট বাসে করে নিয়ে যাওয়া হয়।

মস্কোর অধিকাংশ রাস্তাঘাটই প্রশস্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যানবাহনের মধ্যে বাস, ট্রাম ও ট্রলি-বাস রয়েছে। ট্রলি-বাসগুলি ট্রামের মতোই বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হয়। এছাড়াও রয়েছে মেট্রো বা পাতাল রেল। মস্কোর মেট্রো বা পাতাল রেলের স্টেশনগুলি অতি সুন্দর এবং ঝকঝকে তকতকে। খুব সম্ভবতঃ মস্কোর পাতাল রেল সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু শোনা গেল, ইদানীং কর্মীদের গাফিলতির ফলে এর মান নিম্নমুখী।

সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বত্র বাস, ট্রাম বা পাতাল রেলের ভাড়া তখন ছিল মাত্র পাঁচ কোপেক। মস্কো ও অন্যান্য বহু শহরে বাস বা ট্রামে কন্ডাক্টার নেই। যাত্রীরা প্রদেয় ভাড়া নিজেরাই তজ্জন্য রক্ষিত মেশিন বা বাক্সে দিয়ে যানবাহনগুলিতে বসেন।

মস্কোতে গ্রীষ্মের সময় বেশ গরম পড়ে। সেসময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে। আবার শীতের সময় হিমাঙ্কের ৩৫ ডিগ্রী নিচে নেমে যায়। আমরা যখন মস্কোয় যাই তখন বেশ গরম।

প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে ট্যুরিস্ট বাসে যেতে যেতে কয়েকটি সুন্দর পার্ক ও রাস্তার দুপাশে স্ট্যালিনের আমলে তৈরি বহু আকাশচুম্বী নিও-গথিক স্থাপত্যের সৌধ ও প্রাসাদতুল্য বাড়ি দেখতে পেলাম। বেশ কিছু স্কাই-স্ক্র্যাপারও দেখতে পাওয়া গেল।

বর্তমান মস্কো নগরীর অধিকাংশ বাড়ি ও রাস্তাঘাটই স্ট্যালিনের আমলে নতুন করে তৈরি হয়েছিল। পুরনো মস্কোর রাস্তাঘাটের অধিকাংশই ছিল সংকীর্ণ। সেগুলি ভেঙে স্ট্যালিন প্রশস্ত রাজপথ তৈরি করিয়েছিলেন।

ক্রমে আমাদের বাস ক্রেমলিনের পাশে গিয়ে থামল। বাস যেখানে থামল তার পাশেই হচ্ছে মস্কোর সবচেয়ে বড় হোটেল। নাম 'রোশিয়া হোটেল'। শুনতে পেলাম এটি নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হোটেল। ছ-হাজার লোক থাকতে পারে। একটু হাঁটার পরই আমরা বিখ্যাত রেড স্কোয়ারে এসে পৌঁছালাম। খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এখানে একটি বড় বাজার ছিল। জারদের রাজত্বকালে এখানে রাজদ্রোহীদের অনেককেই

প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পিটার দ্য গ্রেট, ইভান দ্য টেরিবল প্রমুখ রুশ জারদের স্মৃতি-বিজড়িত রেড স্কোয়ার একটি ঐতিহাসিক স্থান। রেড স্কোয়ারের এক পাশে ক্রেমলিন, অপর পাশে প্রাসাদতুল্য বিরাট বাড়িতে সরকারি গুদাম। এই রেড স্কোয়ারেই বিখ্যাত সেন্ট বেসিলস ক্যাথিড্রাল। এই ক্যাথিড্রালটির গম্বুজগুলি দেখতে রঙ বেরঙের পেঁয়াজের মতো। ইভান দ্য টেরিবলের আমলে এই গির্জাটি তৈরি হয়েছিল। কিংবদন্তী অনুযায়ী ইভান নাকি গির্জাটির স্থপতিকে অন্ধ করে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন যাতে স্থপতি এত সুন্দর স্থাপত্য-কর্ম অন্য কোথাও করতে না পারেন। কিন্তু ইতিহাস বলে যে, স্থপতি পসনিক ইয়াকভলেভ এর পরেও কাজান অঞ্চলে অনুরূপ আরেকটি গির্জার ডিজাইন করেছিলেন। কাজেই কিংবদন্তীটি নির্ভরযোগ্য নয়।

আমরা মস্কো যাওয়ার বছর দুয়েক আগে পশ্চিম জার্মানির একটি তরুণ বিমানচালক একটি ছোট এরোপ্লেনে রেড স্কোয়ারে নেমেছিলেন। নাম মাথিয়াস রাস্ট। এই ঘটনাটি সেসময় সর্বত্র খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। রেড স্কোয়ারের সেই স্থানটি দেখা হলো।

রেড স্কোয়ারের এক পাশে লেনিনের সমাধি রয়েছে। সেখানে গেলে লেনিনের সংরক্ষিত মরদেহ দেখতে পাওয়া যায়। শত শত দর্শনার্থী, অধিকাংশই রাশিয়ান, লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছেন দেখতে পেলাম।

এর পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ক্রেমলিনে।

ক্রেমলিন দুর্গটি প্রিন্স দোলগোরুকি প্রথম কাঠ দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। এর পর দুবার দুর্গটি ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হয়। বর্তমান দুর্গটি খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তৈরি হয়েছিল। জার তৃতীয় ইভানের আমলে ইটালীয়ান স্থপতিদের সাহায্যে এটি তৈরি হয়। দুর্গটিতে প্রচুর লাইম স্টোন ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্রেমলিনে তিনটি প্রাসাদতুল্য বাড়ি রয়েছে। একটি হচ্ছে অস্ত্রাগার, অপর দুটি হচ্ছে সেনেট ও প্রেসিডিয়াম। 'প্রেসিডিয়াম' ভারতের 'পার্লামেন্ট' -এর সমতুল্য। এই তিনটি বাড়ির সামনে পুরনো আমলের শত শত কামান সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে যখন নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী মস্কোর তীব্র শীত সহ্য করতে না পেরে ফ্রান্সে ফিরে যায় তখন তারা এই কামানগুলি ফেলে গিয়েছিল। একটু দূরেই আমরা বিখ্যাত 'জার-পুশকা' কামানটি দেখতে পেলাম। ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে পাঁচ মিটার লম্বা এই কামানটি তৈরি হয়েছিল, কিন্তু কখনো ব্যবহৃত হয়নি।

আমরা এরপর গেলাম দুর্গের ঠিক মাঝখানে ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারে। এখানে কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক গির্জা বা ক্যাথিড্রাল রয়েছে। গির্জাগুলির এক পাশে ইভান দ্য গ্রেটের আমলে তৈরি একটি বিরাট ঘণ্টা দেখতে পেলাম। ঘণ্টাটির ওজন ২০০ টন। ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে এটি তৈরি হয়; কিন্তু ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে ঘণ্টাটিতে আগুন লাগে। ঘণ্টাটি যখন খুব উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল তখন আগুন নেভাবার জন্য জল ঢালাতে ঘণ্টাটি ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যায়। এরপর প্রায় আড়াইশো বছর ধরে ঘণ্টাটি ভাঙা অবস্থাতেই রয়েছে। ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারের গির্জাগুলির মধ্যে ক্যাথিড্রাল অব দ্য অ্যাসাম্পশন, ক্যাথিড্রাল অব দ্য অ্যানানসিয়েশন এবং ক্যাথিড্রাল অব দ্য আর্ক এঞ্জেল মাইকেল প্রসিদ্ধ। ক্যাথিড্রাল অব দ্য আর্ক এঞ্জেল মাইকেলে বহু রুশ সম্রাটের সমাধি রয়েছে।

ক্রেমলিন দেখার পর আমরা ট্যুরিস্ট বাসে মস্কোর বিখ্যাত বলশয় থিয়েটার দেখতে গেলাম। বাড়িটি তখন মেরামত হচ্ছিল বলে ভিতরে ঢোকা গেল না। এই থিয়েটারটিতে ব্যালে নাচ হয়। রাশিয়ান ব্যালে পৃথিবী-বিখ্যাত।

এছাড়াও দ্রষ্টব্যের মধ্যে মস্কোতে বহু মিউজিয়াম রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রেতিয়াকভ গ্যালারি, পুশকিন ফাইন আর্টস মিউজিয়াম ও মিউজিয়াম অব ফোক আর্ট। সময়াভাবে আমাদের মস্কো শহরের কোন মিউজিয়ামই দেখা সম্ভব হয়নি। মস্কো সফরের পর রাত্রিতে আমাদের মস্কোর বিখ্যাত সার্কাস দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রথম রাত্রিতে সময়াভাবে ঘুমোতে পারিনি বলে আমি ও আমার সঙ্গী ভক্তটি সার্কাস দেখতে আর গেলাম না। [ক্রমশঃ]

কবিতা

কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শান্তি সিংহ

জহুরী

পুঁজিমত দর হাঁকে প্রতিলোক স্বভাবসঙ্গত
বেগুন-কাপড়ওলা হীরা-মূল্য দেয় মনোমত।
নামমাত্র দর শুনে দুঃখ-হাসি জাগে অবিরাম—
জহুরী জহর চেনে হীরকের ঠিক দেয় দাম।

সূত্র : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১৪।৭

"সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? রামচন্দ্রকে বারোজন ঋষি কেবল জানতে পেরেছিল। সকলে ধরতে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে; কেউ সাধু ভাবে; দু-চারজন অবতার বলে ধরতে পারে।

"যার যেমন পুঁজি—জিনিসের সেই রকম দর দেয়। একজন বাবু তাঁর চাকরকে বললে : 'তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কি রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা।' চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়েচেড়ে দেখে বললে : 'ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি।' চাকরটি বললে : 'ভাই আর একটু ওঠ, না-হয় দশ সের দাও।' সে বললে : 'আমি বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি; এতে তোমার পোষায় তো দিয়ে যাও।' চাকরটি তখন হাসতে হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে : 'মহাশয়, বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশি একটিও দেবে না। সে বললে, আমি বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।'

"বাবু হেসে বললে : 'আচ্ছা এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কত দূর বুঝবে! কাপড়ওয়ালার পুঁজি একটু বেশি—দেখি, ও কী বলে।' চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে : 'ওহে, এটি নেবে? কত দর দিতে পার?' কাপড়ওয়ালা বললে : 'হাঁ, জিনিসটি ভাল, এতে বেশ গয়না হতে পারে; তা ভাই, আমি নয়শো টাকা দিতে পারি।' চাকরটি বললে : 'ভাই, আর একটু ওঠ, তাহলে ছেড়ে দিয়ে যাই; না-হয় হাজার টাকাই দাও।' কাপড়ওয়ালা বললে : 'ভাই, আর কিছু বলো না; আমি বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি; নয়শো টাকার বেশি একটি টাকাও আমি দিতে পারব না।' চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল, আর বললে যে, কাপড়ওয়ালা বলেছে যে, নশো টাকার বেশি একটি টাকাও সে দিতে পারবে না। আরও সে বলেছে, আমি বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি। তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে : 'এইবার জহুরীর কাছে যাও—সে কী বলে দেখা যাক।' চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একেবারে বললে : 'এক লাখ টাকা দেব'।"

আকুতি

দিলীপ কুমার রায়

গভীর রজনী, করালবদনী
স্তব্ধ হয়ে আছ শিববক্ষোপরে।
মুণ্ডমালিনী, আয়ুধশোভিনী
কেন ক্ষান্তি দিলে, ভীষণ সমরে?

দেখে মনে হয় ধ্বংসের মাঝে
ভীতজনে তব বরাভয় রাজে;
যে চায় আশ্রয়, পাবে সে নিশ্চয়
এ ডাক ধ্বনিত সারা অম্বরে॥

আমার চেতন হয়ে অচেতন
শিকড় গেড়েছে মনের গভীরে
পঙ্কিল যত বাসনা কামনা
ষড়রিপু সহ সেথা খেলা করে।

তাই দিবানিশি করি ক্রন্দন,
এসো এসো মাগো, ছিঁড়ে বন্ধন,
দিব তব পূজা, বুকের শোণিতে
শুদ্ধাভক্তি-ভরা অন্তরে।

আবাহন

কালো তুমি বলেই মাগো,
কালো আমার চোখের তারা,
দুই তারাতে মিলন হলে কালো হবে অর্থভরা।
তাইতো তোমার আসন পাতা দুই নয়নে,
তাইতো হৃদয় পলে পলে প্রহর গোণে।
আসন আলো করলে মাগো হৃদয় হবে আত্মহারা,
দেরি আমার আর সহে না, এসো তুমি পরাৎপরা।

মাগো

আরতি ঘোষ

মাগো, তোর মেয়ে হয়ে আমি
কেমনে তোকে থাকি ভুলে?
তোর হাসিতে হেসে খেলে,
তোর ভাষাতে কথা বলে,
তোর চরণে পরাণ ঢেলে,
কেউ কি কভু পথ ভোলে?
তুই কিগো মা ছল করেছিস
ঠাঁই দিবি না চরণতলে।
তোর মেয়ে আজ কাঁদে সদা
বুক ভাসে তার নয়নজলে।
অভিমানের কঠিন এ ভার
নামিয়ে দে মা বুকের থেকে,
শুধু তোর নামে প্রেমে মাতাল হয়ে
থাকতে দে মা তোর মেয়েকে।
তোর 'সারদা' নাম যে নিয়েছে
তার কি কোথাও ব্যথা থাকে?
সেই পরশমণির ছোঁয়া দিয়ে—
সোনা করে রাখ না তাকে।

আলোর ভুবনে যাব

বিজয়কুমার দাস

এক আলোকিত পৃথিবীর জন্য
অনন্তকাল এই প্রার্থনা—
হৃদয়ে হৃদয় ছুঁয়ে থাক মানুষে মানুষে।
একা নয়, একসাথে যেতে হবে
স্বপ্নের সেই কাঙ্ক্ষিত ভুবনে।
দুচোখে স্বপ্ন আছে, হাতের মুঠোয় বিশ্বাস
তাই প্রতিদিন এগিয়ে যাওয়া
অন্ধকারের বৃত্ত থেকে মুক্তির আলোয়।
এখনো যেতে হবে অনেক পথ,
পবিত্র স্বদেশের মাটি ছুঁয়ে
সব পাপ পোড়াব আগুনে।
আলোর ভুবনে যাব আমরা সবাই।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

জয়পুরে স্বামীজী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

সেটা ১৮৯০ অথবা ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ।[১]

কবে সেই দণ্ডকমণ্ডলুধারী নগ্নপদ গৈরিকবাস —তখন অখ্যাত, পরে বিশ্ববিখ্যাত অপূর্বদর্শন তেজস্বী সন্ন্যাসী কোন্ পথে জয়পুরে এসেছিলেন? কোন্ ধর্মশালায় অথবা খেতড়ি মহারাজের জয়পুর প্রাসাদেই সে-সময়ে ছিলেন?

সেই সময়েই মহারাজ তখনকার বিখ্যাত কোন গায়িকার গান শুনতে স্বামীজীকে আহ্বান করেন এবং স্বামীজী বাঈজীর সঙ্গীত শুনতে অনিচ্ছুক হন। পরে মহারাজের আগ্রহে একটু বসেন।

তাঁর দ্বিধার ভাব দেখে গায়িকা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন একটু। তবু গাইলেন, কবি সুরদাসের একটি বিখ্যাত গান—

প্রভু মেরে অওগুণ চিত ন ধরো।
সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো (তুমারো)।…
ইক লোহা পূজা মে রাখত
ইক রহত ব্যাধ ঘর পরো,
পারশকে মন দ্বিধা নহী হৈ,
দুহু* এক কাঞ্চন করো।
ইক নদীয়া ইক নার,
কহাবত মৈলো নীর ভরো—
জব্ মিলি দোনো এক বরণ
ভয়ে সুরসুরি নাম পরো।…

গান শুনে সন্ন্যাসীর সহসা ভাবান্তর হলো। সন্ন্যাসীর এ ভেদজ্ঞান কেন? নর-নারী, সতী-নর্তকী—ভেদাভেদ কেন হবে তাঁর?…

এর আগে আবু পাহাড়ে খেতড়ি মহারাজের মন্ত্রী জগমোহন লালজী তাঁকে দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে নিজের প্রভুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

কোন কোন বইতে দেখি, এ গানটি খেতড়ি মহারাজের জয়পুর-ভবনেই তিনি শোনেন। কিন্তু আমার অত হিসাব-নিকাশের, তারিখের ভাবনা ভাবার দরকার নেই। ঠাকুরের কথাতেই আছে, "মিছরি রুটি আড় করেই খাও আর সিধে করেই খাও, মিষ্টি সমানই লাগবে।" মহাপুরুষের কথাও তাই। যেভাবেই শুনি, যাঁর মুখেই শুনি, তার মধুরতার সীমা নেই।

স্বামীজীর জয়পুরে যাওয়ার কথা শুধু কানেই শুনেছিলাম—বাবার কাছে, কাকার কাছে, পিসিমা ও মার কাছে। আমার তখনো জন্ম হয়নি। প্রায় ৭০ বছর আগের কথা, যখন স্বামীজী জয়পুরে গেছেন।

সম্ভবতঃ ১৮৯২/৯৩ খ্রীস্টাব্দ।

হয়তো খেতড়ি মহারাজের [জয়পুর] প্রাসাদে থাকার সময়েই আমার পিতা স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন। সেটাই সম্ভব। নইলে জয়পুরের

১ জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখেছেন, স্বামীজীর জয়পুরে আগমন ১৮৯০ অথবা ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে। কিছু পরে তিনি আবার লিখেছেন, সময়টি "সম্ভবতঃ ১৮৯২/৯৩ খ্রীস্টাব্দ"। সময়টি হওয়া উচিত এপ্রিল, ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ। স্বামীজী আলোয়ার থেকে সেই প্রথম জয়পুরে এসেছিলেন। আলোয়ারে তিনি এসেছিলেন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে। তিনি আলোয়ার ত্যাগ করেন ২৮ মার্চ। এপ্রিলের (১৮৯১) শুরুতেই তিনি জয়পুরে এসে পৌঁছান। জয়পুরেই পরিব্রাজক-বেশে তাঁর প্রথম ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল। তিনি সেবারে জয়পুরে মোট দু-সপ্তাহ ছিলেন। তার মধ্যে 'তিন-চারদিন' জ্যোতির্ময়ী দেবীর পিতৃগৃহে স্বামীজী অতিথি হিসাবে ছিলেন। বাকি দিনগুলি তিনি কোথায় ছিলেন তা জানা যায় না। তবে জয়পুরের প্রধান সেনাপতি সর্দার হরি সিংহ লাডকানীর গৃহে তিনি কয়েকদিন ধর্মালোচনা করেন বলে জানা যায়। তখন ঐ গৃহেই তিনি ছিলেন বলে অনুমিত হয়। জয়পুরে থাকাকালীন স্বামীজী একজন সুপণ্ডিত বৈয়াকরণের কাছে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং পতঞ্জলি-কৃত ভাষ্য আয়ত্ত করেন। এর পর স্বামীজী দ্বিতীয়বার জয়পুরে আসেন খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে ২৫ জুলাই ১৮৯১। থাকেন ২ আগস্ট পর্যন্ত জয়পুরের খেতড়ি-ভবনে। শিকাগো-যাত্রার আগে স্বামীজী আরও দুবার জয়পুরে আসেন—১৮৯২-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি এবং মে-এর মাঝামাঝি।—যুগ্ম সম্পাদক

বাঙালীরা এর আগে তাঁর কোন খবর জানতেন না, কিংবা রাখতেন না। খেতড়ি-রাজার ভবনে ঐ বাঙালী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব সম্ভবতঃ তাঁদের কৌতূহলী করেছিল।

১৩১৫ সালে একদিন বাবা-পিতামহদের খাবার সময় আমরা ছোটরা ভূত দেখা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছি, সেদিন বাবার কাছে প্রথম শুনি স্বামীজীর কথা; তিনি কোন কোন সময়ে অশরীরীর দেখা পেয়েছিলেন। ছোটবেলায় এথেকে কৌতূহল মিটে গিয়েছিল, স্বামীজীর আর কোন কথাই শুনতে আগ্রহ করিনি। শুনিওনি। শুনলে হয়তো কিছু 'অমৃত কথা' শুনতে পেতাম।

কিন্তু কে জানে সময় ও সুকৃতির গতি।

এতকাল পরে মাকে জিজ্ঞাসা করিঃ "মা, তুমি কি স্বামীজীকে দেখেছিলে?" মায়ের অনেক বয়স, থাকেন প্রবাসে জয়পুরে। বহুদিন কাছাকাছি ছিলাম। আশ্চর্য! তখন এই প্রশ্ন মনে ওঠেনি। আসলে এই হলো সুকৃতি আর অকৃতির রহস্য। সৎকথাও সুকৃতি না থাকলে শোনা যায় না।

তবু মায়ের কাছেই শুনিঃ মায়ের তখন ষোল-সতেরো বছর বয়স। সে-সময়ে সেকালের মেয়েদের কোনখানেই বেরনোর প্রথা ছিল না।

বাড়ির বৈঠকখানা তখন চালাঘরে, সেই ঘরেই স্বামীজী বসেছিলেন।

মেয়েরা—মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, অন্য আত্মীয়েরা সকলে পাশের একটি ঘরে চিকের আড়ালে বসে ঐ জগদ্বিখ্যাত সন্ন্যাসীকে দর্শন করেছিলেন। আর শুনেছিলেন কয়েকটি গান। সেই গানের কথাই তিনি বললেন। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব-চরিতের' বিখ্যাত গান—

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই!
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবিগো তাই। ইত্যাদি।

প্রকাণ্ড গানটি। স্বামীজীর কণ্ঠও যেমন, ভাবও তেমনি—কে না জানে! এবং শ্রোতা ও শ্রোত্রীরাও জীবনে সে-গান ও সেদিনের কথা ভুললেন না। তখন স্বামীজী 'বিবেকানন্দ'ও হননি। মেঘাবৃত সূর্য অনাবৃত হয়নি তখনো।

কে জানত ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মতো ঐ সন্ন্যাসীর দীপ্তি আর মহিমা? যখন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এক মুহূর্তে জগদ্বাসী আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে চাইল, সেদিন বোধহয় ঐ প্রবাসী মানুষগুলি ও অন্তঃপুরবাসিনীরাও পরম বিস্ময়ে তাঁর জয়পুর-বাসের ঐ ক-দিনের কথা মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিলেন। গান আরও দু-তিনটি হয়েছিল ঃ

এলো কৃষ্ণ এলো ওই, বাজলো বাঁশরী
রাধা-অভিলাষী, 'রাধা' বলে বাঁশী
বাঁশী ডাকে তোরে, ওঠ লো কিশোরী।

এটিও গিরিশচন্দ্রের—চৈতন্যলীলার গান।

গাইলেন আর একটি গান—

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥

আর কোন কথা বলবার লোক আজ আর কাছাকাছি বেঁচে নেই।

সহসা শুনলাম, এক পিসিমা বললেন, তিনি তাঁর জননীর কাছে (আমার পিতামহীর কাছে) শুনেছেন। তখন আমাদের বাড়ি হয়নি। বৈঠক-খানা একটি 'চারচালা'র মতো ঘরে ছিল। গভীর রাত্রে সন্ন্যাসী গাইছেন সেইখানে বসে—

'নিবিড় আঁধার মাঝে মা তোর চমকে অরূপ-রাশি।'

ভাবি, সে-সময়ে তিনি কি ঐ বাড়িতে দু-একদিন ছিলেন? এতদিন পরে সেকথা আমার মাকে জিজ্ঞাসা করি। মা বললেন, তিন-চারদিন তিনি ঐ বাড়িতে ছিলেন; এবং সেই গৃহস্বামীর নাম ৺সংসারচন্দ্র সেন। মায়েরা স্বামীজীকে চোখে দেখেছিলেন, কিন্তু বাইরে আসেননি সেকালের প্রথামত।

তবু মুগ্ধ বিস্ময়ে আনন্দে শুনি, তবু তো দেখেছিলেন। আমরা যে-দেখায় বঞ্চিত হয়েছি, সে-দর্শন তাঁদের হয়েছিল। জন্মালে বা বেঁচে থাকলেই যে মানুষের মহাপুরুষ-দর্শন হয়, তাও তো হয় না দেখি। কেননা শ্রীশ্রীমাও তো দীর্ঘদিন এই ঘরের পাশে কলকাতাতেই উদ্বোধন লেনে কতদিন বাস করে গেছেন। তাঁকে দর্শন করাও তো হতে পারত।* □

* উদ্বোধন, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৌষ, ১৩৭০, পৃঃ ২৬৪-২৬৬

স্মৃতিকথা

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পদপ্রান্তে

প্রতিভা বসু

ইংরেজী ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, বাঙলা ১৩৩২ সালের ১০ বৈশাখ বারো বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়। স্বামী সাধনচন্দ্র বসুর বয়স তখন একুশ বছর। আমার পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণাশ্রিত। বিয়ের আগে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হতো। তখনকার প্রশান্ত-গম্ভীর দক্ষিণেশ্বরের রূপ আজ বহুলোকের কোলাহলে যেন অনেকটা হারিয়ে গেছে। ঠাকুরের ঘরখানি, মায়ের নহবত, ফুলের বাগান, পাখির ডাক, সুরধুনী গঙ্গা, মহাপবিত্র পঞ্চবটী—সব মিলিয়ে দক্ষিণেশ্বর আমার শিশুমনকে বিস্ময়ে অভিভূত করত।

যে-সময়ের কথা বলছি সে-সময় ঠাকুরের ঘরখানিতে কালো সিমেন্টের মেঝে ছিল। ঘরে ছিল ঠাকুরের দুটি তক্তপোশ—একটি বড় ও অন্যটি ছোট। দুখানি তক্তপোশে ধবধবে সাদা বিছানা পাতা থাকত এবং বিছানার ওপর থাকতো ঠাকুরের দুটি প্রতিকৃতি। দেওয়ালে স্বামীজীর নানা রকমের ছবি একখানি বড় ফ্রেমে টাঙানো থাকত। মাতা-ঠাকুরানীর ছবিও ছিল। বাবা-মার সঙ্গে বহুবার আসা এই অমৃততীর্থের হারানো দিনের স্মৃতি-সৌরভটুকু আজও মনের মণিকোঠায় অম্লান।

পঞ্চবটীর বাঁধানো স্থানটি আমি শিশুকালে ভাঙাচোরা অবস্থায় দেখেছি। দু-এক ধাপ সিঁড়ি —তাও ভাঙা অবস্থায়। এদিক-ওদিক বড় বড় ফাটল। মনে হতো শ্রীশ্রীঠাকুরের পদরজঃ যেন তখনো পড়ে আছে ওখানে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধন-ভজনের রেশ তখনো যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিয়ের পর স্বামীর কাছেও শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমায়ের অনেক কথাই শুনেছি। সম্ভবতঃ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ আমার স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বড় প্রতিকৃতি এনে ঠাকুরঘরের বেদির ওপর লাল শালুতে সুন্দর করে সাজিয়ে বসিয়েছিলেন। সে-ছবি আজও আমাদের ঠাকুরঘরে তেমনটি আছে।

আমার স্বামীর সহপাঠী বন্ধু, পরবর্তী কালে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী সংশুদ্ধানন্দ মহারাজ (ভবতারণ মহারাজ) তাঁকে একদিন বললেন: "এলাহাবাদ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য মস্তবড় ব্রহ্মজ্ঞ এক সন্ন্যাসী বেলুড় মঠে এসেছেন। তাঁকে ধর, তাহলে দীক্ষা হয়ে যাবে। বাইরে তিনি যেমনটি কঠোর ও গম্ভীর ভিতরে ততই নরম ও কোমল।" ঘটনাটি ১৯৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দের। তারপরেই আমার স্বামীর দীক্ষা হয় শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে। দুঃখের বিষয়, সেবার কোন কারণে আমার দীক্ষা হলো না। পরে অবশ্য স্বামীর চেষ্টায় মনে হয় ১৯৩৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দে শারদীয়া পূজার আগে আমি বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের চরণাশ্রিত হবার সৌভাগ্যলাভ করি।

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি আজও আমার কাছে চির-উজ্জ্বল হয়ে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অপার কৃপায় এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় তাঁদের শ্রীচরণে স্থান পেলাম। দীক্ষার দিন কিছু ফল, ফুল ও সামান্য প্রণামীর টাকা নিয়ে যাই। মহারাজজী আমাকে একাকী মন্ত্র দেন। একটি চেয়ারে তিনি বসেছিলেন। আমি একটি আসনে বসি। উনি বেশ স্পষ্ট করে মন্ত্র এবং অন্যান্য করণীয় সব বলে দিলেন। একটি বড় মন্ত্র ও একটি ছোট মন্ত্র। একটি কাগজে মন্ত্র-দুটি নিজহাতে লিখেও দিলেন এবং করজপ করার প্রণালীও দেখিয়ে দিলেন। একটি ছোট রুদ্রাক্ষের মালা নিজে শোধন করে আমার হাতে দিয়ে মালাজপের বিধিও বলে দিলেন। দীক্ষার সময় যে-ফুলগুলি তাঁর চরণে নিবেদন করি, তার সবগুলি প্রণাম করে তুলে এনে বাড়িতে রেখে দিই। স্বামীজী

মহারাজের ঘরের পশ্চিমদিকের ঘরে (যে-ঘরে সূর্য মহারাজ—স্বামী নির্বাণানন্দজী পরে থাকতেন) আমার দীক্ষা হয়েছিল।

শ্রীশ্রীগুরুদেব যখন বেলুড় মঠে আসতেন আমার স্বামী তখনই ছুটে যেতেন তাঁর দর্শনমানসে। তাঁর পুণ্যসান্নিধ্যলাভে তিনি ধন্য হতেন। মহারাজের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলে তিনি আমাদের গাড়িতে যেতেন। স্বামীর আন্তরিক প্রার্থনায় তিনি এই কৃপাটুকু আমাদের করেছেন।

একদিন আমার স্বামী মঠে গেছেন মহারাজজীকে দর্শন করতে। তিনি তখন দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর মহারাজ উঠলেন। অপেক্ষমান ভক্তদের ডাক পড়ল। সকলে চরণধূলি মাথায় নিয়ে পদপ্রান্তে বসলেন। শিষ্যদের সঙ্গে কথা শুরু হলো। বেশি ভক্ত জমায়েত হলে একইসঙ্গে কথা হতো। অল্প ভক্ত থাকলে একা একাও আলাপ হতে পারত। সেদিন ভক্তের ভিড় বেশি না থাকায় আমার স্বামী প্রণাম করে বললেন: "বাবা, আপনি শুয়েছিলেন, তাই বাইরে বসেছিলাম।" উত্তরে মহারাজজী বললেন: "হ্যাঁ, আমি জানি আপনি এসেছেন।" (বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ সকলকে 'আপনি' সম্বোধন করতেন।) আমার স্বামীর মনে বিস্ময় জাগল, কেমন করে গুরুদেব জানতে পারলেন তিনি এসেছেন বলে। পরে তাঁর মনে হয়েছিল, মহারাজজীর মতো উচ্চস্তরের মহাপুরুষের কাছে কোন কিছুই অজানা থাকে না।

সেবছর দুর্গাপূজোর সময় মহারাজ মঠে এসেছেন। মহাষ্টমীর দিন মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এবং মহারাজকে প্রণাম করতে মঠে গেলাম। মঠে অনেক ভক্তের ভিড়। প্রণাম নিবেদনের পর মেঝেতে বসে আছি। সকলের মনেই তাঁর উপদেশ ও বাণী শোনার আগ্রহ। তিনি সকলকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। জপ-ধ্যান ঠিকমত হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেন। আমার কাছে জপ-ধ্যানের বিষয় জানতে চাইলে আমি বললাম: "এক-একদিন বেশ মনোসংযোগ হয়, মনটা স্থির হয়ে থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই মনটা চঞ্চল হয়ে যায়। জপ করতে গিয়ে সংসারের নানা চিন্তা-ভাবনা এসে জপ থেকে মনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। শুনে মহারাজ বললেন: "এরকম মনের চাঞ্চল্য আসবে। সেজন্য মন খারাপ করবেন না। নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন জপ করবেন। চেষ্টা করতে করতেই মন ক্রমশঃ শান্ত হবে।"

আর একদিনের কথা। মহারাজ মঠে এসেছেন। মঠে গেছি মহারাজজীকে দর্শন করতে। সেদিন উপস্থিত ভক্তসংখ্যা অল্প থাকায় একাই তাঁর ঘরে যাই। তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে বসে 'কদিন থাকবেন', 'কেমন আছেন' ইত্যাদি ছোটখাটো দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করার পর ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর অমৃতসঙ্গের স্মৃতি এবং ঠাকুরের বিষয়ে কিছু বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি মহারাজজী সহাস্যে বললেন: "আমি একদিন দক্ষিণেশ্বরে গেছি। আমায় দেখে ঠাকুর বললেন, 'ওহে তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি কুস্তি লড়ো। এসো তো দেখি তুমি কেমন পালোয়ান'।" হাসিমুখে মহারাজ বললেন: "কুস্তি লড়তে গিয়ে বুড়োকে তো দিয়ে-ছিলাম পটকে।" তারপরই গম্ভীর মুখে বললেন: "কুস্তি লড়তে লড়তে আমার কি যে হলো বুঝতে পারলাম না। শেষে নিজেই পটকে গেলাম। হঠাৎ যেন আমার শরীরের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট বয়ে গেল। আমি সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে-ছিলাম।" একথা বলে মহারাজজী বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন: "আজ আসুন।" আমিও কিছু সময় সম্বিৎ হারিয়ে স্তব্ধভাবে বসে থেকে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে চলে এলাম ঘর থেকে। সেদিনের ঘটনা আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান। দেখেছিলাম এই মহাযোগীর মধ্যে পূর্ণভক্তির কী অপূর্ব সামঞ্জস্য। সেই দিব্য ঘটনার বর্ণনাকালে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপার্ষদ বিজ্ঞানানন্দজী মনের অতীত বিজ্ঞান-ভূমিতে অবগাহন করেছিলেন।

খুব বেশিদিন মহারাজের সঙ্গলাভ আমার জীবনে হয়নি। যতটুকু হয়েছে তাতে আমার পিতার স্নেহময় স্পর্শই আমি অনুভব করেছি। একটি দিনের কথা মনে পড়ে। সেদিনও একান্তে চরণদর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। সেদিন আমি একটি প্রার্থনা তাঁর চরণে নিবেদন করি। কিছু

গঙ্গামাটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর চরণে ঐ মাটি স্পর্শ করিয়ে আমার ঠাকুরঘরে রেখে দেব—এই আশায়। চরণামৃত করে সেটি সংসারে সকলের মুখে দেব—এই বাসনা। মহারাজজীকে বললাম মনের কথাটা। তিনি বললেন: "আপনি পায়ে মাটি ছোঁয়াবেন কি করে? পায়ে যে মোজা আছে।" আমি বললাম: "বাবা, মোজা খুলে মাটি ছুঁইয়ে নিয়ে মোজা আবার পরিয়ে দেব।" উনি বললেন: "বেশ তো, তাহলে মাটি ছুঁইয়ে নিন।" আমি মোজা খুলে ঐ মাটি শ্রীচরণে বুলিয়ে নিয়ে আবার মোজা পরিয়ে দিলাম। তিনি যে আমার এই প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন তা মনে হলে আজও হৃদয়ে পরম শান্তি আর আনন্দ পাই।

আরেকবার মঠে স্বামীজী মহারাজের পশ্চিম-দিকের ঘরটিতে মহারাজ চেয়ারে বসে আছেন। চারপাশে সেদিন অনেক ভক্ত। গুরুদেব উত্তরাস্য হয়ে বসেছেন। তাঁর বাঁদিকে পুরুষভক্তরা এবং ডানদিকে স্ত্রীভক্তেরা বসে আছেন। মহারাজজী একজন পুরুষভক্তকে বললেন: "দিন ও রাত্রি কাকে বলে জানেন? দিন হচ্ছে জ্ঞান, রাত্রি মানে অন্ধকার—অজ্ঞান। মানুষ জ্ঞান দিয়ে কাজ করলে ভাল হবে, অজ্ঞান দিয়ে কাজ করলে তা ভাল হয় না।"

আরেকবার বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে গিয়েছি। স্বামী, পুত্রকন্যারা সঙ্গে। মহারাজজী মঠে এসেছেন, ছেলেমেয়েরা তাঁকে প্রণাম করে একটু দূরে দাঁড়ালো। গুরুদেব ওদের নাম জানতে চাইলেন। তারপর ডানহাতটি মুঠো করে হাসিমুখে বললেন: "তোমরা কি নেবে?" ওদের বয়স চার-পাঁচ বছরের মধ্যে। ওরা বলল: "গাড়ি নেব।" মহারাজজী বললেন: "ধর, ধর।" ওরা এগিয়ে এসে হাত বাড়াতেই উনি বললেন: "ধরতে পারলে না তো, কোথায় উড়ে গেল।" সেদিন বাচ্চাদের সঙ্গে তিনি প্রফুল্ল মনে অনেক আহ্লাদ করলেন। ঘরে সেবক ব্রহ্মচারী দুজন ছিলেন। একজনকে সন্দেশ এনে ছোটদের দিতে বললেন। সন্দেশ দিয়ে সেবক ব্রহ্মচারী কাঁচের গ্লাসে জল দিলেন। মহারাজজী বললেন: "বাচ্চাদের কখনো কাঁচের গ্লাসে জল দেবে না, ভেঙে ফেলতে পারে।"

আমার স্বামী অল্পবয়সেই ব্লাডপ্রেসারে বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেজন্য আমার শ্বশুরমশায় ও শাশুড়ী-মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকতেন। তাঁরা গুরুদেবের কাছে গিয়ে একদিন আমার স্বামীর অসুখের কথা জানিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। তিনি মনোযোগ দিয়ে ওঁদের সব কথা শুনে পরম স্নেহভরে বললেন: "আমার আশীর্বাদ সততই আছে। করুণাময় ঠাকুর আপনাদের ছেলেকে রক্ষা করুন।" উপদেশ দিলেন: "সাধনবাবুকে দুধভাত খেতে বলবেন। নুন খেতে মানা করবেন।" বলা বাহুল্য, আমার স্বামী মহারাজের সেই উপদেশ মেনেছিলেন এবং সে-যাত্রায় কঠিন অসুখ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। গুরুর আশীর্বাদ কখনো বৃথা হয় না—এ অমোঘ সত্য আমার জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখেছিলাম ও উপলব্ধি করেছিলাম।

স্বামীর অসুস্থতাকালীন অন্য একদিন মহারাজ-জীকে সে-সময়কার আমার মানসিক অবস্থার কথা বলেছিলাম। পুত্রকন্যারা ছোট, সংসারের নানা ভাবনায় জপ-ধ্যান সাধ্যমত করতে পারি না। সেদিন আমার মনোব্যথা শুনে পরম স্নেহমাখা স্বরে তিনি বললেন: "দেখুন, আপনার সুবিধামত জপ-ধ্যান করবেন। যেদিন সুযোগ-সুবিধা না পাবেন সেদিন শুধুমাত্র ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম নিবেদন করবেন। তাহলেই হবে।"

মহারাজজীর কাছে একবার স্বামীজীর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন: "স্বামী-জীকে দেখলে একটু ভয় পেতাম। তবে তিনি যখন আমার সঙ্গে কথা বলতেন, তখন সহজভাবে কথা বলতাম। একদিন মঠে বড় মন্দিরের সামনের মাঠে অর্থাৎ পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে সন্ধ্যার সময় স্বামীজী ও আমি বেড়াচ্ছিলাম। স্বামীজী বর্তমান মন্দিরের মাঠটি দেখিয়ে বললেন: "দ্যাখো পেসন, এই জায়গাটায় নতুন মন্দির করতে হবে। তখন অবশ্য আমি থাকব না। তবে ওপর থেকে দেখব।"

১৯৩৭-এর ডিসেম্বর মাসে আমরা গিরিডিতে ছিলাম। আমার দ্বিতীয় পুত্র কঠিন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শে কয়েকমাস

গিরিডিতে চলে যাই। ওখানে হরিদাস মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। তাঁরা সস্ত্রীক শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তাঁদের কাছে জানতে পারলাম, বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

আমার স্বামীকে মহারাজ কিছুদিন আগে বলেছিলেনঃ "আমার একটি রঙ্গীন ছবি করিয়ে দেবেন।" তাঁর যেসব ছবি প্রচলিত রয়েছে সেসব ছবি আমার স্বামী তাঁর অনুমতি নিয়ে আলোক-চিত্রী হরিচরণ পালের মাধ্যমে তুলেছিলেন। কয়েকটি ভঙ্গিতে পূজনীয় মহারাজের ফটো তোলা হয়েছিল। সোজাভাবে মাটিতে বসা একটি, অন্য একটি পাশ ফিরে বসা। এইরকম বসা ছবির সামনে একটি কমণ্ডলু রাখা ছিল। সেটি পিতল বা কাঁসার নয়। সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত কাঠের কমণ্ডলু। আরেকটি ফটো তোলা হয় স্বামীজী যে-বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ির গঙ্গার দিকে যে-বারান্দা আছে তার বেঞ্চিতে—মহারাজ বসে আছেন। তাঁর রঙিন ছবি এযাবৎকাল হয়ে ওঠেনি। আমার স্বামী ব্যস্ত হয়ে তৎপরতার সঙ্গে হরিচরণ পালের সঙ্গে যোগাযোগ করে রঙিন ছবি করালেন এবং আমার দেবরকে দিয়ে সেটি শীঘ্র গিরিডিতে আনানোর ব্যবস্থা করলেন। সাত-আটদিনের মধ্যে সেটি গিরিডিতে এসে পেঁছাল। তারপর আমরা অর্থাৎ স্বামী, দেবর, আমি ও বাড়ির পুরনো কর্মচারী মতিকে নিয়ে গিরিডি থেকে হাজারিবাগ রোড স্টেশনে এসে রাত্রিতে তুফান এক্সপ্রেসে মহা-রাজজীর দর্শনমানসে এলাহাবাদ রওনা হলাম।

এলাহাবাদ পেঁছে জিনিসপত্র 'ফ্রেন্ডস বোর্ডিং' নামে এক হোটেলে রেখে টাঙায় করে কিছুক্ষণের মধ্যে মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পথে রওনা দিলাম। মহারাজকে দর্শন করে তাঁর রঙ্গীন ছবি-খানি হাতে দেব—এই আনন্দে চলেছি। রাস্তার ধারেই একতলা আশ্রমবাড়ি। দু-পাশে রোয়াক—মাঝখানের রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে মহারাজের ঘরের দরজা পর্যন্ত। সামনের দরজায় পর্দা ঝুলছে। দরজায় কয়েকটি হাল্কা আঘাত দিতে সম্ভবতঃ বেণী বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কোথা থেকে এসেছি, কি দরকার ইত্যাদি। মহারাজের অসুস্থতার খবর পেয়ে হাওড়া থেকে এসেছি বলাতে বেণী ভিতরে নিয়ে এল। ঘরের ডানদিকে গুরুদেব একটি চেয়ারে বসে আছেন, সামনের টেবিলে কিছু বই ও ফাউন্টেন পেন রাখা আছে। শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করে পদপ্রান্তে বসলাম।

অসুস্থতার জন্য মহারাজজীর শরীর অনেক রোগা হয়েছে। চোখের কোলটিও বসা-বসা। শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে মন ভারাক্রান্ত হলো। আমাদের দেখে কিন্তু মহারাজজী উৎফুল্ল হলেন। দীর্ঘদিন পরে প্রিয়জন দেখলে মানুষ যেমন আনন্দ প্রকাশ করে মহারাজজী স্নেহসিঞ্চিত হৃদয়ে আমাদের দেখে তেমনি আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। এই অহেতুকী কৃপা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, এটি অনুভব করার বস্তু। পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান তিনি। সৌভাগ্যক্রমে সেই সন্তানের শ্রীচরণ স্পর্শ করতে পেরেছি। ধন্য আমি। তাঁর সস্নেহ সম্ভাষণে আমাদের মন আনন্দে ভরে গেল। গুরুদেব আমার স্বামীকে দেখে খুব খুশি। স্বামীর অতিরিক্ত রক্তচাপ ও অসুস্থ শরীরের কথা তিনি মনে রেখেছেন। বললেনঃ "কেমন আছেন এখন? দেখে তো আপনাকে ভালই মনে হচ্ছে। আপনি ভালই থাকুন।" আমাকে দেখে বললেনঃ "মা তো দেখছি ভালই আছেন, চেহারা বেশ মোটাসোটা হয়েছে।"

গিরিডিতে আসা, হরিদাস মিত্রের কাছে মহা-রাজের অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া ইত্যাদি পূর্বাপর সব কথা আমার স্বামী গুরুদেবকে নিবেদন করলেন। প্রসঙ্গতঃ মহারাজের একটি রঙীন ছবি, যেটি দেওয়ার দুর্বার আকর্ষণে আমরা এসেছি—সেটিও তাঁকে বলা হলো। ভয় ছিল, ছবিটি মহারাজজীর পছন্দ হবে কিনা। গুরুদেবের কাছে ছবিটি দিয়ে আমার স্বামী বললেনঃ "দেখুন বাবা, ছবিখানি আপনার পছন্দ কিনা।" ছবিটি দেখে শিশুর মতো সরল হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠল। বললেনঃ "বাঃ! বাঃ! ভারী সুন্দর হয়েছে। খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু ট্রেনে কেমন করে আনলেন? খুব সাবধানেই এনেছেন, একটুও দাগ লাগেনি।"

আমরা এলাহাবাদ থাকার সময়ই একদিন বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে গাড়ি নিয়ে এলেন, যতদূর

মনে হয়, স্বামী সত্যাত্মানন্দ মহারাজ। আগামী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ওখানে কোন একটা বাড়ি বা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকল্পে বিজ্ঞানানন্দজীকে তিনি নিয়ে যাবেন শুভ উদ্বোধনের জন্য। যাত্রার দিন মহারাজ বেণীকে নিয়ে বেশ কিছু রঙ্গ-তামাশা করছিলেন। বললেন ঃ "বাবা বেণী, ভাল ছড়ি তুলে রাখো, পুরনো ছড়ি লে চল। ছড়ি ভক্তলোগ মুঝে দেঙ্গে।" শিশুর মতো ছড়ি-লাঠি হাতে নিয়ে তিনি আনন্দ করছিলেন। মহারাজ কাশী থেকে এলাহাবাদে ফিরলে আবার তাঁকে দর্শন করে বাড়ি ফিরব—এই আশায় কদিন আমরা এলাহাবাদে থেকে গেলাম।

তখন তিন সিটের ছোট এরোপ্লেন যমুনা নদীর ওপারে ওঠা-নামা করত। এলাহাবাদ শহর দেখিয়ে দেওয়া হতো এই প্লেনে। সামনে একটি এবং পিছনে দুটি সিট। স্বামী, দেবর ও আমি একদিন ঐ প্লেনে চাপি। সেই আমার প্রথম ও শেষ প্লেনে চাপা। একদিন সঙ্গমে স্নান এবং দেবদেবী দর্শন করাও হয়েছিল। অতীত দিনের এসব মধুময় স্মৃতিকথা আজও মনকে আপ্লুত করে।

দু-চারদিন বারাণসীতে থেকেই মহারাজ এলাহাবাদ ফিরে এলেন। আসার দিন ক্লান্ত থাকায় পরদিন সকালে তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। দেখলাম, গুরুদেব তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে আছেন। সামনের টেবিলে কাগজ, পেন, পেন্সিল। প্রণাম করে দাঁড়াতেই বললেন ঃ "আপনারা ফিরে যাননি? আছেন এখনো?" আমার স্বামী বললেন ঃ "আপনি ফিরে এলে দর্শন করে বাড়ি ফিরব—এই আশায় কদিন থেকে গেলাম।" আমি বললাম ঃ "আমরা সংসারী মানুষ, এমন পুণ্য সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। আবার কতদিন পরে দর্শন হবে শ্রীঠাকুরই জানেন।" অল্প কিছু কথাও সেদিন হয়েছিল—প্লেনে চড়া, পুণ্যস্নান, কেল্লাদর্শন ইত্যাদি। মহারাজজীর জন্য আমার স্বামী কিছু কচুরী নিয়ে যান। তিনি তাথেকে অল্প মুখে দেন। কোন্ দোকান থেকে খাবার আনলে তাঁর ভাল লাগবে সেকথাও তিনি বলে দিলেন। আমার স্বামী সেই দোকান থেকে খাবার এনে এরপর তাঁকে দিয়েছিলেন। তাঁর অহেতুক কৃপায় কয়েকদিন তিনি আমাদের দেওয়া সেসব জিনিস গ্রহণ করেছিলেন।

বিকালে পুনরায় আসব বলায় মহারাজজী বললেন ঃ "সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আসবেন।" দুঃখের কথা, সেদিন পেঁছাতে আমাদের একটু দেরি হয়ে যায়। শীতকাল, বেশ ঠাণ্ডা। মঠে যখন পেঁছালাম তখন ছটা বেজে গেছে। ভিতরে যাবার সময় বেণী বলল ঃ "এখন বাবার সঙ্গে কোন কথা হবে না। তিনি এখন ধ্যানে বসেছেন। আপনারা আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে প্রণাম করে চলে আসুন।" ঘরে গিয়ে দেখলাম, মহারাজজী ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। পায়ে মোজা, হাতে উলের প্লাভস, গায়ে লম্বা কোট, মাথায় টুপি। পায়ের কাছে একটা উঁচু গোল বালিশ মাথার কাছে একটি ছোট চিমনিতে মৃদু আলো জ্বলছে। শান্ত পবিত্র স্থান। দিব্য মনোহর মূর্তি। গুরুদেবের এই মূর্তিখানি আজও আমার মানসপটে তেমনি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দর্শন হলেও আলাপ হলো না বলে পরদিন সকালে আবার আশ্রমে আসা হলো। আমরা প্রণাম করে চরণপ্রান্তে বসলাম। কথাপ্রসঙ্গে হরিদ্বারে আগামী কুম্ভমেলার কথা উঠল। আমরা কুম্ভযোগে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। মহারাজ বললেন ঃ "বেশ তো ঘুরে আসুন। এসব তীর্থ দর্শন করা ভাল। স্থান পরিবর্তনে মানুষের মন প্রফুল্ল হয়।" স্বামীর শরীর ভাল নয় বলে তাঁর যাওয়া সমীচীন কিনা সেকথা মহারাজের কাছে নিবেদন করলাম। শুনে মহারাজ বললেন ঃ "ঠাকুর-মার নাম করে বেড়িয়ে পড়ুন। কোন ভয় নেই।" তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে মার্চ মাসে দোলপূর্ণিমার দিন কুম্ভস্নানের উদ্দেশ্যে আমরা হরিদ্বার-যাত্রা করলাম। পরবর্তী চৈত্রসংক্রান্তির মহাযোগে আমরা খুব ভালভাবে পুণ্যস্নান সমাপন করেছিলাম।

সেবার মহারাজজী বারাণসী থেকে ফেরার দু-তিন দিনের মধ্যে কিছু দূষিত খাবার খেয়ে আমার দেবরের কঠিন পেটের অসুখ হয়। স্বামীর ইচ্ছা, বারাণসীতে এসে আশ্রমের হাসপাতালে চিকিৎসা করাবেন। তিনি মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁর অনুমতি

ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। মহারাজ সে-প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। সেদিন আমার স্বামী মহারাজের একটি ফটো তুলতে চাইলেন। উনি আনন্দের সঙ্গে সম্মত হয়ে বললেন: "বেশ তো, এখানেই তুলে নিন।" বারান্দার একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় ও সামনের টেবিলে কিছু লেখার সাজসরঞ্জাম নিয়ে তিনি তখন বসেছিলেন। ফটো সেখানেই তোলা হয়েছিল। যাত্রার দিন আমারও সাধ ছিল তাঁর চরণপ্রান্তে বসে একটি ছবি নেব। দেবরের অসুস্থতা হেতু আমার সেদিন আশ্রমে যাওয়া হয়নি। ফলে সেই সৌভাগ্য আর হয়নি। বিদেশে দেবরের অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য আমরা দুজনেই চিন্তিত ছিলাম। গুরুদেব আশীর্বাদ করেছিলেন: "ঠাকুর-মা আছেন, আপনাদের কোন চিন্তা নেই। ঠাকুর-মাকে ধরে থাকুন, তাঁরা সতত আপনাদের দেখবেন।" তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, ব্রহ্মজ্ঞানী এই জীবন্ত দেবতার দর্শন সেবারই শেষ।

জীবনসন্ধ্যায় যখন ভূমাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের স্মৃতিতর্পণ করতে বসেছি তখন আনন্দে মন কানায় কানায় ভরে উঠছে। দু-চোখ জলে ভরে যায়। সেদিনের মতো এমন মধুর করে আর তো জীবনকে পাওয়ার জো নেই। তবে জীবন আমার কৃতার্থ যে, নিজের সম্বন্ধে, নিজের জীবন সম্বন্ধে 'বোধ' জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ আমার শ্রীশ্রীগুরুদেব।* □

* **লেখাটি পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের প্রেরণায় লিখিত।**

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির (মাঝে)। পিছনে—বিষ্ণুমন্দির/গোবিন্দজীর মন্দির/রাধাকান্ত-মন্দির। সামনে—কালীমন্দিরের নাটমন্দির; এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মথুরবাবুকে অনুরোধ করে পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় তিনি বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সমকালীন অগ্রগণ্য সাধক ও পণ্ডিতদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। বিচারসভায় সমবেত সাধক ও পণ্ডিতবর্গ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দিরের (দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছবি অবশ্য প্রচ্ছদে নেই।) অবস্থান বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু হিন্দুদের দিক থেকেই নয়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের দিক থেকেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি তাৎপর্য রয়েছে। মন্দিরের জমির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, বাকি অংশের অনেকটা জুড়ে ছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী সাহেবের পীরের দরগা। এই যোগাযোগ যেন দৈবনির্দিষ্ট। কারণ, এই ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে যুগাবতার মহাসমন্বয়ের উদার বাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। এই বাণীই আজ শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে। দেশ ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মত ও পথের অসহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে এই বক্তব্য আমরা তুলে ধরতে চাইছি।—**যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন**

বিশেষ রচনা

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও ধর্মমহাসম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্ব

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : ভাদ্র ১৩৯৯ সংখ্যার পর]

স্বামীজীর পাশ্চাত্যযাত্রার পশ্চাতে যে 'দৈবশক্তি' কার্য করেছিল, তা স্বামীজী স্বয়ং জানতেন। ভারত-পরিক্রমাকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে নানান জনের কাছে তা ব্যক্ত করেছিলেন। পরবর্তী কালে স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন : "আমাকে কাজ করতে হবে, এই ধারণা এই সময়ে যতটা অভিভূত করে, সারা জীবনে আর কখনো তা করেনি। মনে হতো, কে যেন আমাকে জোর করে এক গুহা হতে আর এক গুহায় জীবনযাপনে বিরত করে নিচে সমতল প্রদেশে বিচরণ করবার জন্য ফেলে দিল।"[১৬] মীরাটে (নভেম্বর, ১৮৯০) সঙ্গী গুরুভাইদের স্বামীজী বলেছিলেন : "আমার জীবনব্রত স্থির হইয়া গিয়াছে।"[১৭] পোরবন্দরে (নভেম্বর, ১৮৯১) স্বামীজীর সঙ্গে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সাক্ষাৎ হয়। সেসময়ে ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে স্বামীজী বলেছিলেন : "ঠাকুর যে বলতেন, এর ভেতর সব শক্তি আছে ; ইচ্ছা করলে এ জগৎ মাতাতে পারে, একথা এখন কিছু বুঝতে পারছি।"[১৮] মহাবালেশ্বরে (মে, ১৮৯২) লিমডির ঠাকুরসাহেব যশোবন্ত সিংহের কাছে স্বামীজীর স্বীকারোক্তি : "...আমাকে একটা ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে।"[১৯] খাণ্ডোয়ায় (আগস্ট, ১৮৯২) সংস্কৃতজ্ঞ উকিল পিয়ারীলাল গাঙ্গুলী স্বামীজীর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বলেছিলেন : "স্বামীজীকে দেখেই মনে হয়, ইনি কালে একজন বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি হবেন।" একথা স্বামীজীকে জানানো হলে তাঁর মুখমণ্ডলে এক দিব্যজ্যোতি খেলে গেল এবং তিনি বিনম্র-পূর্বক বলেছিলেন : "আমি নিজে ইহার কিছুই জানি না, তবে আমার গুরুদেব ঠিক এই কথাই বলতেন, যদিও আরও জোরালো ভাষায়।"[২০] বোম্বাইয়ে স্বামী অভেদানন্দকে স্বামীজী বলেছিলেন : "কালী, আমার ভেতর এতটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।"[২১] স্বামীজীর এই শক্তি, এই ব্রত তাঁকে প্রদান করেছিল আর্ষদৃষ্টি, তাঁর অন্তরে জাগ্রত করেছিল ভারত-পরিচয়ের মর্মবোধ, তাঁর হৃদয়-গুহায় অনুরণিত হয়েছিল ভারতাত্মার মর্মবীণার ধ্বনি।

॥ ২ ॥

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর উত্তর কলকাতায় বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঐ বছরের ১৯ অক্টোবর। তার কিছুকাল পরেই স্বামীজীর পরিক্রমা-পর্ব আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল প্রধানতঃ কিছু তীর্থগমন এবং কিছুকাল নির্জনবাসের পর্ব। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দকে নিয়ে স্বামীজী তাঁর দীর্ঘ ভারত-পরিক্রমায় বহির্গত হয়েছিলেন। পরিক্রমাকালে মাঝে মাঝে অন্যান্য গুরুভাইরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু বছরখানেক পর তিনি বেরিয়ে পড়েন একাকী—নিঃসঙ্গ পরিক্রমায়। বাস্তবিক এই পরিক্রমা ছিল সর্বার্থেই একটি 'ঐতিহাসিক' পরিক্রমা। অবশ্য ১৮৮৮ থেকে মে, ১৮৯৩ স্বামীজীর সুদীর্ঘ ছ-বছরের ভারত-পরিক্রমাই ছিল ঐতিহাসিক। স্বামীজীর এই ভারত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সদ্যোজাত রামকৃষ্ণ আন্দোলনকে।

১৬ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৮৪, পৃঃ ৬৩

১৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮

১৮ ঐ, পৃঃ ৩৪৩

১৯ ঐ, পৃঃ ৩৫০

২০ ঐ, পৃঃ ৩৫১

২১ ঐ, পৃঃ ৩৫৬

এই পরিক্রমা যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীপ্রচারের সহায়তা করেছিল, তেমনি ভারতের সামাজিক ইতিহাসেও এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সেইসঙ্গে জগতের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে তা এক নব দিগন্তেরও উন্মোচন করেছিল। ঐতিহাসিক ও মনীষীদের গভীর বিশ্লেষণে ও তাত্ত্বিক মূল্যায়নে এসব কথাই বলা হয়েছে।

ঐতিহাসিক সর্দার কে. এম. পানিক্কর লিখেছেন: "সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে তিনি শুধুমাত্র হিন্দু-অনুভবের বোধশক্তি জাগ্রত করেননি, তিনি নব্য হিন্দু সংস্কার সাধনের প্রেক্ষাপটে সার্বজনীন বেদান্তের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন।"[২২] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক পানিক্কর স্বামীজীকে 'নব শংকরাচার্য'-রূপে দেখেছেন। ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন মন্তব্য করেছেন: "...তিনি অভিনব ভারত-পথিক।... অসামান্য দরদী প্রাণ নিয়ে তিনি পরিব্রাজকের বেশে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পরিক্রমা করেছিলেন, শোষিত-দরিদ্র-পীড়িত দেশবাসীর মর্মন্তুদ বেদনা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। এই প্রাণময় অভিজ্ঞতা স্বামীজীকে একাধারে করে তুলেছে মরমী দেশপ্রেমিক এবং অভিনব ভারততত্ত্ববিদ্।... ভারতের মহামানবের সাগরতীরে উত্তীর্ণ হয়ে ধ্যাননেত্র উন্মীলন করে তিনি উদ্ঘাটন করেছেন মাতৃভূমির অঙ্কে থরে থরে সাজানো রত্নরাজি, ইতিহাস-চেতনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে তিনি তাদের বর্তমান ভারতের পক্ষে অবশ্য-গ্রহণীয় বলে চিহ্নিত করেছেন।"[২৩] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, যদি স্বামীজী হিমালয়ে নির্জন জীবনযাপন করতেন, যা তিনি গভীরভাবে চেয়েও ছিলেন এবং সহজেই তা করতে পারতেন, তাহলে ভারতের পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতো মাত্র, কিন্তু বিবেকানন্দকে পাওয়া যেত না। তিনি লিখেছেন: "স্বামীজীর সমগ্র ভারত-পরিক্রমাকালে আহৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আনয়ন করেছিল তাঁর জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। তিনি লাভ করেছিলেন ভারতের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, মর্মপীড়া ও দুর্দশার প্রাথমিক জ্ঞান। এগুলি তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তিনি অনুভব করে-ছিলেন কিভাবে পাশ্চাত্য জাতির গৌরব ও মাহাত্ম্যে মুগ্ধ তথাকথিত উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ তাদের নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতির গৌরব ও মাহাত্ম্য সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত। শতাব্দীর বৈদেশিক শাসনাধীনে কিভাবে তাদের দেহ-মনের শৌর্য নিঃশেষ্টতা ও দাসত্বে নিমজ্জিত। তাদের মধ্যে না ছিল বর্তমান অবনতি সম্পর্কে সচেতনতা, না ছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আশা।... স্বামীজী গুরুত্ব-পূর্ণ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন যে, তখন থেকেই তিনি শাশ্বত আনন্দের নির্বিকল্প সমাধি বা নিজ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করবেন এবং দেশমাতৃকার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন।"[২৪] ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন: "...গুরু রামকৃষ্ণ পরম-হংসের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবন-রহস্যের কুঞ্চিকা লাভ করিয়াছিলেন।... ইহার পরও তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল—সমভাবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল সাধারণ মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, সকলকে শিখাইতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল—এবং ভারতমাতা যেরূপ ছিলেন, যেরূপ হইয়াছেন, তাহা দেখিতে হইয়াছিল—এই ভাবেই বিশাল সমগ্রতার সর্বাবগাহিত্ব তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল...।"[২৫] রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন: "...তিনি অবিরাম একাকী ভ্রমণ করিতে

২২ The Determining Periods of Indian History—K. M. Panikkar, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1962, p. 53

২৩ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদক), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২য় সং, ১৩৯৫, পৃঃ ৪৪৩

২৪ Swami Vivekananda: A Historical Review—R. C. Majumdar, General Printers & Publishers, Calcutta, 1st Edn., 1965, p. 31

২৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, ভূমিকা।

লাগিলেন। তাহার সঙ্গে রহিলেন কেবল ভগবান। …জীবনের মহাগ্রন্থ তাঁহার সম্মুখে বর্তমানের বেদনাক্লিষ্ট সকরুণ মুখখানি উন্মোচিত করিয়া ধরিল।… তিনি শুনিলেন, ভারতের তথা বিশ্বের জনসাধারণ কিভাবে সাহায্য প্রার্থনায় কাতর আর্তনাদ করিতেছে। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার মতো নব ইডিপাসের কর্তব্য কি—ইডিপাসের কর্তব্য ছিল স্ফিংসের হিংস্র চঞ্চুর কবল হইতে হয় থিবিসকে রক্ষা করা, নয় থিবিসের সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করা। গ্রন্থশালার সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াও এই শিক্ষা তিনি পাইতেন না।… 'ভ্রমণ-বর্ষগুলি। শিক্ষালাভের বর্ষগুলি।' [গ্যেটের উক্তি] কী অপূর্ব এই শিক্ষা।… তিনি কেবল দীন-দরিদ্রের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের জীবনের অংশগ্রহণ করেন নাই; তিনি সকল প্রকার মানুষের সহিত সমান অবস্থায় থাকিয়া সকলের জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আজ তিনি ঘৃণিত লাঞ্ছিত ভিক্ষুক—কোন অস্পৃশ্যের আশ্রয়ে রহিয়াছেন; কাল তিনি মহামান্য অতিথি—কোন মহারাজা বা মহামাত্যের সহিত সমানভাবে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। আজ তিনি নিপীড়িতের বন্ধু, তাহার সেবা করিতেছেন, কাল তিনি ধনীর বিলাসের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সুপ্ত হৃদয়ে জনসেবার চেতনা জাগাইয়া তুলিতেছেন। বিশেষজ্ঞের বিদ্যার সহিত যেমন ছিল তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, জনসাধারণের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে যে গ্রাম্য ও নাগরিক অর্থনীতি, তাহার সম্পর্কেও তাঁহার ছিল তেমনি পরিপূর্ণ চেতনা। তিনি কেবলই শিখিতেছিলেন, শিখাইতেছিলেন, নিজেকে ধীরে ধীরে করিয়া তুলিতেছিলেন সমগ্র ভারতের বিবেক, ভারতের ঐক্য, ভারতের নিয়তি। এগুলি সমস্ত তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবং বিশ্ব এগুলিকে বিবেকানন্দ-রূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।"[২৬]

॥ ৩ ॥

সন্ন্যাসীর চিরন্তন ধারা তীর্থে তীর্থে তীর্থ-মধু আস্বাদন করা, নির্জন তপস্যা, নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল পরিব্রাজক জীবন গ্রহণ করা। স্বামীজি চেয়েছিলেন—তাঁর গুরুভাইরা বরানগর মঠে সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকুন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে নিজেদের জীবন গঠন করুন। কিন্তু সন্ন্যাসীর চিরন্তন ধারা তাঁদের কাউকেই বরানগর মঠে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। স্বামীজীও সুদূরের আহ্বান নিজ অন্তরে শুনতে পেয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে আলোড়িত হতো তাঁর হৃদয়কন্দর। মঠের স্থায়িত্বের জন্য তিনি প্রথম প্রথম তাঁর হৃদয়াবেগকে দমন করে রাখলেও পরিব্রাজক-জীবনের আহ্বানকে তিনিও উপেক্ষা করতে পারেননি।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের সর্বোচ্চ অনুভূতি তিনি লাভ করেছিলেন এবং সনাতন শাস্ত্রাদিতে তার সমর্থনও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব জীবনের সকল অভিজ্ঞতায় তার চাক্ষুষ পরিচয় লাভের তাগিদও তিনি অনুভব করেছিলেন। যে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম জগদাতীতরূপে প্রতিভাত হন, তাঁকে নিখিল চরাচরের আধার ও সর্বানুস্যূতরূপে অনুভব করতেও স্বামীজী চেয়েছিলেন। এজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হতে দেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি শুনেছিলেন: "চোখ বুজলে তিনি আছেন, চোখ চাইলে তিনি নাই?" অতঃপর স্বামীজী ভারত-পরিক্রমা শুরু করলেন নিজ অনুভূতি, গুরু ও শাস্ত্রের বচনকে যাচাই করে নেওয়ার জন্য। বস্তুতঃ, তাঁর এই পরিক্রমা ছিল দৈবনির্দেশিত।[২৭]

বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠা (১৯ অক্টোবর, ১৮৮৬) হবার কিছুকাল পরেই স্বামীজী এদিক-ওদিক বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার গিয়েছিলেন। যাত্রার পূর্বে প্রতিবারই বলতেন: "এই শেষ, আর ফিরছি না।"[২৮] কিন্তু কোনবারেই সে-সংকল্প রক্ষা করা সম্ভব হতো না। প্রতিবারই মঠের আকর্ষণে তাঁকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মঠে প্রত্যাবর্তন করতে হতো। অবশেষে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে স্বামীজী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন প্রব্রজ্যা গ্রহণের।

২৬ বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী—রোমাঁ রোলাঁ (অনুবাদক—ঋষি দাস), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৩৬০, পৃঃ ১৭-১৮

২৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬

২৮ ঐ, পৃঃ ২৩৭

সঙ্গী নির্বাচিত করলেন ভ্রমণ-বিশেষজ্ঞ গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দকে। যাত্রার আগে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গেলেন। শ্রীমা তখন বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়িতে একটি ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। শ্রীমায়ের কাছে স্বামীজী নিজের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করলে শ্রীমা প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। আর অখণ্ডানন্দজীকে তিনি আদেশ দিলেন, তাঁদের সকলের 'সর্বস্ব' নরেনকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে।[২৯] যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের বলেছিলেন: "এবার আর স্পর্শমাত্র লোককে বদলে ফেলতে পারার ক্ষমতা লাভ না করে ফিরছি না।"[৩০]

বরানগর মঠ থেকে স্বামীজীর সর্বপ্রথম (১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল) পরিক্রমা ছিল বিহারে শিমুলতলা ও বৈদ্যনাথধাম। এরপর (১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মের মধ্যে) তিনি যান বারাণসী ও সারনাথ। বারাণসীতে সঙ্গী ছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ফকির (যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য)। বারাণসীতে তাঁরা এক সপ্তাহ ছিলেন শ্রীদ্বারকাদাসের আশ্রমে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি সেখানে পরিচিত হন। প্রথম আলাপেই ভূদেববাবু স্বামীজীর অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অভিভূত হয়েছিলেন। কাশীধামে স্বামীজী দুজন মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেন—ত্রৈলঙ্গ স্বামী এবং স্বামী ভাস্করানন্দ। বারাণসীতে দুর্গামন্দিরে একদল বানরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হলে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁকে বললেন: "থামো, জানোয়ারদের সম্মুখে রুখে দাঁড়াও।" পরবর্তী কালে তিনি বলতেন: "প্রকৃতির সম্মুখে রুখে দাঁড়াও; অবিদ্যার সম্মুখে রুখে দাঁড়াও; মায়ার সম্মুখে রুখে দাঁড়াও। কখনো পলায়ন করো না।"[৩১] এই বাণীর পশ্চাতে ছিল তাঁর বারাণসীর অভিজ্ঞতা।

বারাণসী ও সারনাথ ভ্রমণশেষে স্বামীজী বরানগর মঠে ফিরে আসেন।

বরানগর মঠে কয়েকদিন থেকেই আবার তিনি ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি পুনরায় পর্যটনে বের হলেন। এবারেও প্রথমে গেলেন বারাণসীতে।

এবার বারাণসীর ধনবান ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই পরিচয় ক্রমশঃ পরিণত হয় বন্ধুত্বে। তার প্রমাণ 'পত্রাবলী'তে মুদ্রিত প্রমদাবাবুকে লেখা স্বামীজীর তেত্রিশটি চিঠি। এরপরও দুবার স্বামীজী বারাণসীতে এসেছিলেন। দুবারেই তিনি প্রমদাদাস মিত্রের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমবার ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের শুরুতে গাজীপুর থেকে এবং দ্বিতীয়বারে আগস্টের পর বৈদ্যনাথ থেকে। শাস্ত্রজ্ঞ প্রমদাবাবুর সঙ্গে স্বামীজীর নানা আলোচনা হতো। স্বামীজী ছিলেন সমাজের প্রাণহীন আচার-বিচারের বিপক্ষে; আর প্রাচীনপন্থী প্রমদাবাবু ছিলেন তার পক্ষে। স্বামীজী ছিলেন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সনাতনপন্থী, কিন্তু সমাজের স্তরে প্রগতিশীল; আর প্রমদাবাবু তার বিপরীত। স্বামীজী তাঁর ক্ষুরধার শাণিত যুক্তির সহযোগে উপস্থাপিত করতেন মৌলিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এখানেই স্বামীজী তাঁর হৃদয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন এক অদ্ভুত দৈবশক্তির অস্ফুট আলোড়ন। অকুতোভয়ে একদিন তিনি প্রমদাবাবুকে বলেছিলেন: "আবার যখন এখানে ফিরব, তখন আমি সমাজের উপর একটা বোমার মতো ফেটে পড়ব, আর সমাজ আমাকে কুকুরের মতো অনুসরণ করবে।"[৩২]

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি বারাণসী থেকে স্বামীজী অযোধ্যা,[৩৩] লখনৌ, আগ্রা পর্যটন করে আগস্ট মাসের প্রথমে বৃন্দাবনে আসেন।

স্বামীজী যেমন লখনৌতে অযোধ্যার নবাবদের শিল্প-সুষমামণ্ডিত উদ্যান, প্রাসাদ ও মসজিদ দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনি আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন মোগলদের অপূর্ব স্থাপত্য-নিদর্শন আগ্রার দুর্গ ও তাজমহল দেখে। তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন

২৯ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৭৫, পৃঃ ২০০

৩০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭২ ৩১ ঐ, পৃঃ ২৩৮-২৩৯ ৩২ ঐ, পৃঃ ২৪০

৩৩ ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের পর স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে তিনি আরেকবার অযোধ্যায় এসেছিলেন। সেবার সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত বৈষ্ণব সাধু জানকীবর শরণের সঙ্গে তাঁর আলাপাদি হয়। (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১-২৪২)

ভারতীয় শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় পেয়ে। তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছিল শিল্প ও কল্পনার ক্ষেত্রে মোগল ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের দিকটি। এই গৌরবের রূপ তিনি পাশ্চাত্যের সামনে তুলে ধরেছিলেন।'

আগ্রা থেকে বৃন্দাবনের পথে স্বামীজী ধূমপানরত এক ব্যক্তিকে দেখেন। তাঁরও ইচ্ছা হয় ধূমপান করার। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে-ব্যক্তি সংকোচের সঙ্গে বলে যে, সে জাতে মেথর, সন্ন্যাসিমহাত্মাকে তার হুকোয় ধূমপান করতে দিতে পারে না। সহজাত সংস্কারবশে স্বামীজীও ফিরে গেলেন। কিছু দূর গিয়েই আবার ফিরে এলেন। ধিক্কার দিলেন নিজেকে, কারণ, সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেননি। তাই আবার মেথরের কাছে গিয়ে জোর করে তিনি তামাক খেয়েছিলেন। সেদিন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জাতপাতের সংস্কার কিভাবে ভারতবাসীর বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। আর সেইসঙ্গে শিক্ষা পেয়েছিলেন, বেদান্ত-তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ না হওয়ায় ধর্মের এই অবনতি।

পরবর্তী কালে এই ঘটনার উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "সন্ন্যাস নিয়ে পূর্ব সংস্কার দূর হয়েছে কিনা, জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হয়।"৩৪ বলেছিলেনঃ "সেদিন আবার আমার এই শিক্ষা হয়েছিল যে, কাউকে ঘৃণা করা চলবে না। ভাবতে হবে যে, সকলেই ভগবানের সন্তান।"৩৫

বৃন্দাবনে স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন স্বামী তুরীয়ানন্দঃ "বৃন্দাবনে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী ভিজতে ভিজতে একবার একটি কুটিরে প্রবেশ করেন। দারুণ বৃষ্টিতে পথ চলা অসম্ভব হওয়ায় সেখানেই অপেক্ষা করতে হয়। মনটা তখন খুব ভেঙে পড়েছিল। সম্ভবতঃ ঐ কুটিরে কোন সাধু বাস করতেন কখনো। স্বামীজী হঠাৎ দেখলেন দেওয়ালে কয়লা দিয়ে লেখা আছে—'চাহ চামারি চুহারি অতি নীচন্ কী নীচ। ম্যায় তো ব্রহ্ম হু, যদি তু ন হতে বীচ।'—অর্থাৎ হে বাসনা (চাহ্) তুই চামারণী, মেথরানী (চুহারি), তুই অতি অধমেরও অধম। তুই যদি আমার মধ্যে এসে না পড়তিস, তাহলে তো আমি ব্রহ্মই ছিলাম। এই লেখাটি পড়ে স্বামীজী খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।"৩৬

বৃন্দাবন থেকে হরিদ্বারের পথে পড়ে ছোট রেলস্টেশন হাতরাস। সেখানে নেমেছেন স্বামীজী। সহকারী স্টেশন মাস্টার প্রবাসী বাঙালী শরৎচন্দ্র গুপ্ত সন্ন্যাসীর অসাধারণ চোখদুটি দেখে অভিভূত হলেন। প্রথম দর্শনেই শরৎচন্দ্র সম্মোহিত। স্বামীজী হাতরাসে থাকলেন দিনকয়েক। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে বহুলোক তাঁর দর্শনপ্রার্থী। তাঁদের নিকট স্বামীজী উপস্থাপিত করেছিলেন তাঁর জীবন-ব্রতের কথা—দেশমাতৃকাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে সচেতন ও সক্রিয় করতে হবে, আধ্যাত্মিকতায় জগৎ জয় করতে হবে। এই তাঁর প্রতি তাঁর গুরুর নির্দেশ। এই 'ব্রত' তাঁকে উদ্‌যাপন করতে হবে।৩৭ শরৎচন্দ্র সেবার স্বামীজীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কয়েক মাস পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বরানগর মঠে যোগ দেন। তাঁর নাম হয় স্বামী সদানন্দ।

শিষ্য শরৎচন্দ্র সহ স্বামীজী এরপর উপস্থিত হয়েছিলেন হৃষীকেশে। হৃষীকেশ ধ্যানমগ্ন চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের প্রবেশদ্বার, সন্ন্যাসীদের তপস্যা ও নির্জনবাসের স্থান। সুরধুনির তরঙ্গধ্বনি, শান্ত শুভ্র হিমালয়ের সৌন্দর্য ও মহাত্মাগণের পবিত্রসঙ্গ। প্রাণভরে সাধন-ভজনে প্রাণ ঢেলে দিলেন স্বামীজী। তাঁর ইচ্ছা—সুদীর্ঘকাল তিনি এই অঞ্চলে অবস্থান করবেন। তারপরে যাবেন কেদারনাথ, বদরীনাথ। কিন্তু বিধি বাম। ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। হাতরাসে ফিরে এলেন স্বামীজী এবং তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রও। এদিকে পরিব্রাজক স্বামী শিবানন্দ উত্তরাখণ্ডের পথে হাতরাসে এসে স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেলেন। তীর্থদর্শন-বাসনা ত্যাগ করে গুরুভ্রাতাকে নিয়ে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের শেষে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন বরানগর মঠে। [ক্রমশঃ]

৩৪ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪২-২৪৩ ৩৫ ঐ, পৃঃ ২৪৩

৩৬ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পাদক), ১৯৯০, পৃঃ ৩

৩৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬

নিবন্ধ

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'

রুদ্রাণী মুখোপাধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতার জন্ম ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর। তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হলো।—যুগ্ম সম্পাদক

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ সীতাকে দেখে বলছেন: "সীতা রামময়-জীবিতা।"[১] এরই যেন অনুরণন ঘটেছে নিবেদিতার জীবনে। নিবেদিতা ছিলেন রামকৃষ্ণময়-জীবিতা, বিবেকানন্দময়-জীবিতা। বিপিনচন্দ্র পাল নিবেদিতার এই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবময়তার মধ্যে দেখেছেন সতী-হৃদয়ের প্রতিফলন। শিবময় বিবেকানন্দের আশীর্বাদে অমরনাথের গুহায় নিবেদিতা হলেন শিবকন্যা ভারতী। এসময়ের অনুভূতির কথা নিবেদিতা লিখছেন: "তিনি সত্যই শিবের কাছে আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন,... তাঁর মুখে সেকথা শোনার পর থেকে আমি দারুণ দ্রুতবেগে হিন্দু হয়ে উঠেছি ভাবাদর্শে।"[২]

শ্রীমা সারদাদেবীর জনৈক সন্ন্যাসি-শিষ্য নিবেদিতার বিখ্যাত জীবনীকার লিজেল রেম'কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "শ্রীমা নিবেদিতাকে গভীর, অতি গভীরভাবে ভালবাসতেন। 'আমার প্রাণের সরস্বতী' বলে প্রায়ই তাঁকে মা ডাকতেন। নিবেদিতাও মায়ের আদরে গলে যেতেন।"[৩] শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় নিবেদিতা এদেশের মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা আরও বলেছেন: "নিবেদিতা আমার মেয়ে; ঠাকুরকে ভোগ রেঁধে নিবেদন করার অধিকার তার আছে; তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে, কোন দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি কারো তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।"[৪] মা জানতেন, নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণেরই নিবেদিতা—তিনি রামকৃষ্ণ সংঘে আনুষ্ঠানিক অর্থে থাকুন অথবা তার বাইরেই থাকুন। তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।

দেশের সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থনে আমরা নিবেদিতাকে বলতে শুনি: "কল্কির তূরীধ্বনি ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে নিনাদিত। আমাদের মধ্যে যাকিছু মহান ও সুন্দর, কৃচ্ছ্রসাধন ও বীরোচিত, তাকেই সেই রণক্ষেত্রের মধ্যে আহ্বান করছে যেখানে পশ্চাদ্-অপসরণের বাদ্য কখনো শোনা যাবে না।

"অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, হে ভারতমাতার সৈনিকগণ। লঙ্ঘন করো দুর্গপ্রাকার, অধিকার করো দুর্গশহর! কেল্লায় রাখো সৈন্যদল, কণ্টার্জিত বুরুজে রাখো সতর্ক প্রহরীদের! আর যদি যুদ্ধে তোমার পতন হয়—তা এমনভাবে হোক যাতে তোমার মৃতদেহের ওপর উঠে অন্যেরা ঊর্ধ্বভূমি জয়ের চেষ্টা করে যেতে পারে।"

"আজ আমাদের মাতৃভূমি জাতীয়তার জন্য আত্মোৎসর্গের কামনায় বিদীর্ণকণ্ঠে ডাক দিচ্ছেন। আজ তিনি শক্তিধর পুরুষের জনয়িত্রী ও পালয়িত্রী-রূপে চাইছেন—আমরা যেন তাঁকে মধুরতা ও মৃদুতার পরিবর্তে পুরুষোচিত তেজ ও দুর্ভেদ্য শক্তি প্রদর্শন করি। আজ তিনি চান—আমরা খড়্গ নিয়ে তাঁর সামনে খেলা করি, যাতে তিনি বীরজাতির জননীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। আজ তিনি আবার চিৎকার করে বলছেন, তিনি ক্ষুধার্ত—মানব-রাজগণের জীবন ও রক্ত ভিন্ন তাঁর দুর্গরক্ষা করা সম্ভব হবে না।... শবাগারের আচ্ছাদনীর নিম্নে বহু পূর্বে শায়িত মৃতগণের মধ্যে এখন শিহরণ ও উত্থানের সংগ্রাম। কম্পমান প্রহর। প্রতীক্ষমাণ আতঙ্করুদ্ধ সন্ধ্যা। দীর্ঘ অতীতে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত উদ্বোধন সং, ১৩৯৩, পৃঃ ৩৮৯

২ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১৯৬৮, পৃঃ ৩৪ ৩ ঐ, পৃঃ ২০০ ৪ ঐ, পৃঃ ২০১

অবলুপ্ত জাতিসমূহ তাদের সুপ্রাচীন নিদ্রার মধ্যে আর্তকণ্ঠ। আমাদের চতুর্দিকে অতীতের কণ্ঠস্বর—জাগো! জাগো!"[৫]

নিবেদিতার এই কথাগুলি পড়লে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসে, তিনি কি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা? এর উত্তরে আমরা বলব, তিনি যথার্থই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা। 'শিখাময়ী' নিবেদিতার সকল প্রেরণা ও উৎস ছিলেন অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর কণ্ঠেই তো ভারতবর্ষ প্রথম শুনেছে মহাবীর্যের রণহুঙ্কার: "গীতা-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা; শক্তিপূজা চালা।··· বাঁশী বাজিয়ে দেশের কল্যাণ হবে না। এই চাই তোপ্ তাপ্ গোলাগুলি ঢাল তরোয়াল নিয়ে খেলা। মার্ মার্ কাট্ কাট্ করে··· উঠে পড়ে লাগতে হবে।···"[৬]

"এখন চাই খাণ্ডা খরশান।··· মায়ের পূজায় রক্ত চাই—নরবলি চাই।···মহা রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন না আছে তোদের ইহকাল—না আছে তোদের পরকাল। দেশ ঘোর তমে ছেয়ে ফেলেছে। তাই ইহজীবনে দাসত্ব—পরলোকে অনন্ত নরক।"[৭]

"তোমরা দাস-মনোবৃত্তি পরিত্যাগ কর। আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হোন। অন্য অকেজো দেবতাদের এই ক-বছর ভুলে থাকলে কোন ক্ষতি নাই।"[৮]

"···মাকে রুধির দিয়ে পূজা করব।··· রুধির নইলে কি মার তৃপ্তি হয়? মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা করতে হয়; তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। একি আলোচাল আর কাঁচকলার কর্ম। মার ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহালয়ে মায়ের ছেলে অভীঃ নির্ভীক হয়ে থাকবে।"[৯]

নিবেদিতা বুঝেছিলেন, সংসারে যে কখনো ভালবাসা, স্বার্থত্যাগ কিংবা ব্রহ্মচর্যের অভ্যাস করেনি সে কখনো যোগী হতে পারে না। পরাধীন ভারতবাসীর কাছে সেদিন এটাই তো ছিল একমাত্র ধর্ম। স্বামীজী বলতেন: "পরাধীন জাতির কোন ধর্ম নেই। তোদের এখন একমাত্র ধর্ম হচ্ছে মানুষের শক্তিলাভ করে আগে পরস্বাপহারীদের দেশ থেকে তাড়ানো।"[১০] স্বামীজীর এই শিক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করে, স্বামীজীর দেওয়া আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের ব্রতকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, দেশমাতৃকার বন্ধন-মোচনের জন্য মরণপণ সংগ্রামই হবে দেহাত্মবোধের পারে যাবার প্রথম সোপান।

শিবাবতার বিবেকানন্দ-পূজায় নিবেদিতা ছিলেন যেন শিবপদে সমর্পিতা অনন্যা এক উপাসিকা। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল, একগুচ্ছ পল্লবসমেত নাসপাতি ফুল দিয়ে স্বামীজীকে পূজো করেন। স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন আসে, কেন তিনি স্বামীজীর পূজোর জন্য এই ফুলকে বেছে নিয়েছিলেন? নিয়েছিলেন তার কারণ, এদের কোন ফল হবে না।[১১] মনে হয়, যেহেতু নিবেদিতার চোখে স্বামীজী ছিলেন শিবের অবতার, তাই সংসারের কেনাবেচার হাটে যার কোন দাম নেই, কোন মানুষের লুব্ধ দৃষ্টি যার দিকে পড়েনি সেই অনুচ্ছিষ্ট, অনাঘ্রাত, অবহেলিত পুষ্পই হোক 'বীরেশ্বর' বিবেকানন্দের পূজোর উপকরণ। কিন্তু নিবেদিতা জানতেন কেমন করে আবেগকে সংযত করতে হয়। তাই আলোড়ন সৃষ্টি না করে তিনি প্রতীক্ষায় রইলেন। পিতা বুঝেছিলেন তাঁর মানসকন্যার মনের কথা। তাই পরবর্তী কালে নিবেদিতার চিঠিতে পাই—"অবশেষে আমার দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হয়েছে, তাঁকে পূজা করতে পেরেছি ফুল দিয়ে। গোলাপ এনে দিয়েছিল একজন সেগুলিকে তাঁর পায়ের উপরে রাখার অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন—তারপর

৫ নিবেদিতা লোকমাতা, ৩য় খণ্ড, ১৩১৫, পৃঃ ২৩৭-২৩৮ ৬ উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩১১, পৃঃ ৩০৫

৭ ঐ, ৯ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, ১৩১৪, পৃঃ ৪৯৪-৪৯৫

৮ Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Calcutta, Vol. III, 11th, Edn. 1973, pp. 300

৯ উদ্বোধন, ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩১৭, পৃঃ ৭৭

১০ স্বামী বিবেকানন্দ: মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, ১৯৮৮, পৃঃ ৭২

১১ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০

আশীর্বাদ করলেন।"[১২]

কাম্যবস্তুকে লাভ করতে হলে যে-সাধনা, যে-ব্যাকুলতার প্রয়োজন, গুরু এবং আদর্শের প্রতি যে একান্ত অনুরাগ প্রয়োজন নিবেদিতার মধ্যে তা ক্রমশই ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। স্বামীজীর অসুস্থতার খবর পেয়ে বিচলিত নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখছেনঃ "কী হবে—যদি মৃত্যু হয় তাঁর! পৃথিবী যে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে আমার কাছে মুহূর্তমধ্যে।"[১৩] আরও আকুতি যেন ঝরে পড়ছে নিবেদিতার আরেকটি চিঠিতেঃ "যেভাবেই হোক, তিনি বেঁচে থাকুন—স্বার্থপরের মতো হলেও বলছি। তাঁর চরণস্পর্শ পায় যে পৃথিবী—সে ধন্য।"[১৪] বিবেকানন্দের নিবেদিতা আত্মগরিমা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, আত্মসমর্পণে অপরূপা—"আগে ভাবতাম, আমি ভারতের নারীদের জন্য কাজ করতে চাই; এই ধরনের নানা সুমহান নৈর্ব্যক্তিক ভাবরাজিতে পূর্ণ থাকত মস্তিষ্ক, কিন্তু ক্রমেই নিশ্চিতভাবে সেই উচ্চ শিখর থেকে নেমে এসেছি; আজ আমি যদি কিছু করতে চাই, তার একমাত্র কারণ—আমার পিতার ইচ্ছা তা-ই। এমনকি আমাদের ঈশ্বরজ্ঞানের ইচ্ছাও দেওয়া-নেওয়ার ভারমুক্ত নয়। সেবার জন্যই সেবার চিরকামনা অবশ্যই শ্রেয়, কিন্তু হে প্রিয় আচার্যদেব।—সে আমাদের এই দুঃখী ক্ষুদ্র জীবনের জন্য নয়।"[১৫]

স্বামীজীকে লেখা নিবেদিতার এই চিঠিতে ব্যক্তিপূজা উচিত কি অনুচিত—এই বহু বিতর্কিত সমস্যাটির একটি সহজ সমাধানের ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়। মনে হয়, ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে আদর্শের পূজা যেন অনেকটা নিরাকারের ধ্যানের মতো। নিরাকারের ধ্যান নিশ্চয়ই মহত্তর, কিন্তু সাকারকে বাদ দিয়ে সরাসরি নিরাকারের ধ্যান করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেনঃ "গুরু অজ্ঞান তিমিরান্ধকার দূর করেন তাই গুরুই শিব।" বাস্তবিকই, নিবেদিতা তাঁর গুরুকে শিবরূপে দর্শন করেছিলেন।

নিবেদিতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছিলেন, এজগতে যদি কেউ প্রকৃত সত্যকে লাভ করতে চায় তবে শুধু সুন্দরের মাঝে, জীবনের মাঝে নয়—ভয়ংকরের মাঝে, মৃত্যুর মাঝেও সেই মহাশক্তিকে দেখতে হবে। শক্তির কাছে আত্মনিবেদন করলে কালী-নামে কালপাশ কাটবে এবং পাশবন্ধ জীব পাশমুক্ত শিবকে লাভ করতে পারবে। কালী-মূর্তির মাঝে নিবেদিতা দেখেছেন পুরুষ-প্রকৃতির মূলতত্ত্ব—"সর্বত্র আমরা দেখতে পাই শক্তি ও কর্মের প্রকাশের জন্য একে অন্যের স্পর্শের অপেক্ষা রাখে। এ-দুয়েরই ভারতবর্ষীয় পরিচয় শিব ও শক্তি নামে। ...শিষ্য যেমন অপেক্ষা করে গুরুর জন্য—যাঁর মধ্যে সে জীবনের সব অর্থ খুঁজে পায়, আত্মাও তেমনি নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, বহিরঙ্গ স্পর্শহীন হয়ে থাকে যতক্ষণ না অধ্যাত্ম-বিপ্লবের চকিতস্পর্শে সমগ্র বহির্জগৎ—সমস্ত জীবন, প্রকৃতি এবং কাল ও অভিজ্ঞতা—আর সমস্ত অন্তর্জগৎ যে এক ঈশ্বরেরই প্রকাশ একথা সে উপলব্ধি করতে পারে।

"প্রতীচ্যের ভাষায় এ সেই অনন্ত সৌন্দর্যদৃষ্টি, আর প্রাচ্যের ঘোষণা—এই সেই আত্মোপলব্ধি।

"কালী এমনই এক মহামুহূর্তের প্রতিমা—আত্মার উন্মোচিত দৃষ্টিতে বিশ্বসংসারের সর্বত্র ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পাওয়া।"[১৬]

নিবেদিতা বুঝেছিলেন, কালী হলেন নিস্তরঙ্গ চৈতন্যসমুদ্র-স্বরূপ শিবের ধ্যান-প্রতিমা, শিবের কাছে তিনি সাক্ষাৎ সৌন্দর্যরূপিণী, কালীতত্ত্বের গভীর উপলব্ধিতে শিব কালীকে 'মা' বলে সম্বোধন করেন। কালী একদিকে যেমন পরমা জননী, অপরদিকে তেমনই প্রলয়ংকরী। একদিকে তিনি তাঁর সন্তানের প্রতি অকৃপণ স্নেহদানে পূর্ণহৃদয়া, অপরদিকে আর্ত-ব্যথিত মানবজাতির ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন অথবা সেই ক্রন্দনের প্রত্যুত্তরে উন্মত্ত অট্টহাস্যে মুখর প্রবহমান কালস্রোত।—নিবেদিতার জ্ঞানদৃষ্টিতে মহাশক্তির এই দ্বৈতরূপটি উন্মোচিত হয়েছিল।[১৭]

১২ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫

১৩ ঐ, পৃঃ ৫৩

১৪ ঐ, পৃঃ ৫৬

১৫ ঐ, পৃঃ ১৭-১৮

১৬ 'শংকরের ধ্যাননেত্রে দেবী কালিকা'—ভগিনী নিবেদিতা [অনুবাদ—প্রণবরঞ্জন ঘোষ], উদ্বোধন, ৭৮তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৭৪, পৃঃ ৪০

১৭ দ্রঃ ঐ

নিবেদিতা প্রকৃতির করালরূপের মাঝে প্রত্যক্ষ করেছিলেন জগন্মাতা চিন্ময়ী কালীকে। সে-উপলব্ধির সাক্ষী ছিলেন 'হিন্দু রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর নিজস্ব বর্ণনা: "একদিন আমি বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার গৃহে বসিয়া তাঁহার অদ্ভুত স্বদেশী পেয়ালায় চা খাইতেছিলাম। সহসা আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকিয়া গেল। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে প্রায়ই এরূপ কালবৈশাখীর আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর মধ্যেও পরিবর্তন দেখা গেল। প্রকৃতির এই রুদ্র-করাল মূর্তি তাঁহার মুখে চোখে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার মুখে এক নূতন আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাহা একাধারে ভীষণ ও মধুর। নিস্তব্ধভাবে নিবেদিতা বসিয়া রহিলেন; আমার উপস্থিতি যেন সাময়িক-ভাবে তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। গভীর দৃষ্টিতে জানালার মধ্য দিয়া দেখিতে লাগিলেন কেমন করিয়া আকাশ ও পৃথিবী কালো হইয়া আসিতেছে। আচ্ছন্নের মতো বসিয়া তিনি শুনিতে লাগিলেন উদ্যত ঝটিকার গর্জনশব্দ। সহসা অন্ধকার আকাশের বক্ষে বিদ্যুৎ চমকিল—তাহার পরেই বজ্রপাতের শব্দ। নিবেদিতা রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—কালী!"[১৮]

জানি না, দেহী অবস্থায় স্বামীজী নিবেদিতার যে-উপলব্ধির কথায় বলেছিলেন—"মার্গট, ও বস্তু তোমাকে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই—আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নই।"[১৯] হয়তো সেদিনের সেই বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে দেহাতীত অবস্থায় স্বামীজীর মানসকন্যার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল চৈতন্য-রূপিণী মা-কালীর অহেতুক কৃপায়।

নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং মা-কালী এবং স্বামী বিবেকানন্দ শিব। তাঁর এই বিশ্বাস নিছক কল্পনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি—এর পিছনে ছিল স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব অভিমত, যা তিনি বলেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে। নিবেদিতা একথা শুনেছেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের কাছেই। ১৬ মার্চ, ১৮৯৯ তারিখে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে লিখছেন: "শ্রীমা বললেন, স্বামীজী সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করতে ভালবাসি, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কথাই তাঁকে বলেছিলেন: স্বামীজী জাতীয় দেবতার [অর্থাৎ শিবের] সাক্ষাৎ অবতার; আর তিনি কালীর অবতার।" (The Mother says that Sri Ramakrishna told her that Swami was even as I have loved to think him, a direct incarnation of the National God, and He Himself of Kali).[২০] এবিষয়ে নিবেদিতার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের যে কথাবার্তা হয়েছিল তা এরূপ:

"নিবেদিতা: শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সর্বদা কালীর অবতার মনে করি। ভবিষ্যতের মানুষ তাঁকে কি তাই বলবে না?

"স্বামীজী: হ্যাঁ। এবিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ যে, কালী রামকৃষ্ণের ওপর ভর করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন।..."

অতঃপর স্বামীজী নিবেদিতাকে বললেন: "এসব কথা কিন্তু কদাপি কাউকে জানাবার নয়, মনে রেখো।"

নিবেদিতা বললেন: "আপনি বলতে চান, এসব আলাপ পৃথিবীর শোনার জন্য নয়?"

স্বামীজী বললেন: "না, কদাপি নয়।"[২১]

একই সত্তা কখনো শিব, কখনো কালী। নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীতে একটিই সত্তার আবির্ভাব ঘটেছিল। সে সত্তা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের। নিবেদিতা ছিলেন সেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ এক বা যুগ্ম সত্তার নিকট সর্বতোভাবে সমর্পিতা। □

১৮ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ২য় সং, ১৯৬৩, পৃঃ ১৫০-১৫১। শংকরীপ্রসাদ বসু লিখিত 'নিবেদিতা লোকমাতা'য় এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বিপ্লবী বিপিন পালের নাম উল্লেখিত আছে। (দ্রঃ নিবেদিতা লোকমাতা, ৩য় খণ্ড, ১৩৯৫, পৃঃ ১১০

১৯ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪ ২০ ঐ, পৃঃ ১৮৪-১৮৫ ২১ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬

প্রশ্নোত্তর

প্রসঙ্গ জপ-ধ্যান

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ (অক্টোবর, ১৮৯২-মার্চ, ১৯৮৫) তাঁর অগণিত শিষ্যদের আধ্যাত্মিক জীবনের নানা জটিল প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন সময়ে মৌখিক ও পত্র মারফৎ বহু উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মন্ত্র-শিষ্যা ও মন্ত্রশিষ্য নয়া দিল্লীর শ্রীমতী বাণী রায় এবং তাঁর পুত্র ভাস্কর রায়কে তিনি জানুয়ারি, ১৯৬৬ থেকে জুলাই, ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যেসব উপদেশপূর্ণ পত্র লিখেছিলেন, সেইসব পত্রের উপাদান থেকেই 'প্রশ্নোত্তর' আকারে সাজিয়ে **'Practical Hints on Meditative Life'** শীর্ষক রচনা 'বেদান্ত কেশরী'-র আগস্ট, ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান লেখাটি তারই বাঙলা অনুবাদ।

বঙ্গানুবাদ : সবিতা পাল
সংগ্রহ : পীযূষকান্তি রায়

প্রশ্ন : ধর্মজীবনে গুরুর স্থান কোথায় ?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : শিক্ষার ক্ষেত্রে তোমার অধ্যাপকের স্থান কোথায় ? গবেষণামূলক কাজে অথবা পি. এইচ. ডি-র থিসিস ছাপবার প্রয়োজন হলে যেমন অধ্যাপকের সাহায্য নিতে হয় সেইকথা অধ্যাত্মজীবনেও খাটে। এখানেও তোমাকে কয়েকটি পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়, বাকিটা তোমার নিজের চেষ্টায় সম্পন্ন করতে হবে। তোমার ভুল-ত্রুটি হলে অথবা যখন 'গবেষণা'র কাজ আটকে যাবে তখন গুরুই তোমাকে সর্বব্যাপারে সাহায্য করবেন ও সঠিক পথ দেখিয়ে দেবেন। পরীক্ষাগারে তুমি যেমন অধ্যাপকের নির্দেশে গবেষণামূলক কাজ কর, সেই রকম ধর্মজীবনেও গুরুর উপদেশ অনুযায়ী তোমাকে তাঁর প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যেতে হবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদা "গুরুর কোন প্রয়োজন আছে কিনা ?" প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন : "নিশ্চয়ই আছে। একজন পকেটমার হতে গেলেও তার গুরুর প্রয়োজন হয়, আর তুমি কি মনে কর ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য কোন গুরুর প্রয়োজন নেই ?" সুতরাং যেকোন বিষয় হোক না কেন বাইরে থেকে আসা একটা সাহায্য বিনা তুমি এগিয়ে যেতে পারবে না।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমি নিয়মিত জপ ও ধ্যান করি এবং খুব শান্তিও পাই, কিন্তু কতবার মন্ত্র জপ করা প্রয়োজন ?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : তুমি নিয়মিত জপ ও ধ্যান করে পরম শান্তি লাভ করছ জেনে আমি আনন্দিত। অভ্যাস করে যাও, ক্রমশঃ আরও শান্তি পাবে। জানতে চাইছিলে, কত সংখ্যা জপ করবে। যত বেশি করবে ততই ভাল, কিন্তু মন্ত্র অনেকক্ষণ ধরে যান্ত্রিকভাবে আওড়ে গেলে কোনই ফল হয় না। তার পরিবর্তে তুমি যদি আন্তরিকতার সঙ্গে অনুরাগদীপ্ত হৃদয়ে সীমিত সময়ের মধ্যেও জপ কর তবে ভাল হয়। ভক্তি ও অনুরাগই মুখ্য, সংখ্যা নয়—যদিও জপের কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। যত বেশি তুমি জপ করবে তত তাড়াতাড়ি তুমি অধ্যাত্ম-পথে এগিয়ে যেতে পারবে। তবে খেয়াল রেখো, জপের সংখ্যা তোমার সাধ্যাতীত বাড়াতে গিয়ে যেন তোমার স্বাস্থ্যের কোনরকম ক্ষতি না হয়।

প্রশ্ন : *মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি কি ইষ্টচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ? অনেক সময় এমন কঠিন ব্যাপার হয় যে, আমি ইষ্টমূর্তি ধ্যানে দেখতে পাই না। দয়া করে এবিষয়ে উপদেশ দিন।*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : মনে মনে মন্ত্রজপ বারবার করবে এবং সেই সঙ্গে তোমার মন ইষ্টচিন্তায় নিবদ্ধ রাখবে। দুটি কাজই সমানভাবে চলবে। যখন জপ করবে তখন ইষ্টচিন্তায় মনকে নিবিষ্ট রাখবে। সেইসময় অন্য দেব-দেবীর বিষয়ে চিন্তা করবে না। তোমার ধ্যানের সময় সর্বক্ষণ যদি তুমি ইষ্টমূর্তি নাও প্রত্যক্ষ কর তবুও উদ্বিগ্ন হয়ো না। তুমি যখন জপ করবে, তখন শুধু মনে করবে তিনি তোমার হৃদয়ে বসে আছেন। তোমার সামনে তাঁর একটি ফটোও রেখে দিও এবং সময় সময় ফটোটির দিকে দৃষ্টিপাত করবে। তারপর ইষ্টদেবতাকে তোমার হৃদয়ে দেখবে। এই উপায়ে তুমি ধীরে ধীরে ইষ্টদেবতার মূর্তি দর্শন করতে পারবে। [ক্রমশঃ]

পরমপদকমলে

স্বামীজীর ভারত-পরিভ্রমণের প্রেক্ষাপট

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

একটু পিছনের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। ঠাকুর চলে গেছেন। বরাহনগরের একটি পুরনো বাড়িতে ঠাকুরের সন্তানদল একত্রিত হয়েছেন। ঠাকুরের রসদদার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র খরচ সামলাচ্ছেন। ঠাকুর মহাপ্রয়াণের আগে শ্রীমকে বলেছিলেন: "তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ত্যাগ করতে একটু কষ্ট হচ্ছে।" রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়ানোটা সুরেন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপনায় বন্ধ হলেও অন্তরে সবাই নিরাশ্রয়। লীলা চলছিল, লীলা শেষ। বুক দিয়ে যিনি আগলে রেখেছিলেন তিনি চলে গেছেন। সেই কথা, সেই গান, সেই প্রেম, সমাধি, শিক্ষা আর নেই। অসীম এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। সকলেই দিশাহারা। নরেন্দ্রনাথ তাঁর নেতৃত্বে, ব্যক্তিত্বে সকলকে ধরে রাখলেও মনে মনে অশান্ত। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তখন, তিনি নেই তবে আমরা কেন দেহধারণ করে আছি? নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই গুরুভাইদের বলছেন, প্রায়োপবেশন করব। দেহ ফেলে দেব। দ্বিতীয় বড় প্রশ্ন, প্রশ্ন না বলে সংশয় বলাই ভাল, ভগবান কি সত্যই আছেন? কে ভগবান। কোথায় তিনি। কত প্রার্থনা করছি; তিনি কিন্তু নিরুত্তর। কোন জবাব নেই। শ্রীমকে বলছেন, কত দেখলাম মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। কত কালীরূপ; আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম। তবু শান্তি হচ্ছে না। আমার কিছু ভাল লাগছে না। এই আপনার সঙ্গে কথা কচ্ছি, ইচ্ছা হয় এখনি উঠে যাই। তৃতীয় প্রশ্ন, ঠাকুর কি চেয়েছিলেন—সন্ন্যাস। সমাধি। নিজের মুক্তি, মোক্ষ। না। ঠাকুর চেয়েছিলেন, নরেন লোকশিক্ষা দেবে। বলেছিলেন: সমাধি-টমাধি তুচ্ছ কথা। সমাধির পারে চলে যাবে। জগৎটাকে ধরে এমন নাড়া দেবে, যাতে সকলের চেতনা হয়। নরেন গৃহী হবে। না, তাও নয়। নরেন্দ্রনাথের বিয়ে হবে শুনে ঠাকুর মা-কালীর পা ধরে কেঁদেছিলেন। কেঁদে বলেছিলেন: "মা ওসব ঘুরিয়ে দে মা। নরেন্দ্র যেন ডুবে না।"

তাহলে নরেন্দ্র কোন্ পথে যাবেন? কেতাবী সন্ন্যাসী। ধ্যান, জপ, ধর্মকথা, গুরু, দীক্ষা, শিষ্য-শিষ্যা নিয়ে গতানুগতিক বৈরাগ্যের পথ ধরে এগিয়ে যাবেন। ঠাকুরের তা অভিপ্রেত ছিল না। ঠাকুর একদিন কথায় কথায় পরীক্ষাচ্ছলে একান্ত গোপনে নরেন্দ্রকে বলেছিলেন: "আমার তো সিদ্ধাই করবার যো নাই। তোর ভিতর দিয়ে করব, কি বলিস?" নরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট বলেছিলেন: "না তা হবে না।" নরেন্দ্র 'না' বললেও ঠাকুর তাঁর মধ্যে নিজের সিদ্ধাই ঢেলে দিয়েছিলেন।

'সিদ্ধাই' বলতে ঠাকুর কি বুঝিয়েছিলেন? ঝাড়-ফুঁক, মারণ উচাটন, বাকসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি? অবশ্যই নয়। ঠাকুরের 'সিদ্ধাই' মানে একটা কালকে স্তব্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা। কোটি মানবকে স্তম্ভিত করে দেওয়ার ক্ষমতা। ধর্মের গোড়া ধরে নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। মানুষের সমস্ত চিন্তাভাবনাকে উল্টে দেওয়ার ক্ষমতা। মন্ত্রমুগ্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা। নরেন্দ্র তা করেছেন। তিনি বলেছেন নিজেই: সব ঠাকুরেরই শক্তিতে।

নরেন্দ্রনাথ অসাধারণ—নরেন্দ্রনাথ অদ্ভুত। ঘোরতর অবিশ্বাসী। ঠাকুরকে বলছেন: "আমি কিন্টফিস্ট মানি না। আমি নিজের মতে কাজ করি।" ঠাকুর বললেন: "আমি ঈশ্বরের রূপ দর্শন করি।" নরেন্দ্রনাথ সোজা বলে দিলেন: "ও সব মনের ভুল।"

ঠাকুর কাগজে লিখলেন: "নরেন শিক্ষে দিবে।"

নরেন্দ্রনাথ বললেন: "আমি ওসব পারব না।"

ঠাকুরও সেইরকম। বললেন: "তোর হাড় করবে।"

গুরু-শিষ্যে সে এক মজার ব্যাপার। অনন্ত ঠোকাঠুকি। আপাত-নাস্তিক আস্তিক হতে চলেছেন। কি রকম আস্তিক। ভগবান তুমি আছ, বলে বিহ্বল হওয়া নয়। তুমি আছ কি নেই, তোমার রূপ কি। অরূপ, স্বরূপ, সগুণ, নির্গুণ পরের

কথা। শেষকালে দেখা যাবে। বিদায়ের আগে বলা যাবে। আপাততঃ আমি আর তুমি। আমি আর আমার বিশ্ব। মানুষ আর মানুষ—এই হলো একমাত্র কথা। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার।"

বরাহনগর মঠের একটি দিন। কথা হচ্ছে। রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলছেন: "এখানে থেকে তো কিছু হলো না।" কি হলো না? ভগবান দর্শন। তাহলে কি করতে হবে? "চল নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।"

নরেন্দ্রনাথ মানতে পারছেন না। বলছেন: "বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস?"

ঠিক ঐ অবস্থায় স্বামীজী পরিব্রাজকের জীবনও পছন্দ করছেন না। ঠাকুরের মতোই—"গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি, কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।" তীর্থে তীর্থে ভ্রমণে কি জ্ঞান বাড়বে। যদি বিশ্বাসই না এল। ঈশ্বরের জ্ঞান তো বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত হয় না। ভিতরে জাগে। বিশ্বাসের জন্মভূমি মন। জ্ঞান কি? ঠাকুর বলে গেছেন: "তিনি আছেন এইটা জ্ঞান। বাকি সব অজ্ঞান।" নরেন্দ্রনাথ সাধনা বলতে বোঝেন—Resignation, Absolute Dependence on God. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে 'কোথায় তিনি, কোথায় তিনি' করে ঘোরাটা অর্থহীন। মুক্তি মনে। ঠাকুর কুটীচক বহূদকের কথা বলেছেন। দুরকমের সাধক, বহূদক আর কুটীচক। ঠাকুর বলছেন: "সাধকদের ভিতরও কেউ কেউ অনেক তীর্থে ঘোরে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না; অনেক তীর্থের উদক—কিনা জল খায়। যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে যায়, তখন এক জায়গায় কুটির বেঁধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেষ্টাশূন্য হয়ে ভগবানকে চিন্তা করে।"

স্বামীজীর কথায় এই কুটীচকের মনোভাবই সুস্পষ্ট। তাহলে কেন তিনি হঠাৎ বেরিয়ে পড়লেন। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীচৈতন্য যেন কালান্তরের একই শক্তির দুই ভিন্ন দেহধারী, দুই নামরূপ। চব্বিশ বছর বয়সে দুজনেই সংসারত্যাগী। দুজনেই পালন করে গেছেন বিশাল সামাজিক দায়িত্ব। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সংস্কারকের ভূমিকা। স্বামীজী বৈদান্তিক প্রেমিক। শ্রীচৈতন্য ভাববিভোর প্রেমিক। দুজনেরই উদ্দিষ্ট মানুষ—বিচিত্র অবস্থায় পড়ে থাকা ভারতের জনসাধারণ। দুই ভিন্ন আবেগে দুজনেই পরিব্রাজক। আমার ঘরেই থাকা দায়, বলে দুজনেই অবশেষে ভারততীর্থের পথিক। নরেন্দ্রনাথ বিচলিত হয়েছিলেন বৃত্তির ওপর বিত্তের প্রভাব দেখে। শ্রীচৈতন্যের কালে মধ্যবিত্ত ততটা প্রবল হতে পারেনি যতটা হয়েছিল স্বামীজীর সময়ের বৃটিশ ভারতে। স্তরবিভক্ত সমাজ। রাজা-মহারাজার দল, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী, তাদের পায়েরখাঁ, সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত, জাতপাতে বিভক্ত নিচের তলার মানুষ। অর্থনীতির বিপর্যস্ত রূপরেখা, পুরোহিতদের হাতে পড়ে ধর্ম নিপীড়নের অস্ত্র। স্বামীজী জ্বলছেন। বিরজা হোম করে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে তিনি ও তাঁর দশজন গুরুভাই সন্ন্যাস নিয়ে নিয়েছেন। সেই হোমের শিখায় জ্বলে উঠেছে চৈতন্যের সমিধ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ জেগে উঠেছেন অন্তরে। কেবলই যেন বলছেন: "তোর হাড় ফরবে।" বৈষ্ণবের ধর্ম—জীবে দয়া। তুই দয়া করবার কে? দয়ার ভিতরেও প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। তাহলে তোমার দর্শন কি হবে নরেন্দ্রনাথ। "জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" ঠাকুরের কথা শুনে স্বামীজী তাঁর অন্তরঙ্গদের বলেছিলেন: "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম… ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব।"

কাদের কাছে প্রচার করবেন? কি প্রচার করবেন? সমাজের ওপরতলাকে নিচের দিকে ঝোঁকাতে হবে। যাঁরা শিক্ষিত তাঁদের বোঝাতে হবে, নিরক্ষরতা অভিশাপ। "দরিদ্র মানুষ যদি শিক্ষার কাছে না পোঁছাতে পারে তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যেতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, কি করে তা সম্ভব হবে? নিঃস্বার্থ, সৎ ও শিক্ষিত শত শত ব্যক্তি আমি সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে পাব। এদেরকে গ্রামে গ্রামে, প্রতি দ্বারে দ্বারে শুধু ধর্মের নয়, শিক্ষার আলোকও বহন করে নিয়ে যেতে হবে। জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নতি

করাই জাতীয় জীবনগঠনের পন্থা।" স্বামীজী আর কি বললেনঃ "শিক্ষিত মানুষ তোমরা বিশ্বাস-ঘাতক। যাদের বঞ্চিত করে শিক্ষিত হলে তাদের কথা একবারও ভাবলে না। অশিক্ষিত, ইতর বলে তাদের ঘৃণা করলে। তোমরা ট্রেটর—বিশ্বাস-ঘাতক।" এরপরই স্বামীজী এমন এক বিস্ফোরক কথা বললেন যা হলো অগ্রচিন্তা। সেকালে বসে একালের কথা বলা। যে-কথায় একালের মণ্ডল-কমিশনও ম্লান মনে হবে। স্বামীজী লিখছেনঃ "যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক কাহাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হইবে। অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশজন শিক্ষকের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম।"

স্বামীজী ধনী ও রাজন্যবর্গদের বলতে চেয়েছিলেন—দেশের জনসাধারণের কথা ভাবুন। ভোগ করুন ক্ষতি নেই, শোষণ করবেন না। ভারতকে ভারতের আদর্শে গড়ে তুলুন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে স্বামীজী সাহস করে বলতে পেরেছিলেন চিরকালের শেষকথাঃ "গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর ওপর কোন ভরসা রেখো না। তাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নেই—তারা একরকম মৃতকল্প বললেই হয়। ভরসা তোমাদের ওপর যারা পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী। ভগবানে বিশ্বাস রাখো।"

ঠাকুরই স্বামীজীকে বসতে দিলেন না বরাহনগরের মঠে। ভাসিয়ে দিলেন তাঁর নির্বিকল্প সমাধির স্বপ্ন। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার।" যাও, সেই রূপ তুমি আগে দেখে এস। পরিকল্পনা তৈরি করতে হলে তদন্তের প্রয়োজন। বিজ্ঞানীর দুটি অস্ত্র—অবজারভেশান এবং ইনফারেন্স। সোস্যাল জাস্টিসের কথা বলতে গেলে বহু স্তরে বিভাজিত সমাজকে তুমি দেখো। আসমুদ্রহিমাচলের জনজীবনকে তুমি প্রত্যক্ষ করো। বহু ভাষা, বহু জাতি, বহু লোকাচার, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের নকশা অতি জটিল। বঞ্চনা সর্বস্তরে। সমগ্র ভারত তোমার তীর্থ, ঈশ্বর তোমার কোটি মানব। ভারতের সমস্যাটা কোথায়? স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখছেনঃ "ভারতে দুই মহাপাপ, মেয়েদের পায়ে দলানো, জাতি জাতি করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা।"

বরাহনগর মঠ থেকে পরিব্রাজক হিসাবে তিনি প্রথম বেরোলেন ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে। যাত্রাপথ কাশী-অযোধ্যা-লখনৌ-আগ্রা-বৃন্দাবন-হৃষীকেশ। বছরের শেষের দিকে ফিরে এলেন কলকাতায়। দ্বিতীয়বার যাত্রা শুরু ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে। সেবারের পথ—এলাহাবাদ, গাজীপুর, কাশী। তিনমাসের পরিভ্রমণ। সেই বছর ৩ আগস্ট আবার বেরোলেন। এই ভ্রমণ সবচেয়ে ব্যাপক ও দীর্ঘকালস্থায়ী। পথ—সারা ভারত। ভাগলপুর-বৈদ্যনাথ-গাজীপুর-কাশী-অযোধ্যা-নৈনীতাল-আলমোড়া-মীরাট-দিল্লী হয়ে রাজপুতানা, সেখান থেকে পশ্চিম ভারত, পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ভারত।

সর্বস্তরের মানুষকে স্বামীজী দেখলেন। অন্তরঙ্গ দর্শন। একাধিক রাজা ও রানীর সঙ্গে পরিচয় এই ভ্রমণেই। তাঁদের মনের প্রসার ঘটালেন স্বামীজী। জনকল্যাণই যেন তাঁদের আদর্শ হয়। বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। স্বামীজী তাঁদের সামনে তুলে ধরলেন শাস্ত্র ও ধর্মের যথার্থ মর্মবাণী, দেশের উন্নতির সঠিক পথ। সেই পথের মন্ত্রঃ "বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায়।" "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" নিজেদের উৎসর্গ করাই শ্রেষ্ঠ ব্রত।

তিনি তাঁর ভারতদর্শনের আবিষ্কার পরিষ্কার ভাষায় লিখে গেছেন। সেই ব্যাধির তালিকায় আছে—এক, ঘোর জড়বাদ আর তারই প্রতিক্রিয়ায় ঘোর কুসংস্কার। দুই, পাশ্চাত্যবিদ্যার মদিরাপানে মত্ত একদল মনে করছেন, আমরা সব জানি, প্রাচীন ঋষিরা উপহাসের চরিত্র। তাঁরা মনে করেন, হিন্দু-জাতির সমুদয় চিন্তা কেবল কতকগুলি আবর্জনা-স্তূপ, হিন্দুদর্শন কেবল শিশুর আধো-আধো কথা আর হিন্দুধর্ম নির্বোধের কুসংস্কার মাত্র। তিন, কিছু শিক্ষিত মানুষ আছেন, তাঁরা বাতিকগ্রস্ত। তাঁদের কাছে প্রত্যেক গ্রাম্য কুসংস্কারটিই বেদ-বাণীতুল্য, সেইগুলি প্রতিপালন করার ওপর জাতীয় জীবন নির্ভর করছে। [ক্রমশঃ]

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

সয়াবীন একটি প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য

সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ

মানুষের জীবনে খাদ্যের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যের গুণগত মান সঠিক পর্যায়ের না হলে শারীরিক এবং মানসিক গঠনের মধ্যে অনেক খুঁত থেকে যায়। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য শরীরের পক্ষে অপরিহার্য। প্রোটিন ভেঙে তৈরি হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino acid)। দেখা যায়, নিরামিষ খাদ্যে প্রোটিন যতটা থাকে সাধারণতঃ খাদ্য বাছাই করে না খেলে ঐ সামান্য প্রোটিনে শরীরের পূর্ণ চাহিদা মেটে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'সয়াবীন' (Soyabean) সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি একটি নিরামিষ প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য।

চীনারা আর জাপানীরা আজকাল খাদ্যতালিকায় ব্যাপক হারে সয়াবীন রাখছে। ভারতে অবশ্য সয়াবীনের বাজার এখনো সীমিত। অথচ এই সয়াবীনের মধ্যে খাদ্যের সবকটা গুণই প্রায় বর্তমান। এর মধ্যে প্রোটিন রয়েছে ৪০ শতাংশ, স্নেহজাতীয় পদার্থ ২ শতাংশ। তাছাড়া রয়েছে ৪ শতাংশ খনিজ দ্রব্য (minerals), কার্বোহাইড্রেট এবং প্রচুর ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স।

সয়াবীন সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী চালু আছে। প্রায় চারহাজার বছর আগে চীনের পূর্ব সীমানায় একবার একদল ব্যবসায়ী একটি দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। প্রাণের ভয়ে তারা নিকটবর্তী এক গিরিগুহায় লুকিয়ে পড়ে। এভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায় বেশ কিছুদিন থাকার জন্য স্বভাবতই আহার্য এবং পানীয়ের অভাব ঘটে। ব্যবসায়ীরা তখন খিদের তাড়নায় গিরিগুহার এধারে ওধারে খাদ্য অন্বেষণে মরিয়া হয়ে ঘুরতে থাকে। ঠিক তখনি তারা সীমজাতীয় এক ধরনের ফল দেখতে পায়। খিদের জ্বালায় তারা সেই সীমের ভিতরকার দানা পেটপুরে খেতে থাকে। তাদের খিদে নিবৃত্ত হয়। এরপর থেকে ব্যবসায়ীরা যতদিন পর্যন্ত ঐ গিরিগুহায় ছিল ততদিন ঐ দানা খেয়েই তারা জীবনধারণ করে। শুধু তাই নয়, ঐ দানা খাওয়ার ফলে ওদের মধ্যে শক্তির প্রাচুর্য ঘটে।

যাই হোক একদিন যখন ঐ ব্যবসায়ীরা গিরিগুহা থেকে মুক্তিলাভ করল সেদিন ওরা ঐ জীবনদায়ী ফল সঙ্গে নিতে ভোলেনি। দেশে ফিরে ঐ দানার চাষে তারা মন দেয়। শুরু হয় সয়াবীনের চাষ। এশিয়াতে এভাবেই নাকি সয়াবীনের আবির্ভাব ঘটেছিল।

এরপর দেখা দেখা যাচ্ছে, অ্যাঞ্জেলবার্ট কেম্ফার নামে এক জার্মান উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে জাপান থেকে ইউরোপে সয়াবীন আমদানী করেন। ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে জাহাজবাহিত মালের সন্ধানে আমেরিকার একটি জাহাজ চীনের উপকূল-পথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। এই যাত্রা দীর্ঘকালীন হওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন খাদ্যঘাটতি মেটানোর জন্য চীন থেকে কয়েক ব্যাগ সয়াবীন তুলে নিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেনের এই প্রচেষ্টায় এইভাবে আমেরিকাতেও সয়াবীন পৌঁছে যায়।

কিন্তু পরের শতাব্দীতে আমেরিকাতে সয়াবীনের তেমন কদর হলো না। শুধুমাত্র অশ্ব এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে এর ব্যবহার সীমিত রাখা হলো। এসময়ে আমেরিকাবাসীর ধারণা হয়েছিল, রঙ উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে তিসির তেল অপেক্ষা সয়াবীন তেলের গুণমান নিকৃষ্ট এবং খাদ্য হিসাবেও এই তেল কাপাসবীজের তেল অপেক্ষা নিম্নমানের। পশুখাদ্য হিসাবেও সয়াবীনের স্থান নির্দিষ্ট হলো দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

কিন্তু এর পরেই আমেরিকাতে আবার সয়াবীনের কদর বাড়তে থাকে। এজন্য আমেরিকার কৃষিবিজ্ঞানী উইলিয়াম মোসেফ মোরেস প্রধান কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। তিনি সয়াবীনকে গবাদ পশুর একমাত্র উপযুক্ত খাদ্য হিসাবে সুপারিশ করে সরকারকে জানান। মোরেস অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সয়াবীনের গুণমান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। চাষীদের কাছে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে দেশের কৃষি-পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লেখা শুরু করলেন। এছাড়া উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী এবং চাষীদের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সয়াবীন সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা দিলেন। এভাবে একদিন আমেরিকাবাসীদের কাছে সয়াবীন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যের স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

আমেরিকা সরকার সয়াবীনের মূল্যমান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে মোরেসকে সয়াবীন সম্বন্ধে একগুচ্ছ প্রচারপুস্তিকা লিখতে অনুরোধ জানান। মোরেস সে-অনুরোধে সাড়া দিয়ে প্রায় চল্লিশখানি প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি ঝটিকাগতিতে দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত ঘুরে ঘুরে চাষী, বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিদের সয়াবীন উৎপাদন বাড়াতে এবং উচ্চমানের সয়াবীনের বীজ তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁরই একক প্রচেষ্টায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক হাজারের বেশি ধরনের বীজ ভার্জিনিয়াতে এসে পৌঁছায়। এর ফলে সয়াবীন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়। মোরেস প্রমাণ করলেন, বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এক কিলোগ্রাম সয়াবীনে ৭৯২ গ্রাম উচ্চমানের প্রোটিন এবং ১৭৮ গ্রাম তেল পাওয়া যায়। তিনি আরও বললেন, গোটা পৃথিবীতে যখন প্রোটিনের অভাব চলছে, সেই মুহূর্তে পশু-মাংস থেকে প্রোটিন সংগ্রহ না করে স্বল্প দামের সয়াবীন থেকে প্রোটিন সংগ্রহ করা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। অবশ্য সয়াবীনের প্রোটিনে অতি আবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড, মিথিয়োনিনের অভাব আছে।

সয়াবীনজাত খাদ্যের ব্যবহার সত্যিই চমকপ্রদ। কৃত্রিম মাখন থেকে শুরু করে হিমশীতল মিষ্টান্ন, এমনকি আঠা ও ছাপার কালিতে সয়াবীনজাত দ্রব্য যাদুর চমক আনছে। দুধসাদা রঙে, পিচ্ছিল তেলে, রবার টায়ারে ও অ্যান্টিবায়োটিক্সে পর্যন্ত সয়াবীন-জাত দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে। কেক, রুটি, মচমচে বিস্কুট ইত্যাদিকে উৎকৃষ্টতর করার জন্যও সয়াবীন মেশানো হয়। জমির সার, কাঠে লাগানোর আঠা, নৌকার ছিদ্র বন্ধ করা, কীটপতঙ্গ-নাশী ওষুধ, পরিশোধনীয় পদার্থ ইত্যাদিতে সয়াবীন লাগে।

সয়াবীন থেকে তফু (Tofu) নামে একরকমের সুস্বাদু দই তৈরি করা যায়। এটি খুবই মুখ-রোচক। শুকনো সয়াবীনের সঙ্গে চর্বি মিশিয়ে একধরনের পনির (Cheese) তৈরি করা যায়। এর থেকে মাখন বের করে নিয়ে চাপের মধ্যে রেখে শক্ত শক্ত গুটি তৈরি করা হয়। এগুলি মাংসের মতো রান্না করে বা তরকারির মধ্যে দিয়ে রান্না করলে খেতেও ভাল লাগে পরন্তু প্রচুর প্রোটিনও পাওয়া যায়।

আজকাল আটা, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদিতে উন্নত-মানের পুষ্টি জোগানোর জন্য সয়াবীন মেশানো হচ্ছে। সয়াবীনের খাদ্য শরীরে বল জোগায় এবং শরীরের চর্বি ও শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখে। সেইজন্য বহুমূত্র এবং কোলেস্টেরলের সমস্যাজনিত রোগের পক্ষে সয়াবীনের খাদ্য বিশেষ উপকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। যারা গরুর দুধ হজম করতে অসমর্থ তাদের জন্য সয়াবীনজাত দুধ খুবই উপযোগী। কারণ এই দুধে সোডিয়ামের (Sodium) মাত্রা গরুর দুধ থেকে অনেক কম থাকে। রক্তের উচ্চচাপজনিত রোগের ক্ষেত্রেও এই দুধ উপকারী।

আমেরিকার এক সমীক্ষাতে দেখা যায়, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে সেখানে সয়াবীনের উৎপাদন হয়েছিল ৩,৭৮,০০০ টন। এর ৫০ বছর পরে ১৯৭৮-৮০ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় গড়ে সয়াবীন উৎপাদন হয়েছিল ৫৪'৪ মিলিয়ন টন। প্রায় ৬,৩০,০০০ আমেরিকান চাষী ২৭'১ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সয়াবীনের চাষ করে। প্রতি হেক্টরে গড়ে ৩৪৭ কিলোগ্রাম সয়াবীন উৎপাদিত হয়।

অধুনা আমেরিকান কৃষি-গবেষকরা বিভিন্ন আবহাওয়ার উপযোগী এবং অল্প বৃষ্টিতে উন্নত-ধরনের প্রচুর দানাবিশিষ্ট সয়াবীন উৎপাদনের জন্য দো-আঁশলা বীজ উৎপাদনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গবেষকদের ধারণা, এভাবে বীজ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে পৃথিবীর সব প্রান্তেই সয়াবীন চাষ সম্ভব করে তোলা যাবে। ফলে প্রোটিন-অপুষ্টিতে আক্রান্ত জনসাধারণের পক্ষে এটা হবে আশীর্বাদ।

তাঁরা জানিয়েছেন এক হেক্টর জমি যদি পশু-পালনের জন্য বরাদ্দ করা যায় তবে সেই পশুমাংস থেকে একজন লোকের ১৯০ দিনের উপযোগী প্রোটিন পাওয়া যায়। যদি ঐ জমিতে গমের চাষ করা যায় তবে একজনের উপযোগী ২,১৬৭ দিনের প্রোটিন মিলবে, কিন্তু ঐ জমিতে যদি সয়াবীনের চাষ করা যায় তাহলে একজনের উপযোগী ৫,৪৯৬ দিনের প্রোটিন পাওয়া যাবে।

অতএব নিঃসন্দেহে সয়াবীন হলো প্রোটিন-সমৃদ্ধ এক উন্নতমানের প্রাকৃতিক সম্পদ। সয়াবীনের উৎপাদন, গুণগত মান বাড়ানো এবং খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যেই পৃথিবীর লোকের প্রোটিন খাদ্য-সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। ☐

গ্রন্থ-পরিচয়

অধ্যাত্মজীবন ও সাধনা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ রচনা সংকলন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ শতবার্ষিকী উৎসব সমিতি, ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১। মূল্য: চল্লিশ টাকা।

মহাপণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজের মাহাত্ম্য ও বৈদগ্ধ্যের কথা সর্বজনবিদিত। আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি যেমন বহু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন, জ্ঞানের পথেও তেমনি। তাঁর মহতী প্রজ্ঞা এবং অধ্যয়নের বিশাল পরিধি—দুই-ই সমান বিস্ময়কর। অজস্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা, যেগুলির অধিকাংশ ধর্ম, দর্শন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধীয়। এগুলি সংস্কৃত, বাঙলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় রচিত। এর বেশকিছু এখনো অপ্রকাশিত অথবা গ্রন্থাকারে অগ্রথিত। এগুলি জাতির মহার্ঘ সম্পদ। প্রকাশক যথার্থই বলেছেন: "পূজনীয় কবিরাজ মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে যে নিরবচ্ছিন্ন সারস্বত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার স্বর্ণময় উজ্জ্বল ফসল তাঁহার অজস্র রচনাবলীতে সকলের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়াই তিনি অমর হইয়া থাকিবেন এবং চিরদিন সকলের মনে প্রেরণা দান করিয়া চলিবেন।"

আলোচ্য গ্রন্থটি আচার্য গোপীনাথের আট-চল্লিশটি নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলন। দু-একটি ব্যতীত সবগুলি রচনাই ধর্ম, আধ্যাত্মিক জীবন কিংবা দর্শন সংক্রান্ত। এগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট। এগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে 'শ্রীগুরু', 'অধ্যাত্মজীবনে গুরুর স্থান', 'দীক্ষার স্বরূপ' তেমনি রয়েছে 'কুণ্ডলিনী তত্ত্ব', 'মাতৃকা রহস্য', 'ষট্‌চক্রভেদের রহস্য', 'তান্ত্রিক সাধনা ও মন্ত্রনয়'।

আচার্য গোপীনাথ মনে করেন যে, বিশ্বসৃষ্টি পরমশিব থেকেই হয়েছে; কিন্তু পরমশিব-তত্ত্ব বুঝতে হলে তার অন্তরালবর্তী অবস্থাও বোঝা দরকার। সে-রহস্য নিগূঢ়। তন্ত্রশাস্ত্রের দৃষ্টি অনুসারে লেখক তা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি সুফী মতবাদের উল্লেখ করেছেন। এসব বিষয় ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন, প্রায় অসম্ভব বলা যায়; তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায়—"যতো বাচো নিবর্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তবু লেখকের প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে, কারণ তিনি নিজে মরমী ও কবি।

'শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ'ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই নিবন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। লেখক মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ভগবৎ-তত্ত্বের স্বরূপভূত হয়েও তার অতীত একটি দিক, যেটা উপলব্ধি করতে না পারলে ভগবৎ-তত্ত্বের পূর্ণ আস্বাদন করা যায় না। লেখকের কয়েকটি পঙ্ক্তি উধৃত করছি: "···আনন্দ জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। তাই মায়া বা কালের রাজ্যে আসিয়াও জীব হারানিধির ন্যায় নিরন্তর এই আনন্দেরই অন্বেষণ করিতে থাকে। অন্বেষণ করে আনন্দের, কিন্তু পায় দুঃখ, কারণ অবিদ্যার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত জীব বিপরীত গতি-বিশিষ্ট হইয়াই ধাবিত হয়। ভগবানের প্রতি বৈমুখ্যই আত্মবিস্মৃতির কারণ এবং আত্মবিস্মৃতিই মায়ারাজ্যে পতনের হেতু।" আর একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক পঙ্ক্তি উধৃত করা প্রয়োজন: "কারণ-জগতের এই ভিতরের দিকই ভাবরাজ্যের ব্যাপার, যাহার প্রস্ফুটিতরূপ ভগবৎ প্রেম এবং যাহার পরিণত ফল ভগবৎ-সাযুজ্য বা মহামিলন। এই মহাভাবময় প্রেমরাজ্যে চিন্তার কোন স্থান নেই। সুতরাং যোগীর ষষ্ঠভূমি ভগবৎ প্রেমের ও ভগবানের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বিকাশের স্থান। এই আকাঙ্ক্ষার একটা দিক বিরহ-বোধ, ইহা অতি মূল্যবান সম্পদ।" (দ্রঃ 'আমি কে? মনুষ্যজীবনের অভিব্যক্তি ও পরম আদর্শ') এর কিছু পরে, একই প্রবন্ধে আমরা পাই: "ভগবৎ সাক্ষাৎকারের ফলে ছোট আমিটি হারাইয়া যায়—এক অনন্ত ব্রহ্মদর্শন বিরাট আমিকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান থাকে। এইভাবে যতদিন ইচ্ছা অবস্থান করা সম্ভবপর।"

সংকলনে অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে 'শক্তির

জাগরণ', 'ইচ্ছাশক্তি', 'মন্ত্র রহস্য', 'শব্দের মহিমা', 'সিদ্ধ পুরুষ', 'গীতায় জীবনের লক্ষ্য' এবং 'পূর্ণের স্বরূপ'।

এই সযত্ন-সম্পাদিত সুন্দর সঙ্কলন-গ্রন্থটি থেকে আমরা সাধক ও মনীষী গোপীনাথের 'অপার ও অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও দীপ্তির যে-চকিত উদ্ভাস' পাই তা আমাদের চিত্ত ঝলমলিয়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত। তবু মনে হয় যে, যদি তাঁর সাহিত্য-মীমাংসা বিষয়ক অসামান্য কয়েকটি নিবন্ধ থেকে আরও দুটি একটি এখানে নির্বাচিত হতো, তাহলে এ-সঙ্কলন সুন্দরতর ও ব্যাপকতর হতে পারত। মাত্র একটি এখানে রয়েছে—'রস ও সৌন্দর্য'। এটি অবশ্য নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম, এবং সেটি শেষ হচ্ছে এই ভাবে:

"যেদিকে তাকাই সেদিকেই যদি সৌন্দর্য না দেখিতে পাই, যাহাকে দেখি তাহাকেই যদি ভালবাসিতে না পারি, তবে রসসাধনার সিদ্ধি হয় নাই বুঝিতে হইবে। সৌন্দর্য অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয় না, ভালবাসার কোন হেতু নাই। পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ প্রেমের সহিত স্বাভাবিক মিলনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের যাবতীয় বস্তুর সহিতই স্বাভাবিক মিলন ফুটিয়া উঠে, যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন কেহই পর থাকে না, কিছুই কুৎসিত থাকে না।..."

মানুষের জীবনে সৌন্দর্যসাধনার এটাই কি শেষ কথা নয়?

ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় অন্যত্র ঠিকই লিখেছেন যে, অগাধ দর্শনশাস্ত্র-সঞ্চারী গোপীনাথ কাব্যামৃতকেও 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' মনে করেছেন। গোপীনাথের সাহিত্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি পড়লে সেটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 'রবীন্দ্রনাথ ও বলাকা', 'বায়রন', 'ব্রাউনিং' প্রভৃতি রচনাগুলি বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির উপযুক্ত। নতুন সংস্করণের উৎকর্ষ আরও বাড়বে যদি লেখকের একটি আলোকচিত্র, সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী যোগ করা হয়। সঙ্কলিত রচনাগুলির উৎস ও প্রথম প্রকাশের তারিখ নির্দেশ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। গ্রন্থের একটি নির্ঘণ্টও থাকা বাঞ্ছনীয়।

ক্যাসেট সমালোচনা

তবু মন মজেছে

হর্ষ দত্ত

মজ মন চরণে: বেচুগোপাল দে। সি বি এস। মূল্য: পঁচিশ টাকা

সি বি এস লেবেলে প্রকাশিত **'মজ মন চরণে'** শীর্ষক ভক্তিগীতির ক্যাসেটটি এক উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। ভক্তিরসে আধুনিকতার ভেজাল আমদানির চতুর ও চালু ব্যবসার পাশে এই ক্যাসেটটি নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী নিবেদন।

শিল্পী বেচুগোপাল দে একজন উদাত্ত-কণ্ঠ গায়ক। সহজ, অনুত্তেজক ও সমর্পিত তাঁর গায়ন-ভঙ্গি। যে-গানের যা দাবি বেচুগোপালবাবু তা আন্তরিকতার সঙ্গে মিটিয়েছেন। মনে হয়, ধ্যান-গম্ভীর মঠপ্রাঙ্গণে বসে তাঁর গান শুনছি।

সাধারণভাবে ভক্তিগীতি বলা হলেও, এই ক্যাসেটের অধিকাংশ গানই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত। ইনলে কার্ডে অঙ্কিত, দক্ষিণেশ্বরের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। তবে শ্যামা, সারদা এবং ঠাকুরের শিষ্যরাও গানের ভিতরে প্রসঙ্গক্রমে এসেছেন। গানগুলির সুরারোপ প্রশংসনীয়, যদিও কয়েকটি গানের বাণী-বিন্যাস খুব উচ্চমানের নয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে তা সুরের প্রবাহে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ছন্দপতন ঘটিয়েছে বাণীর দুর্বলতা।

বাউলাঙ্গের প্রথম গান 'কামারপুকুরে গদাধর' দিয়ে ক্যাসেটের শুরু। শেষ গান কীর্তনাঙ্গের 'ঐ মোহন গদাধর'। মোট বারোটি গানের এই ডালির ভিতর 'মন কেন তুই', 'যদি হৃদ্‌কমল', 'মহামায়া এলেন ঐ', 'তানপুরার চারটি তারে' উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা। রাগ-রাগিণীর যথোচিত মিশ্রণে শিল্পীকৃত সুরারোপ মনে রাখার মতো।

সব মিলিয়ে সঙ্গীতানুরাগীমাত্রেই মজে যাবেন এই ক্যাসেটটি শুনে। শিল্পী বেচুগোপাল দে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে সঙ্গীতাঞ্জলি সমর্পণ করেছেন, তা ভক্তপ্রাণে প্রেরণা যোগাবে। ☐

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১ জুলাই (১৯৯২) **রামকৃষ্ণ মিশন জলপাইগুড়ি আশ্রমের** নব-সংস্কৃত মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর মূর্তির উভয় পার্শ্বে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী মহারাজের সুদৃশ্য প্রতিকৃতি কারুকার্য-মণ্ডিত কাঠের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এখানে তিনদিন অবস্থান-কালে তিনি সমাগত ভক্ত ও জিজ্ঞাসুবৃন্দকে আধ্যাত্মিক উপদেশাদি প্রদান করেন।

ভক্ত-সম্মেলন

গত ২৬-২৮ জুন ১৯৯২, **তমলুক রামকৃষ্ণ মঠ** আয়োজিত ত্রয়োদশ ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই ভক্ত-সম্মেলনে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত, হাওড়া, কলকাতা এমনকি বিহার থেকেও ভক্তগণ এসেছিলেন। আবাসিক ও অনাবাসিক মিলিয়ে মোট ২১০ জন ভক্ত এতে যোগদান করেন।

২৬ জুন তমলুক মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দের স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনায় স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ, স্বামী গোপেশানন্দ, স্বামী অকল্মশানন্দ, স্বামী সমাত্মানন্দ, স্বামী হরিদেবানন্দ, স্বামী একরূপানন্দ এবং দীপককুমার দত্ত অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সন্ন্যাসিবৃন্দ বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলির সারমর্ম আলোচনা করেন। এবারের সম্মেলনে নতুনভাবে সংযোজিত হয় গোষ্ঠী-আলোচনাচক্র ও সমবেত সঙ্গীত। এর মাধ্যমে যোগদানকারী ভক্তগণ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। অনুষ্ঠানটি একক ও সমবেত সঙ্গীত, গোষ্ঠী-আলোচনাচক্র এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সেমিনার

গত ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি **দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ** প্রাক্তন ছাত্রদের এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'বর্তমান সমাজে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাক্তন ছাত্রদের ভূমিকা'।

সেমিনারের উদ্বোধন করেছিলেন তদানীন্তন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী। সেমিনারে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সহ কয়েকজন প্রবীণ সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, 'দ্য রামকৃষ্ণ মিশন অ্যালাম্নি অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সর্বভারতীয় সমিতি গঠন করা হোক, রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির সকল প্রাক্তন ছাত্রই যার সদস্য হতে পারবে।

উদ্বোধন

গত ১৩ আগস্ট **তমলুক আশ্রমের** নবনির্মিত সাধুনিবাসের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

গত ১৭ আগস্ট **মাদুরাই আশ্রমের** নবনির্মিত বিদ্যালয়গৃহের উদ্বোধন করা হয়েছে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১০ জুন **পুরী মঠের** প্রস্তাবিত সাধুনিবাস ও ভোজনালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

গত ১১ জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত **পুরী মঠে** ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভুবনেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজীর ভাষণ সমবেত ভক্তগণকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করে। স্বামী নির্জরানন্দ এবং স্বামী দীনেশানন্দ সম্মেলনে ভাষণ দেন।

চিকিৎসা-শিবির

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন গত ৩০ জুলাই পুরী শহর থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে চকপদা গ্রামে এক চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে দুজন দন্তচিকিৎসক ও একজন সাধারণ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ১৬৫ জনের দন্তচিকিৎসা এবং ১৭০ জন রোগীর অন্যান্য চিকিৎসা করা হয়।

পুরী মঠের পরিচালনায় চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবিরে যেসকল রোগীর চক্ষু-অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, গত ৭ মে এক অনুষ্ঠানে উড়িষ্যার

রাজ্যমন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ নায়েক তাদের মধ্যে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

'সদ্ভাবনা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা'য় বাঙলায় প্রবন্ধ রচনা করে সারদাপীঠের **রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের** একজন ছাত্র চল্লিশ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার ও একটি জাতীয় স্বীকৃতিপত্র পেয়েছে। পুরস্কার প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসিংহ রাও। তাছাড়া এই ছাত্রটি উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রতিমাসে চারশো টাকা করে পাঁচ বছর বৃত্তি পাবে।

ত্রাণ

মহারাষ্ট্র খরাত্রাণ

বোম্বাই আশ্রমের মাধ্যমে সোলাপুর জেলার বরশী তালুকের ছয়টি খরাপীড়িত গ্রামের ৪৩৬টি পরিবারের মধ্যে ২৩০০ কিলোঃ খাদ্যশস্য এবং ১৯০৪টি গো-মহিষের জন্য ৪৮,৩৬৫ কিলোঃ পশুখাদ্য পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৪২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের পোশাক দেওয়া হয়।

তামিলনাড়ু কুষ্ঠত্রাণ

সালেম আশ্রম তামিলনাড়ুর দেবীয়া-কুরিচিহর ভালাইবাসাল সরকারি কুষ্ঠ-পুনর্বাসন আবাসনে কুষ্ঠ-রোগীদের মধ্যে ৩০০ কম্বল, ৩০০ তোয়ালে, ৩০০ ফতুয়া এবং ৩০০ খাবার প্যাকেট বিতরণ করেছে।

উড়িষ্যা ঝঞ্ঝাত্রাণ

পুরী রামকৃষ্ণ মঠ গত ১৭ জুনের সামুদ্রিক ঝড়ে যে ৩৪ জন জেলে এখনো নিখোঁজ রয়েছে তাদের পরিবারবর্গের মধ্যে ৪২টি শাড়ি, ১৬টি ধুতি ও ৯০ সেট শিশুদের পোশাক বিতরণ করেছে। গত ১২ আগস্ট এক অনুষ্ঠানে পুরীর বিধায়ক উমাবল্লভ আশ্রমের পক্ষে এগুলি বিতরণ করেন। তাছাড়া পুরী জেলার পেন্টাকোটা গ্রামে ৮০ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রতিদিন এই মঠের পক্ষ থেকে টিফিন দেওয়া হচ্ছে।

পুনর্বাসন

উত্তরকাশী জেলার ভাতওয়ারি তহশিলের নেতালা গ্রামে ৮টি বাড়ি ছাদ-স্তর পর্যন্ত এবং ১২টি বাড়ির স্টীলের কাঠামো পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) গত ৬ মার্চ এবং ৭ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেছে। প্রথম দিন বিশেষ পুজাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দশ হাজার ভক্তকে এদিন খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। ৭ থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় আলোচনাসভা। সভাগুলিতে মহম্মদ আশরাফ, ডঃ আমিনুল ইসলাম, নিশিরঞ্জন সাহা, সুলতানা রাজিয়া হল, সোফিয়া করিম, ডঃ মারুফী খান, সুস্মিতা সাহা, এম. রেজাউল করিম, ডঃ হুমায়ুন আহ্‌মেদ, যতীন সরকার, কান্তিবন্ধু ব্রহ্মচারী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তিনদিনই ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দ। ১০ এপ্রিল রথীন রায়, মহিউজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

১৪ জুলাই এই আশ্রমে ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মোট ২৫০ জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ এবং ভক্তদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বাঁশরী আচার্য, তৃপ্তি দাস, ডাঃ পীযূষকান্তি রায়, সঞ্জীব হালদার ও অঘোর সরকার।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা): গত ১ জুলাই থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত এই সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় এক সাধন-শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সাধন-শিবিরে যোগদান করেছিলেন। ঐসময় কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা ও নরেন্দ্রপুর ছাত্রাবাসের যেসব প্রাক্তন ছাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপে আছেন তাঁদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

গত ১৪ জুলাই গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে পুজাদি ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। ঐদিন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ গুরুপূর্ণিমা তিথির তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

গত ৩০ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত এক বিশেষ সাধন-শিবির এবং ২৬ সেপ্টেম্বর একদিনের এক সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটিতে সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী

প্রবুদ্ধানন্দ এবং শেষেরটিতে ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ যোগদান করেছিলেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন: গত সেপ্টেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে এই সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এবং মঙ্গলবারগুলিতে তিনি 'দ্য গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া (স্যানফ্রান্সিস্কো): গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। ১৬ সেপ্টেম্বর বুধবার 'বেদান্তের প্রয়োগ' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন বেদান্ত সোসাইটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দ। তাছাড়া ১৯ তারিখ স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশাবলীর ওপর আলোচনা এবং ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্ক: গত ২০ ও ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ প্রতি শুক্রবার ও প্রতি রবিবার যথাক্রমে 'ভগবদ্‌গীতা' ও 'দ্য গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী দেবানন্দ (দেবেন্দ্র মহারাজ) গত ২৬ আগস্ট রাত ২-১৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি কয়েক বছর ধরে বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন। যদিও দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব থেকে তাঁর অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল তথাপি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ সচেতন ও হাসিখুশি ছিলেন।

স্বামী দেবানন্দজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি কনখল সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, শিলং, ফরিদপুর, বরিশাল এবং বলরাম মন্দিরের প্রধান ছিলেন। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিক পর্যন্ত তিনি কাশীপুরে ছিলেন। তারপর থেকে তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। মধুর স্বভাব ও স্নেহশীল ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ **উদ্বোধন কার্যালয়ের** সারদানন্দ হল-এ 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতাব্দী জয়ন্তী' উপলক্ষে একটি মহতী জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রারম্ভিক ও স্বাগত ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রধান অতিথির ভাষণ দেন অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু এবং বিশেষ অতিথির ভাষণ দেন অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু।

এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে তিনটি বই এবং 'শিকাগো বক্তৃতা' নামে একটি অডিও ক্যাসেট প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন নিমাইসাধন বসু। বই তিনটি হলো: শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের 'শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ', শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের 'স্বামীজীর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন' এবং মেরী লুইস বার্কের 'Swami Vivekananda in the West: New Discoveries' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-কৃত বঙ্গানুবাদ ('পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ: নতুন তথ্যাবলী')।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শঙ্কর সোম। স্বামীজীর 'স্বদেশ-মন্ত্র' আবৃত্তি করেন শংকর বসুমল্লিক। প্রায় পাঁচ শতাধিক শ্রোতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' শিরোনামে একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন বরানগরের 'ত্রিশরণ গোষ্ঠী'র শিল্পিবৃন্দ। □

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ইন্দ্রানী পার্ক (কলকাতা-৩৩) গত ২১ ও ২২ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথমদিন প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণাদি অনুষ্ঠিত হয়। কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন যথাক্রমে স্বামী বলভদ্রানন্দ ও স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ভৈরবানন্দ এবং স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন তপন সিন্‌হা ও সম্প্রদায়। দ্বিতীয়দিন ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠান হয়। ঐদিন বস্ত্র-বিতরণ অনুষ্ঠানে ১০৭ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে বস্ত্র ও অর্থ বিতরণ করেন স্বামী ঋতধানন্দ। সন্ধ্যায় মঠ ও মিশনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজীর সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ। সভান্তে স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সবিতাব্রত দত্ত ও শুভব্রত দত্ত। এই উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

গত ৮ মার্চ ১৯৯২ **নারায়ণপুর (উত্তর ২৪ পরগনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে** ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম শুভ আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মঙ্গলারতি, চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, বিশেষ পূজো, হোম, নগর পরিক্রমা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, শ্রীমা কে. জি. বিদ্যালয় কর্তৃক শিশুদের নৃত্যনাট্য প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ এবং স্বামী বলভদ্রানন্দ। দুপুরে প্রায় চার হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উৎসব উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, চকমাণিক (দক্ষিণ ২৪ পরগনা): গত ৫ এপ্রিল উক্ত পাঠমন্দিরের পরিচালনাধীন 'সারদা সেবাসদন' গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বারোদ্ঘাটন করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সরোজ গুপ্ত। বক্তব্য রাখেন স্বামী শিবনাথানন্দ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডেপুটি মেজিস্ট্রেট শৈলেন রায়। স্বামীজীর রচনাবলী থেকে পাঠ করেন শোভনলাল মুখোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে ১৫ জন মহিলা সহ মোট ৬৫ জন রক্তদান করেন।

গত ৫ এপ্রিল, ১৯৯২ **গাভী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ক্যানিং থানা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের** উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৫৭তম জন্মোৎসব পালিত হয়। উৎসবে ভক্তিগীতি, পদাবলী কীর্তন, ধর্মসভা এবং নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। উক্ত ধর্মসভায় স্বামী কমলেশানন্দ সভাপতিত্ব করেন। কমল নন্দী, নরুল আমিন নস্কর, হবিবর রহমান এবং কৃষ্ণকান্ত দত্ত বক্তব্য রাখেন। প্রায় দুই হাজার লোককে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ১ মার্চ **দাঁতন (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমে** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম জন্মোৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা, চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম এবং দুপুরে প্রায় এক হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় স্বামী দেবদেবানন্দ ভাষণ দেন। উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন আশ্রমাধ্যক্ষ মৃত্যুঞ্জয় ভঞ্জ। সন্ধ্যায় সঙ্গীতে কথামৃত পরিবেশন করেন স্বামী দেবদেবানন্দ ও রাত্রি ৯টায় 'রানী রাসমণি' ছায়াছবি দেখানো হয়। পরদিন সন্ধ্যারতির পর রামায়ণ গান পরিবেশিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি): গত ২২-২৪ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি,

ভক্তসম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা প্রতি-যোগিতামূলক অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। উৎসবের তিনদিনই ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী ত্রিপাদানন্দ, স্বামী মঙ্গলানন্দ ও স্বামী ভাগবতানন্দ। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে প্রায় তিনহাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ, হরিণডাঙ্গা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ গত ১২ এপ্রিল নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান-সূচীর অঙ্গ ছিল প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ, পাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন, গীতি-আলেখ্য, ছবি ও মৃৎশিল্পের প্রদর্শনী প্রভৃতি। উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শিবনাথানন্দ।

ধানবাদ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটিতে ৬ মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম আবির্ভাব-তিথি বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন-কীর্তনাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন ধানবাদ এবং সন্নিহিত কয়লাখনি ও শিল্পাঞ্চলের বহু ভক্তদের মধ্যে দুপুরে প্রসাদ দেওয়া হয়। ১৩ মার্চ থেকে তিনদিনের বার্ষিক উৎসবে স্বামী চন্দ্রানন্দ, স্বামী ভাগবতানন্দ, স্বামী শশাঙ্কানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দেন। উৎসবের শেষদিনে রামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সঙ্ঘের শিল্পিবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন।

রামকৃষ্ণ কুটির, নবাদর্শ (বিরাটী, কলকাতা-৫১)ঃ গত ১০ মে নবাদর্শ পল্লীবাসিগণের সহযোগিতায় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম জন্মোৎসব পালন করা হয়েছে। ঐদিন পল্লী-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভবেশ্বরানন্দ। বক্তব্য রাখেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুজিত গুপ্ত, সুনীতি রায়, গীতা শর্মা প্রমুখ।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বাগআঁচড়া (নদীয়া) রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের সভাপতি **অশোককুমার সেন** ৭৭ বছর বয়সে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শেষরাত্রে পরলোকগমন করেন। অকৃতদার, সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী অশোকবাবু বনগাঁর নিকট চাঁদপাড়া গ্রামে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য পৃথক দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় ও সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ যোগা-যোগ ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের এম. এ. প্রয়াত অশোককুমার সেন একজন সফল ব্যবসায়ীরূপে বহুলোকের কর্মসংস্থানের পথ সুগম করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **অণিমা সাহা** গত ১০ মার্চ রাত্রি ১১-৫৫ মিনিটে ৮৯এ, সন্তোষপুর অ্যাভিনিউতে অবস্থিত তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। প্রয়াতা অণিমা সাহা মডার্ন ল্যান্ড প্রাইমারী ও হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। তিনি স্থানীয় বিবেকানন্দ আত্মনির্ভরশীল কর্মী সংঘেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **বকুলরানী দাস** গত ১৭ মার্চ পশ্চিম ত্রিপুরার সোনামুড়ায় তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। সোনা-মুড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ফণীন্দ্রমোহন সরকার** গত ১৩ জানুয়ারি তাঁর উত্তরপাড়ার বাসভবনে করজপরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। □

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

হৃদ্‌পিণ্ডকে সুস্থ রাখতে মাছ খাওয়া

হৃদ্‌পিণ্ডের আকস্মিক অসুখ এবং 'স্ট্রোক' (stroke) এখন শুধু উন্নত দেশেই মৃত্যুর প্রধান কারণ বলে পরিগণিত নয়, ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশেও হৃদ্‌পিণ্ডের ঐসব অসুখে মৃত্যুর সংখ্যাও খুব কম নয়। সেজনাই ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসের (৭ এপ্রিল) বিষয়বস্তু ছিল: 'হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন—স্বাস্থ্যের ছন্দ', যাতে সকল দেশের স্বাস্থ্যবিভাগ হৃদ্‌পিণ্ডের অসুখ প্রতিরোধের ব্যাপারে সজাগ হয়।

হৃদ্‌পিণ্ডের আকস্মিক অসুখ ও স্ট্রোকের কারণ হলো: যে-ধমনীগুলি (করোনারি আর্টারি) হৃদ্‌পিণ্ডের মাংসপেশীকে রক্ত সরবরাহ করে তাদের দেওয়ালে লিপিড (lipid) নামক চর্বিজাতীয় বস্তু জমে (অর্থাৎ অ্যাথিরোসক্লেরোসিস হয়ে) রক্ত-চলাচল ব্যাহত হওয়া অথবা তাদের মধ্যে রক্ত জমে যাওয়া। রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে যে হৃদ্‌-পিণ্ডের অসুখ হয়, তার অনেক নজির আছে। কোলেস্টেরল প্রোটিনের সঙ্গে মিশে লাইপোপ্রোটিন অবস্থায় থাকে। লাইপোপ্রোটিন দু-ধরনের—কম ঘন লাইপোপ্রোটিন (Low density lipoprotein বা L. D. L), যাকে 'খারাপ কোলেস্টেরল' বলে, কারণ তা যকৃৎ থেকে ধমনীতে কোলেস্টেরল নিয়ে যায়; আরেক ধরনের হচ্ছে বেশি ঘন লাইপোপ্রোটিন (High density lipoprotein বা H. D. L) বা ভাল কোলেস্টেরল, যা ধমনী থেকে কোলেস্টেরল যকৃতে নিয়ে গিয়ে তাকে ধ্বংস করতে সহায়তা করে। অর্থাৎ L. D. L বেশি হলে বা H. D. L কম হয়ে গেলে হৃদ্‌পিণ্ডের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। এসব ছাড়া আছে ট্রাইগ্লিসারাইড (triglyceride), যার সঙ্গেও হৃদ্‌পিণ্ডের অসুখ সম্পর্কিত।

জান্তব খাদ্য মারফত কোলেস্টেরল শরীরে ঢোকে; তাছাড়া এটি শরীরের মধ্যেও তৈরি হয়। চর্বিজাতীয় খাদ্য থেকেই এটি তৈরি হয়। চর্বিতে ফ্যাটি অ্যাসিড-এর ধরন অনুযায়ী চর্বিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: স্যাচুরেটেড, মনো-আন-স্যাচুরেটেড ও পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (পি. ইউ. এফ. এ.)। শেষোক্তটিকে বলা হয় 'প্রয়ো-জনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড' (Essential fatty acid), যাদের মধ্যে দুটি হচ্ছে লাইনোলেয়িক (এন-সিক্স) ও আলফালাইনোলেনিক (এন-থ্রি) অ্যাসিড। স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কোলেস্টেরল বাড়ায়; কিন্তু এন-সিক্স ও এন-থ্রি কোলেস্টেরল কমায়। সেইজনাই খাদ্যে বেশি পলি-আনস্যাচুরেটেড ও কম স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড রাখা ভাল। মাংস, ঘি, মাখনে স্যাচুরেটেড এবং শষ্য ও শাকসব্জিতে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি আছে।

১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে 'ল্যানসেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো যে, এস্কিমোরা মাছ ও সমুদ্রজাত খাদ্য বেশি খায় বলে তাদের হৃদ্‌পিণ্ডের অসুখ হয় না যদিও তাদের খাদ্যে চর্বি ও কোলেস্টেরল যথেষ্ট। মাছে এন-থ্রি পি. ইউ. এফ. এ. (n-3 PUFA) থাকে বলেই এটি সম্ভব। কডলিভার অয়েল-এ এটি থাকলেও বেশি খাওয়ান যায় না, কারণ বেশি খেলে তার মধ্যে 'এ' ও 'ডি' ভিটামিনের আধিক্য শরীরের ক্ষতি করবে। কিন্তু মাছের ক্ষেত্রে এন-থ্রি পি. ইউ. এফ. এ. কোন ক্ষতি করে না। সেজন্য ১০০—২০০ গ্রাম মাছ সপ্তাহে দু-তিনবার খেলে হৃদ্‌পিণ্ডের উপকার হয়। প্রশ্ন হচ্ছে—নিরামিষাসীরা কি করবেন? অধিকাংশ ভেজিটেবিল অয়েল বিশেষতঃ সয়াবীন, বেপসিড ও সরষের তেলে এন-সিক্স ও এন-থ্রি লাইনোলেনিক অ্যাসিড আছে যা থেকে শরীরে এন-থ্রি পি ইউ এফ এ তৈরি হয়। তবে এসব তেলের 'এরুসিক অ্যাসিড' (erucic acid) কিছুটা ক্ষতিকারক। বাদাম তেলে এই অ্যাসিড নেই। তাছাড়া গম, বজরা, শাকসব্জিতেও আলফালাইনোলেনিক অ্যাসিড যথেষ্ট আছে বলে এগুলিও হৃদ্‌পিণ্ডের দিক থেকে উপকারী। যদি স্যাফলাওয়ার কিংবা সূর্যমুখীর তেল ব্যবহার করা হয়, যাতে লাইনোলেয়িক অ্যাসিড খুব বেশি, তাহলে তার সঙ্গে কম লাইনোলেয়িক থাকা তেল (যেমন পামোলিন) মেশানো ভাল। □

প্রকৃত ধার্মিক লোক সর্বত্রই উদার হয়ে থাকেন। তাঁর ভিতর যে প্রেম আছে, তাই.ত তাঁকে বাধ্য হয়ে উদার হতে হয়। কেবল যাদের কাছে ধর্ম একটা ব্যবসামাত্র, তারাই ধর্মের ভিতর সংসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিবাদ ও স্বার্থপরতা এনে ব্যবসার খাতিরে ঐরূপ সংকীর্ণ ও অনিষ্টকারী হতে বাধ্য হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হতে পারে, সে-বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

মানুষ মূর্খের মতো মনে করে—স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে পারে। বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে না; জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে, সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।.. তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভালকাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

অমৃতকথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

The only God to worship is the human soul in the human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of temples. If I cannot worship in that, no other temple will be of any advantage.

Swami Vivekananda

লোকে অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করেছি—তাঁর (ভগবানের) ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলক ধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলেই ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্রবিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন বৃথা।

স্বামী বিবেকানন্দ

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত
শ্রীম কথিত
(৫ খণ্ডে সমাপ্ত) : প্রতি সেট : কাপড় ১৪, বোর্ড ৮০
শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজি প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যেরা এবং কথামৃত-কার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে ৫-খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন "কথামৃতের" আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক শ্রীম'র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)।
ফলে এই মহাগ্রন্থের Originality এবং সুমহান ঐতিহাসিক পবিত্র ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে বহাল রহিয়াছে এই ৫-খণ্ডে বিভক্ত "কথামৃতে"।
প্রকাশক : শ্রীম'র ঠাকুর বাড়ী (কথামৃত ভবন)
১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা : ৬ ফোন: ৩৫-১৭৫১

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

৯৪তম বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ সংখ্যা

সম্পাদক

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়— প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ আশ্বিন থেকে পৌষ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ তিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঁয়ত্রিশ টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ছয় টাকা

গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন

সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
যুগ্ম সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৯৫তম বর্ষ : মাঘ ১৩৯৯—পৌষ ১৪০০/জানুয়ারি ১৯৯৩—ডিসেম্বর ১৯৯৩

☐ আগামী মাঘ / জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯২-এর মধ্যে আগামী বর্ষের (৯৫তম বর্ষ : ১৩৯৯-১৪০০/১৯৯৩) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ : ৪৩ টাকা** ☐ **ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ : ৫৪ টাকা**

☐ **বাংলাদেশ—১০০ টাকা** ☐ **বিদেশের অন্যত্র—২৭৫ টাকা (সমুদ্র-ডাক), ৫৫০ টাকা (বিমান-ডাক)।**

আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) : এক হাজার টাকা

☐ **আজীবন গ্রাহকমূল্য** (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) **কিস্তিতেও** (অনূর্ধ্ব বারোটি) প্রদেয়। কিস্তিতে জমা দিলে প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে একশো টাকা দিয়ে পরবর্তী এগারো মাসের মধ্যে বাকি টাকা (প্রতি কিস্তি কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা) জমা দিতে হবে।

☐ ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে "Udbodhan Office, Calcutta" এই নামে পাঠাবেন। **পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়।** চেকের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য **বিদেশের গ্রাহকদের** প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

☐ **কার্যালয় খোলা থাকে :** বেলা ৯·৩০—৫·৩০ ; শনিবার বেলা ১·৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বেগের বিষয় যে, গত কয়েকমাস যাবৎ গ্রাহকদের অনেকে ডাকে উদ্বোধন হয় দেরিতে পাচ্ছেন অথবা একেবারেই পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন। সহৃদয় গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানাই যে, ঊর্ধ্বতম ডাকবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ডাকবিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের পত্রিকা-প্রাপ্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিতরণের আশ্বাস দিয়ে 'উদ্বোধন'-কে 'প্রথম শ্রেণীর ডাক' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন গত আশ্বিন সংখ্যা থেকে। তদনুসারে আশ্বিন সংখ্যা থেকেই 'উদ্বোধন' প্রতি মাসে কলকাতার জি. পি. ও. থেকে ডাকে দেওয়া হচ্ছে। ভাদ্র সংখ্যাটি অনেকে দেরিতে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এই দেরির কারণ আগের ডাকঘরের বিলিব্যবস্থার ত্রুটি।

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত **ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ** (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি **সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের** সাধারণতঃ **৮/৯ তারিখ** হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে কখনো কখনো পত্রিকা পৌঁছাতে বিলম্বও হয়। অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে আমরা খবর পাই। সে-কারণে আমরা সহৃদয় গ্রাহকদের **একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা** করতে অনুরোধ করি। **একমাস পরে** (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ / পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে **গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে** কার্যালয়ে জানালে **ডুপ্লিকেট** বা **অতিরিক্ত কপি** পাঠানো হবে।

☐ যাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) পত্রিকা সংগ্রহ** করেন তাঁদের পত্রিকা **ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ** থেকে বিতরণ শুরু হয়। **স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার** বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই **সংশ্লিষ্ট** গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা **সংগ্রহ করে নেন।**

উদ্বোধন

অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ নভেম্বর ১৯৯২ ৯৪তম বর্ষ—১১শ সংখ্যা

দিব্য বাণী

আমি সমাজের ওপর একটা বোমার মতো ফেটে পড়ব, আর সমাজ আমাকে কুকুরের ন্যায় অনুসরণ করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

[এই কথাগুলি পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন বারাণসীতে। কাল ঃ ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ।]

কথাপ্রসঙ্গে

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ঃ কিছু নিরুদ্দিষ্ট সূত্রের সন্ধানে

মহাবালেশ্বরে স্বামীজীর আগমন প্রসঙ্গ

পুনায় বাল গঙ্গাধর তিলকের বাসভবনে দিন দশেক অবস্থানের পর স্বামীজী পুনা ত্যাগ করেন। তিলক তাঁহার স্মৃতিকথায় ইহা জানাইয়াছেন। প্রহ্লাদনারায়ণ দেশপাণ্ডে সংগৃহীত স্মৃতিকথায় তিলক জানাইয়াছেন যে, পুনার হীরাবাগে স্বামীজীর প্রস্তুতিহীন অসাধারণ ভাষণ শুনিবার পর হইতে পুনা শহরের বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে এবং তাঁহার কথা শুনিতে তিলকের বাড়িতে আসিতে শুরু করে। তিলক জানাইয়াছেন,স্বামীজীর নাম তিনি জানিতে পারেন নাই। কারণ স্বামীজী নিজের নাম বলেন নাই। নাম জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় তিনি একজন সন্ন্যাসী মাত্র। তিলক বলিয়াছেন ঃ "[হীরাবাগ বা ডেকান ক্লাবে বক্তৃতার পর] যখন লোকজনের আসা-যাওয়া ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল তখন একদিন সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন পরদিন তিনি চলিয়া যাইবেন। সত্যিই তিনি চলিয়া গেলেন, কেহ শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্বেই।" (দ্রঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮২-৮৩)

পুনা ত্যাগ করিয়া স্বামীজী কোথায় গিয়াছিলেন তিলক তাহা জানিতেন না, কারণ স্বামীজী তাঁহার পরবর্তী গন্তব্যস্থল তিলককে বলেন নাই। আমরা ইতঃপূর্বে (দ্রঃ কথাপ্রসঙ্গে, ভাদ্র, ১৩৯৯, পৃঃ ৩৬৮) দেখিয়াছি যে, স্বামীজীর ইংরেজী ও বাঙলা জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণগুলির মতে পুনা ত্যাগ করিয়া স্বামীজী গিয়াছিলেন কোলাপুরে এবং সেখান হইতে বেলগাঁও-এ। কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁহার সুবিখ্যাত গবেষণা-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, স্বামীজী পুনা হইতে যান মহাবালেশ্বরে। মহাবালেশ্বর হইতে স্বামীজী যান কোলাপুর এবং সেখান হইতে যান বেলগাঁও। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮১) বলা বাহুল্য, স্বামীজীর মহারাষ্ট্র-ভ্রমণ সম্পর্কে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গবেষণা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালের। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরেও স্বামীজীর উভয় জীবনীগ্রন্থের পরবর্তী এবং সাম্প্রতিকতম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেখানেও উঁহাদের পূর্ব সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হয় নাই। প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, স্বামীজী পুনা হইতে সেবার মহাবালেশ্বর যান নাই। প্রমথনাথ বসু লিখিত স্বামীজীর 'প্রাচীন' বাঙলা জীবনীতেও অবশ্য বলা হইয়াছে যে, স্বামীজী তিলকের পুনার বাসভবন ত্যাগ করিয়া মহাবালেশ্বরে যান। প্রমথনাথ বসু লিখিয়াছেন ঃ "এইসময়ে [স্বামীজী যেসময় পুনা ত্যাগ করেন] লিম্বডিরাজ মহাবালেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন শ্রবণ করিয়া স্বামীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।..." (স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২১-২২২) এই তথ্যের সূত্র অবশ্য ইংরেজী জীবনীর মূল সংস্করণ (Vol. II, 1913, p. 178)।

পরবর্তী কালে স্বামীজীর যেসব নূতন পত্র ও অন্যান্য উপাদান প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সাহায্যে স্বামীজীর মহাবালেশ্বরে আগমন সম্পর্কে নিশ্চিত-ভাবে জানা গিয়াছে এবং মোটামুটি সেই আগমনের একটি সঠিক সময়ও নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, স্বামীজীর মহাবালেশ্বরে গমন তিলকের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাতের কয়েক মাস পূর্বের ঘটনা।

পুনা হইতে লিখিত স্বামীজীর ১৫ জুন ১৮৯২ তারিখে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত চিঠি হইতে জানা যাইতেছে, তৎপূর্বেই স্বামীজী মহাবালেশ্বর হইতে লিমডির রাজার ('ঠাকুরসাহেবের') সহিত পুনায় আসিয়াছেন এবং পুনায় ঠাকুরসাহেবের সহিত অবস্থান করিতেছেন। [দ্রঃ Complete Works, Vol. VIII, 5th Edn., 1971, p. 287। 'পত্রাবলী'র (৪র্থ সং, ১৯৭৭) এই অংশের অনুবাদ মূলানুগ নহে।] পুনায় এই সময় স্বামীজী "আরও দু-এক সপ্তাহ" থাকিতে চাহেন বলিয়া ঐ চিঠিতে লিখিয়াছেন। এই চিঠি হইতে জানা যায় যে, তিলকের সহিত পুনায় আসিবার কয়েকমাস পূর্বে স্বামীজী অন্ততঃ আরও একবার পুনায় আসিয়াছিলেন এবং সেইবার তিনি ঠাকুরসাহেবের অতিথি ছিলেন। বোম্বাই হইতে ২২ আগস্ট ১৮৯২ তারিখে স্বামীজী জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে যে-চিঠি লিখেন তাহাতেও মহাবালেশ্বরে লিমডির ঠাকুরসাহেবের সহিত তাঁহার অবস্থানের পুনরুল্লেখ রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, স্বামীজী মহাবালেশ্বরে কখন আসেন? স্বামীজীর ইংরেজী ও বাঙলা জীবনীর সাম্প্রতিকতম সংস্করণ অনুসারে স্বামীজী মহাবালেশ্বরে গিয়াছিলেন ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের শেষে অথবা মে-র প্রথমে। বরোদা হইতে ২৬ এপ্রিল ১৮৯২ তারিখে জুনাগড়ের দেওয়ানকে লিখিত একটি পত্রে স্বামীজী জানাইয়াছেন যে, ঐদিনই (২৬ এপ্রিল ১৮৯২) তিনি বোম্বাই রওনা হইতেছেন। পরে আমরা দেখিব, বোম্বাই হইতেই তিনি মহাবালেশ্বরে যান। গুজরাটী ভাষায় লিখিত ঠাকুরসাহেবের জীবনীতে ভি. আর. যোশী লিখিয়াছেন: "নামদার ঠাকুরসাহেব শ্রীযশোবন্ত সিংহ ১৮৯২-এর ২৪ এপ্রিল মহাবালেশ্বরে যান। সেখানে তিনি তিন মাস থাকেন। এই সময়ে তিনি স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং স্বামীজীর সহিত তিনি দর্শন ও আত্মজ্ঞান বিষয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনা করেন।" (দ্রঃ ইংরেজী জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০০) উক্ত জীবনীতে ঠাকুরসাহেবের ঐসময়ের ব্যক্তিগত ডায়েরীর যে-অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি স্বয়ং লিখিতেছেন: "৪ ও ৫ মে, ১৮৯২: চারদিন আগে [স্থূলাক্ষর আমাদের] জন্মান্তরবাদ লইয়া স্বামীজীর সহিত যে-আলোচনা হইয়াছে তাহা লইয়া আমি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি এবং ঐবিষয়ে তাঁহার প্রস্তাব মতো কয়েকটি গ্রন্থও দেখিয়াছি।—

৯-১১ মে: স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া আমি যারপরনাই বিস্মিত হইতেছি। শাস্ত্রবিষয়ে আমার যে-জ্ঞান তাহা তাঁহার সহিত আলোচনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

ঠাকুরসাহেবের ৪ ও ৫ মে-র ডায়েরী হইতে জানা যাইতেছে, স্বামীজী অন্ততঃপক্ষে ৩০ এপ্রিল ১৮৯২-এর মধ্যে বোম্বাই হইতে মহাবালেশ্বরে পৌঁছিয়াছিলেন।

১৮৯২-এর এপ্রিল-মে মাসে স্বামীজীর মহাবালেশ্বরে অবস্থানের সমর্থন পাওয়া যায় পূর্ব-উল্লিখিত ১৫ জুন ১৮৯২ তারিখের চিঠি এবং পরবর্তী কালে 'মারাঠা' পত্রিকার সম্পাদক ও তিলকের সহকর্মী এন. সি. কেলকারের একটি বক্তৃতাতেও (১৯ জুলাই ১৯৩৫)। [দ্রঃ 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬]

এখানে একটি প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই আসে, তাহা হইল স্বামীজী মহাবালেশ্বরে কতদিন ছিলেন? স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে ঠাকুরসাহেবের গুজরাটী জীবনী উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, ঠাকুরসাহেব মহাবালেশ্বরে প্রায় তিন মাস ছিলেন। (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০০) অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল ১৮৯২ হইতে প্রায় ২৪ জুলাই ১৮৯২ পর্যন্ত ঠাকুরসাহেবের মহাবালেশ্বরে থাকার কথা। ইংরেজী জীবনীতে বলা হইয়াছে: "স্বামীজী মহাবালেশ্বরে প্রায় আড়াই মাস থাকিবার পর পুনা যান।" (পৃঃ ৩০২) অর্থাৎ পুনা যাইবার পূর্বে স্বামীজীর মহাবালেশ্বরে ১৫ জুলাই পর্যন্ত থাকার কথা। কিন্তু স্বামীজীর পূর্ব-উল্লিখিত ১৫ জুন ১৮৯২ তারিখের চিঠিতে দেখিতেছি, তিনি ইতঃপূর্বেই পুনায় আসিয়া গিয়াছেন। মজার কথা, ইংরেজী জীবনীতেও (পৃঃ ৩০০-৩০১) আবার বলা হইতেছে, স্বামীজী জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত মহাবালেশ্বরে ছিলেন। সুতরাং ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণে এই বিষয়ে একটি মারাত্মক অসঙ্গতি থাকিয়া যাইতেছে। স্বামীজীর উক্ত চিঠির ভিত্তিতে বলা যায় যে, স্বামীজী পুনায় এবারে ১৫ জুনের দুই-চারদিন আগে হইতে জুন মাসের শেষাশেষি পর্যন্ত মোটামুটি সপ্তাহ তিনেক ছিলেন এবং মহাবালেশ্বরে তাঁহার অবস্থানকাল দেড়মাসের মতো। জুনের (১৮৯২) শেষে স্বামীজী পুনা হইতেই খাণ্ডোয়া চলিয়া যান। (ইংরেজী জীবনী, পৃঃ ৩০২)

মহাবালেশ্বরে স্বামীজীর আগমন সম্পর্কে আরও দু-একটি প্রশ্ন আছে। ইংরেজী জীবনীতে আছে যে, বরোদায় থাকাকালীন (মূল সংস্করণে ছিল পুনায়

থাকাকালীন) স্বামীজী শুনিয়াছিলেন, ঠাকুরসাহেব মহাবালেশ্বরে আছেন এবং **তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশে** তিনি মহাবালেশ্বরে গমন করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রাচীন বাঙলা জীবনী এবং শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গ্রন্থেও ঐ কথা রহিয়াছে। কিন্তু 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের জুন সংখ্যায় প্রেম এইচ. যোশী তাঁহার প্রবন্ধে 'Swami Vivekananda in Limdi and Mahabaleswar : 1891-'92') লিখিয়াছেন যে, স্বামীজী ঠাকুরসাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য মহাবালেশ্বরে যান নাই, তিনি ১৮৯২-এর গ্রীষ্মকালটি মহাবালেশ্বরে কাটাইবার উদ্দেশে গিয়াছিলেন। মহাবালেশ্বরে যাইবার পর স্বামীজীর সহিত ঠাকুরসাহেবের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজী জানিতে পারেন যে, গ্রীষ্মকাল কাটাইবার জন্য ঠাকুরসাহেবও সেখানে আসিয়াছেন। (প্রবুদ্ধ ভারত, জুন, ১৯৭৭, পৃঃ ২৭৫) 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের সাম্প্রতিকতম সংস্করণে এই ব্যাপারটি উল্লেখ করিয়া স্বামী গম্ভীরানন্দ মন্তব্য করিয়াছেন : "সম্ভবতঃ মহাবালেশ্বরে **আকস্মিক সাক্ষাতের** অল্পকাল পরেই স্বামীজী লিমডি রাজার [ঠাকুরসাহেবের] গৃহে [মহাবালেশ্বরে] চলিয়া যান।" ('যুগনায়ক', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩)

অর্থাৎ ঠাকুরসাহেবের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে স্বামীজী মহাবালেশ্বরে অন্য কোথাও ছিলেন। বিষয়টি ইংরেজী জীবনীতে আলোচিত হয় নাই। প্রশ্ন হইবে : "স্বামীজী কোথায় ছিলেন?" ইহার উত্তর ইংরেজী জীবনী বা প্রাচীন বাঙলা জীবনী কোথাও নাই। তবে এইপ্রসঙ্গে ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণে স্বামী অভেদানন্দের আত্মজীবনী হইতে একটি উধৃতি রহিয়াছে এবং উহাতেই এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাইতেছি। কিন্তু ইহা ইংরেজী জীবনীতে আলাদাভাবে দেখানো হয় নাই। বিষয়টি গম্ভীরানন্দজী 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের সাম্প্রতিকতম সংস্করণে অভেদানন্দজীকে উধৃত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অভেদানন্দজী লিখিয়াছেন : "বোম্বাই শহর পরিভ্রমণ করিয়া সেইখান হইতে মহাবালেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, মহাবালেশ্বরে নরোত্তম মুরারজী গোকুলদাস মহাশয় অতিথিসৎকার-পরায়ণ ভদ্রলোক। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া গোকুলদাসজীর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখি —নরেন্দ্রনাথ একদিন পূর্বেই সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।··· গোকুলদাসজীর একান্ত অনুরোধে আমি মাত্র তিনদিন তাঁহার বাড়িতে নরেন্দ্রনাথের সহিত অতিবাহিত করিয়া চতুর্থদিনে পুনা-অভিমুখে··· যাত্রা করিলাম।" (আমার জীবনকথা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৪, পৃঃ ২০২-২০৩)

অভেদানন্দজীর এই বিবরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মহাবালেশ্বরে আসিয়া স্বামীজী প্রথমে নরোত্তম মুরারজী গোকুলদাসের বাড়িতে ছিলেন। তিনি সেখানে একদিন বাস করিবার পর অভেদানন্দজী সেখানে আসেন এবং তিনদিন দুই গুরুভ্রাতা একত্রে বাস করেন। সুতরাং মহাবালেশ্বরে পদার্পণের চারদিন পর্যন্ত ঠাকুরসাহেবের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ঠাকুরসাহেবের সহিত কবে তাঁহার দেখা হইল? ইতঃপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, ঠাকুরসাহেব তাঁহার ৪ ও ৫ মে, ১৮৯২ তারিখের দিনলিপিতে লিখিয়াছেন, চারদিন পূর্ব হইতে তাঁহার সহিত স্বামীজীর শাস্ত্রাদি আলোচনা শুরু হইয়াছে। অর্থাৎ ১ মে ১৮৯২ স্বামীজীর সহিত ঠাকুরসাহেবের মহাবালেশ্বরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং সেই দিনই তিনি স্বামীজীকে তাঁহার আবাসে লইয়া আসেন। যদি এইদিনটি অভেদানন্দজীর মহাবালেশ্বর ত্যাগের দিন হয় তাহা হইলে তাহার চারদিন আগে অর্থাৎ ২৭ এপ্রিল ১৮৯২ স্বামীজী মহাবালেশ্বরে পৌঁছিয়াছিলেন। বরোদা হইতে স্বামীজী ২৬ এপ্রিল বোম্বাই রওনা হইয়াছিলেন সেই সংবাদ স্বামীজী নিজেই জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে জানাইয়াছিলেন, আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। বোম্বাইয়ে তিনি সেই দিন রাত্রিতে যদি পৌঁছিইয়া থাকেন তাহা হইলে সেই রাত্রিটি কি তিনি বোম্বাইয়ে কাটাইয়াছেন? কাটাইলে কোথায়? বোম্বাই রেলস্টেশনে, অথবা কাহারও বাড়িতে? ইহার উত্তর এখনও জানা যায় নাই।

আমরা আগেই দেখিয়াছি, স্বামীজী পুনা হইতে ১৫ জুন ১৮৯২ তারিখের চিঠিতে জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে লিখিয়াছেন যে, তিনি মহাবালেশ্বর হইতে ঠাকুরসাহেবের সহিত পুনা আসিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গেই আছেন। ইংরেজী জীবনীতে (পৃঃ ৩০২) বলা হইতেছে : "[স্বামীজীর] চিঠিতে লিখিত ঠিকানা [দ্রঃ C.W., Vol. VIII, p. 287] হইতে মনে হয় যে, পুনায় তিনি [স্বামীজী] এল্লাপা বলরামের নিউট্র্যাল লাইন-এ অবস্থিত বাড়িতে ছিলেন, যেখানে ঠাকুরসাহেব উঠিয়াছিলেন।" অর্থাৎ পুনায় যে-বাড়িতে স্বামীজী ছিলেন উহা

ঠাকুরসাহেবের নিজের বাড়ি নহে, ঠাকুরসাহেবও সেখানে অতিথি ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ঠাকুরসাহেব স্বামীজীকে অনুরোধ করেন স্বামীজী যেন স্থায়িভাবে লিমডিতে বাস করেন। উত্তরে স্বামীজী বলেন: "না, ঠাকুরসাহেব, এখন নয়, কারণ আমাকে একটা ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। এখন আমার বিশ্রাম অসম্ভব, তবে যদি কখনও কর্ম থেকে মুক্তি পেয়ে বিশ্রামলাভের অবকাশ ঘটে তো আপনার ওখানে যাব।" ('যুগনায়ক', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩-২৮৪) প্রমথনাথ বসুর মতে, স্বামীজীকে ঠাকুরসাহেব এই অনুরোধ মহাবালেশ্বরে করিয়াছিলেন (দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২)। স্বামী গম্ভীরানন্দের মতও তাহাই। বলা বাহুল্য, প্রমথনাথ বসু এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ উভয়েই যে-সূত্র হইতে তথ্যটি সংগ্রহ করিয়াছেন স্বামীজীর সেই ইংরেজী জীবনীর প্রথমসংস্করণ অনুসারেও তাহাই। (দ্রঃ p. 178) কিন্তু ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণে যেভাবে ঘটনাটির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যেন ঘটনাটির স্থান পুনা। (দ্রঃ p. 302) এই অস্পষ্টতা কেন? আবার ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণে স্বামীজীর উক্তিটি যেভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে মূল সংস্করণের (1913, p. 178) সহিত তাহার কিছুটা ভিন্নতাও রহিয়াছে। অথচ এই ভিন্নতার ভিত্তি ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণে উল্লেখ করা হয় নাই।

পরিব্রাজক স্বামীজী অন্যান্য স্থানের ন্যায় মহাবালেশ্বরেও নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মহাবালেশ্বরে স্বামীজীর অবস্থান বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। পুনার এন. সি. কেলকারের সূত্রে ইহা জানা গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন: "১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি [স্বামীজী] আমাদের বোম্বাই ও পুনা অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি কিন্তু বিখ্যাত হন নাই। আমি তখন এল. এল. বি. পরীক্ষার জন্য তৈরি হইতেছি। গ্রীষ্মের ছুটিতে কয়েকজন উকিল মহাবালেশ্বরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহারা বলিলেন, এক প্রদীপ্ত-প্রতিভা বাঙালী সন্ন্যাসীর দেখা তাঁহারা পাইয়াছেন। চমৎকার তাঁহার ইংরেজী ভাষার বাগ্মিতা! একেবারে বাঁধিয়া রাখে! তাঁহার দার্শনিক চিন্তা প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুমহান।" (দ্রঃ 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬) এন. সি. কেলকারের এই বক্তব্য হইতে পরিষ্কার যে, ঠাকুরসাহেবের বাসভবনে তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা ভিন্ন মহাবালেশ্বরে অন্যত্রও স্বামীজী ঘরোয়া অথবা প্রকাশ্য সভায় ভাষণ দিয়াছিলেন।

ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণে স্বামীজী সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দের একটি সুপরিচিত উক্তি মহাবালেশ্বরে স্বামীজীর সহিত স্বামী অভেদানন্দের সাক্ষাতের সময় কথিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উক্তি ইংরেজী জীবনীর মূল সংস্করণেই (পৃঃ ১৭৭) ছিল এবং সেখানে উহা বোম্বাইয়ে উভয়ের সাক্ষাতের সময়ে (জুলাই-আগস্ট, ১৮৯২) কথিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। উহারই ভিত্তিতে প্রমথনাথ বসু (স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২১) এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ ('যুগনায়ক', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯) উক্তিটি বোম্বাইয়ে কথিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, মহাবালেশ্বরের আগে জুনাগড়ে স্বামীজীর সহিত মনসুখরাম সূর্যরাম ত্রিপাঠীর বাড়িতে তাঁহার দৈবক্রমে সাক্ষাৎ হয়। (দ্রঃ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১৯৯-২০০) স্বামী অভেদানন্দের আত্মজীবনীতে কিন্তু উক্তিটি নাই। ইংরেজী জীবনীর মূল সংস্করণ এবং উহার অনুসরণে বাঙলা জীবনীদ্বয়ে স্বামী অভেদানন্দের উক্তিটি এইরূপ: "এসময় স্বামীজীর হৃদয়টা যেন অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় হইয়াছিল। আর কোন চিন্তা নাই, কেবল কি করিয়া ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়, অহর্নিশ ইহাই ভাবিতেন। তাঁহার অস্থির উৎকণ্ঠা দেখিয়া আমি ভীত হইয়াছিলাম। তখন স্বামীজীকে দেখিলেই একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত বলিয়া মনে হইত। স্বামীজী নিজেও বলিয়াছিলেন: 'কালী, আমার ভেতর এতটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।'"

ইংরেজী জীবনীর মূল সংস্করণ অনুসারে আমেরিকাযাত্রার পূর্বে উহাই ছিল স্বামীজীর সহিত অভেদানন্দজীর শেষ সাক্ষাৎ। অনেক পরে অভেদানন্দজীর আত্মজীবনী প্রকাশিত হওয়ায় জানা গিয়াছে, মহাবালেশ্বরেই উভয়ের শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উক্তিটি 'শেষ সাক্ষাতের' সময় ধরিয়া লইয়াই কি ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণে উহাকে মহাবালেশ্বরের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে? □

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

॥ ৩২ ॥

কনখল
২. ৯. (১৯)১২

প্রিয় রামচন্দ্র,

মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা-সমন্বিত একখানি মহিম্নঃ স্তোত্রম্ আমার নিকট পাঠাইতে চেষ্টা করিবে কি? বোম্বাইয়ে যেকোন পুস্তক-বিক্রেতার নিকট অনুসন্ধান করিতে পার। সেখানে উহা অনেক পাওয়া যায়। কিছু কিছু তো খুবই বড়। আমি চাই 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা সহিতম্'। যদি মধুসূদন সরস্বতীর টীকা সহ না পাও তবে অন্য কোন টীকা হইলেও চলিবে। কিন্তু টীকা-সমেত একটি মহিম্নস্তোত্র আমার চাই-ই। শিবমহিম্নের উপরে মধুসূদন সরস্বতীর টীকা আছে আমি জানি। এইটিই প্রথম অনুসন্ধান করিবে এবং না পাওয়া যাইলে যাহা পাইবে তাহাই পাঠাইবে। কিন্তু মনে রাখিও, টীকা-সমন্বিত হওয়া চাই। মনে হয়, উহা সংগ্রহ করিতে তোমার বিশেষ কষ্ট হইবে না। এখানে সকলে ভাল আছে। আশা করি তুমি মঙ্গলমত আছ। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

স্নেহবদ্ধ
তুরীয়ানন্দ

পুনঃ—আমি আশা করি, কিছুদিন পূর্বে তোমাকে যে চিঠির উত্তর দিয়াছিলাম তাহা তুমি পাইয়াছ। মাঝে মাঝে তোমার সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইব, ইহা তোমাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। ইতি

তুরীয়ানন্দ

॥ ৩৩ ॥

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
কনখল
জেলা—সাহারানপুর
৯ জুন, (১৯)১৩

প্রিয় রামচন্দ্র,

তোমার এই মাসের ৩ তারিখের চিঠিটি সময়মতই পাইয়াছি। আজ সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান এবং ধূপের প্যাকেট পাইয়াছি। অভিধানটির জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু ইহাতে তোমার এত খরচ পড়িবে বুঝি নাই। যাহা হউক, এইটি আমার নিত্যসঙ্গী এবং সংস্কৃতপাঠের জন্য খুবই কাজে লাগিবে। বাস্তবিক এইরকম একটি শব্দকোষেরই আমার খুব প্রয়োজন ছিল। সত্যি কথা বলিতে কি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এইটিই সর্বোত্তম। মা তোমাকে সতত আশীর্বাদ করুন। আমি জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ইতোমধ্যে তুমি আমাদের স্বামীজীর জীবনী পড়িয়া ফেলিয়াছ। দেখিতেছি, তুমি পুনরায় সাংবাদিকতার কাজে ঢুকিয়াছ। আমার মনে হয়, অন্য বৃত্তি অপেক্ষা এই বৃত্তি তোমার অধিকতর উপযোগী হইবে এবং সেইসঙ্গে ইহা অর্থকরীও হইবে। যদি তোমার অসুবিধা না হয় তবে নূতন পত্রিকা 'বোম্বে ক্রনিকল'-এর এক কপি পাঠাইও। দেখিব উহা কেমন পরিচালিত হইতেছে। সমগ্র ভারতে দেশীয় শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকারূপে ইহার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমি আনন্দিত যে, এইরকম একটি মহৎ কাজের সহিত তুমি যুক্ত হইয়াছ।

হ্যাঁ, আমার স্বাস্থ্য এখানে অনেক ভাল, কিন্তু অসুখের এখনও একটুও উপশম হয় নাই। স্বামী কল্যাণানন্দ এবং আশ্রমস্থ অন্যান্য সকলে কুশলে আছেন।

তোমার কুশল ও সমৃদ্ধি কামনা করি। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

তোমার স্নেহবদ্ধ
তুরীয়ানন্দ

নিবন্ধ

"আবার এস"

স্বামী গিরিজাত্মানন্দ

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' সুদীর্ঘকাল ধরে মঠ ও মিশনের নানা কেন্দ্রে এবং অন্যত্র ঘরোয়া বৈঠকে এবং প্রকাশ্য সভায় ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হয়ে আসছে। কিন্তু 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র ব্যাখ্যা এবং আলোচনা বিশেষ শোনা যায়নি। 'মায়ের কথা' প্রকাশ্য সভায় নিয়মিত আলোচনার সূত্রপাত করেন বলরাম মন্দির কর্তৃপক্ষ ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর থেকে শ্রীসারদা মঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণসংঘ (শ্যামপুকুরবাটী), বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা) ও গদাধর আশ্রমে 'মায়ের কথা' প্রকাশ্য সভায় আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হচ্ছে। বর্তমান নিবন্ধে 'মায়ের কথা'র লিখিত ব্যাখ্যা ও আলোচনার প্রয়াস করেছেন স্বামী গিরিজাত্মানন্দ।—যুগ্ম সম্পাদক

কলিকাতা পটলডাঙার বাসায় শুক্রবার সকালে শ্রীমান — বলে গেল: "কাল শনিবার মায়ের শ্রীচরণদর্শন করতে যাব; আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন।" কাল তবে মায়ের দর্শন পাব! সারা রাত আমার ঘুমই এল না। আজ ১৩১৭ সন, প্রায় চৌদ্দ-পনেরো বছর হয়ে গেল কলিকাতায় আছি, এতকাল পরে মায়ের দয়া হলো কি? এতদিনে কি সুযোগ মিলল? পরদিন বিকালে গাড়ি করে সুমতিকে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় হতে নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণদর্শন করতে চললুম। কি আকুল আগ্রহে গিয়েছিলুম, তা ব্যক্ত করার ভাষা জানি না! গিয়ে দেখি মা বাগবাজারে তাঁর বাড়িতে ঠাকুরঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক পা চৌকাঠের ওপর, অপর পা পাপোশখানির ওধারে; মাথায় কাপড় নেই, বাঁহাতখানি উঁচু করে দরজার ওপর রেখেছেন, ডানহাতখানি নিচুতে, গায়েরও অর্ধাংশে কাপড় নেই, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। গিয়ে প্রণাম করতেই পরিচয় নিলেন। সুমতি বললে: "আমার দিদি।" সে পূর্বে গিয়েছিল; তখন মা একবার আমার দিকে চেয়ে বললেন: "এই দেখ মা, এদের নিয়ে কি বিপদে পড়েছি। ভাই-এর বউ, ভাইঝি, রাধু সব জ্বরে পড়ে। কে দেখে, কে কাছে বসে, ঠিক নেই। বস, আমি কাপড় কেচে আসি।" আমরা বসলুম। কাপড় কেচে এসে দুই হাত ভরে জিলিপি-প্রসাদ এনে দিয়ে বললেন: "বৌমাকে (সুমতি) দাও, তুমিও নাও।" সুমতিকে শীঘ্র স্কুলে ফিরতে হবে, তাই সেদিন একটু পরেই প্রণাম করে বিদায় নিলুম। মা বললেন: "আবার এস।" এই পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা, আশা মিটল না! অতৃপ্ত প্রাণে বাসায় ফিরলুম।

(শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, ১৪শ সং, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২, পৃঃ ১-২)

নদীই কেবল ছুটে চলে না সাগরের পানে মহা-মিলনের আকাঙ্ক্ষা বুকে বয়ে বয়ে, সাগরও উন্মুখ হয়ে থাকে মোহানায় দাঁড়িয়ে কলস্বিনীর আগমন প্রতীক্ষায়। দর্শনের পিপাসা কেবল ভক্তেরই অন্তর-রাজ্যকে উদ্বেলিত করে তোলে না, সমান ব্যাকুলতা নিয়ে দর্শনদানের জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকেন ভগবানও। তেমনি সন্তানের মাতৃদর্শনের আকুতি মমতাময়ী সারদাদেবীকেও করে তোলে অস্থির। কখন আসবে তারা, যাদের জন্যে আপনা থেকে অপেক্ষমাণা জননী? দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি পথের পানে চেয়ে, যে-পথ ধরে আসবে তার পিপাসু সন্তান।

মন্দিরের দরজার সামনে অহেতুক করুণামণ্ডিতা কে এই জননী? মন্দিরের দ্বারদেশে গুরুরূপে মহামায়া রয়েছেন দাঁড়িয়ে—ব্যাকুল সন্তানের অন্তর-গভীরে প্রবেশের জন্যে। আয়ত দুটি চোখে কি গভীর একাগ্র অন্তর্দৃষ্টি। সে-দৃষ্টিতে মেদুর অম্বরে ছায়াপাতী পরম মমতার নরম শিশিরের ছোঁয়া। সহজ সরল অনাবৃত সৌন্দর্যে মহাকালরূপিণীর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিকে দেবী কালিকার সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে না। "এক

পা চৌকাঠের ওপর, অপর পা পাপোশখানির ওধারে ; মাথায় কাপড় নেই. বাঁহাতখানি উঁচু করে দরজার ওপর রেখেছেন ; ডানহাতখানি নিচুতে।" যেন শবরূপী মহাদেবের ওপর তাঁর দুটি চরণ সংস্থাপিত। এলোকেশীর মস্তক অনাবৃত। উত্তোলিত বাম করকমলে যেন অশুভ নাশের প্রতীকী কৃপাণ। অধোচালিত দক্ষিণ কর বরমুদ্রায় যেন শোভমান।

সরযূবালা অপেক্ষমাণ সৌন্দর্যের ঘনীভূত এই বিগ্রহের দর্শনলাভ করলেন। গত রাত্রিটি তাঁর নিদ্রাহীন কেটেছে। দর্শনের প্রাক্কালে রাত্রিটি যেন 'কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি' হয়ে নিদারুণভাবে পথ আগলে রেখেছিল দর্শনার্থিনীর। কখন আঁধার যাবে দূরে! আগামী দিনের পথ-পরিক্রমা ভরে যাবে উজ্জ্বল আলোর আভায়। প্রতীক্ষা যে রাত্রিকে আরও দীর্ঘতর করে তুলেছে। কালই মাতৃদর্শন-লাভে ধন্য হবেন সরযূবালা। আজ সারারাত যেন 'নিদ্ নাহি আঁখিপাতে'। এ যেন, "যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।" সমস্ত প্রাণিজগৎ যখন ঢলে পড়েছে নিদ্রার কোলে, আবিষ্ট যখন দৈহিক চেতনা সুপ্তির বিশ্রামাগারে ; সেই পরম মাহেন্দ্রক্ষণে অভিসারী চেতনা নিশিযাপন করে পরম প্রেমময় অথবা পরমা প্রকৃতির স্মরণ-মনন-ধ্যান-চিন্তনে। একটি আস্থর রাত্রি কাটছে সরযূ-দেবীর মাতৃদর্শনের প্রস্তুতিপর্ব সাধন করতে করতে। তৈরি হয়েছেন তিনি কায়মনোবাক্যে মহা-মায়ীকে দর্শন করার মানসে। পবিত্রতাস্বরূপিণীর দর্শন, যাঁর কৃপা-কটাক্ষে শত শত নরেনের উদ্ভব হতে পারে। পলকে প্রলয়-সংঘটনী ; যাঁর করুণানয়নসম্পাতে মুক্তি আমলকবৎ হয় করতল-গত। এত কাছে রয়েছেন তিনি, তবুও চৌদ্দ-পনেরো বছরের ভিতর তাঁকে দর্শনের ব্যাকুলতা জাগেনি সরযূবালার মনে। এত কাছে, তবু কত দূরে। কলকাতার পটলডাঙা আর বাগবাজার। দূর আর কোথায় ? তবে এই দূরত্ব কম বা বেশির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সময়ের ওপর। সময় না হলে ফুল ফোটে না, বয় না বসন্তানিল। এতদিন পরে এসেছে সেই ব্যাকুলতা। সংস্কারের কৃষ্ণ মেঘ দূরে সরে যাচ্ছে। আলো আসছে সামনে। দেব-দর্শনকে ব্যক্ত করার ভাষা মানুষের থাকে না। আবার যদি সেই দেব-দর্শন প্রতীক্ষার ঝড়ো রাতের পরে সামনে আসে।

"এতকাল পরে মায়ের দয়া হলো কি ?"—এই বিস্ময়-ব্যাকুল জিজ্ঞাসা জেগেছে সরযূদেবীর মনে। দয়ার যে কোন কালাকাল নেই, পাত্রাপাত্র নেই। এতো কোন শর্তাধীন নয়। এযে অহেতুক। কার ওপর কখন যে করুণা-মন্দাকিনীর শীতল স্বচ্ছ প্রবাহ বয়ে যাবে, তা কেই বা বলতে পারে ? কবির ভাষায় বলা যেতে পারে ঃ

> "কি ভাবে কাহারে দয়া কর কেবা জানে,
> তোমার করুণা কভু হিসাব নাহি মানে।"

দয়া শর্তাধীন না হলেও গ্রহীতাকে প্রস্তুত হতে হয় বৈকি! তবে সে-প্রস্তুতির জন্যে কোন দাবি থাকতে পারে না। কত দিনে, কোন্ ক্ষণে সে-সুযোগ আসবে, তা বলা দুষ্কর। তবু মাতৃদর্শনের 'সুযোগ' এসেছে সরযূবালার জীবনে ।

শনিবারে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন। মিলনের শান্ত মোহানায় অপেক্ষমাণ বরাভয়করা। শান্ত শ্রীমণ্ডিতা উমা হৈমবতী। পবিত্র সলিলা জাহ্নবী। তাপসী নির্ঝরিণীর উথল অন্তরোচ্ছ্বাসে বোন সুমতিকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন সরযূবালা। এসে পৌঁছেছেন মাতৃ-অঙ্গনে। মাতৃময় সরযূবালা লুটিয়ে পড়লেন সারদা-চরণে এক বিনম্র প্রণতির মতো।

পরিচয়ের পর্ব শেষ হতে না হতে যেন এক ঘন কুয়াশার প্রাচীর ব্যবধান রচনা করল মাতা ও কন্যার মধ্যে। বয়ে নিয়ে আসা সমাজ-সংস্কারের জঞ্জাল দিয়ে মোহানার বুকে সৃষ্টি হলো এক ব-দ্বীপের। অথবা পরীক্ষার অগ্নি জেলে কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে চাইলেন জননী আপন কন্যাকে। অহং-অভিমান-রাহিত্য সারদাদেবী নিজেকে কখনই প্রচার করেননি দেবীরূপে কারও সামনে। সাধারণ নারীর সাংসারিক মমতাকে বিসর্জন দিয়ে বা সংসারের সকল যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে তাঁর দেবজীবনকে কখনো দূরবগাহ করেননি এই মহা-মানবী। তাঁর একান্ত অনুরাগী ভক্তের কাছে তিনি প্রথমেই তুলে ধরলেন এমন একটি জীবনের চিত্র,

যার ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষ থাকে সদা-সচেতন, যার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যে মানুষ ছুটে যায় দেবজীবনের সান্নিধ্যে। যেমন ছুটে এসেছেন সরযূবালা। অথচ এখানেও যে একই চিত্র। চিত্রটি তুলে ধরা হচ্ছে মায়ের ভাষায়। প্রথম দেখায় সরযূদেবীকে বলেছেন তিনি : "এই দেখ মা, এদের নিয়ে কি বিপদে পড়েছি। ভাই-এর বউ, ভাইঝি, রাধু সব জ্বরে পড়ে। কে দেখে, কে কাছে বসে, ঠিক নেই। বস, আমি কাপড় কেচে আসি।"

সরযূদেবী এসেছিলেন হয়তো জ্বালা জুড়াতে—সংসার-বিনির্মুক্ত জীবনের বকুল-ছায়ায় ক্লান্তি অপনোদন করতে, মিঠি বকুলের আঘ্রাণে অভিষিক্ত হতে। কিন্তু একি! স্বয়ং বিপত্তারিণী যে বিপন্মুক্ত নন। ভাই-এর বউ, ভাইঝি—এদের নিয়ে তিনি মহা চিন্তিত। আবার নিজের কাপড় নিজে কাচতে চলেছেন। এই দৃশ্য দেখে যুক্তিবাদীরা সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করতেন। কিন্তু ভক্তিবাদী আত্মসমর্পিতা সরযূবালার স্বচ্ছদৃষ্টিতে কি ধরা দিয়েছিল মায়ের অন্য কোন রূপ? যার জন্য তিনি অবিশ্বাসীর অন্তর দিয়ে অনুসন্ধান করেননি মায়ের বর্ণিত এই চিত্রটিকে। মা কি বলতে চেয়েছিলেন, সংসারে থেকে সংসারের সকল ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান? সমস্ত কর্তব্যকর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেও মানুষ লোকাতীত হতে পারে। তিনি কি আমাদের জীবনে নিয়ে আসেননি আশার বাণী? ধনে জনে জড়িয়ে থেকেও মনকে ঠিক রাখতে হবে ভগবানের পাদপদ্মে। তিনি কি পরীক্ষা করেছিলেন তাঁর অনুরাগী ভক্তকে ছলনার কুহক বস্বীপ সৃষ্টি করে? সংসার রঙ্গমঞ্চের কুশলী অভিনেত্রী সারদাদেবী। কিন্তু সেদিন কোন মোহজাল বিস্তার করতে পারেননি সরযূবালার জীবনে। এখানেই মায়ের অহেতুক করুণার পরিচয় লক্ষ্য করে আমরা অভিভূত হই। যেন একদিকে পরীক্ষা গ্রহণ, আবার সেই পরীক্ষায় পাসের জন্যে ছাত্রের হয়ে পরীক্ষকের অযাচিত প্রার্থনা।

এই অবগুণ্ঠনের পর্দাকে সরিয়ে যে-সন্তান তাঁকে দেখতে চায়, জননী নিজেকে তারই কাছে পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত করেন। কেবল আপনার জনকে একটু বাজিয়ে বাছাই করে নেওয়া—এই মাত্র। সেই পরীক্ষার প্রথম পর্বেই অনায়াসে জয়ী হয়েছিলেন সরযূবালা। তাই তিনি মায়ের এবম্বিধ কথাবার্তায় তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে বা ভ্রমবশতঃ সারদাদেবীকে নিতান্তই মানবী না ভেবে, মায়ের কাপড় কেচে আসা অবধি অপেক্ষা করে রইলেন ধৈর্যের সঙ্গে। মা এলেন। দুহাত ভরে দিলেন জিলিপি প্রসাদ। ফিরে এসেছেন মহামায়া আপনার রাজ্যে, যে-রাজ্যে শুধু করুণার স্রোতস্বিনী বইছে ফল্গুধারায় সকলকে স্নান করিয়ে দেওয়ার জন্যে, যে-রাজ্যটি মানবিক সৌজন্যের স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত। মানবত্বকে ছাড়িয়ে কেউ কখনো মহামানব, দেবমানব ঈশ্বরীয় মানব হতে পারে না। একটি মানুষের প্রতি অপর একটি মানুষের প্রথম দর্শনে যে ভব্যতা ও অভ্যর্থনাবোধ জাগে, সে-সামাজিক আচারপ্রথার মানবিক ধর্মকে ধূলিসাৎ করে কোনদিনই সারদাদেবী তাঁর ধর্মীয় ভাবনাপুষ্ট চিত্তজয়ী চেতনাকে সাধারণের কাছে তুলে ধরতে চাননি। চাননি বলে 'জিলিপি প্রসাদ' তখন ভক্তের কাছে মনে হয়েছিল পরম অমৃতের মতো। কারণ তাতে ছিল না ধর্মীয় অহংবোধ ও বিশুষ্ক দার্শনিকতার পলায়নী মনোবৃত্তি। তা ছিল নিতান্তই মানবিক স্নেহরসের জারকে জারিত।

কিন্তু সময়ের ঘণ্টা চলে এগিয়ে। তাই সেই রসের আস্বাদনে নেমে আসে যবনিকা। বিদায় নিয়ে উঠে পড়তে হয় সরযূবালাকে। মাত্রই "পাঁচ মিনিট"। অনন্তকাল ধরে দর্শনের আকাঙ্ক্ষাকে তো করে তোলে সঞ্জীবিত ও পল্লবিত। এ যেন "নয়ন না তিরপিত ভেল"। আশা মিটল না। মিটতে পারে না। শুধু মা বললেন ছোট একটি কথা : "আবার এস।" এ যেন কালান্তরের আহ্বান। এই আহ্বানকে যে উপেক্ষা করার উপায় নেই। মধুনিষ্যন্দী কণ্ঠস্বরে হৃদয়-উৎসারিত আহ্বান। ফিরে ফিরে আসতেই যে হয় সকলকে। 'নয়নের মাঝখানে' 'ঠাঁই' নেওয়া স্বপ্নের এই প্রতিমাকে বারে বারে নয়নের বাইরে দেখার বাসনা নিয়ে অতৃপ্ত প্রাণে আপন বাসায় ফিরে গেলেন সরযূবালা। তৃষিত মন পড়ে রইল মাতৃমন্দিরের অঙ্গনে। ☐

কবিতা

প্রেম

নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

কোন এক শান্ত স্তব্ধ দিবসের
ক্লান্ত আঁখিপাতে
পশ্চিম সমুদ্র হতে
প্রভাতের রক্তিম সম্পাতে
ঊর্ধ্ব হতে নভোচ্যুত
একটি কী বাণী
মহাশূন্যে ক্ষণিকের লাগি
দ্যুতিমান রহি বিলম্বিত
পড়িল ঠিকরি—
প্রেম। প্রেম। কোথা প্রেম।
হে অন্ধ-পথিক, কাহার লাগিয়া
দিনান্তে সুদূর প্রান্তে
শ্রান্ত দেহ ন্যুব্জকায় চলেছ উন্মুখ
মাগিয়া সন্ধান ?
ফিরাতে কি চাহ তুমি
উচ্চকিত পৃথিবীর তটে
উন্মাদ এ-সমুদ্রের
যত ঢেউ যত আর্তনাদ।
পন্থহারা হে ক্লান্ত পথিক,
দেখ নাই কভু
অশ্রান্ত বর্ষণদিনে
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিপ্লবী নিশীথ ?
হে অধৃষ্য প্রেমিক
তোমার এ-তপশ্চরণের দুঃসহতা তবু
বারম্বার পেয়েছে প্রণাম।
তাই কহিলাম
আপনার মর্মমাঝে
আছে সেই অফুরন্ত ধন। ফিরায়ে নয়ন
দেখ দগ্ধ আর্তমানবের মনের মুকুরে
প্রতিদিন প্রতিচ্ছবি ফুটে
যে-অনন্ত মনোব্যথা অব্যক্ত ক্রন্দনে—
তাই হলো প্রেম॥

শ্লোক

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

কিভাবে তোমার কাছে যাব
যেভাবে দক্ষিণে যায় পৃথিবীর জল
আমি কি বৃষ্টির মতো এমনই সজল ?

কিভাবে তোমাকে দেখব প্রতিদিন
যেভাবে আগুন দেখে আকাশের মুখ
আমিও কি ততটা উন্মুখ ?

কি করে সমস্ত কিছু তোমাকেই দেব
যেভাবে গন্ধ দেয় বরষার ফুল
আমিও কি তেমনই বকুল ?

কিভাবে তোমাকে কাছে পাব
যেভাবে গানের মাঝে কথা পায় সুর
আমি কি গো পিঁপড়ের পায়ের নূপুর ?

আশা মোর

অজিতেন্দ্র সিংহ

আশা কুহকিনী—এ-প্রত্যয় সত্য নয়,
জেনেছি তা মিথ্যা, অতি ভুল ;
নিয়ে গেলে সুপথে আশাকে,
আশা করে না প্রবঞ্চনা ;
আশাই জাগায় মোদের
বিশ্বাস পরলোকে,
আছেন ঈশ্বর, আছে বিচার—
এ-ধারণা হয় বদ্ধমূল।

সুপথের ঠিকানা, ঠাকুর,
তোমার দয়ায় যে পায়,
ধন্য সেজন, বড় পুণ্যবান ;
ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞানে প্রেমে
নানা বিদ্যা বিভূষিত হয়,
নবশক্তি লাভে হয় গরীয়ান।
দীন আমি না জানি সাধন-ভজন,
না পারি কর্মকোলাহলে ঈশ্বরে পূজিতে,
আশা মোর এ-পাপরসনা শুধু
মা হয় বিরত যেন 'রামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারিতে।

দুটি কবিতা

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

পাকা বেদন

কাঁচ বেদন পাকা হলে
মনকে বসে পেয়ে,
মন হয়ে যায় নৌকা তখন
পাকা বেদন নেয়ে।
তখন যদি চোখের জলে
দু-কূল ভেসে যায়
সে-জল ঠেলে নৌকা চলে
কে করে হায় হায়!

বাউল বলেছিল

তোর ইচ্ছেগুলো বিদেয় করে
মনের ঘরে শূন্য ভরে
থাকতে যদি পারিস তবে
দেখবি কেমন মজা হবে।
ওরে মজার মজা আসল মজা
মন খাবে তোর খাজা-গজা
কি জন্যে আর ঘুরবি বাবা
শূন্য ঘরেই সকল পাবা।

না, পারছি না

শান্তশীল দাশ

বয়স তার সবে দুই পূর্ণ হলো,
কী দুষ্টু যে হয়েছে!
মা বকে বকে অস্থির,
এমন দস্যি ছেলে কোথা থেকে যে এল!
মাঝে মাঝে দু-চার ঘা বসিয়ে দেয় পিঠে,
আর বকুনি—
'বেরো, দূর হ! পারি নে আর তোকে নিয়ে।'
মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে
মাকেই জড়িয়ে ধরে।
মা হেসে ফেলে
আদর করে বুকে টেনে নেয়।

তুমি আমাদের দুঃখ ব্যথা দিয়েছ কত,
আমরা ভুগছি আর অভিযোগ করছি,
কিন্তু কই, তোমার কাছে তো ছুটে যাচ্ছি না
ঐ ছেলেটির মতো।
তাহলে তুমিও তো ঐ মার মতো
কোলে তুলে নিতে।
না, পারছি না,
ভুগছি আর কাঁদছি।

আমাকে কাঁদতে দাও

নিমাই মুখোপাধ্যায়

আমার খুব কান্না পাচ্ছে
আমায় কাঁদতে দাও।
হায় সভ্যতা, তুমি আমার কান্না ছিনিয়ে নিয়েছ।
আমি কাঁদতে কাঁদতে এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছি
এর প্রতি পদে কান্না।
যখন বড় হয়েছি আর কাঁদতে পারিনি।
তুমি আমায় একের পর এক আবরণ পরিয়েছ
আমার ভিতরের কান্না কোথায় হারিয়ে গেছে
আজ এতটা পথ অতিক্রম করে এসে
এটা বুঝেছি
কান্না এক মস্ত সম্পদ
মনের সব মলিনতা ধুয়ে দেয়।
অথচ তুমি আমায় কাঁদতে দেবে না।
আমার খুব কান্না পাচ্ছে
আমায় কাঁদতে দাও।
যখন আপন মনে বসে বসে কাঁদছিলাম
কোথা থেকে এক ঝড় এল
মনে হলো আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।
দেখতে দেখতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি।
বৃষ্টির কান্নার সুরে
আমার কান্নার সুর হারিয়ে গেল।
আমাকে কাঁদতে দাও।

প্রসঙ্গ জপ-ধ্যান

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ (অক্টোবর, ১৮৯২—মার্চ, ১৯৮৫) তাঁর অগণিত শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের নানা জটিল প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন সময়ে মৌখিক ও পত্র মারফৎ বহু উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মন্ত্র-শিষ্যা ও মন্ত্রশিষ্য নয়াদিল্লীর শ্রীমতী বাণী রায় এবং তাঁর পুত্র ভাস্কর রায়কে তিনি জানুয়ারি, ১৯৬৬ থেকে জুলাই, ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যেসব উপদেশপূর্ণ পত্র লিখেছিলেন, সেইসব পত্রের উপাদান থেকেই 'প্রশ্নোত্তর' আকারে সাজিয়ে 'Practical Hints on Meditative Life' শীর্ষক রচনা বেদান্ত কেশরী'-র আগস্ট, ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান লেখাটি তারই বাঙলা অনুবাদ।

বঙ্গানুবাদ : সবিতা পাল
সংগ্রহ : পীযূষকান্তি রায়

প্রশ্ন : মহারাজ, কখনো কখনো এমন হয় যে, ধ্যানকালে আমি কেবল গুরুমূর্তি'রই দর্শন পাই।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : যদি ধ্যানকালে তুমি গুরু-মূর্তি দর্শন কর তাতে ক্ষতি নেই যদি তোমার স্পষ্ট ধারণা থাকে যে, গুরুমূর্তি আসলে তোমার ইষ্টেরই প্রতিরূপ। যেমন পাথরের মূর্তি পূজাকালে তুমি ভুলে যাও কিংবা দেখও না যে, এ পাথর, তুমি দেবতারই পূজা কর এবং তাঁকেই দেখ; কিন্তু সর্বদাই গুরুর মূর্তি ইষ্টের মধ্যে লয় করবে এবং কেবলমাত্র ইষ্টমূর্তি'র দর্শনলাভেরই চেষ্টা করবে। এটাই সবচেয়ে ভাল নতুবা মন নিচে নেমে যাবে এবং গুরুর মূর্তি কেবলমাত্র 'স্বামী অমুকের' মূর্তি হিসাবেই দেখবে। এবিষয়ে সতর্ক না হলে গুরুর রূপের মধ্যে তোমার ইষ্টের রূপ দেখতে পাবে না।

প্রশ্ন : ধ্যানের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি। কতক্ষণ ধ্যান করব ?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : ধ্যান যতক্ষণ সম্ভব তুমি করবে, কিন্তু খেয়াল রাখবে যেন তোমার অতিরিক্ত পরিশ্রম না হয়। প্রথম প্রথম যদিও আনন্দ অনুভব করবে, কিন্তু এতে স্নায়ুর ওপর চাপ পড়বে এবং এর প্রতিক্রিয়া পরে দেখা দেবে। রাত্রে যথেষ্ট বিশ্রাম ও ঘুম দরকার যাতে খুব সকালে উঠে তুমি চাঙ্গা হয়ে ধ্যানে বসতে পার। কমপক্ষে তুমি ছয়ঘণ্টা ঘুমোবে ও বিশ্রাম নেবে। যদি কোন কারণে রাত্রিতে সেটা সম্ভব না হয় এবং তুমি খুব সকালে উঠতে চাও, তবে দুপুরে খাবার পর একটু বিশ্রাম ও ঘুমের দ্বারা তার অপূর্ণতা পূরণ করে নিতে পার। প্রাথমিক অবস্থায় প্রায়ই যখন আমাদের স্বাস্থ্য ভাল এবং স্নায়ু সবল থাকে, আমরা তখন বিশ্রাম ও ঘুমের অভাবটা বুঝি না; কিন্তু ক্রমাগত এই অভাবটা জমা হতে হতে দীর্ঘকাল পরে আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

প্রশ্ন : প্রাথমিক অবস্থায় কেউ দীর্ঘকাল ধ্যান অভ্যাস করতে পারে না। এর প্রতিকার কি ?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : হৃদয়ে ইষ্টদেবতাকে দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষ করা যদি সম্ভব না হয় কিংবা বহুক্ষণ ধ্যানাদি যদি নাও করতে পার তবে হতাশ হয়ো না। অভ্যাসের দ্বারা সবই সম্ভব হবে। ভ্রূ-যুগলের মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করবে না, এতে বিপদ আছে। যদিও মনকে হৃদয়ে নিবদ্ধ করার চেয়ে ভ্রূর মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিবিষ্ট রাখাটা সহজ হতে পারে, কিন্তু সময়ে এতে শারীরিক অথবা মানসিক অসংলগ্নতা ঘটতে পারে। এতে তোমার স্নায়ুমণ্ডলী পরিশ্রান্ত হবে। পরিণামে তোমার স্নায়ুমণ্ডলী বিকল হবে অথবা অবিরত মাথায় বেদনা অনুভব করবে। নিয়মিত জপ ও ধ্যান কর, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, জপ-ধ্যানে বসলে প্রায়ই আমার মন নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। এতে বড়ই অস্বস্তি বোধ করি।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : উপাসনাকালে মন অন্য দিকে আকর্ষিত হলে প্রত্যেকের পক্ষেই অস্বস্তি বোধ করা স্বাভাবিক। চিন্তা করো না, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তুমি যথাসময়ে এটা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

প্রশ্ন: কিন্তু মহারাজ, কথাটা হলো এই যে, উপাসনায় বসে আমরা কেন একাগ্রতা হারিয়ে ফেলি বা মন অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত হয়? এর প্রতিকারের কি কোন উপায় নেই?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ: দ্যাখ, প্রথম প্রথম মন চঞ্চল থাকে এবং ছোট ছোট জিনিসে বিব্রত হয়; সুতরাং একাগ্রতা আনা কঠিন হয়, কিন্তু এতে হতাশ হয়ো না। এটা প্রত্যেক প্রাথমিক অভ্যাসকারীরই সাধারণ অভিজ্ঞতা। যদি তুমি দ্যাখ যে, মন এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে, তাহলে দৃঢ়তার সঙ্গে অভ্যাসে লেগে থাক এবং পূজা ও ধ্যানের বিষয়ে মনকে ক্রমাগত ফিরিয়ে আন। কামনা-বাসনাই মনকে চঞ্চল করে এবং একাগ্রতা আনা কঠিন হয়। বিচারের দ্বারা ঐ সকল বাসনাকে ত্যাগ কর, এতে মন শুদ্ধ হবে এবং তোমার একাগ্রতাও আসবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দুটি উপায়, যার দ্বারা মনের একাগ্রতা আসে। বৈরাগ্যের অর্থ—আমি মনে করি—বিচারবোধ এবং সমস্ত বাসনা থেকে মনকে আগাছামুক্ত করা; এতে মন শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হয়। যখন মন শুদ্ধ হবে তখন তোমার ধ্যান ভাল হবে এবং তুমি পরমানন্দ লাভ করবে। এই আধ্যাত্মিক সংগ্রাম অন্ততঃ দু-এক বছর চলবে; সুতরাং আধ্যাত্মিক সাধন-ভজনে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে লেগে থাকবে। এতে তোমার সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে। একাগ্রতা এত সহজে আসে না। তুমি নিয়মিতভাবে অভ্যাস করে যাও। সময়ে তোমার প্রকৃত একাগ্রতা আসবে।

প্রশ্ন: এটা তো আশার কথা, মহারাজ। কিন্তু কখনো কখনো মন এত নৈরাশ্যগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, জপে মোটেই একাগ্রতা আনতে পারি না।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ: মন জাগতিক বস্তুর মধ্যে নিবদ্ধ এবং নদীর স্রোতের মতো এর জোয়ার-ভাটা আছে। অতএব এই অবসাদের সময়ে কোন ভয় পেও না। যখন তুমি এই ধরনের হতাশা অনুভব করবে অথবা দেখবে মন সহজ অবস্থায় নেই, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এই মনোভাব দূর করার জন্য প্রার্থনা করবে এবং তিনিই তোমাকে সাহায্য করবেন। সময় সময় মহাপুরুষদেরও এ-ধরনের হতাশা এসেছে এবং আসে।

প্রশ্ন: কেন আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কখনো কখনো অতৃপ্তি অনুভব করি?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ: এটা শুভ লক্ষণ যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে তুমি ঠাকুরকে যথেষ্ট না ভালবাসার ফলে অতৃপ্তি অনুভব কর, কারণ এটাই তোমাকে ভগবৎ-উপলব্ধিতে উত্তরোত্তর আগ্রহী করে তুলবে। যদি তুমি সন্তুষ্ট থাক তবে তোমার আর উন্নতির আশা নেই, কিন্তু মনে হতাশার স্থান দিও না। শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর বিশ্বাস রাখ এবং পরিশ্রম করে এগিয়ে যাও তাহলে তাঁর কৃপায় সফল হবে। তাঁর করুণা ও শক্তির জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা কর—তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে কৃপা করবেন।

প্রশ্ন: স্বপ্নের মাহাত্ম্য কি? বিশেষ করে দেবদেবীর স্বপ্নের?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ: তোমার মন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া ঐসব স্বপ্ন সাধারণতঃ কোন কিছুরই নির্দেশ করে না। সাধারণতঃ জাগ্রত অবস্থার চাক্ষুষ দর্শনের মানসিক ছাপ ভিন্ন স্বপ্ন আর কিছুই নয়; সুতরাং দেবদেবীর স্বপ্ন দেখাটা সূচিত করে যে, এখন তোমার মন উচ্চতর বিষয় নিয়ে চিন্তামগ্ন এবং জাগতিক চিন্তা অপেক্ষা ঐসব চিন্তাই তোমার মনকে প্রভাবিত করছে।

প্রশ্ন: কখনো কখনো আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখি। এটা কি আধ্যাত্মিক উন্নতির মাপকাঠি?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ: ঠাকুরের স্বপ্ন দেখা ভাল, কিন্তু এসব জিনিসের ওপর বেশি মূল্য দিও না। যেটা মূল্যবান সেটা হলো তোমার মনের অবস্থার উত্তরণ—জগতের প্রতি নিস্পৃহতা, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, অন্যের প্রতি সমবেদনা—এসব কি তুমি অনুভব কর? জানবে, এগুলিই তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকৃত পথনির্দেশক।

প্রশ্ন: কিন্তু মহারাজ, "মহাপুরুষ অথবা দেবদেবী অথবা অবতারদের স্বপ্ন কি সত্য?"—এই প্রশ্ন কোন শিষ্য করলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন: "হাঁ, এসব সত্য। মহাপুরুষ,

দেবদেবী এবং দেব-অবতারগণের স্বপ্ন দেখা সত্য অনুভব। এসমস্তই প্রকৃত দর্শন। অনেক আধ্যাত্মিক সত্য এসব স্বপ্নে প্রকাশ পায়।" সুতরাং ব্রহ্মানন্দজী যা বলেছেন এবং আপনি যা বললেন এতে কোন স্বতোবিরোধ নেই কি?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : মহাপুরুষ, দেবদেবী বা অবতারগণকে স্বপ্নে দেখা সবসময়েই ভাল, কিন্তু তুমি এতে খুব গুরুত্ব আরোপ করবে না। কারণ, যতক্ষণ তোমার জীবন ক্রমোন্নতির পথে পরিবর্তিত না হবে ততক্ষণ এসব স্বপ্নের বিশেষ কোন মূল্য নেই। অতএব আমি তোমাকে যেকথা আগেও বলেছি এবং পূজনীয় ব্রহ্মানন্দজী যেকথা বলেছেন তাতে কোন স্বতোবিরোধ নেই। স্বপ্নে সত্যদর্শন দুর্লভ এবং যাঁরা তা দেখেন তাঁদের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তোমার ক্ষেত্রে কি তা হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, তাহলে তা যথার্থ ও মূল্যবান। তা না হলে সেগুলো তত মূল্যবান নয়। তবে সেই সঙ্গে বলি, জাগতিক স্বপ্ন দেখার চেয়ে এইসব স্বপ্ন দেখা অনেক ভাল।

প্রশ্ন : যেসব সমস্যা আধ্যাত্মিক অভ্যাস থেকে বিরত করে সেই সব সমস্যার সঙ্গে আমরা প্রতিদিন কিভাবে লড়াই করব?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : জাগতিক জীবনে সর্বদাই নানা গোলমেলে সমস্যা থাকে, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর নির্ভর করবে। তিনিই তোমার সকল সমস্যার সমাধান করবেন। এবিষয়ে তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর যেভাবে বলে গেছেন সমস্ত কর্তব্য সেভাবে সম্পন্ন করবে, সবকিছু তাঁকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকবে।

প্রশ্ন : সে তো ঠিকই মহারাজ, কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্তব্য যদি আধ্যাত্মিক কর্মের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : জাগতিক সমস্ত কর্তব্য-কর্ম পূজার মনোভাব নিয়ে করার চেষ্টা করবে। পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে চেষ্টা করা ও তাদের প্রতি তোমার সেবার মধ্য দিয়ে কর্তব্য পালনের চেষ্টা করবে। এভাবে তোমার মন বিক্ষিপ্ত হবে না এবং যখন তুমি ধ্যানে বসবে তখন তা সহজ হয়ে যাবে; কিন্তু তখনো তুমি জানবে মন স্বভাবতঃ অত্যন্ত চঞ্চল এবং নিয়মিত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের স্বারাই একে সংযত করতে হবে: সুতরাং প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তুমি উপাসনায় বসবে। 'বৈরাগ্য' মানে সৎ-অসৎ বিচার। তুমি তোমার মনকে বিশ্লেষণ কর আর দেখ, প্রচ্ছন্নভাবে কোন বাসনার অঙ্কুর সেখানে লুকানো আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে সদসদ্ বিচারের দ্বারা সেগুলিকে প্রত্যাহার কর।

প্রশ্ন : বাস্তবিক এটা খুবই আশার কথা, কিন্তু ছাত্র হিসাবে জপ বাড়ানোর জন্য বেশি সময় যে দিতে পারি না।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজকর্মের জন্য তুমি জপ বাড়াতে পারছ না বলে দুঃখবোধ করার কোন কারণ নেই। এখন তুমি ছাত্র। সুতরাং ভাল করে লেখাপড়া কর এবং উপাসনা ইত্যাদি যতটুকু করতে পারবে তা করবে ভক্তি ও একাগ্রতার সঙ্গে।

প্রশ্ন : শাস্ত্র কিম্বা শ্রীরামকৃষ্ণসংক্রান্ত গ্রন্থপাঠ ফলপ্রদ কিনা?

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : তোমার অবসরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজী সম্পর্কিত গ্রন্থ পাঠ অবশ্যই ভাল। কারণ, তা তোমার ধ্যানে সাহায্য করবে। তাঁকে অনবরত স্মরণ করাও ধ্যানেরই অঙ্গ।

জিজ্ঞাসু : মহারাজ, আমি বিনীতভাবে আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং তাঁর ওপরেই নির্ভর কর। তোমার কল্যাণের জন্য যাকিছু প্রয়োজন তিনিই করবেন; সুতরাং নিশ্চিন্ত থাক আর তাঁর নাম জপ কর। তোমার আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়মিতভাবে করে যাও। ঠাকুরের কাছে ভক্তি প্রার্থনা করবে। তিনি তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দান করবেন। ঠাকুর তোমাদের সকলের প্রতি সদাই করুণাপরবশ থাকুন, এই তাঁর কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা। [সমাপ্ত]

পরিক্রমা

সোভিয়েত রাশিয়াতে যা দেখেছি

স্বামী ভাস্করানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরের দিন ভোরে আমাদের ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশে পিয়াতিগরস্ক শহরের দিকে রওনা হতে হলো। পিয়াতিগরস্ক শহরটি একটি বিখ্যাত 'স্পা' (Spa) বা স্বাস্থ্যনিবাস। প্রাতরাশের আগেই ট্যুরিস্ট বাসে আমাদের মস্কোর একটি অন্তর্দেশীয় বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হলো। এই অন্তর্দেশীয় বিমানবন্দরটি ও মস্কোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্দেশীয় বিমানবন্দরগুলির মান অতি নিম্নস্তরের। অত্যন্ত ভিড়। বাথরুমগুলি দুর্গন্ধময় ও নোংরা। সর্বত্র মাছি ভনভন করে উড়ছে। এই বিমানবন্দরে বিদেশী ট্যুরিস্টদের জন্য একটি ওয়েটিং রুম রয়েছে, সেখানে রাশিয়ানদের আসতে দেওয়া হয় না। ওয়েটিং রুমটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

জলখাবারের জন্য একটি দোকান রয়েছে। সেখান থেকে কিছু বিস্কুট ও কফি কিনে আমরা আমাদের প্রাতরাশ সেরে নিলাম অনবরত মাছির উপদ্রব সত্ত্বেও।

কিন্তু আমাদের বিমান প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে বলে ততক্ষণ বিমানবন্দরে বসে থাকতে হলো। শেষ পর্যন্ত আমাদের গাইড এসে আমাদের সঙ্গে করে বিমানে উঠলেন। বিমানটি খুব বড়—৩৫০ জন যাত্রী নিতে পারে। ইলিউশিন-৮৬ মডেলের বিমান। কিন্তু বিমানে ওঠার পরও আমাদের আরও দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো সম্ভবতঃ কোন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য।

অন্তর্দেশীয় বিমানে কোন খাবার দেওয়া হয় না বলে রুশ যাত্রীরা সঙ্গে করে খাবার নিয়ে বিমানে চড়েন। বিমান আকাশে ওড়ার পর হাস্যবিহীন বিরসমুখে এরোফ্লটের এয়ারহোস্টেসরা অতি ছোট প্ল্যাস্টিকের কাপে করে আমাদের কিছু আপেলের রস দিয়ে গেলেন এবং কিছু পরে এসে কাপগুলি ফেরত নিয়ে গেলেন।

প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৫টি রিপাবলিক ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় রিপাবলিকের নাম রাশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেটিভ স্যোসালিস্ট রিপাবলিক। মস্কো, লেনিনগ্রাদ ইত্যাদি বড় বড় শহর এই রিপাবলিকেই রয়েছে। মস্কো থেকে অনেক দক্ষিণে এবং ককেশাস পর্বতমালার কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত হলেও পিয়াতিগরস্ক একই রিপাবলিকের অন্তর্ভুক্ত। সরলরেখায় দূরত্ব মাপা হলে পিয়াতিগরস্ক মস্কো থেকে প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার দূরে।

পিয়াতিগরস্ক বিমানবন্দরে নামার পর আমাদের ট্যুরিস্ট বাসে করে পিয়াতিগরস্ক শহরে নিয়ে যাওয়া হলো। এ-শহরটি ককেশাস অঞ্চলের স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে বিখ্যাত। এখানে বহু উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। এখানকার জলে নানা রকমের রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ আছে বলে রোগ-নিরাময়ের জন্য এই জলের ব্যবহার হয়। পিয়াতিগরস্কের এক পাশে ককেশাস পর্বতমালা। পিয়াতিগরস্ক শব্দের অর্থ হচ্ছে—'পাঁচটি পাহাড়'। এ-শহর থেকে পাঁচটি পাহাড়ের চূড়া দেখতে পাওয়া যায় বলে শহরটিকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে শহরটির পত্তন হয়েছিল। শহরটির সঙ্গে লেরমনটভ নামে জনৈক রোমান্টিক রুশ সাহিত্যিকের নাম বিজড়িত। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে এই শহরে লেরমনটভের সঙ্গে এক সামরিক বাহিনীর অফিসারের 'ডুয়েল' হয়। তাতে লেরমনটভ মারা যান। পিয়াতিগরস্কে লেরমনটভের নামে একটি মিউজিয়াম রয়েছে। মাউন্ট মাসুক-এর পাদদেশে ডুয়েলটি হয়েছিল। যেখানে লেরমনটভ মারা যান সেখানে অতি সুন্দর একটি পার্কে লেরমনটভের স্মৃতিফলক রয়েছে।

পিয়াতিগরস্কে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয় ইনট্যুরিস্ট হোটেলে। হোটেলটির নাম ভলনা। আগস্ট মাসে পিয়াতিগরস্কে খুব গরম পড়ে। অথচ সোভিয়েত রাশিয়ার অধিকাংশ হোটেলেই এয়ারকন্ডিশনিং নেই। আমাদের হোটেলটিতেও ছিল না। বেশ কয়েক তলা উঁচু অধুনা-নির্মিত হোটেলটিতে বিছানাপত্র ভালই, কিন্তু বাথরুমটি নোংরা। জানালা খুলতে গিয়ে দেখা গেল দুটি জানালার মধ্যে একটিমাত্র খোলা যায়, অন্যটি খোলা যায় না। ব্যালকনি রয়েছে, কিন্তু তা এমনভাবে তৈরি যে, সিমেন্ট ইতিমধ্যেই খসে পড়ছে। ভয় হলো যে, ব্যালকনিতে দাঁড়ালে যেকোন সময় তা ভেঙে পড়তে পারে।

সোভিয়েত রাশিয়ায় গত দু-তিন দশকে যেসব বহুতল বাড়ি তৈরি হয়েছে সেগুলির হাল আমাদের হোটেলটির মতোই। মস্কো, লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি দু-চারটি শহর ছাড়া অন্যান্য শহরগুলির বহুতল-বিশিষ্ট বাড়িগুলির একই অবস্থা।

সরকারি আমলাতন্ত্রের মধ্যে দুর্নীতি রয়েছে বলে সোভিয়েত অর্থনীতির অবস্থা শোচনীয়। বহু মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর হলেও দুর্নীতির ফলে দেশটির এই দুরবস্থা। কালো বাজার, কালো টাকা এবং ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে স্বার্থান্বেষীরা দুর্নীতিকে জিইয়ে রেখেছে। সিমেন্টের সঙ্গে অতিরিক্ত মাত্রায় বালি মিশিয়ে সিমেন্ট চুরি করার ফলে আট-দশ বছরের পুরনো বাড়িগুলির দেয়াল থেকে সিমেন্ট খসে খসে পড়ছে। এর ওপর কর্মীদের কাজে ফাঁকি দেওয়া তো রয়েছেই। ইদানীং আর্মেনিয়ার ভূমিকম্পে অসংখ্য বাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বহু লোকের প্রাণহানি হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান গরবাচভের মতে সিমেন্টে ভেজাল দেওয়ার জন্যই নাকি বাড়িগুলি এত সহজে ভূমিস্যাৎ হয়েছিল। গরবাচভের গ্লাসনস্ত বা উন্মুক্ততার নীতির ফলে তখন রাশিয়ার পত্র-পত্রিকাগুলিতে নানা ধরনের দুর্নীতির প্রকাশ্যে সমালোচনা হচ্ছিল। মস্কো থেকে প্রকাশিত সরকারি 'মস্কো নিউজ' পত্রিকার ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২০ আগস্ট তারিখের একটি পত্রিকার কপি আমার কাছে রয়েছে। পত্রিকাটির দশম পৃষ্ঠায় একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধটির শিরোনাম হচ্ছে: "Corruption—the Exception or the Rule?" (দুর্নীতি—ব্যতিক্রম, অথবা নিয়ম?) প্রবন্ধটিতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পীপলস ডেপুটি তেলম্যান গিদলিয়ান বলেছেন: "স্ট্যালিন ও তাঁর অন্তরঙ্গদের আমলে আমাদের দেশে এতটা সর্বত্র-বিস্তৃত ও গভীর-মূল দুর্নীতি ছিল না।... কিন্তু ব্রেজনেভের মতো অক্ষম নেতার আমলে কি হলো? তখন দেশের এই পচা শাসন-পদ্ধতি ভেঙে পড়তে লাগল। পাপের (vice) ফুল প্রস্ফুটিত হলো এবং দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার ক্ষমতার সর্বস্তরে প্রবেশ করল।"

তিনি আরও বলেছেন: "আমরা যেখানেই অনুসন্ধান করেছি সেখানেই ঢালাও দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার এবং ঘুষ দেওয়া-নেওয়া দেখতে পেয়েছি। এই দুর্নীতিগ্রস্ত লোকগুলি কি তাদের জন্ম থেকেই অপরাধপ্রবণ ছিল? নিশ্চয়ই নয়। আমাদের শাসনপদ্ধতিকেই (system) একমাত্র এদের এই দুর্গতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করা চলে।"

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্ল্যানিং কমিটির অর্থনৈতিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সর্বোচ্চ পদাধিকারিণী ডক্টর তাতিয়ানা কোরিয়াগিনা সেদেশের দুর্নীতি সম্পর্কে বলেছেন: "অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আমরা বলেছিলাম যে, এদেশে স্বাধীনভাবে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন করার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তদনুযায়ী আমাদের কো-অপারেটিভ সংক্রান্ত আইনের মাধ্যমে এই ভাব-ধারাটিকে বাস্তবরূপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের রিসার্চ অনুযায়ী কো-অপারেটিভ বা সমবায় সমিতিগুলিকে এই সুযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমিতিগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের হিসাব অনু-যায়ী ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে আইনানুগ সমবায় সমিতির ব্যবসাগুলির মোট মূল্য সে-বছর ৮০ কোটি রুবলের মতো বেড়ে যায়। কিন্তু কালো টাকার ব্যবসার ক্ষেত্রে সে-বছর বার্ষিক বৃদ্ধি হয়েছিল ১৪০ কোটি রুবল। সেটা সম্ভব হয়েছিল ফাটকাবাজী (racketeering), ঘুষ এবং ব্যবসার সত্যিকারের লাভ গোপন করার কারচুপির মাধ্যমে।"

ঐ নিবন্ধে তিনি আরও বলেছেন : "যাদের আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাপিট্যাল বা কালো টাকা আছে তারা নরম্যাল মার্কেট ওরিয়েন্টেড ইকনমিকে ভয় করে। কারণ সেক্ষেত্রে এধরনের ব্যবসাতে যে প্রচুর লাভ হচ্ছে তা সরকারকে জানাতে হবে।"

যাই হোক এখন আমার ভ্রমণকাহিনীতে ফিরে আসা যাক। পিয়াতিগরস্কে আমরা ছিলাম তিন রাত্রি। হোটেলের পাশেই একটি অতি সুন্দর পার্ক। পার্কটি বেশ বড় ; পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে গাছপালা, জলের ফোয়ারা ও নানারকমের ফুলের গাছ রয়েছে। আমরা প্রায় প্রতিদিনই বিকালের দিকে পার্কটিতে বেড়াতে যেতাম। পার্কে বেড়াতে বেড়াতে একদিন দুজন ভারতীয়কে দেখতে পেলাম। দেখে মনে হলো তারা ছাত্র। তারা দুজন একটি গাছের তলায় বসে খুব উত্তেজিতভাবে তর্ক অথবা ঝগড়া করছিল। দুজনের হাতেই মদের বোতল। শুনে মনে হলো, তারা খুব সম্ভবতঃ মালয়ালাম ভাষায় কথা বলছে। সুদূর বিদেশে ভারতীয়দের দেখলে স্বভাবতই তাদের সঙ্গে পরিচয় করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কেন জানি না এদের দেখে মনে একটা দারুণ আঘাত পেলাম। ভারতের আদর্শ ছাত্রজীবনের যে-ভাবমূর্তি আমার মনে ছিল ছাত্রদুটিকে দেখে মনে হলো এরা যেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভারতীয় ছাত্ররা, যারা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে পড়তে যায়, তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছাত্র স্পঞ্জের মতো পাশ্চাত্য সমাজের দোষগুলি শুষে নেয়। অথচ পাশ্চাত্যের অনেক দেশে, যেমন আমেরিকাতে কয়েক লক্ষ আমেরিকান রয়েছেন যাঁরা মদ তো দূরের কথা, চা-কফি পর্যন্ত ছোঁন না। উদাহরণ-স্বরূপ মর্মন চার্চের (Mormon Church) কোন সভ্য চা, কফি অথবা মদ খান না। কিন্তু এসব ভারতীয় ছাত্রদের পাশ্চাত্যসমাজের গুণগুলি, যেমন সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি অর্জন করার তেমন স্পৃহা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আবার ভারতীয় ঐতিহ্যের গুণগুলিও তাদের জীবনে তেমন প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না।

এ-ঘটনাটি দেখে দুঃখিত মনে সেদিন হোটেলে ফিরে এলাম।

পিয়াতিগরস্ক থেকে একদিন ট্যুরিস্ট বাসে আমাদের ১৪০ কিলোমিটার দূরে কিসলোভস্ক শহরে নিয়ে যাওয়া হলো। এ-শহরটিও পিয়াতি-গরস্কের মতোই একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস। শহরটিতে একটি গাছপালায় ঢাকা বিরাট পার্ক রয়েছে। পার্কটির এক পাশে রেস্তোরাঁ, ট্যুরিস্ট-দের জন্য প্রতীক্ষালয় ইত্যাদি রয়েছে। আমরা পার্কটিতে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর একটি প্রতীক্ষালয়ের বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম করছি, এমন সময় কয়েকটি কমবয়সী যুবক আমাদের কাছে এসে বসল। এদের মধ্যে একজন কিছু ইংরেজী বলতে পারে। সে জিজ্ঞাসা করল, আমি কোন্ দেশ থেকে এসেছি। আমি আমেরিকা থেকে এসেছি বলাতে যুবকটি বলল : "I like America." তারপর আমার ক্যামেরাটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল : "এ-ক্যামেরাটি কি আপনি বিক্রি করবেন ?" আমি "না" বলাতে সে আবার প্রশ্ন করল : "আপনার জুতোজোড়া কি আমায় বিক্রি করবেন ?" তদুত্তরে আবার "না" বলায় যুবকটি বলল : "আপনার কাছে কি আমেরিকান ডলার আছে ? ডলারের বদলে আমি অনেক রুবল দেব।" তখন আমি বললাম যে, আমার রুবলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যুবকটি এবং তার বন্ধুরা নাছোড়বান্দা। আমার সঙ্গী ভারতীয় ভক্তটি বললেন : "এদের মতিগতি ভাল মনে হচ্ছে না। চলুন, আমরা অন্য কোথাও গিয়ে বসি।" উঠে অন্যত্র যাওয়ার আগে আমি যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম : "তুমি কি এ-শহরের বাসিন্দা ?" যুবকটি উত্তর দিল : "না, আমি ও আমার বন্ধুরা জর্জিয়া থেকে এসেছি।"

কিসলোভস্ক থেকে বাসে পিয়াতিগরস্ক ফেরার সময় আমি আমাদের গাইড আল্লা লোভিতিনাকে বললাম : "আমরা যখন পার্কের ওয়েটিং রুমে বসেছিলাম তখন কয়েকটি যুবক এসে আমাদের বিরক্ত করছিল।" তা শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : "কেন, ওরা কি ডলার বিনিময়ের জন্য আপনাদের ধরেছিল অথবা জিনিসপত্র কিনতে চেয়েছিল ?" আমি "হ্যাঁ" বলাতে তিনি বললেন : "এখানে ভাল ক্যামেরা, জুতো বা এধরনের ভোগ্য-পণ্য সহজে পাওয়া যায় না বলে ট্যুরিস্টদের কাছ

থেকে স্থানীয় লোকেরা এসব কিনতে চায়। তবে ভবিষ্যতে কেউ এভাবে বিরক্ত করলে আমাকে বলবেন, আমি তখন ওদের নিষেধ করব।" আমি বললাম: "আমার ক্যামেরাটির দাম কয়েকশো ডলার। আমি বিক্রি করতে রাজি হলেও ওরা এত টাকা দিয়ে কিনত কি করে?" তদুত্তরে আল্লা লেভিতিনা বললেন: "এদেশে অনেকেরই যথেষ্ট টাকা রয়েছে।"

পরে আমি বই পড়ে এবং খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, রাশিয়াতে অধিকাংশ লোকের মাসিক বেতন ৯০ রুবল থেকে শুরু করে ৩০০ রুবলের মধ্যে। মেথরদের বেতন ৯০ রুবল, ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের বেতন মাসে ১২০ রুবল, হাসপাতালের ডাক্তার এবং স্কুলের শিক্ষকদের বেতন মাসে ১৫০ রুবল, অথচ গাড়ি বা ট্রাক-ড্রাইভারদের বেতন ৩০০ রুবল। ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী এই বেতনের হারগুলি দেওয়া হলো। কিন্তু ইউক্রেনের কয়লাখনির শ্রমিকদের ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দেই মাসিক বেতন ছিল ৩২০ রুবল। সাইবেরিয়ার জনবিরল এলাকাগুলিতে যাঁরা তীব্র শীতের মধ্যে কাজ করেন তাঁদের বেতন অন্যান্য অঞ্চলের কর্মীদের বেতনের দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ। সোভিয়েত রাশিয়ায় সাধারণতঃ শ্রমিকদের বেতন বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে বেশি বলে শুনলাম। শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের বেতন কম হলেও এঁদের উপরি আয়ের সুযোগ আছে। শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশ্যনি করতে পারেন, ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে আয় বাড়াতে পারেন এবং সাংবাদিকরা প্রবন্ধাদি লিখে অনেক উপরি উপার্জন করতে পারেন।

১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে আমি সোভিয়েত রাশিয়াতে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন মস্কোর একজন সাধারণ কর্মচারীর খাওয়া, থাকা, যানবাহন ইত্যাদির খরচা মিটিয়েও মাসে ১০০ রুবল উদ্বৃত্ত থাকার কথা। যেহেতু সোভিয়েত দেশে কেউ বসে থাকে না, প্রাপ্ত-বয়স্ক সব স্ত্রী-পুরুষকেই কাজ করতে হয়, সেহেতু একটি পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর যুক্ত আয়ের থেকে অনায়াসে প্রতি মাসে দেড়শো রুবল সঞ্চয় করা যেতে পারে। প্রখ্যাত লেখক, অভিনেতা বা অভিনেত্রী এবং অর্কেস্ট্রার কম্পোজার (Composer)-দের মধ্যে যাঁরা খ্যাতনামা তাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন সেখানে। কিন্তু অর্থ সঞ্চয় করলেও উচ্চমানের ভোগ্যপণ্য সোভিয়েত রাশিয়ায় পাওয়া কঠিন। এজন্য ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে এঁরা জিনিসপত্র কিনতে চান।

ভোগ্যপণ্য সুলভ নয় বলে ভোগ্যপণ্য বিনিময় সোভিয়েত সমাজের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিয়াতিগরস্ক শহরের একটি বাজারে আমার ভক্ত বন্ধুটি কিছু কিনতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, একটি দোকান থেকে এক ভদ্রলোক প্রায় তিরিশ-চল্লিশটি খাতা একসঙ্গে কিনে ফেললেন। এতগুলি খাতা একবারে কেনার মাত্র দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমতঃ তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে, আবার কবে এধরনের খাতা কিনতে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় কারণ এই হতে পারে যে, ভবিষ্যতে খাতাগুলির বিনিময়ে তিনি অপরের কাছ থেকে অন্য কোন ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার প্রায় সর্বত্র আমেরিকান ডলার ও ব্রিটিশ পাউন্ডের চাহিদা রয়েছে। বিমান-বন্দর, রেস্তোরাঁ, ইত্যাদি যেসব জায়গায় অধিক সংখ্যক বিদেশী ট্যুরিস্টের আনাগোনা, সেখানেই কিছু লোক এসে বেআইনিভাবে ডলার বা পাউন্ডের বিনিময়ে সস্তায় রুবল বিক্রির চেষ্টা করেন। আমরা যখন সেদেশে গিয়েছিলাম তখন এক রুবলের রুশ সরকার-নির্দিষ্ট দাম ছিল প্রায় দেড় ডলার। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকের 'চোরা বাজারে' ট্যুরিস্টরা একটি আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে ১৫ রুবল এবং একটি ব্রিটিশ পাউন্ডের বিনিময়ে ১০ রুবল অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারতেন, কিন্তু ধরা পড়লে বেআইনী অর্থ বিনিময়ের জন্য ট্যুরিস্টদের পুলিশের হাতে বিশেষ নাজেহাল হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার কিছু লোক ডলার বা পাউন্ড কিনতে এত আগ্রহী কেন—এই প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি এই প্রশ্নের উত্তর এখনো সঠিকভাবে জানতে পারিনি। অনেকে বলেন, ডলার বা পাউন্ডের বিনিময়ে কালো বাজারে বিদেশী ভোগ্যপণ্য কিনতে পাওয়া যায়।

[পরবর্তী অংশ আগামী চৈত্র ১৩৯৯ সংখ্যায়]

নিবন্ধ

ভারতের বাইরে ভারত-সংস্কৃতি

সন্তোষকুমার অধিকারী

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ তার ধর্ম ও সংস্কৃতির পণ্য বহন করে ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। খ্রীস্টজন্মের আনুমানিক ছয়শো বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে এই বিজয়যাত্রা। হিন্দু-সংস্কৃতির বাহক হয়ে হিন্দু বণিক ও রাজকুল —শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ—দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে হাজির হয়েছে দক্ষিণে সিংহলে, দক্ষিণ-পশ্চিমে মালদ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে, ইন্দোচীনে ও জাপানে এবং সুবর্ণ দ্বীপ বা সুমাত্রা থেকে নিউগিনি ও উত্তরে ইস্টার আইল্যান্ড পেরিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। তারা ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে বহন করে নিয়ে গিয়েছে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি, ভারতের চিন্তা, ভারতের শিল্পকলা এবং রাষ্ট্র-নীতিকেও। পূর্ব এশিয়ায় কম্বোজ (বা কম্বোডিয়া) ও চম্পায় (বা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে) হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়েছে দ্বিতীয় শতকেই। চতুর্থ শতকের মধ্যেই হিন্দু-ধর্মচেতনা স্থানীয় চাম ও অন্যান্য উপজাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। যবদ্বীপ (জাভা) ও বালিতে হিন্দুমন্দির যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি স্থাপিত হয়েছে সংস্কৃত-চর্চাকেন্দ্র। শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভাব ঘটেছে বৌদ্ধধর্ম-ভাবনা ও শিল্পরীতির। আশ্চর্য ! আগন্তুক সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় উপজাতিক সংস্কৃতির কোন বিরোধ ঘটেনি, বরং সমন্বয় ঘটেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে অন্তহীন বিশালতায় পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলি মোচার খোলার মতো ভেসে রয়েছে। উত্তরে হাওয়াই, দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড এবং পূর্বে ইস্টার আইল্যান্ড—এই ত্রিভুজের মধ্যে রয়েছে পলিনেশিয়া। দ্বীপগুলি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন। মরুভূমির মধ্যে উট যেমন মানুষের একমাত্র ভরসা, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তেমনি ভেলা (raft) পলিনেশিয়ার মানুষদের একমাত্র সম্বল। বালসা-গুঁড়ির দীর্ঘ ভেলায় সওয়ার হয়ে তারা তরঙ্গের বুকে ভেসে পড়ে। ফেয়ারফিল্ড অসবোর্ন লিখেছেন : “আদিম যুগের ভেলায় চড়ে নক্ষত্র দেখে তাদের দীর্ঘ ও দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রা পলিনেশিয়ার অধিবাসীদের পৃথিবীর আদিম ও শ্রেষ্ঠ নাবিকরূপে চিহ্নিত করেছে।”[1] বস্তুতঃ পলিনেশীয় নাবিকেরাই যে সমুদ্রপথ তৈরি করেছে সেই পথ ধরেই হিন্দুবণিক ও সন্ন্যাসীরা সাগর পাড়ি দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পলিনেশীয়রা অস্ট্রিক গোষ্ঠিভুক্ত, উড়িষ্যার প্রাচীন অধিবাসীরা, যারা কলিঙ্গ নামে অভিহিত, তারাও অস্ট্রিক গোষ্ঠিভুক্ত। উড়িষ্যা, মালয় ও পলিনেশিয়ার মধ্যে নৌ-চলাচল ছিল এবং সেইসঙ্গে ছিল সংস্কৃতির আদানপ্রদানও। পুরীর জগন্নাথদেবের মূর্তির সঙ্গে পলিনেশীয়দের বাহুহীন মূর্তিগুলির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পলিনেশিয়ার শিল্পনিদর্শন —ত্রিভুজাকার স্তূপ ও বাহুহীন মূর্তি।[2]

প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃতি বুঝতে হলে, মনে রাখতে হবে যে, ভূপৃষ্ঠের আয়তনের অর্ধেক জুড়ে আছে এই মহাসাগর। বিষুবরেখার উত্তরে মাইক্রোনেশিয়া আর দক্ষিণে মেলানেশিয়া ; এদের পূর্ব-দিকে পলিনেশিয়া। তার মধ্যে রয়েছে সামুয়া, তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, ইস্টার আইল্যান্ড প্রভৃতি দ্বীপগুলি।

মহাসমুদ্রের বুকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা হাজার মাইল ব্যবধানে স্থিত এই দ্বীপগুলিতে যারা

১ 'অতীত ভারতীয় শিল্পে সাগরিকা সভ্যতার অবদান' -পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, তরুণের স্বপ্ন, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৯,

২ ঐ

বাস করে তাদের পূর্বপুরুষ যে এশিয়ার লোক একথা ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন। প্রশান্ত মহাসাগরে ঘোরার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে থর হেয়েরডাল লিখেছেন: "The Malaya people··· possesses rudimentary evidence of early contact with a palaeo-Polynesian stock."[৩] (মালয়ের অধিবাসীদের ··· প্রাচীন পলিনেশিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের প্রাথমিক পরিচয়ের প্রমাণ আছে।) পলিনেশীয়দের পূর্বপুরুষেরা পূর্ব এশিয়ার উপকূলবর্তী এলাকা ত্যাগ করে দ্বীপে দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল সভ্যতার বিকাশের পূর্বেই। পলিনেশীয় নাবিকদের দেবতা কেন বা কানে (Kane) সূর্যের স্থানীয় নাম। হেয়েরডাল বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, সিন্ধু উপত্যকার মানুষের মতো পলিনেশিয়ার ইস্টার আইল্যান্ডের অধিবাসীরাও কানে গোল রিঙ ঝোলাতো। তিনি লিখেছেন: "Was it pure coincidence that remote oceanic islands like Maldives and Easter Islands had been found and settled by navigators whose Gods and nobles were supposed to wear big discs in their earlobes?"[৪] (এটা কি নিছক দৈব সংঘটন যে, মালদিভে ও ইস্টার আইল্যান্ডের মতো দূরবর্তী সামুদ্রিক দ্বীপে যে সমুদ্রচারী নাবিকেরা ছিল, তাদের দেবতা ও অভিজাত সম্প্রদায় কানের লতিতে গোল রিং পরার রীতি গ্রহণ করেছিলেন?)

মহাসমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে থাকা এই পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ভারত-সংস্কৃতির ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাচীনকাল থেকেই, হয়তো সিন্ধু-সভ্যতার যুগ থেকেই। ঐতিহাসিক হেয়েরডাল এই দ্বীপগুলিতে ঘুরেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন ইস্টার আইল্যান্ডে অগণিত প্রস্তরমূর্তি; মূর্তিগুলির কানের নিচের দিক (লতি বা lobe) লম্বা এবং ঘাড়ের দিকে প্রলম্বিত। শুধু ইস্টার আইল্যান্ডে নয়, এমন লম্বিত কর্ণের নিদর্শন পেরুতেও তিনি দেখেছেন। যাঁরা বুদ্ধের প্রাচীন মূর্তি দেখেছেন, তাঁদের মনে পড়বে যে, বুদ্ধমূর্তির কানও লম্বা এবং বুদ্ধের সময়েরও অনেক আগে মহেঞ্জোদারোর মূর্তিতেও এই লম্বিত কর্ণের বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। হেয়েরডাল এপ্রসঙ্গে বলছেন: "The Indus Valley mariners were of long ears.···The Hindu nobility had later copied the custom from them, and afterwards Buddha and his followers had spread it far and wide in Asia."[৫] (সিন্ধু-সভ্যতার যুগের নাবিকরা লম্বা কানযুক্ত ছিল।··· হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষেরা পরবর্তী কালে তাদের এই লম্বকর্ণের বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করতো এবং আরও পরে বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যদের দ্বারা এর বিস্তারলাভ ঘটে সারা এশিয়াতে।)

জানা গিয়েছে যে, সিন্ধু-সভ্যতার কাল থেকেই ভারতীয় নাবিকেরা মহাসমুদ্রে ভ্রমণ করেছে। নৌবিদ্যায় তাদের এই পারদর্শিতার সঙ্গে পলিনেশীয় নাবিকদের যে যোগাযোগ ছিল, তাও এখন স্বীকৃত। তাই এই লম্বকর্ণের বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষ থেকে পলিনেশিয়ায় এবং সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতেও গিয়ে পৌঁছেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দুস্তর বুক অতিক্রম করা, বিশেষভাবে ইন্দোনেশিয়া অথবা ইন্দোচীন থেকে যাত্রা করে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বলে অনেকেই মনে করেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল থর হেয়েরডাল বালসা কাঠের তৈরি ভেলা 'কোন-টিকি'র সাহায্যে পেরু থেকে যাত্রা করে প্রথমে মহাসাগরের বুকে এক হাজার মাইল দূরে ইস্টার আইল্যান্ডে পৌঁছেছিলেন। পরে ৪৩০০ মাইল পথ ঘুরে ১০১ দিনে রারোইয়ার মাটি ছুঁয়েছিলেন। হেয়েরডাল দেখেছেন যে, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইন্দোনেশিয়ায় এইভাবে ভেলাতে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু ইন্দোনেশিয়া বা মালয় থেকে আমেরিকা পৌঁছানো দুরূহ ব্যাপার বলে তাঁর মনে হয়েছে।

৩ The Early Man and the Ocean—Thor Heyerdahl, Doubleday & Co. New York, pp. 153-154
৪ The Maldive Mystery—Thor Heyerdahl, Adler & Adler, Bethesda, U. S. A., 1986, pp. 6-8
৫ Ibid, p. 6-8

পলিনেশিয়ানদের তৈরি এই বালসা-ভেলা তৈরির জন্য বালসা-গুঁড়িগুলি কাঁচা অবস্থাতেই কেটে সমুদ্রে নামানো হলে সেগুলি জলসহ ও মজবুত হয়ে থাকে। দু-ফুট মোটা গুঁড়ি দিয়ে ভেলা তৈরি হলে সে-ভেলা গভীর সমুদ্রে ঝড়-তুফানেও অক্ষত থাকে। এই ধরনের এক-একটি ভেলা ৭০ ফুট পর্যন্ত লম্বা ও সাড়ে ৬ ফুট চওড়া হয়। একটি ভেলাতে একশো জন নাবিক থাকতে পারে।

প্রাচীন নথিপত্র থেকে দেখা গেছে যে, প্রাচীনকালের এই বালসা-ভেলা প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর উপকূল ঘেঁষে জাপান বা ফিলিপাইন থেকে যাত্রা করে হাওয়াই ও অ্যালেশিয়ান দ্বীপের মাঝ দিয়ে উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার কূলে পৌঁছাতে পারত এবং সেখান থেকে তারা এগিয়ে যেত প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণদিকে, যার একদিকে দক্ষিণ আমেরিকার গুয়াতেমালা থেকে পেরু পর্যন্ত উপকূল, অন্যদিকে পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ। হেয়েরডাল লিখেছেন :

"The island studded coast of British Columbia offers··· a feasible geographical stepping stone from the Philippine sea to Polynesia.··· It (the British Columbian Archipelego) is the only area known to receive natural drift from South-East Asia."[৬] (ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে ছড়িয়ে রয়েছে অগণিত দ্বীপ। এই দ্বীপগুলিতে পা রেখে ফিলিপাইন সাগর থেকে পলিনেশিয়া যাওয়ার সম্ভাব্য পথ। এই দ্বীপপুঞ্জই হলো একমাত্র স্থান যেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রকৃতির অনুকূলে গতি প্রবাহিত হয়েছে।)

এইভাবেই চীনের উপকূল বেয়ে জাপান কারেন্ট ধরে উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার কূলে পৌঁছেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ। সেখান থেকে আবার তারা এগিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়াতেমালা ও পেরুর পথে, অথবা ফিরে এসেছিল পলিনেশিয়ার হাওয়াই বা ইস্টার আইল্যান্ডে। এই যাওয়া-আসার স্রোত শুরু হয়েছে সিন্ধু-সভ্যতার কাল থেকেই। খ্রীস্টজন্মের অন্ততঃ তিন হাজার বছর আগে সিন্ধু-সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল বিকাশ। একই সঙ্গে সুমের-সভ্যতা (টাইগ্রিস নদীর তীরে) এবং মিশর-সভ্যতার (নীল নদের তীরে) আবির্ভাব। সেই প্রাচীন যুগেই অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেই ব্যাবিলন-মেসোপটেমিয়া, হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো, তাম্রলিপ্ত এবং সুবর্ণ দ্বীপের (সুমাত্রা-জাভা) মধ্যে নৌ-চলাচল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। হেয়েরডাল লিখছেন : "Until we can prove differently from archaeological remains, civilized man suddenly appeared 5000 years ago, when he began to build cities like Amri, Kot-Digi, Mahenjodaro and Harappa in the Indus Valley. He was already a sea-farer too building port, along the river banks and along the coasts of the Indian Ocean."[৭] (প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে আমরা যদি বিপরীত প্রমাণ কিছু না পাই, তাহলে একথাই সত্য যে, পাঁচহাজার বছর আগে হঠাৎ সভ্য মানবের আবির্ভাব ঘটেছে, যে-মানব অমরি, কোট-দিগি, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মতো শহর তৈরি করেছে সিন্ধু নদের উপত্যকায়। সেই মানুষই আবার সমুদ্র পরিভ্রমণ করেছে এবং নদী ও ভারত মহাসাগরের কূলে কূলে বন্দর গড়ে তুলেছে।)

সিন্ধু-সভ্যতা ভেঙে পড়ার পর আর্য ও দ্রাবিড়-সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ("by acculturation of the two different cultures") হিন্দুধর্ম নতুন করে জেগেছে। তারই পথ বেয়ে পরবর্তী কালে জন্ম নিয়েছে বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মসম্প্রদায়। খ্রীস্টজন্মের তিনশো বছর আগেই নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়েছে বহির্ভারতের বিভিন্ন স্থানে সিংহলে ও মালদিভ দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণ দ্বীপ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে পলিনেশিয়া এবং ফিলিপাইন ও জাপান হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো ও পেরুতে।

ভারত মহাসাগরের জাভা অথবা ফিলিপাইন্সের

৬ Early Man and the Ocean, p. 46,

৭ The Maldive Mystery, p. 256,

ম্যানিলা থেকে পোত বা ভেলা ভাসিয়ে হিন্দু বণিকেরা যে একসময়ে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়াতেমালা ও পেরুতে পৌঁছেছিল, এঘটনাকে অনেকে অবিশ্বাস্য মনে করেন। গত ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় থাকার সময়ে আমি বিশ্ববিখ্যাত ভৌগোলিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ থর হেয়েরডালকে একটি চিঠি দিই। আমার চিঠির উত্তরে তিনি লিখেছেন: "আপনার চিঠিটি আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি।··· প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও মায়া-সভ্যতার মধ্যে আরও অনেকের মতো আপনিও যে অন্তরঙ্গ মিল লক্ষ্য করেছেন, আপনার এই বিবৃতিতেও আমি আকৃষ্ট। এই মিল এত বেশি যে, আমার মনে হয়েছে—ভারত মহাসাগর থেকে সমুদ্রযাত্রীর দল দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে মেক্সিকো উপসাগরে পৌঁছেছিল সেই একই বাতাস ও স্রোতের গতি ধরে। তার সহায়তায় আমি আফ্রিকা থেকে বার্বাডোজ দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেছিলাম ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে।···"

হেয়েরডাল তাঁর চিঠিতে বলেছেন যে, তিনি নিজেও ১৯৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে মেসোপটেমিয়া থেকে রেড-সি হয়ে সিন্ধু-সভ্যতার যুগের নাবিকদের মতো ভেলায় করে রওনা হয়ে আফ্রিকা ঘুরে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দেননি, সে-পথ ইন্দোনেশিয়া থেকে জাপান সাগরের স্রোত ধরে উত্তর দ্রাঘিমার পথ।

'ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অফ ইন্ডিয়ান কালচার'-এর ডিরেক্টর লোকেশচন্দ্র ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে জাপানে এক প্রাচীন বৌদ্ধবিহারে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কার করেছেন।[৮] একাদশ খ্রীস্টাব্দের প্রাচীন কোকিজী মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। লোকেশচন্দ্র ঐ মন্দিরে এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে যেসব হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে সরস্বতী ও কার্তিকেয়র মূর্তি রয়েছে। তাছাড়া জাপানে এবং থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরে বিভিন্ন ধরনের গণপতি-মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সংস্কৃতভাষা-চর্চা এক সময়ে যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, তার নিদর্শন কিছু কিছু এখনো বর্তমান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্পেনীয় ধর্মযাজকেরা ফিলিপাইনের প্রাচীন পুঁথিগুলি নষ্ট করে দিয়েছেন। অন্যদিকে সেলিবিস ও মোলাক্কাস দ্বীপপুঞ্জে, এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের নিউগিনিতেও যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছিল, তার নিদর্শনও পাওয়া যাচ্ছে। সেলিবিস দ্বীপে ব্রোঞ্জের একটি বিরাট বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভারতীয় বণিকদের ডিঙাগুলি মালয়ের অস্ট্রিক নাবিকদের সঙ্গে একসময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর কোন একসময়ে ম্যানিলার পথে জাপান সমুদ্র দিয়ে পশ্চিম আমেরিকায় এবং সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়াতেমালা ও পেরুতে গিয়ে পৌঁছেছে,[৯] অথবা সরাসরি নিউগিনি থেকে যাত্রা করে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ হয়ে পেরুতে গিয়ে উঠেছে—এরূপ অনুমান করার কারণ আছে।

হিন্দু বণিকেরা যে জাভা থেকে যাত্রা করে মেক্সিকোয় গিয়ে পৌঁছেছিল, তার একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শনও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মেক্সিকোর ইউকাতানে মাটির তলা থেকে দশম শতকের (৯২৩ খ্রীস্টাব্দ) একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে। ঐ লিপিতে বলা হয়েছে যে, ভারতের একটি বাণিজ্যতরী জাভা হয়ে মেক্সিকো এসেছিল ৯২৩ খ্রীস্টাব্দে।[১০]

এই অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হয়েছে: "Archaeological evidence of Indian influence on the peninsula includes Sanskrit inscriptions found in Perai, opposite to the island of Penang, which have been dated to the

৮ The Statesman, 1 Feb., 1988

৯ The Early Man and the Ocean, p. 38.

১০ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ মার্চ, ১৯৮৯

fourth century.··· The most interesting archaeological site on the peninsula comes, however, from a later era—the tenth century Candi Sungai Batu Pahat in Kedah, a temple dedicated to a deceased ruler, which combines Hindu and Buddhists motifs in its design."[১১] (এই উপদ্বীপে ভারত-সংস্কৃতির প্রভাবের যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে পেনাঙ দ্বীপের বিপরীত দিকে পেরাইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত শিলালিপিগুলি চতুর্থ শতাব্দীর বলে জানা গিয়েছে।··· উপদ্বীপটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আরও পরবর্তী কালে দশম শতকে কেদাতে প্রাপ্ত একটি মন্দির; নাম চণ্ডী সুঙ্গাই বাটু পাহাৎ। হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পের উপকরণকে একত্র করে ব্যবহার করেছিলেন এমন একজন মৃত রাজার উদ্দেশ্যে মন্দিরটি উৎসর্গীকৃত।)

স্থানীয় কিংবদন্তী ও উপকথা এবং নানাস্থানে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে থাকা শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেই মালয় উপদ্বীপে হিন্দু-সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত, 'মালয়' নামটি প্রাচীন ভারতের 'মালব' উপজাতির নামানুসরণে এসেছে। এই মালব উপজাতির নাম 'মুদ্রারাক্ষস' গ্রন্থে এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেও পাওয়া যায়। রাজপুতানার জয়পুরে মালবদের নামাঙ্কিত অজস্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অস্ট্রোনেশিয়া গোষ্ঠীর এই মানুষেরা ভারত থেকে মালয়ে পৌঁছেছিল, একথা ডঃ মজুমদারের অনুমান।[১২] চীনা ও আরব পর্যটকদের রচনা এবং কিংবদন্তী ও উপকথা থেকে ডঃ মজুমদার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেই দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় বণিকেরা বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল।[১৩] ভারতীয়দের প্রভাবে সেইসব জনপদ তাক্কোলা, জাভা, তাম্রলিঙ্গ, কোক্কোনগর, কলসপুরা ইত্যাদি ভারতীয় নামে আজও পরিচিত। দূর ইন্দোচীনে কম্বোজ, চম্পা ও শ্যাম যখন হিন্দু রাজাদের অধীনে চলে গিয়েছে তখন মাঝখানে মালয় উপদ্বীপ যে তার আগেই ভাগ্যান্বেষী হিন্দু বণিক ও রাজকুলের দ্বারা অধ্যুষিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মালয় উপদ্বীপে কেদা, পাহাং, কাস্তোলি প্রভৃতি হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন। সুঙ্গাই বাটু এস্টেটে (কেদা পাহাড়ে) একটি হিন্দুমন্দির আবিষ্কার করেছেন আই. এইচ. এন. ইভান্স। মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা করে তিনি বলেছেন যে, সুঙ্গাই বাটুর আদিবাসীদের অনেকে নিঃসন্দেহে হিন্দু ছিল। তারা ছিল শিব ও দুর্গার উপাসক।

ইভান্স লিখেছেন: "They certainly show that some early inhabitants of Sungai Batu were Hindus, and worshippers of Siva or related deities, for we have obtained images of Durga, Ganesha, the Nandi on which he rides and of the yoni always associated with the worship of Siva."[১৪] (এই নিদর্শনগুলি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, সুঙ্গাই বাটুর প্রাচীন অধিবাসীরা হিন্দু ছিল। তারা শিব এবং শিবের সঙ্গে যুক্ত দেবদেবীর উপাসক ছিল। কারণ, আমরা এখান থেকে দুর্গা, গণেশ ও শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি পেয়েছি। তাছাড়া শিবের উপাসনার সঙ্গে সদা-যুক্ত যোনি-চিহ্নও দেখা গিয়েছে।)

মালয় উপদ্বীপের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা

১১ Malaysia— Ed. Frederick M. Burge, Foreign Area, Studies Centre—American University, Malaysia, 1984, p. 9

১২ Ancient Indian Colonies in the South East Asia—R. C. Majumdar, Vol. II, pp. 19-25, 47

১৩ Ibid, pp. 69-70

১৪ দ্রঃ Papers on the Ethnology and Archaeology of the Malaya Peninsula— I.H.N. Evans, Cambridge, 1927.

যে অজস্র শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি সংস্কৃতভাষায় লেখা এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে রচিত। এগুলির মধ্যে দুটি লিপি বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ সম্বলিত। একটিতে রক্তমৃত্তিকার (রাঙামাটির) মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের কথা বলা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ এক সময়ে রাজা শশাঙ্কের (গৌড়) রাজধানী ছিল। এই কর্ণসুবর্ণের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধবিহার ছিল। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ এই বিহারটিকে 'রক্তমৃত্তিকা' নামে অভিহিত করেছেন। মুর্শিদাবাদ শহর থেকে বারো মাইল দক্ষিণে রাঙামাটিতে বৌদ্ধবিহারের যে-ধ্বংসস্তূপটি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেইটিই যে হিউয়েন সাঙ্ বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চীনের সুঙ্গ বংশের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, মালয়ের পাহাঙ রাজ্যের রাজা ছিলেন সরিৎপাল বর্মা। ৪৪৯ খ্রীস্টাব্দে (পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে) তিনি চীনের রাজদরবারে তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।[১৫] চীনসম্রাট পাহাঙ-এর রাজপ্রতিনিধিকে সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন।

অষ্টম খ্রীস্টাব্দে মালয় 'শ্রীবিজয়'-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রীবিজয়-রাজ্য শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে মুসলিম আক্রমণে মালয়ের হিন্দু-কীর্তিগুলি ধ্বংস হয়ে যায়; অধিবাসীরাও মুসলিমধর্ম গ্রহণ করে। ☐

১৫ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সিগনেট প্রেস, ১৩৫৪, পৃঃ ২৪৮

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির (মাঝে)। পিছনে—বিষ্ণুমন্দির/গোবিন্দজীর মন্দির/রাধাকান্ত-মন্দির। সামনে—কালীমন্দিরের নাটমন্দির; এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মথুরবাবুকে অনুরোধ করে পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় তিনি বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সমকালীন অগ্রগণ্য সাধক ও পণ্ডিতদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। বিচারসভায় সমবেত সাধক ও পণ্ডিতবর্গ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দিরের (দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছবি অবশ্য প্রচ্ছদে নেই।) অবস্থান বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু হিন্দুদের দিক থেকেই নয়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের দিক থেকেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি তাৎপর্য রয়েছে। মন্দিরের জমির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, বাকি অংশের অনেকটা জুড়ে ছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী সাহেবের পীরের দরগা। এই যোগাযোগ যেন দৈবনির্দিষ্ট। কারণ, এই ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে যুগাবতার মহাসমন্বয়ের উদার বাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। এই বাণীই আজ শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে। দেশ ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মত ও পথের অসহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে এই বক্তব্য আমরা তুলে ধরতে চাইছি।—**যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন**

বিশেষ রচনা

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের আধ্যাত্মিক পটভূমি ও তাৎপর্য

অজিতনাথ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভগিনী নিবেদিতা 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় যথার্থই লিখেছিলেন: "তাঁহার মনটি ছিল সর্বাধিক সার্বভৌম অথচ পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী সংস্কৃতি-সম্পন্ন। যিনি সর্বতোভাবে বৈদিক, বৈদান্তিক, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব এমনকি ইসলামের দিক হইতে ধর্মমহাসভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে উদ্যত ছিলেন, তাঁহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কোন্ প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল? যিনি স্বীয় জীবনে সত্য সত্যই একটি ধর্মমহাসভাস্বরূপ ছিলেন সেই মহামানবের শিষ্য এই ব্যক্তি অপেক্ষা আর কে এই কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতর পাত্র ছিলেন?"[১৯] বোম্বাইয়ে (মতান্তরে আবু রোডে) খেতড়ি-প্রত্যাগত স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের প্রথমার্ধে স্বামী তুরীয়ানন্দের দেখা হয়। তখন শিকাগো-যাত্রার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। স্বামীজী সে-সময় স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন: "এই যে আমেরিকায় এইসব যোগাড়যন্ত্র ধর্মমহাসভাটা হচ্ছে শুনেছ, তা সব এইটের (নিজের শরীর দেখিয়ে) জন্য। আমার মন একথা বলছে। শিগ্গিরই দেখতে পাবে।"[২০]

স্বামীজীকে দেখে স্বামী তুরীয়ানন্দের মনে হয়েছিল স্বামীজী যেন দিব্য আদেশ মাথায় নিয়ে আমেরিকায় যাচ্ছেন। তিনি বলতেন: "আমেরিকা-যাত্রার পূর্বে স্বামীজীর ভাস্বর মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইয়াছিল, তিনি সাধনা শেষ করিয়াছেন এবং জগতের নিকট গুরুর বাণী প্রচার করিবার জন্য যাইতেছেন।" কথাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিকাগোয় স্বামীজী যে-বাণী উপস্থাপন করতে চলেছেন তা যে একান্ত-ভাবেই আধ্যাত্মিক বাণী এবং তাঁর পাশ্চাত্যের 'মিশন' যে একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক 'মিশন' তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা এখানে পাই। বস্তুতঃ, পৃথিবীতে যত মহৎ ব্রত সাধিত হয়েছে যার সুফল কাল থেকে কালান্তরের মানুষ ভোগ করে চলেছে সেগুলি সমস্তই মূলতঃ আধ্যাত্মিক আদর্শ ও প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ। স্বামীজী বলেছেন যে, আধ্যাত্মিক আদর্শ আমাদের যে-পরিমাণ শক্তি দিতে পারে সে-পরিমাণ শক্তি আর কোন আদর্শই দিতে পারে না। শ্রীমা বলেছিলেন: "[আমেরিকায়] তার [স্বামীজীর] মনে হতো তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] তার হাত ধরে রয়েছেন।"[২১] স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, শিকাগোতে তিনি একদিন উদ্বেগ ও ভাবনায় ঘরের মেঝেতে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে তাঁকে বলছেন: "ওঠ, লোক না পোক!"[২২] শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যোগদানের ব্যাপারে স্বামীজী অভাবনীয়-ভাবে যেসব সাহায্য পেয়েছিলেন তাতে বোঝা যায়, তাঁর পিছনে একটি দৈবশক্তি ক্রিয়াশীল ছিল। যখন ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য স্বামীজী অধ্যাপক রাইটের কাছে পরিচয়পত্র চাইলেন অধ্যাপক রাইট তখন তাঁকে বলেছিলেন: "আপনার কাছে পরিচয় পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তাহার কিরণ বিকিরণের কি অধিকার আছে জিজ্ঞাসা করা এক কথা।" অধ্যাপক রাইট অবশ্য প্রতিনিধি নির্বাচক কমিটির সেক্রেটারিকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন যাতে তিনি লিখেছিলেন: "ইনি (স্বামীজী) এমন একজন বিজ্ঞ

১৯ দ্রঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৭

২০ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পাদক), ১৯৯০, পৃঃ ৪ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৬, পৃঃ ২৯

২১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সং, ১৩৮০, পৃঃ ৭৪

২২ Swami Vivekananda in the West: New Discoveries—Marie Louise Burke, Vol. I, 3rd Edn., 1983, p. 63

ব্যক্তি যে, আমাদের সকল অধ্যাপককে একত্র করলেও তাঁরা এঁর সমকক্ষ হবেন না।" ক্রমশঃ ধর্মমহাসভার সব দরজা ও জানালা খুলে গেল। মিঃ জে. বি. লায়নের গৃহে ধর্মমহাসভার কিছু প্রতিনিধি থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। মিসেস এমিলি লায়ন তাঁর স্বামীকে বললেন যে,'কালা আদমী' স্বামীজী থাকলে তাঁদের অন্যান্য অতিথি আত্মীয়স্বজন আপত্তি করতে পারেন। সেসময় ধর্মমহাসভা উপলক্ষে বহু আত্মীয় লায়নের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। লায়ন বললেন: "আমাদের সব অতিথি চলে গেলেও আমার এতটুকু দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমাদের ঘরে এযাবৎ যত লোক এসেছেন তাঁদের মধ্যে এই ভারতবাসীটি সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও চিত্তাকর্ষক—তিনি যতদিন খুশি এখানে থাকবেন।"[২৩]

ধর্মমহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশনে যতবার সভার অধ্যক্ষ স্বামীজীকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করেন স্বামীজী ততবারই বলেন: "না, এখন নয়।" শেষ মুহূর্তে বিনা প্রস্তুতিতে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। "হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ" সম্বোধন করে তিনি ভাষণ শুরু করলেন। নিবেদিতা লিখেছেন: "যখনই প্রাচ্য সন্ন্যাসী নারীকে প্রথম স্থান দিয়া সমগ্র জগৎকে নিজ পরিবার বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন সেই মহাসম্মেলনে আনন্দের যে শিহরণ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা শ্রোতৃবর্গের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি।... সেই মুহূর্ত হইতেই বোধ হয় তাঁহার নিশ্চিত সাফল্যের সূচনা হইয়াছিল।"[২৪] স্বামীজী ধর্মমহাসভায় তাঁর কোন বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর সমস্ত ভাষণেই শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ" বাণী ও সর্বধর্ম ও সর্বমত সমন্বয়ের আদর্শকেই তুলে ধরেছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই বাণী এবং সেই আদর্শ শাশ্বত ভারতবর্ষেরই বাণী এবং আদর্শ।

প্রথমদিনের অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজীর ক্ষুদ্র ভাষণ থেকে এর প্রমাণ পাই। প্রথমেই তিনি বললেন: "সর্বধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। ... যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।"

ভারতের চিরায়ত ধর্ম-ধারণার রূপকে উজ্জ্বল করার জন্য স্বামীজী শিবমহিম্নঃ স্তোত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন:

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।
—বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাহাদের জলরাশি ঢালিয়া দেয়, তেমনি হে ভগবান,নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানা পথে যাহারা চলিয়াছে, তুমিই তাহাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

অতঃপর গীতার বাণী উদ্ধৃত করলেন তিনি:

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।"
—যে যেভাব আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলিয়া থাকে।

বস্তুতঃ এই শ্লোক-দুটিতে হিন্দুধর্ম ও বেদান্তের ভাবরূপটি প্রকটিত হয়েছে। 'যত মত তত পথ' বেদান্তের মর্মবাণী। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে বিভিন্ন ধর্মসাধনা অনুশীলন করে হিন্দু-ধর্ম ও বেদান্তের সেই ভাবরূপকে বাস্তবে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্ত।" —সত্য এক, ঋষিরা তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন। ঋগ্বেদের ঋষি যে-মহাবাণী স্মরণাতীত কালে উপলব্ধি করেছিলেন, আধুনিক কালে তাঁর 'বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে' শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সত্যকে 'করে' দেখালেন এবং প্রচার করলেন।

এই ঐতিহাসিক ভাষণে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও অনুভূতির তিনটি মহাবাক্য জগতে প্রচার করলেন। প্রত্যেকটিই বেদান্তের সার। স্বামীজীর

২৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, ২য় সং, ১৩৭৬, পৃঃ ২০

২৪ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ ৩

ভাষণের আগে অনেক বক্তা তাঁদের ধর্মই একমাত্র সত্য—এই কথা বলেছিলেন। স্বামীজীই প্রথম যিনি সকলের কাছে সরলভাবে বললেনঃ সব ধর্মের উৎস এক—ঈশ্বর। সেই একই বহু হয়েছেন। দ্বিতীয়—সকল ধর্ম সত্য। যত মত তত পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। তৃতীয়—সকল ধর্ম বা সকল মতকে সহ্য করা যথেষ্ট নয়, আসল কথা হলো, সব ধর্ম ও সব মতকে সত্য বলে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করা। স্বামীজী তাই বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে যে, সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, ধর্মোন্মত্ততা প্রভৃতি অসম্ভাবমূলক বৃত্তি, ভাবনা ও প্রয়াসের অবসান হোক। পৃথিবী হোক মিলনের মহাপীঠ, প্রেমের তীর্থক্ষেত্র।

স্বামীজীর ভাষণের পর উপস্থিত হাজার হাজার নরনারীর সেদিন মনে হয়েছিল, এই প্রথম আমেরিকাবাসী দেখলেন এমন এক ব্যক্তিকে যিনি যেসব কথা বললেন তা তাঁর মুখের কথা নয়, তা তাঁর উপলব্ধি। স্বামীজীর মুগ্ধ আর স্তব্ধ শ্রোতাদের মনে হয়েছিল দৈবাদেশপ্রাপ্ত এক আলোক-দূত যেন তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত। আমেরিকায় এইরকম আধ্যাত্মিক শক্তিমান পুরুষ বাস্তবিক আগে কখনো দেখা যায়নি।

১৫ সেপ্টেম্বর স্বামীজী একটি ছোট বক্তৃতা দেন। প্রথমদিনের ভাষণে ভগবান এক, ধর্ম এক, লক্ষ্য এক বলে যে-মনোভাব তিনি গড়ে তুলেছিলেন সেই মনোভাব যাতে সকল প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্ত হয় সে-সম্বন্ধে তিনি সকলকে সতর্ক করে দিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল ভ্রাতৃভাব। স্বামীজী একটি গল্প বললেনঃ একটি ব্যাঙ একটি কূপের মধ্যে বাস করত। একদিন সমুদ্রতীরের একটি ব্যাঙ সেখানে এসে উপস্থিত। কূপের ব্যাঙটি যখন শুনল যে, অন্য ব্যাঙটি সমুদ্র থেকে আসছে তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করল সমুদ্র কি তার কূপের মত বড়? সমুদ্রের ব্যাঙ বলল, সমুদ্রের সঙ্গে কি এই ক্ষুদ্র কূপের তুলনা করা যায়? কূপমণ্ডুক তখন লাফ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, সমুদ্র কি এত বড়? সমুদ্রের ব্যাঙ বলল, সমুদ্রের সঙ্গে কূপের তুলনা করা নির্বুদ্ধিতা। গল্পটি বলে স্বামীজী বুঝিয়ে দিলেন আমাদের মতভেদের কারণ আমাদের মনের সংকীর্ণতা আর দৃষ্টির সংকীর্ণতা—এই কূপমণ্ডুকতা অর্থাৎ নিজের কূপের বাইরে যে বিরাট পৃথিবী আছে সে-সম্বন্ধে অজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। আমার মতই ঠিক, অন্য মত ঠিক নয়—এই ভাবই সব সংকীর্ণতার মূল। মহাসভার মঞ্চে স্বামীজী সেই সংকীর্ণতা এবং সংকীর্ণতাজনিত আত্মম্ভরিতাই দেখলেন। তাই প্রতিনিধিদের এই বলে সতর্ক করলেন যে, এই সংকীর্ণতা দূর না হলে সকল ধর্মকে সত্য বা সকল ধর্মের লক্ষ্য এক—এই মনোভাব আনা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় যথার্থ ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। সম্ভব নয় পৃথিবীর সভ্যতাকে স্থায়িত্ব দান করা।

স্বামীজীর তৃতীয় বিখ্যাত ভাষণ 'হিন্দুধর্ম'। এটি অবশ্য তাঁর লিখিত ভাষণ। এই ভাষণে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আত্মতত্ত্ব—আত্মবোধ—আত্মশক্তি—আত্মবিশ্বাস হলো হিন্দুধর্মের সারকথা। স্বামীজী বললেন, মানবজাতির হৃদয়ে ও মনে আত্মবোধ কিভাবে জাগ্রত হতে পারে হিন্দুধর্ম সে-কথা জগৎকে বলেছে। বললেন, হিন্দুধর্মের সর্বপ্রধান শাস্ত্র বেদ গ্রন্থমাত্র নয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি—সকলেই ঋষি—বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করেছেন বেদ সেইসব উপলব্ধির ভাণ্ডারস্বরূপ।

স্বামীজী তাঁর উল্লিখিত ভাষণে বললেন, বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ উপলব্ধি করেছিলেন আত্মতত্ত্বের মূল কথা হলো জড়ের বন্ধন থেকে মুক্তি। জড়ের বন্ধন-শৃঙ্খল চূর্ণ করাতেই জীবনের পূর্ণতা নিহিত। শুদ্ধ অপূর্ণতামুক্ত হৃদয়ে মানুষের মধ্যস্থ ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশিত করেন। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সেই প্রকাশের নাম মানুষের 'ঈশ্বর দর্শন'। 'ঈশ্বর দর্শন' মানে 'ঈশ্বর হওয়া'। সংগ্রাম ও সাধনার দ্বারাই মানুষ মানুষের এই পরম অবস্থায় উপনীত হয়। স্বামীজী বললেন, খ্রীষ্টীয় পরিভাষায় যাঁকে 'স্বর্গস্থ পিতা' বলে অভিহিত করা হয় হিন্দুর কাছে তিনিই হলেন মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম। 'স্বর্গস্থ পিতা' যেমন পূর্ণ, মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম তেমনি পূর্ণ। সেই পূর্ণ মানুষ নিজেই হতে পারে এবং তা হওয়াই হিন্দুধর্মের লক্ষ্য।

[পরবর্তী অংশ আগামী চৈত্র ১৩৯৯ সংখ্যায়]

পথে যেতে হলে

স্বামী স্থিরাত্মানন্দ

"সব্‌সে রসিয়ে সব্‌সে বসিয়ে
সব্‌কা লীজিয়ে নাম।
হাঁ জী হাঁ জী করতে রহিয়ো
বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥"

—সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের সঙ্গে বসো, সকলের নাম নাও, অপরের কথায় 'হাঁ হাঁ' করতে থাকো, কিন্তু নিজের ভাব কখনো ছেড়ো না। তুলসীদাসের এ দোহায় নিজ নিজ সাধনায় নিষ্ঠার কথা খুব সুন্দরভাবে বলা আছে। কারও সাথে বিরোধ না করে নিজ নিজ সাধনায় লেগে থাকার কথা, অনুরাগের কথা এখানে বলা হয়েছে।

কিন্তু।

হ্যাঁ সেই 'কিন্তু'। আমাদের সন্দেহপ্রবণ মন —প্রশ্ন আমাদের যেন প্রস্তুত হয়েই থাকে।

কিন্তু, অন্যের ভাবে 'হাঁ জী' 'হাঁ জী' করতে হবে, আর নিজের ভাবে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকতে হবে। এ কি 'পাটোয়ারী' বুদ্ধি হলো না? শ্রীরামকৃষ্ণ এরকম ক্ষেত্রে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছেন। সেই যে একজন শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে তর্ক করছে দেখে ব্রাহ্মসমাজের একজন তাকে তাঁর বক্তব্য মেনে নেওয়ার জন্য বললেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন: "তুমি কি রকম লোক। কথায় বিশ্বাস না করে শুধু মেনে লওয়া। কপটতা!"[১] আবার আমার ধর্মই ঠিক, আর অন্যেরটা ভুল—এমন ভাব না হলে সাধনাতে নিষ্ঠাই বা হবে কি করে? আর তুলসীদাসের দোহাটিতে উদারতার ভাব রয়েছে ঠিকই, কিন্তু উদারতাই কি সত্যের মাপকাঠি?

ভাববার বিষয়। উপলব্ধিহীন আমরা 'সব্‌সে রসিয়ে'—ভাবে নিষ্ঠা ও উদারতার সামান্য সহাবস্থানও দেখতে পাই না। পরিবর্তে দেখি 'পাটোয়ারী'—মনে একটা মুখে একটা। এর মানে —আমার ধর্মই ঠিক, আমার সাধনপথই ঠিক। আর মনে মনে জেনে বসে আছি—অন্যেরটা ভুল।

জানলে কি করে? অন্যের মতে সাধন করেছ?

জবাব দেবার কি-ই বা আছে। তা ছাড়া নিজধর্মে অনুরাগ ছাড়া তো কিছু হবার নয়—একথা আমাদের আচার্যগণ বলে গেছেন। তবে অধর্ম জগতের অন্তর্গত হয়েও ধর্মের নামাবলী গায়ে যারা ধর্মজগতে রাজত্ব করছে তারা হলো—নিষ্ঠার নামে ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ, গোঁড়ামী।

তাহলে নিষ্ঠা বলতে কি বোঝায়? আবার নিষ্ঠা থাকলে কি উদারতা থাকা সম্ভব? উদারতায় তো নিষ্ঠা উবে যাবার কথা। আর নিষ্ঠা হলে তো উদারতা থাকার কথা নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে যদি কারও নিষ্ঠা ও উদারতা একত্রে দেখতে পাই, তবে আমরা সিদ্ধান্ত করি—লোকটির মন ও মুখ এক নয়, অথবা লোকটি মতলববাজ।

এক্ষেত্রে আমাদের এমন একজনকে বেছে নিতে হবে যার মন মুখ স্বপ্নেও দ্বিধা হয়নি। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বলছি। এ দেবচরিত্র এমনই ঠিক ঠিক যে এতে কলঙ্কারোপের চেষ্টামাত্রেই আমরা নিজেরা কলঙ্কিত হই। তাই এই চরিত্র প্রণিধানযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উদারতা ও নিষ্ঠার একত্র অবস্থানের পরাকাষ্ঠা দেখে আমরা আশান্বিত হই। এই উদারতা ও নিষ্ঠার সহাবস্থানের অভাবেই আমরা দ্বন্দ্বে ভুগছি।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৭৭৪

নিষ্ঠার দাবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যের হাতে খেতে পারছেন না কালীবাড়িতে—খেলেন পবিত্র গঙ্গাজলের মহিমায়[২]; সামান্য সঞ্চয় হলো বলে গঙ্গায় ডুবতে যাচ্ছেন[৩]; সন্ন্যাসী হয়ে তর্পণ করতে গিয়ে হাত গলিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে।[৪] একজন টাকা দিয়ে গেল—পরিগ্রহ হলো বলে "রাতের বেলা বুকে যেন বিল্লি আঁচড়ানো।"[৫] এসব আমরা সামাজিক অনুশাসনের অন্ধ অনুকরণ বা অন্য কিছু বলে উড়িয়ে দিতে পারি না, তাহলে ছাই ভেবে সোনাকে উড়িয়ে দেবার সম্ভাবনা।

আর উদারতা? উদারতায়ও শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ। তিনি বলছেন: "কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি, কেউ আল্লা, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই বস্তু।"[৬] তিনি বিভিন্ন মতে সাধন করেও তা প্রকাশ করলেন। উদারতায় সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডি আপনা থেকে ভেঙে যাচ্ছে। বললেন: "এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই।"[৭] এসব তাঁকে ঘোষণা করতে হয়েছে সত্যের অনুরোধে।

হায় আমরা! আমরা উদারতা দেখাতে গিয়ে নিষ্ঠা জলাঞ্জলি দিই। আবার নিষ্ঠার বাড়াবাড়িতে সংকীর্ণতার হাতের পুতুল হই। সাথে সাথে হৃদয়ে ভগবান এসে বসার পরিবর্তে এসে বসেন ঈর্ষা ঘৃণার সাঙ্গোপাঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এসবের কারণ নির্দেশ করেছেন। বলেছেন: "গেঁড়ে, ডোবা প্রভৃতি যে-সকল জলাধারে স্রোত নাই সেখানেই যেমন দল বা নানারূপ উদ্ভিজ্জ-দামের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে যেখানে আংশিক সত্যমাত্রকে মানব পূর্ণ সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে, সেখানেই দল বা গণ্ডিনিবদ্ধ সম্প্রসকলের উদয় হইয়া থাকে।"[৮] আর এজন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'—রূপ মহান নিরাবরণ সত্যকে স্বীকার করতে আমরা ভয় পাই। তাহলে কি কালের প্রভাবে নিষ্ঠার নাম ধরে ঈর্ষা, ঘৃণা, কুসংস্কার প্রভৃতি আমাদের হৃদয়ে ঠাঁই নিয়েছে। চামচিকা পরিবেষ্টিত অন্ধকার জেলখানার জীবনে কি আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তবে কি জেলখানার জীবনে অভ্যস্ত ব্যক্তির মতো মুক্তির আলোক পেয়েও পুনরায় আমরা সেই অন্ধকার কুঠারিতে ফিরে যেতে দারুণভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি! কে বলবে। হতে পারে, এরকম অন্ধকারেই আমাদের চক্ষু অভ্যস্ত, সত্যের এত নিরাবরণ আলোক সইবে কেন।

অবশ্য প্রশ্ন এমনও হতে পারে যে—'যত মত তত পথ' যে লোক-ঠকানোর কোন ব্যাপার নয় তা কি করে বোঝা যাবে?

হাঁ, বোঝা খুবই কঠিন। ওরকম সাধনা তো আমাদের নেই, ওরকম উপলব্ধি তো আমাদের হয়নি যে আমরা সহজেই বুঝতে পারব। তবে উদাহরণের সাহায্য নিয়ে কতকটা বোঝা যায় বৈকি। উদাহরণের ক্ষেত্রে আমাদের যা অভিজ্ঞতা, যা উপলব্ধি সেই অনুসারে উপমা হয়ে থাকে। উপমা আমাদের চারপাশেই রয়েছে। আমাদের উপলব্ধিপূর্ণ দৃষ্টি নেই বলেই আমাদের বোধ হয় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের উপমাগুলি আমাদের এমন সব অনুভূতিতে নিয়ে যায় যা আমরা এতদিন অনুভব করিনি। আর তাই তাঁর উপমার এত কদর; জ্ঞানি-গুণীরাও এ-উপমায় মুগ্ধ।

যাক সেকথা। এখন কে করবে এই উপলব্ধি? আমাদের তো গেঁড়ে ডোবার দলের অবস্থা: তিনিই পারেন সঠিক উপলব্ধি করতে যাঁর দর্শনের ক্ষমতা প্রবল পূর্বসংস্কারের আবরণে আবৃত নয়। কাজেই একাজে ভগবানকে নিজে সাধন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই এক এক করে সাধন করে আমাদের দেখালেন। আমাদের কৌতূহল—শ্রীরামকৃষ্ণের উদারতা ও নিষ্ঠায় বিশেষত্ব কোথায়, যার জন্য তাঁর জীবন উদারতার পরাকাষ্ঠা

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, ১৩৫৮, সাধকভাব, ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৮০

৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, উদ্বোধন, ১০ম সং, পৃঃ ৮৯

৪ কথামৃত, পৃঃ ১১৫ ৫ ঐ, পৃঃ ৭১৭ ৬ ঐ, পৃঃ ১১৬৬ ৭ ঐ, পৃঃ ১২০

৮ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ১৩৫৮, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৫ম অধ্যায়, পৃঃ ১০২

হয়েও গভীরভাবে নিষ্ঠাবান? আর যার ফলশ্রুতি—'যত মত তত পথ'? এ-বিশেষত্ব হলো—শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের কথায়, "রাজার ছেলে, আপনার বাড়ি সাতভোলায় যাওয়া আসা করতে পারে।"[৯] ধর্মজগতে তাঁর একচ্ছত্র অধিকার। কারণ এ-জগৎ তাঁরই। তিনিই তার 'খপর' দিতে এসেছেন।

আসলে আমরা প্ল্যান করে উদার হতে গিয়ে বা নিষ্ঠা দেখাতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলি। শ্রীরামকৃষ্ণ একে বলেছেন—"ভাবের ঘরে চুরি"। তিনি ভাবের ঘরে চুরি একদম না রেখে নিজে সাধনা করলেন, আর তার ফল প্রকাশও করলেন। প্রকাশ করলেন কাদের কাছে? আমাদের কাছে, আমরা যারা 'গেঁড়ে ডোবার দল', যাদের আছে 'দল ভাঙ্গার ভয়', আর আছে প্ল্যান করে উদার হবার ভাব। কিন্তু তাঁকে অর্থাৎ পরম তত্ত্বকে উপলব্ধি করলে আমাদের হবে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। না হলে উদারতা ও নিষ্ঠার সহাবস্থানকে মনে হবে ফাঁকি। এ-কারণেই আমরা 'যত মত তত পথ'-এ প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাতে যাই। তা অবশ্য হতেই পারে। আমরা তো আর 'এ্যাঞ্জেলস' বা দেবদূত নই। দেবদূতেরা যেখানে পা ফেলতে ভয় পান, মূর্খেরা সেখানে অনায়াসে ঝাঁপ দেয়।

"অসত্য না হইলে জগতের কোন বস্তুই ঘৃণার চক্ষে দেখিব না"[১০]—এরকম মনোভাবসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু উপলব্ধির দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়িয়ে বলছেন: "একঘেয়ে হস্‌নি, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়, এখানে ঝোলেও খাব, ঝালেও খাব, অম্বলেও খাব—এই ভাব।"[১১] তাঁর তেজোদৃপ্ত ঘোষণা— "কেন একঘেয়ে হব? 'অমুক মতের লোক তাহলে আসবে না' এ ভয় আমার নাই। কেউ আসুক আর না আসুক তাতে আমার বয়ে গেছে;—লোক কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছু আমার মনে নাই।..."[১২] শ্রীরামকৃষ্ণের এই তেজোময় কণ্ঠের উৎস কোথায়? কোথায় উৎস সকল সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে উদারতার এই যুদ্ধঘোষণার?

উত্তর—সত্য। সত্য তার নিজস্ব প্রকৃতিতেই উদার। পরম সত্যকে কি কোন দেশ-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায়? সত্যপ্রতিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে বিশেষভাবে প্রকাশিত উদারতাই বর্তমান যুগের এক মহান শিক্ষা। লীলাপ্রসঙ্গকার তাই বলেছেন: "পূর্ব পূর্ব যুগের কোন্ আচার্য বা অবতারপুরুষের জীবনে এইরূপ অদ্ভুত বিপরীত চেষ্টার একত্র সমাবেশ ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়? কে না বলিবে এরূপ আর কখনও কোথাও দেখা যায় নাই?"[১৩]

তাহলে আমাদেরও আশা আছে? আশা আছে। উদারতা ও নিষ্ঠার মিথ্যা দ্বন্দ্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির উপায় কি? জয়গোপাল প্রশ্ন করছেন: "সব পথই সত্য কেমন করে জানব?" শ্রীরামকৃষ্ণ—"একটা পথ দিয়ে ঠিক যেতে পারলে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। তখন সব পথের খবর জানতে পারে। যেমন একবার কোন উপায়ে ছাদে উঠতে পারলে কাঠের সিঁড়ি দিয়েও নামা যায়, পাকা সিঁড়ি দিয়েও নামা যায়; একটা বাঁশ দিয়েও নামা যায়; একটা দড়ি দিয়েও নামা যায়।"[১৪] নিষ্ঠা ও উদারতার চিরকালের বিবাদভঞ্জন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আমাদের প্রার্থনা—হে প্রভু। তোমাকে আদর্শ করে একটা পথ ধরে ঠিক গিয়ে যেন তোমাতে পৌঁছাতে পারি। আর আমাদের চরিত্রে নিষ্ঠা ও উদারতার যথার্থ স্থান দিয়ে আমরা যেন পরম শান্তির অধিকারী হতে পারি। ☐

৯ কথামৃত, পৃঃ ৬৯২

১০ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩২৭

১১ ঐ, পৃঃ ৩৩৫

১২ কথামৃত, পৃঃ ৬৬১

১৩ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১০৪

১৪ কথামৃত, পৃঃ ৪০১

স্মৃতিকথা

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকণা

মৃন্ময়ী মিত্র

ভুবনেশ্বর মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ। ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মা-বাবার সঙ্গে আমরাও ভুবনেশ্বর যাই। সাতদিন ধরে ভুবনেশ্বর মঠে খুব উৎসব হয়। আমরা তখন খুবই ছোট। ঐ উৎসবে খুবই আনন্দ পাই। মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা।

উৎসবের একদিনের দৃশ্য—শ্রীমতী জল আনতে যাচ্ছেন। দেবেন মহারাজ ঘড়া কাঁখে 'শ্রীমতী' সেজেছেন। আমি ও আমার ছোট বোন পুতুল মহাপুরুষ মহারাজের দুই পাশে বসে দেখছি। মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের দুই বোনকে খুবই ভালবাসতেন। দেবেন মহারাজের নাচ দেখে সকলেই খুব হাসছে। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজও হাসছেন।

নাচ দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার পায়ে হাঁটুর কাছে চুলকানি শুরু হলো। পরে গায়ের ভিতরও। আমি চুলকাচ্ছি। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন: "এই মিনি, নাচ দেখতে দেখতে অমন কচ্ছিস কেন?" আমি তবু চুলকাচ্ছি দেখে তিনি আমাকে পাশের ঘরে গিয়ে গায়ের ফ্রক খুলে দেখতে বললেন। আমি তাই করলাম। ফ্রক খুলতেই ৭/৮ ইঞ্চি লম্বা একটা তেঁতুল বিছা গা থেকে পড়ে যায়। সকলে বলে, ওটা কামড়ালে আমার বাঁচা শক্ত ছিল।

মহাপুরুষ মহারাজকে আমি সাক্ষাৎ দেবতা বলে মনে করি। তাঁর ভালবাসার কথা আজও ভুলতে পারি না। খাওয়ার সময় তাঁর কাছে বাইরের কেউ থাকতে পারত না। কিন্তু আমাদের দুই বোনকে উনি নিজে ডেকে খেতে খেতে আমাদের হাতে তাঁর প্রসাদ দিতেন।

ভুবনেশ্বর মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর বাবা আমাদের বলেন: "দীক্ষা নিবি?" 'দীক্ষা' কি তা আমরা জানতুম না। আমরা অক্ষয়তৃতীয়ার দিন বেলুড়ে মা-বাবার সঙ্গে যাই এবং ঐ দিনই পুরানো মন্দিরে আমাদের দুই বোনকে পূজনীয় মহারাজজী দীক্ষা দেন। দীক্ষার পর ওঁর সামনে জপ করতে বলেন। পুতুল বলল: "কবার করব?" মহারাজজী হেসে বললেন: "দশ বার। বেশি পারলে আরও করবি।" সেদিন থেকেই তিনি আমাদের গুরু এবং আরও কাছের। □

একটি আবেদন

যিনি ভারতের জন্য তাঁর সর্বস্ব দিয়েছিলেন—সেই লোকমাতা নিবেদিতার কোন পূর্ণাবয়ব মূর্তি আজও কলকাতা মহানগরীতে কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সম্প্রতি ভগিনী নিবেদিতার ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ নিবেদিতার একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে এই জাতীয় লজ্জা অপনোদন করার প্রয়াস করছেন।

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘের আবেদনে সাড়া দিয়ে বাগবাজারে গিরিশ মঞ্চ সংলগ্ন উদ্যানে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি স্থান নির্দেশ করে দিয়ে (দ্রঃ বর্তমান, ৩০ আগস্ট, ১৯৯২, রবিবার) কলকাতা কর্পোরেশন দেশবাসীর প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

ভগিনী নিবেদিতার এই পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মাণ ও স্থাপনার জন্য দু-লক্ষেরও বেশি টাকার প্রয়োজন। আমরা প্রত্যেক নিবেদিতা-অনুরাগী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি সংস্থা ও সমগ্র দেশবাসীর নিকট আবেদন রাখছি—আপনারা এই মহান প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নিচের ঠিকানায় আর্থিক অনুদান পাঠান। প্রত্যেক দাতার নাম সঙ্ঘের মুখপত্র 'ব্রতী'তে যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে। চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠালে 'Nivedita Vrati Sangha Statue Fund' এই নামে পাঠাবেন।

ডব্লিউ ২এ (আর) ১৬/০, ফেজ ৪ (বি)
গল্ফ গ্রীন আর্বান কমপ্লেক্স
কলকাতা-৭০০০৪৫

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত
সম্পাদিকা
নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ

পরমপদকমলে

স্বামীজীর ভারত-পরিভ্রমণের প্রেক্ষাপট

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ২ ॥

বুদ্ধ আর বিবেকানন্দে তফাৎ কতটা। শুধু যুগের তফাৎ। জীবনযন্ত্রণা দুজনেই দেখেছেন। বিবেকানন্দ শুধু দেখেননি, নিজে সহ্যও করেছেন। বরাহনগর মঠে বসে শ্রীমকে বলছেন, নাস্তিক থেকে কেমন করে আস্তিক হলেন। 'ও-পথে যেয়ো না ফিরে এসো' বলে কে ডেকে আনলেন। "আমি নিজের মতে কাজ করতাম, তিনি কিছু বলতেন না ('তিনি', অর্থাৎ ঠাকুর)। আমি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মেম্বার হয়েছিলাম, জানেন তো?"

"তিনি জানতেন, ওখানে মেয়েমানুষেরা যায়। মেয়েদের সামনে রেখে ধ্যান করা যায় না, তাই নিন্দা করতেন। আমায় কিন্তু কিছু বলতেন না। একদিন শুধু বললেন: 'রাখালকে ও-সব কথা কিছু বলিসনি—যে তুই সমাজের মেম্বার হয়েছিস। ওরও, তাহলে হতে ইচ্ছা যাবে'।"

শ্রীম বললেন: "তোমার বেশি মনের জোর, তাই তোমায় বারণ করেন নাই।" মনের জোর কি করে হলো? সে কি এমনি হয়েছে। "অনেক দুঃখকষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে।... দুঃখ-কষ্ট না পেলে Resignation হয় না—Absolute Dependence on God."

সেই দুঃখকষ্টের চেহারাটা কেমন ছিল? আমরা ভাবতেও পারব না। তা আমাদের ধারণার বাইরে। আমরা বিশ্ববিজয়ী, বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে হয়তো কিছুটা চিনি, নরেন্দ্রনাথকে চিনি না। জীবনযন্ত্রণার কত ডিগ্রি ফারেনহাইটে সিমুলিয়ার নরেন্দ্রনাথ বিশ্বের বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হচ্ছিলেন, তার পরিমাপে আমাদের উৎসাহ না থাকারই কথা। অঙ্কুর উদ্গমে বীজের যন্ত্রণা, মহীরুহে পরিণত হওয়ার উদ্বেগ অন্তরালেই থাকে। মানুষের কাজ ফলে, ফুলে, ছায়ায়।

পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু, সংসারের দায়িত্ব, বিষয়-সম্পত্তির মামলা। বাগবাজার থেকে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই নরেন্দ্রনাথ প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখছেন: "কলকাতার কাছাকাছি থাকলে আমার সাফল্যের কোন আশা নেই। কলকাতায় আমার মা আছেন আর আছে দুই ভাই। আমি বড়, মেজ ভাই ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে, ছোট সদ্য যুবক। একসময় তারা খুবই সম্পন্ন ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তারা খুবই কষ্টে আছে—মাঝে মাঝে উপবাসেও দিন কাটাতে হচ্ছে। এর ওপর আর এক বড় বিপদ, অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে কিছু আত্মীয় পৈতৃক বসতবাটী থেকে তাদের বিতাড়িত করেছেন। হাইকোর্টে মামলা চালিয়ে একটা অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, মামলার খরচ সামলাতে তারা এখন নিঃস্ব।"

সেই সময়কার একটি দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন: একদিন সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টিতে ভিজে, সারাদিন অনাহারের পর তিনি পথের ধারে একটা বাড়ির সামনে অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়লেন; তাঁর সেই ধূল্যাবলুণ্ঠিত দেহ যেন জ্বরের প্রদাহে সংজ্ঞাহীন। হঠাৎ চেতনা হলো—মনে হলো, যেন তাঁর আত্মার শতপাক-বেষ্টনী ছিঁড়ে গেছে আর সেই পথে অলৌকিক এক আলোর প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এতদিনের দ্বিধা-সংশয় আপনা আপনি বিদূরিত হলো, তখন তাঁর আর বলতে বাধল না, 'আমি দেখেছি, আমি জেনেছি, আমার বিশ্বাস হয়েছে, আমার দৃষ্টি হতে মোহজাল অপসৃত হয়েছে।' পরের দিন সকালে তিনি কৃতনিশ্চয় হলেন। স্থির করলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে।

মোহিতলাল মজুমদার লিখছেন: "দুঃখের সহিত প্রথম পরিচয়ে বিবেকানন্দও তাহার সেই মৃত্যু-রূপ দেখিয়াছিলেন; তখনও তাঁহার হৃদয়ের হবি হোমযোগ্য হইয়া উঠে নাই, তখনও তাহা ঢালিয়া দিবার মতো তরলতা প্রাপ্ত হয় নাই; কারণ, তখনো জগতের বিশাল যজ্ঞভূমিতে, তাহার হোমানল শিখার প্রচণ্ড উত্তাপ সে-হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তথাপি নিজেরই গৃহদ্বারে তাহার সেই মৃত্যু-রূপ দেখিয়া তিনি বিমূঢ় হন নাই; তাহার সেই মূর্তি তাঁহার পৌরুষকে ব্যঙ্গ করিয়াছিল—সেই ব্যঙ্গ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার শক্তি পরীক্ষা

করিতে চাহিয়াছিলেন; এবং শেষে মৃত্যুরূপী দুঃখের মুখ হইতেই, বালক নচিকেতার মতো, তিনি জীবনের অগ্নিক্ষেত্রে পূর্ণাহুতির মন্ত্র—সেই এক প্রশ্নের উত্তর—কাড়িয়া লইয়াছিলেন।"

বিবেকানন্দ বলছেন: আমি আমার জীবন দিয়ে দুঃখের নখর-দন্ত-বিদারী রূপ দেখেছি। বুঝেছি বঞ্চনার ব্যাপ্তি দিগন্তবিস্তারী। দুঃখই আমার শক্তি, আমার আধ্যাত্মিক অহংকার।

"Who ne'er in weeping ate his bread,
Who ne'er throughout the night's sad hours
Hath sat in tears upon his bed.
He knows you not, ye heavenly Powers!"

কিন্তু কি ভয়ংকর আত্মসম্মানবোধ। তাঁর কথাতেই—"যখন বাবা মারা গেলেন, মা-ভাইরা খেতে পাচ্ছে না, তখন একদিন অন্নদা গুহর সঙ্গে গিয়ে তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো [অন্নদা গুহ নরেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু। বরাহনগর নিবাসী। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে ধন্য হন]। তিনি অন্নদা গুহকে বললেন: 'নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কষ্ট, এখন বন্ধুবান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়।' অন্নদা গুহ চলে গেলে আমি তাঁকে বকতে লাগলাম। বললাম, কেন আপনি ওর কাছে ওসব কথা বললেন? তিনি তিরস্কৃত হয়ে কাঁদতে লাগলেন ও বললেন: 'ওরে তোর জন্যে যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি।' তিনি ভালবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন।" ভালবাসাই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধের হৃদয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম মিশিয়েছিলেন। স্বামীজী বলছেন: "The only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species, is the special object of my worship." (Letter to Mary Hale, 9 July 1897)

গুরু চেয়েছিলেন শিষ্যের জন্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে। শিষ্যও চেয়েছিলেন গুরুর জন্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে। স্বামীজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মে বাগবাজার থেকে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখছেন: আমি জানি না ঠাকুরের সন্তানদল আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাঁর পূত দেহাবশেষ আর তাঁর আসন নিয়ে। বঙ্গবাসীর স্বভাব আপনি ভালই জানেন। স্বামীজীর ক্ষোভ—বিষয়ী বাঙালী সংখ্যায় অসংখ্য; কিন্তু তারা উদাসীন। সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা মুহূর্তে সব পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যায় বেরিয়ে পড়তে পারেন; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ অশান্ত। তিনি বলছেন: "মৈঁ গুলাম, মৈঁ গুলাম, মৈঁ গুলাম তেরা।" একখণ্ড জমির প্রয়োজন, যেখানে তাঁর স্মৃতির আধার চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হবে, স্থাপিত হবে তাঁর আসন, নির্মিত হবে সৌধ, মন্ত্র হবে—জীবই শিব, দয়ার অধিকারী কৃষ্ণের জীব সে নয়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ: "শ্রদ্ধার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা তাহার সেই শিবত্বের উদ্বোধন কর; আপনার মুক্তিচিন্তা ভুলিয়া, পরকালের কথা ভুলিয়া, আর সকল তত্ত্ব ভুলিয়া—মানুষের পূজা কর, দেখিবে সকল দুর্বলতা দূর হইয়াছে; মৃত্যুভয় থাকিবে না—পরমজ্ঞান, পরমশান্তি, পরমানন্দের অধিকারী হইবে। যতদিন এই সংসার ও এই মানুষের প্রতি বিমুখ হইয়া আত্মসাধনায় মগ্ন থাকিবে ততদিন মহাভয়ের দাস হইয়া থাকিবে; ততদিন প্রকৃত আত্মদর্শন হইবে না। যে জড়-প্রকৃতির নিয়মকে মানুষেরও নিয়তি বলিয়া বিশ্বাস করে, সেও যেমন মানুষকে অশ্রদ্ধা করিয়া আপনি অমানুষ হয়, তেমনই, যে জগৎ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক করিয়া আপনার সহিত সেই ব্রহ্মের যোগসাধনে তৎপর হয় সেও তেমনই আত্মহত্যা করে, সেও নাস্তিক। আত্মাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়—পরের মধ্যে তাহাকে প্রত্যক্ষ করার সাধনা। কাঠ, পাথর বা মাটির মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধক যে উপাসনা করে তাহাও যেমন ভ্রান্ত, মনের নিভৃত মন্দিরে ধ্যানকল্পনার সাহায্যে যে ব্রহ্ম-দর্শনের সাধনা তাহাও তেমনই অসম্পূর্ণ; স্বচ্ছ শীতল জলরাশিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াও যে পিপাসা নিবৃত্তির জন্য আকাশের পানে চাহিয়া থাকে, সে হয় উন্মাদ, নয় তাহার পিপাসা সত্য নয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পিতারও অধিক। এত স্নেহ পৃথিবীর আর কারো কাছে স্বামীজী পানান। যখনই কোন সমস্যা হয়েছে ঠাকুর তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছেন। কাছে ডেকেছেন, সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন এককথায়। সেই গুরুর

অন্তিম সংস্কার অগ্নিতে হয়েছে। স্বামীজী তা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন অবতারোচিত সমাধি। পরিস্থিতি সেই সময় অনুকূল ছিল না। ভস্মাধার, যাকে সন্ন্যাসীরা বলতেন, 'আত্মারামের কৌটো', সেই কৌটো, ছবি ও আসন প্রতিদিন পূজিত হয় বরাহনগর মঠে। যতদিন না একটি স্মৃতিসৌধে তা রক্ষিত হচ্ছে ততদিন নরেন্দ্রনাথের শান্তি নেই।

গঙ্গার তীরে একখণ্ড জমি চাই। ঠাকুরের শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও ভক্ত বলরাম বসু উদ্যোগী হয়েছিলেন। মিত্র মহাশয় প্রাথমিক পদক্ষেপে এক হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন, পরে আরও দেবেন এমন প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু দুজনেই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। এক হাজার টাকায় জমি হয় না। স্বামীজী প্রমদাবাবুকে লিখছেন ঃ এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। আপনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। উত্তরপ্রদেশে আপনার অসীম প্রতিষ্ঠা। ধনী ভক্তের অনুগ্রহ লাভ আপনার মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। আমার স্বপ্ন সফল করুন। প্রয়োজন হলে আমি আপনার কাছে যাব। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করব আমার প্রভুর জন্যে, তাঁর সন্তানদের জন্যে।

সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ কেন এত বিচলিত? নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক। প্রয়োজনে তিনি তাঁর সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠায় জীবনপাত করবেন। ঐ স্মৃতিসৌধ আর কোথাও হলে চলবে না, এমনকি কাশীতেও নয়। এই বঙ্গভূমেই হবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা। বাংলার অবস্থা অতি করুণ। এদেশের মানুষ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, প্রকৃত বৈরাগ্য জিনিসটা কি। ত্যাগের প্রকৃত অর্থটা কি। বাবুয়ানা আর ইন্দ্রিয়পরতা জাতির প্রাণশক্তি হরণ করছে। ঈশ্বর এদের ত্যাগ দিন, অবৈষয়িকতার ভাব দিন।

'ত্রিবিধ তাপে তারা নিশিদিন হতেছি সারা।'

'ত্রিবিধ তাপ' কি কি। প্রথম তাপ—সংসারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। সম্পত্তিতে আংশিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। পরিজনদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা। দ্বিতীয় তাপ—বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান-দলকে নেতৃত্বদান ও বৃহত্তর স্মৃতিমন্দির নির্মাণের স্বপ্ন। তৃতীয় তাপ—ভারত।

"Let character be formed, and then I shall be in your midst. Do you see? We want converts at any risk. We want two thousand Sannyasins, nay ten, or even twenty thousand, men and women both."

গৃহী ভক্তে আমার প্রয়োজন নেই। আমার চাই শত সন্ন্যাসী। তোমাদের একটি মস্তক শতমস্তক হয়ে উঠুক। শিক্ষিত যুবক চাই, মূর্খের দল নয়। তবেই তোমরা বীর। নারী পুরুষ দুই চাই। আমাদের একটা আলোড়ন তুলতে হবে। আলস্য ছুঁড়ে ফেলে কোমর বাঁধো, উত্তিষ্ঠত। কলকাতা আর মাদ্রাজের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-পথ তৈরি কর। দিকে দিকে শাখাকেন্দ্র স্থাপন কর। আধ্যাত্মিকতার বিশাল এক প্লাবন আসছে—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নি-বোধত—"Arise! Awake! And stop not till the goal is reached," বললেন ঃ "Expansion is life, contraction is death."

ভিতরে অদ্ভুত এক অস্থিরতা। একটা আগুন। বারুদ। ভারতবর্ষের সমাজজীবনের ওপর ফেটে পড়তে চাইছেন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ। ভয়ঙ্কর আর এক প্রশ্নে তিনি বিচলিত, বেদে শূদ্রের অধিকার আছে কি নেই। বেদ, উপনিষদ্ কি বর্ণ-বৈষম্যের প্রবক্তা? শঙ্কর কি সেই মতের সমর্থক? বেদের পুরুষ-সূক্তে বর্ণভেদ জন্মগত নয়, কর্মগত। তাহলে জন্মগত বর্ণবৈষম্যের ব্যাধিটা এল কোথা থেকে? স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন পণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্রকে ঃ শাস্ত্রে আপনার অগাধ জ্ঞান। আপনিই পারেন এই সংশয়ের সমাধান করতে। আচার্য শঙ্কর কোন্ যুক্তিতে বলছেন, বেদে শূদ্রের অধিকার নেই? শূদ্র কেন উপনিষদ্ পড়বে না? শঙ্করের যাবতীয় যুক্তিকে স্বামীজী খারিজ করে দিচ্ছেন বলছেন, আচার্য শঙ্কর দুবার দুরকম কথা বলছেন। বর্ণবিভেদের ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথ আশৈশব বিদ্রোহী। কর্মসূত্রে বর্ণভেদ মানা যায়, জন্মসূত্রে অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন সামাজিক অবিচার।

এই সময়টায় স্বামীজী পরিপূর্ণ এক গবেষক। তত্ত্বে ও তথ্যে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে চাইছেন। অভিজ্ঞ এক ভিষক্। ভারত-শরীরের রোগলক্ষণ জেনে তবেই তিনি চিকিৎসায় নামবেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "তুই হবি বটবৃক্ষ। তোর ছায়ায় এসে কত মানুষ শান্তি পাবে।"

[পরবর্তী অংশ আগামী চৈত্র, ১৩৯৯ সংখ্যায়]

প্রাসঙ্গিকী

উদ্বোধন শারদীয়া সংখ্যাঃ ১৩৯৯

উদ্বোধন শারদীয়া সংখ্যা (১৩৯৯) 'প্রচ্ছদ থেকে প্রচ্ছদ' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। কোন কোন লেখা একাধিকবার পড়লাম। কোন কোন লেখা বা লেখাংশ বিশেষ ভাল লাগায় স-হৃদয় (সমান-হৃদয়) আমার এক বিশেষ শ্রোতাকেও ডেকে শোনালাম। অন্যদেরও পড়তে অনুরোধ করলাম। সমগ্র সংখ্যাটি আমাকে একটা স্নিগ্ধ-মধুর শান্ত-রসাশ্রিত শারদীয়া পুজা-পুজা-আমেজে আপ্লুত করে রেখেছিল। এই 'উদ্বোধন' পাঠেই আমার দুর্গা-পুজা, চণ্ডীপাঠ ও অঞ্জলি প্রদানের কাজ হয়ে গেল। সংখ্যাটি যথার্থই পুজার অর্ঘ্য-ডালি হয়েছে।

এবারকার প্রচ্ছদটির কল্পনা অভিনব। যুগ্ম সম্পাদক মহারাজ প্রচ্ছদ-পরিচিতিতে 'অপরাজিতা' চণ্ডীদেবীর সর্বব্যাপিত্ব, অনন্তরূপিণত্ব, সর্ব-ভূতান্তর্যামিত্ব বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। প্রচ্ছদটির ব্যঞ্জনা আমার কাছে বাস্তবিক খুবই মধুর এবং গভীর মনে হয়েছে।

নন্দলাল বসুর সুপ্রসিদ্ধ মহিষাসুরমর্দিনী-র চিত্রটিকে কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় মহানারায়ণ উপনিষদের ২।২ মন্ত্রের মাধ্যমে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলাম—একাধিকবার। মন্ত্রের ধ্যানে চিত্রের রূপায়ণকে মেলাবার চেষ্টা করলাম।

'দিব্যবাণী'-তে শুনলাম চণ্ডীদেবীর মাত্র একক সত্তা হিসাবে সমগ্র বিশ্বে অবস্থানের কথা। দুর্গা-তত্ত্বের ও সমগ্র অধ্যাত্মসাধনার উপলব্ধির চরম উপলব্ধি এই একাত্মানুভব। দুর্গাপুজার মূল লক্ষ্য এই সংক্ষিপ্ত মন্ত্রটি।

'কথাপ্রসঙ্গে'—"এ পুজা কাহার?" শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমাদের শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এবং বিদেশের ও প্রাচীনতম ধর্মীয় সাহিত্য এবং কাহিনীর উল্লেখ করে অপূর্বভাবে দেখানো হয়েছে যে, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ-শক্তির দ্বন্দ্বে সর্বদাই শুভশক্তিরই জয় হয়েছে। আর এই শুভশক্তি সর্বত্রই প্রকট ও বিমূর্ত হয়েছেন 'নারী'-রূপেই। "শক্তির আধার নারী নিজেই। নারীর মধ্যে অপরকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি সহজাত" (পৃঃ ৪১৯)। "পুরুষের দ্বারা নারীর পুজা চিরকালীন ঘটনা" (পৃঃ ৪২০)। এই নারীরূপের পূর্ণতা মাতৃত্বে। "এই যে দুর্গার পুজা ইহাতে আসলে ভারতবর্ষের সেই সনাতন ঐতিহ্যেরই মর্মকথাটি নিহিত রহিয়াছে। জগতের সর্বনিয়ন্ত্রী হইয়াও দুর্গা আমাদের ঘরের 'মা'-টি হইয়াছেন।··· দুর্গার মধ্যে আমরা পাইয়াছি আমাদের সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত (মাতৃ) রূপ এবং তাঁহার পায়েই নিবেদন করিয়া দিয়াছি আমাদের প্রাণের পুজা, আমাদের শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি" (পৃঃ ৪২০)।

তত্ত্বে, তথ্যে, ভাবে ও ভাষায় সম্পাদকীয় নিবন্ধটি শ্রীদুর্গা স্মরণের একটি সুন্দর 'রহস্য-ব্যাবৃতি' হয়ে উঠেছে। শিরোনামের প্রশ্নচিহ্নের (?) উত্তরে আমরা ভালভাবেই বুঝলাম—এ পুজা কাহার।

'ভাষণ' অধ্যায়ে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর 'স্মরণ-মনন', স্বামী নির্বাণানন্দজীর 'অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ' এবং স্বামী ভূতেশানন্দজীর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভায় আমাদের জীবন আলোকিত হোক'—এই তিনটি অধ্যাত্ম-অনুশাসন পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবনা-লোকে, তাঁর ছাঁচে, মহত্তর জীবনের পথে অগ্রগতির প্রেরণালাভে ধন্য হলাম। এই ভাষণ তিনটিতে সঙ্ঘগুরুদের সাক্ষাৎ উপস্থিতি এবং ভক্তদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য তাঁদের করুণ আকুতি উপলব্ধি করলাম।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর 'প্রসীদ' নিবন্ধটিতে বিশেষভাবে অনুভব করলাম যে, চণ্ডীর "প্রসীদ দেবি,"—মন্ত্রটি একটি "কাতর প্রার্থনা, অকপট অনুশোচনা, ক্ষমাভিক্ষা ও ব্যাকুল আশা প্রকাশ করে" (পৃঃ ৪১৩)। বুঝলাম,—"রুচি অনুসারে তাঁহাকে পিতা বা মাতা বলিয়া উপাসনা করিবার ইচ্ছা জাগে। ঐ উপাসনার প্রধান মন্ত্র "প্রসীদ" "প্রসীদ" "প্রসীদ" (পৃঃ ৪৩৪)। প্রবন্ধটি পড়ে মার কাছে "প্রসীদ" বলে কয়বার প্রার্থনা করলাম। প্রাণটা ভরপুর হয়ে গেল। আধ্যাত্মিক সাধকের অনুভবজাত আকুতিমন্ত্র "প্রসীদ" শারদীয়া পুজার

বিশেষ স্মরণীয়।

কবিতা আমি কম বুঝি, তাই সাধারণতঃ পড়ি না—চোখ বোলাই মাত্র। আধুনিক লেখকদের কবিতায় আমি চিত্রকল্প বা ধ্যেয় 'বস্তু' কম পাই। কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর এই সংখ্যার সবকটি কবিতাই আমি মন দিয়ে পড়লাম। কোন কোন কবি আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিতও। কোন কবির নাম না উল্লেখ করে বলি—আমার মতো অরসিক জনও অনুভব করেছে—শারদীয়া সংখ্যার সামগ্রিক কবিতাপর্বটি কাব্যরসে পরিপূর্ণ।

'অতীতের পৃষ্ঠা থেকে' শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'বেলুড়মঠে দুর্গোৎসব' পড়ে জানতে পারলাম, কিভাবে স্বামীজী রঘুনন্দনের স্মৃতিকে অনুসরণ করে মঠে প্রথম দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেন। সেই 'ট্র্যাডিশান' এখনও চলেছে। আরও জানতে পারলাম, স্বামীজী তাঁর গর্ভধারিণীর সংকল্পিত মানত উদ্ধারকল্পে কালীঘাটে মা-কালীর মন্দিরে গিয়ে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে মা-কালীর পূজা এবং আনুষঙ্গিক কৃত্যাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন।

'মাধুকরী'র শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'দুর্গা-পূজা' রচনাটি শক্তিতত্ত্বের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা। মাতৃভাবে ও কন্যাভাবে দুর্গাকে পূজা করার কথা সবিস্তার আলোচনার পর উপসংহারে লেখক খুব মূল্যবান একটা কথা বলেছেন—"এই বাহ্য পূজাই আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম সোপান" (পৃঃ ৪৪৯)। সেই যুগে, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধ পরিবেশে এই উক্তিটি খুবই মূল্যবান।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তবচতুষ্টয়' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও খুবই সারবান এবং আমার কাছে একটি নূতন বার্তাবাহী। স্তব চারটির মোট শ্লোক সংখ্যা হলো একশো সাত। "তাই কি ইহার নাম সপ্তশতী?" (পৃঃ ৪৫১) প্রবন্ধটি নতুন একটি দিক্‌দর্শন—আমার কাছে। এই স্তব চারটির মধ্যেই লেখক দেখেছেন, "যেন সমস্ত অধ্যাত্মসাধনার ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণিত হইয়াছে" (পৃঃ ৪৫১)। শারদীয়া সংখ্যার গৌরব ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে এই সংক্ষিপ্ত লেখাটি।

প্রণতি রায়ের 'দেবী দুর্গা ঃ বিবর্তনের পথে' প্রবন্ধটিকে খুব মূল্যবান একটি গবেষণার ফসল বলা যেতে পারে। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদের পর পুরাণ, মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতের মাধ্যমে দুর্গার ধারণার বিবর্তনের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণটি যুক্তিসম্মত হয়েছে। বৈদিক ধারণায় যে দেবী-ভাবনার সূচনা, তারই বিকাশ ঘটেছে,—"নানা বৈচিত্র্যে... ভারতের শক্তিসাধনা এবং দেবী দুর্গার ধারণার মধ্য দিয়ে" (পৃঃ ৪৬০)।

আশাপূর্ণা দেবীর নিবন্ধ "সেবাধর্মে নারী" লেখাটি নিজে একাধিকবার পড়েছি। অপরকে পড়িয়েও তৃপ্তিবোধ করেছি। নারীপ্রগতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ এবং যাঁরা এনিয়ে 'হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ' করছেন, সেইসব পুরুষ ও নারীর অবশ্যপাঠ্য এই মূল্যবান প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত দরদী লেখাটি। সহজাত সেবাধর্মে মাতৃরূপা নারী যে 'স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতা'—এ ধারণাটির উপলব্ধির জন্য অবশ্য-পাঠ্য এই লেখাটি। "নারী কল্যাণরূপা, সেবারূপা, মাতৃরূপা" (পৃঃ ৪৬৫)। সম্পাদকীয় নিবন্ধেও এই ভাবটিকে সুপরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই অনুভব থেকেই নারী উত্তীর্ণ হয়ে যাবে 'ঈশ্বরী' রূপে, 'দেবী' রূপে।

চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'বিনোদিনী, রঙ্গমঞ্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ' নিবন্ধে দেখলাম শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে 'আসলে নকলে' এক দৃষ্টিতে দেখে থিয়েটারের অভিনেত্রী, সমাজ-নিন্দিতা "বিনোদিনীদেরও এমনি জন্মান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিলেন" (পৃঃ ৪৬৮)।

স্বামী বিমলাত্মানন্দের 'বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ' প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে দেশ-কাল অতিক্রম করে সেই পুরনো দিনের মঠের দুর্গাপূজাকে যেন প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলাম। বর্ণনাগুলি চিত্রধর্মী—যেন মঠের পুরনো দিনের ভাবভক্তির 'জ্যান্ত দুর্গার' পূজাই স্বচক্ষে দেখছি। "এখানে মায়ের যেমন প্রকাশ তেমনটি আর কোথাও পাবে না, বাবা, বলছি।... মা এখানেই সদা বিরাজমানা" (পৃঃ ৪৭৪)। —মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজের এই উক্তিটির তাৎপর্য এখনো বেলুড় মঠের পূজায় গেলে উপলব্ধি করা যায়।

গোপেশানন্দজীর রম্যরচনা 'আঁটি'। শ্রীরামকৃষ্ণ-রোপিত কামারপুকুরের আমগাছের আঁটির মধ্যে

কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র স্পর্শ ও দিব্যভাব 'জীবন্ত' হয়ে আছে, তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গোপেশানন্দজী। আমিও প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে এই আমগাছের একটি আঁটিকে প্রোথিত করেছিলাম কলকাতা থেকে প্রায় ৪০০ মাইল দূরে ত্রিপুরার এক প্রত্যন্ত জনপদে।

'স্মৃতিকথা' বিভাগে 'শ্রীমা সারদাদেবীর পদপ্রান্তে' শীর্ষক লেখাটিতে অতি কাছের জীবন্ত মানুষ সুধীরচন্দ্র সামুই মশায়ের স্মৃতিতে, প্রত্যক্ষদর্শীর জবানীতে, শ্রীমাকে আমরাও যেন প্রত্যক্ষ করলাম তাঁর বিচিত্র লীলায়।

স্বামী বোধানন্দের 'স্বামীজীর একটি স্মৃতি'তে নতুন একটা কথা জানলাম—স্বামীজী তাঁর নিজ শিষ্য এবং তাঁর ইষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণকে একই সঙ্গে অভিন্নভাবে পূজা করেছিলেন এবং ভোগ-নিবেদন কালে তিনি ঠাকুরকে 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করে আহ্বান করেছিলেন (পৃঃ ৪৮১)। অপূর্ব স্মৃতিকথাটি।

কণা বসুমিশ্র 'উনিশ শতকের পটভূমিকায় শ্রীমা সারদাদেবী' নিবন্ধে বহু উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীমার দিব্য-মানবী জীবনের একটি মূল্যায়ন করেছেন। তিনি মাকে দেখেছেন "সারা বিশ্বের নারী সমাজের কাছে প্রেরণা ও পাথেয়ের চির অনির্বাণ ধ্রুবতারা" রূপে (পৃঃ ৪৮৬)।

স্বামী কমলেশানন্দের তীর্থ 'পরিক্রমা'র সঙ্গী হয়ে, তল্পিবাহক সাধুর চেলা হিসাবে আমিও নর্মদা-পরিক্রমা করলাম। বর্ণনা ইতিহাস ও পুরাণ-ভিত্তিক এবং 'রঙ্গিন' চিত্রধর্মী।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পরমপদকমল'-এর 'ধর্ম-কর্ম' রচনাটিতে এবার উপনিষদ্ এবং গীতার বহুল উদ্ধৃতির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বচন মিশ্রিত একটি গুরু-গম্ভীর তত্ত্ববহুল প্রবচন শুনতে পেলাম—ব্যাস-আসনে উপবিষ্ট 'বিদগ্ধ' কথকঠাকুরের মুখে।

প্রণবেশ চক্রবর্তীর নিবন্ধে 'সতীপীঠ বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামে'র পূজা ও মেলায় ভ্রমণ করে আসা একটি আনন্দকর উপরি পাওনার মতো। তান্ত্রিক গৌড়ীয় সাধনপীঠ ও লোকোৎসবের সুন্দর একটি ছবি পেলাম সুলিখিত এই নিবন্ধটিতে।

নীহার মজুমদার 'সারদাদেবী: পৃথিবীর মহত্তমা নারী' নিবন্ধে শ্রীমার দেবী-মানবী চরিত্রের মহিমার কয়েকটি দিক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'দূষণমুক্ত পৃথিবীর প্রথম আহ্বান' শীর্ষক 'বিশেষ রচনায়' শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর "ভগিনী ও ভ্রাতাগণ"—এই সম্বোধনের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক যথার্থই বলেছেন, স্বামীজীর এই আহ্বানই মনুষ্যদূষণ রোধ করতে পারবে। (পৃঃ ৫০৭)।

হর্ষ দত্তের নাট্যকাব্য 'প্রাণঃ প্রাণেন যাতি'র মধ্যে একটা নতুন আঙ্গিক এবং নাট্যরস ফুটে উঠেছে। বিষয়বস্তু—আলমোড়ায় সংজ্ঞাহীন স্বামীজীকে ফকিরের শশা নিবেদন এবং সংজ্ঞালব্ধ স্বামীজীর অখণ্ডানন্দজীর নিকট একই প্রাণের সর্বত্র প্রবহমানতার তত্ত্ব প্রকাশ। স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষে এই রচনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'বিজ্ঞান-নিবন্ধে' অমিতাভ ভট্টাচার্য 'তামাকের নেশা থেকে ক্যান্সার' শীর্ষক সুন্দর আলোচনায় তামাকের নেশার কুফল সম্পর্কে সাধারণকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু তিনি তো জানেন "ও ভয়ে কম্পিত নয়" তাম্রকূটসেবীদের হৃদয়।

'বিজ্ঞান প্রসঙ্গে' জানলাম 'বরফে রক্ষিত প্রায় সাতহাজার বছর আগের মানুষ'-এর কথা। চমক লাগার মতো বিস্ময়কর খবর।

'গ্রন্থ পরিচয়ে' তাপস বসু শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে দুটি নতুন সংযোজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

পড়লাম রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের দেশ-বিদেশের সংবাদ, বিবিধ সংবাদ, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ। বিজ্ঞাপনও বাদ দিইনি। 'মলাট থেকে মলাট' পর্যন্ত সব বিজ্ঞাপনই পড়েছি। বিজ্ঞাপনগুলিতে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর সুন্দর সুন্দর বাণীর সঙ্গে আবার যেন নতুন করে পরিচিত হলাম।

মলাটের শেষের 'সৌজন্যে' আবেদন-বিজ্ঞাপনটি ভুবনেশ্বর মঠের মন্দির সংস্কারের জন্য সাহায্যের আবেদন। শারদীয়া সংখ্যাটি বন্ধ করে রাখার সময় মনে হলো এ-আবেদনে সাড়া না দিলে একটা কর্তব্যের ত্রুটি থেকে যায় না কি? □

সচ্চিদানন্দ ধর
কসবা, কলিকাতা-৭০০ ০৪২

বিশেষ রচনা

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও ধর্মমহাসম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্ব

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৪ ॥

ভারত-পরিক্রমায় স্বামীজী একদিকে যেমন নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তেমনি তাঁর মনোজগতে প্রবাহিত হয়েছিল নতুন চিন্তা-স্রোত। বেদান্ত তত্ত্বকে কার্যে পরিণত করা, গরিব-দুঃখীদের সেবা করা, আপামর জনসাধারণের মধ্যে নির্বিচারে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের সংকল্প এবং জাতি-বিভাগের বেড়াজালে আবদ্ধ পঙ্গু সমাজকে বাঁচাবার উপায়ের কথা তিনি অহরহ চিন্তা করতেন। সনাতন-পন্থী সাধুসমাজ ছিলেন নিজেদের মুক্তি-সাধন ভিন্ন অন্য চিন্তার ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বামীজী ভিন্ন শিক্ষা পেয়েছিলেন। ভারত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় স্বামীজী বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল কত যথার্থ। তিনি স্থির করলেন, সাধুসমাজের এই অচলায়তনকে আঘাত দিতে হবে। তিনি তাঁর গুরুভাইদের বলতেন: "সকলেই প্রচারকার্যে রত; কিন্তু তারা সেটা অজ্ঞাতসারে করে। আমি সেটা জেনেশুনে করব, এমনকি, তোরা যে আমার গুরুভাই, তোরাও যদি তার প্রতিবন্ধক হোস, তবু আমি ছাড়ব না—দীনহীন চণ্ডালের কুটীরে পর্যন্ত গিয়ে প্রচার করে আসব। প্রচার মানে বহিঃপ্রকাশ।"[৩৮] স্বামীজীর অনুভব হয়েছিল—ভগবান সর্বব্যাপী। তাঁর নিজের মনে যেমন দৃঢ়তা প্রগাঢ় রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তেমনি তিনি অর্জন করেছিলেন অপরের মনে সাহস সঞ্চার করবার শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক অর্পিত 'দায়-ভার'-এর গুরুত্ব তিনি তখন উপলব্ধি করছিলেন। স্বামীজীর হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল "রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে আপাত-বিচ্ছিন্ন ভারতখণ্ড আবার এক হইবে।"[৩৯] ভারত-পরিক্রমাকালে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির সঙ্গে সম্যগ্‌ভাবে পরিচয় হয়েছিল স্বামীজীর। তিনি বলতেন জীবন্ত ও সক্রিয় হিন্দুধর্মের কথা। আর বলতেন বিশ্বসংস্কৃতিতে হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব ও গভীর অবদানের কথা।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে বরানগর মঠ থেকে স্বামীজী আবার প্রব্রজ্যায় বেরিয়ে পড়লেন। গন্তব্যস্থল বিহারের শিমুলতলা। কিন্তু অসুস্থ হয়ে কিছুকাল পরে ফিরে এলেন মঠে। কিন্তু তীর্থদর্শনের ইচ্ছায় পুনরায় ডিসেম্বরে (১৮৮৯) স্বামীজী উপস্থিত হলেন বৈদ্যনাথ ধামে। কিছু-কাল সেখানে বাস করার পর সংবাদ পেলেন—এলাহাবাদে চকবাজারের ডাঃ গোবিন্দ বসুর বাড়িতে পানি-বসন্তে আক্রান্ত হয়েছেন গুরুভাই স্বামী যোগানন্দ। অনতিবিলম্বে স্বামীজী গুরু-ভাইয়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলেন। মঠ থেকে এলাহাবাদে পৌঁছালেন স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। তীর্থরাজ প্রয়াগের ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান আর নিরত জপ-ধ্যান ও শাস্ত্রালোচনায় স্বামীজী এবং গুরুভাইদের মন স্বভাবতই উচ্চতানে বাঁধা থাকত।

এলাহাবাদের উকিল (পরে হাইকোর্টের বিচার-পতি) গিরিশচন্দ্র বসুকে স্বামীজী যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন বেদান্ত-দর্শনের সারবত্তা। গিরিশবাবু এতদিন থিয়োজফী-দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। গিরিশবাবু চিৎকার করে বলেছিলেন: "স্বামীজী করলে কি? আমার দশ বছরের

৩৮ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১

৩৯ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু, ১ম ভাগ, ১৩৫৬, পৃঃ ১৯২

পরিশ্রম পণ্ড করলে?" স্বামীজী বললেন: "তোমার পণ্ড হলো বা না হলো তাতে আমার কি?" ত্রিবেণীতে সিন্দুক সা নামে এক রামাৎ বৈষ্ণব বৈরাগীর ভণ্ডামি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন স্বামীজী। স্বামীজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে মাধবদাস নামে এক বৈরাগী "মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য সর্পের ন্যায় মস্তক অবনত করে রইলেন, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করতে পারলেন না।"[৪০]

একজন ধার্মিক মুসলমান ফকিরকে দর্শন করে স্বামীজী অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, তাঁর "মুখের প্রতিটি রেখা বুঝাইয়া দিতেছিল যে, তিনি পরমহংসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"[৪১] এলাহাবাদে অমূল্যের সঙ্গে লংকা খাওয়া প্রতিযোগিতায় স্বামীজী জয়ী হয়েছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র বসু স্মৃতিচারণ করেছেন: "এই সামান্য ব্যাপারেতেও স্বামীজীর ··· মাধুর্য ও হৃদয়স্পর্শী ভাব লক্ষিত হয়েছিল।··· অতি সামান্য কার্যেও তাঁর গাম্ভীর্য ও মাধুর্য এরূপ প্রকাশ হতো, যেন বেদান্তের উচ্চতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন।"[৪২] এলাহাবাদে স্বামীজীর অবস্থানের মধুর স্মৃতিচিত্র অঙ্কিত করেছেন গোবিন্দচন্দ্র: "একদিন স্বামীজী ও তদীয় গুরুভ্রাতাগণ ও আমি ঝুঁসি দর্শন করতে দয়ারামের আশ্রমে উপস্থিত হই। সারাদিন অতীব আনন্দে অতিবাহিত হয়েছিল, তা আর বর্ণনা করবার নয়। কি জমাট ভাব, কি কথা-প্রসঙ্গ, কি হৃদয়স্পর্শী ভালবাসা এবং মাঝে মাঝে হাস্যোদ্দীপক কৌতুক রহস্য, তা অদ্যাপি আমার হৃদয়ে জাগ্রত রয়েছে এবং অল্প দিনের কথা বলে যেন মনে হয়। দৃশ্যটি যেন আমার চোখের সামনে রয়েছে। সায়ংকালে প্রত্যাবর্তন করলাম। স্বামীজীর পরিধানে একটিমাত্র কৌপিন ও গৈরিক বহির্বাস অতি মোটা ভেড়ার কম্বল গাত্রাচ্ছাদিত এবং নগ্নপদ।··· নানা বিষয়ের স্মৃতি যদিও বিভ্রম হয়, কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গ এত জ্বলন্ত ও জীবন্ত—অদ্যাপি তা পূর্বাহ্ণের কথা বলে প্রতীয়মান হয় এবং যেন মধুর সঙ্গ, স্নেহপূর্ণ মুখ, জ্যোতির্ময় কলেবর ও বিশাল হৃদয়ের কথা যখনি মনে মনে চিন্তা করি, তখনি অতীব পুলকিত হয়ে উঠি।··· আমি প্রয়াগে চল্লিশ বৎসর অবস্থান করায় নানাপ্রকার সাধুর সঙ্গে মিশেছি এবং কুম্ভমেলা প্রভৃতি এখানে হওয়ায় অনেক প্রকার সাধু-মহাত্মার দর্শন করেছি এবং চিকিৎসা-ব্যবসা থাকায় বহুপ্রকার লোকের সম্মিলনে এসেছি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতন অত অল্পবয়সে ঐরকম ত্যাগ ও বৈরাগ্য অপর কারও ভিতর দেখিনি। তাঁর ওজস্বী বাণী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দূরদর্শিতা, গম্ভীর বাণী ও সাহসপূর্ণ উক্তি, মধুময় সান্ত্বনাবাক্য এবং কৌতুক ব্যঙ্গ ও হাস্যোদ্দীপক কথাবার্তার এরূপ এক সঙ্গে সমাবেশ কুত্রাপি দর্শন করিনি।"[৪৩]

এলাহাবাদ থেকে স্বামীজী যান গাজীপুরে। গাজীপুর বারাণসী থেকে প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার পূর্বে। গঙ্গাতীরে বিখ্যাত সিদ্ধযোগী, সুপণ্ডিত পওহারী বাবার আশ্রম। স্বামীজীর গাজীপুর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পওহারী বাবার দর্শনলাভ। স্বামীজী গাজীপুরে আসেন ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি। এখানে প্রথমে গোরাবাজারে বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং পরে আফিং অফিসের বড়বাবু গগনচন্দ্র রায়ের বাড়িতে স্বামীজী প্রায় তিনমাস ছিলেন। পওহারীবাবার গুহার কাছেই ছিল গগনবাবুর বাগানবাড়ি। ঐ বাড়ির একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় স্বামীজী বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। গাজীপুর থেকে লেখা স্বামীজীর বাইশটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। জনশ্রুতি, সেগুলির অধিকাংশ এই গাছতলায় বসে লেখা।[৪৪]

৪০ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ১৮১

৪১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩

৪২ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ১৮১

৪৩ ঐ, পৃঃ ১৮১-১৯১

৪৪ স্থানীয় বিবেকানন্দ-অনুরাগীরা অশ্বত্থ গাছের চারদিকে সিমেন্টের চাতাল করে দিয়েছেন এবং রেলিংও বসিয়েছেন। এই বিবেকানন্দ-স্মারকটি উদ্বোধন করেছেন শৃঙ্গেরী মঠের জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য গত ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি।

গাজীপুরে পাশ্চাত্য সভ্যতার নির্লজ্জ অনুপ্রবেশ দেখে স্বামীজী অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি প্রমদাবাবুকে লিখেছিলেন (২৪ জানুয়ারি ১৮৯০): "এ-স্থানের সকলই ভাল, বাবুরা অতি ভদ্র, কিন্তু বড় westernised (পাশ্চাত্যভাবাপন্ন); আর দুঃখের বিষয় যে, আমি western idea (পাশ্চাত্য ভাব) মাত্রেরই উপর খড়্গহস্ত।... কি কাপুড়ে সভ্যতাই ফিরিঙ্গী আনিয়াছে? কি materialistic ধাঁধাই লাগাইয়াছে।... ভগবান শুকের জন্মভূমিতে আজি বৈরাগ্যকে পাগলামি ও পাপ মনে করে। অহো ভাগ্য।"[৪৫]

গাজীপুর স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্পর্কের এক অভিনব দৃশ্যের অভিনয় হয়েছিল। স্বামীজী সেসময় কোমরের বাত ও অজীর্ণ রোগে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাই স্বামীজী সিদ্ধান্ত নিলেন সিদ্ধ হঠযোগী পওহারী বাবার কাছে হঠযোগে দীক্ষা নিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করবেন। স্বামীজীর নিজের কথা: "একদিন মনে হলো, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এত কাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় করবার কোন উপায়ই তো পাইনি। পওহারী বাবা শুনেছি, হঠযোগ জানেন। এঁর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে শরীরটাকে দৃঢ় করে নেবার জন্য এখন কিছুদিন সাধন করব।"[৪৬] যেই ভাবা, সেই কাজ। পওহারী বাবাকে অনুরোধ করলেন স্বামীজী। আর পওহারী বাবাও সম্মত হলেন। দীক্ষার পূর্বরাত্রে স্বামীজী শয্যায় শায়িত। গভীর চিন্তায় মগ্ন। যেন একটা মানসিক দ্বন্দ্বে তাঁর মন নিপীড়িত। স্বামীজী বলছেন: "এমন সময় দেখি—ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছেন, যেন বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন। তাঁর কাছে মাথা বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু করব—এই কথা মনে হওয়ায় লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরূপে বোধ হয় ২।৩ ঘণ্টা গত হলো; তখন কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না। তারপর হঠাৎ তিনি অন্তর্হিত হলেন। ঠাকুরকে দেখে মন একরকম হয়ে গেল, কাজেই সেই দিনের মতো দীক্ষা নেবার সংকল্প স্থগিত রাখতে হলো। দু-একদিন বাদে আবার পওহারী বাবার নিকট মন্ত্র নেবার সংকল্প উঠল। সেদিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব হলো—ঠিক আগের দিনের মতো। এইভাবে উপর্যুপরি একুশ দিন ঠাকুরের দর্শন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সংকল্প একেবারে ত্যাগ করলুম। মনে হলো, যখনই মন্ত্র নেব মনে করছি, তখনই যখন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন্ত্র নিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হবে না।"[৪৭]

এই ঘটনায় স্বামীজীর এক অনুপম উপলব্ধি হলো। অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে এল গভীর আকুতি: "...হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য, আমি তোমার ক্রীতদাস! আমার এ আত্মহারা দৌর্বল্যের অপরাধ ক্ষমা করো প্রভো।"[৪৮] তাঁর এই মর্মানুভূতির কথা ৩ মার্চ ১৮৯০ তারিখের চিঠিতে প্রমদাবাবুকে লিখলেন: "আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—'আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে'।... এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ-জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন, অথবা বেদান্ত-দর্শন যাহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ 'লোক-হিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী' বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত 'মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা'।"[৪৯]

[পরবর্তী অংশ আগামী চৈত্র, ১৩৯৯ সংখ্যায়]

৪৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩০৩-৩০৪

৪৬ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১

৪৭ ঐ, পৃঃ ২৩২

৪৮ বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ২য় সং, ১৩৩১, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৫১

৪৯ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২০-৩২১

নিবন্ধ

শেলীর কাব্যে সনাতন ধর্মের মহত্তম উপলব্ধির অভিব্যক্তি

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

বর্তমান বছরে ইংরেজ কবি পি. বি. শেলীর জন্মের (৪ আগস্ট, ১৭৯২) দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধটি সেই উপলক্ষে রচিত।—যুগ্ম সম্পাদক

ইংরেজ কবি রুডইয়ার্ড কিপলিং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন :

"East is East and West is West
And never the twain shall meet."

—প্রাচ্য হলো প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য হলো পাশ্চাত্যই, এদের মিলন কদাচ ঘটবে না।

স্বাজাত্যাভিমানী কিপলিঙের এই উক্তি কিন্তু সমর্থিত হয়নি বাস্তবে। চিন্তা ও কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বারংবার মিলন সংঘটিত হয়েছে এই দুই গোলার্ধের। চিন্তাজগতের এমনই এক বিস্ময়কর মিলনের প্রসঙ্গই বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য।

ইংরেজী 'রোমান্টিক' কথাটির সার্থক কোন পারিভাষিক প্রতিশব্দ বাঙলা ভাষায় অদ্যাপি স্বীকৃতি বা পরিচিতি লাভ করেনি। সুতরাং সাহিত্যে, বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যে, শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য ব্যক্ত করার পক্ষে এটি বিকল্প-বিহীন। ইংরেজী রোমান্টিক কাব্য বলতে আমরা বুঝি উনিশ শতকের সূচনাপর্বের কাব্যসম্ভার। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এই কালটি ছিল এক যুগসন্ধিক্ষণ। শিল্প-বিপ্লবের ফলে সেখানে উদ্ভব হয় এক ঐহিক ভোগবিলাস-সর্বস্ব সভ্যতার। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে যন্ত্রের অপরিসীম ক্ষমতা ও কুশলতায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ নিবেদন করে তার সত্তাকে সেই যন্ত্রের বেদিমূলে। নবাবিষ্কৃত যন্ত্ররাজি-সমৃদ্ধ বৃহৎ কারখানাসমূহের চতুষ্পার্শ্বে গড়ে ওঠে জনবহুল শহর। মানুষ প্রকৃতির স্নিগ্ধ সান্নিধ্য ও সংসর্গ থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত হয়ে দলে দলে আগমন করতে থাকে এইসব শহরে জীবিকার তাগিদে অথবা বিলাস-ব্যসনের বাসনায়। গ্রামগুলি হয়ে পড়ে পরিত্যক্ত ও অবহেলিত। আধ্যাত্মিক ভাবুকতার স্থলে চরম বস্তুতান্ত্রিকতা অধিকার করে মানুষের মন।

এই আত্মিক অবক্ষয়ের যুগে ইংল্যান্ডে আবির্ভাব ঘটে এক তরুণ কবি-সম্প্রদায়ের, যাঁরা তাঁদের বাস্তব-বিমুখতার জন্যে ভূষিত হলো 'রোমান্টিক' আখ্যায়। বাণিজ্যিক লেনদেনের আবিল পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁদের মন। তৎকালীন ঐহিকতা-সর্বস্ব অস্তিত্বের প্রতি তাঁদের মনে জাগে এক তীব্র বিরাগ। প্রকৃতির প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেন তাঁরা অন্তরে অন্তরে। প্রকৃতির মধ্যেই তাঁরা খুঁজতে প্রবৃত্ত হন তাঁদের সত্তার আশ্রয়। সম-মানসিকতার দরুন এঁরা ইংরেজী সাহিত্যে পরিচিতি লাভ করেন রোমান্টিক গোষ্ঠী (Romantic School) রূপে।

ইতিমধ্যে সমগ্র ইউরোপে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে বিশ্ববিদিত ফরাসী মনীষী রুশোর নিসর্গ-দর্শন। এই দর্শনের মূলতত্ত্ব হলো প্রকৃতি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। রুশোর মতে প্রকৃতিই জ্ঞান, শান্তি ও আনন্দের আকর। মানুষ যতদিন বাস করেছে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে ততদিন তার মন-প্রাণ ভরে থেকেছে শান্তি ও সন্তোষে। সেই ঘনিষ্ঠতা থেকে বঞ্চিত হবার ফলেই তার চিত্তে দেখা দিয়েছে অশান্তি আর বিক্ষেপ। তাঁর মতে অন্তরের সেই নির্মল প্রসন্নতা পুনরুদ্ধারের অপরিহার্য শর্ত হলো প্রকৃতির পরিমণ্ডলে প্রত্যাবর্তন ('Return to Nature')।

পূর্ববর্তী যুগে—অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে—কবিতাকে দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে মর্মগোচর করাবার একটি সার্থক মাধ্যমরূপে গণ্য করা হতো। এই যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি আলেকজান্ডার পোপের কাব্যগ্রন্থ 'The Essay on Man'-এর ভূমিকা পাঠ করলেই একথা স্পষ্ট প্রতীত হয়। রোমান্টিক কবিরা—বিশেষ করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলী কিন্তু কবিতাকেই গ্রহণ করলেন প্রগাঢ় দার্শনিকতার অভিব্যক্তিরূপে। বস্তুতঃ ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে অধ্যাত্ম-দর্শনের গভীর তত্ত্বসমূহ।

রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর অগ্রগণ্য দুই কবি—ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলীর কবিতায় আমরা পাই মরমিয়াবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদ (mysticism) ও অদ্বৈতবাদ (Pantheism)-এর সুললিত ছন্দোময় উপস্থাপন। বলা বাহুল্য, এই তত্ত্বদ্বয় সামান্যতঃ দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান উপজীব্য এবং বিশেষতঃ ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের প্রকৃত ভিত্তিমূল বলে সর্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত।

এপ্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। সেটি হলো এই যে, উনিশ শতকের আদিপর্বের এই রোমান্টিক কবিবৃন্দের নিসর্গ-অনুধ্যানের মাধ্যমে দর্শনশাস্ত্রের মূলতত্ত্বের যে-ধারণা, তার সঙ্গে উপনিষদের ঋষিদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উদ্ভবের বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই নিসর্গ-তন্ময়তা এই অধ্যাত্ম-বোধের উন্মেষের হেতু বলে স্বীকৃত হয়েছে প্রাজ্ঞজনের কাছে।

অপর একটি বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। সেটি হলো এক অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করতেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলীর মতো রোমান্টিক কবিরাও তাঁদের সৃষ্টিশীল জীবনের একটি বৃহৎ অংশ যাপন করেছেন প্রকৃতির বুকে।

ভারতের আর্য ঋষিরা বাস করতেন শান্ত নির্জন তপোবনে, প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত ক্রোড়ে। এই আরণ্যক পরিবেশ তাঁদের গভীর মনন ও নিদিধ্যাসনের পক্ষে ছিল অনুকূল। এখানে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁরা উপলব্ধি করেন প্রকৃতির গভীর গোপন অন্তরাত্মাকে এবং নিবিড় এক আত্মীয়তা স্থাপন করেন তার সঙ্গে। মানবাত্মা ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্তার ঐক্যবোধের ফলেই গড়ে ওঠে অধ্যাত্ম-দর্শনের পরমতত্ত্ব—অদ্বৈতবাদ।

শেলীর সংক্ষিপ্ত জীবনের সৃষ্টিশীল কালটি যাপিত হয় নগরজীবনের কোলাহলমুখর পরিমণ্ডল থেকে দূরে প্রশান্ত ও নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি চিরতরে ইংল্যান্ড ত্যাগ করেন এবং স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করেন ইটালীতে। সমুদ্রের সন্নিকটে উঁচু পাহাড়ের কোলে পিসা-প্রণালীর (Bay of Pisa) তীরে তিনি খুঁজে পান তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্থান। দক্ষিণ ইটালীর নেপলস প্রণালী (Bay of Naples) অথবা ইউগেনিয়ার পর্বতমালার (Euganean Hills) স্বভাব-সৌন্দর্য তাঁর তৎকালীন ক্ষত-লাঞ্ছিত হৃদয়ে বুলিয়ে দেয় প্রশান্তির প্রলেপ। তৎকালে রচিত একটি কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে মমতাময়ী প্রকৃতির কোলে পরিশ্রান্ত শিশুর মতো কবির শয়নের আকুতি :

> "I could lie down like a tired child,
> And weep away the life of care."
>
> ('Stanzas written in Dejection Near Naples', lines : 30-31)

—আমি যেন (এখানে) ক্লান্ত শিশুর মতো শায়িত হয়ে উদ্বেগ-ভারাক্রান্ত জীবনটাকে অশ্রুধারায় নিঃশেষ করে দিতে পারি।

এই পঙ্‌ক্তিদ্বয় ব্যক্ত করছে মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত অন্তর্গূঢ় এক ঐক্যবোধ—যা ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যে আমরা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রথম দেখলাম বিশ্বপ্রকৃতির একটি অন্য-নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি। প্রকৃতির প্রতি এই অভিনব মনোভঙ্গির ফলে রোমান্টিক কবিরা লাভ করলেন অতীন্দ্রিয় এক উপলব্ধি, যার ফলে তাঁদের ধ্যান-দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হলো প্রকৃতির বাহ্য রূপের অন্তরালে চির-বিরাজমান পরম সত্তার তত্ত্বটি। এই সর্বব্যাপী একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরম-সত্তার উপলব্ধিই অধ্যাত্ম দর্শনের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব।

কবি কীটস-এর মহাপ্রয়াণে শেলী 'অ্যাডোনাইস' ('Adonais') শীর্ষক যে দীর্ঘ শোকগাথা রচনা করেন তাতে সনাতন ধর্মের মহান তত্ত্বগুলি অভিব্যক্ত হয় নান্দনিক মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে।

ভারতের সনাতন ধর্মের ভিত্তিমূলে রয়েছে আত্মার অবিনাশিতা ও তার পুনর্জন্মের তত্ত্বটি। যে-গীতাকে সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং উপনিষৎসমূহের সারাৎসার বলা হয়েছে তার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তবিংশতিতম শ্লোকে। এই তত্ত্বটি ঘোষিত হয়েছে স্বয়ং শ্রীভগবানের কণ্ঠে :

> "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।"

—জন্মগ্রহণকারীর মৃত্যু যেমন নিশ্চিত, তেমনই

নিশ্চিত মৃতের পুনর্জন্ম।

এই অধ্যায়েরই বিংশতিতম শ্লোকে শ্রীভগবান আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥"

—(এই আত্মা) জন্মরহিত, সর্বদা একরূপ, অপক্ষয়শূন্য এবং পরিণামশূন্য ; শরীর বিনষ্ট হলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

উপরি উল্লিখিত 'এ্যাডোনাইস' কবিতায় শেলী কীটস-এর স্মৃতিতর্পণপ্রসঙ্গে লেখেন ঃ

"Thou canst not soar where he is
sitting now,
Dust to the dust ! but the pure
spirit shall flow
Back to the burning fountain
whence it came,
A portion of the Eternal,
which must glow
Through time and change,
unquenchably the same."
(Stanza 38)

—যেখানে সে এখন অবস্থান করছে তোমার সেখানে উত্তরণের সাধ্য নেই। ধূলার শরীর হয়েছে ধূলায় বিলীন। কিন্তু শুদ্ধ আত্মার অবশ্যই প্রয়াণ ঘটবে সেই অর্চিষ্মান উৎসে, যেখান থেকে হয়েছিল তার আগমন। শাশ্বত সত্তার অংশ সে। তাই সময় ও পরিবর্তনের মধ্যেও চির-অনির্বাণ থাকবে তার দ্যুতি।

আবার তিনি লিখছেন ঃ

"Peace, Peace ! he is not dead,
he doth not sleep—
He hath awakened from the
dream of life—" (Stanza 39)

—শান্তি, শান্তি। সে নয় মৃত, সে নয় নিদ্রিত—তার জাগরণ ঘটেছে জীবনের স্বপ্ন থেকে।

আমাদের পার্থিব সত্তা যে আত্মার চিরযাত্রা-পথের ক্ষণিক বিরামস্থল—ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের এই ধারণাটি অপরূপ সুরে-ছন্দে-লয়ে মণ্ডিত হয়ে প্রকাশলাভ করেছে উপরি উদ্ধৃত স্তবকাংশদ্বয়ে।

পরিশেষে অবতারণা করা যাক সনাতন ধর্মের মহত্তম উপলব্ধি অদ্বৈতবাদের। ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের পরিণামী এই পরমতত্ত্বটি বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে 'প্রস্থানত্রয়' অর্থাৎ উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্ত-দর্শনে। প্রস্থানত্রয়কে গণ্য করা হয় সনাতন ধর্মের প্রধান স্তম্ভ হিসাবে। অদ্বৈত-বেদান্তের প্রধান প্রবক্তা আচার্য শঙ্কর বললেন ঃ

"শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥"

—অর্ধমাত্র শ্লোকে আমি ব্যক্ত করব সেই পরমতত্ত্বটি যা কোটি কোটি ধর্মগ্রন্থে উক্ত হয়েছে। সেটি হলো—জগতের সমস্ত বস্তুই অনিত্য, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ নিত্যবস্তু। জীব ব্রহ্মই, অপর কিছু নয়। এই ধারণাটিই প্রকাশিত হয়েছে চতুর্বেদে ও বেদান্তের মহাবাক্যগুলিতে।

উপনিষদ্ ও গীতার বিভিন্ন শ্লোকে জগৎ-প্রপঞ্চের মূলে একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরম সত্তার সর্বব্যাপী অস্তিত্বের তত্ত্বটি বিধৃত হয়েছে।

উপনিষদের মূলতত্ত্ব হলো ঃ "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" এই ধারণা অভিব্যক্ত হয়েছে শেলীর 'এ্যাডোনাইস'-এ,

"The One remains, the many change
and pass ;
Heaven's light forever shines,
earth's shadows fly ;
Life, like a dome of many-
coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity,
Until Death tramples it to fragnants."
(Stanza 52)

—সেই পরম এক থাকেন চির-বিরাজিত, রূপান্তর ও বিনাশ ঘটে বহুর। স্বর্গের আলোক দীপ্তিমান থাকে চিরদিন, মর্ত্যের ছায়া হয় অপসৃত। বহুবর্ণরঞ্জিত গম্বুজের মতো জীবন প্রতিফলিত করে অনন্তের শুভ্র জ্যোতি—যতক্ষণ না মৃত্যু এসে তাকে দলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে।

এইভাবে ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় এই কবির কাব্যে সংশয়াতীতরূপে প্রতিপাদিত হয় যে, অধ্যাত্ম-জগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব মিলন সংঘটিত হয়েছে। □

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

চায়ের ভাল-মন্দ

আয়ান ম্যাকডাউয়েল ও ফিলিপ উওর

এক কাপ ভাল চা সত্যই তুলনাবিহীন। কিন্তু স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয় যে চা, তার সঙ্গে সাধারণ চায়ের তফাতটা কোথায়? ভাল চায়ে থাকা বিশেষ রাসায়নিক বস্তুটা কি?

চীনদেশের গুল্ম ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস (camellia sinensis) থেকে তিন রকম চা এসেছে। একটি হলো কালো গাঁজানো চা (black fermented tea), যা সারা পৃথিবীর চায়ের ৭৫ শতাংশ। দ্বিতীয়টি হলো সবুজ না-গাঁজান (green unfermented), যা আসে চীন, জাপান ও তাইওয়ান থেকে। তৃতীয়টি হলো উলং (oolong) চা, যা আসে চীন ও তাইওয়ান থেকে। ব্যবসা হিসাবে চায়ের ব্যবসা খুবই বড়; ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীতে ২·৪ লক্ষ টন (০·৫ লক্ষ টন সবুজ ও ১·৯ লক্ষ টন কালো) চা তৈরি হয়েছিল। কালো চায়ের বেশির ভাগ ভারতে ও সবুজ চায়ের বেশির ভাগ জাপানে উৎপন্ন হয়। কালো চা পাঁচ পর্যায়ে ও সবুজ চা চার পর্যায়ে প্রস্তুত হয়। চা-পাতা চয়ন করার পর তাকে হাওয়ার স্রোতে রাখা হয় ৪ থেকে ১৮ ঘণ্টা। এতে পাতার জলীয় ভাগ ৬০ শতাংশ কমে যায়, যার ফলে পাতাকে ভিজিয়ে নরম করা (maceration) সহজ হয়। সবুজ চাকে এই অবস্থায় শুকানো হয় না, কিন্তু প্রথমে জলীয় বাষ্পে উৎসেচক নষ্ট করে শুকানো হয়। ভিজিয়ে নরম করায় কালো পাতার কোষগুলি ভেঙে গিয়ে ক্যাটেচিনস্ (catechins), উৎসেচক (enzymes) ও হাওয়া মিশে যায়। এই প্রক্রিয়ার ওপর চায়ের গুণাবলী নির্ভর করে। দার্জিলিঙের চাকে এমন যন্ত্রে নরম করা হয়, যা প্রায় হাতে করার মতো। আরও আধুনিক পদ্ধতি—সি. টি. সি.-তে (CTC—crush, tear and curl) চায়ের পাতার আয়তন কমানো হয়, যাতে ছোট করা পাতাগুলি থেকে কাথ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। এর পরে গাঁজানো হয়। এই গাঁজানোতে মদ তৈরির মতো কোন ইস্ট (Yeast) ব্যবহৃত হয় না। একটি উৎসেচক—পলিফেনল অক্সিডেজ এই কাজ করে এবং এর ফলে থিয়াফেল্গভিনস্ ও থিয়ারুবিগিনস্ (Theaflavins and Thearubigins) তৈরি হয়। সি. টি. সি. চা গাঁজাতে লাগে ৯০ মিনিট, কিন্তু গুটানো চা-পাতা প্রায় ছ-ঘণ্টা গাঁজাতে হয়। সবশেষে অবশ্য সব চাকেই শুকাতে ও বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করতে (grading) হয়। কালো চা ও সবুজ চায়ে রঙ ও সুগন্ধ কেন হয়, সেটা বোঝা সহজ নয় এবং সাম্প্রতিককালেই তা কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে। চা-উৎপাদকরা কফি ও মদ্য-উৎপাদকদের মতো পেশাদারী আস্বাদক (professional taster) রাখেন এবং এই আস্বাদকরা ঘণ্টায় প্রায় ৫০ ধরনের চা আস্বাদন করে মতামত দিতে পারে। তবে উৎপাদকরা এখন ভাল চায়ের বিশেষ রাসায়নিক বস্তুর খোঁজে আছেন। চায়ের ভাল ফ্লেভার (flavour—গন্ধ ও স্বাদ) আসে দার্জিলিঙ এবং শ্রীলঙ্কার চা থেকে। কালো চায়ে থিয়াফেল্গভিনস্ ও থিয়ারুবিগিনস্ তৈরি হয় গাঁজানোর সময়। এখন জানা গেছে যে, চার রকমের থিয়াফেল্গভিনস্ আছে এবং এদের প্রকৃতিগত তারতম্যের ওপর চায়ের স্বাদ ও রঙ-এর পরিবর্তন নির্ভর করে, যাকে পেশাদারী আস্বাদকরা 'ঔজ্জ্বল্য' (brightness), 'প্রাণবন্ত ভাব' (briskness), 'জীবন্ত ভাব' (aliveness) ও 'তাজা ভাব' (freshness) প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। কালো চায়ের এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে থিয়ারুবিগিনস্। এর জন্য আস্বাদকদের ভাষায় চায়ের 'রঙের ঘনত্ব' (depth of colour), 'শরীর' (body), 'সম্পদ' (richness) ও 'পূর্ণতা'

(fullness) নির্ভর করে। গাঁজানোর সময় বাড়ালে চায়ে থিয়ারুবিগিন্‌স বাড়ে ও থিয়াফেল্ভিন্‌স কমে। এদুটির আদর্শ অনুপাত যে কি সেটাই এখন প্রশ্ন। তবে গাঁজানোর পরেও যে সামান্য ক্যাটেচিন্‌স থেকে যায়, তার অবদানও সামান্য না হতে পারে। উপরি-উক্ত দ্রব্যগুলি চায়ে থেকে যায় এবং উবে যায় না। দামী চায়ের যে সুগন্ধ, তা কিন্তু নির্ভর করে উদ্বায়ী (volatile) কিছু দ্রব্যের ওপর। সুগন্ধ চা জন্মায় শ্রীলংকা ও দার্জিলিঙের ১২০০ মিটার উচ্চতায়। অনেকে জানেন না যে, এই চায়ের সুগন্ধ আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। ঠান্ডা, শুষ্ক, পরিষ্কার, কড়া আবহাওয়ায় দিনের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী এবং রাতের তাপমাত্রা ৬'১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হলে সুগন্ধি চা জন্মে। চায়ে সৌরভ আনে এমন বস্তুটির পরিমাণ শুকনো চায়ের ক্ষেত্রে ০'২ শতাংশ, কখনো বা ০'০২ শতাংশ মাত্র। অর্থাৎ এক কাপ চায়ে গন্ধকারক বস্তুটির পরিমাণ দশ লক্ষের একভাগ। কয়েকটি উঁচুদরের চায়ে (যেমন চীনদেশের এবং তাইওয়ানের উলং চায়ে) যে যুঁই ফুলের গন্ধ থাকে, তার রাসায়নিক বস্তু মিথাইল এপিজেসমোনেট, যার পরিমাণ এক লক্ষ কোটিতে ০'৫ অংশ মাত্র। দার্জিলিং চায়ে ফুলের গন্ধের পরিমাণ আসাম চায়ের ঐ গন্ধের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি। দামি চা নির্ভর করে গন্ধের ওপর—স্বাদের ওপর নয়। চায়ের কোষ্ঠবদ্ধতা আনার ক্ষমতা এবং কষা স্বাদের (astringency) কারণ হলো ক্যাটেচিন ও থিয়াফেল্ভিনে থাকা 'গ্যালো' (gallo) নামক রাসায়নিক দ্রব্য। চায়ে দুধের প্রোটিনের সঙ্গে ক্যাটেচিনের ও থিয়াফেল্ভিনের মিশ্রণে কষাভাব কমে।

গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে যে, চায়ের যে মান নির্ণয় (grading) করা হয় তার সঙ্গে ফ্লেভারের কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীলংকার চা কে অরেঞ্জ পিকো, ফ্লাওয়ারি পিকো, ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো, ব্রোকেন পিকো, ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো, ফ্যানিংস এবং ডাস্ট—শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এই শ্রেণীবিভাগ কেবল পাতার আয়তন ধরে। 'পিকো' কথাটি এসেছে চীনদেশের 'পি-হো' (Peh-ho) থেকে, যার অর্থ পাতার ওপর সাদা দাগ হওয়া। কিন্তু এখন 'পিকো' কথার অর্থ দাঁড়িয়েছে চা-পাতার একটি বিশেষ আয়তন।

কোন চা-গাছ থেকে সবচেয়ে ভাল চা পেতে হলে পাতা-চয়নকারীদের কুশলী হতে হবে। সাধারণতঃ চা-গাছ থেকে দুটি পাতা এবং একটি কলি (bud) সমেত শিষ চয়ন করা হয়। তিন বা তার বেশি পাতা থাকলে চায়ের মান নিচু হয়ে যায়। অরেঞ্জ পিকো একটি বিশেষ মানের চা। ফ্লাওয়ারি পিকোর চায়ে অনেকগুলি কলি থাকে, কিন্তু তার সুগন্ধ সবচেয়ে বেশি হয় ঋতুর একটি বিশেষ সময়ে। কিন্তু আগে বলা হয়েছে, চায়ের মান নির্ণয় করা হয় পাতার আয়তনের ওপর এবং সুগন্ধ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। বাজারে যে কালো চা বিক্রি হয় তাতে ছোট আয়তনের পাতা ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো এবং ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো ফ্যানিংস-ই (broken orange pekoe fannings) প্রধান। চীনদেশের সবচেয়ে সুগন্ধি চা হচ্ছে নানা রকমের উলং চা, যার একটির নাম কিনুম (Keenum)। তবে চীনে বিভিন্ন গন্ধের কালো ও সবুজ চাও আছে। চীনের পশ্চিমাংশে উন্নানে ১৭০০ বছর ধরে চা চাষ হয়ে আসছে, তবে সেখানে কালো চা তৈরি হচ্ছে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই চা কতকটা আসাম চায়ের মতো।

চায়ে অনেক সময় নানা গাছের সুগন্ধি নির্যাস (essential oils) মিশানো হয়—যেমন বার্গামট (bergamot—নাসপাতি ধরনের ফল), লেবু, গোলাপ, অলিভ অয়েলের গন্ধ প্রভৃতি। ব্রিটেনে সবচেয়ে প্রিয় গন্ধের চা হলো আর্ল গ্রে (Earl grey), যাতে বার্গামটের খোসার রস প্যাকিং করার আগে চায়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য অনেক চায়ে নানা ফুলের (যেমন ক্রিসেন্থিমাম, দারুচিনি, লবঙ্গ) পাপড়ি অথবা রোজমেরি গুল্ম বা পেপারমিন্ট মিশিয়ে দেওয়া হয়।

অর্থাৎ এক কাপ ভাল চা সত্যিই চমৎকার জিনিস, তবে 'ভাল চায়ের' ব্যাপারটি খুব সোজা নয়।* □

* প্রবন্ধটি New Scientist, 11 January 1992, pp. 30-33 থেকে সংকলন ও অনুবাদ করেছেন ডঃ জগদীশকুমার সরকার।—যুগ্ম সম্পাদক

গ্রন্থ-পরিচয়

সার্ধ-শতবর্ষের আলোকে সন্ত

জীবন মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব (প্রতিবেদন) : সম্পাদক—কৃত্তিবাস প্রভুদাস। দেবমন, ৪৬/১ বি, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০। মূল্য : পঁচিশ টাকা।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ : প্রেম-প্রজ্ঞা ও নিন্দা-অবজ্ঞার আলোকে : সংকলক ও সম্পাদক—কৃত্তিবাস প্রভুদাস। দেবমন, কলিকাতা-১০। মূল্য : ষাট টাকা।

বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একটি স্মরণীয় নাম। শান্তিপুরের বিখ্যাত অদ্বৈতবংশের সন্তান বিজয়কৃষ্ণ প্রথম যৌবনেই সত্যানুসন্ধানে রত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশান্ত মূর্তি ও মধুর বাক্যালাপ, তরুণ শিবনাথ শাস্ত্রী ও যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতো জ্বলন্ত চরিত্রের সান্নিধ্য এবং ব্রাহ্মসমাজের উদার সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শ তাঁকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মে পরিণত করে। প্রবল ক্ষুধা তৃষ্ণা, অভাব-অনটন সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রম করে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন। এজন্য প্রবল বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে তিনি পদব্রজে কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম যান। আসামের পথে ক্ষুধার তাড়নায় কর্দম ছেঁকে খেয়ে জীবন রক্ষা করেন। পূর্ববঙ্গের দুর্গম পথে বন্যমহিষের হাতে তাঁর প্রাণ যাবার উপক্রম হয়। পদ্মার ভীষণ স্রোতে তিনি প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। সচ্ছল পরিবারের সন্তান হয়েও সেদিন স্বেচ্ছায় চরম দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন। দিনের পর দিন যেত অনাহারে, শীতবস্ত্র ছিল না। অনেকদিন আহার ছিল কেবলমাত্র ভাত আর তেঁতুলগোলা জল। সত্যানুসন্ধানী বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন নির্ভীক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মুখের ওপর তিনি বলেছিলেন : "যে-জীবন ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়াছি, সে-জীবন মনুষ্যের দাসত্ব করিবে ?"

পরবর্তী কালে অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ, ব্রাহ্ম আচার্যদের উপবীত গ্রহণ ও সংস্কৃতের পরিবর্তে বাঙলা মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি প্রশ্নে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন তরুণদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ বাধে। কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলে বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন তার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। এই 'সত্যধর্মে'র' আকর্ষণেই আবার তিনি কেশবচন্দ্রের সান্নিধ্য ত্যাগ করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হন। এতেও তাঁর প্রাণ ভরেনি। সত্যানুসন্ধানী বিজয়কৃষ্ণ গয়ার কাছে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে নানকপন্থী সাধক শ্রীব্রহ্মানন্দ পরমহংসের কাছে দীক্ষালাভ করেন। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও অন্যান্য মহাপুরুষদের সান্নিধ্যও তিনি লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর মধুর ও প্রেমময় সম্পর্ক ছিল। বিজয়কৃষ্ণের শ্বশ্রূমাতা মুক্তকেশীদেবীকে বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, বিজয়কৃষ্ণ হলেন "ভক্তির ভাণ্ডারী, তাঁর নিকট হতে প্রেমভক্তি লাভ করে ধন্য হও।" গুরু কেশব সেন ও শিষ্য বিজয়কৃষ্ণের বিবাদকে তিনি "শিব ও রামের যুদ্ধ" বলে অভিহিত করতেন। তিনি বলতেন : "যুদ্ধও হলো, দুজনে ভাবও হলো, কিন্তু শিবের ভূত-প্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো, এদের ঝগড়া কিচিমিচি আর মেটে না।" 'কথামৃতে'-র পাতায় এসব কথা ছড়িয়ে আছে।

বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাবের সার্ধ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচ্য গ্রন্থদুটি প্রকাশিত হয় এবং দুটি গ্রন্থের কোনটিই তাঁর জীবনী নয়। তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা বাংলা জুড়ে—

এমনকি ভারতের নানা অংশ ও ভারতের বাইরেও নানা স্থানে বিপুল উদ্দীপনা সহকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়। প্রথম গ্রন্থটি হলো তারই প্রতিবেদন। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, সুন্দরীমোহন দাস, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মৃণালকান্তি বসু, নরেন্দ্রনাথ শেঠ, মাখনলাল সেন, প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, দেবপ্রসাদ ঘোষের মতো কৃতী ব্যক্তিরা এইসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সম্পাদক কৃত্তিবাস প্রভুদাস সেযুগের আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রকাশিত সংবাদের রিপোর্ট, সম্পাদকীয় ও বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সংকলন করেছেন। কেবলমাত্র তাই নয়, 'উত্তরা', 'উজ্জ্বল ভারত', 'মন্দির' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এধরনের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর। গ্রন্থের প্রকাশিকা জানিয়েছেন যে, বিজয়কৃষ্ণের শতবার্ষিকী উৎসবকালে "পঞ্চাশ বছর আগে কি হয়েছিল, আর পঞ্চাশ বছর পরে বিজয়কৃষ্ণ-প্রেমীরা কি করছেন—তাঁরা কতখানি এগিয়েছেন বা পিছিয়েছেন, একটা নিখুঁত রেকর্ডের ভিত্তিতে তা সকলকে জানানো এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।" বলা বাহুল্য, প্রকাশিকার এই উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে।

ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৩৬২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত মোট ৩০৩ জন ব্যক্তির বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় নেতা, ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃমণ্ডলী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন জীবনীকার, যথা ত্রৈলঙ্গস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণ, ভোলা গিরি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে শুরু করে অতি সাম্প্রতিক কালের হরিপদ ভৌমিক পর্যন্ত বহু ব্যক্তির রচনা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর সব রচনাই নিছক প্রশংসা নয়—নিন্দা-সমালোচনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—সবই এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থটি জীবনী নয়, তবুও বিজয়কৃষ্ণের জীবনীর প্রচুর উপাদান এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণ-শিষ্য দেশনায়ক মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের কোন রচনা সন্নিবিষ্ট হয়নি, অথচ 'Soul of India', 'Memories of My Life and Times' এবং 'যুগের মানুষ বিজয়কৃষ্ণ' ও 'Saint Vijaykrishna Goswami' গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। মনে হয় পরবর্তী খণ্ডে এগুলি যুক্ত হবে। কঠোর পরিশ্রম ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা ব্যতীত এ-জাতীয় গ্রন্থ সংকলন সম্ভব নয়। সংকলক ও সম্পাদক কৃত্তিবাস প্রভুদাসকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থটির ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

ধর্ম-জিজ্ঞাসার নানা প্রসঙ্গ

পলাশ মিত্র

ধর্ম জিজ্ঞাসা : বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী। পরিবেশক : প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম। ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য : বারো টাকা।

কালী প্রতিমার তাৎপর্য, তন্ত্রদর্শনের বৈজ্ঞানিকতা, উপাস্যের বৈচিত্র্য, শিবলিঙ্গ-তত্ত্ব, প্রতিমা পূজার আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনা এবং ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি-সহ নিজস্ব অনুভূতি-মণ্ডিত মতামত লেখক আলোচ্য গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। লেখকের ভাবনা-চিন্তায় নিরাবেগ যুক্তিবাদী মানসিকতা সবসময়েই সক্রিয় থেকেছে। এই গ্রন্থ পাঠ করে জিজ্ঞাসু পাঠক তৃপ্তি পাবেন আশা করা যায়। গ্রন্থের প্রকাশমান সাধারণ স্তরের। □

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ অনুষ্ঠান

কোয়েম্বাটোর (তামিলনাড়ু) আশ্রম: কোয়েম্বাটোর শহরের আশপাশের ২৯টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একদিনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাহিত্য-বিষয়ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। তাছাড়া কোয়েম্বাটোর জেলার বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের নিয়ে একদিনের একটি আলোচনাচক্রও অনুষ্ঠিত হয়।

ভুবনেশ্বর আশ্রম স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ স্মরণে গত ২৫ জুলাই ও ১৮ সেপ্টেম্বর দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ১৮ সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উড়িষ্যার শিক্ষামন্ত্রী সি. পি. মাঝি। স্কুল-কলেজের বহু ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ, মেদিনীপুর: গত ৭ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সারদাত্মানন্দের স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। পরবর্তী দুদিন সারাদিনব্যাপী আলোচনা-সভা, পাঠ, ভজন, জপ-ধ্যান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী গৌতমানন্দ, স্বামী শান্তিদানন্দ, স্বামী শেখরানন্দ ও স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। ৮ ও ৯ অক্টোবর সান্ধ্য অধিবেশনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন যথাক্রমে নয়ন দাস ও অসিত সাহা। সম্মেলনে আবাসিক ও অনাবাসিক মিলে মোট ১৫০ জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর **হায়দ্রাবাদ আশ্রমে** এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এন. জনার্দন রেড্ডি শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী লিখিত 'ইটারন্যাল ভ্যালুস ফর চেঞ্জিং সোসাইটি' (৪ খণ্ড) এবং 'মেসেজ অব দ্য উপনিষদস' ইংরেজী গ্রন্থের তেলেগু ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন।

উদ্বোধন

গত ৯ আগস্ট **রাজমুন্দ্রি আশ্রম** পরিচালিত রামপচোদভরম গ্রামে উপজাতি-সেবাকেন্দ্রে একটি আলট্রামডার্ন স্ক্যানার যন্ত্রের উদ্বোধন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের আইনমন্ত্রী ডি. কে. সমরসিংহ রেড্ডি।

মাদ্রাজ সারদা বিদ্যালয়ের নবনির্মিত একটি প্রার্থনাগৃহের উদ্বোধন করা হয় গত ১৬ সেপ্টেম্বর।

ছাত্র-কৃতিত্ব

আলং (অরুণাচলপ্রদেশ) রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারী এ্যাডুকেশন পরিচালিত ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের 'স্টেট মেরিট লিস্ট ফর ট্রাইবাল ক্যান্ডিডেট' পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে।

নরোত্তমনগর (অরুণাচলপ্রদেশ) আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র উক্ত বোর্ড পরিচালিত ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান এবং অরুণাচলের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে।

শিক্ষক-কৃতিত্ব

আলং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক রাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়ে 'গভর্নরস এ্যাওয়ার্ড—১৯৯২' লাভ করেছেন।

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত মাদ্রাজ সারদা বিদ্যালয়ের একজন সঙ্গীত-শিক্ষিকা ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের জন্য 'তামিলনাড়ু রাজ্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' পুরস্কার লাভ করেছেন।

চিকিৎসা-শিবির

পোনামপেট (কর্ণাটক) আশ্রম গত ১২ সেপ্টেম্বর এক চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। বিভিন্ন বিভাগে মোট ২৫৭ জন রোগীকে ঐ শিবিরে চিকিৎসা করা হয়।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ 'কল্যাণ' নামক সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পুরুলিয়া জেলার

সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রান্নাকরা খাবার, ত্রিপল, পলিথিনের শীট প্রভৃতি বিতরণ করেছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো)ঃ গত অক্টোবর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। তাছাড়া তিনি প্রতি শুক্রবার সোসাইটির পুরনো মন্দিরে যোগসূত্রের ক্লাস নিয়েছেন। গত ৬ অক্টোবর মহানবমীর দিন সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি, ধ্যান-জপ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে দেবী দুর্গার পূজা করা হয়। পূজান্তে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটনঃ গত অক্টোবর মাসের রবিবারগুলিতে এই সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এবং মঙ্গলবারগুলিতে তিনি 'দ্য গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

গত ৩ ও ৪ অক্টোবর সকালে দেবী দুর্গার পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজার পর ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয় এবং উপস্থিত ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইসঃ অক্টোবর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবারগুলিতে যথাক্রমে 'মাণ্ডুক্য উপনিষদ্' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ দ্য গ্রেটমাস্টার'-এর ক্লাস নিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ। তাছাড়া ৩ অক্টোবর সকালে দেবী দুর্গার পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউ ইয়র্কঃ গত অক্টোবর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ এবং প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার যথাক্রমে ভগবদ্গীতা ও 'দ্য গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

গত ২৩ আগস্ট সিঙ্গাপুর আশ্রমে একটি হলঘরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

গত ৪ সেপ্টেম্বর স্বামী গহনানন্দজী ফিজি আশ্রমের বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে একটি নবনির্মিত অডিটরিয়ামের উদ্বোধন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে ফিজির শিক্ষামন্ত্রী তোফা বকতালে এবং বিরোধী দলের নেতা জয়রাম রেড্ডি যোগদান করেছিলেন।

দেহত্যাগ

স্বামী স্মরহরানন্দ (অচ্যুতন) গত ২০ সেপ্টেম্বর বেলা ১১-৩০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। গত ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি বুকের অসুখ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

স্বামী স্মরহরানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি কেরালার ওট্টাপালেম আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাঞ্চিপুরম (তামিলনাড়ু) আশ্রমে অতিবাহিত করেন। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি ঐ কেন্দ্রের প্রধান হন। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে নেট্টায়াম, আলসুর, বারাণসী সেবাশ্রম প্রভৃতি কেন্দ্রে বাস করেছেন। ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি বেলুড় মঠে বাস করছিলেন। সদা প্রফুল্ল ও অমায়িক এই সন্ন্যাসী সকলেরই প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ২৬ সেপ্টেম্বর শুভ মহালয়ায় উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বিশ্বজননী শ্রীমা সারদাদেবী' (শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম থেকে দক্ষিণেশ্বরে আগমন) নামে একটি অডিও ক্যাসেটের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন স্বামী নির্জরানন্দ। ঐ দিন স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জন্মতিথি উপলক্ষে মহারাজ একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান-শেষে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শঙ্কর সোম।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনাঃ প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। ☐

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৫ এপ্রিল শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মস্থান হুগলী জেলার **ময়াল-ইছাপুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-রামকৃষ্ণানন্দ** আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী, অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী দেবদেবানন্দ, স্বামী অমেয়ানন্দ, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ উৎসবে যোগদান করেছিলেন। ঐদিন দুপুরে প্রায় চারহাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় উপস্থিত সন্ন্যাসিবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা নিয়ে আলোচনা করেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার **ও সেবাশ্রম, বলাই চক (হুগলী)** গত ২ ও ৩ মে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণোৎসব উদ্‌যাপন করেছে। প্রথম দিন নানা প্রতিযোগিতা-মূলক অনুষ্ঠান ও বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। দ্বিতীয় দিন প্রশ্নোত্তরের আসর সহ নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের আসর পরিচালনা ও বৈকালিক ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সনাতনানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, শেখ হাসান ইমাম, তরুণ বসু ও মথুর দাঁ। ঐদিন সাতহাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাখালচণ্ডী (উত্তর ২৪ পরগনা) গত ১ মে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। সকালে পল্লী-পরিক্রমা, হরিনাম সংকীর্তন, দুপুরে পূজাদির পর একসহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের উপর আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ ও স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। সভার পূর্বে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুজিতকুমার গুপ্ত। সন্ধ্যারতির পর পালাকীর্তন পরিবেশন করেন কাজলরানী বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, বড়জাগুলি (নদীয়া) গত ১৭ এপ্রিল সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৭তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। দুপুরে তিনশো জন ভক্তকে বসিয়ে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয়। এক অনুষ্ঠানে এগারো জন সঙ্গীত প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ধর্মসভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক ডঃ গৌরাঙ্গ চৌধুরী ও স্বামী অম্বিকেশানন্দ। বক্তব্য রাখেন ডঃ পার্থব্রত ঘোষ ও কৃষ্ণা ভৌমিক।

গত ১০ মে **কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের যুবশাখা** কর্তৃক এক যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি থেকে মোট সাতাশি জন ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে যোগদান করেছিল। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় অভিভাবক ও শিক্ষকদের আলোচনাসভা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ।

উত্তর বাকসাড়া (হাওড়া) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র গত ২৫ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও পাঠচক্রের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি-উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। ঐদিন বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দের পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন বরুণকুমার ভট্টাচার্য। উদ্বোধন সঙ্গীত ও প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন দুলালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার কেন্দ্র, বহড়াগোড়া (বিহার) গত ২১ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম জন্মোৎসব এই ভাবপ্রচার কেন্দ্রে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌-যাপিত হয়। এই উপলক্ষে পূজা, পাঠ, নগর-পরিক্রমা, ধর্মসভা ও গীতিনাট্যের আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ, কালীপদ সিদ্ধাচার্য ও বিনায়ক ঝা। শঙ্কর সোমের পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী প্রচার

সন্ধ্য "পঞ্চবটীর ভগবান" ও "বিশ্বজননী জগদ্ধাত্রী মা সারদাদেবী" গীতিনাট্য পরিবেশন করে। ২৩ মার্চ দুপুরে প্রায় একহাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রানিয়া-কুলটুকারী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা): গত ১২ এপ্রিল এই আশ্রমে উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম জন্মোৎসব পালিত হয়। মঙ্গলারতি, উষা-কীর্তন, প্রভাতফেরী, কথামৃত ও পুঁথিপাঠ, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। বিকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী চেতসানন্দ, প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী শিবনাথানন্দ। সন্ধ্যাবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-আলেখ্য পরিবেশন করে নিবেদিতা বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। এই উপলক্ষে প্রায় একহাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

কোহিমা (নাগাল্যান্ড) রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর উদ্যোগে গত ১১ এপ্রিল শনিবার স্থানীয় দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে দিবসব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনশোরও বেশি সংখ্যক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সুমেধানন্দ। সন্ধ্যারতি ও আরাত্রিক ভজনের পর অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।

বহির্ভারত

গত ১২ জুন, ১৯৯২ বাংলাদেশের খুলনা জেলার **কৈলাসগঞ্জ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ রায়। প্রধান অতিথি ছিলেন কৈলাসগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ননীগোপাল মণ্ডল, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাগেরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সহাধ্যক্ষ স্বামী কৃপারূপানন্দ। বক্তব্য রাখেন গৌরাঙ্গপ্রসাদ রায়, পরানচন্দ্র মণ্ডল, জয়সেন বড়ুয়া, কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল প্রমুখ। সভান্তে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং 'ভক্ত প্রহ্লাদ' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

পরলোকে

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগিণী **ক্যাথারিন হোয়াইটমার্শ** ৯৪ বছর বয়সে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টাবারবারায় পরলোকগমন করেন। ভক্তমণ্ডলীর নিকট তিনি 'প্রসন্না' নামে পরিচিত ছিলেন। পাশ্চাত্যে সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন শেষ ব্যক্তি, যিনি স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করেছিলেন।

প্রসন্না পারিবারিক সূত্রেই বিবেকানন্দ-বেদান্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা থিওডোর হোয়াইটমার্শ স্বামীজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। স্বামীজী তাঁর চারটি যোগ-গ্রন্থের প্রকাশনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হোয়াইট-মার্শকে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে স্বামীজী নিউ ইয়র্কের স্টেশন রীজের রীজলি মেনর-এ মিস্টার লেগেটের গৃহে অতিথি হিসাবে থাকার সময় তাঁর প্রাত্যহিক ভ্রমণকালে তিনি খেলায় রত শিশু প্রসন্না ও তার ভাই কার্লকে দেখতেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দৌড়াদৌড়ি খেলা উপভোগ করতেন। দুজনের মধ্যে যে বিজয়ী হতো স্বামীজী তাকে একটি পেনি পুরস্কার দিতেন। স্বামীজী প্রসন্নাকে কোলেও নিয়েছিলেন। স্বামীজীর 'বন্ধু' মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ছিলেন প্রসন্নার আত্মীয়া ('great aunt')। ম্যাকলাউডের চরিত্র তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রসন্না দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ৮০ বছর বয়সে স্বামী নিখিলানন্দের অনূদিত 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটির 'কনকরড্যান্স' প্রস্তুত করেছেন। প্রসন্নার বদান্যতা ও বন্ধুত্ব করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ভক্তিমতী প্রসন্না পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের কার্যাবলীর একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন।

গত ১ বৈশাখ ১৩৯৯ ভোর ৫টায় শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর কৃপাধন্যা ও মন্ত্রশিষ্যা **শিবানী মিত্র** ৮৮ বছর বয়সে (জন্ম ১ চৈত্র, ১৩১০) পরলোকগমন করেছেন। শিবানী দেবী ছিলেন বলরাম বসুর দৌহিত্রী কৃষ্ণময়ীর কন্যা। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কন্যার মতো আলাপ করা ও তাঁর সঙ্গে 'কিন্নরী' নাটক দেখার সৌভাগ্যলাভ তাঁর হয়। জীবনের শেষদিন

মায়ের আশীর্বাদী নির্মাল্য বুকে ধরে ইষ্টনাম জপ করতে করতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শৈশবে তিনি দাদামশায়ের গৃহে বেশ কিছুদিন কাটান। সেই সময় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু সাধু মহারাজের সংস্পর্শে তিনি আসেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষালাভ করেন। তিনি তখন অবিবাহিতা। তাঁর স্বামী (১২ বছর আগে প্রয়াত) ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত। তাঁর শৈশব যে ধর্মীয় পরিবেশে কেটেছে তার স্মৃতি তাঁর বার্ধ্যকের সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দিয়ে তাঁকে এক অপার আনন্দে নিমগ্ন রেখেছিল।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের কৃপাধন্যা **ব্রহ্মচারিণী ভূষণমাতা** বাঁকুড়া জেলার কংসাবতী নদীতীরস্থ কেলাতি শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ৬ এপ্রিল রাত্রি ৬টা ৫০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি বাল্যাবধি সাধন-ভজন-পরায়ণা এবং সাধুভক্ত ও আর্তজনের সেবায় নিবেদিতপ্রাণা ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। পূর্বাশ্রম সম্পর্কে তিনি স্বামী অনঘানন্দের সহোদরা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **দ্বারিকানাথ মল্লিক** ৯ এপ্রিল সকালে কাঁকড়াদাড়া গ্রামে ৮১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী এবং হোমিওপ্যাথ ছিলেন। পূর্বে উল্লেখিত ভূষণমাতার তিনি অন্যতম সহোদর ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **সুখময়ী মজুমদার** গত ১৯ এপ্রিল, ১৯৯২ বেলা ১২-১৫ মিনিটে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল স্টেশন রোডে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ধর্মপ্রাণা এবং হিতৈষিণী হিসাবে তাঁর খুব সুনাম ছিল। উল্লেখ্য যে, তাঁর স্বামী প্রয়াত দুর্গাপ্রসন্ন মজুমদারও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বেলুড় মঠের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

গত ২১ মার্চ বেলা দুটো নাগাদ **অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল** ৭৪ বছর বয়সে বিনা রোগভোগের পর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অধ্যাপক ঘোষাল বাংলাদেশের পাবনা জেলার স্থলগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন। পদস্থ সরকারি কর্মচারী হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন বাদেই সরকারি কর্ম থেকে পদত্যাগ করে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। দীর্ঘ বাইশ বছর যোগ্যতার সঙ্গে তিনি বিভাগীয় প্রধানের পদে বৃত থেকে ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে নরেন্দ্রপুর কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি একক প্রচেষ্টায় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-জিজ্ঞাসার মুখপত্র হিসাবে 'আলেখ্য' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করতে থাকেন। প্রথমে দ্বৈমাসিক ও পরে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে এই উচ্চমানের পত্রিকাটি মূলতঃ তাঁরই একক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অপরিসীম অবদান রেখেছে। 'চিত্রভানু' ছদ্মনামে তাঁর রচিত কাব্যনাটক 'যযাতি', 'দশরথ', কাব্যগ্রন্থ 'সময় কঠিন সূত্রধার' এবং 'চণ্ডরীক' ছদ্মনামে তাঁর রচিত 'প্রগতি রহস্য' নাটকটি বিদগ্ধ মহলে সমাদৃত হয়েছিল। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে পাঠক, লেখক এবং শুভানুধ্যায়ী হিসাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উদ্বোধন-এ প্রকাশিত তাঁর মননঋদ্ধ প্রবন্ধ পাঠকমহলে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। □

সংশোধন

গত ভাদ্র সংখ্যায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদের (পৃষ্ঠা ৪১১) ২য় কলামের 'উদ্বোধন' শিরোনাম সংবাদের ৩য় লাইনে 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-স্মৃতি ভবন' স্থলে 'বিরজানন্দ-স্মৃতি ভবন' হবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

চেষ্টা করলে করোনারি অসুখের প্রতিরোধ কি সম্ভব?

ফিনল্যান্ডে সম্প্রতি মধ্যবয়স্কদের হৃৎপিণ্ডের করোনারি অসুখের (Coronary heart disease) প্রতিরোধ ব্যাপারে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা (trial) হয়েছে, তার ফলাফল করোনারি অসুখ প্রতিরোধে সচেষ্ট ব্যক্তিদের সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছে। এই ধরনের পরীক্ষায় একভাগ রোগীর জীবনযাত্রা ধারায় হস্তক্ষেপ করা হয়, খাওয়া-দাওয়ার নিয়ন্ত্রণ করে বা ওষুধ খাইয়ে। এই ভাগকে বলা হয় 'ইন্টারভেনশন গ্রুপ' (intervention group)। অন্য সমসংখ্যক সমগোত্রীয় রোগীদের ওপর ঐরূপ করা হয় না, যাদের বলা হয় কন্ট্রোল গ্রুপ (control group)। ফিনল্যান্ডের এই পরীক্ষায় পাওয়া গেছে যে, পরীক্ষাকাল শেষ হবার পরের দশ বছরে ইন্টারভেনশন গ্রুপের রোগীদের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের অসুখ-জাত বা অন্যান্য কারণে মৃত্যুর হার কন্ট্রোল গ্রুপের চেয়ে বেড়ে গেছে। শুধু তাই নয়; আরও দেখা গেছে যে, কোলেস্টেরল বৃদ্ধির জন্য ওষুধ ব্যবহারের ফলে অ-হৃৎপিণ্ডজাত কারণে মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে গেছে।

ফিনল্যান্ডের এই পরীক্ষা ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে এই পরীক্ষায় ১২২২ জন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আধিকারিক (business executives), যাঁদের হৃৎপিণ্ডের বা রক্তপ্রণালীর অসুখ (Cardiovascular disease) হবার এক বা একাধিক কারণ (যেমন রক্তচাপ বৃদ্ধি, রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি ইত্যাদি) ছিল, তাঁদের দুভাগ করা হয়েছিল— একভাগ ইন্টারভেনশন, অন্যভাগ কন্ট্রোল। ইন্টারভেনশন গ্রুপের রোগীদের নিয়মিত পরীক্ষা করা হতো, তাদের খাওয়া-দাওয়া, ব্যায়াম ও ধূমপান বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হতো এবং তাদের উচ্চ রক্তচাপ বা রক্তে বেশি কোলেস্টেরল থাকলে তার চিকিৎসা করা হতো। শুরু হওয়ার পাঁচ বছর পরে হস্তক্ষেপ করা বা ইন্টারভেনশনের অবসান হয়। তবে ইতিমধ্যেই অর্থাৎ এই পাঁচ বছরেই দেখা গেল যে, ইন্টারভেনশন গ্রুপের রোগীদের করোনারি অসুখে মৃত্যুর হার প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে; কিন্তু অ-মারাত্মক হৃৎপিণ্ডের অসুখ (যেমন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন—Myocardial infarction) এবং হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য অসুখ আরও বেড়ে গেছে এদের মধ্যে।

পরীক্ষার আওতায় আনা সকল রোগীকেই আরও দশ বছর নজরে রাখা হয়েছিল। ইন্টারভেনশন গ্রুপের রোগীদের এই পনেরো বছরে দেখা গেল যে, এদের যেকোন কারণে মৃত্যুহার, হৃৎপিণ্ডের অসুখ-জনিত মৃত্যুহার এবং দুর্ঘটনাজনিত কারণে বা অন্যান্য হিংসাত্মক কারণে মৃত্যুর হার বেশি হয়েছে।

যদিও ফিনল্যান্ডের পরীক্ষায় ইন্টারভেনশন গ্রুপের রোগীদের মধ্যে করোনারি অসুখে মৃত্যুর হার এই প্রথম বেশি পাওয়া গেছে, অন্যান্য এই ধরনের সব পরীক্ষায় যে ঐ গ্রুপের মৃত্যুর হার কম পাওয়া গিয়েছিল তা নয়। ৬১,০০০ লোকের ওপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W.H.O.) এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, ইন্টারভেনশন গ্রুপের লোকের ছয় বছরে করোনারি অসুখে মৃত্যুর হার কমেনি।

হয়তো ধূমপান কমানো, খাদ্যের মাধ্যমে রক্তে কোলেস্টেরল কমানো প্রভৃতি ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করলে ফল আরও ভাল হয়। অস্লোতে যে-পরীক্ষা (Oslo study) হয়েছিল সেখানে রোগীদের খাদ্যে ৪৪ শতাংশ চর্বি ছিল; রক্তে কোলেস্টেরল খুব বেশি (প্রতি মিলিলিটারে ৭·৫—৯·৮ মিলি মোল) ছিল। সাড়ে আট বছরে এদের করোনারি অসুখে মৃত্যুর হার অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। এই একমাত্র পরীক্ষা যার ফল খুব আশাজনক হয়েছিল। এক্ষেত্রে রোগীর খাদ্যে চর্বি খুবই সীমিত (পলি-আনস্যাচুরেটেড : স্যাচুরেটেড = >১·০) করা হয়েছিল।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, যতদিন না এই ধরনের অন্যান্য সমস্ত পরীক্ষার ফল না জানা যায়, ততদিন ফিনল্যান্ডের এই অপ্রত্যাশিত ধরনের ফল দেখে আমাদের শিখতে হবে যে, বিপদের সম্ভাবনায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের রক্তে কোলেস্টেরল কমালে যে-কোন কারণে মৃত্যুর হার কমবে না এবং অ-হৃৎপিণ্ড-জাত কারণে মৃত্যুর হার বাড়তে পারে। ☐

[**British Medical Journal, 15 February, 1992, pp. 393-394**]

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে।... প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির মৃত্যুও ঘটে।... যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

এন্টিফ্লজিস্টিন
কার্বাঙ্কল, ফোঁড়া, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া
বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া

যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয় চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য এমনকি জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি।... ধর্ম অনুসরণ কর, তোমরা গৌরবান্বিত হইবে; ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চিত।

স্বামী বিবেকানন্দ

মানুষ মূর্খের মতো মনে করে—স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে পারে। বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে না; জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে, সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন।... তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভালকাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

RAMAKRISHNA MISSION INSTITU
LIBRARY

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয় ? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন ? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন ?

স্বামী বিবেকানন্দ

We shall spend no time arguing as to theories and ideals, methods and plans. We shall live for the good of others ; we shall merge ourselves in struggle. The battle, the soldier and the enemy will become one.

Sister Nivedita

He who served and helped one poor man seeing Siva in him, without thinking of his caste, creed or race or anything, with him Siva is more pleased than with the man who sees Him only in image.

Swami Vivekananda

পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

কত সৌভাগ্যে এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটু সময় করে নিতে হয়।… জপ-ধ্যান করতে করতে দেখবে উনি (ঠাকুর) কথা কবেন, মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুণি পূর্ণ করে দেবেন—কি শান্তি প্রাণে আসবে!

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

জগতের ইতিহাস হইল—পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস। আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—অনুভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাত। যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

অমৃতকথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

The only God to worship is the human soul in the human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of temples. If I cannot worship in that, no other temple will be of any advantage.

Swami Vivekananda

লোকে অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করেছি—তাঁর (ভগবানের) ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলক ধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলেই ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্রবিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন বৃথা।

স্বামী বিবেকানন্দ

নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতেই সমগ্র ধর্ম নিহিত। আমি যখন 'মনুষ্যত্ব-লাভের বা মানুষ-গড়ার ধর্ম'—এই শব্দ-কয়টি ব্যবহার করি, তখন আমি ঐগুলির দ্বারা কোন পুস্তক, অনুশাসন বা মতবাদের কথা বুঝি না। যে-ব্যক্তি সেই অনন্ত সত্তার এতটুকুও তাহার অন্তরে অনুভব করিয়াছে বা ধারণা করিয়াছে, আমি তাহার কথাই বলি।

স্বামী বিবেকানন্দ

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেততুল্য ; কারণ যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত ; প্রেত বই আর কি ? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক···। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ, অনন্ত শক্তি আসিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র ৯৪তম বর্ষ পৌষ ১৩৯৯ (ডিসেম্বর ১৯৯২) সংখ্যা

♣ ♣

সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ আশ্বিন থেকে পৌষ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ ত্রিশ টাকা ☐ সডাক ☐ পঁয়ত্রিশ টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা

উদ্বোধন

পৌষ, ১৩৯৯ | ডিসেম্বর ১৯৯২ | ৯৪তম বর্ষ—১২শ সংখ্যা

দিব্য বাণী

নরেন হলো ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি… তাঁর কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করাবেন বলে নরেনকে দিয়ে এসব করাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

কথাপ্রসঙ্গে

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর বিশ্ব-পরিক্রমার প্রেক্ষাপট

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগ। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার উদগ্র বাসনায় বরানগর মঠ হইতে প্রব্রজ্যায় বাহির হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি কি তখন জানিতেন, এই হইয়াছে, তিনি যেন নিশ্চিত ছিলেন তাঁহার গরিমাময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, আবার কখনও কখনও মনে হইয়াছে, তিনি যেন দ্বিধাগ্রস্ত, হতাশার তটরেখায় যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুইজনের কোন সন্দেহ ছিল না। কালের প্রস্তরফলকে তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে দেখিয়াছিলেন তিনি পৃথিবীর বুকে নবযুগের উদ্বোধন-বাণী ঘোষণা করিতে দৈবনির্দিষ্ট। একজন শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি প্রায় অন্তিম নিঃশ্বাসের সঙ্গে স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেনঃ **"নরেন শিক্ষে দিবে। যখন ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে।"**

নরেন্দ্রনাথ যে নবযুগ উদ্বোধনের বার্তাবহ সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না আরেকজনেরও। তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর

ভারত-পরিক্রমার এবং অবশেষে বিশ্ব-পরিক্রমার? পরিক্রমার সূচনা হইয়াছিল কলিকাতা হইতে। দীর্ঘ সাড়ে ছয় বৎসর পর উভয় গোলার্ধ পরিক্রমা করিয়া স্বামীজী যখন কলিকাতার বুকে পা রাখিলেন তখন যুদ্ধজয় হইয়াছে, বিরোধী-পক্ষের দুর্গশীর্ষে গৈরিক পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। এই পতাকা কোন ব্যক্তির নহে, একটি দেশের, একটি জাতির, একটি সংস্কৃতির, একটি আদর্শের। বস্তুতঃ, ইহা ইতিহাসের একটি 'ফেনোমেনন'—একটি মহাঘটনা। ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নহে, তবে একথা অবশ্যই বলা যায় যে, এই মহাঘটনার পটভূমি হিসাবে প্রব্রজ্যার সংকল্প গ্রহণ করিয়া স্বামীজীর নিষ্ক্রমণের এবং ভারত-পরিক্রমার একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রহিয়াছে।

আমরা বলিতেছিলাম, যখন তিনি নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন তখন কি তিনি অবহিত ছিলেন তাঁহার অনাগত পাশ্চাত্য-গমন সম্পর্কে, তাঁহার ভাবী কৃতিত্ব সম্পর্কে? জানিতেন, আবার জানিতেনও না। কখনও কখনও তাঁহার কথায় মনে

তাঁহারা ছিলেন বিষণ্ণ এবং উদ্দেশ্যহীন। অপর দিকে তাঁহারা হইয়াছিলেন সমাজের চোখে অবিশ্বাস, লাঞ্ছনা ও বিদ্রূপের পাত্র এবং স্বজনবর্গের চোখে মতিভ্রমগ্রস্ত কয়েকটি বালক। তাঁহাদের নেতা নরেন্দ্রনাথও তখন দ্বিধাগ্রস্ততা স্পষ্টভাবে কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। তখন সেই ক্রান্তি-মুহূর্তে তাঁহার এবং তাঁহাদের সম্মুখে আশার আলোকরেখা দেখাইলেন সারদাদেবী। বলিলেনঃ সাধারণ সন্ন্যাসীদের মতো জীবন কাটাইবার জন্য তাঁহারা আসেন নাই, তাঁহারা এক মহান ভাবান্দোলনের সূত্রপাত, যে-ভাবান্দোলন সমগ্র পৃথিবীকে দিবে নূতন প্রভাতের প্রতিশ্রুতি। আর নরেন্দ্রনাথকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, তিনিই সেই ভাবান্দোলনের প্রধান নায়ক। বর্তমানের পথ, সামনের পথ কঠিন ও বন্ধুর, কিন্তু সেই পথ ধরিয়াই তাঁহাকে চলিতে হইবে, চালাইতে হইবে তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের। সমালোচকের কটূক্তি সমাজের উপেক্ষা ও পীড়ন যতই কঠোর হউক,

স্বজনবর্গ তাঁহাদের জীবনব্রত সম্পর্কে যতই অবজ্ঞা দেখাক, তিনি যেন বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁহাদের গুরুদেব তাঁহার সম্পর্কে যাহা বলিতেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া একদিন প্রমাণিত হইবেই।

এই সহানুভূতি, এই প্রেরণা, এই আশ্বাস, এই উৎসাহ নরেন্দ্রনাথকে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর স্থাপন করিল। প্রেরণার অগ্নিতে উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ শুরু করিলেন ভারত-পরিক্রমা। তিনি বলিয়াছেন: "ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিলাম। উদ্দেশ্য—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা।··· হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত··· সেই তরুণ দলটি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।··· তারপর ভাবিলাম, ভারতবর্ষে চেষ্টা করিয়াছি,এবার অন্য দেশে করা যাউক। এমনি সময় আপনাদের [শিকাগো] ধর্মমহাসভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল।··· আমি এদেশে [আমেরিকায়] আসিলাম।" (দ্রঃ বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১৬৬-১৬৯)

স্বামীজীর "আমার জীবন ও ব্রত' ভাষণে উপরি-উক্ত কথাগুলি এবং উহাদের পূর্ববর্তী অংশ পাঠ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের (১৬ আগস্ট, ১৮৮৬) পর যে-ঘটনাবর্তের মধ্য দিয়া স্বামীজী এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে চলিতে হইয়াছিল তাহার কিছু সুস্পষ্ট আভাস আমরা পাই। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের আদিযুগের সঙ্কটের রূপ, তাহার স্থপতিগণের বিশ্বাস ও সংগ্রামের গভীরতা ও তীব্রতার আকার, নূতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য যে মূল্য তাঁহাদের দিতে হইয়াছিল তাহার পরিমাণ—সমস্ত কিছুর ইতিবৃত্ত সংহত হইয়া রহিয়াছে ঐ কথাগুলিতে। রহিয়াছে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং পরিশেষে বিশ্ব-পরিক্রমার পটভূমির সঙ্কেত। রহিয়াছে অপ্রকাশ্য কিন্তু মূলে ও সর্বাংশে প্রবলভাবে অনুভূত এবং সক্রিয় শ্রীমা সারদাদেবীর উপস্থিতি ও ভূমিকার ইঙ্গিত। বস্তুতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের মহিমা সম্পর্কে স্বামীজীর গভীর বিশ্বাস এবং উহার প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁহার ব্যাকুল আগ্রহের পশ্চাতে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর শ্রীমায়ের নিজস্ব অনুভূতির প্রভাব। সেই অনুভূতি কিরূপ ছিল তাহা শ্রীমা নিজেই বলিয়াছেন: "কামারপুকুরে যখন ছিলুম বৃন্দাবন থেকে আসবার পর,তখন··· একদিন দেখি কি সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আগে আগে (ভূতির খালের দিক থেকে), পিছনে নরেন, বাবুরাম, রাখাল, সব যত ভক্তেরা—কত লোক! দেখি কি ঠাকুরের পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে—এই জলের স্রোত!" স্থানটি যোগীন-মাকে দেখাইয়া শ্রীমা পরে বলিয়াছিলেন: "ঐ অশ্বত্থগাছের গোড়ায় ঠাকুর তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন। শেষে দেখলুম, ঠাকুর নরেনের দেহে মিলিয়ে গেলেন।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সং, পৃঃ ১৪৮, ১৪৯ : পাদটীকা) এই দর্শনের কথা স্বামীজী জানিতেন। শ্রীমায়ের এই দর্শন হইয়াছিল ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধের পরে কোন সময়।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে মার্চের শেষে শ্রীমা বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি দেখিলেন দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘজীবন, ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শকে সেই সন্ন্যাসীরা কিভাবে সঙ্ঘজীবনের মাধ্যমে প্রোজ্জ্বল রাখিয়াছেন। বুঝিলেন, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শকে প্রচার করিবার জন্য প্রয়োজন অনুরূপ একটি সঙ্ঘের। তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইল এক ব্যাকুল প্রার্থনা—শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণ যেন একটি সঙ্ঘের মাধ্যমে সংগঠিত করেন তাঁহাদের আচার্যের আদর্শ ও ভাবান্দোলনকে, যে-সঙ্ঘ পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে বহুশত বর্ষ নিয়োজিত থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়াছেন, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার ত্যাগী পার্ষদদের, তাঁহাদের মধ্যে জগৎ যেন পায় এক-একজন শ্রীরামকৃষ্ণকে।

বুদ্ধগয়া হইতে শ্রীমা কলিকাতায় ফিরেন ঐ বৎসর এপ্রিলের গোড়ায় এবং বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করেন। স্বামীজীও ঐ সময়ে গাজীপুর, বারাণসী ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। শ্রীমায়ের সঙ্গে ঐ সময় তাঁহার নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং শ্রীমা তাঁহাকে নিশ্চিতভাবে তাঁহার প্রার্থনা এবং সংগঠিতভাবে সঙ্ঘের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছিলেন। ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার আকাঙ্ক্ষার কথা, স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বক্ষণের এবং অন্তিম লগ্নের আকুতির কথা যে, তাঁহার সন্তানগণ যেন ভালবাসার নিগূঢ় বন্ধনে নিরন্তর আবদ্ধ থাকে এবং জগৎকল্যাণে তাঁহারা যেন নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। বলিয়াছিলেন, সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহারই মধ্যে এবং তাঁহারই

মাধ্যমে কর্ম করিবেন, সে-কথাও। অবশ্য ইহা আমরা অনুমান করিতেছি, তবে অনুমান যে ভিত্তিহীন নহে তাহা বরানগর মঠ হইতে বারাণসীর প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত স্বামীজীর ২৬ মে ১৮৯০ তারিখের পত্র হইতে বেশ বুঝা যায়।

এই সময় স্বামীজীর মনে হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের মহান আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শকে দেশে ও দেশান্তরে প্রচারের পূর্বে কঠোর তপস্যা ও সাধনার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন, তিনি দীর্ঘ প্রব্রজ্যায় বাহির হইবেন, জগৎকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য আত্মজ্ঞানের সাধনা করিবেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত আর ফিরিবেন না। স্থির হইল, জুলাই মাসের মধ্যভাগে তিনি প্রব্রজ্যায় বাহির হইবেন। সঙ্কল্প স্থির হওয়া মাত্র প্রথমেই স্বামীজীর মনে আসিল শ্রীমায়ের কথা। তাঁহার আশীর্বাদ লইতে হইবে। শ্রীমা তখন বেলুড়ে ঘুষুড়ি অঞ্চলে একটি ভাড়াবাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী সেখানে গিয়া তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন: "মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই।" শ্রীমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন: "সে-কি!" স্বামীজী বলিলেন: "না, না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ৯ম সং, পৃঃ ৭৪) শ্রীমা বলিলেন: "বাবা, তোমার মাকে দেখে যাবে না?" স্বামীজী উত্তর দিলেন: "মা, আপনিই আমার একমাত্র মা।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ২২১) স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন তিব্বত ও হিমালয় ভ্রমণে অভিজ্ঞ গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ। প্রব্রজ্যাকালে অখণ্ডানন্দজীও তাঁহার সহযাত্রী হইবেন। শ্রীমা অখণ্ডানন্দজীকে বলিলেন: "বাবা, তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলাম; তুমি পাহাড়ের সকল অবস্থা জানো—দেখো যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয়। (ঐ; স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ৬৫) বিদায় লইবার সময় শ্রীমা স্বামীজীকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। শ্রীমায়ের আশীর্বাদ মাথায় লইয়া স্বামীজী দীর্ঘ পরিব্রাজক-যাত্রায় বাহির হইলেন। রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়, "তাঁহার পক্ষ তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া গেল।" (Life of Vivekananda, 1979, p. 16) বস্তুতঃ, ইহা ছিল সর্ব অর্থেই তাঁহার 'মহানিষ্ক্রমণ'। কারণ, অল্পদিনের মধ্যেই উহা তাঁহার বিখ্যাত ভারত-পরিক্রমায় রূপলাভ করে এবং অবশেষে উহা সমাপ্তি লাভ করে বিশ্ব-পরিক্রমায়।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থান পর্যটন করিয়া স্বামীজী আসিয়া পৌঁছাইলেন ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে কন্যাকুমারিকায়। ইতঃপূর্বে অনেকেই তাঁহাকে শিকাগো বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে যোগদান করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তিনি নিজেও মাঝে মাঝে ভাবিয়াছেন যোগদান করিবার কথা। কন্যাকুমারিকায় ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে ধ্যানাসনে বসিয়া তিনি স্থির করিলেন সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তিনি যাইবেন সুদূর আমেরিকায়। মাদ্রাজে স্বামীজীর অনুরাগিবৃন্দ স্বামীজীর পাশ্চাত্য গমনের জন্য কিছু অর্থসংগ্রহও করিয়াছিলেন। সেই অর্থ স্বামীজীকে অর্পণ করা হইলে স্বামীজী কিন্তু দ্বিধায় পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল: "আমি নিজের খেয়ালে চলছি না তো? উৎসাহে গা ভাসিয়ে দিইনি তো? যেরূপ ভেবেছি এবং যেরূপ পরিকল্পনা করেছি, তার ভেতর কোন সত্য আছে তো?" তিনি প্রার্থনা জানাইলেন: "মা, তোমার কি ইচ্ছা বল। মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।" স্বামীজী 'মায়ের আদেশে'র অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই 'মা' অবশ্যই জগজ্জননী, কিন্তু 'মায়ের আদেশ' যেভাবেই আসুক তাহার সহিত যে শ্রীমা যুক্ত থাকিবেন ইহা স্বামীজীর চিন্তায় অবশ্যই ছিল। প্রব্রজ্যা-সূচনার প্রাক্কালে তাঁহার আশীর্বাদ তিনি গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন এই দৃষ্টি লইয়াই। তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, কাহারও মাধ্যমে শ্রীমায়ের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে কোন নির্দেশ আসিবে। কিন্তু যখন কোন 'আদেশ' বা 'ইঙ্গিত' আসিল না তখন স্বামীজী তাঁহার মাদ্রাজের যুবক অনুরাগিবৃন্দকে বলিলেন: "বৎসগণ, আমি মায়ের অভিপ্রায় তাঁরই কাছে জেনে নিতে বদ্ধপরিকর। এ তো অন্ধকারে ঝম্পপ্রদান ছাড়া আর কিছু নয়, অতএব মাকে প্রমাণ করতে হবে যে, এ তাঁরই ইচ্ছা; যদি তাঁরই ইচ্ছা হয় তবে অর্থ আপনা থেকেই আবার আসবে। অতএব ঐ টাকা নিয়ে যাও এবং গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।" ('যুগনায়ক', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩০)

স্বামীজীর নির্দেশ পালিত হইল। ইহার

পর হইতে স্বামীজীর মধ্যে একটি বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি আরও অন্তর্মুখী হইয়া গেলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিয়াছেন: "মনের অন্তরতম প্রদেশে ডুবিয়া গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগজ্জননীর শ্রীচরণে আলোকলাভ ও পথের সন্ধানের জন্য [তিনি] আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। ঐকালে তাঁহার গভীর ধ্যানপরায়ণতাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।··· অশেষ প্রতিভাশালী সন্ন্যাসী তখন যেন অসহায় বালকের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া মায়ের আহ্বানের অপেক্ষা করিতে থাকিলেন, আর হৃদয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিলেন, মায়ের ডাক অবশ্যই আসিবে; এক সুদৃঢ় সংকল্প তাঁহার মনে জাগিয়া রহিল— মায়ের অভিপ্রায় মায়েরই কাছে না জানিয়া কোনরকম সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না।" (ঐ, পৃঃ ৩৩১)

ইতোমধ্যে বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। একদিকে অস্থির উদ্বেগ, অন্যদিকে ঐকান্তিক ধ্যান-প্রার্থনায় স্বামীজীর দিন কাটিতেছে। একদিন রাত্রিতে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার একটি দর্শন হইল। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে বিস্তৃত মহাসমুদ্র। তাহার তীরে দণ্ডায়মান শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সমুদ্রে নামিয়া পদব্রজে অপর তীরাভিমুখে চলিয়াছেন এবং স্বামীজীকে ইঙ্গিত করিতেছেন তাঁহাকে অনুসরণ করিতে। অতঃপর তিনি শুনিলেন একটি অশরীরী বাণী: "যাও"। নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরম শান্তি এবং আনন্দে স্বামীজীর প্রাণ-মন পূর্ণ হইল। বুঝিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতে ঐভাবে নির্দেশ দিলেন। স্বামীজী নব-উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইলেন। (ঐ পৃঃ ৩৩৭)

কিন্তু ইহার পরেও স্বামীজীর মনে আবার দ্বিধা আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিতে লাগিলেন—তাঁহার 'দর্শন' কি সত্য—উহা নিছক স্বপ্ন নহে তো? এই চিন্তা স্বামীজীকে আকুল করিয়া তুলিল। ঠিক সেই সময়েই তাঁহার মনে পড়িল শ্রীমায়ের কথা। তিনি তো জগন্মাতার চেতন বিগ্রহ এবং শ্রীরামকৃষ্ণেরও অপর সত্তা। তৎক্ষণাৎ স্বামীজী তাঁহার ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য পাশ্চাত্য-গমনের অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া শ্রীমাকে পত্র লিখিলেন এবং জানিতে চাহিলেন, উহা তাঁহার অভিপ্রেত কিনা। প্রায় দীর্ঘ দুই বৎসর পর তাঁহাদের 'সর্বস্ব'-এর সংবাদ পাইয়া স্বাভাবিক-ভাবেই শ্রীমা খুব আনন্দলাভ করিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য তাঁহাদের পুত্রাধিক প্রিয় 'নরেন' বহির্বিশ্বে যাইবেন, সে তো খুবই আনন্দের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি কতবার শুনিয়াছেন নরেনের জগৎ-আলোড়নকারী প্রতিভা এবং ক্ষমতার কথা। শুনিয়াছেন, পাশ্চাত্যদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের অনাগত সমাদরের কথাও। কিন্তু মা হইয়া কিভাবে তিনি পুত্রকে সমুদ্রপারে যাইতে অনুমতি দিবেন? "মাতৃস্নেহ এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের মধ্যে" এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। চরম উদ্বেগ লইয়া রাত্রিতে শুইয়া আছেন তিনি। অকস্মাৎ তাঁহার একটি দর্শন হইল। তিনিও দেখিলেন: শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রের তরঙ্গের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন এবং নরেন্দ্রকে বলিতেছেন তাঁহাকে অনুসরণ করিতে। সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। পরদিনই স্বামীজীকে পাশ্চাত্যযাত্রা করিতে অনুমতি দিয়া সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করিয়া শ্রীমা পত্র দিলেন। বলিলেন, নরেন্দ্রনাথের পাশ্চাত্যযাত্রা সর্বতোভাবেই শ্রীরাম-কৃষ্ণের অভিপ্রেত। বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে জানাইয়াছেন উহাতে জগতের কল্যাণ হইবে। সুতরাং নরেন্দ্রের ঐ বিষয়ে কোন দ্বিধা-সংশয়ের প্রয়োজন নাই। সেখানে অভূতপূর্ব সাফল্য নরেন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তিনি প্রাণ-ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। ঐ পত্রে তিনি কামারপুকুরে দৃষ্ট তাঁহার পূর্বোক্ত দর্শনের কথাও স্বামীজীকে জানাইয়া দিলেন।

পত্র পাইয়া স্বামীজীর হৃদয়-মন আনন্দে ও আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইল। মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভ করিয়া স্বামীজীর সকল সংশয় ও দ্বিধা চিরতরে দূর হইয়া গেল। তিনি আনন্দে নাচিলেন এবং কাঁদিলেন। সোল্লাসে তিনি বলিয়া উঠিলেন: "আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হলো; মার ইচ্ছা আমি যাই!" (Life of Swami Vivekananda, 1983, p. 383; শ্রীমা সারদা দেবী —স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৮৪, পৃঃ ৩৮১-৩৮২) আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে তিনি অনুগামীদের বলিলেন: "হ্যাঁ, পাশ্চাত্য—পাশ্চাত্য! আমি এখন প্রস্তুত। এসো, আমরা এখন উঠে পড়ে লাগি। স্বয়ং জগন্মাতা বলেছেন!" ('Life', p. 383)

সংকল্প স্থির হইয়া গেল। ভারত-পথিক বিবেকানন্দ বিশ্ব-পরিক্রমায় বাহির হইবেন। স্বামীজী অবশেষে "মায়ের কাছে"ই জানিয়াছেন তাঁহার পরম কাঙ্ক্ষিত "মায়ের অভিপ্রায়", শুনিয়াছেন তাঁহার বহু-প্রতীক্ষিত "মায়ের আহ্বান"।

বিশ্ব-পথিকের এখন শুধু যাত্রার প্রতীক্ষা। □

নিবন্ধ

মা আমার, মা সবার

কৃষ্ণা সেন

ব্রিটিশ শাসন আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত নব্য ভারতীয় সম্প্রদায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হন। ইংরেজরা সেই সময় আমাদের প্রভু এবং সেই কারণেই পদানত জাতির ধর্ম, দর্শন, পুরাণ, মহাকাব্য ইত্যাদি সবকিছুকেই হেয় জ্ঞান করতেন। আমাদের মনেও এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্পন্ন মানসিকতা ছিল একেবারেই ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী। আমরা মনে করতাম, বিজ্ঞানসাধনাই জীবনের একমাত্র কাম্য আর ধর্ম বা ঈশ্বর সেকেলে মনের কুসংস্কার মাত্র।

ক্রমশঃ মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে লাগল। বাইরের জগতের মনীষীরা ভারতীয় বেদ, বেদান্ত, দর্শনের দিকে আগ্রহী হলেন। পাশ্চাত্য জগতের ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হলো প্রাচ্যে। পাশ্চাত্য যা গ্রহণ করে প্রাচ্য তাকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। রামমোহন, কেশবচন্দ্রকে পাশ্চাত্য সম্মান দিয়েছিল। এরপর এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী প্রাচ্যের যাকিছু মহৎ, যাকিছু সুন্দর তা বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে ও ভাষায় তুলে ধরলেন পাশ্চাত্যের সামনে। পাশ্চাত্যের মনীষীরা বুঝতে পারলেন, ভারতেও এমন অনেক কিছু আছে যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবারে তাই নতুন গবেষণা শুরু হলো যা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে চায়। ঈশ্বরকে একেবারে অস্বীকার করতে বেশির ভাগ মানুষই অক্ষম। এমন অনেক কিছু মানুষের জীবনে আকস্মিকভাবে এসে উপস্থিত হয়, যখন বৈজ্ঞানিক মনের পক্ষেও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা মুশ্কিল হয়ে পড়ে। তাই বিজ্ঞানের সত্য ও ধর্মের ঈশ্বরের সমন্বয় সাধন করলে যেন একটা পূর্ণত্বের উপলব্ধি আসে। কোন কিছুকে জানার নাম জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানকে সম্যক্ উপলব্ধির দ্বারা জীবনে প্রয়োগ করা হলো বিজ্ঞান। আজ বিজ্ঞান যত অগ্রসর হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকেরা তত তাঁদের সংখ্যা, পদার্থ, রসায়নের মধ্য দিয়ে ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পারছেন। "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু" সবার মধ্যেই রয়েছে এক অবিচ্ছিন্ন সূত্র। বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়ে দেখছেন, কি এক অদৃশ্য হাতের খেলায় গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডল এবং মনুষ্যজীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ঈশ্বর বা কোন অদৃশ্য নিয়ন্তায় বিশ্বাস করতেই হবে।

এই অদৃশ্য নিয়ন্তা বাজীকরের মতো আমাদের জীবনকে পরিচালনা করছেন। বিপথগামী মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে দিতে, পৃথিবীকে গ্লানিমুক্ত করার উদ্দেশে তিনি নেমে আসেন ধরার বুকে বারবার—"সবার নিচে সবার কাছে সবহারাদের মাঝে" তাঁর আসন হয় পাতা। আবার যুগে যুগে আমরা দেখি চৈতন্য ও শক্তির মিলন। রামচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন সীতা, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা, বুদ্ধদেবের সঙ্গে যশোধরা, চৈতন্যের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া। এযুগে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদা। রামকৃষ্ণদেব নিজেই সারদার সম্বন্ধে বলেছিলেন: "ও আমার শক্তি।" চণ্ডীতে আছে:

"এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥"

—হে রাজন্, সেই ভগবতী জন্মাদিশূন্য হলেও বারে বারে এইভাবে আবির্ভূত হয়ে জগতের পালন করেন। এই দেবী একাধারে শক্তি এবং মা। তিনি ভক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী আবার পাপাচারীর দণ্ড-

বিধাত্রী। ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে দেবী স্বর্গের ঐশ্বর্য ছেড়ে মর্তের মৃত্তিকায় অবতরণ করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখছেন: "শ্রীমায়ের জীবনে আমরা দেবীর এই অবতরণ-ধারারই চরম পরিণতি দেখিতে পাই। দেবী এখানে সাক্ষাৎ, সচলা, রক্তমাংসের দেহবিশিষ্টা—শ্রীরামকৃষ্ণের পূজিতা ভবতারিণী ও স্বীয় গর্ভধারিণীর সহিত অভিন্না—শ্রীমা।" ষোড়শীপূজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সাধনার ফল, জপের মালা ইত্যাদি সবকিছুই সারদাদেবীর পাদ-পদ্মে অর্পণ করেন। উপযুক্ত আধার না হলে কারও পক্ষে এই পূজা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক শক্তি ঠাকুরের সমতুল ছিল বলেই তিনি নির্বিকারভাবে ঠাকুরের পূজা নিতে পেরেছিলেন। পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন বলছেন:

"মা না হলে মহাশক্তি কার হেন গায়ে শক্তি,
লইবেন শ্রীপ্রভুর পূজা।
প্রভু যে পরমেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
সর্বেশ্বর সকলের রাজা।"

নিজের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ রেখে গিয়েছিলেন শ্রীমাকে। দক্ষিণেশ্বরে সারদাদেবীর আগমনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে এক আদর্শ নারীরূপে গড়ে তোলেন। আঠারো বছরের সহধর্মিণীকে ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভাষায় অধ্যাত্মজীবন এবং ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে নানা শিক্ষা দিয়েছেন। সহজ সরল উপমার মধ্য দিয়ে ঠাকুর বুঝিয়েছেন—ঈশ্বর সকলেরই আপনার—চাঁদামামা যেমন সকল শিশুর মামা। তাঁকে ডাকবার অধিকার সকলেরই আছে। ডাকার মতো ডাকতে পারলে তিনি না দেখা দিয়ে পারেন না। সংসারে এসে মানুষ পায় অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা—দেহধারণ করলেই নানা উপসর্গ। একমাত্র নিত্য সত্য ভগবান। তাঁকে যাতে মানুষ বুঝতে পারে, জানতে পারে, সেজন্যেই এবার তাঁর বিশেষ প্রকাশ মাতৃরূপে। কারণ, মা জগতে সকলের চেয়ে আপনার। মায়ের কাছে অকুণ্ঠ শরণাগতিই আমাদের শান্তি দিতে পারে। তবে মাকে ভালবাসতে হবে তিনি আমাদের একান্ত আপন বলে—ভয়ে নয় বা কিছু পাবার আশা নিয়ে নয়—তবেই অন্তর্যামিনী অন্তরে প্রকাশিত হয়ে কোলে টেনে নেবেন সন্তানকে।

মায়ার আবরণে নিজেকে আবৃত করে মহাশক্তি নেমে এসেছেন পৃথিবীর মাটিতে। শ্রীশ্রীমা বলছেন: "বারবার আসা—এর কি শেষ নেই? শিব-শক্তি একত্রে; যেখানে শিব, সেখানেই শক্তি—নিস্তার নেই। তবু লোকে বোঝে না।" লোকে যে বোঝে না তার কারণ তারা মায়ায় বদ্ধ। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি: "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।"—আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না, যোগমায়া দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখি। সারদাও তাই সংসারের মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। রাধুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎকণ্ঠিতা মায়ের আচরণ দেখে সাধারণ মানুষ ভেবেছে মা মায়ায় ঘোর বদ্ধ। শুধু ভাবেইনি, সোজাসুজি তাঁকে বলেছেও। মা দ্ব্যর্থবোধক উত্তর দিয়েছেন: "কি করব মা, নিজেই মায়া।" এ যেন ঈশ্বরী পাটনীকে অন্নপূর্ণার আত্মপরিচয় দেওয়া। নিখিল বিশ্বের সঙ্গে সারদা জড়িয়ে পড়েছেন মায়ার বন্ধনে—তাই মাতৃরূপে তাঁর প্রকাশ। দুর্বৃত্ত আমজাদ থেকে শুরু করে শরৎ মহারাজ পর্যন্ত সকলেই তাঁর সন্তান। 'মা' বলে ডাকলেই হলো। "ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে?"

একবার মহাষ্টমীর দিন ভক্তেরা সবাই মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন—একজন কেবল দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। মা তাকে কাছে ডেকে জানলেন যে, জাতিতে বাগদি বলে সে ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। বিশ্বজননী সেই বাগদিকে ভিতরে এসে পায়ে ফুল দিতে বললেন। জাতপাতের সংকীর্ণতা দূরে গেল—ভক্তের প্রাণের বাসনা হলো পূর্ণ। মায়ের আশীর্বাদ কোন জাতি গোত্রের বাধা মানেনি। বার বার তিনি জাতি গোত্রের গণ্ডি ভেঙেছেন।

এই বাৎসল্যময়ী মানবীই নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা করেছেন সঙ্ঘমাতারূপে। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে তাঁর ভালবাসাতে। তিনি স্বয়ং বলেছেন: "ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসার ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রয় করে সব একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে

পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হলো। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কয়জনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।' তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে।"

মায়ের কথার মধ্যে দিয়েই মায়ের জীবনের পরিচয়। বাসনাই মানুষের দুঃখের মূল কারণ। মা তাই বলেছেন, ঠাকুরের কাছে যদি কিছু চাইতেই হয় তাহলে নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। জীবনের পথে চলতে চলতে কত না সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। এইসব সমস্যা সমাধানের সহজ পথ বলে দিলেন মা: "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।" আমরা তা না করে নিজেদের মতটাকেই সবসময় প্রাধান্য দিই—স্বকীয় ইচ্ছাটাকেই বড় করে দেখি। ফলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

কথায় বলে, মানুষ অভ্যাসের দাস। মানুষের শরীর বা মন সে-অভ্যাসে রপ্ত, তার দ্বারাই সে বশীভূত হয়। জোর করে জপের অভ্যাস করলেও জপমন্ত্রের কাজ কিছু হবেই। ঠাকুর বলছেন: "জলে ইচ্ছে করেই পড় আর কেউ ঠেলেই ফেলে দিক—কাপড় ভিজবেই।" অভ্যাস করতে আরম্ভ করলে মন ক্রমশঃ ঈশ্বরের দিকে নিবিষ্ট হবে। জপ না করা পর্যন্ত মনে হবে কি একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। আর একটা জিনিসের অভ্যাস জীবনে বড় প্রয়োজন। তা হচ্ছে সহ্য করার অভ্যাস। "পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর ওপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইছে। সন্তোষের সমান ধন নেই, আর সহ্যের সমান গুণ নেই। যে সয় সেই রয়।"

মা সকলেরই সম্মান রাখতেন এবং সম্মান রাখার শিক্ষা দিতেন। কেউ উঠান পরিষ্কার করে ঝাঁটাটা ছুঁড়ে ফেলেছে; মা বললেন: "ও কি গো... যার যা মান্যি, তাকে সেটি দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্যি করে রাখতে হয়...।" আমরা কাজ ফুরোলেই কাজের জিনিসের বা লোকের কথা মনে রাখি না। তখন আর তাদের দিকে তাকাবার সময় নেই—কত সময় অবজ্ঞা করেও চলি।

সন্ন্যাসীদের সামনে স্বামীজী স্থাপন করলেন এক নতুন আদর্শ—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" একই সঙ্গে নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ। শিবজ্ঞানে জীবসেবা। আর্তত্রাণে সন্ন্যাসীদের অংশগ্রহণ অনেকেই কিন্তু সেকালে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা মনে করতেন, সেবাকাজ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও ভাবনার বিপরীত। এই দলে শ্রীমও ছিলেন। মা কিন্তু সন্ন্যাসি-সন্তানদের এই সেবাকাজে বিশেষ প্রীত হন। স্বামীজীর প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত কাশীর সেবাশ্রম ঘুরে দেখার পর মা বলেন, এখানে ঠাকুর সাক্ষাৎ বিরাজিত। মায়ের মত জানার পরে মাস্টারমশায় স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, সেবাকাজের বিরুদ্ধে তাঁর আর কোন আপত্তি নেই।

সামান্য ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়ে মায়ের জীবনদৃষ্টির গভীর ও বিস্ময়কর পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। দেহত্যাগের আগে তাঁর শেষ বাণী: "যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখ না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।" সত্যিকারের মা তিনি, পাতানো মা নন। তাই দুঃখী মানুষের ব্যথা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। জীবনে দুঃখ যেমন সত্য, দুঃখ না থাকাও তেমন সত্য।

তাই পরম আশ্বাসে বরাভয়প্রদায়িনী বলেছেনঃ "চিরদিন কেউ দুঃখী থাকবে না, সব জন্ম কারও দুঃখে যাবে না।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে পার্থসারথি বিদায় নিতে এসেছেন পিতৃস্বষা কুন্তীর কাছে। কুন্তী তাঁকে বলছেনঃ এখন আমাদের বিপদের দিন শেষ হয়ে সম্পদের দিন সমাগত, তাই তুমি বিদায় নিতে এসেছ। কিন্তু এই সম্পদে আমার প্রয়োজন নেই।

"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥"

—আমার যেন সর্বদা বিপদ লেগে থাকে, কারণ যেখানেই বিপদ সেখানেই তুমি। তুমি আমার কাছে এসো, সামনে দাঁড়িয়ে থেকো আমাকে সেই বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্যে। সেজন্যেই আমি বিপদকে চাই।

কবি বলছেনঃ

"দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে বেদনা তাহা জানাক মোরে
চাব না কিছু কব না কথা চাহিয়া রব বদনে হে।"

তোমাকে দেখতে পাওয়া মানেই চিরমুক্তি। দুঃখ ও বিপদের মধ্য দিয়ে যদি সেই দুর্লভ দর্শন আসে, যা আমার মুক্তিপথের সহায়ক, তাহলে সেই বিপদকেই আমি কামনা করি।

"বিপদো নৈব বিপদঃ সম্পদো নৈব সম্পদঃ।
বিপদ্ বিস্মরণং বিষ্ণোঃ সম্পন্নারায়ণস্মৃতিঃ ॥"

—পার্থিব দৃষ্টিতে যা বিপদ তা যথার্থ বিপদ নয়, আবার পার্থিব দৃষ্টিতে যা সম্পদ, সেগুলিও সম্পদ নয়। বিপদ হলো বিষ্ণুকে বিস্মৃত হওয়া আর সম্পদ নারায়ণকে স্মরণ করা। কাজেই অমানিশার গভীর অন্ধকারে আমার হৃদয়ে যদি নারায়ণ-স্মৃতি ফিরে ফিরে জেগে ওঠে তাহলে সেটাই হলো শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আর সুখের নিশ্চিন্ত আরামে থেকে সেই পরম-পুরুষকে যদি মনে করতে না পারি, তাহলে সেটাই হলো সবচেয়ে বড় বিপদ।

মা তাঁর জীবনে পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের সুন্দর সমন্বয় সাধন করে গেছেন। মায়ের জীবন-দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ধর্ম ও কর্মের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। ভগবানকে সামনে রেখে তাঁর উদ্দেশে যেই কোন কর্ম নিবেদন করা হলো, তাই হয়ে উঠলো ধর্ম। চাই শুধু নিষ্কাম আত্ম-নিবেদন, আর সেইসঙ্গে চিত্তের ঔদার্য আর মুক্ত স্বচ্ছন্দ একটি মন। নিবেদিতা মাকে লিখছেন একটি চিঠিতেঃ "আমাদের উচিত তোমার কাছে একান্ত স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে থাকা। অবশ্য কখনো কখনো একটু-আধটু মজাও করব বইকি! বাস্তবিকই, ভগবানের যা-কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই শান্ত, নীরব। গোপনে, অজ্ঞাতে তারা প্রবেশ করে আমাদের জীবনে—যেমন বাতাস ও সূর্যের আলো, যেমন বাগানের মধুগন্ধ ও গঙ্গার মাধুর্য। এইসব শান্ত জিনিসই তোমার তুলনা।" আমাদের সকলেরই কামনা নয় কি নিবেদিতার মতো মায়ের চরণতলে স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে একটু বসা? তবেই তো আমরা পাব সেই স্নেহকোমল হাতের শান্ত স্পর্শ। "জগৎ জুড়ে উদার সুরে" সতত যে আনন্দগান বেজে চলেছে সে-গান তখন গভীরভাবে বেজে উঠবে আমাদের হৃদয়বীণার তারে। আমরা ভুলে যাব স্বার্থ, গ্লানি, হিংসা, দ্বেষ, কলহ। দেবীর প্রসাদে হবে মোহমুক্তি। আমাদের সকলের মধ্যে যে-আত্ম-জ্ঞান ঘুমন্ত অবস্থায় বর্তমান, সেই আত্মজ্ঞান তখন স্বতঃস্বাভাবিকভাবে তার দলগুলি মেলে বিকশিত হয়ে উঠবে। বাইরে থেকে জোর করে কারো ওপর কোন জ্ঞান চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর স্মরণে মননে এই জ্ঞান স্বকীয় অনুভবে পরিণত হয়। মায়ের নাম বেজে উঠুক আমাদের রক্তধারার ছন্দে, ঝঙ্কৃত হোক আমাদের দেহবীণার তারে তারে। নিদ্রায়-জাগরণে, আশায়-আকাঙ্ক্ষায়, ভালবাসায়-ভক্তিতে প্রদীপশিখার মতো অনির্বাণ জেগে থাকুক মধুর আমাদের মায়ের নাম।

কবি বলছেনঃ

"সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ফলে'
রাখব কেঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে রবে নামের মধু—
তোমায় দিব মরণক্ষণে তোমারি নাম বঁধু।"

আমরাও বলি এই কথা আমাদের মাকে। □

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকণিকা

শিবরানী সেন

আমার বয়স এখন সাতাশি। আজ থেকে প্রায় ৭৯-৮০ বছর আগে (১৯১২-১৩ খ্রীস্টাব্দে) আমার যখন সাত-আট বছর বয়স তখন মাকে প্রথম দেখি। আমার মামার বাড়ি বাগবাজারে। আমার দিদিমা প্রায়ই বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে যেতেন মাকে দর্শন করতে। মামার বাড়ি এলে আমিও আমার দিদিমার সঙ্গে 'মায়ের বাড়ী' যেতাম। তারপর শ্রীশ্রীমা যতদিন জীবিত ছিলেন মাঝে মাঝেই বাগবাজারে তাঁকে দর্শন করে ধন্য হয়েছি। তখন বয়স অল্প—মায়ের মহিমা তো কিছুই বুঝতাম না, শুধু মাকে দেখলে, তাঁর কথা শুনলে প্রাণটা জুড়িয়ে যেত। আর মায়ের কাছে গেলেই সবসময় উপরি-পাওনা ছিল মায়ের হাত-ভর্তি প্রসাদ। যতদিন মা সুস্থ ছিলেন, মা নিজের হাতেই প্রসাদ দিতেন। সন্দেশ, ফল কত কী। আমার দুটো ছোট হাতে সব ধরতো না। মায়ের মহিমা বুঝি আর না বুঝি প্রসাদ তো বুঝতাম। মায়ের কাছে যাবার সময় ঐ হাত-ভর্তি প্রসাদের লোভও ছিল।

দিদিমা ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলতেন। সেসব কথা শুনতাম, বুঝতাম না কিছুই। তবে আমাকে তিনি যা বলতেন তার কিছু কিছু এখনো আমার মনে আছে। এখনো তাঁর সেই উজ্জ্বল প্রসন্ন করুণাময়ী মূর্তি চোখের সামনে ভাসছে।

মায়ের কথা ছিল খুব মিষ্টি। সেই মধুমাখা কথা এখনও কানে বাজে। মা একদিন আমাকে বলেছিলেন: "মা, কখনো চুপচাপ বসে থেকো না—কিছু না কিছু কাজ করবে। একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকতে হয়, নইলে অলস মনে নানা বদ চিন্তা এসে ভিড় করবে।" একজন বয়স্ক মহিলাকে মা একদিন বলছিলেন: "যে-রাস্তায় তুমি চলছ, যদি দেখো সে-রাস্তায় কেউ পড়ে গিয়েছে তাকে তুমি তুলে দেবে। পথে পড়ে থাকা কাউকে দেখে কখনো ফেলে যেতে নেই।" তখন ছোট ছিলাম, মায়ের কথার তাৎপর্য বুঝিনি। পথে কিছু পেলে কুড়িয়ে রাখতাম, কিন্তু বয়স যত বাড়ল তত বুঝতে পারলাম, জগজ্জননী কি বলতে চেয়েছেন। তাঁর জীবন-কথা পড়ে বুঝেছি যে, তিনি পথে পড়ে থাকা জিনিস কুড়োতে বলেননি; তিনি বলেছেন আমাদের প্রতিবেশী হোক, চেনা-অচেনা হোক—কেউ যদি চলার পথে পড়ে যায় তাকে বা তাদেরকে যেন আমরা হাত ধরে ঠিক পথে নিয়ে যাই। কারণ, সকলের পথ তো একটাই—ভগবানের দিকে। আমিই শুধু সেই পথে একা হাঁটব, তা কেন হবে? আমি অন্যদেরও, যারা পথভ্রষ্ট তাদেরও, আমার সাধ্যমত টেনে তোলার চেষ্টা করব। এই আদর্শ তো মা তাঁর নিজের জীবন দিয়েই দেখিয়ে গেলেন। পথে পড়ে থাকা কত পাপী-তাপী, আর্ত নর-নারীকে দুহাতে পথ থেকে তুলে নিয়ে নিজের কোলে তিনি স্থান দিয়েছেন। ধন্য তারা—মায়ের সেই পথে-কুড়ানো ছেলে-মেয়ের দল।

মা ছিলেন খুবই লজ্জাশীলা। ছেলেদের বয়স পনেরো-ষোল বছর হয়ে গেলেই মায়ের কাছে সে হয়ে যেত 'পুরুষমানুষ'। পুরো মুখ ঢেকে মা তার সামনে ঘোমটা দিতেন। তিনি বলতেন: "মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ। আব্রু ছাড়া মেয়েদের মানায় না।" একদিন এক অল্পবয়সী সুন্দরী গৃহবধূকে তিনি বলছেন শুনলাম: "সবসময় গায়ে ভাল করে কাপড় বা চাদর জড়িয়ে বাইরে বেরুবে। তাহলে মনে হবে, ঠিক তোমার সঙ্গে কেউ আছে।"

একবার দিদিমা ও আমার বাড়ির আরও কয়েক-জন মিলে 'মায়ের বাড়ী'তে গেছি। দুপুরে প্রসাদ পাব। মায়ের সঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। তখন দেখতাম, মেয়েদের নিয়ে মা একটি ঘরে প্রসাদ পেতে বসতেন। ছেলেরা আরেকটি ঘরে প্রসাদ পেত। পেট ভরে প্রসাদ পেয়েছি সবাই, হাত-মুখও ধোয়া হয়ে গেছে। দেখি, মা খুব ব্যস্ত হয়ে একজনকে বলছেন, আমাদের বাড়ির জন্যে কিছু প্রসাদ পাত্রে করে দিতে। যাঁকে বললেন, সে একটু দেরি করায় মা নিজেই উঠছিলেন খোঁজ করার জন্য। যোগীন-মা বললেন: "মা, তুমি উঠছ কেন? ও হয়তো বাটি-টাটি ধুয়ে নিয়ে আসছে, সেজন্য দেরি হচ্ছে।" তারপর একটু হেসে বললেন: "তোমার বাবার ঘর থেকে কি একরাশ বাসন দিয়েছে যে, তুমি সবাইকে বাটি করে করে প্রসাদ দেবে?" মা মিষ্টি হেসে বললেন: "আহা, বাছারা একটু প্রসাদ পেত তাই।" যোগীন-মা হেসে বললেন: "তোমাকে কি আমরা জানি না? দুনিয়ার সবাইকে পারলে তুমি বসে বসে খাওয়াও। আচ্ছা, তুমি বসো আমি দেখছি।" এই বলে যোগীন-মা উঠে গেলেন এবং প্রসাদ এনে আমাদের দিলেন বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য। মায়ের মুখে ফুটে উঠল গভীর তৃপ্তির হাসি। এখন যখন এই সব কথা ভাবি, তখন মনে হয়, মা জগদ্ধাত্রী জগতের পালন করেন, মা অন্নপূর্ণা জগৎকে ভরণ করেন তাই সকলের জন্য তাঁর চিন্তা।

শ্রীশ্রীমা ছিলেন "রামকৃষ্ণগতপ্রাণা"। তাঁর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, প্রতিটি চিন্তায় ঠাকুর থাকতেন জড়িয়ে। মা আমার মা-দিদিমাকে বলতেন: "জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ঠাকুরকে স্মরণ রেখ। তাহলে কোন কষ্টকে আর কষ্ট বলে মনে হবে না। জীবনে দুঃখ-কষ্ট কার বা নেই? ওসব তো থাকবেই। তাঁর নাম নিলে, তাঁকে আশ্রয় করলে তিনি শান্তি দেবেন; দুঃখ ও কষ্ট তখন আর তোমার ওপর ছাপ ফেলতে পারবে না।"

বাগবাজারের ('মায়ের বাড়ী'তে) ঐ ছোট্ট বাড়িটির মধ্যে মা যেন বিশ্ব-সংসার পেতে বসে থাকতেন। অত ভক্তের আসা-যাওয়ার মধ্যে প্রত্যেকটি কাজ সুষ্ঠুভাবে চলত। বিকাল হলে যোগীন-মা বা গোলাপ-মা মায়ের চুল আঁচড়ে দিতেন। মায়ের মাথায় ছিল একরাশ কালো চুল, আর সে চুল কি সুন্দর। মা নিজে যেমন গভীর ঠিক যেন তেমনি গভীর ঘন মায়ের মাথার চুল। দেখে মনে হতো, আকাশ জুড়ে যেন কালো মেঘ করেছে। তবু তো শেষ বয়সে মায়ের মাথার চুল কমে গেছিল।

মায়ের পা-দুটি ছিল খুব সুন্দর। পায়ের তলায় পদ্মফুলের রক্তাভা। পায়ের গড়নও ছিল খুব সুন্দর। মুখের গড়ন ছিল ভারী মিষ্টি, চোখ, নাক ছিল অপূর্ব। করুণা আর মমতায় মাখা ছিল মায়ের মুখ, মায়ের চোখ দুটি।

একবার মায়ের ভাইঝি রাধুর চোখে কি যেন পড়েছে। সে দৌড়ে এসে শ্রীশ্রীমায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে বলল: "আমার চোখে কি পড়েছে, চোখ জ্বালা করছে। তোমার হাতটা একটু আমার চোখে বুলিয়ে দাও। তাহলেই আমার চোখ ঠিক হয়ে যাবে।" মা সহাস্যে রাধুর মাথাটা তাঁর কোলে আরও কাছে টেনে এনে সযত্নে চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। আশ্চর্য! রাধু বলল: "আমার চোখ ঠিক হয়ে গিয়েছে। আর কিছু নেই চোখে।"

অল্পবয়সী বিধবা মেয়েরা একাদশীতে নির্জলা উপবাস করে থাকবে বা এমনি উপবাস করবে, মা সহ্য করতে পারতেন না। তারা মাথার চুল ছোট করে কাটবে তাও মা চাইতেন না। বয়স্ক বিধবারাও একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করুক, তাও মা চাইতেন না।

মায়ের অনন্ত লীলার কতটুকুই বা বুঝি! যতটুকু দেখেছি, তাও ঠিকমতো লেখা আমার মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও আমার সেই ছেলেবেলায় যা নিজের চোখে দেখেছি, যে-কথাগুলি শুনেছি তার মধ্যে সামান্যমাত্রই মনে রাখতে পেরেছি। আমার সেই দেখা আর শোনার কিছু মুহূর্ত মায়ের কৃপায় 'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকার কাছে পৌঁছে দেবার বাসনায় উপস্থিত করলাম। □

তুমি

বন্যা মজুমদার

আমার হৃদয়পাত্র ভরে রাখ সুধাদানে
তুমি আছ মোর কথায়, তুমি আছ মোর গানে।
যদি তুমি থাক দূরে
তবু আছ হৃদি পুরে',
কাছে থেকে আছ দূর
দূরে রহি আছ প্রাণে।
তুমি থাক অনিমেষে আমার দুটি নয়নে।
স্বপনে তোমারে পাই
জাগরণে মা হারাই
আমার প্রতিটি কর্মে
রয়েছ তুমি সদাই।
তুমি আছ সুখমাঝে
আছ যবে বুকে দুখ বাজে
হৃদয়কমলে হেরি
বিরাজ জ্যোতি-আসনে।
জীবনের সার তুমি, রবে গো সাথে মরণে॥

সবার জননী

গীতি সেনগুপ্ত

জীবনে চলার পথে থাকে নাকো ক্লেশ—
যদি মোরা মনে রাখি 'মার উপদেশ'।
'পরের গুণটা দেখ', 'দেখ নিজ-দোষ'
'বড়ো ধন যদি অল্পে থাকে সন্তোষ'॥
সকলের তরে মার খোলা থাকে দ্বার—
মার কাছে গিয়ে শুধু করি আবদার।
জীবন ঘিরিয়া যত দ্বিধা-লাজ-ভয়,
মার স্মিত মুখখানি আনে বরাভয়॥
মায়ের 'সারদা' নাম সুমধুর অতি,
দশদিক আলোকিত অপরূপ জ্যোতি।
হোক সে দরিদ্র, হোক নাকো ধনী,
সকলেরই তিনি মা—সবার জননী॥

জননী

নন্দিনী মিত্র

উত্তাল তরঙ্গসংকুল সমুদ্রে টালমাটাল হতে হতে
কিছু একটা অবলম্বন ধরতে গিয়ে—
তোমার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে
মনে হলো তুমি তো ছবি নও,
তুমি যে প্রত্যক্ষ।
তুমি তো 'পাতানো মা' নও, তুমি 'সত্যিকারের মা'।
তোমার অগণিত সন্তানের 'মা' ডাকের
মিলিত আকুলতায় আমার কণ্ঠস্বরটিও
মিশিয়ে নির্ভার হতে চাই।
জানি স্থির মনে রঙীন খেলনা
যখন ভাল লাগে না
তখনই তুমি কোলে তুলে নাও।
আমার প্রতিদিনের প্রার্থনা—
'আমায় অহংকারশূন্য কর',
কিন্তু আমি যে ব্রহ্মময়ীকে ডাকার অধিকার পেয়েছি
এই গর্বটুকু আমার রেখো।
পূজাহীন, নৈবেদ্যহীন, সাধনহীন, ভজনহীন
তোমার এই সন্তানের জন্য আছে—
একটিই মন্ত্র,
সে অমোঘ মন্ত্র—'মা'।

অগ্নিশুদ্ধা

মানসী বরাট

এককণা স্ফুলিঙ্গের কর্ম এতো নয়,
হে জননি, সুবিপুল অগ্নি উদ্গিরণে—
ভস্মীভূত করে দাও—
আসমুদ্রহিমাচল যত পাপ—
হয়ে আছে জমা।
জানি বহ্নিহৃদয়ে স্থান কভু—
পায়নি কো ক্ষমা।
তারপর—
ধ্বংসের বেদনা কিংবা
নতুন সৃষ্টির উল্লাসে—
তোমার নয়ন হতে ঝরে পড়া—
অশ্রুজলে—
ভালে নিয়ে বিজয়ের দীপ্ত জয়টিকা
সিক্ত ভস্ম হতে জন্ম নেবে নতুন মৃত্তিকা॥

পরিক্রমা

তোমারি ভুবন মাঝে হে, বিশ্বনাথ

অনুরাধা সাধুখাঁ

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে॥"
(নৈবেদ্য : ১)

সেই 'দাঁড়ানো'র আকুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্যস্থল কেদারনাথ-বদ্রীনাথ। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ হাওড়া থেকে রওনা দিয়েছিলাম দুন এক্সপ্রেসে। ৭ সেপ্টেম্বর এসে নামলাম হরিদ্বারে। সেখানে সন্ধ্যায় গঙ্গার অপূর্ব মাধুর্যপূর্ণ আরতি দেখে নিজের সারা অন্তরটি আনন্দে ভরে গেল। পরদিন সকালে কনখলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অতিথিভবনে বিশ্রাম করে উঠে পড়লাম বাসে। পথে হৃষীকেশ, দেবপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ দর্শন করে শ্রীনগরে রাত্রিবাস করলাম। পরদিন আহারাদির পর আবার বাসে। সামনে রুদ্রপ্রয়াগ। হঠাৎ কানে ভেসে আসে প্রচন্ড জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। এখানে ধীরস্থির শান্ত মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ভয়ঙ্করী অলকানন্দা। আমাদের বাস পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছুটে চলেছে প্রচন্ড গতিতে। পথের পাশে মাঝে মাঝে ঝরনা। রাত কাটল গৌরীকুণ্ডের এক ধর্মশালায়। সকালে প্রায় প্রত্যেকেই লাঠি ভাড়া করে (পাহাড়ে চলতে গেলে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে যার তুলনা মেলা ভার) কেউ পদব্রজে, কেউ ঘোড়ার পিঠে আবার কেউবা ডান্ডি বা কান্ডি ভাড়া করে বেরোলাম। আমাকে নিতে হলো একটি ঘোড়া। হাঁটার অভ্যাস নেই, শরীরের জোর কম, মনের জোর আরও কম। ঘোড়ার সহিস সমস্ত অশ্বারোহীদের বলে দেয়—চড়াইয়ের সময় শরীরের ভার সামনে আর উতরাইয়ের সময় ভার পিছনে রাখতে। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বাচ্চাদের আনন্দের চেয়ে ভয়ই বেশি। ঘোড়ার পিঠে মালের বস্তার মতো নিজেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া কিন্তু মোটেই সুখকর নয়। কেদারনাথজীর নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে অতিক্রম করলাম ৮ কিলোমিটার পথ। এবার রামবাড়া চটিতে বিশ্রাম। মনোরম দর্শনীয় হিমরাশির দৃশ্য দেখে আমাদের দলের সকলে তখন অভিভূত। একটু বিশ্রাম করে আবার ১৪ কিলোমিটার পাহাড়ী পথ। প্রকৃতিদেবীর সৌন্দর্য অবলোকন করতে করতে চটিতে সামান্য আহার করে কিছু শুকনো খাবার সঙ্গে নিয়ে শুরু হলো আবার পথ চলা। পথের শেষে শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্যের মাঝে দূরে নজরে এল ২২,৭৭০ ফুট উঁচু কেদারনাথের তুষারশুভ্র শৃঙ্গ। ঘোড়ায় চড়া সাঙ্গ হলো। তখন আমরা সবাই শ্রান্ত এবং ক্লান্ত, কিন্তু অদম্য উৎসাহে আমাদের মন তখন ভরপুর। সেই উৎসাহে ক্ষীণকায়া মন্দাকিনী সেতু পেরিয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত কেদারনাথজীর দর্শনে উপস্থিত হলাম। চারিদিকে পাহাড়ঘেরা পাথরের কারুকার্য-খচিত এক অতি প্রাচীন মন্দির। সেই বিশাল মন্দিরের পাশেই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। হঠাৎ সন্ধ্যারতির ঘন্টাধ্বনি শোনামাত্র মন্দিরে প্রবেশ করে দেখি, মৃদু আলোয় কেদারনাথজীর অপূর্ব রাজবেশ। বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত, ধূপ-দীপ-ঘৃত-সুবাসিত চন্দনে লিপ্ত বিশাল বিগ্রহ। বনফুলে পূজা ও অঞ্জলি দান করে এক অপার্থিব আনন্দে মন ভরে গেল। বাইরে এসে দেখি মন্দিরের পিছনে আচার্য শঙ্করের সমাধি। জ্যোৎস্নারাতে পাহাড় দেখে মনে হয়, মহাদেব যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন। একসময় আমাদের আশ্রয়স্থলে ফিরে বিছানায় আশ্রয় নিতেই বুঝতে পারলাম, হিমালয়ের শীতের প্রকোপ কত তীব্র, হাত-পা যেন সব বরফ। কোনরকমে রাত কাটিয়ে,

সকালে আবার কেদারনাথ-দর্শন। একি বিগ্রহ দেখি! দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এটি। কিন্তু সচরাচর যে-শিবলিঙ্গের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেরকম কিছু এখানে নেই। কথিত আছে, দেবাদিদেব মহিষের রূপে দর্শন দেওয়া মাত্র যুধিষ্ঠির তাঁকে চিনে ফেলেন। ভীমকে তিনি আদেশ দিলেন মহিষকে ধরতে। শেষকালে মহিষরূপী মহাদেব মাটির মধ্যে ঢুকে পড়ার সময় মহিষের শরীরের যে-অংশটি ভীম চেপে ধরেন সেই অংশটি আজকের কেদারনাথ, দেখতে মহিষের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়।

হঠাৎ এক বৃদ্ধা মহিলা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আমরা তখন তাঁর পরিবারের লোকজনদের জিজ্ঞাসা করি, কেন তাঁকে এই দুর্গম তীর্থে নিয়ে এলেন? তখনই সেই বৃদ্ধা চোখ মেলে বললেন: "মা, শুনেছি এই বিগ্রহ দর্শন ও স্পর্শ করলে, ভক্তিভাবে পূজা করলে কোটি কোটি জন্মের পাপ ধুয়ে যায় এবং তার আর জন্ম হয় না।" কী বিশ্বাস! তাঁর এই কথা শুনে আমাদেরও মনে খুব জোর এল। মন্দাকিনী-সেতু পার হয়ে গৌরীকুণ্ডে গেলাম। শরীরের যাবতীয় কলকব্জাগুলো যেন বিকল হওয়ার যোগাড়! শুধু আমারই নয়, সব যাত্রীরই। পাশেই রয়েছে উষ্ণজলের কুণ্ড। সেখানে সবাই অবগাহন করতে শরীরের সব জড়তা নিমেষে চলে গেল। ঈশ্বরের কী অপরিসীম মহিমা! প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও এই গরমজল! এই কদিনে সব যাত্রীরা যেন একই পরিবারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু হলো। এবার বদ্রীনাথের পথে।

গুপ্তকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে পিপলকোটীতে রাত কাটিয়ে সকালে যাত্রা শুরু করে এলাম যোশীমঠে। এটি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত চার মঠের একটি মঠ। সুন্দর পরিবেশ। চারদিকে পাহাড়, নানা বর্ণের অজস্র ফুল। সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন মনটাকে টেনে নিয়ে যাই আবার বাসে। পথে শুরু হলো বরফবৃষ্টি। জীবনে কখনো বরফ পড়া দেখিনি, সেও এক অপূর্ব ব্যাপার। কিছুক্ষণ পর বরফবৃষ্টি থেমে গেল। এখন চারিদিকে শুধু দুধসাদা বরফের সমারোহ। সেই দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। প্রকৃতি-দেবীর স্বর্গতুল্য সৌন্দর্য অবলোকন করতে করতে শ্বেতশুভ্র হিমরাশির ওপর অলকানন্দা-সেতু পেরিয়ে বদ্রীনাথজীর বিশাল প্রাচীন মন্দির দেখে মনে হলো, কেন চিরপুরাতন হয়েও হিমালয় এত নবীন। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি, মূর্তির ললাটে বিচিত্র হীরক-খচিত মুকুট। বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ-যুক্ত নারায়ণের অপূর্ব প্রস্তর-বিগ্রহ দর্শন করে সবাই কৃত-কৃতার্থ। সন্ধ্যায় আরতি দেখে ফিরে আসি হোটেলে। রাতে বিছানায় শুয়ে মনে হচ্ছিল, হিমালয়ের সব বরফ কেউ বুঝি শরীরে চেপে ধরেছে। রাত বাড়ছিল, সাথে সাথে বাড়ছিল ঝড়ের তাণ্ডব। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দুটি যাত্রিবাহী বাস হোটেলে ঢুকল। পরদিন বাইরে এসে দেখি, আর এক হিমালয়! অনুভব করলাম, সত্যিই চির-নবীন হিমালয় মনের সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। সকালে কাঁচা রোদে হিমালয় তখন স্বর্ণবর্ণ। মনে হচ্ছে রোদে যেন মাখন গলে গলে পড়ছে গাছ-ডাল-পাতা থেকে। এখানেও রয়েছে এক তপ্তকুণ্ড। সবসময় সেখান থেকে গরমজল নির্গত হচ্ছে। সেখানে স্নান করে সব জড়তা দূর হয়ে গেল।

এবার ঘরে ফেরার পালা। আমাদের সাময়িক একান্নবর্তী পরিবার এবার ভেঙে যাবে। এখন যে যার গন্তব্যস্থানের জন্য তৈরি। কিন্তু সকলের মনের মণিকোঠায় এই কয়েকদিনের অপার আনন্দ ও দিব্যভাবের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইল। জীবনে আনন্দের মুহূর্ত তো বেশি আসে না। এই আনন্দের দিব্যমুহূর্তগুলিও শেষ হয়ে এল। কিন্তু তার স্মৃতি কোনদিন হারিয়ে যাবে না আমাদের কারও মন থেকে। মনে মনে ভাবি, এই বা কম কি? তখনই মনে পড়ে গেল কবিগুরুর লেখা সেই বিখ্যাত ছত্রগুলি:

"মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে
তোমার নির্মল ধামে। সেথা ডেকে লবে
সমস্ত আলোক হতে তোমার আলোতে
আমারে একাকী—সর্ব সুখদুঃখ হতে,
সর্বসঙ্গ হতে, সমস্ত এ বসুধার
কর্মবন্ধ হতে। দেব, মন্দিরে তোমার
পশিয়াছি পৃথিবীর সর্বযাত্রী-সনে,
দ্বারমুক্ত ছিল যবে আরতির ক্ষণে।" □

(নৈবেদ্য: ৩৭)

প্রবন্ধ

যুগের আলোকে মা সারদা

রমা চক্রবর্তী

'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া'—হাজার বছরের অজ্ঞান-অন্ধকার মুহূর্তে একটি মাত্র প্রদীপের আলোয় দূরীভূত হয়ে গেল। একটি অমৃতবাণীর মাধুর্যে বিকশিত হয়ে উঠল কু-সংস্কারাচ্ছন্ন হৃদ্‌শতদল—"আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।" দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন মা সারদা—সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সকল সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। বর্তমানে পৃথিবীময় যে যুদ্ধবিগ্রহ, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, অশান্তি তার মূলে আছে ধর্মবিরোধ, ভাষাবিরোধ ও জাতিবিরোধ। এমনকি একুশ শতকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজও ধর্ম, বর্ণ ও জাতিভেদ আমাদের অক্টোপাশের মতন ঘিরে আছে। আজও চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জাতিদাঙ্গা, বর্ণদাঙ্গা, দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি অত্যাচার। তাদের বেদনা, অনুভূতি সমাজের উচ্চস্থানে স্থিত বহু মানুষকে আজও স্পর্শ করে না। জাতপাতের প্রশ্নে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের 'শিক্ষিত' বহু মানুষের সংস্কার আজও কত প্রবল ও দুর্ভেদ্য। আমরা মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে পারি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় আমরা প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারি, কিন্তু এখনো আমাদের অনেকেরই মন সংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত চেতনার অধিকারী হতে পারেনি। এখনো আমরা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের নিরিখে বিচার করতে পারি কি? বরং এই অতি আধুনিক যুগেও আমরা জন্ম, বংশ, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্মের পরিচয়ে মানুষকে চরম অবমাননার মধ্যে ঠেলে দিই, গড়ে তুলি তাদের ও আমাদের মধ্যে এক বিশাল প্রাচীর। কিন্তু সেই উনিশ শতকে এক আক্ষরিক অর্থে শিক্ষাদীক্ষাবিহীন, আভিজাত্য-বিহীন এক পল্লীনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো বিশ্ব-মানবতার বাণী—"আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।" "ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।"

মা কোন সন্তানকেই অস্বীকার করেননি। তাই বিদ্বানের যেমন অধিকার, মূর্খেরও তেমনই অধিকার মায়ের দরবারে। সমাজের নানা স্তর থেকে নানা পেশার মানুষ মায়ের কাছে আসত। কিন্তু জাত-পাতের সংকীর্ণতা তাঁকে কখনো বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি, বরং সকলকে নিজ অঞ্চলে আশ্রয়দান করে সমাজে মাতৃত্বের এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে-ছিলেন তিনি। সকলের প্রতিই তাঁর ছিল স্নেহদৃষ্টি। তাঁর এই অপার অসীম স্নেহ জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো না। সকলকেই তিনি অকাতরে স্নেহদান করতেন। তাই দেখি ঠাকুরের জন্য মুসলমানের আনা কলা কত আনন্দে তার কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করছেন। বলছেনঃ "খুব নেব, বাবা, দাও। ঠাকুরের জন্য এনেছ, নেব বৈকি!" বলছেনঃ "দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা জানে কজনে?"[১] মায়ের অহেতুকী কৃপা কতভাবে যে সকলের ওপর বর্ষিত হতো তার ইয়ত্তা নেই। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমজাদ ছিল মায়ের একান্ত অনুগত সেবক। জ্বরের সময় মায়ের অরুচির জন্য চিকিৎসক আনারস খাওয়ার বিধান দেন। নানা স্থানে অনুসন্ধান করে এই আমজাদই মায়ের জন্য আনারস সংগ্রহ করে।[২]

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৭৯

২ ঐ, পৃঃ ৪৮১

এমনই ছিল মায়ের প্রতি তার ভালবাসা। একবার জয়রামবাটীতে একজন ভক্ত পীতাম্বর নাথ মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন বারান্দায় বসে—ঘরে প্রবেশ করছেন না হীনজাত বলে। বলছেন: "মা, এই-খানেই (বারান্দায়) বসি, আমি হীনজাত।" মা দৃঢ় কণ্ঠে মমতা মাখানো সুরে বললেন: "কে বলেছে তুমি হীনজাত? তুমি আমার ছেলে, ঘরে এসে বস।"[৩] এই ছিলেন আমাদের মা, অনন্ত ভাল-বাসার মূর্ত প্রতীক। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্য তাঁর হৃদয়দ্বার ছিল উন্মুক্ত।

একবার অষ্টমীপূজার দিন মায়ের শ্রীচরণে সকলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করছে। ভাববিহ্বল অবস্থায় একজন বাইরে দাঁড়িয়ে। মায়ের পূজায় অঞ্জলি দেবার অসীম ইচ্ছা তার। কিন্তু সমাজের অন্ধ কুসংস্কারে সে দ্বিধাগ্রস্ত। জাতে সে বাগদী, তাই মনের ইচ্ছা মনেই গোপন করে দূরে থেকেই মাকে জানায় তার শ্রদ্ধা ও প্রণতি। অন্তর্যামিনী মা কিন্তু বুঝলেন তার মনোবেদনা। তাকে কাছে ডেকে সকলের সাথে মিলিয়ে দিলেন। মা বলতেন: "ভালবাসাই তো আমাদের আসল।"[৪] একজন ভক্ত জাতে যুগী। শ্রীমার কাছে যেতে তার খুব সংকোচ। একদিন মা তাকে ডেকে বলতেন: "তুমি যুগী বলে সংকোচ করছ? তাতে কি বাধা? তুমি যে ঠাকুরের গণ—ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ।"[৫] ভগিনী নিবেদিতা, ওলিবুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি বিদেশিনীরাও ছিলেন মায়ের অতি একান্ত আপনজন। তিনি সকলকেই 'আমার মেয়ে' বলে সস্নেহে কাছে টেনে নিতেন। এমনকি দেশাচার ও কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে তিনি আহার পর্যন্ত করতেন। তখনকার সেই রক্ষণশীল সমাজে এই বিদেশিনীদের সঙ্গে আহার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে) খ্রীষ্টান মিশনারীদের একটি চা-চক্রে ভারতীয় নবজাগরণের দুই নায়ক বাল গঙ্গাধর তিলক ও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে আমন্ত্রিত হন। এজন্য তাঁদেরও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।[৬]

শিক্ষার প্রতিও শ্রীশ্রীমায়ের ছিল একান্ত অনুরাগ। শিক্ষা মানুষের মনকে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে, চরিত্র গঠন করে, স্বাবলম্বী করে, উদার মানবপ্রেমের পথে পরিচালিত করে। তিনি নিজে লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ পাননি, কিন্তু লেখা-পড়ার প্রতি তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। তাঁর কথাতেই জানতে পারি: "ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ ওরা সব পাঠশালায় যেত। ওদের সঙ্গে কখন কখন যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম। পরে কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণ পরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়রাম মুখো-পাধ্যায়) বই কেড়ে নিলে। বললে: 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই, শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত। সে এসে আবার আমায় পড়াত। ভাল করে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে। একাটি একাটি আছি। ভব মুখুয্যেদের একটি মেয়ে আসত নাইতে। সে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। সে রোজ নাইবার সময় পাঠ দিত ও নিত। আমি তাকে শাকপাতা, বাগান হতে যা আমার এখানে দিত, তাই খুব করে দিতুম।"[৭] এইভাবে মা বর্ণ পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগ, রামায়ণ ও অন্যান্য বই ভালভাবেই পড়তে পারতেন।

শিক্ষার প্রতি তাঁর এতই অসীম আগ্রহ ছিল যে, তাঁর রাধু, মাকু, ভাইঝিদের মধ্যেও তিনি এই বিদ্যার বীজ বপন করেছিলেন। রাধুকে তিনি

৩ দ্রঃ বিপ্লবের প্রতীক শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী—জীবন মুখোপাধ্যায়, অভয় পাবলিকেশন্স, ১৩৯১, পৃঃ ৪৫

৪ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৭০, পৃঃ ২০০

৫ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪৬৩

৬ স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শংকরীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, ৩য় খণ্ড, ১৩৯০, পৃঃ ৩০৯

৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১০ম সংস্করণ, পৃঃ ১০৩-১০৪

একটি মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দেন। তিনি বলতেন: "লেখাপড়া শিখলে, কাজকর্ম শিখলে নিজেরাও সুখে থাকবে, অপরকে সুখী রাখতে পারবে তাদের উপকার করে।"[৮] শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার প্রতিই যে তাঁর আগ্রহ ছিল তা নয়—তিনি সঙ্গীত, সেলাই এবং ধাত্রীবিদ্যাতেও মেয়েদের উৎসাহ দিতেন। আধুনিক শিক্ষার সমর্থক শ্রীশ্রীমা চাইতেন পুরুষের মতনই নারীরা নানান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। ভাবতে আজও অবাক লাগে, সেই গ্রামীণ রক্ষণশীল পরিবেশে লালিতা হয়েও তাঁর মধ্যে ছিল আধুনিক মানসিকতা, শিক্ষার প্রতি একান্ত অনুরাগ। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত গৌরীমার শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের পিছনেও শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। বর্তমান আশ্রমের জমি ক্রয়ের সময় গৌরীমা মাকে জমি দেখানোর জন্য নিয়ে আসেন। প্রসন্ন কৃপা-দৃষ্টিতে মা বলে ওঠেন: "খাসা জমি, বেশ বাড়ি হবে, মেয়েরা সুখে থাকবে।"[৯] নিজ হাতে আশ্রম-ভবনের ভূমি পূজা করে আশীর্বাদ করেন শ্রীশ্রীমা সারদা। মায়ের আশীর্বাণী সার্থক হয়েছে পরবর্তী কালে। আশ্রমের অন্তেবাসিনীদের প্রতি মায়ের নানা উপদেশের মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি, নারীজাতির আদর্শের প্রতি তাঁর ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা প্রসঙ্গে মা বলতেন: "মেয়েরা পড়াশুনো করবে, বিদ্যালাভ করবে; কিন্তু মেয়েমানুষের ছুঁচের মতো বুদ্ধি ভাল নয়। তারা ঠকে সেও ভাল, জিতে দরকার নেই। তারা সরল হবে, পবিত্র থাকবে।"[১০] তৎকালীন গোঁড়া সমাজে মানুষ হয়েও মায়ের চরিত্রে আধুনিকতার উজ্জ্বল প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। ইংরেজীকে অবহেলা করে দুর্গা-মা কেবল সংস্কৃতচর্চা করছেন শুনে গৌরী-মাকে বলেন: "আমার মেয়ে কিন্তু ইংরাজীও পড়বে।" শ্রীমায়ের কথার ওপর গৌরী-মার আর কোন মতামত ছিল না। তিনি এককথায় বললেন: "তোমার যা ইচ্ছে, তাই হবে মা। ও ইংরাজী পড়বে।"[১১]

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতি মায়ের ছিল অগাধ আস্থা ও গভীর ভালবাসা। তিনি জানতেন, প্রকৃত মানুষ গঠন করাই হলো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একবার জনৈক স্ত্রী-ভক্ত মায়ের কাছে এসে তাঁর পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দিতে পারেননি বলে গভীর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মা এতে বিন্দুমাত্র চিন্তিত ও বিচলিত হলেন না, বরং বললেন: "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও—লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।"[১২] নিবেদিতা নিজেকে পরমধন্য মনে করেছিলেন যেদিন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত ও তাঁর গুরুদেব স্বামীজীর ইচ্ছামূর্তি বাগবাজারের বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হলো। সেই মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে আসেন স্বয়ং সারদাদেবী ১৩ নভেম্বর ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে। তিনি আশীর্বাদ করে বলেন: "আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।"[১৩] নিবেদিতার কর্মময় জগৎ, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, তৎকালীন মেয়েদের অবস্থার উন্নতিসাধন প্রভৃতিতে ছিল মায়ের পরম উৎসাহ।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের নাগপাশ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্রীমায়ের মুখে শুনি: "তারাও (ইংরেজরাও) তো আমার ছেলে।"[১৪] তিনি ছিলেন অনন্ত মাতৃত্বের চিরন্তনী মূর্তি। আমরা একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে লক্ষ্য

৮ দ্রঃ বিপ্লবের প্রতীক শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৭৪

৯ গৌরী-মা—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, পৃঃ ১৮৮ ১০ ঐ, পৃঃ ১৮৫

১১ সারদা-রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী দেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১৩৬৮, পৃঃ ৩৪৬

১২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১৩৯২, পৃঃ ১৭

১৩ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১ম সং, ১৯৫৯, পৃঃ ১৩৫

১৪ মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৯, পৃঃ ৫২-৫৩

করি জ্বলন্ত স্বদেশপ্রীতি। স্বদেশবাসীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসককে লক্ষ্য করে বলেছেন: "ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে গো।"[১৫] তবে এই ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে ভারতের মুক্তি নিশ্চিত—এই দৃঢ় ধারণায় তিনি তাঁর মন্ত্রশিষ্য শ্রীশচন্দ্র ঘটকের পত্নীকে বলছেন: "আগে ওদের ধ্বংস হবে—নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।"[১৬] তিনি বলছেন, স্বদেশবাসীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত গঠনমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করা। বলছেন: "হুজুক নয়—কাজ কর।"[১৭] স্বদেশী জিনিসের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। একবার তাঁকে স্বদেশের তাঁতে বোনা একটি মোটা কাপড় পরিধানের জন্য দেওয়া হয়। তিনি পরমপ্রীত মনে ঐখানি পরিধান করে আনন্দ প্রকাশ করেন।[১৮] বহু দেশপ্রেমিকের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও অনুপ্রেরণার উৎসমূল হয়ে উঠেছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আমাদের এই পরমমমতাময়ী মা। বহু তরুণ বিপ্লবী বেলুড় মঠে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতেন। তাঁদের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের সদাসতর্ক দৃষ্টি ছিল। মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁদের মনোভাবের প্রতি সর্বদা ওয়াকিবহাল ছিলেন। পরবর্তী কালে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অনেকেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে মঠের কাজে আত্মনিয়োগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ), রাধিকা অধিকারী (স্বামী সুন্দরানন্দ), দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) প্রমুখ। এঁরা ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। মায়ের চরণপ্রান্তে এসেছেন অরবিন্দ ঘোষ, বাঘা যতীন প্রমুখ মহান বিপ্লবীরাও।

শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রীতি, সমস্ত কুসংস্কার থেকে মুক্ত বিচারশীল মন, দৃঢ়চিত্ততা, প্রখর বাস্তবদৃষ্টি তাঁকে সর্বকালের জন্য অনুপম মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: "ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।" "ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।"[১৯] নিবেদিতার ভাষায় মা ছিলেন "বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী"। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমার মধ্যে দেখেছেন নারীজাতির ভাবী আদর্শের বিগ্রহ।[২০] গিরিশচন্দ্র ঘোষ মাকে প্রশ্ন করেছিলেন: "তুমি কি রকম মা?" মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন: "আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য—সত্য জননী।"[২১] যেখানে ক্লান্তি, যেখানে হতাশা, যেখানে অসন্তোষ, অবসাদ সেখানেই তাঁর অকৃপণ স্নেহবারি বর্ষণ। মা তাঁর জীবনের শেষবাণীতে পরম আশার কথা শুনিয়েছেন সমগ্র বিশ্ববাসীকে: "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা,—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।"[২২]

শ্রীমায়ের অন্তিম বাণীতেই রয়েছে তাঁর যথার্থ পরিচয়। তাঁর বাণীর আলোকবর্তিকা উজ্জ্বল করে রাখুক আমাদের আগামী দিনের জীবনসরণিকে। □

১৫ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা—স্বামী সারদেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৯, পৃঃ ১৬৬
১৬ শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদক), ১৩৮৫, পৃঃ ৪৫১
১৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩২৫
১৮ দ্রঃ শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী—স্বামী পরমেশ্বরানন্দ, ১৩৭৯, পৃঃ ৯-১০
১৯ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৫২
২০ দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ৭৬
২১ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৮২
২২ সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃঃ ৪০৯-৪১০

নিবন্ধ

মায়ের জীবনের আলোয়

নীলিমা লাহিড়ী

যেসব ভারতীয় নারী চরিত্রের মহিমায় ভারতের মাটিকে করে তুলেছিলেন পবিত্র ও সুন্দর, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সেই মহিমাময়ী নারীদের অন্যতম প্রধান। বড় অনাড়ম্বর, বড় সহজ, সরল ছিল তাঁর জীবন। কিন্তু তাঁর নিরাভরণ জীবনচর্যার আড়ালে ছিল এক পরম ব্যক্তিত্বময়ী নারী—ভগিনী নিবেদিতার চোখে সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। ধাপে ধাপে সেই মহিমা তাঁর জীবনে প্রকাশ পেয়েছে।

জীবন তো নয়, এক মহা সাধিকার নিরলস কঠোর সাধনা, যার তুলনা তিনি নিজেই। চরিত্রের মাধুর্যে ও মহিমায় তিনি সত্যই অতুলনীয়া। কিন্তু তাঁর পরম ঐশ্বর্য তাঁর মাতৃত্ব। তাঁর বাৎসল্য সহজ, শান্ত, কিন্তু তার আবেদন দুর্নিবার। এ যেন খাঁটি আমাদের ঘরের মা-টিই।

তাঁর ছন্দবহুল জীবনের চারটি অধ্যায়ই (শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য) মানুষের মনে এক জিজ্ঞাসার চিহ্ন নিয়ে আসে, একটি প্রশ্নের মুখোমুখি করে আমাদের। কে এই নারী, যিনি এসেছিলেন এক অখ্যাত পল্লীর দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটিরে, চিহ্নিত হয়েছিলেন কাম-কাঞ্চনত্যাগী মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিরূপিণীরূপে—উত্তর-সাধিকারূপে?

নিভৃতে, নেপথ্যে তাঁর আনাগোনা—অবগুণ্ঠনেই যেন তাঁর সমস্ত জীবনটা ঢাকা। দরিদ্র পিতামাতার সন্তান তিনি, তাই শৈশব থেকেই কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। শৈশবে বাবা-মা ও ছোট ভাই-বোনদের সেবার মধ্য দিয়েই শুরু হয় তাঁর সেবার তপস্যা। শিশুবয়সেই তিনি মায়ের কাজে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে যেতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাইদের নিয়ে নাইতে যেতেন। খেলার সাথী হয়ে তাদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতেন। আবার নানাভাবে তিনি দরিদ্র পিতামাতার পরিশ্রম লাঘব করতে চেষ্টা করতেন। মাতৃস্নেহের পরশ দিয়ে ক্ষুধার্ত গরুর জন্য তিনি গলাসমান জলে নেমে দলঘাস কেটেছেন। মনিষদের জন্য মাঠে মুড়ি নিয়ে গিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের সময় বুভুক্ষুদের পাত্রে পরিবেশিত তপ্ত অন্ন জুড়াবার জন্য পাখার হাওয়া করেছেন।

এই সব ছোট ছোট ঘটনা দিনে দিনে তাঁর বৃহত্তর জীবনের পটভূমিকে গড়ে তুলেছিল। সংসারের সমস্ত কর্তব্যকর্মের মাঝে ত্যাগ ও সেবার সাধনা এই ভাবেই সারদাদেবীর ভিতরে স্নেহ-বাৎসল্যের একখানি মাতৃমূর্তির রূপ নেয়।

তিনি 'বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী', সাধ করে সংসারের ধূলোকাদা নিয়ে খেলা করবার জন্যই পর্ণকুটিরে এসেছিলেন। তাঁর গভীর কালো চোখ দুটির ভিতরে লুকিয়ে ছিল অধ্যাত্ম সম্পদের এক মণিময় খনি। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীমায়ের সমগ্র জীবনটা যেন ত্যাগ ও সেবার কাঠামো দিয়ে গড়া। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, কোন সংকল্প নিয়ে নয়, ত্যাগ ও সেবা তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ছিল জড়িত। তাঁর ত্যাগ ও সেবার পিছনে ছিল অহেতুক ভালবাসা। অতুলনীয় ভালবাসা। কষ্টিপাথরে যাচাই করা ভালবাসা। বোহসেবী ভালবাসা। এই ভালবাসার পূর্ণকুম্ভ বুকে নিয়ে তিনি জয়রামবাটী, কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতায় পথ চলেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনটি প্রার্থনাময়। সেই প্রার্থনা কখনো নিজের জন্য ছিল না, সবই ছিল অন্যের জন্য।

ফুলের কুঁড়ি যেমন আপনা থেকেই বাগান আলো করে, তেমনি এই সরলা বালিকার হৃদয়-পদ্মও ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। অবশেষে তার সুরভি ও সৌন্দর্যে জগৎ আলো হয়ে গিয়েছে। জীবনে তিনি কখনো থেমে থাকেননি। কোন

আবর্তের ফেনপুঞ্জ তাঁকে জড়াতে পারেনি। তিনি যেন মানুষের বুকের কথা শুনতে পেতেন। নব বেদান্তের বাণী নিয়ে তিনি নিজের মনের মধ্যেই 'আনন্দের পূর্ণঘট' স্থাপন করেছিলেন।

গৃহান্তরালেই তাঁর গোটা বিশ্ব-পরিক্রমা। বাইরে তিনি ছিলেন অবগুণ্ঠিতা—লজ্জাপটাবৃতা। কিন্তু অন্তরে ছিলেন পূর্ণবিকশিতা। জগতের নানা জাতি, নানা বর্ণের মানুষকে নিজের কোলে আশ্রয় দেবার জন্য মন্দাকিনীর প্রবাহ বুকে নিয়ে বসুন্ধরার মাটিকে তিনি রসসিক্ত করতে এসেছিলেন। তাঁর এই নীরব সাধনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো। বাইরে থেকে তার কিছুই বোঝা যেত না।

দক্ষিণেশ্বরের নহবতে তিনি প্রায় চৌদ্দ বছর কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ—দিনের আলোয় কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি। ছোট্ট এক কক্ষ, কোনরকমে একজন সেখানে থাকতে পারে। অথচ অনাবিল আনন্দে সেখানে তিনি থেকেছেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কোন অভিযোগ নেই, কোন অশান্তি নেই। কী সহনশীলতা, কী ধৈর্য! একটা পরিপূর্ণ ও ভরাট মন নিয়ে তিনি ওখানে থেকে স্বামীর সেবা করেছেন, শাশুড়ীর সেবা করেছেন, ঠাকুরের ভক্তদের সেবা করেছেন পরম মমতায়, পরম প্রীতিতে। মর্তলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই মমতা, এই প্রীতি। এই অমূল্য ধন কন্যা-রূপে, সহধর্মিণীরূপে, ভগিনীরূপে, জননীরূপে তিনি অকাতরে বিতরণ করেছেন।

একদিন মা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আমি তোমার কে?" সহজ কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: "তুমি আমার মা আনন্দময়ী।" আর একদিন তিনি ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন: "আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?" ঠাকুর বলেছিলেন: "যে-মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, (তখন শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভধারিণী নহবতের দোতলায় বাস করতেন।) আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন।" একই মা তিন রূপে। মা মানেই তো মমতা—সে দেবীই হোক আর মানবীই হোক। দেবী ভবতারিণী, মা চন্দ্রমণি ও পত্নী সারদামণি। ষোড়শীপূজার মাধ্যমে দেখেছি এই ত্রিবেণীসঙ্গম।

এ যেন ইতিহাস এবং কিংবদন্তী এক সঙ্গে। মায়ের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় যেন পল্লীর কুটিরে তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ। এ দীপ বড় স্নিগ্ধ। এই দীপালোকে তেজ নেই, আছে শান্তি। উগ্রতা নেই, আছে শীতলতা। প্রকাশের উচ্ছলতা নেই, আছে বিকাশের অনিবার্যতা। মাতৃস্নেহরূপ অমৃতরসের ভাণ্ডার তাঁর হৃদয়ে। সকলের জন্য সেই ভাণ্ডার উন্মুক্ত। সেই স্নিগ্ধ শিখায় সকলের প্রাণ জুড়োয়।

কর্ম জ্ঞান ভক্তি যোগ—ভগবৎ-সাধনার সকল স্তরের মূলভিত্তিই হলো বাসনাত্যাগ। শ্রীশ্রীমায়ের সমগ্র জীবনটি ছিল নির্বাসনার নিরবচ্ছিন্ন স্রোতো-ধারা। এই নির্বাসনার আদর্শই ভারতের আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পথ দেখিয়েছেন। তাঁরই শিক্ষায় শ্রীশ্রীমা সেই ভারতীয় সনাতন আদর্শকে জীবনে অনুশীলন করেছেন। পরিশেষে স্বয়ং সেই আদর্শের চেতন বিগ্রহ হয়ে উঠেছেন।

জীবন দিয়েই তো জীবন গড়ে ওঠে। প্রদীপ থেকেই তো জ্বলে ওঠে প্রদীপ। মা তাঁর জীবন দিয়ে সহস্র জীবন গড়েছেন। জ্বালিয়েছেন সহস্র প্রদীপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর নিষ্ঠাভরে ভক্ত সন্তানদের নিজের ক্রোড়ে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই আশ্রয়দানের পিছনে কোন বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন ছিল না। সবই ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার প্রেরণায়। নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর অগণিত সন্তানের কাছে একমাত্র ভালবাসার দ্বারাই। এই দিব্য ভালবাসার ঐশ্বর্যে তিনি এক মহান সঙ্ঘের সৌধ রচনা করেছেন, হয়েছেন সেই সঙ্ঘের নিরঙ্কুশ নেত্রী, তার জননী, তার পালয়িত্রী, তার রক্ষয়িত্রী। সঙ্ঘের পতাকা তিনি দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধারণ করেছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে অনু-প্রাণিত ত্যাগী সন্ন্যাসীদের দায়িত্বভার বহন করে তাঁদের সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

এই কাজে তাঁর একমাত্র পদ্ধতি ছিল তাঁর গণ্ডি-ভাঙা স্নেহ ও বাৎসল্যের অভ্রান্ত পদ্ধতি। ভাল-বাসায় তিনি আত্মহারা হতেন ঠিকই, কিন্তু কখনো

ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হতেন না। তাঁর ত্যাগসিদ্ধ প্রজ্ঞার দীপ্তি তাঁর চিন্তাকে, তাঁর ব্যক্তিত্বকে সর্বদা ঘিরে থাকত। কখনো তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যেত না, কিন্তু বিরাট সঙ্ঘের অণুতে পরমাণুতে অনুভূত হতো তাঁর শক্তি, তাঁর উপস্থিতি, তাঁর নেতৃত্ব। বর্তমানের জটিল পটভূমিতে দাঁড়িয়ে একজন নিরক্ষর নারী যে সাহস, শক্তি ও প্রজ্ঞা অর্জন করেছিলেন তা ভারতের গৌরব, তা পৃথিবীর বিস্ময়।

শ্রীশ্রীমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে তিনি ইষ্টমন্ত্রের মতো বুকের মধ্যে ধরে রেখেছিলেন। প্রতিদিনের চর্যায়, কর্মে, চিন্তায় ঠাকুরের অসমাপ্ত ব্রতকে সমাপ্ত করবার জন্য নিজের জীবনকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন।

সেবার মাধ্যমে আত্মবিলুপ্তি—এই মন্ত্রে তিনি ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধা। আত্মবিলোপের শক্তি মহাশক্তি। যে শক্তিমান তাঁর পক্ষে আত্মবিলোপ করা কঠিন। অথচ পরম শক্তিময়ী হয়েও মায়ের নিজেকে প্রকাশ কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর কাজে, তাঁর কথায় সবসময় প্রকাশ পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নিজেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুছে দিয়েছিলেন। এই আত্মবিলোপের তপস্যা ছিল তাঁর সহজাত। এবং এই তপস্যার মধ্য দিয়েই ঘটেছে তাঁর অপরূপ আত্মপ্রকাশ। বাস্তবিক এক অনন্যসাধারণ আত্মবিলয়ের আদর্শ তিনি রেখে গেছেন। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের ইতিহাসে তাঁর জীবন এক অভূতপূর্ব আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাঢ়ভূমির রাঙামাটির পথের ধুলায় এই মহীয়সী নারীর পুণ্য পদরজঃ রয়েছে ছড়ানো। সেই রজোকণা থেকে আমরা যেন আমাদের জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি, পারি জ্বালিয়ে নিতে নিজেদের দীন জীবনকে তাঁর তপস্যার অনির্বাণ জ্যোতিতে। □

গণ্ডিভাঙা মা

সুজাতা বণিক

শ্রীমা সারদাদেবীকে ভক্তদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতে দেখে তাঁর স্ত্রীভক্তদের মধ্যে একজন বলেছিলেন: "তুমি বামুনের মেয়ে, আবার গুরু, এরা তোমার শিষ্য। তুমি এদের এঁটো নাও কেন?" শ্রীমা তখন উত্তর দিয়েছিলেন: "আমি যে মা গো। মায়ে ছেলের করবে না তো কে করবে?"

সত্যই শ্রীমায়ের নিকট তাঁর সমস্ত শিষ্যরা শুধু সন্তানের মতোই ছিলেন না, ছিলেন সন্তানেরও বেশি। এর মধ্যে অবশ্য ত্যাগী শিষ্যরা তাঁর অধিকতর আত্মীয় ছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন: "ত্যাগী আর গৃহস্থ কি সমান? ওদের কামনা-বাসনা কত কি রয়েছে আর এরা তাঁর জন্য সব ছেড়ে চলে এসেছে। এদের আর তিনি ভিন্ন কে আছে? সাধুদের সঙ্গে কি ওদের তুলনা হয়?" তবু সন্ন্যাসী, গৃহী সকলেরই মা ছিলেন তিনি এবং গৃহস্থ ভক্তরা তাঁর নিকট সাধুভক্তদের তুল্যরূপ আদরই পেতেন, তিনি যে-জাতেরই হোন না কেন।

দীক্ষাদানকালে শ্রীমা জাতের কথা জিজ্ঞাসা করতেন না। একজন যুগী ভক্ত তাঁর কাছে সংকোচবোধ করলে তিনি বলেছিলেন: "তুমি যুগী বলে সংকোচ করছ? তাতে কি বাবা? তুমি যে ঠাকুরের গণ—ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ।" বাগদী, মুচি, মেথর সবাইকে মা আপন করে কোলে টেনে নিয়েছেন। প্রত্যেককেই তাঁর চরণপূজার অধিকার দিয়েছেন। জাতে যে মুসলমান তাকেও তিনি নিজের হাতে খাওয়াতেন এবং খাওয়ানোর পর উচ্ছিষ্ট স্থানটি নিজেই পরিষ্কার করে দিতেন। তিনি বলতেন: "আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।"

শ্রীমায়ের এরূপ জাতিবর্ণনির্বিশেষে অপার স্নেহ, করুণা, সহানুভূতি প্রদর্শন কেবলমাত্র নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, গৃহীদেরও তিনি ঐরূপ আচরণ করতে শেখাতেন তাদেরই কল্যাণের জন্য, মানসিক-আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য; বলতেন: "দেখ মানুষের হাজার উপকার করে একটু দোষ কর, অমনি তার মুখটি বেঁকে যাবে। লোক কেবল দোষই দেখে, গুণটি কজন দেখে? গুণটি দেখা চাই।" অপরের দোষ দেখতে নেই। এরকম বহু উপদেশ তিনি গৃহী ভক্তদের দিতেন, যাতে তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

তিনি স্বয়ং যন্ত্রণা ভোগ করেও ভক্তদের প্রতি 'মা'য়ের কর্তব্যপালনের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। জয়রামবাটীতে থাকাকালীন গৃহী ভক্তদের তত্ত্বাবধান করা, প্রত্যেককেই সমদৃষ্টিতে দেখে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা, যার চা খাওয়ার অভ্যাস তার জন্য চায়ের ব্যবস্থা করা, যে মাছ খাবে তার মাছের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি তিনি নিখুঁতভাবে করতেন। এছাড়া বৃদ্ধ বয়সেও তরকারি কোটা, পূজা করে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা, বিকালে আটা-ময়দা মেখে রুটি তৈরি করা, দুধ জ্বাল দেওয়া, লণ্ঠন পরিষ্কার করা ইত্যাদি তাঁর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পড়ত। এরই মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধু, মাকু, নলিনী, ভাতৃজায়া পাগলী মামী—সকলকে দেখাশোনা করতে হতো। অবশ্য এই কর্মবহুল জীবনের সূচনা হয়েছিল পিতামাতার দরিদ্র সংসারে থাকাকালীন সেই বাল্যকাল থেকেই। শ্রীমায়ের ভাই কালীমামা এর সমর্থনে বলেছিলেন: "দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দিদি কি না করেছেন!" এইভাবে পরবর্তী

কালেও তিনি প্রতিটি কর্তব্যপালনে সদা ব্যস্ত থাকতেন। সংসারের যাবতীয় ছোটখাট বিষয়ে পর্যন্ত মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। বিশৃঙ্খলা, অপচয় তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই গৃহস্থ ভক্তদের তিনি সঞ্চয় করতেও বলতেন: "কি জান বাবা, কিছু সঞ্চয় করলে নিজের সংসারে ও ভবিষ্যতের উপায় হবে। আর সাধুদের সেবা করতে পারবে।" যোগীন-মার মনে একবার সন্দেহ হয়েছিল—"ঠাকুরকে দেখেছি এমন ত্যাগী, কিন্তু মাকে দেখছি ঘোর সংসারী।" পরে অবশ্য যোগীন-মার সেই ভুল ভাঙে। শুধু যোগীন-মাই নন, মায়ের আপাত ব্যবহার দেখে আরো অনেকেও তাই ভেবেছেন।

কিন্তু শ্রীমায়ের মন সাধারণ অর্থে কখনো সংসারে লিপ্ত হয়নি। বৈরাগ্যভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। একসময় বলেছিলেন: "এ তো একটা মোহ নিয়ে আছি, এ একটা মায়া নিয়ে আছি বই তো নয়।" এই মোহের কারণ ছিল রাধু। শ্রীমা 'রাধি, রাধি' করেই তাঁর ঊর্ধ্বগামী মনকে বাস্তব সংসারের মধ্যে নামিয়ে এনেছিলেন সংসারে আবদ্ধ জীবের মঙ্গলের জন্য। বস্তুতঃ এই 'মায়া'কে তিনি স্বীকার করেছিলেন বলেই তাঁর ভগবতী তনু জগৎকল্যাণার্থে ঠাকুরের পর দীর্ঘকাল পৃথিবীতে ছিল।

শ্রীমায়ের বিশ্বমাতৃত্বের অপরূপ মহিমা দেখে রাসবিহারী মহারাজ তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "তুমি কি সকলের মা?" মা উত্তর দিলেন: "হ্যাঁ"। পুনরায় মহারাজ প্রশ্ন করলেন: "এই সব ইতর জীবজন্তুরও?" মা বললেন: "হ্যাঁ, ওদেরও।" ☐

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির (মাঝে)। পিছনে—বিষ্ণুমন্দির/গোবিন্দজীর মন্দির/রাধাকান্ত-মন্দির। সামনে—কালীমন্দিরের নাটমন্দির; এখানে ভৈরবী ব্রাহ্মণী মথুরবাবুকে অনুরোধ করে পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেই সভায় তিনি বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ সমকালীন অগ্রগণ্য সাধক ও পণ্ডিতদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। বিচারসভায় সমবেত সাধক ও পণ্ডিতবর্গ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দিরের (দ্বাদশ শিবমন্দিরের ছবি অবশ্য প্রচ্ছদে নেই।) অবস্থান বাস্তবিকই এক অভাবনীয় ব্যাপার। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হলেও শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার ক্ষেত্রভূমি হিসাবে একটি প্রতীকী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু হিন্দুদের দিক থেকেই নয়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের দিক থেকেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরভূমির একটি তাৎপর্য রয়েছে। মন্দিরের জমির বেশির ভাগের মালিক ছিলেন জন হেস্টি নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, বাকি অংশের অনেকটা জুড়ে ছিল মুসলমানদের কবরস্থান এবং গাজী সাহেবের পীরের দরগা। এই যোগাযোগ যেন দৈবনির্দিষ্ট। কারণ, এই ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে যুগাবতার মহাসমন্বয়ের উদার বাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। এই বাণীই আজ শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সারা পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে। দেশ ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মত ও পথের অসহিষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে এই বক্তব্য আমরা তুলে ধরতে চাইছি।—**যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন**

নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি এবং শ্রীমা সারদাদেবী

মারুফী খান

সুবক্তা এবং সুলেখিকা ডঃ মারুফী খান ঢাকার ইস্পাহানী মহাবিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপিকা।—যুগ্ম সম্পাদক

আত্মার উপস্থিতি সর্বভূতে, প্রাণীতে স্পষ্টতর। তবে এই আত্মার পরিণত সুপ্রকাশ একান্তভাবে মানবপ্রাণে। অতএব, এই মানুষই স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির আসনে সমাসীন।

'নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি' প্রবন্ধের নামকরণের কারণে বক্তব্যকে নির্দিষ্ট সীমায় গণ্ডিবদ্ধ করা সমীচীন নয় এজন্য যে, নারী 'মানুষ' সম্প্রদায়ের বাইরের কেউ নয়; জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি, ধী-শক্তির সমন্বয়ে তার মানবিক বিকাশ এবং আত্মার প্রকাশ-সাধন—পুরুষের চেয়ে সম্পূর্ণ অর্থে বিপরীত কিছু নয়। সমাজব্যবস্থার কার্য-কারণেই নারী-পুরুষের সম্পর্কগত অধিকার চিরস্বীকৃত। তবে প্রাচীনকাল থেকেই একটি প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় 'নারীর স্থান গৃহ, নারীর সত্তা যেন অন্দরমুখী, সন্তানপালন এবং সংসারই তার একমাত্র উদ্দেশ্য' ইত্যাকার নানা জাতীয় নিয়ম-নির্দেশে জর্জরিত নারীসমাজ আদিকাল থেকেই সুষ্ঠু জীবনবোধের সীমানা থেকে দূরে। বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসেও এই অধিকার অর্জনের চেষ্টা চলছে। ফলে নারী-পুরুষের সমানাধিকার এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষায়।

'তোমরা যদি একটি সুষ্ঠু জাতি চাও, একজন প্রকৃত মা আমায় দাও।' সম্রাট নেপোলিয়ন একথা বলেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক গঠন-কাঠামোর ওপর যে-রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ় সংস্থাপিত, সেই রাষ্ট্রের মূলশক্তির উৎসকে ধারণ করছেন একজন নারী। তিনি মা, তিনি প্রেরণার শক্তিদাত্রী।

নবজাগরণের মুক্তিবাণী উচ্চারিত হচ্ছে যাদের ঐক্য-সম্মেলনে তাদের মধ্যেও রয়েছে নারী-সম্প্রদায়। সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে নারীর বিশেষ পরিচয় অবশ্যই আছে। কারণ নারী-পুরুষের ঐকান্তিক যুগ্ম কর্মপ্রচেষ্টাই সৃষ্টির মহারহস্যময় প্রকাশ—এ-সত্য আমাদের বিস্মৃত হবার নয়। কাজেই পুরুষের সম্পূরক নারী একটি আলাদা দৃষ্টিকোণে পৃথক জীবনবোধের আলোতে বিশ্লেষিত হবার নয়, তবে নারীত্বের প্রশ্নে তার মহিমা, কর্তব্য, জাগতিক জীবনপ্রণালীতে তার অবদান অবশ্যই নানাভাবে বিশ্লেষিত হতে পারে।

শ্রীমা সারদাদেবী—একটি নাম, একটি প্রত্যয়। আপাতদৃষ্টিতে এ-নারী অত্যন্ত সাধারণ। নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের সন্তান, অথচ কালের মানুষের কাছে তাঁর আবেদন চিরদিনের জন্য অম্লান। নারীশিক্ষা এবং নারীমুক্তিতে তাঁর অবদান সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করার প্রয়াস করব।

'নারীশিক্ষা এবং নারীমুক্তি' এটি পৃথক কোন ব্যাপার নয়, মানুষের শিক্ষা এবং মুক্তির ইচ্ছাকে আভাসিত করছে নবজাগরণের মহাবাণী। এবং সেই 'জাগরণ-বাণী' নারীসম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও উচ্চারিত হচ্ছে। তবে সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী-শিক্ষাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে গিয়েই আলোচনার এই সীমা টেনে রাখা।

'শিক্ষা' শব্দটি নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে 'অভ্যাসের ফলে অর্জিত বিদ্যা-ভ্যাসই শিক্ষা'। আধুনিক পাশ্চমী সমাজবিদ্ Samuel Koenig-এর ভাষ্যে 'শিক্ষা' শব্দটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এভাবে যে, একটি শিশু সেই আচরণজাত নিয়মগুলি অভ্যাস করবে যে-সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করেছে। তাঁর ভাষায়ঃ "Education may also be defined as the process whereby the social heritage of a group is passed on from one generation to another as well as the process whereby the child becomes socialized, i.e., learns the rules of behaviour of the group into which he is born." স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিক্ষাদর্শনে বলেছেনঃ "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।" ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা এবং বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ভাববিষয়ের

মৌলিক পার্থক্য তেমন কিছু নয়। একটি মানব-শিশু জন্মসূত্রেই পূর্ণত্বপ্রাপ্ত, শুধুমাত্র অভ্যাস ও চর্চার মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং প্রকাশ আর তখনই তা সম্পূর্ণ অর্থে 'শিক্ষা'।

শ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম ১২৬০ সালে। পশ্চিমী সভ্যতা সাহিত্যের ধারায় ভারতবর্ষে রীতিমত নতুন জোয়ারের সময়। ডেভিড হেয়ার, বেথুন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের উদ্যোগে বাঙালী সমাজে চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের সূচনা ঘটে গিয়েছে। শ্রীমা যখন বয়ঃপ্রাপ্তা, তখন দেশীয় জীবনধারায় এক ধরনের বৈপ্লবিক মুক্তির চেতনা।

"কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে, বললে, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই, শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?'... আমি গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে আনালুম। লক্ষ্মী পাঠশালায় পড়ে আসত, সে এসে আমায় পড়াত।" শ্রীমার এ-উক্তি খুব সাধারণ অর্থের নয়, কারণ পড়াশুনার প্রতি প্রবল 'আগ্রহ' তাঁকে দ্বিতীয়বার বই কিনতে আগ্রহী করেছিল। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, 'আগ্রহ' ব্যাপারটি সমসাময়িক চেতনার ফসল হতে বাধ্য। একজন সাহিত্যিক, শিল্পী কখনই সৃষ্টির আগ্রহ অনুভব করেন না, যদি না সমসাময়িক চেতনার উন্মেষ এবং একাগ্রতা তাঁকে প্রবুদ্ধ করে। কাহিনী, আবহাওয়া প্রাচীন হতে পারে, কিন্তু 'নবলব্ধ দৃষ্টিভঙ্গি'র কারণেই আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ, সেক্ষেত্রে শ্রীমা সারদাদেবী আত্মপ্রকাশের তাগিদ অনুভব করেছিলেন বলেই শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

'তোমাদের চৈতন্য হোক, ভক্তি বিশ্বাস হোক'—শ্রীমার বাণী আজ থেকে কম করে হলেও সাত দশক পূর্বের। এ-চৈতন্য, এ-বিশ্বাস কোন্ মহাসত্যকে আভাসিত করছে? মানবিক সত্তার স্ফুরণ কি সে-চৈতন্যের অনুগামী? পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিতের তুল্য মর্যাদা যে-নারীর জন্য নয় সে-নারীকে দুঃখ করতে হয় এই বলে: "আহা! যদি লেখাপড়া জানতুম, তাহলে অমনি করে সব টুকে টুকে রাখতুম।" তিনি কি করে নারীশিক্ষা, নারীমুক্তির একজন আদর্শস্থানীয়া নারী হবেন, অবশ্যই ভাবনার অবকাশ রাখে।

আগেই শিক্ষা সম্পর্কে যে-অভিমত ব্যক্ত হয়েছে সেখানে একথাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা শুধুমাত্র পুঁথিগত অর্থের সমার্থক নয়। এবিষয়টি সাধনার পরিণতি। যেকোন সাধনার ফলাফলই 'শিক্ষা' হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।

শ্রীমা সারদাদেবী ভক্তি, যোগ, কর্ম এবং জ্ঞান প্রভৃতিকে সাধন-মার্গের শিক্ষা বলে অনুভব করে-ছিলেন। কাজেই নারীদের জন্য শিক্ষা (নারীদের জন্য শিক্ষা=নারীশিক্ষা, এভাবে সমাস করতে চেয়েছি) বলতে তিনি তাঁর দীর্ঘ সাতষট্টি বছরের জীবনে যে-বাণী, যে-কর্ম রেখে গেছেন সেটি নারীপ্রগতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আলোকবর্তিকা।

"ও সারদা—সরস্বতী। জ্ঞান দিতে এসেছে। ও জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী, ও কি যে সে? ও আমার শক্তি।"—বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরই তিনি একমাত্র শক্তি নন, সমকালের তথা ভাবীকালের জন্যেও তিনি শক্তি, সঞ্চারণ-সত্তা।

"সংসারী অপেক্ষা সংসারত্যাগী মহত্তর—একথা বলা বৃথা, সংসার হতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন সহজ জীবনযাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা অনেক কঠিন কাজ।"—স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তির পাশাপাশি শ্রীমা সারদা-দেবীর সংসার-সচেতন উক্তির যেন বিরোধ নেই, রাধুর কথায় তিনি বলেছেন: "আর যা বলিস, আমায় সর্বনাশী বলিসনে, জগৎ জুড়ে আমার ছেলেরা রয়েছে, তাদের অকল্যাণ হবে।"

শুধুমাত্র ক্ষুদ্র গৃহকোণের গৃহকর্ত্রী তিনি নন, সমস্ত বিশ্বের সর্বজনীন মায়ের ভূমিকায় তিনি নিজেকে এক করে নিয়েছেন। ত্যাগীর জীবনের নিঃস্পৃহতা এখানে নেই, গৃহের স্নেহকাতর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি আপন ঔজ্জ্বল্যে এখানে দীপ্যমান। স্রষ্টার নিত্য উপস্থিতি অনুধাবনের জন্য সংসার-বিমুখতা নয়, সংসার-আবেষ্টনীও যে মাধ্যম হতে পারে, তার উল্লেখ লক্ষণীয়। "একদিন [শ্রীরাম-কৃষ্ণ] কতকগুলি পাট এনে আমাকে দিয়ে বললেন, এইগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও। আমি সন্দেশ রাখব, লুচি রাখব ছেলেদের জন্য, আমি

শিকে পাকিয়ে দিলুম আর ফেঁসোগুলি দিয়ে থান ফেলে বালিশ করলুম, চটের উপর পটপটে মাদুর পাততুম আর ফেঁসোর বালিশ মাথায় দিতুম।"

একান্ত গৃহস্থ পরিবারের চিত্র। "কর্ম করতে হবে"—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বাণী প্রকাশের পথ পেয়েছে শ্রীমায়ের কাজের মধ্য দিয়ে। রান্না, গৃহকর্ম, সেবা, পারিবারিক সম্পর্করক্ষা কোন কিছুতেই অনীহা অথবা উদাসীনতা নেই, অথচ এর মধ্যেই ঈশ্বরচিন্তার মহৎ এবং গভীর দর্শনের সন্ধান তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন: "সাধারণ মনের স্বভাবই হলো নীচের দিকে যাওয়া, মানুষ কত মনের জোর করে বাঁধ দিয়ে রাখে, আবার বাঁধ ভেঙে কখনো কখনো জল বেরিয়ে পড়ে; তবু বারবার চেষ্টা রাখতে হয়।"

এই চেষ্টাই তো ঈশ্বরসন্ধানের অন্যতম শিক্ষা। ভগিনী নিবেদিতার প্রতি স্নেহ, রাধুর প্রতি মমতা এবং জয়রামবাটী ও কামারপুকুরের সাধারণ মানুষের জন্য একবুক ভালবাসা দিয়ে যে-নারীর হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ, সে-নারী শ্রীমা সারদাদেবী। আত্মীয়-পরিজন এবং সকল দেশের সকল নারী-পুরুষের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল সমভাবে বিদ্যমান। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে জীবন-চেতনার গভীর অনুভবকে অন্তরে স্থাপন করা একজন 'মানুষ' তিনি।

শ্রীমা সারদাদেবী শুধু তাঁর সময়কার আদর্শ-স্থানীয়া নন, উপরন্তু আজকের মানুষের কাছেও তাঁর আদর্শ একান্ত গ্রহণীয়।

"পারিবারিক জীবনের কার্যাবলী সর্বতোভাবে নারীর প্রভাবের অন্তর্গত এবং সেইজন্য গৃহস্থালী এবং সন্তানগণের লালন ও শিক্ষা সম্বন্ধে নারীদিগের সমধিক জ্ঞান থাকা উচিত। ইহা বুঝিতে হইবে না যে, জ্ঞান নির্দিষ্ট কোন সীমার ভিতর আবদ্ধ থাকিবে, কিন্তু যদি শিক্ষার ব্যবস্থা এই সকল মৌলিক নীতির বিশ্লেষণ ও যথাযথ ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে পুরুষ ও নারীর পূর্ণ জীবন বিকশিত হইতে পারে না।"—মহাত্মা গান্ধীজীর এই বাণী বড় মূল্যবান।

আমাদের লক্ষ্যই জীবনের পূর্ণ বিকাশসাধন। ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের পরিণামকে পদানত করে বর্তমান সভ্যতার জয়যাত্রা নতুন পথে নতুন আঙ্গিকে ক্রমাগ্রসরমান। গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিবি খাদিজা, বিবি আয়েসা, বিবি মরিয়ম প্রমুখ নারীরা শত শত বছরের যে-ইতিহাস ধারণ করেছেন, তাঁদের মহৎ প্রচেষ্টার ফল আজকের সচেতন নারীসমাজ। যুগধর্মের প্রয়োজনে মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটে পৃথিবীতে। লক্ষণীয়, মহাপুরুষদের সঙ্গিনীরূপে একেকজন নারীরও আগমন ঘটেছে। স্ত্রীরূপে, মাতারূপে, কন্যারূপে মহাপুরুষদের কর্মসাধনাকে তাঁরা করেছেন ফলপ্রসূ।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী সারদাদেবী বর্তমান শতকের দূরের কেউ নন, কাজেই চিন্তা-ভাবনার ঐক্যসূত্রে তাঁরা আজকের মানুষের অত্যন্ত নিকটজন।

পুরুষের সমকক্ষ হওয়াই শেষ বা চরম কথা নয়, সভ্যতার প্রয়োজনে নারীর অবদান পুরুষের প্রতিভার স্ফুরণকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে। এটিই মূলকথা।

এই শিক্ষাই আমাদের আদর্শ হোক। খাল পেরনোর সময় ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা সবই কাণ্ডারীর কাছের মনে হয়। যখন সে নদীর তরঙ্গ-দোলার স্পর্শ পায়, তখন ঘর-বাড়ি, গাছপালা সরে যায় দূরে। স্রোতের উদ্দামতা বাড়ে। একসময় আসে মহাসমুদ্রের আহ্বান। অতল জলের কলতানে কাণ্ডারী ভাসে বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায়। দুপাশের প্রকৃতি তখন বিলীন, অথচ প্রকৃতির সুবৃহৎ অস্তিত্বের মধ্যেই ভাসার খেলা তখনও নিরন্তর।

সামান্য পাওয়াটুকুর শিক্ষা নিয়েই ভেসে যাওয়া। প্রকৃতির খোলামেলা পরিসর থেকে জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান-সাধনার সঙ্গমে ঈশ্বরলাভের প্রচেষ্টা। যেখানে নারী-পুরুষের পার্থক্য নির্ধারণযোগ্য কোন ব্যাপারই নয়, চিন্ময় প্রশান্তিই সেখানে সূচিত করছে মুক্তির সুবিমল আনন্দকে।

শ্রীমা সারদাদেবী এই পথযাত্রার সহপথগামিনী। অন্ধকার রাত্রিতে যেমন অসংখ্য তারার আলোয় একটি সন্ধ্যাতারা দিকনির্দেশের স্মারক, তেমনি মুষ্টিমেয় দিশারীর মধ্যে শ্রীমা সারদাদেবীর নামও অম্লান। "যেটুকু পেয়েছ, তাই ধরে থাক না কেন?" বলেছেন তিনি।* ☐

* উদ্দীপন, মার্চ, ১৯৮৪, পৃঃ ১১৩-১১৬; প্রকাশস্থান—ঢাকা, বাংলাদেশ।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী

মনোরমা গুহ

তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ, সাত-আট বছর বয়স, একদিন নৌকায় গঙ্গানদীর উপর দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। ঘুরে ঘুরে এখান সেখান দেখিতে লাগিলাম—পঞ্চবটী, নহবতখানা প্রভৃতি সবই দেখিলাম। শুনিলাম, এই পঞ্চবটীর পাদমূলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিদ্ধিলাভ করেন, এই ঘরে তিনি ঘুমাইতেন, এই ঘরে তাঁহার স্ত্রী বাস করিতেন—এইরূপ নানা কথা শুনিতে লাগিলাম। তখন মহাপুরুষের মাহাত্ম্য বুঝিবার বয়সও না, বুঝিও নাই কিছুই; এখনও যে সবই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না; তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু বিদ্যাবুদ্ধির প্রসার হয় তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছি। যাক, বিদ্যাবুদ্ধিকে বাদ দিয়া সাধারণ মন বলিতে যা বুঝি তাহার কথাই বলি।—জায়গাটি বড় সুখপ্রদ, বড় শান্তিপ্রদ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কেন এরূপ হইল? গ্রাম বলিতে বহু নির্জন গ্রাম আছে, সেখানে ভয়ই আসে সকলের আগে, বহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালীমন্দির স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়, কৈ একবারও মনের কোন নিভৃত কক্ষে আঘাত করে বলিয়া মনে পড়ে না তো? বহু গৈরিক-পরিহিত, রুদ্রাক্ষ, শঙ্খ, কমণ্ডলুধারী বা কণ্ঠিধারী ছিন্নকন্থা-পরিহিত বহু সাধু-সন্ন্যাসী বা ফকিরকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কৈ সহসা মস্তক নত হওয়ার কোন লক্ষণই তো অনুভব করি নাই। তীর্থস্থানে বা পীঠস্থানে সর্বত্রই এমন এক আবহাওয়া অনুভূত হয় যে, কোনদিনই আমার এসব স্থান সম্পর্কে কোন আস্থা নাই। এতসব বিরুদ্ধ ভাবসম্মিলন সত্ত্বেও দক্ষিণেশ্বরকে আমি প্রীতির চক্ষে, প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছি।

কুলকুলনাদিনী ভাগীরথীর বক্ষে স্বর্গীয় বিভূতি-মণ্ডিত সাধকের তপস্যার ঘনীভূত পুণ্যরাশিতে পরিপূরিত সিদ্ধিস্থল পাপী-তাপী সকলের উপরই তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্ষণকালের জন্যও মনকে সেই পবিত্র ধামে উচ্চতর গ্রামে লইয়া যায়। এই পুঞ্জীভূত পুণ্যরাশির সম্পাদনকর্তা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের কথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে সমভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আজ বিজ্ঞানের যুগ, বস্তুতত্ত্বই সর্বত্র তাহার স্থান করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ধর্ম বা ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। এসময় কি করিয়া ঠাকুরের আদর্শবাদের, ভক্তিতত্ত্বের একখানা আসন এই পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই ভাবিবার বিষয়। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব হইয়াও ভগবদনুগ্রহে এমন অনির্বচনীয় জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন যে, গতানুগতিক কালের সহিত অভঙ্গভাবে চলিবার ক্ষমতা তাঁহার প্রচুর ছিল। তাই যদি না হইত, তবে ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য যুবকগণ তাঁহার পদসংবাহন করিবার জন্য রাজধানীর প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইত কেন? তাঁহার বাণী বহন করিয়া একটি যুবক সুদূর আমেরিকার অন্তঃপাতী শিকাগো ধর্মসভায় অজ্ঞাতকুলশীলভাবে জনমণ্ডলীকে স্তব্ধীভূত করিয়াছিলেন কি করিয়া? কর্মিশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরের সেই আত্মভোলা ঠাকুরের মহামন্ত্রের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া অপরিচিত বৃহৎ জনসঙ্ঘকে চিরপরিচিত 'ভ্রাতাভগ্নী' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া ভারতীয় আদর্শ মতবাদ প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন—যে-মহামন্ত্রে পাশ্চাত্যদেশ পর্যন্ত জিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রের যিনি সম্পূর্ণ ভাগীদার আমরা তাঁহাকে হয়তো অনেকে চিনি না, বা চিনিতে চেষ্টা করি না। আজ তাঁহারই স্মৃতি রক্ষার্থ, তৎস্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার

উৎসবে আমরা সমবেত হইয়াছি। তিনি আর কেহ নন, আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের সহধর্মিণী সহ-কর্মিণী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী। গ্রাম্য ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়া তিনি কিরূপ উচ্চাদর্শের ও উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন তাহাই আমাদের লক্ষণীয় বিষয়।

আমরা আমাদের দেশের গুরুপুরোহিতদের মুখে শুনি, নারীজাতি নারায়ণ-পূজার অধিকারিণী নহে, এমন কি তাহারা 'ওঁ' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারে না। কারণ, তাহাদের বেদে অধিকার নাই অর্থাৎ তাহারা বেদপাঠ করিতে সমর্থা নহে। এশুধু আমাদের দেশেরই কথা নহে, সুসভ্য আলোকপ্রাপ্ত পাশ্চাত্যদেশীয় পুরোহিতের মুখেও শোনা যায়ঃ "স্ত্রীলোক নরকের দ্বারস্বরূপ।" তাঁহাদের ধর্মপুস্তক বাইবেল সমস্ত পাপের বোঝা নারীর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছে। পরের কথা ছাড়িয়া আমরা আমাদের নিজেদের ঘরের কথাই ভাবি—কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রাহ্মণেতর নারী মাত্রেই বৈদিক মন্ত্রের অধিকার হইতে বঞ্চিতা; কিন্তু ইহাই মজার কথা যে, বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি-দিগের মধ্যে পূজনীয়া গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রমুখা আমাদের দেশীয়া কন্যাগণও আছেন। ইহা কি অদ্ভুত কথা নহে যে, যাহারা মন্ত্রদ্রষ্টা তাহারা তাহা অধ্যয়ন করিতে পারিবে না। অতএব ইহা বৈদিক শাস্ত্রানুমোদিত বিধিনিষেধ বলিয়া মনে হয় না; মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মের অবনতিকালে পৌরাণিক ধর্ম কতকগুলি নূতন নূতন বিধি-নিষেধের গণ্ডি সৃজন করে, ইহা তাহারই একটি অঙ্গমাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুর তদীয় পত্নীকে স্ত্রী-শরীরী মনে না করিয়া একই আত্মার আধার, আশ্রয়স্থল বিবেচনা করিয়া বীজমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাই একদিন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ "আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?" ঠাকুর উত্তরে বলিতে পারিয়াছিলেনঃ "যে-মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই।" স্ত্রী-পুরুষে সম্পূর্ণ অভেদদৃষ্টি ছিল বলিয়াই তিনি ৺ষোড়শীপূজা সমাধান করিতে পারিয়াছিলেন। সকলের এদৃষ্টি থাকে না সত্য! তবে যদি কেহ আংশিকভাবে 'মহাজনগতপথ' অনুসরণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেনঃ "পরমহংস একজনই হয়। সকলে কি আর পরমহংস হয়।"

ঠাকুর বিরাট পুরুষ। ঠাকুরানী কি? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে বলিতে হয়, ঠাকুরানীও বিরাট। বিরাটের ছায়া ও কায়া দুই-ই বিরাট। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদাই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন এবং নিজেই বলিয়াছেন যে, ঠাকুরানী যদি সম্পূর্ণ কামলোভ বর্জিতা না হইতেন তাহা হইলে ঠাকুর কতটা সংযমের বাঁধ রাখিতে পারিতেন, বলা যায় না। এরূপ মণিকাঞ্চনের যোগ হইয়াছিল বলিয়াই আমরা এরূপ বিরাট স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছি।

আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।" ঠাকুর ও ঠাকুরানীর জীবনী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এই মতের ব্যত্যয় করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তখন প্রশ্ন হইতে পারে—তবে তাঁহারা দাম্পত্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন কেন? তাহার উত্তরে বলিতে হয়, অতি মহান ধর্মোজ্জ্বল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের মতে "ধর্মার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।" সাধারণ গৃহী ইহার সারবত্তা কতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, জানি না। তবে তাঁহারা যদি এই দম্পতিযুগলকে আপনাদের মতো সাধারণ নরনারীর পর্যায়ভুক্ত না করিয়া ঐশ্বরিক বিগ্রহরূপে দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয়ের রুদ্ধ কবাট খুলিয়া যাইবে, আশা করা যায়। আকাশ লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে তাহা যেরূপ অন্ততঃপক্ষে উন্নত বৃক্ষের মস্তকে আঘাত করে, সেইরূপ উন্নততর আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণ করিলে কতকটা আদর্শানুরূপ হইতে পারে, আশা করা যায়।

এই ক্রম অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুর ও ঠাকুরানীর মধ্যে অনন্ত প্রেম ও অভেদ আত্মা বিরাজিত। তাঁহাদের বিবাহ এক রহস্যজনক ব্যাপার,—যেন পূর্ব হইতেই সব ঠিকঠাক ছিল,

জীবনও এক রহস্যজনক ব্যাপার—মানুষের বুদ্ধির অগম্য। মৃত্যুও তদনুরূপ; ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ঠাকুরানী যখন এয়োর চিহ্ন শাঁখা খুলিতে যান, তখন ঠাকুর নাকি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন: "আমি কি মরেছি যে তুমি শাঁখা খুলছ।" তাই তিনি চিরকাল এয়োশ্রী ধারণ করিয়াছেন। তিনি স্বামীকে চিরকাল শ্রীভগবানের অবতাররূপে বিশ্বাস করিতেন ও সেইরূপেই স্বীয় প্রেম ও ভক্তি নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।

বাল্যাবধিই শ্রীশ্রীমা ভগবানের সত্তা সর্বত্র অনুভব করিতেন ও তাহাতেই তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল। একবার মা দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পথে পথ হারাইয়া ফেলেন, সঙ্গিগণ আগে আগে চলিয়া গিয়াছে। অন্ধকার প্রান্তর মধ্যে বলিষ্ঠ ও ভীষণ আকৃতির এক অপরিচিত পুরুষ ও তাঁহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া সরলা বালিকা বলিয়া বসিলেন: "বাবা, আমি পথ হারিয়েছি। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে থাকেন, সেখানেই যাচ্ছি।" ঐ ব্যক্তির স্ত্রীকেও একই ভাবে সম্বোধন করেন ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'তোমার জামাই' কথাটিতে মায়ের সহজ সরল বিশ্বাসের চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। এই পরম আত্মীয়ের ন্যায় কথায় কোন লোকই স্থির থাকিতে পারে না, পূর্বোক্ত স্বামী-স্ত্রীও পারিলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে আপন কন্যাজ্ঞানে গ্রহণ করেন ও আদর-যত্ন সহকারে তাঁহাকে আশ্রয়দান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। মায়ের এই মধুরক্ষরা বাণী চিরকালই ভক্তবৃন্দের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিত। 'মা' 'বাবা' 'মা' 'বাবা' প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে সর্বদাই তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে একটু কিছু না খাইয়ে কখনই তাহাকে যাইতে দিতেন না। কেহ যদি বলিত 'যাই' তখনই যেন মাতৃহৃদয়ে আঘাত লাগিত, অমনি সংশোধন করিয়া বলিতেন: "যাই বলতে নেই, বল আসি।" কদাপি কাহাকেও কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, যদি কোন সময় কঠোর বাক্য ব্যবহার করিতে হয়, এই ভয়ে তিনি অস্থির ছিলেন। একদিন কোন এক সাংসারিক কথায় বলিয়াছিলেন: "আমাকে বেশি জ্বালাবে না, কারণ আমি যদি চটেমটে কাউকে কিছু বলে ফেলি তো, কারো সাধ্য নেই যে, আর রক্ষা করে।" দক্ষিণেশ্বরে হিন্দু-ঘরের অবগুণ্ঠনবতী বধূরূপে বাস করিয়াও সকলের মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। মা যেন ঠিক ঘরের মা-টিই ছিলেন। সকল সন্তানের সাংসারিক অবস্থা, আয়-ব্যয়ের সংবাদাদি ও আত্মিক উন্নতি-অবনতির সকল সংবাদই তিনি অবগত ছিলেন; শিষ্যগণও নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট সব নিবেদন করিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। শিষ্যসম্প্রদায়ের তাঁহার প্রতি এত অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা মনে করিতেন, যদি মা একবার তাহাদিগের উপর করুণা-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। একদিন জনৈক শিষ্য বলিয়াছিল: "মা, আমার তো শান্তি হয় না। মন সর্বদা চঞ্চল—কাম যায় না।" এই কথা শুনিয়া মা এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। এই সংবাদ অন্য একজন প্রকৃষ্ট শিষ্যের কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন: "তবে আর কি? সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়।"

যিনি একবার অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সর্ববিষয়ে শ্রীভগবানের মঙ্গলময় হস্তের নিদর্শন দেখিয়া তৃপ্ত হন ও ভগবানের আশীর্বাদে সর্ববিষয়েই অগ্রগামী। তাই মা পৌরাণিক হইয়াও আধুনিক সংস্কৃতির পরিপন্থী তো ছিলেনই না বরং যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার স্কুলের ব্যবস্থাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেন। "মাদ্রাজের দুটি মেয়ে বিশ-বাইশ বছর বয়স, বিবাহ হয় নাই, নিবেদিতার স্কুলে আছে। আহা তারা সব কেমন কাজকর্ম শিখেছে। আর আমাদের পোড়া দেশের লোকে কি আট হতে না হতেই বলে—পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও।" ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বাল্য-বিবাহ নিরোধ বিধায় আইন লইয়া গত দুই বৎসর দেশময় হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছিল, বহু বৎসর পূর্ব হইতেই মা এই কুপ্রথার উপর কিরূপ বিরক্ত ছিলেন।

আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের ভিতর কেমন সুন্দর আধুনিকতার আলোক-রশ্মি দেখা দিয়াছে

মাতাঠাকুরানীর ব্যবহারে। তিনি অগস্ত্য-যাত্রাও মানিতেন, আবার স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতীও ছিলেন ; পরদেশীয়া ক্রিশ্চিয়ান কন্যাকে নিজ কন্যাজ্ঞানে কোলে টানিয়া আশ্বস্ত করিতে একবারও দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি নিজেকে পরের পায়ে বলি না দিয়া, পরকে নিজের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল পরের জন্য—socialism-এর চূড়ান্ত নিদর্শন। এইরূপ আদর্শবাদ আমাদের এই সীতা-সাবিত্রীর দেশেই সম্ভব। আমাদের দেশের কন্যাগণ যেন নকল মেমসাহেবের আদর্শ অবলম্বনে বিরত হইয়া দেশীয় মহীয়সী মহিলাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশীয় মা হইয়াই থাকেন। মাতৃহৃদয়ে স্নেহসম্ভার লইয়া ঘরে ঘরে তাঁহারা প্রতিষ্ঠিতা হউন। নিজেকে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আদর্শে গড়িয়া সকলের নিকট বিলাইয়া দিন—সন্তানকে দশের কাজের, দেশের কাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলুন। অসংযমের বন্যায় হাবুডুবু না খাইয়া সংযমের বন্ধনে নিজেকে বাঁধিয়া ফেলুন। তবেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, তবেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, তবেই দেশ ও দশের মঙ্গল সাধিত হইবে। একই বাণী স্বামী বিবেকানন্দের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া সর্বদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—

"হে ভারত। ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে—ভুলিও না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।"

যিনি এই ভারতীয় আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়াছেন, তিনি মাতৃপূজার পুষ্পাঞ্জলিপ্রদানের যোগ্য নহেন। সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত পরহিতার্থে উৎসর্গিত জীবনই মাতৃপূজার উপযুক্ত পূজক। পূজারিণীর যোগ্য জীবন আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া আজ আমরা—

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তু তে॥" বলিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর চরণে শরণ গ্রহণ করি।* ☐

উদ্বোধন, ৩৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪১, পৃঃ ৬৭-৭১

নিবন্ধ

অতুলনীয়া মা

সন্ধ্যা সেন

'মা'—এই ক্ষুদ্র একটি অক্ষরের মধ্যে যে কত শক্তি, কত ভালবাসা, কত নির্ভরতা লুকিয়ে আছে সাধারণ 'মা' ডাকের মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই 'মা'কে অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করতে পারি না। আর এই উচ্চারিত শব্দটি কেবল অসার প্রতিধ্বনিরূপে নিজের কানেই ফিরে আসে। ঠাকুর গাইতেন: "ডাকার মত ডাক দেখি মন কেমন শ্যামা থাকতে পারে?" যেমন করে সমস্ত মন প্রাণ শক্তি দিয়ে নিজের জন ও পার্থিব প্রিয় জিনিস আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করি তেমন শরণাগতি নিয়ে স্মরণ করি না 'মা'কে, নির্ভর করি না 'মা'য়ের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে। শুধু কথার কথা, তাই 'মা' ডাক কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়।

বাস্তবিক মা যে কি ও কে তা আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। মায়ের সাধারণ চলাফেরা, কাজ-কর্ম, ব্যবহার এসবের মধ্য দিয়ে মায়ের প্রকৃত সত্তাকে বুঝতে পারে কার সাধ্য যদি না তিনি দয়া করে আমাদের সেই দৃষ্টি, সেই অনুভূতি দেন? মায়ের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মধুর বাণী: "আমি সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়, সত্য—সত্য জননী।" এমন কেউ নেই যারা তাঁর এই আশ্বাসে রোমাঞ্চ অনুভব না করেছে। শুধু তাই নয়, ঐ ডাক যেন সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারাবেষ্টিত অনন্ত চরাচর মাঝে উত্থিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে অনন্তেই মিলিয়ে যায়। যারা তাদের অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তির সাহায্যে জানতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে তারাই মাকে পেয়েছে। তারা দেখতে পেয়েছে একটা সাধারণ রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে, সাধারণ বেশে ও সরলা পল্লীনারীর আচরণের মাধ্যমে তিনি হেসে খেলে কত কঠিন সমস্যার সমাধান করে গেছেন কত সহজ স্বাভাবিক ভাবে।

এখন প্রশ্ন জাগে, এই 'মা' কে? মা যে কি ও কে, তা বুঝতে হলে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও আচরণ বিচার ও বিশ্লেষণ করে এগোতে হবে। তবে তার আগে মায়ের একটা কথা মনে পড়ছে। শ্রীশ্রীমা বলেছেন: মাতৃভাব বিকাশের জন্য ঠাকুরের এবার আসা। সেই মাতৃভাব বিকাশের জন্য তাঁকে তিনি রেখে গেছেন। মাতৃশক্তি কি ও কি সেই শক্তির স্বরূপ? ঠাকুর একটি গান গাইতেন:

> "নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি
> তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।"

অন্তহীন নিবিড় আঁধারে মায়ের রূপহীন রূপের বিকাশ। সেই রূপরাশি ঠাকুরকে উন্মাদ করে তুলেছিল। রূপহীন মা রূপে ধরা দিলেন রক্তমাংসের শরীরে—মা সারদার রূপে। কীটপতঙ্গ, পশু-পাখি, সাধু-অসাধু সকলের মা হয়ে তিনি এলেন তিনি ঠাকুরের ভোগের লুচি খাওয়ান বিড়ালকে, ভোগের আগেই নৈবেদ্য থেকে তুলে দেন ক্ষুধার্ত বালককে, গরুর হাম্বা ডাকে অস্থির হয়ে ওঠেন, টিয়াপাখির ডাকে ব্যাকুল হন, পতিতার গলা জড়িয়ে ধরে অভয় দেন, দস্যুকে পাশে বসিয়ে মায়ের স্নেহে খাওয়ান, অস্পৃশ্যকে ঘরে ডেকে এনে বসান। জগৎপ্লাবী এ এক অদ্ভুত মাতৃসুধার মূর্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-মাকে দেখেছিলেন বিশ্বচরাচরের প্রসবিত্রীরূপে, তাঁকেই তিনি বিশেষভাবে দেখতে পেলেন শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে। মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?" ঠাকুর যোগনেত্রে অবলোকন করে বুঝতে পারলেন, সম্মুখে অবস্থিত তাঁর পদসম্বাহনরতা তাঁর স্ত্রী-রূপে এই নারী কে? তাই স্বচ্ছন্দে তিনি উত্তর দিলেন: "যে-মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন।" মা যেন আস্তে আস্তে অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছেন। মা যে-প্রশ্নটি ঠাকুরের কাছে রেখেছিলেন সেটা কোন সহজ প্রশ্ন নয়। তিনি কে সেটা যাচাই করার জন্য যেন এই জিজ্ঞাসা। ঠাকুর এক জায়গায় ভক্তদের বলেছেন, এখানে যারা আসে তারা দুই থাকের লোক। এক থাকের যারা, তারা বলে আমাদের উদ্ধার করো। আর শেষের

থাকে যারা তাদের দুটো জিনিস জানলেই হলো। একটি আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে এবং তারা (ভক্ত) কে ? আর একটি হলো আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি ? আর এই প্রশ্নই করেছিলেন মা ঠাকুরকে। সেদিন ঠাকুর সুস্পষ্টভাবে মায়ের প্রকৃত স্বরূপ জানালেন। আরও বললেন : "সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" কোন্ অতীন্দ্রিয় সত্তায় অবস্থান করলে এই দৃষ্টি আসে ? এই মা-কে জানতে ঠাকুরকে করতে হয়েছিল দুর্জয় তপস্যা। চোখের জলে নিজেকে নিঃশেষ করে চিন্ময়ী মায়ের দ্বারে এসে দেখলেন তিনিই আরেক রূপে এসেছেন তাঁরই পাশে তাঁর ব্রতসহায়কারিণী রূপে।

ঠাকুর বলতেন : "ও আমার শক্তি।" বলতেন : "ও সারদা—সরস্বতী।" অবশেষে ষোড়শীপূজার রাত্রিতে নিজের সাধনার ফল তাঁর চরণে সমর্পণ করে ভূলুণ্ঠিত হয়ে তিনি প্রণিপাত করলেন। ঠাকুর যখন মাকে বিবাহ করেন, তখন মা ছিলেন নিতান্ত বালিকা। মা যখন আর একটু বড় হলেন লীলাপ্রসঙ্গে তখনকার অপূর্ব একটি ছবি পাই : "পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধিবিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্ন লাভে ঐকালে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিত হইয়াছিলেন।··· কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, বালিকা তখন অত্যন্ত আনন্দসম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন।··· তাঁহার চলন বলন আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর··· একটি পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল।···" তিনি তখন শান্ত, চিন্তাশীল ও নিঃস্বার্থ প্রেমিকায় রূপান্তরিত হয়ে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত হয়েছেন।

মনের অতলান্ত প্রশান্তি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে জয়রামবাটীর মাতাপিতার বৃহৎ সংসারের দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে মা অবলীলাক্রমে সমস্ত কাজ করছেন। অভাব-অনটনের মধ্যে পরিবারের সকলকে সেবা করছেন। অন্যদিকে চলছে এক নিদারুণ মনোকষ্ট। পাড়াপড়শী, আত্মীয়স্বজন 'পাগলের বৌ' বলে মাকে অনুকম্পা, অবহেলা ও অবমাননা করছে। কিন্তু তিনি সমস্তই সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো সহ্য করেছিলেন। তাঁর পাশে তখন এমন কেউ ছিল না যে, তাঁর হয়ে কিছু যন্ত্রণা ধারণ করে তাঁকে একটু হালকা করবে। প্রতিকূল অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঠাকুরের কাছে মিলিত হওয়ার জন্য এ যেন মায়ের তপস্যার পর্ব। ধীরে ধীরে সংযম, স্থির বুদ্ধি ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সাহায্যে একটির পর একটি মানসিক ও পারিপার্শ্বিক বাধা অতিক্রম করেছেন তিনি। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছালেন স্বামীর পদপ্রান্তে। পেলেন স্বামীর সাগ্রহ অভ্যর্থনা। তিনি যেন এতকাল তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিলেন।

একদিন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ ?" মা একটুও দ্বিধা না করে উত্তর দিলেন : "না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব ? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" মায়ের হৃদয়ে মহাশক্তির চৈতন্য-স্বরূপটি যদি অধিষ্ঠিত না থাকত তাহলে কি এই উত্তর বেরিয়ে আসত মায়ের মুখ থেকে ? ঠাকুর কি অবাক হয়েছিলেন ? ভেবেছিলেন কি 'সারদা' নামে গ্রামের এই মেয়েটি কি সত্যই অত শক্তি অর্জন করে প্রস্তুত হয়ে এসেছে ? আমাদের মনে হয়, তিনি অবাক হননি মোটেই। এই উত্তরটিই সারদার কাছ থেকে যে আসবে তা তিনি জানতেন।

ঠাকুরের বেদান্ত-সাধনার গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী একসময় বলেছিলেন : "[ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছে জানিয়া] স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন তাহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে।" তোতাপুরীর এই কথা ঠাকুরের স্মরণপথে উদিত হলো। বহুকালব্যাপী সাধনলব্ধ নিজ শক্তির পরীক্ষার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। স্ত্রীরূপে সারদামণিও ঐ একই পরীক্ষায় তাঁর সঙ্গে সামিল হলেন।

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখছেন : "পূর্ণযৌবন ঠাকুর ও নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এইকালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যেসকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোন মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না।··· দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের

প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে, সাধারণ মানবের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে একক্ষণের জন্যও উদিত হইত না। ঐরূপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতীত হইয়া ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতীত হইল—কিন্তু এই অদ্ভুত ঠাকুর ও ঠাকুরানীর সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হইল না।"

ভাবতে অবাক লাগে, কি অদ্ভুত তাঁদের মহিমা যার উপমা চলে না—অনুপম, অনন্য। বিরাট হিমালয়ের গাম্ভীর্যে তা আবৃত। অগ্নিপরীক্ষা শেষ হলো। সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন দুজনেই। কেউ কারও চেয়ে কম নন।

এরপর প্রস্তুতি শুরু হলো আর একটি পর্বের জন্য। যাঁকে সকল দায়িত্ব নিয়ে চলতে হবে, যুগাবতারের অবর্তমানে তাঁকে জগৎসংসারে ও সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ঠাকুর আয়োজন করলেন দেবীর বোধনের—ফলহারিণী অমাবস্যার মহানিশায়। ঠাকুর প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁর মনে এই অদ্ভুত বাসনার উদয় হয়েছে। এত বড় একটা ঘটনা ঠাকুর ঘটালেন, কিন্তু মা নির্বিকার, অচঞ্চল, স্থির। যেন কিছুই ঘটেনি এমনি একটা ভাব নিয়ে পরদিন প্রত্যুষে নিত্যকার কাজের ধারায় নিজেকে মিশিয়ে দিলেন। এই মুহূর্তে ঠাকুরের একটি অতি সুন্দর ও গভীর উপমার কথা মনে পড়ে। ঠাকুর ভক্তদের বলছেন, মহাভাব– ঈশ্বরের ভাব। দেহ-মন তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা হাতি কুঁড়েঘরে ঢুকেছে। ঘর তোলপাড়। হয়তো ভেঙেচুরে যায়। কিন্তু সায়র দীঘিতে হাতি নামলে টের পাওয়া যায় না। আমাদের মা সেই 'সায়র দীঘি'।

যত দিন যেতে লাগল ঠাকুর দেখতে পেলেন, মায়ের মধ্যে ভাব ধারণ করবার শক্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ছেলেরা একটু বেশি খেয়েছে, কি অন্য কেউ তাঁর খাবার থালা এনে দিয়েছে ঠাকুর যেন তাতে বিরক্ত। কিন্তু মা যেই বলছেন, "আমার ছেলেদের আমি দেখব" বা "আমার কাছে 'মা' বলে কিছু চাইলে আমি না বলতে পারব না", অমনি যেন সাপে মন্ত্র পড়ার মতো চুপ হয়ে যান ঠাকুর। মা কে এটা জানতে বা বুঝতে পেরেই ঠাকুর হৃদয়কে একদিন বলেছিলেন: "এর [নিজেকে দেখিয়ে] ভিতর যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; কিন্তু ওর ভিতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবে না।"

কাশীপুরে একদিন ঠাকুর মাকে বলছেন: "তুমি কি কিছু করবে না? এই (নিজেকে দেখিয়ে) সব করবে?" মা বললেন: "আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?" ঠাকুর বললেন: "তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।" বাস্তবিক, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর দীর্ঘকাল স্থূলদেহে বর্তমান থেকে মাকে অনেক বেশিই করতে হয়েছিল। যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম, দয়া, বুদ্ধি দিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন-রূপ ইমারত তৈরি হয়েছে তার পিছনে মহাশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইচ্ছাশক্তি না থাকলে কখনই তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব হতো না। মা-ও বুঝেছিলেন, অনেক কাজ বাকি রয়েছে। পরবর্তী কালে দেখা গেল যে, তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞা ভিন্ন রামকৃষ্ণ সংঘ রূপলাভ করতে পারত না। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের কাছে মায়ের কথা ছিল ঈশ্বরের আদেশস্বরূপ। স্বামীজীর কাছে মা ছিলেন সংঘের 'হাইকোর্ট'।

স্বামীজী বলতেন, মায়ের মমতা এবং স্নেহের শক্তিতে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অর্থ ছিল না, প্রতিপত্তি ছিল না, তিনি ছিলেন দরিদ্র। কিন্তু তাঁর ছিল দিব্য-দৃষ্টি, ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জগৎকল্যাণব্রত সম্পর্কে ধ্রুব বিশ্বাস। ঠাকুরের তিরোধানের পর ত্যাগী সন্তানগণের সামনে যখন বিরাট শূন্যতা নেমে এসেছে তখন দরিদ্র, অশিক্ষিতা সদ্যোবিধবা এই পল্লীনারী এগিয়ে এলেন। তাঁদের প্রাণে দিলেন শক্তি, হৃদয়ে দিলেন সাহস, দৃষ্টিতে দিলেন অনাগত বিশ্বপ্লাবী রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন এবং তার সুমহান ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট রূপরেখা। আর নিরন্তর চোখের জলে প্রার্থনা জানাতে থাকলেন, তাঁর সন্তানরা যেন স্থায়ী ধর্মসংঘ গড়ে তুলতে পারে, ঠাকুরের ভাব ও আদর্শ নিয়ে সংঘবদ্ধ থাকে জগতের মানুষের কল্যাণ-ব্রত এবং সাধনায়। আজ সেই ধর্মসংঘ বিশ্ববিস্তৃত। এই সংঘের তিনি প্রসবিত্রী, তিনি জননী। □

প্রাসঙ্গিকী

শারদীয়া সংখ্যা ঃ একটি জিজ্ঞাসা

গত শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৯৯) সুধীরচন্দ্র সামুইয়ের লেখা 'শ্রীমা সারদাদেবীর পদপ্রান্তে' শিরোনামে স্মৃতিকথাটি পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। গ্রামের কুসংস্কারের জন্য শ্রীমাকেও জরিমানা দিতে হয়েছে, সেকথা জেনে শিহরিত হচ্ছি। শ্রীযুক্ত সামুই লিখেছেন : "যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বৈঠকখানায় গ্রামের প্রধানদের মজলিস বসে গেল। তখন গ্রামে পাঁচজন মুখ্য ব্যক্তি ও জমিদারের এক প্রতিনিধি মিলে সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি ও বিচার করতেন। ঐদিনের মজলিসে জিবটা গ্রামের জমিদার-পরিবারও নিমন্ত্রিত ছিলেন। ঐ মজলিসে জমিদারদের প্রতিনিধি হিসাবে শম্ভুনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ঐ মজলিসে ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন।" (পৃঃ ৪৮০)

জানতে ইচ্ছা হয়, মজলিসে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ কি সকলেই জয়রামবাটীর অধিবাসী ছিলেন অথবা অন্য কোন গ্রামের? সুধীরচন্দ্র সামুইয়ের ঠিকানা আমার জানা নেই, সেজন্য উদ্বোধনের মাধ্যমে তাঁর কাছে এই প্রশ্নটি উপস্থিত করলাম।

মণিদীপা চট্টোপাধ্যায়
রাউরকেল্লা, উড়িষ্যা

এবারের শারদীয়া সংখ্যা

বাঙালী সংস্কৃতি এবং বাঙালীর উচ্চ অধ্যাত্ম-চিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য বাহক হয়ে উঠেছে এবারের শারদীয়া উদ্বোধন (১৩৯৯)। উদ্বোধন-এর প্রতিটি সংখ্যাই হৃদয়গ্রাহী। আমাদের মগ্ন চৈতন্যকে জাগ্রত করে প্রতিবারই সে আমাদের নতুন আলোকের সন্ধান দেয়। তবে নিজের সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও উদ্বোধন তার এবারের শারদীয়া সংখ্যায় একটি বিশেষ আবেদন রাখতে সক্ষম হয়েছে পাঠকবৃন্দের কাছে।

এবারের উদ্বোধন-এর প্রচ্ছদটি অবশ্যই একটি বিশেষত্বের দাবি করে। রুচিশীলতা, মননশীলতা এবং বক্তব্যের গভীরতায় সাম্প্রতিককালের বাঙলা শারদীয়ার জগতে এটি সবদিক দিয়ে অভিনব এবং দৃষ্টিনন্দনও। সম্পাদকীয়, ভাষণ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, অতীতের পৃষ্ঠা থেকে, মাধুকরী, পরিক্রমা, বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ প্রভৃতি প্রতিটি বিভাগই এবারের শারদীয়া সংখ্যায় তথ্যসমৃদ্ধ এবং উচ্চাঙ্গের রচনাসমূহের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। নিজে পাঠ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ তো করেছিই, সেই সঙ্গে বারবার মনে হয়েছে, সকলেই যদি এগুলি পড়ত!

এবারের শারদীয়া সংখ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দূষণমুক্ত পৃথিবীর প্রথম আহ্বান'। এই 'বিশেষ রচনাটি' আমাকে চমৎকৃত করেছে। সত্যদ্রষ্টা ঋষির অন্তরে সর্বংসহা পৃথিবীর অন্তরের অব্যক্ত আর্তনাদ মর্মভেদী ধ্বনি তুলেছিল। আজ বিপন্ন বসুন্ধরাকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নেতৃবর্গ গভীরভাবে ভাবছেন। তাঁরা বলছেন, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দূষণ রোধ করা না হলে বসুন্ধরার বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সব দূষণের মূলে যে-দূষণ—যাকে লেখক 'মানবদূষণ' বলে চিহ্নিত করেছেন—তার প্রতিরোধ না হলে দূষণমুক্তির সমস্ত প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কিন্তু এই সত্যটি পৃথিবীর কোন নেতাই ভাবছেন বলে জানি না। লেখক অনবদ্যভাবে তাঁর রচনায় দেখিয়েছেন, শিকাগোর বিশ্বধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম বিশ্বনেতৃবর্গের দৃষ্টিকে এদিকে আকর্ষণ করেছিলেন। স্বামীজীর সেই আহ্বানকে পুনরায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে বলি, সুধীরচন্দ্র সামুইয়ের লেখা "শ্রীমা সারদাদেবীর পদপ্রান্তে" শীর্ষক স্মৃতিকথাটিতে শ্রীশ্রীমাকে যেন আমাদের খুব কাছে পেলাম। কাছের মানুষ তিনি সবসময়ই, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিতে তিনি যে সত্যিই আমাদের বড় কাছের মানুষ সেটি যেন নতুন করে আবার অনুভব করলাম। মাতৃসান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্যে ধন্য শ্রীযুক্ত সামুইকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। □

আরতি ঘোষ
চন্দননগর, হুগলী

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

মাথাধরা

কুমকুম ঘোষ

কথায় বলে, 'মাথা থাকলেই মাথা ধরে'। আমাদের সকলেরই মাথা আছে; অতএব মাথা আমাদের সকলেরই ধরে। অর্থাৎ খুব কম লোকই আছেন যাঁদের সারা জীবনে কখনো মাথা ধরেনি। প্রশ্ন হচ্ছে, জন্তু-জানোয়ারদেরও কি মাথা ধরে? হয়তো ধরে, কারণ অনেক জন্তু-জানোয়ারেরই মেনিনজাইটিস, এনসেফেলাইটিস (মস্তিষ্কের প্রদাহ) প্রভৃতি রোগ যে হয়, তা আমরা জানি। তবে তাদের মাথা ধরে কিনা এবিষয়ে সঠিকভাবে বলা মুশকিল।

মাথাধরা কি?

প্রথম আলোচ্য বিষয়, 'মাথাধরা' ব্যাপারটা কি? মাথার যেকোন রকম যন্ত্রণাকেই মাথাধরা বলে অভিহিত করা উচিত, তবে সাধারণ অর্থে মুখ, গলা ও ঘাড়ের যন্ত্রণাকে বাদ দিয়ে কপাল এবং তার ওপরের যন্ত্রণাকেই মাথাধরা বলা হয়। এর মধ্যে মাথাধরা, মাথায় যন্ত্রণা, মাথা দপদপ বা কটকট করা, মাথাব্যথা, মাইগ্রেন (migraine) বা আধ-কপালে ইত্যাদি সবকিছুই 'মাথাধরা' পর্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

মাথার গঠন

মাথা কিভাবে ধরে, একথা জানতে হলে মাথার গঠন সম্পর্কে দরকারী কয়েকটি কথা জানা দরকার। মাথার আকার, আয়তন ইত্যাদি গঠন করছে খুলি (skull)। মাথার খুলির বাইরে আছে ত্বক, পেশী, চুল ইত্যাদি এবং ভিতরে আছে মস্তিষ্ক (brain)। খুলির ভিতরের গায়ে আছে বহু বড় বড় রক্ত-শিরা বা সাইনাস (sinus)। মাথাধরায় এগুলির খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমাদের মস্তিষ্কের আবার তিনটি আবরণ আছে, যাদের বলে মেনিনজেস (meninges)। এদের মধ্যে সবচেয়ে বাইরেরটি হচ্ছে ডুরা মেটার (dura mater), যেটি খুলির ভিতরের গায়ে লেগে থাকে। তার ভিতরের দুটি হলো অ্যারাকনয়েড (arachnoid) ও পায়া মেটার (Pia mater)। পায়া মেটার মস্তিষ্কের গায়ে ওতপ্রোতভাবে লেগে থাকে। এই তিনটি আবরণের মধ্যে ডুরা মেটারের একটি বিশেষত্ব আছে। ডুরা মেটার বেশির ভাগ জায়গায় খুলির গায়ে লেগে থাকলেও কোন কোন জায়গায়, যেখানে মস্তিষ্কের গায়ে বড় বড় খাঁজ আছে, সেই খাঁজ ধরে নেমে আসে। এই ডুরা মেটারের গায়ে আবার বহু ধমনী, শিরা-উপশিরা ইত্যাদি আছে।

মাথাধরার কারণ: ১

যেকোন মাথাধরায় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের এক বা একাধিক ভূমিকা থাকে:

(১) খুলির ভিতরের বা বাইরের ধমনীগুলির ওপর টান পড়া (traction) বা কোন কারণে এগুলিতে রক্তসঞ্চালন কমে রক্তবৃদ্ধি পাওয়া (congestion) এবং এগুলি ফুলে ওঠা (dilatation);

(২) খুলির ভিতরের এবং ডুরা মেটারের সাইনাসগুলির ওপর টান পড়া;

(৩) কোন ভাবে ডুরা মেটারের ওপর টান পড়া বা ক্ষতি হওয়া;

(৪) মাথার এবং ঘাড়ের স্নায়ুশিরাগুলির (cranial and spinal nerves) ওপর টান পড়া;

(৫) মাথার এবং ঘাড়ের পেশীগুলির সঙ্কোচন (spasm)।

মাথাধরার কারণ কি বা উপরোক্ত অবস্থাগুলি কখন কার্যকরী হয় এ-সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, এদের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই

পরিষ্কার বোঝা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাথাধরা দৈনন্দিন মানসিক ক্লান্তি, অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এটি খুলির ভিতরের কোন মারাত্মক অসুখের ইঙ্গিত বহন করতে পারে। সেজন্য চিকিৎসকরা অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল যাবৎ মাথাধরাকে গুরুত্ব দিয়ে রোগীকে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। মাথার ঠিক কোন্ জায়গায় ব্যথা হয়, কতক্ষণ মাথাধরা থাকে, দিনরাত্রির কোন্ সময়ে মাথা ধরে —এইসব খবরগুলি রোগনির্ণয়ে অনেক সাহায্য করে। কচিৎ দু-এক সেকেন্ডের জন্য মাথাধরাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না; আবার একটানা মাথাধরা চলতে থাকলে মেনিনজাইটিস অথবা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কথা ভাবতে হয়। আবার মাইগ্রেন-এর মাথাব্যথা সকালে আরম্ভ হয়ে এক ঘণ্টাতেই খুব বেড়ে যায়। ঘাড়ের শিরদাঁড়ায় প্রদাহ (cervical arthritis)-জনিত ব্যথা বিশ্রামের পর শরীরের প্রথম নড়াচড়া আরম্ভ হতেই শুরু হয়। চোখের জন্য ব্যথা পড়াশুনা করলে, জোর আলোর মধ্যে থাকলে অথবা সিনেমা দেখাকালীন আরম্ভ হয়। এই সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অসুখের আলোচনা করা যাক। মেনিনজাইটিস অসুখে সাধারণতঃ রোগীর সমস্ত মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। এছাড়া জ্বর প্রভৃতি অন্যান্য উপসর্গও থাকে। মস্তিষ্কের আবরণে (meninges) সরাসরি আঘাত লাগলেও মাথার খুলিতে আঘাত লাগার জন্য মাথায় যন্ত্রণা হয়। এছাড়া মস্তিষ্কে টিউমার হলে এর প্রধান উপসর্গ হিসাবে তীব্র মাথাধরা শুরু হয়। তবে মাথা দপদপ করতে বা নাও করতে পারে এবং ব্যথা দিনে অনেকবার হতে পারে। চুপচাপ শুয়ে থাকলে ব্যথা কমে, রাত্রে ব্যথার জন্য ঘুম ভেঙে যেতে পারে এবং বমি হলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। দেখা যাচ্ছে যে, মাথায় যন্ত্রণার উপরোক্ত কারণগুলির উৎপত্তি হলো খুলির ভিতরের বিভিন্ন অসুখ।

মাথাধরার কারণঃ ২

খুলির বাইরের বিভিন্ন কারণের জন্যও মাথা ধরে। নাক ও চোখ মাথাধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। নাকের চারপাশে হাওয়া-ভর্তি গহ্বর বা সাইনাস (sinus) থাকে। এই সাইনাসগুলির ফাঁকা জায়গা সর্দিতে বা জীবাণুজনিত রোগে (infection) বন্ধ হয়ে গেলে মাথায় যন্ত্রণা হয় এবং তা হয় প্রধানতঃ কপালে ও গালে। এতে মাথা দপদপ করে এবং সাধারণতঃ দিনের নির্দিষ্ট সময়ে (সকালের দিকে) ব্যথা হয়, ঘাড় নিচু করলে ব্যথা বাড়ে। চোখের জন্য মাথায় যে-ব্যথা হয় তা অনেকটা কনকনে ধরনের এবং অনেকক্ষণ চোখের কাজ করার পর এই ব্যথা শুরু হয়। অনেক সময় মাথাধরাই প্রথম ইঙ্গিত দেয়, কারো চশমার প্রয়োজন বা চশমা বদলের প্রয়োজন আছে কিনা। সাধারণতঃ দৃষ্টিশক্তির গলদের জন্য মাথা ধরলে বুঝতে হবে, হাইপার মেট্রোপিয়া (hypermetropia) যাতে প্লাস পাওয়ারের চশমা লাগে অথবা অ্যাস্টিগম্যাটিসম (astigmatism) যাতে সিলিন্ড্রিক্যাল চশমা লাগে। এছাড়া ঘাড়ের বিভিন্ন অসুখ যেমন আথ্রাইটিস, স্পন্ডিলাইটিস ইত্যাদির জন্য মাথাধরাও বিরল নয়। আবার অতিরিক্ত মদ্যপান, ধূমপান, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি কারণেও মাথা ধরতে পারে। রক্তচাপবৃদ্ধি পাওয়ার (high blood pressure) জন্যও মাথায় যন্ত্রণা হয়। তবে ডায়াস্টোলিক (diastolic) রক্তচাপ ১০০ মিলিমিটার মার্কারির ওপর হলেই নিয়মিত মাথা ধরে। অনেক রোগই আছে যার প্রাথমিক লক্ষণই হলো মাথাধরা। আর জীবাণুসংক্রমণজনিত খুব কম অসুখই আছে যাতে মাথা ধরে না। এর মধ্যে টাইফয়েড, ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতিতে মাথাধরা খুবই তীব্রভাবে দেখা দেয়।

বিশেষ ধরণের মাথাধরা

এবার কতকগুলি বিশেষ ধরনের মাথাধরার কথা বলা যাক। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মাইগ্রেন। মাইগ্রেনকে দুভাগে ভাগ করা হয়—ক্ল্যাসিক্যাল ও সাধারণ। ক্লাসিক্যাল অসুখের সাধারণতঃ (৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে) বংশগত ইতিহাস থাকে। এর শুরু হয় শৈশবে বা কৈশোরে। এতে মাথার একদিকে দপদপে ব্যথা হয়, আলো এবং আওয়াজে সেই ব্যথা বাড়তে পারে এবং বমিও হতে পারে। আরগট (ergot) জাতীয় ওষুধে কাজ হতে পারে।

সাধারণ মাইগ্রেনে অসুখ শুরু হয় একটু বেশি বয়সে। এর বংশগত ইতিহাস থাকে না, ঘন ঘন মাথা ধরে এবং আরগট ওষুধে কাজ হয় না। 'ক্লাসটার হেডেক' (cluster headache) নামে আরেক ধরনের মাথার যন্ত্রণা আছে। এটি পুরুষদের বেশি হয়। মাথার একদিকে, প্রধানতঃ চোখে ব্যথা হয় এবং ব্যথা শুরু হয় ঘুমিয়ে পড়ার দু-তিন ঘণ্টা পর থেকে। এর যন্ত্রণা খুব তীব্র; ব্যথার সময়ে নাক বন্ধ হয়ে যায় এবং নাক ও চোখ থেকে জল ঝরে। এছাড়া অন্যান্য উপসর্গও থাকে। এটি থাকে প্রায় এক ঘণ্টা এবং কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে প্রতি রাত্রে দেখা দেয়। সৌভাগ্যক্রমে, অসুখটি খুব ঘন ঘন দেখা যায় না।

মাথাধরার মানসিক কারণ

মানসিক কারণেও মাথায় যন্ত্রণা হতে পারে। আশঙ্কা থেকে এবং অন্যান্য মানসিক উত্তেজনায় মাথাধরা বিচিত্র নয়। এজন্য আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মাথাধরার রোগীর সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে বেশি। ঐসব দেশে নানা অসুখের প্রতিরোধক ব্যবস্থার উন্নতি হলেও মাথাধরার ক্ষেত্রে খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি। মানসিক কারণে মাথাব্যথা মাথার দুধারেই হয় এবং মাথার ওপর পর্যন্ত ব্যথা করে। অনেক ক্ষেত্রে মাথার পিছন দিকে ব্যথা করে। দিন-রাত্রি ধরে ব্যথা চলতে পারে। এতে ঘুম হয়, তবে জাগলেই মাথা ধরে এবং ট্যাবলেটে কাজ হয় না। মাথাধরা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, মাথাধরার তীব্রতার অভিব্যক্তি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়। কেউ অল্পে কাতর হয়ে পড়েন; কেউ বা বেশি যন্ত্রণাকেও উপেক্ষা করেন। সেজন্য রোগীর মানসিক প্রবণতা এবং সহনশীলতা এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসক রোগীর সঙ্গে কথাবার্তা বললেই রোগী কোন্ ধরনের তা বুঝে নেন। তবে মাথাধরা এমন একটি অসুখ, যার ভাল করে অনুসন্ধান করার পরও তার প্রকৃতি নির্ণয় করা সহজ নয়।

চিকিৎসা

এখন মাথাধরার চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য এই রোগে ভুক্তভোগীরা এর চিকিৎসা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং প্রয়োজনে দোকান থেকে মুড়ি-মুড়কির মতো অ্যাস্পিরিন জাতীয় ট্যাবলেট কিনে ব্যবহার করেন। খুব কম ক্ষেত্রেই অর্থাৎ খুব বেশি বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে তাঁরা ডাক্তারের কাছে যান। তবে মনে রাখা উচিত যে, ব্যক্তিবিশেষে অ্যাস্পিরিন বিভিন্ন শরীরাংশে (বিশেষতঃ পাকস্থলীতে) রক্তক্ষরণ (haemorrhage) সৃষ্টি করতে পারে। অসুখটি সারা পৃথিবীব্যাপী বলে মাথাধরার নানা ধরনের নতুন নতুন ওষুধ (ট্যাবলেট) বার হয়েই চলেছে। বৈজ্ঞানিকভাবে মাথাধরার চিকিৎসা করতে গেলে সবচেয়ে দরকারী বিষয় হলো মাথাধরার কারণটি খুঁজে বার করা এবং সেটি দূর করা। প্রাত্যহিক পরিশ্রম ও ক্লান্তির জন্য, ধূমপান এবং মদ্যপান করার জন্য মাথাধরা সারানো যায় উপরোক্ত কারণগুলিকে দূর করে, যদিও বাস্তবে ঐ দুটি করা খুব কঠিন। যাঁরা নিরাশাজনিত কারণে বা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য মাথার যন্ত্রণায় ভোগেন তাঁদের নিরাশা দূর করার এবং কোষ্ঠকাঠিন্য সারানোর চেষ্টা করা উচিত। রক্তচাপবৃদ্ধি বা ব্লাড প্রেসারের জন্য মাথা ধরলে রক্তচাপ কমানোর চিকিৎসা দরকার। রক্ত নালীগুলিতে রক্তসঞ্চালন কমে রক্তবৃদ্ধি পাওয়ার (congestion) দরুণ মাথা ধরতে পারে। এজন্য মালিশ করলে বা মাথা টিপে দিলে রক্তসঞ্চালন বাড়ে বলে মাথাধরায় আরাম হয়। তবে মাইগ্রেনের মতো অসুখের সন্তোষজনক সুচিকিৎসা এবং প্রতিরোধ এখনও বার হয়নি।

মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই মাথাধরায় ভুগে আসছে এবং মানুষ যতদিন থাকবে, তার মাথাধরাও ততদিন থাকবে। আর মাথাধরার সবচেয়ে সাধারণ কারণ যেহেতু শ্রান্তি, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মানসিক চাপ ইত্যাদি, সেহেতু বেশির ভাগ মাথাধরার ক্ষেত্রেই সুষম খাদ্য, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, নিয়মিত ব্যায়াম ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখলে সুফল পাওয়া যায়। □

গ্রন্থ-পরিচয়

নারীর জীবন ও সমাজজীবনে নারী

কঙ্কাবতী মিত্র

স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ : জ্যোতির্ময়ী দেবী। প্রকাশক : অশোকা গুপ্ত। ৪০৪/৫ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-২৯। মূল্য : পনেরো টাকা।

চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা : জ্যোতির্ময়ী দেবী। অনন্য প্রকাশন, ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। মূল্য : বাইশ টাকা।

যে-দুটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ মিলেছে, তাদের লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে বিশেষভাবে পরিচিত। বাংলার বাইরে বাঙালীদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল যে-সারস্বত পরিবেশ, তেমনই এক সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়েছিলেন লেখিকা। তাঁর পরিবারের কৃতী ব্যক্তিরা যেমন প্রশাসনে সুদক্ষ ছিলেন, তেমনই ছিলেন সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির আন্তরিক অনুরাগী। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে স্বামীকে হারান তিনি; কিন্তু বৈধব্য তাঁকে হারাতে পারেনি। অপরিমেয় প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি সমকালীন যেকোন জনকল্যাণমূলক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। সাহিত্যচর্চাতেও তিনি মগ্ন থেকেছেন আজীবন।

অভিজাত সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারের এই বিদুষী মহিলার দেখা ও জানার পরিধি বিস্তৃত ও ব্যাপক। সমাজের নানা স্তরের স্বনামধন্য বহু মানুষের যেমন তিনি স্নেহধন্যা ছিলেন, তেমনি অনেক খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিও তাঁর স্নেহ-সাহচর্যে কৃতার্থ বোধ করতেন। সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অপরিসীম মূল্য শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ লেখিকার স্মৃতিকথা। অধুনালুপ্ত 'উত্তরা' পত্রিকায় ছেষট্টি বছর আগে তাঁর স্মৃতিকথার কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরে 'মহিলা মহল' পত্রিকায় কিছু প্রকাশ হয়েছে। এখন গ্রন্থবদ্ধ হলো সত্তর-আশি বছর আগেকার এক সরস বিবরণ। লেখিকার কথায় —"সেই সেকালের মানুষের সুখ-দুঃখের, কাজ-কর্মের, খেলা-কৌতুকের, উৎসব-আমোদ-প্রমোদের, দান-পুণ্যের, অতিথি-সজ্জনের, আত্মীয়-কুটুম্বের, বন্ধু-বান্ধবের কথা" আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত।

গ্রন্থের বর্ণনা সহজ-সরল এবং খুবই আন্তরিক। সেকালের সমাজ, আচার-বিচার, ঘরগেরস্থালির নানান ঘটনায় ভরে আছে বইটি। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এবং নির্মোহ আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখিকা যা বলেছেন, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট। লেখিকার "সোনার শৈশবের সোনার সেকাল" থেকে পরবর্তী জীবনের বহু ঘটনা এবং এই সূত্রে সামাজিক জীবনে নানা বিধিনিষেধের প্রসঙ্গ এখানে যেমন পাওয়া যাবে, তেমনই বহু উল্লেখযোগ্য মানুষের উপস্থিতি গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করার মধুর প্রাপ্তি ঘটবে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, লেখিকার "সেকালটা যেদেশে কেটেছে সেটা সুজলা-সুফলা মলয়জ শীতলা বাংলাদেশ নয়, সে দেশটা রাজস্থান।"

বিদুষী লেখিকার বর্ণনা থেকে সেকালের বিবাহের দেনা-পাওনার মূল্যবান তালিকা যেমন পাওয়া যায় ; তেমনই জানা যায়, বারো বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না দিলে 'জাত' যেত। "অনেক তার আইন কানুন ছিল। জাতটা কিরকম ভাবে যেত", তা অবশ্য লেখিকা জানতেন না। সেকালের কলকাতার যানবাহন, সামাজিক প্রথার নানা কথাও এখানে বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "সেকালের শ্বশুরবাড়ির গুরুজনেরা বেশ অকরুণ বা নিষ্ঠুর প্রকৃতির হতেন বা ছিলেন।" এই রকম নানা খবরাখবর, নানা তথ্য অত্যন্ত সরস ভঙ্গি ও পরম আন্তরিকতায় এই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন লেখিকা। সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ও বড় কম নয়। কত ঘটনা, কত মানুষ, কত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যে লেখিকা পরিচিত হয়েছেন, তার কথঞ্চিৎ বিবরণ এখানে পাঠ করা যাবে। বইটির প্রকাশমান অতি সাধারণ। এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশে যত্নবান হলে পাঠকের আনন্দের পরিমাণ আর একটু বাড়ত।

চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা লেখিকার প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংকলন। 'আমার লেখার গোড়ার কথা' সহ মোট তেইশটি রচনার একটি অনবদ্য সংকলনে লেখিকা তাঁর ভাবনাচিন্তা, সমাজমনস্কতা ও মনীষার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই গ্রন্থের সমস্ত রচনাই নারী তথা নারীর সমস্যা বিষয়ক। বহু জনহিতকর সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে লেখিকা সমাজের নানান সমস্যা, বিশেষ করে নারীর সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত থেকেছেন। দেশ-জাতি তথা নারী-সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলির প্রচার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির জন্য এখন বহু সভা-সমিতি ও আন্দোলন হচ্ছে। লেখিকার এই রচনাগুলি নারীসমস্যার নানা বিষয়ে আলোকপাত করেছে। নিছক সাজানো কথার কিছু উচ্ছ্বাস নয়; নয় দায়সারা কিছু বিবৃতি। প্রতিটি রচনায় লেখিকার তীব্র মানবতাবোধ, সমাজসচেতনতা ও অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পঠন-পাঠনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা থাকায় তাঁর রচনাগুলি একই সঙ্গে মননশীলতায় সমৃদ্ধ এবং বক্তব্যে দ্বিধাহীন। অন্যের মতামতের চর্বিতচর্বণ না করে লেখিকা তাঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তা এই রচনা-সংকলনে স্বাদু গদ্যে পরিবেশন করেছেন।

তবে লেখিকার 'নারীর কথা' রচনাটির একটি মন্তব্য সম্পর্কে সামান্য নিবেদন আছে। এখানে তিনি লিখেছেন: "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশে কামিনী-কাঞ্চন শব্দটির অনাবশ্যক প্রাদুর্ভাব অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। নব্যবঙ্গের পূজ্য ভক্তিভাজন বিবেকানন্দের উপদেশেও ঐ মূল্যবান উপদেশটির অভাব নেই। এই সব দেখলে স্বতঃই মনে আসে তাহলে কি আমাদের জ্ঞানী সাধকদের কাছে তাঁদের মাতা কন্যা ভগিনীরা পিশাচী স্বৈরিণী।" (পৃষ্ঠা ২১)

শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের উপদেশ সম্বন্ধে অনেক ভুল ব্যাখ্যা নজরে এসেছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীও ঐ একই ভুল করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নারী জগন্মাতার প্রতিচ্ছবি। আত্মদীপ্ত হয়ে নারীও উচ্চতম জীবন-যাপনের অমৃত অধিকার লাভ করে সংসারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করুক—এই ছিল আধুনিক নারী-সমাজ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের মন্তব্য স্মরণে রাখলে আমরা অনেক ভ্রান্তি এড়াতে পারব। তিনি বলেছেন: "কামিনী মানে নারীতে স্ত্রী-বুদ্ধি; আর কাঞ্চন মানে ধন-ঐশ্বর্য—এক কথায় এষণা। পুত্রৈষণার জন্য স্ত্রী আর স্ত্রী-পুত্রের জন্যই কাঞ্চন—আর ঐগুলির পরেই লোকমান্য হবার ইচ্ছা—এ সবই ত্যাগ করা চাই। যুগে যুগে ঋষিদের যা অনুভূতি ঠাকুরেরও সেই অনুভূতি। তাঁরাও পুত্রৈষণা ও লোকৈষণা ত্যাগ করতে বলে গেছেন অমৃতত্ব-লাভের জন্য।" প্রসঙ্গতঃ স্মরণে রাখা দরকার, শ্রীরামকৃষ্ণ 'পুরুষ-কাঞ্চন'-এর কথাও বলেছেন।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর এই ব্যাখ্যা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা থাকার কথা নয় যে, এষণা ত্যাগের উপদেশের দ্বারা নারীকে হেয় করা হয় না এবং শ্রীরামকৃষ্ণও নারীর প্রতি দ্বেষ পোষণ করতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সীমাহীন মর্যাদায় নারীকে অভিষিক্ত করেছেন তাঁরা। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এই মহামূল্য পথনির্দেশের আসল সত্যটি ধরতে না পেরে অনেকের মতো জ্যোতির্ময়ী দেবীও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

এই জাতীয় ভ্রান্তি থাকলেও 'চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা'র গুরুত্বের তাতে কোনও হানি হয়নি। বক্তব্যে মতানৈক্য থাকতেই পারে। কিন্তু কোন রচনায় কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অশ্রদ্ধা জানাননি তিনি। ক্ষোভে দুঃখে বহু রচনায় তিনি হয়তো কোথাও কোথাও কিছু কঠিন হয়েছেন, কিন্তু এসবই তাঁর গভীর মানবতাবাদ ও সমাজ-সচেতনার বহিঃপ্রকাশ। আজকের সমাজে এই গ্রন্থের পঠন-পাঠন একান্ত জরুরি। এই গ্রন্থ যেকোন সচেতন মানুষকে নারীসমস্যার গভীরে যেতে সাহায্য করবে। এমন একটি মননশীল মহৎ গ্রন্থের জন্য কিছুদিন আগে প্রয়াতা শ্রদ্ধেয়া জ্যোতির্ময়ী দেবীর কাছে আমরা সকলেই ঋণী রইলাম। ☐

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

কালাডি (কেরালা) আশ্রম কোচিন ভারতীয় বিদ্যাভবনের সহযোগিতায় এর্নাকোলামে উক্ত উৎসবের আয়োজন করে। গত ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী কে. করুণাকরণ।

কোয়েম্বাটোর (তামিলনাড়ু) আশ্রম গত ১২ থেকে ২২ অক্টোবর কোয়েম্বাটোর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এক পদযাত্রার আয়োজন করে। মোট ৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া এই আশ্রম গত অক্টোবর মাস পর্যন্ত ২০টির অধিক বিদ্যালয়ে একদিন করে ভারত-পরিক্রমা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে।

বম্বে আশ্রম গত ৪ জুলাই জনসভা, ৮ আগস্ট কলেজ-ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা, ১৫ আগস্ট যুব-সম্মেলন এবং ২৫ সেপ্টেম্বর একটি সর্বধর্ম-সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। শেষের অনুষ্ঠানটিতে ১০জন যুবপ্রতিনিধি বিভিন্ন ধর্মবিষয়ে আলোচনা করেন।

পুনে আশ্রম গত ২৩ সেপ্টেম্বর ও ৫ অক্টোবর দুটি জনসভার আয়োজন করেছিল। ২৩ সেপ্টেম্বরের সভায় সভাপতিত্ব করেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি. সুব্রহ্মণ্যম।

এলাহাবাদ আশ্রম ৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রদের বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন উচ্চ-শিক্ষামন্ত্রী নরেন্দ্রকুমার সিং গৌর।

খেতড়ি আশ্রম সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে রাজস্থানের ৪টি জেলায় ২১টি জনসভা করে। এছাড়া এই আশ্রম গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর দুদিনের এক গ্রামীণ যুবশিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ৪৫১জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোম ১ থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতার আয়োজন করেছিল।

গত ৮ সেপ্টেম্বর **গদাধর আশ্রম (কলকাতা-২৫)** স্থানীয় বস্তিবাসী ছেলেদের নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ওপর 'তপন মেমোরিয়াল হল'-এ একটি নাটক মঞ্চস্থ করে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে:

আঁটপুর, আসানসোল, বম্বে, বারাসত, কাঁথি, গৌহাটি, জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদহ, মেদিনীপুর, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জি), শিলং, শিলচর, বারাণসী অদ্বৈতাশ্রম, বিবেকনগর (আমতলী, ত্রিপুরা)।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের মাধ্যমে পুরুলিয়া জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোসেনবেরা, কোতলুই ও সিমুলিয়া গ্রামের ৪৩৮টি পরিবারকে এবং পুরুলিয়া ১নং ব্লকের ৭১টি গ্রামে ১৮৬৮ কিলোগ্রাম চিঁড়া, ৬২২ কিলোগ্রাম গুড়, ২৮৬৬ কিলোগ্রাম গম, ২০০৩ কিলোগ্রাম শিশুখাদ্য, ২১৪ কিলোগ্রাম সয়াবিনের তেল, ২৯১টি ধুতি, ৩০৬টি শাড়ি, ৩৮৪ সেট শিশুদের পোশাক, ৪৩৭টি লণ্ঠন, ৪৩৭ সেট (প্রতি সেটে ৮টি করে) বাসনপত্র এবং ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বন্যাপীড়িত রোগীদের চিকিৎসা করা হয়েছে। ত্রাণকার্য এখনও চলছে।

কেরালা বন্যাত্রাণ

ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যারা আশ্রম-সংলগ্ন অঞ্চলে দুটি শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে চাল, তরিতরকারী এবং কাপড়চোপড় দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া তাদের মধ্যে চিকিৎসাকার্য করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ ভূমিকম্পত্রাণ

উত্তরপ্রদেশের টেহরি গাড়োয়াল জেলার ধনশালী তহশিলের জাখানা, তোলি এবং কোট গ্রামে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১০০ শাড়ি,

৩০০ পশমী কম্বল, ৩০টি ত্রিপল এবং প্রচুর পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন

উত্তরপ্রদেশ

উত্তরকাশী জেলার ভাতওয়ারি তহশিলের নেতালা গ্রামে প্রস্তাবিত ৬৩টি বাড়ির মধ্যে ২৫টি বাড়ি ছাদ-স্তর পর্যন্ত এবং ৩২টি বাড়ির স্টীলের কাঠামো নির্মাণ শেষ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ

পুরুলিয়া জেলায় বন্যায় গৃহহীনদের জন্য বাড়িনির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ছাত্র-কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর, পুরুলিয়া, রহড়া এবং **সারদাপীঠ বিদ্যামন্দিরের** ছাত্ররা ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নিম্নলিখিত স্থানগুলি অধিকার করেছে:

মাধ্যমিক পরীক্ষা

পুরুলিয়া: ১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ১৪শ; নরেন্দ্রপুর: ১০ম, ১৩শ ও ১৪শ; রহড়া: ১৩শ।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা

নরেন্দ্রপুর: ১৩শ ও ২০শ; সারদাপীঠ বিদ্যামন্দির: ১৭শ; রহড়া: ১৮শ।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ পরিচালিত ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের মাধ্যমিক পরীক্ষায় **আসানসোল, বরানগর, কামারপুকুর, মালদা, সরিষা, মনসাদ্বীপ, নরেন্দ্রপুর, পুরুলিয়া, রহড়া, সারগাছি, রামহরিপুর** ও **টাকী** রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের ছাত্ররা একশো শতাংশ সফল হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের স্টার মার্কস (শতকরা ৮০ ও তার ওপরে নম্বর) প্রাপকের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো:

আসানসোল—১৩০জনে ১৩জন, বরানগরে—১৬৬জনে ৩৮জন, কামারপুকুর—৭১জনে ১১জন, মালদা—৯৮জনে ২৩জন, নরেন্দ্রপুর—১২৪জনে ১০৩জন, পুরুলিয়া—৯৯জনে ৭১জন, রহড়া—২৩০জনে ১১০জন, রামহরিপুর—৫৬জনে ২জন, সরিষা—১৫৫জনে ৭জন, সারগাছি—৬১জনে ৩জন এবং টাকী—৫৩জনে ১জন।

১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের বি.এ., বি.এসসি. (সাম্মানিক) পরীক্ষায় **নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়ের** ছাত্ররা নিম্নলিখিত স্থান অধিকার করেছে:

স্ট্যাটিস্টিক্স: ১ম, ৩য় (দু-জন), ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ; অংক: ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ; পদার্থবিদ্যা: ৬ষ্ঠ; রসায়ন: ৭ম (তিনজন)।

কালাড়ি আশ্রম পরিচালিত ব্রহ্মানন্দোদয়ম বিদ্যালয় 'জেলা বিদ্যালয় সবজি চাষ প্রতিযোগিতা'য় ১৯৯১-৯২ খ্রীস্টাব্দের জন্য প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। পুরস্কারের মূল্য ৬০০০ টাকা।

চিকিৎসা-শিবির

রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গলের ব্যবস্থাপনায় গত ১৮ থেকে ২৪ অক্টোবর কামারপুকুরে চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। শিবিরে মোট ১৩৪জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। পল্লীমঙ্গলের পরিচালনায় এটি ছিল একাদশ শিবির।

গত ১৮ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত **কাটিহার আশ্রমের** ব্যবস্থাপনায় একটি চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ঐ শিবিরে ৮৯জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয় এবং চশমা দেওয়া হয়।

ত্রিবান্দ্রম আশ্রম গত ২ অক্টোবর এক চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে মোট ৬৭জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

কোয়েম্বাটোর আশ্রম গত ২৭ সেপ্টেম্বর অস্থি-চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ৭৫২জন রোগী চিকিৎসিত হয়।

পুরী মিশন আশ্রম গত ২৪ সেপ্টেম্বর একটি দন্ত ও সাধারণ চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২০৫জনের দাঁত ও ৩০৫জনের সাধারণ চিকিৎসা করা হয়।

গত ১৮ অক্টোবর **শ্যামলাতাল আশ্রম** একটি চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করেছিল। মোট ৬৭জন রোগী শিবিরে চিকিৎসিত হয়।

পোশাক বিতরণ

খেতড়ী আশ্রম বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৪৭ সেট বিদ্যালয়ের পোশাক বিতরণ করে। তাছাড়া ৬৩৬টি পাঠ্যপুস্তকও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়।

কালাডি আশ্রম ৩০০জন ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ের পোশাক বিতরণ করেছে।

সালেম আশ্রম গত ২১ অক্টোবর ৯৫জন অন্ধ ছাত্রছাত্রীকে পোশাক বিতরণ করেছে।

বহির্ভারত

উৎসব-অনুষ্ঠান

বহির্ভারতের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রসমূহে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঃ

বাংলাদেশের বালিয়াটি, বরিশাল, ঢাকা, দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও সিলেট এবং মরিশাস।

ঢাকা কেন্দ্রের দুর্গাপূজায় বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান; স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী; পরিবেশ, বন ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গয়েশ্বর রায় এবং যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সাদিক হোসেন যোগদান করেছিলেন।

মরিশাস কেন্দ্রের দুর্গাপূজায় মরিশাসের কৃষি, মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী মদন দুলু এবং পূর্তমন্ত্রী স্বারকেশ্বর গুংগ, ভেকোয়াজ পৌরসভার মেয়র পি. ঋগ্রু এবং মরিশাসে ভারতের হাইকমিশনার এ. এন. ঝা যোগদান করেছিলেন।

পরিদর্শন

গত ২৭ আগস্ট ভারতের সেচ ও জল-সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা ঢাকা আশ্রম পরিদর্শন করেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরেন্টো (কানাডা) ঃ গত ২৬ সেপ্টেম্বর এই বেদান্ত সোসাইটির পরিচালনায় একদিনের এক সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ধ্যান, প্রার্থনা, পাঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শিবির পরিচালনা করেন বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটনের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ এবং এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ।

গত ৩, ৪ ও ৬ অক্টোবর সোসাইটিতে মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও বিজয়া দশমী পালন করা হয়। মহাষ্টমীর দিন মা-দুর্গার পূজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, ভক্তিগীতি, স্তোত্রপাঠ ও প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যায় শান্তিজল প্রদান করা হয়। ২৫ অক্টোবর শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী (চিন্তাহরণ মহারাজ) গত ২২ অক্টোবর দুপুর ১২-৩০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। দেহত্যাগের চার মাস পূর্বে নয় সপ্তাহ তিনি হাসপাতালে ছিলেন। তারপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। কিন্তু হঠাৎই তাঁর শেষ মুহূর্তটি নেমে আসে।

শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সাক্ষাৎ শিষ্যের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি অদ্বৈত আশ্রমের মায়াবতী অথবা কলকাতা শাখার কর্মী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী প্রকাশনার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। দুবারে দীর্ঘ আঠাশ বছর তিনি এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পদে বৃত ছিলেন। তাছাড়া তিনি কয়েক বছর উদ্বোধন (রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার)-এরও অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি দিল্লী, কলকাতার ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং বেলুড় মঠে কাটিয়েছেন। আলাপচারিতায় তিনি অপরের মন জয় করতে পারতেন। সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তি এবং নিখুঁত কাজকর্মের প্রতি অতি সতর্কতা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শিবরাত্রি ও কালীপূজায় একাসনে সারারাত বসে বেলুড় মঠের নাটমন্দিরে তিনি পূজা দেখতেন। তাঁর লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ আছে। তাঁর সম্পাদিত 'অষ্টাবক্রসংহিতা' গ্রন্থটি তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঃ প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। □

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২৮ ও ২৯ মার্চ ডোমজুড় রামকৃষ্ণ ভক্তদল (হাওড়া) কর্তৃক ডোমজুড় কালীতলা প্রার্থনা-মন্দিরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৭তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। উৎসবের দুই দিনই স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ ও স্বামী বিমলাত্মানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন চারজন কৃতি ছাত্রকে সম্বর্ধনা ও পুস্তক উপহার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন প্রায় দুই সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং ৪০জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে বস্ত্র এবং ২০জন ছাত্রছাত্রীকে খাতার কাগজ বিতরণ করা হয়। উভয় দিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল বাউল সঙ্গীত, দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সঙ্ঘ কর্তৃক গীতি-আলেখ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সম্বলিত স্থিরচিত্র প্রদর্শন, ভক্তিগীতি, চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর: গত ২৩-২৭ ফেব্রুয়ারি আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বিশেষ পূজাদি ও প্রায় চারহাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়িপ্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসবের বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দ, স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী বামনানন্দ, স্বামী ঈশাত্মানন্দ, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, স্বামী গিরিশানন্দ, প্রব্রাজিকা অচিন্ত্যপ্রাণা, অধ্যাপিকা সুব্রতা সেন, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। শেষদিন সন্ধ্যায় গীতিনাট্য পরিবেশন করে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সঙ্ঘ। এই উৎসব উপলক্ষে সেবাশ্রমের প্রথাবহির্ভূত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের তৈরি হস্তশিল্পের আয়োজন করা হয় এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, চিত্তরঞ্জন: গত ১৪ ও ১৫ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, রক্তদান শিবির, নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠান-সূচীর প্রধান অঙ্গ। উভয় দিনই স্বামী অধ্যাত্মানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন স্বামী লোকনাথানন্দ, স্বামী বলভদ্রানন্দ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ডঃ হোসেনুর রহমান, হর্ষ দত্ত প্রমুখ। এই উৎসব উপলক্ষে নবনির্মিত কোচিং ক্লাস ও দাতব্য চিকিৎসালয় কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। দ্বারোদ্ঘাটন করেন চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের মহাপ্রবন্ধক জগদীশ উপাধ্যায়। প্রথম দিন সন্ধ্যায় সমীর রায় কর্তৃক বাউল সঙ্গীত ও দ্বিতীয় দিন গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হালালপুর, (নদীয়া): গত ৬ ও ৭ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৭তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বিশেষ পূজাদি ও প্রায় আড়াই হাজার ভক্তকে খিচুড়িপ্রসাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন বিকালে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী ব্রজেশানন্দ ও সাধুদাস চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় 'শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ'' গীতিনাট্য এবং সুবোধ গোস্বামী ও সম্প্রদায় রামায়ণ গান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তসংঘ, জামালপুর, মুঙ্গের (বিহার): গত ২২ মার্চ '৯২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব-উৎসব সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন নগরসংকীর্তন, বিশেষ পূজা, ধর্মালোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের সান্ধ্য ধর্মানুষ্ঠানে স্বামী একদেবানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং স্বামী লোকনাথানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনচরিত আলোচনা করেন।

রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী আশ্রম কান্দারা (বর্ধমান): গত ২৪-৩০ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে

আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রামায়ণ গান, ধর্মসভা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, নগরসংকীর্তন, ইন্দ্রজাল প্রদর্শন প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন এবং 'সঙ্গীতে রামকৃষ্ণ-কথামৃত' পরিবেশন করেন কামারপুকুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ।

পশ্চিম রাজপুর রামকৃষ্ণ সংঘ (কলকাতা-৩২)ঃ গত ১২ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সকালের দিকে বিশেষ পূজা, পাঠাদি ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। বিকালে স্বামী সংপ্রভানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর বক্তব্য রাখেন শিবশঙ্কর চক্রবর্তী ও নির্মলেন্দু বিশ্বাস। শেষে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ।

ভাবপ্রচার পরিষদের সম্মেলন

গত ৩০ ও ৩১ মে **সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন** আশ্রমে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং তৎসংলগ্ন বর্ধমান, বীরভূম ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৩৪টি আশ্রম থেকে মোট ২০৮জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৩০ মে সকাল ১০টায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সারগাছি আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অনাময়ানন্দ। সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন এবং ভাষণ দেন স্বামী ঋতধানন্দ, স্বামী দেবরাজানন্দ ও স্বামী দিব্যানন্দ। আশ্রমগুলির পক্ষ থেকে সদস্যবৃন্দও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। আগামী তিন বছরের জন্য পরিষদের আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়ক মনোনীত হন দীপক দত্ত ও সাঁইদাস চট্টোপাধ্যায়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ডাঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য** গত ২৪ এপ্রিল '৯২ বিকাল ৪-১৫ মিনিটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বোড়াল গ্রামে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন সাহিত্য-রসিক ও সুগায়ক। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অনেক কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মঠ-মিশনের অনেক সন্ন্যাসীর সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **রামকৃষ্ণ মজুমদার** গত ৪ এপ্রিল রাত ৮-৪৫ মিনিটে কলকাতার রাধানাথ চৌধুরী রোডের নিজ বাস-ভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহিভক্ত মনমোহন মিত্রের দৌহিত্র-পুত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী শিষ্যের ও মঠ-মিশনের অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীর তিনি স্নেহভাজন ছিলেন। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে তিনি উদ্বোধন পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য বর্ধমান-নিবাসী **দেবপ্রসাদ দত্ত** গত ১৯ এপ্রিল রাত্রি ২-১০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। কর্মজীবনে তিনি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক অধিকর্তা ছিলেন। তিনি আজীবন মঠ ও মিশন আয়োজিত বিভিন্ন ধর্মীয় ও সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্ধমানের রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিনাব্যয়ে চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবিরের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং প্রতিটি শিবির পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। বর্ধমান আশ্রমের ট্রাস্টি বোর্ডের তিনি সদস্য ছিলেন। কামারপুকুর আশ্রমের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বর্ধমান রোটারী ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **রাজলক্ষ্মী মণ্ডল** ১৫ মে অপরাহ্ণ ২-১০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত, বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বিজয়বসন্ত মণ্ডলের সহ-ধর্মিণী ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার তাঁর সান্নিধ্যে আসা সকলকেই মুগ্ধ করত। □

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

শিশুকন্যারা কি এদেশে অবহেলিত ?

অনেকেই মনে করেন যে, আমাদের দেশে মেয়েরা অনেক ব্যাপারেই ছেলেদের চেয়ে কম সুযোগ-সুবিধা পায়, যার ফলে মেয়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য খারাপ। এটি যথার্থ কিনা, তা দেখার জন্য স্কুলে যাওয়ার আগের বয়সের একদল ছেলে-মেয়ের (pre-school children) পরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছিল। হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী অঞ্চলে গ্রামের ৩০৪টি পরিবারে এই পরীক্ষা করা হয়েছিল। জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান, ছেলেমেয়ে মানুষ করার সামাজিক প্রথা, অর্থনৈতিক অবস্থা—এই সব খবর মায়েদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। পুষ্টির অবস্থা দেখার জন্য এইসব পরিবার থেকে ১৯২জন ছেলে ও ২০৪জন মেয়ের ওজন, উচ্চতা, বাহুর মাঝখানের পরিধি মাপা হয়েছিল এবং পুষ্টির অভাবজনিত কোন অসুখের লক্ষণ আছে কিনা তাও পরীক্ষা করা হয়েছিল।

এই সব পরীক্ষার ফলাফল মোটামুটিভাবে যা হয়েছিল :

(১) সব পরিবারেরই সামাজিক ও অর্থনৈতিক মান (socio-economic status) নিচু ছিল; পিতামাতার মধ্যে ৫৮ শতাংশ পিতা ও ৮১ শতাংশ মাতা অশিক্ষিত ছিলেন।

(২) ৭৩ শতাংশ ছেলের এবং ৫৬ শতাংশ মেয়ের ক্ষেত্রে 'দোলনা উৎসব' (cradle ceremony) পালিত হয়েছিল; এই উৎসব উপলক্ষে ১২ শতাংশ ছেলের ও ১ শতাংশ মেয়ের পিতামাতা লোক খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই থেকে ছেলের প্রতি পিতামাতার পক্ষপাতমূলক ব্যবহার বোঝা যায়।

(৩) পরীক্ষাকালে ৫১ শতাংশ ছেলে ও ৩০ শতাংশ মেয়ে স্তন্যপান অবস্থায় ছিল। অনেকদিন ধরে (৩৬-৫৯ মাস) স্তন্যপান করানোর অবস্থায় পাওয়া গেছে ৮৫ শতাংশ ছেলে ও ৭৬ শতাংশ মেয়ে।

(৪) কিছু কিনে খাওয়ার জন্য পয়সা দেওয়া (pocket money) হয়েছিল ৭১ শতাংশ ছেলে ও ৪৩ শতাংশ মেয়েকে।

(৫) অসুখ হলে ৮৫ শতাংশ ছেলেকে ও ৬৩ শতাংশ মেয়েকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; অর্থাৎ গড়ে ছেলেদের ২.৩ শতাংশ বার এবং মেয়েদের ১.৮ শতাংশ বার।

(৬) পিতামাতা কাজে বেরিয়ে গেলে ২১ শতাংশ একটু বড় বয়সের মেয়ে তাদের বাড়ির ছোট বাচ্চাদের দেখাশোনা করেছিল, কিন্তু সেই বয়সের ছেলেদের এসব করার ভার দেওয়া হয়নি।

(৭) দেখা গেছে যে, বেশি সংখ্যক মেয়ের মা মেয়েদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ছেলেদের অন্য গ্রামে পাঠিয়েও পড়াতে ইচ্ছুক ছিলেন তাদের মায়েরা।

(৮) খাওয়ার ব্যাপারে ছেলে ও মেয়ের কোন তফাৎ পাওয়া যায়নি। দুধ ও মাংস দেওয়ার ব্যাপারেও (যদিও অভাববশতঃ এসব জুটত কমই) কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

(৯) পুষ্টির অভাবজনিত রোগের লক্ষণ ব্যাপারে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোন ভিন্নতা পাওয়া যায়নি।

উপরি-উক্ত পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে, সামাজিক ভাবে যদিও ছেলেরাই বেশি কাম্য তবে খাদ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি। □

[Nutritional News, July, 1992, pp-5-6]

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে।... প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির মৃত্যুও ঘটে।... যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য এমনকি জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি।··· ধর্ম অনুসরণ কর, তোমরা গৌরবান্বিত হইবে; ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চিত।

স্বামী বিবেকানন্দ

মানুষ মূর্খের মতো মনে করে—স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে পারে। বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে না; জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে, সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ

যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না তিনিই রক্ষা করবেন।... তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভালকাজটা করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

জনৈক ভক্ত

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

He who served and helped one poor man seeing Siva in him, without thinking of his caste, creed or race or anything, with him Siva is more pleased than with the man who sees Him only in image.

Swami Vivekananda

পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। যত মত তত পথ। সকল ধর্মই সত্য।…
ভিন্ন ভিন্ন মত আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

জগতের ইতিহাস হইল—পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস। আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—অনুভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাত। যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

অমৃতকথা

অধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধিনিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয়ই জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

The only God to worship is the human soul in the human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of temples. If I cannot worship in that, no other temple will be of any advantage.

Swami Vivekananda

লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করেছি—তাঁর (ভগবানের) ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলক ধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলেই ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্রবিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন বৃথা।

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের জন্মভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই— বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

কাজ করা চাই বইকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কামভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 54-2248

JANUARY 1992

Licence No.
WB/NC/CL-3

R.N. 8793/57
Postal Reg. No. WB/NC-19

**স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র,
তিরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।**

উদ্বোধন

১ মাঘ ১৩৯৮ (১৫ জানুয়ারি, ১৯৯২) ৯৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে

অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন

- ☐ রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।
- ☐ **স্বামী বিবেকানন্দের** ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।
- ☐ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।
- ☐ **স্বামী বিবেকানন্দের** আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে **উদ্বোধন** যেন থাকে। সুতরাং আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা।
- ☐ **উদ্বোধন**-এর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য যা ধার্য করা হয় তা **উদ্বোধন**-এর জন্য আমাদের যে বার্ষিক খরচ হয় তার অর্ধাংশ মাত্র। বাকি অর্ধাংশের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাগণের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক দানের ওপর।
- ☐ বর্তমানে কাগজের দাম, বাঁধানো এবং মুদ্রণের ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ (ডাকমাশুল সহ) যেভাবে বেড়ে চলছে বা বাড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা আমাদের পক্ষে খুবই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথচ আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি যাতে আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবর্গের (যাঁদের অনেকেই সাধারণ মধ্যবিত্ত) ওপর বেশি চাপ না পড়ে। **উদ্বোধন-এর শারদীয়া সংখ্যাটি** সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণ এবং এই সংখ্যাটি **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ার জন্য অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। কিন্তু আমরা এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছে আলাদা মূল্য নিই না। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারেও আমরা **এবছর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য মাত্র চার টাকা বাড়িয়েছি**। ডাকখরচ ক্রমাগত বেড়ে চললেও গত দুবছরের মতো বর্তমান বছরেও ডাকমাশুল বাড়ানো হয়নি।
- ☐ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন**-এর সেবা **ঠাকুরেরই সেবা**। সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ '**উদ্বোধন**'-এর প্রতি তাঁদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবেন, এই আশা রাখি।
- ☐ '**উদ্বোধন**'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০ জি ধারা অনুসারে আয়কর-মুক্ত। আর্থিক দান চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে '**Ramakrishna Math, Baghbazar**'-এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানাঃ ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ ("**উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়**" যেন চিঠিতে বা M.O. কুপনে লেখা থাকে।)

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
যুগ্ম সম্পাদক

স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ☐ চুয়াল্লিশ টাকা ☐ সডাক পঞ্চাশ টাকা ☐ প্রতি সংখ্যা ☐ ছয় টাকা

সম্পাদকঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ — যুগ্ম সম্পাদকঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ